বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ

প্রথম খণ্ড

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬৫

প্রকাশক :
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

অক্ষর বিন্যাস :
টেক্‌নোগ্রাফিক
কলকাতা ৩৫

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ :
সুব্রত চৌধুরী

১

ছোটগল্প ও বাংলা ছোটগল্প

১.

ছোটগল্পের সংজ্ঞা পটভূমি প্রসঙ্গ প্রকরণ

সারা বিশ্বসাহিত্যে কথাসাহিত্য ধারায় ছোটগল্প বস্তুত নতুন এক শিল্পশাখা—নতুনত্ব তার অন্তঃস্বভাবে যেমন, তেমনি তার পোশাক-পরিচ্ছদেও। সময় বদলালে সচেতন সমাজ-মানুষের যেমন রুচি বদলায়, নতুন রীতির আকাঙ্ক্ষা ও আর্তি দেখা দেয়, পুরনো বহু-প্রচলিত সাহিত্য-শিল্প-শাখায় ছোটগল্পও তেমনি স্বাদবৈচিত্র্য এনে পাঠকদের সামনে আসে, রূপের অভিনবত্বে ও চমকে টানে। ছোটগল্প একেবারে কাছের সময়ের শিল্প-ফসল, অথচ আজ সারা বিশ্বের নানান শিল্প-শাখার মধ্যে তার আসন বিজয়ী রাজার মতো!

কাকে না গ্রাস করেছে এই ছোটগল্প? উপন্যাস, গীতিকবিতা, নাটক, 'ফেব্‌ল্' 'নভেলা' (Novella), 'এনেক্‌ডোট' (Anecdote)—সমস্ত কিছুকে কম-বেশি গ্রহণ করে সে সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি—তিলোত্তমা! আর, এই ছোটগল্প প্রত্যেক দেশেই জন্মমুহূর্ত থেকে নানাভাবে বদলাতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। উৎসমুখে নদী যেভাবে প্রকাশ্য, সমতল ক্ষেত্রে তার অন্য রূপ, অন্য বেগ। আবার সমতল ক্ষেত্রেই তার প্রাগ্রসরতার মুখে মুখে বেগ কমে-বাড়ে, চেহারার বদল হয় বার বার। যে গাছের বীজ থেকে নতুন গাছের জন্ম, মাটির ভেদে পরিপার্শ্বের ভিন্নতায় মূল সংযোগ ঠিক রেখে সে পুরনো গাছ থেকে পৃথক হওয়ার দাবি রাখে। ছোটগল্পও তাই। সে এক একজন স্রষ্টার হাতে অন্য আকার নিয়ে, অন্য প্রাণ ও প্রসঙ্গ, প্রকরণ ও প্রকৃতিতে নতুন হয়ে ওঠে।

তাই কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তাকে ধরা দুরূহ। যে মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষকে গভীর গূঢ় আনন্দদানের ক্ষমতা রাখে, বাসনা পোষণ করে মনে মনে, কিন্তু কোনো জাগতিক আচার-আচরণ, বিধিনিষেধের বাইরে থাকাতেই যার বিশিষ্টতা, তাকে, তার অন্তর্গূঢ় প্রকৃতিকে, তার প্রাণ ও প্রাণশক্তিকেএক কথায় বোঝানো বা ব্যাখ্যা করা যেমন দুরূহ, তেমনি কঠিন ছোটগল্পের সংজ্ঞা-নিরূপণ, তার স্বভাব-চরিত্রের প্রতিমা-নির্মাণ!

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ বা খসড়া কি ছোটগল্প? মোটেই না। এক একটি ছোটখাটো উজ্জ্বল মণিখণ্ডের মতো যেসব সার্থক ছোটগল্পের দীপ্তি—তার সঙ্গে উপন্যাসের আত্মীয়তা সাজে না। ছোটগল্প তার বিষয়-গ্রহণে যে কত বিচিত্র ধরনের বিষয়বস্তুকে স্বাগত জানাতে সক্ষম, তার প্রতিতুলনা সাহিত্যের অন্য কোনো শাখায় সম্ভব কিনা প্রশ্ন থেকেই যায়। বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক আন্তন চেখভ বলেছেন, 'আমি একটা এ্যাস্‌ট্রেকে নিয়েও গল্প লিখতে পারি।' রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি স্মরণীয়—'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা/নিতান্তই সহজ সরল' ছোটগল্পের বিষয় হবে, আর

তা পড়ার পর 'অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে/ শেষ হয়ে হইল না শেষ।' এদেশীয় এক প্রতিষ্ঠিত লেখক এরকমও মন্তব্য করেছেন, একটা ঢিল নিয়ে যে দিকে ইচ্ছে ছুঁড়লে যে মানুষটির গায়ে লাগবে, সে যেই হোক, তাকে নিয়েও একটা ভালো গল্প লেখা যায়।

এমন সব চিন্তাভাবনা ছোটগল্পের অশরীরী অস্তিত্বের ওপর একটা শরীরী অবয়ব আনার দিকে ঝোঁকে। অর্থাৎ, ছোটগল্পের বিষয়ে বোধ হয়, বিশাল পৃথিবী, তার বিবিধ বিচিত্র সমাজ ও মানুষের জীবনের যাবতীয় বৈচিত্র্য—প্রকাশ্য ও গোপন এবং গোপনতম—সবই স্থান পেয়ে যায়। ছোটগল্প বুঝিবা একধরনের elastic art যার বিষয়ের স্থিতিস্থাপকতা অতুলনীয়। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ছোটগল্পের প্রকরণ বা রীতি এমন 'তিলে তিলে নূতন হোয়'! এক বিদেশি সমালোচক মন্তব্য করেছেন, মানুষের জীবনটা হয় সবচেয়ে বড় গল্প-বলিয়ে! তাই যদি হয়, ছোটগল্প যদি জীবনেরই সার্থকতম শিল্পরূপে অন্যতম আধার হয়, তবে আধেয় হল তার জীবনেরও ভাঙচুর-হওয়া নানান খণ্ড খণ্ড অণুপ্রতিম রূপ! বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আবহমান কালের ধারায় মানুষের জীবনে যে কোটি কোটি অনুভূতি বিশাল আকাশের তারাদের মতো দপ্ দপ্ করে জ্বলে-নেভে বা জ্বলে নিভে যায়, এক একটি ছোটগল্পে সেই এক একটি তারার প্রজ্বলন বিষয়-গরিমার দীপ্তি দান করে।

এই প্রসঙ্গেই আমরা বিগত বিশ শতকের প্রথমার্ধের গোড়ার দিকে ফিরে তাকাই। 'কল্লোলে'র এক দক্ষ ভাস্কর-প্রতিম গল্পকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কিছু গল্প লেখার আত্মিক অভিজ্ঞতার আত্মোক্তিমূলক মন্তব্য স্মরণ কবি। রবীন্দ্রনাথ তো ছোটগল্প রচনায় একক বিস্ময়কর স্বয়ম্ভূ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উঁচু আসনে বসিয়েই তাঁর সমসময়বর্তী, অথচ অনুজ এক গল্পকারের কথা ধরে এগোনোয় নিশ্চয়ই প্রথম পূর্বসূরির অসম্মান করা হয় না!

অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'শত গল্প' সংকলনেব ভূমিকায় আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার নিশ্চিতি ও নিশ্চিন্তি দিয়ে বলেছেন, 'ছোটগল্প লেখবার আগে চাই ছোটগল্পের শেষ, কোথায় সে বাঁক নেবে, কোন কোণে। আর কোনো রচনার আরম্ভেই আমরা শেষ জেনে বসি না, না উপন্যাসে, না কবিতায়, না নাটকে। .... শেষ না পেলে ছোটগল্প নিয়ে আমি বসতেই পারবো না।' উপন্যাস ও কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের মিল-অমিলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সিদ্ধান্ত: 'উপন্যাসের বেলায় আমাদের দু'চোখ খুলে রাখতে হবে কিন্তু ছোটগল্পের বেলায় হতে হবে আমাদের একচক্ষু হরিণ, ব্যাধকে রাখতে হবে সর্বদা চোখের দিকে, যাতে দ্রুতবেগে পৌঁছে যেতে পারি নিরাপদ আশ্রয়ে। দু'চোখ খুলতে গেলেই দৃষ্টিভ্রমে পড়বো গিয়ে ব্যাধের সীমায়। এই যে একরোখা হয়ে ছোটা প্রারম্ভবিন্দু থেকে পরিশেষ বিন্দুতে, এর মাঝে ফুটবে রসের এককত্ব এবং সেইখানেই কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের মিল।'

এই প্রতিষ্ঠিত কথাকারের আর একটি অভিজ্ঞতার কথাও শেষমেশ উল্লেখ করতে

হয় প্রসঙ্গত: 'গল্পের আর সব উপাদান পেলেই আমরা রচনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু আকার সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিমাণজ্ঞান থাকে না। পরিমাণ জানলেই চলে না, পরিণাম সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া দরকার। গল্পের ধর্মনাশ হয় শুধু অসংযমে বা রসদ্বৈধে নয়, বেশিরভাগ হয় এই কেন্দ্রচ্যুতিতে।'

ছোটগল্প তার বৈচিত্র্যে অনেক এগিয়ে গেছে, তার মধ্যে এমন মন্তব্য তর্কের ক্ষেত্র অবশ্যই বাড়ায়।

মনে হয়, ছোটগল্পকে নিজের বিষয় খুঁজতে হয় না, বিষয়ই নানাভাবে ছোটগল্পের মধ্যে আসতে উৎসুক বিষয়ের শিল্পনিয়তি আর এক অর্থে। যে সময় ছোটগল্প সারা পৃথিবীর সাহিত্যে কিছু আগে-পরে দেখা দিতে প্রস্তুত, ঠিক সেই সময় থেকেই এই শাখার স্রষ্টারা নানান প্রশ্ন, সংশয়, জিজ্ঞাসা, বিশ্বাস—এসব সামনে রেখে নিজ নিজ সৃষ্টিতে মগ্ন থেকেছেন। এই সময়টা হল উনিশ শতক। এমন জিজ্ঞাসা যেমন বিষয়-সন্ধানে প্রাণিত করে লেখকদের, তেমনি ছোটগল্পের অঙ্গসজ্জা নিয়েও ভাবিত করে তোলে। ছোটগল্প ক্রমশ হয় জীবনের বিশ্বরূপ দেখার উপযোগী ছোট ছোট প্রতিবিম্ব-চকিত আয়না। আমরা আমাদের প্রসঙ্গকে এবার এভাবে গুছিয়ে বা গুটিয়ে আনতে পারি যে, যেহেতু ছোটগল্পের মধ্যে বা বিষয়ে জীবনের বিশ্বরূপ ঘটে লক্ষ লক্ষ মুহূর্তের প্রতিটির ব্যঞ্জনাগর্ভ চিত্র-রচনার মাধ্যমে, তেমনি ছোটগল্পের রীতিতেও দেখা দেয় নানান কৌশল, যা বিশ্বকর্মাকেও হার মানাতে পারে! বিশ্বের সমস্ত খ্যাতকীর্তি ছোটগল্পকাররা এমন বিশ্বকর্মার কর্মকেও প্রাচীনত্বের মধ্যে ঠেলে দিতে পারেন। বিষয়ের এমন ভরসাতেই রীতি আসে তার রক্তিম রূপ নিয়ে। ছোটগল্পের আধারে তার বিষয় যদি হয় তার প্রেম, রীতি হয় প্রিয়তমা। প্রেমিকের মতো ছোটগল্প বিষয়কে প্রেমের রূপ দিয়ে রীতিকে প্রেমিকার মতো আলিঙ্গন করে। সেখানে অবশ্যই 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'!

আপাতত analogy থেকে সরে আসি। ছোটগল্পের বিষয়ানুগ রীতির পরিচয় স্পষ্ট করা যাক। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের 'কেনিয়ন রিভিউ' পত্রিকায় তিরিশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'International Symposium on the Short story'—এই শিরোনামে রচনাটির মধ্যে একটি মন্তব্য করেন হার্বার্ট গোল্ড—'the story-teller must have a story to tell. not merely some sweet prose to take out for a walk.' কথাটা আমাদের মানতে নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবে না। কারণ ছোটগল্পে বলার মত টানা গল্প নিশ্চয়ই আমরা চাই। রীতির এটি একটি প্রথম ও প্রধান শর্ত—অন্তত ছোটগল্প-সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজও এর চাহিদা কমেনি।

অন্যদিকে আয়ান রীড একটা কথা বলেছেন ছোটগল্পের Problems of definition আলোচনায়—"in current usage 'short story' is generally applied to almost any kind of fictitious prose narrative briefer than a novel." *(The Short Story)* ছোটগল্পের আকৃতি কি হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে এরকম ধারণাকে কিছুটা মেনে নিতেও আপত্তি থাকে না।

ও' কন্নর (O' Connor) আর একজন ছোটগল্প-রীতির নিরীক্ষক যিনি ছোটগল্পের মধ্যে রোমান্টিক কবিদের মতো 'Romantic impulse'-কে ধরেছেন। 'Short stories do frequently focus on one or two individuals who are seen as seperated from their fellow-men in some way, at odds with social norms, beyond the pale. In this respect short stories can properly be called romantic.' কন্নর-এর ব্যাখ্যায় একটা কথা স্পষ্ট, ছোটগল্প হল, 'in essence a Romantic form: the Romantic prose form'। রোমান্টিসিজ্‌ম্‌-এর বিকাশের পক্ষে ছোটগল্পের আধার হল তার আকৃতির সীমিত ক্ষেত্র, আর ব্যক্তির মানস বিকাশে ছোটগল্প গীতিকাব্যের কাছাকাছি চলে আসে। এই কারণেই ছোটগল্পের বিষয় 'tends to concentrate on some significant moment, some instant of perception'. এ থেকেই ছোটগল্পের রীতি সম্পর্কে যে কথা স্পষ্ট হয়, তা হল, ছোটগল্পের বাঁধুনি খুবই আঁটসাঁট, আর তার মধ্যে একটা ব্যক্তি-মানসের রোমান্টিক অভীপ্সা চিত্রময় হয়ে ওঠার সুযোগ পায় খুব সংযতভাবে, ধীরে ধীরে।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া যাক, যা আয়ান রীড তাঁর *The Short Story* গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'the story typically centres on the inward meaning of a crucial event, on sudden momentous intuitions.' একটা বিশেষ ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ব্যঞ্জনায় ধরার চেষ্টা ছোটগল্পকারদের লক্ষ্যে থাকেই। সেই ঘটনার আত্মিক স্বভাবে যে বিমূর্ত ব্যঞ্জনা তা-ই গতি আনে ছোটগল্পে।

ছোটগল্পের রীতি সংক্রান্ত আমাদের এই আলোচনাকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—১. ছোটগল্পে গল্প থাকা আবশ্যিক। এই প্রসঙ্গে প্লট ও আখ্যান বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ২. ছোটগল্পের বর্ণনাব যে গদ্য তা হবে বিবরণধর্মী ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সংযত। ৩. ছোটগল্পের মধ্যে আধুনিক গীতিকাব্যের মতো কঠিন বন্ধন, রোমান্টিকতা এসে যায়। ৪. ছোটগল্পের বিশেষ বিশেষ ঘটনাব এমন এক অন্তঃশীল ব্যঞ্জনাকে প্রতীকত্ব দেন গল্পকাবরা, যা বস্তুত গল্পের সফল action-এর অনুসারী হয়।

ছোটগল্পেব আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তার আগে বলে নিই, ছোটগল্পেব চরিত্র তো থাকবেই, থাকবেই একটি চবিত্রের মাধ্যমে স্থির-লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে অমোঘ তিরবিদ্ধ করার মতো লেখকের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য— যাকে বলা যায় লেখকেব জীবনদর্শনের একমাত্র পরিপোষক। এসব কথা কিন্তু বহু-আলোচিত এবং স্থির ন্যায়ে স্থিত ছোটগল্পেব দীর্ঘ-প্রবাহিত রীতির সূত্রে।

এসবের সঙ্গে, আমরা ছোটগল্পের আরও তিনটি লক্ষণের কথা বলতে চাই। ১. 'a single impression on the reader' তৈরি কবাব নির্ভুল ক্ষমতা, ২. আগের বৈশিষ্ট্যের সূত্রেই 'ইমপ্রেশান্' তৈরি হবে 'by concentrating on a crisis,' ৩. আবার ওই 'crisis pivotal on a controlled plot'-এই নির্মিত রূপ নিয়ে দেখা দেবে। এসব

রীতিগত কথা অবশ্যই সারা বিশ্বের উনিশ-বিশ শতকের গল্পের সহজ প্রচলিত রীতির সূত্রেই আমরা রাখলাম। ছোটগল্পের 'চরমমুহূর্ত' বা 'মহামুহূর্ত' একটা রুদ্ধশ্বাস অবস্থা তৈরি করে দেয়। গল্পের plot-এ সেখানেই ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। প্লটের সঙ্গে জড়ানো যে সমস্যার চূড়ান্ত অবস্থা—তারও একটা পরিণামী ভাবনার প্রাক্‌চিত্র আঁকা হয়ে যায়।

ছোটগল্পের পরিণাম বা সিদ্ধান্ত-বাক্য এক অমোঘ অস্ত্র যা দিয়ে গল্পের আদ্যন্ত সমস্ত রকম turmoil হয় শান্ত, সেই সঙ্গে পাঠক-হৃদয়ের যাবতীয় turmoil হয় আরও অশান্ত, তোলপাড়। গল্পের শান্তি তার সিদ্ধান্ত বাক্যে, গল্পের অশান্তি তার পাঠকদের মর্মের গভীরতম প্রদেশে। ছোটগল্প এমন হবে যা একেবারে পাঠকদের মর্মে গিয়ে ঘা মারে, নিমেষে এক অলৌকিক অনুভূতির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তার চিরন্তন ব্যঞ্জনা কম্পন তোলে।

* * *

তা হলেই ছোটগল্পের দায়িত্ব—রীতির দিক থেকে, আবও নিবিষ্টতা দাবি করে তার ভাষা-প্রয়োগে। ভাষা যেমন হবে চিত্রধর্মী, তেমনি হবে চিত্রল, আমরা যাকে বলতে পারি 'চিত্রকল্পে'র অভিজ্ঞতা ও ব্যঞ্জনা-সমন্বিত। কবি যেমন কবিতায় এক একটি চিত্রকল্প রচনা করেন তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি-পরিশীলিত অভিজ্ঞতার আধার হিসেবেই, ছোটগল্পকারকেও চিত্রকল্পকে রচনা করতে হয় গল্পের আরম্ভ এবং শেষে নিশ্চয়ই, না হলে গল্পের সামগ্রিকতা (totality) ও ব্যঞ্জনা (suggestiveness) রচিত হয় না!

একজন সমালোচক বলেছেন, ছোটগল্প দেয় 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ'। অন্য এক সমালোচকের কথা—'ছোটগল্প হল চোরা-লণ্ঠনের আলোর মত'। কেবল একটিমাত্র কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও পরিণামী ব্যঞ্জনাময় লক্ষ্যেই তার সমস্ত আলোটুকুর প্রস্তুতি, প্রয়োগ, পরম প্রাপ্তি। এমন সব মন্তব্য অবশ্যই ছোটগল্পের রূপ ও রীতির অনুপন্থী। এত সব আলোচনার নির্যাসে আমরা ছোটগল্পের রূপ ও রীতির যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রধান বলে মনে করি তা হল :

> ক. আরম্ভের তির্যকতা ও চমৎকারিত্ব এবং প্রতীক ধর্ম, খ. কাহিনী ও ঘটনার একমুখিনতা, গ. এক রুদ্ধশ্বাস 'মহামুহূর্ত'-এ সমস্ত কিছুর দুঃসাহসিক আরোহণ ও সেই সঙ্গে অবরোহণের সূচনা, ঘ. রীতির মধ্যে লেখক-ব্যক্তিত্বের ও জীবনাগ্রহের রোমান্টিক প্রকাশ, ঙ. গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা, চ. ভাষা ও গদ্যভঙ্গির মধ্যে অবধারিত চিত্রকল্পকে সহজ স্বীকৃতি দান।

এগুলিই ছোটগল্পের সঙ্গে তার পাঠকের সম্পর্ককে মাকড়সার জালের মতো ঢেকে ধরে রাখে। তাই ছোটগল্পের বিষয় যেমন প্রধান, তেমনি তার প্রকরণের দায়িত্ব বুঝিবা অনেক বেশি। সাধারণ মাপের মানুষের থেকে মানুষ যদি কিছুটা বড় হয় বা বেশ কিছুটা ছোট হয়, সে ক্ষেত্রে তার জামার মাপের নিখুঁত রূপ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, গল্প ছোট হওয়ায় তার রীতির নিখুঁত অবস্থানকেও আদৌ অবহেলা করা একেবারেই দুরূহ।

২.

উদ্ভব ও বিকাশ : দেশে বিদেশে

ছোটগল্প ছোট আকারে হলেও প্লটের অভিধায় কাহিনী একটি, কখনো কিছুটা বিস্তৃত আকারে, কখনো বা প্রচ্ছন্নরূপে, থাকেই। একালের ছোটগল্প যদি চরিত্রকেন্দ্রিক হয়, যদিবা মননধর্মী, অথবা গভীর-গোপন মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েনের শিল্পরূপ, তবে সেসবের মধ্যে, কাহিনী, এবং তন্নিহিত রসাস্বাদ কোনো না কোনোভাবে মিলে যাবেই পাঠকের পক্ষে। নিশ্চয়ই উপন্যাসের আকারে কাহিনী নয়, ছোটগল্পের একান্তভাবে গূঢ় ব্যঞ্জনার উপযোগী প্রতীকাভাসে সংহত সংযত রূপেও। আর এই কাহিনী যদি ছোটগল্পের অঙ্গসজ্জার একটা উপাদান হয়, তবে পাঠক তেমন কাহিনীরস বড় ও বিস্তৃত আকারে যে কোনো দেশি-বিদেশি মহাকাব্যে, মিথে, আখ্যানে-উপাখ্যানে, পুরাণ-কাহিনীতে ইতিপূর্বে পেয়ে গেছে—ধরে নিতে হয়।

অর্থাৎ বিদেশি সাহিত্যে যথার্থ অর্থে ছোটগল্পের আবির্ভাব-ঘটনাকালের আগে নানাভাবে কাহিনীর ছিল সচল প্রত্যক্ষ রূপ। প্রাচীনকাল থেকে সরে এসে উত্তরকালে কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বোক্কাচ্চিও গিয়োভানি, ফাঁসোয়া র‍্যাবলে, চসার—এঁরা সাহিত্যের নতুন সূত্র ধরালেন, কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত বালক-কৃষ্ণের মত মোহন-বেশ ছোটগল্পে কোথায়? তার জন্য সারা বিশ্বসাহিত্য অপেক্ষা করেছে উনিশ শতকের আসার। গোটা উনিশ শতক আমাদের দেশের রেনেসাঁসের কাল, আর সেই রেনেসাঁসেব স্বভাব আন্তর্জাতিক মেঘের পাখায় বুঝি ভর করেই সারা পৃথিবীতে—অন্তত আমেরিকান, রাশিয়ান, ফরাসি, ইংরেজি—এই সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় মানুষদের বোধ ও বুদ্ধিমগ্ন-চিন্তাভাবনায় নতুন নতুন বীজ বিকশিত হওয়ার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেয়। এই প্রসঙ্গে তথ্য-নির্ভর দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যে একটি ছোট তালিকা তৈরি করা যাক। এমন উনিশ শতকের প্রয়োজনেই বুঝিবা, বিধাতার অলিখিত নির্দেশের মতো, আমেরিকান সাহিত্যে এসেছেন আর্ভিং হথর্ণ, এ্যালেন পো, বীচারস্টো, ফ্রান্সিস ব্রেড হার্ট, হেনরী জেম্‌স্, ও হেনরী। ফরাসি সাহিত্যে দেখা দিয়েছেন স্তাঁধাল, বালজাক, মেরিমে, দুমা, জোলা, মোপাসাঁ আর আনাতোল ফ্রাঁস। রাশিয়ান সাহিত্যে দেখি পুশ্‌কিন, গোগোল, তুর্গেনিভ, দস্তয়ভ্‌স্কি, টলস্টয় ও চেখভ-দের মতো তীক্ষ্ণধী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের। ইংরেজি সাহিত্যে পাই ডিকেন্স, কলিন্স, হার্ডি, ওয়াইল্ড ও কোনান ডয়েলকে।

এত বিস্তারিত করে তালিকা দেওয়ার কারণ, এইসব দেশের ছোটগল্পের জন্মলগ্নে এঁরাই ছিলেন পুরোভাগে, এঁরাই তার স্রষ্টা, লালন ও পালনকর্তা! আর, সবচেয়ে বড় কথা, এঁদের প্রত্যেকের জন্ম উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত, প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতিও গোটা উনিশ শতক ঘিরে! সেই জন্যেই বলি, বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের জন্মলগ্নের ঠিকুজি রচনার জন্যে বুঝিবা বিধাতার নির্দেশেই, অলক্ষ্যে চিহ্নিত ছিল এই উনিশ শতক। সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ করিয়ে দিই, রেনেসাঁস-উচ্চকিত উনিশ শতকে আমাদের বাংলা ছোটগল্পের প্রথম এবং একমাত্র পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথের জন্মও

সেই কাল ও সময় ধরে, তবে পূর্বসূরি বিদেশি লেখকদের পরে। রবীন্দ্রনাথ এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। আর বিদেশি ছোটগল্পের আবির্ভাবের তুলনায় বাংলা ছোটগল্পকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ সীমায় এসে অপেক্ষা করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো নতুন ছোটগল্পের জন্য মসিকে অসি করেছেন তাঁর বছর তিরিশ বয়সে পা রাখার কাল থেকেই।

কিন্তু সারা বিশ্বে বিশেষ করে উনিশ শতকই বা কেন এভাবে চিহ্নিত হল ছোটগল্পের জন্মের একমাত্র শুভক্ষণ হিসেবে? কোনো বিধাতার আশীর্বাদ নয়, অঙ্গুলি-হেলন নয়, কোনো দৈবের চমক নয়, ইতিহাসের যুক্তি-পরম্পরা, তার কার্যকারণ-নিহিত ন্যায়বোধ থেকেই ছোটগল্পের জন্ম-উপযোগী ভ্রূণ তৈরি হয়। বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবের কথা ধরা যাক। ফরাসি বিপ্লবে সারা ফ্রান্সে যেমন নানান ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়, যেমন ভাব ও বুদ্ধির জগতে বিস্ময়কর আলোড়ন-আন্দোলনের ঢেউ তুঙ্গে ওঠে, তেমনি তার প্রভাব অন্যান্য রাষ্ট্রেও মানুষের নিজের শরীরের ছায়ার মতো সত্য ও অবধারিত হয়ে দেখা দেয়।

ইতিহাস-পাঠক মানুষ জানে, একদিন বড় আয়োজনের, বড় মাপের ফরাসি বিপ্লবও ব্যর্থ হয়, সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার শিবনেত্রের মতো তিন অন্তর্ভেদী আর্তি, অথবা মানবদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তিন মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট-চিহ্নিত তিন বিল্বপত্রও হতাশা, ক্ষোভ, রক্তক্ষয়কেই উপচার করে তোলে। এসব থেকেই ফরাসিদেশে বসে বালজাক লিখলেন বস্তুতান্ত্রিক জীবননিষ্ঠ গল্প, লিখলেন নতুন চিন্তাভাবনার গল্প প্রস্পের মেরিমের প্রমুখ। অর্থাৎ কালের ইতিহাস যে সংকট তৈরি করে, সেই সংকট থেকে সংশয়, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বুদ্ধিপ্রাণ অভিমানী লেখককুল জন্ম দিলেন ছোটগল্পের। মুনি বাল্মীকি কথিত 'কিমিদিং!' এমন বিস্ময় সেখানে বিশেষ সক্রিয় হলেও তা-ই সত্য হয়ে আসে। ছোটগল্প লেখকদের আত্মিক শিল্প-সংকটবোধ থেকে জাত আর এক অভিনব শিল্প-শাখা, শিল্পের গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত শ্বাস নেওয়া আর এক প্রাঙ্গণ! অনেক ঘটনাই তো ঘটে, কিন্তু ছোট ছোট ঘটনা দিয়ে কি জীবনের ভিতরের সমস্যাকে যথাযথ বলা যায় না? ফরাসি লেখকরা এই জিজ্ঞাসা থেকেই জন্ম দিলেন ছোটগল্পের, নিরন্তর যন্ত্রণা আর জিজ্ঞাসায় যার জন্ম, বিকাশ, বিবৃদ্ধি!

এর উত্তাপ এসে লাগে ইংল্যান্ডে,—শেলী, কীট্স্, বায়রন যাকে কাব্যে লালন করেছেন, গল্পকাররা তাকেই নিলেন কথাসাহিত্যে। কিন্তু ছোটগল্প ইংরেজি সাহিত্যে এসেছে তুলনায় বেশ দেরিতে এবং এই উনিশ শতকেই! এই শতকের প্রথম দিকে ইংরেজি সাহিত্যে ছোটগল্প দেখা দেয়নি, তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ডিকেন্স আর থ্যাকারের জন্যে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজি ছোটগল্পের পূর্ণ-যৌবন রূপ। কলিন্স, কোনান ডয়েল, হার্ডি, ওয়াইল্ড—এঁরা একে একে এই ধারার সনিষ্ঠ পোষণে ব্যস্ত হন। কবিতা ও নাটকের দেশ ইংল্যান্ড। রাজতন্ত্রে রক্ষণশীল, সুখী দেশ ইংল্যান্ডে কিছু আন্দোলন হলেও ছোটগল্পের জন্মযন্ত্রণা বুঝি ছিল না বলেই তার এই শিল্পরূপ কিছুকাল দেরিতে আসে।

তাকানো যাক আমেরিকান ছোটগল্পের জন্মক্ষণটির দিকে। এখানে কিন্তু ছোটগল্প এসেছে একেবারে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই! ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর প্রয়াসে এর

প্রথম রূপ, এডগার এালেন পো-তে এর ঋদ্ধি এবং এর সিদ্ধিও! একে একে হথর্ন, হ্যারিয়েট, বীচারস্টো, ব্রেটহার্ট, হেনরী জেম্‌স্ এবং ও হেনরী—এঁরা সকলেই আমেরিকান ভাবধারার সঙ্গে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের সূক্ষ্ম ভাব-সূত্রটি যোজনা করে ছোটগল্পের আসরকে জমিয়ে তোলেন। এবং এসব প্রচেষ্টা কিন্তু সারা উনিশ শতক ধরে! আসলে, আমেরিকান সাহিত্য-ভাবনাটি আদিতে ছিল ইংরেজি সাহিত্যের মুখাপেক্ষী। ক্রমশ জাগে জাতীয় সচেতনতা, আসে নিজস্ব জাতিত্ববোধ সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা। আমেরিকান বুদ্ধিজীবীরা সরে আসতে চাইলেন সাগরপারের অকারণ ব্রিটিশ সাহিত্য-প্রীতি থেকে, স্বাতন্ত্র্য চাইলেন নিজেদের ভাবপ্রকাশের। অন্যান্য সাহিত্যশাখার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হল ছোটগল্পের, এবং, কখনো বিষয়ে কখনো বা প্রকরণে ছোটগল্পকে নিত্যনতুন করলেন পো, হেনরি জেম্‌স্ থেকে ও হেনরি—সকলেই, সাহসের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ব্যাপক ব্যবহারে, স্বতঃস্ফূর্ত মৌলিক চিন্তায়।

অন্যদিকে সারা রাশিয়া ধরে চলেছে জারের অপশাসনের তীব্র বেগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রতিবেগের গোপন-গভীর সক্রিয়তা। রাশিয়ান সাহিত্যে ছোটগল্প যখন জন্ম নেয়, তখন এই সাহিত্যের সারা আকাশ জুড়ে সোনার রঙের প্রলেপ। মহাকাব্যের মতো বিশাল ও গম্ভীর একাধিক উপন্যাসের জন্মদাতা পুশকিন, দস্তয়ভ্স্কি, টলস্টয় তখন ছোটগল্পকে নিজত্বে বিশিষ্ট করতে সচেষ্ট। একথা ঠিকই, স্থির স্থবির পুরাতনের প্রতি বিরক্তি, ক্লান্তির প্রকাশে বীতস্পৃহা, বা প্রতিবাদী বিরুদ্ধতা, অথবা স্বতঃস্ফূর্ত 'অপূর্ববস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা' দিয়ে সৃষ্টিকে প্রামাণ্য করার বাসনা থেকেই যে-কোনো শিল্পশাখায় ঘটে নতুনের জন্ম। রাশিয়ান সাহিত্যে ছোটগল্পও উনিশ শতকে ছিল নতুন এবং জারের অত্যাচার, সুদুর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত মানুষদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, অত্যাচারিত হওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পুরনো পচা নিয়মকানুনের প্রতি উপেক্ষা—এসব থেকেই লেখকদেব আছে ছোট কথা দিয়ে বড় কথা বলার বাসনা, তাগিদ। ছোটগল্প একেবারে তুচ্ছ, ছোটখাটো ঘটনা, তন্নিহিত আন্তর অনুভূতি সমূহেরই বড় শিল্পরূপ। রাশিয়ান লেখকদের অভিজ্ঞতা তারই অনুপন্থী ছিল সে সময়ে।

একদিকে শাসক ও শোষক শ্রেণীর অত্যাচার, আর একদিকে নিপীড়িত মানুষদের অসহায়তা—এ দু'য়ের মধ্যে লেখকরা নেমে এসেছিলেন নিপীড়িতদের দলে। সচেতন, স্পর্শকাতর লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে তা-ই হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে একাধিক লেখকও যেখানে কোনো না কোনোভাবে অত্যাচারিত-অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। পুশ্‌কিন, গোগোল, লারমেন্টাফ্, 'ওভারকোট'-এর চেখভ—এঁরা সকলেই সমানভাবে নবজাতক ছোটগল্পকে বলবর্ধক পুষ্টিদান করেছেন। উনিশ শতকের সময়সীমায় চার প্রধান বিদেশি রাষ্ট্র—আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ড—যেভাবে ছোটগল্পের পরিচ্ছন্ন সূতিকাগার ও জীবন গঠনের উপযোগী সংসার-ক্ষেত্র রচনা করেছে, তার সম্যক পরিচয় ও প্রভাব অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহিত্যশাখায় অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্প তো আন্তর্জাতিক বিনিসুতোয় গাঁথা মূল্যবান মুক্তোর মালা।

ছোটগল্পে সেরকম এক রাষ্ট্র প্রাচ্যের ভারতবর্ষ—যার কাজ আন্তর্জাতিক ছোটগল্প-

সাহিত্যে মূল্যবান মুক্তোর জোগান। এর মধ্যবর্তী বাংলাদেশে যে গল্পের জন্ম হয়েছে, বাংলা ভাষায় তা অনেক পরে এবং বিদেশি গল্পের দৃঢ় শিল্প-মন্ত্রকে আত্মস্থ করেই! প্রভাব নয় প্রেরণা, অনুকরণ নয় আত্মীকরণ, রূপ নয় স্ব-রূপ, গতানুগতিকতা নয় আবেগদীপ্ততা—এসব দিয়েই বাংলা ছোটগল্প কনিষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সাহিত্যের সংসারে একটি স্থায়ী জায়গা পায়। কনিষ্ঠ এই অর্থে যে সারা উনিশ শতক ধরে বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্প যেভাবে অসম্ভব চকিত সব ঢেউ রচনা করে, বাংলা ছোটগল্প তার সামিল হতে পারেনি তার জন্মক্ষণ বিলম্বিত হওয়ায়। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল এবং পুরনো বাতিল বৃক্ষরাজিকে সমূলে উৎপাটিত করার কুঠারটিও। তিনি সৃষ্টির বিস্ময় যেমন দেখিয়েছেন, সৃষ্টির বিচিত্র করার ক্ষমতাও দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন পুরনো পদ্ধতি নয়, নতুন রীতিতে এই নবজাতক সাহিত্য-শাখার জীবনস্পন্দনকে নিত্য বহমান করার পথ এবং প্রয়াসটিও!

আসলে, বিদেশি ছোটগল্প হল বাংলা ছোটগল্পের জন্মযন্ত্রণার এক প্রেক্ষিত। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ তখন সমানে চলেছে ভারতে, অতি ধীরে, সংগোপনে। এরই মধ্যে আসে রেনেসাঁসের প্রবল বেগ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা দেয় নতুন সৃষ্টির মত্ততা, আত্মিক উল্লাস। আগত রেনেসাঁসের বেগ ও ভিতরের দেশজ আবেগ—এই দুই মিলেমিশে বাঙালিদের বুদ্ধির জগৎ যেমন নাড়া খায়, জাতিত্ব বুদ্ধি ও অভিমান যেমন তীব্র হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষের দিকে মুখ ফেরাবার তাগিদও আসে। এটাও রেনেসাঁসের অলিখিত 'ম্যাণ্ডেট'। সাহিত্য-সংস্কৃতি তখন দেশীয় আবহাওয়াকে কখনো ত্যাগে, কখনো বা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিদেশি নতুনকে স্বাগত জানাতে উৎসুক, উন্মুখ। এমন দেওয়া-নেওয়ার মানস-সম্মিলনের কালে বাঙালি লেখকরা যে আপন-আপন মুক্তির কথা ভাবছিলেন, নানান দিকের 'ডাইমেনশান' থেকে তার বড় ক্ষেত্রফলে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ।

আর, রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ মন্দিরাবাদক—প্রথম নান্দীকার।

৩.

বাংলা ছোটগল্পের পদসঞ্চার

বাংলা ছোটগল্পের জন্ম রবীন্দ্রনাথের হাতে এবং উনিশ শতকের শেষ দশকের প্রথমে। আর, বলা যায়, তার জন্মমুহূর্তেই তার চারপাশে ছিল সুস্থ, সবল জীবনী-শক্তিদায়ক বিদেশি সাহিত্যের শ্বাস-প্রশ্বাস। রেনেসাঁসের কালে বাংলা ভাষায় বিদেশি সাহিত্য কম অনূদিত হয়নি! যখন সারা বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ-বাসনা প্রবলতম হয়, তখন মিলন-ভূমির প্রসারণে অনুবাদ ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই, এই অনুবাদের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অনুপ্রবেশ ঘটানো। ইতিমধ্যে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে তা সহজ হয়েছে, বাংলাদেশের জন্মের আগে ও জন্মসময়ে ছোটগল্পের সে প্রয়াস থেমে থাকেনি।

মূলত রেনেসাঁসের আর সব রকম দাবির মতো ছোটগল্পের জন্মদান বুঝিবা আর এক

দাবি হয়ে দেখা যাচ্ছিল। বাংলা ছোটগল্প যখন জন্ম নেয় রবীন্দ্রনাথের হাতে, তার আগেই রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ছোটগল্পের মূল্যবান সব পসরা পাঠকদের বিস্ময়ে স্তব্ধ করে রেখেছে, রেখেছে মোহবদ্ধ, মুগ্ধ ও অভিভূত করে! সেই মুগ্ধতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মাননীয় সভ্যরা গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের মতো করে। ইংরেজি ও ফরাসি—দুই ভাষায় সমান অভিজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিক গল্প অনুবাদ করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দু-তিন দশকে নানান পত্রিকায় ছোটগল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময়ের 'সাহিত্য' পত্রিকা ছোটগল্প নিয়ে নানান আলোচনায় মুখর হয় লেখক-বুদ্ধিজীবীদের তর্ক-বিতর্কে।

স্বভাবতই একেই আমরা বলি বিদেশি গল্পের শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবেশ রচনা! উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে— যেটা প্রথমার্ধের গঠন-যুগ পেরিয়ে-আসা সৃজন-যুগ, আত্মমুক্তির ও আত্মামুক্তির উল্লাসের কাল, সে সময়ে অনূদিত হয়েছেন মোপাসাঁ, চেখভ প্রমুখ। ফরাসি জানা এদেশীয় বুদ্ধিজীবী সোজাসুজি ফরাসি থেকে মোপাসাঁকে বাংলায় নিয়ে এলেও রাশিয়ান চেখভ সেভাবে আসেন অনেক দেরিতে। বাঙালিরা সে সময়ে যে কোনো অনুবাদ পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। রাশিয়ার চেখভ ইংল্যান্ডের সাহিত্য-জগতে অনূদিত হয়ে দেখা দেন সম্ভবত উনিশ শতক শেষ হওয়ার মুখে। তারপর ইংরেজির মাধ্যমে বাংলায় আসা! তাই রবীন্দ্রনাথের হাতে যে বাংলা ছোটগল্পের জন্মক্ষণ, সেখানে রাশিয়ান গল্পের গোপনতম শ্বাস ও প্রেরণা ছিল না। কিন্তু মোপাসাঁ প্রমুখ গল্পকারদের সঙ্গে এই বাঙালি, অসম্ভব প্রতিভাধর উনিশ শতকের সর্ব-কনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পবিচয়টুকু থাকলেও, বা ঘটলেও, ববীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের জন্মলগ্নে নিজেই একমাত্র স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির সাম্রাজ্যে একমাত্র স-মুকুট রাজা, স-দণ্ড সমালোচক, এককথায় একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বাংলা কথাসাহিত্যের যথাযোগ্য পিতামহ বঙ্কিমচন্দ্র। পুরনো সুপ্রতিষ্ঠিত সামন্ততান্ত্রিক কোনো রাজবংশের পিতামহ-প্রপিতামহদের মতো দীর্ঘদেহী বিশাল ব্যক্তিত্বের এক পূর্ণ-পুরুষ তিনি। ছোটগল্পকার না হলেও আপাতত তাঁর প্রসঙ্গ মনে পড়ছে এবং পড়তে বাধ্য। সেই সঙ্গে তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'ও। একমাত্র বঙ্গদর্শনই প্রমাণ করে, প্রতিভাধর কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক যেমন পত্রিকা, তেমনি পত্রিকার কঠিন মর্যাদার ও প্রতিষ্ঠার বড় সহায়তা বড় বড় ব্যক্তিত্বের সমবায়েই! 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা যেন নানান মণি-মাণিক্যের কারুকাজ করা বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো এক বিস্ময়কর তৈলচিত্র। তৈলচিত্রের বিষয় বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব। আর তাঁরই প্রতিভায় আলোকিত ফ্রেমের বিচিত্র পাথরগুলি। ফ্রেমটি তাঁর ও তাঁর পত্রিকার যেন শোভা, সম্পদ, সামগ্রিক সৃজন! 'বঙ্গদর্শনে'র আর এক নাম বুঝি 'বঙ্কিম-দর্শন', বঙ্কিমচন্দ্রেরও স্বঘোষিত সাম্রাজ্য বুঝিবা 'বঙ্গদর্শন'ও!

এমন একটি পত্রিকায় এত স্থিতধী মনীযা ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রসসাগর কথাকারের সবেগ পদচারণার মধ্যে ছোটগল্পের কি কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না!—এ প্রশ্ন ও সংশয় দানা বেঁধে ওঠে। এই সন্ধিৎসু প্রশ্ন আর সংশয়ের চোরা লণ্ঠন নিয়ে নিবিষ্ট

হলেও ধরা পড়ে, বঙ্গদর্শনেই ছিল ছোট আকারের গল্প লেখার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—যদিও একাধিক ক্ষেত্রে সেসব অন্তঃশীল থেকেছে উপন্যাসের একটা কাটা-ছাঁটা গোছানো ছকে। অনেকটা পোশাকের উপযুক্ত করার জন্য জামাকে সেলাইয়ের আগে দর্জির কাপড় মাপে-মাপে কেটেছেঁটে সুদৃশ্য জামার আদল আনার প্রয়াসের মতো।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' আর 'যুগলাঙ্গুরীয়'-এর কথা মনে পড়ে এরই যুক্তিসূত্রে। বেরিয়েছিল বঙ্গদর্শনেই আঠারোশো বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালের এমন দুটি বছরের গায়ে-গায়ে। কথাসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার-প্রকারের স্বভাব-লক্ষ্যের মাপে ছোটগল্প, বড়গল্প, নভেলেট, নভেল—এমন সব অভিধা দিয়েছেন বুদ্ধিমান, সতর্ক, রসিক পাঠকরা। আকাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ওই দু'টি রচনা ছিল বড়গল্প, এবং ভিতরে ছিল উপন্যাসেরই একটি নির্দিষ্ট ভ্রূণ রচনার সচেতন প্রয়াস—যাকে 'স্কিম' বলা যায় ইংরেজি সমালোচকের পরিভাষায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এমন রচনার প্রেরণায় কিনা বোঝা যায় না, হয়তো বা এই অবস্থাতেই থাকতে থাকতে, বাতাস, আলো-অন্ধকার, জল, মাটি, মাটির সার, অবধারিত আকর্ষণ, সজীবতা—এসবের পরিবেশ শিশির-পতন স্বভাবে অ-সচেতন বীজের অঙ্কুরোদগমের মতোই। 'শ্রীপূঃ' এমন আত্মগোপনকারী নামে একটি 'ছোটগল্প' লেখেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের এক সহোদর! বেরোয় সেই বঙ্গদর্শনের পাতাতেই এবং বাংলা বারোশো আশি সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়—স্মরণীয়, তার আগের মাসেই বেরিয়ে গেছে 'যুগলাঙ্গুরীয়'।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস আসে আচমকা, তার জন্যে পুরোপুরি তৈরি ছিল না ভারত তথা বাংলাদেশ! এমন তৈরি ছিলেন না বলেই এই শতকের যাঁরা অকৃত্রিম আবেগ ও বুদ্ধিমিশ্রিত শিল্পকর্মের বিশাল স্তম্ভ, তাঁদের অনেকেই ভাবেননি যে তাঁরা যা রচনা করছেন, করেছেন, সেখানেই তাঁরা প্রথম পথিকৃৎ! ক্রৌঞ্চীর বেদনায় শোকার্ত মুনি শ্লোক উচ্চারণের পরে 'কিমিদং'-এর মতো নিজ নিজ কোনো সৃষ্টি সম্পর্কে কোনো আত্মিক উৎকণ্ঠার পরিচয় কোনো কোনো স্রষ্টার মনে জাগেনি। যেমন উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র কি ভেবেছিলেন একবারও যে, তিনিই তাঁর প্রযাসের অ-সচেতনায় রেখে গেছেন একটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা উপন্যাস! যদি তা ভাবতেন তাহলে কখনোই উপন্যাসটির ভূমিকায় সমাজ-সংস্কারকের ও বৈয়াকরণের মতো কৈফিয়তগুলি দিতেন না!

যাই হোক, আমাদের কথা হল, বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শৈল্পিক প্রয়াসের অসচেতন স্বভাবে নিহিত ছিল একই সঙ্গে প্রথম ছোটগল্প সৃষ্টির ভ্রূণ-আবির্ভাব, ভ্রূণ-যন্ত্রণা ও আনন্দ-উল্লাস। গল্পের নাম 'মধুমতী'। পত্রিকার সূচি-ঘোষণায় ছিল রচনাটি 'উপন্যাস', কিন্তু 'ইন্দিরা' আর 'যুগলাঙ্গুরীয়'-এর থেকেও এটি ছিল পাতার সংখ্যায় ছোট—মাত্র চোদ্দ পৃষ্ঠার। একালে তো এর দু'গুণ বা তারও বেশি মাপের লেখা সৃষ্টিকর্মকে আমরা 'ছোটগল্প' বলতে অভ্যস্ত অবলীলায়! বাংলা ছোটগল্প তার উৎস-মুখে বিস্ময় জাগায় এইভাবেই!

তাই, শুধু আকার নয়, স্বভাবেও 'মধুমতী' নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওযার মতো

হাত বাড়ায় 'ছোটগল্পে'র দিকে, মুঠোর মধ্যে ধরেও বা! আসলে লেখকের পক্ষে রচনার বিষয়কে সংক্ষিপ্তির মধ্যে রাখার উদ্যোগ-আয়োজন, চরিত্রের দ্বন্দ্বকে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আরও অন্তর্গূঢ় করার ভাবনা-চিন্তা, মুহূর্তের ব্যঞ্জনায় স্রষ্টার মানস-অবগাহন, আর গল্পকারের সহানুভূতির চকিত দীপ্তিখণ্ডগুলি 'মধুমতী'র মধ্যে ছোটগল্পের অঙ্কুর-স্বভাবকে কখন যেন বুঝিয়ে দেয় স্বভাবী পাঠকদের। জীবনকে অভিমন্যুর মতো বেষ্টিত নানান সমস্যার কেন্দ্রে রেখে দেখা, তার গভীর-জটিল বিন্যাসে রূপায়ণের ক্ষমতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছিল না। যা তাঁর ছিল না, তাই আমাদের পক্ষে তাঁর শুভ-অভিনন্দনের সূচক হয় ছোটগল্পের সূত্রে। পুরাণের দশরথের সন্তানলাভ ছিল অভিশাপ থেকে আশীর্বাদের শুভ বাসনার ফল, 'মধুমতী'তে যে 'ছোটগল্পে'র অঙ্কুর-পরিচয়, আমাদের পক্ষেও যেন তা-ই! যুবক-নায়ক ব্রাহ্ম করালীপ্রসন্ন, তরুণী-সুন্দরী নায়িকা মধুমতী, আর মধুমতীর পূর্ব-স্বামী লালগোপাল দত্তের প্রেম-সম্পর্কের টানাপোড়েনে পূর্ণচন্দ্র একটিমাত্র সমস্যার বলয়ে, একটিমাত্র আকস্মিক দুর্ঘটনায় অনন্তের আর্তিকে এঁকেছেন এই গল্পে। তাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' রচনাতেই অবহেলায়, অ-সচেতনায় পরিত্যক্ত ছোটগল্পের বীজ-স্বভাব থেকে ভবিষ্যতের মূল্যবান বৃক্ষ জন্মানোর ব্যঞ্জনার সংকেত পেয়ে যায় চিরকালের পাঠককুল। বঙ্গদর্শনের প্রয়াস ছোটগল্পের জন্মের ইতিহাসে বিমাতার লালন-ধর্মে নয়, আপন মাতার স্তন্যদায়িনী মমতাতেই ধন্য। অন্তত জন্মের কোষ্ঠী-ঠিকুজির লগ্ন বিচারে তারই সমর্থন মেলে।

তা হলে, কথা আসে, বাংলা ছোটগল্পের পদসঞ্চার পর্বটি বহুর বিস্বনে বিম্বিত, না একক ব্যক্তিত্বে স্পষ্ট-চিহ্নিত! নতুন যে কোনো সাহিত্যধারায় জন্ম হতে পারে দু'ভাবে—এক, প্রচলিত ধারার স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত আনুগত্যে, দুই, যা কিছু প্রচলিত, পুরনো, প্রথাবদ্ধ—কি বিষয় কি আঙ্গিক—তার সবল বিরোধিতায়। বাংলা ছোটগল্পের পদসঞ্চার ঘটে আনুগত্যে নয়, বিরোধিতায় নয়, স্বতঃস্ফূর্ততায়। স্বতঃস্ফূর্ততাই রেনেসাঁসের আর এক অন্যতম শর্ত। বুদ্ধিমান, সতর্ক, সচেতন শিক্ষিত মনে যা কিছু সুপ্ত, গোপন, অনড় অথচ প্রকাশোন্মুখ, তাকে সবেগে ঘা মারার প্রয়াসই থাকে রেনেসাঁসের অন্তঃস্বভাবে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেয় সে। আর, এক একটা 'থির বিজুরী' হয়েই রূপ নেয় উনিশ শতকের একাধিক বাংলা সাহিত্যশাখার মধ্যে অন্যতম ছোটগল্প-রূপাবয়বে।

কিন্তু এর সঙ্গে সে সময়ের বাংলাদেশের ইতিহাস-সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্কের সন্ধিলগ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-নিষ্ঠা সেখানে তার অস্তিত্বের মাপকাঠি। এতেই ছোটগল্পের জন্মের কার্য-কারণ সম্বন্ধটা চিহ্নিত করা যায়। উনিশ শতক রেনেসাঁসের সুস্থ আবেগের কাল ঠিকই, কিন্তু তার সূত্রে সে সময়ের যে রাজনীতিভাবনা তা মনে আসেই। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারত তথা বাংলাদেশে তার শাসন-শোষণের পাশে ছিল নবাগত মানবতাবোধের বাণী, ছিল অতি ধীর নবজাগ্রত জাতিত্ব বুদ্ধি। তবে এত সব ভাব-ভাবনার স্রোতে রাজনীতি নিয়ে দেশীয় মানুষদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর বিরোধ যেমন বাধে, তেমনি দেশীয় মানুষদের মধ্যে পরস্পরের মতানৈক্যে আসে সংঘাত-সংঘর্ষ।

নতুন মতবাদে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এসবে নিজের মধ্যে অস্থিত-বোধ করতে থাকেন।

এরকম এক দ্বিধান্বিত মানসিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসেন শিলাইদহে! এখানে আসাটা ছিল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, কিন্তু পদ্মার তীরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর বড় মূলধন। আর সেই মূলধন দিয়ে একদিকে কবিতা, অন্যদিকে ছোটগল্প—দুই পক্ষকে বিস্ময়কর অভিনবত্বে নবজন্ম দেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের যে প্রথম জন্ম, তাতে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে তাঁর চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতি ও তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি। সদ্য-পরিচিত অনুন্নত, দরিদ্র, অশিক্ষিত তীরবাসীদের জন্য সহমর্মিতাবোধ হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের ধাত্রীমাতা, বলিষ্ঠ ব্যাপক জীবনপ্রেম তাঁকে জোগান দিয়েছে অনন্তকাল বেঁচে থাকার উপযোগী জারক রস।

জন্ম হয় বাংলা ছোটগল্পের। এর আবির্ভাব যেন এক নিপুণ সব্যসাচীর দু'হাতের সৃষ্টি অফুরন্ত সবুজ সজীব ফসল হিসেবেই! বাংলা ছোটগল্পের পদসঞ্চারটি এমন অফুরন্ত প্রাণশক্তি, ঊর্ধ্বের নীলিমার বর্ণে-আলোয় দীপিত। বাংলা ছোটগল্পের জন্মের পিছনে বেগ দিয়েছে রেনেসাঁস, প্রেরণা দিয়েছে বিদেশি একাধিক অনূদিত গল্প, পালন করেছে বিষয়ের ক্ষেত্রে সমকাল, জারকরস জোগান সম্ভব হয়েছে শিলাইদহের বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতায়। তাকে মনোরম করেছে প্রকৃতি ও কবির প্রকৃতি-প্রীতি। তার ভূমিগ্রহণের পর তার আধার হিসেবে এগিয়ে এসেছে সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা—একে একে 'সাপ্তাহিক হিতবাদী', 'সাধনা', 'সবুজপত্র', 'ভারতী' ইত্যাদি।

বাংলা ছোটগল্পের পদসঞ্চার পর্বে উনিশ শতকের শেষ দশকের কালটি অত্যদ্ভুত এক প্রেক্ষিত সামনে আনে। বিদেশি গল্পকারগণ সারা উনিশ শতক ধরে যা করেছেন ছোটগল্পের সাম্রাজ্যে, রবীন্দ্রনাথ একা একক ব্যক্তিত্বের গরিমায় মাত্র দশ বছরে তা-ই করে দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ দশটি বছরেই বাংলা ছোটগল্পের শৈশব, বাল্য, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন চিহ্নিত হয়ে যায়, যেন চণ্ডীদাসের রাধার মতো জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যুবতী রূপগ্রহণ!

একথা বলাই বোধ হয় সঙ্গত, বাংলা ছোটগল্পের জন্মলগ্ন বহু-ব্যক্তিত্বের স্পর্শে দীপিত নয়, এক প্রতিভাধরের তৃতীয় নেত্রের অগ্নির উত্তাপ ও আলোকময়তায় তার জন্মক্ষণেই ঘটে পরিশীলন! মহাভারতের ভগীরথ এনেছিল প্রবল-প্রবাহিনী গঙ্গা। তার ধারক হয়েছিল শিবের সমৃদ্ধ জটাজুট। ভগীরথের হাতের শঙ্খে ছিল গঙ্গার জন্মের শুভ-ধ্বনি ও গঙ্গার সাদর আবাহন-আশ্বাস। শিবের জটাজুটে ছিল গঙ্গার নানাবিধ মোহিনী রূপের প্রবাহ। বাংলা ছোটগল্পে পদসঞ্চারে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিবও, যিনি দু'হাতে গল্প লিখে গল্পের শিবজটাধৃত জাহ্নবীর মতো বিবিধ-বিচিত্র স্বভাবকে আঁকতে পেরেছিলেন। বাংলা ছোটগল্প সেই প্রবাহিত গঙ্গা—যার সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত অজস্র শাখাপ্রশাখা সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পকে নানান উৎসাহ দিয়ে বিচিত্র রূপ গ্রহণ করতে শেখায়।

বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথই নরম-কঠিন মাটি, তার অন্তর-নিহিত শিকড়-বাকড়, গাছগাছড়া, তার ঊর্ধ্বমুখী হবার উপযোগী অসীম আলোক-স্তম্ভ।

৪.

প্রথম প্রভাত : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

একে একে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গল্পগুলির কথা মনে রাখলে তাঁর গল্পধারায় বিশেষ মনোভঙ্গিটির চারটি স্তরের পরিচয় মেলে। ১. 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকার পর্ব, ২. 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের কাল, ৩. 'সবুজপত্র' অধ্যায়, ৪. শেষপর্ব—'তিনসঙ্গী' গ্রন্থভুক্ত তিনটি গল্পের রচনাকাল। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি গল্পকার রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাহ্নকাল' চিহ্নিত করে। এমন চারটি স্তরের মধ্যে 'ভারতী', 'নবজীবন', 'বালক' পত্রিকার কথাও স্মরণে আসে। ১২৯১-১২৯২-এর সময়সীমায় রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে লেখেন তিনটি গল্প। মূলত ১২৯৮ থেকেই শুরু হয় তাঁর গল্পসাহিত্য-পথে সবল পদসঞ্চার।

এসব তথ্য সামনে রাখার কারণ, আমাদের সাহিত্যে গল্প এসেছে এক একক অভাবনীয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টির আত্মিক উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ততায় নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব গল্পকে ধারণ ও বহন করেছে একাধিক পত্রপত্রিকাই। পত্রিকার মধ্য দিয়েই গল্পকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন আমাদের পরিচয়, তেমনি বাংলা গল্পের প্রথম প্রভাতের পরিবেশে আমাদের মানস-মুক্তিও ঘটে। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভিখারিণী' গল্পটি রচনার মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ। বিশ্বসাহিত্যের গল্পরেখায় এডগার অ্যালেন পো তখন জ্যেষ্ঠ, মধ্যে মোপাসাঁ আর চেখভ, অন্তে রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ বয়সে যেমন, তেমনি গল্পের আবির্ভাবেও! কিন্তু কনিষ্ঠ হয়েও বাংলা ছোটগল্পে যে সূচনা ও বেগ ঘটালেন, তাতে তাঁর স্থান ও গল্পের স্থান বিজয়ী রাজার ও রাজ-সিংহাসনের মতো চিহ্নিত হতে থাকে।

কথাটা নিশ্চয়ই বলা যায়, অল্প সময়ের পরিধিতে দু'হাতে গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ। যেন একটা প্রবহমান নদীর প্রবল বেগ, তা স্বতন্ত্র, অদ্ভুত আর প্রাণদায়ী, যেন অজস্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস-উল্লাস, এবং তাতেই নদী আর এক নতুন দ্বীপ ঠেলে তোলে নিচের মাটি থেকে—যেটা জন্ম থেকেই উর্বর, আকর্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্প লিখে এক নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করেন, জয় করে বিজেতার বীর-সম্মানে লালন পালন শাসনও করে যান! শাসন অর্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিশীলন, নির্দিষ্ট নীতি-নির্ধারণ। রবীন্দ্রনাথের হাতে যার সগর্ব সূচনা, সেই রবীন্দ্রনাথের হাতেই তার আবার অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যসৃষ্টি। বিষয়ে বিবিধ রসের স্বাদ সৃষ্টি, পোশাকে বিচিত্র রঙের বাহার দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপচার সাজানো।

এটা সর্বজনবিদিত, এবং প্রসঙ্গত আগেও বলেছি, গল্প লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহবাসী এবং পদ্মার তীরে বোটে পরিভ্রমণ করছেন ব্যক্তিগত ও জমিদারি কাজে। এই সময়ের গল্প-রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য—'সাধনার যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) ফরমাশ আসত, গল্প চাই। গ্রাম্য-জীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি

গল্প।' তাঁর প্রথম দিকের গল্পে গ্রামজীবন, নিম্নবিত্ত সংসার ও সমাজ-জীবন হয় নামাবলী। তাঁর গল্পের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্পর্ক রক্তের। এক সমালোচক তথ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন—'১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ (বাং ১২৯৮—১৩০২)-এর মধ্যে পাইতেছি চুয়াল্লিশটি গল্প, সমগ্র গল্পগুচ্ছের অর্ধেকের কিছু বেশি, প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ পত্রিকার জন্য রচিত।' এই কয়েক বছর 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্য রচনার সময়।

রবীন্দ্রনাথ যখন গল্প লিখতে বসেছেন, তখন সারা বিশ্বে উনিশ শতকের শেষতম দশকটি বাদ দিয়ে বাকি বিশাল সময় ধরে ছোটগল্পের একটা মোটামুটি আকার এসে গেছে। খড়-মাটি দিয়ে আকার রচনার পর তাতে নানা রঙের মূর্তি গড়া হয়ে গেছে। পুতুলকে বড় করে তৈরি করা হয়েছে প্রতিমা। আগে বলেছি, বিদেশি গল্পের সঙ্গে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের তখন পরিচয়ের মাধ্যম একমাত্র কিছু অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা করতে বসে জন্মমুহূর্তে যাকে করেছেন প্রতিমা, তাকেই দিলেন নানান অবযব, পূর্ণতার মধ্যেও বৈচিত্র্য, অপূর্ণতাকে অপূর্ণ করেই ধরে নানা-খানা করে তার একাধিক নতুন নতুন পূর্ণ রূপের প্রতিরূপ।

তাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্প মিলেমিশে সাধারণভাবে ছোটগল্পের যে দেহ-মন-আত্মা, ঘর-বাহির-আকাশ রচনা করে, তা উত্তরসূরি বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ দিকনির্দেশক হয় নিঃসন্দেহে। তাঁর গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক গভীর-নিবিড় থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করে, সেগুলিকে মোটামুটিভাবে সাজালে দাঁড়ায় : ১. ছোটগল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে একটাই এবং একমুখী। গল্পের অন্যান্য উপকরণ তার প্রতিষ্ঠায় একমাত্র তৎপর হয়। ২. গল্পের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি 'মহামুহূর্ত' থাকবে যেখানে পাঠকের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা স্থির অথচ চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কম্পমান। ৩. একটি প্রধান কাহিনী, একটি প্রধান ঘটনা, একটি প্রধান চরিত্র অন্যান্যদের নিয়ে এমন এক জায়গায় থামবে যেখানে পাঠকের মন থেমেও থেমে যাবে না। তা হল তার উপসংহার, সেখানেই গল্পের মহত্তম ব্যঞ্জনা। শেষ এমন হবে যেন পাঠকের একেবারে মর্মে গিয়ে ঘা মারে। ৪. একাধিক সমালোচক যাকে বলেছেন 'Unity of Impressions' অর্থাৎ প্রতীতির সমগ্রতা, তা ছোটগল্পে থাকা প্রয়োজন। ৫. চরিত্রের বাস্তবতা, লেখকের বক্তব্য ও শিক্ষা জীবনের বৃহত্তম সত্যকে তুলে ধরবে।

এ সব শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ছোটগল্পগুলি আমাদের দেয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথেব ছোটগল্প আসার আগে স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখের ছোটগল্প-জাতীয় রচনাগুলি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যবহার করেন 'ছোটগল্প' কথাটি। তাঁর আগে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ যে গল্প রচনার প্রয়াস করেন, সেগুলিতে ছোটগল্পের শিল্পরূপের পূর্ণতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথেই তার সর্বপ্রথম সার্বিক বিস্ময়কর পূর্ণতা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি কৃতিত্ব, পুরনো যেসব অঙ্গসজ্জা, গড়াপেটা রূপ ছিল গল্পের, তাকেও বিচিত্রতায় ব্যবহার করে বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিকে দেন নবরূপ। রবীন্দ্রনাথ,

একেবারে তাঁর হাতেই ছোটগল্পের জন্মলগ্নে, গল্পকে বাদ দিয়েও গল্প লিখে গেছেন, যেমন, 'রাজপথের কথা', আবার গল্প রচনায় ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে প্রায় ছোটগল্পের সূচনা ঘটান 'ঘাটের কথা' গল্পে। যে শক্তি ও সাহস এসব গল্পে, তাতে বারুদে আগুন স্পর্শ করানোর মতো কাজ করে 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকা। গল্পের গোমুখ যায় খুলে।

এই 'হিতবাদী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই দেখা দেয় তাঁর প্রথম স্তরের মোট ছটি গল্প— 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'। শিলাইদহে থাকাকালীন প্রকৃতি-মানুষের যে নতুন সম্পর্কের মানস-উদ্বোধন ঘটে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়, তা-ই আসে মর্তপ্রীতি ও মানব-ভালবাসার মানবিকতার স্বরূপে ছোটগল্পগুলিতে, ছোটগল্পের বিষয়ে আসে বিচিত্রতা। ছোটগল্পের পায়ের নিচের মাটি যেমন হয় শক্ত, তেমনি মাটির ওপরকার নানান গাছপালার মতো ছোটগল্পে আসে বিষয়ের অভিনবত্ব। নির্জন, নিঃশব্দ মানব-হৃদয় এই গল্পগুলির নায়ক-নায়িকার স্থায়ী ভাবের মতো হয়ে ওঠায় যুগপৎ সুখ-দুঃখ-নিঃসৃত বেদনাই গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় রূপ পায়।

প্রথম পর্বের গল্পে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গ্রামীণ (rural), দ্বিতীয় পর্বে হলেন নাগরিক (urban)। এটা বিষয়ের দিক থেকেই বিবেচ্য। 'সাপ্তাহিক হিতবাদী' পত্রিকার কর্মকর্তারা রবীন্দ্রনাথের গল্পের এত 'serious' বিষয়ে তুষ্ট হলেন না। রবীন্দ্রনাথকে চলে আসতে হল 'সাধনা'র পাতায়। 'সাধনা'র সম্পাদকও হলেন তিনি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সাধনা'র পাতায় গল্প লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথের গল্পরসিক মনে আসে আরও বিচিত্রতা। কবি ক্রমশ হলেন নাগরিক বিষয়ের গল্পকার। বাংলা ছোটগল্পের জন্মলগ্ন থেকে অব্যবহিত কালের মধ্যে গল্পের বিষয়ে এল আরও বিস্ময়, আরও রহস্য, উন্মাদনা, প্রসারতা।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির গল্প লিখেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে ব্যক্তিকে যোগ করেছেন নিবিড় করে। এসব গল্প যেন রবীন্দ্রনাথেরই আত্মবিম্ব। নায়ক তারাপদর কথা লিখতে বসে 'অতিথি' গল্পে এঁকেছেন প্রকৃতি ও ব্যক্তির নিবিড়তম সম্পর্কের রূপ। এমনিভাবে লিখেছেন 'ছুটি'র মতো গল্প, 'শুভা'র মতো সুভাষিণী নামের সেই মূক ব্যক্তি-মেয়েটির গল্প। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো গল্পেই ব্যক্তিকে আড়ালে রাখেননি, অস্বীকার করেননি। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, যা প্রেমে মহৎ হতে পারে, জটিল হতে পারে, মতান্তরে রহস্যময় হতেও বুঝি তার কোনো বাধা নেই। নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প 'নষ্টনীড়' বিষয়ের দিক থেকে সমস্ত সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত। 'মধ্যবর্তিনী', 'দৃষ্টিদান', 'দুরাশা', 'মানভঞ্জন', 'নষ্টনীড়', 'মাল্যদান', 'দালিয়া', 'একরাত্রি', 'সমাপ্তি' ইত্যাদির মতো গল্প যেন খাঁটি মুক্তোর মালার মতো প্রসঙ্গত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা বিস্ময়ে চকিত, আনন্দে অভিভূত, মৌচাকের অজস্র মধুর ছোট ছোট আধারে স্বাদ গ্রহণে অস্থিত-চিত্ত!

প্রেম ছাড়াও তো মানুষে-মানুষে গভীর-নিবিড় সম্পর্ক হতে পারে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা, মায়ের স্নেহ, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সশ্রদ্ধ প্রীতি—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর,—এসবও গল্পের বিষয় হয়েছে অবলীলায় রবীন্দ্রনাথের হাতে। প্রমাণ, 'দিদি', 'পণরক্ষা',

'রাসমণির ছেলে', 'দান প্রতিদান', 'মাস্টারমশাই', 'শেষের রাত্রি'-র মতো গল্প। বাংলা ছোটগল্পের ধারার কথা মনে রেখে বলি, 'বিচারক' গল্পেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেহজীবী নারীর প্রসঙ্গ এনেছেন। আবার 'ব্যক্তি' তো কখনোই 'সমাজ' বিচ্ছিন্ন নয়, তাই 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'দেনাপাওনা', 'সদর ও অন্দর', 'হালদার গোষ্ঠী'-র মতো গল্পগুলির মধ্যে তীব্র পারিবারিক ও সামাজিক সংকটকে গল্পের বিষয়ে অন্তঃশীল করেছেন। একাধিক গল্পে এনেছেন অতিপ্রাকৃত রসের ধারা। বাংলা ছোটগল্পে এর স্বাদও নতুন। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'কংকাল', 'মণিহারা', আগের গল্প 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'গুপ্তধন'—এসব গল্পের অতিপ্রাকৃত-ভাবনা বাংলা ছোটগল্পের মূল্যবান সব মণিহারের মতো।

রাজনীতিও রবীন্দ্রনাথের গল্পে এতটুকুও অস্বীকৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। কোনো কালেই তিনি উগ্র স্বদেশিআনার সমর্থক হতে পারেননি। এর জন্য তাঁকে নানান সমালোচনা শুনতে হয়েছে। তাঁর কালে একসময়ে তাঁকে ভুল বুঝেছেন অনেকেই, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যাও হয়েছে তাঁর সমকালে, তবু গল্পে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি ও স্বদেশ-ভাবনাকে কত বড় জায়গায় যে বসিয়েছেন 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে তার প্রমাণ আছে। শিশুদের কথায় তাঁর একাধিক গল্প বিস্ময় আনে। তাঁর গল্পে ব্যক্তি-পুরুষদের থেকে জটিল নারীরাই বেশি জায়গা নিয়েছে, বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্যই পুরুষেরা অবহেলিত হয়নি, তবে স্বল্প কথায় তারা দীপ্তিময়, উজ্জ্বল, হৃদয়গ্রাহী। তুলনায় নারীদের দেখেছেন নানা-খানা করে, কখনো বা চোরা লণ্ঠনের আলোর মতো মূল আলোটি তাদের ওপরেই সব সময় গভীর-নিবদ্ধ রেখে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেষ স্তরে নিশ্চয়ই 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলির অন্তঃস্বভাব মেলে। এখানেই তাঁর গল্প-ভাবনার সম্যক সিদ্ধি। অভিজ্ঞ, পরিণত ভাষার গাঢ়তা শুধু নয়, পরিণত বয়সের প্রগাঢ় প্রাজ্ঞতাও এসেছে চরিত্র নির্মাণে, মনস্তত্ত্বের ব্যবহারে, তীব্র বুদ্ধির মধ্যেকার দহন-জ্বালার যথাযথ প্রয়োগে। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের প্রমাণপত্র শুধু নয়, বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একটা 'মাইলস্টোন' রেখে যাওয়ার উপযোগী গল্পই 'তিনসঙ্গী'র 'ল্যাবরেটরি'।

কোথাও কাহিনী ও ঘটনা-বিরলতা, কোথাও চরিত্র-প্রাধান্য, কোথাও বা গল্পের জন্য ভাল গল্প বলার প্রয়াস—এমন মিলেমিশেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিশাল গগনচুম্বী সৌধনির্মাণ। এমন সৌধনির্মাণ যেমন বিষয়-গরিমায় সম্ভব হয়েছে, তেমনি গল্প বলার টেকনিক-এর কারণেও এর বিশালতা স্বীকৃতি পায়। গল্পগুলির মধ্যে কোনো কোনো গল্পে নায়ক নিজেই নিজের কথা বলছে, যেমন, 'অধ্যাপক' গল্প, কোথাও লেখক স্বয়ং একটু বলে দেওয়ার পর লেখকের কাছ থেকে কাহিনীর সুতো কেড়ে নিয়েছে গল্পের অন্যান্য চরিত্র—যেমন 'নিশীথে'। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কাঠামোই তো অন্তরঙ্গ একটা চিঠি! রূপকথা, নাটক—এসব অঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার আড়ালে চমৎকার সব গল্প বলে গেছেন।

সাধারণ মানুষের ভাবনায় থাকে, সদ্য প্রভাতকালটিই যেন সারাদিনের বিশিষ্টতাকে নানাভাবে ধরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের সেই প্রথম প্রভাতের শুরু।

আর এমন দীপ্ত, উজ্জ্বল প্রভাতেই পাই আগামী দিনগুলির ছোটগল্প রচনার প্রাথমিক সব প্রতিশ্রুতি, চুক্তি ও শপথ। একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের পর থেকে যত গল্প লেখা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে একাধিক গল্পে লেখকের নিজের কথা নিজেই বলার পদ্ধতিটি এমনভাবে গৃহীত হয়েছে, যা আমাদের আজও সমান বিস্ময়চকিত করে।

বাংলা ছোটগল্পের সামগ্রিক জগৎ বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিকে হবে তাজমহল, রবীন্দ্রনাথ তার সম্পূর্ণ নির্মাণের পক্ষে এক কৃতী বিশ্বকর্মা। তিনি বাংলা ছোটগল্পের ভগীবথ।

৫.

গল্পের যাত্রাপথে মধ্যাহ্ন দীপ্তি : কল্লোলের কাল

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সপ্রাণ সজীব ফসলের মতো গল্পগুলির একমাত্র আধার ছিল পত্রপত্রিকা, আবার রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই প্রবলতম রবীন্দ্র-বিরোধিতার মাটি তৈরি করে এই পত্রপত্রিকাই—'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি'। বেশ কিছু অতি বুদ্ধিমান, নগরপ্রাণ, তীব্র স্পর্শকাতর তরুণ লেখক 'কল্লোল' প্রকাশ করলেন কুড়ির দশকে, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। এর দেখাদেখি একে একে বেরুল 'কালিকলম' ১৯২৬ ও 'প্রগতি' ১৯২৭-এ। এই সব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, একটা 'স্কুল' করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে আসা। সে সময়ে তরুণ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমকালীন সমাজ-জীবন-অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রবল অনিশ্চয়তাবোধ, রবীন্দ্র-ভাবনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া, অসহিষ্ণুতা, ভাব ও ভাষার জগতের বন্ধনের মধ্যে মুমুক্ষুর স্বভাব।

মোটকথা, দ্বিধা, যন্ত্রণা, এক ধরনের অস্থিত-চিন্ততাই তরুণদের সেই সময়-স্বভাবের থেকে উৎকেন্দ্রিক করছিল। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটগল্পে তার পরিচয় স্পষ্টত মেলে। কিন্তু কেন এই নদীর প্রবাহিত স্রোতের বিরোধী এমন তরঙ্গবিক্ষোভ? এমন বুদ্ধিগত বিক্ষোভের সমবেত প্রয়াসের 'প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ'—এমন একটা কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের এক প্রবন্ধে। লক্ষ করার বিষয়, এই 'রবীন্দ্রবিরোধিতা' বা 'বিদ্রোহ' কিন্তু সামান্য ব্যাপার নয়। তরুণেরা কতটা সফল হয়েছিলেন, সে বিচার না করেও বলা যায়, এই বিপরীত স্রোত কিন্তু ছিল সে সময়েরই এক অবধারিত ফল। একটা নতুন 'সিন্‌থেসিস'-এর জন্যই সময় 'থিসিস' ও 'এ্যান্টিথিসিস'-এর বিরোধ দিয়ে এমন এক অবস্থার স্তর সৃষ্টি করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

প্রসঙ্গত বলি, 'প্রতিক্রিয়া' ও 'বিদ্রোহ' এক নয়। কোনো কিছুর বিদ্রোহের মতো বড় রূপ পাওয়ার একেবারে উৎসে নিশ্চয়ই থাকে প্রতিক্রিয়া—প্রবল থেকে প্রবলতর। কিন্তু প্রতিক্রিয়া সব সময় বিদ্রোহের রূপে না-ও পৌঁছতে পারে। কল্লোলীয়দের মধ্যে রবীন্দ্র-ভাবনার প্রতিক্রিয়া ছিল ঠিকই, কিন্তু তা যথার্থ অর্থে বড় বিদ্রোহ হতে পারে কিনা, তাকে বিদ্রোহের অভিধা দান ঠিক কিনা, মূলেই সংশয় থাকে। মনে হয়, কল্লোল যথার্থ বিদ্রোহ নয়, এক প্রবলতম প্রতিক্রিয়াই।

দেশীয় রাজনীতির চেহারা যেমন বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে নানা টানাপোড়েনে উজ্জ্বল-রঙিন ছিল, ছিল এক-একটি প্রচণ্ড শক্তিমান উজ্জ্বল অগ্নিগোলকের মতো, তেমনি তাদের ব্যর্থতায় সে সময়ের যুবকপ্রাণে হতাশা, তিলতিল করে নৈরাশ্যও কম জমেনি! এল প্রথম মহাযুদ্ধ। অবশ্যই ছিল প্রতীচ্যে সীমাবদ্ধ, তাই প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের অভিঘাত আমাদের দেশে লাগেনি যদিও, তবু ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে তার অভিশাপ গ্রহণ করতে হয়েছে আশীর্বাদের টিকার মতো কপালে। যুদ্ধজনিত যুবসমাজের বেকারত্ব, তীব্র আর্থিক সংকট, মধ্যবিত্ত মানুষ ও সংসারের পায়ের তলায় মাটিহীন অনিশ্চয়তা, হতাশা, নৈরাশ্য, স্বপ্ন দেখতে উৎসুক, অতিরিক্ত 'সেন্সিটিভ', 'অভিমানী' লেখককুলকে ক্রমশ বিরক্ত করে, বিপন্ন করে, বিরোধী ও বিদ্রোহী করে তোলে ভেতরে-ভেতরে।

এর সূত্রে এল বিদেশি ভাবধারার সঙ্গে যোগ্য যোগ-সাধন। ১৯১৭-এ যে রুশ বিপ্লবের শুরু ও সফলতা, তার প্রভাব বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের যেমন প্রাণিত করে, তেমনি আবার সেই বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তর বিশ্ব-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর-নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে নেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের জন্মের প্রাক্কাল ও সমকালে বিশ্বসাহিত্যের বাংলা অনুবাদ একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও তেমনি অনুবাদ-ভাবনা ও অনূদিত গ্রন্থাদির সঙ্গে গভীর পরিচয় কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকাগুলির কেন্দ্রে সমবেত হবার প্রেরণা ও প্রাণ জোগায়। এই সূত্রেই সাহিত্যে গৃহীত হল মার্ক্স্, ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, এল বিশ্বজনীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা এবং মানসিকতার ছায়া, প্রেম-যৌনতা-মনস্তত্ত্বের বাস্তব ব্যবহার। ছোটগল্পের বিষয় ও রূপ বদলাতে চাইল, বদলালোও। নানাভাবে গৃহীত হলেন রুশ লেখক দস্তয়ভ্স্কি, টুর্গেনিভ, গোর্কি, টলস্টয় প্রমুখ। লরেন্স, মোপাসাঁ, ফ্লবেয়ার, জোলা, রোমা রোলাঁ, নুট হ্যামসুন, যোহন বোয়ার—এঁরাও সাগ্রহে নন্দিত হলেন তরুণদের পাঠে, লেখায়, চিন্তাভাবনায়।

এ সময়ের তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর 'কল্লোল'-নির্ভর ভাবনার প্রধান দায়বদ্ধতা দেখা দিল রবীন্দ্র-বিরোধিতায়। আমরা বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তিতে তা আগেই জানিয়েছি। প্রসঙ্গত বলি, তরুণ কল্লোলীয়দের রবীন্দ্র-বিরোধিতার কারণ ও যুক্তি কিন্তু স্পষ্ট ছিল না, পরিষ্কার হত না রবীন্দ্র-ভাবনার ধ্রুপদী স্বভাবের কাছে। তবু বিদ্রোহ বিদ্রোহের পথেই গেছে। বিদ্রোহের স্বভাবই এই। যখন সে দেখা দেয়, একটা যুক্তির সূত্র ধরে, যখন সে এগোয়, তখন আর সব প্রবল প্রয়াসের মধ্যে সেই যুক্তি যায় হারিয়ে বা ঢাকা পড়ে, তখন শুধু বিদ্রোহই বেগ-প্রতিবেগে একটা চরিত্র হয়ে ওঠে। তাই 'সবুজপত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথই একে একে 'হালদার গোষ্ঠী', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদির মতো গল্প লিখে দেখিয়েছেন কৃত্রিম সমাজের বানানো খাঁচার বিরুদ্ধে খাঁচা-বদ্ধ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সবল সক্ষম প্রকাশোন্মুখ বেরিয়ে আসার, বিচ্ছিন্ন হওয়ার, বিদ্রোহ করার আন্তর-সত্তার স্বরূপকে। কিন্তু সেই স্বরূপে প্রাণিত হয়েও বিদ্রোহের বেগে মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে চলেন তরুণ লেখক-তুর্কীর দল।

তাঁর 'কল্লোলযুগে' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো রক্তাম্বর-পরিহিত রবীন্দ্র-বিরোধী তান্ত্রিক কল্লোলীয়—স্মৃতিচারণের মতোই একালে বসে লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।' শরৎচন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পকর্মের ক্ষমতায় যদিও বড় ছিলেন না, তবু সামগ্রিকভাবে তাঁর পাত্র-পাত্রীদের রবীন্দ্রনাথের থেকে এক স্তর নীচে কিছুটা নামিয়ে এনেছিলেন। কল্লোলীয়রা আরও নেমে এলেন। এ কাজে অগ্রণী হলেন ছোটগল্পের সূত্রে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কল্লোলের সমকালে কল্লোলের প্রত্যক্ষত লেখক না হয়েও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সমকালীন হতাশা, বেদনা, ব্যর্থতাকে ঠিকমতো ধরেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং তাকেই আবেগ ও কবিত্ব নয়, গভীর মনন দিয়ে গ্রহণ করেছেন 'শুধু কেরানী', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'ভবিষ্যতের ভার', 'পুন্নাম' ইত্যাদি গল্পে। এই সমস্ত গল্পে যেসব নায়ক-নায়িকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তারা সময়ের দাবি মেটায়, আবার চিরন্তন মানবতার সম্পর্কেও, তার রূপভেদের তুল্যমূল্যকেও দেখিয়ে দেয়। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের নায়িকা বেগুনের যে অসহায়তা, হীন জীর্ণ ছবি, 'পুন্নাম'-এর নায়ক ললিতের যে আয়নায় নিজের মুখ দেখার মতো বিবেক-দংশন, 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পের মূল কথক সেই হেডমাস্টারের জীবনে ভয়াবহ দারিদ্র্যের নির্মম প্রহার, 'শুধু কেরানী' গল্পেব অসহায় দম্পতির অর্থনৈতিক দুরবস্থার ছিন্নমূল বিষাদকরুণ পরিণতি—এসব তো ববীন্দ্রোত্তর কালের গল্পের বিষয় ও চরিত্র এবং প্রতিপাদ্য সহ-জ ললাটলিখনই!

শৈলজানন্দ মননশীল লেখক নন, তবু গল্পের বিষয়ে ভৌগোলিক সীমা বাড়ালেন প্রথম 'কয়লাকুঠি' গল্প লিখে। শিল্পকর্মে এসব গল্পের শরীর শক্ত নয়, কিন্তু সেই সময়ের ছোটগল্প রচনার বিশেষ আবেগে এমন সব গল্প আমাদের আর এক নতুন জগতের স্বাদ দেয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্পষ্টত কল্লোলের লেখক হয়ে একেবারে নিম্নবিত্তের মানুষের অন্তরঙ্গ সঙ্গীর ভূমিকা নিয়েছেন ছোটগল্পে। তাঁর 'কাঠ খড় কেরোসিন,' 'যে কে সে', 'ধন্বন্তরি', 'দুই বার রাজা' ইত্যাদি গল্পে আমাদের মন্তব্যের প্রমাণ মেলে। যৌনকামনা, দেহভোগ ও লালসা—এসব কথা অচিন্ত্যকুমারের গল্পে যেমন এসেছে অবলীলায়, তেমনি থেকেছে বুদ্ধদেব বসুর গল্পেও। যৌনতার সঙ্গে অবক্ষয়, পচা-গলা সমাজের নাক-বন্ধ করা দুর্গন্ধ, হতাশা, ব্যর্থতা, চরম নৈরাশ্য, পতন-স্খলন—এসবও রক্ত-মাংস-মজ্জার সম্পর্কে জড়িত। বুদ্ধদেব বসুর 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পের নায়ক ভাস্কর ও নায়িকা এমিলিয়ার সম্পর্ক-ভাবনা ও সবশেষে এমিলিয়ার হত্যার করুণ চিত্রের স্মৃতি ভেসে ওঠে বর্তমান আলোচনা সূত্রে।

আর এক কল্লোল-চিহ্নিত লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল। ইনি ছিলেন কল্লোলের এক যৌবন-

প্রাণের গল্পকার। তাঁর যৌবন-প্রাণ ঘরে বাঁধা থাকেনি, সে পথ খুঁজেছে বাইরে, সংসার ছেড়ে সুদূরের কোন এক সীমা টানার প্রয়াসে। এই অর্থে জাত-রোমান্টিক প্রবোধকুমার একাধিক গল্পে কিন্তু ছবি রেখেছেন রূঢ় বাস্তবের। যাযাবর-প্রাণ একেবারে আশ্রয়হীন হয়ে গতিপ্রাণ থাকেনি। 'নিশিপদ্ম', 'বনমানুষের হাড', 'মর্মকামনা' ইত্যাদি গল্পে প্রবোধকুমার স্যান্যাল যে সমস্ত রমণীর শূন্যতাবোধ, অসহায়তা, স্খলন-পতনের ছবি এঁকেছেন তাতে লেখকের শৈল্পিক সহমর্মিতা আবেগবান শিল্পীর স্বভাবকেই স্পষ্ট করে।

কালিকলম-কল্লোলের অন্যতম কথাকার জগদীশ গুপ্তও কিন্তু কল্লোলে লিখেও এই লেখক-মানসিকতায় ছিলেন অ-কল্লোলীয়, নিজস্ব ভঙ্গিতে ও ভাবনায় স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী। তিনি যে বাস্তবতার সরণীর মুখ-নির্মাণের স্পর্ধা দেখান, তা তাঁর তথাকথিত জনপ্রিয়তা না আনলেও ছোটগল্পের জনপ্রিয়তাকে বিস্তারে নয়, গভীরে টেনে রাখে। 'পেযিংগেস্ট', 'দিবসের শেষে', 'যৌবনযজ্ঞের কবি' গল্পে কবির আত্মদর্শন যেন ভবিষ্যৎ-দর্পণই। তাঁর গল্পের কুশীলবরা কেউ ইন্সিওরেন্সের দালাল, কেউ প্রবঞ্চক, কেউ বা প্রবঞ্চনার শিকার। কোথাও বা একই পরিবারের বিবিধ বিচিত্র বাস্তব চরিত্রের সুবিধাবাদী স্বার্থপর মানুষের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে যায় তাঁর একাধিক গল্পপাঠে।

'কল্লোলের কুলবর্ধন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,—বলেছেন অচিন্ত্যকুমার। কিন্তু কল্লোলের নন, বাইরের, তিনি এবং তারাশঙ্করও কল্লোলের সময়সীমার শেষ লগ্নে আবির্ভূত। বিভূতিভূষণ প্রমুখ লেখক সেই সময়ের নিজ নিজ পরিবেশে যেসব গল্প লেখেন—সেগুলির অধিকাংশই আজ বাংলা ছোটগল্পের স্থায়ী জমানো আমানত। বাস্তবতার নতুন সংজ্ঞা দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মূল ভিত্তি ছিল বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে। 'অতসীমামী' গল্পটি প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। এই নামের এবং 'প্রাগৈতিহাসিক' নামের গল্পগ্রন্থও বেরোয় বছর দু-তিন তফাতে। দুই গল্প সংকলনের গল্প ও এই নামগল্প দু'টি বাংলা ছোটগল্পের নতুন মুখ খুলে দেয়। গল্পের বিষয় ও ট্রিটমেন্ট—দুই সূত্রেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা ছোটগল্প কল্লোলের কালেরই নতুন পথের সন্ধান দেয়।

কল্লোলের লেখক নন, তবু এই কালে বসে তারাশঙ্কর বৃত্তিতে ভিন্ন, অন্ত্যজ মানুষদের প্রেম, ঈর্যা, আদিম বৃত্তি, যৌনতা—এসবের মধ্যে জীবনের রূপ নয় স্বরূপ সন্ধান করতে বসে ভিন্ন লোকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন ছোটগল্পকে এবং তাঁর স্বভাবী পাঠকদেরও। 'নারী ও নাগিনী', 'বোবা কান্না', 'ডাইনী', 'বেদেনী'—এসব গল্পে তার পরিচয় আছে। বিখ্যাত 'তারিণী মাঝি' নামের গল্পে নায়ক তারিণীর যে জীবনার্তি, সুখীকে গল্পে সচল করে সেই জীবনার্তির যে রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় বিশিষ্টতার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা-ও লেখকের বিশিষ্ট জীবন-ভাবনারই অনুগ। তারাশঙ্কর, সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা ছোটগল্পের বিষয়ে এনেছেন অভাবনীয় বিস্তার! তাঁর গল্পে পশু আছে, মানুষ আছে, প্রেম আছে, আদিমতা ও যৌনতাও কবিরাজি গাছগাছড়ার মতোই বনজ গন্ধে উপস্থিত। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে পশু ও মানুষের জৈব-সম্পর্ক-ভাবনা, 'কালাপাহাড়' গল্পে পশুর

সচেতন সক্রিয়তা—এ সমস্তই বাংলা গল্পে নতুন! প্রকৃতিকে এই লেখক অস্বীকার করেননি ছোটগল্পে—প্রমাণ, 'রায়বাড়ী' গল্প, অস্বীকার করেননি ঐতিহ্যের ধারক-বাহক প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে একালের আধুনিক মানুষের ও সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও তার পরিণতির কথা, প্রমাণ—'জলসাঘর' গল্প। 'পিতাপুত্র', 'অগ্রদানী' গল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ তারাশঙ্করের সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে বৈশিষ্ট্যে ওতপ্রোত। রচনাভঙ্গি বিবৃতিপ্রধান, অতিরিক্ত নাটকীয়তায় দীপিত, ব্যক্তি-চরিত্র প্রধান হলেও তারাশঙ্কর বাংলা ছোটগল্পের মধ্যাহ্ন-দীপ্ত গগনে স্বরাজ্যে স্বরাট্!

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলের কালে বসে গল্প লিখলেও আদৌ কল্লোলের লেখক নন। তাঁর দৃষ্টি ছিল একই সঙ্গে একান্তভাবে মর্ত্য-ও প্রকৃতি-প্রেমিকের। মাটির পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে আকাশের নক্ষত্রখচিত বিশাল পটভূমিতে তাঁর মন কিসের যেন অনুসন্ধানী ছিল। তিনি 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রীদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নরদল'—এমন সব গল্প লিখে তাঁর উপেক্ষিত মানবকুল ও প্রকৃতি-মানসের যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি ছোটখাটো জাগতিক সুখ-দুঃখ, সংসার-পরিবারের কথাকেও শিল্পের মর্যাদায় রাজবেশ দান করেছেন। সমস্ত দিক থেকে এক সুষম শিল্পের সারল্য ও সহজাত প্রকৃতিকেন্দ্রিক এক আধ্যাত্মিক অভীপ্সা গল্পকার বিভূতিভূষণের ছিল কবচকুণ্ডল। কল্লোলের কালে এবং কল্লোলের শেষ সময়ের সীমায় আরও একাধিক সার্থকনামা গল্পলেখক মধ্যাহ্ন-দীপ্তির নানান ছটা রেখে গেছেন। যুবনাশ্ব, অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মনে করি।

আগেই বলেছি, বাংলা ছোটগল্পে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকাগুলি এমন এক আবহাওয়াকে লালন করে, সমর্থন করে, সাহিত্যধারাকে পুষ্ট করার মতো এমন সব রসের জোগানে সহায়তা করে, যা রবীন্দ্রভাবনা থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। এই সময়টা ছিল আধুনিকতার নতুন ব্যাখ্যা রচনায় ব্যস্ত। এঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহে প্রগতিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সর্বসময়ের প্রগতিমনস্ক শিল্পী, এঁদের প্রগতিভাবনায় সময়কে সামনে রেখে অন্য স্বর শোনানোর প্রয়াস—যা কল্লোলীয়দের মতে 'নবীনতা, অনন্যতা'। সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ গল্পের মধ্যে প্রধান স্থান করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রচ্ছন্ন সংশয়, নৈরাশ্য, হতাশা, ব্যর্থতা গল্পে মাথাচাড়া দেয়, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব তীব্রতা পায়, যৌনতা ও প্রেম সমানভাবে তাদের আসন করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার চেহারা বদলাতে থাকে। বেকার ছেলেদের মধ্যে যে 'বোহেমিয়ানিজম্' স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তা-ই গল্পের নায়ক-নায়িকাদের বাইরের স্বভাব ও অন্তঃস্বভাবে প্রোথিত হয়ে যায়। ছোটগল্পকাররা ব্যঞ্জনায় প্রতীক-প্রতিম টীকাভাষ্যে তাকে গল্পের ভিত্তি করে তোলেন। affirmation নয়, negation দিয়ে জীবন, জগৎ, মানুষ—সমস্ত কিছুকে নানা টুকরো করে দেখার প্রয়াসেই এই সময়ের লেখকরা বেশি তৎপর হন। ফলে বাংলা ছোটগল্প ধারায় মধ্যাহ্ন-দীপ্তির কালটি কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

৬.

বাংলা ছোটগল্প : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও উত্তরকাল

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সমস্ত দিক থেকেই এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব যেমন একক ব্যক্তিত্বে রেনেসাঁস এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি অনেকটা একক ব্যক্তিত্বে রেনেসাঁস ঘটিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে-শিল্পে। তাঁর সমকাল ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ দু'টি মহাসংকটকে চিহ্নিত করে। একটি প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আগেই বলেছি, ভারত তথা বাংলাদেশের বুকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব ছিল না, যা কিছু ঘটেছে পরোক্ষে এবং তা ঘটাও স্বাভাবিক, কারণ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে ভারতবর্ষে সে সময়ের যে কোনো বিশ্বযুদ্ধের কোনো না কোনো প্রতিক্রিয়া থাকতে বাধ্য।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একেবারে ভারত তথা বাংলাদেশের মাঝখানে এসে স্থান করে নেয়, তা ঘরের উঠোন ছেড়ে ঘরের দরজা-জানালায় প্রবলভাবে আঘাত করতে থাকে, করে ভাঙচুর! বাংলা সাহিত্যে তাই এই যুদ্ধের প্রভাব যেমন ব্যাপক, প্রত্যক্ষ, তেমনি গভীর থেকে গভীরতম। এ এক সন্ধিক্ষণের সংকট। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি অধ্যায়ের সূচক-প্রতিভা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল ও কল্লোল-এর প্রকাশ-সীমা দিয়ে বাঁধা একটি পর্যায় হল ছোটগল্প ধারার দ্বিতীয় অধ্যায়, নিশ্চিতভাবে যাত্রাপথে লক্ষণীয় মোড় ফেরানোর স্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর এক 'মাইলস্টোন'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে টানা ছ'টি বছর ধরে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের শুরুতেই যার শুরু, ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরের শুরুতেই তার শেষ। এই সামান্য ছ'টি বছর যেন রুদ্ধশ্বাস এক শ্মশানবাসী তান্ত্রিকের চরম সাধনার মুহূর্ত। রক্তচক্ষু দৈত্যের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেশের বাইরের ও ভেতরের জীবন-স্বভাবে ত্বরিত বদল ঘটায় নানান দিকের। যে সমস্ত বৃটিশ-বিরোধী গণ-আন্দোলন বার বার নানাভাবে আশা-নিরাশায় ওঠানামা করছিল, সেগুলির চরম রূপ তৈরি হয় বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে, সাম্যবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতায়, দেশীয় রাজনীতির নানান ক্রস-কারেন্টে। আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়াল মন্বন্তর, বিদেশি শাসক ও শোষক শ্রেণীর চরম অবিমৃষ্যকারী শাসনব্যবস্থা, কলকাতার বুকে বাংলাদেশের সীমান্তে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের পদসঞ্চার ঘটনা! বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মধ্যবিত্ত মানুষ ও সংসারে ভাঙন, অবক্ষয়, পচন, পতন, মেয়েদের চাকরি করতে বেরিয়ে আসার সুযোগে গণিকাবৃত্তির রকমফেরে আবির্ভাব, সর্বপ্রথম মজুতদার-কালোবাজারি-মুনাফাখোরদের সৃষ্টি— এসব দিয়ে ভারত তথা বাংলাদেশের জনজীবনে এক অস্বাভাবিক দুঃসহ চাপ সৃষ্টি হয়।

একসময় যুদ্ধ শেষ, তবু ভারত পরাধীন থাকে টানা একবছর দশ মাস। এর মধ্যে ছেচল্লিশের দাঙ্গা বাধে। আসে স্বাধীনতা, কিন্তু সে পরভোজী গাছের মতো সঙ্গে আনে দাঙ্গা, দেশ বিভাজনের লজ্জা ও জ্বালা, অসহায় বাস্তুহারার দল, অসম্ভব অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশীয় শাসকদের হাতে ক্ষমতা এলেও রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংকট ও সংঘর্ষ। এসবের মধ্যেই পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত

একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, চীন-ভারত সংঘর্ষ, সাম্যবাদী দলে ভাঙন, নকশাল আন্দোলন, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সে সময়ের শাসকদের সারা রাজ্যজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা—এসব চিহ্নিত ঐতিহাসিক সত্য হয়ে ওঠে।

এবং এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একে একে লক্ষণীয় বিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়। 'কল্লোল'-এর কালে যা ছিল নবীনতার, যৌবন-ভাবনার, আবেগের, রবীন্দ্র-বিরোধের—যুদ্ধের ভস্ম থেকে উঠে-আসা গল্পের শরীর ও মন থেকে সে সব সরতে থাকে, আসে যুদ্ধের প্রত্যক্ষতা-জনিত বাস্তব অবস্থার মধ্যেকার গভীরে প্রোথিত ক্ষতচিহ্নগুলি। যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই সে সময়ের তরুণ লেখককুলের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ দেখা দেন। আসেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ। যুদ্ধ শুরুর কিছু পরে-পরেই দেখা দেন সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ, কমলকুমার মজুমদার, সতীনাথ ভাদুড়ী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ। পঞ্চাশের দশকের প্রথম ও মাঝামাঝি কাল থেকে আবার একদল তরুণ লেখকের আবির্ভাব হতে থাকে যাঁদের কাছে যুদ্ধ হল বালক ও কিশোর কালের বিস্ময়-চকিত, কখনো বা অনাস্বাদিত তিক্ত অভিজ্ঞতা মাত্র। ষাটের ও সত্তরের দশকের গল্পকাররা দেশীয় শাসনে অভ্যস্ত অভিজ্ঞতায় আর এক গল্পের দিকে মুখ ফেরাতে সচেষ্ট।

অবশ্যই মনে রাখা দরকার, কল্লোলের কালের তরুণ লেখকরা, প্রায় ক্ষমতাবান সকলেই গল্পের বিষয়ে সমকাল নিয়ে অভিনিবিষ্ট হলেন। মন্বন্তরকে নিয়ে অসাধারণ, যদিও আবেগধর্মী কিছুটা, তবু, সার্থক গল্প লিখলেন প্রবোধকুমার সান্যাল 'অঙ্গার' নামে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কে বাঁচায় কে বাঁচে'র নামে, মনোজ বসু লিখলেন 'একদা নিশীথকালে' নামে। গণবিক্ষোভ ও তার প্রতিবাদী স্বভাব নিয়ে গল্প রচনা করলেন নবেন্দু ঘোষ তাঁর 'এই সীমান্তে' গ্রন্থের একাধিক গল্পের জন্ম দিয়ে। যুদ্ধের অসামান্য প্রতিক্রিয়া ও করুণ স্পর্শকাতরতার ছবি আছে রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খেলনা' গ্রন্থের গল্পগুলি, সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গভীর যক্ষ্মাক্রান্ত সমাজ-রূপের অসামান্য দলিল যেন! যে পতিতার কথা পেয়েছি কল্লোলের কালে 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে, নবেন্দু ঘোষের 'কান্না', বিমল করের 'আঙ্গুরলতা' এমন সব গল্পে সেগুলি যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসা তাদেরই অন্যরূপ! চিরকালের মানবতা-বিরোধী দাঙ্গার কথা মনে রেখে সমরেশ বসু তাঁর অসামান্য প্রথম যে গল্পটি আমাদের উপহার দেন, তা হল 'আদাব'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষকেও প্রসঙ্গত স্মরণ করতেই হয়। এই তিন লেখকই প্রখর কাল-সচেতন গল্পকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পে, যদিও আবেগ ও সেন্টিমেন্ট বড় কথা, তবু দেশীয় জাতিত্ব-ভাবনা তাতে উপেক্ষিত থাকেনি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখলেন নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী পুরুষ-রমণীর একই সঙ্গে পেশা ও প্রেমকে কেন্দ্র করে অসামান্য প্রেমের গল্প 'রস'। সুবোধ ঘোষের হাতে পাই 'ফসিল' 'গোত্রান্তর', 'অযান্ত্রিক', 'পরশুরামের কুঠার'এর মতো গল্প। শেষোক্ত গল্পে পতিতা ধনিয়ার আর এক

রূপ। 'ফসিল' গল্প যেন সুবিশাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই বৃহৎ শক্তিদের রাজনৈতিক চালবাজির এক অতি-সংক্ষিপ্ত চিত্র। এ গল্প যেন সেই অভিজ্ঞতারই 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ'। 'গোত্রান্তর' গল্পের মধ্যবিত্ত নায়কের যে প্রতিচিত্রণ চোখে পড়ে, তা একালের নবগঠিত সমাজ-ন্যায়ের সার্থক বাস্তব চিত্রায়ণ। 'সুন্দরম', 'অযান্ত্রিক' এসব গল্পে সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য ও স্বভাবকে অপূর্বত্ব ও অভিনবত্ব দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর আগে পর্যন্ত, প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের পরের সময় থেকেই বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাবের আধার ক্রমশ বদলাতে থাকে। শুরু রবীন্দ্রনাথ, পরে রবীন্দ্রনাথ তো নিশ্চয়ই, ক্রমশ 'সবুজপত্র', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাগুলি ধরে একে একে বিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশকেই গল্পকার হয়ে দেখা দেন প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখিকা-কুলের শরৎকুমারী চৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাধুরীলতা, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, সীতা ও শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া—এঁরা সকলেই। বস্তুত এঁরা ছোটগল্প লিখে প্রকাশ্য হন প্রধানত পত্রিকা ধরেই। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, জলধর সেন, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখও পত্রিকা-নির্ভর গোষ্ঠী ভাবনার বাইরের লেখক হয়ে থাকতে পারেননি।

এইসব তালিকা দিয়ে লেখকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো এখানে প্রধান কথা নয়, আসলে আমাদের কথা হল, যে ছোটগল্প ও তার গল্পকার পত্রিকাশ্রয়ী ছিল প্রথম থেকে বিশের দশকের শেষ পর্যন্ত, সেই নির্ভরতা কমে যেতে থাকে। 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি', 'উত্তরা' ও পরে 'অলকা'—এসব পত্রিকা বিশের দশকে দেখা দিয়ে ক্ষীণ অবয়বে তিবিশের দশকের শেষ পর্যন্ত গল্প-উপন্যাসকে, তাদের রচয়িতাকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে। কিন্তু ক্রমশ পত্রিকা বন্ধ হয়, লেখকরা পত্রিকা-মুখিন না থেকে ব্যক্তিগত প্রেরণাকেই তাঁদের গল্পের জন্মের উৎসমুখ করেন—মুখ্যত ব্যক্তিগত মানসিক প্রেরণা, মনন, গৌণ পত্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ!

অর্থাৎ, বাংলা ছোটগল্প ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থেকে তার অনিকেত স্বভাব ত্যাগ করে। 'কল্লোল' উঠে যায় উনিশশো উনত্রিশে। তিরিশের দশকের গল্পকাররা পত্রিকার চাহিদা ও দাবি মেটাতেই গল্পের কলম ধরেননি, সাহিত্যের যে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মধর্ম তারই মধ্যে সদা বর্তমান থাকে, গল্পকাররা তাতেই অজস্র গল্প লিখে গেছেন। গল্পের বিষয়ে এসেছে বৈচিত্র্য—রোমাঞ্চ, মনন, কৌতুকরস ব্যঙ্গ, রাজনীতি, তীব্রতম নাগরিক বুদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু পত্রিকার পাতা ভরানোর জন্য গল্পরচনা—এই তাগিদ ও আবেগের দিন অবসিত হয়। তবু যেসব গল্প পাই—তা লেখক-ব্যক্তিত্বেরই পরিচ্ছন্ন প্রতিচ্ছায়া, নূতন প্রসঙ্গ ও প্রকরণে আত্মপ্রকাশ!

স্বভাবতই এসব প্রসঙ্গের শেষে আসে পত্রিকা যদি গল্পের ধারক অর্থাৎ আধার না হয়, গোষ্ঠীনির্ভর সাহিত্য-ভাবনা যদি সে সময়ের বুদ্ধিজীবীদের সমবেত স্বভাবে তাড়িত না করে, তাহলে বাংলা ছোটগল্পের একাধিক স্বর্ণকমল—আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল থেকে উত্তরকালে বিস্ময়করভাবে পাই কী করে! আমরা গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে প্রসঙ্গত বলি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নতুন নতুন বিষয়ের চাপে সাহিত্যের

স্বস্থানকে নতুন করে নির্মাণ করার তাগিদ দেয়। তা যেন এক অলিখিত প্রেরণা, সময়ের ললাট-লিখন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এমন প্রত্যক্ষভাবে জীবন, জগৎ, মানুষকে, সমাজ ও অর্থনীতিকে নাড়া দেয়, সবের মধ্যে গভীর ফাটল ধরায় যে, সেখানে প্রচলিত প্রথার হয় ভাঙচুর! প্রত্যেকটি লেখক স্বস্থানে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র অবলম্বন করে গল্প লেখেন। তাই পত্রিকা হয় গৌণ, গোষ্ঠী-সাধনা ও মতবাদ হয় পরিত্যক্ত। আর এই কারণেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু—কেউই একটিমাত্র গোষ্ঠীর সাহিত্যিক অর্থাৎ গল্পকার হতে পারেননি, একটিমাত্র পত্রিকার লেখক হয়ে দেখা দেননি, কোনো বিশেষ পত্রিকার আদর্শে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘোষকের ভূমিকাতেও আসেননি। যুদ্ধের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে নিজেদের মতো করে ছোটগল্প লিখেছেন—যেগুলি সমগ্রভাবে সময়ের ফসল, কিন্তু সময়াতীত স্বভাবের অভিজ্ঞান।

আমরা মনে করি, সময় যখন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকের মতো উথাল-পাথাল হয়, সমাজ যখন চোরাবালির স্বভাবে বার বার ভিতরে অনড় ভাঙতে থাকে, মানুষ যখন বাঁচার জন্যই ভয়ঙ্কর অস্থিত ও অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়, তখন গোষ্ঠী জীবনের যে বন্ধন, মতবাদ তা সত্য হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও উত্তরকাল এবং পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত ছোটগল্প প্রকাশের আধার হতে পারে—এমন কোনো পত্রিকা-নির্ভর গোষ্ঠীচেতনা দানা বাঁধেনি প্রবীণ ও নবীন লেখকদের মধ্যে। এটা ইতিহাসের নিশ্চিত নিয়ম, নির্দেশ! অর্থাৎ 'কল্লোলে'র কালে থেকেও, কল্লোলের উন্মাদনাময় প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের মোহজালে দৃষ্টি রেখেও বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন এক এক করে আপন স্বাতন্ত্র্যে ছোটগল্পের ভূমিতে বিচরণ করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী লেখকরাও আপন ব্যক্তিত্বে গল্পের জন্ম দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকের নিজের পক্ষে দরকার মনে হয়নি কোনো পত্রিকার মতাদর্শগত তাগিদ, দরকার হয়নি পাশাপাশি কোনো লেখক-বুদ্ধিজীবীর গোষ্ঠীচেতনা লালিত সান্নিধ্য।

অবশ্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলাদেশের নবীন লেখকদের বিষয় ও প্রকরণ ভাবনায় যে অভিনব প্রেরণা দেয়, যেভাবে, সমস্ত কিছু ভেঙে নতুন কিছু গড়ার বীজ বপন করে, বাংলা ছোটগল্পের লেখককুল তাকে স্বাগত জানান। সে সময়ের তরুণ প্রজন্ম যুদ্ধের উত্তপ্ত অনুভব থেকে সরে এসে আবার গোষ্ঠীগত সাহিত্যভাবনায় নিযুক্ত হয়। একে একে নতুন নতুন পত্রিকা জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু তা কল্লোলের মতো প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসময়ের প্রতিক্রিয়ায় জাত কোনো আধার নয়, সময় তাদের এভাবে এক জায়গায় টানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটি সচেতন লেখককে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বে নাড়া দিতে থাকে। তাই ছোটগল্পের বিষয়-পরিধি যেমন বাড়ে, তেমনি প্রকরণের অভিনব কৌশলগুলি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পের পোশাককে বিচিত্রদর্শী করে তোলে। কোনো পত্রিকার ও গোষ্ঠীর মতের জন্য নয়, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার কারণেই বাংলা ছোটগল্পের ঘটে বিস্ময়কর বিস্ফোরণের মাধ্যমে চমকপ্রদ বিপুল সংখ্যক আলোর ফুলকির আকর্ষণ!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও উত্তরকাল বাংলা ছোটগল্পে নতুন লেখকদের হাত দিয়ে

যেসব বিষয়কে অবধারিতভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভাঙনটা অর্থাৎ সমাজ-মানস ব্যক্তি-মানস ও সামগ্রিক জীবন-বোধের মূল ধরে টানার ফলে যে অবক্ষয় ও ভাঙচুর, যে মানবতার ক্ষয়—সে সব অনেক বেশি 'ইন্ট্রোভার্ট' হয়ে দেখা দেয় ছোটগল্পে। ছোটগল্প বিষয় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে রীতি বদলায়। বাংলা ছোটগল্প কল্লোলের কালের চকিত নবীনতায় ও যৌবন-উন্মাদনায় যে ঢিলে-ঢালা স্বভাব নিয়ে কোথাও কোথাও দেখা দিচ্ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে ষাট ও সত্তর দশক পার হয়ে, তা ক্রমশ শিল্পের আঁট-সাঁট গড়ন পায়। শুধু বিষয় নয়, প্রসঙ্গ নয়, পরিবেশ নয়, প্রকরণেও ছোটগল্প ক্রমশ পরিশীলিত দীপ্ত রূপ পায়।

উনিশশো পঞ্চাশ সাল দিয়ে যে দশক শুরু, সেই দশকে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা দেশীয় রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলির সমবেত প্রয়াসে ও নানান বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে বিশিষ্টতা পেতে থাকে। দেশীয় একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ, তৎকালীন শাসক-বিরোধী সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বরূপ, বুর্জোয়া অর্থনীতিকে একমাত্র সত্য ভেবে তার ওপরেই দেশীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নির্মাণ, সদ্য-সৃষ্ট বেকারদের ভয়াবহ ক্রমবর্ধমান রূপ, যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি, নবাগত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থার ঢিলে-ঢালা অবস্থা, যুবজন-চিত্তে অস্থিরতা-অসহায়তা, মাঝে-মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তচক্ষু—এই সবই পঞ্চাশের দশক ও তার পরবর্তী সময়কেও নানান ঘটনায় জটিল করতে থাকে।

আর এই জটিল পরিবেশেই আবার নতুন একদল গল্পকার দেখা দেন বাংলা সাহিত্যে। যাঁদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বয়স ছিল বালককালের, যাঁদের সেই সময়ের চোখে ছিল রুদ্ধশ্বাস, আড়ষ্ট-ভয়ার্ত বিস্ময়, তাঁরাই স্বাধীনতা-প্রাপ্তিকালের আবেগাত্মক অবোধ উত্তেজনা-অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে এই বিশেষ দশকে লেখনী ধরেন। সময়টা চিহ্নিত করা যায় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কিছুটা পরবর্তীকালের সময়-সীমায়। এই সময়ে যুদ্ধ-সমকালে আবির্ভূত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ ছোটগল্পে যুদ্ধ-সময় ও উত্তরকালের সমাজে তার অন্তঃশীল অভিঘাতকে যথেষ্ট স্পষ্ট করেছেন। এবং এঁদেরই মধ্যে আসেন নতুন নতুন গল্পকার—যাঁদের লেখা ষাট ও সত্তর দশক ধরে যুদ্ধ থেকে সরে-আসা নতুন কিছু কথা বলতে তৎপর হয়। সেই সঙ্গে ছোটগল্পের প্রকরণও নতুন সাজ নিতে ব্যস্ত হয়।

অর্থাৎ যতই সময় যুদ্ধকাল থেকে সরে আসে, দেশীয় শাসনব্যবস্থার একাধিক পরিকল্পনা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মনে আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতা আনে, দেশীয় রাজনৈতিক সমস্যায় প্রতিবেশী একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-ঘটিত সংঘর্ষে দেশের মানুষের নূতন অভিজ্ঞতার জন্ম হয়, যুবকদের মধ্যে হতাশা, অসহায়তা, চতুর্দিকের নিষ্ফলত্ব সংশয় এসব থেকে আত্মিক সংকট তৈরি হয় এবং ষাটের দশকের শেষ থেকেই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রাজনীতির সূত্রে আসে নতুন নতুন বিচিত্র তাত্ত্বিক ও তাদের প্রয়োগগত কৌশলের চমৎকারিত্ব, ততই উপন্যাসের মতো বাংলা ছোটগল্পেও বিষয়ে

ভিন্ন স্বাদ বাড়তে থাকে। কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নিয়ে বেশ কিছু আন্দোলনের মুখোমুখি হয় সচেতন পাঠক-জনতা। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালের তিন-চারটি দশকের নবাগত লেখক কল্লোলীয় বিষয় ও রীতি শুধু নয়, যুদ্ধ-সময়ে যে সমস্ত তরুণ গল্পকার ফিনিক্স পাখিদের মতো দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের থেকেও অন্যভাবে গল্পের রূপ ও রীতি নিয়ে ব্যস্ত হন। অস্থিরতা, অবিশ্বাস, সংশয় যেমন এ সময়ের অভিজ্ঞান, তেমনি ক্রমশ চরিত্রদের 'ইন্‌ট্রোভার্ট' হয়ে ওঠাও এই গল্পকারদের বিষয়-ভাবনায় ছিল অবধারিত। বুর্জোয়া অর্থনীতি যেভাবে ধনীদের আরও ধনী করছিল, কৃষক-শ্রমিকদের উন্নতির নামে প্রহসনাত্মক ভূমিকা নিচ্ছিল শহরতলি অঞ্চলে ও গ্রামেগঞ্জে, তাতে গতানুগতিক নায়ক-ভাবনা থেকে সরতে চাইছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু যেমন, তেমনি উত্তরসূরি নতুন লেখকগোষ্ঠীও। এবং এটাই স্বাভাবিক, কারণ ছোটগল্প ও উপন্যাস এমনই কাল-চেতনার সঙ্গে সমন্বিত সাহিত্য এবং কাল-চেতনাকে অতিক্রম করারও বড় শিল্পাঙ্গিক—যার জন্য ওই জাতীয় পরিবর্তনই তার কঠিন নিয়তি, তার নিষ্ঠুর ভাগ্য। যেনবা তা, শিল্পের যিনি ঈশ্বর, যিনি তৃতীয় নয়নে একচ্ছত্রাধিপতি, তাঁর সবল কঠিন নির্দেশও! একে অস্বীকার করার ক্ষমতা ছিল না নবাগত লেখকদের। অবশ্যই, আমাদের মতে, সেই লেখক, যিনি অত্যন্ত সতর্ক, বুদ্ধিমান, সৎভাবেই কাল-সচেতন, তিনি শিল্প-সচেতন সহৃদয় মনের অধিকারী!

সময় অস্থির, সমাজও দ্রুত বদলাতে চায়। অস্থিত সমাজ আর বিক্ষিপ্ত অনিশ্চয়তায় সংশয়াকুল সময় যত স্পষ্ট হবে, গল্পের চেহারাও চাইবে বদল। ছোটগল্পের প্রাণ-স্বভাব, অরূপ-ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে ছোটগল্পকাররা বার বার চেহারা নিয়ে পরীক্ষায় বসবেন নিশ্চয়ই। এটাই যে-কোনো শিল্পের নিয়তি। ছোটগল্প এমন এক শিল্প-মাধ্যম, যার বদল দ্রুত হওয়াই স্বাভাবিক। জীবনের খণ্ড মুহূর্তই যার একমাত্র বিষয়-ভরসা, সমাজ-বাস্তবতাই যার একমাত্র মূলধন, সে ক্ষেত্রে উপন্যাস নয়, ছোটগল্পের ছোট পরিসরে রঙবদল হওয়া স্বাভাবিক, এবং ত্বরিতই।

সব কালেই দেখা যায়, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সেই সময়ের মানুষ নিজে নিজে ফ্যাশন তৈরি করে ফ্যাশন-দুরস্ত হয়ে পুরুষ-রমণী কিছুকাল আপন সৌন্দর্য-ভাবনায় তন্ময়, নিবদ্ধ থাকে। আবার ফ্যাশন বদলায়, নিজেদের রুচির সঙ্গে তাল রেখে মানুষও বদলায়। ফ্যাশন এমন একটি বিষয় যার মূল্য ক্ষণস্থায়ী, যার অস্তিত্বের মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ কালেই শেষ। একালের একাধিক গল্পকার ফ্যাশন-দুরস্ত হবার জন্যেই যেন গল্প লেখেন, গল্পের বিষয় ও জীবনবাণীর টানে নয়। তাতেই ফ্যাশন-সর্বস্বতা তাঁদের রচনাকে সাময়িক করে, পাঠকদের বিরক্তি ও অনীহা তৈরির উপকরণ করে তোলে। ছোটগল্প এমন একটি শিল্প-মাধ্যম যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা দুই-কে নিয়েই করতে হবে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ দু'য়ের ছায়া-কায়ার সম্পর্ক গল্পহীনতাকে লক্ষ্যে রেখে নিষ্ফল রচনা-সম্ভার সাজানো ছোটগল্পের পক্ষে অনুর্বর মাটির আগাছাকেই বাড়ায়, নতুন গল্পের নিঃসীম শূন্য সম্ভাবনাকে দিগন্তে পাঠায়। সাম্প্রতিক কালের বাংলা ছোটগল্পের কোনো কোনো আন্দোলন মূল্যহীন, জীবন-বিমুখ, ক্ষমতাহীন গল্পকারের অক্ষমতায় সরব আবরণ মাত্র বলেই মনে হয়।

২

গল্পকার ও বিশেষ গল্প-সমীক্ষা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২২ জুলাই ১৮৪৭
মৃত্যু : ৩ নভেম্বর ১৯১৯

মনে আসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়কাল ও তার অনুবর্তন।

তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাবয়ব শিল্পকৃতি তাঁর জীবৎকাল ধরে ১৮৬৪ থেকে ১৮৯৪-এর মধ্যবর্তী সময়ে উপন্যাস ও নভেলেট বা বড়গল্পের ভাবনা-ভূমি ও আদর্শ এবং সূক্ষ্ম শিল্পরুচিকে মান্য করেই সমসময়বর্তী অন্যান্য অনুসারী এবং নবাগত উপন্যাসকারদের ভাবনার জগতে একটি সুনির্দিষ্ট অনড় চাপ বজায় রেখে চলেছে অন্তঃশীল স্বভাবে। এরই মধ্যে কথাকার ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব রেনেসাঁস চকিত উনিশ শতকের শেষ দশকের শুরুতেই 'কঙ্কাবতী'র মতো প্রণয় উপন্যাস হাতে নিয়ে। আগে ছোটগল্প কঠিন শিল্পরূপে একটাও দেখা দেয়নি—যদিও পূর্ণচন্দ্রের অসতর্ক প্রয়াস মনে থাকে। আমরা রবীন্দ্রনাথের হাতে ভারতী পত্রিকা ধরে 'ভিখারিণী' (১৮৭৭) পেয়েছি, পেয়েছি ভারতী ধরেই 'ঘাটের কথা' (১৮৮৪) এবং নবজীবন পত্রিকার আধারে 'রাজপথের কথা' (১৮৮৫)-র মতো গল্প। খাঁটি রসের বিশুদ্ধি না থাকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভিখারিণীকে বিস্মৃত হতে চেয়েছিলেন তাঁর সংকলনে গল্পটিকে বাদ দিয়ে, আর বাকি দু'টি গল্পও রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সমর্থন পায়নি!

একদিকে বঙ্কিমের উপন্যাসে শিল্পের অশরীরী প্রবল চাপ, আর একদিকে রবীন্দ্রনাথের হিতবাদীর আগের পর্বে রচিত ছোটগল্পের মন্ময় অস্বীকৃতি—এই দু'য়ের মাঝখানে ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতী' ধরে উপন্যাসেই সফল-জীবনের প্রথম আবির্ভাবের 'নান্দী' রচনা করতে চেয়েছেন। এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কঙ্কাবতী তাঁকে যে খ্যাতি পাঠককুলে এনে দিয়েছিল, তা সর্বাধিক সমর্থন পায় উত্তরকালের ছোটগল্পের তীব্র আকর্ষক কৌতুকব্যঙ্গের মিশ্রিত মজার, উদ্ভট ও বীভৎস সব রসের স্বাদ-স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্য গালগল্পের, বৈঠকী রীতির আবহের নূতনত্বে পাঠকদের সর্বগ্রাহী ও সর্বগ্রাসী মর্যাদা পায় একমাত্র ত্রৈলোক্যনাথেই ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উদ্ধারের মধ্যে।

ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থগুলির মূল রসনিষ্পত্তিতে যে স্বাদ-স্বাতন্ত্র্য, তার সঙ্গে তাঁর সমসময়বর্তী 'ভারতউদ্ধার' কাব্যের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'মডেলভগিনী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মনোভঙ্গির মিলমিশ সময়ের প্রাথমিক সূত্রে মানতেই হয়। সে সময় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম মূল অসি-আঘাতের বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। আর উনিশ শতক জুড়ে, বিশেষ করে শতকের দ্বিতীয় কোটিতে যে ছিল ব্যঙ্গ করার প্রবল প্রবণতা, তার শক্তির উৎস ছিল সমাজ-সংস্কারের বাসনায়,

শিল্পকর্মীর কর্মিষ্ঠতায়। রেনেসাঁসের কালে সৃজনী পরিবেশে একজন শিল্পীর বিশুদ্ধ শিল্প-ভাবনার সঙ্গে আবশ্যিক লেগে থাকে কর্মীর সচেতনা। নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকেও একসময়ে বলতে হয়েছে তাঁর বিপুল পরিমাণ সৃষ্টির মধ্যে থেকে —'দায়ে পড়ে—out of sheer necessity' তিনি তাঁর শিল্পকর্মের বিপুল বিস্তার ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথকেও তাঁর শিল্পকর্মে দু'টি দিকই বিশেষভাবে ভাবতে হয়েছে—একদিকে শিল্পীর শিল্প রস ও রীতি-ভাবনা, আর একদিকে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন-অনুগ সামাজিক আদর্শ-মঙ্গল ও কল্যাণ-ভাবনা। হুতোমের রচনায়, সার্থক শিল্পরূপে বিশ্বধন্য কমলাকান্তে তাই হিতবাদ ইত্যাদি নবাগত দার্শনিক মতবাদ সমন্বিত উদ্দেশ্য মোড়কের আড়ালে থেকে গেছে। তবে অসাধারণ প্রতিভায়, 'নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা' প্রজ্ঞায় বঙ্কিমচন্দ্র যে কঠিন শিল্পের পরাকাষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন, সমসময়বর্তী অন্যরা তা পারেননি।

আমাদের মতে, ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তি ও কর্মজীবন বাস্তব জীবনের করুণা, সুখ-দুঃখের সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবিক বোধে এমনভাবে গড়ে উঠেছিল, যা তাঁর শিল্পপ্রয়াসে গভীর ছায়াপাতে সক্রিয় থেকেছে। তাঁর গল্পগুলি যে মানবিক মঙ্গলবোধ, আদর্শচিন্তা, মতবাদের পরিশীলনে অন্যান্যদের থেকে সাহিত্যমূল্যে স্বতন্ত্র আসন পায়, তার কারণ শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তাই তাঁর 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'মুক্তামালা' (১৯০৩), 'মজার গল্প' (১৯০৬) এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অসামান্য নায়ক-লেখক-কথক চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পগ্রন্থ 'ডমরু চরিত' (১৯২৩) তাঁকে বিচিত্র স্বাদের গল্পকারের অলংকৃত আসন দেয়।

হুতোম যেভাবে তাঁর কথা বলতে চেয়েছেন, উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে ত্রৈলোক্যনাথ সেভাবে তাঁর শ্রোতাদের কথা শোনাতে চাননি। কমলাকান্তের স্রষ্টার অসামান্য মৌলিক উচ্চ কল্পনা, মনন ও প্রতিভা ত্রৈলোক্যনাথে আশা করা নিশ্চিত অ-যথার্থ, তাই সেই আত্মমুখীন যন্ত্রণার ব্যঙ্গাত্মক বহিঃপ্রকাশে ত্রৈলোক্যনাথ সামিল হতে পারেননি। তবে ত্রৈলোক্যনাথ নিজের রীতিটি বেছেছিলেন বৈঠকী চালে ও কথকতায় পাঠকদের সামনে বসার। তিনি গল্প বলতে চেয়েছেন, শোনাতে চেয়েছেন, এবং তা একেবারে বৈঠকখানায় জড়ো হওয়া সীমিত নির্দিষ্ট শ্রোতাদের মুখোমুখি বসেই। গল্প বলে কৌতুকে-করুণায়, ব্যঙ্গে-বেদনায় মানবতার কথা বলতে চেয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের কৌতুকপ্রিয়তা, মানব্যভাবনা তাঁর বাস্তবজীবনের পক্ষে যেনবা রক্তের সম্বন্ধে রঞ্জিত সত্য। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে একাধিক চরিত্রে বাস্তব জীবন্ত মানুষের কাঠামো, উৎস ও ছায়া মেলে। 'কঙ্কাবতী'র জনার্দন চৌধুরীর চেহারাগত সাদৃশ্য, ডমরুচরিতের ছেলে-খেকো স্বদেশী বক্তার প্রসঙ্গ, ত্রৈলোক্যনাথের পুত্রের কথা : 'ময়না কোথায়' ও 'পাপের পরিণামে' আমার দিদির জীবনের ছবিই পরিস্ফুট, এমন সব তথ্য স্বীকৃতিতে আমাদের এমন মন্তব্যের প্রমাণ মেলে। বৈঠকী রীতির গল্পকথনের সার্থক রূপ মেলে 'মজার গল্প'-এর আখ্যানগুলিতে, 'ভূত ও মানুষ', 'মুক্তামালা' ও ডমরুচরিতের গল্পগুলির কাঠামোয় মেলে সেই বৈঠকী মেজাজ ও রীতি, কিন্তু কল্পনাময় বলার ভঙ্গির

সঙ্গে বিষয়ের উদ্ভটত্ব, বীভৎসতা, বাস্তব-অবাস্তবের সীমা-স্পর্শের দ্বান্দ্বিক মনোভঙ্গি সবই কৌতুকরসে ও সমাজ-বাস্তবতার যে রসাস্বাদে আমাদের ধরে রাখে তা একান্তভাবে ত্রৈলোক্যনাথেরই নিজস্ব। 'লুল্লু' ইত্যাদির মতো ভূত চরিত্র লেখকের কলমে স্বচ্ছ রঙ্গ-রূপক ধর্মের মিলমিশে নব-আস্বাদী। মানুষের গড়া সমাজ ও তার ধারক ও বাহক সমাজ-মানুষের সমস্তরকম সীমা, কুসংস্কার, স্খলন-পতন, নির্মমতা, নির্লজ্জ সুবিধাভোগী স্বার্থপরতাকে বিনাশপ্রাপ্ত মানবতাবোধের অশ্রুজলে রূঢ় বাস্তবতার দাবিতে এঁকেছেন। একদিকে গালগল্প, কৌতুক, ব্যঙ্গ—আর একদিকে কারুণ্য, দ্রোহভাবনা ইত্যাদি—দুই মেরুর মেলবন্ধনে 'ভূত ও মানুষ', 'মুক্তামালা' ও ডমরুচরিতের গল্পগুলিতে অভিনবত্বেরই বিস্ময় ও আধুনিকতা। চরিত্র ও চিত্ররচনায় মমত্ববোধ প্রকাশে, দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'ডমরুচরিত' গ্রন্থের ঢাক মহাশয়ের বিধবা বালিকা কন্যার গল্পকথায় মেলে কথাকারের ব্যঙ্গশাণিত পৌরাণিক পরশুরাম-স্বভাবী ক্রুদ্ধ সত্যভাষণ!

১.

চঞ্চলার গাইগরু

এক

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থের রচনাগুলির প্রথম প্রকাশ ঘটে রচনার সমসাময়িক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় সাতটি পূজাসংখ্যায়। মোট সাতটি গল্প নিয়েই 'ডমরুচরিত' গ্রন্থের গল্প সংকলন। এর নামেই বোঝা যায়, গল্পগুলির প্রধান কথক ও নায়ক লেখক-সৃষ্ট চরিত্র ডমরুধর। স্বয়ং লেখক গ্রন্থের নামপত্রে এমন দু'টি পয়ারের চরণ যোগ করেছেন, যাতে বোঝা যায় ডমরুধরই লেখকের গল্পভাবনার প্রধানতম উদ্দীষ্ট ব্যক্তিত্ব। 'ডমরু-চরিত কথা অমৃতসমান/ স্বয়ং ডমরু ভণে শুনে ভাগ্যবান।' গল্পগুলি ঠিক প্রচলিত গল্পের রীতিতে কাঠামোভুক্ত হয়নি। সাতটি গল্পের মধ্যে আবার প্রত্যেকটির মধ্যে স্বতন্ত্র শীর্ষনাম সহ পরিচ্ছেদের ভাগ আছে। প্রথম গল্পে মোট সাতটি, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ গল্পের প্রত্যেকটিতে আটটি পরিচ্ছেদ, পঞ্চম গল্পে মোট তিনটি, ষষ্ঠ ও সপ্তম গল্পের প্রত্যেকটিতে সাতটি করে পরিচ্ছেদ আছে।

আমাদের আলোচ্য গল্প 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পাংশটি পঞ্চম গল্পের শেষতম তৃতীয় পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত—শীর্ষনাম 'চঞ্চলার গাইগরু'। এর প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে 'স্বদেশী কোম্পানী' ও 'ভিকু ডাক্তার'। তিনটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্র শীর্ষনামে চিহ্নিত গল্পাংশগুলি সমগ্রভাবে 'পঞ্চম গল্প' এমন শীর্ষনামে আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হতেই পারে, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুর বলার ভঙ্গিতে তিনটি গল্পাংশের সঙ্গে ঘটনার তেমন সূক্ষ্ম যোগ না থাকলেও যোগ আছে তিনটি গল্পের চরিত্র-সূত্রের। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখা পাই বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়সেব শংকর ঘোষের, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বছর চল্লিশ বয়সের ডাক্তার ভিকুর সঙ্গে পরিচিত হই, যে আবার দুর্লভী বাগদিনীর শুশ্রূষার সূত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা দেয়। দুর্লভীর বোনঝি চঞ্চলার গাইগরু-প্রসঙ্গ আসে এবং ডমরুধর প্রথম পরিচ্ছেদের শংকর ঘোষের প্রসঙ্গও যথাসময়ে স্মরণ কবে।

এইভাবে 'ডমরুচরিত' গল্প সংকলনে পঞ্চম গল্পটি তিনটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে একটি কাহিনীসর্বস্ব বড় গল্পের বিশ্বাসযোগ্য অবয়ব পায়। তবে গল্পের প্রসঙ্গ ধরে বলা যায় 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পাংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ছোটগল্পের মর্যাদা পায়। এর কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র পরিকল্পনা, প্লট ও ডমরুধরের attitude—সব মিলিয়ে ছোট মাপের বৈঠকী গল্পের স্বভাবধর্ম অবশ্যই আনে। পঞ্চম গল্পের প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদ সূত্রে যা স্পষ্ট হয়, তা হল, শংকর ঘোষের স্বদেশী কোম্পানী করার কৌশলে ডমরু শংকর ঘোষকেও ঠকিয়ে বিরাট ধনী হয়ে উঠেছে। প্রচুর অর্থের কারণে সুখে-শান্তিতে ডমরু যে তার চেহারায় নিজের কাছেই নিজে আকর্ষক হয়ে উঠেছে, তা জানান দিতে দুর্লভীর ঘরে ঢোকে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের গল্পে জ্বরে দুর্বল দুর্লভীর ঘরে সে যে হেনস্থা হয়, তার স্বীকৃতি ডমরুধরের নিজের কথায় মেলে। সেখানেই ডমরু দুর্লভীর প্রায় তিরিশ বছর বয়সের

বিধবা যুবতী বোনঝি চঞ্চলাকে দেখে এবং কালো হলেও দেখতে ভাল বলে তার সঙ্গে গোপন সখ্যতার সম্পর্ক তৈরিতে উদগ্রীব হয়। 'চঞ্চলার গাইগরু' অংশের শুরু হয়েছে ডমরুর চঞ্চলার গ্রামে যাওয়ার প্রবল বাসনার চিত্র দিয়ে। বৈঠকী গল্প-কথনের রীতিতে ডমরু লম্বোদরের সঙ্গে সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরে যে কাহিনীর অবয়ব রচনা করেছে 'চঞ্চলার গাইগরু' অংশে, তার সবটাই এই গল্পাংশের বর্ণিত প্রধান প্রসঙ্গ।

চঞ্চলার মাসি দুর্লভী তার জ্বর থেকে সুস্থ হলে চঞ্চলা নিজের গ্রামে চলে আসে। কিন্তু চঞ্চলার সঙ্গে সদ্ভাব জমাবার বাসনায় ডমরু মাঝে-সাজে চঞ্চলার বেশ দূরের গ্রামে যাওয়া-আসা করত। চঞ্চলার গ্রামের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় গরুর গাড়ি চলে, ঘোড়ার গাড়িও, এমনকি মোটর গাড়িও। সে সব ধরে সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে, খরচ করে মাঝে-সাজে ডমরু চঞ্চলার বাড়ি যেত। চঞ্চলা মাতৃহারা। বাবা সহদেব বাগদী চঞ্চলার গাইগরুর দুধ বিক্রয় করে। ডমরু চঞ্চলার বাড়ি জমিয়ে গল্পগুজব করত। রসের কথা বলার সময় পাড়ার সব মেয়েরা তার সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরায় মজে যায়। চতুর কৃপণ ডমরু দুর্লভীকে খুশি করার জন্যই চঞ্চলাকে একটা দশ পয়সার গামছা কিনে উপহার দেয়।

এরপর ডমরু লম্বোদরকে তার একটি দুর্ঘটনার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলে। তার ছ'মাসের মধ্যে দুর্ঘটনার বিষয়টিতে লম্বোদর যখন সন্দেহ প্রকাশ করে তখন কুশলী ডমরুধর সবই জগদম্বার মায়া—এই বলে লম্বোদরের সন্দেহের নিরসন ঘটায়। এবং নিজেই দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে বসে। এক রাতে ডমরুর একান্ত বিনিদ্র রাত কাটে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে ঠিক করে চঞ্চলাকে বরং তার কেনা এবং স্ত্রী এলোকেশীর দৃষ্টি থেকে সন্তর্পণে লুকনো চঞ্চলার ন'হাতি কাপড়টি তাকে দিয়ে আসে। পথে ভোর কেটে সকাল হয়। চঞ্চলাদের গ্রামে ঢোকার পথে দেখা হয় চঞ্চলার বাবার সঙ্গে। সে তখন চঞ্চলার গাইগরু দড়ি দিয়ে বেঁধে মাঠে নিয়ে যাচ্ছিল। বড় রাস্তা। সহদেবের সঙ্গে কথা বলার নিমগ্নতার মধ্যে হঠাৎ একটি মোটর গাড়ি সশব্দে ডমরুধরকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় ডমরুর শরীর কোমরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে দু'টি ভাগ হয়ে যায়। নীচে কাটা কোমর থেকে দু'পা সমেত ডমরুর শরীরের নীচের কাটা অংশ নিয়ে মোটর গাড়ি দ্রুত পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে চঞ্চলার গাইগরুর শরীর দু'টি খণ্ড হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। সহদেবের তখন হতভম্ব বিষণ্ণ মুখ। ডমরুধর এই অবস্থায় রাস্তায় ছটফট করলেও প্রাণে বেঁচে আছে এবং জ্ঞানও লুপ্ত হয়নি।

এই বীভৎস পরিবেশে ভিকু ডাক্তার হাতে ব্যাগ নিয়ে তখন রাস্তা দিয়ে কোনো রোগীর চিকিৎসা করতে যাচ্ছিল। ডমরুর অবস্থা দেখে ডমরুর শরীরের ওপরের অংশের সঙ্গে গরুর কোমর আর পা জুড়ে দেয়। তার হাতের ব্যাগ থেকে দু'টি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুলি মুখে দেওয়ার পর গরুর কোমর ও পা ডমরুর শরীরের সঙ্গে যায় জুড়ে। এরপর ভিকু ডাক্তার আরও দু'টি গুলি ডমরুকে খাওয়ালে ওই অবস্থায় তার শক্তি ফিরে আসে। কিন্তু ডমরু মানুষের দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম। ফলে গরুর দুই পা আর ডমরুর দু'টি হাতে ডমরু দাঁড়ায় চতুষ্পদ জন্তুর মতো। এই অবস্থা দেখে চারপাশে জড়ো

হওয়া লোকজন তাঁকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে ভিকু ডাক্তারের কথা—দুর্লভীর অসুখের সময় ডমরু যেহেতু ভিকুর প্রাপ্য টাকা দেয়নি, তাই গরুর পা ও কোমর ডমরুর শরীরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় সে প্রাণে বাঁচে— তাতে এই শরীরটা ভিকুরই সম্পত্তি হল। এবার এই অবস্থায় ডমরু যতদিন বাঁচবে, তাকে ভিকুর চাষের কাজে শ্রম দিতে হবে।

যখন ডমরুর গলায় দড়ি বেঁধে ভিকু টানে, তখন চঞ্চলার বাবা সহদেবও ডমরুর শরীর দাবি করে। কারণ তার আধখানা শরীর চঞ্চলার গাই! এখনো সে দুধ দিতে সক্ষম। সুতরাং ডমরুর ওপর তার অধিকার! দুজনের বিবাদ তুঙ্গে উঠলে গ্রামের লোক মীমাংসা করে দেয়। তাতে ঠিক হয় ডমরু ভিকুর ঘরে সারাদিন থাকবে, চাষের কাজ করবে আর রাতে চঞ্চলার গোয়ালে থাকবে বাঁধা। সকালে চঞ্চলা দুধ দুয়ে ডমরুকে আবার ভিকুর কাছে পাঠিয়ে দেবে সারাদিনের কাজের জন্য। অন্য বেলায় সহদেব বাগদী তাকে খাবার দেবে। রাতে যদি ডমরু হাত দিয়ে বাঁধন খুলে পালায় তাই চঞ্চলা তার হাতও বেঁধে দেয়। খেতে দেয় মুড়ি। দাঁত না থাকায় মুড়ি খাওয়ায় দারুণ অসুবিধে ডমরুর। তার ওপরে দু'সের দুধ নেওয়ার পর বাছুর ছেড়ে দেয় চঞ্চলা। তখন বাছুর ডমরুর পেটে মাথা দিয়ে বার বার ধাক্কা মারে। ভিকু পরে দাবি করে ডমরুর পেট তার অধিকারে। এভাবে ধাক্কায় ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে পড়ার অবস্থা দেখা দিতে পারে। ফলে চঞ্চলা আগের ব্যবস্থা যেন বন্ধ করে। ভিকু ও সহদেবের ডমরুর বিচিত্র দেহের দাবি-দাওয়ার একাধিক যন্ত্রণাদায়ক টানাপোড়েনে, প্রভুব নির্দেশে কৃষকের বাসনামতো চাষে যুক্ত হতে গিয়ে ডমকর কষ্টের শেষ নেই। ক্রমশ শরীর শুকিয়ে যায় ডমরুর। লাঙল টানতে পারে না। দুধও দিতে পারে না। সহদেবের শেষ সিদ্ধান্ত—'আবার বাছুর না হলে তো দুধ পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং এবার তার ব্যবস্থাই জরুরী!'

চরম অসহায় অবস্থায় ডমরু তার আরাধ্যা দেবী শ্রীদুর্গার স্মরণে কিছুটা মুশকিল আসান উপলব্ধি করে। শংকর ঘোষ—যাকে ডমরু ঠকিয়েছিল স্বদেশী কোম্পানির সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে—সে এসে টাকা ফাঁকির কারণে পুলিশে দেওয়ার কথা বলে। ডমরুর ডান হাত ধরে টানে। ভিকু এসে দাবি জানায়—সে ডমরুর ধড় বাঁচিয়েছে বলে ডমরুর ধড় তারই সম্পত্তি। ডমরুর বাঁ হাত ধরে টানে। গোলমাল শুনে এগিয়ে আসে চঞ্চলা। তার দাবি শরীরের নীচের দিক তারই। তাই নীচের ডান পায়ের খুর ধরে টানতে থাকে। এই চরম অবস্থার মধ্যেও পালকি চেপে আসে ডমরুর উগ্রমূর্তি স্ত্রী এলোকেশী। সে ডমরুর শেষ বাঁ পায়ের খুর ধরে টানতে থাকে। এই টানাটানির মধ্যে একসময়ে চঞ্চলার গাইগরুর অংশটি ডমরুর শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। ডমরু প্রবল চিৎকারের মধ্যে একসময়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। যখন জ্ঞান ফেরে, ডমরু দেখে নিজের ঘরেই সে শুয়ে আছে। শরীর একেবারে স্বাভাবিক। নধর শরীরে এতটুকুও খুঁত নেই। ওর চারপাশে কেউ নেই, আছে এলোকেশী। বাক্স খুলে কাপড় বের করতে ব্যস্ত। ডমরু শেষমেশ ঘুম থেকে জেগেছে দেখে এলোকেশীর প্রবল সন্দেহসূচক প্রশ্ন, গত রাতে এত চিড়বিড় করার কারণ কী? চঞ্চলা কে?

নিরুত্তর ডমরুর মনের গভীরে সেই বিশ্বাস: 'সকলই জগদম্বার মায়া! সমুদয় মায়ের লীলা!'

ছোটগল্পের উপযোগী প্লটনিহিত কাহিনী ও ঘটনার সমবায়িক স্বভাবে 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পের শিল্পবন্ধন ও জটিলতা কতটা নিখুঁত স্বভাবে সমুন্নত হতে পেরেছে, গল্পের বিচারে সেই ভাবনাই প্রথম, কতটা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের অনুগ থেকেছে বিচারের প্রশ্ন সেখানেই! 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পের আঙ্গিক একটি বড় গল্পের ভিতরে শাখাগল্পের স্বভাবে অভিনব। এর কৌতুক, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বৈঠকী রীতির গালগল্প সবই বিষয় ও চরিত্র ধরে গ্রথিত। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে, সেই বঙ্কিম-সমসময়ে অভাবনীয় বঙ্কিমী মনোবিশ্লেষণ, জটিলতা ও মনস্তত্ত্বকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বরং কাহিনী ও ঘটনার উদ্ভটত্ব, উৎকটতা, বীভৎসতা এবং এসবের কাহিনীবলয়ে সংস্থাপনের কৌশলগত কৃতিত্ব উত্তরকালে প্রভাতকুমারের গল্পে মেলে।

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পাংশের বা গাথাগল্পে প্রথমে ডমরু চঞ্চলার প্রসঙ্গে একটি বিশ্বাস্য পরিবেশ রচনা করেছে। লম্বোদরের সঙ্গে কথোপকথনে তার একটা যুক্তির ভিত রচিত হয়। এর পর ডমরুর জীবনে এক দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ ভাষাচিত্র পায় ডমরুর বলার ভঙ্গিতে। কাহিনীর মধ্যে বড় দুর্ঘটনার ফল—মোটর গাড়ির ধাক্কায় ডমরুর কোমর থেকে নীচের পা পর্যন্ত অংশটি মূল শরীর থেকে ছিন্ন হয়ে মোটর গাড়ির সঙ্গে উধাও হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় ফল—চঞ্চলার বাবার সামনে চঞ্চলার গরুর ধড় কোমর থেকে ছিন্ন হয়ে পথে পড়ে থাকা, সেই সঙ্গে কোমর ও পা রাস্তার ওপর পড়ে থাকায় বিষম বিভ্রাটের চিত্র। তৃতীয় ফল হল—ভিকু ডাক্তারের ঔষধ দানের প্রয়াসে ডমরুর শরীরের প্রথমটির সঙ্গে কোমরের কাছে গরুর দ্বিতীয়ার্ধকে জুড়ে দেওয়ার ঘটনা।

এবার অর্ধেক নিজের শরীর, বাকি অর্ধেক গরুর শরীর সংযোগে ডমরুর চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে—দিনে ভিকু ডাক্তার ও রাতে চঞ্চলার অধিকারে—সারাদিনের দু'ভাগে জীবনযাপন—তা কষ্টের ও অসহায়তার। ভিকু ডাক্তারের চাযের দুঃখদীর্ণ কাজে, চঞ্চলার দুধ সংগ্রহ করে বিক্রির ব্যবসার বিড়ম্বনায় ডমরুধরের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অনেক দুঃখ কষ্ট বিড়ম্বনার পর আসে শংকর ঘোষ, ভিকু ডাক্তার, চঞ্চলা স্বয়ং এবং ডমরুর উগ্রমূর্তি স্ত্রী এলোকেশী। ডমরুর দুই হাত, নীচের চঞ্চলার গাইগরুর দুই পা ধরে চারজন টানাটানি করার কালে, ডমরুর নিজের ভাষায় : 'আমার শরীর হইতে ফস করিয়া চঞ্চলার গাইগরুর কোমর ও পা খসিয়া পৃথক হইয়া গেল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। ..... যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, আমি আমার ঘরে শয়ন করিয়া আছি।' কাহিনী যেমন উদ্ভট, উৎকট, বীভৎস, তেমনি তার প্লটের গাঁথুনিতে অসম্ভব কল্পনার কৌতুকরস ও শ্লেষমিশ্রিত একাধিক ঘটনার সাজসজ্জা! গল্পের প্লটে পরিস্থিতির বর্ণনায়, মূল লক্ষ্যের অভিমুখীন করার নিশ্চিত কুশলতায় ও চাতুর্যে ত্রৈলোক্যনাথ ডমরু চরিত্রের মানসিক গঠনের রুদ্ধশ্বাস উদ্ভাসনে রীতিমতো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু যেভাবে গল্প সাজিয়েছে, তাতে সমূহ জটিলতা

মনোগত (Psychological) নয়, বর্ণনীয় বিষয়ে কৌশলের কৃতিত্বনির্ভর। 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পে গল্পকারের নিখুঁত situation সৃষ্টি ও ঘটনা দিয়ে তার শৈল্পিক শ্রীবৃদ্ধির সৃজনধর্ম রচনা ত্রৈলোক্যনাথের একান্ত নিজস্ব প্রকরণ-অভিজ্ঞতা অনুগত। গল্পাংশটি যে ত্রৈলোক্যনাথের দিক থেকে এক দীর্ঘ স্বপ্নের আবহে মজার বিষয় রচনা, বীভৎস রসে স্বাদের স্বাতন্ত্র্য আনারই নৈপুণ্য—তা সব শেষেই প্রতিষ্ঠা পায়।

নিছক কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে প্লট রচিত হলেও এখানে একালের সার্থক ছোটগল্পের আঙ্গিকগত সন্ধিগুলির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া সম্ভব নয়। ত্রৈলোক্যনাথ তা বজায় রাখারও চেষ্টা করেননি। কারণ গল্পের উদ্দেশ্য হল সমাজ-সমালোচনা ও জীবনের মানুষের, স্বার্থপর ব্যক্তিদের স্বভাব সমালোচনা। গল্পের ফর্ম সেখানে বৈঠকী রীতির মধ্যে মানানসই হওয়ায় বাধা পাবেই। তবে গল্পটিতে 'চরমক্ষণ' (Climax) অংশটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তৈরি হয়ে গেছে। আঙ্গিকের নিহিত কাহিনী ও ঘটনার ন্যায়েই ধীরে ধীরে চরম মুহূর্তটি পাঠকদের নিবিষ্ট করার পক্ষে শিল্পের গ্রাহ্যতা পায় :

> 'প্রত্যুষে শংকর ঘোষ আসিয়া বলিল,—"তুমি আমাকে টাকা ফাঁকি দিয়াছ। চল, তোমাকে আমি পুলিশে দিব।"
>
> এই বলিয়া সে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিল। সে সংবাদ পাইয়া ভিখু ডাক্তার দৌড়িয়া আসিলেন, —তিনি বলিলেন,—"ধড়টি আমি রক্ষা করিয়াছি। এ ধড় আমার সম্পত্তি।"
>
> এই কথা বলিয়া তিনি আমার বাম হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিয়া চঞ্চলা সে স্থানে দৌড়িয়া আসিল। সে বলিল,—"ইহার নীচের দিকটা আমার। আমার গাইগরু।"
>
> এই কথা বলিয়া সে আমার পশ্চাৎ দিকের দক্ষিণ পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল।
>
> এমন সময় "হু হু" পালকির শব্দ হইল। আমি ও অপর সকলে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। এলোকেশী ঠাকুরাণী উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া পালকি হইতে নামিলেন। আমার নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন,—"ইনি আমার স্বামী, তোমরা ছাড়িয়া দাও, ইঁহাকে আমি বাড়ি লইয়া যাইব। বাড়ি গিয়া ঝাঁটাপেটা করিয়া ইঁহার ভূত ছাড়াইব।"
>
> এই কথা বলিয়া তিনি আমার পশ্চাৎ দিকের বাম পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। আপন আপন দিক কেহই ছাড়িয়া দিল না। একদিকে শংকর ঘোষ ও ভিকু ডাক্তার আমার দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। অপর দিকে চঞ্চলা ও এলোকেশী দুই খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল, তাহাদের টানাটানিতে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও" বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই ছাড়িল না।'

এই দৃশ্যই যেমন গল্পের আখ্যানের climax, তেমনি একই সঙ্গে মূল চরিত্র ডমরুধরের

চরিত্র-পরিণতির সম্ভাব্য পরিণতি-নির্দেশক। চরম ক্ষণের যে দোদুল্যমানতা—একদিকে ডমরুর চরমতম অসহায় অবস্থা, আর একদিকে নায়কের স্বপ্নভঙ্গের নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত অবস্থার ব্যঞ্জনা—তা ত্রৈলোক্যনাথের আখ্যান ও চরিত্র—দু'য়ের যথোচিত শিল্পসঙ্গত দিক রচনার কৌশলে অভিনবত্ব পায়।

এর পরেই চরম ক্ষণের শেষতম পরিণামী দিকের একমাত্র পরিস্থিতি : '...... তাহাদের টানাটানিতে আমার শরীর হইতে ফস করিয়া চঞ্চলার গাইগরুর কোমর ও পা খসিয়া গেল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।' ডমরুর স্বপ্ন-শেষ এবং স্ত্রী এলোকেশীর সঙ্গে তার কথোপকথনে সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিত্র। সে চিত্রের মূল লক্ষ্য চঞ্চলার পরিচয় জানতে উৎসুক এলোকেশীর প্রশ্ন, ডমরুর তার আরাধ্য জগদম্বার লীলা-মাহাত্ম্যের কাছে মানসিক আত্মসমর্পণ ও সুখের স্বাদ গ্রহণ!

দুই

ত্রৈলোক্যনাথ নির্দিষ্ট কল্পনাময় ঘটনা সংস্থানের মধ্যে চরিত্রদের ওতপ্রোত করে তাঁর বৈঠকী রীতি~ গল্পে কৌতুকরসের প্রবাহ, গালগল্পের অসম্ভাব্যতাকে শ্রোতা তথা পাঠকদের কাছে বিশ্বাস্য করতে প্রয়াসী। এ হল রীতিব কথা। এই প্রয়াস কখনও মন্ময় (Subjective) নয়, তন্ময় (objective)। বঙ্কিমের সমসময়ে লিখতে বসে অন্তরলোকের জটিল বাস্তবতায় তাঁর অভিনিবেশ ছিল না আদৌ, প্রকরণ-শিক্ষার পক্ষে থাকার কথাও নয়, সাময়িক সমাজ সমালোচনা ও জীবন সমালোচনাকে নির্ভর করে, নিজ জীবনকে দেখার আদর্শ দিয়ে গল্পগুলির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য স্থির করেছেন। সেখানে সংস্কারমুক্ত মন, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় লব্ধ মানবভাবনা নিছক গল্পবলার উদার উন্মুক্ত খোলা-মন স্বভাবের বাতাস বাহিত হয়ে .পাঠকদের আবৃত ও আপ্লুত করে।

তাই 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য গল্পকারেরই জীবন দেখায় নির্দিষ্ট, শিল্পের সূক্ষ্ম সত্যের বন্ধনে সংযত নয়। এটা তাঁর ত্রুটি নয়, তাঁর সীমা, তাঁর নিজস্বতা। কেন্দ্রীয় সত্য তীব্র মননে ও আধুনিকতায় ছোটগল্প শিল্পের উজ্জ্বল মণিখণ্ড নয়। 'ডমরুচরিত' গ্রন্থের পঞ্চম গল্পের তিনটি পরিচ্ছেদের শাখা গল্পগুলিতে আছে শংকর ঘোষ, ভিখু ডাক্তার প্রসঙ্গ। তারা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পের পর ঠিক তৃতীয় 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পে যথার্থ প্রাসঙ্গিকতায় এসেছে। শংকর ঘোষ স্বদেশি কোম্পানি বানিয়ে যে অর্থ-উপায়ের কৌশল করে, তার সবটাই আত্মসাৎ করে ডমরু—শংকরকে পর্ণ প্রবঞ্চিত করে। ডমরু হয় রীতিমত ধনী। সে তৃতীয় গল্পে আসে টাকা আদায়ের পুলিশি ভয় দেখিয়ে ডমরুর অসহায় অবস্থার সুযোগে 'ব্ল্যাকমেল' করতে। ভিকু আসে : 'ডমরুবাবু! তুমি আমার পাওনা টাকা দাও নাই। আমাকে ফাঁকি দিয়াছিলে। কিন্তু এখন তোমার এই শরীরটি আমার হইল।'—এমন অজুহাতে চরম মুহূর্তের অজুহাত 'ধড়টি আমি রক্ষা করিয়াছি। এ ধড় আমার সম্পত্তি।' এসবই এক অমানবিকতার রূপক কল্পনা। ডমরু যখন প্রাণসংশয়ে তীব্রতর কাতর, শংকর ঘোষ ও

ভিকুর মতো মানুষ রূঢ় অমানবিক প্রাণবিনাশী কাজে নির্মম, স্বার্থ-সন্নদ্ধ অর্থগ্রহণে পিশাচের ভূমিকা গ্রহণে নির্দ্বিধ।

এই সামাজিক মানুষের অমানবিক মানসিকতাতেই ডমরুর যে পরিণাম তা গল্পটির কেন্দ্রীয় বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন রূপক স্বভাবকে তুলে ধরে। অন্যদিকে ডমরু নিজে আর এক লোভী, কামুক, স্বার্থচিন্তায় দড়, নারীভোগী মানুষ—যে তৃতীয় স্ত্রী এলোকেশী থাকা সত্ত্বেও কামাসক্তিতে খামতি রাখতে চায় না। প্রথম গল্পে ডমরুর কথা : 'যদি আমার রং ফরসা হয়, তাহা হইলে দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।'—এই যুক্তিতে পরে 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পে দুর্লভীর বোনঝি চঞ্চলার প্রতিও—'চঞ্চলার সহিত সদ্ভাব করিতে আমার বাসনা' এমন মনোভঙ্গিতে ডমরু আর এক অসৎ পুরুষের উজ্জ্বল নমুনা হয়ে যায়। আরাধ্যা মা দুর্গার নামে তার বিপদ মুক্তির বাসনা তাকে সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর, নিষ্ফল ধর্মপ্রাণতার মুখোশ পরায়।

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পে নায়ক ডমরুধর নিজেকে নিয়ে যেমন শ্লেষব্যঙ্গ করেছে, তেমনি আত্মস্ফালনের দিকটাও তুলে ধরে। মোটর গাড়ি চড়ার প্রসঙ্গে ডমরু বলে, 'সেই সময় আমি মোটর গাড়ী চড়িয়াছিলাম। কিন্তু অতি বেগে গমন করে। আমার ভয় হইয়াছিল। মোটর গাড়ি টানিবার নিমিত্ত ঘোড়া থাকে না। তবে ইহার ভিতর কোনরকম বিলাতি জন্তু-জানোয়ার থাকে কি না, তাহা আমি জানি না।' ডমরুর মধ্য দিয়ে তার স্বভাব-অনুগ আত্মসচেতনতা ও আত্মসমীক্ষায় ত্রৈলোক্যনাথের দেখার বিশেষ কোণটিও স্বতঃস্ফূর্ত উঠে আসে।

গল্পের রূপকে শংকর ঘোষ, ভিকু ডাক্তার, চঞ্চলা ও এলোকেশী—চারজন মুমূর্ষু ডমরুর দু'টি হাত ও দু'টি পায়ের খুর ধরে টানাটানি করে। একজন অসুস্থ মানুষকে বিপদের সময় তাকে সাহায্য করার বদলে নিজেদের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোয় মেতে ওঠে। পাঁঠার মাংসের ছাল ছাড়ানো, অল্পবয়সী বিধবার ঘরে বদ্ধ থেকে পিপাসার্ত হয়ে মেঝে চেটে খাওয়া—এসবের মতো ডমরুকে নিয়ে টানাপোড়েনের ছবি এঁকেছেন ত্রৈলোক্যনাথ, তাও গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে শ্লেষজর্জর স্বাদ দেয় পাঠকদের। অর্থাৎ 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পে ত্রৈলোক্যনাথ মজলিশি গল্পের আবেগাত্মক ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ কৌতুক রসের মোড়ক দিয়ে নিজের জাতি ও নিজের সমাজের চমৎকার সমালোচনার এক রক্তচক্ষু ভাবচিত্র এঁকেছেন। একা ডমরুর স্বভাবের গভীরে জীবনকে ও নিজেকে দেখার স্বভাবে আছে অর্থগৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার, অসহায় অবস্থায় ধর্মের নামে আরাধ্যা দেবীর প্রতি ভক্তি-প্রীতির কথা ভিক্ষার প্রহসন। গালগল্পের, কৌতুকরসের গল্পের, বৈঠকী মেজাজের অন্তরঙ্গতায় ত্রৈলোক্যনাথের আলোচ্য গল্পের যে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, তা রঙ্গ রূপকের স্বাদুতায় লেখক-ব্যক্তিত্বেরই অন্যতম অভিজ্ঞান। গাইগরু কখনো কি চাষবাসের কাজে লাগে? সেখানে তো 'ষাঁড়'ই চাষের উপকরণ! এমন ভাবনায় মূলেই শ্লেষাত্মক হাসির উতরোল চাপা স্বভাব পায়!

তিন

আমরা আগেই বলেছি, ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে চরিত্রদের মধ্যে মনোলোকের খবর, চেতন-অচেতন-অবচেতনের রহস্যময় জগৎ উন্মোচন প্রয়াস আশা করা নিষ্ফল। যে রোমান্টিক মনোলোক—যার বৈশিষ্ট্য—মনই সবচেয়ে বাস্তব, হুবহু বাস্তবের বর্ণনা নয়—যা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বসে তাঁর উপন্যাস ও বড়গল্পে, কমলাকান্তের ব্যক্তিত্বে মূল সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রতিভাধর শিল্পীর তৃতীয় নয়নে, ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের চরিত্রে --কি প্রধান কি অপ্রধান—কোথাও মেলে না, অথচ ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের চরিত্রই একমাত্র প্রাণ, একমাত্র যাবতীয় অভিজ্ঞতার মূলধন। আর এই চরিত্র একেবারে নিবিড় জড়িয়ে থাকে নানান বৈশিষ্ট্যের ঘটনার সঙ্গে। ঘটনা সোজা হতে পারে, হতে পারে উদ্ভট, উৎকট এবং বীভৎস ও স্বাদের স্বাতন্ত্র্যে অভিনব।

এই চরিত্রসৃষ্টিতে গল্প লেখা নয় গল্প বলার দিক নীল আকাশের বুকে মেঘের পাখনায়, মুক্ত বাতাসের নির্ভরতায় আকৃষ্ট করে পাঠকদের। এর সঙ্গে কৌতুকরস, রঙ্গব্যঙ্গ, শ্লেষ, রূপকথা ও রূপক, প্রহসন, সমাজ ও জীবনের রূঢ় বাস্তব দিক লেখকের খেয়ালী কল্পনায় অভিনবত্ব পায়। 'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির নায়ক ডমরুব যাবতীয় বাহ্যিক ও মানসিক সক্রিয়তা এসবেরই নির্যাস। ডমরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মেলে 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পেও। ত্রৈলোক্যনাথ তাকে করেছেন আত্মসচেতন ও আত্মসমীক্ষকও—যা লেখকের জীবন ও সমালোচনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে একাকার থাকে।

আলোচ্য গল্পে সাক্ষাতের আগে ডমরুর নিজের কথায় নিজের স্বভাবনির্দিষ্ট অবয়ব ঃ

> 'আমার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তাহার পর আমাকে দেখিয়া কেহ বলে না যে, ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প পুরুষ। নিজের কথা নিজে বলিতে ক্ষতি নাই,—এই দেখ, আমার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শেউল মাছ। দাঁত একটীও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোঁটের দুইপাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে।' (প্রথম গল্প : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি?)

ডমরুর তিনটি বিবাহ। তৃতীয় স্ত্রী এলোকেশী। তবু সে অন্য কুমারী, পরস্ত্রী, বিবাহিতা, বিধবা—এমন নারীদের প্রতি আসক্ত। পঞ্চম গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে 'স্বদেশী কোম্পানী' শীর্ষনামে তার স্বীকৃতি :

> 'ছেলেবেলা হইতে ফরসা হইবার আমার সাধ ছিল। অনেক সাবাং মাখিয়াছিলাম, কিছুতে কিছু হয় নাই। মনে মনে ভাবিলাম,—"এই ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন? যদি আমার রং ফরসা হয়, তাহা হইলে দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।"

ডমরু একসময়ে শংকর ঘোষের নিজেরই কৌশলে তাকে ফাঁদে ফেলে স্বদেশি কোম্পানির সব টাকা আত্মসাৎ করে ধনী হয়—তা-ও গল্পের মধ্যে স্বীকার করে। দ্বিতীয়

পরিচ্ছেদে 'ভিকু ডাক্তার' অংশে ডমরু সেই সময়ের মানুষের পাটোয়ারী বুদ্ধি, উগ্র স্বার্থচিন্তার নমুনাও গল্পে বলে :

> 'অনেক কচলাকচলির পর আমি বলিলাম, যে,—"আপাততঃ আপনি এক টাকা লউন, রোগী ভাল হইলে পরে আর তিন টাকা দিব।"
>
> এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি এক টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্লভী ভাল হইল। কিন্তু তাহার পর ডাক্তারকে ঘোড়ার ডিম! রোগ ভাল হইলে অনেকেই ডাক্তার-বৈদ্যকে কলা দেখায়।'

মেয়েদের সম্বন্ধে ডমরুধরের অভিজ্ঞতা প্রীতি-চিত্র এইরকম :

> 'চঞ্চলার দাওয়াতে বসিয়া আমি গল্প-গাছা করিতাম। কখন কখন দুই-একটা রসের কথাও বলিতাম। তখন হাসিয়া সে নুটিপুটি খাইত। পাড়ার মানীদের সে ডাকিয়া আনিত। আমার দিকে চক্ষু ঠারিয়া সকলে হাসিয়া নুটিপুটি হইত। আমাকে দেখিলে লোকের আনন্দ হয়। মাগীদের তো কথাই নাই। আমার রূপ দেখিয়া তাহাদের মন ভুলিয়া যায়। মাগীগুলো আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে।'

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পে ডমরুর নিজের বলা এমন অভিজ্ঞতা চিত্রে শুধু নায়কের আত্ম-আবিষ্কার ধরা পড়ে না, গল্পের মূল সত্যও প্রতিভাত হয়।

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পটি ডমরুর বলা এবং বৈঠকী রীতি-অনুগ। গল্পটি ডমরুর একটি স্বপ্নের চিত্র রচনা। স্বপ্নের বর্ণনায় স্ত্রী এলোকেশীকেও যে সে ভয় পায় তার অকপট স্বীকৃতি আছে। ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুর মধ্য দিয়ে এক উৎকট, উদ্ভট ও বীভৎস রসের সম্যক উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। ডমরুর শরীর মোটরের ধাক্কায় কোমর থেকে দু'ভাগ হয়ে যাওয়া, মোটরের সঙ্গেই শরীরের নিচের ভাগ অদৃশ্য হওয়া, চঞ্চলার গাইগরুটি দু'খণ্ড হওয়ার পর ডাক্তার ভিকুর নিচের অংশটিকে ডমরুর শরীরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার পর মধ্যে উদ্ভটত্ব ও ঘটনার উৎকটতা তীব্র রসের স্রোত আনে। এখানে অসম্ভব কল্পনাই কৌতুকরসের স্রোত বহায়। চতুষ্পদ জন্তুর মতো ডমরুর ভিকুর বাড়িতে চাষকরা দিনে, রাতে চঞ্চলার বাড়ি আশ্রয়গ্রহণ, আহারাদির ব্যবস্থা, সকালে দুধ দান, কর্ম হলে বাছুরের মাথা দিয়ে দুধের থলিতে আঘাত দেওয়া ও তাতেও দুধ না পাওয়া গেল আর একটি নতুন বাছুরের প্রয়োজনের কথা শোনানোর মধ্যে তুমুল হাস্যরসের পরিচয় মেলে।

ডমরুর স্বপ্নের মধ্যে শংকর ঘোষ, ভিকু ডাক্তার, চঞ্চলা ও স্ত্রী এলোকেশীর ডমরুর মুমূর্ষু শরীর নিয়ে যে টানাপোড়েনে সংকটচিত্র তা ডমরু তথা ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরসাত্মক 'সিচুয়েশান' ও রসসৃষ্টিকে অবাধ ও অভিনব স্বাদযোগ্য করে। গল্পের শেষেও তথাকথিত ধর্মভীরু ডমরুর আর এক সংসার-চিত্র :

> 'আমি জাগরিত হইয়াছি দেখিয়া এলোকেশী বলিলেন,—"কাল রাত্রিতে ওরূপ বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলে কেন? চঞ্চলা কে?"
>
> আমি কোন উত্তর করিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, সকলই জগদম্বার মায়া! সমুদয় মায়ের লীলা!'

বৈঠকখানায় বসে কথোপকথনের স্বভাবে গল্পের মধ্যে গল্প বলার ঢঙে ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব সৃষ্টি ডমরু এক অভিনব চরিত্র—বাংলা সাহিত্যে এর আগে কখনও দেখা মেলেনি।

এক সমালোচক ডমরুর গল্পে 'নির্দোষ' ও 'নির্মল' হিউমার লক্ষ করেছেন। আগেও বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ছিল জীবনরস নির্যাস রূপ রোমান্টিক মন্ময়তার সার্থক বাস্তব অভিজ্ঞান। ত্রৈলোক্যনাথে তা নেই এবং সেই অভাব পূরণ করেছেন ডমরুর কথার ঢঙ ও উপস্থাপন-কৌশলের অভিনব চমৎকৃতি দিয়ে। যে গল্প কানে শোনার, উপলব্ধিতে অলংকৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে, তাতে জটিল মনস্তত্ত্ব অবশ্যই অস্বীকৃত হয়—অন্তত বঙ্কিমের আমলে ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধরে তা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বোধক, প্রচারক। আত্মমুখী মনোমন্থনের বিবিক্তি পূরণ হয়েছে ভিন্নস্বাদী বহির্মুখ গতিপ্রাণতায়। তারই রূপক রূপ হল ডমরুধর। সে ত্রৈলোক্যনাথের বিস্তৃত অভিজ্ঞতাজাত জীবন সমালোচনা, সমাজ সমালোচনা, প্রত্যক্ষ কারুণ্য ও মমত্ববোধের উজ্জ্বল উদ্ধার মানবাধর্মে দীপিত ব্যক্তিত্ব। 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পাংশের ডমরুধর আগের বলা একাধিক গল্পাংশ মান্য করে যে অভিজ্ঞতা-চিত্র স্বপ্নদর্শনের বকলমে উপহার দেয়, তা এই চরিত্রগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত আকাশ ও প্রকাশ।

চার

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পাংশটি একটি পূর্ণগল্পের মর্যাদা পেতেই পারে। গল্পাংশটি একই সঙ্গে কিছুটা রূপকাশ্রয়ী যেমন, তেমন আবার রঙ্গব্যঙ্গেরও বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত গল্প। এই গল্পে একদিকে আছে নায়ক-গল্পবলিয়ে ডমরুর যাবতীয় কথার বাইরের অর্থ ছাড়িয়ে সামনে আসে আর একটা অর্থ সমান্তরাল স্বভাবে, তেমনি রূপকের আড়ালে চোলাই মদের মতো থাকে রঙ্গ এবং ব্যঙ্গের বিচিত্র রসের মিশ্রণ। এই গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের জীবন ও সমাজ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নেওয়া নীতি-ভাবনা, আদর্শবোধ, আবার আছে তথাকথিত নায়কের ধর্মাশ্রয়িতা, পাপপুণ্য, জীবনের গ্লানি, ভণ্ডামি, স্বার্থগৃধ্নুতা, লোভ, লালসা ইত্যাদির বাস্তব দিক। ডমরুধরের গালগল্পে, কৌতুকরস-আশ্রিত শ্লেষ স্বভাবে, বৃহত্তর অর্থে ব্যঙ্গরসের ভিয়েন চাপানোয় মেলে রঙ্গ ও রূপকের সমাহার। ডমরুধরের যে স্বপ্নদর্শন তা উৎকট, উদ্ভট, বীভৎস পরিস্থিতির উদ্বোধন। গল্পের রীতি তাই মিশ্রধর্মী—বাইরে নিছক গল্পকথন, অন্তরালে আদর্শ ও উদ্দেশ্যধর্ম।

গল্পের রূপক হল ভিকু ডাক্তারের দুটি মাত্র হোমিওপ্যাথিক গুলি খাইয়ে ডমরুর ওপর-অংশের শরীরের সঙ্গে চঞ্চলার গাইগরুর নীচের অংশের যোগসাধনের ঘটনা। রাস্তায় একসিডেন্ট হতেই পারে, কিন্তু মাঝখান থেকে কেটে বেরিয়ে যাওয়া শরীরের এক অংশ অদৃশ্য হওয়া ও বাকি অংশের গাইগরুর সঙ্গে স্থায়ী সংযোজন রূপকথার বিস্ময় থেকে রূপকের থ্রিল সৃষ্টি করে। ডমরুর চতুষ্পদ জন্তু হওয়া, ওই শরীরে ভিকুর নির্দেশে চাষবাস করা, গরু দুধ পর্যাপ্ত না দিলে নতুন বাছুরের জন্য ভাবনা—এসব যেমন রূপকথা ছেড়ে রূপকে আশ্রয়গ্রহণের দিক দেখায়—তা ক্রমশ রূপকথা ছেড়ে, রূপক ছেড়ে উতরোল কৌতুকের স্রোতকে গল্পে প্রবল বেগ দান করে। এই বেগের আবেগেই

পরে আসে চার জনের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ডমরুর মূর্তি ধরে টানাপোড়েনের প্রহসন। এটাও গল্পের 'fun'।

অর্থাৎ 'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পের যে টান—তা ত্রৈলোক্যনাথের অসম্ভব অবাস্তব কল্পনা-সম্ভূত কৌতুককর পরিস্থিতি রচনার পরাকাষ্ঠা দেখায়। দুই খণ্ড দেহের ম্যাজিকের মতো সংযোজন বালকচিত্ত আকর্ষক রূপকত্বে। এই রূপকের ব্যঞ্জনাই শেষে ডমরুর দেহ নিয়ে স্বার্থপরতার সংগ্রামকে করে রুদ্ধশ্বাস। গল্পের প্রকরণ-নিহিত বড় ভাবের অপূর্বত্ব এখানে। ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুর স্বপ্ন দিয়ে নিজের লক্ষ্য ও ব্যক্তির ব্যতিক্রমী অবস্থান বোঝাতে চেয়েছেন। গল্পের রঙ্গরস লেখকের গল্পবলার অভিনবত্বের পক্ষে যথার্থ আধার।

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পের মধ্যেকার 'প্রতীতির সমগ্রতা' (Unity of Impression) ডমরুর স্বপ্নটুকু ঘিরেই যথাযথ। ডমরুর উদ্ভট স্বপ্ন তার চার জনের হাতে অপদস্থ হওয়ার Climax-এ গালগল্পের স্বভাব পায়। গল্পের উৎকণ্ঠিত দিক সমবেত চরিত্রদের আনুকূল্যেই শিল্পভিত্তি পেয়েছে। ডমরুর যে স্বভাব ও চিন্তাভাবনা, কর্মিষ্ঠতা—সবই গল্পকারের সত্য আদর্শভাবনার একান্ত অনুগ। গল্পটির ভাবের একমুখিতা ডমরুর স্বপ্ন-ক্রমের শেষে শঙ্কর ঘোষ, ভিকু ডাক্তার, চঞ্চলা ও এলোকেশীর ডমরুর দেহ নিয়ে টানাটানির কেন্দ্রেই রক্ষিত। তবে গল্পের একেবারে শেষে ডমরুর স্বপ্নভঙ্গের পর, স্বপ্নের নিষ্ফলত্বের পর এলোকেশী-ডমরুর সম্পর্কের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মের থেকে দুজনের সাংসারিক আবহে বাস্তব সংসার-তাৎপর্য রূপ পেয়েছে। ডমরুর নিজের থেকে তার ভাষাচিত্রের অঙ্কন এই রকম:

> 'কেবল দেখিলাম যে, এলোকেশী বাক্স খুলিয়া কাপড় বাহির করিতেছিলেন। আমি জাগরিত হইয়াছি দেখিয়া এলোকেশী বলিলেন,—"কাল রাত্রিতে ওরূপ বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলে কেন? চঞ্চলা কে?"
>
> আমি কোন উত্তর করিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে,—সকলই জগদম্বার মায়া! সমুদয় মায়ের লীলা!'

একদিকে উগ্রমূর্তি এলোকেশীর স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি স্বপ্নের সূত্রে অন্য নারী চঞ্চলা প্রসঙ্গের প্রতিক্রিয়ায়, অন্যদিকে চতুর স্বামীর মতো ডমরুধরের নিরুত্তর থাকা ও 'সবই জগদম্বার মায়া! সমুদয় মায়ের লীলা'— এমন আত্মোক্তির স্বভাবে স্ত্রীকে সামলানোর কৌশলগত প্রয়াসে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঞ্জনা নয়, গালগল্প ও বৈঠকী গল্পের উপসংহার টানার প্রয়াস মান্য।

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ অবশ্যই বৈঠকী গল্পের উপযোগী। লেখক তথা ডমরুধরের গল্পের বর্ণনাচিত্র, সংলাপ প্রয়োগের বাক্যরীতি—সবই সাধুরীতি অনুগ—যদিও একাধিক ক্ষেত্রে চলতি এবং কথ্য শব্দ প্রয়োগ অ-দৃশ্য নয়। তাতে গল্পের পরিবেশ ও আকর্ষণ কমেনি। চঞ্চলার বাড়িতে ঠাট্টা-ইয়ার্কির কথায় 'নুটিপুটি' শব্দ ব্যবহার করেছেন লেখক ডমরুর কথায়। 'মাগী' শব্দের প্রয়োগ ডমরুর স্বভাবসুলভ নিশ্চিত। মাঝে মাঝে 'সকলই জগদম্বার মায়া'—এমন ধুয়ার মতো প্রয়োগ বৈঠকী মেজাজ, গল্পের কাহিনীর বিশ্বাস্যতা, ডমরুর বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাগা-

তাবিজের ব্যবহারের মতো গল্পের অলংকার বাড়িয়েছে কথ্য পরিবেশ বজায় রাখতে। বাছুরদের—'চঞ্চলার গাইয়ের পেটে মাথার হুড়ো' মারার পরিকল্পনা নির্মল কৌতুকরসের উদার স্বাদ দেয়। ভিকুর নির্দেশে চাষী চতুষ্পদ ডমরুর লেজে মোচড় দেওয়ায় চঞ্চলার বাবা সহদেবের আপত্তি : "ও কি! তুমি উহার লেজ মলিতে পারিবে না। লেজ তোমাদের নহে, লেজ আমাদের ভাগে পড়িয়াছে," অন্যদিকে ভিকু ডাক্তারের অভিযোগের সার্থকতা প্রবল হাসির খোরাক দেয় গল্পের শ্রোতা অর্থাৎ পাঠকদের :

> "ডমরুবাবুর ওই পেট এখন আমার। পেট আমার ভাগে পড়িয়াছে। পেটে আমি বাছুরকে মারিতে দিব না। তাহার ঢুঁতে যদি ডমরুবাবুর নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের নামে আমি নালিশ করিব।"

গাইগরুর যখন দুধে একবারে টান পড়ে, তখন সহদেবের নতুন বাছুর জোগাড়ের তোড়জোড়-ভাবনায় ডমরুর প্রতিক্রিয়া :

> 'এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। একে লাঙল টানিয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। তাহার উপর আবার বাছুরের জোগাড়।
> সে রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না।'

গল্পের মধ্যে চতুষ্পদ ডমরুর যে হেনস্থাচিত্র ও ডমরুর ভয়ের অভিব্যক্তি—গল্পের কৌতুকরসে ক্রমশ প্রবল বেগ ও উচ্ছ্বাস সংক্রামিত করেছে।

পাঁচ

'চঞ্চলার গাইগরু' গদ্যাংশটি ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরুচরিত' গ্রন্থের মোট তিনটি পরিচ্ছেদের শেষ পরিচ্ছেদ—যার শীর্ষনাম এই গল্পনাম। নামটি গল্পের মূল বিষয়ের পক্ষে অবশ্যই মানানসই।

প্রথমত, গল্পে ডমরুর যে গল্প—যা তার স্বপ্নে পাওয়া—তার মূলকেন্দ্রে আছে যেমন ডমরু, কিন্তু তার থেকেও প্রধান হয়েছে চঞ্চলার গাইগরুই। ডমরু চঞ্চলার বাড়ি গেছে তার সঙ্গে কিছু সদ্ভাব করতে। সেখানে তার স্বপ্নদর্শনের বিভ্রাট থেকে গাইগরু ডমরুর সঙ্গে যুক্ত হয়। আর তা নিয়েই গোটা স্বপ্নে ডমরুর যত বিড়ম্বনা। সুতরাং নামের সাধারণ তাৎপর্য গল্পনামের যথার্থতার পোষক।

দ্বিতীয়ত, ডমরুর সঙ্গে গাইগরুর যোগ ওষুধের প্রয়োগে—যে ওষুধ দেয় ভিকু ডাক্তার। যুক্ত হওয়ার পর ডমরুর শরীর ও মনের যাবতীয় বিড়ম্বনা আনে চঞ্চলার গাই-এর ছিন্ন হয়ে-আসা নীচের দুটি পা সহ অংশই। তার দুধ বিক্রি, দুধ কমে আসায় বাছুরের উৎপাত, আবার নতুন বাছুর আনার ভাবনা, ডমরুর নাদুস-নুদুস নধর শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ও অস্থিচর্ম সার শরীর হওয়া—এসব উপসর্গ দেখা দেয়। অন্যদিকে ভিকু ডাক্তারের চতুষ্পদ জন্তুর মতো ডমরুধরকে দেখে নিজের কৃষিকাজে লাগানো, গরুর মতো মাঠে কৃষিকাজে যুক্ত করা, পিঠে কৃষকের চাবুকের যন্ত্রণাকে সহ্য করানো—এসবই সেই গাইগরুর সংযোগেই ভিকুকে সুযোগ করে দিয়েছে। বিড়ম্বনা

হল—ডমরু অর্ধেক শরীর নিয়ে মানুষই! গাইগরুটি তো চাষের কাজে লাগা, দুধ দেওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে স্বাভাবিক, আবার হাস্যকরও! ডমরু তা নয়। সুতরাং ডমরুর যে চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব গাইগরুর স্বভাবের কারণেই তা ডমরুর ওপরে চাপানো ব্যাপার। চঞ্চলার গরুর বাছুর নিজ স্বভাবেই ডমরুর পেটে গুঁতো মারে। তাই ভিকুকে তার জন্য প্রতিবাদ করতে হয় ডমরুর এক অংশের অধিকার সূত্রে। ডমরুর থেকে আর একটি নতুন বাছুরের যে কল্পনা করে চঞ্চলার বাবা সহদেব, তাতেও গাইগরুর দায়িত্ব যতটা, অর্ধশরীর বিশিষ্ট ডমরু সেখানে তেমন কোনো সমস্যা তৈরি করে না। সুতরাং এই ব্যাখ্যার বিস্তারে গল্পের কাহিনীতে চঞ্চলার গাইগরুর গুরুত্ব ও সক্রিয়তা গল্পের শ্লেষ-ব্যঙ্গের মূল লক্ষ্যকে সামনে আনে। নাম তাই লক্ষ্যের মূলে গল্পের লক্ষ্য-নির্দেশক অভিজ্ঞান।

তৃতীয়ত, গল্পের পরিণামে, ডমরুর কষ্ট লাঘবের শেষ ঘটনায় গাইগরুর দু'টি খুর ধরে চঞ্চলার ও এলোকেশীর যে টানাটানি, তাতে ডমরুর অবস্থা হয় স্বাভাবিক। 'অবশেষে তাহাদের টানাটানিতে আমার শরীর হইতে ফস করিয়া চঞ্চলার গাইগরুর কোমর ও পা খসিয়া পৃথক হইয়া গেল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।' গল্পে গুরুত্ব—ডমরুর সামগ্রিক কষ্ট, বেদনা, ও অসহায়তার দিক থেকে গাইগরুরই। মানবশরীর থেকে জন্তুর আকস্মিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই গল্পের নায়কের অজ্ঞান হওয়া ও স্বপ্নের পরিপূর্ণ মুছে যাওয়ার পর একমাত্র শান্তিলাভ। তাই 'চঞ্চলার গাইগরু'র ভূমিকা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

'ডমরুচরিত'এর পঞ্চম গল্পের প্রসঙ্গে এসেছে প্রথমে শংকর ঘোষের স্বদেশি কোম্পানি—যার সূত্রে শংকর ঘোষকে সম্পূর্ণ ঠকিয়ে ডমরু হয বিরাট ধনী, দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেছে ভিকু ডাক্তার দুর্লভীর জ্বর সারাবার উদ্দেশ্যে, সেখানে দুর্লভীর সুস্থ হওয়া, ডমরুর স্বস্তি পাওয়া ও ভিকুকে ডমরুর প্রবঞ্চনার মতো ঘটনা ঘটে। তৃতীয় ও শেষ গল্পাংশ 'চঞ্চলার গাইগরু' প্রসঙ্গে একে একে গল্পের প্রয়োজনে শংকর ও ভিকু আসে ডমরুকে উচিত শিক্ষা দিতে। এসেছে ডমরুর উগ্রমূর্তি স্ত্রী এলোকেশী। চঞ্চলা তো আগাগোড়া আছেই। সুতরাং পঞ্চম গল্পের নামের সামগ্রিক বিচারে উপসংহার হিসেবে চঞ্চলার গাইগরু নামটি বড় তাৎপর্যে একান্তই মানানসই। তাই নামটি গোটা গল্পের পরিণতি-নির্দেশক নিঃসন্দেহে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি
মৃত্যু : ৫ এপ্রিল ১৯৩২

গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম আবির্ভাব-প্রসঙ্গ ভাবনায় ছোটগল্প নয়, তাঁর কবিতার প্রসঙ্গই মনে আসে। সে সময়ে প্রকাশিত 'দাসী', 'ভারতী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকার একাধিক সংখ্যা তারই প্রমাণ দেয়। বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন তাঁর লেখা কবিতা এবং কবিতানির্ভর চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে তাঁর পাঠক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘটে পরিচয়। একান্ত অনুগত রবীন্দ্র-ভক্ত হয়ে ওঠার কারণে ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় পরবর্তী সময়ে কবিতা ছেড়ে প্রভাতকুমার গদ্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন 'সাধনা'র সম্পাদক, পরে 'ভারতী'র। তবে সম্পাদক হয়ে তিনি প্রভাতকুমারের কবিতাপাঠে বেশি আগ্রহ দেখান প্রথম দিকে। এই কিশলয়-স্বভাবী সাহিত্য-মনস্কতার মধ্যেই প্রভাতকুমারের 'অভিশাপ' নামের প্রথম কাব্যগ্রন্থটিও বেরিয়ে যায়। প্রকাশকাল বাংলা ১৩০৬ সাল।

একদিকে কবিতা, আর একদিকে গদ্য তথা গল্প-উপন্যাস-ভাবনা—দু'য়ের মাঝখানে প্রভাতকুমারের মনোভঙ্গির এক ক্রান্তিরেখার মতো সীমাচিহ্ন হয়ে ওঠে তাঁরই একটি স্বীকারোক্তি : 'রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্যরচনায় হাত দিই।' প্রভাতকুমারের কবিতা লেখার মূলে ছিল অপরিণত অভ্যাস, আবেগময় স্বতঃস্ফূর্ততা, রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ও প্রত্যক্ষ নির্দেশজনিত বিভ্রান্তি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। এর মধ্য থেকেই জন্ম নেয় 'বেনামী চিঠি' নামের ছোটগল্প। এই গল্পের কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়ে যায় 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' গল্প ('প্রদীপ' ১৩০৫ সালের বৈশাখ)। অবশ্য 'সর্বপ্রথম, মৌলিক রচনা' 'বেনামী চিঠি' (ভাদ্র ১৩০৫) আগে লেখা হলেও এবং 'সাধনা'র জন্য পাঠানো হলেও প্রকাশিত হয় পরে ১৩০৫ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রদীপ' পত্রিকায়।

প্রভাতকুমারের শিল্পী-মনের বিলাসী আত্মক্রিয়ায় কবি-মনস্কতার বোধন, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে কথাকার তথা গল্পকার সত্তার উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথই সেক্ষেত্রে একমাত্র উদ্বোধক। ১৯৭৩ সালে প্রভাতকুমারের জীবনভূমি শতবর্ষের মর্যাদায় ধন্য। এই মর্যাদার ভিত প্রধানত তাঁর ছোটগল্পেরই জনপ্রিয়তা ও সুখপাঠ্যতার আলোয় স্পষ্ট। এই আলো গল্পকার প্রভাতের শিল্প-সম্মানের শক্তিমত্তার একমাত্র অভিজ্ঞান। লেখকের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবন, বলতে গেলে, দু'টি দিক প্রায় একই সঙ্গে ছিল পাঠক-জনতার আড়ালে, কতকাংশে আত্মকেন্দ্রিক স্বয়ম্ভু অ-সামাজিকতা তাঁর এই যৌথ জীবনকে সাধারণের থেকে, তথ্য প্রমাণের সূত্রে, আড়াল দেয়। অল্পবয়সে বিবাহ, দুই সন্তানের জন্ম দিয়ে অকালে

পত্নীবিয়োগ (১৩০৪), স্কুলে শিক্ষকতা, ভিন্ন ভিন্ন চাকরিসূত্রে সিমলা, কলকাতায় পর্যায়ক্রমে বসবাস, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা সরলাদেবীর সঙ্গে প্রেম, সেই সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের খরচে প্রভাতকুমারের বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া, ফিরে ব্যারিস্টারি পেশার সূত্রে দার্জিলিং রঙ্গপুরে দিনযাপন, গয়ায় এসে আইনি পেশা গ্রহণ ও ক্রমশ তাতে অনীহা প্রকাশ, দুই স্বতন্ত্র পত্রিকার সংযুক্তিতে 'মানসী ও মর্মবাণী'র সহযোগী সম্পাদনার কাজে কলকাতায় ফিরে আসা, কলকাতার ল'কলেজের অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ—এমন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আইনি পেশানির্ভর চাকরির যাবতীয় অস্থায়িত্বের মধ্যে প্রভাতকুমার নিয়মিত সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

আর এই সৃষ্টির মধ্যে পরিমাণগত পরিচয়ে যেমন, তেমনি পাঠক-জনতার অভিনন্দনেও প্রভাতকুমার বিপুল জনপ্রিয়তা পান, অথচ সেই জনপ্রিয়তা প্রভাতকুমারের গভীর শিল্প-ক্ষমতার, মননের ধর্মে আদৌ সার্থক ছিল না। শুধু জনপ্রিয়তা একজন যথার্থ শিল্পীর সৃষ্টির অভিজ্ঞান হতে পারে না। যে পাঠক-জনতা এক বিশেষ সময়-পরিধিতে প্রভাতকুমারের সৃষ্টিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়, তারাই আবার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রভাতকুমারের রচনাকে পাশে সরিয়ে রাখে। জনপ্রিয়তার বিচারের মাপকাঠি এমনই! প্রভাতকুমারের আগে উনিশ শতকের শেষার্ধে, ষাট থেকে নব্বই দশকের মধ্যকাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র আপন মনসা ও মনীষার, অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে উপন্যাস ও অন্তর্নিহিত গল্পকথা দিয়ে যে পাঠক-জনতা তৈরি করেছিলেন, তাতে 'এ্যাভারেজ' পাঠক-জনতা নয়, নব্য ইংরেজি শিক্ষিত 'সহৃদয়' অর্থাৎ 'ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল' পাঠকরাই প্রধান পক্ষ নেয়। রবীন্দ্রনাথ অব্যবহিত বঙ্কিম-উত্তর সময়ে নতুন করে কথাসাহিত্যের যে content ও form-এর শক্ত মাটি তৈরি করেন, সেসবেও পাঠক-জনতা নিজেদের তৈরি করতে পারেনি।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—দু'তরফেই যথার্থ 'এ্যাভারেজ' পাঠককুল প্রস্তুত হয়নি তাঁদের গ্রহণ করার ব্যাপারে। তাই সীমিত শিক্ষিত পাঠক-জনতা বাদে বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠক ছিল আপনাপন স্বভাবে অ-প্রস্তুত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'র মতো প্রথম যথার্থ সামাজিক উপন্যাস রচিত হলেও তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'র পাঠক-জনতা সমকালে অ-প্রস্তুত থাকার কারণে 'বিষবৃক্ষে'র থেকে সরে গিয়ে অনেক বেশি সংস্করণে 'স্বর্ণলতা'কে অভিনন্দিত করেছিল— সে ক্ষেত্রে 'স্বাদের স্বাতন্ত্র্য' অবশ্য মান্য, তবে জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে পাঠককুল অবশ্যই 'এ্যাভারেজ'। এই বিশেষ শূন্য পরিবেশে বিশ শতকের রবীন্দ্র-সমকালে আসেন প্রভাতকুমার। ১. প্রভাতকুমারের লেখায় একজন প্রতিভাধরের উপযোগী High poetic Imagination ছিল না। ছিল না intellect ও যথোচিত observative power। তিনি নিজের লেখাকে ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে অনেকটাই সমকালের রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মতো। তাঁর গল্প ও উপন্যাস বক্তব্যে

হয়েছে পাঠক জন-মনোরঞ্জনী। ২. সাধারণ পাঠকের কাছে 'শান্ত'রসের স্বভাব-জাত স্নেহরস সর্বদাই বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর চিহ্নিত 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু'-কথার তাৎপর্য ছিল সর্বদাই অত্যন্ত উপাদেয়। প্রভাতকুমার তাঁর একাধিক গল্পে সেই রসের ভিয়েন সর্বদাই পূর্ণ রেখেছেন। জনপ্রিয়তায় তার স্বাদ সীমা ছাড়ায় পাঠক মনে। 'ভিখারী সাহেব' 'মাতৃহীন', 'ফুলের মূল্য', 'আদরিণী' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। ৩. তাঁর একাধিক লেখায় সহজ কৌতুককে প্রভাতকুমার করেছেন নির্ভুল লেখনীসঞ্জাত। আগে ত্রৈলোক্যনাথ ও পরে পরশুরাম যে কৌতুকরসে যথাক্রমে সমাজচেতনায় বৈঠকী শ্লেষ ও তীব্র ব্যঙ্গের ক্ষুরধার দীপ্তির ঝলক তীক্ষ্ণ আলোকময় করেছেন, সেখানে প্রভাতকুমার শিল্পীমনে শুভ্রবাস শান্ত-সহজ সরল-স্বভাবী। ৪. প্রভাতকুমার যখন লিখতে শুরু করেছেন, তখনকার বাংলা সাহিত্য-পরিবেশে লেখকহৃদয়ই সময়কে গভীর মান্য করে, সেখানে বুদ্ধি ঝিমোয়, সেই সঙ্গে তা ঢাকা পড়ে যায় হৃদয়রসের মাদকতায়, অনেকটা আফিঙ্-এর প্রতিক্রিয়ার মতো। তাই প্রভাতকুমারের লেখা পাঠক-মন লুঠ করে নেওয়ার প্রচণ্ড শক্তি ধরে। তা প্রভাতকুমারের ত্রুটি নয় কোনোমতেই। তার সীমা শিল্পী-ব্যক্তিত্বেব। ৫. একই সঙ্গে আবেগসর্বস্বতা ও করুণ রসের প্রতি চুম্বক আকর্ষণ যার জন্য 'এ্যাভারেজ' পাঠক-জনতা প্রস্তুত—তাতেই প্রভাতকুমার ছায়া সুনিবিড় গাছেব নিচের শান্ততা, আরাম, পরিতৃপ্তি আনেন। প্রভাতকুমারের একাধিক গল্প সে সবের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। তাকেই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কথাকার-সমালোচক 'সহজ সুরে সহজ কথা' বলে অভিনন্দিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্যের যথার্থ পাঠক তৈরি করার শপথ মূর্ত করেন তাঁদের নিজ নিজ রচনার জীবনবীক্ষণের মধ্য দিয়ে। ১৯২৩-এ কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকা দিয়ে মধ্যাহ্নের প্রাথমিক দাবদাহের প্রস্তুতি আনেন একদল নবীন তরুণ তুর্কি লেখক। মাঝখানের সময়ে প্রথম ভাগে প্রভাতকুমারের রচনা পাখির গান শোনায়, শেষভাগে শরৎচন্দ্র তাকেই গ্রহণ করে একই সঙ্গে যেমন 'এ্যাভারেজ' পাঠক-জনতাকে লালন করেন, জনপ্রিয় হন, তেমনি কিছু সচেতন পাঠকও তৈরি করেন সীমিত শিল্পক্ষমতা দিয়ে। প্রভাতকুমারের শিল্পীমনের সীমাবদ্ধতাই শরৎচন্দ্রের দায়বদ্ধতাকে কিছুটা সতর্কতায় দেখায়—যদিও জনপ্রিয়তা তাঁকে আগের বৈশিষ্ট্যেই মান্য করে। প্রভাতকুমারের উপন্যাস সুখপাঠ্য এবং ছোটগল্পে তিনি স্ব-ক্ষেত্রে 'সিরিয়াস'। শরৎচন্দ্র ছোটগল্প লিখতে অনীহ ছিলেন বলেই প্রভাতকুমার তাঁর গল্পের পাঠক-জনতাকেন্দ্রিক মর্যাদা যথাযথ রাখতে পেরেছেন। কল্লোলের নতুন প্রতিক্রিয়াকে আদৌ আমল না দিয়ে প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র দুজনেই যে সময়কালকে মান্য করে অসাধারণ জনপ্রিয় থেকে গেছেন যথাক্রমে ছোটগল্প ও উপন্যাসে, তা উভয় কথাকারেব ব্যক্তিত্বের সীমাকেই বাস্তবতাব মূল্যে উজ্জ্বল করে।

আগেও বলেছি, আবার বলি, প্রভাতকুমার যে একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বেব গল্প

উপহার দিতে পারেননি, তা তাঁর ত্রুটি নয়, ব্যক্তিত্বের সীমা। এই সীমা কিন্তু এক খড়ির গন্ডি, যার মধ্যে তিনি প্রধান অর্থে 'good' বা 'minor' গল্পকার। এই ক্ষমতায় বেশ কয়েকটি ভাল গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। পাঠকের মনকে বিলাসের, তৃপ্তির সুখপাঠ্য স্বভাবে মজিয়ে তোলার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। লঘু রস আর সাজানো সমাজের ছবি ধরে তিনি নিপুণ কুশলী গল্প শুনিয়েছেন। মানুষে-মানুষে স্নেহের সম্পর্ক, কৌতুকহাস্যের শুভ ও শোভন শালীন রসস্রোত, ঘটনা সাজানোর কৌশল, বিলাস-মুখ্য পরিবেশ রচনা আপনজনদের মধ্যেকার সহজ পদস্খলনে শান্তিবারি বর্ষণ—এসব নিয়েই গল্পের শিল্পগত সর্বাবয়ব বন্ধনকে মোহের আবরণে সত্য করেছেন।

'কাশীবাসিনী', 'প্রণয়-পরিণাম', 'বলবান জামাতা', 'আদরিণী', 'রসময়ীর রসিকতা', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'হিমানী', 'বিষবৃক্ষের ফল' ইত্যাদি গল্প থেকে প্রভাতকুমারের গল্পকার সত্তার স্বাতন্ত্র্যের বড়মাপের পরিচয় মেলে। 'দেবী' গল্পটি এই সমস্ত গল্পের থেকে, প্রভাতকুমারের সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ ও ক্ষমতার সৃজন। প্রেমের বিভিন্ন স্তর, স্বাদ ও বয়সের সীমা, ধর্মের গোঁড়ামি ও সংস্কার, সামাজিক সমস্যার অন্যতম পণপ্রথা-কন্যাদায়, অলৌকিক রস, গল্পের পটভূমির সমসময়ের স্বদেশী আন্দোলন,—এসব নানাভাবে মিলমিশে প্রভাতকুমারের গল্পের বিষয়ভাবনার আভরণ-স্বভাব নির্মাণ করে। এমনকি প্রভাতকুমারের মতো শুচিবাদী লেখকের হাতে দুই যুবতী নারীর সমকামিতার মতো 'প্রিয়তম' নামের গল্পও পাই। এইসব বিষয়ের অনেক গল্প গঠনশিল্পের মানে খাটো হতে পারে, কিন্তু লেখক তাঁর গল্প বলার যথাযথতা, শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতায় গল্পের উপযোগী করে আঁকার ক্ষমতা কোথাও কোথাও দেখিয়েছেন। ঘটনা সাজানোর স্বাভাবিক কৌশল, পাঠক-রুচির ও চিত্তবিনোদনের আনুগত্য—সহজ আনন্দ-সুখ দানের লক্ষ্য, এসবেই তাঁর সে সময়ের বিপুল জনপ্রিয়তার শিল্প-ভাগ্যনির্দিষ্ট কবচকুণ্ডল।

১.

দেবী

এক

প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩০৬ সালের 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র মাসের সংখ্যায়, পরে গ্রন্থভুক্ত হয় লেখকের প্রথম গল্প সংকলন 'নবকথা'র প্রথম সংস্করণে, কার্তিক ১৩০৬-এ। 'দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথ লেখককে 'দান' করেছিলেন। লেখকের এই স্বীকৃতি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ স্বয়ং লেখক পাঠকদের সে কথা জানান। সে সময়ে লেখক কর্মসূত্রে গয়ায় বাস করতেন।

'নবকথা' গ্রন্থটির সংকলিত গল্পগুলির ক্রম ধরে হিসেব করলে 'দেবী' গল্পটির স্থান সংখ্যায় হয় নবম। গ্রন্থটির সংকলিত সর্বশেষ গল্প 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর'। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত ১৩১৮র ১লা জ্যৈষ্ঠ যে পাঁচটি নতুন গল্প 'অতিরিক্ত গল্প' হিসেবে সংযোজিত হয়, তাতে 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' গল্পটিও হয় শেষতম, এই হিসেবে 'দেবী'র স্থান-এর তাৎপর্য প্রভাতকুমারের গল্পকার তথা কথাকার মানসবৈশিষ্ট্যের আরও কিছু দিক চিহ্নিত করে—যা, আমাদের মনে হয়, 'দেবী' গল্পের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। 'দেবী' কৌতুকরসের গল্প নয়, এক সমালোচক কথিত 'অন্ধ সংস্কারের বেদিমূলে জীবনের অপচয়'কে দেখানোই লেখকের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। গল্পটি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক রচনা—যা প্রভাতকুমারের মূল শিল্পীস্বভাবের বিপরীত।

অপূর্বমণি দত্তকে প্রভাতকুমার একসময়ে বলেন, '.......কি দরকার করুণরসের, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসটাই বরং দুর্লভ'। এই বিশেষ মানসিকতাই প্রভাতকুমারের গল্পের প্রসারিত আবেদন। তাই গল্প সংকলনের গল্পের ক্রম-ভাবনায় লেখকের কথা : 'দেবী Tragedy উহাকে একেবারে শেষ গল্প করা সঙ্গত মনে করি না।' অর্থাৎ গল্পকার প্রভাতকুমারের হাতে দেবী অবশ্যই এক এবং একমাত্র ব্যতিক্রমী মনোভঙ্গির অভিজ্ঞান। প্রভাতকুমার গল্পে মানুষজনের, নায়ক-নায়িকার মৃত্যুকে আঁকতে, ট্র্যাজেডি দেখাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। জীবনের উপরিতলভিত্তিক (superficial) লঘুরসের সাধনাই তাঁর জীবন ও শিল্পের সাধনা। কৌতুকরসের গল্পকার হয়ে থাকাই তাঁর একান্ত বাসনা। এই রসের গল্পই তাঁর জনপ্রিয়তার বড় সিদ্ধি।

আগেই বলেছি, লেখকের স্বীকৃতি 'দেবী' গল্পের 'থিম' প্রভাতকুমারের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'দান'। সেই 'দেবী' লেখার পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রভাতকুমার জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকেই লেখা তাঁর একটি চিঠির মধ্যে : 'শুনিলাম আমার "দেবী" গল্প পড়িয়া আপনি নিরাশ হইয়াছেন। তাহার "সাইকলজি" পরিস্ফুট হয় নাই দেখিয়া। ...... দেবীর একটা ফাইল পাঠাইতেছি এই ডাকে; একটু Touch করিয়া দেবেন অনুগ্রহ করিয়া, ...'। এই পত্রেই প্রভাতকুমারের উল্লেখ আছে যে তাঁর 'অভিশাপ' নামের ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু সংশোধন করেন। অর্থাৎ প্রভাতকুমারের লেখায় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের যে কিছু ঘষা-মাজার ব্যাপার ঘটত, তা সত্য। কিন্তু চিঠির

মধ্যে 'দেবী' সম্পর্কে উপরি-উক্ত 'Touch' করে দেওয়ার কোনো উল্লেখ নেই, প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথের 'দান' নিয়ে প্রভাতকুমারের এই লেখা গল্পপাঠে রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যমার্জিত নৈরাশ্যের দিক। আমাদের 'দেবী' গল্পটির বিস্তারিত আলোচনার ভূমিকা ও বিচার-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা আলোচনাটির সমর্থনে কিছু গুরুত্ব পাবেই। অর্থাৎ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি, এবং তা যে গল্পটির শিল্পভিত্তির পক্ষে অস্বস্তির উদ্বোধক তা মানতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নৈরাশ্য' ও 'নীরবতা' এবং গল্পটি অবশেষে প্রভাতকুমারের ফেরত চাওয়ার পর, 'দেবী যথাসময়ে ফিরিয়া পাইয়াছি' এক পত্রের এমন স্বীকৃতিতে গল্পটির যথার্থ শিল্পমান বিচারে কিছু আলোর নির্দেশ মেলে।

'দেবী' গল্পের কাহিনী-কাঠামো, চরিত্রবিন্যাস, কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও অন্যান্য মানুষজন—সব মিলিয়ে লেখকের লেখার প্রেক্ষিত-নির্দেশ তাঁরই ভাষায় — 'সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা'। গল্পটির পরিবেশ, স্থান-কাল-পাত্র এক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত পারিবারিক জীবন। সে জীবনে ধর্মচর্চা, আধ্যাত্মিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, তন্ত্রনিহিত কালী সাধনার প্রভাব, ভক্তিরস—এসব রক্তের আত্মীয়তায় জড়ানো। তারই মধ্যে স্বপ্নে আরাধ্য দেবীর নির্দেশ ও তার প্রতিপালন গল্পটি পাঠে রীতিমত চুম্বকের আকর্ষণ আনে। গল্পের বিষয় হয় শিল্পের চমৎকারিত্বে অভিনব।

গল্পের প্রথমে আছে, সে সময়ের প্রসিদ্ধ পরম পণ্ডিত, পরম ধার্মিক নিষ্ঠাবান শাক্ত জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের ছোট ছেলে কুড়ি বছরের উমাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর পাঁচ-ছয় বছর আগের বিবাহ করা, বর্তমানে ষোল বছর বয়সী দয়াময়ীর, রাত্রিকালীন শয্যাঘরে সংলাপ বিনিময়ের জীবন্ত চিত্র। এই চিত্রে উমাপ্রসাদের, তার প্রপিতামহের মতো, চঞ্চল-মতিত্বের আদৌ প্রকাশ নেই স্ত্রীর সামনে। এর ফলে উমাপ্রসাদ স্ত্রীর সামনে 'মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকল্যাণের' কোনো প্রসঙ্গ তোলেনি এবং সে নিয়মাদি প্রসঙ্গে স্ত্রীকে অজ্ঞও করে যে রাখে, তার ফলে কথাবার্তা হয় বাস্তব জীবন গড়া নিয়েই। স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসার বিনিময়ে একসময়ে নিজের পশ্চিমে চাকরি করতে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলে। এই চাকরি নিযে ষোড়শী স্ত্রী জমিদারি পরিবারের বধূর দায়িত্বে থেকে অসুবিধের, অস্বস্তির কথা বলে। উমাপ্রসাদ একাধিক পাল্টা যুক্তি দেয়।

এই চিত্রের শেষে উমাপ্রসাদ কৌতুকের ছলে তাদের বড়ভাই তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান দয়াময়ী-অন্ত প্রাণ, বিপরীতে দয়াময়ীও—প্রসঙ্গের মধ্যে বাইরের একক সংসারে নতুন সন্তানের আগমনের ইঙ্গিত দেয়। এইভাবেই আসে এই খণ্ডচিত্রের শেষে অন্যতম মূল সূত্র ধরার দিক। বড়ভাই তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান গল্পে 'খোকা' নামেই পরিচিত। রাতে শেষের দিকে, ভোরে খোকা স্নেহার্ত স্বভাবে দয়াময়ীর কাছে আসে, আদর পায়, ওর কাছেই ঘুমোয়। এটা প্রতিদিনের পারিবারিক অভ্যাস। সে এখনো না আসায় দয়াময়ী, খোকার ভালো-মন্দ নিয়ে তীব্র উৎকণ্ঠা জানায় স্বামীকে। কিন্তু রাত এখনো ভোর হয়নি বুঝতে পেরে দুজনেই একসময়ে শান্তির ঘুমে ডুবে যায়।

এই প্রভাত শুরুর মুখেই হঠাৎ ওদের ঘুম ভেঙে যায় উমাপ্রসাদের পিতার ডাকে। সে ডাক স্বর-স্বভাবে কম্পিত, একেবারে অন্যরকম। এমন ভোরের আহ্বান একেবারেই

ব্যতিক্রম। উমাপ্রসাদ ভাবে, বাবার এমন অসময়ের ডাক খোকার কোনো অসুখবিসুখ! কিন্তু দরজা খুলে বাবাকে দেখে অন্যরূপে—পরনে লাল রঙের কৌষেয় বস্ত্র, কাঁধে নামাবলী, উত্তরীয়, গলায় ঝোলানো রুদ্রাক্ষের মালা। এসব তো বাবার নিত্তনৈমিত্তিক পুজোর বেশ, গঙ্গাস্নানের পর এসবের আয়োজন! এখন কেন? এর কোনো প্রসঙ্গ না তুলে পিতা কালীকিঙ্কর রায় খোঁজ করেন ছোটবউমা দয়াময়ীর। দয়াময়ী তখন বিছানা ছেড়ে ঘরের মধ্যে কিছু দূরে জড়সড়। ওকে দেখামাত্র কালীকিঙ্কর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন দয়াময়ীকে। ছেলেকেও তার স্ত্রীকে প্রণাম করতে বলেন। উমাপ্রসাদ বাবাকে বিস্ময়ে উন্মাদ হওয়ার কথা স্মরণ করালে কালীকিঙ্কর জানান তাঁর জীবন ধন্য, তিনি কাল রাতে স্বপ্নের প্রত্যাদেশে জেনেছেন দয়াময়ী তাঁদের বংশে তাঁর একমাত্র আরাধ্যা মা জগন্ময়ী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

পিতার দৃঢ় বাসনায় পবিবারে মানবী দয়াময়ী হল দেবী, সারা গ্রামে ও দূরদূরান্তে প্রচার হয়ে যায় দয়াময়ী সাধ্যা কালীই! দয়াময়ীর আকুল কান্না তাদের বিশ্বাস টলাতে পারেনি। তিনদিন পূজার্চনার পর গভীর রাতে উমাপ্রসাদ প্রায়-মূক দয়ার কাছে এসেও কোনো সমাধান করতে পারল না এই বিপর্যস্ত অবস্থার। দয়াময়ীরও সমস্ত বিশ্বাস তখনো মানবিক, নিজের দেবীত্বে নয়। শেষে সে রাতেই ঠিক করে উমাপ্রসাদ—গোপনে ও স্ত্রীকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যাবে। দয়াময়ীও রাজি, সাতদিন সময় নেয় উমাপ্রসাদ।

ইতিমধ্যে গ্রামের এক বৃদ্ধ মানুষের মুমূর্ষু নাতিকে দয়াময়ীর কাছে রাখা হয়। তার মা আবার দয়াময়ীর সখীও। একসঙ্গে দুজনকে দয়াময়ীর কাছে রাখা হলে দেখা যায় সে সুস্থ হয়েছে সারাদিনের শেষে। আবার আর এক ব্যক্তির আসন্নপ্রসবা কন্যার দয়াময়ীর চরণামৃত খেয়ে রাজপুত্রের মতো সুন্দর সন্তানের জন্ম হয়। এইসব প্রচার থেকে মুক্ত হয়ে আগের পরিকল্পনা মতো উমাপ্রসাদ সেই রাতে একসময়ে দয়াময়ীকে নিয়ে নদীর নৌকার কাছে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়, কিন্তু বেরোনোর সময় ঘরে উমাপ্রসাদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিক্ষত দয়াময়ী একসময়ে এক এক করে জানায়, ১. 'আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি নে,' ২. 'হয় ত তোমার অকল্যাণ হবে ...... তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন?' ৩. 'হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।'

উমাপ্রসাদ যখন যুক্তি দেয় দয়াময়ী স্ত্রী হলে উমাপ্রসাদ স্বামী হিসেবে মহাদেবই, তখন কান্নাক্রান্ত কণ্ঠে দয়াময়ী স্বামীর কথায় গঙ্গার ধারে আসে, নৌকায় ওঠার আগে শেষমেশ যেতে আপত্তি জানিয়ে, দয়াময়ী যুক্তি দেয়, 'আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পুজো গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেবে কেন? আমি পালাব না। চল ফিরে যাই।' প্রতিবাদে উমাপ্রসাদ শেষ রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। দয়াময়ী দেবত্বে ফিরে আসে।

খোকার মা, বাড়ির বড়বউ হরসুন্দরী, দয়াময়ীর ভাসুর-পত্নীর এতটুকুও দয়াময়ীর দেবীত্বে বিশ্বাস ছিল না। এবার উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার সপ্তাহ দুই পরে তৃতীয় সপ্তাহে খোকার প্রবল জ্বর আসে, ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। কালীকিঙ্কর বৈদ্যের

বদলে দয়াময়ীর কাছেই তার চরণামৃত খাইয়ে বাঁচানোর বিধানে স্থিত থাকেন। বড়ছেলে পিতৃভক্ত তারাপ্রসাদ, নিজেব স্ত্রীর দয়াময়ীর দেবীত্বে অবিশ্বাস দেখেও বেদের মতো বিশ্বাসে বাবার মতকেই মেনে নেয়। দয়াময়ীও জানায়, 'না, আমি ওকে ভাল করে দেব।' কিন্তু দয়াময়ীর সেবা, যত্ন, সমস্ত মানুষের দেবীত্বে বিশ্বাসের দিক উপেক্ষার মধ্যে খোকার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরেও কালীকিঙ্করের ছোটবউমাকে সাশ্রু নয়নে বাঁচিয়ে দেওয়ার অনুরোধ, তারাপ্রসাদ ও তার স্ত্রীর দয়াময়ীকে কটূক্তি, তীব্র অবিশ্বাস, দয়াময়ীর ক্লান্তিহীন, অসহায় কান্নার মধ্যেই খোকা সেই মৃতই থেকে যায়। 'তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।' দেবীরূপে দয়াময়ীর যাবতীয় পুজো হল বন্ধ, দয়াময়ী নিঃসঙ্গ, সারাদিনে কেউ তার কাছে আসেনি। আরতিও কোনোরকমে শেষ করা হয়।

পরের দিন পুজোর ঘরে কালীকিঙ্কর দেখেন নিজের পরার শাড়িকে দড়ির মতো করে কড়িকাঠে আত্মহননে স্থির দয়াময়ী। 'দেবী' গল্পের আখ্যানভাগ গল্পকার প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক মনোভঙ্গির অণুবৃত্ত থেকেই একটি পূর্ণাবয়ব রূপ পেয়েছে। প্লটগঠনে লেখক সুশান্ত, সহজ স্বভাবে এমন একটি ছক বা 'স্কিম' নিয়েছেন, যার মধ্যে গল্পের 'থিম' সুন্দর মাপে শোভন হয়ে ওঠে। গল্পটির মূল বিষয়কে গভীর বিশ্বাস্য করার জন্যই আরও একশো বছরের বেশি সময়কালে পাঠকদেব নিয়ে গেছেন। সে কালে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও পরিবার পরিবেশে ধর্মের সংস্কার ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে বিজড়িত থেকে প্লটের জটিলতা ও কাহিনীর কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যের সাধনকে সহজ করতে পারে।

'দেবী' গল্পের কাঠামো আলোচনায় প্রথমেই গল্পটির মধ্যে গল্পকারের শিল্পসম্মত 'Precision' ও নির্ভুল 'Situation' তৈরির বিস্ময়করতা লক্ষ করার মতো। গল্পের প্রথম দিকে দয়াময়ী উমাপ্রসাদের দাম্পত্যের অন্তরঙ্গ চিত্রের মধ্যে একসময় সংলাপ-বিনিময়ে দয়াময়ী স্বামীকে বলে : 'দেখ, আজ আমাব মনটা কেমন হয়ে গেছে। .... কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।' ... দয়া একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমি বুঝতে পারছি নে। মনে হচ্ছে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।' অকারণে দয়াময়ীর অবোধ্য মন খারাপ হওয়া, গভীরে মনের কারণহীন অস্বস্তি, স্বামী কাছে থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে আর দেখা না হওয়ার মত গভীর রহস্যময় শঙ্কা—এসবেব সংলাপ ও স্বভাবচিত্রে প্রভাতকুমার অদ্ভুত সংক্ষিপ্তির মধ্যে অব্যবহিত পরবর্তী চিত্রের ব্যঞ্জনাব ভ্রূণস্বরূপ মেলে। তা হল, একটু পরেই শ্বশুরের কথায় শোনে দয়াময়ীর মধ্যেই দেবী কালিকাব রূপান্তরিত হওয়ার স্বপ্নাদেশ। এই চিত্র-খণ্ডের precision অর্থাৎ নির্ভুলতা, যথাযথতা, মূল বিয়য়ের সূক্ষ্মতা পাঠকদের বোধ অধিকার করে। এব পর পরবর্তী ছোটবড় চিত্রগুলিতে আছে সিচুয়েশান সৃষ্টি করে একের পর এক চাপের ভারে গল্পের বাঁধুনি শক্ত করা। শ্বশুরের কঠিন বিশ্বাস, গ্রামের এক বৃদ্ধের নাতির সুস্থ হওয়ার ও এক অন্তঃস্বত্ত্বা রমণীর সুন্দর সন্তান প্রসবের ঘটনা ইত্যাদি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে বিশ্বাসের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস আছে। গল্পে ঘটনা কম—যা আছে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের ছায়ারূপেই তার উপস্থিতি। ঘটনার নাটকীযতা বড়জোর শ্বশুরের স্বপ্নাদেশে থাকতে পারে, কিন্তু তা গল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণে মানানসই। গল্পের শেষে দয়াময়ীর আত্মহননে কোনো নাটকীয়তা নেই, চরিত্রন্যায়ে তা একেবারেই স্বাভাবিক বাস্তব, ছোটগল্পের precision-এ সংযম, সংক্ষিপ্তি।

প্লটের পরিকাঠামো নির্মাণে প্রথম দুই স্তরে খানিকটা স্কেচের বৈশিষ্ট্যে দয়াময়ী ও স্বামী উমাপ্রসাদের দাম্পত্যের বাস্তব রসপুষ্ট মানবিক ছবি এঁকেছেন প্রভাতকুমার। প্রথম অংশে দুজনের প্রীতির সম্পর্কচিত্র পরে উমাপ্রসাদ যে পশ্চিমে চাকরি করতে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলে, তার সঙ্গে গল্পের মধ্যবর্তী অংশ মেলে গল্পের গভীর প্রয়োজনেই। উমাপ্রসাদ সেই চাকরির কথা মনে রেখে দয়াময়ীকে নিয়ে পলায়নের উদ্যোগের অবধারিত ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রেক্ষিত রচনা করে। দ্বিতীয় স্কেচের শেষে আসে উমাপ্রসাদের বড়ভাই তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান—যে 'খোকা' নামে পরিচিত, তার সঙ্গে দয়াময়ীর গভীর গূঢ় স্নেহের সম্পর্ক-কথা। এই প্রসঙ্গের সচিত্র প্রাথমিক উত্থাপনই বস্তুত গল্পের পরিণতির অবধারিত অসহায় কারুণ্য ও ট্র্যাজেডির বিষাদঘন রসকে তীব্রতম করে দয়াময়ীর জীবনবিনাশে।

এরই মধ্যে প্লটের জটিলতা যেমন তৈরি হয়, তেমনি আখ্যানভাগের বিস্ময়কর গতিমুখ হয় দুর্বার। দয়াময়ী শ্বশুরের স্বপ্নদেখার মূল্যে হয় নিশ্চিত ভাগ্যের নিয়তিনির্দেশে সামান্য মানবী থেকে কঠিন দেবী। দয়াময়ী ক্রমশ মানবী সত্তা থেকে দেবীত্বে নিজের বিশ্বাসকে দেবীর মত উচ্চ স্থানে বসায় : 'আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।' ....'হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।'....'আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এতজনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।' কাহিনীর মধ্যপর্বে দয়াময়ীর স্বামীকে বলা এই কথাগুলি বস্তুত প্লটের চরম স্বভাবকে যেমন ত্বরান্বিত করে, তেমনি সম্ভবত দয়াময়ী-ব্যক্তিত্বের এক চরমক্ষণকে গড়তে থাকে।

কিন্তু সমগ্র আখ্যানের যে চরম চূড়া (climax) যা প্লটের গঠনের সঠিক অবস্থান, তা পরে আসে। আমাদের অপেক্ষা করতে হয় একটি সার্থক ছোটগল্পের যথার্থ 'চরমক্ষণ' আসার জন্য। তা হল অসুস্থ 'খোকা'কে কেন্দ্র করে পরিবারে দয়াময়ীর দেবীত্বের পরীক্ষাচিত্র। সীতার অগ্নিপরীক্ষায় সীতা উদ্ধার হয়, দয়াময়ীর উদ্ধার হয় এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায়—দয়াময়ীর আত্মবিশ্বাসের সমূল বিনাশের সূচনাসূত্র ধরে। গল্পের আখ্যানে তার সূচনা এই চিত্রে :

> ..... কর্তা একদিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে কি?'
>
> দয়াময়ী বলিল,—'না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।'
>
> কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।'

এই চিত্রেই সমগ্র গল্পটির তীব্র সূচিমুখ 'চরমক্ষণে'র (Climax) ক্ষেত্রপ্রস্তুতি! এই চিত্রের মলিন পরিণতি ঘটেছে আখ্যানের চমৎকার স্বভাবে দয়াময়ীর ক্রমিক সক্রিয়তার নিষ্ফলত্বের শিল্পমহিমায় :

> '......দয়াময়ী ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে যমরাজকে উদ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিল, এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া

হউক। ... .. আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমরাজা খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না। তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।'

এই সর্বশেষ চিত্রে সমগ্র আখ্যানের 'ক্লাইম্যাকস।' লক্ষণীয়, এখানে যেমন দয়াময়ীর ব্যক্তিত্বের নিষ্ঠুরভাব ভেঙে যাওয়ার সর্বশেষ ইঙ্গিত, তেমনি আছে সমগ্র প্লটধৃত আখ্যানের করুণতম দীর্ঘশ্বাসের সূক্ষ্ম নির্মাণ।

সবশেষে সার্থক ট্র্যাজেডির অনুগ এক নিয়তিনির্দিষ্ট রক্তক্ষরণ তথা 'ভাবমোক্ষণ' (Catastrophae)। 'পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।'—এমন 'বিষাদঘন' পরিণতির সূক্ষ্ম সূত্রের আভাস প্রভাতকুমার রেখেছেন গল্পের প্রথম দিকে দয়াময়ীর সঙ্গে স্বামীর সংলাপ বিনিময়ে স্বামীর অল্পকথার কৌতুকে—যার পরেই গল্পে এসেছে 'খোকা' প্রসঙ্গ ও সে সূত্রে দয়াময়ীর 'খোকা'র প্রতি দুর্বার স্নেহার্ত হৃদয়ের মুক্ত স্বভাবের একাধিক প্রাসঙ্গিকতায়। সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে (Central theme) আছে মানুষের প্রাণ ও মানবীপ্রেমের সমূল বিনাশধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের দ্বন্দ্বের আঘাতে। এই 'বিনাশে'ই অন্তর্গূঢ় আছে নিয়তির নির্দেশ—করুণতম বিষাদঘন মানব প্রাণের অসহায়তা। প্রভাতকুমার যেভাবে ছোটগল্পের সংযত কাঠামোয় ট্র্যাজেডির কঠিন বন্ধনকে শিল্পাত্মার সঙ্গে বেঁধেছেন, তা একালের এক প্রখ্যাত কথাকার-সমালোচকের কথায় অবশ্য মান্য : 'প্রভাতকুমারের শিল্প-প্রতিভা নিজের শান্ত, সহজ ও সরল কল্পনার সীমা অতিক্রম করে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকতা-সুলভ এক মহাকাশের মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে।' গল্পের ছক ও কাঠামো যেন এক বিশ্বকর্মার নির্মাণ!

দুই

'দেবী' গল্পের আখ্যানভাগ প্রভাতকুমারের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া। একথা আমরা আগে একবার জানিয়েছি। কথাটা ব্যাখ্যা করলে সহজবোধ্য হয় যা, তা হল, আখ্যানপরিকল্পনার সঙ্গে গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়টিও রবীন্দ্র-পরিকল্পিত চিন্তা-ভাবনা থেকেই উঠে আসা! এক কথাকার-সমালোচক জানিয়েছেন, 'অন্ধ ধর্ম সংস্কারের বেদীমূলে জীবনের করুণ অপচয় রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সহ্য করতে পারেননি—ধর্মের সঙ্গে ধর্মতন্ত্রের বিরোধে তিনি বার বার প্রাণের বন্দনা শুনিয়েছেন।'

এমন এক বিরাট কল্পনাময় বিষয়ের কথা যদি রবীন্দ্রনাথ 'দান' করে থাকেন প্রভাতকুমারকে নতুন কোনো ছোটগল্প লেখার প্রেরণা দিয়ে, তা হলে ভাবতেই হয় 'দেবী' গল্পে প্রভাতকুমার সেই বিষয়কে কতটা গল্পকারের যুগপৎ বাস্তবতা ও কল্পনাময়তা মিশিয়ে গরিমাময় করতে পেরেছেন! রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মহামায়া' গল্প লিখেছেন ১২৯৯-এর ফাল্গুনে। তার আগেই লেখা হয়ে যায় 'রাজর্ষি', 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। এদের কাহিনী ও বিষয়ভাবনার সূত্রে 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয় আঠারো শতকের শেষ দশকের মধ্যেই। বেশ কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ বৌঠাকুরানীর হাটের কাহিনী-অংশ ও বিষয়-ভাবনা ধরে নাটক লেখেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। আমাদের কথা হল, এই সমসময়ের বিষয় ও ধর্মভাবনা নিয়ে যে পরিকল্পনার কথা 'দান' করেন প্রভাতকুমারকে, তা

কবিকল্পনার এই বিশেষ সময়েরই একান্ত অনুগ। 'মহামায়া' গল্পে নায়িকা মহামায়া, বড় ভাই ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কঠিন আদেশে, এক মুমূর্যু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শ্মশানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। পরের দিনই বৃদ্ধের মৃত্যুতে মহামায়া হয় বিধবা। তার পাণিপ্রার্থী প্রেমিক রাজীব হয় উপেক্ষিত। মহামায়া হয় চিতায় স্বামীর সহমৃতা। ঝড়জলের কারণে চিতা থেকেই মুখের অর্ধেক পুড়ে যাওয়ায় বিকৃত রূপ নিয়ে মহামায়া ফিরে আসে রাজীবের কাছে, কিন্তু রাজীবের শপথভঙ্গে মহামায়া রাজীবের সঙ্গত্যাগে বাধ্য হয়। এখানে সেই সতীদাহপ্রথার নির্মমতার পাশে মুক্তপ্রাণের সমূহ বিনাশকে দেখানোই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। 'বিসর্জন' নাটকেও অপর্ণার ছাগবলির রক্ত দেখে হৃদয়ের সকরুণ আর্তি, জয়সিংহের কাছে তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য মানসিক বেদনার প্রকাশ ও রঘুপতির ধর্মতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা সেই প্রথাবদ্ধ অন্ধ সংস্কারের কাছে প্রাণের সংহার-রূপে প্রবল প্রতিবাদীর ভূমিকা ঘোষণা করে।

এমন রবীন্দ্ররচনায় সংস্কারের সঙ্গে প্রাণশক্তির প্রবল বিরোধ ও প্রাণের অমর্যাদা দিয়ে প্রাণসংহারের পরিকল্পনার কথাই বলেন কবি প্রভাতকুমারকে ছোটগল্পের মাধ্যমে আঁকতে। কেন্দ্রীয় বক্তব্যে তা প্রভাতকুমার নিজের মতো সার্থকভাবেই এঁকেছেন, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের তা মনঃপূত হয়নি। প্রভাতকুমারের লেখা পড়ে তিনি অতৃপ্ত থাকেন, সৌজন্যের নীরবতা তাঁকে সংযত করে বাখে। কথাকার-সমালোচক 'দেবী' গল্পের আলোচনায় বলেছেন : 'এর কল্পনায় এমন একটা তির্যক বৈচিত্র্য আছে যাকে প্রভাতকুমারের সরল সরসতার সগোত্র বলা যায় না। প্রভাতকুমার সহজ পথের যাত্রী—তাঁর কল্পনা বস্তু-নির্ভর।' শেযে এই সমালোচক স্বীকার করেছেন 'দেবী' গল্পটির 'সর্বতোমুখী শৈল্পিক সফলতার সত্যে'র দিক, তবু বলেছেন : 'আর একটু আত্মস্থ এবং সাধননিষ্ঠ হলে তাঁর যে হাত জলতরঙ্গ বাজিয়েছে তা মৃদঙ্গে ধ্রুবপদী বোল তুলতে পারত।'

'মহামায়া' গল্পের মহামায়া, 'বিসর্জন' নাটকের অপর্ণা ও জয়সিংহ যেভাবে সংস্কার থেকে, প্রথা থেকে মুক্তি চেয়েছে, 'দেবী' গল্পের দয়াময়ীও সেই প্রথার শিকার হয়ে চিরন্তন প্রাণের বিনাশকে ধর্মতন্ত্রের প্রভাবী বিকারগ্রস্ত রূপ দিয়েছে। তাকে সাহায্য করেছে তার শ্বশুর প্রসিদ্ধ শাক্ত জমিদার কালীকিঙ্কর রায়। গল্পের প্রথম দিকে স্বামী উমাপ্রসাদের সঙ্গে স্ত্রী দয়াময়ীর যে নৈশ শয্যাগৃহের চিত্র—সেখানে দয়াময়ী একেবারেই মানবী। গল্পে কোথাও দয়াময়ীর ব্যক্তিগত ধর্মভাবনার কথা বলা হয়নি। তাব ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের চিত্র স্বামী-সঙ্গের দৃশ্যে নেই। জমিদার নিজে ধর্মভীরু, শাক্তধর্মের উপাসক; এবং প্রচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক মনোভঙ্গিতেই দয়াময়ীর ওপর ধর্মের সমস্ত সংস্কারের বোঝা চাপান। বাড়ির কর্তার ধর্ম সমগ্র পরিবারের ধর্ম। কালীকিঙ্কর রায়ের স্বপ্নদর্শন ও দয়াময়ীর মধ্যে আদ্যাশক্তির রূপকামনা একান্তভাবে জমিদারেরই। তাতেই দয়াময়ী হয় দেবী।

সেকালে জমিদারশাসিত সমাজ, সামন্ততন্ত্রের দাপট, প্রভাব গ্রাম্য প্রজাদের ধর্মভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করত। তাই কালীকিঙ্করের দেখা ধর্ম ও সংস্কারের চোখে, ধর্মতন্ত্রের আচার-আচরণে দয়াময়ী নিশ্চিত দেবীই—প্রমাণিত হয়ে যায়। দয়াময়ীর যেটুকু

ব্যক্তিসত্তা, তা, স্বামীর সঙ্গে দেবী হওয়ার তিন দিন পরে রাতের নির্জনতায় শয্যাগৃহে দেখা হওয়ার পর, পরিবার-জীবন-মূল্যেই নির্ধারিত হতে থাকে। যখন 'তিন দিন কাল ভক্তগণের ''মা মা'' শব্দে তাহার হৃদয়দেশ মরুভূমির মত শুষ্ক', সেই অবস্থায়'স্বামীর মুখনিঃসৃত আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধাবৃদ্ধি!' এই চিত্র মানবী দয়াময়ীর জীবন্ত রূপ। এই স্বভাবেই সে জানায় : 'না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।'

যে চাপানো সংস্কারে দয়াময়ী আজ দেবী, তা থেকে তার মুক্তির উৎকণ্ঠা ও আর্তি সংস্কারকে সবলে পরিত্যাগ, প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু সংস্কার এমন অন্ধ, মোহবদ্ধ, এমন আফিঙের মতো ঘোর আনে, এমন ভয় ও বিবেকহীনতাকে চেপে বসায় সংস্কারবদ্ধ মানুষের মনে যে, গল্পে এই দয়াই আর এক ঘোরের মধ্যে সেই বিশ্বাসকে অবশেষে নিক্ষেপ করতে নির্দ্বিধ। মানবী দয়াময়ী হয় 'দেবী'—বলে, 'হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।' শ্বশুরের বিশ্বাসে গ্রাম ও গ্রামান্তরের মানুষ এত ধর্ম-ভাবে উদ্বেল হয়, এত সংস্কারনিষ্ঠ আচার-আচরণে অন্ধ হয়ে ওঠে যে, গল্পের যে কেন্দ্রিত লক্ষ্য, তার রূপ আচার-আচরণ সর্বস্ব ধর্মের বিশ্বাসের কঠিন মাটি নির্মাণ করে। মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। পিতৃভক্ত তারাপ্রসাদের কথায় কালীকিঙ্কর রায় তাঁর একমাত্র নাতির, 'খোকার চিকিৎসা না করিয়ে দেবী দয়াময়ীর আশ্রয়ে এনে রাখেন।

শ্বশুরের বিরোধিতা করে একমাত্র 'খোকার মা, তারাপ্রসাদের স্ত্রী, বাড়ির বড়বউ হরসুন্দরী, সে একমাত্র যুক্তিনিষ্ঠ। দয়াময়ী তার কাছেও যুক্তি চায় মানবীর স্বভাবে, মুক্ত মনে। বড়বউয়ের কথা : 'কি করবো বোন, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।' গভীর অপত্যস্নেহে, ধর্মভয়ে, বিশ্বাসের চরম ভ্রান্তির মধ্যে, আশু বিনাশের কথা ভুলে গিয়ে দয়াময়ীর শেষ ট্র্যাজেডির রূপ—'আমিই ওকে ভাল করে দেব।' অন্ধ প্রথাবদ্ধ সংস্কার, ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বোধহীন বধির বিশ্বাস জমিদারের চাপে দয়াময়ীর মনকে মহামড়কের মতো ঘিরে রাখে। কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে দয়াময়ীর আত্মহননে। একটি ফুলের মতো নিষ্পাপ বধূর যে ধর্মতন্ত্রের কাছে আত্মবলিদান, মুক্ত প্রাণকে অস্বীকার—তার নির্মমতার চিত্র রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রভাতকুমারের কাছে! রবীন্দ্রনাথের আশা তাতে সামগ্রিক শিল্পমূল্যে, উত্তুঙ্গ কবিকল্পনায় হয়তো সম্পূর্ণতা পায়নি, কিন্তু প্রভাতকুমার আপন ক্ষমতায় যেভাবে গল্পটির পরিকল্পনা করেছেন, তাতে গল্প হিসেবে শিল্পের হানি হয়নি। ট্র্যাজেডি চিত্র বিষাদঘন হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় গল্পের শুরু ও শেষ। মধ্যবর্তী মানুষজন, একাধিক 'সিচুয়েশান' রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যকে অনেকাংশে সার্থক করেছে।

তিন

গল্প-উপন্যাস থেকে যে কোনো সৃজনধর্মী রচনায় যদি কোনো এক বা একাধিক চরিত্র থাকে, তাদের বাস্তবতা কোনোমতেই বস্তুর ও তন্নিহিত তথ্যের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় থাকে না, থাকে চরিত্রের মনোলোকে। আসলে শিল্পের স্বভাবে মনই একমাত্র বাস্তব (Real)। চরিত্রের

অন্তরীণ মনের শিল্পসম্মত জটিল রহস্যময় টানাপোড়েনেই গড়ে ওঠে চরিত্রের শিল্প-বাস্তবতা। প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসে, বিশেষত গল্পে এই চরিত্রগত শিল্পবাস্তবতা প্রায়শই অনুপস্থিত। প্রভাতকুমার সে সব ক্ষেত্রে তাঁর 'সিচুয়েশান' সৃষ্টির চমৎকারিত্ব ও চমক, ঘটনা সংস্থাপনের মনোরম আলোয় চরিত্রে অভ্যন্তরীণ জগৎকে পাশে সরিয়ে রাখেন। যেটুকু মনের ক্রিয়া থাকে, তাকে সিচুয়েশান-নৈপুণ্য ও ঘটনার ঘটা আবরণ দেয়।

'দেবী' গল্পে দয়াময়ীর চরিত্র পরিকল্পনার বিচারে প্রাথমিকভাবে এই কথাগুলি মনে পড়বেই। প্রভাতকুমারের একটি চিঠিতে লেখা—রবীন্দ্রনাথের 'দেবী' গল্প তেমন পছন্দ হয়নি তার কারণ, তিনি নিজেই সংশয়ান্বিত হয়ে গল্পে যে 'Psychological' দিক স্পষ্ট হয়নি, তার প্রসঙ্গ তোলায় একথাই সত্য হয়, 'দেবী' গল্পে 'সাইকোলজি'র ঘাটতি আছে। এই অভাব ও সীমা দয়াময়ীর চরিত্রভাবনাতেই বেশি ধরা পড়ে। গল্পে দয়াময়ীর চরিত্র-বিকাশে মেলে—কাহিনী ও প্লট-সূত্রে পাঁচটি স্তর : ১. স্বামী-স্ত্রী উমাপ্রসাদ-দয়াময়ীর একান্ত ব্যক্তিগত দাম্পত্যের নৈশচিত্র, ২. দাম্পত্যের সূত্র ধরে উমাপ্রসাদের বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে বড়জোর 'খোকা'র প্রতি তীব্র স্নেহার্ত আকর্ষণে উমাপ্রসাদের নিজেদের ভাবী সন্তান জন্ম হওয়ার কৌতুকনির্ভর ইঙ্গিত; ৩. শ্বশুর কালীকিঙ্কর রায়ের দয়াময়ীর মধ্যে স্বপ্নাদেশ নির্ভর আদ্যাশক্তি কালীর ভাবনা আরোপ, ৪. উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ীর যৌথ সম্পর্কে দেবী-মানবীর জটিলতায় দয়াময়ীর সংশয় ও স্বামীর অকল্যাণ চিন্তা, শেষে দেবী-ভাবনায় ফিরে আসা, ৫. ক্রমাগত দেবীত্বের বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মহননে সেই মানবী ভাবনার স্বীকৃতিতে ট্রাজেডির গভীর বিপদের যন্ত্রণাকাতর পরিণতি!

এইভাবেই ধীরে ধীরে গল্পের প্লট গল্পের কেন্দ্রীয় এবং নায়িকাচরিত্র দয়াময়ীর মধ্য দিয়ে পূর্ণ রূপ পায়। এমন প্লটে জটিলতা নেই, যেটুকু আছে তা দয়াময়ীরই মানস বিকাশের ধারায় উত্থানপতনে কিছুটা বিশিষ্ট। দয়াময়ী একবারেই ষোড়শবর্ষীয়া এক সাংসারিক নিষ্পাপ, অবোধ বধূ। বাঙালি হিন্দুর পূজা-পদ্ধতিতে মেলে কুমারীপূজার ধর্মীয় ইতিবৃত্ত। একজন কুমারীকে দেবীমূর্তির পাশে রেখে পূজা করা হয় দেবীর মতোই। এই ঐতিহ্য কি বিবাহিতা দয়াময়ীর সামনে আদ্যাশক্তির ধ্যানে পূজা-অর্চনার বিধিপ্রয়োগে তারই প্রসারিত সূক্ষ্ম ছায়াবী ধর্মে ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম সূত্র ধরায় না? মানুষের মধ্যে এভাবে ধর্মসংস্কারে ও ধর্মতন্ত্রের আচার-আচরণে এক নারী মানবী থেকে দেবীত্বে অলংকৃত হয়ে ওঠে!

লক্ষণীয়, পরিবারের এক সামান্য গৃহবধূ দয়াময়ীর নিজস্ব কোনো তন্ত্রের শিক্ষা নেই, শাক্তধর্মের অনুগ কোনো ধর্মাচার, অধ্যাত্মচিন্তা, ধর্মতন্ত্রের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস গল্পে উল্লেখ নেই। সে শ্বশুরের গভীর ধর্ম সংক্রান্ত আচার-আচরণে, অধ্যাত্ম-ধ্যানকর্মের একজন নিষ্ঠাবতী সহায়ক : 'গৃহকার্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষত তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না।'..... একশো বছর আগে, সেকালে পরিবার জীবনে দয়াময়ীর মতো কনিষ্ঠা বধূ শ্বশুর-ভাসুরদের কাছে 'মা' বলে সম্মানিত হত, তার

ওপর শ্বশুরের তন্ত্রাচার বিষয়ক সব কাজে দয়াময়ী সহায়ক ছিল বলে দয়াময়ী শ্বশুরের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার obsession-এও মাতৃরূপে মনে স্থান পেত। তাই শ্বশুরের স্বপ্নাদেশে ছোটবউ দয়াময়ীর প্রসঙ্গই প্রধান হয়েছে, বাড়ির বড়বউ হরসুন্দরীর ভাবনা একেবারেই অবহেলিত।

দয়াময়ী তার স্বামীকে ভালোবাসে একেবারে অনুগত বাস্তব বধূর মতো। উমাপ্রসাদের অন্তরঙ্গতায়, আদরে বাস্তব স্ত্রীর মতোই সাড়া দেয়, প্রতিক্রিয়া জানায়। সে স্বামীর মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা ভেবে রীতিমতো শঙ্কিত হয়। দেবীত্বের মর্যাদা পাওয়ার, এমনকি দেবী হয়েও বড়জা হরসুন্দবীকে নিজের দেবী হওয়ার কথায় ভীতি জানায়, প্রচ্ছন্ন অভিমানে প্রতিবাদী, হতাশ মনের পরিচয় দেয়। তার মধ্যে দেবীত্বের স্থায়ী আসন তৈরি হয় না। কারণ তার সবটাই শ্বশুর কর্তৃক আরোপিত। ভিতরের কোনো আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির চাপ দয়ামযীর মধ্যে শূন্য। তাই সমগ্র গল্পে দয়ামযীর যে দেবীত্বে স্বীকৃতি পাওয়াব বিষয় তা 'dependent', স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা-সাপেক্ষ নয়। গল্পের শেষে দয়াময়ীর পরিণামী রূপ যে উন্মাদগ্রস্ততায় বা আত্মহননে চিত্ররূপ পাবে, তা সহজবোধ্য। এখানেই চরিত্রটির limitation—অন্তত প্রভাতকুমার যেভাবে চিত্রিত করেছেন তার যুক্তি পরম্পরার নিরিখে।

গল্পের প্রথম স্তরে দয়াময়ী স্বাভাবিক, বাস্তবসম্মত এক গৃহবধূ। দ্বিতীয় স্তরে তার নিজের সন্তান হওয়ার কথা ওঠায় প্লটে আসে 'খোকা'র প্রতি স্নেহার্তির তীব্রতার দিক। দয়াময়ীকে কেন্দ্র কবে প্লট মূল সূত্রে জটিলতার সূত্র ধরে। শ্বশুরের হঠাৎ দয়াময়ীকে নিজের কালীমন্ত্রের দীক্ষা নেওয়ার সূত্রে তাঁদের বংশে মা জগন্ময়ীর আবির্ভূতা কল্পনায় দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা দানে জটিলতার চরম অবস্থা আসে। গ্রাম-গ্রামান্তবে তার প্রচারের ফলে দয়ামযীর বিভ্রান্তি মানসিক ভারসাম্যের বিপর্যস্ততা, বিনষ্টি। এই অবস্থায় দয়াময়ী ক্রমশ ট্র্যাজেডির নায়িকা রূপে স্থিত হতে থাকে। কিন্তু প্রভাতকুমার দয়াময়ীকে প্রথম দিকে এক বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন। দয়াময়ীর স্বামীর কাছে বলা 'আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া কিছু নই—..... আমি দেবী নই—আমি কালী নই', পরে উমাপ্রসাদের স্ত্রীত্বে নিজের সংশয় দেখা-দেওয়া, অন্যদিকে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা—এসবেই দয়া ক্রমশ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ট্র্যাজেডির নায়িকা হয়ে ওঠে। তাব মধ্যে 'খোকা'কে না বাঁচানোর অক্ষমতায়, অসহায়তায় এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়। দয়াময়ী শিকার হয় নিশ্চিত আত্মহননের।

ঈশ্বর কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন না, দেবদেবীরাও না। পুরাণে আছে দেবদেবী মারা গেলে পুনর্জন্ম হয় এবং সে জীবন শেষে আবার তাঁদের স্বর্গবাস সেই পুরনো জীবন ঘিরে। দয়াময়ীর দেবীত্ব যে নিষ্ফল, অন্ধ ধর্মের মোহবদ্ধতা, মিথ্যাচার, তা তার আত্মহননই বোঝায়। গল্পের শেষে ১. দয়াময়ীর দেবীত্বের যাবতীয় আরাধনা, পূজা-পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যায়, ২. দয়াময়ী হয় স্বামী পরিত্যক্তা একা, নিঃসঙ্গ, ৩. 'খোকা'র জীবননাশে দেখা দেয় তার বাস্তব বাঁচার ভিতে বিশাল ফাটল, ৪. নিজের ওপর গভীরতম অবিশ্বাস। এই একা দয়াময়ী তখনই আত্মহননে জীবন শেষ করে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের নায়িকা কাদম্বিনী গল্পের শেষে চরম সত্য প্রতিষ্ঠা করে :

'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।' প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পের নায়িকা দয়াময়ীও তা-ই—দয়াময়ী আত্মহত্যা করে প্রমাণ করে সে মানবীই, দেবী নয়।

'দেবী' গল্পের দয়াময়ীর মধ্যে প্রভাতকুমার ব্যক্তিমনের জটিলতার কোনো টানাপোড়েন দেখাতে পারেননি। গ্রামের এক বৃদ্ধের নাতিকে সে সুস্থ করেছে, এক আসন্নপ্রসবার সুন্দর শিশুর জন্ম ঘটিয়েছে নির্বিঘ্নে। এসবই তো দেবী দয়াময়ীর পক্ষে বাস্তব যুক্তি-পরম্পরা জাত Coincidence—নিশ্চিত কাকতালীয়, দেবীত্বের বিশ্বাসে দয়াময়ী তা বোঝেনি, বোঝার কথা নয়। এটা ঠিক। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের অমোঘ প্রভাবে দেবীর মনোলোকের যে গভীর আন্দোলন, নানান প্রতিক্রিয়া, লেখক সে সব দয়াময়ীর ব্যক্তিগত প্রাণস্বভাব ধরে দার্শনিক মর্যাদায় চিত্রিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে গল্পের প্লটে situation-এর যথাযথতা গল্পের বাঁধুনি শিল্পের যথাযথতা রক্ষা করলেও লেখকের উচ্চ কল্পনার কবিত্ব ও দর্শনকে পাঠকহৃদয়ে অভিনিবিষ্ট করে সেই ট্র্যাজেডির বিষাদকে গাঢ়-রস দিতে পারেনি। দয়াময়ী ট্র্যাজেডীর নায়িকা ঠিকই, কিন্তু ট্র্যাজেডির নির্মম, নির্মোহ বিষাদময় রস-উদ্বোধনে, আধ্যাত্মিক সংকট সৃষ্টি ও মুক্তির স্বাদদানে অসার্থক।

জমিদার কালীকিঙ্কর রায় চরিত্রটি 'দেবী' গল্পের যেনবা সেই চাবিকাঠি যা দিয়ে সমগ্র গল্পের মূল বন্ধ দরজাটি খোলা সম্ভব হয়। গল্পের আদিতে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার : 'পরম পণ্ডিত, পরম ধার্মিক, নিষ্ঠাবান শাক্ত উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই! অনেকের বিশ্বাস উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।' গল্পের মধ্যে তাঁর এক স্বপ্নাদেশ গল্পে প্রবেশের পক্ষে প্রধান তালাটি খুলে দেয়। বাংলা পুরাণে বিশেষ ধর্মের মানুষকে আরাধ্য দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশ দেওয়ার কথা বিস্তৃত আকারে বলা আছে। সেই স্বপ্নাদেশেই বিশেষ দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ হয়, দেবদেবী মাহাত্ম্যের কাহিনী প্রচারে গ্রন্থ লেখা হয়। প্রভাতকুমার কালীকিঙ্কর রায়ের স্বপ্নাদেশ দিয়ে বাড়ির ছোটবউ দয়াময়ীর যে ট্র্যাজেডি চিত্র এঁকেছেন, তার মূলে আছে বিশেষ ধর্মীয় সংস্কারের মোহে ও অন্ধতায় বাস্তব ও মানবজীবনের নির্মম এবং অশ্রুসজল বিনাশের চিত্র।

কালীকিঙ্করের স্বপ্নাদেশে বাড়ির ছোটবউ দয়াময়ী হয় তাঁর আজীবন আরাধ্যা মা জগন্ময়ীর, আদ্যাশক্তির পারিবারিক ধ্যানধারণার সম্পর্কের প্রতিমূর্তি। দয়াময়ী হয় দেবী। যে সময়ের কথা, তখন বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ঐশ্বর্যরূপ। জমিদার নিজে ধর্মান্ধ, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ হিসেবে গ্রাম ও গ্রামান্তরের মানুষের কাছে বিপুল বরেণ্য। তাই দয়াময়ীর দেবীত্বের প্রচার বিপুল আকার নেয়। যেনবা এক 'মাস-মেস্-মেরিজ্‌ম্'! এই সূত্রে ধর্মীয় অন্ধ সংস্কার সর্বাংশে জীবনবিমুখ, প্রাণ সংহার হলেও চারপাশে মোহের উন্মাদগ্রস্থতা! ক্রমশ দয়াময়ীও স্বামীকে ছেড়ে দেবীত্বে অনড় গভীর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এসবেই 'দেবী' গল্পে কালীকিঙ্কর রায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো।

কালীকিঙ্করের জন্যই ১.পরিবার জীবনের সুখশান্তি থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয় ছোট ছেলে, দয়াময়ীর স্বামী উমাপ্রসাদ, ২. দয়াময়ীর জীবনে নেমে আসে ভ্রান্ত জীবনভাবনার চরম অভিশাপ ও মৃত্যু, ৩. বড়বউ হরসুন্দরীর নিষ্পাপ শিশুপুত্রের অকালমৃত্যু, ৪. শ্বশুরের প্রতি হরসুন্দরীর ঘৃণা, শ্লেষ, 'ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি হয়েছে।' ৫. দয়াময়ীর সঙ্গে হরসুন্দরীর স্বাভাবিক সম্পর্কে এসেছে বিষম প্রতিক্রিয়া' 'ও রাক্কুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কি সাধ্যি।'

'দেবী' গল্পে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াই গল্পের মূল প্লটকে অনেক বেশি ঘনত্ব দিয়েছে। এতই ধর্মমোহে নিমজ্জিত জমিদার যে, খোকার প্রবল জ্বরেও বৈদ্য না ডেকে দেবী দয়াময়ীর অলৌকিকত্বে, মিথ্যের বিশ্বাস-আশ্বাসে অনড় থাকেন। কালীকিঙ্কর রায় মানুষটি গল্পের মধ্যে আবির্ভাবকালে যা ছিলেন, অন্তেও তা-ই। প্রথম দিকে তাঁর দেবীত্বে বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত কঠিন, শেষে ভাঙে : 'কালীকিঙ্কব ছল ছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন, "মা খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনো দেহ নষ্ট হয়নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।" কিন্তু এই চরিত্রের পরিণামে যে pathos তা পাঠকের চোখে জল আনতে ব্যর্থ, বরং শ্লেষে চরিত্রটির থেকে পাঠক মুখ ঘোরায়। গল্পের সব শেষে আছে গল্পকার কালীকিঙ্করের নিজের পুজোর ঘরে পরনের শাড়িকে দড়ির মতো করে গলায় ফাঁস দিয়ে দেবীর আত্মহননের ছবি। কালীকিঙ্কর নিজেই নিজের সৃষ্টির অসহায় দর্শক। এর যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, তা জমিদার চরিত্র ও গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা—দুয়ের সমান মিলিত ছবিতে বড় শিল্পভিত্তি পায়।

জমিদার চরিত্র কিছুটা static। একই ধর্মসংস্কার ও ধর্মতন্ত্রে ও আচারে-আচরণে আদ্যন্ত জড়িত থেকে কালীকিঙ্কর রায় দয়াময়ীর মধ্যে স্বপ্নাদেশের প্রতিক্রিয়াটুকুই তৈরি করে নিজে স্থির থেকেছেন। তিনি স্বপ্নাদেশের কুফল দেখেছেন, কিন্তু প্রভাতকুমার সেই কুফল দেখে তাঁর সংশোধনের কোনো ব্যঞ্জনাগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তাঁকে আনতে পারেননি। দয়াময়ী ট্র্যাজেডির চরিত্র, কালীকিঙ্কর 'প্যাথেটিক'। অন্ধ মোহবদ্ধ ধর্ম ও তার সংস্কার এবং আচার-আচরণ বিরাট মানবিকতার বিনাশে বড় ভূমিকা নিতে পারে জমিদারের মধ্যে, তার বোধ জাগরণের উপায়ের সূত্রে প্রভাতকুমার নীরব। আসলে সেই একই কথা, প্রভাতকুমারের জমিদার ঘটনার ও সিচুয়েশানের শিকার, মনের নানান 'turmoil' ও টানাপোড়েনের সাক্ষ্য দিতে পারেনি। দয়াময়ীতে তার অভাব, অভাব কালীকিঙ্করেও। তবু কালীকিঙ্কর পাঠকদের খুশি করে, কারণ প্রভাতকুমারের গল্পরচনার নিজস্ব কৌশল—যা জীবনের গভীরে যায় না, কিন্তু পাঠকদের তৃপ্ত করতে স্বাদুতা সৃজনে সক্ষম।

'দেবী' গল্পের মধ্যে সবচেয়ে বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র উমাপ্রসাদ। এই চরিত্রটি বাংলা ছোটগল্পে বাস্তব রসঘন জীবন্ত চরিত্রদের হাটে এবং ধারাবাহিকতায় রীতিমতো অন্যতম এক exception। সাধারণভাবে কুড়ি বছর বয়সী উমাপ্রসাদ সেকালে এক ষোড়শী বধূর যথোপযুক্ত স্বামী। তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, তথাকথিত ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা, তরুণ বয়স্কের অসার অপদার্থ পিতামহ-প্রপিতামহদের চঞ্চল

মতিগতির জীবনাচারে অনীহা তাকে অবশ্য ভিন্ন মাত্রা দেয় : 'অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ যে শেষ পর্যন্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকল্যাণের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।'

'দেবী' গল্পের প্রথম থেকেই উমাপ্রসাদকে আমরা দেখি। প্রথম রাতের শয্যাগৃহের আধো-আলো-অন্ধকারে প্রভাতকুমার সুন্দর এক দাম্পত্য ছবি উপহার দিয়েছেন—যার নায়ক উমাপ্রসাদ, নায়িকা দয়াময়ী। এই দৃশ্যের দু'টি ভাগ, প্রথমটিতে দুই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একেবারে নিরপেক্ষ প্রেমছবি। চুম্বন নিয়ে স্ত্রী দয়াময়ীর সঙ্গে উমাপ্রসাদের আলাপচিত্রে মেলে নায়কের সূক্ষ্ম রসবোধের ব্যঞ্জনা—যেন দুই তরুণ-তরুণীর মনোরম প্রেমের খেলা! এর পরেই দ্বিতীয়ভাগে আছে উমাপ্রসাদের পশ্চিমে চাকরি করার বাসনার উল্লেখ—কারণ স্ত্রীকে একান্তভাবে নিজেদের একার সংসারে একনিষ্ঠ করে কাছে পাওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা করা। স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে পশ্চিমে নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় আছে মজা, কৌতুক। অত্যন্ত আন্তরিক সে চিত্র।

এসব দিয়েই উমাপ্রসাদকে স্বচ্ছ স্বভাবে চেনা যায়। দয়াময়ীর বড়জায়ের ছেলে 'খোকা'কে স্নেহের সূত্রে উমাপ্রসাদ নিজেদের সন্তান হওয়ার প্রসঙ্গও তোলে। এই চিত্রের যে শান্তি, স্নিগ্ধতা তা মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয় পিতা কালীকিঙ্কর রায়ের স্বপ্নাদেশ শোনানোর প্রসঙ্গ এলে। স্বপ্নাদেশে গভীর পুলকিত পিতাকে দেখে উমাপ্রসাদের প্রতিক্রিয়া স্থৈর্যের—'মুহূর্তকালের মধ্যে মাথায় ভাবনা-চিন্তার শুরু' স্ত্রী দয়াকে প্রণাম করার কথা বলায় বাবার সামনে তাঁর প্রতিক্রিয়াকে উন্মাদগ্রস্ততা কিনা সন্দেহ প্রকাশ করা—এসবে আছে চরিত্রটির যুক্তি-ভাবনার উৎসমুখ। এরপর উমাপ্রসাদ স্বামী হিসেবে স্বক্ষেত্রে শপথদীপ্ত। তার প্রমাণ মেলে পরবর্তী দুটি নৈশচিত্রে।

দয়াময়ীর দেবীত্বে উন্নীত হওয়ার পর তিন দিন অতিক্রান্ত। পরবর্তী রাতে উমাপ্রসাদ গোপনে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে। উমাপ্রসাদ দয়ার কাছে দেবীরূপে তার মনের কথা জানতে চায় 'তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি?' উমাপ্রসাদ যে আদৌ তা বিশ্বাস করে না, এই প্রশ্নে তা প্রচ্ছন্ন। দয়াময়ীকে নিয়ে গোপনে, রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় আদৌ ধর্মভয় নেই উমাপ্রসাদের। এখানেই পিতা কালীকিঙ্কর রায়ের পুত্র হয়ে তার প্রতিবাদী বাস্তবতা। দয়াময়ী নির্দিষ্ট রাতে দেখা করলে দয়াময়ীর তার দেবীত্বের বিশ্বাসে স্থির হয় সংশয় সরিয়ে। 'কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল।' পরে উমাপ্রসাদ অসহায়তায় স্ত্রীর কাছে কাঁদলেও দয়া তখন স্বামীর থেকে দূরযাত্রিনী এক বধূ। নিজেকে দেবীর স্বামী মহেশ্বরের যুক্তি দিয়েও দয়া অনড়।

সবশেষে দয়াকে বাড়ির বাইরে গঙ্গার ধারে আনতে সমর্থ হয়েও দয়ার যুক্তির জেদ শোনে : 'আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।'

দয়াময়ীর এই শেষ কথায় উমাপ্রসাদের সমস্ত প্রয়াস, যুক্তিচিন্তা, পরিকল্পনা নিদারুণ ধাক্কা খায়। দয়াময়ীর এই মন্তব্যই উমাপ্রসাদের জীবন-ট্র্যাজেডির বড় আঘাত। তার ধর্মের প্রতি অনীহা, স্ত্রীর দেবীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, তার পরাজয় তাকে সেই নির্মম উক্তি করতে প্রেরণা দেয় : 'তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।' এইভাবেই শুধু পিতা কালীকিঙ্কর রায় নন, স্ত্রীও তার সমস্ত সুখস্বপ্নকে, জীবনমুখীন বাঁচার আর্তিকে ধূলিসাৎ করে। 'দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।'

উমাপ্রসাদ যে প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক পরিবেশের ধর্মীয় নিষ্ঠার বিরুদ্ধপ্রায় বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব, তা তার দয়ার আরতির সান্ধ্য অনুষ্ঠান একবারও না দেখার স্বভাবে নিহিত। গল্পে এই ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল অভিজ্ঞান : 'যখন শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে।' চরিত্রটির অসামান্য বাস্তবতার প্রমাণ মেলে পূজা-অর্চনাকে নিষ্ফল, কৌতুককর, অগ্রাহ্য করার উপযোগী ভাবনার মধ্যে : 'আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে মনে হাসিবে।' দয়াকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সর্বশেষ পালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে পরের দিন প্রভাতে পুরোহিতের দয়ার অন্তর্ধানের চিন্তা, প্রতিক্রিয়াকে কল্পনায় উপভোগ করে উমাপ্রসাদ। এই লঘু ভাবনা, প্রচ্ছন্ন কৌতুক, ধর্মীয় পরিবেশে তার নিষ্ফলত্ব, বাস্তবতার অভিঘাতই ভিন্ন রসাস্বাদ দেয় পাঠকদের।

উমাপ্রসাদ গ্রাম থেকে একা অন্তর্হিত হয়ে যায়, কোনো উদ্দেশ তার আর মেলে না। এই সংবাদে এক গভীর pathos পাঠকমনে বাজে। উমাপ্রসাদ চরিত্রটি static নয়, dynamic। প্রথম স্তরে সে এক আশাবাদী জীবন্ত চরিত্র স্বামীস্বভাবে, শেষে সে একা মর্মাহত, বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে যন্ত্রণায় অ-দৃশ্য। ১. ধর্মসংস্কার ও ধর্মতন্ত্রের কঠিন পরিবেশ ও বন্ধন থেকে উমাপ্রসাদ দয়াময়ীকে মুক্তি দিতে বাইরে আনতে পেরেছে নিশীথের অন্ধকারে। এখানে উমাপ্রসাদ-ব্যক্তিত্বের গৌরব-গরিমা। ২. বাবা শাক্ত হলে উমাপ্রসাদ তাতে সম্পূর্ণ অনীহ। এখানে সে সেকালে এক আধুনিকোত্তম ব্যক্তিত্ব। ৩. গল্পের মধ্যে কোনো কোনো প্রকৃতি বর্ণনায় আছে উমাপ্রসাদের Pathos-এর উপযোগী মনোচিত্রের ব্যঞ্জনা। প্রথমদিকে পিতার স্বপ্নাদেশের আগের মুহূর্তের চিত্র এইরকম :

> "দয়া একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'
> বাইরে জ্যোৎস্না নিরতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল।"

স্ত্রীর দেবীত্বে উত্তরণের আগে স্বামীর এই ম্লান মুখ যেন চরিত্রটির পরিণামী চিত্রের যথোচিত ব্যঞ্জনার ভূমিকা। বস্তুত উমাপ্রসাদই একমাত্র চরিত্র যে সমগ্র গল্পে সঠিক শিল্প বাস্তবতার বাতাবরণ রচনা করেছে। তার সুখ, বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছে গভীর নৈরাশ্যে, সুস্থ প্রাণের সমাধি রচনায়, চিরকালীন রহস্যময় নিরুদ্দেশে। এটাই pathetic।

চার

'দেবী' গল্পের প্রকরণ প্রভাতকুমারের সুচিন্তিত শিল্প-ভাবনার ও শিল্পরূপের অনুগ। অন্যান্য লঘুরসের গল্পের মতো এ গল্পে কেবল 'সিচুয়েশন' বৈশিষ্ট্য আদৌ প্রাধান্য পায়নি, গল্পের আরম্ভ ও শেষের মধ্যে এক নিটোল বন্ধন আছে—যা সংযম ও সংহতিতে গল্পটিকে বড় মাপের শিল্পকর্মের অভিধা দেয়। একটি প্রথম শ্রেণীর গল্পে যা সম্ভব—'দেবী' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের রূপরচনার দিকে তাকালে তার মধ্যে, প্রেম ও প্রাণের পরাভবের মধ্যে মেলে গভীর ও পরিব্যাপ্ত ট্র্যাজেডির বার্তা—জানিয়েছেন কথাকার-সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

এই বিষয়ের প্রভাতকুমার নির্মিত 'সমুন্নতি' গল্পের প্রকরণ ও ভাষাবৈশিষ্ট্য, কোথাও কোথাও প্রতীকী ব্যঞ্জনা এবং পরিণামের বিনাশী সর্বধ্বংসী রূপাবয়ব রচনায় মেলে। পাঁচ-ছ'বছর আগের বিবাহিত স্ত্রী দয়াময়ীর কাছে ছ'বছরের পরের ঘনিষ্ঠতার নূতন সূত্রপাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ফাঁক-এর সূক্ষ্ম ছবি এঁকেছেন প্রভাতকুমার : 'উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার যোড়শী পত্নী একপাশে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া আছে।' গল্পের এই একেবারে শুরুর প্রথম চিত্রটি গল্পের পরবর্তী প্রসারিত ও কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুগ ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম প্রতীকপ্রতিম প্রতিরূপ! প্রথম দিকেই সুখী দাম্পত্যচিত্রের মধ্যে, দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে দয়াময়ীর কথা : 'মনে হচ্ছে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।' একটু আগের চিত্রে দয়ার অন্যমনের যেনবা স্বগতোক্তি : 'আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।' এই সব স্বগতোক্তিমূলক দয়াময়ীর ভাষণ সমগ্র গল্পের পক্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষে প্রাথমিক ব্যঞ্জনাগর্ভ আবহ রচনা করে। প্রকরণের দিক থেকে এমন শুরু গল্পকারের সূক্ষ্ম বোধের পরিচায়ক।

গল্পের শেষেও আছে লেখক রচিত প্রথম চিত্রগুলির ছায়া-স্বভাবে অনুগ পরিণামী বেদনা, হতাশা, হননের বিষাদমলিন নিয়তির স্বরক্ষেপ : '...... দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।' এই সংক্ষিপ্ত চিত্রের দ্ব্যর্থক ব্যঞ্জনায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র ছোটগল্পের বন্ধন-শিল্প সংহতি পায়। সমগ্র গল্পের পটভূমিতে মেলে রাতের বিভিন্ন সময়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র—যার মধ্যে প্রধান চরিত্রগুলির নানা ধরনের উপস্থিতি তাৎপর্য পায়। আছে পৌষমাসের দীর্ঘরজনীর monotony-র মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর শয্যাগৃহে রাত্রিযাপনের স্বভাব বর্ণনা। দম্পতি হল দয়াময়ী ও উমাপ্রসাদ। এদের প্রেম-বিনিময়ের চিত্রে মেলে স্বামীর চুম্বনে দয়াময়ীর 'ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা' হওয়ার দিক—যা রাতের অন্ধকারের জন্য দুজনের কারোর চোখে না পড়া! এই চিত্রের ব্যঞ্জনা প্রধানত স্বামী-স্ত্রীর সুখের সমৃদ্ধি ও অন্তরঙ্গতার দিক—এর বিনষ্টিই তো গল্পের প্রধান সুর!

ভোরে খোকা আসে দয়াময়ীর ঘরে দয়াময়ীর গভীর নিবিড় স্নেহাশ্রয়ে। তার অনুপস্থিতিতে দয়ার চিন্তা, রাত্রিশেষের ভোরের মধ্যে একসময়ে প্রথম প্রভাত আলোর স্পর্শে তাদের নিদ্রার নিশ্চিন্তি শেষতম সুখের বার্তা শোনায়। দয়ার মানবী থেকে দেবী

হয়ে ওঠার পর আবার রাত দ্বিপ্রহরে দয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে উমাপ্রসাদের। এই দ্বিতীয় সাক্ষাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেচিত্রে মেলে দাম্পত্যজীবনে ঝড়ের প্রবল আঘাতের ব্যঞ্জনা। এর নির্দিষ্ট সাতদিন পরে আবার দয়ার সঙ্গে উমাপ্রসাদের দেখা হয় সেই রাতেই—সেই একই রাত্রি দ্বিপ্রহরে। সেই রাতেই মধ্য অংশে উমাপ্রসাদ দয়াকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসে। সেখান থেকে শেষে দয়া বাড়ি ফেরে একা, উমাপ্রসাদও হয় নিরুদ্দেশ একা এক গভীর হতাশায় ও অভিমানে, হয়তো জীবন-বিতৃষ্ণায়। সর্বশেষ দয়ার আত্মহনন ঘটে সেই সন্ধের সামান্য আরতির শেষে গভীর রাতের কোনো এক সময়ে।

এইভাবে 'দেবী' গল্পে প্রভাতকুমার পরিবেশের রাতের ভূমিকাকে স্বামী-স্ত্রীর, দয়াময়ী কালীকিঙ্কর রায় ও একা দয়াময়ীর জীবনবিনাশের উপযোগী করে প্রতীকী তাৎপর্যে ভাগ্যগঠনে সহায়তা করে।

'দেবী' গল্পের ভাষা সাধু-চলিত মিশ্রিত। লেখকের বর্ণনা সাধুরীতির, সংলাপ চলিত ভাষার অনুগ। বর্ণনা সাবলীল, সহজ, হৃদয়-স্বভাবী। বুদ্ধির চাকচিক্য, দীপ্তি, কাঠিন্য গদ্যে নেই। এবং না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ প্রভাতকুমারের গল্পের চিত্র-স্বভাবে আছে প্রধানত আবেগধর্ম, ভাবপ্রবণতা, স্বচ্ছ ও সচ্ছল গতিময়তা। গল্পের সর্বশেষ বাক্যাংশ সংক্ষিপ্ত এবং কোনো প্রসারিত ব্যঞ্জনায় অনুরণন বোঝায় না। 'দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন'-এর মধ্যে গভীর-তলাশ্রয়ী কোনো আঘাতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হওয়ার সুযোগ নেই। প্রভাতকুমার তাঁর বেশিবভাগ গল্পের শেষে যে কথা বলেন, তাতে 'শেষ হয়ে না হইল শেষ'-এর কোনো চুম্বক কাজ করে না। গদ্যরীতিতে অলংকার প্রয়োগ কম। থাকলেও সব সময় তা গল্পের পরিবেশ, চরিত্র, ঘটনা, সিচুয়েশানকে সমৃদ্ধ করে না।

পাঁচ

গল্পটির নাম 'দেবী'। গল্পটি আদৌ না পড়ে প্রথমেই আমাদের নামকরণ রীতির একটি সহজ বৈশিষ্ট্য মনে আসতেই পারে। প্রাচীনকালে, একালেও, আমাদের মেয়েদের নামে তার পদবি ব্যবহার না করে 'দেবী' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পিতৃদত্ত বা স্বামীপ্রদত্ত পদবি মূল নামে পরিত্যক্ত হয়। হয়তো মেয়েদের সম্মান জানাতেই এমন প্রয়োগ। কিন্তু 'দেবী' গল্পপাঠের পর এই বিষয় আর প্রাধান্য পায় না। গল্পকার 'দয়াময়ী দেবী' এমন ভাবনার পক্ষে কোনো প্রসঙ্গেরই সুযোগ কবে দেননি, প্রয়োজনও নেই।

কিন্তু গল্পের শিল্পরূপেব সমর্থিত নামে 'দেবী' নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এমন নাম ব্যঙ্গ্যাত্মক। নামে মেলে দয়াময়ী চরিত্রের এবং সমগ্র গল্পের pointing finger-এর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বক্তব্যের দ্বিমুখী তাৎপর্যের বৈশিষ্ট্য।

প্রথমত, সাধারণ যে অর্থ, দয়াময়ী মানবী থেকে দেবী হল, শ্বশুর কালীচরণ রায়ের বাসনায় ও ধর্মপ্রাণেব নির্দেশে, এবং দয়াময়ী যখন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, সুতরাং 'দেবী' নামের গুরুত্ব প্রাথমিকভাবে স্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত, নামের অবশ্যই আরও গভীর তাৎপর্য আছে। দয়াময়ী সামান্য একজন সুখী দম্পতির বধূ। পারিবারিক জীবনে সে সাধারণ নাবীর স্নেহ, প্রেম, বাসনা-কামনায়

জীবন্ত। সে একেবারেই বাস্তব চবিত্র, বাস্তব পারিবারিক ভূমি ও সংসারের সদস্যা। সে জমিদারের স্বপ্নাদেশে হল দেবী। তাতে তার কোনো একান্ত নিজস্ব প্রয়াস বা ইচ্ছা কাজ করেনি। এখানে সে স্বাবলম্বী নারী নয় নামের অর্থে। অথচ শ্বশুরের দেওয়া অভিধায় সে দেবীরূপে আদৃত হতে বাধ্য। তাই 'দেবী' নামে তার অন্য এক ব্যক্তিত্বের সমর্থন মেলে।

তৃতীয়ত, সমগ্র গল্পের যে লক্ষ্য, তা হল দয়াময়ীর ওপর দেবীত্ব আরোপ করে, দেবীধর্মের ও সত্তার যোগ অন্তঃশীল করে ধর্মীয় ও অধ্যাত্মসাধনার, ধর্মসংস্কার ও ধর্মতন্ত্রের জয় ঘোষণা গল্পকারের প্রতিপাদ্য। স্বভাবে দেবী না হয়েও প্রতিপাদ্য তত্ত্বের মর্যাদায় সে দেবী। সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের অনুগামী বলেই সে থেকেছে গল্পের শিরোনামে 'দেবী' হয়ে।

চতুর্থত, তার 'দেবীত্ব' নিষ্ফল, মানব্য প্রাণবিনাশী এক অশুভ দিক, সংস্কারের সঙ্গে যোগে এক শূন্যতার সমর্থক। আসলে সে সুস্থ মানবিক, কিন্তু অসুস্থ অমানবিকতার পরিপোষক, তার আত্মহননে তার প্রমাণ রেখেছে। গল্পের দেবী, প্রথমে মানবী, মধ্যে দেবী, শেষে আবার মানবী হয়েছে আত্মহননে। ঈশ্বর বা দেবদেবীরা আত্মহননে লিপ্ত হতে পারে না। দয়াময়ী যদি সত্যি অলৌকিক দেবী হ'ত তা হলে তার জাগতিক মৃত্যু ঘটত না। সে মরে প্রমাণ করেছে যে সে সাধারণ নারী। দেবীত্ব তার মুখোশ। মানুষের প্রাণই সত্য, ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র—সংস্কারে মোড়া মানুষের ও পরিবারের যে কৃত্রিম, স্বার্থসর্বস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা তা থেকেই দয়াময়ীর হয়েছে মানবীত্বে পুনরুত্থান। বিশ্বাস, বিভ্রান্তির, বিনাশের, প্রাণশক্তির অপচয় ঘটিযে দেবীত্ব ব্যর্থ, মানুষই সত্য। 'দেবী' গল্পের নির্গলিতার্থে এই লক্ষ্যই প্রমাণিত হওয়ায় 'দেবী' নাম দু'দিকের বিবর্তনে—আদিতে মানুষ থেকে দেবীতে, শেষে দেবী থেকে মানুযে ফিরে আসার ব্যঞ্জনায় 'দেবী' নামকে বড় শিল্পমান দেয়।

২.

কাশীবাসিনী

এক

প্রভাতকুমারের 'কাশীবাসিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী'তে বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে, ইংরেজি ১৯০৩-এ। লেখকের 'ষোড়শী' নামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থে তা সংকলিত হয় আশ্বিন ১৩১৩ সালে। এই গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনের ভাষা ও লক্ষ্য ছিল এই রকম : 'ইহাতে নানা রসপূর্ণ ষোলটি গল্প আছে। অধিকাংশ ষোড়শী রূপসী লইয়া ঘটনা গ্রন্থন।' ষোড়শী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের লেখক-কৃত ভূমিকা এই বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দেয় : 'এই গ্রন্থে আমার ষোলটি গল্প প্রকাশিত হইল। তাই ইহার নাম রাখিলাম "ষোড়শী"।' অথচ আমাদের আলোচ্য 'কাশীবাসিনী' গল্পটির কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রটি, গল্পে ষোড়শী নয়। 'ষোড়শী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সে সময়ে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে, ১৩১৪-র শ্রাবণ সংখ্যায় লেখেন, 'আমরা কিন্তু বোধ করি, অশ্লীলতা নিবারণী সভার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য, গ্রন্থকার এইরূপ চতুরতা করিয়াছেন। ... গল্পের আটটিতে ষোড়শীই জান্।' আমাদের কথা,

'কাশীবাসিনী'র এমন অন্তর্ভুক্তি গ্রন্থনামের কোন সাপেক্ষে যুক্তি দেয়? প্রভাতকুমারের দৃষ্টি আরও প্রসারিত ছিল। কাশীবাসিনী চরিত্রটি গল্পে প্রৌঢ়া হতে পারে, কিন্তু যৌবনে যোড়শ বয়সের কাছাকাছি আগে-পিছে তো তার পদস্খলন ঘটেছিল! সুতরাং গ্রন্থনামের সঙ্গে 'কাশীবাসিনী'র এভাবেই যোগসূত্র ধরা পড়ে।

যাই হোক, 'কাশীবাসিনী' সেকালের এক পতিতা রমণীর নিজ কন্যার প্রতি গভীর স্নেহদুর্বলতার, পরোক্ষে পাপক্ষালনের, আত্মপক্ষ শোধনের নিপুণ কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে তিন প্রধান চরিত্র গিরীন্দ্রনাথ, তার স্ত্রী মালতী এবং নামহীন এক কাশীবাসিনী। প্রথম জন নায়ক, দ্বিতীয় জন নায়িকা এবং তৃতীয় কেন্দ্রীয় চরিত্র। কাহিনীর পটভূমি সেকালের খগোল নামের একটি জায়গায় অবস্থিত দানাপুর স্টেশন ও তার আশপাশ। খগোল বাজার থেকে কিছু দূরে স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসাবাড়ি। গিরীন্দ্রনাথ এই চাকরিতে আসার পর বছর দশেক ধরে সঙ্গদোষে মদ্যাসক্তিতে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করত। বছর দুই হল বিবাহ করে কিছুটা ভদ্র হয়েছে। স্ত্রী মালতী অল্পবয়সেই বিদেশে একা স্বামীর কাছে বাস করতে শুরু করে। এখানে মালতী একা, একমাত্র কাজের মেয়ে বুড়ি দাই ভুজুয়াব মা ছাড়া কোনো কথা বলার লোক নেই। স্বামীর তো প্রায় সারাদিনের অফিস।

এমন নিঃসঙ্গ একক জীবনে এক শীতকালে মালতীর বাসাবাড়িতে এসে উপস্থিত হয় একটি তোরঙ্গ ও হাতে পুঁটুলি নিয়ে এক অপরিচিতা বিধবা প্রৌঢ়া বাঙালি। নবাগতা বিধবা মালতীকে জানাল, কাশী থেকে গাড়িতে যাবার সময় টিকিট হারিয়ে যাওয়ায় ট্রেন থেকে নেমে আসতে বাধ্য হন এবং পরের গাড়ি সেই রাত একটায় থাকায় তিনি অপরিচিত হলেও ভদ্রলোকেব বাড়ি বলে গিরীন্দ্রনাথের এখানে আসেন সাময়িক আশ্রয় নিতে। একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে মালতী একজন সঙ্গী পাওয়ায় সরল বিশ্বাসে ও ব্যবহারে এই বিধবা কাশীবাসিনীর অন্তরঙ্গ অতিথি পরিচর্যার ত্রুটি রাখে না। ক্রমশ আলাপ-পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা হয়। কাশীবাসিনী মালতীর নাম, বাপের বাড়ির ঠিকানা, মা-বাবার খবর, স্বামীর সঙ্গে কতদিনের বিবাহ, স্বামী কখন কাজে যান কখন ফেরেন, কত মাহিনা পান ইত্যাদি বিস্তারিত বিষয়ের প্রশ্নোত্তরে আরও ঘনিষ্ঠ হন।

গিরীন্দ্রনাথ পুরনো অভ্যাস ছাড়েনি, অফিস থেকে ফিরে অতিথির কথা শোনে, প্রথমে স্বাভাবিক সন্দেহ, পরে স্ত্রীর কথায় কাশীবাসিনীর সঙ্গে আলাপ করে। রাতের গাড়ি নয়, কাল দুপুরে অফিস থেকে কুলি পাঠিয়ে তিনটের গাড়িতেই অতিথিকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে। মদ্যপান করে বাইরে চলে যায় আড্ডায়। ফিরে এসে মালতীকে তার তাড়িঘাটে বদলির শুভ খবর জানায়। মাইনে বাড়বে মাত্র পাঁচ টাকা, তবু উপরি মিলবে বেশ, এই আশ্বাসে স্থিতচিত্ত হয়। যাওয়ার তারিখ তিন-চার দিন পরে। পরের দিন কাশীবাসিনীর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি গিরীন্দ্রনাথ ঠিক সময়ে কুলি না পাঠানোয় শেষে। কাশীবাসিনী আরও কদিন থেকে যায়। ইতিমধ্যে বদলি হওয়ার জন্য গিরীন্দ্রনাথকে বন্ধুদের খাওয়ানোর আয়োজন করতে হয় বাড়িতে। তার আগে কাশীবাসিনী নিজেই মালতীকে সাহায্য করে রান্নায়। মালতীকে বিকেলের জলখাবার

কেনায় বাধা দিলেও নিজেই দু'টাকা দেয়। রাতের রান্না করে গিরীন্দ্রকে খাওয়ায়। খাদ্যের আস্বাদে গিরীন্দ্র মুগ্ধ।

নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে গিরীন্দ্র দেখে বাড়তি খরচ করার মতো একটি টাকাও নেই। শেষে কাশীবাসিনী নিজেই তিরিশ টাকা দেয়, প্রয়োজনে আরও দিতে রাজি। গিরীন্দ্র সেই টাকা সলজ্জে নিয়ে নিমন্ত্রণপর্ব সমাধা করে এবং কাশীবাসিনী যদি তাড়িঘাটে ওদের সঙ্গে যায় তবে এক সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা শুধে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এসবের মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই মালতীকে সাবধান থাকতে বলে অপরিচিতা কাশীবাসিনী সম্পর্কে। বদলি হওয়ার দিন কাশীবাসিনী তাড়িঘাটে যাওয়ায় রাজি হলেও শেষমেশ গিরীন্দ্রের জিদে সায় না দিয়ে তাড়িঘাটে যাওয়ার আগে বদলি স্টেশন দিলদার নগরে মালতী-গিরীন্দ্র নেমে গেলে কাশীবাসিনী সোজা কাশীতে ফিরে যান।

তাড়িঘাটে এসে স্টেশন সংলগ্ন নতুন বাসায় মালতী স্নান সেরে কাপড় বের করতে গিয়ে দেখে তোরঙ্গে গয়নার বাক্স নেই। কোথাও না পেয়ে যখন হতাশ এবং গভীর কান্নাক্রান্ত, তখন গিরীন্দ্র ফেরে এবং সব শোনে। গিরীন্দ্রের একমাত্র সন্দেহ তখন কাশীবাসিনীকেই। কারণ মালতী কাশীবাসিনীকে ওর সব গহনা দেখিয়েছিল আগে তারই কথায়। তার ওপর ট্রেনেও তোরঙ্গ খুলেছিল, চাবি রেখেছিল কোমরেই। কাশীবাসিনীর নাম ওরা জানে না, কাশীর কোন মঠে যেন থাকেন কাশীবাসিনী! অগত্যা গিরীন্দ্রনাথ থানায় ডায়েরি করে। ডায়েরি করলেও ক্রমশ সপ্তাহ দুয়েকেব মধ্যে তা ভুলে যায়। কারণ তাড়িঘাটের উপরি পাওয়ার সুখের দিনগুলিই তাদের তা ভুলিয়ে দেয়।

এক গড়ানো সকালে কাশীবাসিনীকে দেখে মালতী কুলিসমেত ওদের বাসায় আসতে। মালতীর বিশ্বাস হয উনি গহনা নিলে আসতেন না। কিন্তু কাশীবাসিনী এসে ওদের থানায় ডায়েরির খবর শোনায়, তাতেই ওর এমন আগমন। দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে পুলিশেব কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছে। নানান কথায় মান-অভিমানে কাশীবাসিনী জানায় সে মালতীর মা। অতীতে কুলটার জীবন কাটিয়েছিল বলে লজ্জায় মেয়ের কাছে আসেনি। মালতী জেনেছিল ওর মা বেঁচে আছে। এই প্রথম ওর স্বপ্নের মাকে দেখল। কাশীবাসিনী প্রচুর গহনা দিতে চাইলে ও নিল না। মা জানায় সব ওর নিজের ধনী বাবার দেওয়া, অসৎ পথের উপার্জন নয়। নানা দ্বিধায় গহনা না নিলে কাশীবাসিনী জানায় স্বামী নিতে না করলে যেন সব দেবসেবায় দিয়ে দেয় মালতী। কাশীবাসিনীর চলে যাবার সময় কান্নাক্রান্ত মালতী প্রণাম করে, মায়ের আশীর্বাদ শেয হলে মা শেষ বিদায় নেয়।

এই কাহিনীটি গল্পকার প্রভাতকুমার নিজস্ব শিল্পকৌশলে একটি 'schematic' জটিলতায় ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন। গল্পটির প্লট গোড়া থেকেই জটিলতার সূত্রটি ধরে। তবে গল্পকার অন্যান্য একাধিক গল্পের মতো descriptive রীতি গ্রহণ করায় সাদামাটা প্রয়োজনহীন বিস্তারে বর্ণনায় শ্লথমন্থর হয়ে উঠেছে। বর্ণনায় কোনো কুশলী তির্যকতা নেই, প্লটে গিরীন্দ্রনাথ ,ও মালতি প্রসঙ্গের ভূমিকা প্রয়োজনহীন বিস্তৃতি পেয়েছে। পাঠকদের ও গল্পের গিরীন্দ্র-মালতী দম্পতির কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বিধবা প্রৌঢ়া কাশীবাসিনীব অযাচিত আগমন অবশ্য রহস্যের ও বিস্ময়ের চমক দেয়।

গল্পের ছকে কাশীবাসিনী ও মালতীর সংলাপ বিনিময় ও সান্নিধ্য এবং অন্তরঙ্গতা প্রধান জট পাকায়। তার মধ্যে গিরীন্দ্রের ভূমিকা সেই জটিলতাকে বিশ্বাস্যতার উপযোগী মজবুত সূত্ররূপ পায়। কাশীবাসিনীর প্রতি সতত সন্দেহ জাগিয়ে রাখার দিক, যা শেষে গহনা হারানো ও কাশীবাসিনীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করবে। তাতে গিরীন্দ্র রীতিমতো উদ্দীপন বিভাবে বিশিষ্ট। গল্পকারের কাশীবাসিনীর ছোট ছোট সাংসারিক আচার-আচরণে, মালতীর প্রসঙ্গ জানার বাস্তব প্রয়াসে পাঠকদের রহস্যকে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বভাব দেয়।

গল্পের 'চরমক্ষণ' (climax) অবশ্যই গয়নার বাক্স চুরি তথা হারানোর প্রসঙ্গটি নির্মাণ করে দেয় কাহিনী-অবয়বের স্বভাবে, কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্স মালতী-কাশীবাসিনীর সম্পর্কেই তীব্রতম রূপ পায়। গয়নার বাক্স ফেলে চলে যাওয়ায় গল্পের শেষ শিল্পিত স্বভাব পায়। মালতীর নস্ট্যাল্‌জিক দ্বন্দ্বে গল্পের গতি তীব্র হয় শেষ পর্বে। মালতী জানে তার মা বেঁচে আছে। গিরীন্দ্রকেও বলেনি, কিন্তু কাশীবাসিনীর মতো কুলটা নারীই যে তার মা—এই দুই ভাবনার মধ্যবর্তী নস্ট্যাল্‌জিয়াই ছোটগল্পের মনস্তাত্ত্বিক মনোরম স্বভাবকে শিল্পের চমৎকারিত্ব দিয়েছে। 'কাশীবাসিনী' গল্পের শক্ত কাঠামোর খাঁচায় মালতী-কাশীবাসিনীর সম্পর্কই শক্ত অচ্ছেদ্য দড়ি—যা গল্পের বড় আকর্ষক উপকরণ। গল্পটি উপসংহারে আসতে প্রলম্বিত হয়েছে বর্ণনার বাহুল্যে, সিচুয়েশান সৃষ্টির অত্যধিক সুযোগ তৈরি করায়। আরও ছোট হলে প্লটের জটিলতার সংযম ও সংহতি হত আরও আধুনিক।

দুই

'কাশীবাসিনী' গল্পের মূল 'থিম'-এ আছে স্নেহরস, করুণরস। এই রসই অতিরিক্ত এবং গল্পকারের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যে কৌতুকরসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রভাতকুমারের প্রায় সব গল্পেই মূল সুর ধরায়। নিছক কৌতুকরসের গল্প, লঘুরসের ভিয়েন বহু গল্পে মেলে। তবে 'কাশীবাসিনী' গল্পে কৌতুকরস নেই, আছে মালতী-কাশীবাসিনী—দুয়ের সম্পর্কে স্নেহার্ত মায়ের অতৃপ্ত হৃদয়ের উদ্বেলতা, আছে মা ও মেয়ে উভয়পক্ষের জীবনের করুণরসের আর্দ্র হৃদয়-স্বরূপ। তবে এই গল্পে মালতী ও কাশীবাসিনীর অন্তিম রূপ শান্তরসে স্থির থাকেনি। গল্প শেষে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে দুই অসমবয়সী নারীহৃদয়ের শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস, অসহায়তা, চিরবিচ্ছিন্নতার অভিশাপ। অভিশাপ এসেছে কাশীবাসিনীর সমাজ ও নীতিভ্রষ্ট জীবন স্বভাবে, দেখা দিয়েছে মালতীর মতো সরল নিষ্পাপ এক কন্যা তথা বধূর নিয়তিনির্দিষ্ট ভাগ্যের লিপির মধ্য দিয়ে।

কেন্দ্রীয় বক্তব্যের এমন পরিণামী ব্যঞ্জনা গল্পটির সবচেয়ে বড় গৌরব! প্রভাতকুমার এই গল্পের শিল্পের মান অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর আঁকা সংক্ষিপ্ত, সংহত, মমতাময় চিত্রব্যঞ্জনায়। কাশীবাসিনীর আছে চিরন্তন অ-তৃপ্ত মাতৃমনের অসহনীয় ক্ষুধা. কন্যা মালতীর অ-দেখা মায়ের জন্য মনের গভীরে জ্বলা অতৃপ্তির আগুন। মালতী মাকে ভোলেনি, মায়ের ভ্রষ্ট জীবনের কথা শুনলেও তাকে একবার দেখাব মতো বাসনাও

অসীম থেকে যায়। যখন আচম্বিতে তাকে চিনতে পারে তখন তার বিহ্বলতা, ভাবনার টানাপোড়েন তাকে মায়ের পায়ের কাছে নিক্ষেপ করে। মা সে আকর্ষণে মুখ দেখাতে গভীর অস্বস্তির কারণে মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

এই যে বিচ্ছেদ—তার সুনিবিড় বেদনা পাঠকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেই। প্রভাতকুমারের লিপিকুশলতায় শেষ চিত্র বড় করুণ। এই চিত্রে বড় জীবনদর্শন নেই ঠিকই, কিন্তু প্রভাতকুমার মানবপ্রাণের বড় বৃত্তি কারুণ্যকে উজাড় স্বভাবে রূপ দিয়েছেন :

> "মালতী বলল, 'গহনা নিয়ে যাও। আমি পরব না।'
>
> কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, 'যা ভেবেছো তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চৌদ্দ বচ্ছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর এর একখানিও পাপের অর্জন নয়। আমি মস্ত বড় মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোন নি?'
>
> মালতী বলিল, 'তবুও আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে, আমি নিতে পারি নে।'
>
> 'তাই কোরো। যদি তিনি তা পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও।'
>
> তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।
>
> মালতী আর থাকিতে পাবিল না। 'মা আবার দেখা দিও'—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।
>
> 'সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও'—বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।"

বস্তুত গল্পের মূল 'থিমে'র মধ্যে ট্র্যাজেডির মহিমা নেই, আছে সজল 'pathos'। তা প্রভাতকুমারের শিল্পীপ্রাণ নিহিত স্নেহের আর্তি, বিচ্ছেদজনিত শূন্যতাবোধে ভিন্ন জীবন-স্বাদী। একজন বলিষ্ঠ কথাকারের কথাসাহিত্য থেকে যে জীবনের প্রতি বিশেষ এক দৃষ্টি গড়ে ওঠে, যা উত্তুঙ্গ কল্পনাময়তা ও কবিত্বে জীবনের মর্মমূলের সন্ধান দেয় জটিল বৈপরীত্যে, তা প্রভাতকুমারের এই গল্পে শুধু নয়, প্রায় সব গল্পেই অনুপস্থিত। তাঁর উপন্যাসও তার প্রমাণ দেয়। ছোটগল্পে প্রভাতকুমার নিশ্চিতভাবে জীবনরসের শিল্পী, কিন্তু প্রোথিত বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ জীবনের মহান বাণীর রূপকার নন। 'কাশীবাসিনী' আমাদের এই মন্তব্যের উজ্জ্বল উদাহরণ।

তিন

'কাশীবাসিনী' গল্পে অবশ্যই অপরিচিত বিধবা প্রৌঢ়ার গিরীন্দ্র-মালতীর সংসারে রহস্যময় স্বভাবে উপস্থিত হওয়া দিয়ে যে কাহিনীর সূত্রপাত, পরে যে চরিত্রকেন্দ্রিক প্লটের ক্রমিক জটিল বয়ন, তার মূলে ওই প্রৌঢ়ার দায়িত্বই প্রধান। তাই গল্পে কাশীবাসিনীই কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্পের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই প্রৌঢ়ার স্বরূপ সম্যক উদ্ঘাটিত। কিন্তু তার আগের পরিচ্ছেদগুলিতে এই বয়স্কা নারীই গল্পের প্রধান সূত্রটি ধরে একে

একে যেমন নতুন নতুন গিঁট তৈরি করেছে তেমনি একে একে সেগুলি খোলারও ব্যবস্থা করেছে।

তাই এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে গল্পকার যথেষ্ট শিল্পকৌশলে সমগ্র গল্পে বিন্যস্ত করেছেন। সম্পূর্ণ পরিচয়হীন হয়ে গল্পের প্রথম দিকে কাশীবাসিনীর মালতী-গিরীন্দ্রন ের সংসারে আসার কারণ তিনটি স্তর ধরে স্পষ্ট করা যায় : ১. মালতীর সংসারের খোঁজখবর নিয়ে তাকে ঠিকমত সচ্ছল সংসারের উপযোগী করে গুছিয়ে দেওয়া; ২. তার অর্থনৈতিক অবস্থার নিপুণ পর্যবেক্ষণ ও সেই সূত্রে সহায়তা দিয়ে সে ব্যাপারে মালতীর মানসিক স্থিতি দান; ৩. সবশেষে নিজের সমস্ত গহনা দিয়ে মালতীর ভবিষ্যৎ সংসারজীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

অবশ্যই এসব করা সম্ভব হয়েছে মালতীর কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে কাশীবাসিনীর আপন সলজ্জ ভ্রষ্ট জীবন থেকে পবিত্র মুক্তির সংগুপ্ত বাসনায়। মালতী কাশীবাসিনীর কন্যা। কাশীবাসিনী যৌবনে সংসাব ত্যাগী, কলঙ্কিনী বারবণিতার জীবন বরণ করে। প্রৌঢ় বয়সে নিজের পাপক্ষালন করতেই মালতীর কাছে অপরিচিতের মতো আসে। একদিকে অবদমিত অশ্রুসজল মাতৃস্নেহ, আর একদিকে কন্যা মালতীকে তার সংসারজীবনে সবদিকের নিরাপত্তা, বিশ্বাস দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। সমগ্র গল্পে প্রভাতকুমার মালতী ও গিরীন্দ্রের কাছে শুধু নয়, পাঠকদের কাছেও কাশীবাসিনীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে একটি সার্থক ছোটগল্পের পরিকাঠামোয় এক জীবন্ত বাস্তব নারীর ছবি উপহার দিয়েছেন।

'কাশীবাসিনী' তাই প্রভাতকুমারের একটি সার্থক সৃষ্টি। মালতীর সংসারে প্রথম দিন এসেই কাশীবাসিনী মালতী, ওর স্বামী, মালতীব প্রাক্ বিবাহজীবনের পিত্রালয়, নিজ বাবা-মায়ের, তার বিবাহ বিষয়, ও গিরীন্দ্রের অফিস যাওয়া-আসা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পবিচয় অন্তরঙ্গ গল্পচ্ছলে জেনে নেয। সুকৌশলে মালতীর স্বামীর খবর নেয় :

> ''কত মাইনে পান?'
> 'ত্রিশ টাকা।'
> 'তাছাড়া উপরি আয় আছে?'
> মালতী লজ্জিত হইয়া বলিল, 'কি জানি।'
> কাশীবাসিনী একটু খুশী হইলেন।''

তাঁব মেয়ে যে অভাবে নেই, গিবীন্দ্রের উপরি আয়ের সচ্ছলতায় নিরাপদ জীবনভোগী—মেয়ের প্রতি স্নেহে ও সংসার-সচ্ছলতার খবরে মায়ের দায়িত্বই পালন করে। এইভাবে একে একে নিজের অর্থ দিয়ে মালতীব সংসারের প্রতি তার কর্তব্য গোপনে, কৌশলে পালন কবে। নিজে বান্না শেখায় মালতীকে। জামাইয়ের সংসারে নিমন্ত্রণের অতিথিদের সম্মান বাঁচাতে অর্থসাহায্য করে নিজে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। সংসারের সহবৎ শিক্ষায় জলখাবার যে বাড়িতেই তৈরি করতে হয়, সেসবও নিপুণ গৃহিণীর স্বভাবে প্রকারান্তরে মেয়েকেই বুঝিয়ে দেয়। কাশীবাসিনীর মালতীর সংসারে আসার পর সমস্তরকম তৎপবতার লক্ষ্য মেয়ে মালতীর জীবনকে সুখী করা! অর্থাৎ ষষ্ঠ

পরিচ্ছেদের আগে পর্যন্ত জামাই গিরীন্দ্রের এক অপরিচিত প্রৌঢ়ার আগমনে আচরণে অস্বস্তি দেখা দিলেও কাশীবাসিনী তাকে আমল না দিয়ে মেয়ের প্রতি গভীর স্নেহে সম্পূর্ণ অন্য এক মাতৃমূর্তির প্রতীক হয়ে ওঠেন।

গল্পের সর্বশেষ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেই কাশীবাসিনীর যথার্থ স্বরূপ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় পাঠকদের কাছে। গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও কাশীবাসিনীর ভূমিকা সূক্ষ্ম শিল্পের মাটি পায়। প্রথম কথা, কাশীবাসিনী মালতীর নতুন কোয়ার্টার্সে এসে প্রমাণ করে, ১. সে মালতীর গহনা চুরি করেনি। ২. কাশীবাসিনীরও যে এক ধরনের মায়ের মতো চরিত্রাভিমান আছে নিগূঢ় স্বভাবে, তা-ও প্রত্যক্ষ করে মালতী : 'মালতী লক্ষ্য করিল, কাশীবাসিনীর মুখখানা যেন বড় গম্ভীর—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ছলছল করিয়া ওঠে।' সর্বশেষে কাশীবাসিনী মালতীকে তার সমস্ত সঞ্চিত অতি মূল্যবান গহনাগুলি দেওয়ার প্রস্তাব দেয় : কারণ, ১. হারানো গহনার জন্য ব্যথিত চিত্তে মালতীকে সাহায্যের স্বরূপে উপহার দান, ২. এই দান কাশীবাসিনীর আত্মপ্রসাদও ও আত্মমুক্তির এক স্বতঃস্ফূর্ত উপহার।

কাশীবাসিনীর দিক থেকে সমগ্র গল্পে রহস্যময় উপস্থিতি এবং সর্বশেষে আগমন যে সম্পূর্ণ পরিকল্পিত, তা মালতী কোন অধিকারে গহনা নেবে, প্রশ্নের উত্তরে প্রৌঢ়ার মন্তব্য : 'তা বলব, তা বলতেই আজ এসেছি।' —এমন সংলাপেই বোঝা যায় কাশীবাসিনীর উক্তি : 'আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা।'—এই উক্তিটিই গল্পের 'ক্লাইম্যাক্স'। গহনা হারানো তথা চুরির প্রসঙ্গটি ঘটনার ক্লাইম্যাক্স যদি বলি, প্রৌঢ়ার মন্তব্যটি হল গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রধান সূত্রচিহ্নিত ক্লাইম্যাক্স—যা সমগ্র গল্পে একমাত্র প্রৌঢ়াকেই গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের শীর্ষে বসায়। কাশীবাসিনী যখন মেয়ে মালতীর সামনে কান্নাক্রান্ত কণ্ঠে বলে : 'আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে?' তখন সর্বকালের সন্তানহারা মা-দের করুণকণ্ঠ যেনবা 'লিরিক ক্রাই'-এর মতো প্রৌঢ়ার স্বরে বেজে ওঠে। প্রভাতকুমারের কাশীবাসিনী এক কলঙ্কিনী মায়ের প্রতিনিধি হয়ে সর্বকালের আত্মক্ষয়ে বিধ্বস্ত পর্যুদস্ত মা-দের স্বরই শোনায়।

কাশীবাসিনীর সর্বশেষ চিত্র চরিত্র-অভিজ্ঞতায় ও শিল্পশ্রীতে অনবদ্য। চরিত্রটির দ্বান্দ্বিক মনোভূমি পরিণামে সার্থক ছোটগল্পের বড় দিক দেখায়।

> "কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, 'যা ভাবছো তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চোদ্দ বছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর, এর একখানিও পাপের অর্জন নয়। আমি মস্ত বড় মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোননি?..... যদি তিনি (স্বামী) তোমায় পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও'।"

এই যে স্বতঃস্ফূর্ত confession, তা কাশীবাসিনীকে চিরন্তন মায়ের মূর্তির ব্যঞ্জনা দিয়ে এক আত্মশুদ্ধির শুভ্রতা, পবিত্রতা আনে চরিত্রটির ভিতরে। চৌদ্দ বছরের পাপজনিত অনুশোচনা—একমাত্র সহজ সরল নিষ্পাপ মায়ের কাছে নতুন করে জন্ম

নেওয়া এই উদ্ধৃতিই কাশীবাসিনীর আলোকার্থী পুনরুত্থান যেন! কাশীবাসিনী বেশ্যার খোলস 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' স্বভাবে মুক্ত হয়ে, অবলীলায় মালতী আদৌ গহনাগুলি না নিলে, দেবসেবায় দিতে বলে। অর্থাৎ কাশীবাসিনীর সুগভীর সুনিবিড় কন্যাপ্রীতি হল মর্ত্যজীবনের মানবিক বাস্তবতার বিকল্পে দেবতার অনুধ্যান-মুক্ত আধ্যাত্মিক স্বভাবতুল্য। গহনা, হয় কন্যা নেবে, না হলে, ফেরত নয়, দেবসেবায় যাবে। কাশীবাসিনীর বর্তমান কন্যাপ্রীতি, কন্যার প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ, মানবিকতার শুদ্ধ স্বভাব ঈশ্বরে আত্মসমর্পণেরই সমতুল। এই বোধের জগতে উন্নীত হয়ে কাশীবাসিনী এক পরম ও চরম অধ্যাত্মশীলিত আলোকময় জগতের চিরন্তন নারী তথা মা হয়ে ওঠে। এই জগতে tragedy নেই, আছে চিন্তাভাবনা থেকে মনন থেকে উঠে আস৷ pathos—যা বিষণ্ণ আলোয় গল্পে বরং শিল্পের কমল হীরের আলো ফেলে। কাশীবাসিনী বাস্তবিকই প্রভাতকুমারের যথার্থ শিল্পসফল এক উপমার সহায়তায় শমীবৃক্ষের শমীবহ্নি!

'কাশীবাসিনী' গল্পে প্রৌঢ়া মা এক চিরন্তন ধিকিধিকি জ্বলা অঙ্গারের স্তূপ, মালতী আর এক অঙ্গারের জ্বলন্ত ছবি। কাশীবাসিনী শেষ বিদায় নিয়ে আর কোনোদিন যে ফিরবে না, মেয়েকে মুখ দেখাবে না, এমন দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হওয়ার মধ্যে তার আভাস রেখে চলে যায়। 'মা কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া দ্রুত গৃহ হই'তে বাহির হইয়া গেলেন।' মালতীও কোনোদিন আর মাকে পেয়েও পাবে না, তার ছবি হয়ে থাকে শেষে। 'মা আবার দেখা দিও—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।' এই কান্না ও আকুলতা এবং আর্তির মধ্যে সেই হতাশার বিস্বন।

গল্পটির শুরু থেকেই মালতী এক অতি উল্লেখযোগ্য বাস্তব চরিত্র রূপে অঙ্কিত। মালতী এক সরল নিষ্পাপ অতিথিপরায়ণ, সেকালের নিঃসঙ্গ বধূ। সে অবলীলায় বিশ্বাস করে সদ্য আগন্তুক একেবারে অপরিচিত বিধবাবেশিনী কাশীবাসিনীকে। হয়তো সে সময়ের সমাজে এমনই অতিথিপ্রীতি ছিল। একালের নাগরিক বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধি-বিবেচনা বাড়ির মেয়ে ও বধূদের ছিল না। আবেগসর্বস্ব জীবন তাদের, তাই কাশীবাসিনীকে দেখামাত্রই তার কথাকেই বিশ্বাস করে প্রীতিরসে সিক্ত হৃদয়ে বলে : 'হাত পা ধুয়ে ফেলুন।..... খাওয়া- দাওয়া হয়নি বোধ হয়?' একটু পরে কাশীবাসিনীর সঙ্গে সামান্য আলাপের মধ্যে মালতীর মনের আর এক অন্ধকার দিক চকিত আলোয় স্পষ্ট হয়।

> "তোমার মা, বাপ সবাই আছেন?'
>
> মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিল,'....মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের'।"

এর পরেই মালতী এসে উনুন ধরাতে দেরি দেখে দাইকে ভর্ৎসনা করে। এই ভর্ৎসনা আর কিছুই নয়, নিজের, মায়ের প্রসঙ্গে তার মনে যে গভীর অস্বস্তি, অপমানবোধ তা-ই তার মধ্যে বিরক্তি আনে। দাইকে ভর্ৎসনায় তার ভিতরের ছবি।

কাশীবাসিনী অপরিচিতা আগন্তুক। তার সম্বন্ধে স্বামী গিরীন্দ্রের একাধিক মন্তব্যেব প্রতিক্রিয়া তার সরলতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও অসহায়তার প্রমাণ দেয়। বিধবার প্রতি সন্দেহ, সে কবে যাবে ফিরে, 'একলা মেয়ে মানুষ—কি রকম বিধবা' —এমন সব

অপরিচিত অতিথি সম্পর্কে মন্তব্যে মালতীর বিষণ্ণতা সারল্য ও অন্তরঙ্গ অতিথি-পরায়ণতার পরোক্ষ অভিজ্ঞান হয়। গহনার বাক্স চুরি হওয়া সন্দেহে গিরীন্দ্রের যাবতীয় ইঙ্গিত মালতীর কাশীবাসিনীর ওপর গভীর বিশ্বাস ও ভদ্রতাবোধকে আহত করলেও তাকে তার নিজের জায়গা থেকে সরাতে পারেনি। গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে ওদের নতুন কোয়ার্টারে কাশীবাসিনীর নিজে থেকে ফিরে আসার পর কাশীবাসিনীর কাছে মালতীর নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তার স্বীকৃতি : 'আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয়নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি?'

মালতীর নিষ্পাপ সারল্যের ভালো প্রমাণ, সে একেবারে অপরিচিত বিধবা কাশীবাসিনীকে নিজের গহনার বাক্স দেখায়। সে অবশ্যই এক উদার হৃদয়ের স্ত্রী। স্বামী মদ্যপান করে, তাতে তার বাধা বা আপত্তি থাকে না : 'দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু মালতীর সেটা সহিয়া গিয়াছিল।' তবে মদ খাওয়া নিয়ে স্বামীর কাছে প্রতিবাদী অভিযোগ জানাতে মালতী যথার্থ স্ত্রীর ভূমিকা নেয় : 'আমি কি করব? মদেই তোমার সর্বনাশ করলে। সে সময় ত জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল দাও টাকা দাও টাকা বল।' মালতী যে সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞা নয়, তার প্রমাণ আছে গিরীন্দ্রকে তার মা সম্পর্কে সমস্ত কথা গোপন রাখার প্রয়াসে। মালতী জানত তার মার স্মৃতি সংসারে ঘৃণিত, মা তার 'কলঙ্কিনী'—মোক্ষদা ঠান্‌দির কথা থেকে; কিন্তু সেসব গিরীন্দ্রকে যে আদৌ বলেনি,ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মায়ের কাছে তা স্বীকার করে।

এমন মালতীকে গল্পকার প্রভাতকুমার অনবদ্য করে এনেছেন সর্বশেষ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। এখানে সে তার মায়ের সমান শিল্প-স্তরে উন্নীত ব্যক্তিত্ব। মায়ের 'সাইকোলজি' ও মালতীর দ্বন্দ্ব সুস্থিত শিল্পমানে প্রায় সমান স্তরে চলে আসে। অর্থাৎ দুই নারী নিখুঁত শিল্পপ্রাণের যোগ্য প্রতিনিধি! মালতীকে অনেকবার রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের ফাঁসিকাঠে মৃত্যুর আগে মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার ছায়ারূপে বাসনার আর এক চন্দরা চরিত্র মনে হয়। চন্দরার অতীত জীবন-বিড়ম্বনার অভিমান ও অপমান শেষে মাকে দেখার বাসনায় নতুন তাৎপর্য পায়। মালতীর জন্মসূত্রে মাকে দেখতে চাওয়ার নৈতিক বাসনাও বিড়ম্বিত জীবন স্বভাবকে সত্য করে। মায়ের জন্য, মা কলঙ্কিনী এ কথা গোপনে জেনেও যে মাকে দেখার পবিত্র আগ্রহ, তা চন্দরার মাকে একবার দেখার মতো জীবনাগ্রহের সঙ্গে সমমূল্য পায়।

> "কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মা কি সত্যি মরেছে?'
> মালতী থতমত খাইয়া বলিল, 'কেন?'
> 'তাই জিজ্ঞাসা করি।'
> 'সবাই ত বলে।'
> 'তা হলে তুমি জান! আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা'....."

মালতীর কাছে ওর মায়ের স্মৃতি পবিত্রতম এবং সেই স্মৃতি মালতীর মনের গভীরে ছিল যখের ধনের মতো। কিন্তু সামনেই সে যাকে দেখে—সে মা সমাজে স্খলিতা, মালতীর কাছে অস্পৃশ্যের মতো। তার মধ্যে তীব্রতম দ্বন্দ্বেই এক শিহরনে অজ্ঞাতসারে

একটু দূরে সরে বসে! কিন্তু মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার মধ্যে মালতীর এক দ্বিধাদীপ্ত নস্ট্যাল্‌জিক চিত্র এঁকেছেন গল্পকার :

> "....তুমি হঠাৎ এসে পড়নি, জেনেশুনে এসেছিলে? কেন?'
>
> মালতীর স্বর এখন কঠোর।
>
> কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে?'
>
> '......কেন তুমি জানালে তুমি কে?'
>
> 'কি জানি। থাকতে পারলাম না।'
>
> মালতী আবেগভরে একবার বলিতে যাইতেছিল—জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে মাকে ত কখনো চক্ষে দেখিতে পাইতাম না!
>
> কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, 'এ মা! নাই দেখতাম।"

এই যে মালতীর অভিমান-হত দ্বান্দ্বিক মনোভূমি, এখানেই এক চিরন্তন নারীসত্তার প্রবল ধর্ম চিত্র হয়ে ওঠে। মালতী কলঙ্কিনী মায়ের দেওয়া গহনা অচ্ছুৎ ভেবে নিতে অস্বীকার করে, অথচ তার আকুল আবেদন—'মা আবার দেখা দিও'—এর মধ্যে তার জন্মদাত্রীর সঙ্গে চিরন্তন মানবিক যোগসূত্রকে ছিন্ন করতে হয় নির্মম অনীহ। গল্পের শেষতম চিত্র বোঝায়, ভবিষ্যতে আর মা-মেয়ের যোগ ঘটবে না। এই যে বিষণ্ণ পরিণতিচিত্র তা গভীরতম আবেগধর্মে হয় 'প্যাথেটিক'!

গল্পের স্বামী গিরীন্দ্রনাথ আর এক বাস্তব চরিত্র। লঘুরসের প্রচলিত এক প্রবচনে একটি কথা মেলে, 'জাতে মাতাল তালে ঠিক।' গিরীন্দ্র সম্পর্কে এই প্রবচনটি সুন্দর প্রযুক্ত হতে পারে। অবিবাহিত গিরীন্দ্র চাকরিতে ঢোকার পর বছর দশেক মদ্যপান ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে যথেচ্ছাচার জীবন কাটায়। বছর দুই চরিত্র বদলানোর পর সম্প্রতি সে বিবাহ করে। মালতীর স্বামী হিসেবে 'কাশীবাসিনী' গল্পে তার ভূমিকা গল্পের প্রেক্ষিতে শিল্পের যথাযথতা বজায় রাখার নিশ্চিত সহায়ক। সে মদ্যপান ছাড়েনি, তবে স্ত্রীর কাছে সেই অভ্যাস হয়েছে সহনশীল। আর এই অভ্যাসই সম্পূর্ণ অপরিচিত কাশীবাসিনীর অতিথি হয়ে থাকার বিষয়টিকে ভিন্ন বিশ্বাস্য মাত্রা দেয়।

গিরীন্দ্র সঠিক সংসারী, আবার মাতালরা যা হয়, মদ পান না করার কালে মনের দিক থেকে উদাম ও উদার, সে বৈশিষ্ট্য সমগ্র গল্পে গিরীন্দ্রের চরিত্রকে নতুন মাত্রা দেয়। গিরীন্দ্রের কৌতুকরসবোধ আছে। মালতীর কাছ থেকে আগন্তুক বিধবা প্রৌঢ়া কাশীবাসিনীর বয়স অনুমানে ত্রিশ-চল্লিশ শুনে সকৌতুকে বলে : 'ত্রিশ আর চল্লিশে কত তফাৎ, নিজের ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না।' কাশীবাসিনীর আসার খবরে বিরক্ত গিরীন্দ্রের 'এত লোক থাকতে আমার বাড়িই কেন এল?' 'কাশী থেকে—একলা মেয়েমানুষ—কি রকম বিধবা', 'কখন যাবে বলেছে?', গিরীন্দ্রের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, 'রাত একটার সময় আবার গাড়ি', 'এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল'—এইসব মন্তব্যে একজন গৃহী মানুষের স্বভাব ধরা পড়ে। বিধবার আসার দিনই তার আগমনকে এমন সব কথায় গিরীন্দ্রকে কিছুটা রুক্ষ, রসকষহীন অসামাজিক একজন গৃহকর্তাও মনে হয়।

অথচ কাজ থেকে ফিরে মদ্যপানের পর রাতে গিরীন্দ্রের অন্য মেজাজ। কাশীবাসিনীকে নিজেই প্রস্তাব দেয় পরের দিন বেলা তিনটের গাড়িতে যাওয়ার, শীতার্ত বিধবার কষ্টের কথায় সমবেদনা জানায়। এই যে বদল, তা তার চরিত্রে অন্য এক ডাইমেনশান আনে—যা গল্পের প্রেক্ষিত ও চরিত্রে রহস্যের শিল্পমান দেয়। গিরীন্দ্র যে দুপুরে কুলি পাঠাতে বলেছিল বিধবার যাওয়ার জন্য, তা ভুলে যায়। সে কাশীবাসিনীকে সন্দেহ করে মালতীকে সতর্ক থাকতে বলে, কারণ অপরিচিত মহিলা কিছু নিয়ে যেতে পারে! বিধবা যে সন্দেহের মহিলা হতে পারে গিরীন্দ্রই সে বিষয়ে বার বার সাবধান করে। গহনার বাক্স চুরির সন্দেহের তির গিরীন্দ্র বিধবার দিকে ঠিকমতোই স্থির রাখে। অফিসের বন্ধুদের খাওয়ানোর নিমন্ত্রণে বিধবার তৎপরতায় বিধবা সম্পর্কে গিরীন্দ্রের কথা: 'দেখ ইনি একজন খলিফা লোক। কাশীতে শুধু ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।' গিরীন্দ্র ভদ্র ও বিনয়ী হতে জানে। বিধবাটিকে মা সম্বোধনে প্রণামও করে। আবার গহনার জন্য পুলিশে ডায়েরি করেও উপরি আয়ের খুশি ও আনন্দে তার প্রসঙ্গ ভুলেও যায়।

শেষ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গিরীন্দ্র অনুপস্থিত। আসলে গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা বিধবা ও তার মেয়ে মালতীর মধ্যেকার মানসিক ও আত্মিক যাবতীয় সংকটের মীমাংসাই। সেখানে গিরীন্দ্রের ভূমিকা প্রয়োজনহীন। গল্পে গিরীন্দ্রের ভূমিকা কয়েকটি দিক থেকে বিশিষ্ট : ১. গিরীন্দ্রের মদ্যপানের অভ্যাস তাকে গল্পের প্রয়োজনে যথেষ্ট ভারসাম্য দিয়েছে। গিরীন্দ্রের মেজাজ শৌখিন—মদ খেয়ে মুখে পান ও হাতে বিলাসের লাঠি নিয়ে তার যে মদ্যপের চিত্র, তাকে প্রয়োজনে কিছুটা সংসার-নিরাসক্ত করে। ২. মদ্যপান করে গিরীন্দ্র স্ত্রীকে গভীর ভালবাসা জানায়—'দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।' স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অবশ্যই আদর্শগত (Ideal)। ৩. গিরীন্দ্রের মদ্যপান না করে বিধবাকে সন্দেহ, মদ্যপানের পর বিধবার প্রতি কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব পালন—গল্পের মূল রহস্যকে যুক্তিনিষ্ঠ করে। ৪. বার বার বিধবাটিকে সন্দেহ ও গহনার বাক্স হারানো নিয়ে নানান সংলাপ গল্পের মূল লক্ষ্যটিকে সঠিক ভিত্তি দেয়। ৫. নিমন্ত্রিতদের যথেষ্ট খুশি করায় প্রয়োজনীয় টাকা ঋণ দেওয়ায় গিরীন্দ্র খুশি হয়। তার টাকা শোধ করতে তাড়িঘাটে কদিন থাকতে বলে। এই মানসিকতায় প্রমাণ হয়, গিরীন্দ্র একজন দোষে-গুণে সে সময়ের উপযুক্ত প্রবাসী বাঙালি সংসারী। ৬. গল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত কাশীবাসিনীর আগমনে যে গভীর রহস্য অপরিচয়ের suspence ক্রমশ ঘন হয়, দানা বেঁধে ওঠে, পাঠকদের রুদ্ধশ্বাস টান টান করে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত, গিরীন্দ্রের সেক্ষেত্রে নিরলস ভূমিকা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ও বাড়তি চমৎকারিত্ব আনে।

চার

'কাশীবাসিনী' গল্পের মূল ভাবকেন্দ্রটির শিল্পসম্মত গতিময়তা (dynamicity) কলঙ্কিনী কাশীবাসিনীর মাতৃহৃদয়ের উদ্বেলতা ও তার কন্যা মালতীর হারানো মায়ের কাছে আসার নানান দ্বন্দ্বদ্বিধায় এবং পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। গল্পের চলমান ভাবটির সংকট-মুহূর্ত দুটি দিক থেকে লক্ষণীয়। ১. গল্পের কাহিনীআশ্রয়ী প্লটে সেই মুহূর্ত আসে

মালতীর গহনার বাক্স হারানোর মধ্য দিয়ে; ২. অন্যদিকে মূল গল্পের ভাবকেন্দ্রে জড়িয়ে ওই সংকট আসে বিধবা ও তার মেয়ের সম্পর্কের মাধ্যমে। কাশীবাসিনীর নিজেকে মালতীর মা হিসেবে প্রকাশ করার মুহূর্তটিই গল্পের প্রধান চাবিকাঠি। কাহিনী, ঘটনা নয়, চরিত্রই সেখানে প্রধান দায়িত্ব পায়। গল্পে ভাবের অতিশায়িতা নেই। বর্ণনায় গিরীন্দ্রের কাহিনী প্রথম সূচনায় আর একটু সংক্ষিপ্ত হতে পারত।

গল্পটি আদ্যন্ত সাধুরীতিতে লেখা, সংলাপ চলিতে, কোথাও কোথাও কথ্যরীতির অনুগ। গিরীন্দ্রের কোনো কোনো সংলাপে মেলে বিধবা কাশীবাসিনীর উদ্দেশে 'মাগী' শব্দের প্রয়োগ। বাংলা বিশেষণ আঞ্চলিক প্রয়োগে কথ্য স্বভাবে 'মাগ' ও 'ভাতার' শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেখানে তার অর্থ যথাক্রমে বউ ও স্বামী। 'মাগী' শব্দ বয়স্কা রমণীদের বলা হত সেকালে। এর বিপরীতে 'মিন্‌সে', অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষ। 'মাগী' শব্দটি কখনো কখনো অবহেলায়, তুচ্ছার্থে, শ্লেষেও ব্যবহৃত হয়েছে। গিরীন্দ্রের মুখে এই শব্দ সেই তাৎপর্যে ভাবতে হয়।

প্রভাতকুমারের গল্পে সাধারণভাবে কৌতুকরস, লঘুরসের প্রাধান্য স্বীকৃত। এই গল্পে বুড়ি দাই ভজুয়ার মার বর্ণনা ও আচরণ সম্পর্কে প্রভাতকুমার কিছু লঘুরসের প্রমাণ রেখেছেন। গিরীন্দ্রের মালতীর কথায় হাস্যরস এবং মালতীকে আদর করার পিছনে ছায়ার মতো কিছু কৌতুক পাঠকদের খুশি করতে পারে। গল্পের গদ্যে মেলে সংক্ষিপ্ততা, সংলাপে আছে ত্বরিত স্বভাব। মালতী ও বিধবা মায়ের ভাবনায় ও সংলাপ ব্যবহারে মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনার চিত্র গল্পকারের গদ্যরীতির চমৎকারিত্ব বুঝিয়ে দেয়।

পাঁচ

গল্পের নাম 'কাশীবাসিনী'। সাধারণ অর্থে গল্পটির একটি প্রধান চরিত্রকে ধরে এমন নাম হওয়ায় নাম রাখার রীতি সাধারণ সূত্রে চরিত্রাত্মক। কিন্তু কেবলমাত্র চরিত্র ধরে এই গল্প-নামের বিচার করলে যে বিভ্রান্তি আসে পাঠকদের মনে, তাতে গল্প-নামটিকে নিয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। তাতে গল্পের চরিত্র-নাম দুটি ভিন্ন তাৎপর্যে দ্বিখণ্ডিত ব্যাখ্যার ভিত পায়। 'কাশীবাসিনী' শব্দটি কোনো বিশেষ চরিত্রের নাম হতেই পারে না। ১. মানুষটি যেখানে বসবাস করে সেই স্থাননামের সঙ্গে ব্যক্তির তার জীবনযাপনের অভ্যাস যুক্ত করে একটি দ্বিতীয় নাম প্রাধান্য পেতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তির নাম না বলে যদি তার পদবি ধরে 'বাবু' শব্দ যুক্ত করে তাকে ডাকা হয়, তাতে আসল নাম ঢাকা পড়ে। কাশীবাসিনী সেইরকম এক বিধবা প্রৌঢ়ার বসবাসের জীবনসূত্র ধরে এক সম্বোধনসূচক নাম। আসল নাম অবহেলিত। ২. আর একটি নাম-তাৎপর্য যা আসল নামকে গোপন করে। আসল নামের ওপরে বসবাসকারীর বিশেষ কোনো স্থাননামের অধিবাসী—এই ব্যাখ্যায় ও ধর্মে আরোপ করে ব্যক্তিনামের আর একটি নির্মোক রচনা করা হয়।

এই দুই তাৎপর্যে কাশীবাসিনী নাম হয় রূপকধর্মী। যে কোনো ব্যঞ্জনাহীন আরোপধর্মে রূপকের তাৎপর্য না থাকতে পারে, কিন্তু আড়াল স্বভাবটি সার্থক হয়। 'কাশীবাসিনী'

গল্পে যে নারীকে দেখানো হয়েছে, তার আসল নাম গল্পকার কোথাও উল্লেখ করেননি, প্রয়োজনও হয়নি। তীর্থ করে আসা মোক্ষদা ঠানদির নাম মালতী জানে, কিন্তু মায়ের নাম তার কাছেও অজ্ঞাত। গল্পের মধ্যে 'কাশীবাসিনী' যখন মালতীকে বলে : 'তোমার নাম কি বাছা?' মালতীর উত্তর, 'আমার নাম মালতী'। কিন্তু মালতী একবারও কাশীবাসিনীর নাম জিজ্ঞেস করেনি। কারণ দু'টি—১. সেকালে কোনো প্রৌঢ় মহিলার নাম, বিশেষ করে অপরিচিতার নাম জিজ্ঞেস করা সৌজন্যমূলক এবং প্রয়োজনীয় ছিল না। ২.কাশীবাসিনীর আলাদা নাম রাখার ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন প্রভাতকুমার। কারণ মালতীর মাকে ওদের সংসারে নিয়ে আসার অন্য উদ্দেশ্য ছিল, যা গল্পের শেষে মেলে। তাই গোড়াতেই কাশীবাসিনীর নাম ধরে গল্প এগোত না, শেষের চমক নষ্ট হয়ে যেত। রহস্য গোপনতায় ব্যঞ্জনা পেত না।

তাই গল্পের নাম 'কাশীবাসিনী' গল্পশিল্পের সূত্রে যথার্থ।

প্রথমত, কাশীবাসিনী প্রৌঢ়া বিধবা এবং শেষ বয়সে তীর্থক্ষেত্র কাশীধামে বসবাস তার শেষ জীবনের আচার-আচরণের বিশুদ্ধিকে দেখিয়ে দেয়। কাশীবাসের জীবনে মালতীর মায়ের ছিল ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন। 'ভাত চড়াতে হবে না—আজ একাদশী' মালতীর কাছে এই সরল অকপট স্বীকৃতিতে তার প্রমাণ মেলে। তার ওপর কাশীবাসিনী জানায় : 'আমি আড়াইটের গাড়িতে ফিরব। আমাদের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছে। কাল আমরা সবাই রওনা হব।' এই যে কাশীবাসিনীর সংসার জীবন-পরিবেশ থেকে আরও অনেক দূরে যাওয়ার স্বীকৃতি, এতে চরিত্রটির সব কিছু ছেড়ে উদাসীন হওয়া—তা গল্পের মূল প্রতিপাদ্যেরই প্রাক্-নির্দেশ!

দ্বিতীয়ত, 'কাশীবাসিনী' নামটি গল্পকার এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে গল্পের নামের উদ্দেশ্য এবং গল্পকারের চরিত্রটিকে গোপন করার লক্ষ্য চমৎকার মিলে যায়। মালতীর ও গিরীন্দ্রের কাছ থেকে চরিত্রটিকে রহস্যময় করে রাখার জন্যই আসল নাম নয়, স্থাননামের সঙ্গে যোগে নাম ব্যবহার করেছেন আদ্যন্ত। শেষেও তার আসল নাম দরকার পড়েনি।

তৃতীয়ত, 'কাশীবাসিনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মালতীর মা—যে কাশীবাসিনী নামেই আগাগোড়া গিরীন ও মালতীর কাছে এবং পাঠকদের কাছে পরিচিত। গল্পের প্রথমে কাশীবাসিনীর প্রবেশ, সব শেষে তারই কন্যাকে আশীর্বাদ করতে করতে দ্রুত মালতীর কোয়ার্টার্স থেকে প্রস্থান। গল্পের মূল বক্তব্য কাশীবাসিনীর মনোভঙ্গির সঙ্গে নিবিড় যুক্ত। মনে হতে পারে মালতীর মাতৃ-সান্নিধ্য-আকাঙ্ক্ষা ও গোপন আর্তিও গল্পের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু তা গল্পকারের দেখানো প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কাশীবাসিনীর যে নিজ পাপ থেকে মুক্তি আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ক্রমশ বিগত চোদ্দ বছর ধরে দগ্ধ করেছে তাকে, তারই আলেখ্যে মালতীর মাকে চেনা ও মায়ের সান্নিধ্যে বাসনার সংকট মুক্তি—সেসবই সহজভাবে উঠে এসেছে মায়ের সঙ্গে মানসিক সংঘর্ষে! কাশীবাসিনী মেয়ের কাছ থেকে মুক্তি চায়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত চায়, বিষয়-সম্পত্তির ভার থেকে অব্যাহতি চায়। তাই মূল্যবান সমস্ত গহনা দিয়েছে মেয়েকে। মেয়ে না নিলে সব দেবসেবায় মানত করে দিতে

চেয়েছে। এই যে মুক্তিবাসনা কাশীবাসিনীর, তা-ই লক্ষ্য গল্পকারের। মালতী তার একমাত্র উপায়। গল্পে কাশীবাসিনী ও মালতীর অন্তর্দাহ তীব্র, কিন্তু মালতীর সংসার-জীবন আরও দীর্ঘদিন ধরে চলবে। প্রৌঢ় বয়সে এসে কাশীবাসিনীর সেই সংসার বাসনা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। সে শেষমেশ শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার মধ্য দিয়ে নিরাসক্ত জীবন-আলিঙ্গনে পাপমুক্তির স্বাদ পেতে চায়। গল্পে কাশীবাসিনী মূল লক্ষ্য, মালতী তার সমস্ত লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নিজ কন্যাকে দেখে, আবার সম্পত্তি থেকে মুক্তির পথও ঠিক করে। তাই কাশীবাসিনী নাম সার্থক ও যথার্থ। গল্পের মূল রসে আছে গভীরতম 'pathos', দেবতার চরণে তা নিঃশেষ। তার সম্পূর্ণ ভাগ ভোগের অধিকারিণী প্রৌঢ়া মা-ই, মালতী যে ভোগের অধিকারী, তা তার pain, এবং eternal pain! মালতী তো পাপ করেনি, তাই সে সম্পূর্ণ মুক্ত গোড়া থেকেই। পাপ করেছে তার মা, তাই তার মুক্তি বেদনার উপশমে নয়, সব কিছু ছেড়ে দেবসেবায় উৎসর্গের বিষণ্ণতায়।

৩.

ফুলের মূল্য

এক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মূল্য' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১২ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় ১৩১৬ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত 'দেশী ও বিলাতী' নামের সংকলনে। গ্রন্থটির প্রকাশকালে প্রভাতকুমার ব্যারিস্টারি কাজে ব্যস্ত ছিলেন গয়ায়। গল্পগ্রন্থটি মোট চোদ্দটি রচনার সংকলন। সংকলিত গল্পগুলি মোট দুটি ভাগে সংকলিত : ১. 'দেশী'—এই ভাগের গল্পসংখ্যা দশ, ২. 'বিলাতী'-এর গল্পসংখ্যা মোট চার। বিষয় ও পরিবেশ ধরে 'ফুলের মূল্য' গল্পটি গ্রন্থের 'বিলাতী' ভাগে সন্নিবেশিত। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বলা হয়, 'শেষোক্ত চারটি গল্প বঙ্গসাহিত্যে নূতন সামগ্রী। বিলাতী গল্পগুলিতে আমাদের যুবকগণ বিলাতে গিয়া কিভাবে জীবনযাপন করেন তাহা জানিতে পারিবেন।' 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর এর সমালোচনা বেরোয় সেকালে 'প্রবাসী'র ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। সমালোচক গ্রন্থটির মধ্যে প্রভাতকুমারের সামগ্রিক শিল্প-কৃতিত্বের কথায় বলেন : '.....আর্টে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবিবাবু শ্রেষ্ঠ; তারপরই প্রভাতবাবু একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহার ভাষা প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে মধুর থাকে, ঘটনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য থাকে এবং উপসংহারে একটি অখণ্ডতা ও জমাটের ভাব দেখা যায়। সবচেয়ে সুন্দর তাঁহার নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি—তিনি জানা কথাই নূতন করিয়া বলিয়া প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেন। বর্তমান গ্রন্থে এই সকল গুণগুলিই আছে; অধিকন্তু রচনা অধিক পরিপক্ক হইয়াছে।'

সমালোচক যে সমস্ত গুণের কথা বলেছেন 'দেশী ও বিলাতী' নামের গ্রন্থটির গল্পগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে, তাতে অবশ্যই 'ফুলের মূল্যে'র শিল্পমানের দিকও কিছুটা আলোচ্য হতে পারে। আমাদের মতে, 'ফুলের মূল্য' অবশ্যই শিল্পের মানে একটি দুর্বল

রচনা। 'ফুলের মূল্য' গল্পটির কথক সাময়িকভাবে চাকরিসূত্রে লন্ডনপ্রবাসী পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিসের এক মিঃ গুপ্ত। উত্তমপুরুষ এই কথক এক শনিবার লন্ডনের সেন্ট মার্টিন্স লেনের একটি হোটেলে লাঞ্চ খেতে ঢোকে। সেখানে তেরো-চোদ্দ বছরের এক বালিকাকেও ভোজনরত অবস্থায় দেখে। তার পোশাক দেখে বোঝে বালিকা দরিদ্র পরিবারের। মেয়েটি ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। মিঃ গুপ্ত জানতে পারে মেয়েটি একটি দোকানে কাজ করে। তার কাজ সিভিল সার্ভিস স্টোর্সে টাইপরাইটারের।

ভারতবর্ষীয় সম্পর্কে তার ঔৎসুক্যের কারণে মিঃ গুপ্ত পরের শনিবার সেই হোটেলে মেয়েটিকে দেখে আলাপ করে। মেয়েটি রীতিমতো দরিদ্র ও বিষণ্ণ হওয়ায় মিঃ গুপ্তও আলাপ করতে উৎসুক ছিল। এমন একটি বালিকাকে সাধ্যমতো সাহায্য করার কথাও মনে মনে ভাবে। মেয়েটি ক্রমশ জানায়, তার দাদা ভারতে গেছে সেনাবাহিনীর কাজ নিয়ে। সে ও তার মা পুরুষ অভিভাবকহীন। ল্যাম্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মায়ের কাছে থাকে। অনেকদিন দাদার পত্র আসেনি। তাই মা চিন্তিত দাদার অমঙ্গলের কথা ভেবে। মেয়েটির ধারণা ভারতের লোকেরা বেশির ভাগই নিরামিষ ভোজন করে। সেখানে সাপ, বাঘ ও জ্বর রোগের বেশি প্রভাব। মায়ের কথাতেই কোনো একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে এসব জানতে উৎসুক।

মিঃ গুপ্ত ক্রমশ জানতে পারে বালিকার নাম ম্যাগি—আসল নাম অ্যারিস মার্গারেট ক্লিফর্ড। ম্যাগির ইচ্ছা, স্টোর্সের যান্ত্রিক কাজ ছেড়ে বুদ্ধিনির্ভর সেক্রেটারির কাজ করা। মেয়েটির অদ্ভুত সব ধারণা, যেমন, ভারতীয় যোগীরা মাংস খায় না। প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দিন ম্যাগির সঙ্গে মিঃ গুপ্ত ওদের বাড়ি আসে। মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। মা মিঃ গুপ্তকে নিজের হাতে তৈরি কেক খাইয়ে আপ্যায়িত করে। মিঃ গুপ্তর কাছ থেকে ভারতবর্ষ বিষয়ে বিস্তারিত খবর নেয়। পুত্র ফ্রান্সিস অর্থাৎ ফ্রাঙ্কের ছবি দেখায়। একসময়ে মায়ের কথায় ম্যাগি ফ্রাঙ্ককে দেওয়া এক ভারতীয় যোগীর আংটি দেখায়—যা ভূত- ভবিষ্যৎ বলতে পারে। ম্যাগির দাদা সেই যাদুযুক্ত আংটি মাকে পাঠায়।

আংটিটি দেখে মিঃ গুপ্তের Crystal gazing নামে এক বিষয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আসলে আংটিটি নিছক পিতলের তৈরি এবং এক টুকরো কাচ মাত্র বসানো। ম্যাগি ও তার মায়ের বিশ্বাস—ফ্রাঙ্কের দেওয়া খবর মতো—সংযত মনে এই স্ফটিকের দিকে তাকিয়ে থেকে কেউ যদি কোনো মানুষের বিষয়ে চিন্তা করে, তা হলে সেই ব্যক্তির কিছু দেখতে পাবে। এটা যে নিছক কুসংস্কার তা মিঃ গুপ্ত মা ও মেয়েকে বলেনি। নিজে আংটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু না দেখতে পাওয়ায় মা ও মেয়ে দুঃখ পায়। তারাও কিছু দেখেনি ওর মধ্যে আগে। ক্রমশ মিঃ গুপ্ত ওদের দারিদ্র্যের চরম দিক স্পষ্ট উপলব্ধি করে। ইংরেজ কিশোরী হয়েও মেয়েটি 'এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর নাম শোনেনি। নিজের চেষ্টায় বেহালা বাজাতে শিখেছে। ম্যাগি ও তার বৃদ্ধা মাকে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং-এর লাইসীয়ম থিয়েটার হলে নিয়ে গিয়ে টিকিট কেটে দেখায় মিঃ গুপ্ত।

লন্ডনের একটি অতি দরিদ্র পরিবারের কন্যা ম্যাগি ও মা ক্লিফর্ডদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মিঃ গুপ্তের অনেক অভিজ্ঞতা হয়। ইংরেজ জাতির কালচার, রুচি, সৌন্দর্যপ্রিয়তা,

সৌজন্যবোধ, ভদ্র আচরণ, অল্প অর্থে সংসার চালানোর দক্ষতা, বোনের সৈনিক ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা, মায়ের সন্তানের প্রতি তীব্র স্নেহাকর্ষণ—এসবই মিঃ গুপ্তকে ওই পরিবারের প্রতি গভীর সংবেদনশীল করে তোলে। মিঃ গুপ্ত অত্যন্ত স্পর্শকাতর মানুষ। প্রথম পরিচিত হওয়ার পর থেকে মাসতিনেক পর ম্যাগি মিঃ গুপ্তকে চিঠি লিখে জানায় তার মায়ের অত্যন্ত পীড়িত হওয়ার কথা, পীড়ার কারণ পুত্র ফ্রাঙ্কের বিষয়ে দুশ্চিন্তা। একসময়ে ম্যাগির সনির্বন্ধ অনুরোধে মিথ্যাভাষণ হলেও সেই আংটির সামনে বসে স্থির চিন্তার ভান করে মিঃ গুপ্ত বৃদ্ধা মাকে জানায় পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে। আংটির স্ফটিকে তা ধরা পড়েছে। তাতে মা ক্রমশ আরোগ্যলাভ করে।

কিন্তু মিঃ গুপ্তর লন্ডন থেকে স্বদেশে ফেরার দিন সকালে ম্যাগি আসে মিঃ গুপ্তর কাছে। এর আগে ম্যাগি জানিয়েছিল ওর দাদার মৃত্যুর কথা এবং যখন মিঃ গুপ্ত মিথ্যা স্তোকবাক্য শোনায় আংটির মিথ্যা খবর শুনিয়ে—ফ্রাঙ্ক বেঁচে আছে, তার আগেই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু ঘটেছিল। এতে মিঃ গুপ্ত গভীর লজ্জিত। যাবার দিন ম্যাগি জানায় পাঞ্জাবে দেরা-গাজীখাঁর কাছে ফোর্ট মনরোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি আছে, তাতে যেন ওদের পক্ষ থেকে এক শিলিং ফুল কিনে তা সাজিয়ে দেয়। আর যেন দেশে ফিরে পত্র পায় ওরা। এই সূত্রে গল্পের শেষে উত্তমপুরুষ কথকের বিষাদঘন অশ্রুসজল স্বীকারোক্তি :

> 'ভাবিলাম, এই বহু কষ্টার্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই।......কিন্তু আবার ভাবিলাম। এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া লাভ কি?—এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।'

শেষে মিঃ গুপ্ত বালিকাকে সস্নেহ আদর করে বিদায় দিয়ে নিজেই মেয়েটির প্রতি সমবেদনায় অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

এমন কাহিনীটি সার্থক ছোটগল্পের প্লটে সংক্ষিপ্তি ও সংযমে বিস্তৃত হয়নি। ছোটগল্পের প্লটের যে জটিলতা, টান টান স্বভাব তা না থাকায় গল্পটি হয়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবৃতি ও বর্ণনামূলক। লন্ডন শহরকে বোঝানোর জন্য, বিস্তারিত উপস্থাপনার বাসনায় অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ স্থান পেয়েছে। এই কারণেই বোধ হয়, 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থ—যার মধ্যে 'ফুলের মূল্য' সংকলিত, তার বিজ্ঞাপনে লেখকের উক্তি : 'বিলাতী গল্পগুলিতে আমাদের যুবকগণ বিলাতে গিয়া কিভাবে জীবনযাপন করেন তাহা জানিতে পারিবেন।'

'ফুলের মূল্য' গল্পে ঘটনা নেই, কাহিনীবয়ন যতটা আছে প্রায় সবই অতিশায়িতা দোষে দুষ্ট। ম্যাগির মানসিকতা, দারিদ্র্য, অসহায়তা, সৌজন্য, সীমিত সংস্কৃতিচেতনা—সব মিলিয়ে কাহিনী হয়েছে ভাবমূলক। প্লটের এই ভাবমূলক কাহিনী ধরলে এর একটা চরমক্ষণ (climax) ধরা যায় মা ক্লিফর্ডের সন্তানের চিন্তায় পীড়িত হয়ে বিছানা নেওয়া।

দাদা ফ্রাঙ্কের প্রতি ম্যাগির যে ভালবাসা তার সূত্রে সমাধিতে ফুল দেওয়ার জন্য এক শিলিং দেওয়ার ঘটনায় আছে আর এক চরমক্ষণ ও মিঃ গুপ্তের ভাবনা সূত্রে ব্যঞ্জনা।

আসলে গল্পের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে ছোটগল্পের কোনো দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন, বৈপরীত্য, জট পাকানোয় গতিময়তা (action) নেই। প্রভাতকুমারের বর্ণনায় মনোরম সহজতার টান আছে, সুখপাঠ্যতা আছে, নেই গল্পশিল্পের জটিলতা ও চমৎকারিত্ব। তাই গল্পের শেষে মিঃ গুপ্তের বোধে পরিসমাপ্তি, তা মা বা ম্যাগির চরিত্রনির্ভর স্বাধীন ব্যঞ্জনায় যুক্তিনিষ্ঠ হয়নি, হয়েছে উত্তমপুরুষ কথকের চরিত্রদের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া ক্ষণিক চিরন্তনের কাতরোক্তি। 'ফুলের মূল্য' ভাবমূলক গল্প, হৃদয়ধর্মের গল্প, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া ম্যাগি, ক্লিফর্ড ও মিঃ গুপ্ত সকলকে নিয়ে এক করুণরসের স্থিরচিত্র হয়েছে, সার্থক ছোটগল্প হয়নি।

দুই

'ফুলের মূল্য' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য অবশ্যই 'sentimental'। দাদার প্রতি বোনের অশ্রুসজল ভালোবাসা, প্রবাসী সন্তানের জন্য উপুড়-করা অশ্রুকাতর স্নেহ গল্পটির সেই ভাবাত্মকতার জনক। প্রভাতকুমারের 'ফুলের মূল্য' লেখা হয়েছে ভাদ্র ১৩১১-য়, এই কাছাকাছি সময়ে আগে-পরে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯-এ দানপ্রতিদান, ১৩০১-এ দিদি, ১৩১৮-য় পণরক্ষা ইত্যাদি। এগুলিতে রবীন্দ্রনাথ একদিকে ব্যক্তির অর্থবাসনা ও পাশাপাশি স্বার্থসর্বস্বতা দিয়ে ভাইয়ের প্রতি প্রেম দেখিয়েছেন। ভ্রাতৃপ্রেম অর্থ ও স্বার্থের মিশেলে হয়েছে জটিল। প্লট নিখুঁত এবং ছোটগল্পের যে পরিশীলিত শিল্প-কাঠিন্য, তা গল্পের লাবণ্য হয়ে যায়। প্রভাতকুমার তা করেননি। অবাধ হৃদয়ধর্ম তাই কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে শিল্পের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়ধর্মের জয়গান-রূপ নিয়েছে।

গল্পে কেন্দ্রীয় বক্তব্য ধরে কোনো জীবনাগ্রহের প্রকাশ নেই। গল্পে দারিদ্র্যের ও অসহায়তার কারণে ম্যাগি কাঁদে, কাঁদে তার মা ক্লিফর্ড, আর গল্পের কথকও অশ্রুসজল হয়। কোনো বিরোধ না থাকায়, কোনো দ্বন্দ্ব না থাকায় কেন্দ্রীয় বিষয়টি প্রীতি ও স্নেহরসে, কথকের পরোপকারূ বৃত্তির মধু-স্বভাবে ছোটগল্পের স্থায়ী প্রসঙ্গের ভার হারিয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র ম্যাগি, তার মা এবং মিঃ গুপ্ত একই ধাতুতে গড়া! 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু' এই বাক্যাংশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে গল্পের লক্ষ্যবস্তু একই জায়গায় স্থির থেকে যায়। তাই গল্পের শেষে মিঃ গুপ্তের এক শিলিং-এর ফুল কিনে সমাধিতে দেওয়ার যে যুক্তি দেখিয়েছে, তাতে মূল বিষয় পরিণামে হয়েছে শান্তরসাস্বাদী, তা তিনটি প্রধান চরিত্রকেই জারিত করে, অন্যদিকে 'ফুলের মূল্য' ছোটগল্পের মানুষগুলির যে হৃদয়দহন, তা হয়েছে হৃদয়-রসাল, —যা ব্যঙ্গের, যা বিপরীত ধর্মী সূক্ষ্ম ও তীব্র আবেগের Juxtaposition, তার বিনাশ ঘটেছে শিল্পের দাবিকে পিছনে রেখে।

আসলে যে কোনো ভাবমূলক গল্পেও থাকে সংঘাত, সংকট—বর্তমান গল্পে তা নেই। ম্যাগির ফুল দেওয়ার জন্য এক শিলিং মূল্যকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ গুপ্তের মেনে নেওয়ার যুক্তি, অর্থতাৎপর্যে সঠিক, কিন্তু সমগ্র গল্পের ধীরস্থির গতির শেষ পর্বে একবারও ধাক্কা

দেওয়ার উপযোগী 'সিচুয়েশান' সৃষ্টিতে অক্ষম। ফুলের মূল্য বোঝার ব্যাপারে মিঃ গুপ্তের ব্যাখ্যার সত্য মানতে হলে গল্পের সমস্ত শরীর অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। তাই কেন্দ্রীয় বক্তব্যের বিচ্যুতি শান্তরস তথা প্রীতি ও স্নেহরসের ওপর সম্পূর্ণ আশ্রয়ার্থী হয়ে উঠেছে।

তিন

'ফুলের মূল্য' গল্পের মূল 'tone' চরিত্র-অভিজ্ঞতা নয়, ব্যক্তির স্বভাবের ভাবমূলকতাই। গল্পের উত্তমপুরুষ কথক মিঃ গুপ্ত নিজের সজল অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে ম্যাগি ও তার মাকে দেখেছে। সেখানে চরিত্রকে দেখার যে নিরপেক্ষতা, তা বিনষ্ট। গল্পে চরিত্রগুলি শিল্পের অভিজ্ঞতায় বাস্তব হয়নি। কথাটা এইভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, মিঃ গুপ্ত তো লেখক স্বয়ং নন, তাহলে এত স্নেহরসে মিঃ গুপ্ত সমেত বাকি দুই প্রধান চরিত্র জড়িয়ে থাকে কেন! আসলে প্রভাতকুমারের ব্যক্তিমন দারিদ্র্য, বিষণ্ণতা, অসহায়তা, দাদার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু—এসব ঘটনা দিয়ে মানুষগুলিকে দেখেছে, শিল্পে যখন তাদের কথা লেখক বলছেন, সেই লেখক-মন ব্যক্তিমনকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

প্রথমে ম্যাগির কথাই ধরা যাক। ম্যাগিকে যেভাবে গল্পকার এঁকেছেন, তাতে স্পষ্ট, সে বালিকা, এই বয়সেই কৃচ্ছ্রসাধন করে মায়ের সংসার সামলায়। দরিদ্র, অথচ সংস্কৃত (cultured) মনের মেয়ে, ভদ্র, সজ্জন, দাদার প্রতি ভালোবাসায় আন্তরিক, বৃদ্ধা মায়ের প্রতি মমতাময়ী, অথচ মায়ের সংস্কার থেকে মুক্তমনা আধুনিকা। তার প্রতিদিনের জীবন ও ভাবী জীবন বিষণ্ণতার কালো মেঘে আচ্ছন্ন। এই মেয়ের পাশে মিঃ গুপ্ত তারই মতো অশ্রুসজল হয়। প্রায়শই ম্যাগির অবস্থা দেখে। ম্যাগির সঙ্গে উত্তমপুরুষ কথকের সহমর্মিতা ম্যাগিকে যেমন, তেমনি গুপ্তের নিজেকেও একই সমতলে নিয়ে আসে। ম্যাগির হৃদয়ভাবের প্রকাশ ছাড়া আব কি বাড়তি পরিচয় মেলে!

ম্যাগি প্রায়শই অশ্রুসজল, মিঃ গুপ্তকেও প্রায়ই সে অবস্থায় দেখি। ম্যাগির মা ক্লিফর্ড তো বয়সের মাপে সবসময়েই পুত্রস্নেহে অশ্রুসজল হবে। এত অশ্রুপাত গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে এক যুক্তিহীন বাতাবরণ ধরিয়ে দেয়। অব্যবহিত পরবর্তী লেখক শরৎচন্দ্র তাঁর একাধিক বড় গল্পে, এমনকি 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলা চরিত্রের মাধ্যমে এত বেশি অশ্রুবর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাতে মনে হয়, প্রভাতকুমার তাঁরই যথার্থ পূবসূরি! চরিত্র আঁকতে গিয়ে প্রভাতকুমার ভেসে গেছেন আকুল আবেগে, ভাবপ্রবণতায়, শিল্পের যুক্তিহীন আসক্তির যোগে। ফলে শুধু ম্যাগি নয়, মিঃ গুপ্ত সার্থক ছোটগল্পের চরিত্র হতে পারেনি। যে দর্শক, সে নিজে Involved হয়ে গেছে তার দেখা ম্যাগি ও মা ক্লিফর্ডের মধ্যে।

এই কারণেই ম্যাগি অনেকটা static (স্থিতিপ্রাণ)। প্রথমে ম্যাগিকে যেভাবে দেখি, শেষেও তা-ই। তার গতিপ্রাণতা (dynamicity) মিঃ গুপ্তের হাতে দাদার কবরে ফুল দেওয়ার মধ্যে নেই। এক শিলিং এভাবে খরচ করার বিষয়ে যে অসহায়তা, তা তো মিঃ গুপ্তের ভাষ্য! এই ভাষ্যে ম্যাগি চরিত্রে কোনো নতুন dimension ধরা পড়ে না।

মা ক্লিফর্ড আদর্শ মা। তার মানস বিকাশ যতটুকু গল্পে মেলে, তাতে যা স্বাভাবিক, তা-ই আছে। মিঃ গুপ্ত একটি অন্যতম চরিত্র। তার চোখ দিয়েই তো গল্পটির সমস্ত দৃশ্য,

পরিবেশ, মানুষজন দেখা! তা হলে মানুষগুলির চিত্রণে মিঃ গুপ্তের যে দায়িত্ব থেকে যায়, তা সংসাধিত হয়নি, কারণ, গুপ্তও যেনবা ম্যাগির ছায়া প্রতিবিম্ব। সে ম্যাগির বিকল্প নয়। শুধু ইংল্যান্ড শহর, ম্যাগির দারিদ্র্য ও অসহায়তা দেখার জন্যই তার এমন উদ্যোগ—যদি তা-ই ভাবি, তাতে চরিত্রটির শিল্পগৌরব নষ্ট হয়ে যায়। গল্পের শেষে মিঃ গুপ্তর স্বদেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি কোনো বড় তাৎপর্য আনে না—একমাত্র সাধারণ statement ছাড়া। গুপ্তের ফুল সংক্রান্ত ধারণা ও ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর ব্যাখ্যাটির জন্য তো কিছুটা স্থান পেয়েছে—তা মনে হলে চরিত্র শিল্পন্যায়ে ব্যর্থ প্রমাণ হয়ে যায়।

আসলে 'ফুলের মূল্য' গল্পে প্রভাতকুমার মূলেই ত্রুটি রেখেছেন—তিনটি চরিত্রই একই মানসিকতার মূলগত স্বভাবে। শেষে ম্যাগি চোখের জল ফেলে বিদায় নেয়, আর মিঃ গুপ্তও সর্বশেষ কথাটা বলে, 'চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া বাক্স-তোরঙ্গ গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম।' গল্পকারের বাসনায় 'ফুলের মূল্য' গল্প নয়, হয়েছে করুণ সহমর্মী দুঃখ-দারিদ্র্যের বিষণ্ণতার চিত্র মাত্র, ছোটগল্পের চিত্রানুগ থেকে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনার মতো সেই পাখির ব্যাকুল উড়ে যাওয়ার স্বভাব অনুপস্থিত। চরিত্রগুলি প্রমাণ করে, প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বিষয়ের অনুগত, বিশেষ ভাবের রূপ-ছায়া, কিন্তু বিষয়ে থেকেও বিষয়-অনন্বয়ী সুদূরের চিন্তায় অ-সফল। প্রভাতকুমারের গল্পে স্নেহরস-সিক্ত বস্তু-স্বভাব আছে, শিল্পের বাস্তবতা তার পিছনে আদৌ নেই। প্রভাতকুমার চরিত্র আঁকতে বসে চরিত্রের ব্যক্তিস্বভাবের আড়ালে 'মন'-এ থেকে স্থির হয়েছেন। চোখের নিচেই যে মন, সেখানে তিনি ঠিক, কিন্তু মন ছাড়িয়ে যে স্তরে স্তরে প্রাণ, আত্মার সংকটদ্যুতির মুক্তিশ্বাস মেলে সেখানে যেতে পারেননি। তাঁর গল্প সুখপাঠ্য, মনোরম, কিন্তু জীবন-ভেদী জীবন-গাথা নয়।

চার

'ফুলের মূল্য' যে একটি ভাবমূলক গল্প আগেই তা বলেছি। অবশ্যই গল্পটির ভিতরে পাঠকরা একটি টান অনুভব করেন। তা হল প্রভাতকুমারের গল্প বলার আন্তরিকতা, স্বাচ্ছন্দ্য। বিষয় যেখানে স্নেহরস, প্রীতিময় সত্তার চিত্রণ, সেখানে এই আন্তরিকতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়তি স্বাদ আনে। যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ, এক একটি অসহায় সংসারকে গভীর জলে নিক্ষেপ করে, ম্যাগির দাদার মৃত্যু তার প্রমাণ দেয়। প্রভাতকুমার শেষ পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তার পরিচয় রেখেছেন। সমগ্র গল্পের যে 'ভাবমোক্ষন', তা গল্পে নিবিড় অথচ লেখকের বিশেষ ভাবপ্রবণতার সূত্রে ভালোভাবেই উঠে আসে। এই গল্পের 'ভালোত্বে'র দিক সবচেয়ে সার্থক ভিত পেয়েছে লেখকের বর্ণনার গুণে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, 'ফুলের মূল্য' গল্পের পটভূমি, চরিত্রনাম, লক্ষ্য বদলে ভারতের কোনো অঞ্চলকে ভিত্তি করানোয় কোনো তফাত থাকত না! প্রভাতকুমার লিখেছেন লন্ডনের পটভূমিকায়, তা বাঙালী লেখকের হাতে হয়েছে বাংলাদেশের ও বাঙালি জীবনের গল্প, এই ধারণার মূলেও কাজ করে লেখকের বর্ণনাভঙ্গি, ভাষাস্বভাব, চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত attitude।

গল্পের ভাষায় এখানে-ওখানে মেলে প্রচ্ছন্ন হাস্যরস। ভারতীয়দের যাদুবিদ্যা বিশারদ হওয়া বিষয়ে ম্যাগির কথায় তার প্রমাণ। ভাবপ্রবণতার বিষয় চরিত্রমূলে থাকায় গদ্যও

হয়েছে স্বাদু, সংলাপ বিনিময় হয়েছে আদ্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহলকে জিইয়ে রাখার উপযোগী। ঘটনা যা আছে একেবারেই চরিত্রদের মনোলোক থেকে উৎসমুখ ধরে। মিঃ গুপ্তের ম্যাগিকে পর্যবেক্ষণ ও তার জীবন ধারণ ও যাপনের শক্তির সীমিত রূপের বিস্ময় ও ব্যথা গদ্যের প্রবহমানতায় সচ্ছল। গল্পের মূল গদ্য সাধুরীতির, সংলাপ বিনিময় চলতি। লন্ডনের কোনো কোনো অঞ্চলের ঈষৎ বিস্তারিত বিবরণে অতিশায়িতার দিক মেলে। গল্পটি পড়ে মনে হয়, গল্পের পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ এক পরিচ্ছেদে রাখা অসম্ভব হত না এবং শিল্পের সুষমা ও সংযম রক্ষিত হত স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবে। বস্তুত গল্পটি পাঠে average পাঠকদের মধ্যে যে আকর্ষণের অবধারিত বৈশিষ্ট্য মেলে তার কারণ প্রভাতকুমারের গদ্যের প্রসাদগুণ ও বিষয়ের স্নেহপ্রীতিসিক্ত বাঙালির মৃত্তিকাস্বভাবী শান্ততা।

পাঁচ

গল্পটির নাম 'ফুলের মূল্য'। নামের সঙ্গে সমগ্র গল্পের তাৎপর্য মিলে কতটা শিল্প সার্থক হয়েছে, প্রথমে তা-ই দেখা দরকার। সাধারণ পাঠক ভাবতে পারতেন গল্পে ম্যাগির মতো দরিদ্র, অসহায়, ভদ্র মেয়েটি, নিষ্পাপ, বিশুদ্ধ মুক্তমনের বালিকাটি অনেকাংশে ফুলের মতো স্বভাবের ও মনের অধিকারী। গল্পকার সেই বালিকাকে গল্পে উপহার দিয়েছেন ফুলের ঘ্রাণ, রঙ ও স্বভাব এমন সব চারিত্রিক মূল্য দিয়ে, তাতে নাম সার্থক।

কিন্তু গল্পের শেষে লেখক স্বয়ং মিঃ গুপ্তের ব্যাখ্যা দিয়ে ফুলের মূল্য নামটির যেন টীকাভাষ্য করেছেন। দাদার মৃত্যুতে ম্যাগি ভারত থেকে এত দূরে লন্ডনে থেকে তার সামান্য আয়ের এক শিলিং বাঁচিয়ে ভারতের সমাধিতে ফুল দেওয়ার অনুরোধ জানায়। মিঃ গুপ্ত তা নিতে রাজি হয়নি। তার ব্যাখ্যা, এই যে নিজের খরচ বাঁচিয়ে তা দিয়ে ফুল কিনে দেওয়ার মধ্যে ম্যাগির একটা গভীর সুখ ও আত্মতৃপ্তি থাকে যা বোন হিসেবে মৃত দাদার প্রতি নিষ্কলুষ, স্বার্থলোভহীন মানবতার প্রকাশ। তাতে তার ত্যাগ ধর্ম তাকে অনেক বড় মানবিক জায়গায় বসাবে। যদি মিঃ গুপ্ত ফুল না কিনে নিজের বিনা পয়সায় পাওয়া ভারতের মাটির ফুল দিত, তাতে, মিঃ গুপ্তের দিক থেকে বড় একটা কাজ হত ঠিক, কিন্তু ম্যাগির কৃচ্ছ্রসাধনের অর্থে ফুল দেওয়ার মধ্যে যে সরল সুখ, যে ভ্রাতৃস্মৃতি স্মরণ এবং স্বর্গত ভ্রাতার আত্মার শান্তি কামনা ব্যঞ্জিত হয়, তার মূল্য অনেক বেশি ম্যাগি ও তার মায়ের দিক থেকে। মানবতার বড় দিক স্বার্থশূন্য স্বভাবে এখানে মেলে, তাই 'ফুলের মূল্য' কথার অর্থ হল গভীর অন্তরঙ্গ প্রেমসূত্রে আত্মত্যাগেরই মূল্য। গল্পনামটি মিঃ গুপ্তের ব্যাখ্যায় সার্থক।

কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়। গল্পের প্রথম দিকে কোথাও ফুলের উল্লেখ নেই। ম্যাগির পুষ্পপ্রীতির কোনো উল্লেখও নেই। ফুল প্রসঙ্গটি ম্যাগির দিক থেকে শেষে প্রয়োগ সঠিক, তবে তার ব্যাখ্যা সমগ্র গল্পের মূল বিষয়ের ব্যঞ্জনানিহিত তাৎপর্যে আসেনি, এসেছে মিঃ গুপ্তের ব্যাখ্যায়। সমগ্র গল্পের সঙ্গে সেই ব্যাখ্যা খণ্ডিত। একটি ব্যাখ্যার অংশ দিয়ে কিভাবে একটি বড় গল্পের নামের তাৎপর্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়? গল্পের নাম তো সমগ্র গল্পের আবহ ধরে সমগ্রের স্বভাবে ব্যঞ্জনা পায়। অতি সরল এবং সুগভীর

ভ্রাতৃপ্রীতিতেই মাগি এক শিলিং দেয় সমাধিতে দেওয়ার জন্য। মিঃ গুপ্তের ভাষ্য নিজস্ব, ম্যাগির অন্তর্গূঢ় চরিত্রদ্যোতনা নামের মধ্যে ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। আসলে গল্পের central theme-এর totality-র ত্রুটিই নামের ব্যঞ্জনায় সীমা ধরিয়ে দেয়।

৪.

বলবান জামাতা

এক

প্রভাতকুমারের একটি কৌতুকরসাশ্রিত শ্রেষ্ঠ গল্প 'বলবান জামাতা।' গল্পটি প্রথম সংকলিত হয় লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ষোড়শী'তে। 'ষোড়শী'র প্রথম প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। সংকলনভুক্ত হওয়ার আগে গল্পটি পত্রস্থ হয় সে সময়ের মাসিক প্রবাসীর ১৩১৩-র বৈশাখ সংখ্যায়। প্রভাতকুমার যখন ব্যারিস্টারি পেশায় অবিভক্ত বাংলার রংপুর শহরে বসবাস করেন, তখনই 'ষোড়শী' সংকলনে বর্তমান গল্পটি নির্বাচিত হয়। 'বলবান জামাতা' প্রথম পত্রস্থ হওয়ার পর 'সাহিত্য' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩-র সংখ্যায় এমন সমালোচনামূলক মন্তব্য করা হয় : 'ক্ষুদ্র গল্পটি অতি সুন্দর। আখ্যানবস্তু মনোহর ও হাস্যরসের কিরণে সমুজ্জ্বল। বহুদিন আমরা এমন মনোহর গল্প পড়ি নাই।'

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ষোড়শী'র সঙ্গে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নব-কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণের গল্পগুলি পড়ে মন্তব্য করেন : 'ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মতো—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মতো—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই—সেটা বিষম ভারি—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না।' যেহেতু বলবান জামাতা সম্পূর্ণত কৌতুকরসের গল্প, তাই উপরি-উক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কিছু আগে বলেছেন : 'দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।' এই মন্তব্যগুলি আমাদের 'বলবান জামাতা' গল্পের নিবিড় বিশ্লেষণের সময় নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে।

আর একটি সংবাদ স্মরণীয়। 'বলবান জামাতা' বাঙালির কাছে রূপ-বৈচিত্র্যে প্রদর্শিত হয়েছিল, ১. দৃশ্যকাব্যরূপে ও ২. একক-হাস্যরস পরিবেশনায়'। ১৯১১ সালে 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'বলবান জামাতা'র নাট্যরূপ 'গ্রহের ফের' প্রকাশ করেন। .... একক হাস্য-রূপ-পরিবেশনায় 'বলবান জামাতা' এক বিশিষ্ট শিল্প-রূপান্তরে পরিবেশিত হয় ও দর্শক ও শ্রোতাদের হাস্যরসে আপ্লুত করে।' গল্পটির এত খ্যাতির পাশে তাঁর গল্পের পরিকল্পনা ও সিচুয়েশানের সঙ্গে মিলিয়ে সমসময়বর্তী কথাকার সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'সাবজজের বাঙ্গলা' নামে একটি গল্প লেখেন। সেখানে আছে নায়ক জামাই ভুল করে শ্বশুরবাড়ি ভেবে অন্য বাড়িতে যায়, পরে বহু কষ্টের পর তার সে ভুল ভাঙে ও নিজের শ্বশুরবাড়ি যেতে সক্ষম হয়। অবশ্যই প্রভাতকুমারের ঘটনা-সাজানোর অপূর্বত্বের কাছে, হাস্যরসের প্রবাহ সৃষ্টিতে দ্বিতীয়

গল্পটি একেবারেই ম্লান। আমাদের কথা, 'বলবান জামাতা' সেকালে শুধু পাঠক-পাঠিকাদের প্রশংসাধন্য হয়নি, লেখকদেরও প্রভাবিত করে নিজস্ব একটি স্থান ও ধারা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে, এখানেই এই গল্পটির আলাদা মর্যাদা।

'বলবান জামাতা'র কাহিনী ভিত্তি মূলত ঘটনা সাজানোর নৈপুণ্যে বিশিষ্ট শিল্প-সম্মান পায়। আলিপুরের এক পোস্টমাস্টার নলিনীবাবু সামনেই পুজোর অবকাশে এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ি যেতে একান্ত উদগ্রীব। দু'বছর আগে বিয়ের পর এই প্রথম তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। স্ত্রীর বিরহকাতর চিঠি তাকে আরও বেশি অস্থির করে, অস্থিরতার মধ্যেই সঙ্গে থাকা স্ত্রীর চিঠিটি বহুবার পড়ার পরেও মন অশান্ত। কারণ তার অফিসের ছুটির অর্ডার শেষ মুহূর্তেও আসছে না। আবার তার এমন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের দ্বিতীয় কারণ, তার শালী কুঞ্জবালা, স্ত্রীর পক্ষে দিনাজপুরের মেজদির সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে দেখা হওয়ার সুযোগ! কুঞ্জবালা দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী, বিদুষী, ইংরেজি শিক্ষিতা, ধারালো বুদ্ধিমার্জিত কথাবার্তায় পটু। বিয়ের সময় নলিনী ছিল নবনী-নিন্দিত দেহের অধিকারী। শরীরের গঠনে আলুলায়িত নরম পেলব স্বভাবটাই বেশি। বাসরঘরে নলিনীর এই শরীর শ্যালিকা হিসেবে কুঞ্জবালার কৌতুক ও বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ্য হয়। এতেই চাপা রাগ জন্মে নলিনীর মধ্যে। বিয়ের পর নলিনী চলে আসে কলকাতায়, শ্বশুর সপরিবারে ফেরেন কর্মস্থান এলাহাবাদে।

কলকাতায় ফিরে নলিনী কুঞ্জবালার সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছুতেই ভুলতে পারে না। শ্যালিকাকে মুখের মতো জবাব দিতে একবছর ধরে ব্যায়ামচর্চা করে নলিনী, পরিমিত খাদ্যাভ্যাস করে, ক্রমশ নলিনীর দেহ হয় পরুষ-কঠিন। ঘন দাড়ি রাখে গম্ভীর পৌরুষ বোঝাতে, আর শিকারি বন্ধুদের সঙ্গে শিকার অভ্যাস করে স্বভাবে একেবারে নতুন হয় নলিনী। অফিস থেকে ছুটি পাওয়ার পরের দিন বেলা দুটোয় আসে এলাহাবাদ স্টেশনে। কলকাতা ছাড়ার আগে নলিনী শ্বশুরের নামে একটি টেলিগ্রাম করে। প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসার পোশাক—পাজামার ওপর গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি কোট, মাথায় পাগড়ি, হাতে একটা বড় মাপের লাঠি। সঙ্গে অন্যান্য জিনিসপত্তরের মধ্যে একটা শিকারের উপযোগী বন্দুকের বাক্সও নেয়।

এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে শ্বশুরবাড়ির কোনো লোক তাকে নিতে না-আসায় নিজেই কুলি ডাকে। জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের বাইরে একটি গাড়ির গাড়োয়ানকে মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ি নিয়ে যেতে বলে। গাড়োয়ান চেনে এবং তাকে সওয়ার করে। এই প্রথম নলিনীর বাংলার বাইরে আসা! আগে কখনো এলাহাবাদে আসেনি। মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ির কম্পাউন্ডে পৌঁছলে ভৃত্য রামশরণ বাড়ির জামাইবাবু এসেছেন শুনে আহ্লাদে সব জিনিসপত্তর নিয়ে নলিনীকে বৈঠকখানায় বসায়। রামশরণ, নলিনীর মুখে মহেন্দ্রবাবু উকিলের খোঁজখবর প্রসঙ্গে জানায়, তিনি কেদারবাবু উকিলের বাড়ি পাশাখেলায় ব্যস্ত।

যথারীতি জামাই আদর হয় শালীস্থানীয় ও অন্যান্য রমণীদের কৌতুকের ও যত্নের মধ্যে। কিন্তু আহারাদির বিশাল আয়োজনের মধ্যে বাড়ির মেয়ে নলিনীকে দেখেই বোঝে এ তার স্বামী নয়, অন্য মানুষ। নলিনীও ব্যাপারটা বুঝে যায়। মনে মনে হাসতে থাকে— খাবারের পাত্রগুলি নিঃশেষ করে। নলিনী বুঝে যায়, তার শ্বশুর তো মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও এসেছে ভুল করে মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ি। দুজনেই উকিল। নামের মিলে গাড়োয়ান ওকে এখানে নিয়ে

এসে ছে। ভৃত্য রামশরণ দ্রুত খবর দেয় কেদারবাবু উকিলেব বাড়ির পাশার আড্ডায়। দুই মহে ন্দ্রবাবুই সেখানে উপস্থিত। ভৃত্য খবর দেয় জামাই নয়, অথচ সঙ্গে বন্দুক নিয়ে এসেছে। লো কটি ডাকাত। বড় মহেন্দ্রবাবু বাড়ি ফিরে সব ব্যাপার বুঝতে পারেন। কিছু গল্পগুজবের প। নলিনী চলে আসে নিজের শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু ছোট মহেন্দ্র বাড়ি ফিরে দেখে সেই ডাকাত ও র বাড়ি এসেছেন, সে এক হুলুস্থূল কাণ্ড। শ্বশুর সত্যিকারের জামাই বোঝালেও চিনতে পারে না। কারণ নলিনীর সবদিক থেকে বদলের চেহারা! গৃহিণী ও বাড়ির কারোর কথা না শুনে ভৃত্যকে দিয়ে তাড়িয়ে দেন। নলিনী চলে আসে কলকাতা ফেরার জন্য এলাহাবাদ স্টেশনে। গৃহিণী নানা যুক্তি দিয়ে স্বামীকে বোঝায় তাঁর ভুলের কথা। জামাইয়ের টেলিগ্রাম দেরিতে আসার কথা বলে। তার আগে শ্যালিকা কুঞ্জবালাও সন্দেহ করে বাবাকে জানায় এ নলিনী নবনী-নিন্দিত দেহের জামাই নয়। শেষে শ্বশুর নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেই স্টেশনে যান জামাইকে ফিরিয়ে আনতে।

নলিনী ফিরে এসে একবারও শালীশালাজকে আগের কোনো প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। শ্বশুরবাড়ির ভুলের জন্য গভীর লজ্জা ও অনুতাপ এমন ভাবনা থেকে তাকে নিবৃত্ত করে। কেবল পরে কোনো একদিন অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকিলের কথা উঠলে নলিনীর যে কথা তা দিয়েই গল্পের শেষ : 'যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠে যে আদরযত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সেরকম নিজের শ্বশুরবাড়িতে পায় না।'

'বলবান জামাতা' গল্পেব কাহিনীভারে রচিত প্লটের জটিলতা ও একমুখিতা প্রভাতকুমারের ঘটনা-সংস্থাপনের নৈপুণ্যে ও সিচুয়েশান সৃষ্টির অসামান্য কুশলতার মধ্যে নিহিত। গল্পটি সম্পূর্ণত কৌতুকরসাশ্রিত। সেই রসোদ্রেকের যথোপযোগী ঘটনা সাজানোয় আছে কমেডি গল্পের গতি ও প্রাণ। সিচুয়েশান নিখুঁত করতে প্রভাতকুমার নলিনী চরিত্রনির্ভর ঘটনাগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। ১. শ্যালিকা বিদুষী কুঞ্জবালার নায়কের প্রতি বিবাহবাসরে বিদ্রূপ, ২. অফিসে নলিনীর ছুটি পেতে শেষ মুহূর্তে দেরি হওয়া, ৩. কুঞ্জবালার প্রতি রাগের বদলা নিতে নলিনীর ব্যায়ামচর্চা, পরিমিত খাদ্যগ্রহণ, পরুষদীপ্ত দাড়ি রাখা, শিকারে অভ্যস্ত হওয়া, ৪. শেষ মুহূর্তে এলাহাবাদে শ্বশুরের নামে টেলিগ্রাম পাঠানো। এই বিষয়গুলি গল্পের সূত্রপাত হিসেবে প্রথমভাগে নিপুণ নিবেশিত। দ্বিতীয় ভাগে আছে মহেন্দ্র ঘোষের বাড়ি ভুলক্রমে পৌঁছনো, ২. মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পরে এসে হেনস্থা হওয়া এমন দুই নাম-সাদৃশ্যে মিলে নলিনীর বিপর্যস্ত হওয়ার দিক। ৩. টেলিগ্রাম দেরিতে পৌঁছনোয় গল্পের সিদ্ধান্ত টানায় দেরি হওয়া ও নলিনীর অভিমানে সেই রাতেই কলকাতায় ফেরার তোড়জোড়, ৪. শ্বশুরের অনুশোচনা এবং স্থিতবুদ্ধির উদ্রেক।

'বলবান জামাতা' গল্পে টানা কাহিনী আছে, অবশ্যই সে কাহিনী প্লটের অভিনবত্বে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। প্লটের অভ্যন্তরে কাহিনীবর্ণিত দুই ব্যক্তির এক নামের বিভ্রাটেই ক্লাইম্যাক্স দেখা দেয়। বড় মহেন্দ্রবাবু উকিল অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পদবির ছোট মহেন্দ্রবাবুই নলিনীর শ্বশুর, বড় মহেন্দ্রবাবু হলেন 'ঘোষ' পদবির। তাঁর বাড়িতেই নলিনী প্রথম আসে। তাঁর বাড়ির অন্দরমহলের মধ্যে গল্পের ক্লাইম্যাক্স ধরা পড়ে। অন্দরমহলে জামাই ভেবে নলিনীর পর্যাপ্ত আদরযত্নের মধ্যপর্বে কৌতুককর ক্লাইম্যাক্স চিত্র :

"জলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। 'কি ভাই এত দিনে মনে পড়ল?'—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা এক মুহূর্তের জন্য। চারি চক্ষে মিলিত হইতেই, সেই মহিলা এক হাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখি ল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই-তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল :—

'কি লো পালিয়ে এলি যে?'

'ও মা, এ যে অন্য লোক।'

'অন্য লোক কি লো? আমাদের শরৎ নয়?'

'না, শরৎ হবে কেন?'......

'এ কি কাণ্ড, জুয়াচোর নাকি?'

'যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য নয়।'

'... জামাই সেজে কে এল?'

একজন বালকের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল, 'একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে'।"

এইভাবে গল্পের প্লটের জটিলতায় ক্লাইম্যাক্স স্বভাব ধাপে ধাপে রূপ পেয়ে শেষ পথে এসেছে। ভুল শ্বশুরবাড়ি আসায় বিভ্রান্তির যে প্লট, এখানে তার পরিসমাপ্তি, গল্পের প্রথম শ্বশুরবাড়ির চিত্রে আছে climax, শেষ শ্বশুরবাড়িতে মেলে সহজ গতির পরিণামী দিক।

মনে হতে পারে দেরিতে টেলিগ্রাম আসায় গল্পের ক্লাইম্যাক্স ধরা যায়। বস্তুত টেলিগ্রাম দেরিতে আসার ঘটনাটি নলিনীর শ্বশুর মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাভাবিক চেতনা ও বুদ্ধি ফিরে আসারই সহায়ক বিষয়। বিশেষ চরিত্রের কথাচিত্রে এবং সমগ্র গল্পের সিচুয়েশানকে টানটান স্বভাব দিতে টেলিগ্রামের বিলম্বিত খবর শিল্প-উপায় হয়। কোনো কমেডি বৈশিষ্ট্যের কৌতুকরসাত্মক গল্পে চরিত্রদের বিভ্রম ও ভ্রান্তির অসঙ্গতি গল্পের কাঠামোকে মজবুত করে। এসব গল্পের শেষ ঘটে মিলনের আনন্দে। তবে গল্পের উদ্দেশ্যভেদে পরিণতি করুণরসাত্মক, অশ্রুজলসিক্তও হয়।

'বলবান জামাতা' গল্পের আদি থেকে শেষে যত অসঙ্গতির উৎকট দিক আছে, তার দায়ভাগ নিয়েছে নায়ক নলিনীই। পরোক্ষে সর্বশেষ নলিনীর একটু নিরপেক্ষ মন্তব্য এক জামাইয়ের নিজের শ্বশুরবাড়ির লক্ষণীয় সীমাটুকু শ্লেষে বোঝাতে ইতস্তত করেনি। গল্পের প্লটে প্রভাতকুমার শেষ পর্যন্ত নলিনীর ভাবনা দিয়ে গল্প শেষ করার রীতিতে গল্পের এতসব মানুষজনেব ভিড়ে নায়কের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার শ্লেষ ভিত্তিটি সঠিক রাখতে পেরেছেন। এখানেই চরিত্রনির্ভর প্লট রচনায় প্রভাতকুমারের অন্যতম শিল্পকৃতিত্ব।

দুই

'বলবান জামাতা' আদ্যন্ত নির্মল কৌতুকরসের গল্প। বাঙালি সমাজে স্ত্রীর পাশে আদরে ও কৌতুকে শ্যালিকার আদর জামাইয়ের কাছে বেশি। একটি রোমান্টিক পরিবেশ রচনা ক'রে

এই শ্যালিকার দল। এমন একটি শ্যালিকাকে গল্পের প্রথমে এনে প্রভাতকুমার কৌতুকরসের উৎসটি ধরায় লেখকের রসবোধের তারিফ করতে হয়। শ্যালিকার প্রতি অর্থাৎ কুঞ্জবালার প্রতি রাগ, অভিমান, প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভঙ্গি গল্পের বুঝিবা মূল চাবিকাঠি। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের ভূতনাথবাবুর মুখের একটি কথা মনে পড়ে : 'অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে... পরিণত হইতে থাকে।' আলোচ্য গল্পে শ্যালিকার প্রতি রাগে নলিনীর ব্যক্তিত্বে ও ব্যবহারে, মনে ও চিন্তাভাবনায় যে অসঙ্গতির শুরু, তারই হাস্যজনক রূপ তার চেহারায় রূপান্তরে অফুরন্ত লঘুরসের জোগান দেয়। এই কৌতুকরসে কোনো ব্যঙ্গ নেই, নায়কের আচার-আচরণেই ঝর্নার মতো কৌতুকরসের প্রবাহ ধরা পড়ে।

পরবর্তী সোজা শ্বশুরালয়ে আগমনের ভাষাচিত্রে নলিনীর তেমন কোনো দায় নেই, প্রভাতকুমার নিজেই সেই দায়িত্ব অসম্ভব শিল্পদক্ষতায় এঁকেছেন। দুই উকিলের একই নাম—তা গল্পকারেরই ঘটনা সাজানোর কৌশল। একই স্বভাবে নলিনী বোঝে সে কুঞ্জবালাদের অর্থাৎ নিজের শ্বশুরালয়ে আসেনি। এই ভ্রান্তি গল্পকারের কৌশল। আবার টেলিগ্রাম না আসার আগে পর্যন্ত নলিনীর যে অসহায়তা, তাকে আসল শ্বশুরের ভুল বোঝা ও অপমান হজম করা—সেসবেও নলিনীর সব দায়ভাগ প্রভাতকুমারেরই কল্পনানিষ্ঠ মনের শিল্পরচনা। কৌতুকরসের 'ভিক্‌টিম্' নলিনী প্রভাতকুমারেরই 'টার্গেট'।

লক্ষ করার বিষয়, প্রভাতকুমার কৌতুকরসের ভারে পরবর্তী কাহিনীতে গতি আনার জন্যই নলিনীকে শিকারি করেছেন, সঙ্গে আনিয়েছেন বন্দুক। এই বন্দুক কিন্তু শিকারে লাগেনি, লেগেছে নলিনীকে ডাকাত বানাতে—যাতে ভৃত্য রামশরণ থেকে ঘোষবাড়ির অন্দরমহলের উৎকণ্ঠা, দুর্বিপাক, সন্দেহ ক্রমশ নলিনীর গতিবিধির পর চাপ সৃষ্টি করে, প্রথমে মহেন্দ্র ঘোষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে, পরে মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নলিনীর প্রতি হাস্যকর দুর্ব্যবহারে প্রণোদিত করতে পারে, এইভাবেই সমগ্র গল্পে কৌতুকরস নির্মল জ্যোৎস্নার মতো দেখা দিয়ে গল্পের শিল্পদেহকে লাবণ্য দান করেছে।

গল্পে প্রচ্ছন্ন কৌতুকরস পাঠকমনে সহাস্য শান্তি ও আরাম দেওয়ার উপযোগী উপকরণের দিক দেখায়। ভুল বাড়িতে যখন খেতে বসে অন্দরমহলের মেয়েদের দেওয়া প্রচুর খাবারের উদ্যোগী হয়েও বোঝে নলিনী সে ভুল বাড়িতে এসেছে, তখন সে নিজেই কৌতুকরসের উপভোগীর আচরণ করে। উকিলের বাড়ির আলমারিতে বইয়ে সে দেখে তার শ্বশুরের নাম নয়, মহেন্দ্র ঘোষ লেখা, 'নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে নিশ্চিন্ত মনে একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি করিয়া ফেলিল।' এই যে সংকটকালে নলিনীর মনের নিশ্চিন্তি ও অন্যের বাড়ির খাদ্যভক্ষণ, তা নির্মল হিউমারের মূল্যবান অভিজ্ঞান হয়। নিজের উত্তেজিত শ্বশুরের মুখে নলিনী শোনে : 'বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এরকম গুণ্ডার মত চেহারা?' এই যে attitude-এর নিষ্ফলত্ব ও অসঙ্গতি অসামান্য কৌতুকরসের জোগান দেয় গল্পে। পিতার সমর্থনে কুঞ্জবালার কথাগুলি কৌতুকরসের আর এক মাত্রা দেয়।

কৌতুকরসের আর এক অনবদ্য ছবি এঁকেছেন প্রভাতকুমার গল্পে মহেন্দ্র ঘোষের বাড়ির অন্দরমহল চিত্রে নলিনীর দুবছর বিবাহের একদিনও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না হওয়া সত্ত্বেও শিশুসন্তান দেখানোর চিত্রে :

"ঝি বলিল, ... আপনাকে একটি নতুন জিনিস দেখাব।'.......

ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্পবয়স্ক শিশু।....'এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।'

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।'

.....'রূপো দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা?'

মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটি গিনি আনিও?

ঝি বলিল, 'ছেলের বাপ হইলেই হয় না!'

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপুর্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। 'ছেলের বাপ হইলেই হয় না। ইহার অর্থ কি? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ নাকি?'..... 'ছেলেটি কবে হল?'

ঝি পুনর্বাব গালে হাত দিয়া বলিল, 'অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞেস করছ?"

এই চিত্রের আদ্যন্ত যে শ্লেষবক্রোক্তির ঘন ছায়া আছে, তা গল্পকারের অনবদ্য বিশ্বাস্য অথচ অস্বাভাবিক রসাভাস উতরোল হাসিতে পাঠক ও পরিবেশের শিল্পরূপ সুষমায় সজ্জিত করে।

বস্তুত 'বলবান জামাতা' গল্পে কৌতুকরস এসেছে—১. নায়ক চরিত্রের বিচিত্র মানসিকতায়, একই সঙ্গে শ্যালিকা প্রীতি ও তার প্রতি রাগজনিত অভিমানে, ২ একই নামের শ্বশুর উকিল ও অন্য ভদ্র উকিলের একই এলাকায় বসবাসে, ৩. লেখক কৃত ঘটনার নিপুণ সজ্জায়, ৪. অনবদ্য সিচুয়েশান নির্মাণের দক্ষতায়। গল্পটিতে সমস্ত অসঙ্গতির সীমাতিশায়ী স্বভাব তাৎপর্যে, শীতল স্বভাবে মেনে নেওয়ার বিস্ময়ে কৌতুকরস আদ্যন্ত ঘটনা ও চরিত্রদের মধ্যে সুক্ষ্ম সূত্রের জন্ম দিয়েছে। কোথাও এতটুকু বাড়তি প্রসঙ্গ নেই। এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে যাওয়া-আসার স্বাভাবিকত্ব গল্পটির কৌতুকরসের বড় গৌরব।

তিন

'বলবান জামাতা' গল্পের প্রধান চরিত্র এবং কেন্দ্রীয় তথা নায়কও নলিনী। আর দুটি চরিত্র গল্পের কাঠামোয় লক্ষণীয় স্থান সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পেতে পারে—মহেন্দ্র ঘোষ—নলিনীর শ্বশুরের বন্ধু এবং একই নামের শ্বশুর মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নলিনী জামাইটি কিন্তু ভদ্র, স্ত্রীও শ্বশুরবাড়ির প্রতি অনুগত। তবে শ্যালিকা বিদুষী কুঞ্জবালার প্রতি রাগ তার চরিত্রে কিন্তু excess স্বভাব আনে। তার ব্যায়ামচর্চা, শিকার করা শিক্ষা, তার দাড়ি রাখা এগুলো যথার্থ কমেডির মধ্যে বাড়তি মাত্রা চরিত্রের। নলিনীর এগুলি না থাকলে কমেডি গল্প জমত না। সে যেন দশচক্রে ভগবান ভূতের মতো হয় গল্পে।

তার যাবতীয় বিভ্রান্তি নিজের মধ্যে থেকেই তৈরি হয় পরিবেশ ও অবস্থা বিপাকে। তার

ছেলে হওয়া যে সম্ভব নয়, তা-ও সে ভুলে যায় মহেন্দ্র ঘোষের অন্দরমহলের ঝিদের কথায়, দাবি দাওয়ায়, যখন সে বুঝতে পারে তার ভুল হয়েছে ওই বাড়ি আসায় তখন সে কিছুটা স্থিতধী হয়। ভদ্রতায় ও সৌজন্যে সে কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যায় না। মহেন্দ্র ঘোষের যথার্থ রাগ দেখা গেলেও তাঁকে বুঝিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয় : 'আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা প্রার্থনা করবার আছে। ...আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চলে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে—আপনাব কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা করছি।' ৭ত বিপর্যস্ততার মধ্যেও নলিনী মহেন্দ্র ঘোষের মুখে দীর্ঘস্থায়ী হাসির উতরোল সৃষ্টি করতে পেরেছে।

সমগ্র গল্পে নলিনী অনেকটা সুস্থ। তার রোগা হওয়ার বাতিক ইত্যাদি বাদ দিলে সে বাকি গল্পে সুস্থ। গ্রহের ফেরেই বিপর্যস্ত। প্রথম দিকে নলিনী নিজেকে তৈরি করেছে, পরে এলাহাবাদে আসার পর গল্পকারের হাতের পুতুল। সেখানে সে সুস্থ না হলে অন্দরমহলে তার পুত্র বলে দেখানো সন্তান ভাবনায় অসঙ্গতি বুঝে নির্মল বিস্ময়ের জন্ম হত না তার মনে। তার সম্পর্কের সংকটকালে সমস্ত খাদ্য খেয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি চমৎকার কৌতুকরসের উদ্বোধক। নলিনী সবটাই কৌতুকের চরিত্র নয়, সে কিছুটা balanced। সে গল্পের পরিণামে যে কথা ভাবে দুই বাড়ির আদরযত্নের তারতম্যের কথায়, এবং তার শ্বশুরবাড়ির লজ্জাব কাছে কিছু মন্তব্য বা বিরাগ না প্রকাশে—তাতে গল্পের সঠিব পরিণামে এবং প্রচ্ছন্ন শ্লেষে শিল্প-ব্যঞ্জনা চরিত্রানুগই হয়েছে।

গল্পে আছে উকিল মহেন্দ্র ঘোষের কথা, আছে নলিনীর একই নামের শ্বশুরের কথা। নলিনীর শ্বশুর কিছুটা বুদ্ধিহীন, রাগী এবং অস্থিব মতিব। তিনি জামাইয়ের কোনো কথাই শুনতে চাননি। অন্যদিকে শ্বশুর নন মহেন্দ্রবাবু রসিক, অল্প সময়েই স্থিত হতে জানেন। শ্বশুরের মানসিক স্থিতির জন্য তাঁর স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে হয়। মহেন্দ্র ঘোষেব পক্ষে তা করতে হয়নি। তিনি নিজেই নলিনীর কথায় বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। দুই ব্যক্তিত্বের এমন তুলনায় চরিত্রদুটির কৌতুকরসাশ্রিত গল্পের মাত্রা বোঝা সহজ হয়। পরের শ্বশুরবাড়ির আদরযত্ন প্রসঙ্গে নলিনীর যে অভিজ্ঞতা, তার পাশে নিজের শ্বশুরবাড়ির অভিজ্ঞতা যে কিছুটা অন্য ধরনের—এই ভাবনায় দুই উকিলেব পারিবারিক জীবনচর্চা ও চর্যার তফাত দুজনকে স্বাতন্ত্র্য দেয়।

চার

'বলবান জামাতা' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর একমুখিতা ও গতিপ্রাণতা নিখুঁত শিল্পমানে চোখে পড়ার মতো। গল্পটিকে নলিনী টেনে নিয়ে যতটা গেছে, তার থেকেও অনেক বেশি গল্পকারের সিচুয়েশান তৈরির কৌশল সহায়তা করেছে। গল্পের গতি কৌতুকরসের মোটা সুতো ধরে তার পরিণামী দিক রচনা করেছে। গল্পের শেষে মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জামাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পরে গল্পকার আর তাঁর সংসারচিত্র দেখাননি। কিন্তু নলিনীর মনের কথাটি অল্প ভাষণে এত সংক্ষিপ্তি ও রসের সাবল্যে

দিয়েছেন, যা শান্তরসের মধ্যেও কিছু কষায় স্বাদ দেয়।

গল্পের বর্ণনার গদ্য সাধুরীতি-অনুগ। সংলাপ কথ্য ও চলতি রীতির মিশ্রণে সুস্বাদু। কমেডিমূলক গল্পের ভাষা ও গদ্য হয় স্বচ্ছ ও সচ্ছল। ট্র্যাজেডি-রসাত্মক গল্পের গদ্য হয় জটিল, গভীর ও গম্ভীর রসভাবনার দ্যোতক, কমেডি গল্পের তা নয়। প্রভাতকুমার গল্পে শ্লেষ বক্রোক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এই রীতির গল্পে তার প্রয়োগ স্বাভাবিক। বস্তুত ঘটনাশ্রয়ী গল্পের ভাষার মধ্যে কিছুটা অগোছালো ভাব আসতেই পারে—যদি তা আবার প্রহসনের, কৌতুক-শ্লেষের হয়। নলিনীর অসহায়তা ও ঘটনার অভিঘাতে মনের মধ্যেকার একাধিক ভাবনা-বিষয়ে নিজস্ব যুক্তির নিষ্ফলত্ব গল্পে স্পষ্ট হয়েছে।

মহেন্দ্র ঘোষের অন্দরমহলের মেয়েদের, ঝি-সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংলাপ অবশ্যই গতিপ্রাণ (dynamic)। প্রভাতকুমার এমনভাবে সংলাপ রচনা করেছেন, অবস্থা বিশেষের বর্ণনাময় ছোট ছোট চিত্র এঁকেছেন যেগুলির মধ্যে দ্রুততা, ক্ষিপ্রতা আছে, শব্দ ও বাক্যের মেদ সেখানে আদৌ নেই। কমেডির ভাষায় structure হবে মূলের দিকে এগোবার উপযোগী নিশ্চিত। বর্ণময় কারুকার্য থেকে সাবলীল চলৎশক্তি 'বলবান জামাতা'র গদ্যকে মনোরম শান্তি দেয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় প্রভাতকুমারকে লেখা চিঠির স্বীকৃতি এখানে প্রযোজ্য : 'তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে, বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।'

পাঁচ

গল্পের নাম 'বলবান জামাতা।' চরিত্রনির্ভর এই নামে আছে দুটি শব্দ—'বলবান' ও 'জামাতা'। জামাতার নাম নলিনী মুখোপাধ্যায়। তার নাম গল্পকার শীর্ষনামে ব্যবহার করেননি। আসলে এমন গল্পকারের দেওয়া নামে গল্পের কৌতুকরসাশ্রিত উদ্দেশ্য ও ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়।

প্রথমত, 'বলবান জামাতা' নামেই আছে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। জামাতা বাঙালি পরিবার জীবনের নতুন কুটুম্বিতা স্থাপনের একটি রম্য অঙ্গ, পারিবারিক সম্পর্কের প্রীতিময় অলংকারের মতো। তার আগে 'বলবান' শব্দপ্রয়োগে বাড়তি লাভ 'কৌতুকরস'। নলিনী তার শক্তি ও পৌরুষ দেখাতেই তো ব্যায়ামচর্চা করেছে, শিকার শিখেছে, দাড়ি রেখেছে। সেই উদ্দেশ্যে সে শ্যালিকার প্রতিস্পর্ধী হয়ে তার আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। সে-ই গল্পের নায়ক। তাই নাম যথার্থ।

দ্বিতীয়ত, গল্পের কেন্দ্রীয় তথা নায়কও নলিনী—সেই বলবান জামাতা। তার কথা দিয়ে গল্পের শুরু, তার কথা দিয়েই সমগ্র গল্পের কথাশরীর রচিত। সমস্ত গল্পের আলো নলিনীর ওপরেই নিবদ্ধ। তার শ্বশুরবাড়ি আসার পথে যে দুর্বিপাক ও বিপর্যস্ত হওয়া তা-ই সকৌতুকে দেখানো গল্পকারের লক্ষ্য। সুতরাং গল্পের নামে 'বলবান জামাতা' শিল্পের মানে যথার্থ।

তৃতীয়ত, নামে এক contradiction আছে। নলিনী জামাতা, সে বলবান। কিন্তু এই বলবান জামাইয়ের যে অকথ্য 'হ্যারাস্‌মেন্ট', তাতে তার শক্তিমত্তার প্রয়োগ অসম্ভব। সে শুধু শালী কুঞ্জবালার কাছে বিদ্রূপের শিকার হয়নি, সে শ্বশুরবাড়ি নয়, এমন বাড়ির

অন্দরমহলে অপ্রস্তুত হয়েছে। খিদের সময় খাদ্য পেয়েছে ঠিক, কিন্তু অন্তঃপুর- বাসিনীদের ভিড়ে তার অসহায়তা, দুর্বলতার দিকটা প্রধান করে। নিজের শ্বশুরবাড়িতেও সে শ্বশুরের কাছে যে ভর্ৎসনা পায়, অবহেলা পায়, তাতে তার প্রথম দিন শ্বশুরালয়ে আসার যাবতীয় আশা-আনন্দ হয় ধূলিসাৎ। সেখানেও তার নিজের কোনো হাত নেই। স্বাস্থ্যে বলবান হলেও মনে সে অসহায় দুর্বল। গ্রন্থনামে তাই মূল অর্থের ব্যঞ্জনা বিপরীতে অন্য ভাব জাগায় বলেই অর্থের contradiction-এ তা মনোরম ও প্রচ্ছন্ন কৌতুকরসের উদ্বোধক।

৫.

রসময়ীর রসিকতা

এক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলা ১৩১৬ সালের প্রবাসী মাসিক পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। পরে গ্রন্থভুক্ত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ লেখকের 'গল্পাঞ্জলি' সংকলনে আশ্বিন ১৩২০ সালে। এর প্রকাশকালে লেখক ব্যারিস্টারি কাজে ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত গয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর চৈত্র ১৩৫৯-এর 'পঞ্চতন্ত্র'-এ 'বর্বর জর্মন' প্রসঙ্গে একটি জর্মন গ্রন্থের অনুবাদের কথা বলেন। সেখানে আছে দশজন বাঙালি লেখকের রচনা। তাতে প্রভাতকুমারের দুটি অনূদিত গল্পের একটি 'ষোড়শী' গ্রন্থের 'বউচুরি', আর একটি হল 'গল্পাঞ্জলি'র 'রসময়ীর রসিকতা' গল্প। এই তথ্য উল্লেখ যে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটির এমন সম্মান লাভ গল্পটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

'রসময়ীর রসিকতা'র আগে প্রভাতকুমারের 'বলবান জামাতা' নামের কৌতুকরসাশ্রিত গল্পের প্রকাশ ঘটে গেছে। 'রসময়ীর রসিকতা' একই রকম সিচুয়েশান সৃষ্টি ও ঘটনা সংঘটনের চমৎকারিত্বে সার্থক। 'বলবান জামাতা'র মূল প্রসঙ্গের কেন্দ্রস্থল একেবারেই পারিবারিক সমস্যার এক প্রহসনাত্মক কৌতুকরহস্যের। 'রসময়ীর রসিকতা'য় আছে প্রায় একই শিল্পপ্রকরণে ভৌতিকরসে আপ্লুত পারিবারিক সম্পর্কভাবনার মজার পরিবেশ। দুটি গল্পের রসই পারিবারিক সম্পর্কের একাধিক ঘটনার বৈপরীত্যের মূল ধরে ব্যাপ্তি পেয়েছে। কৌতুকরসের স্বাদের স্বাতন্ত্র্যই গল্পদুটির নিজ নিজ বিশিষ্টতা।

'রসময়ীর রসিকতা'র মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা—ছোট-বড় মাপ মিলিয়ে আটটি। কাহিনী ধাপে ধাপে এই পরিচ্ছেদগুলির মাপের মধ্যে জটিল হতে হতে শেষে নির্মল আকাশের মতো কৌতুকের স্বভাবে মুক্তস্বভাবী পরম রমণীয় রূপের ব্যঞ্জনা পায়। পূর্বসূরি ত্রৈলোক্যনাথের মতোই প্রভাতকুমারের গল্পে ঘটনা ও চরিত্র ধরেই ঘটে গল্পের বিস্তার, কিন্তু চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বময় মনোলোকের স্বরূপ উদঘাটন-কৃতিত্ব তেমন নেই। গল্পের কাহিনী যেসব ঘটনার হাত ধরে, তা চরিত্রের ন্যায়েই প্রাধান্য পায়, ঘটনাকে নিয়েই গল্পের পরিণামে পাঠকদের চিত্তকে পরম রমণীয় অনুভবে কৌতুক রসাস্বাদী করে তোলে।

বাংলা নবিশ মোক্তার ক্ষেত্রমোহনবাবুর দীর্ঘ আঠারো বছরের দাম্পত্য জীবন তিরিশ বছর বয়সী রণরঙ্গিণী স্ত্রীর সঙ্গে নিরন্তর পায়ে-পা-তোলা বিবাদ, যুদ্ধ, সমস্যা, সংঘাত, সংকটেই জড়িত থেকে ক্ষেত্রমোহনকে রুদ্ধশ্বাস করে তোলে। ক্ষেত্রমোহনবাবুর বর্তমান বয়স চল্লিশ, নিঃসন্তান। আদিতে বাড়ি হুগলিতে ছিল না, হুগলিতে থেকে বেশ কিছু পয়সা উপার্জন করে একসময়ে হুগলিতেই বাড়ি করে বসবাস করেন। আত্মীয়স্বজনদের অনুরোধে, বুদ্ধিতে এবং ক্ষেত্রমোহনবাবুর নিজের আন্তরিক বাসনাতেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করার বাসনা থাকলেও স্ত্রীর ভয়ে কোনো চেষ্টায় সাহস দেখাননি। কোনো এক সামান্য ঘটনায় স্ত্রী রসময়ী ক্ষেত্রমোহনবাবুকে ঘরছাড়া করে। নিজে যায় হালিশহরে পিত্রালয়ে, ক্ষেত্রমোহনবাবু এই সুযোগে সাহসে ভর্র করে নিজের বাড়ি ফিরে এসে বসবাস করার মধ্যে প্রতিজ্ঞা করেন স্ত্রীর মুখদর্শন তিনি কোনোক্রমেই করবেন না। অন্য জায়গায় বিবাহ করবেন। রসময়ী এ বাড়িতে ফিরে এলে তার প্রবেশ সব দিক থেকে একেবারেই নিষিদ্ধ। এদিকে রসময়ীর পিত্রালয়ে থাকে তার বিধবা দিদি বিনোদিনী, দুটি ছোট ভাই কারখানার কর্মী নবীন ও স্কুল ছেড়ে বাড়ি বসা সুবোধ। আগে রসময়ী ঝগড়া-বিবাদের কোনো কারণে পিত্রালয়ে এলে ক্ষেত্রমোহনবাবু নিজে থেকে এসে সাধ্যসাধনা করে স্ত্রীকে নিজগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন। এবারে এক মাসের ওপর হয়ে গেলেও না আসায় রসময়ী কিছুটা চিন্তিত।

গ্রামের একটি স্কুল-পড়া ছেলে প্রচার করে ক্ষেত্রমোহনবাবু আবার বিবাহ করছেন চুঁচুড়ার হরিশচন্দ্র চাটুজ্যে—যিনি জজ-আদালতে কাজ করেন—তাঁর তেরো বছরের মেয়েকে। শোনার পরেই সেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তাকে বাড়ির বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে বিনোদিনী ও রসময়ী যায় হরিশ চাটুজ্যের বাড়ির অন্দরমহলে। সেখানে, ক্ষেত্রমোহনবাবুর বলা স্ত্রী রসময়ীর দজ্জাল ব্যবহারের বিষয় ও স্বামী রসময়ীকে ত্যাগ করেছে এমন কথা শুনে অসম্ভব ক্ষিপ্ত হয়ে রসময়ী চিৎকার, গালাগালি, মারধোর ও শেষে এক কদর্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এমন বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পুলিশ এসে পৌঁছলে দিদি বিনোদিনীর যুক্তি রসময়ী মেনে খিড়কি দরজা দিয়ে বাইরে আসে এবং নিজেদের গাড়িতে চেপে পালিয়ে মুক্তি পায়।

হরিশচন্দ্রবাবু শেষ পর্যন্ত গৃহিণীর যুক্তিতে—তাঁদের মেয়ে এমন বিয়ের পর রসময়ীর মতো সতীনের হাতে খুন হতে পারে—এই ভাবনায় কন্যাদানে বিরত হন। পরের দিন কাছারিতে গিয়ে ক্ষেত্রমোহনবাবু সব শুনে রাগে জ্বলতে থাকেন। কাছারিবাড়িতে ফিরে ক্ষেত্রমোহনবাবু যখন তামাক সেবনে ব্যস্ত, তখনি আসে রসময়ী। উভয়ের মধ্যে তীব্র ক্রোধান্ধ শ্লেষাত্মক সংলাপ বিনিময়ের পর রসময়ী—তার স্বামী আবার বিয়ে করলে কি বিধান দেবে—ফিরিস্তি দেয়।

'ক্ষেত্রমোহন বলিলেন,—"তুমি না মরলে আর বিয়ে করছি নে, মরবে কবে?" ....রসময়ী বিদ্রূপের স্বরে হাসিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া বলিল—'রসি বামনি এখনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব।' রসময়ীর পক্ষে যুক্তি হল—স্বামী একেবারে সম্পূর্ণ অক্ষম বৃদ্ধ হয়ে গেলে কোনো মেয়ে যখন তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না, তখনি মরবে।

কিন্তু এইসব কথার পর ছ'মাস কেটে গেলে ত্রুটিহীন চিকিৎসার পরেই রসময়ীর মৃত্যু ঘটে। আর তার মুখাগ্নি করে—স্ত্রীর কাছ থেকে নানা গঞ্জনা কষ্ট পেয়েও ক্ষেত্রমোহনই। স্ত্রীর জন্য অশ্রুসংবরণেও অক্ষম হন। এই ঘটনারও ছ'মাস পরে যখন ক্ষেত্রমোহন নিজে হুগলির ইংরেজি জানা রজনীকান্ত ঘোষালের মেয়ে দেখে পছন্দ করেন, কাল আশীর্বাদ হবে—সব ঠিক, ক্ষেত্রমোহনবাবুর খুড়া আশীর্বাদ উপলক্ষ্যে উপস্থিত সেদিন, হঠাৎ ডাকে একটি চিঠি আসে, যার খামের ওপরের বেগুনি রঙের ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা ও ভিতরের চিঠির অংশ উভয়ত, এবং ভাষাও একেবারে মৃত রসময়ীরই! তাতে রসময়ী লেখে সে বাড়ির সামনের বটগাছে মৃত্যুর পর বাস করছে। ক্ষেত্রমোহন যদি বিবাহ করে তবে তার অশেষ দুর্গতি। ক্ষেত্রমোহনবাবুর খুড়ার ভূতে বিশ্বাস ও যাবতীয় সংস্কার অসীম। তার কথাবার্তা আচরণে ক্ষেত্রমোহনের 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হওয়ার মতো অবস্থা দেখা দেয়। ভয়ঙ্কর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলার মধ্যে পরের দিন আশীর্বাদ হয়ে যায়। চিঠি রসময়ীর দিক থেকে সত্য কিনা, এ নিয়ে থিওজফিস্ট মহলে গবেষণা, বিপুল চিন্তা-ভাবনা, সত্য-মিথ্যা যাচাই বিচার-বিবেচনা চলতে থাকে। ভূত বিষয়ে প্রাচীন ও নব্যশিক্ষিত দেশি ও বিদেশি মানুষ ও পণ্ডিতদের গবেষণার অন্ত থাকে না রসময়ীর চিঠিকে কেন্দ্র করে। আশীর্বাদের পর বিবাহের দিন ঠিক হয়ে গেলে আবার আর একটি চিঠি আসে রসময়ীর নাম স্বাক্ষরিত হয়ে। তার মধ্যে রসময়ীর কঠিন ক্রুদ্ধ শাসন এই বিবাহ করলে রসি বামনির হাতে তার রাতের ঘুম আর কোনোদিনই ভাঙবে না। ক্রমশ সমস্ত দিক বিচার করে পত্রগুলি যে রসময়ীরই লেখা এবং তার মৃত আত্মার চরম আদেশ—তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রমোহনবাবু বাড়ির সামনের বটগাছটিকে সমূহ ভয়ের আধার ভাবতে থাকে।

খুড়ার যুক্তিতে শেষে ক্ষেত্রমোহনবাবু বছর পূর্ণ হলে বিবাহের আয়োজন স্থির করে থাকে। ইতিমধ্যে তিনি গয়ায় পিণ্ড দিয়ে আসবেন। সেইমতো কন্যার পিতাকেও জানানো হয়। জালিয়াতি মোকদ্দমায় ব্যস্ত ক্ষেত্রমোহনবাবু এক মোকদ্দমার আগের দিন সন্ধেয় কাছারি থেকে ফেরার সময় আবার রসময়ীর তৃতীয় চিঠি পান। তাতে রসময়ী স্বামীর গয়াযাত্রার কথা বলেছে। জানিয়েছে পিণ্ড দিলেও ক্ষেত্রমোহন নতুন বিবাহে তার থেকে মুক্তি পাবে না। ট্রেনে তাঁর গয়াযাত্রার সময় রসময়ী চোরের স্বভাবে ও পোশাকে ট্রেনে উঠে স্বামীর বুকে ছোরা বসাবে। থিয়জফি শাস্ত্রে অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরি বসাতে পারে কিনা—এইসব জটিল ভূততত্ত্ব আলোচনার মধ্যেই বিবাহ আর হল না। চিঠিগুলিও সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রবল। এর মধ্যে একসময়ে নিজের দুর্ভাগ্যের দুঃখে বিষণ্ণ ক্ষেত্রমোহনবাবু যখন গভীর দুঃখিত, তাঁর কাছে হঠাৎ খবর আসে, তাঁর হালিশহরের শ্বশুরবাড়িতে দোলের উৎসবে বাজি পোড়াতে গিয়ে ছোট শ্যালক সুবোধ হয়েছে জখম। তাকে হাসপাতালে দেখতে যান ক্ষেত্রমোহনবাবু তাঁর ভাড়া গাড়ি নিয়ে।

হাসপাতালে উপস্থিত বিধবা শ্যালিকা বিনোদিনী। সারাদিন ধরে চিকিৎসা, ঔষধ প্রয়োগ ও শুশ্রূষার পর যখন ডাক্তাররা জানান বাঁচার সম্ভাবনা কম, তখন বিনোদিনী হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে নারাজ। সে রোগীর কাছে থাকতে চায়। সে নিয়ম নেই

ডাক্তাররা তা জানানোয়, শেষে ক্ষেত্রমোহনবাবুর যুক্তিতে বিনোদিনী তার ভগ্নীপতির ভাড়া গাড়িতে চেপে বাড়ি ফেরে। এবং বিনোদিনী সে রাতে তাদের বাড়ি থাকার কথা বললে ক্ষেত্রমোহনবাবু রাজি হন। কিন্তু ভোরের দিকে আচমকা পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলে। পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘোড়ায় চেপে এসে ক্ষেত্রবাবুকে যে সব জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাতে বোঝা যায়, তাদের সন্দেহ এই বাড়িতে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বোমা তৈরি হয়। পুলিশ তন্নতন্ন করে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু অভিযোগ করার মতো কাগজপত্তর, বেআইনি জিনিস কিছুই পায় না তারা। যতক্ষণ পুলিশ অনুসন্ধান চালায়, ততক্ষণ সমানে বিনোদিনী বাড়ির তুলসীতলায় হরিনামের মালা হাতে নিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে। সব শেষে উঠানে জিনিসপত্তর জড়ো করা হয়। তার মধ্যে থেকে বেরোয় এক ধুলোভর্তি চিঠির ফাইল। বিনোদিনীর বাক্স থেকেও বেরোয় এক বান্ডিল চিঠি ও কিছু ঠিকানা লেখা শাদা খাম। দারোগা কাগজপত্রগুলির লিখিত ফিরিস্তি তৈরিতে ব্যস্ত, ক্ষেত্রমোহনবাবু পুলিশের মত নিয়ে শাদা খামগুলি দেখতে থাকেন। খান কুড়ি চিঠির প্রতিটি বেগুনি রঙের মেজেন্টা কালিতে লেখা, রসময়ীর হস্তাক্ষর, খামের ওপর ক্ষেত্রমোহনের ঠিকানা। কিছু চিঠি ক্ষেত্রবাবু নিজেই খুলে পড়লেন। নানা অবস্থা কল্পনা করে অনুমানে চিঠিগুলি লেখা। কোনো কোনোটিতে রসময়ীর বটগাছে বসবাসের কথাও আছে। আছে গয়ায় ক্ষেত্রমোহনবাবুর পিণ্ডদান করে আসার কথা। একটি চিঠির কথা : "কল্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই তুমি শুনিলে না। আচ্ছা, বাসরঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইয়া মারিব"—ইত্যাদি। সমস্ত ব্যাপারটি ক্ষেত্রমোহনের কাছে দিনেব আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা-চিত্রটি এই রকম :

> 'বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন,—
> "ঠাকুরঝি, এসব কি?"
> ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।'

'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটির প্লটের জটিলতা উল্লিখিত কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে, প্রধান প্রধান চরিত্রের আশ্রয়ে বিস্তৃতি ও শিল্পের ঘনত্ব পেয়েছে। গল্পটির প্রধান কাহিনীর তিনটি স্তর : ১. স্বামীর সঙ্গে রসময়ীর তীব্রতম সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চরম সন্ত্রাসের শেষ সীমায় রসময়ীর স্বাভাবিক মৃত্যু (প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদের শুরুর অংশ এই স্তরের সীমা-নির্দেশক) ২. রসময়ীর মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহনবাবুর নতুন বিবাহের আয়োজন এবং সেই সূত্র ধরেই মৃত রসময়ীর কাছ থেকে তিনখানি চিঠির প্রাপ্তির মধ্যে ভূত-তত্ত্ব ও ভৌতিক ভয় নিয়ে তীব্র আলোড়ন এবং গল্পের নায়কের চরম বাহ্যিক ও মানসিক বিপর্যস্ততার করুণ স্বরূপ (পঞ্চম পরিচ্ছেদের রসময়ীর মৃত্যুর পর থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি-সীমা) ৩. গল্পের জটিল জটের বন্ধনমোচন, উতরোল কৌতুকরসের বিস্তারে ও বিস্ময়ে গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় রস-নিষ্পত্তি (অষ্টম পরিচ্ছেদ)।

প্রথম স্তরে তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিনোদিনী ও রসময়ীর গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়ার

মাধবীতলায় হরিশবাবুর বাড়ি গিয়ে বীভৎস কুৎসিত বিবাদী দৃশ্যের জন্ম দেয়, পরে ক্ষেত্রমোহনের কাছে এসে একা রসময়ী স্বামীকে শাসন করে নতুন বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে—এই দুই দৃশ্য গল্পের প্লটের গাঁথুনির উজ্জ্বলতম অংশ। প্রভাতকুমার নিপুণ লেখনীব সফল বাস্তবসম্মত প্রতিচিত্রণে গল্পের কাহিনী ও ঘটনাকে ভূতসম্পর্কিত ভাবনার সঙ্গে শিল্পের ন্যায়ে চমৎকারিত্ব এনেছেন। রসময়ীর মৃত্যুর পর একে একে পরলোক থেকে ক্ষেত্রমোহনবাবুর কাছে একাধিক চিঠি আসার শিহরিত ঘটনায় প্লটের বাঁধুনি হয় শক্ত। ভূতের ভয় ও রসময়ীর স্বামীর অসহায়তার চরম রূপ তুলে ধরার পক্ষে মধ্যবর্তী ভৌতিকরসকে লেখকের পক্ষে বিশ্বাস্য করার অভিনব প্রয়াস, থিওজফিস্ট সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তি ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল চিত্তবৃত্তির জীবন্ত বাস্তব রূপ নির্মাণ—এসব কথাকারের সংযত কলমে প্লটের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে করে নিয়তির মতো অমোঘ। এই অনড় অবস্থার নিরসন হয় দোলের দিনের সাধারণ বাজি পোড়ানোর দুর্ঘটনাকে সে সময়ে শাসক শ্রেণীর প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনা ও বোমার ভয়ের সঙ্গে এক করে দেখার সূত্রে।

অর্থাৎ প্রভাতকুমার গল্পের কাঠামোয় এতটুকুও মেদ রাখেননি। রসময়ীর চিঠি ও ক্ষেত্রমোহনবাবুর বিবাহ বাসনা এবং যাবতীয় তৎপরতা সূত্রে ভূত বিষয়ক আলোচনা ও বিশ্লেষণ গল্পের প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টির একান্ত অনুগ। যখন ভূত বিষয়ক ভয় ও ভাবনা তুঙ্গে, তখনি বৃটিশ পুলিশের বাড়ি সার্চ করা থেকে বেরিয়ে আসে গল্পের কেন্দ্রীয় রহস্যের একই সঙ্গে climax ও পরিণতির কৌতুকরসসিক্ত উতরোল ব্যঞ্জনার নির্মল আকাশ। পুলিশি investigation থেকে প্লটের জট সরে এসে ক্ষেত্রমোহন ও বিনোদিনীর পারস্পরিক বিপরীতমূলক ভাবনার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায়। কিন্তু প্রভাতকুমারের সেই বিশেষ সিচুয়েশানকে অত্যন্ত সংযত স্বভাবে ও শৈল্পিক নিপুণতায় পাঠকদের রসনিষ্পত্তির মুক্ত সুযোগ এনে দেয়। জীবিত রসময়ীর দিক থেকে নানা অবস্থা কল্পনা করে অনুমানে চিঠিগুলি লেখার কৌশল মোক্তার ক্ষেত্রমোহনবাবুর পক্ষে মেঘের অপসারণে স্বচ্ছতায় আকাশ দেখায়, ব্যঞ্জনায় শিল্পরসিক পাঠকদের মনে প্রহসনের 'fun'-কে প্রতিষ্ঠা দেয় :

> "সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত তখন ক্ষেত্রমোহনের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।
>
> বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিয়াছেন—'ঠাকুরঝি এসব কি?'
>
> ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।"

দুই

'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল—স্বামী-স্ত্রীর তীব্র বিরোধমূলক সাংসারিক পারস্পরিক বিবাদের কথা মনে রেখে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর বিড়ম্বিত, দুর্ভাব জীবনচিত্র অঙ্কন। কিন্তু এই চিত্রে নেই সার্থক ছোটগল্পের উপযোগী প্রধান চরিত্রদের জটিল মনস্তত্ত্বের উন্মোচন, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বময় সংঘাত-সংঘর্ষের কথা। ঘটনা-সংস্থাপন ও

যথোচিত পরিস্থিতির উপযুক্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যাবতীয় বিরোধকে শিল্পরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন প্রভাতকুমার। ঘটনাগুলি প্রয়োগের গুণে 'delightful' হয়, কিন্তু 'mental' নয়। লেখকের নিজস্ব বলার রীতিতে, সাজানোর নিপুণতায় মূল উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব সহজেই বোধগম্য হয় সমস্ত সমস্যার মীমাংসার অন্তে।

আলোচ্য গল্পের বিষয়ে আছে এক নিঃসন্তান, দজ্জাল নারীর জীবিত অবস্থায় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে সপত্নীকে সহ্য না করার মতো উৎকট ঈর্ষাতুর মানসিকতা। আচরণের সমস্ত ভদ্রতা, সভ্যতা, সম্পর্কের সমস্তরকম 'নর্ম'-গুলিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, স্বামীর ওপর অকথ্য কর্তৃত্ববোধে, শাসনে-তর্জনে স্ত্রীর নিজের দীনতা, অক্ষমতা প্রকাশের দিক। গল্পে আছে সেই রসময়ীর মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহনের চল্লিশ বছর বয়সেও এক তেরো বছরের বালিকাকে বিবাহের বাসনা। এটি গল্পে উল্লিখিত মাত্র, কিন্তু সামাজিক এই ব্যবস্থাকে অবশ্য প্রভাতকুমার আদৌ কোনো বাঁকা চোখে দেখেননি, কারণ গল্পের মূল উদ্দেশ্য অন্য। তাছাড়া সে সময়ে এমন বিবাহব্যবস্থা ছিল সামাজিক রীতিসম্মত।

গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে আছে স্ত্রী রসময়ীর মৃত্যুর পরেও একের পর এক ভৌতিক পত্র পাঠিয়ে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত করার জন্য, জব্দ ও শাসন করার জন্য প্রহসনাত্মক প্রয়াস। এই প্রয়াসের গোপন রহস্যটি নিয়েই গল্পকারের এমন গল্প রচনা। গল্পের যে গোপন চাবিকাঠি তার খোঁজ মেলে এই ভৌতিক চিঠিগুলির মধ্যেই, রসময়ীর মৃত্যুর পরেও পার্থিব জগতে তার অস্তিত্ব বজায় থাকার থিওজফিস্ট তর্কবিতর্কের বিচারণার বিভ্রান্তিতে। প্রভাতকুমার সুকৌশলে নিছক ভূততত্ত্ব ও ভৌতিক ভয় সৃষ্টির কারুকলা ও সবের বিফলত্ব দেখাতে ছোটগল্পে 'আর্ট' অবলম্বন করেছেন।

আগেই বলেছি, কোনো গভীর জটিল মনস্তত্ত্ব এর মধ্যে নেই। মৃত বা জীবিত চরিত্রের আত্মউন্মোচনের কোনো প্রয়াস নেই। নিছক সম্পর্ক নিয়ে এক খেলা গল্পের কেন্দ্রিত বিষয়কে বিশ্বাস্য করে। আসলে Tragedy of fate বা 'Character' নয়, Tragedy of situations গল্পের মূল কথাকে করেছে আকর্ষণীয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষে একা বিধবা বিনোদিনী—ক্ষেত্রমোহনের শ্যালিকা, পরোক্ষে রসময়ী ও বিনোদিনী দুই বোনের অসাধারণ কৌতুকরস দীপ্ত বুদ্ধির ব্যবহার। স্বামীর ওপর রসময়ীর মৃত্যুর পরেও প্রতিশোধস্পৃহায় এমন বুদ্ধিগত কৌশল অবলম্বিত। আর বিনোদিনীর দিক থেকে সেই যে বুদ্ধির operation, সেখানে বিনোদিনীর গোপনতম সক্রিয়তা গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যটিকে সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় করে পাঠকদের কাছে।

প্রভাতকুমার কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে অলৌকিক রস ও ভূততত্ত্বকে যোগ করেছেন। পূর্বসূরি ত্রৈলোক্যনাথ ভূত নিয়ে একাধিক অভিনব কল্পনার গল্প ও উপন্যাস রচনা করে গেছেন। 'স্কাল ও স্কেলিটন', ডমরুচরিতের 'লুল্লু' ভূত, ভিকু ডাক্তারের ভূত বিষয়ক অভিজ্ঞতা ছোটগল্পের বিষয়ে এককালে লোভনীয় অলংকার ছিল। ত্রৈলোক্যনাথের ভিকু ডাক্তারের নিজস্ব ডাক্তারিবিদ্যার অভিজ্ঞতা বর্ণনায় ভূত এইরকম :

'একবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমি ঝিলগ্রামের শ্মশানঘাটের নিকট দিয়া

> যাইতেছিলাম। দেখিলাম যে, সে স্থানে কয়েকটি ভূত কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া কমিটী করিতেছে। আমি একটু দূরে বসিয়া ব্যাগ হইতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বাহির করিলাম। দিয়াশলাই জ্বালিয়া তাহার আলোকে ভূতের ঔষধ দেখিলাম। তাহার পর যেই ঔষধের শিশি বাহির করিয়াছি, আর তাহার গন্ধ পাইয়াই ভূতেরা রুদ্ধশ্বাস হইয়াই পলায়ন করিল। একটু বিলম্ব করিলে আমার ঔষধের গুণে তাহারা ভস্ম হইয়া যাইত। ভূতের ছাই দিয়া হিস্টিরিয়া রোগের চমৎকার ঔষধ আমি প্রস্তুত করিতে পারিতাম।'

এখানে ত্রৈলোক্যনাথের ভূত কোনো তত্ত্ব নয়। তারা জীবিত প্রাণীদের মতো আচরণ করে। তাদের কথা বলে মানুষ বিশেষ করে ডাক্তার নিজেদের রোগী সারানোর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। ভিকু ডাক্তার এই ভূতের প্রসঙ্গ বিস্তারিত করে জানায়:

> ......'ভূতগণ যখন পলায়ন করিল, তখন আমি সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম যে তাহারা এক মড়া ভক্ষণ করিতেছিল। মড়ার হাত-পা সর্বশরীর তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছিল, কেবল মুখটি অবশিষ্ট ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুলি বাহির করিয়া তাহার মুখে দিলাম। মুখে গুলি দিবা মাত্র সে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আশ্চর্য্য কথা কি বলিব মহাশয়! আমার ঔষধের গুণে তাহার শরীর গজাইতে লাগিল। প্রথম গলা হইল, তাহার পর বক্ষঃস্থল হইল, তাহার পর উদর হইল, তাহার পর হাত-পা হইল। সে উঠিয়া বসিল। তখন আমি বুঝিলাম যে, সে হিন্দুস্থানী, বাঙালী নহে। সে রাত্রি আমি তাহাকে আমার বাটীতে লইয়া যাইলাম। পরদিন সে আপনার দেশে চলিয়া গেল। এখানে থাকিলে আপনাদিগকে দেখাইতাম।'

এখানে ভূত ত্রৈলোক্যনাথের রসাপ্লুত গালগপ্পের, বৈঠকী আড্ডা জমানোর, রূপকথা স্বভাব থেকে রূপ হয়ে ওঠার উপকরণ।

প্রভাতকুমারের ভূত-ভাবনা রসময়ীর চিঠির সূত্রে অলৌকিক আত্মার কথা, নানা যুক্তি-তর্কের জন্ম দিয়েছে। ভূতের কোনো বর্ণনা নেই, সে বটগাছে অশরীর বাস করে—এমন উল্লেখ আছে। তাত্ত্বিক আলোচনায়, তর্কেবিতর্কে, বাস্তব বিচারে, কোর্টে আইনি আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাকে ভাবা হয়েছে। কিন্তু গল্পের সিদ্ধান্তে এই ভূত-তত্ত্ব যখন প্রহসনের সামনে যাচাই হয় তখন ভূত সম্পর্কে প্রভাতকুমারের কেন্দ্রীয় ভাবনার যৌক্তিকতা আসামীর কাঠগড়ার মতো সামনে আসে। প্রভাতকুমারের ভূত কেন্দ্রীয় বক্তব্য প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র। থিওজফিক সোসাইটি ও পণ্ডিতদের শ্লেষে উপেক্ষা করে কৌতুকরসের অবাধ প্রবাহ আনে। ভূত যে অ-সত্য, অবাস্তব, মানুষেরই অলৌকিক বিশ্বাসের সূত্রে আত্মগত বিভ্রান্তি, 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে গল্পকার প্রভাতকুমারের তা-ই শিল্পভাবনার 'মিশন'।

তিন

'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে তিনটি প্রধান চরিত্রের পরিচয় মেলে—বিনোদিনী,

ক্ষেত্রমোহন ও রসময়ী। এর মধ্যে বিনোদিনীর গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ সমগ্র গল্প-ভাবনার নেপথ্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে রসময়ীর আচরণ ও চিঠি সব থেকে প্রধান force, আসলে তা নয়। ক্ষেত্রমোহন তাঁর স্বস্থানে ঠিক আছেন। রসময়ীর মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকার মধ্যে চরিত্রের 'motive' গুরুত্ব পেতেই পারে, তবে গল্পের রসময়ীর বেঁচে থাকা ও মৃত্যুর পরের যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকাণ্ডের একমাত্র যন্ত্রী বিনোদিনীই। সমগ্র গল্পটির ছক, আড়ালের কলাকৌশলে বিনোদিনীর হাতে ও বুদ্ধিতে ধরা আছে প্রধান চাবিকাঠি।

সমগ্র গল্পে চরিত্র আঁকায় যে সীমা, তার মূলে আছে প্রভাতকুমারের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ভাবনাচিন্তার অভাব। চরিত্রের মনোলোকের যে বাস্তবতা, লেখক সেদিকে তাকাননি। নিয়েছেন কাহিনী ও ঘটনার সমবায়িক 'স্কেলিটন', তাতে মিশেল দিয়েছে ঘটনা সাজানোর নিপুণ কৌশল ও ঘটনাসূত্রে দেখা-দেওয়া জটিল পরিস্থিতিকে শিল্পের কাজে লাগানোর বিস্ময়কর নিপুণতা। গল্প থেকেই বোঝা যায়, বিনোদিনী বিধবা এবং সংযত ও স্বল্পবাক নারী। সে বোনের—রসময়ীর চণ্ডাল রাগ ও অকথ্য, অভব্য, অরুচিকর আচরণের কারণ বোঝে। আর বোঝে বলেই রসময়ীর কথামতো ক্ষেত্রমোহনকে জব্দ করার জন্য, দ্বিতীয় বিবাহে বাধা দেওয়ার কর্মসূচিতে বড় অংশ নেয়।

এই সূত্রে বিনোদিনীর মানস গঠনের কিছু সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য দিক লক্ষ করতে হয়। প্রভাতকুমার সে সব ভাবেননি, কারণ, আবার বলি, psychological conflict বলতে যা বোঝায় পুরুষ ও নারী চরিত্রে, যা শিল্পের পূর্ণ বাস্তবতার অনুগ, তা প্রভাতকুমারের ভাবনায় নেই। 'রসময়ীর রসিকতা'র সিদ্ধান্ত তারই প্রমাণ।

গল্পের শুরুতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রথম প্যারাগ্রাফে লেখকের বর্ণনায় জানতে পারি রসময়ীর বাপের বাড়িতে বাবা-মা জীবিত নেই, আছে তার বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং দু'ভাই নবীন ও সুবোধ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই ক্ষেত্রমোহনবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের খবর পাড়ার এক স্কুল-বালকের কাছে শুনে রসময়ীর দিদিই প্রথম এক বিকেলে ছেলেটিকে বাড়িতে ডেকে তাকে মিষ্টি ইত্যাদিতে আদর-অভ্যর্থনা করে ক্ষেত্রমোহনবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের হবু শ্বশুরালয়ের খবর জেনে নেয়। পাত্রীর বয়স তেরো এবং 'বেশ সুন্দর' শুনে প্রভাতকুমারের বর্ণনায় 'বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন।' এই কথোপকথনের সময় রসময়ী কাছে ছিল না। বিনোদিনী নিজে ছেলেটির সঙ্গে যুক্তি করে ওদের দু'বোনকে সেই হরিশ চাটুজ্যের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। বালক কারণ জানতে চাওয়ার সময় বিনোদিনীই জানায় 'বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না—তার মেয়েও জলে পড়বে...'। হরিশচন্দ্রবাবুর বাড়ি রসময়ী যে কুৎসিত হামলা, মারধোর, চিৎকার-চেঁচামেচি, ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটায়, তাতে নেতৃত্ব দেয় বিনোদিনীই। যখন রসময়ীব চূড়ান্ত অপদস্থ করার সক্রিয়তা সামনে ঘটে এতক্ষণ ধরে, তখন 'বিনোদিনী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।'

এমন যে বিনোদিনীর ধীব স্থির সংযত শান্ত মূর্তি এত সম্পর্কের চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যেও, তাতে কি সন্দেহ হয় না রসময়ীকে এভাবে চিঠি লিখে রাখার যুক্তির অনেকটাই

বিনোদিনীর? বিনোদিনীর দিক থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক মূল্যে ভাবা দরকার! ১. ক্ষেত্রমোহনের শ্যালিকা বিনোদিনী, বয়সে না হলেও ভগ্নীপতির সঙ্গে সম্পর্কে বড়। শ্যালিকার সঙ্গে মধুর রোমান্টিক হাসি-ঠাট্টা সেকালে প্রচলিত ছিল বেশি মাত্রায়। রসময়ীকে দিয়ে চিঠি লেখানো কি সেই ঠাট্টারই অঙ্গ? ২. বিনোদিনী বিধবা, সংযত চরিত্রের মহিলা। রসময়ী মারা যাবার পর বিনোদিনী কি তাদের পরিবারের রক্ষক পুরুষ হিসেবে ভগ্নীপতিই আদর্শ, বিনোদিনীর মনের বাসনা তা হতে পারে না? ৩. ক্ষেত্রমোহনের দ্বিতীয় বিবাহ বাসনায় বিনোদিনী নিজে কি দুই ভাইয়ের স্বার্থে এবং নিজে নিঃসন্তান থাকায় প্রার্থী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে পারত না? ৪. তা যদি না-ও হয়, সে সময়ে সমাজে রক্ষিতা রাখার চল ছিল অনেকটাই, বিনোদিনীর কি বোনের মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহনের রক্ষিতা হয়ে থাকার বাসনাও নীতিবিগর্হিত হত? যেখানে চল্লিশ বছরে দ্বিতীয় বিবাহ করার ক্ষমতা ও বাসনা আছে, অর্থভাগ্যও উত্তম, তা হলে প্রথমটি বাদে বাকি তিনটি প্রশ্ন আলোচনা করা যেত, যদি প্রভাতকুমার চরিত্রটির বিচাব মর্মলোকের বাস্তবতায় বিভিন্ন 'ডাইমেনশানে' ভাবতে পারতেন শিল্পী-মন দিয়ে। তাই আপাতত প্রশ্ন ওঠাই থাক।

এবার শ্যালিকা-ক্ষেত্রমোহনের সম্পর্কের মাধুর্য, রোমান্টিকতা, হাসি-ঠাট্টায় গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হয়, রসময়ীর পাগলামিতে বন্দোবস্ত মতো চিঠিগুলি ডাকে ফেলে সে শালী-জামাইবাবুব সম্পর্কের কৌতুকরসের স্বাদ দিতে চেয়েছে। মনে রাখা দরকার, রসময়ী মৃত, তার বেঁচে থাকার সময় সব চিঠির পরিকল্পনা বিনোদিনীর বোনের মনের ইন্ধন-অনুগ ভাবনাতেই ডাকে ফেলা হয়েছে! রসময়ী নিঃসন্তান, দজ্জাল, স্বভাব-ক্রোধী। সে একটা জায়গায় তার জীবনধর্মের ও আচরণের সীমায় বাঁধা। বিনোদিনী তা নয়। তাহলে রসময়ীর সেই আগেব চিঠিগুলি রসময়ীব মারা যাবার পর ডাকে ফেলার উদ্দেশ্য কী! প্রবঞ্চিত বোনের বিদেহী আত্মার শান্তিকামনা, নাকি ক্ষেত্রমোহনের ওপর রাগের বশে প্রতিশোধ নেওয়াব আনন্দ? গল্পে বিনোদিনী যে সমস্ত ছোট বড় ঘটনার, সক্রিয়তার যন্ত্রী—বুদ্ধি ও বিবেক ধ'রে—তা তো গল্পেব শেষে পরিষ্কার ধরা পড়ে :

> 'সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোব মত তখন ক্ষেত্রমোহনের নিকট পবিষ্কার হইয়া গেল।
>
> বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন,"ঠাকুর ঝি এসব কি?"
>
> ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।'

এই যে ওর সামনে বিনোদিনীর বাক্সের সব চিঠি ক্ষেত্রমোহনের নিবিষ্ট হয়ে দেখা ও আসল বিষয় পরিষ্কার হওয়া, তার পরে নিবিষ্টতার ভানে বিনোদিনীর মালা জপের কাজটি কি বাস্তব সত্যকে অস্বীকাব কবা, না, ভগ্নীপতির প্রতি বিনোদিনীর প্রতিশোধস্পৃহায় গোপন সুখ, অথবা তামাশার এক অবচেতন মনের ক্রীড়াসুখ?

আমাদের মনে হয় অবচেতন মনের কোনো ক্রিয়া গল্পকার প্রয়োগ করতে অক্ষম। চবিত্রেব বাস্তবতা প্রভাতকুমারের গল্পে মনের বাস্তবতায় নয়, গল্পের কাহিনীস্রোতে ঘটনাব যথাযথ

বিন্যাসে পরিবেশ-সফল নৈপুণ্যে তার সীমা ও শিল্পের মহিমা। বিনোদিনী তা-ই। এ গল্পের নায়িকা রসময়ী নয়, বিনোদিনী। সে হল চিঠি-সংক্রান্ত অলৌকিক রসসৃষ্টি এবং ছোটবোনকে যথাযথ পথে চালনা করার উপযোগী গল্পকারের শিল্প-সীমার এক ব্যক্তিত্ব।

রসময়ী চিঠিগুলো নিজেই লিখেছে ঠিক, কিন্তু তার এই বুদ্ধি তার চরিত্রন্যায়ে আসে না, আসতে পারে না। রসময়ী অত্যন্ত রাগী, ব্যক্তিত্বহীন, নিঃসন্তান হওয়ার কারণে অবচেতন মনে 'obsessed'। তার মধ্যে প্রবলভাবে purvertion থাকায় সে যুক্তি-চিন্তার সমস্ত দিক ছাড়িয়ে আচরণ করে। রসময়ীকে আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথমেই শেষ দেখি। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে রসময়ী তার চিঠিতে জীবন্ত। তার চিঠির ভাষা, বানান, লক্ষ্য, motive আমাদের হাসির উদ্রেক করে। সে কোনো যুক্তি মানে না, জানেও না। ক্ষেত্রমোহনের মতো বাংলা-নবিশ মোক্তারের স্ত্রী হওয়ার সে অযোগ্য। তার চিঠির ভাষা ও ঠিক সময়ে প্রাপকের কাছে পৌঁছনোয় কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা গল্পকারের পরিকল্পনার সাফল্য বোঝায়। চিঠিতে কাজ হওয়ার যে আনন্দ, তা তো বিনোদিনীর প্রাপ্য। গল্পের গোপনতা ও চমক সৃষ্টির কারণে সেই আনন্দের বিষয় আনতে পারেননি গল্পকার। ক্ষেত্রমোহনকে জব্দ করতে গিয়ে রসময়ী ও বিনোদিনীর যৌথ প্রয়াস ক্রমশ সার্থক হতে থাকলেও মৃত রসময়ী তো তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, বিনোদিনীর বরং কৌশলের জয়। গল্পের কাঠামোয় রসময়ীর রসিকতার বিষয়টি গল্পকারের সীমান্ত চরিত্রভাবনায় হয়ে গেছে স্থিতিপ্রাণ।

ক্ষেত্রমোহনবাবু গল্পকারের আঁকা একটি সার্থক নায়ক চরিত্র। মোক্তার মানুষ, স্বভাবতই যুক্তিনিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়। কিন্তু রসময়ীর অস্বাভাবিক চরিত্রদোষে তিনি বিভ্রান্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁর মধ্যে গভীর মানবতাবোধ আছে, দজ্জাল হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী রসময়ীর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। পঞ্চম পরিচ্ছেদে রসময়ীর অসুস্থতায় ও মৃত্যুতে তার প্রমাণ মেলে। রসময়ীর অসুস্থ অবস্থার পর মৃত্যুর আগের মধ্যবর্তী সময়ের খবর : 'চিকিৎসাদির কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু রসময়ী বাঁচিল না।' শুধু তাই নয়, লেখকের বর্ণনায় ক্ষেত্রমোহনবাবুর মানবিক পরিচয় মেলে : 'গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য্য সংসারের মায়া—যে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।'

ক্ষেত্রমোহনবাবু সংসারী ও সংসারবিলাসী মানুষ। রসময়ী তাঁকে সেই মানসিকতায় এতটুকু তৃপ্তি ও শান্তি দিতে পারেনি। রসময়ীর মৃত্যুর আগে গল্পে পাওয়া রসময়ীর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারে ক্ষেত্রমোহনবাবু পরিষ্কার তীব্র শ্লেষজর্জর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন : 'তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?' এর মধ্যে যেমন নিজের মনের জ্বালা আছে, তেমনি কিছুটা শান্তিকামনাও। এই ক্ষেত্রমোহন কিন্তু রসময়ীর অলৌকিক আত্মার চিঠি তিনটি পড়ার পর দুর্বল হয়ে যান। নানা সংশয়ের দোলায়, খুড়া মহাশয়ের নিজের ভূত বিশ্বাসে ও ভয়ে যেনবা ক্রমশ 'দশচক্রে ভগবান ভূত' অবস্থায় আসে। ক্ষেত্রমোহনবাবু রসময়ী মারা যাবার পর বার বার জীবনের দিকে ফিরতে চেয়েছিলেন সুস্থ বিবাহের

মাধ্যমে, তা সম্ভব হতে দেয়নি রসময়ীর চিঠি। চিঠিগুলি যে নকল—এটাই বার বার ক্ষেত্রমোহনবাবু মনেপ্রাণে বিচারের জন্য বড় বড় থিওজফিস্টকে দেখান। শেষে সরকারি উকিল মনোহরবাবুকে নিয়ে ডাক-বাংলায় সাহেবের কাছে যান। সেখানে সাহেবের কথায় ক্ষেত্রমোহনের মানস-প্রতিক্রিয়া বাস্তবিকই বেদনাদায়ক। 'সাহেব বলিলেন,—"পরীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তের লেখা।" ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল।'

গল্পের শেষে ক্ষেত্রমোহনবাবুর পুলিশের সামনে বিনোদিনীর চিঠির বাক্স থেকে বের হওয়া চিঠিগুলি পড়ার পর মূল বিষয়টি বুঝতে পারেন। তার পরেই লেখকের হাতে ক্ষেত্রমোহন হয়ে ওঠে এক সংযত ভদ্র ব্যক্তিত্ব। তাঁর মনের বহিঃপ্রকাশ শান্ত, যেনবা কিছুটা নির্বিকার। সমগ্র গল্পে নায়ক ক্ষেত্রমোহনের চরিত্রভাবনায় একটি বিবর্তন আছে। প্রথম দিকে রসময়ীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্ষেত্রমোহনবাবু অনেকটাই active। তিনি রসময়ীর সামনে কথায়, শ্লেষে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন এবং রসময়ীর সামনেই দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গ তুলে নিজের বাসনা জানিয়ে দেন। রসময়ীর চিঠি তিনটি ক্রমান্বয়ে পাওয়ার পর তিনি ভয় থেকে ভূতে বিশ্বাসী হয়ে হতাশায় নীরব হয়ে যান। প্রথম স্তরে ক্ষেত্রমোহন active। মধ্যস্তরে ভূতবিশ্বাসের ঘোরে, ভয়ে হন critical এবং ক্রমশ বিষাদগ্রস্ত, শেষ স্তরে মূল বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পর হন passive, অনুত্তেজক এবং Indifferent! অন্তত গল্পকারের সর্বশেষ সংক্ষিপ্ত চিত্রে, বিনোদিনীর attitude দিয়ে চিত্র শেষ করার পরে ক্ষেত্রমোহনকে তা-ই মনে হয়। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে বিষয়ের বিশিষ্টতায় রসময়ী জুগিয়েছে ইন্ধন, বিনোদিনী গোপনে থেকে সেই ইন্ধনের করেছে যথাযথ প্রয়োগ। গল্পের শেষে ক্ষেত্রমোহন বিষাদময়তার কালো রঙে সেই প্রয়োগ-চাতুর্যকে নিরাসক্তচিত্ততায় করেছে মান্য।

চার

'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি ভূত-প্রসঙ্গ নির্ভর কৌতুকরসাশ্রয়ী, চরিত্রাত্মক গল্প। অন্তত গল্পটির অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ অংশ পাঠের পর এমন সিদ্ধান্তই মনে ভাসে। গল্পটির ভাববস্তুর একমুখী স্বভাব আদ্যন্ত কাহিনী ও ঘটনানির্ভর চরিত্র-ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তায় প্রতিষ্ঠা পায়। গল্পের অন্যতম চরিত্র রসময়ীকে গল্পকার যেভাবে এঁকেছেন তার স্বামী ক্ষেত্রমোহনের পাশে, তাতে গল্পের ভাববস্তুর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের ভিতে স্ত্রী রসময়ী অন্যতম ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। তার কলহপরায়ণ, বদমেজাজি, উৎকট কর্মকাণ্ড, চিৎকার, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস, সতীন ভয়ের ভীতিবোধ—সমস্তই তার মৃত্যুর আগে প্লটে এমন গতি সৃষ্টি করেছে, যা তার মৃত্যুর পর ভূত-তত্ত্বের বিচারে চমৎকারিত্ব পায়।

রসময়ী মারা যায় এবং গল্পকার দেখিয়েছেন মারা যাবার পরেও তার অলৌকিক আত্মা একটানা স্বামীকে ভয় দেখায় বার বার চিঠি পাঠানোর মধ্য দিয়ে। স্বামী ক্ষেত্রমোহন যখনি দ্বিতীয় বিবাহের জন্য বাসনাময় হয় তখনি ভূতের স্বভাবে থেকে রসময়ী তাঁকে শাসন করে

বিয়ে না করার। তাঁকে মৃত্যুর ভয়ও দেখায়। এমন যে পর পর তিনটি পত্রবিভ্রাট—যা আদ্যন্ত রসময়ীরই নিজের হাতের লেখা, বানান ভাষা সবের প্রমাণ দেয়।

একদিকে রসময়ীর মৃত্যু, ভূতের স্বভাবে চিঠি লেখা, চিঠির বয়ানে স্বামী ক্ষেত্রমোহনের ভয়, অসহায়তা, দ্বিতীয়বার বিবাহ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত এসবেই মূলভাবের একমুখিতা রক্ষিত। প্রভাতকুমার আখ্যায়িকা বিবরণে তার গুরুত্ব দেখাননি। প্লটের জটে তার রসের ঘনত্ব ভাববস্তুর স্বাভাবিকতা এনেছে। গল্পের মাঝখানে প্রধান হয়েছে রসময়ীর পাঠানো পত্র নিয়ে থিওজফি সোসাইটির ভূত-তত্ত্ব প্রসঙ্গে বিস্তার, বিচারণা এবং সব মিলিয়ে অলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সমাধানহীন বিভ্রান্তি।

রসময়ী, তাব দিদি বিধবা বিনোদিনী, ক্ষেত্রমোহন—এদের চিন্তাভাবনায় যে থিওজফিস্ট সম্প্রদায়ের ভূত-বিচার ও ভাবনার ছবি সামনে আসে—তাতে আছে লেখকের শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গি। এই মনোভঙ্গি গুরুগম্ভীর নয়, fun জাতীয় কৌতুকরসের অনুগামী মনোভাব। গল্পের শেষে চিঠিগুলির অলৌকিক স্বভাবের মিথ্যারূপ, অসীম আত্মার নিষ্ফলত্বের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হলে গল্পের অন্তর্নিহিত ভাববস্তুর ভিতর থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে প্রহসনের মেজাজ। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে কৌতুকরসই প্রধান। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রমোহনের ভীতি, শঙ্কা, অসহায়তা গল্পের সর্বশেষ ব্যঞ্জনার পর পাঠকদের কাছে হাসির স্রোত বহায়। রসময়ীর স্বামীকে মৃত্যুর পর চিঠি পাঠানোর পরিকল্পনায়, চিঠির ভাষায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে, বিনোদিনীর নীরব নিরুচ্চার অন্তর্বর্তিনী স্বভাবে চিঠি ঠিকমতো পাঠানোর কার্যকারিতায় সবটাই কৌতুকরসের লঘুতা প্রাপ্ত হয়ে যায়, ফলে শেষে সব পরিষ্কার হয়—তাতে চরিত্রগুলি প্রহসনের সত্যেই চিহ্নিত হয়ে যায়।

গল্পের প্রকাশভঙ্গিতে আছে বিবৃতির ধর্মের থেকে ঘটনা ও পরিস্থিতির সম্যক সমবায়ে, চিন্তাভাবনার বৈপরীত্যে ঝরনাধারার মতো স্বতঃস্ফূর্ত হাসির ব্যঞ্জনা। এ বিষয়ে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব মূলে কৌতুকরসকেই যথাযথ বজায় রাখার আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে। চিঠিগুলির মধ্যে যে অলৌকিক রহস্যময় স্বভাব তৈরি হওয়ার সুযোগ আছে তা গল্পের পরিবেশ-এর পক্ষে জরুরি। কারণ তা না হলে গল্পের শেষের বিপরীত ব্যঞ্জনার জগৎ পাঠকদের কাছে একসঙ্গে বিস্ময়রস ও কৌতুকরস, হতবুদ্ধি স্বভাব ও বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসে উত্তরণচিত্র—গ্রাহ্য হয়ে যায় যুগপৎ। এ গল্পে কাহিনী বিষয় ও কেন্দ্রীয় সত্য অনুযায়ী পরিবেশ-পরিস্থিতি রচনা এবং সন্দেহের একটানা রহস্যময়তা গল্পকারের পরিমিতি বোধের শাসনে-সংযমে শিল্পসুষমা পেয়ে যায়।

গল্পটি প্রভাতকুমার লিখেছেন সাধু কথ্য—দু'য়ের গদ্যভঙ্গি ব্যবহার করে। রসময়ীর চিঠির ভাষা, বাক্যরীতি, বানান ও ভয় দেখানোর ভঙ্গি প্রবল হাসির উদ্রেক করে। প্রত্যেকটি চিঠির মানসিক প্রতিক্রিয়া—যা ক্ষেত্রমোহনের মধ্যে ধরা পড়ে—তা প্রথম প্রথম পাঠকদের বিষাদ-আক্রান্ত করলেও গল্পের শেষতম মুশকিল আসানে কৌতুকরসে অপ্রত্যাশিত এক স্বাদের মধ্যে নিয়ে যায়। গল্পের গদ্য রসময়ীর রসিকতার মতো নিখুঁত ছোটগল্পের নিশ্চিত অনুপন্থী।

পাঁচ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'রসময়ীর রসিকতা'র এমন নাম গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র রসময়ীকে মনে রেখে তারই সক্রিয়তার সূত্রে মূল বিষয় ধরে রাখা হয়েছে। নামের মধ্যে 'রসময়ী' এবং 'রসিকতা'—এমন দু'টি শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেকার অনুপ্রাসের সূক্ষ্ম ধ্বনিমাধুর্যের সৌন্দর্য নামটিকে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে পাঠকদের কাছে। আবার মূল বিষয় নামে ইঙ্গিতবহ হওয়ায় নামের গুরুত্ব গল্পের সমগ্র স্বভাবে গুরুত্ব পায়।

এমন নাম গল্পের চরিত্র ও ব্যঞ্জনা—দু'য়ের সমবায়ে শিল্পের সামগ্রিক গুরুত্ব পায়।

প্রথমত, প্রত্যক্ষ অর্থে ক্ষেত্রমোহনের স্ত্রী রসময়ীর তিনটি চিঠি ক্রমান্বয়ে হাতে আসে স্বামীর ডাক মারফত। চিঠি আসার আগে রসময়ীর মৃত্যু ঘটেছে। তাই তারই হাতের লেখায়, বানান ব্যবহারে, লেখার কালির মিলে এবং সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে অদ্ভুত মিলমিশ থেকে ক্ষেত্রমোহনবাবুর কাছে আসে। এ এক রহস্য। সেই রহস্যের উদঘাটনেই গল্পের সর্বশেষ কাহিনী ও ঘটনার বিস্তার। মৃত্যুর পর তার এই চিঠি অবশ্যই বাস্তব অর্থে প্রাপকের হাতে আসা রহস্যজনক। রসময়ীর চিঠিই রসিকতার উপাদান হয়—যা রসিকতা থেকে শেষমেশ ভয় ও বিস্ময়ের দিক তুলে ধরে। এই অর্থে প্রাথমিক তাৎপর্যে নাম বিষয়ের সঙ্গে নিশ্চিত জড়িত।

দ্বিতীয়ত, গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদে রসময়ীকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা স্বামী করলে রসময়ী পিত্রালয় থেকে ক্ষেত্রমোহনের কাছে আসে। বিবাহ করলে রসময়ী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের বধূ ও তার মায়ের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থার কথা জানালে ক্ষেত্রমোহনবাবু পালটা কথা বলে, "তা হলে দু'টো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না?".......কথার চাপান-উতোরে এক কথায় ক্ষেত্রমোহন বলেন, "তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?" কথা শুনে সহাস্য কঠিন বিদ্রূপ : 'রসি বামনি এখনি মরছে না, তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে —যখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না—তখন আমি মরব।" কিন্তু ভাগ্যের ফেরে এই কথাবার্তার মাস ছয়েক পরেই রসময়ীর মৃত্যু ঘটে। এর পর ক্ষেত্রমোহনবাবুর বিবাহের কন্যা পছন্দ হলে, ব্যবস্থাদির মধ্যে একে একে ক্ষেত্রমোহনের অবস্থা বুঝে রসময়ীর চিঠি আসে। এই অবিশ্বাস্য অথচ রসময়ীর সত্যিকারের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিই হয় রসিকতা—পরম অথচ নির্দয়, নির্মম। সেই চিঠির জন্যই ভয় ও ভাবনা ক্রমশ ক্ষেত্রমোহনকে দুর্বল, অসহায় করে তোলে। ক্ষেত্রমোহন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, থিওজফিস্ট মতবাদী শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে পাঠকরাও হতভম্ব ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গল্পের টান টান স্বভাব এই চিঠিগুলির কারণে শিল্পের চমৎকারিত্ব ও suspence আনে। নাম তাই যথার্থ।

তৃতীয়ত, গল্পের শেষে সমস্ত ভয় ও অবিশ্বাস চলে যায়। বিনোদিনীর এক এক করে ডাকে পাঠানো মৃত্যুর আগে রসময়ীর লিখে যাওয়া চিঠিগুলি যত দুর্ভাবনার কারণ—

প্রমাণ হয়। যা ছিল রসময়ীর রসিকতা তা শ্লেষব্যঙ্গে রক্তিম হলেও আখ্যায়িকার ঘটনাচক্রে সবশেষে নিষ্ফল হয় এবং তা মৃত রসময়ী না জানলেও তার দিদি বিনোদিনী বুঝে যায়। সবশেষে ক্ষেত্রমোহনবাবুর প্রশ্নের সামনে তুলসীতলায় বসা নিঃশব্দ মালাজপের ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ালে বিনোদিনীর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়। যা ছিল রসিকতা, তার নির্মম উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যায়। গল্পনামে এখানেই শিল্প-পরিণাম মান্য।

কিন্তু প্রসঙ্গত, আরও একটি দিক ভাববার বিষয়। রসময়ী যদি এভাবে রসিকতা করার নামে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করে, তাতে প্রশ্ন ওঠে রসময়ীর বুদ্ধি, রুচি ও চিন্তাভাবনায় এই কৌশল গ্রহণ কি চরিত্র-ন্যায়ে সঠিক হয়? রসময়ী চিঠিগুলি লিখেছে ঠিকই, তার পিছনে কি দিদির ভূমিকা প্রধান ছিল না? তাই যাকে বলা হয়েছে রসময়ীর রসিকতা, তা তো বিনোদিনীর ও ছোটবোনের, অন্যত্র দ্বিতীয় বিবাহেচ্ছু স্বামীকে পরোক্ষে শাস্তি দেওয়ার প্রয়াস! বিনোদিনীও এই পত্র পাঠানোর একজন অন্যতম যুক্তিদাতা এবং শরিক। তা হলে শুধু নামে রসময়ীর রসিকতা বলায় অর্থের সীমা আসে। ভগ্নীপতির উদ্দেশে পাঠানো চিঠির প্রতিক্রিয়ায় বিনোদিনীর কৃতিত্বও স্বাগত হতে বাধ্য। অবশ্য রসময়ীর লেখা, মুখ্যত রসময়ীর নিজস্ব কারণেই এমন চিঠি পাঠানোর কৌশল—যদিও তাতে রসময়ী ইহলোকের রাগ থেকে পরলোকের ভাগ্যে জোটে শূন্য, তবু এই চিঠির কাঠামো ও লক্ষ্যের তাৎপর্যে রসময়ীর নামে রসিকতা যোগে নাম মান্য। তবে রসময়ীর প্রচণ্ড রাগ ছিল, যুক্তিহীন অভিমান, অস্থিরতা ছিল, কিন্তু এমন সুন্দর রসিকতা করার ক্ষমতা ও মনোভঙ্গি ছিল কি? লেখকের এমন নামগ্রহণে, মনে হয়, লেখকের শিল্প মানসিকতা বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। নামে বিনোদিনীর অন্তরালের ভূমিকা অবহেলিত, মূল তাৎপর্যের ভিতরে আড়াল। সমগ্র গল্পে বিনোদিনী যেন 'কাব্যের উপেক্ষিতা'।

৬.

মাতৃহীন

এক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'গল্পাঞ্জলি'তে সংকলিত 'মাতৃহীন' নামের গল্পটি প্রথম রচনার পর পত্রস্থ হয় ১৩১৭ সালের 'মানসী' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায়। গল্পাঞ্জলির প্রথম প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩২০। তখন প্রভাতকুমার দীর্ঘ আট বছর ধরে—১৯০৮ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত, গয়ায় ব্যারিস্টারি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। গল্পটি সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বয়ং জানান 'মানসীতে প্রকাশিত হইলে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ঘটনাটি সত্য। এমনকি, নায়কের পিতা প্রবীণ ব্যারিস্টারটি কে, কেহ কেহ এ অনুসন্ধানেও ব্যাপৃত ছিলেন। সেই কারণে প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি, উক্ত প্রবীণ ব্যারিস্টারটি কোনো বার লাইব্রেরীতে কোনোদিন পদার্পণ করেন নাই—সম্পূর্ণভাবে কল্পনারাজ্যের অধিবাসী। আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি.....'।

'মাতৃহীন' অবশ্যই গভীর গাঢ় প্রেমের গল্প—যার পরিণতি-চিত্রে মেলে—প্রেমে বিচ্ছিন্ন বিরহকাতরা এক রমণীর মর্মন্তুদ বিষণ্ণ মনোলোকের বিষাদঘন রূপাবয়ব। প্রেমিকা রমণীর প্রেমিক ভারতবর্ষীয় এক বাঙালি ব্যারিস্টার, প্রেমিকা স্বয়ং ইংরেজ রমণী, বিদুষী, শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না। সম্ভবত এমন এক যুবক-যুবতীর রোমান্টিক সম্পর্কচিত্র থাকার কারণেই, এবং পরিণতিতে বিফল প্রেমভাবনার অশ্রুসজল রূপ থাকার কারণেও সে সময়ের পাঠকদের ভারতবর্ষীয় যুবক সম্পর্কে তার বাস্তব পরিচয় উদ্ঘাটনের অনুসন্ধিৎসা তীব্র হয়। সে সময়ের যুবক প্রেমিক প্রবীণ বয়সে পৌঁছলে গল্পের চিত্র ধরে 'ব্যারিস্টারটি কে, কেহ কেহ এ অনুসন্ধানে', 'ঘটনাটি সত্য' ভেবে অনুসন্ধিৎসু হয়। গল্পকার প্রভাতকুমার যখন জানান সে 'সম্পূর্ণভাবেই কল্পনা রাজ্যের অধিবাসী' তখন প্রমাণিত হয়ে যায়, গল্পকার প্রেমের গল্পচিত্রে ও বেদনাঘন পরিণতিদানে একজন সফল শিল্পী।

'মাতৃহীন' গল্পের কাহিনী-অংশ ধীরগতিসম্পন্ন প্রথম দিকে। যুবক ভারতবর্ষীয়, নায়কের নাম শরৎকুমার মিত্র, বিলাতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয়বারও অকৃতকার্য হয়। উত্তমপুরুষ এই কথক-নায়কের কথায় বিলাতে তার আমোদ-প্রমোদে দিন কাটানোর জন্যই লেখাপড়ায় অমনোযোগের মধ্যে আসে পাশে ব্যর্থতা। যাই হোক কিছু মদ্যপান করে নায়ক সন্ধেয় চলে আসে এক প্রেক্ষাগৃহে শেক্সপিয়রের একটি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখতে। নাটক দেখে মুগ্ধ নিজেই নাটক লেখার প্রেরণা পায়। বৃটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে নাটকের বই পড়ে ও দেখে সেখানেই নাটক লিখতে শুরু করে।

সেইখানেই বর্ষীয়সী পাকা মাথার ইংরেজ মহিলার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। মহিলা বিখ্যাত একটি ম্যাগাজিনের জন্য ছবি আঁকে, আঁকার বিশেষ বিষয় 'ভারতবর্ষ'। প্রথম আলাপে ভদ্রমহিলার ছবি আঁকা নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়, শেষে ভদ্রমহিলা যুবকটিকে নিজের ছবির স্টুডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যুবকের হাতে নিজের একটি কার্ড দেয়, যুবকও নিজের কার্ডটি মহিলাকে দিতে ভোলেনি। ভদ্রমহিলা যুবকের কার্ড ও নাম দেখে জানতে চায় কলকাতায় স্বর্গত, প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ মিত্র যুবকের পরিচিত কিনা! যুবক তাঁর পুত্র জেনে একসময়ে হোটেলে অস্বস্তিকর দারুণ ভিড়ের কারণে একটু দ্রুতই সেখান থেকে চলে যায়।

ইংরেজ ভদ্রমহিলার নাম মিস ক্যাম্বেল। যুবকটির নাটকের কাহিনী রচনা কিছুটা এগোলে মিস ক্যাম্বেল সেই কাহিনী শোনার বাসনা জানায়। মিস ক্যাম্বেলের আস্তানা—ব্লুম্‌স্‌বেরি ম্যানসনের মতো বিরাট অট্টালিকার একটি ফ্ল্যাট। সেখানে বসে যুবক মিস ক্যাম্বেলকে তার লেখা নাটকের কাহিনী ইংরেজিতে শোনাবে, এই সূত্রেই মহিলা জানায় একসময় বছর কুড়ি বয়সে বাংলা লিখতে শুরু করে। এই কথায় তার চোখে জল দেখে নায়ক হয় অপ্রস্তুত। একসময়ে মিস ক্যাম্বেল যুবককে প্রস্তাব দেয় নাটক লেখা শেষ হলে একটি গার্হস্থ্য নাটকের প্লট নিয়ে নাটক লিখতে। যুবক ক্রমশ বোঝে, ভদ্রমহিলা ব্যবহারে ও কথাবার্তায় যুবকটিকে অত্যন্ত স্নেহ করে। ডিসেম্বরের এক বর্ষণসিক্ত তুষারপাতের দিনে পূর্বকথা মতো জলে ভিজেও নায়ক মিস ক্যাম্বেলের বাড়ি এলে মহিলার নায়কের

প্রতি স্নেহসিক্ত আন্তরিক আচরণ নায়কের মাতৃহারা হৃদয়ের বেদনা বুঝিবা নিজ মায়ের অধিকারের স্মৃতিকেই জাগিয়ে দেয়।

এই বর্ষণসিক্ত অন্ধকার পরিবেশে মিস ক্যাম্বেলের ড্রইংরুমে বসে মহিলাটি যুবককে তার প্রস্তাবিত গার্হস্থ্য নাটকের প্লট শোনায় এক এক করে। মিস ক্যাম্বেল কাহিনী বলে আর নাটকে যুবক স্থান ও চরিত্রদের কি ধরনের নাম ব্যবহার করতে পারে, তা-ও কথা প্রসঙ্গে ঠিক করে দেয়। কাহিনীটি লন্ডনের থেকে সামান্য দূরে এক শহরতলিতে—তা কথকের কথায় হ্যামারস্মিথ বা রিচমন্ড—যা হোক হতে পারে—বাস করে এক মধ্যবিত্ত গৃহী পরিবারের। পরিবারের কর্তার একটি একুশ বছরের ছেলের নাম ফ্রেড্রিক—ডাকনাম ফ্রেড। দুই মেয়ে—বড় এলিজাবেথ বা লিজি, বয়স বছর উনিশ, ডাকনাম মড বা গ্ল্যাডিস, ছোট ক্যাথরিন, মডের থেকে দুবছরের ছোট। মিস ক্যাম্বেলের গল্পে মড হল নায়িকা। মডের বেশি ঝোঁক লেখাপড়ার দিকে, ফরাসি, জার্মানি, ইতালি তিন ভাষায় দক্ষ, গ্রিকও শিখছে। বড় ভাই ফ্রেড তখন কেমব্রিজের ছাত্র। ওদের বাড়িতে এক ভারতীয় বন্ধুকে আনে মাস দেড়েকের জন্য বেড়াতে।

কিন্তু একই বাড়িতে মড এক ভারতীয়কে থাকতে দিয়ে নিজের থাকার বিরোধী। প্রতিবাদে মাসির বাড়ি চলে যায়। মিস ক্যাম্বেলের মত নিয়ে যুবক তার নাম রাখে চারুচন্দ্র দত্ত। চারু ভাল সংস্কৃত জানে। এক সময় পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃত ও ফরাসি শেখার চুক্তিতে যথাক্রমে মড ও চারু উভয়ে অন্তরঙ্গ হয়। একসময়ে মডের বাবাকে চারু বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে বাবার মতে একবছর দেখা না করে শেষে বিবাহের উদ্যোগ হলে চারু ভারতে বাবার কাছে মতের জন্য চিঠি লেখে। কিন্তু চারুর উত্তেজিত পিতা সোজা চলে আসে মডের বাবার কাছে। প্রবল আপত্তি জানায় নিজেদের অন্ধ সংস্কারে বিশ্বাস রেখে। চারু বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে বিবাহ করতে বদ্ধপরিকর। মডের বাবাও তাতে রাজি। শেষে মড বেঁকে বসে। এই অবস্থায় সে কিছুতেই চারুকে বিবাহ করতে পারে না। তাদের জীবনে তা অমঙ্গল আনবে। মডের প্রেমে অবিশ্বাস ও সন্দেহ এনে চারু দেশে ফেরে। মড ভাবে পরলোকে একদিন চারুর সঙ্গে দেখা হবেই। তখন তার প্রতীক্ষায় প্রতিবাদী দিক শোনাবে। পরে মড অত্যন্ত পীড়িত হয়, কিন্তু মরে না। চারু মডকে ভারতের তৈরি দুটি সোনার চুড়ি উপহার দিয়েছিল। কাগজে চারুর মৃত্যুসংবাদে মড তার পরে থাকা চুড়ি দুটি হিন্দু বিধবাদের রীতিমতো খুলে রাখে। মিস ক্যাম্বেল গল্পের শেষে জানায় এই ভাবে—মডের ঘরে তার প্রণয়ীর এক তেলরঙের ছবি আছে, তা দেখে সে জীবনধারণ করে।

'মাতৃহীন' গল্পের নায়ক মড-এর কাহিনীর শেষ কথায় অনুরূপ সেই ব্যারিস্টার প্রেমিককে সত্যিই দেখে মিস ক্যাম্বেলের ঘরে। সে গল্পের যুবকের পিতা। গল্প বলে মিস ক্যাম্বেল মূর্ছিত হয়ে যায়। 'মাতৃহীন' গল্পের শেষ—মিস ক্যাম্বেলের ওই অবস্থার পর নায়ক একবছর লন্ডনে ছিল ক্যাম্বেলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে, পুত্রবৎ স্নেহের আশ্রয়ে, মা সম্বোধনে, পত্রাদির যোগাযোগে। পরে নায়ক শোনে নায়ককে দেখেই ওর

বাবার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যে ওকে চেনে মিস ক্যাম্বেল। দেশে ফিরে বিবাহ করে নায়ক, পুত্র হয়, বিবাহে ক্যাম্বেল সেই সোনার চুড়ি দুটি স্ত্রীকে উপহার পাঠায়। শেষে ক্যাম্বেলের সঙ্গে দেখা করতে বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা করে হতাশ হয়, কারণ শেষ পত্রের ফেরত আসার খবর পায়—ক্যাম্বেল মৃত। গল্পের নায়কের শেষতম স্বগতভাষণ : 'আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম।'

'মাতৃহীন' গল্পটি সার্থক প্রেম-বিরহ ভাবনার গল্প হলেও এর গঠনের শৈথিল্য স্পষ্ট। গল্পের শুরু থেকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অপরিচিত মিস ক্যাম্বেলের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ অংশটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হত। অংশটি গল্পের টান টান বাঁধুনির পক্ষে ত্রুটিপূর্ণ। অতিকথনে মেদপূর্ণ—যদিও সমগ্র অংশটি পাঠকদের কাছে রীতিমতো সুখপাঠ্য। দ্বিতীয়ত, সমগ্র গল্পে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী আছে। একটি মূল 'মাতৃহীন' গল্পের কাহিনী, আর এক মিস ক্যাম্বেলের বর্ণিত কাহিনী। গল্পের মধ্যে গল্পরচনা—এ রীতি সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অনুসারী। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গদ্যে এর পরিচয় মেলে। অবশ্যই দুটি গল্পের মধ্যে একটি শক্ত যোগসূত্র শিল্পমূল্যকে বজায় রাখে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পেও এই রীতির আরও জটিল অভিনব প্রয়োগ দেখি।

যেহেতু গল্পে দুটি কাহিনী, তা একটি প্লটেই ধরে রাখে, যেখানে মিস ক্যাম্বেলের মড-এর গল্প যুবক নায়ক ও তার মাতৃসদৃশ বাবার প্রেমিকার গল্পের সঙ্গে, মাতৃস্বরূপা ক্যাম্বেলের সঙ্গে মিলে যায়, সেখানে প্লটের জটিলতা ও নিবিড়তা চমৎকারিত্ব আনে। কিন্তু গল্পের 'ক্লাইম্যাক্স' দুই স্বভাবে এবং সেই সঙ্গে মডের কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স মূল গল্পের প্লটের ক্লাইম্যাক্সকে গতি দান করে, তাতেই গল্পটি সার্থক শিল্পগুণের অভিজ্ঞান হয়। মডের যে কাহিনী তার ক্লাইম্যাক্স চারুচন্দ্রের বাবার লন্ডনে আসা ও বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী ভূমিকাচিত্রে মেলে। চারুর বাবার কথা শোনে মড, চারুর প্রেমকে অস্বীকার করে মূক প্রেমিকার ভূমিকায় থেকে এবং তাতেই থাকে অনড়, জেদি। তার আত্মসমর্পণের ভাষা, তার প্রেম মূক। এখানেই মড-এর কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স। 'মাতৃহীন' গল্পের অপর ক্লাইম্যাক্স নায়ক শরৎচন্দ্র মিত্রের মিস ক্যাম্বেলের স্টুডিওয় নিজের বাবার তৈলচিত্র দেখার চমকে। মড এবং ক্যাম্বেল যে এক, বাস্তব ও কল্পনা যে একাকার হয়ে যায়, দুই ক্লাইম্যাক্সের শিল্পিত ভূমিকায় প্লটটিকে যথাযথতা দিয়েছে। মূল গল্পের টান মড-এর কাহিনীর টানে একই গল্পের, একটিমাত্র গল্পের অবয়ব দেখায়।

'মাতৃহীন' গল্পের শেষ ব্যঞ্জনা মিস ক্যাম্বেলের বাস্তবতার মর্যাদায়, মৃত্যুতে। মডের গল্পে মডের মৃত্যু নেই। কারণ মড অর্থাৎ ক্যাম্বেল তো বর্তমানে জীবিত! তার প্রতীক্ষার বিধুরতা বোঝাতেই এর পরিণামী কৌশল। পরিণামে ক্যাম্বেলের সোনার চুড়ি দুটি পাঠানো, নায়ক যুবকের সন্তানকে দেখার মমতা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেমের গল্পের বিষাদময় পরিণতি ক্যাম্বেলের মৃত্যুখবরে বড় ব্যঞ্জনা আনে না। প্রভাতকুমারের গল্পের বৈশিষ্ট্যই হল শেষের ব্যঞ্জনায় তিনি বাড়তি কোনো মাত্রা দিতে অক্ষম। তাঁর লেখায় তিনি নিজেই

সব সমাধা করে গল্প শেষ করেন, পাঠকদের অতিরিক্ত কিছু বোঝার ও ভাবার অবসর রাখেন না।

এখানেই তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম সীমা। 'মাতৃহীন' গল্পের প্লটে আকর্ষণ আছে, গতি আছে, কিন্তু মিস ক্যাম্বেল চরিত্রের Psychological জটিলতা মড-এর গল্প উপস্থাপনায় স্বনির্ভর হতে পারেনি। মড-এর বানানো গল্প বলে তবে ক্যাম্বেল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মড-এর গল্পে চমক আছে ঠিক, কিন্তু ক্যাম্বেল ও মড একই নারীসত্তা হওয়ায় গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কি কিছুটা দুর্বল শিল্পভিত্তির অভিজ্ঞান হয় না? প্রভাতকুমার গল্প বলতে ভালোবাসেন, গল্পের প্লটে বৈপরীত্য রচনায় তিনি সীমিত ক্ষমতার গল্পকার।

দুই

গল্পে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে প্রভাতকুমার স্নেহরস তথা ভারতীয় শান্তরসের আনুগত্য দেখিয়েছেন 'মাতৃহীন' গল্পেও। 'কাশীবাসিনী' প্রেমের গল্প নয়, 'ফুলের মূল্য'ও নয়, তবু এই গল্পদুটিতেও মেলে প্রভাতকুমারের করুণ রসসৃষ্টির নিশ্চিত বাসনালোক। আগেও বলেছি, প্রভাতকুমারের গল্পের, 'দেবী' গল্প বাদে, প্রধান রস দুটি —১. করুণ ও স্নেহরস ২. কৌতুকরস। দুটিই এক অর্থে লঘু। করুণ ও স্নেহরস মানবিক ভাবপ্রবণতার (Sentimentalism) অভিজ্ঞান। কৌতুকরস জীবনের নানা অসঙ্গতি-জনিত লঘুরসের অনুষঙ্গী বিষয়। তিনি তাঁর কোনো কোনো চিঠিতে ও মন্তব্যে ছোটগল্পে লঘুরসের প্রতি প্রবল পক্ষপাতের কথা সোচ্চারে স্বীকার করে গেছেন।

'মাতৃহীন' গল্পের কেন্দ্রীয়রস অপত্য স্নেহ—যা করুণরসে বিষাদ-মলিন—তা গল্পের অঙ্গীরস। মিস ক্যাম্বেলের প্রতি উত্তমপুরুষ কথক নায়ক শরৎকুমারের যে আকর্ষণ তা মাতৃস্নেহরসের প্রতি প্রবল আকর্ষণে বিশিষ্ট। গল্পের যুবক নায়কের জীবনে একদিন নিজের মাকে হারাতে হয়। তারপর তার জীবনে আসে মিস ক্যাম্বেলের মতো বাবার ব্যর্থ প্রেমিকা আর এক মায়ের প্রতীকে। ক্যাম্বেলের জীবনের অসহায়তা শেষে মায়ের স্বরূপে আর এক স্নেহার্তির জন্ম দেয়।

অন্যদিকে মিস ক্যাম্বেলের যে প্রেমজনিত জীবনার্তি, তা তার জীবনের স্তরে যেমন যৌবপ্রাণের পরাকাষ্ঠা দেখায়, পরের স্তরে দেখা দেয় তার প্রেমিকের সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহে। প্রভাতকুমার বাঙালি নারীর মতোই প্রেম ও তার অতৃপ্তিতে অদম্য সন্তানবাসনায় চাপা চরিতার্থতায় স্নেহভাব প্রবণতার দিক এঁকেছেন। বস্তুত প্রভাতকুমার এমন প্রেম, বিরহ ও বিচ্ছেদক্লান্ত নারীর শেষ জীবনে স্নেহের কথায় হয়েছেন শরৎচন্দ্রের যোগ্য পূর্বসূরি। পূর্বপ্রেমিকের সন্তানকে দেখে মিস ক্যাম্বেলের স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয়ের প্রকাশ, তা সে সময়ের আদর্শ প্রেমভাবনার একধরনের পরিণতিকেই সামনে আনে। প্রেমে মিস ক্যাম্বেলের শেষমেশ যুবক নায়কের ওপর নির্ভরতা স্বাবলম্বী প্রেমের ও স্নেহের যুগপৎ মিলমিশ দেখায়।

অন্যদিকে উত্তমপুরুষ যুবক নায়কের মিস ক্যাম্বেলের স্নেহার্থী হয়ে ওঠার মধ্যে আছে

পিতার বাগদত্তা প্রেমিকাকে মা ভেবে স্নেহে জড়িত হওয়া। তা যুবকের দিক থেকে পরনির্ভর, পিতার সূত্রে সমাজস্বীকৃত না হলেও দ্বিতীয় মায়ের সঙ্গে অপত্য স্নেহে জড়িয়ে যাওয়া, তা স্বাভাবিক কিন্তু অন্য নির্ভর (dependent)। সেকালে উত্তমপুরুষ নায়ক বাবার প্রেমকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে, এইভাবেই কেন্দ্রীয় রস 'অপত্য স্নেহ' সমগ্র গল্পের ফলিতার্থে হয়েছে ভিন্নস্বাদী। ক্যাম্বেলের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যুবক নায়কের সম্পর্ক মেনে নেওয়ার মধ্যে এক শান্তরস আস্বাদ্য হয়—যা প্রভাতকুমারের নিজস্ব প্রেমভাবনার ঠিক দর্শন নয়, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শাত্মক মীমাংসা।

প্রভাতকুমার যে পরিবেশে প্রেমের গল্পটি লিখেছেন তার আগে ও সমসময়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রথাবদ্ধ প্রেম ও তার সংস্কারের বিরুদ্ধে, মুক্তপ্রাণের প্রেমের স্বভাবে, অবৈধ ও অ-নৈতিক প্রেমকে সুস্থ যুক্তি, বুদ্ধি ও বোধ দিয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। সে সময়ে তা ছিল দুঃসাহসী কাজ, এবং তার জন্য সেকালের রক্ষণশীল সমালোচক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। প্রভাতকুমার সুদূর লন্ডনের পরিবেশে ওই দেশেই এক নারীর মধ্যে ভারতীয় হিন্দুর সংস্কার ও প্রথানুগ প্রেম এঁকে প্রেমকে মুক্তরূপ দিতে পারেননি। বরং চারুচন্দ্র দত্তের মধ্যে উদার ও মুক্তস্বভাব আছে, কিন্তু মিস ক্যাম্বেলের? চারুচন্দ্রের পিতার মডের বাবার কাছে যুক্তি : ১. 'দেশে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উহাকে জাতিতে তুলিয়া লইব। সেইখানে হিন্দুমতে বিবাহ দিব। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে জন্মের মত উহার জাতিচ্যুতি ঘটিবে'। ২. 'মরিবার সময় আমাদের মুখে ও জলগণ্ডূষ দিবার অধিকারী থাকিবে না।' মডের বাবার উক্তি : 'আপনারও বাধা দিবার কোন অধিকার নাই।'

কিন্তু মডের কথা হিন্দু রমণীসুলভ, শেষ কাজও তাই। সে বলে 'এমন অবস্থায় আমি কখনই চারুকে বিবাহ করিব না।' এই ভাবনায় অনড় থেকে প্রভাতকুমারের প্রেমঋদ্ধ নায়িকা প্রতিবাদহীন নিশ্চুপ। এক ইংরেজ মহিলাকে ভারতীয় করে তাকে বিবাহ থেকে বিরত করেন প্রভাতকুমার। স্মরণিকা হিসাবে হিন্দু নারীসুলভ দুটি সোনার চুড়ির আমৃত্যু সংরক্ষণ! এতেই বোঝা যায়, প্রভাতকুমার 'মাতৃহীন' গল্পে হিন্দু নারীর সেবাধন্য স্বভাব ও বিশ্বাসের কথাই ধ্রুব ভেবেছেন। এইভাবে গল্পে গল্পকারের প্রেমভাবনা কেন্দ্রীয় বক্তব্যে প্রাচীন প্রথার আনুগত্যকে শাশ্বত ভাবে। মাতৃহীন মড-এর প্রেমের গল্প, কিন্তু কেন্দ্রীয় বক্তব্যে থেকে বাঙালি নারীর রক্ত ও স্বভাব তার নায়িকা মড-এর মধ্যে। এখানেই গল্পকারের প্রেমভাবনার নিশ্চিত সীমা। প্রভাতকুমার এ ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রের পূর্বসূরি শিল্পী-অভিভাবক।

তিন

'মাতৃহীন' গল্পে প্রধান দুটি চরিত্র—মড তথা মিস ক্যাম্বেল ও মিস ক্যাম্বেলের ভারতীয় প্রেমিক ব্যারিস্টার চারুচন্দ্র দত্ত। গল্পের প্রথম থেকে মড-এর তথা মিস ক্যাম্বেলের উপস্থাপনা চিত্র স্বাভাবিক শিল্পসম্মত প্রেমিকাই। গল্পের উত্তমপুরুষ নায়ককে

প্রেমিকের সন্তান ভেবে স্নেহে তার সান্নিধ্যে আসায় এতটুকু অস্বাভাবিকতা নেই। প্রেমিকের পুত্রের কাছে নিজের প্রেমমনস্কতার affinity প্রকাশের স্তরগুলি আকর্ষক। প্রেমিকার অভিমান-চিত্র অনবদ্য : "মিস ক্যাম্বেল বলিলেন—'এ বয়সে আর শিখিয়া কি হইবে? যখন শিখিতাম তখন আমি বিংশতিবর্ষীয়া বালিকা।'—বলিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন।" এই যে অন্যদিকে অশ্রুসজল তাকিয়ে থাকা তা যথার্থ প্রেমিকা রমণীর নস্ট্যাল্‌জিয়া! মিস ক্যাম্বেলের খবরের কাগজে তার প্রেমিকের মৃত্যুসংবাদ দেখার কথা বলার প্রতিক্রিয়া—চারুচন্দ্রের দেওয়া দুটি চুড়ি খুলে ফেলে। সে যেন হিন্দু বিধবা, চুড়ি পরা উচিত নয়। এইসব প্রতিক্রিয়ায় মিস ক্যাম্বেলের প্রেমিকা সত্তার সম্যক স্ফূর্তি!

চারু দত্ত জন্মের মতো মডের কাছ থেকে বিদায় নেয়। তার কথা : 'বিচ্ছেদ যখন অপরিহার্য, তোমার অচল ভালোবাসা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেও জীবনে অনেক সান্ত্বনা পাইতাম। সে সান্ত্বনা হইতেও তুমি আমায় বঞ্চিত করিলে।' এই প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস নিয়ে চারু দেশে ফিরে বিয়ে করে। প্রভাতকুমার তার বিবাহ ও সন্তানজন্মের ঘটনা ঘটিয়ে মডের সারাজীবন কুমারী থাকার দিকটিতে নারীর ব্যতিক্রমী প্রেমের মহত্ত্ব ও ট্র্যাজেডি-চিত্র এঁকেছেন স্বভাবের বৈপরীত্যে। তার মধ্যে মিস ক্যাম্বেলের প্রেমের নিঃসঙ্গতা, সত্যমূর্তি, মহত্ত্বের প্রমাণ মেলে।

মিস ক্যাম্বেল নিজের প্রেমের কথা সোজা না বলে অন্য গল্প তৈরি করে শোনায় গল্পের কথককে। আসলে, বাধা হল, প্রথমত, প্রেমিকা মিস ক্যাম্বেলের স্বভাবের মূল্যবান অলঙ্কার স্বরূপ লজ্জা; দ্বিতীয়ত, একেবারেই পুত্রতুল্য বা পুত্রকেই একজন বঞ্চিতা মা হিসেবে নিজের প্রেমের কথা বলায় আড়ষ্টতা থাকা! আগেও বলেছি, ক্যাম্বেলের মধ্যে হিন্দুরমণীর স্বভাব ও চিন্তা আরোপ করে গল্পকার তার বিদেশিনী সত্তার সীমা টেনেছেন। সে ইংরেজ রমণী, হিন্দুর মতো ব্যবহার করেছে। এটা গল্পকারের পুরনো প্রথা সংস্কার ও বিশ্বাসের আরোপ। এতে গল্পকার প্রাগ্রসর স্বভাবের পরিচয় দিতে পারেননি। তবু যাবতীয় শিল্পের সীমা সত্ত্বেও মিস ক্যাম্বেল একজন যথার্থ প্রেমিকার মতোই বিরহ বেদনার ও নস্ট্যাল্‌জিক স্বভাবের রমণী হয়েছে। গল্পে প্রেমিকা হিসেবে মড তথা মিস ক্যাম্বেলের যে মূক জিদ চারু দত্তের বাবা ও চারু দত্তের সামনে, তাতে ক্যাম্বেলের স্বভাবে ধ্রুব নক্ষত্রের মতো এক আলোকিত ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর মেলে। তার সারাজীবনের জন্য অনিশ্চিত দুঃখকষ্ট বরণ, নিঃসঙ্গতাকে নীরবে লালন চরিত্রের নতুন মাত্রা দেয়।

গল্পের উত্তমপুরুষ কথকও একটি লক্ষণীয় চরিত্র হয়ে যায়, যখন দেখা যায়, তার বাবাই মিস ক্যাম্বেলের প্রেমিক। গল্পটি বলেছে শরৎচন্দ্র মিত্র—যে তার বাবার মতো দেখতে, এবং তার বাবাই ক্যাম্বেলের জীবন-আরাধ্য প্রেমিক। কথক ক্যাম্বেলের কথা শুনতে শুনতে বুঝে যায়, তার নিজের প্রেম ও প্রেমিকের গল্পই হল মড ও চারুচন্দ্রের সম্পর্কচিত্র, তখন গল্পে তার শিল্প-দায়িত্ব গুরুত্ব পায়। বাবার চলচ্চিত্র ক্যাম্বেলের স্টুডিওয় টাঙানো দেখে সে অবাক হয় যেমন, তেমনি মিস ক্যাম্বেলকে মা হিসেবেই সম্মান দেয়। গল্প শেষ হয়েছে 'মাতৃহারা' গল্পের কথকের নতুন করে মাতৃহীন হওয়ার

ঘটনায়—মিস ক্যাম্বেলের নিঃসঙ্গ মৃত্যুর খবরে। গল্পের শেষ একটি সার্থক ছোটগল্পের কোনো ব্যঞ্জনা আনে না, তবে প্রভাতকুমারের সীমাবদ্ধ শিল্পবোধ কথকের গুরুত্ব বাড়ায়। গল্পের কথক একজন Cultured ভারতীয়, লেখক এবং সঙ্গী হিসাবে সৎ, তাই মিস ক্যাম্বেলের সঙ্গে তার পরিচয় ও যোগাযোগ সঠিক চরিত্র উপযোগী। কারণ ক্যাম্বেল একজন অতিশিক্ষিতা, স্পর্শকাতর প্রেমিকা। সমগ্র গল্পে গল্পের মূল কথক অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠেছে।

চারুচন্দ্র দত্তও একটি স্বল্পরেখায় আঁকা প্রেমিক ব্যক্তিত্ব। চারু ভারতীয় প্রেমিক ব্যক্তিত্ব হলেও মুক্তমনের হিন্দু। সে মডের দাদা ফ্রেড-এর বন্ধু। সে পিতৃভক্ত যেমন, তেমনি পিতার মতামত-নিরপেক্ষও। বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি যথেষ্ট। তাদের বিবাহে মত দেবে কিনা এতে মূলে সন্দেহ ছিল চারু দত্তেরই। চারু বাবার মতের তীব্র বিরোধিতা করে মড তথা ক্যাম্বেলকে বিবাহে স্থিত থাকে। কিন্তু মডের আপত্তিতে বিচ্ছেদ অপরিহার্য জেনে মডের ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল। আমাদের মনে হয়, চারু দত্ত কিন্তু মডকে ঠিকমতো বোঝেনি বলেই 'জন্মের মত বিদায়' নেয় তার কাছ থেকে। এই যে প্রেমিকা, তার সঙ্গে পরবর্তী কোনো যোগাযোগের কথা গল্পকার জানাননি। ফলে প্রেমিকাকে খবরের কাগজে চারুর মৃত্যুর খবর জানতে হয়। গল্পে চারুর ভূমিকা এক মুক্তমন প্রেমিকেরই, কিন্তু তাকে লেখক গল্পের খাতিরেই মূল সম্পর্ক থেকে আড়াল করেন। পিতার প্রেমিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনার দিক পূর্ণ করে পুত্র মাতৃমূর্তি মিস ক্যাম্বেলের কাছে এসে। চারুর ভূমিকা ১. প্রেমিকা ও প্রেমের ভূমিকা উজ্জ্বলতম করে বৈপরীত্য দিয়ে ২. প্রেমিকার সঙ্গে পরবর্তী জীবনে নিরঙ্কুশ নীরবতার মধ্যে নিজ পুত্রের ভূমিকাগ্রহণকে লেখকের কলমে সহজ করে।

চার

'মাতৃহীন' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবমুখিতার দিক গতিপ্রাণ (dynamic) হয়েছে মিস ক্যাম্বেলের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও সংকটের শুরুর ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে। গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সব শেষে মিস ক্যাম্বেল কথক প্রদত্ত কার্ডটি দেখে, যখন শোনে গল্পের কথক তারই প্রেমিকের পুত্র, তখন কোনো পরিচয় আর জানতে না চেয়ে নিজের মনের এক প্রতিক্রিয়ার চমৎকার প্রকাশ ঘটায় :

> '"উঃ—আজ এ ভোজনশালায় লোকের কী ভীড় হইয়াছে! গরমে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। আমি চলিলাম"—বলিয়া তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।'

এই যে এক প্রেমিকার তার স্বর্গত প্রেমিকের সঙ্গে গোপন সম্পর্কসূত্রে প্রেমিকের পুত্রের পরিচয় পাওয়ার প্রবলতম সংগুপ্ত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ, তাতে কোনো বিদায়কালীন সৌজন্যটুকুও না দেখিয়েই প্রস্থান করে! এখানে গভীর জটিল মনোবিক্রিয়ার এক কঠিন সূত্র! এই সূত্র ধরেই মিস ক্যাম্বেল কুড়ি বছর বয়সে বাংলা ভাষা শিক্ষার কথা বলে :

> 'বলিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন দিবালোক অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখ আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তথাপি আমার সন্দেহ হইল, তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন ছলছল করিতেছে।'

এমন অভিমানাহত অশ্রুসজল অন্তরালবর্তী চোখ প্রেমিকার নস্ট্যাল্‌জিয়ার করুণ প্রতীক, এবং তখনও গল্পের কথক তার কারণ জানে না, কল্পনাও করতে পারেনি। এক ঘন বৃষ্টির দিনে মিস ক্যাম্বেলের বাড়ি এসে শুনতে হয় 'আমাকে তোমার মা মনে কর না কেন?'

গল্পের ভাবমুখিতার গতিপথে আসে দ্বিতীয় গল্প—যা মিস ক্যাম্বেলেরই প্রেমিকা জীবনের যৌবনধর্মের এক বিষাদময় চিত্র। ভারতে মড-এর প্রেমিকের মৃত্যুখবর, চারুর দেওয়া দু'জোড়া সোনার চুড়ি প্রসঙ্গ, মৃত্যুখবরে নিজেকে বিধবা ভেবে হিন্দু বধূর মতো চুড়িগুলি সযত্নে সরিয়ে রাখা, শোবার ঘরে নিজের সেই প্রেমিকের তেল রং ছবি ঝুলিয়ে, তা দেখে 'ইহজগতের পরপারে চিরমিলনের প্রতীক্ষা করে' বাকি জীবনধারণ প্রয়াস—এসবই গল্পের কেন্দ্রের ভাববস্তুকে ঘন গাঢ় বিষাদ-বেদনায় গভীর-স্বাদী করে। শেষে উত্তমপুরুষ কথক নাযকের সেই তৈলচিত্র দেখে নিজের পিতাকে চিনতে পারার মধ্যে গল্পের শম গল্পের সিদ্ধান্ত টানে, অর্থাৎ গল্পের কথক নয়, মিস ক্যাম্বেলের প্রণয়কথাই ভাবকেন্দ্রের বিষয় এবং তা তারই কেন্দ্রে গল্পের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে।

'মাতৃহীন' গল্পের প্রকাশভঙ্গি—বর্ণনা ও সংলাপ—উভয়তই সাধুরীতির গদ্যে বিশিষ্ট। সংলাপ সাধুরীতির হওয়ায় গল্পের অলংকরণের সহজতা, বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি হয়তো বিনষ্ট হয়নি, তবু কিছুটা কৃত্রিমতা তো থেকেই যায়। গল্পকার নায়িকার মনোলোক নির্মাণে কিছু কিছু প্রতীকী ভাষণের স্বাক্ষর রেখেছেন, যা বেগ সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততা পেয়েছে। গল্পে মনস্তত্ত্ব ঠিকভাবে প্রযুক্ত, কিন্তু গল্পকে যেভাবে শেষ করেছেন গল্পকার তা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চমক স্বভাবের বিপরীত—বিবৃতিমূলক। গল্পকারের লেখনীতে, কথকের মাতৃহারা হওয়ার মধ্যে কোনো বিদ্যুচ্চমক নেই, নেই সার্থক ছোটগল্পের সেই পাঠকচিত্ত অস্থির করার মতো ধারালো দীপ্তি ও রহস্য। তা গল্পকারের সহজভাবে জীবনকে দেখার ত্রুটি নয়, অবশ্যই সীমা।

পাঁচ

গল্পের নাম 'মাতৃহীন', তাই এমনি গল্পটির শীর্ষনামেই পরিষ্কার হয়ে যায় গল্পটির অঙ্গীরস বাৎসল্য। মা হারানোর দুঃখ তো, মানবিক ধর্মে, উপমা দিয়ে বলা যায়, আন্তর্জাতিক মেঘের মতো। মা ও ছেলের সম্পর্ক শাশ্বত জীবন রসে জারিত এক বিষয়। এর পবিত্রতা, নিবিড়তা, হৃদয়নিহিত উপলব্ধির গভীরতা ও প্রসারতা যে কোনো স্তরের মানুষ, উচ্চ প্রাণীজগতেরও—যে কোনো সম্পর্কে মূল্যবান পাথরের আলোর মতো লাবণ্য আনে। প্রভাতকুমারের 'মাতৃহীন' গল্পে মিস ক্যাম্বেলের সঙ্গে গল্পকার কথকের অন্তিম সম্পর্ক-ব্যঞ্জনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোটা গল্পটিকে ধরে রাখে। এমন নাম ব্যঙ্গাত্মক নিঃসন্দেহে।

তবে ছোটগল্পের নামে যে উপলব্ধির জটিলতা সক্রিয় থাকে, যে অন্তর্গূঢ় বোধ ও

বোধির দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া পাঠকের মনে তৈরি করার সুযোগ করে দেয়, তা 'মাতৃহীন' নামে নিশ্চয়ই অনুপস্থিত। তবে সাধারণ অর্থে কথক নায়ক শরৎকুমার মিত্র ক্রমশ মিস ক্যাম্বেলের সঙ্গে মানসিক অভিজ্ঞতায় যে সম্পর্কের মধ্যে চলে আসে, তা ক্যাম্বেল বৃদ্ধা এক মা, কথক নায়ক তার মৃত্যুতে, নিজের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে, সামাজিক বিচারে মা না হলে জীবন উপলব্ধিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের স্নেহার্ত প্রতিমূর্তি দেখেছে বলেই শেষে মাকে হারানোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাই নাম সোজা সহজ ব্যাখ্যায় যথার্থ।

দ্বিতীয় একটি ভাবনা, গল্পের নাম বিচারে 'মাতৃহীন' নামের যথাযথতায় জিজ্ঞাসা আনে। কথক মিস ক্যাম্বেলের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্ত থেকে তার স্নেহার্ত হৃদয় বুঝে মায়ের সান্নিধ্যে নতুন উত্তাপ পায়। ঘোর বৃষ্টি ও তুষারপাতের সকালে মিস ক্যাম্বেলের বাড়ি এসে ভিজে পোশাকে যেভাবে বৃদ্ধার স্নেহার্ত অনুযোগ পায়, তাতে মহিলা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়, কথক তার স্নেহের উপযোগী এক সন্তানই। যখন কথককে বলে 'আমাকে তোমার মা মনে কর না কেন?'—এর উত্তরে কথকের নীরব আত্মভাষণ যা গভীর উপলব্ধিরই আর এক দিক :

> 'তাঁহার শেষ কথাগুলি এতই করুণামাখা, আমার মাতৃহারা হৃদয়ে এমনই সুধাবৃষ্টি করিল যে, আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলাম।'

প্রবাসে কথকের পক্ষে এমন এক বিদেশি মহিলাকে মায়ের স্নেহে পাওয়া—তা এক মহামূল্য জিনিস।

পরে প্রমাণিত হয়, বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কথকের বাবারই প্রেমিকা। অহল্যার প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছে কথকের বাবা তারই স্বামী। বাঙালি স্বামীর যথোচিত স্ত্রী হিসেবে নিজেকে ভেবে ভদ্রমহিলা হিন্দু আচারে সোনার চুড়ি হাত থেকে সরায় কথকের বাবার মৃত্যুর খবর কাগজে পড়ে। এবং শেষে কথক দেশে চলে গিয়ে বিবাহ করলে স্ত্রীকে আশীর্বাদের কথা ভেবে চুড়িগুলি পাঠিয়ে দেয়। এসবই হিন্দু পারিবারিক রীতিনীতির অনুবর্তী। অর্থাৎ মিস ক্যাম্বেল কথকের এক অর্থে বিমাতা। প্রসঙ্গত পঞ্চম পরিচ্ছেদের শুরুতে গল্পের কথকের একটা বিবৃতি লক্ষ করার মতো :

> '....একটি বৎসর আমি বিলাতে ছিলাম। মিস ক্যাম্বেলের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিতাম। তিনি আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবার সময় মাতৃ সম্বোধন করিয়া লিখিতাম; কিন্তু সাক্ষাতে বলিতে পারিতাম না—কেমন লজ্জা করিত।'

এই 'মা' বিষয়ে ইতস্তত ভাবের মধ্যে—পত্র লেখায় মা, কথায় তা স্বীকারে 'লজ্জা'র বিষয়টি স্বাভাবিক এক অ-বৈধ, স্বঘোষিত অধিকারে বিমাতার ভাবকে প্রতিষ্ঠা দেয় পরোক্ষে। একজন ভারতীয় তথা বাঙালির পক্ষে এক বৃদ্ধা বিদেশিনীকে মা-সম্বোধনে আড়ষ্টতা থাকেই। তার ওপর বিদেশিনী যদি তার পিতার অতীত, অবৈধ প্রেমিকা হয়, তাতেও মা-সম্বোধনের আড়ালে আড়ষ্টতা, লজ্জা, সংকোচ দেখা দিতেই পারে। বাবার প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ কথকের একেবারে নতুন অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। তার নিজের মা-

ও নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। এতে প্রমাণ হয় কথকের দিক থেকে মা -চিন্তা স্বভাব স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু সামাজিক সংস্কারে কোথাও নীরব বাধা চাপ তৈরি করে। ক্যাম্বেল অবৈধ 'স্বামী'-প্রেমে অকপট-আগ্রহী, উদারহৃদয়া, কিন্তু কথক মা সম্বোধনে সংকুচিত, সম্বন্ধ-সংস্কারে প্রথাবদ্ধ, তার কারণ মিস ক্যাম্বেলের কাছে এমন ভাবনার মুক্ত ছাড়পত্র নেই।

এই যে একটি শেষতম কথা গল্পের—'আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হইলাম।'—তা সংস্কার ও প্রথার অনুবর্তী কথকেরই একান্ত নিজস্ব স্বগতভাষণ। এই মাতৃহারা হওয়ার ব্যাখ্যা সংসার-সংস্কার সম্পর্কহীন এমন এক অনুভবে নিজেকে সান্ত্বনা-কথা শুনিয়েছে, যা গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের সু-প্রতিষ্ঠা দেয়। এ যেন এক অ-বৈধ বিধবা বৃদ্ধার পবিত্র, বিশুদ্ধ প্রেমভাবনার সকরুণ ভাগ্যলিপি। গল্পের নাম 'নটেগাছটি মুড়লো'র মতো সব কিছুর শেষ বলে দিলেও গল্পের নাম বৃদ্ধা ও কথকের সম্পর্কের চিরন্তন আলোয় আমাদের দুঃখকে কিছুটা জাগায়। নাম তাই অ-সার্থক নয়।

৭.

আদরিণী

এক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩২০ সালের ভাদ্রমাসের সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায়। 'গল্পাঞ্জলি' গ্রন্থে এটি সংকলিত হয় ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে। তখন লেখক গয়ায় ব্যারিস্টারি পেশায় নিযুক্ত। গল্পটি সম্পর্কে গল্পকার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় জানান :

> 'আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি—তবে ক্বচিৎ কখনও বাস্তব-জীবনের দুই-একটা ঘটনা থাকে ঘটে। কেবল আদরিণী গল্পটি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। উহার প্রায় চৌদ্দ-আনা কথা সত্য। গল্পে এত সত্য ঘটনা আর কখনও আমি লিপিবদ্ধ করি নাই।'

এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন লেখক—'গল্পাঞ্জলি'র 'মাতৃহীন' গল্পটা পাঠের পর অনেক পাঠকের মনে হতে থাকে 'নায়কের পিতা প্রবীণ ব্যারিস্টার বাস্তবে সত্য এক ব্যক্তি।' এর সত্যতা অস্বীকার করে লেখক সে প্রসঙ্গে জানান, 'উক্ত প্রবীণ ব্যারিস্টারটি সম্পূর্ণভাবেই কল্পনারাজ্যের অধিবাসী।

'আদরিণী' গল্পটিও 'কাশীবাসিনী', 'ফুলের মূল্য', 'মাতৃহীন' গল্পগুলির মতো বাৎসল্য রসের গল্প। প্রভাতকুমারের 'কুকুরছানা' নামের গল্পটিও সাহিত্যে পশুপ্রীতি বিষয়ক রচনার প্রমাণ দেয়। তবে তা লন্ডনের পটভূমিকায় ইংরেজদের কুকুরপ্রীতির কথাচিত্র। মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায় ও 'আদরিণী' হাতি—উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে যে মিলন- বিচ্ছেদের কথা, তা গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব-ভূমি। এমন পশুপ্রীতি জাতীয় বিষয় নিয়ে,—যেখানে একটি পশু ও একজন পালক-পোষক প্রভুর প্রধান ভূমিকা—একাধিক গল্প প্রভাতকুমারের সমসময়ে ও পরে রচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', তারাশঙ্করের

'কালাপাহাড়', বিভূতিভূষণের 'বুধীর বাড়ি করা' ইত্যাদি তার প্রমাণ। পশুদের নিয়ে গল্প বাংলা সাহিত্যে একাধিক মেলে। শুধু হাতিকে নিয়ে গল্প লিখেছেন বনফুল 'গণেশ জননী' নামে। কুকুর ও বাঘও বনফুলের পশুসংক্রান্ত গল্প—যার পরিচয় আছে তাঁর যথাক্রমে 'খেঁকি' ও 'বাঘা' নামের গল্পদুটিতে। পরশুরাম তো 'লম্বকর্ণ' গল্পে ভিন্ন তাৎপর্যে ছাগলকে নিয়ে কৌতুক ও শ্লেষাত্মক গল্প উপহার দিয়েছেন!

'আদরিণী' গল্পের কাহিনীটি গল্পের প্রধান ব্যক্তিত্ব জয়রাম মোক্তার দিয়ে শুরু, শেষেও আছে মোক্তারের মৃত্যুর মতো শোচনীয় পরিণতির কথা। বিপত্নীক মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বর্তমান বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব, সে সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বাহাদুরের টানা কুড়ি বছর ধরে এস্টেটের বাঁধা মোক্তার। পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়িতে এই মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে হবে অত্যন্ত ধুমধাম করে। মোক্তার জয়রাম তাতে নিমন্ত্রিত এবং এত দূরের নিমন্ত্রণে যাবে সম্মানের সঙ্গে হাতির পিঠে চেপে, এই বিষয়ে মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যস্ত। মোক্তার পেশা ধরে সে সময়ের একজন নামী ব্যক্তিত্ব। মানুষটি অল্প কারণেই তীব্র অভিমানী হয়ে ওঠে, অথচ স্নেহার্দ্র হৃদয়ের। আবার বন্ধুবৎসলও। বদরাগী হলেও দানধ্যান আছে অনেক। জয়রাম মোক্তার মহারাজ নরেশচন্দ্রের পিতার আমল থেকেই ওদের মোক্তারি করে। সেই অধিকার ও সম্মানে মহারাজকে নিজের ভৃত্য মারফত একটি পত্র লেখে হাতি পাঠানোর জন্য। হাতির পিঠে চেপে দুই বন্ধু সহ নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাবে মোক্তার।

মহারাজ হাতি পাঠাবেনই, এই ভেবে নিজের বাড়ির বাগানে বিকেলের দিকে হাতি রাখার ও তাকে খাওয়ানোর সব ব্যবস্থা করে রাখে। আজ রবিবার, কাল সোমবার বিয়ের নিমন্ত্রণ যাওয়ার দিন। খবর আসে, মহারাজ হাতি পাঠাতে অক্ষম। তার যুক্তি বিয়ের নিমন্ত্রণে গরুর গাড়িই যথেষ্ট, হাতির প্রয়োজন নেই। এমন প্রত্যাখ্যানেব ঘটনায় মোক্তার জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রাগে, অসম্মানে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শেষে নিজেই জিদে দু'হাজার টাকায় বীরপুরের উমাচরণ লাড়িহীর কাছ থেকে একটি ছোট, যাত্রীবহনে সক্ষম মাদী হাতি কিনে তাতেই নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। হাতির নাম 'আদরিণী'। কেনার পর তাকে নানা মাঙ্গলিক আচারে ও খাবার খাইয়ে বরণ করে মোক্তারের বড় ছেলের বউ।

নিমন্ত্রণ রক্ষার পর পরের দিন বিকেলেই ফেরার পথে মোক্তার মহারাজের সঙ্গে দেখা করে হাতির পিঠে আসীন অবস্থায়। মহারাজ শোনেন ওই হাতিটি তাঁর নয়, তিনি এই হাতি কোনোদিন দেখেননিও। মোক্তার জানায় সে নিজের অর্থে কিনেছে। নিজেরও ক্ষোভ ও লজ্জা মন থেকে দূর হয় এবং মোক্তার রাজাকে সে বিষয়ে কিছুটা বিনয় কিছুটা শ্লেষাত্মক কথায় বলে খুশি করে। সেই যে আদরিণী কেনে, তাকে একটানা পালন করতে থাকে মোক্তার। এরপর পাঁচ বছরের মধ্যে মোক্তারের অবস্থার অনেক বদল ঘটে। ক্রমশ অবনতির করুণ চিত্র এঁকেছেন গল্পকার মোক্তারের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার। নতুন নিয়মে পাশ-করা মোক্তাররা সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়ায় জয়রাম মোক্তারের কাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক

নেমে যায়। শেষে এক ইংরেজ জজের এজলাসে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একটি খুনের মামলার ফয়সালা করার কারণে ও জজের প্রশংসায় অভিভূত হয়ে জজকে আশীর্বাদের পর কাছারি চিরকালের জন্য বর্জন করে জয়রাম।

কাছারি বাড়ির কাজ ছাড়ার পর জয়রাম মুখোপাধ্যায় পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমশ চরমে ওঠে যে এতদিনের জমানো টাকার সুদে আর সংসারও চলে না, মূলধনে টান পড়ে, ক্রমশ টান পড়ে কোম্পানির কাগজেও। তিন ছেলে একাধিক নাতি-নাতনি নিয়ে একান্নবর্তী সংসারে যে চাপ তা থেকে মুক্তি পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে। শেষে আদরিণী হাতিটিকে বিক্রি করে অর্থের সংকুলানের কথা ভাবে জয়রাম। বড় ছেলের পীড়া, বড় ও মেজ বৌমার একই সঙ্গে সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা, জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণীর বিবাহদান সমস্যা এবং বরপণের মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা, কনিষ্ঠ পুত্রের বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া—এমন সব নানান বিষয়ে বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে অসহায় জয়রাম আদরিণীকে বিক্রির ব্যবস্থা করে। শেষে চৈত্রসংক্রান্তিতে বামুনহাটের বড় মেলায় বিক্রয়ের জন্য পাঠালেও ভাল দামে বিক্রি না হওয়ায় হাতি নিয়ে সহিস ফিরে আসে। হাতিটি বিক্রয়ের জন্য যে মুখুজ্যে পরিবারে দুঃখের দিন ঘনায়, অবিক্রিত হয়ে হাতি ফিরে আসায় তা থেকে আবার তারা আশান্বিত হয়, আনন্দ ফিরে আসে। কিন্তু আবার রসুলগঞ্জের বড় মেলায় বিক্রি করতে পাঠালে আদরিণী পথেই অসুস্থ হয়। রাস্তার পাশে এক আমবাগানে শুয়ে পড়ে চিৎকার করতে থাকে। দ্বিতীয় পুত্রের পাঠানো এক চাষীর হাতের চিঠিতে খবব পেয়ে স্নেহে পাগল জয়রাম নিজেই সেখানে যায়। কিন্তু পৌঁছবার আগেই হাতিটি মারা যায়। গল্পের শেষতম চিত্রটির ভাষারূপ গল্পকারের বর্ণনায় এইরকম :

> 'বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার বলিতে লাগিলেন —"অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলেম বলে—তুই অভিমান করে চলে গেলি?'
>
> ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।"

'আদরিণী' গল্পটি প্রধানত চরিত্রাত্মক বা চরিত্রনির্ভর রচনা। গল্পের আখ্যানে আদরিণী হাতিটি কিছুটা পরোক্ষে থেকে মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের ও জীবনের ওঠানামা ধরেই প্লটের কিছু জটিলতা এনেছে। উপরি-উক্ত কাহিনী থেকেই সহজবোধ্য হয়, গল্পকার তাঁর গঠনরীতিতে Descriptive method নিয়েছেন। গল্পের মূল স্বভাবটাই 'Tale' ধর্মী। এই জাতীয় গল্পরূপের যা বৈশিষ্ট্য, গভীর কোনো মনস্তত্ত্ব নয়, লেখকের কলম নামক মূল সুতোয় ব্যক্তির বাহির ও ভিতর স্বভাব একটি টানা রূপাবয়ব পায়। প্রভাতকুমারের এই গল্পে, তাঁর বেশিরভাগ গল্পের মতোই, তাঁর শিল্পবোধের অনুগ প্লটে জটিলতা কম, হৃদয়েরও দ্বান্দ্বিক কোনো টানাপোড়েন থাকে না।

আলোচ্য গল্পের প্লট তারই অনুগ। গল্পের ঘটনা আনুমানিক দশটি বছর—অন্তত গল্পটি যেভাবে বর্ণিত—সেই বিচারে, জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের যখন পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স,

তার কথাই বলছেন লেখক, এতে স্পষ্ট হয়—মোটামুটি দশ বছরর কাহিনী প্রধান অংশ নিয়েছে। জয়রাম হাতি কিনেছে পঞ্চান্ন বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে। তারপর নতুন মোক্তারদের কারণে কাছারিতে তার পসার কমে যাওয়া, হতাশা ও কাছারি বাড়ি যাওয়া ত্যাগ করে অভিমানে। তা ঘটে যাওয়ার পর জয়রামের কথা বলেছেন লেখক পাঁচ বছর পরের। পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই অর্থাভাবে তার একান্নবর্তী পরিবারটির জীবনে চাপ বৃদ্ধি ও অসহায়তা ক্রমশ তুঙ্গে ওঠে।

এই অর্থনৈতিক অসহায়তায় আদরিণী বিক্রির প্রসঙ্গ ওঠে প্লটের ক্রম-রূপ ধরে। কোনো জটিলতা নেই, আছে প্লটের ভিতরে আবৃত বা আড়াল কাহিনীর ধারাবাহিকতা (Narrativeness)। তা হলেই স্পষ্ট হয় প্লটের সুতোয় গাঁথা কাহিনীর কয়েকটি স্তর। ১. নিজের আভিজাত্য বোঝাতে ও আত্মাভিমান প্রতিষ্ঠায় এবং ক্ষোভ লজ্জা প্রশমিত করতে, অপমানের প্রতিশোধ নিতে নিজেরই একটি হাতি কেনা ও পরোক্ষে মহারাজকে প্রত্যুত্তর দেওয়া, ২. নতুন মোক্তারদের দল ভারী হওয়ায় প্রাচীনপন্থী মোক্তার জয়রামের অভিমানেই কাছারি ও পেনসন ত্যাগ, ৩. ক্রমশ: পারিবারিক অর্থনৈতিক চাপে আদরিণীকে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ৪. হাতি বিক্রির ব্যবস্থাকালে দ্বিতীয়বারে পথে হাতির মৃত্যু, ৫. কন্যাতুল্য হাতির মৃত্যুতে জয়রামের স্নেহদুর্বল মনের বিষাদঘন পরিণতি এবং হাতির মৃত্যুর প্রায় আড়াই মাস পরে তার মৃত্যুবরণ।

এই ব্যক্তি-চরিত্র ও চিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, আছে এক স্নেহদুর্বল ব্যক্তির প্রবলতম ভাবাবেগ নির্ভর মনোলোকের দুঃখিত রূপরেখা। সবটাই গল্পকার স্বয়ং বর্ণনায় সেই চিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। জয়রামের যে ব্যক্তিত্বের ও স্নেহদুর্বল হৃদয়ের আলো-অন্ধকার, তা গল্পকারের হাত ধরেই ছবি হয়েছে, চরিত্র গল্পকারের মর্জিতেই রূপ পেয়েছে। ভিতরের দ্বন্দ্বেও গল্পকারের নিয়ন্ত্রণ মেলে। গল্পের বিষাদঘন পরিণতির জন্য জয়রামের মধ্য দিয়ে হাতিটিই পরোক্ষে দায়ী। হাতি কেনায় কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্বের দায় বেশি, কিন্তু সেখানে কোনো Climax আসেনি। গল্পের নাম আদরিণী, তাকে অভাবে বিক্রি করে দেওয়ার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই গল্পে ক্লাইম্যাক্স এসেছে। বন্ধুদের নানা যুক্তির পরে শেষে জয়রাম বিক্রয়ে মত দেয় : "ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন, 'তোমরা সবাই যখন বলছ, তখন তাই হোক।'" এখানেই মধ্যবর্তী 'ক্লাইম্যাক্স' ঘটার প্রাথমিক পর্যায় শুরু। যার প্রতি জয়রামের নিজ কন্যার থেকেও প্রবলতম জীবনভেদী স্নেহাকর্ষণ, তাকে বিক্রি করার মতো সিদ্ধান্তের মধ্যেই আছে গল্পের ক্লাইম্যাক্স রচনার প্রস্তাবনা। আদরিণীর মৃত্যুতে সেই ক্লাইম্যাক্স শেষ ও সেখানেই গল্পের মানসিক ব্যঞ্জনাগর্ভ উপসংহারও।

কিন্তু গল্পকার এর পরেও জয়রামের শারীরিক মৃত্যুর কথা বলেছেন। এখানেই প্রভাতকুমারের প্লটগঠনের ত্রুটি নয়, সীমা। জয়রামের মৃত্যুর খবর না দিয়ে যদি তিল তিল করে দুঃখের ভাবনায় ও বিষাদে কোনো প্রতীকপ্রতিম মৃত্যুর ব্যঞ্জনা দিয়ে গল্প শেষ হত, তাতে গল্পের প্লটের শিল্পভিত্তি কিছুটা প্রসারিত শিল্পের ব্যঞ্জনা পেত। আরও একটি বিষয় গল্পের গঠনবৈশিষ্ট্য আলোচনায় লক্ষণীয়। গল্পের নাম 'আদরিণী' কিন্তু সমগ্র

রচনায় 'আদরিণী' নামের হাতিটি গৌণ হয়ে জয়রামের হৃদয়দীর্ণ কষ্টের উপায় মাত্র হয়েছে। ফলে তার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হওয়ার দিক বাধাপ্রাপ্ত। জয়রাম কেন্দ্রীয় বক্তব্যের নিহিত মূল চরিত্র। গল্পে হাতিটি কোনো চরিত্র হয়নি। এ বিষয়ে আমরা চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু যুক্তি নিশ্চয়ই রাখব। আপাতত এটাই প্রকট যে, গল্পকারের লক্ষ্য হাতি নয়, হাতির প্রতি প্রবলতম স্নেহের সূত্রে জয়রামের অন্তরলোকের অসহায়তা ও 'প্যাথেটিক' জীবনশেষের দিক দেখানো। তাই গল্পের কাঠামো-নির্ভর প্লটে যত কিছু জটিলতা, তার মূলে জয়রামের ব্যক্তিত্বই দায়ী। হাতিটি আদ্যন্ত উদ্দীপন বিভাব।

দুই

'আদরিণী' গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাবের ও লক্ষ্যের ভিত্তি—বাৎসল্যরস। ভাবের এই রসমূর্তি রূপাশ্রয়ী হয়েছে প্রধানত মোক্তার জয়রাম মুখার্জি ও তার পালিত 'আদরিণী' নামের হাতিটি—দুয়ের সম্পর্ক-বিপর্যয়ের চিত্রে। এতে স্বাভাবিকভাবেই সমান মাপে জয়রাম ও আদরিণীর চরিত্র গল্পে বিকশিত হবে—এটাই আশা করতে পারেন স্বভাবী পাঠকরা! কিন্তু গল্পকারের গল্প লেখার শিল্পভাবনায় আছে যথার্থ পর্যবেক্ষণ শক্তির (Observative power) অভাব। বাৎসল্যরসের স্ফুরণ ঘটেছে একমাত্র জয়রামের চিন্তাভাবনা ও সক্রিয়তার মূল থেকে, আদরিণী সেখানে হয়েছে গৌণ। গল্পে আদরিণী এসেছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মূলের পশুপ্রীতি থেকে নয়, সে এসেছে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ' স্বভাবে ও তাৎপর্যে, জয়রামের জিদের ও অভিমান-অপমানের কারণে ব্যক্তিত্বের অবনমনের উপায় ধরে প্রতিশোধ স্পৃহায়।

হাতির শ্রমে জয়রাম মুখুজ্যে ও তার বন্ধুদের সুখ বিলাস ভোগেই হাতির সমাদর। এই attitude আদৌ পশুপ্রীতির নমুনা প্রমাণ করে না। হাতি কেনার পর আদরিণী মোক্তারের বাড়িতেই থেকে যায় এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর টানা। সেই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে গল্পকার মোক্তারের সঙ্গে হাতির ব্যবহারের কোনো বাৎসল্যের সম্পর্কচিত্র ও situation আঁকেননি। এই যে চিত্রের অভাব, তাতে হাতির দিক থেকে মোক্তারের প্রতি আকর্ষণের স্বরূপ বোঝা যায় না। তাছাড়া কোনো কোনো মানবিক বৃত্তিতে মোক্তারের স্নেহের ফল্গুধারা হাতিটির প্রতি প্রবাহিত হয়েছে, সে সবের প্রমাণচিত্রও মেলে না! বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে এসে পাঁচ বছর ধরে হাতির কোনো স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাসনার চিত্রও অনুপস্থিত। এগুলি থাকলে হাতির ও মোক্তারের সম্পর্কের শিল্পের যুক্তি স্পষ্ট হত।

মোক্তারের কাছারি বাড়ি চিরকালের মতো ছেড়ে আসার পর একান্নবর্তী সংসারে পারিবারিক অর্থনীতির সমূহ বিপর্যয়ের মুখে আবার হাতির প্রসঙ্গ আসে। সেই বিপর্যস্ততা কিছুটা সামলাতেই হাতি বিক্রয়ের উদ্যোগও হয়। তখনি গল্পে আদরিণী দ্বিতীয় গুরুত্ব পায়। তা থেকেই ক্রমশ আদরিণীর প্রতি মোক্তারের স্নেহার্ত হৃদয়ের স্বভাবচিত্র হতে থাকে। এই চিত্রেই গল্পকার দু'পক্ষের সম্পর্কে বাৎসল্যরসের স্বরূপ এঁকেছেন। এই অংশেও বাজারে হাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থায় হাতিটির দিক থেকে প্রতীকী তাৎপর্যে সামান্য হলেও তার মনের খবর দু'বার পাই।

১. জ্যেষ্ঠা পৌত্রী বারো বছরের কল্যাণীর কথায় :

"দাদামশায় আদর যাবার সময় কাঁদছিল। মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'কি বললি? কাঁদছিল?'

'হ্যাঁ দাদামশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল'।"

এই চিত্রে হাতির প্রতিক্রিয়া কিছুটা ধরা পড়ে। এই চিত্রে মোক্তারের প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক : 'জানতে পেরেছে। ওরা অন্তর্যামী কিনা। এ বাড়িতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।' ২. মধ্যমপুত্রের পাঠানো চাষীর হাতের একটি চিঠির ভাষায় হাতির কান্নার প্রতীকী স্বভাব :

'......আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধহয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টা উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতর স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।'

এই চিত্রের প্রতীকপ্রতিম তাৎপর্যে মোক্তারের প্রতিক্রিয়া তার হাতির প্রতি স্নেহার্দ্র মানসিকতার অসহায়তার দিক দেখায় :

"আমার গাড়ীর ব্যবস্থা করে দাও। আমি এখন বেরুব। আদরের অসুখ-যাতনায় যে ছটফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আর আমি দেরী করতে পারব না।

.........'বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার বলিতে লাগিলেন—'অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম বলে?—তুই অভিমান করে চলে গেলি?"

বস্তুত 'আদরিণী' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু তথা অঙ্গীরস যে মমতাময় মানবিক ভাবনার অসীম পশুপ্রীতি, তার একতরফা প্রকাশ গল্পটির মধ্যে শিল্পসীমা দেখায়। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের মহেশ নামে ষাঁড়টি গল্পের কাহিনী, প্লট ও আবহে রক্তমাংসের স্বভাবে ওতপ্রোত। তার তর্করত্ন পুরোহিতের ফলের পুঁটলি দেখে মাথা নাড়িয়ে আহারের বাসনা জানানো, অন্যের সাধের বাগানের গাছপালা তছনছ করা, দারুণ গ্রীষ্মের দিনে তৃষ্ণার্ত হয়ে আমিনার জলের কলসি ভেঙে দেওয়া—এসব প্রতীকী হলেও নায়ক গফুরের সঙ্গে সম্পর্কে অনেক বড় তাৎপর্য আনে গল্পের কেন্দ্রীয় রসে। আদরিণী তা করে না। তাই 'আদরিণী' গল্পের রসাভাস আংশিকতা দোষে দুষ্ট।

তিন

'আদরিণী' গল্পে প্রধান চরিত্র মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায় যে স্নেহার্দ্র হৃদয়ের স্বরূপ দেখায়, তাতে চরিত্রটি গল্পের গতিতে dynamic হতে পারেনি। সে স্থিতিপ্রাণ (static), তার জিদ, আত্মাভিমান, অপমানবোধ, লজ্জা— সবই তাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছে। কাছারি বাড়ির কাজ ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও সেই একই ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ রূপ। চবিত্রটির সীমা হল—১. হাতির প্রতি স্নেহের আকর্ষণ স্পষ্টভাবে দেখানো হয়নি, যাকে

ভিত্তি করে পরে হাতির জন্য দুঃখের তীব্রতা আসে। ২. মনে হয়, মোক্তারের যে পশুপ্রীতি ও পশুপালনের মানসিকতা তার থেকে বড় হয়েছে, তার পারিবারিক নির্মম বিপর্যয়ের, দুর্বলতম অর্থনীতির অব্যবস্থা! আদরিণীর প্রতি আকর্ষণ গৌণ হয়ে যায় আদরকে ঠিকমতো গল্পে জায়গা না দেওয়ায়। ৩. হাতির সঙ্গে মোক্তারের সম্পর্ক অনেকটাই আরোপিত মনে হয়। বৃদ্ধ বয়সে ভাবপ্রবণ এক মানুষের যেমন সাংসারিক পরিবেশে ভাবপ্রবণতার অতিবৃদ্ধি ঘটে, সাংসারিক পুত্রকন্যাদের নাতি-নাতনিদের মতো হাতির প্রতিও—এক অন্যতম সদস্য হিসেবে—গুরুত্ব পায়।

আসলে আদরিণীর উপস্থাপনায় শৈল্পিক ত্রুটি থাকার কারণেই মোক্তার চরিত্রে ঘটেছে শিল্পগত বিভ্রান্তি। মোক্তারের আভিজাত্যের চিত্র সঠিক, তার মানসিক উত্থানপতনের সমূহ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যথার্থ, কিন্তু গল্পের মূল রসে তার যোগসূত্র ক্ষীণ হওয়ায় মোক্তারের কান্না ও মৃত্যু Pathetic হয়েছে, পাঠকদের হৃদয় দুঃখেকষ্টে মথিত করতে পারেনি। স্নেহরসে কারুণ্য ও Pathos উঠে এলেও চরিত্রের স্থিতিপ্রাণ (Static) শিল্পরূপ কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মূল ভিতের মাটি শিথিল, আলগা করে দিয়েছে।

এক কথাকার-সমালোচক মন্তব্য করেছেন : 'করুণ রসের দিক থেকে "আদরিণী" প্রভাতকুমারের অন্যতম মুখ্য গল্প।' কিন্তু আমাদের মতে 'করুণ রস'-এর অসম পরিবেশনে গল্পের শিল্পগুরুত্ব কমে যায়। সমালোচক জানিয়েছেন : 'মোক্তার জয়রাম মুখুজ্যে জেদের বশে যে হাতিটি কিনেছিলেন—সে যেন তাঁরই প্রতীক।' হাতিকে মালিকের প্রতীক ভাবলেও তার প্রতীকী রূপ গল্পে স্পষ্ট নয়। আবার 'আদরিণী'র মধ্যেই জয়রামের প্রাণভ্রমর প্রচ্ছন্ন ছিল।' এমন মন্তব্যের লক্ষ্য গল্পের শিল্প ন্যায়-এর (logic of art) প্রতিষ্ঠা দেয় না।

হাতিটি 'আদরিণী' গল্পে যে কোনো চরিত্র হতে পারেনি, সে কথা আগেও বলেছি। অথচ হওয়া উচিত ছিল। আদরিণী প্রসঙ্গে আসায় গল্পকারের অতিকথন বাধা হয়েছে। হাতির প্রতি স্নেহের প্রকাশ—যার বিস্তারিত রূপ মোক্তারের দিক থেকে থাকা উচিত ছিল—তা না থাকায় হাতির প্রতীকী স্বভাব বিনষ্ট। মোক্তারের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা গল্পের লেখক নিজেই জানিয়েছেন। সেই বর্ণনা বিগত পাঁচ বছরের আড়ালে থেকে হাতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়নি। ফলে শেষ মুহূর্তে অর্থনৈতিক কারণে বিক্রির প্রস্তাব ও মোক্তারের স্নেহদীর্ণ হৃদয়ের ছবি ভারসাম্যতা (Balance) পায়নি। তাই হাতিটি স্নেহরসের কারণ হলেও তা মোক্তারের পক্ষে উদ্দীপন বিভাবমাত্র, চরিত্রের স্বভাবে তার ঔজ্জ্বল্যের স্পষ্ট সীমা ধরায়।

চার

'আদরিণী' গল্পের প্লটনিহিত ভাবের একমুখিতা হাতি ও মোক্তার—দুই-এর সমবায়ে তৈরি হয়নি। একা মোক্তারকে নির্ভর করেই তার অগ্রগমন। সমস্ত গল্পটি একটিমাত্র চরিত্রকেন্দ্রিক হওয়ায় এক ব্যক্তির স্নেহার্দ্র হৃদয়ের উত্থানপতনের ছবি হয়ে উঠেছে।

গল্পকার বিবরণে প্রায় দশ বছরের সময় পরিধি নিয়েছেন। মোক্তারের জীবন-স্বভাব এই দশ বছরের মূল চিত্র—যা সমগ্র গল্পেরও মূল লক্ষ্য। ফলে গল্পের শেযে মোক্তারের মৃত্যুই বড় হয়েছে, হাতির মৃত্যু গৌণ। হাতির মৃত্যুতে মোক্তারের যে খেদ, তা যদি হাতির সঙ্গে নিবিড় যোগে শিল্পভাষ্যের প্রসার ঘটাত, তাতে গল্পের গতির শেষতম পথটি অন্য ভাষার ছবি হত।

গল্পটি মোট সাতটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা। গল্পের ভাষায় সাধুরীতির বর্ণনার সঙ্গে চলতিরীতির সংলাপ মানানসই। একেবারেই দ্বন্দ্বহীন মনের ধর্মে বর্ণনা ও সংলাপ থাকায় গল্পের যে শিল্প-সুষমা তা সীমিত রূপ দেখায়। প্রভাতকুমারের যে গদ্যভাবনা এ গল্পে তা যথাযথ প্রযুক্ত। আমরা আগেও বলেছি মোক্তারের মৃত্যু এইভাবে না দেখিয়ে যদি সংক্ষেপে মোক্তারের মনোলোকের বেদনাকে জীবিত রেখে ব্যঞ্জনাগর্ভ করতেন তাতে প্রকরণগত সৌকর্য বজায় থাকত। প্রভাতকুমারের গল্পের প্রকরণে, শেষতম সিদ্ধান্তে গল্পকার পাঠকদের কিছু ভাববার সুযোগ ব্যঙ্গার্থে রাখতে পারতেন না। এ গল্পে সেই শিল্পবোধের সীমা প্রকট।

পাঁচ

'আদরিণী' নামের হাতিটিকে যদি আমরা চরিত্র ভাবি তা হলে গল্পটির নাম নির্বাচনে গল্পকার হাতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু এই নাম চরিত্রটির গল্পনিহিত সূত্রটিকে শক্ত স্বভাব দিতে পারেনি। প্রথমত, 'আদরিণী' নামে একটি চরিত্রসুলভ পশু থাকায় এমন নাম প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মনে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এমন নাম বাধা হয় গভীর শিল্পবোধে, আদরিণী প্রথম গল্পে দেখা দেয় তৃতীয় পরিচ্ছেদে। তার আগে মোক্তার জয়রামের পরিচয় ও ব্যক্তিত্বের ভাষ্যই প্রধান। ক্রমশ দেখা যায়, আদরিণী গৌণ হয়ে যায়, গল্পে মোক্তারের সক্রিয়তাই বেশি। তাই এমন নামে আমাদের শিল্পাত্মার যথাযথতায় সন্দেহ জাগে। তৃতীয়ত, গল্পে আদরিণী কোনো চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। তার পোষ্য প্রাণীর স্বভাবে কোনো দিক ধরা পড়ে না। এখানে গল্পনামে তার উল্লেখ পাঠকদের শিল্পবোধকে আঘাত করবেই। চতুর্থত, এক কথাকার-সমালোচক যা বলেছেন : 'মোক্তারের কেনা হাতিটি জেদের বশেই কেনা। গল্পে "সে যেন তাঁরই প্রতীক"।' মোক্তারের স্নেহের সূত্রে এই মন্তব্য মান্য হলেও গম্ভীর মর্মার্থ তার অনুপন্থী হয় না সবসময়। মোক্তারের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে হাতির জড়িত থাকার দিকটি এমন নামে সমর্থন জানালেও, আমাদের মনে হয় জয়রাম মুখ্য, হাতি গৌণ হয়ে ওঠে নামের দায়িত্বে। আসলে প্রভাতকুমার মোক্তারের মধ্য দিয়ে আদরিণীকে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, কিন্তু হাতির সূত্রে মোক্তারই নিজের স্নেহার্ত হৃদয়কে প্রসারিত করেছে অনেক। হাতি সেখানে অনেকটাই গুরুত্বহীন। বোঝা যায়, হাতির জন্য মোক্তারের pathos—এই অর্থে 'আদরিণী' নাম—যা ঠিক সম্পূর্ণ শিল্পের সমর্থন পায় না!

পরশুরাম

জন্ম : ১৮ মার্চ ১৮৮০
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল ১৯৬০

রাজশেখর বসু, ছদ্মনাম পরশুরাম, বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক গভীর বিস্ময়কর নাম। বিস্ময় গভীরতম এই কারণে যে, কথাসাহিত্যিক হয়েও তিনি একমাত্র ছোটগল্প রচনা করে এবং কথাসাহিত্যের অন্য বড় ও প্রধান শাখা উপন্যাস রচনার কথা বিন্দুমাত্র মনে না রেখেই বাংলা সাহিত্যে স্ব-শাসিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি বাংলা পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুবাদ করেছেন, অভিধানের মতো পণ্ডিতি ও পরিশ্রমী রচনায় নিবিষ্ট থেকেছেন, একাধিক জ্ঞানগর্ভ, মননিষ্ঠ প্রবন্ধও রচনা করেছেন, কিন্তু রসের সাহিত্য রচনা থেকে কিছুকাল নিজেকে নিবৃত্ত করেছেন, তবুও না! তাই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে আজও এক অদ্বিতীয় বিস্ময়।

কিন্তু বিস্ময়ের আরও দিক আছে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের চারিত্র্যে—যা তাঁর গল্পকার সত্তাকে অভিনব হৃদয়-সংবাদীর মাটিতে নিয়ে আসে। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, কর্মজীবনে বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির বড় মাপের ও মানের পরিচালক, এলেন রসের সাহিত্য রচনায়। সম্ভবত সাহিত্য রচনা করে সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর পরিবার-জীবনসূত্রে সহ-জ ললাট-লিখন, আবার সে সময়ের সাহিত্যিক পরিবেশের সূত্রেও সেই একই। তাঁর পিতা ছিলেন উনিশ শতকের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে খ্যাতকীর্তি গ্রন্থকার, বড় দাদা সাংবাদিক হলেও ইংরেজি ভাষার একজন লক্ষণীয় লিপিকার, ছোট ভাইও মনস্তত্ত্বের জটিল অন্ধকার থেকে মুখ তুলে বাংলা রচনায় দৃষ্টি ধৌত করে গেছেন স্ব-ক্ষমতায়। যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে লেখনী ছিল সর্বাবয়ব আত্মপ্রকাশের মাধ্যম, সেখানে রাজশেখরের লেখনী ল্যাবরেটরির বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় যে থেমে যাবে না, লেখনীমুখ সেখানেই যে রস-স্বভাব নিঃশেষ করবে না, তাঁর সরস গল্প-সৃজন-মানস তারই বড় প্রতিশ্রুতি!

'পরশুরাম' নাম নিয়ে রাজশেখর বসু এলেন বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রথমেই—উনিশশো বাইশ সালে। পৌরাণিক পরশুরামের হাতে ছিল পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার উপযোগী অগ্নিময় ও খরদীপ্ত কুঠার, বাজশেখরের লেখনী-কুঠারে এল বাস্তব সমাজকে তার সমস্ত রকম উৎকেন্দ্রিকতার ন্যায়নীতিভ্রষ্টতা ধরিয়ে দেওয়ার উপযোগী ক্ষুরধার তীক্ষ্নতা ও তারই দীপ্তিতে ক্ষমাহীন নির্মমতা। বিস্ময় এখানেও, তিনি কিন্তু কোথাও বিশেষ ব্যক্তিকে ঘা মেরে জ্বালা ধরাতে লেখনীকে নির্দেশ দেননি, দিয়েছেন তিক্ততার ওপরে হাসির 'কোটিং'। পৌরাণিক পরশুরামের সেই দু'চোখের অগ্নিজ্বালার, সেই কণ্ঠের সক্রোধ বিস্ফার সেখানে অনুপস্থিত। বাংলাদেশে তখন 'ভারতী' পত্রিকার পাশাপাশি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা। সেখানেই বেরুল 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্প—প্রথম আবির্ভাবের সূত্রে।

বিজ্ঞানীর কর্মজীবন এল শিল্পীর ভাবজীবনে। একজন বৈজ্ঞানিক হলেন সার্থক গল্পকার, রসিক মানুষ। ল্যাবরেটরির কেমিক্যালের কষায়-স্বাদে এল ভাবের শিল্পরূপের মিষ্টি-মধুর আস্বাদ্যমানতা। তখন বাংলা সাহিত্যের পরিবেশে শরৎচন্দ্রের গল্পরসে পাঠকরা আফিঙের নেশাগ্রস্তের মতো, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত রস-সাহিত্যে তাঁরা বিরূপ, নজরুলের কাব্যের বেগবান গতি-মুখে তারা প্লাবিত, তৃপ্ত। 'কল্লোল' পত্রিকার পক্ষে লেখকের আবির্ভাব-সময়ে পরশুরামকে টানা সম্ভব ছিল না। কারণ, কল্লোল বেরুল উনিশশো তেইশে কলকাতায় 'ভারতী' গোষ্ঠী থেকে সরে-আসা কিছু লেখকের বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়াজাত তারুণ্যের উৎসবের পতাকা নিয়ে। কলকাতায় বেরুল 'কালিকলম' উনিশশো ছাব্বিশে, 'প্রগতি' ঢাকায় উনিশশো সাতাশে। পরশুরাম এদের সঙ্গে যুক্ত না থেকে লিখলেন টানা দশ বছর বিখ্যাত সব গল্প। লেখনী-মুখে বেগ, লেখকমুখে স্মিত হাসি, লেখকমনে কল্পনামূলক বিশ্লেষণ-দীপ্তি।

সারা দেশময় দেশীয় রাজনীতির নানা টানাপোড়েন, উত্থান-পতন সে সময়ে। পরশুরাম তার আগুনের তাপ থেকে দূরে বসে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে এবং তা-ও সুদূর ইউরোপে। এরপর যে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-কবলিত ভারত তথা বাংলাদেশে সমাজের স্খলন-পতন অন্তঃশীল হতে থাকে, যে দারিদ্র্য, বেকারত্ব যুবকদের মনে পচন ধরায়, তাকেই তির্যক চোখে দেখেন পরশুরাম, লেখনী ধরেন সেদিকেই প্রধানত দৃষ্টি রেখে। রচিত হল 'বিরিঞ্চিবাবা'-র মতো গল্প। এবং পরের গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থ তিনটির গল্পসমূহ। কল্লোলের রবীন্দ্র-বিরোধিতার নামে বিমুখতা, বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তাঁকে স্পর্শ করেনি। পৌরাণিক পরশুরাম যেমন শুধু ক্ষত্রিয়দের দিকেই একমাত্র দৃষ্টি ও দৃষ্টির শাসনকে কেন্দ্রস্থ করেছিলেন, বিশ শতকের পরশুরাম তেমনি রক্ত-দৃষ্টিকে স্থির রাখেন বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের, সমাজ-মানুষের, তার যাবতীয় অসংগতি, ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির স্থিব প্রশান্ত পর্যবেক্ষণের দৃষ্টির ওপর ছিল গল্পকারের বাস্তববোধের সঙ্গে যুক্ত কৌতুক রসের 'এ্যাল্‌কালি'।

'বাস্তবতা' আর 'আধুনিকতা'কে মূল করেই কল্লোলীয়রা আসরে নামেন। সে বাস্তবতা বিদেশি শিক্ষার ফল। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা তা থেকে আলাদা জাতের। পরশুরাম কল্লোলীয় বাস্তবতার অনুষঙ্গী হলেন না, তিনি বৈজ্ঞানিকের বাস্তবতা নিয়ে সমাজ ও তার মানুষের ভিতরটা 'পোস্টমর্টেমে' বসলেন। ল্যাবরেটরির অ্যাসিড, এ্যাল্‌কালি আর মাইক্রস্‌কোপ হল তাঁর হাতিয়ার, পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট 'স্পেসিমেন' হল তাঁর দেখা সমাজ ও সমাজের ভিতরের যাবতীয় বিষয়। পরশুরায়ের গল্প তাঁর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির মতোই এক নিরীক্ষাধর্মী কথাশিল্পের গবেষণাগার—যেখানে ছোট মানুষ, ছোট জীবন অনেক বড় মাপের ব্যঞ্জনায় বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতেই পাঠকের সামনে আসে।

'লম্বকর্ণ' গল্পটি পরশুরামের প্রথম গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' সংকলনের সূচিপত্রে চতুর্থ স্থানে চিহ্নিত রচনা। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থপাঠেই নতুন এক লেখকের আবির্ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করে

গ্রন্থটিকে বলেন 'চরিত্র চিত্রশালা'। এ গ্রন্থে 'মূর্তির পর মূর্তি গড়ে' তোলার এমন ক্ষমতাকে নন্দিত করে গেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গুণী একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ীকে সাদর সংবর্ধনা জানানোর মতো। পরশুরামের দৃষ্টি ছিল তির্যক, মনের গভীরে ছিল নিরাসক্তচিত্ততা, লেখনীতে ছিল বুদ্ধিশাণিত ক্ষুরধার দীপ্তি, প্রকাশ-ভঙ্গিতে ছিল সম-সময়ের উপযোগী মানুষগুলিকে কার্টুনিস্টের মতো বৈশিষ্ট্যে এঁকে তোলার উপযোগী রঙ এবং সেটাই তাঁর গদ্যভঙ্গি ও ভাষাবৈশিষ্ট্যের চাঁছা-ছোলা স্বভাবধর্ম। 'লম্বকর্ণ' গল্প শুধু নয়, 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'জাবালি', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'উলটপুরাণ', 'দক্ষিণরায়' ইত্যাদি প্রথম দশ বছরে লেখা গল্পগুলিতে পরশুরাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় ও সমাজের, মানুষ ও তাদের আচার-আচরণের, ব্যবহৃত নীতি ও নীতিভ্রষ্টতার এক শ্লেষমধুর টীকাভাষ্য রচনা করে গেছেন। এ সবই যেন কার্টুনিস্টের আঁকা সঠিক ছবি।

প্রথম দশ বছরের কথাটা আমরা জোর দিয়ে 'বিশেষ' করতে চাইছি এই কারণে যে, পরশুরাম উনিশশো বত্রিশ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছর একেবারেই গল্পকারের লেখনী স্তব্ধ করে রাখেন। হয়তো প্রথম যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে গল্পকারের যা বলার ছিল—সবই বলা হয়ে গেছে! আমরা মনে করি সম্ভবত তা-ই। সাহিত্যে একজন কৌতুকরসের স্রষ্টা আজীবন কৌতুকরসকে সম্বল করে সমান মর্যাদায় সাহিত্য সৃষ্টিতে নিমজ্জিত থাকতে পারেন না। সেখানে পুনরুক্তি এসে যেতেই পারে প্রসঙ্গ এবং প্রকরণ—উভয়তই। পরশুরাম ছিলেন আত্মসচেতন শিল্পী—যে কোনো কৌতুক রস-সাহিত্যের স্রষ্টাকে তা হতেই হয়। তাই উনিশশো বাইশ থেকে উনিশশো বত্রিশ সাল পর্যন্ত যে লেখনীর দুর্বার গতি, তার স্তব্ধতা বুঝিবা আত্ম-সচেতন, আত্ম-সমালোচনামুখর, সতর্ক এক স্রষ্টার সচেতন প্রয়াসই! হয়তো বা মনের অধিতলের স্থির-নির্দিষ্ট বাসনাও!

পরশুরাম আবার লেখনী ধরেন উনিশশো বিয়াল্লিশে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দানব কলকাতার আশেপাশে তার বীভৎস বলবান হাত-পায়ের সঞ্চালন করে চলেছে সশব্দে। সারা বাংলাদেশের ওপর যুদ্ধের অক্টোপাশের প্রত্যক্ষ আক্রমণের ছায়া। ল্যাবরেটরির দেয়ালেও তার ঘা পড়ে। নিবিষ্ট বৈজ্ঞানিক আবার লেখনী হাতে নেন কথাশিল্পীর। যখন সমাজ ভয়ংকরভাবে ভাঙতে থাকে, দেশের সংহতি, জাতীয়তায় পড়ে আঘাত, যখন পচন-পতন অবক্ষয় সমাজ-মানুষকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয় নির্মমভাবে, তখন একজন যথার্থ শিল্পী-প্রাণ মানুষ লেখনী নিস্তব্ধ করে রাখতে পারেন না। কর্মীর সচেতনা থেকে শিল্পীর সচেতনতাই তখন বড় হয়ে ওঠে। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির বৈজ্ঞানিক কর্মী-পরিচালক রাজশেখর বসু পরশুরামের রক্ত-বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে শিল্পী সচেতনায় আবার গল্পের জগতে চলে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তাঁকে টেনে আনে যুদ্ধমুখর ও বিধ্বস্ত সমাজের প্রাঙ্গণে, অসহায় মানুষদের জনতার মধ্যে। আমৃত্যু, অর্থাৎ উনিশশো উনষাট পর্যন্ত সে লেখনী আর বন্ধ হয়নি। পরশুরামের মৃত্যু উনিশশো ষাট সালে।

লক্ষ করার মতো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে বিজ্ঞানীকে নামায় ছোটগল্প রচনার উপযোগী সাহিত্য-পথে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই কাজ সমাধা করে। তার মানেই যুদ্ধের অভিঘাত,

বিশেষ করে বিশ শতকে, যে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল শিল্পীমনগুলিকে, পরশুরাম তার বড় দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকে রেনেসাঁস এনেছিল চিরকালের বড় রোমান্টিক কম্পন, তাই দেখা দেয় বাংলা সাহিত্যের বড় বড় ব্যক্তিত্বের স্তম্ভগুলি। বিশ শতকে দুটি যুদ্ধ আনে বড় অথচ রূঢ় বাস্তব আঘাত, জাগে বড় বড় শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কল্লোলের মূল্যবান বহু বিচিত্র ফসল সৃষ্টির সহায়ক ঘটনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সার্থকতম একাধিক ছোটগল্প রচনার উপযোগী মালমশলা জোগানের সূত্রে সমাজ-দেহের বাস্তব চিত্র রচনার উপযুক্ত ঘটনা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী প্রায় কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম দশ বছরে পরশুরামের আবির্ভাব ও ছোটগল্পের জগতে সাম্রাজ্য বিস্তার, শেষ দশ বছরে যেন বা ক্লান্তিজনিত সম্রাটের আত্মগোপন। শেষ যুদ্ধের পরে সম্রাটের যেন নিজ রাজ্যে নীতির শাসন প্রতিষ্ঠার কারণেই পুনরাবির্ভাব এবং আমৃত্যু তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ পরিচালন! পরশুরামের গল্পকার জীবনের মধ্যের দশটা বছর যেন তাঁর শিল্পী-মনের এক 'চরমমুহূর্ত'। 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'জাবালি', 'কচিসংসদ', 'মহাবিদ্যা', 'লম্বকর্ণ' ইত্যাদি গল্পে যে কৌতুকরস, যুবক সমাজের প্রতিচিত্রণ, যে পারিবারিক জীবন-সমস্যা ও দিনযাপনের বিচিত্র, বিস্ময়কর, সঙ্গতিপূর্ণ আবেগধর্ম—তা 'চরমমুহূর্ত' পর্বটির উত্তরকালের গল্পে মুছে যায়নি, উত্তরকালের রচনায় শিল্পের যত সীমাবদ্ধতাই থাক না কেন।

পরশুরামের কৌতুক-ব্যঙ্গরসের গল্প-প্রসঙ্গ উঠলেই পূর্বসূরি ত্রৈলোক্যনাথের কথা মনে আসে। উনিশ শতকের 'ত্রৈলোক্যনাথের বাংলা সাহিত্যে নক্‌শা আর রহস্যকে ছাড়িয়ে প্রথম খাঁটি হাসির গল্প' লেখেন বলে একালের এক কথাকার-সমালোচক তাঁকে এমন পথিকৃৎ-সম্মান দিয়ে গেছেন। কথাটা আদৌ যে অ-যথার্থ নয়, তার প্রমাণ—তাঁর থেকেই হাসির গল্পের প্রেরণা পেয়েছেন প্রভাতকুমার ভিন্ন বাস্তবতায়, বৈঠকী গল্পের আসরের মেজাজ নিয়েছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব-স্বভাবে। পরশুরামের ওপরেই দায়িত্ব এল ত্রৈলোক্যনাথের গগন-বিস্তারি কল্পনা ও উদ্ভট রসের আয়োজনকে বুদ্ধির ছাঁকনিতে পরিশীলিত করার ও নাগরিক করে তোলার।

বাংলা হাসির গল্পের ধারায় যেখানে ত্রৈলোক্যনাথ, সেখানে পরশুরামের আবির্ভাব শিষ্য একলব্যের মতো। পরোক্ষে গুরুমন্ত্র লাভ ঘটে ত্রৈলোক্যনাথের কাছেই। ত্রৈলোক্যনাথ গুরু, পরশুরাম শিষ্য। নিশাতরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান লাভ করে নীচ জাত বলে, পরে তার একক নিঃসঙ্গ সাধনা। ত্রৈলোক্যনাথের কাছ থেকে পরশুরামকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়নি, তবে তাঁর হাসির গল্পের শিক্ষালাভ পূর্বসূরি অনেকের অভিজ্ঞতার পথ ধরে গোপনে নিঃসঙ্গ সাধনার স্বভাবে তৈরি হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের আর পরশুরামের মধ্যে হাসির গল্পের সীমানায় অনেককে পেয়েছি—সব সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের শিষ্যত্ব না নিয়েও, তাঁদের মধ্যে আছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ বসু—এমন সব উনিশ-বিশ শতক কাঁপানো সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। এঁরা যখন লিখছেন, তখন পরশুরামের বুঝিবা

ত্রৈলোক্যনাথকেই পরোক্ষে গুরু করে পৌরাণিক একলব্যের মতো নির্জনে, নিঃসঙ্গতার সাধনা করে-যাওয়া!

আর এমন সাধনারই প্রথম ফসল 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'—যার প্রেরণার মূলে থাকে ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরুচরিতে'র পঞ্চম গল্পের পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'স্বদেশী কোম্পানী' কথা-অংশটি। এই গল্পই প্রমাণ করে, পরশুরামের আবির্ভাবের আগের সাধনায় প্রথম মন্ত্র জোগান ত্রৈলোক্যনাথই। তাই, যে কথা আগেই বলেছি, পরশুরামের গল্প আলোচনায় ত্রৈলোক্যনাথ সুস্থ গুরুবাদের বড় মানে তাঁর আদিপুরুষ-মর্যাদা পেয়ে যান। একলব্যের নির্জন একনিষ্ঠ সাধনা গুরু দ্রোণাচার্যকেও হারিয়ে দিয়েছিল, পরশুরামের সাধনা মিলে-অমিলে গুরুর থেকে আলাদা এক ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছিল গল্পের সর্বাবয়ব রূপের প্রকরণ ও বিষয়ে। বৈঠকী গল্পের মেজাজ, গল্পের মধ্যে গল্প বলার সরস শিল্পকুশলী রীতি, ভৌতিক রসসৃষ্টির অবারিত দ্বার-উন্মোচন, শব্দের ও কোথাও বা বাক্যাংশের অক্ষরডম্বর প্রয়োগ—এসবে গুরু-শিষ্যে মিল। একথা তো ঠিক, আদিতে, মনে হয় গুরু আর শিষ্যে সম্যক মিল না থাকলে কোনো শিষ্যই গুরুর কাছে আসবে না, গুরুও শিষ্যকে শিষ্যত্ব দানে নারাজ হবেন! তাই ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম সাদৃশ্যে অনেক কাছের, কিন্তু অমিলে এঁরা দুজন হাস্যরসের ধারায দুই বিপরীত মেরুর জগতের দিকে এগোতে থাকেন। 'ডমরুধবের বুকে প্যাঁচ' এমন শীর্ষনামের কাহিনী-অংশে ত্রৈলোক্যনাথের ডাক্তার বোগীর বুকে নল লাগিয়ে বলে—'এখানে একটা প্যাঁচ আছে।' পবশুরামের ডাক্তার 'চিকিৎসা সংকটে' বলে, 'তোমার পেটে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আছে'—এমন অসম্ভবেব, উদ্ভট মন্তব্যের সিচুয়েশন তৈরিতে দুই লেখকেব আত্মীয়তা বিস্মিত করে।

কিন্তু দুই ব্যক্তিত্বের অমিল বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো! দুই প্রতিভা একই উপন্যাস-শিল্পের সম্পূর্ণ নতুন দুই ধাবামুখ চিহ্নিত করে গেছেন—রবীন্দ্রনাথে আদি-স্বভাবে বঙ্কিম- অনুসরণ থাকলেও ত্রৈলোক্যনাথ-পরশুরাম অনেকটা সেইরকম। দুজনেব আবির্ভাব সময়টাই তো আলাদা—ত্রৈলোক্যনাথ উনিশ শতকের শেষার্ধের আবেগবান পুরুষ, পবশুরাম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের বিবেকবান শিল্পী। দুই ব্যক্তিত্বে তফাত হতে বাধ্য। যুগ ও সময় ত্রৈলোক্যনাথকে কল্পনাবিলাসে নিমজ্জিত হতে বাধ্য করে, পরশুরামের সময় তাঁকে বুদ্ধিগত বাস্তবতার চুম্বকে কঠিন আকর্ষণে স্থির রাখে। নিটোল গল্প বলার অবকাশ আছে ত্রৈলোক্যনাথে, পরশুরাম সময় ও পাঠকদের মেজাজ ভেবেছেন, বিশ শতকীয় বিজ্ঞান-মনস্কতাকে মেনে নিয়ে কাহিনী ও গল্পবিবিক্ত নকশা ও চিত্রকে দিয়েছেন প্রাধান্য। পরশুবাম তাঁব মানুষগুলিকে সমাজ ও তারই বাস্তবতায় বেছে বেছে তুলে এনেছেন—যাদের যথার্থ দর্শন সাধারণের পক্ষে অসাধ্য। ত্রৈলোক্যনাথ কল্পনায় মানুষগুলিকে সৃষ্টি করতে আনন্দ পেয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথের ভূত কল্পনাতেই দারুণ মজার, পরশুরামের ভূত বুদ্ধি-বিবেকের একান্ত অধিগত থেকে বাস্তব, তারা রীতিমতো ভাবায়! এই গল্পকারেব কল্পনা বাস্তব মাত্রা থেকে বেশি উপরে উঠতে পারেনি,

চাননি। ত্রৈলোক্যনাথ 'গ্রামীণ' (Rural), পরশুরাম 'নাগরিক' (Urban) —এই কারণেই অমিল দুজনের ভাগ্যে তুলনায় নিয়তির মতো নির্দিষ্ট। দুজনেরই আবির্ভাব দেশপ্রেমের উত্তাল পরিবেশে। ত্রৈলোক্যনাথের দেশপ্রেম-ভাবনা রেনেসাঁসের ভাবধর্মী সমালোচনা-বৈশিষ্ট্যে নিটোল কাহিনীর সমাপ্তিকে শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছে, পরশুরাম দেশপ্রেমের বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর দরকার হয়নি গল্প বলে চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখানো। ত্রৈলোক্যনাথ বৈঠকী গল্পের আড্ডায় বসে অনেক বেশি কথা বলতে একান্ত অভ্যস্ত, পরশুরাম যুক্তি-তর্কের সময়ে অল্প কথার মানুষ। বুদ্ধির দীপ্তি সেখানে কখনো বিস্ময় আনে, কখনো মানবিকতায় ভাবায়, কখনো কারুণ্যে কাঁদায়। আবার আমরা নিশ্চয়ই পরশুরামের হাতে আজগুবি রসের বড় ভিয়েন আশা করব না, তার কারণ বিজ্ঞানের কঠোর চোখ তখন কঠিন শাসকের মতো। ত্রৈলোক্যনাথ এ ব্যাপারে শিষ্যকে তাঁর ক্ষমতার বীজমন্ত্র নিতে দেননি। আজগুবি রসে ডমরুধরের যে ক্ষমতা তা অতুলনীয়, ত্রৈলোক্যনাথ সে ব্যাপারে আমাদের ঘরের কাছের মানুষ, পরশুরাম দূরের, পাশ্চাত্যের ঠাট-ঠমকে উন্নত মানের, গম্ভীর রীতিমতো সাহেবি!

এইভাবেই ত্রৈলোক্যনাথ থেকে পরশুরামের শিষ্যত্বকে বরং অমিলেই, বিপরীত সাধনাতেই স্বাগত জানানো ঠিক। তাতেই আমরা খুশি। একমাত্র পরশুরামই গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়ার মতো ত্রৈলোক্যনাথকে মাঝেমধ্যেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধ সাধনায় গুরুকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন, করেওছেন। ত্রৈলোক্যনাথের সুবোল গড়গড়ি, তিনু, ডমরু, পরশুরামের কেদার চাটুজ্যে ইত্যাদির মধ্যে নতুন সংস্করণের বিস্ময় নিয়ে বেশ-বাস বদলায়। ত্রৈলোক্যনাথ থেকে পরশুরাম সরে এসে যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে পরশুরামে-ই নিজের গড়া সাম্রাজ্য, সেখানে পরশুরাম স্বরাজ্যে স্বরাট্!

১.

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

এক

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি শাণিত কুঠারের মতো হাতে নিয়েই বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের মধ্যবয়সী অভিজ্ঞ এক রাজার মতো প্রবেশ। এ পবশুরামের পোশাকে ঋষির রক্তবর্ণ বা গৈরিক রঙ নেই, আছে বিশ-শতকীয় বিজ্ঞানের স্বভাব দিয়ে সাজানো এক নবীন রাজার পরিচ্ছদ। তাঁর প্রবেশ বাহিরে স্মিত কৌতুক ও ব্যঙ্গের পোশাক পরিধান করে, ভিতরে গভীর জ্বালার অসহায়তা নিয়ে।

কোনো সমাজ সংস্কারে তিনি ব্রতধারী হননি, বাস্তবতার কঠিন শর্তে পরশুরাম নির্ভীক নিরাসক্তি নিযে সমসময়ের মানুষজনকে চিনিয়ে দেওয়ার বিচিত্র সব শিল্প-দায়িত্ব লেখনী-মুখে সমবেত করেছিলেন। তাঁর সমকাল তাঁকে প্রাণিত করে, তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে মূল্যবান মণিরত্নে দীপিত করে, তাঁর বিস্ময়কর কল্পনাশক্তি তাঁকে নির্ভীকতায়, শিল্পের সংযমের শিক্ষায় সনিষ্ঠ করে তোলে। পরশুরাম যে একজন নাগরিক বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের, কৌতুক-ব্যঙ্গের চিত্রী বাংলা সাহিত্যে, তার প্রথম পথিকৃৎ-প্রমাণ গল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', প্রকাশিত হল উনিশশো বাইশ সালের সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।

এই প্রকাশে তাঁর রাজকীয় আবির্ভাবের বিস্ময়করতা ও খ্যাতির অসীমতা নিয়ে আবেগাত্মক মন্তব্যে তাঁকে স্বাগত জানাতে আমাদের আপত্তি থাকে না, কিন্তু, আমাদের অন্য কথা হল, বাংলা কৌতুকব্যঙ্গের কথাসাহিত্যে উনিশ শতকীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পর পরশুরামই প্রথম ব্যঙ্গ সাহিত্যের বিশ শতকীয় উৎসমুখ চিহ্নিত করে দিলেন। তা যে বিশ শতকীয় সমাজ-বাস্তবতার এক নতুন নান্দী! এমন সৃষ্টিব পিছনে সমকালীন সমাজ ও তার মানুষজন গল্পকারকে রসদ দেয নিশ্চয়ই।

উনিশশো আঠারো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের—যার শুরু উনিশশো চোদ্দ সালে এবং যার ভয়াল প্রত্যক্ষ রূপ প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল প্রতীচ্য খণ্ডেই—অবসান ঘটে। ভারত এক বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব ভারত তথা বাংলাদেশে আসতে বাধ্য। সারা দেশে তখন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আন্দোলনের উথাল-পাথাল রূপ। দেশে অসহনীয় দারিদ্র্য, হতাশাব্যঞ্জক বেকারিত্ব, আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক মন্দার বাজার, মধ্যবিত্তের উৎকেন্দ্রিক জীবনধারণ এক অভিশাপের মতো কালো ছায়ার আবরণ তৈরি করে। স্বার্থমগ্ন সুবিধাভোগীদের এমন ত্রিযামার তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশেই উচ্ছ্বাস-উল্লাস, সচলতা, সক্রিয়তা বাড়ে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বেঁচে থেকেও নিশ্চিত মৃত্যুর উদ্বিগ্নতায় মাথাচাড়া দেয় দেবতা, ধর্ম ইত্যাদির ওপর নিরঙ্কুশ নির্ভরতার আপাত নিশ্চিন্তি। এমন অস্থিত, অন্তঃশীল ক্ষয়রোগের সমাজ-স্বভাবে মানুষ সদাগম্ভীর, বাঁচার তাগিদেই সময়ের মূল্য মাপতে ব্যস্ত থাকে। সে সময়ের সাহিত্যে তাই রাজনীতি, সমাজনীতি, মধ্যবিত্ত জীবন-সংকট ইত্যাদি নিয়ে বড় বড় জীবনদর্শনের সাহিত্য রচিত

হতে শুরু করেছে। সাহিত্যের আশ্রয়ে এতটুকু শ্বাস ফেলার অবকাশ মানুষের ও জীবনের কোথায়? তারই মধ্যে নির্মল কৌতুক ও ব্যঙ্গের আবহাওয়ায় সেই অবকাশটুকু দেখিয়ে দিয়ে পরশুরাম আনলেন 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে'র মতো গল্প।

এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন 'চরিত্র চিত্রশালা', প্রমাণ পেলেন পরশুরামের 'মূর্তির পর মূর্তি গড়ে তোলার' অসাধারণ শিল্পদক্ষতা। পরশুরাম গতানুগতিক রীতির গল্পকথা বর্ণনা না করে, মনস্তত্ত্বের জটিল অন্ধকার জগতে ডুব না দিয়ে সেই তীক্ষ্ণনাসা তান্ত্রিক বাস্তবতায় গণ্ডেরী, শ্যামানন্দ, তিনকড়ি, অটল, বিপিনদের একেবারে বেছে বেছে আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। ঝানু গোয়েন্দার মতো আসামীদের দেখিয়ে দেওয়া! এমন বাছার কারণ তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ করা! পরশুরামের 'চরিত্র চিত্রশালা' নির্মাণে অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের দ্বিতীয় দশকের শেষে বসে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের স্বভাবসহ গোটা বিশ শতকের একশ্রেণীর মানুষের পথিকৃৎদের, পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। এ দূরদর্শিতা ও সাহস একজন ব্যঙ্গচিত্রী যত সহজে, নির্মোহ স্বভাবে চিহ্নিত করতে পারেন, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার মতো কৌতুকরসের কুঠারে রক্তপাত ঘটাতে পারেন, অন্য কোনো শিল্পীর পক্ষে ঠিক সেভাবে সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারত তথা বাংলাদেশে একেবারে প্রত্যক্ষরূপেই দেখা দেয়। তার এই উতরোল স্বভাবের মধ্যেই সারা ভারত তথা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দেখা দেয় মজুতদার, মুনাফাখোর কালোবাজারির দল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। পরশুরাম নিপুণ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো এদেরই পূর্বসূরিদের এনেছেন তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে'র গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া, শ্রী শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্যালক বিপিন, উকিল অটল—-এমন সব মানুষগুলিকে একত্র সমবেত করে। বাংলা কৌতুক-ব্যঙ্গের, রঙ্গরসের গল্পের ধারায় এরাই গল্পকার পরশুরামের প্রথম পথিকৃৎ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণীয় করে। আদিতে ধর্ম যত 'আগমার্কা'ই হোক না কেন, বিজ্ঞানের বিবর্তনে ক্রমশ তা হয় সুবিধাভোগী সমাজ ও জনমানসের কাছে আফিঙ, একটা পরিত্যাজ্য খোলস। আলোচ্য গল্প তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দিষ্ট করে। গোটা বিশ শতক প্রমাণ করে তথাকথিত ঈশ্বর-নির্ভর, মানবতাবিধ্বংসী ধর্ম রাজনীতির বড় ভান ও ধূর্ত কৌশল, যাবতীয় অমানবিকতার জন্মদাতা, ব্যবসাদার ও মুনাফাখোরদের অতি মূল্যবান স্বপ্নাদ্য 'মদনমোহন' মাদুলি। একালেই আমাদের কলকাতা ও গ্রামগঞ্জের শহর, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকেন্দ্রগুলি ও তাদের পরিচালকরা রাস্তায় রাস্তায় ধর্মেরই নামে ঘৃণ্য যথেচ্ছাচারে, ক্ষমতালোভ ও অর্থলোভের নিরঙ্কুশ চরিতার্থতায় লিপ্ত।

নির্মোহ, নিরাসক্ত ব্যঙ্গচিত্রী পরশুরাম এদেরই পূর্বপুরুষদের চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁর 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে। এখানেই তাঁর দূরদর্শিতা, আধুনিক চিন্তাচেতনা, বেঙ্গল কেমিক্যালের রসের ভিয়েনে পরিশীলিত করা বিজ্ঞান-মনস্কতা। কোথায় কোন

কেন্দ্রে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে কাদের নিয়ে তিনি লিখবেন, তাঁর লেখনীকুঠার কোন কোন সমাজ, তার বিধি, তার মানুষজনকে সহাস্য আঘাতের রক্তপাতহীন শীতল স্বভাবে চিহ্নিত করবে, উদ্দেশ্যহীনতায় কিভাবে যথার্থ শিল্পীর মহিমায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাবেন তিনি, তার বীজচিহ্ন 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের 'চিত্র'স্বভাবে নিহিত আছে। এই গল্পটি যেন তাঁর শিল্পী-মনের গভীরে প্রবেশের অব্যর্থ চাবিকাঠি।

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে'র গল্পাংশ সামান্য, গল্পশিল্পের প্রচলিত মাপে তা নেই বললেই চলে। এই গল্পের পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সের মূল নায়ক নিঃসন্তান শ্যামলাল গাঙ্গুলী, গল্পকারের কলমে শ্যামবাবু, পরে সে নিজেকেই শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী এমন অ্যাখ্যা দিয়ে তাতেই বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে যায়। ই. বি. রেলওয়ে অডিট অফিসের চাকুরে। ছোটবেলা থেকেই তার ঝোঁক স্বাধীন ব্যবসা করার। সেই কারণে আগে অনেক কারবারে বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও এখনো চাকরির অবকাশে ব্যবসা করতে একান্ত আগ্রহী। তার বর্তমান কারবারের নাম 'ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল মার্চেন্টস্'। এর স্বত্বাধিকারী শ্যামবাবু নিজেই এবং তার শ্যালক বিপিন চৌধুরী। শ্যামবাবুর প্রতিদিনের স্বভাবে, আচার-আচরণে, কথায় আছে ধর্মভীরুতা। তার স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীর ওপর স্বপ্নাদেশ হয় জাগ্রতা দেবী সিদ্ধেশ্বরীর। তাতেই স্বগ্রামের যৎসামান্য দেবত্র সম্পত্তির কিছু জমি ও ভাঙা কালীমন্দির স্ত্রীর নামে লিখে সেখানে মন্দিরকে কেন্দ্র করে মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে।

তার ভার পড়ে শ্যামবাবুরই প্রতিষ্ঠিত কারবার শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের ওপর। এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয় অবাঙালি ব্যবসাদার গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া, শ্যালক বিপিন,, সদ্যোজাত অ্যাটর্নি অটলবাবু, অর্থলোভী অথচ কৃপণ রিটায়ার্ড ডেপুটি রায়সাহেব তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে। শ্যামবাবু মন্দির প্রতিষ্ঠার নামে, ধর্মাচারের বিবিধ বিচিত্র প্রভৃত লাভজনক সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়ে প্রচুর অর্থলাভের টোপ ফেলে দশ লক্ষ টাকার কোম্পানি খোলার কথা ও জনসাধারণকে শেয়ার কেনার কথা প্রচারপত্র মাধ্যমে জানায়। এমনভাবে প্রচার করা হয় যাতে বারো লক্ষ টাকা হবে লাভ এবং সহজেই একশো পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দেওয়া যাবে শেয়ারহোল্ডারদের। শ্যামবাবু ও তার বাকি চার ডিরেক্টর নিজেরা নগদে কোনো অর্থ লগ্নি না করেই মোটা টাকার শেয়ার কেনার হিসেব কৌশলে খাতায় কলমে রেখে কোম্পানির কর্ণধার হয়। প্রচারে সব শেয়ার বিক্রি হয়ে যায় একসময়।

বছর দেড়েক পরে কোম্পানির চিত্র অন্যরকম। সাধারণ মানুষ বাজারে শেয়ার কেনার জন্য ব্যস্ত, অস্থির, বাজারে শেয়ারের তখন চড়া দাম। এরই মধ্যে গণ্ডেরী মোটা টাকায় তার সব শেয়ার বিক্রি করে দেয়, অটলও সেই পথ ধরে। হিসেবের মারপ্যাঁচে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে বাদে ডিরেক্টররা দায়িত্বমুক্ত হয়ে সকলেই মোটা টাকা পেয়ে যায়। কিন্তু শ্যামবাবু ও অন্যদের ধাপ্পাবাজিতে কোম্পানি ডুবে যায়। গণ্ডেরী নিজের দায় থেকে মুক্ত, শ্যামানন্দ কাশীর বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয়-সন্ধানী। ডিরেক্টররা সব অর্থলোভী তিনকড়িকেই কৌশলে একমাত্র ডিরেক্টর করে দিয়ে, মাসিক হাজার টাকার পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে যখন

পলাতক, তখন কোম্পানির নিশ্চিত ভরাডুবি অবস্থা, সরকারের দৃষ্টি তখন এদিকেই। আর সুযোগসন্ধানী অর্থলিপ্সু তিনকড়িরও সর্বস্বান্ত হবার শেষতম স্তর চূড়ান্ত। 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটির কাহিনী-অংশ এখানেই শেষ।

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' অবশ্যই সমাজ-সমস্যা-নির্ভর ব্যঙ্গধর্মী গল্প। এ গল্পের ঘটনানির্ভর কাহিনী-অংশ কম। 'ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল মার্চেন্টস্'-এর ব্যবস্থাপনায় 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমেটেড' নামের জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সমস্ত শেয়ার বিলি করা সম্ভব হয়েছে। 'লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়াদামে বেচা-কেনা হইতেছে।' এটা গল্পের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আবার গল্পের শেষে কোম্পানি ডুবে যাওয়ার বিষয়টিও আর একটা ঘটনা। এই দুটি পরস্পর বিপরীত ঘটনা দিয়ে গল্পের যে প্লট-বৃত্ত—তাতে কাহিনীর টানা কোনো সূত্র নেই। কাহিনীকে রূপ দিয়েছে পাঁচটি প্রধান চরিত্র। আসলে গল্পটি রবীন্দ্রনাথের কথাতেই এক 'চরিত্র-চিত্রশালা'। পবশুরাম গল্পের শরীর গঠনে গতানুগতিক রীতি বর্জন করেছেন।

গল্পটির চারটি অংশ : ১. প্রথমে পরশুরাম গল্পের মূল নায়ক শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর বাহির ও ভিতর স্বভাবের এক জীবন্ত বাস্তব রূপের পরিচিত চিত্র এঁকেছেন। ২. 'ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল মার্চেন্ট্স্' অফিসে বসে চারটি চরিত্র গণ্ডেরী, শ্যামানন্দ, অটল, বিপিনের নতুন 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামের জয়েন্টস্টক কোম্পানি খোলার পরিকল্পনা করা ও রায়সাহেব তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে ডিরেক্টর করার ব্যবস্থা পাকা করা গল্পের উল্লেখযোগ্য অংশ। এই অংশেই ক্রমশ প্রচ্ছন্ন কাহিনীসূত্র যেমন রচিত হতে থাকে ধীরে ধীরে, তেমনি চরিত্রগুলির অন্তঃশীল স্বরূপ স্পষ্ট হতে থাকে। ৩. তৃতীয় অংশে নব-প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির সমস্ত শেয়ার বিলি হয়ে যাওয়ার এক ব্যবসায়িক 'মহামুহূর্ত' অবস্থার খবর দিয়েছেন গল্পকার। ৪. গল্পের সব শেষে কোম্পানির ভরাডুবি ও অর্থলোভী তিনকড়ির নতুন ডিরেক্টর প্রধানের পদগ্রহণে তার করুণ পরিণতির চিত্রাভাস।

লক্ষণীয়, গল্পের শুরুতেই সাক্ষাৎ মেলে প্রধান চরিত্র শ্যামানন্দর। বস্তুত সে-ই গল্পের নায়ক। কিন্তু গল্পের শেষে শ্যামানন্দেব বিদায় নেওয়ার পরেও প্রধান হয় তিনকড়ি। এমন প্লট-বন্ধনে কাহিনী ও ঘটনা নয়, চরিত্রই প্রধান স্থান নিয়েছে। গল্পের মধ্যেকার চরিত্রের বিবর্তন চিত্রে একপ্রান্তে শ্যামানন্দ, অন্যপ্রান্তে রায়সাহেব তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে। মধ্যে গণ্ডেরী, অটল, বিপিন মিলে প্লটে কাহিনী ও ঘটনা নয়, সমবায়িক স্বভাবে চরিত্রচিত্রের ব্যঞ্জনাই গল্পের কাঠামো নির্মাণে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। গল্পে চরিত্রের প্রয়োজনেই যতটুকু কাহিনীর অবয়ব, স্বতন্ত্র কাহিনী ও ঘটনার দায়দায়িত্ব সেখানে উপেক্ষার বিষয়।

গল্পটির উপস্থাপনা রীতিতে কেউ কেউ নাটকীয়তার প্রসঙ্গ তুলে তাকে অস্বীকার করেছেন। আমাদের মতে, 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের শরীরে বা কাঠামোয় আছে নাট্যরীতি, কিন্তু ভিতরে নাটকীয়তা নেই। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কখনো ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশের ভাবনায় গুরুগম্ভীর আলোচনা, কখনো বা রিলিফের মতো কিছু বৈঠকী হাসি-তামাশার পরিবেশ সৃষ্টিতে যথার্থ নাট্যগতির তীব্রতা ও বিপরীত

স্বভাবের দ্বন্দ্ব বিনষ্ট। চরিত্রগুলির অন্তঃস্বভাবের পরিচয় সুনিপুণ আঁকাতেই লেখকের লক্ষ্য, নাট্যদ্বন্দ্বে তার কোনো অধিকার নেই। গল্পের প্রথম অংশের আয়োজনে নাট্যদৃশ্য-নির্দেশের মতো বিবরণ থাকতে পারে, কিছু চরিত্রগুলি একসঙ্গে জমে গেলে তার মধ্যে সত্যিকারের নাটকীয়তা সরে গিয়ে বৈঠকখানায় বসে গল্প করার রীতিতে নকশার বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে যায়। গণ্ডেরীর কিছু কৌতুককর মন্তব্য, শ্যামানন্দের লিমিটেড কোম্পানির প্রেস-প্রুফের মাধ্যমে 'মেমোরাণ্ডাম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা'-পাঠ নাট্যবিষয় নয়, বরং গল্পনামের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যাই সেখানে প্রধান হয়।

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে'র চরিত্রগুলির সক্রিয়তার প্রয়োজনীয় সময়কাল দেড় বছর। গল্পকার নিজেই সেই সময়-পরিধিকে গল্পের প্রয়োজনেই বিন্যস্ত করেছেন। Descriptive method-এ গল্পের কাল-নির্দেশক অঙ্গ সজ্জিত। কোম্পানির ওঠা-নামার দিক থেকে 'চরমমুহূর্ত' ধরলে সমস্ত শেয়ার বিলি হয়ে যাওয়া ও শেয়ার কেনার জন্য বাজারে ক্রেতাদের অস্থিরতার চিত্র-উল্লেখ অংশটি ধরতে হয়। কিন্তু যেহেতু তা গল্পকারের লক্ষ্য নয় আদৌ, তাই চরিত্রের বিবর্তনেই এই গল্পের 'চরমমুহূর্ত' অংশটি বিচার্য। গল্পটির চরিত্রই তার মূল্যবান সম্পদ। দেড় বছর পর কোম্পানির অফিসে ডিরেক্টরদের সভায় শ্যামানন্দ যে লক্ষ্যবস্তুর মোড় ফেরানোর প্রস্তাব দেয়, সেখানেই আছে গল্পটির 'চরমমুহূর্ত' :

> 'শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করবে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?'

এখানেই শ্যামানন্দ ও তিনকড়ি—দুটি চরিত্র-সূত্র ধবে গল্পের 'চরমক্ষণে'র শুরু। তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করে মাসিক হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব, তিনকড়ির প্রাথমিকভাবে পরোক্ষে সম্মতি দান, কোম্পানির ষোলশো শেয়ারকে দর-কষাকষি করে শেষ পর্যন্ত শ্যামানন্দের ওই তিনকড়ির কাছেই মাত্র আশি টাকায় বিক্রিতে রাজি করানো ও সেই টাকা নগদে আদায়—এসবের মধ্যে 'চরমক্ষণে'র বিস্তার, শেষে সভা থেকে তথা মূল গল্প থেকেই বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো থাকার অজুহাত দেখিয়ে শ্যামানন্দের বিদায় গ্রহণের মধ্যে আছে 'চরমমুহূর্ত'টির সফল শিল্প-পরিণতি। গল্পটির পরিণতির ব্যঞ্জনা তিনকড়ির অসহায় অলিকেত চেতনার জাগরণেই। এই অংশে যেমন আছে তিনকড়িব মতো অর্থ-লোভীর চরিত্র-উদঘাটন, তেমনি আছে সুনিপুণ করুণ-রসমিশ্রিত ব্যঙ্গ :

> 'তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—
>
> অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই। কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।
>
> তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরী। রাম রাম!'

যেহেতু 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য যে তীব্র কষায় ব্যঙ্গ, তার একমাত্র আধার কাহিনী-ঘটনা-আশ্রিত প্লট-বৃত্ত নয়, চরিত্রই, তাই পরশুরাম চরিত্রগুলির স্বভাব-নির্ণয়ে সতর্ক শিল্প-দৃষ্টি রেখেছেন। লেখকের এই প্রথম প্রকাশিত গল্পটিই প্রমাণ করে, পরশুরাম একজন দক্ষ গল্পকার ও চরিত্রশিল্পী। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি নিপুণ। আলোচ্য গল্পে প্রধান দুটি চরিত্রের অবস্থান নির্ণয়ে, প্রবেশ-প্রস্থানে লেখকের হাতে আছে শিল্পের 'রিমোট কন্ট্রোল'। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী দিয়ে শুরু, কিন্তু তাকে দিয়ে গল্পের শেষ নয়। শ্যামানন্দ যেখানে বিদায় নিয়েছে সেখানেই গল্পের হাল ধরেছে তিনকড়ি—গল্পের অল্প সময়ের মধ্যে পরিণতি টানার জন্য। বিশ শতকীয় এই জাতীয় ব্যবসা যে এক Continued process, শ্যামানন্দ থেকে তিনকড়িতে নির্ভরতা তারই প্রতীকী রূপ। প্রথম কথা হল, তিনকড়ির পরিণতি সঠিক তুলে ধরা, দ্বিতীয়, শ্যামানন্দর ব্যবসায়িক ভণ্ডামি আর একজনের ওপর বর্তানো, তৃতীয়, শ্যামানন্দরই creation তিনকড়িকে দিয়ে গল্পের চিত্র-কাঠামোয় নতুন রঙ লাগানো—এসব দিয়েই গল্পটির মধ্যে অভিনবত্ব আনা হয়েছে শিল্পের। ঘটনাশ্রয়িতা নয়, চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকাশের অনুগামিতায় গল্পের ভাববস্তুটি বৃত্তান্তের সমস্ত রকম মেদ-মাংস বর্জিত।

দুই

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ তথা নায়ক নিশ্চিত শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। এর বাইরের আকৃতি ও আচার-আচরণ, প্রতিদিনের অভ্যাস, বাস্তবসম্মত বাসনা এর ভিতরের স্বভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। 'বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠ লম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু।' নিঃসন্তান, ধর্মভীরু, তান্ত্রিক সাধনায় অভ্যস্ত, প্রয়োজনে মাংসাহারি ও মদ্যপ, অলৌকিকে সদা ও অতি-বিশ্বাসী এই শ্যামানন্দ। তার অর্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভ অহেতুক, কারণ সংসারে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই। কেবল শ্যালক বিপিন তার সঙ্গে থাকে। সেই অর্থলোভ চরিতার্থ করতেই তার কাজে লাগে ধর্মভীরুতার খোলস। এমন ধর্মাচার যে কৃত্রিম, নিছক সংস্কার, কখনো বা ছল, তার ১০৮ বার দুর্গানাম জপে 'দি অটোম্যাটিক দুর্গাগ্রাফ' ব্যবহারেই প্রমাণ হয়ে যায়।

এই শ্যামানন্দ যে একজন ঝানু ব্যবসাদার, দেশসেবা ও সর্বজনীন ধর্মাচরণের নামেই ধর্মকে ভিত্তি করে ব্যবসায় একজন কৃতকর্মা পুরুষ, তার স্থাপিত 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর 'মেমোরাণ্ডাম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা'য় সে পরিচয় মেলে। মুসাবিদায় বলা হয়েছে : ক. দেশের বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে, খ. 'ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্থে' মহান তীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার কারণেই সংগৃহীত অর্থের একমাত্র প্রয়োজন। 'ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনো কার্য সম্পন্ন হয় না।.....ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে।.... শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা

ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।' এই 'অনুষ্ঠান পত্রে'র বয়ান শ্যামানন্দ রচিত।

সমগ্র গল্পের যে শিল্প-কাঠামো, তার নির্মাণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র শ্যামানন্দের কুশলী সক্রিয়তাতেই। শ্যামানন্দই মধ্যমণি, তার চারপাশে গণ্ডেরী, বিপিন, অটল, তিনকড়ি। শ্যামানন্দই তিনকড়ির মতো রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, সে সময়ের ইংরেজ সরকারের মানী ব্যক্তি, কৃপণ, সন্দিগ্ধ মানুষটিকে নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে, কোম্পানির অভিনব প্রস্‌পেক্‌টাস তৈরি করে, স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তি দান করে শেয়ার বিক্রির টাকায় মন্দির ইত্যাদি তৈরি করার পরিকল্পনা ফাঁদে, সমস্ত টাকা গোপনে সরিয়ে কোম্পানিকে দেউলিয়া করে, শেষে কথার মার-প্যাঁচে সেই লিকুইডেটেড কোম্পানিকেই তিনকড়ির দায়িত্বে দিয়ে, নিজের সমস্ত শেয়ার একেবারে সামান্য টাকায় তার ওপর চাপিয়ে যেমন নিজে গল্প থেকে বিদায় নেয়, তেমনি ধর্মের দোহাই দিয়ে কাশীর বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণের কথাও জানায়।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এমন একটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ে পাঠক তার ওপর ক্রুদ্ধ হয় না। তার কাজ আপাতদৃষ্টিতে এত সহজ, সরল, বিশ্বাস্য, এমন কৌতুককর, তার পলায়নও যেন পরিকল্পনাহীন পাঠকের কাছে, যে সে তার সমস্ত ধূর্ততা দিয়ে, ফাঁকি দেওয়ার আধুনিক বুদ্ধিটুকু দিয়ে পাঠকদের বিস্ময়াভিভূত করে। এখানেই পরশুরামের চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব। চরিত্রটি জীবনের অনেক অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি, ধর্মের নামে স্খলন-পতনকে দেখায়, কিন্তু সে যে সমসাময়িক সমাজের সৃষ্টি, সমাজকেই বোকা বানিয়ে ঘুরে বেড়ায় চারপাশে, তাতে পাঠক মজা পায়, রীতিমতো চিনে রাখে এবং চিনে ফেলেও! এই পরিচিত হওয়ার মধ্যে পাঠকদের প্রসন্নতা আছে যেমন, তেমনি অস্পৃশ্য করে রাখার মতো নিরাসক্তি আছে। পরশুরামের চরিত্র চিত্রের স্বভাবে, রঙের মিশেলে যেমন কৌতুকের প্রসন্নতা আনে, তেমনি ব্যঙ্গের সহনযোগ্য দীপ্তির মধ্যে নিরাসক্তি বজায় রাখে। সমাজ সংস্কার নয়, সমাজকে চিনিয়ে দেওয়াই সৃষ্ট চরিত্রের একমাত্র লক্ষ্য, এটাই শ্যামানন্দের অন্তর্স্বভাব ও গল্পকারের চরিত্র নির্মাণের মূল লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়েই এসেছে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে চরিত্র। শ্যামানন্দের মতো তারও একটা বিবর্তন আছে গল্পের ছোট পরিসরে। তার কথা গল্পে প্রথম শুনি শ্যামানন্দের মুখে বিপিনকে তিনকড়ির কাছে পাঠানো খবরের সূত্র ধরে। শ্যামানন্দের কথা 'বুড়ো যেমন কঞ্জুষ তেমনি সন্দিগ্ধ'। তাকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করে ডিরেক্টর হতে শ্যামানন্দই তার যুক্তি ও কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে। বৃদ্ধ, রিটায়ার্ড, গভর্নমেন্ট সার্ভিসের মানী ব্যক্তি রায়সাহেব তিনকড়ি কিন্তু হিসেবি, অর্থলোভী, সম্মান-আকাঙ্ক্ষী। বিদেশি শাসকের অধীনে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে তাদের অন্ধ তোযামুদে। একদিকে ডিরেক্টর হওয়ার লোভ, অধিক অর্থসঞ্চয়ের স্বপ্ন, নিজেব যাবতীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার বাসনা, আর একদিকে সংশয়—দুয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যেই সে একসময়ে শ্যামানন্দর জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডিরেক্টর হয়। তার জন্যই খরচ করে শ্যামানন্দদের নিমন্ত্রণে ভুরিভোজের ব্যবস্থায় কার্পণ্য করেনি।

শ্যামানন্দের বাগবাজারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর ফাঁকে শ্যামানন্দকে নিজের মানমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কোল্ডহাম সাহেবের সুপারিশ ছাড়াও তন্ত্রশাস্ত্রের অলৌকিক প্রক্রিয়ার কথা জানায় শ্যামানন্দকে, নিজ শ্যালিকাপুত্রের একটি চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, শেষে বাড়ির পুরনো ফাটা খাঁটি কাঁসার কাঁসরটিকে নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের কাজে লাগানোর জন্য সস্তায় বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাবও দেয়। এই হল সুযোগসন্ধানী, নিষ্ফল মানাকাঙ্ক্ষী, অর্থলোভী, স্বার্থপর তিনকড়ির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এত হিসেবি তিনকড়িকেও বোকা হয়ে যেতে হয় শ্যামানন্দের কাছে গল্পের শেষে। মাস মাহিনার লোভে, শেয়ারের টাকার লোভে, আরও এক কোম্পানির সম্মানিত ডিরেক্টর হওয়ার বাসনায় তিনকড়ির সবদিক শেষে ভরাডুবি হয় শ্যামানন্দের কৌশলেই। ইংরেজ, ঊর্ধ্বতন অফিসারের খোসামোদ করেই এই জাতীয় বাঙালি সে সময়ে বাংলাদেশে উচ্চ আসনে বসা সরকারি আমলাদের মধ্যে অনেক ছিল। পরশুরামের পর্যবেক্ষণ নিপুণ।

তিনকড়ি চরিত্রের বিবর্তন আছে, তবে সে বিবর্তন স্বাধীন নয়, শ্যামানন্দ নির্ভর। শ্যামানন্দের সম্পর্কেই তার কিছু মানসিক সংকট, দুর্ভাবনা, সংশয়, দ্বিধা দেখা দেয়। কিন্তু আবার তার জন্যই সেসব কাটিয়ে সে বোকা হয়ে যায় গল্পের শেষে। শ্যামানন্দের কৌশলেই, বুদ্ধির মারপ্যাঁচেই তার স্বস্থান থেকে উত্থান ও পতন। সমগ্র গল্পে তিনকড়িও একটি চরিত্রচিত্র, কিন্তু তার আঁকাব তুলি পরশুরাম শ্যামানন্দের হাতেই দিয়েছেন, রঙটা অবশ্যই গল্পকারের। তিনকড়ি চিত্রের subject, শ্যামানন্দ তার artist, আর পরশুরাম সার্থক পর্যবেক্ষণে এই দুই মানুষকে সমন্বিত করে গল্পের নিপুণ ক্যানভাসে নিজ বিচিত্র অভিজ্ঞতার পূর্ণ রূপকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্যামানন্দের মতো তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে পরশুরামের নিশ্চিত নিজস্ব বর্ণোজ্জ্বল সৃষ্টি।

গল্পে গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এক স্থির চরিত্র। সে অবশ্যই রক্তমাংসের নয়, রূপকের স্বভাবে একমুখিন চরিত্রচিত্র। গল্পের আদিতে সে যা, অন্তেও তাই-ই। সর্বভারতীয় সুবিধাবাদী ব্যবসাদারদের সে চমৎকার এক প্রতিনিধি। সে তার উদ্দেশ্যভেদী বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও কৌতুককর স্বভাব ও সংলাপ নিয়েই গল্পের শিল্প-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় সে শ্যামানন্দের মতো গভীর গোপন স্বভাবে রহস্যময় নয়, একান্ত খোলামেলা এবং যা বলে তা পরিষ্কার ভাষায় ও অর্থে বুঝিয়ে দেয়। সে আমাদের করুণা কুড়োয় না, চায় না, সে যা বিশ্বাস করে, তা-ই আমাদের সকলকে বিশ্বাস করাতে চায়। গণ্ডেরীকে দেখে আমরা ব্যবসা-বুদ্ধি শিখি, তার কৌশলকে তারিফ করি, কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে চাই না। সে দেশের জাতীয় ব্যবসাপত্তরের একটা দিককে দেখায়। আমরা তাকে নিয়ে হাসি, কিন্তু তাকে হাসাতে আমরা অক্ষম।

গণ্ডেরী যে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শেয়ারের ব্যবসায় বেশ মোটা মাছ ধরতে চায়, অটলকে বলা শ্যামানন্দের উক্তিতে তার পরিচয় মেলে : 'সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই সে চায়।' পরশুরাম তথাকথিত ধর্মপ্রাণ শ্যামানন্দের মতোই তারও সর্বভারতীয় ব্যবসাদারের উপযোগী একটি ছবি উপহার দিয়েছেন আমাদের :

'মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-

করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মখমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।'

লেখকের এমন পর্যবেক্ষণ তাঁর চরিত্র-বাস্তবতা-জ্ঞানের নিখুঁত প্রাথমিক পরিচয় দেয়। তার লেখক-প্রদত্ত নামেই আছে চরিত্রনির্দেশ ও গল্পের মূল লক্ষ্যমুখিন ব্যঞ্জনা। শ্যামানন্দের মতো সে-ও ভাগ্য ও ভগবানে বিশ্বাসী :

'হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিঞ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুচ্ছু না।'

শ্যামানন্দের উপযুক্ত সহযোগী অংশীদার সে। অটলের কথায় : 'আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরী-দা যেন মানিকজোড়।' যেমন পাকা ব্যবসাদার, তেমনি বাংলা-হিন্দি শাস্ত্রীয় বচনকে গণ্ডেরী ব্যবসার লক্ষ্যভেদে ঠিক-ঠিক মতো বসাতে পারে। যেমন 'ভেক বিনা ভিখ মেলে না।' —কবীরজীর মূল্যবান উক্তি প্রয়োগ—এমন সব। লক্ষ করার বিষয়, 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামের জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা গণ্ডেরীই। ম্যানেজিং এজেন্টের টাকাকে অটল শতকরা দু'টাকা থেকে দশ টাকা করার প্রস্তাব দিলে গণ্ডেরীর যুক্তি : 'কুছু দরকার নেই! শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।' শ্যামানন্দের নিজের স্ত্রীর নামে সব জমি লেখাপড়া করে দেওয়াকে সমর্থন করে। ব্যবসায় তার স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে নিজেকেই দেখা : 'জো খুশি করো। হামার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।' গণ্ডেরীই বাস্তবে নয়, খাতা-কলমে আড়াই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করতে পরামর্শ দেয় : 'টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজেন্ট মহাজন হোবে।' বাজারে শেয়ারের দাম বাড়ানো ও চাহিদা বাড়ানোর পদ্ধতিতে মোক্ষম যুক্তি দেয় সে-ই!

দু'নম্বরি ব্যবসায় গণ্ডেরী অদ্বিতীয়। তার নকল ঘি ('ঘই')-এর ব্যবসায় অন্যদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে মোটা লাভের অর্থ আদায় ও পুণ্যসঞ্চয় পরিকল্পনা এককথায় অদ্বিতীয়, অনবদ্য! কাসেম আলি আর আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালার প্রসঙ্গ এ-ব্যাপারে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে। গণ্ডেরী নিজের ব্যবসাবুদ্ধি ও চরিত্র, নিজের বিশ্বাস ও পুণ্য-অর্জন বিষয়ে কোনো রাখা-ঢাকা কথা যেমন বলে না, তেমনি গল্পের শেষে তিনকড়িবাবুর কাছে ব্যবসা লিকুইডেশানে যাওয়া, ডুবে যাওয়ার কোনো কথাই গোপন করে না। শেষে নিজের হিসেব সব ঠিক রেখে গল্পের পট থেকে বিদায় নেয়।

বস্তুত গণ্ডেরীর মত চরিত্র পরশুরামের অনবদ্য সৃষ্টি। এই চরিত্র দর্শনে পরশুরামের শিল্প ক্ষমতা অনন্ত-মূল্যের মর্যাদা পায়। একটা সম্পূর্ণ বাস্তব, চতুর, বিশ শতকীয় বুদ্ধিনির্ভর, 'ক্যালকুলেটিভ', বাচাল, রসিক, টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশে স্বার্থপর, পাপ-পুণ্যের মাপ বিচারে মোটা চামড়ার পশুর মতো চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। সে নিজেই নিজেকে পরিচালনা করে, শ্যামানন্দের থেকেও সে ধূর্ত, অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। ব্যবসায়িক নির্মমতা তার রক্তে—সে রক্ত সর্বভারতীয়, গোটা বিশ শতক ধরে তার ছায়ায় অনেক ব্যবসায়ীকেই আজও দেখা যায়। গণ্ডেরী বিশ শতকীয় বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধারক, বাহক ও পোষক। ত্রৈলোক্যনাথের মাংস-ব্যবসায়ী পাঁঠার

চামড়ায় বেশি লাভের আশায় জীবন্ত পাঁঠার চামড়া ছাড়ায়, গণ্ডেরীর ব্যবসার মানসিকতা সেইরকম। আলোচ্য গল্পে শ্যামানন্দ 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামের জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সফল প্রতিষ্ঠাতা, গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া তার যথার্থ রূপকার। গল্পে গণ্ডেরীর যেভাবে, যে স্বভাবে, যে উদ্দেশ্যে প্রবেশ, ঠিক-ঠিক সেইসব নিয়েই গল্প থেকে তার প্রস্থান ঘটেছে। তার বিচিত্র চরিত্রচিত্রে আছে এই বিশ শতকের শেষের দশকেরই এক শ্রেণীর সর্বভারতীয় ব্যবসাদারের মণিমুক্তা খচিত রাজবেশ। সর্বকালের রসিকদের পক্ষে অফুরন্ত ব্যঙ্গরসের আস্বাদ গ্রহণের কারণে সে সদাই সু-স্বাগতম।

তিন

বাংলা ব্যঙ্গ সাহিত্যের ধারায় পরশুরামের 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি যেনবা একটি লক্ষণীয় 'মাইলস্টোন'। এর সংহত, সংযত শিল্পরূপ যেমন এক একটি মূল্যবান মুক্তোর মতো নিখুঁত গল্পের মর্যাদা দান করে, তেমনি এর অন্তর্নিহিত খাঁটি কৌতুক-ব্যঙ্গের রস সর্বকালের পাঠকদের কাছে অমৃতের আস্বাদ দেয়। এই প্রথম গল্পেই গল্পকার তাঁর নবস্বাদের সফল কড়া ব্যঙ্গরসের ভিয়েন চাপিয়েছেন। উজ্জ্বল বুদ্ধির টাটকা মশলাপাতিতে ত্রৈলোক্যনাথ থেকে এই গল্পের ভিয়েনে রসের স্বাদ পুরনো ঘিয়ের মতো নয়, বিশুদ্ধতম মাখনের স্বভাবে বলকারী।

আলোচ্য গল্পের মূল প্রসঙ্গে আছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-শাসিত ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলাদেশের বিশ শতকীয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সমাজ ও মানুষ, প্রকরণে আছে তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কুঠার। সে কুঠার চরিত্রগুলিকে চিরে চিরে দেখানোর পর ভিন্ন অবয়বে রূপান্তরিত হয়েছে একজন চিত্রীর রঙে ডোবানো তুলিতে। কুঠারের ধার নেই, নির্মমতা নেই, আছে নিবাসক্ত শিল্পীর তুলির একাধিক তির্যক টান। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া, বিপিন চৌধুরী, অটল মিত্র ও তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে মানুষগুলির সেই টানেই যেনবা চরিত্র-চিত্র হয়ে-ওঠা! পরশুরামের ব্যঙ্গরসের লক্ষ্য হয়েছে প্রধানত দেশীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ধর্মভীরু ভণ্ড মানুষ, সাধারণ ধূর্ত ব্যবসায়ী, নকল বিজ্ঞানী, সুযোগসন্ধানী আইন ব্যবসায়ী আর বৃটিশ ঊর্ধ্বতন অফিসারদের তোষামোদকারী মধ্যবিত্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমলা মানুষ। পরবর্তী সারা বিশ শতক জুড়ে শতাব্দীর এই শেষ দশক পর্যন্তও এরা বদলায়নি। এদের আছে মৌরসিপাট্টা। তাই আলোচ্য গল্পের ব্যঙ্গরস, কৌতুকের লাবণ্য সমাজবাস্তবতা-বিবিক্ত নয়, আবার উদ্দেশ্যহীন, কারণহীনও নয়, তবে অঙ্কিত মানুষগুলির পক্ষে গল্পকারের attitude যন্ত্রণাতিক্ত হয়ে ওঠেনি।

পরশুরামের আলোচ্য গল্পটি সাধুগদ্যে লেখা, সংলাপ চলিত রীতির অনুগ। কোথাও কোথাও সে রীতি চরিত্র-বাস্তবতায় কথ্যরীতিকে গ্রাস করেছে। গল্পে শ্যামানন্দের আবির্ভাবেই কৌতুকরসের সঙ্গে ব্যঙ্গের মিশেল আছে। 'শ্রী শ্রী দুর্গা' খোদিত ১২ লাইন সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্প-এর 'শ্রমহারক' যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন— 'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।' এটি দিয়ে নয়বার কাগজে

ছেপে শ্যামানন্দ ১০৮ বার দুর্গানাম লেখার শ্রমটুকু করে। এই অভিনব শ্লেষ-কৌতুক-রসমিশ্রিত ব্যঙ্গ পরশুরামের মৌলিক কল্পনার অসামান্য দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয়, সাধুগদ্যে প্রত্যেকটি ধূর্ত, স্বার্থপর, লোভী, পাপী চরিত্রকে 'আপনি' সম্বোধন করে গল্পের স্বভাবে আদ্যন্ত ব্যঙ্গরসের একটানা স্রোত বজায় রেখেছেন। এই প্রকরণেও গল্পকারের আপন মৌলিকতা। শ্যামলাল গাঙ্গুলীর অবশেষে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী নামগ্রহণেও এই শ্লেষ! তথাকথিত ধর্মের ধ্বজায় শ্যামানন্দই বুঝিবা পরবর্তী বিরিঞ্চিবাবার গুরুবাদে বিরিঞ্চি চরিত্রে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। শ্যামানন্দের প্রসপেকটাসের মুসাবিদা, মন্দির ও অন্যান্য বিষয় উপস্থাপনে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ নির্ভুল অঙ্কের মতো সতর্ক সিঁড়ি ভাঙে।

রিটায়ার্ড রায়বাহাদুর তিনকড়ির উত্তরসূরি বুঝিবা কিছুটা ভিন্ন পরিবেশে বিরিঞ্চিবাবার গুরুপদবাবু। তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের ওপরওয়ালা ইংরেজ অফিসার কোল্ডহ্যাম-তোষণ পরিচ্ছন্ন ব্যঙ্গকে ধরিয়ে দেয়। তার সর্বশেষ বুদ্ধিভ্রম, অসহায়তা, বোকা বনে যাওয়া তাকে যেমন ব্যঙ্গের ইন্ধন করে, তেমনি কোনো কারুণ্য নয়, সমবেদনা নয়, আমাদের মনে কৌতুককর খুশির জন্ম দেয়। শ্যালক বিপিন গল্পে কম কথা বলেছে, তার সক্রিয়তাও কম, তার নকল বিজ্ঞানীর ভেক নেওয়ার বিষয়টা বিলেত যাওয়ার বাসনা-জারিত সাহেবি মেজাজের সঙ্গে কিছুটা খাপ খায়, কিন্তু অটলের কথায় কুমড়োর খোসার একটি গতি করতে বিপিন যখন বলে :

> 'কস্টিক পটাশ দিযে বয়েল করলে বোধ হয ভেজিটেব্‌ল স্টু হতে পারে। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব।'

তখন কোনো শ্লেষ বা ব্যঙ্গ নয়, পরশুরাম পরিচ্ছন্ন কৌতুকরসকেই 'রিলিফে'-র মতো সংলাপে ব্যবহার করেছেন। বিপিনের এমন তাৎক্ষণিক মন্তব্য, 'বিরিঞ্চিবাবা'য় কোনোদিন প্রফেসরি করেনি অথচ এমন অনেক পাস করা ননীর গবেষণায় রীতিমতো বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ পায়।

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে পরশুরাম প্রভূত কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গের তুফান এনেছেন একমাত্র গণ্ডেরী চরিত্রে। তার হিন্দি-বাংলা মেশানো বিচিত্র সংলাপ ও বাংলা শব্দের অবাঙালি উচ্চারণ, শিক্ষাদুরস্ত শাস্ত্রের দখল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পাঠের অহমিকা, কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এমন পঙ্‌ক্তিকে হিন্দি মেশানো উচ্চারণে বিচিত্র করে নিজের যুক্তিমতো হাস্যকর ব্যাখ্যা করা, কবীরের বাণীকে ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে ভেড়ার পালের স্বভাবে বিশিষ্ট করা ইত্যাদির মধ্যে যেমন কৌতুকের স্রোত আছে, চরিত্রের অন্তঃশীল স্বভাবে মিলে তা ব্যঙ্গে রক্তিম হযে ওঠে। 'শ্যামবাবু, আপনিও এখনসে ধৌতি উতি ছড়ে লিঙোটি পিনহুন।'— এমন কথায় আছে বিশুদ্ধ হিউমার, হয়তো বা শ্যামানন্দর প্রতি শ্লেষও। তাকে কোনো 'পাপ' স্পর্শ করে না, তার গীতা, রামচরিতমানস পাঠ, রামভজন—সবই কৌতুক ও ব্যঙ্গের মিশেলে অভিনবস্বাদী।

'পুণ্যেব দালালি' নেওয়ার ব্যাখ্যা গণ্ডেরী চরিত্রের আর এক ডাইমেনশন। বাঙালি

ও নিজের জাত—দু'য়ের তফাত দেখাতে তার যুক্তি অফুরন্ত কৌতুকরসকে উজাড় করে পাঠক মনে :

'বাঙালি ধরম জানে না। তিন রুপয়া নোকরি করবে পাঁচ পইসার হরিলুঠ দেবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন ভি করে হিসাব সে।'

এর সঙ্গে রবীন্দ্রকবিতার বিশেষ একটি পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা গণ্ডেরীর মৌলিক সৃষ্টি। এখানেই এই চরিত্রের অভিনবত্ব। গণ্ডেরীর চরিত্র গল্পে শ্যামানন্দকে চিনিয়ে দিয়েছে, কোম্পানির ভবিষ্যদ্বাণী সফল করার সুযোগ করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে আগাগোড়া সফল কৌতুক ও ব্যঙ্গরসে গণ্ডেরীকেই অসামান্য ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। গণ্ডেরীর চরিত্র চিত্র হতে পারে, কিন্তু সে চরিত্র স্বাবলম্বী এবং আপনাকে আপনি নিয়ন্ত্রণে একান্ত সমর্থ। কিন্তু কৌতুকরসের বিচিত্র বর্ণে গল্পকে করেছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আলোচ্য গল্পের কৌতুক-ব্যঙ্গে ভেজাল নেই, ভাঁড়ামো নেই এতটুকু, তা হীরকের দ্যুতি-সমন্বিত। হীরকের পাথরের ধার নেই, আছে হীরকের আলোর লাবণ্যময়ী দীপ্তি। 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি পরশুরামের সোনায় বাঁধানো লেখনীর ওপর একটি মূল্যবান মুক্তা।

চার

গল্পটির নাম 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। নামের মধ্যেই ধরা পড়ে এক দেবীর শুভ নামে উৎসর্গীকৃত একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। যেভাবেই হোক কোনোও গল্পের নাম তার কেন্দ্রীয় ভাববস্তু বা বক্তব্যের সঙ্গে সমন্বিত, সূত্রবদ্ধ না হলে নামের ব্যবহারে লক্ষণীয় ত্রুটি থেকে যায়। নাম যদি ব্যঞ্জনাধর্মী হয়, তবে তার দায়িত্ব গল্পের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সঙ্গে গভীর-নিবিড় যোগে শিল্পের সার্থকতা পেতে বাধ্য। 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নাম অবশ্যই বিশেষ এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম হলেও তার ব্যঞ্জনা অনস্বীকার্য।

গল্পপাঠে প্রাথমিকভাবে পরিষ্কার হয় এমন নামের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। শ্যামানন্দ রচিত তার নিজস্ব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের 'মেমোরান্ডাম ও আর্টিকল্‌সের মুসাবিদা'র প্রথমেই আছে 'জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ'। তার নীচে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির এমন নাম। সিদ্ধিদাতা গণেশ সর্বস্তরের ব্যবসায়ীদের পরমপূজ্য দেবতা। মুসাবিদার প্রথমে জয় ঘোষণা ধর্মীয় আচরণের পক্ষে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রসপেক্টাস থেকে জানা যায়, হুগলির গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর বহু শতাব্দীর একটি প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। সেটি শ্যামানন্দের জমিরই অংশ। সেই মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন জমির সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কারণেই শ্যামানন্দের নতুন ব্যবসা আরম্ভ। গল্পে তারই কথা মুসাবিদার মাধ্যমে প্রচারিত। তাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে শ্যামানন্দের ধর্মচিন্তা ও ব্যবসার শুভচিন্তা একত্রিত হওয়ায় নাম প্রাথমিক অর্থে অ-যথার্থ নয়। যে কোনও ব্যবসায়ী তা করতেই পারে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামটির আরও তাৎপর্যপূর্ণ গভীর অর্থ আছে গল্পের নায়কের attitude-এর সঙ্গে মিলিয়ে। সুযোগ বুঝে শ্যামানন্দ ব্যবসায়িক ধুরন্ধর স্বভাবে প্রথমেই নিজের স্ত্রীর নামে মন্দির ও সব জমি লেখাপড়া করে দেয়। তারপরেই আসে 'দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর' সাম্প্রতিক স্বপ্নাদেশ, সর্বপীঠের সমন্বয় প্রসঙ্গ এবং স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরীর মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করার বাসনা। এই দৈবাদেশের সঙ্গে মন্দির যুক্ত হওয়ায় শ্যামানন্দের নতুন ব্যবসাটির গুরুত্ব অন্যদিকে দায়িত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধর্মকর্ম করার জন্যই ব্যবসা এবং 'শ্রীমতী নিস্তারিণী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাদ আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।' তাই শ্যামাপদর মতে 'স্বপ্নাদেশ, একান্নপীঠ এই ঠাঁই, জাগ্রত দেবী'—এসবের কারণেই এমন দেবীর নামে লিমিটেড কোম্পানি। মুসাবিদায় তা প্রচারিত ও লক্ষ্য হওয়ায় গল্পের নামের দায়িত্ব বাড়তি তাৎপর্য পায় প্রাথমিক অর্থ থেকে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা আরও ব্যাপক ও গভীর অর্থ সামনে আনে। এমন গভীর অর্থ করার মূলে আছে শ্যামানন্দের ধর্মের আবরণে ধূর্ত কৌশল। কৌশল দুটি সূত্রে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বিজ্ঞাপিত— ক. দেশের বিরাট অভাব দূরীকরণ, খ. ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারদের টাকায় একটা মহান তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য করার বিষয়, ব্যবসায়িক কৌশল আর ব্যক্তিগতভাবে শ্যামানন্দের সঙ্গে জড়িত থাকছে না। দেশসেবা ও ধর্মপ্রাণ জনগণ-সেবার সঙ্গে যোগে এক জাতীয় মহৎ উদ্দেশ্যকে একালের সামনে তুলে ধরে। একটি যদি লিমিটেড কোম্পানি হয় এবং ম্যানেজিং এজেন্ট যদি তার কার্যনির্বাহী দায়িত্ব নেয়, তাহলে ধূর্ত শ্যামানন্দেব চতুর মুসাবিদায়—প্রথমত, শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেন্ড পাবে; দ্বিতীয়ত, একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করে ধন্য হবে; তৃতীয়ত, শেয়ারহোল্ডাররা মন্দির ঘেরা আবাসগুলিতে বিনা খরচে সপরিবারে বসবাস করতে পারবে। তাই শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরীর নামাঙ্কিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে 'লিমিটেড' শব্দ যোগ করলে তা হবে সর্বসাধারণের বিশ্বাস্য। শ্যামানন্দের মতো পাঁকাল মাছের কেটে বেরিয়ে আসায় কোনো বাধা থাকবে না। গল্প-নামের দায়িত্ব এভাবে সর্বজনের মঙ্গলে স্থিত হওয়ায় নাম সার্থক।

নামকরণের পক্ষে সর্বশেষ ব্যাখ্যা এই লিমিটেড কোম্পানির পাঁচ ডিরেক্টর-এর দিক থেকে এবং 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার ইন ল, জেনারেল মার্চেন্টস্'-এর ম্যানেজিং এজেন্ট হওয়ার কৌশলের দিক থেকে উঠে আসে। 'লিমিটেড' কোম্পানির ডিরেক্টর হতে গিয়ে পাঁচটি চরিত্র যেভাবে নিজেদের মধ্যে শেয়ার বিক্রি করেছে মিথ্যে টাকার ঋণ দেখিয়ে ও তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার লিখিত প্রমাণ তুলে ধরে, তাতে নামের এমন আবরণ একান্ত প্রয়োজন। জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে শ্যামানন্দ ও শ্যালক বিপিন। সমস্ত ডিভিডেন্ড বিনা মূলধনে ভাগ করে নেয় গণ্ডেরী, অটল ও বাকি দুজন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। পরশুরাম তার পরিচালকদের ব্যঙ্গ-রসাত্মক বাস্তব ছবি দিয়ে গল্পটি আরম্ভ করে, বিস্তার ও সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। লিমিটেড কোম্পানির

ডিরেক্টরদের ধর্মের নামে, ব্যবসার অসাধুতায় ধূর্তামি, কৌশল, প্রবঞ্চনা, পলায়ন গল্পের আদ্যন্ত চিহ্নিত বলেই গল্পের নামে এসেছে ভক্তিরস-গদগদ 'শ্রীশ্রী' সম্বোধন, 'দেবী সিদ্ধেশ্বরী'র নামে ব্যবসাকে উৎসর্গ ও 'লিমিটেড' করার কৌশল। তাই গল্পের নাম 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। এমন নাম গল্পের দেহ ও আত্মার সঙ্গে রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণের সম্পর্কে সমন্বিত।

২.

লম্বকর্ণ

এক

পরশুরাম গল্প বলেন চরিত্রের হাত ধরে। সে চরিত্র যেমন কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারে, নায়ক বা নায়িকাও, তেমনি পার্শ্ব চরিত্রও কম-বেশি। এই চরিত্র ধরে গল্প গড়ার রীতি আমরা উত্তরকালে তারাশঙ্কর ও অন্যান্য কিছু লেখকদের মধ্যেও পাই। চরিত্র যেমন গল্পের গঠনে সহায়ক-ব্যক্তিত্ব হয়, তেমনি হয় মূল বিষয় বা লক্ষ্যের উদ্বোধকও। গল্পের কাহিনী ও ঘটনা বিষয়কে কেন্দ্রস্থ করে ধীরে ধীরে। শিল্প বিচারে যাকে বলা হয় প্লট, যার একটা বৃত্তধর্ম গল্পের বিষয় ও গতিকে নিটোল শিল্পরূপ দেয়, পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্পে তার পরিচয় স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যে এঁর গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন 'তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন,' তা 'লম্বকর্ণ' গল্পে বংশলোচন ব্যানার্জির চরিত্রায়ণে অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে ধরা পড়ে।

'লম্বকর্ণ' গল্পে আছে নিটোল কাহিনীবৃত্ত। গল্পের প্রথমেই পরিচিত হই 'রায় বংশলোচন ব্যানার্জী বাহাদুর জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা বেঞ্চ'-এর সঙ্গে। বংশলোচন স্বাস্থ্যের কারণে, ডাক্তারের নির্দেশে ও উপদেশে যেমন খাদ্যগ্রহণে সংযম অভ্যেস করেন, তেমনি ভ্রমণ ইত্যাদির সহায়তায় শরীর ঠিক রাখতে যত্নবান হন। এমন এক বৈকালিক ভ্রমণের সময় একটি নিরীহ ছাগলের সাক্ষাৎ দিয়ে গল্পের শুরু। ভ্রমণান্তে ফেরার মুখে খালের ধারেই ছাগলটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ মেলে। ছাগলটির ক্ষুধা প্রচুর, বংশলোচনের তামাকের দুটি চুরুট এমনকি চামড়ার সিগারেট-কেসটিও উদরস্থ করায় তাঁর কৌতুককর কৌতূহল বৃদ্ধি হয়। ছাগলটির ওপর মায়া জন্মে। নধর, অল্পবয়সী জীব। ছাগলটির মালিককে খুঁজে না পাওয়ায় পালন করার মানসে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের পোষার ঘোরতর বিরোধী হলেন মানিনীদেবী— বংশলোচনবাবুর স্ত্রী। তার ওপর কদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চূড়ান্ত দাম্পত্য কলহের কারণে বাক্যালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় এমন জীবটিকে গৃহে নিয়ে আসায় প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হন বংশলোচন। শেষে নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর জোর বিশ্বাসেই ছাগল নিয়ে ঘরে ঢোকেন। তাঁর ঘরে এক বৈঠকী আড্ডা বসে প্রায় প্রতিদিনই। আড্ডার সদস্যরা পাঁঠাটিকে কেন্দ্র করে ভাল ভোজনের ব্যবস্থা করতে বললে বংশলোচন বাধা দেন। মেয়ে টেঁপী তাকে পুষবে বলে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় একসময়ে বংশলোচনের বারণ সত্ত্বেও। টেঁপীর

কথামতোই ছাগলের নাম রাখা হয় লম্বকর্ণ। মানিনীদেবী ঘরের মধ্যে ছাগল দেখে ক্রুদ্ধ, লম্বকর্ণকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর। রাগে-অভিমানে বংশলোচন বৈঠকখানায় রাত্রিযাপন করেন একা। সেখানেই লম্বকর্ণ তার ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় গৃহ-সামগ্রীর অন্য কিছুর সঙ্গে মালিকের পাঠ্য গীতার পাতাও উদরস্থ করে। পরের দিন বংশলোচন লম্বকর্ণকে বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ডপার্টির লাটুবাবুকে দিয়ে দেন পালন করার জন্য—শর্ত, তাকে কেটে খাওয়া বা বিক্রি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কিন্তু লাটুবাবুরাও লম্বকর্ণের ভয়ঙ্কর ক্ষুধার কোপে প্রায় সর্বস্ব হারায় এক রাতেই। তারা ফিরিয়ে দিয়ে যায় লম্বকর্ণকে বংশলোচনের বাড়ি। তাদের খেসারত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত অর্থ জমিদারের কাছ থেকে আদায় করে। শেষে বংশলোচন লম্বকর্ণকে এক আসন্ন ঝড়-বৃষ্টিপাতের সন্ধেয় সেই খালের ধারেই ছেড়ে দিয়ে আসেন এই আশায় যে, এর মালিক তাকে গ্রহণ করবে। ঝড়-জলের মধ্যে ফেরার পথে আকস্মিক বজ্রপাতের শব্দে বংশলোচন সংজ্ঞাহীন হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকেন। শেষে বাড়ির সবাই তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসে খুঁজে পেয়ে। স্বামীর এমন বিপদে মানিনীর ভয় আসে, স্বামীর প্রতি তাঁর নতুন করে প্রীতি ও ভক্তি জন্মায় এবং তা গভীরতম। কিন্তু একসময় আবার বাড়ির মধ্যে ছাগলটিকে দেখেন। বংশলোচন পরে শোনেন যে লম্বকর্ণই তাঁদের বাড়িতে জানায় তাঁর পথের বিপজ্জনক অবস্থার কথা এবং যেহেতু লম্বকর্ণের সহায়তায় অসুস্থ স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন মানিনী, তাই বাড়িতে লম্বকর্ণের স্থায়ী বাস গৃহকর্ত্রীর একান্ত কাম্য। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহজনিত রাগ ও অভিমানের দূরত্ব এইভাবে সম্পূর্ণ ঘুচে যায়। লম্বকর্ণ ক্রমশ বড় হয় এবং জমিদার বাড়িতে তার ভোগ-সুখেই কাটে পরবর্তী শেষ জীবন।

'লম্বকর্ণ' গল্পের বৃত্ত-পরিকল্পনা বংশলোচনকে কেন্দ্র করেই শিল্পভিত্তি পেয়েছে। তাঁর সূত্রে আসে ছাগল লম্বকর্ণ এবং মানিনীর সঙ্গে বংশলোচনের অভিমান-প্রসঙ্গ। গল্পের কাহিনীসূত্রের যেসব ছোটখাটো ঘটনা ঘটতে থাকে, তাব মূলে লম্বকর্ণ। তার আচরণ, অসম্ভব ক্ষুধার্ত স্বভাবের আতিশয্য গল্পের গতির পক্ষে হয়েছে সহায়ক যেমন, তেমনি গল্পের বৃত্তকে করেছে জটিল। প্লটে জট পাকানোর মূলে লম্বকর্ণই। কিন্তু গল্পের বড় ঘটনা এবং সেখানেই যে গল্পের 'চরমক্ষণ'— তা হল বংশলোচনের রাস্তার মধ্যে ঝড়ে-জলে-বজ্রপাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকা। মনে হয়, এই ঘটনার অপেক্ষাতেই প্রথম থেকে সমস্ত ছোট ছোট কাহিনী ও ঘটনা-অংশ, ছোট ছোট চরিত্রও সক্রিয় থেকেছে। মানিনীর সঙ্গে বংশলোচনের সৌহার্দ্যের সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এমন ঘটনা ছাড়া সম্ভব হত না। সেখানে ছাগল লম্বকর্ণের ভূমিকাই সর্বশেষ গল্পের প্লটে এনেছে সমান্তরাল গতিময়তা। একদিকে বংশলোচন-মানিনীর দাম্পত্য কলহের একটানা সংঘর্ষময় প্রতিরূপ, পাশাপাশি লম্বকর্ণের যাবতীয় অবুঝ তৎপরতা—দুই প্রধান দিক সমান্তরাল থেকে গল্পের সমাপ্তি টেনেছে। মানিনী-বংশলোচনের সম্পর্কের মীমাংসায় লম্বকর্ণের ভূমিকা শিল্পের তাৎপর্যে গুরুত্ব পায়। তার অর্থই হল, পরশুরাম গল্পের গোড়া থেকে বংশলোচন-লম্বকর্ণের সম্পর্কের আতিশয্যে গল্পের প্লটের শক্ত বন্ধনের কথা ভেবেই লম্বকর্ণকে শেষে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, 'লম্বকর্ণ' চরিত্র-নির্ভর হাস্যরসাত্মক গল্প। গল্পটির মূলেই পরশুরাম বিষয় নির্বাচন করেছেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মান-অভিমানকে। চল্লিশোত্তর বাঙালি বিবাহিত পুরুষ ও তার স্ত্রীর পারিবারিক কলহ, মতদ্বৈধতার সূত্রে তীব্র সংঘর্ষ, মান-অভিমান— এসব বিষয় নিশ্চিতভাবে স্মিত হাসির ক্ষেত্র তৈরি করে পাঠকদের মনে। এর সঙ্গে পরশুরাম একটি নিরীহ প্রাণী ছাগল লম্বকর্ণকে কেন্দ্রে রেখেছেন। লম্বকর্ণের সক্রিয়তায় যে সমস্ত ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে, বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে, বিনোদবাবু, উদয়, নগেন, লাটুবাবুর দল যেভাবে কথা বলেছে গল্পে ও বংশলোচনের কর্মপ্রচেষ্টায় যেভাবে নানান ধরনের মদত দিয়েছে, তাতে গল্পের বিষয় হয়েছে কৌতুকাবহ।

আর সবরকম কৌতুকরসের মূলেই থাকে 'অসঙ্গতি'। অসঙ্গতিই হাস্যরসের প্রাণ। অসঙ্গতি থাকে চরিত্রে-চরিত্রে, চরিত্র-ঘটনায়, চরিত্র-ব্যবহৃত সংলাপের বহুমাত্রিক অর্থ-ব্যঞ্জনায়, সিচুয়েশন সৃষ্টির বৈষম্যে ও বৈসাদৃশ্যে। কোনো কোনো বিদেশি সমালোচক, হাসির গল্পের লেখকও, মনে করেন, এমন অসঙ্গতি মনের গভীর-গোপন অন্তস্তলের বিচিত্র দ্বন্দ্ব থেকে দেখা দেয় বলেই সেখানে কৌতুকের সঙ্গে অশ্রুর মিশেলে অত্যদ্ভুত রসের স্বাদ মেলে। আবার কেউ কেউ অসঙ্গতির সূত্রে মনের মধ্যে একদিকে রেখেছেন কৌতুক, অন্যদিকে বিষাদ, এবং দু'য়ের কমবেশিতে মানুষের মনে একটি বৃত্তই অন্যটির আশ্রয়ে স্থির হয়ে বিচিত্র স্বাদ-গ্রাহ্য বিষয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ 'কৌতুকহাস্য' আর 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে 'অসঙ্গতি'র পাথরে হাসি আর অশ্রুর, কমেডি আর ট্র্যাজেডির সম্বন্ধের নিপুণ ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন।

পরশুরাম কৌতুকরসের প্রয়োজনে বাঙালি পরিবারের প্রতিদিনের সঙ্গে সরল জীবনের ছোটখাটো তরঙ্গ-বিক্ষোভের একটি বিষয় নিয়েছেন। মানিনী ও বংশলোচনের মানসগঠন বহির্জীবনের আচার-আচরণে বিপরীত, মিল প্রেমভিত্তিক অন্তর-স্বভাবে। এঁকেছেন লম্বকর্ণকে যার স্বভাবে আছে 'আতিশয্য'। এই আতিশয্য কৌতুকরস সৃষ্টির কারণেই আরোপিত। পবশুরামের মূল লক্ষ্য, অন্তত লম্বকর্ণ গল্পে, কৌতুকরস-সৃষ্টিই। তাই যে কোনো আতিশয্য মানানসই যেমন, তেমনি গল্পের সমস্ত অসঙ্গতিজনিত বিবাদ-বিসম্বাদে দিয়েছে কৌতুকরসের 'সুগার কোটিং'। লাটুবাবুদের সংলাপের অশিক্ষিত উচ্চারণের হাস্যকরতা, উদয়-নগেনের তুচ্ছ বিবাদের লঘুতা, কেদার চাটুজ্যের গল্পের অন্তর্নিহিত গাল-গল্প-বৈশিষ্ট্য, বংশলোচনের সারল্য ও নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয় মানসিকতা, মানিনীর স্বামীর ওপর কর্তৃত্বের অহমিকার আতিশয্য, লম্বকর্ণের অসম্ভব সব খাদ্যগ্রহণে তৎপরতা—সমস্ত কিছুই অসঙ্গত সাধারণ জীবনযাত্রার মাপে, কিন্তু কৌতুকরসের অনাবিল প্রবাহে সম্ভাব্যতার সীমায় বাঁধা থেকে যায়।

কৌতুকরসের বাস্তব ভিত্তি এখানেই— শিল্পের সীমায় রেখে তাকে সম্ভাব্য বিশ্বাস্যতা দান। লম্বকর্ণ গল্পে তারই চমৎকার প্রয়োগ ঘটেছে। গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চিত্রে বাঙালির পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকার প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ থাকতে পারে, কিন্তু পরশুরাম এ গল্পে উদ্দেশ্যহীন কৌতুকরসকেই প্রধান করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনে সে উত্তাল কৌতুক রসের একধরনের শম-এ এসে স্থিরতা প্রাপ্তি ঘটেছে। শুধু উদ্ভট বিষয়,

বিসদৃশ ঘটনা, চরিত্রগুলির অসঙ্গত আচরণেই লেখক হাস্যরসের কোটিং দেননি, পাত্র-পাত্রীদের নামেও আছে অফুরন্ত অনাবিল হাস্যরস। বংশলোচন, মানিনী, চুকন্দর সিং, লম্বকর্ণ, ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র-কন্যার নাম যথাক্রমে ঘণ্টা-টেঁপী, লাটুবাবু— এসবই তার উপযুক্ত উদাহরণ।

পরশুরাম 'লম্বকর্ণ' গল্পের বিষয়-ভাবনায় যে কৌতুকরসের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তার স্বরূপ দ্বিবিধ। এক, স্বতঃস্ফূর্ত বা অন্তর্নিহিত, দুই, আরোপিত। স্বতঃস্ফূর্ত বা অন্তর্নিহিত কৌতুকরসের পরিচয় আছে গল্পের কাহিনী-বিন্যাসে, ঘটনা-সংস্থানে, চরিত্রের স্বভাব ও চরিত্র-মুখে স্বাভাবিক সংলাপ-প্রয়োগে। স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরসের অন্তর্গূঢ় প্রবাহ আছে লেখকের নিজস্ব বর্ণিত গদ্যভঙ্গিতেও। অন্যদিকে আরোপিত কৌতুকরস এসেছে অসঙ্গতিনির্ভর আতিশয্যের সূত্রে। পরশুরামের বড় কৃতিত্ব এবং আতিশয্য বা অতিরিক্ততা যতটা শিল্প বা গল্পের প্রয়োজনে কাম্য, সেইটুকুই সংযতভাবে রেখেছেন। এই শিল্পীর সংযম ও পরিমিতিবোধে লম্বকর্ণ গল্পের শিল্পরস হয়েছে স্বাদু, উচ্চহাস্যমণ্ডিত বিশাল হৃদয়ের সহজ অভিনন্দন-যোগ্য। আতিশয্য অনেক সময় fantasy আনতে পারে, অলৌকিকের সংলগ্ন করতে পারে তার অবলম্বন বা আশ্রয়কে, কিন্তু সেখানেও শিল্পের প্রয়োজনটাই বড় কথা। মাত্রাজ্ঞান ও সংযম যে সূক্ষ্ম কৌতুকরসাত্মক গল্পকারের বড় মূলধন! পর্যবেক্ষণ, পরিশীলন, বাস্তবতাবোধ, যথাযথ সিচুয়েশান সৃষ্টির জন্য তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও সর্বোপবি লেখকের নির্মম নিরাসক্তি—এসবই কৌতুকরসাত্মক গল্পের আরোপিত আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রণের শিল্প-চমৎকৃতি দান করে। 'লম্বকর্ণ' গল্পের নাম-চরিত্রের উপস্থাপনে, প্রতি-চিত্রণে ও পরিণতিদানে পরশুরাম এদিক থেকে এক দক্ষ চরিত্র-চিত্রী, সুস্মিত স্বভাবের হিউমারিস্ট।

'লম্বকর্ণে'র কাহিনী ও ঘটনার কেন্দ্র এক বাঙালি জমিদার বাড়ির চল্লিশোত্তর বয়সী কর্তা ও গৃহিণীর দৈনন্দিন প্রেম-বিরহ-বিবাদ-মিলনের মানসিক দুর্যোগ-চিত্র ও সংঘর্ষের অবসান-কথা। পরশুরাম কাহিনী-বিন্যাসেই নির্মল কৌতুককে অন্তঃশীল করতে ভোলেননি। বাঙালী জমিদার হলেও বংশলোচন গৃহিণীর দাপটে ভীত-সন্ত্রস্ত। স্বামীর ওপর ব্যাপিকার স্বভাবে, কর্তৃত্বে অহংকারী স্ত্রী মানিনীর সঙ্গে বংশলোচনের প্রেম, মতানৈক্যে সংঘর্ষ, তার তীব্রতা, বিচ্ছেদ, বিরহ, মিলনাকাঙ্ক্ষা ও পুনর্মিলনের চিত্র বাঙালি পরিবার জীবনে স্বতোচ্ছল হাস্যরসেরই জন্মদাতা। বিশেষ করে যেখানে মধ্যবয়সী স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকলার রোমান্টিক ভিত্তিটি অন্তরালে সদা-সক্রিয়! কাহিনী ও তার প্রেক্ষাপট নির্বাচনে কৌতুকরসের স্বতঃস্ফূর্ততা অনস্বীকার্য। বংশলোচনের সঙ্গে লম্বকর্ণের সাক্ষাৎ, মানিনীর তীব্র আপত্তির মধ্যে এবং স্বামী-স্ত্রীর তীব্রতম দাম্পত্য কলহ-পটেই তাকে ঘরে নিয়ে আসায় লম্বকর্ণের অস্বাভাবিক খাদ্যপ্রীতির উৎপাতে তাকে বিদায় করার যাবতীয় ছোট-বড় ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে কাহিনীর স্বাভাবিকতাতেই গল্পের মধ্যে থেকে গতিপ্রাণ হয়েছে ও গল্পকেও অসঙ্গতিজনিত বিপরীত রসে বেগবান করে তুলেছে।

আবার চরিত্রগুলির আসা-যাওয়ায় আছে নিগূঢ় কৌতুকরস। লম্বকর্ণকে বাড়ি নিয়ে

আসার সময় মানিনীর অন্যান্য দাপটের কথা ভেবে বংশলোচনের পত্নীর সঙ্গে কাল্পনিক বাকযুদ্ধ যেন পাঠকের মনের গভীরে রসের ভিয়েন চাপায়। যখন বংশলোচন স্ত্রীর শাসনের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজের পদমর্যাদা, কোর্টে হাকিমি কর্তৃত্ব, নিজ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মর্যাদারক্ষা, বিপুল অর্থের কৌলীন্য এসব মনে রেখে বলেন— 'তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভাস্‌নেস?—তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।' স্বপ্নের মধ্যে নিজের পাশেই 'নরম-গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ' অনুভবে লম্বকর্ণকেই স্ত্রী-উপস্থিতি চিন্তা, নিবিষ্ট-চিত্তে গীতাপাঠ করতে করতে বংশলোচনের ভাবনা 'ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধিস্থাপনা হইলেও হইতে পারে'—এমন সব চরিত্রভিত্তিক কর্মে-চিন্তায় আছে স্বাভাবিক কৌতুকরসের প্রবাহ। মানিনীর বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার বাসনা জানিয়ে স্বামীকে শাসানো, শ্যালক নগেন ও দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের সংঘর্ষের অসঙ্গতি, চুকন্দর সিংয়ের কর্তা ও গৃহিণী—দুজনের ব্যক্তিগত সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে দুজনকেই সমান খুশি রাখার উপযোগী আজ্ঞাপালন প্রয়াসে যে কৌতুকরস, তা এতটুকুও কৃত্রিম না হওয়ার কারণ তার জন্ম পরশুরাম অঙ্কিত চরিত্রের স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই আতিশয্যের অস্বাভাবিকতার সীমা বজায় রাখে বলে।

কথাসাহিত্যের যে কোনো চরিত্রের ডাইমেনশান ধরা পড়ে তার মানসিকতা, সংলাপে। 'লম্বকর্ণ' গল্পের বড় সম্পদ যেমন চরিত্র, তেমনি এর সংলাপ। আর সংলাপ থেকেই অবলীলায় কৌতুকরস যেন ঝরে পড়ে স্বভাবী পাঠকের মনোলোকে। লক্ষণীয়, এই সমস্ত সংলাপ প্রত্যেকটি চরিত্রের মাপে চমৎকার মানানসই। তার অন্তর্নিহিত কৌতুকরস তার চরিত্রের হাস্যরসাত্মক গল্পের উপযোগী মধুর ব্যক্তিত্বও :

১. উদয়ের উক্তি : 'যাই বল, বাঘের মাপ কখনই ল্যাজ-শুদ্ধ হতে পারে না। তা হলে মেয়েছেলেদের মাপও চুল-সুদ্ধ হবে না কেন? আমার বউ-এর বিনুনিটাই তো তিন ফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা।'

২. কলঘরে স্ত্রীর অবস্থিতি জেনে স্বামী বংশলোচনের মন্তব্য : 'তা হলে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি।'

৩. চুকন্দর সিংকে বলা বংশলোচনের সংলাপ : 'এই বকরি গেটের বাইরে যা গা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।'

৪. 'ল' কে 'ন' ও 'ন' কে 'ল' বলার রীতিতে লাটুবাবুর সংলাপ : 'দস্তুর মত কলসার্ট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্লারিওনেট— এই লরহরি লাগ ফুলোট— এই লবকুমার লন্দন ব্যয়লা।'

৫. বংশলোচনের সনির্বন্ধ অনুরোধ : 'ছাগলটিকে আপনি যত্ন করে মানুষ করবেন।'

৬. লম্বকর্ণের পেট থেকে খেয়ে-ফেলা নব্বই টাকা বের করার বংশলোচনের যুক্তি : 'একটা জোলাপ দিলে হয় না।'

এমন একাধিক সংলাপ চরিত্রন্যায়ের মধ্যে থেকেই অসঙ্গতির মোড়কে সঙ্গত হাসির ফোয়ারা ছোটায় পাঠকমনে।

স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরসের পরিচয় লম্বকর্ণ গল্পে কাহিনী-ভিত্তি, ঘটনা-নির্মাণ, চরিত্র-পরিকল্পনা ও সংলাপরীতি বাদে আর একভাবে লেখক রেখেছেন। তা আছে লেখকেবই ব্যবহৃত নিজস্ব বর্ণনার মধ্যে। যেমন :

১. 'রায় বংশলোচন ব্যানার্জি' বাহাদুর জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা-বেঞ্চ প্রত্যহ বৈকালে খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান।

২. 'একটা কার্পেটি বোনা ছবি। কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা— CAT, রচয়িত্রীর নাম মানিনী দেবী।'

৩. 'পুরাকালে বড়লোকদের বাড়িতে একটা করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্যপুত্রদের জন্য সেরকম কোনও পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, অগত্যা তাঁহারা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।'

লেখককৃত বর্ণনাগুলি লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি বর্ণনায় আছে স্মিত, প্রচ্ছন্ন নির্মল কৌতুকরস। প্রথমটিতে আছে প্রধান চরিত্র-লক্ষ্য বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রস্তাবনা। দ্বিতীয় উদাহরণের নির্মল হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্তই! এমনভাবে বিড়ালটি সুতোয় বোনা, যার পরিচয় নীচে আলাদা বুনে লিখে দিতে হয়েছে। আবার সেই cat-এর নীচে মানিনী দেবীর নাম থাকায় cat ও মানিনী-র সাদৃশ্য ভাবনা হাসির যোগ ঘটায় অবলীলায়। তৃতীয় দৃষ্টান্তে আছে শ্লেষমিশ্রিত কৌতুকরস। এইসব কৌতুকরস নিঃসন্দেহে লেখকের বর্ণনার রীতিনিহিত স্বাভাবিকত্বে উজ্জ্বল, স্বাদু।

অন্যদিকে আরোপিত কৌতুকরসের একমাত্র নমুনা আছে লম্বকর্ণ চরিত্রে। ছাগলটির ব্যবহার, নড়া-চড়া, অতিরিক্ত আহারগ্রহণের তৎপরতায় নিশ্চিতভাবে লেখকের শিল্পসম্মত আতিশয্যের আরোপধর্ম স্পষ্ট। লম্বকর্ণ ক্রমশ স্বাভাবিক থেকে হয়েছে অস্বাভাবিক। সে দুটো বর্মাচুরুট, সিগারেট কেস, জ্বলন্ত প্রদীপের তেল, তার বন্ধনরজ্জু, খবরের কাগজ, গীতার তিনটি পাতা, লাটুবাবুদের ঢোলের চামড়া, বেহালার তাঁত, হারমোনিয়ামের চাবি, পাঞ্জাবির পকেটের নব্বই টাকা— এসব সহজেই খেয়ে ফেলেছে। তার এই উদরস্থ করার সক্রিয়তায় স্বভাব-উপযোগী স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা দুইই অন্তঃশীল। এগুলি আরোপিত বৈশিষ্ট্য— গল্পের প্রয়োজনে। গল্পের প্রয়োজনেই সে বংশলোচনের ঝড়-জলের মধ্যে পথে পড়ে থাকার খবর দেয় তার বাড়িতে। লম্বকর্ণের এইসব আচরণ নিশ্চিত আতিশয্যের দিক। কিন্তু আরোপিত বৈশিষ্ট্য তাকে আজগুবি, fantasy বা রূপকথার চরিত্রে নিয়ে যায়নি। পরশুরামের সংযম লম্বকর্ণ-নিহিত

হাস্যরসকে সহাস্য কৌতুকে শিল্পের সংযম ও সহনশীলতা দান করেছে। এককথায়, 'লম্বকর্ণ' গল্পের মূল রস যে কৌতুক, তার শিল্পের নিখাদ ধর্ম, গল্পকারের অনবদ্য রচনাকৌশলের অন্তর-স্বভাবে বিশিষ্ট।

দুই

'লম্বকর্ণ' গল্পের প্রধান-অপ্রধান চরিত্রগুলিই কাহিনী, ঘটনা ও সর্বোপরি প্লটের অবয়বদানে একমাত্র সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন জাতের চরিত্র এনে পরশুরাম গল্পের পরিবেশ, লক্ষ্যবস্তুকে উচ্চ কৌতুকে উতরোল করেছেন। যে কোনো কৌতুক-রসাশ্রিত গল্পে চরিত্র যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তখন তাদের বাহির ও ভিতর স্বভাব, তাদের যাবতীয় সক্রিয়তা যেমন গল্পের গতি-নির্দেশক হয়, তেমনি তাদের ব্যবহৃত সংলাপ শুধু মানস-অভিব্যক্তির, ভাব আদান-প্রদানের সহায়ক হয় না, সেই সঙ্গে সংলাপের একাধিক অর্থ-মাত্রার বৈপরীত্যে ও অসঙ্গতিতে গল্পের অভ্যন্তরে চাঁদের বলয়ের মতো এক কৌতুকের নির্মোক রচনা করে। চাঁদের বলয় যেমন চাঁদেরই একটি অঙ্গ, কিন্তু চাঁদের স্বভাবকে অতিক্রম না করে তার সঙ্গে ছায়া-কায়ায় লগ্ন থাকে, চরিত্রাত্মক কৌতুকরসের গল্পে চরিত্রের অভ্যন্তরের অফুরন্ত অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসের প্রভাব গল্পকে পাঠকদের মনে তূরীয় আনন্দের মেজাজে ভরিয়ে রাখে। সমস্ত বিশ্বাস-অবিশ্বাস্যতার ঊর্ধ্বের সেই আনন্দ অবশ্যই লেখকের একান্ত নিজস্বতা-চিহ্নিত পরম শিল্পের আনন্দ।

'লম্বকর্ণ' গল্পের বংশলোচন ব্যানার্জি এমন এক মেজাজি চরিত্র। বংশলোচনের প্রসঙ্গ এলেই আসে লম্বকর্ণের নামের ওই ছাগলটি। সে লেখক-চিহ্নিত শিল্পের মাপে আরোপিত চরিত্র নিশ্চয়ই, কিন্তু পরশুরাম এমনভাবে তাকে সমগ্র গল্পে সক্রিয় করে রেখেছেন, যাতে সে যে প্রথাবদ্ধ সমালোচকদের ভাষায় কোনো অভিধা পাওয়ার যোগ্য, তা সন্দেহ নিয়েই প্রশ্ন তোলে। গল্পের নাম 'লম্বকর্ণ', কিন্তু গল্পের নায়ক নিঃসন্দেহে বংশলোচন। তাঁরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পত্নী সম্পর্কে ভয় ও পত্নী-বিরোধিতা, সেই সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রেম-বাসনা, অসহায়তা— এসবই উপযুক্ত কৃতকর্মের মাধ্যমে গল্পের মধ্যে আঁকা। বংশলোচন সজীব, কৌতুককর মানসধর্মের চরিত্র। পাশাপাশি লম্বকর্ণ কোন শিল্পের মর্যাদা পায়? সে তো বংশলোচন-মানিনীর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল আরও বাড়িয়ে দেয়, বাড়িয়ে দেয় তার বিষম ক্ষুধার দাবিতে তার চমকপ্রদ কার্যাবলীর রাজ্য বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ডপার্টির মধ্যেও। গল্পের চরিত্রের যত কিছু দুর্ভোগ, অসঙ্গতিজনিত অসহায়তা— সবের মূলে লম্বকর্ণ। লম্বকর্ণই গল্পের নায়ক বংশলোচনের দৈনন্দিন জীবনে শান্তির কারক হয় সবশেষে।

কিন্তু লম্বকর্ণ নায়ক নয়। একটি পশু বলেই যে নায়ক হবে না তা নয়, আসলে গল্পের মূল লক্ষ্যের দিকে তাকালেই লম্বকর্ণের শিল্প-দায়িত্ব অন্যত্র সরে যায়। গল্পের লক্ষ্য বংশলোচন-মানিনীর পারিবারিক সংঘর্ষের মধ্যেকার মান-অভিমান ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট দূরত্ব ঘুচিয়ে তাতে শান্তি আনা। বংশলোচন-মানিনীর সম্পর্কই যে একমাত্র এবং প্রধান

লক্ষ্য, সেখানে বংশলোচনই নায়ক, তাদের মিলনের কারিকা শক্তি লম্বকর্ণেব অদ্ভুত সব ক্রিয়া। লম্বকর্ণের সব কিছু সক্রিয়তা বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত 'ক্যাটালিস্ট'-এর মতো। দাম্পত্য কলহের সুমধুর অবসানেই তার শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তাটুকুর সমাপ্তি। গল্পের নাম 'লম্বকর্ণ' হলেও বংশলোচন নায়ক এবং লম্বকর্ণ নামের ছাগলটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের কিছুটা মর্যাদা পেতেই পারে। কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দানে কিছুটা সংশয় আমরা রাখছি এই কারণে যে, লম্বকর্ণ নামের ছাগলটি সাধারণ পশু নয়, স্বভাবের অসঙ্গতি-নির্ভর আতিশয্য-জড়িত বৈশিষ্ট্যে লেখক আরোপ করেছেন শিল্পের লক্ষণীয় মাত্রাগুলি, ফলে লেখকের উদ্দেশ্য চরিত্রটিতে যতটা কাজ করে, ছাগলটির নিজস্ব অন্তর্নিহিত স্বভাবের ততটাই ঘটেছে বিচ্যুতি। তার স্বতঃস্ফূর্ততার হানি তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্বক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল করে। তাতে অবশ্যই, পরশুরামের অসামান্য চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতার কারণে শিল্পীর তান্ত্রিকসুলভ নিরাসক্তি ও সংযমের গুণে বংশলোচনের মতোই লম্বকর্ণ সমান হাসির জোগান দিতে সমর্থ।

বংশলোচন চরিত্রটির বড় শিল্পের মর্যাদা তাঁর ভালোমানুষি সদাশয়তায়, তাঁর ছাগলের জন্য দুঃখবোধে, তাঁর চল্লিশোর্ধ্ব বয়সেও শিশুর সারল্য নেই, আছে একজন রাশভারি জমিদার, বেলেঘাটা-বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট—যিনি রীতিমতো ধনী, তীব্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাপ্রিয়, কোর্টে আসামীদের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা থেকে একমাস জেল দেওয়ার মতো অসম্ভব ক্ষমতাধারী হয়েও সংসারে স্ত্রী মানিনীর মতো কর্তৃত্বময়ী অহংকারী ধনী কন্যার কাছে অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে যান, পরাজিত হন,—তারই মধ্যে। চরিত্র-নিহিত এই অসঙ্গতিই নায়ক চরিত্রটিব প্রাণ। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই লম্বকর্ণের প্রতি তার কৌতূহল, স্ত্রী কুকুর পুষতে দেয়নি বলে প্রতিশোধমূলক ছাগল পোষার বাড়াবাড়ি, ছাগলের প্রতি স্নেহাধিক্য ইত্যাদি বিষয় চরিত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে, আর সেগুলিই গল্পের নায়ক-নির্ভর হাস্যরসের যথার্থ উদ্বোধক হয়ে ধরা পড়ে। বংশলোচনের যাবতীয় সক্রিয়তাই গল্পেব প্রধানতম গতি। লম্বকর্ণ নায়কের সক্রিয়তাকে আরও বেশি কৌতুককর করে তোলে। 'লম্বকর্ণ' গল্প কমেডির উপযোগী মিলনান্তক। মানিনী-বংশলোচনের মিলন-পরিণাম চরম কৌতুকের হয় এই কারণে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত ঘটনায় বংশলোচনের কীর্তিগুলির নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যকবতা বারবার বিপরীত রসের জোগান দেয়। গল্পে লম্বকর্ণের জন্যই বংশলোচনের চিত্রণ নয়, বংশলোচনই লম্বকর্ণকে কাহিনীতে যুক্ত করে, তাকে দিয়ে পরোক্ষে একাধিক হাস্যকর কাজ করিয়ে নেওয়ায় সম্যক শৈল্পিক সহায়তা করে।

লম্বকর্ণ সম্পর্কে আগেই বলেছি, চরিত্রটি স্ব-নির্ভর নয় তার শৈল্পিক আত্মার স্বভাবে। বংশলোচন তাঁর শিল্পীর হাতে আর ধরা থাকেনি, লম্বকর্ণ পরশুরামের নির্দেশেই এগিয়ে চলেছে গল্পের মধ্যে। বংশলোচন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, লম্বকর্ণ শিল্পীর হাতের কল-পুতুল। কিন্তু যেমন নিখুঁত কল-পুতুলের নির্মাণকৌশল বিস্ময়কর হয়, অস্বাভাবিকেব মধ্যে অনবদ্য স্বাভাবিকতায় মুগ্ধ করে, লম্বকর্ণ পরশুরামের হাতে তা-ই। সে যখন গোড়াতেই দুটি বর্মা চুরুট ও চুরুটের কেসটি খেয়ে নেয়, সেখানেই তার শিল্পমাত্রা নির্দিষ্ট সীমা পেয়ে যায়। জল-ঝড়ের সন্ধের আগে পর্যন্ত তার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, বেলেঘাটা

ব্যান্ডপার্টির সবকিছু নষ্ট করার মধ্যে সেই শিল্পমাত্রাই কাহিনীর গতি আনে। সে এই পর্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থে dynamic নয়, static, কিছুটা বা প্রতীকী। সর্বশেষ বংশলোচনের অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকার পর তার প্রভুভক্তির নিদর্শন তাকে শেষ গতিটুকু দিয়ে জীবন্ত করে। লম্বকর্ণের শেষতম প্রভুভক্তি বিশ্বাস্য যেমন, হাস্যকরও তেমনি। সবশেষে তার হাস্যরসের জোগান যেন গল্পের সিদ্ধান্তকে উজ্জ্বলতম করে। গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদে তার বর্ণনায় পরশুরাম বাড়তি হাস্যরসের জোগানে কৃপণতা করেননি। তার 'আলালের ঘরের দুলাল'টির মতো সমাদর, আপ্যায়ন, যত্ন, পরিচর্যা সবই বংশলোচন-মানিনীর শুভ সম্পর্কের উপযুক্ত প্রতিদান ও সম্মান :

> 'লম্বকর্ণ' বাড়িতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার আধ-হাত দাড়ি গজাইল। ......
> মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাধাইয়া দিয়াছেন।
> তাহার জন্য সাবান ও ফিনাইল ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ
> ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রূপ করে।'

মানিনীদেবী নায়িকা নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর প্রয়োজন সামান্যই। তাঁর আবির্ভাবও গল্পে প্রত্যক্ষভাবে দু'বার। প্রথম দেখা যায় বংশলোচনের বাড়িতে লম্বকর্ণের প্রথম আশ্রয়লাভের মুহূর্তে, শেষ বংশলোচনকে অসুস্থ অবস্থায় রাস্তা থেকে নিয়ে এসে স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ও রোমান্টিক মিলনমুহূর্ত রচনায় স্ত্রীর গোপনতম বাসনার অভিব্যক্তিতে। আসলে 'লম্বকর্ণ' গল্পের নায়িকা সমগ্র গল্পের লক্ষ্যবস্তুর সূত্রে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে। মানিনীর জীবজন্তু প্রীতি নেই, এটাই গল্পের একটি চাবিকাঠির কাজ করে। শেষে সেই প্রীতিতেই তাঁর মানসিক রূপান্তর সাধন। অসঙ্গতির দিক এক Positive জীবনধর্মে চলে আসে। মানিনীর এমন চরিত্র-ভাবনার রূপান্তরীকরণ চরিত্র-ন্যায়েই স্বাভাবিক। চুকন্দর সিংকে সামনে রেখে লম্বকর্ণ বিদায়ের পক্ষে তাঁর দাপট ও উচ্চকণ্ঠ তাঁকে স্বাভাবিকই করে। এই দাপটের সঙ্গে পরাজয়ের ভয়ে আর একটি অস্ত্র কাজ করে, তা তাঁর অভিমান। স্বামীর বিরুদ্ধে কন্যা টেঁপীকে বলার বকলমে সেই অস্ত্রের মোক্ষম প্রয়োগ :

> 'হ্যালা টেঁপী, হাতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল,— গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।'

বাপের বাড়ি যাওয়ার মতো এই আকস্মিক কথাটি বাঙালি পরিবারের বধূদের অভিমানের উপযোগী একটি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই মানিনীকেই আবার গল্পের শেষে স্বামী-সহবাস কামনায় বৈঠকখানা ঘরেই রাত্রির শয়ন বাসনায়, স্বামীকে সেবাময়ী নারীর মতো খাওয়ানোর অতীব আহ্লাদী হৃদ্য প্রয়াসে, স্বামীর মদ্যপানের অভ্যাসকে সহায়তায় কৌতুককর ভূমিকা গ্রহণে দেখি। পরশুরাম অল্প কয়েকটি তুলির আঁচড়ে মানিনীকে গৃহিণী, পত্নী ও রোমান্টিক প্রেমিকার চমৎকার চিত্রে এনেছেন। যখন বৈঠকখানায় বসে ঝিকে বলেন, 'আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আঃ, চাটুজ্যে মিনসে নড়ে না।'— তখন

চল্লিশোর্ধ্ব স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মধ্যবয়সের চাপা প্রেমের ছলা-কলার ইঙ্গিতটা ভূরি-ভোজনের শেষে মূল্যবান অতীব সুস্বাদু ও মুখরোচক চাটনির মতো স্বাদযোগ্য হয়ে ওঠে। মানিনীর বিবর্তন প্রধানত কৌতুকরসের সমবায়েই একান্ত স্বাভাবিক।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে চুকন্দর সিং যে নির্মল শুভ্র কৌতুকরসের জোগান দেয়, তার স্বাদ অনবদ্য। সে বাড়ির দারওয়ান। রোগা ছোটখাটো চেহারার এই জমিদার বাড়ির বৃদ্ধ দারোয়ানটি 'গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো তার নামে'ই যে চোর-ডাকাতকে সামলাতে সক্ষম—এই চারিত্র্যে হাস্যরস স্বতঃ-উচ্ছল হয়। তার ওপর একই সঙ্গে মানিনীর আদেশ ও বংশলোচনের বিপরীত প্রত্যাদেশ—দুইকে পালন করার সম্মতিতে 'বহুত আচ্ছা' সংলাপটি চরিত্রটিকে নির্মল নীল আকাশের মতো কৌতুকরসে ঢেকে দেয়। শ্যালক নগেন ও ভাগিনেয় উদয়ের ঝগড়া তাদের বিপরীত স্বভাবের সংঘর্ষে কৌতুকরসকে দীপ্ত করে। যেখানে গল্পের মূল নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য-কলহ তীব্রতম, স্ত্রী মানিনীর প্রতি অভিমান অসহায় বংশলোচনের হাস্যকর সীমায় ধরা, সেখানে উদয়ের স্ত্রী-প্রীতির কারণে নগেনকে বলা : 'আমার দাদাশ্বশুর যে সিমলায় থাকতেন। বউ তো সেখানেই বড় হয়। তাই তো রং অত'—সংলাপ চমৎকার হাসির পরিবেশ রচনা করে। 'লম্বকর্ণ' গল্পের কৌতুকরস পরিবারজীবন-আশ্রিতই প্রধানত, সেখানে উদয় ও তার স্ত্রীর সম্পর্ক-ভাবনার হাস্যকবতা অন্য মাত্রা দেয। জমিদার বাড়ির চিরকালের বৈঠকী গল্পের আড্ডায় বিনোদ, কেদার চাটুজ্যেদের উপস্থিতি স্বাভাবিক। কেদার চাটুজ্যের মধ্যে একাধিক সমালোচক পূর্বসূরি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নায়ক চরিত্র ডমরুধরের সঙ্গে আত্মীয়তার রক্ত আবিষ্কারে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু কেদার চাটুজ্যে 'লম্বকর্ণ' গল্পে যে ভূটে পাঁঠার বাঘে রূপান্তরিত হওয়ার গল্প বলেছেন, তার হাস্যকর রোমাঞ্চ-স্বভাব চরিত্রটির বৈঠকী মেজাজকে নিশ্চয়ই যথাযথ করে। বিনোদের শিল্পমূল্যের স্বতন্ত্র ভিত্তি নেই কোনো, আড্ডাখানায় একজন সদস্যমাত্র সে।

গল্পে বড় স্থান পেয়েছে লাটুবাবুর বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ডপার্টি। কিন্তু লাটুবাবু নরহবি নবীনকুমার— এদের কারোর স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব নেই, গল্পের কাহিনীবৃত্তে তার প্রয়োজনও ছিল না। 'ন' কে 'ল' ও 'ল' কে 'ন' বলার এমন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে, অমার্জিত ও অশিক্ষিত আচারের মধ্য দিয়ে লাটুবাবু ও তার দলবল গল্পের কাহিনীকেই গতি দিয়েছে, লম্বকর্ণকে বোঝাতে সাহায্য করেছে, মানিনী-বংশলোচনের সম্পর্কটিতে কোনো প্রভাব ফেলেনি। লম্বকর্ণকে নিয়ে উদ্ভট হাস্যরস সৃষ্টির যে পরিকল্পনা গল্পকারের ছিল, লাটুবাবুর দল তারই যথাযোগ্য পরিপোষক। লম্বকর্ণকে নিয়ে বংশলোচনের চরম অসহায়তা বোঝাতেই ব্যান্ডপার্টি প্রসঙ্গটির আগমন। তারা লম্বকর্ণকে ও বংশলোচনের অসহায়তাকেই আরও শিল্পসম্মতভাবে এগিয়ে দিয়েছে। এখানেই তাদের শিল্প-সার্থকতা। তবে এই দলটির হাস্যকর সংলাপ, সংলাপের অর্থ-ব্যঞ্জনায় mannerism নিশ্চয়ই 'লম্বকর্ণে'র মতো কৌতুকরসের গল্পের সম্পদ। পাড়ার কনসার্ট পার্টির

অহমিকা ও অশিক্ষিত কর্মতৎপরতা যে কী পরিমাণ নির্মল হাস্যের জোগানে সমর্থ, পরশুরাম তাকেই মধুর সচিত্র করেছেন গল্পে।

'লম্বকর্ণ' গল্পে আরও দুটি চরিত্র আছে— শিশু চরিত্র— ঘেণ্টু ও টেঁপী। ঘেণ্টু বংশলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র এবং টেঁপী তাঁর সাত বছরের মেয়ে। এদের দুজনেরই শিশুসুলভ আচরণ ও সংলাপ লম্বকর্ণকে কেন্দ্র করে, বালখিল্যসুলভ পাঁঠার মাংসের প্রতি লোভ ও ছাগল পোষার বাসনা বস্তুত নির্মল কৌতুকরসকেই দ্যোতিত করে। দুজনের মধ্যে টেঁপী একটু বেশি তৎপর হয়েছে গল্পের আখ্যায়িকায়। টেঁপীর আবদারেই লম্বকর্ণের বিশেষ একটা নাম দেওয়ার কথা উঠেছে, তাকে গৃহপালিত হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে। টেঁপী ও ঘেণ্টু মানিনী ও বংশলোচনের মধ্যে দাম্পত্য কলহকে বেশি তির্যক ও তীব্র করেছে। টেঁপী ও লাটুবাবুদের দল লম্বকর্ণকে ফেরত দিতে গেলে, সরল সোৎসাহে মা-বাবার বিবাদ ও অভিমানের তীব্রতাকে বুঝিয়ে দিয়েছে বৈঠকখানার অন্যতম সদস্য বিনোদের মাংস খাওয়ার প্রস্তাবের সময়। টেঁপীর সংলাপে আছে এক সরল, অবোধ, নিষ্পাপ বয়স্ক-শৈশবের উপযোগী উদ্দেশ্যহীন সংলাপ প্রয়োগের কৌতুকনির্ভর অসঙ্গতির স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা :

> 'বা-রে, আমি বুঝি টের পাই না? তবে কেন মা, খালি খালি আমাকে বলে টেঁপী পাখাটা মেরামত করতে হবে— টেঁপী, এ-মাসে আরও দু'-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?'

অল্পবয়সী বালিকার মুখে এমন সংলাপ পরশুরামের সংলাপ বৈশিষ্ট্যের অন্য পরিচয় দেয়, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের ভিন্ন মাত্রাও।

তিন

প্রধানত কৌতুক-রসাশ্রিত গল্প 'লম্বকর্ণে'-র কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে বৃত্ত-রচনার বৈশিষ্ট্য আগেই বলেছি। এই সূত্রেই আর একটি প্রসঙ্গ আপাতত আলোচনার যোগ্য নিশ্চয়ই। 'লম্বকর্ণ' গল্পটির ভাবগত ঐক্যটি যথাযথ রক্ষিত হয়েছে কি না এবং তার মধ্য দিয়েই সার্থক ছোটগল্পের অন্তঃস্বভাব কতটা নিখুঁত শিল্পের অঙ্কশায়ী হয়েছে— তার বিচার-প্রসঙ্গ উঠে আসে। গল্পটির বিষয়-উপস্থাপনা-রীতিতে লেখকের বিবরণ, চরিত্রগুলির সংলাপ এবং গদ্য-ভাষার মধ্যেকার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা কতটা অসঙ্গতি ও আতিশয্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার ঘটিয়েছে, তা-ও লক্ষ করার মতো। আমরা একথা মানি, সার্থক ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত সংযমসিদ্ধ অবয়বে লেখক কখনোই কোনো রকম অতিরিক্ততাকে প্রশ্রয় দেন না কোনো দিক থেকেই— তা কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র-ভাবনা শুধু নয়, রচনারীতি, গদ্য-ভঙ্গি, ভাষাবৈশিষ্ট্য এবং শুরু-শেষের ব্যঞ্জনা— এতসব ধরেই। গীতি-কবিতার সঙ্গে এখানেই এর আত্মীয়তা। গীতিকবি, একাঙ্ক নাটক বচয়িতা ও গল্পকার— তিনজনই তাঁদের নিজ নিজ শিল্পকর্মে সংযম অভ্যাস করেন সৃজন-প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই। এমন সতর্ক বিবেকী সংযম রচনার প্রকাশকালেই রচয়িতা

ও রচনার মধ্যে অলিখিত চুক্তির মতো মান্য হয়ে থাকে। 'লম্বকর্ণ' হাসির গল্প হলেও এর মধ্যে ক্ষণের চিরন্তনত্ব প্রতিষ্ঠা প্রধান কথা বলেই শিল্পীর সচেতনা একমাত্র মূল্য পায়।

অথচ পরশুরাম গল্পটিকে রূপদান কালে সচেতন থেকেও দ্বিধা থেকে মুক্ত হননি। আর এমন দ্বিধাই গল্পটির অবয়বে এনেছে শিল্পের দুর্বলতা। দ্বিধা হল গল্পটির মূল লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর রসিক চিত্তের চরিত্র পরিকল্পনার সম্ভাব্যতার সীমা-সংশয়। যে কোনো গল্পের 'ভাব-ঐক্য' (Unity of impression) হল অনাবশ্যক অতি-বিস্তার বর্জন করে ভাবের একমুখিতাকে নিখুঁত ও যথাযথ রাখা। আর একটু পরিষ্কার করে বললে এভাবে বলতে হয়, লেখকের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত না হয়ে গল্পের বাকি আধারগুলিকে তার একান্ত সমীপবর্তী রাখা এবং এমনভাবে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, বিবরণ-বৃত্তান্ত, ভাষা, শুরু-শেষ নির্মিত হবে— যেগুলি কোনোক্রমেই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য বা ভাবকে আচ্ছন্ন না করে, আবার তার বলয় থেকে বিন্দুমাত্র বাইরেও না যায়। আমরা আগেই বলেছি আয়ান রীডের একটি মন্তব্য— ছোটগল্প 'Centres on the inward meaning of the crucial event, on sudden momentous intuitions'—এই 'inward meaning'-এই ভাব-ঐক্য স্থাপিত হবে যখন, তখন লম্বকর্ণকে উদাহরণ ধরলে বলা যায়, গল্পটির ভাব-ঐক্য হয়েছে ব্যাহত। 'a single impression on the reader' তৈরি করতে গল্পটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

কোনো কোনো সমালোচক গল্পটির 'কেন্দ্রস্থ ভাব-ঐক্য খুব সুপরিস্ফুট' নয় বলার পিছনে 'মৌলিক ভাব অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সরস বর্ণনাই অধিকতর কৌতুকোদ্দীপক' হওয়াকে দায়ী করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, গল্পের সরসতা— যা অধিকতর 'কৌতুকোদ্দীপক' তা ভাব-ঐক্যেরই স্বাভাবিক অনুগ, তা ভাব-ঐক্যের ব্যাহত হওয়ার কারণ নয়। আসলে গল্পের মূল লক্ষ্য মানিনী-বংশলোচনের দাম্পত্য কলহ ও তার 'মধুরেণ সমাপয়েত'র ব্যবস্থা করা। সেখানে লম্বকর্ণ নামের ছাগলটির অতিরিক্ত তৎপরতার বর্ণনাই ভাব-ঐক্যের বাধা হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য যদি দাম্পত্য কলহ হয় তবে গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটির এমন দীর্ঘতা শিল্পের বিচারে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। তা একটিমাত্র বাক্যে গল্পকার ব্যক্ত করলে কোনো ক্ষতিই হত না! দ্বিতীয় কথা হল, চাটুজ্যের পাঁঠার বাঘে রূপান্তর হওয়ার কাহিনীটির বিস্তার নিশ্চয়ই ভাব-ঐক্যের হানির আর এক কারণ। বৈঠকী গাল-গল্পের ও কৌতুকের পরিবেশ এবং বংশলোচনের মনে ছাগল সম্পর্কে হাস্যকর ভয় উৎপাদনই যদি চাটুজ্যের গল্পের লক্ষ্য হয়, তবে তা একান্তই অপ্রয়োজনীয় এবং মূল লক্ষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

আবার কোনো কোনো সমালোচক এমনও মনে করতে পারেন যে কেন্দ্রচ্যুতির কারণেই 'গল্পের হাস্যরস কিছু লঘু কিছু শিথিল হয়ে পড়েছে।' কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'লম্বকর্ণ' হাস্যরসাত্মক গল্প। বেলেঘাটা ব্যান্ডপার্টির উপস্থিতি কৌতুকরসের লঘুতার জন্য দায়ী নয়। কারণ, লম্বকর্ণের মধ্যেকার আতিশয্য এবং সেই সূত্রে বংশলোচনের মনে লম্বকর্ণ সম্পর্কে চাপা বিরক্তি ও সমূহ অসহায়তা সৃষ্টির জন্যই এই দলের মধ্যে লম্বকর্ণকে

পাঠানো প্রয়োজন ছিল। আর স্বতঃস্ফূর্ত সেই প্রয়োজনেই লাটুবাবুদের আচারে-সংলাপে এসেছে নির্মল হাস্যরস। বৈঠকী গল্পের সূত্রে বৈঠকখানার আসর থেকে উঠে-আসা কৌতুকরসও মাত্রা ছাড়ায়নি একমাত্র চাটুজ্যের বাঘের গল্প ছাড়া।

তবু 'লম্বকর্ণ' তার ভাব-ঐক্যের রচনায় বিভ্রান্তি আনে পাঠকদের। কারণ আছে গল্পের নামকরণ ও গল্পের নায়ক-ভাবনার বিরোধের মধ্যেই। পরশুরাম গল্পের নাম দিয়েছেন 'লম্বকর্ণ', কিন্তু লম্বকর্ণ নায়ক নয়, তার স্বভাব-চরিত্র, দুঃখ-ব্যথা প্রতিষ্ঠা গল্পের ভাব-ঐক্যের কথা নয়, সে 'ক্যাটালিস্টে'র মতো দাম্পত্য কলহের মীমাংসা করতেই গল্পে এসেছে। সে প্রধান নয়, সাহায্যকারী, অথচ গল্পের নামে তারই রাজত্ব। অন্যদিকে বংশলোচনের যাবতীয় সঙ্গত-অসঙ্গত ভাবনা ও স্ত্রীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও মিলন-আকাঙ্ক্ষাই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। সেখানে বংশলোচনকে গল্পের নামে কোনো তাৎপর্যে বা ব্যক্তিনামে রাখা হয়নি। পরশুরামের এমন শিল্প-নামের দ্বিধাই তাঁর লক্ষ্যকে দ্বিধান্বিত করেছে। তা না হলে কিছুতেই লেখক লম্বকর্ণকেই শেষ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হতেন না গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করে। মানিনী-বংশলোচনের মিলনেই গল্পের শেষ, লম্বকর্ণের দায়িত্ব শেষ, কৌতুকরসের জমজমাট রূপেরও সার্থক রূপায়ণ সেখানেই। দাম্পত্য কলহ ও শান্তি এবং লম্বকর্ণের সক্রিয় জীবন স্বভাব ও পরিণতি—দু-এর কোনটিকে যে পরশুরাম প্রধান করতে চান—তার দ্বিধা—অন্তত গল্পের অবয়বে আছে বলেই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব-ঐক্য শিথিল হয়। প্রসঙ্গত আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। গল্পের crisis আসে কেন্দ্রীয় ভাব-ঐক্যের দিকে Pointing finger রেখে। বংশলোচনের চরিত্রেই আছে সেই crisis, লম্বকর্ণে নয়। এই যুক্তিতেই লম্বকর্ণের শেষ পর্যন্ত শিল্পের প্রাধান্য পাওয়ার কারণেই ঘটেছে 'ভাব-ঐক্যে'র হানি, এবং সমালোচক কথিত 'a single impression on the reader' সৃষ্টি করতে 'লম্বকর্ণ' গল্পটি ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।

গল্পটিতে পরশুরাম নিজে যেটুকু বর্ণনা করেছেন, সেখানে আছে প্রচ্ছন্ন আর অতি সূক্ষ্ম হিউমার, কখনো বা তা শ্লেষ মাখানো। লম্বকর্ণ গল্পের আরম্ভের প্রথম বাক্যটিই লক্ষণীয়—যার মধ্যে নায়ক বংশলোচনের সামাজিক স্ট্যাটাসকে বিশেষণে সবিশেষ করেছেন নায়কের পক্ষে। এই বাক্যের ব্যঞ্জনাই বুঝিয়ে দেয়, এই গল্পটি হবে কৌতুক রসাত্মক। এই যে গল্পের প্রথমেই সমগ্র গল্পের মেজাজটিকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস, সেখানেই আছে গল্পকারের যথার্থ শৈল্পিক কৃতিত্ব। লেখকের নিজস্ব কিছু বিবরণ ছাড়া বাকি সবই এসেছে চরিত্র-সূত্রে, চরিত্র-মুখে, চরিত্র-মনোলোকে। বিষয় অনুযায়ী লেখকের এসব বিবরণ ও গদ্যরীতির প্রয়োগ গল্পটির মনোরম দেহ-সৌষ্ঠবের পরিচায়ক। আগেই বলেছি, লম্বকর্ণের কথা শেষ অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বলায় গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। শেষ হওয়ার সময় পাঠককুল কোনোক্রমেই লম্বকর্ণ নামক ছাগলটির বিস্তারিত পরিণতি জানতে উৎসুক থাকে না, বরং তারা বংশলোচন-মানিনীর দাম্পত্য কলহের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-এ নিমগ্ন থেকে ব্যঞ্জনায় কৌতুকরসকে আস্বাদ কবতেই তৈরি হয়ে থাকে। 'লম্বকর্ণে'র সিদ্ধান্তের শিল্পগত ত্রুটি এখানেই।

'লম্বকর্ণ' গল্পটির সংলাপ এর সম্পদ। আমরা আগেই এর কিছু কিছু উদাহরণ দিয়েছি। সংলাপের আর একটি বৈশিষ্ট্য—তা বিরল অথচ এখানে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উপস্থিত—এবার তার পরিচয় রাখি। পরশুরাম শ্লেষ-বক্রোক্তির মেজাজেই লাটুবাবু ও বংশলোচনের সংলাপ বিনিময়ে সুন্দর কৌতুকের প্রবাহ ঘটিয়েছেন। অর্থের ব্যঞ্জনা ও তার মনোরম বৈপরীত্যে কৌতুকরস সাময়িক, কিন্তু সার্থক প্রয়োগ লাটুবাবুর সঙ্গী নরহরি যখন বংশলোচনকে জানায় যে লম্বকর্ণ শয়তানের মত তাদের সব নষ্ট করেছে, লাটুবাবুর পকেটের টাকা পর্যন্ত খেয়েছে, খেয়েছে চাবিও, এবং বংশলোচনই লাটুর অসহায় অবস্থা থেকে একমাত্র ত্রাতা হতে পারেন, তখন বংশলোচনের সংলাপ লক্ষণীয় :

> "'বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'
> লাটুবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—'মশাই এই কি আপনার বিবেচনা হল? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'
> বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন, ছাগলটাকে দিতে বলছি।'''

এই যে বক্তা-প্রতিবক্তার ভূমিকায় থেকে বংশলোচন-লাটুবাবুর নির্দোষ সংলাপ-বিনিময়, এর মধ্যে শ্লেষ-বক্রোক্তির মেজাজটি চমৎকার উদ্দেশ্যহীন হাস্যরসের ঔজ্জ্বল্য আনে। 'লম্বকর্ণ' গল্পের প্রথম দিকে যতটা বেশি সংলাপের আধিক্য, শেষ দিকে তা বিরল। এখানে সংলাপের বদলে এসেছে বংশলোচনের ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে কৌতুককর চিন্তা-ভাবনা, অসহায়ভাবে রাস্তায় পতন ও সংজ্ঞাহীন হওয়া। প্রকৃতির বর্ণনা নায়ক চরিত্রের যোগে যথেষ্ট serio-comic রসের জোগান দেয়। 'লম্বকর্ণ' গল্পের প্রতিবেশ, সংলাপ, দাম্পত্য-কলহ ও মিলন, ছাগলের ক্রিয়াকলাপের অতিরিক্ততা, বৈঠকী গল্পের মেজাজ, পাড়ার ব্যান্ড-মাস্টারদের উপস্থিতি—সব মেলানো 'ভিয়েন' থেকে কম রসের জোগান আসেনি পাঠকদের মনে!

চার

'লম্বকর্ণ' গল্পটির নামে তেমন কোনো ব্যঞ্জনা নেই। নাম চরিত্রকেন্দ্রিক। সাধারণভাবে যে কোনো সৃষ্টিধর্মী রচনার নাম নির্দিষ্ট করার বিষয়ে, বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসে, নাম সবসময় মূল বক্তব্যনির্ভর ব্যঞ্জনাধর্মী নাও হতে পারে, বক্তব্য বা লেখক-লক্ষ্যের ব্যাখ্যার আশ্রয়েও প্রযুক্ত হতে পারে, কখনো বা নায়ক, নায়িকা, কেন্দ্রীয় চরিত্র-লক্ষ্যও নামে থাকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণও বিষয়বস্তুর দ্যোতনাকে বাদ দিয়ে শিল্পের মাটি পায় না সম্পূর্ণত। আবার চরিত্রের সক্রিয়তা যদি গোটা গল্প বা উপন্যাসের লক্ষ্যের মাত্রায় বড় তাৎপর্য না আনে, তা হলে সে নামও ব্যর্থ হয়। গল্পের কাঠামোয় বা লেখকের উদ্দেশ্যে চরিত্রনির্ভর নাম শিল্পের শাসনে থাকা চাই।

পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' এমন গল্প-নামে লম্বকর্ণ নামের ছাগলটির দিকে Pointing finger থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এমন নামে কোনো বিভ্রান্তি আসে না, বিষয় থেকে বিচ্যুতিও নেই। লম্বকর্ণের সক্রিয়তাতেই যাবতীয় হাসির উদ্রেক, দাম্পত্য কলহের যুগপৎ

বৃদ্ধি ও শান্তি—সুতরাং এমন নামে বাধা নেই শিল্পের। কাহিনীর মধ্যে যোজক চরিত্র—মানিনী ও বংশলোচনের হৃদয়ভাবের—তাই 'লম্বকর্ণ' নাম সার্থক।

আবার বিদেশি fable -এর গল্পের মতো বাংলা পঞ্চতন্ত্রের গল্পেও এমন জীবজন্তুর সক্রিয়তা, fun, wit -এর মেজাজি গল্প আছে। সেখানে দীর্ঘ কানওলা ছাগলের কথাও পাওয়া যায়। পরশুরামের গল্পে বংশলোচনের সাত বছরের মেয়ে টেঁপীর সানুনয় আবদারে, আদরে, আহ্লাদে, বিনোদের দেওয়া 'লম্বকর্ণ'ই ঠিক হয়। কিন্তু বিনোদ 'ভাসুরক', 'দধিমুখ', 'মসীগুচ্ছ'—এমন সব উদ্ভট নামও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে 'লম্বকর্ণ' নামটি পছন্দ হওয়ার কারণ একই সঙ্গে খাদ্য-রসিক, পেটুক ছাগলটির চেহারায় তার যথাযোগ্য সমর্থন মেলে—'বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কাঁচা পটলের মতো দুটি শিং বাহির হইয়াছে।' ছাগলের দুটি কানের বৃহতত্বেই লম্বকর্ণ নামকরণ কেবল ছাগলটির পক্ষে যথাযথ—আবার সেই ছাগলই গল্পে বড় জায়গা পাওয়ায় গল্পের শীর্ষনামে খাপ খেয়ে যায়।

এইভাবে 'লম্বকর্ণ' নামে কিন্তু অর্থ-তাৎপর্যে ঈষৎ শ্লেষ ও কৌতুক আছে! 'লম্ব' 'কর্ণ' শব্দ দুটির প্রয়োগেই স্মিত হাসি থেকে যায়, ঈষৎ শ্লেষের ছোঁয়া থেকে যায়। নামের স্মিত হাসির অন্তঃশীল ব্যঞ্জনাটিই গল্পের আবহে উতরোল হয়েছে কৌতুকের উচ্চহাস্যে। তাতে ছাগলের চমৎকার সহায়তা থাকায় ছাগলের নাম, গল্পের নাম ও গল্পের ছাগ-নির্ভর কৌতুকরস—তিন মিলে নামের ব্যঞ্জনাকে নিশ্চয়ই তাৎপর্য দেয়।

কিন্তু আমরা তো আগেই প্রমাণ করে দেখিয়েছি, লম্বকর্ণ ছাগলটিই গল্পের নায়ক নয়, লেখকের আরোপিত কৌতুকরসের বৈশিষ্ট্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র। আর এর কেন্দ্রীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে গল্পের নামে নায়কত্ব পাওয়ায় লেখকের গল্পাঙ্গিকে দেখা দিয়েছে দ্বিধা, বিভ্রান্তি। একথাও আমরা আগে আলোচনা করেছি। আমাদের বক্তব্য হল, 'লম্বকর্ণ' নামে গল্পের পরিচিতি ছোট বা খাটো হয়নি, কিন্তু নিখুঁত শিল্পের তাৎপর্যে জট পাকিয়েছে। তাই 'লম্বকর্ণ' নামটি শিল্পের বিভ্রান্তি সৃষ্টিব কারণে মৌল সমস্যাটিকে সব সময়ে জিইয়ে রাখে।

৩.

বিরিঞ্চিবাবা

এক

পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলা তেরশো উনত্রিশ সালের, অর্থাৎ ইংরেজি উনিশশো বাইশ সালের মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। তখনো কল্লোলের প্রকাশ ঘটেনি, সেখানে আরও একটি বছরের প্রতীক্ষা! রবীন্দ্র-বিরোধিতায়, রবীন্দ্র ভাব-ভাবনার বিপরীত, ক্লান্ত, বিতৃষ্ণ মানস-প্রতিক্রিয়ায় তরুণতম লেখককুল তখনো গোষ্ঠীবদ্ধভাবে 'ভারতী' থেকে বেরিয়ে এসে কল্লোলের ভেলায় চাপেননি। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়, পরিবেশ, অসহায় অসহনীয় দেশীয় ভঙ্গুর তীব্র অর্থনীতির

বৈষম্যের সমাজ-পরিবেশ তরুণ লেখককুলকে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচলিত ধারায়—কোনো উপবাসীর কাছে খাদ্যহীনতার প্রতিক্রিয়ার মতো—বিদ্রোহী হবার রসদ অন্তঃশীল স্বভাবে যোগান দিচ্ছিল, তখন একা পরশুরাম রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় আদৌ নয়, বরং সমসময়ের সমাজ-বিরোধিতায়, প্রচলিত সমাজের ভিত্তিমূলের নিষ্ফলত্বকে নিয়েই বিরোধীদের বিদ্ধ করার মতো সূচমুখ কলম ধরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ধারায় সে সময়ে রাজশেখর বসুর 'পরশুরাম' নাম নিয়ে প্রবেশ জ্যেষ্ঠের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা নিয়েই। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্প সেইরকম অভিজ্ঞতার, মানসিকতার এক স্বর্ণফসল!

আবির্ভাব সময়, সেই সঙ্গে 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'বিরিঞ্চিবাবা'র মতো গল্পরচনার কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের অব্যবহিত পরবর্তী সময়-চিহ্নিত। এই বিশেষ সময় পরিবারকেন্দ্রিক ব্যক্তিজীবনে আঘাত হানে, সমাজের ভিতরে অবক্ষয়, পচনকে মন্থর স্বভাবে নির্দিষ্ট মাত্রায় নিশ্চিত চিহ্নিত করে, সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক বিপরীত জীবন-স্বভাবে বিশিষ্ট করে। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রতীচ্যেরই, কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারত তার দূষিত রক্তের ক্ষরণ থেকে, ছোঁয়াচে রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। পরিবার-জীবন তার স্ব-স্থানে বসবাসে অসহায়, ব্যক্তির আর্থিক সংকট ও দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সমাজের মধ্যেকার সমস্তরকম ভারসাম্যহীনতা, সুস্থ নীতির মধ্যে মুখোশধারী দুর্নীতির স্বার্থসিদ্ধি ও ভণ্ডবুদ্ধিতে অন্তরাল হওয়া—এসবই ছিল যুদ্ধোত্তর সমাজ-ব্যাধি। নিয়মই হল, যখনই বাস্তব জীবন ধারণে ও যাপনে পায়ের তলার মাটি ক্রমশ আলগা হতে হতে একেবারে তলহীন হয়ে যায়, তখনি মানুষ, সমাজ বাঁচার জন্য ঊর্ধ্বের দিকে হাত তোলে, শূন্যের মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিশ্বাসে ও অন্বেষায় মূঢ়, স্বার্থপর, আত্মবিশ্বাসশূন্য হয়ে যায়। এমন অলৌকিকে বিশ্বাস মানুষকে অন্ধ করে, যুক্তিহীন করে, নির্বোধ ভক্তির ও সংসারের আফিঙ খাওয়ায়।

অন্তঃশীল এই ব্যক্তি ও সমাজ-স্বরূপের অসঙ্গতি থেকেই একদিন পরশুরাম জন্ম দেন 'বিরিঞ্চিবাবার' মতো গল্প। বিশ শতকীয় 'গুরুবাদ' আরও তীব্র রূপ নেয় কি শহর, কি গ্রাম—উভয় জীবনের মানুষের মধ্যেই। 'গুরু' তথা 'বাবা'-র দল যেমন সুযোগ পেয়ে স্থায়ী আসন পাততে চায়, তেমনি প্রচলিত জীবন ধারণ ও যাপনে অভ্যস্ত মানুষও কখনো বিশ্বাসে, কখনো স্বার্থ বুঝে সেই 'গুরু' তথা 'বাবা'দের কাছে মুদিতচক্ষু ভক্ত হয়ে যায়। এই দুই দলের মুখোশ খুলে দিয়েছেন পরশুরাম তাঁর 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে। অর্থাৎ পরশুরামের প্রথম থেকেই লেখা সমস্ত কৌতুকরসের গল্পের মতোই এ গল্পেও 'অসঙ্গতি'কে, যা কিছু সুস্থ, প্রচলিত, চির-আচরিত তার বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানুষ ও সমাজকে দেখিয়েছেন। উনিশ শতকে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম সমাজ সংস্কারের কথা মনে রেখে প্রচ্ছন্ন কৌতুকে শ্লেষ-ব্যঙ্গের দীপ্তি এনেছিলেন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সূত্রেই অসাধারণ মনসা-মনীষায় তাতে বৈদগ্ধ্যের বিস্ময়কর প্রলেপ ও প্রাণ, জ্যোতি ও যৌবন দেন। তাঁর হাতেই কমলাকান্তের বকলমে রম্য-ভঙ্গির আপাত লঘু মেজাজে লেখা হয়ে যায় 'বাবু'-র মতো রচনা।

এমন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 'বাবু' আর বিশ শতকের প্রথমার্ধের 'বাবা'-দের নিয়ে যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র ও পরশুরাম সাহিত্যের দুই আধারে—যথাক্রমে রম্যরচনা ও ছোট গল্পে—অসামান্য কৌতুকরসের অভিনব স্বাদ দিয়েছেন। 'বাবু'তে কড়া ডোজের শ্লেষমেশানো অনাবিল বিস্ময়। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটির আবির্ভাবে আছে অ-দৃশ্য স্বভাবে সময়ের ও সমাজের দাবিই। মনে রাখা দরকার, আবির্ভাবের দিক থেকে পরশুরাম তাঁর সাহিত্যজীবনের স্বভাবে ও মানসিকতায় 'দ্বিজ'। প্রথম দশ বছরে তাঁর আবির্ভাবে এক জন্ম, দ্বিতীয় আবির্ভাব দশ বছরে একেবারে নিশ্চুপ অন্তরালে থাকার পর উনিশশো একচল্লিশে। দুই জন্মই কিন্তু দুটি যুদ্ধের অব্যবহিত পরের তৎপরতায়, অর্থাৎ প্রত্যেকটি যুদ্ধ যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির মধ্যে মহতী বিনষ্টি আনে,—তার মধ্যেই পরশুরামের কুঠার-ধরা হাত কেঁপে ওঠে ব্রাহ্মণ-ক্রোধে। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটি তাই পরশুরামকে জন্ম দিয়েছে, তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে তাঁর সময়, সমাজ, পরিবেশ।

তবে পরশুরাম যে এমন গল্প লিখে দেশকে 'নিঃক্ষত্রিয়' করতে চাননি, তাদের যথার্থ চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন সুস্থ শিক্ষিত, সচেতন, বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে, দেশীয় সমাজ, জাতি, সমগ্রভাবেই দেশের কাছে, অন্যান্য গল্পের মতো 'বিরিঞ্চিবাবা' তা-ই প্রমাণ করে। 'বিরিঞ্চিবাবা' নিশ্চয়ই কৌতুকরসের গল্প, কিন্তু তা প্রত্যেকটি মানুষকে সমাজের যথাযথ পরিবেশে যে যার স্ব-স্থানে রেখেই চিনিয়ে দেওয়ার গল্প। 'বিরিঞ্চিবাবা' 'বাবা'দের প্রতি রসাপ্লুত ভক্তির গল্প নয়, মোহছুট ভণ্ডামির গল্প। শ্রেণীবিচারে একে আমরা বলব কৌতুকরসাশ্রিত চরিত্রাত্মক গল্প—এর কৌতুকরসে বিশুদ্ধ 'হিউমার' ও উদ্দেশ্যহীন সর্বজনীন 'শ্লেষ' দুইই যদিও বর্তমান!

দুই

'লম্বকর্ণ' গল্পে প্রসঙ্গত আমরা বলেছি, পরশুরাম প্রায়শই তাঁর যে কোনো একটি গল্পকে ছোট বড় সবরকমের চরিত্রের হাত ধরেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ছক করেন। এইভাবেই একসময়ে গল্পের কাহিনী তৈরি হয়ে যায়, ঘটনা এগিয়ে আসে, গল্পের ব্যঞ্জনায় 'চরমমুহূর্ত' হয় সেই নায়ক বা প্রধান চরিত্রের ললাট-লিখনে তৃতীয় নয়নের মতো বিস্ময়কর। চরিত্রের ভিড় আছে গল্পের কাহিনী-আবহে। আড্ডা-ভালো জমে ওঠে বিচিত্র সব মানুষের ভিড়েই—সে সব যত বিচিত্র হয়—ততই। পরশুরামের গল্পে অনেকটা আড্ডার আবহ নিয়ে মানুষ-জন ঘোরাফেরা করে, গল্পের কাহিনীকে এক বা একাধিক ঘটনায় জড়িয়ে প্লট-কাঠামো নির্মাণ করে। 'বিরিঞ্চিবাবা'-ও এই নির্মাণ-পদ্ধতির বাইরে যায় না।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের পটভূমি কলকাতা শহর, গল্পের শুরু পুজোর ছুটিতে হাবশীবাগান লেনের প্রায়-খালি-হয়ে যাওয়া একটি ছোট মেসবাড়ির ছোটখাটো আড্ডার সূত্র ধরে। আড্ডার সদস্য সংখ্যা কম, কিন্তু বিচিত্র সব মানুষ সেই আড্ডায় সাধু-সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ নিয়ে সোরগোল তোলে। মেসের ম্যানেজার দর্শনের অধ্যাপক আমোদপ্রিয় নিবারণ, বীমা কোম্পানির দালাল আর হঠযোগ ও দিব্যচর্চার বাতিকগ্রস্ত পরমার্থ, সংসারে

বীতশ্রদ্ধ, জ্বালা-যন্ত্রণার সংসার থেকে মুমুক্ষু প্রতিবেশী বয়স্ক নিতাইবাবু, বাইশ-তেইশ বছরের শিক্ষিত ব্রাহ্মযুবক সত্যব্রত—এমন সব আড্ডাধারী মানুষদের আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক দিয়ে গল্পের কাহিনী-মুখ রচিত। নিতাইবাবুর দরকার নিরীহ, সৎ, যথার্থ অর্থে শক্তিমান গুরু লাভের জন্য সাধু-সন্ন্যাসী সঙ্গ। এমন তুমুল আড্ডার মধ্যে পরমার্থ দমদমে বিপত্নীক উকিল গুরুপদবাবুর বাগানবাড়িতে সম্প্রতি বসবাসকারী এক ত্রিকালজ্ঞ গুরু বিরিঞ্চিবাবার প্রসঙ্গ তোলে।

আড্ডার মধ্যে থেকেই জানা যায়, গুরুপদবাবুর দুই মেয়ে নিরুপমা আর বুঁচি। বুঁচি গুরুপদবাবুর বাগানবাড়িতে বিরিঞ্চিবাবার দেখাশুনা করে। বড় মেয়ে বিবাহিতা। অনেক পাশ-করা, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, বন্ধুদের কথায় নানান গবেষণারত হওয়ার কারণেই 'প্রফেসর' ননী তার স্বামী। ননী আবার মেসের আড্ডাদার সত্যব্রতরও দূর-সম্পর্কের ভাই। এদিকে সংসারে বীতশ্রদ্ধ গুরুপদবাবু বিরিঞ্চিবাবাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই উৎসর্গ করার সিদ্ধান্তে স্থির থাকেন। আড্ডায় পরমার্থের কথায় অভিভূত হয়ে নিতাইবাবু ঠিক করেন, বিরিঞ্চিবাবার কাছেই তিনি যাবেন। শেষে সকলে মিলে যুক্তি করে আগে আসে গুরুপদবাবুর মেয়ের বাড়ি। সেখানে এসে তারা প্রত্যক্ষ করে ননীর পৃথিবীর খাদ্যাভাব দূর করার জন্য ঘাস সিদ্ধ করার উদ্ভট পদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ততা।

এই ব্যস্ততার মধ্যেই নিরুপমা ওদের জানায়, ওর গণেশমামাই ওর বাবাকে বিরিঞ্চিবাবার মতো গুরু জুটিয়ে দিয়েছে। শোনায় বুঁচকিকে নিয়ে দুর্ভাবনার কথা, গুরুকে বাবার সম্পত্তি উৎসর্গ করার প্রসঙ্গ, নিজের শাশুড়ির অসুস্থতার কারণে বাবার কাছে না থাকতে পারার অক্ষমতা, এবং শেষে বলে ননির পক্ষেও এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ এতে বাবার ধারণা হবে, তাঁর জামাই তাঁর সম্পত্তিব লোভেই ধর্মে-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এসব শুনে সত্যব্রত সিদ্ধান্ত করে—এ ক্ষেত্রে প্রহারই শ্রেষ্ঠ পথ। নিরুপমার কাছ থেকে আগে-ভাগে বিরিঞ্চিবাবার নানা অলৌকিক কৌশলের কথা শুনে নেয়। বিরিঞ্চিবাবার প্রধান চেলা মহারাজ কেবলানন্দ। সেখানে গণেশ মামাও অন্যতম সেবক। গুরুপদবাবু সেখানেই মাসখানেকের বাসিন্দা। ভক্তদের অসম্ভব ভিড়। প্রতি রবিবার রাতে হোম হয়। হোমের দিনে রাম, ব্রহ্মা, চৈতন্য, যীশুদের মতো দেবতাদের সশরীরে আবির্ভাব ঘটে হোমঘরে। এই ঘরে সত্যিকারের ভক্ত ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না। এমন ব্রহ্মার আবির্ভাবের সময় নিরুপমা নিজেই ব্রহ্মার লম্বা দাড়ি আর চারটি মুখ দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে।

আগামীকালই হোমকুণ্ডে হবে মহাদেবের আবির্ভাব—একথা জেনে ওরা সকলে আসে দমদমের বাগানবাড়িতে। গণেশমামাকে নানাভাবে তোয়াজ করে নিতাইবাবু, নিবারণ, পরমার্থ ও সত্যব্রত পরম ভক্ত হয়ে হোমঘরে থাকার অনুমতি আদায় করে। উন্মুখ, উৎকণ্ঠিত ভক্তদের সামনে একসময়ে আবির্ভাব ঘটে বিরিঞ্চিবাবার। তিনি তাঁর নানা অলৌকিক শক্তির কথা বলেন, বলেন প্রবৃত্তিমার্গ-নিবৃত্তিমার্গের বড় বড় তত্ত্বকথা। রাত ন'টায় হোমঘরে হোম শুরু হলে বাবা যোগাসনে থাকেন। একসময়ে বিরিঞ্চিবাবা কোষা

থেকে জল ছিটোলে অন্ধকার ঘরে মহাদেবের আবির্ভাব ঘটে সশরীরে সমবেত সকলের কণ্ঠের স্তোত্র ও মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে। এই সময়েই বাইরে আগুন লেগে যাওয়ার চিৎকার ওঠে। বিরিঞ্চিবাবা একলাফে ঘরের বাইরে চলে যায়, আর নিবারণের বাতি-জ্বালা আলোয় দেখা যায় পলায়নরত মহাদেবকে। সত্যব্রত ছুটে এসে মহাদেবকে জাপটে ধরে। এই মহাদেব হল কেবলানন্দ অর্থাৎ কেবলরাম। বিরিঞ্চিবাবা ও কেবলরামের মুখোশ খুলে যায়। আসলে কোনো আগুন লাগেনি, নিবারণ ও সত্যব্রত বাগানের মালী ও দারোয়ানের সঙ্গে আগের গোপন ব্যবস্থা মতো ভিজে খড়ে আগুন দিয়ে ধোঁয়া তৈরি করে ভয় দেখানোর ব্যবস্থা হয়। ভণ্ডামি ও ধূর্তামি ধরা পড়ার পর গুরুপদবাবুর তদারকিতেই দুজনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় করা হয়। মূল গল্প এখানেই শেষ। পরশুরাম গল্পের শেষতম সিদ্ধান্ত টেনেছেন সত্যব্রত ও বুঁচকির পরিণয় বন্ধনের কৌতুকময় ইঙ্গিত দিয়ে।

গল্পটির মূল বক্তব্য একটিমাত্র কাহিনীর 'চরমক্ষণে' ধরা। সেখানেই গল্পটির প্লট-বৃত্তের বাস্তবতা। যারা 'গুরু', সাধারণ ভক্তদের কাছে 'বাবা', তাদের সমস্ত রকম অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপরীত রূঢ় বাস্তব সত্যকে উদঘাটিত করাই এই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য বা ভাববস্তু। কোনো তত্ত্ব এখানে নেই, সমকালীন এক বিসদৃশ, বিভ্রান্ত সামাজিক সত্যকে গল্পকার ধরেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিন্যাসে। বিরিঞ্চিবাবা সেই চরিত্র যার মধ্যে আছে ভণ্ডামি, ধূর্তামি দিয়ে, স্বার্থপরতা ও শিক্ষিত বুদ্ধিপ্রাণ বাকচাতুরী দিয়ে সামাজিক সত্যের প্রয়োগগত সুস্থতাকে আড়াল করার প্রয়াস।

কিন্তু গল্পের কাহিনী ও সেই সূত্রে ঘটনাকে যে বিরিঞ্চিবাবা চরিত্রটি একটি নিটোল বৃত্তে রূপ দিতে তৎপর, তার প্রসঙ্গটি লেখক এনেছেন প্রত্যক্ষভাবে গল্পের শুরু থেকে অনেক পরে—নিবারণের নিরীহ বাবাজীর সন্ধানের অনুরোধে পরমার্থের সংলাপে। গল্পের মূল লক্ষ্য বিরিঞ্চিবাবা, কিন্তু তার অবতারণা ঘটেছে বেশ কিছু সময় আড্ডার সাধু-সন্ন্যাসী ও তাদের অলৌকিক কার্যকলাপ বিষয়ক রসালাপ করার পর। গল্পের কাহিনীগত কেন্দ্রটি এর ফলেই প্লট-বৃত্ত গঠনে কিছুটা শৈথিল্য, অতিবিস্তার এনেছে কিনা প্রশ্ন জাগে। পরমার্থের 'মিরচাইবাবা' প্রসঙ্গ ধরে নিবারণের জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গের মতো মিরচাইমার্গ, করাতমার্গ, গোবরমার্গ, লবণমার্গ, টিকিমার্গ, দাড়িমার্গ, কাগমার্গ—এমন সব হাস্যকর মতগুলির উত্থাপন, সত্যব্রতর তড়িতানন্দ ঠাকুর ইত্যাদি দিয়ে পরশুরাম গুরুদের অলৌকিক ক্ষমতায় শ্লেষকে করেছেন pointing finger। গুরুবাদের এক কৌতুককর পরিবেশ রচনা করেছেন। কিন্তু মূল প্রসঙ্গে আসায় কাহিনীর কিছুটা অতিবিস্তার ঘটেছে বলেই মনে হয়। প্রথমত, এই অংশে লেখক ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরসূরি হয়ে আড্ডার আকর্ষণীয় মোহ ও আমেজকে ভুলতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, কৌতুক ও শ্লেষের রসের ভিয়েনে বিরিঞ্চবাবার গুরুবাদের একটা নিরপেক্ষ ভণিতায় কিছুটা শিল্পের সার্থকতা দান করেও অতি প্রসারিত প্রাসঙ্গিকতায় নিখুঁত শিল্পের মাত্রা সামান্য ছাড়িয়েছেন। তৃতীয়ত, কাহিনীর অকারণ স্ফীতি প্লটবৃত্তকে কিছুটা 'কেন্দ্রাতিগ' করে তুলে সার্থক ছোটগল্পের রসাভাস দোষ ঘটিয়েছে।

নিশ্চয়ই, গল্পের এই প্রথমাংশে শ্লেষ-মেশানো কৌতুকরস জমাট, আমরাও যেন আড্ডার অংশীদার হয়ে তাতে বসে যাই, তাতেই মশগুল থাকি। গল্পের শেষেও গল্পকার আবার মূল প্লট-বৃত্তের বাইরে প্রসঙ্গ এনেছেন সত্যব্রত-বুঁচির প্রেমপ্রসঙ্গ টেনে। গল্পের মধ্যে একবার মাত্র বুঁচকি-সত্যব্রতর সংলাপ-বিনিময় আছে বুঁচকির কাছে চা-খাওয়ানোর প্রসঙ্গে। কিন্তু সেই কথাবার্তায় প্রথম পরিচয়ের পাঠ আছে, প্রেমের সূত্রপাত হওয়ার মতো শিহরন নেই। বিরিঞ্চিবাবা আদৌ প্রেমের গল্প নয়, প্রাসঙ্গিকতায় 'প্রেম' থাকার কথা নয়, কিন্তু পরশুরাম, গল্পের যেখানে শেষ—বিরিঞ্চিবাবার ভণ্ডামি ধরা-পড়া ও তাদের বিদায় দেওয়া—তার পরেও সত্যব্রত-বুঁচকি প্রসঙ্গ এনেছেন। গল্পের মূল কাঠামোয় এর কোনো যোগ নেই, অন্তত সিদ্ধান্তে এ প্রসঙ্গ অবান্তর। এত বড় একজন ভক্তের কথাতেই, অন্তত সামান্য টীকা-টিপ্পনিসহ আলোচনাতেই গল্প শেষ হওয়া উচিত ছিল, এবং সেটাই গল্পের প্রকরণগত বাস্তবতায় একান্ত স্বাভাবিক। পরশুরাম তা করেননি। যেন একটি প্রেমের গল্পের শেষ টেনেছেন গল্পকার—যা গল্পের বৃত্তকে শিল্পের অনৌচিত্যতা দান করেছে।

আমাদের মতে, কঠিন ছোটগল্প-শিল্পের মাপে সত্যব্রতর এই সংলাপেই গল্পের শেষ ও ব্যঞ্জনার চিন্তার :

> 'প্রভু, তা হলে নিতান্তই চললেন? চন্দ্র-সূর্য আপনার জিম্মায় রইল, দেখবেন যেন ঠিক চলে। দম দিতে ভুলবেন না, আর মধ্যে মধ্যে অয়েল করবেন।'

গল্পকার কিন্তু এখানেই শেষ করেননি। কাহিনী কাঠামো প্রধান চরিত্রসূত্র ধরে একটি বড় ঘটনাশ্রয়ে পূর্ণতা পায়। গল্পের যথোচিত তীব্রতা এখানে। সত্যব্রতর হাত মহাদেবের কামড়ে দেওয়া, রক্তপাত, বুঁচকির ছোটখাটো সেবার ইঙ্গিত দান, বুঁচকিকে বিয়ে করার প্রসঙ্গ তুলে সত্যব্রতর দিক থেকে নিবারণের কাছে প্রস্তাব—এ সমস্তই অনাবশ্যক অতিবিস্তারের দিক চিহ্নিত করে। হতে পারে পরশুরাম এই অংশে তাঁর অসাধারণ শিল্পসম্মত বিশুদ্ধ হিউমার-এর সার্থক রূপচিত্র উপহার দিয়েছেন। গল্পের মূল রুদ্ধশ্বাস পরিণতির পর এমন হাস্যরসাত্মক সিদ্ধান্ত কিছুটা মজার শ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেয়, কিন্তু শিল্পের মাপে তা অবশ্যই অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট। আবার পরশুরামের চরিত্র-চিত্রের প্রতি গভীর মোহ ও বৌদ্ধিক কৌশল-ভাবনা সব সময় কাজ করে বলেই ননিকে দিয়ে তার গবেষণা-প্রক্রিয়া এত বড় করে দেখানোয় শিল্প-যৌক্তিকতা থাকে না। কিভাবে বিরিঞ্চিবাবার ওখানে ধোঁয়া তৈরি করবে তার প্রসঙ্গেই কাহিনী-বৃত্তে এর যোগ করেছেন লেখক। তাই ননি প্রসঙ্গেও আছে চরিত্র চিত্রের প্রতি মোহ ও অতিবিস্তার। এদেশীয় আড্ডার ঐতিহ্যের প্রতি এবং বিশুদ্ধ শ্লেষ ও কৌতুকরসের প্রতি পরশুরামের কিছু মোহ তাঁর গল্পের নিখুঁত শিল্প-কাঠামো রক্ষায় কখনো কখনো কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তিন

অবশ্যই ছোটগল্পের কাঠামোয় প্রধান চরিত্র বিরিঞ্চিবাবা পরশুরামের এক অনবদ্য

সৃষ্টি। পরশুরামের গল্প চরিত্রের হাত ধরে এগোয়—এই বৈশিষ্ট্যে অবশ্যই বিরিঞ্চিবাবার দায়িত্ব অনেক। বিরিঞ্চিবাবার বাইরের রূপ আঁকায় পরশুরাম দক্ষ ভাস্কর। বিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত যে গুরুবাদের প্রবল বিস্তার এবং যে গুরুকুলের ঐতিহ্যগত রূপাবয়ব, তারই সার্থক প্রতিনিধি যেন বিরিঞ্চিবাবা। এই চরিত্র আঁকতে বসে লেখক গুরুবাদের ভবিষ্যৎ এবং এক স্থায়ী কালাতিশায়ী রূপ কল্পনা করে এক ভাস্কর্যের মূর্তি উপহার দিয়েছেন আমাদের। সাধন-ঘরে সভা আলোকিত করে বসা বিরিঞ্চিবাবার চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া, গায়ের রঙ ফরসা, দুচোখ উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ নাক এবং ঠোঁটে সব সময়েই মৃদু হাসি। পরনের আলখাল্লাটি গৈরিকবর্ণের। মাথায় কান পর্যন্ত ঢাকা টুপি। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্নের মধ্যে। বেদীতে উপবিষ্ট বিরিঞ্চিবাবার ডান দিকে ছোট মহারাজ কেবলানন্দ।

এ তার বাইরের রূপ। তার ভিতরে আছে ভণ্ডামি। কিন্তু তার ভণ্ডামি ভক্তদের ধর্মীয় ভক্তি আকর্ষণের জন্য নয়, বুদ্ধিদীপ্ত বিষয় ও কথা দিয়ে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সম-অসম মিল-অমিলে অলৌকিক রসের জোগান দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করা! ভক্তি তৈরি হয় ধর্মের আধ্যাত্মিকতায় নয়, অলৌকিকের অভিনবত্বে। বিপুল তার শিক্ষা, অসাধারণ বাকবৈদগ্ধ্য, উপস্থাপনা রীতি, উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে শ্রোতাদের নিবিষ্ট করে রাখার প্রয়াস—এসবই তার enchanting power, তার 'বাবা' হিসেবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। স্বার্থসর্বস্ব বিষয়ী শিক্ষিত মানুষের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অথচ সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে সম্যক বোঝার ক্ষমতা সে রাখে। এখানেই নিচু স্তরের ভণ্ড 'বাবা'দের থেকে এর লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। বিরিঞ্চিবাবা ধনী ও মধ্যবিত্তদের 'গুরু', নির্ধন অশিক্ষিত সর্বহারাদের 'বাবা' সে নয়।

গল্পের প্লটবৃত্তে বিরিঞ্চিবাবা মাকড়সার বিস্তারিত জটিল সূক্ষ্ম জালের ঠিক কেন্দ্রে স্থির-স্থিত মাকড়সাটির মতো। প্রথম কথা হল, সমগ্র গল্পে বিরিঞ্চিবাবার নিজস্ব তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। তার উপস্থিতি কাহিনীকে ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সে নিজে কাহিনীকে গতিদানে সহায়তা করেনি। গল্পে তার ইমেজটাই একমাত্র কথা। দ্বিতীয় কথা হল, আগুন লাগার চিৎকার শুনেই হোমঘরের অন্ধকার থেকে একাকী পলায়ন-ঘটনা তার চরিত্রের নকল ভাবমূর্তিকে আকস্মিকভাবে হতমান করে। এই হতমানতা গল্পের অন্তিমে পাঠকদের দেয় বিপরীত অভিজ্ঞতায় ভিন্ন স্বাদ। চরিত্রটির মধ্যে প্রধান কৌতুকের জায়গাটি হল, তার শিক্ষাদীক্ষা, ভণ্ডামির মুখোশ খোলার পরেও, তা সর্বতোভাবে আসন্ন জেনেও—যখন সে সাধারণ মানুষ হয়ে যায়, তখনো সে দমিত হয় না। গুরুপদবাবুকে ভর্ৎসনার সুরে বলে : 'দিব্যদৃষ্টি কোন নাস্তিকের হয় না। তাই দেখা দিয়েও শেষে মানুষের মূর্তি ধরে তাঁকে বিদ্রূপ করেন।' এখানে যে চরিত্রভাবের বৈপরীত্য জনিত অসঙ্গতি—তার মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুক আলো ফেলে। এমন কৌতুকরস সৃষ্টির ক্ষমতা পরশুরামের লেখনীর সোনার স্বভাব! তৃতীয় কথা হল, বিরিঞ্চিবাবার একাধিক কথায় আছে নির্মল কৌতুকরস—তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সমগ্র গল্পের মূল রস শ্লেষ-মিশ্রিত কৌতুকরস; তার উৎস, বিস্তার, সিদ্ধি বিরিঞ্চিবাবা চরিত্রায়ণেই উজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত।

গল্পের কাহিনী ও ঘটনার যৌথ কাঠামোয় বিরিঞ্চিবাবা চরিত্রটি ব্যক্তিগত স্বভাবে Static (স্থিতিপ্রাণ), তাকে Dynamic (গতিপ্রাণ) করেছে পরশুরামের গৌণ চরিত্রগুলির

সমবেতভাবে বিস্ময়কর সক্রিয়তা। তার ভণ্ডের মুখোশ সামনে ধরা ও খোলাটাই গৌণ চরিত্রদের লক্ষ্য। গল্পের 'হোমঘরটি' হল 'চরমক্ষণ' রচনার উপযুক্ত আধার। এখানেই বিরিঞ্চিবাবার যাবতীয় বাক-চাতুরী, সক্রিয়তা! আর এখানেই ঘটেছে তার স্বরূপ উদঘাটন। এই সূত্রে বিরিঞ্চিবাবা অবশ্য সার্থক ছোটগল্পের নায়ক-ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার নায়কত্বকে গল্পের প্লট-বৃত্তে শিল্পের মহিমা ও মহনীয়তা দিয়েছে তিনটি দল—ক. ছোট মহারাজ কেবলানন্দ সহ বাবাজীর দল, খ. অতিবিশ্বাসী গুরুপদবাবু, ও. কে সেনের মতো অতি বিশ্বাসীর দল, গ. সত্যব্রত-নিবারণের মতো বুদ্ধিমান, ফেকু পাঁড়ের মত অবিশ্বাসী সমগ্রত সংশয়বাদীর দল। পরশুরাম এই জটিল-যৌগিক মনের ও বিশ্বাসের মানুষগুলিকে দিয়ে বিরিঞ্চিবাবাকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দিয়েছেন। প্রধান চরিত্রচিত্রণে গল্পের টেকনিকের অভিনবত্ব সৃষ্টি পরশুরামের নিজস্ব ব্যক্তিত্বেই চিহ্নিত। গৌণ চরিত্রের ভিড়ে ও কোলাহলে বিরিঞ্চিবাবার ব্যক্তিত্ব ভিন্নস্বাদী।

লক্ষণীয়, বিরিঞ্চিবাবা যেমন নিজেই হাস্যরসের প্রবাহ এনেছে গল্পে, তেমনি নিজেও হাস্যরসের খোরাক হয়েছে পাঠকদের। তার মধ্যেকার হাস্যরস ত্রি-মাত্রিক (3-dimentional)। সে এমন সব বুদ্ধিদীপ্ত কথায় ত্রিকাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনায়, নিবারণ তার পা জড়িয়ে ধরলে অবলীলায় অলৌকিক শক্তির ভানে নিবারণের গতজন্মের জগতসিংহের খাজাঞ্চি মতিরাম হওয়ার কথা বলে ফেলে, 'ধনীর স্বর্গলাভ হয় না'—যীশুর এমন কথার প্রতিবাদ ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত জানায়—যে সবের মধ্যে অসামান্য কৌতুকরসের ফোয়ারা তৈরি হয়। এই কৌতুকরস বিরিঞ্চিবাবার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-জাত। আবার যখন সে ধরা পড়ে গিয়েও বাস্তব রূপে বলে ওঠে 'নাস্তিকের দিব্যদৃষ্টি হয় না', তখন তার ব্যক্তিত্বের আর এক মোহমুক্ত কৌতুকের মাত্রা রচিত হয়ে যায়। বিরিঞ্চিবাবাকে কেন্দ্র করে নিতাইবাবু, নিবারণের সক্রিয়তা, সত্যব্রতর হাসি, ও. কে. সেনের বিস্ময় প্রকাশ করে ইষ্টনাম জপ —এ সমস্তই বিরিঞ্চিবাবার 'গুরু' তথা 'বাবা'-স্বভাবের বৈপরীত্য ও নিষ্ফলত্বকেই কৌতুকে জারিয়ে তোলে। বিরিঞ্চিবাবা চরিত্রের এমনি এক পরোক্ষ হাস্যরসাত্মক মাত্রা আমাদের চিনিয়ে দেয়।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে পরশুরাম গৌণ চরিত্রের ভিড় তৈরি করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। কিন্তু তারাই কেউ যথার্থ অর্থে individual নয়। বিরিঞ্চিবাবার প্রয়োজনেই তাদের আগমন ও যাতায়াত। তবে তাদের অনেকের পেশার কথা বলেছেন—যেসব প্রসঙ্গে কৌতুকরস ঢাকা থাকে না। দর্শনের অধ্যাপক নিবারণ অথচ আমোদপ্রিয়, পরমার্থ জীবনবীমার দালাল কিন্তু হঠযোগ ও দিব্যজ্ঞান চর্চার বাতিকগ্রস্ত, নিতাইবাবু বয়স্ক, সংসারে বীতশ্রদ্ধ কিন্তু সংসার ত্যাগেও তীব্র অর্থবাসনা, অনেক পাশ-করা, পৈতৃক-সম্পত্তির অধিকারী তথাকথিত প্রফেসার ননির উদ্ভট গবেষণা প্রয়াস—এমন সব চরিত্র পরিকল্পনার পেশা ও স্বভাবের বৈপরীত্যে চমৎকার কৌতুক রসাস্বাদ দিয়েছেন গল্পকার। এদের মধ্যে বাইশ-তেইশ বছর বয়সের ব্রাহ্ম যুবক সত্যব্রত আধুনিক মনের চবিত্র। তার রসবোধ তাকে ভিন্ন চরিত্র করেছে গল্পে। একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা বুঁচিকে নিয়ে

বিপত্নীক গুরুপদবাবুর ঔদাসীন্য, বিরিঞ্চিবাবাকে সব সম্পত্তি দানের সিদ্ধান্ত ও গুরুবাদের মোহে নিরাসক্ত হওয়ার মধ্যে কিছুটা সঙ্গতি আছে। বিরিঞ্চিবাবার ধরা পড়ার পর গোবর্ধনবাবু তাকে প্রহার করতে গেলে গুরুপদবাবুর প্রকৃতিস্থ হওয়া ও তাদের বিদায় দেওয়ার ঘটনার মধ্যে চরিত্রে কিছুটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তার পরবর্তী আচরণ, সত্য ও নিবারণদের নিমন্ত্রণ করার মধ্যে এসবের পরিচয় মেলে। তবে এই সমস্ত চরিত্রই পরশুরামের চরিত্র-চিত্রশালার দেওয়ালে টাঙানো লেখকের কলমের শোভা। গল্পের প্রয়োজনেই এদের আগমন, সমগ্র গল্পটিকে করেছে বিশুদ্ধ হাস্যশ্রীমণ্ডিত।

চার

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের মূল রস হাস্যরসের প্রবাহে শান্তরস। গল্পের মধ্যে ও শেষে যে পরশুরাম গুরুবাদকে ব্যঙ্গ না করে শ্লেষাত্মক দিক দেখিয়েছেন, গুরুপদবাবুর বিরিঞ্চিবাবা ও তার দলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পাঠানোর মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে। গুরুবাদ বা 'বাবা'-ইজম কি ধরনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে,—পরশুরামের মূল লক্ষ্য তা-ই দেখানো। পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে, মাংসের স্তর সরিয়ে যেমন শরীর দেখানো হয় মাংসবিক্রেতার ছুরিতে, তেমনি পরশুরাম গুরুবাদ তথা 'বাবা'দের ওপর বিশ্বাসী মানুষদের চিনিয়ে দিয়েছেন 'বাবা'দের সর্বাবয়ব স্বরূপে। আজকের বিদায়ী বিশ শতক সেই পরশুরামের সময় থেকে যত এগিয়েছে, ততই এই 'বাবা'-র দল বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে, আড়াল করে, প্রায়-অস্বীকার করে গুরুবাদের ভণ্ডামিকে 'কোটিং' দিয়ে, আধ্যাত্মিকতার আফিং দিয়ে সুসজ্জিত করে চলেছে। সে-ইতিহাসের সারা বিশ শতক ব্যাপী ধারার প্রথম পদসঞ্চার বুঝি পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পেই!

গল্পটির প্রকাশভঙ্গিতে পরশুবাম বিবৃতিমূলকতাকে প্রশ্রয় দেননি, এর মধ্যে নেই গভীর কোনো ব্যঞ্জনাধর্মী ইঙ্গিতময়তা। আসলে এটি কৌতুকরসাশ্রিত গল্প বলেই এব মধ্যে রূঢ় বাস্তবধর্মিতাই সত্য কথা। অসঙ্গতি থেকেই এ গল্পের জন্ম ও পরিকল্পনা। বাস্তবতা তার একমাত্র সত্য। তাই গল্পে আছে সংলাপ প্রাধান্য, আছে প্রচ্ছন্ন নাটকীয়তা। হোমঘরে হয়েছে নাটক, নাটক আছে ননির চরিত্র-ভাবনায়, আর কৌতুকরসের অফুরন্ত উৎসার ঘটেছে চরিত্রদেব সংলাপে। গৌণ চরিত্রগুলির সংলাপ, বিভিন্ন মতের 'বাবা'দেব নিয়ে গালগল্প, অলৌকিকতা নিয়ে হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির কথা—গল্পের পরিমণ্ডলকে উচ্চকিত করেছে। একদিকে গৌণ চরিত্র পরমার্থ, সত্যব্রতর সংলাপ, হোমঘরে নিবারণেব সংলাপ, সত্যব্রতর হাসি থেকে কান্না—এসব চমৎকার কৌতুকরসের সঙ্গে শ্লেষের মিশেল ঘটিয়ে আমাদের নতুন রসাস্বাদ ঘটায়। হোমঘরে নিবারণের জ্বালানো বাতির আলোয় পলায়নরত মহাদেবকে জড়িয়ে-জাপটে ধরলে মহাদেবের স্বরের আর্তি আমাদের প্রবঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, অপমান, রাগ আনে না, বিশুদ্ধ হাস্যরসই আনে :

> "'মহাদেব বলিলেন—'আঃ ছাড়—ছাড়—লাগে, মাইরি এখন ইয়ারকি ভাল লাগে না—চার্দ্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলছি'।'''

গুরুর এমন চরিত্রান্তর হওয়া—'বাবা' থেকে বাস্তব মানুষ হওয়ার মধ্যে গল্পের উত্তেজক স্থানে লক্ষণীয় চরম মুহূর্ত যেমন আছে, তেমনি আছে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস। মহাদেবরূপী কেবলানন্দের এমন সংলাপ উতরোল হাসির ধ্বনি শোনায় পাঠকদের।

বিরিঞ্চিবাবা-সৃষ্ট হাস্যরসের স্বরূপ আমরা চরিত্রটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে হাস্যরস তিনভাবে দেখার মতো। ১. হিউমার অর্থাৎ নির্মল, উদ্দেশ্যহীন কৌতুকরস, ২. সহজ, সরল, জ্বালাহীন শ্লেষ-মিশ্রিত হাস্যরস, ৩. পরোক্ষভাবে 'বাবা' জাতীয় গুরুবাদের প্রতি কিছু ব্যঙ্গদৃষ্টিতে ধরা হাস্যরস। মুক্ত, বিশুদ্ধ কৌতুকরসের পরিচয় আছে গল্পের শেষে সত্যব্রতর বুঁচকিকে বিয়ে করার প্রসঙ্গে নিবারণের সঙ্গে সত্যব্রতর সংলাপ-বিনিময়ে :

'নিবারণ। বাপ না হয় রাজি হল, কিন্তু মেয়ে কি বলে?

সত্য। বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।

নিবারণ। কি বলে বুঁচকি?

সত্য। বললে, যাঃ!

নিবারণ। দূর গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁ।'

সমগ্র গল্পে আছে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে, কখনো প্রকাশ্যে শ্লেষ। এখানকার কৌতুকরস যেন সে সব থেকে এক নির্মল আকাশের মতো প্রসারিত প্রাণবন্ত 'রিলিফ'।

এই গল্পে পরশুরাম বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সামাজিক মানুষগুলি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এনেছেন। যে সমাজে দারিদ্র্য, লোভ, স্বার্থান্ধতা অবধারিত, যে সমাজে ধর্মের নামে, অলৌকিকে বিশ্বাসের নামে আফিং-এর মতো ঘুম আসে মানুষের, যে সমাজে স্বার্থপর মানুষের প্রয়োজনহীন মুনাফা লুঠে নেওয়ার বাসনার শেষ নেই, সেই সমাজের নিতাইবাবু, ও. কে. সেন—এমন সব মানুষদের এঁকে, তাদের সঙ্গে ভণ্ড বিরিঞ্চিবাবাদের জুড়ে দিয়ে গল্পকার হাস্যরসের মধ্যে শ্লেষের কড়া ঝাঁঝের গন্ধ বিলিয়েছেন। বিরিঞ্চিবাবা লেখকের শ্লেষের মূল লক্ষ্য। গল্পে আগের কোনো কোনো জায়গায় ব্যঙ্গকেও প্রচ্ছন্ন থাকতে দেখি সত্যব্রতর পিসিমার ধর্ম-বাতিকের কথায়। ব্যঙ্গ আছে পরমার্থ, সত্যব্রত 'বাবা'দের নানান বিচিত্র শ্রেণীর পরিচয় দানের কথায়। এসবে কৌতুকবস বেশি, কিন্তু ব্যঙ্গও বুঝি মাথাচাড়া দেয়। সত্যব্রতর রসিকতা কিছুটা বা ব্যঙ্গের জ্বালাকে মোলায়েম করে আমাদের সামনে হাস্যরসের পাত্র সাজায়। যিনি বিচারবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হাস্যরসের গল্প রচনায় আজীবন ব্রতচারী, তাঁর কাছে দুটি দিক প্রধান লক্ষ্য হয়—ক. সমস্ত রকম পারিবারিক সামাজিক মিথ্যাচার, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, অমানবিক ক্রিয়া-কর্ম, অহংসর্বস্বতা, কুসংস্কার, ভণ্ডামি ইত্যাদি অ-সুস্থ বৃত্তির নিষ্ফলত্ব, খ. লেখনীর সূচিমুখের স্থায়ী কালির সঙ্গে রূঢ় বাস্তবতা তথা বস্তুতন্ত্রতার মিশেল। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে পরশুরাম বিচার-যুক্তি-ঋদ্ধ কৌতুক শ্লেষ-ব্যঙ্গের সুগার কোটিং-এ সমকালের সমাজকে পোস্টমর্টেম টেবিলে এনেছেন। বিরিঞ্চিবাবা ও অন্যান্য চরিত্রের আচরণগত অসঙ্গতি একই সঙ্গে জটিল-যৌগিক হাস্যরসের বর্ণের ধাঁধার সৃষ্টি করে।

বাইরে স্মিত-মুখ, অভ্যন্তরে রক্তচক্ষু ও কঠিন শাসন-দৃষ্টি পরশুরামের। বিরিঞ্চিবাবার হাস্যরস এমনি—যেখানে, লেখকের কোনো প্রতিশোধস্পৃহা নেই, আছে সমাজের শোধনকর্মের মঙ্গলঘট স্থাপন।

পাঁচ

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে পরশুরামের লেখক-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কী? তাঁর কোন বিশেষ মনোভঙ্গি থেকে, জীবন দৃষ্টি থেকে এমন গল্পের জন্ম ঘটেছে, এরকম এক জিজ্ঞাসা পাঠকমনে থেকেই যায়। আগেও বলেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশেষ সময় লেখককে প্রাণিত করেছে এমন গল্প রচনায়। বিশেষ সময়ের দেশীয় মানুষগুলি, তাদের মধ্যেকার ভণ্ড, স্বার্থান্ধ, বিষয়ী একাধিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পরশুরামের হাসির স্মিত-স্বভাব জড়ানো লেখনীমুখে সমাজের স্খলন-পতনকে একমাত্র বিষয় হিসেবে গ্রহণে বাধ্য করেছে। পরশুরামের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ভাবাত্মক নয়, রূঢ় বাস্তব সমাজ-সংস্কারকের। কিন্তু পরশুরাম গল্পে আদৌ সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় নামেননি, নিরাসক্ত দ্রষ্টার ভূমিকায় থেকে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন সমাজের অনেক অন্ধ অলি-গলি, অনেক অন্ধকার বিবর!

একজন হাস্যরসিকের পক্ষে নিরপেক্ষ বাস্তবতাই তাঁর কবচকুণ্ডল। পরশুরামের মতো লেখক মানসিকতায় শিক্ষিত রুচির, Rational, বিদগ্ধ, শহুরে। এসব তাঁর সীমা নয়, তাঁর ছায়ার মতো ব্যক্তিত্ব, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের পটভূমি কলকাতা শহর। যেহেতু পরশুরামের মতো হাস্যরসিকের প্রতিভায় নেই Rurality, তিনি যেহেতু ব্যক্তিত্বে নাগরিক, তাই তাঁর নায়ক বিরিঞ্চিবাবা মার্জিত ভাষায় কথা বলে। শিক্ষিত বলে তার সংলাপে আছে ভব্যতা, সংযম ও 'বুদ্ধি-মানের বজ্জাতি'। এগুলির সবই নাগরিকত্বের বাঁধা তকমা। সত্যব্রত, পরমার্থ, নিবারণ, ননি—সকলেই তাদের Pedigry -র অনুগত। তারা নগরবাসী, তাদের কথাবার্তাতেও আছে সেই নাগরিক বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। তাদের হাস্যরসের উপযোগী অসঙ্গতির রূপনির্মাণে পরশুরাম যেসব situation সৃষ্টি করেছেন, সেখানে কোথাও এতটুকু যুক্তির বাইরেকার সস্তা আবেগ, ভাবাতিরেক নেই।

যেহেতু বিরিঞ্চিবাবার মধ্যে যে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসের জন্ম, তার ভিতে আছে একমাত্র যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধির চমক, তাই পরশুরাম গল্পে নাগরিক শিল্প-স্বভাবকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরও একটা দিক লক্ষণীয়, তাঁর মনোভঙ্গির নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠায়। বিরিঞ্চিবাবার যে আলৌকিক শক্তি প্রদর্শন, তা কেবলমাত্র বাকচাতুরিতেই আছে, অন্ধ কোনো ধর্মীয় ভক্তির আবেগাতিশায়িতায় নয়। ধর্মীয় ভক্তির অন্ধকূপ-বিশ্বাস থাকে গ্রামীণ অশিক্ষিত মানুষদের। বিরিঞ্চিবাবা তাদের গুরু নয়, সে বুদ্ধিমানদের জন্যই। সুতরাং 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে পরশুরামের গায়ে জড়ানো নামাবলী গেরুয়া নয়, সভ্য-ভব্যতা যুক্ত শিক্ষিত মানুষদের দামী সিল্কের চাদর। বিরিঞ্চিবাবা ও কেবলরামের পোশাক বদলে পুরাণের অতিমানুষদের অনুকরণ থাকতে পারে, হোম, কোষাকুষির জল, তান্ত্রিকসুলভ ধ্যানে বসা ও অন্যলোকে গমনের ভড়ং থাকতে পারে, সেগুলি পরশুরাম

কেবলমাত্র গল্পের কাঠামোর situation সৃষ্টির জন্যই গ্রহণ করেছেন, বিরিঞ্চিবাবাদের ধর্মীয় ভক্তির বিশ্বাসে ধরার জন্য নয়। সুতরাং পরশুরামের যে সমাজদৃষ্টি, হাস্যরস পরিবেশনের সূত্রে যে মনোভঙ্গি, তা তাঁর নাগরিক জীবনভাবনার অনুগ। সমাজ-সমালোচনা গল্পকার পরশুরামের নিশ্চিত লক্ষ্য, কিন্তু তিনি গল্পে সমাজ-সমালোচক নন, সমালোচ্য সমাজের উদ্যানে নানা জাতের ফুল ফোটানোর মালী। এ গল্পে পরশুরামের বিশেষ ব্যক্তিত্বটি হল—যথার্থ অর্থে নাগরিক এক গল্পকারের সংযত ভাষার যথাযথ প্রয়োগ, চরিত্রের সঙ্গে তারই ছায়ায় জড়ানো সংলাপের সুষ্ঠু কৌশল ও নিপুণ পর্যবেক্ষণে ধরা গল্পের পরিবেশন-সুষমা—এসব মেলানো এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিকের। সম্পূর্ণ রূপ ধরা পড়ার পর গুরুপদবাবুর কাছে তারা ক্ষমা পেয়ে যায়। তারা আমাদের ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, মারমুখী করে না এতটুকুও, অথচ আমরা ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ পোষণ করে থাকি নিরন্তর—এখানেই পরশুরামের গল্পে উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্বের অনন্যতা।

ছয়

গল্পের নাম 'বিরিঞ্চিবাবা'। সাধারণভাবে যে কোনো গল্পের নাম তার বিষয়কে টেনে ধরে রাখে। কেন্দ্রীয় ভাববস্তু কোনো না কোনোভাবে গল্পের নামে জড়িয়ে যায়। কখনো ভাববস্তু ব্যঞ্জনার নামে ছায়া-কায়ার সম্বন্ধে যুক্ত থাকে, কখনো চরিত্রের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন গল্পের নামে অমোঘ সম্পর্কের অর্থদ্যোতনা আনে। 'বিরিঞ্চিবাবা' বিশেষ চরিত্রের, বলা যায়, নায়ক চরিত্রের নামেই চিহ্নিত গল্প। এমন নামে নিশ্চিত সমগ্র গল্পের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা পায়।

প্রথমত, প্রত্যক্ষ অর্থে বিরিঞ্চিবাবা গল্পের কেন্দ্রীয় মানুষ। তাকে নিয়েই গল্পের যাবতীয় কাহিনী ও নানান গতিময়তা, বিকাশ ও বক্তব্যের বা লেখকের লক্ষ্যের পরিণাম-ভাবনা। তাই গল্পের নামে তাকে স্বাগত জানানোয় গল্পকারের কোনো অসঙ্গতি নেই, বরং নাম সার্থকই।

দ্বিতীয়ত, 'বিরিঞ্চি' এমন শব্দের নামের মধ্যে তিনটি দেবতা-নামের অর্থ অভিধান নির্দিষ্ট করে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তিনজনই পৌরাণিক দেবতা। এরা সকলেই সাধারণ বাঙালি সমাজে সদা-আরাধ্য। পরশুরাম এমন পৌরাণিক অর্থের সূত্র ধরে নায়কের নাম রেখেছেন 'বিরিঞ্চি'। নাম দিয়ে ভক্তদের আকর্ষণ করার একটা সুযোগ থেকেই যায়। চরিত্রে অলৌকিকের প্রতিষ্ঠায় এ নাম অনেকটা সহায়ক হয়। সুতরাং গল্পের নাম 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের অলৌকিকত্বের সাধনা সূত্রে বেশ মানিয়ে যায়।

তৃতীয়ত, 'বিরিঞ্চি'র সঙ্গে 'বাবা' যোগ করে বিশেষ চরিত্রে ও গল্পনামে লেখক বেশ কিছুটা বাড়তি কৌতুকরসাশ্রিত শ্লেষ মিশিয়েছেন। সাধারণ মানুষ প্রকৃত অর্থে নিজের নিজের 'বাবা'কে ফেলে রেখে সর্বজনীন 'বাবা'র পিছনে ছোটে। ভক্তির নামে মানুষের এই যে মনের দিক থেকে দুর্বলতা, আত্ম-অসম্মান, হঠকারিতা, নির্বুদ্ধিতা, তা দেখানোই গল্পকারের লক্ষ্য। 'বাবা' এখানে উনিশ শতকীয় 'বাবু'দের মতন একটা বিশেষ শ্রেণী—

সুবিধাভোগী, স্বার্থপর, ভণ্ড, জুয়াচোর। এই শ্রেণীকে চিনিয়ে দেওয়ার কাজই গল্পকারের। গল্পের প্রধান চরিত্রে ও নামকরণে এই 'বাবা'কে এনে সর্বাংশে সেই বড় কাজটি করেছেন গল্পকার। তাই এমন গল্প-নাম গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধে নিবিড়। ব্যক্তি 'বিরিঞ্চি' নয়, 'বাবা' বিরিঞ্চিই গল্পকারের লক্ষ্য হওয়ায় একই সঙ্গে সমাজের ভণ্ড ব্যক্তির, বিশেষ টাইপ বৈশিষ্ট্যের সামাজিক ভণ্ড শ্রেণীর সম্যক ছবি এঁকেছেন বলেই গল্পের নাম গল্পকারের উদ্দেশ্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করে।

৪.

জাবালি

এক

পরশুরামের 'জাবালি' গল্পটি সোনার ফ্রেমে বাঁধানো এক ঐতিহ্য-প্রাচীন একান্ত-কাম্য আধুনিক স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিত্বের পোর্ট্রেট। পোর্ট্রেট ভিতরে, সে গম্ভীর, স্থির, বাইরে তার নানাবঙের সমাবেশ। পুরাণের 'জাবালি' চবিত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে পরশুবাম গল্পে যে নানা মানুষের বৈপরীত্যের দিক এঁকেছেন, 'জাবালি' গল্পের তা-ই তার প্রধান ব্যাখ্যার দিক। গল্পটির প্রকরণগত সৌকর্য ও বন্ধন হল সোনার ফ্রেম। অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে অভাবনীয় সংযমের মধ্যে লেখক 'লোকায়তিক দর্শনেব নির্ভয় ধ্বজাধারী শালপ্রাংশু পুরুষ জাবালির' কৌতুক ও ব্যঙ্গরস-ঋদ্ধ ছবি উপহার দিয়েছেন আমাদের। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পৌরাণিক সিদ্ধরসে যথাযথ, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বকে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না করে তাঁকে নিয়ে সহৃদয় পাঠকদের কাছে, একালের বুদ্ধিজীবী রসিক মানুষদের কাছে মার্জিত শ্লেষের লঘুরস পরিবেশ করতে গিয়ে পরশুরাম ব্যঙ্গচিত্রীর অসাধাবণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এ-গল্পে।

সম্ভবত পৌরাণিক পরিবেশ, মানুষজন, সিদ্ধরস, ভাবালুতা, ভক্তিরস, অলৌকিকতা ইত্যাদি নিয়ে বহু গভীর গম্ভীর তত্ত্বাশ্রয়ী গাথাকাব্য মহাকাব্য নাটক লেখা হয়েছে গোটা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে। কিন্তু তা নিয়ে হাসির গল্প রচনায় সম্ভবত পরশুরামই প্রথম পথিকৃৎ। 'কজ্জলী'র অন্তর্গত 'জাবালি' গল্পে তাঁর সেই গল্পকারের আদি স্বভাবের, বলা যায় এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেলে। কোনো তীক্ষ্ণ, সমাজ-সচেতন, কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গের লেখক যখন কলম ধরেন, তখন তা আর একজন কলাকৈবল্যবাদীর আনন্দের সৃষ্টিমাত্র হয়ে থাকে না, তার মধ্যে সময়-চেতনা ও তীব্র সমাজ-পর্যবেক্ষণ থাকেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'জাবালি' গল্প লিখতে বসে পরশুরাম দেশীয় মানুষ ও মানুষের গড়া সমাজ-আত্মাকে লক্ষ্য হিসেবে ধরেছিলেন। বিশ শতকের মানুষ বিজ্ঞানের যুক্তি-তর্ক থেকে সরে এসে যে নানা সংস্কারে আবদ্ধ থাকছে, ভ্রষ্ট হচ্ছে তার সনাতন সমাজ-সত্য থেকে, সত্যদর্শী, মোহমুক্ত, নির্ভীক মানুষের ঘটেছে বিষম অভাব, সেই আসন্ন ভয়াল পরিণতিতে বিষাদগ্রস্ত, অসহায় উপায়হীন না হয়ে বরং রক্তচক্ষু, কঠিন পৌরাণিক পরশুরামের মতোই বাস্তব সত্যকে উদঘাটনে উৎসাহী হয়েছেন।

কিন্তু তাঁর উৎসাহের মূলে দুটি মানসিকতা কাজ করেছে। একদিকে যে কোনো বড় সত্যকে যথাযথ করে রাখার প্রয়াস, আর একদিকে মানুষের ক্রোধের জাগরণের বদলে তাকে সহনযোগ্য সহজ করার মতো লঘু কৌতুক-ব্যঙ্গ রসে মিশেল দিয়ে পরিবেশন প্রয়াস। পৌরাণিক জাবালি-চরিত্র গ্রহণে ও চিত্রণে গল্পকারের এই দুই মানসিকতার চমৎকার সম্মিলন ঘটেছে। গল্পের শেষে সমস্ত রকম তরঙ্গ বিক্ষেপের পরেও সত্য ধ্রুব ও দীপ্যমান থেকেছে একেবারে একালের বস্তুতন্ত্রতায়। কিন্তু তা কোথাও গ্রহণে অনীহা জাগায়নি পাঠকদের তার সর্বাবয়ব পরিবেশন-কৃতিত্বের গুণে।

দুই

'জাবালি' অবশ্যই চরিত্রাত্মক গল্প। চরিত্রটি পৌরাণিক, কিন্তু গল্পে তিনি পুরাণের নির্মোকে এক আধুনিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়েছেন লেখক। তাঁর চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য এ গল্পে সত্য, তাঁর নিজস্বতাই এ গল্পের গতিসঞ্চারক। জাবালির লেখক-কল্পিত জীবনবৃত্তই এ গল্পের একমাত্র প্লটবৃত্ত। গল্পের কাহিনী অংশ সংক্ষিপ্ত। সত্যসন্ধ রামকে চিত্রকূট পর্বতের বনবাস থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে বশিষ্ঠাদি একাধিক মুনি-ঋষিদের মধ্যে জাবালিও তাঁর যুক্তি-তর্কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। রামকে বোঝানোর সময় জাবালির যুক্তিগুলিকে সমবেত প্রবীণদের মনে হয়েছে ঘোর নাস্তিক্যবাদী। তাই অযোধ্যায় ফিরে আসার পর থেকেই খর্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি ঋষি তাঁর প্রবল বিরোধিতা করেন। এমনকি এইসব ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ি এসে অপমান করার চেষ্টা করলে নিঃসন্তান জাবালি স্ত্রী হিন্দ্রলিনীকে নিয়ে কয়েকজন অনুগত নিষাদসহ হিমালয়ের কোলে শতদ্রু নদীতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় পর্ণকুটির রচনা করে বাস করতে থাকেন। পর্বতবাসী কিরাতরা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয় ও তাঁকে সংবর্ধিত করে। এখানে জাবালির কাজ হল মানসিক দিক থেকে নানান তত্ত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা, আর অবসর সময়ে শতদ্রু নদীতে মাছ ধরার মতো চিত্ত-বিনোদন প্রয়াস।

নানান গুজবের মধ্য দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে খবর আসে, জাবালি ইন্দ্রত্ব, বিষ্ণুত্ব বা এই রকম কোনো পরমপদ গ্রহণের জন্য তপস্যায় বসেছেন। ইন্দ্র এতে ভয় পেয়ে নারদের সঙ্গে নানা যুক্তির পর জাবালির ধ্যানভঙ্গের জন্য স্বর্গের বয়স্কা বারবনিতা নৃত্যপটীয়সী ঘৃতাচীকে পাঠায়। ইন্দ্রের আদেশ মতো বসন্তের উপযোগী পরিবেশ রচনারও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সে চেষ্টাতে ঘৃতাচী ব্যর্থ হয়। জাবালিপত্নী হিন্দ্রলিনীর ঈর্ষাকাতর ক্রোধের সম্মার্জনী প্রহারে ঘৃতাচী স্বর্গে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

ইন্দ্র শোনে যে জাবালি ইন্দ্রত্ব চান না, কিন্তু তিনি নানান দেবতাদের অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চান। এবার নারদের সঙ্গে যুক্তির পর নারদই বাকি ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাবালির বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য উত্তেজনা জাগায় ও উস্কানি দেয় এবং ব্রহ্মার কাছে গমন করে। এদিকে ব্রাহ্মণরা সভা ডেকে সেখানে বিচারের জন্য জাবালিকে আমন্ত্রণ জানায়। জাবালি যে নাস্তিক নন, এর পক্ষে কোনো যুক্তিই ব্রাহ্মণরা শেষ পর্যন্ত না মেনে তাঁর প্রতি

চরম শাস্তির জন্য 'বিশুদ্ধ চৈনিক হলাহল' জোর করে পান করায় এবং গভীর অরণ্যে ফেলে রেখে আসে। বনের মধ্যে এমন হলাহলের নেশায় জাবালির বাহ্যজ্ঞান লোপ পেলে জাবালি এক স্বপ্ন দেখেন।

সেই স্বপ্নের মধ্যে জাবালির একসময় ভয়ঙ্কর বিস্তারিত নরকদর্শন ঘটে। এমন নরকের মধ্যে খর্বট খল্লাট খালিত ইত্যাদি ব্রাহ্মণদেরও কুম্ভে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেন জাবালি। যমরাজের মতে, যেহেতু জাবালির যা কিছু দোষ-ত্রুটি তা তাঁর নিছক দুর্বলতাজাত এবং যেহেতু জাবালি কোনোদিন আত্মপ্রবঞ্চনা করেননি, তাই তাঁর লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা শরীর একটি গরম তৈলকুম্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। ঠিক এর পরেই স্বপ্নাচ্ছন্ন জাবালির স্ত্রীর কোলে শুয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্ন ছুটে যায়। দেখা দেন ব্রহ্মা। তিনি জাবালিকে বর দিতে চাইলে জাবালি নিতে নারাজ হন। ব্রহ্মা তাঁকে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে লোকে লোকে মানুষের মনকে সংসারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব দেন। শেষে এমন স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী জাবালি তা মেনে নেন।

'জাবালি' গল্পের এই যে কাহিনী ও ঘটনা-সম্বলিত প্লট-বৃত্ত, তা পরশুরামের সম্পূর্ণ নিজস্ব-কল্পিত। একথা বলার কারণ এই যে, পরশুরাম গল্পের মধ্যে একটি অভিনব রীতি গ্রহণ করেছেন। ইতিহাস বা পুরাণ নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস বা পুরাণ বিষয়ক গ্রন্থে লেখকরা কখনোই স্বতন্ত্রভাবে ইতিহাসের হুবহু বর্ণনা যোগ করেন না। ইতিহাস বা পুরাণকে কাহিনী ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেই রক্ত-মাংস-মজ্জার মতো মিলিয়ে রাখেন। পরশুরামের এই গল্পের প্রথমেই আছে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড থেকে জাবালি প্রসঙ্গের কিছু অংশ। সেই উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে 'জাবালি' গল্পের মূল প্লট-বৃত্তের যৌগিক যোগ ক্ষীণ। তাতে পৌরাণিক জাবালির আদি পরিচয় মেলে। যেহেতু তা লোক-কল্পিত আদৌ নয়, অথচ তা গল্পের প্রথমেই উপস্থাপিত, তাই 'জাবালি' গল্পটি প্রকরণ বিচারে দুটি ভাগে বিভক্ত। পরশুরাম বলেছেন—'জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।' সুতরাং যে জাবালিকে আমরা সমগ্র গল্পে পাই তিনি সম্পূর্ণত পুরাণবিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ লেখককল্পিত পুরাণরস-সমৃদ্ধ চরিত্রাভ্যন্তরের স্বভাব বিশ্লেষণে।

গল্পের প্লটে একে একে ঘটনা এসেছে এবং আমরা পরশুরামের গল্প রচনা-রীতির স্থির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলি, তাঁর গল্প চরিত্রের হাত ধরে চলে। যেহেতু গল্পে জাবালিই একমাত্র লক্ষ্য, তাই সমস্ত কাহিনী-সূত্র ও ঘটনা-সংঘটন জাবালিকে কেন্দ্রে রেখেই দেখা দিয়েছে। অযোধ্যায় খর্বট খল্লাট খালিতদের মতো ব্রাহ্মণদের জাবালির সূত্রে আগমন, পত্নীসহ জাবালির অযোধ্যা ত্যাগ, হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে তাঁর বসবাস, ঘৃতাচীর সঙ্গে আদর্শের সংঘাত, ব্রাহ্মণদের সভা ও জাবালির অচৈতন্য হয়ে স্বপ্নদর্শন, উপসংহারে ব্রহ্মার বরদান ইত্যাদি সমস্ত কাহিনী ও ঘটনা জাবালিকে জড়িয়েই প্লটের যথাযথতা দান করেছে। প্লটের কাঠামোর কাহিনী-ঘটনার এমন কঠিন বাঁধুনি জাবালি গল্পের শিল্পরূপকে নিশ্ছিদ্র শক্ত শরীর দিয়েছে। গল্পের গতি একমুখিন ও রুদ্ধশ্বাস।

'জাবালি' গল্পের 'মহামুহূর্ত' অংশ ঈষৎ বিস্তারিত। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের চরমক্ষণ যেমন মহাদেবরূপী কেবলানন্দের একটা কথায় উচ্চারিত, 'জাবালি'র তা নয়। জাবালি গল্পের এমন 'মহামুহূর্ত' রচিত হয়েছে নেশাগ্রস্ত জাবালির স্বপ্নের পরিকল্পনায়। কিন্তু পরশুরাম এমন স্বপ্নটিকে নরকদৃশ্যের বিস্তার-চিত্রে চমৎকার ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। স্বপ্নে জাবালি নরকে গেছেন। এখানেই গল্পের 'চরমক্ষণ' শুরু। তারপর গোটা স্বপ্নদৃশ্যটি লেখক নিপুণভাবে তৈরি করে পৌরাণিক অলৌকিকতার উপযোগী মানুষগুলির শাস্তির দিক দেখিয়েছেন। জাবালির যাবতীয় জিজ্ঞাসা এখানে বিস্ময়চকিত সংকটের সম্মুখীন এবং সবশেষে জাবালির বিচার ও নরকবাস এইরকম :

> 'এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবৃহৎ লৌহ সংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত তৈলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ছ্যাঁক করিয়া শব্দ হইল।'

চরমক্ষণের এমন শিল্পরূপ দক্ষ কৌতুকরসচিত্রী গল্পকার পরশুরামেব অভিনব কৌশল। স্ত্রী হিন্দ্রলিনীর কোলে শুয়ে জাবালির চৈতন্যলাভ ও ব্রম্মাদর্শন হল গল্পের উপসংহার। উপসংহার অংশে জাবালির সত্যসন্ধ চরিত্রের সিদ্ধান্ত। গল্পটির একেবারে প্রথমে আছে মূল গল্প-বহির্ভূত একটি অংশ। তা যেনবা জাবালির তথা গল্পেরই ভূমিকা। ক. এর উপস্থাপনায় মূল গল্পের রস ও পৌরাণিক চরিত্রের রসের তফাত সহজবোধ্য হয়। খ. জাবালিকে পৌরাণিক স্বভাবেই একালের উপযোগী একান্ত কাম্য মানুষ ভাবার সহায়ক হয়। গ. পুরাণের সহজ-সরল অথচ উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং আধুনিক গল্পের কৌতুক-ব্যঙ্গের সহাস্য লঘুতা—দুই স্বাদের স্বাতন্ত্র্যে একটি চরিত্রকে তথা লেখকের মনোভঙ্গির বোধগম্যতাকে নিশ্চিত করে দেয়। গল্পের ভূমিকা অংশটি যেনবা অনেকটা সংস্কৃত নাটকের 'নান্দী'র মতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাশ-ফেল' গল্পে মাত্র একটি ছোট বাক্যে এরকম এক ভূমিকা যোগ করে গল্পশিল্পের কাঠামোগত অভিনবত্ব সৃষ্টিতে প্রয়াসী থেকেছেন।

তিন

'জাবালি' গল্পের জাবালি পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব এবং সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ, প্রধান চরিত্র। সত্যসন্ধ জাবালির যে চরিত্রভিত্তি, গল্পে তা পুরাণেরই অনুগত। এই চরিত্রকে নিয়ে গল্পকার যে অফুরন্ত রসের উৎসার ঘটিয়েছেন, তাতে চরিত্রটির মূল ব্যক্তিত্বের ধর্মে কোনো বদল বা বিবর্তন নেই। তাই চরিত্রটি ফ্রেমে বাঁধানো পোর্ট্রেটই! প্রাচীন বেদ ও পুরাণে জাবালির বিচিত্র সব পরিচয় আছে। জাবালি বিশ্বামিত্রের সন্তান, অথর্ববেদের ব্যাখ্যাতা, সারা জীবন বশিষ্ঠের সঙ্গে জড়িত, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্যবহারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রম্মর্ষি। আবার অযোধ্যার রাজা দশরথের এক ব্যবহারদ্রষ্টা ও যাজক ব্রাম্মণ ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে জানানো হয়েছে জাবালা নামের এক রমণীর গর্ভজাত সন্তান মহর্ষি সত্যকাম নিজ গুরু গৌতম কর্তৃক জাবালি নামে অভিহিত হন। বিষ্ণুপুরাণে ব্যাস কাহিনীসূত্রে পথ্যের শিষ্য ছিলেন জাবালি। পদ্মপুরাণে জাবালি একজন মুনি এবং তাঁর সন্তানরাও জাবালি নামে পরিচিত হতেন। সেখানে জাবালি একজন কৃষ্ণের আরাধ্য মুনি। স্কন্দপুরাণে

জাবালি এমন একজন মুনি যাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র রম্ভাকে তাঁর কাছে পাঠালে তাঁর একটি কন্যা হয় এবং রাজা চিত্রাঙ্গদ তাকে চুরি করলে জাবালির শাপে চিত্রাঙ্গদ কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হয়।

জাবালির এমন সব কাহিনী থেকে পরশুরাম একমাত্র রামায়ণের জাবালিকেই গ্রহণ করেছেন। কারণ এতে জাবালির বিশ শতকের উপযোগী এবং একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জীবনতত্ত্ব ও যুক্তিনিষ্ঠা, স্বাবলম্বী মন, মুক্ত-মতিত্ব, যশোবিমুখতা তাঁর গল্পের মূল প্রতিপাদ্যের সহায়ক হয়েছে। গল্পে জাবালি কোনো কাহিনী ও ঘটনার স্রষ্টা নন, বরং তাঁর বিরোধী ব্রাহ্মণ ও দেবতারাই তাঁকে নিয়ে কাহিনীর এক সম্পূর্ণ রূপ নির্মাণ করেছে। জাবালি তাঁর অন্তঃস্বভাবে গল্পের আদিতে যা, অন্তেও তাই-ই। খর্বকায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাত, স্ত্রী হিন্দ্রলিনীর সঙ্গে সংসার-জীবন যাপন, ঘৃতাচীর প্রলোভনের মুখে তাঁর সুদৃঢ় সংলাপ-বিনিময়, ব্রাহ্মণদের সভায় তাঁর পর্যুদস্ত হওয়া ও বিষক্রিয়ায় অরণ্যমধ্যে অচৈতন্য হওয়া, শেষে নরকযন্ত্রণার অন্তে স্বপ্নভঙ্গে ব্রহ্মার বরদানের ঘটনাগুলি জাবালির চরিত্র-স্বরূপের থেকে গল্পকেই নির্মাণ ও গতিদান করেছে। জাবালির দুরূহ তত্ত্বের অনুসন্ধান আর মাছ ধরার চিত্ত-বিনোদন বৈপরীত্যে সূক্ষ্ম হাস্যরস আনে।

জাবালি গম্ভীর, স্থিরবুদ্ধি ঋষি, কিন্তু পরশুরাম তাঁকে দিয়ে চাপা বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রবাহ এনেছেন। ব্রাহ্মণদের 'জুজুগণ ও কর্ণকর্তকদের স্মরণ' করার কথা বলায়, হাতে ধরে তাদের একে একে উঠানের বাইরে নিক্ষেপ করার মধ্যে সেই হাস্যরস! পরশুরাম-সৃষ্ট জাবালি যখন ঘৃতাচীকে বলেন, 'তুমিও নিতান্ত খুকিটি নহে' বা 'যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্ত থাকিবে না।'—তখন জাবালির ব্যক্তিগত চরিত্রের কৌতুক রসবোধ ও সমগ্র গল্পের হাস্যরস চরিত্রটিকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। দক্ষকে 'ছাগমুণ্ড দক্ষ' সম্বোধনেও সেই শ্লেষ! ব্রাহ্মণরা জোর করে হলাহল পান করালে সম্পূর্ণ অচৈতন্য হওয়ার আগে প্রচণ্ড নেশার মধ্যেই ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে ভৃগুমামার সঙ্গে চুরি করে 'ফেনিল তালরস' অর্থাৎ তাড়ি খাওয়ার স্মৃতি ভেসে ওঠে। জাবালির এমন সব চিন্তা গল্পের চরিত্রটির মধ্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের উপযোগী উপাদান জোগায়।

গল্পের পরশুরাম অঙ্কিত জাবালি অবশ্যই serio-comic চরিত্র। তাঁর জীবন সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা পুরাণের মোড়কে বিশ শতকীয়, কিন্তু মৌল অর্থে গভীর-গম্ভীর-রসাত্মক। লেখক তাঁর মধ্যেও যে লঘুরসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাতে আদৌ সূক্ষ্ম শিল্পের বিচারে ভারসাম্যহীনতা নেই। জাবালি চরিত্র নিজে গল্পটির মধ্যে কোনো গল্প তৈরি করেননি, গল্পকার পরিকল্পিত প্লট-বৃত্ত তাঁকে কেন্দ্রে রেখে গল্পের পূর্ণতা এনেছে। এটি গল্পকার ভাবিত চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব। গল্পের আদিতে জাবালি, অন্তেও তিনি। ব্রহ্মার মুখ দিয়ে জাবালির প্রতি লেখক যে সংলাপ শুনিয়েছেন, তাতে আছে লেখকের জাবালি চরিত্র-সৃষ্টির উদ্দেশ্য :

> 'হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না। লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। ....তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানব মনকে সংসারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।'

পরশুরামের মতো একজন বিশুদ্ধ কৌতুকরসের ও ব্যঙ্গের গল্পকারের কাছে জাবালি এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় এবং সেই অর্থে জাবালি চরিত্রটি এক কৌতুক-ব্যঙ্গচিত্রীর সার্থক 'মিশন'।

জাবালি-পত্নী হিন্দ্রলিনীও 'জাবালি' গল্পের মধ্যে ছোট পরিসরে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বময়ী নারীচরিত্র হয়ে উঠেছে। পুরাণে হিন্দ্রলিনীর জাবালি-পত্নী হিসেবে স্বীকৃতি আছে। পরশুরামের হিন্দ্রলিনী এক বাঙালি দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মনস্তত্ত্বসম্মত বাস্তব নারী স্বভাবেই যথাযথ অঙ্কিত। সত্যসন্ধ, নীতিনিষ্ঠ, স্বাবলম্বী, মুক্তমতি, যশোবিমুখ, নিরীহ ব্রাহ্মণ স্বামীকে নিঃসন্তান হিন্দ্রলিনী ঠিকমতো বুঝতে পারে না, বুঝতেও চায়নি। স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নেই, পরলোকে পিণ্ডের ভাবনা নেই, কারো সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে জানেন না, জপ-তপ নেই, সকলকেই চটিয়ে দেন তর্কে। এইসব ভাবনায় এক রাতের ভোজ্য তৈরি করতে করতে তাঁর ভাবনা :

'স্বামী যদি মানুষের মত মানুষ হইতেন তাহা হইলে হিন্দ্রলিনীর অত ক্ষেদ থাকিত না।' শেষে সিদ্ধান্ত করেন সাধারণ স্ত্রীর মতোই—'আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটু বাক্য শোনাইবেন।' সময় বুঝে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্বামীর অপমানে, অসম্মানে তাঁদের খেদিয়ে দেবার যুক্তি দেন। সবটাই বাস্তব জ্ঞান-সম্পন্না এক স্ত্রীর ব্যবহার! ঘৃতাচী তাঁর স্বামীকে বশ করার জন্য দ্বিতীয়বার নৃত্য শুরু করলে আড়ালে থেকে তা দেখে ঘৃতাচীকে সজোরে ঝাঁটাপেটা করতে তিনি নির্দ্বিধ। রেগে ঘৃতাচীকে বলেন :

> 'হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে খেঁচী, তোর আস্পর্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস!'

বাস্তবে সব স্ত্রীই তাদের স্বামীকে বোকা ভাবে, আর অন্য যে কোনও রমণীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। হিন্দ্রলিনীর স্বামীকে এমন মায়াবিনী রমণীর সঙ্গে 'বিজনে বিশ্রম্ভালাপ' করার জন্য কথা শোনান। অতি সাধারণ রমণীদের মতো ঈর্ষা, ক্রোধ, সে কারণে সক্রিয়তা, স্বামী-সন্দেহ, স্বামীর জন্য দুঃখ ইত্যাদি দিয়ে পৌরাণিক রমণীকে বাস্তব করেছেন পরশুরাম। কিন্তু হিন্দ্রলিনীর চরিত্রটির বড় গুণ তিনি পরশুরামের গল্পের প্রধান লক্ষ্য যে বিশুদ্ধ কৌতুকরস-সৃষ্টি—তার পরিবেশনে অসাধারণ শিল্পক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র গল্পের হিন্দ্রলিনীই একমাত্র বাস্তব এবং ছোট পরিসরে বিবর্তিত চরিত্র।

ঘৃতাচী আর একটি সার্থক পৌরাণিক পরিচ্ছদে বাস্তব চরিত্র। পরশুরাম সুকৌশলে ঘৃতাচীকে এখানে ব্যবহার করেছেন। পুরাণে ঘৃতাচীর একাধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ আছে। মহাভারত মতে ঘৃতাচী ছজন শ্রেষ্ঠ অপ্সরার মধ্যে একজন। বহু ঋষির তপস্যা নষ্ট করে ঘৃতাচী হয় বহু সন্তানের জননী। বিশ্বকর্মার ঔরসে তার মেয়ে হয় চিত্রাঙ্গদা। বেদ বিভাগকর্তা ব্যাসদেব ঘৃতাচী দর্শনে কামার্ত হয়ে অগ্নিতে বীর্যত্যাগে অগ্নির মতো শুকদেবের জন্ম দেন। চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতিও ঘৃতাচীর গর্ভে রুরুর জন্ম দেন। মহারাজ কুন্দের পুত্র কুশনাভের ঘৃতাচীর গর্ভে একশত কন্যা জন্ম নেয়। ভরদ্বাজ মুনিও স্নানরতা ঘৃতাচীকে দেখে দ্রোণী নামে এক ধরনের পাত্রে বীর্যপাত ঘটিয়ে রণগুরু দ্রোণাচার্যের জন্ম দেন। কুবেরের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জন্ম হয় কন্যা চিত্রার।

এমন এক রমণী ঘৃতাচীকে পরশুরাম গল্পে বেছেছেন জাবালির মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর জন্য। কারণ জাবালি যে ধরনের মানুষ, তাতে এক শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে না আনলে চরিত্রন্যায় প্রতিষ্ঠায় অসুবিধে থাকে। গল্পে লেখক ঘৃতাচীকে করেছেন মধ্যবয়সী। তার সঙ্গে জাবালির যে সংলাপ-বিনিময়, তার মধ্যে আছে সফল ব্যঙ্গচিত্রী পরশুরামের নির্ভুল উদ্দেশ্য-সাধন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এরকম একটি চরিত্র এঁকে লেখক এদেশীয় উচ্চশ্রেণীর 'সোসাইটি গার্ল'দের পথিকৃৎ-চরিত্র উপহার দিয়েছেন। ঘৃতাচীর স্বভাব ও সংলাপ রচনায় আমরা উচ্চহাস্য হয়ে উঠি। জাবালিকে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ঘৃতাচী সবশেযে জানায় :

> '''এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালি গুড়দ্রোণী—সকলই তোমার। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে—নাঃ থাক।' এই বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নিচু করিলেন।'''

এই চিত্রে এক মধ্যবয়সী সুন্দরী রমণীর যে পরিচয়—তা আমাদের কৌতুকরসকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে অবলীলায়। আবার ঘৃতাচী যখন জাবালিকে যুক্তি দেয় তাঁর 'নিশ্চয়ই লোলাঙ্গি বিগত যৌবনা' স্ত্রীকে বারাণসী পাঠিয়ে—তাঁকেই দেখার, কারণ সে 'চিরযৌবনা নিটোলা নিখুঁতা। উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছটফট করে।'— তখন জাবালির সহাস্য উক্তিগুলি ঘৃতাচীর পৌরাণিক অবয়বের অন্তরালে একালের বিশ শতকের বয়স্কা 'সোসাইটি গার্ল'দের নাইট ক্লাব ইত্যাদি জায়গার লজ্জাহীন 'ককেটিজম্' কে Pointing finger-চিহ্নিত করেন গল্পকার। জাবালি বলেন :

> 'তুমি নিতান্ত খুকিটি নহ। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপঙ্‌ক্তিতে ও কিসের ফাঁক?'

তার উত্তরে ঘৃতাচীর নিজের রূপ সম্পর্কে সাফাই গাওয়া—'আগে সকাল হোক, আমি দুধের সর মাখিয়া স্নান করি, তখন দেখিও, মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে।' এসবে আছে বিশ শতকীয় আধুনিক শিক্ষিতা ছলনাময়ী রমণীদের দেহ-বিলাসের কৃত্রিমতার প্রতি কটাক্ষ। বস্তুত 'জাবালি' গল্পে ঘৃতাচী চরিত্র পরশুরামের এক মৌলিক সৃষ্টি—যে পৌরাণিক বেশবাস ত্যাগ করে একেবারে আমাদের সমাজের কৃত্রিম দেহ-সচেতন বিলাসিনীর তথাকথিত সভ্য রমণীদের স্বরূপ দেখায়। আসলে ঘৃতাচী এক ব্যঙ্গ রসাত্মক চরিত্র, যে তার স্বভাবে, সক্রিয়তায় ও সংলাপে গল্পটির মধ্যে অসামান্য কৌতুক ও ব্যঙ্গরসের এক ভিয়েন চাপায়। গল্পের প্লট-বৃত্তে ঘৃতাচী চরিত্র শিল্পমাপের একান্তই যথাযথ ও প্রয়োজনীয়।

'জাবালি' গল্পের খর্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা গোষ্ঠীগতভাবে কৌতুক ও শ্লেষের লক্ষ্য হয়েছে, তাদের সমবেত স্বভাব ও ক্রিয়াকর্ম কাহিনী ও হাস্যরসের যথাক্রমে স্বাভাবিক গতি ও স্রোত সৃষ্টি করে।

চার

'জাবালি' গল্পের হাস্যরসে একই সঙ্গে আছে বিশুদ্ধ কৌতুকরস, শ্লেষ ও ব্যঙ্গ। গল্পটিতে হাস্যরসের প্রবাহ কয়েকটি সূত্রে লক্ষ্য করার মতো। ক. গল্পকারের সাধু গদ্যে

নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি, খ. কাহিনী ও ঘটনার যৌথ রূপ-রচনা, গ. সিচুয়েশন সৃষ্টি, ঘ. সংলাপও সাধুগদ্যের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য, ঙ. পুরাণের চরিত্র চিত্রণ।

প্রথমত, গল্পটির লেখককৃত বর্ণনামূলক নাট্যরীতির গদ্যে যে হাস্যরস নিহিত আছে, তা অর্ধতৎসম, একেবারে মৌলিক শব্দ ব্যবহারেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং subtle।

ক. 'ছোকরার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর' (শব্দপ্রয়োগে)

খ. 'প্রাঙ্গণ বেষ্টনীর পরপারে ঝুপঝুপ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। (চলতি ধ্বন্যাত্মক শব্দে)

গ. 'তাহাকে দেখিলে শূকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে (উপমা প্রয়োগে)

ঘ. 'অন্তর্যামী দেবতাগণেরও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয়' (স্বভাব বর্ণনায়)

ঙ. 'সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া...' (শব্দপ্রয়োগে)

চ. 'ধীমান জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট্ করিয়া হৃদয়ংগম করিলেন (শব্দ ব্যবহারে)

ছ. 'কৃতান্ত জাবালিকে...একটি তপ্ত তেলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ....ছ্যাঁক করিয়া শব্দ হইল। (ধ্বন্যাত্মক চলতি লোক-প্রচলিত শব্দপ্রয়োগে)

দ্বিতীয়ত, কাহিনীর মধ্যে খর্বর খল্লাট ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের সক্রিয়তা সৃষ্টি, ঘৃতাচীর প্রসঙ্গ, জাবালির অচৈতন্য হওয়া ও স্বপ্নে নরকদর্শন—এমন সব কাহিনী-গ্রন্থন ও ঘটনার যোগে অন্তঃশীল আছে কৌতুকরস।

তৃতীয়ত, পরশুরাম হাস্যকর সব সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছেন গল্পে। বামন হওয়ায় জাবালির প্রাঙ্গণের অলিন্দে ব্রাহ্মণদের বসতে না-পারা, ঘৃতাচীর পিঠে ঝাঁটা প্রয়োগ, নরকে ব্রাহ্মণদের প্রবেশ ও শাস্তিপ্রদান হাস্যরসের অভিনব স্বাদ দেয় পাঠকদের।

চতুর্থত, পরশুরাম রচিত সাধুরীতির সংলাপগুলি হাস্যরস সৃষ্টির পক্ষে অনবদ্য। সংলাপে বৈপরীত্য আছে, অসঙ্গতি আছে, শ্লেষ ও ব্যঙ্গ আছে। পরশুরাম বুদ্ধিমার্জিত সংলাপ রচনায় একান্ত অভ্যস্ত। সংলাপের যথাযথ হাস্যরসসিদ্ধ প্রয়োগে তিনি একজন বিশ্বকর্মার মতো শিল্পী। এ প্রসঙ্গে জাবালি, হিন্দ্রলিনী, ঘৃতাচী, যমরাজ ইত্যাদির সংলাপে তার প্রমাণ মেলে।

পঞ্চমত, 'জাবালি' গল্পের চরিত্রনির্মাণ সর্বতোভাবে হাস্যরসের অন্তর্গত। পরশুরাম যে নিজের মতো নতুন করে জাবালি ও তৎ-সংক্রান্ত চরিত্রনির্মাণ করেছেন, গল্পের প্রথমেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঘৃতাচী চরিত্র, হিন্দ্রলিনীর চরিত্র তার সার্থক প্রমাণ। ইন্দ্র, নারদ, ব্রহ্মা—এইসব দেবতা চরিত্রেও লেখক দেবচরিত্রের পুরাণ-স্বভাবের মধ্যে মর্ত মানুষের উপযোগী বিপরীত বৈশিষ্ট্য যোগ করে হাস্যরসের যথোচিত প্রমাণ রেখেছেন।

'জাবালি' গল্পের কৌতুক-ব্যঙ্গে আছে পুরাণ-বহির্ভূত বিশ শতকীয় সমাজ-অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস। পরশুরামের লক্ষ্য একাল, পোশাকে আছে পুরাণের বৈশিষ্ট্য।

যেহেতু বিশ শতকীয় সভ্য মানুষ ও সমাজ গল্পকারের মূল লক্ষ্য, তাই এ গল্পের হাস্যরস হয়েছে আধুনিক, সচল ও শুভ্রদীপ্ত। বের্গসঁ যাঁকে বলেছেন Intellectual laughter, জাবালি গল্পের শরীর ও অভ্যন্তরে তার পরিচয় মেলে। পরশুরাম নাগরিক মনস্কতার ব্যঙ্গচিত্রী। তাই তাঁর কৌতুকরস লঙ্কার জ্বালা আনে না, লঙ্কার ঝাল মেশানো মিষ্টি চাটনির স্বাদ দেয়। এ স্বাদ পরশুরামের বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত দৃষ্টির সমর্থক।

জাবালি চরিত্রের যে অন্তর্নিহিত বক্তব্য, তা-ই গল্পকারের 'মিশন', বলা যায় attitude to life 'তিনি বিশ শতকীয় প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর নগরজীবন-কেন্দ্রিক ব্যক্তিক ও সামাজিক অসঙ্গতিতে, অমানবিক স্বভাবে বিব্রত, বিরক্ত, প্রহরীর মতো সতর্ক। তাই জাবালির মতো চরিত্রকেই একালের সত্য মনে করেছেন। গল্পে তাঁকে তাঁর স্বভাবের অনুকূল মর্যাদা দিয়েই লঘুরসের বন্যা বহিয়ে দিয়েছেন। গল্পের শেষে সমস্ত হাস্যরসের উপশম হয়েছে চরিত্রের শুভশ্রী প্রতিষ্ঠায়। তাই জাবালির যাবতীয় কৌতুকরসের অন্তে লেখক-লক্ষ্যের অনুগ শান্তরসের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। গল্পের 'জাবালি' অবশ্যই একটি সার্থক পুরাণ-পরিবেশ নির্ভর Serio-comic গল্প।

পাঁচ

'জাবালি' গল্পের নাম কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র ধরেই চিহ্নিত। সমগ্র গল্পের কাহিনী-কাঠামো জাবালিকে ঘিরেই নির্মিত। জাবালির জীবনভাবনার লক্ষ্য সমগ্র গল্পের যেমন, তেমনি গল্পকারেরও। গল্পের উপসংহারে, জাবালি গল্পের মধ্যে আগে যা ছিলেন—তা নিয়েই স্থিত। গল্পের কোনো গৌণ চরিত্র, বা গোষ্ঠী চরিত্র জাবালির সংস্রববিহীন নয়। জাবালির জীবনদর্শনই গল্পকারের গল্পের চরম রূপে কাম্য। সুতরাং গল্পের 'জাবালি' এমন নামে শিল্পের ও কাহিনী-বৃত্তের এবং চরিত্র-ধর্মের দিক থেকে কোনো আপত্তি থাকে না।

দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা এমন নামের স্বপক্ষে রাখা যায়। গল্পের প্রথমে আছে মূল রামায়ণের বাংলা অনুবাদে জাবালির পৌরাণিক রূপের পরিচয়। পরে পরশুরাম নতুন করে জাবালিকে রচনা করেছেন। পরশুরামের ভাষায়, 'জাবালির কথা রামায়ণে...যাহা নাই তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।' গল্পে জাবালি কি মূল রামায়ণ থেকে নতুন?—এরকম একটা জিজ্ঞাসা সহৃদয় পাঠকমনে তৈরি হতেই পারে! উত্তর ইতিবাচক হবেই। অর্থাৎ পরশুরামের জাবালি নতুন এই জাবালি প্রাচীন পুরাণসম্মত গম্ভীর, অথচ আধুনিক জীবনসম্মত লঘুরসে স্নাত। তাঁর সমগ্র ক্রিয়াকর্ম রামকেন্দ্রিক নয়। জাবালি স্বভাবে পৌরাণিক, কিন্তু বিশ শতকের তাৎপর্যে অবশ্যই নতুন। এই জাবালির প্রয়োজন বিশ শতকেই। সুতরাং, মূল রামায়ণের জাবালি ও পরশুরামের জাবালি স্বভাবে কিছু পরিবর্তিত। কিন্তু সে বদল দুই জাবালির স্বভাবকে পরিবর্তিত করেনি। তাই গল্পের 'জাবালি' এমন নামের ব্যাপারে পরশুরাম একই নাম ব্যবহার করে পাঠকের ঔৎসুক্য ও নব সৃষ্টির বিস্ময়কে জাগ্রত করতে উৎসাহী থেকেছেন।

তৃতীয় একটি শিল্প-সূত্র এমন নামের ব্যাখ্যায় রাখা যায়। ঘৃতাচীকে জাবালির কাছে পাঠানোর ব্যাপারে ইন্দ্র স্থিতবুদ্ধি হলে পরশুরাম গল্পে লিখছেন—'সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালি বিজয়ে যাত্রা করিলেন।' এমন 'জাবালি বিজয়ে'র বিষয়টি শুধু ঘৃতাচীর কেন, সমস্ত অঙ্কিত গোষ্ঠী চরিত্রেরই মূল লক্ষ্য। খর্বট, খালিত, খল্লাট ব্রাহ্মণরা জাবালিকে শাস্তি দিতে চেয়েছে, জাবালিকে নিজেদের অনুগত করতে ও সামলাতে চেয়েছে স্বর্গের দেবতারা। আবার নৈমিষারণ্যে সভা ডেকে জাবালিকে জোর করে শাস্তি দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়েছে ব্রাহ্মণকুল। স্বপ্নের মধ্যে জাবালির নরকবাসের অলৌকিক তত্ত্বে মূলত তাঁর শাস্তিরই ব্যবস্থা। সুতরাং গল্পের নাম 'জাবালি বিজয়' হলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু পরশুরাম সেইরকম কোনো নামের কথাও ভাবেননি। নাম হয়েছে শুধু 'জাবালি'। অর্থাৎ পরশুরাম-সৃষ্ট ও কল্পিত জাবালির নতুন সক্রিয়তা সমস্ত কিছুর মধ্যে জাবালির ব্যক্তিত্বকেই বড় করে রাখে। তাই 'জাবালি' নামটি গল্পের পক্ষে এবং চরিত্রের লক্ষ্যের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত শিল্প-সিদ্ধান্ত।

৫.

দক্ষিণ রায়

এক

'দক্ষিণ রায়' গল্পটি পরশুরামের 'কজ্জলী'র অন্তর্গত এক অভিনব রীতির রূপকাশ্রয়ী চরিত্রাত্মক গল্প। 'কজ্জলী'র গল্প-গ্রন্থের প্রথম গল্প 'বিরিঞ্চিবাবা'য় কোনো রূপক নেই, সেখানে আছে কৌতুক-শ্লেষের লক্ষ্য একেবারে সোজাসুজি বাস্তব ভূমির মানুষ, লেখকের কলমে বিশ শতকীয় গুরুবাদের লক্ষ্যে তাঁর কৌতুকশিল্পের অতিরিক্ততায় যাবতীয় শিল্প-মূল্যায়ন। পরবর্তী 'জাবালি'তে পরশুরাম অলৌকিকতার রসশূন্য পৌরাণিক ঋষি-ব্যক্তিত্বকে নিয়েছেন—যেখানে কৌতুকরসের সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ। 'দক্ষিণ রায়' গল্পের লক্ষ্য সমকালের নাগরিক জীবনের স্বার্থসর্বস্ব, লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মুখোশ-উন্মোচন। এখানে কৌতুকরসের সঙ্গে ব্যঙ্গের মিশেলে আর এক স্বাদ। বিশেষ অঞ্চলের লোককথার সঙ্গে যুক্ত লোকদেবতাকে রূপকমাত্র করে দেশীয় ধনলোভী, সংকীর্ণ-চিত্ত মানুষদের বস্তুগত জীবনস্বরূপকে গল্পকার অবলীলায় এঁকেছেন।

বস্তুত সমকালকে পরশুরাম কোনো গল্পেই বিস্মৃত হননি। তৃতীয় দশকে লেখা গল্পগুলিতে আছে সেই সচেতনা—যা দেশীয় স্বার্থান্বেষী, উচ্চশ্রেণীর মানুষের সমাজভিত্তি ও যাবতীয় সক্রিয়তার নির্দেশক। 'দক্ষিণ রায়' গল্পটি লেখার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলি ও বিদেশি শাসনকর্তাদের রাজ্যশাসনজনিত গঠিত সরকার—দুয়ের সম্পর্কে আছে নানা নিষ্ফল আদানপ্রদান। দেশপ্রেমের নামে দেশভাবনা-শূন্য ভ্রষ্টতা, স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস নিরাবরণ হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভ্যালারে নন্দলাল'রা নানা বেশে তখন দেশীয় রাজনীতি, দেশপ্রেম ও অর্থনীতিকে টীকাভাষ্যে ধরতে উৎসাহী। বিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক শাসক-বিরোধী দেশচেতনা ও আবেগের

নির্মোকে দেশপ্রেম নিছক আবেগসর্বস্ব নয়, তা রাজনীতির কূট বিচারণা ও কৌশলের সঙ্গে গভীর-নিবিড় যুক্ত। দেশপ্রেম আর ঔপনিবেশিক শাসককুলের সরকারি নীতি-নির্দেশ একত্র হয়ে মানুষকে অভিনব দেশ ভাবনায় সে সময়ে সবিশেষ প্রাণিত করে। একজন ব্যঙ্গচিত্রীর কাছে এমন দুটি সম্পর্ক মানব সম্পর্কের অসঙ্গতিতে শিল্পীর তৃতীয় নয়নের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। 'দক্ষিণ রায়' গল্পে তাই পরশুরাম অতি সচেতন বস্তুতান্ত্রিক শিল্পী।

গল্পটির আঙ্গিকের অভিনবত্ব, চরিত্রের অন্তর্নিহিত হাস্যরসের বিষয় আমাদের পরে আলোচ্য, কিন্তু গল্পটির কাহিনী, ঘটনা-সজ্জা ও কেন্দ্রীয় বিষয় গতানুগতিক গল্প রচনার পথ পরিহার করে অভিনব অবয়বে পাঠকদের টানে। চরিত্রই এ গল্পের কাহিনী ও ঘটনার একমাত্র আধার। 'জাবালি' গল্পে ঋষি জাবালি গল্পকারের কলমে কোনো নিজস্ব তৎপরতা দেখাননি, গৌণ চরিত্ররাই লেখকের সিচুয়েশন সৃষ্টির কৌশলে জাবালিকে গতিময়তার স্বাভাবিকতায় কেন্দ্রে বসিয়ে দিয়েছে। 'দক্ষিণ রায়' গল্পের নায়ক বকুলাল দত্তই গল্পের বৈঠকখানার পরিবেশে অন্যতম আড্ডাদার এবং গল্পের একমাত্র কথক চাটুজ্যে মশাইকে দিয়ে কাহিনী ও ঘটনাকে এবং সিচুয়েশন সৃষ্টিকে শিল্পের ন্যায়ে সূত্রবদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

'দক্ষিণ রায়' গল্পের মজলিশি সূত্রপাত শহর কলকাতার বনেদি মানুষ বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা থেকে। প্রধানত নাগরিক জীবনের পটভূমিতেই এক মেসে গল্পের নায়ক বকুলাল দত্তের বাস। তার পরিবার থাকে গ্রামে। গল্পে নগর জীবন ছেড়ে একবার সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গে তার যোগ ঘটে। বকুলালের এক ক্লাসের বন্ধু রামজাদু এবং এককালে নিজের গরিবি অবস্থার মধ্যে রামজাদুর অ্যাটর্নি অফিসে আশি টাকার মাহিনায় সে ছিল একজন চাকুরে। বকুবাবুর ঈষৎ হাতটানের স্বভাব কড়া লোক রামজাদুবাবুর নজরে এলে বন্ধু-মালিকের কাছে বকুলাল অপমানিত হয়, চাকরিতে নিজে থেকেই ইস্তফা দিয়ে বেকারত্ব গ্রহণ করে। রাগের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে বকুলাল প্রচণ্ড আক্রোশে রামজাদুর ওপর যে কোনো এক সময়ে প্রতিশোধ নেওয়ার একটি মানসিক সিদ্ধান্ত করে রাখে।

কলকাতার এক মেসের বাসিন্দা বকুলাল ভাগ্যের ফেরে এক সময়ে স্বর্গত পিসতুতো ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তির অধিকার পেয়ে বড়লোক হয়ে গেল। এমন প্রাপ্তিযোগ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আগের ঘটনা। সেই টাকায় বকুলাল ব্যবসা করে এবং যুদ্ধ বাধলে সেই ব্যবসা তার অর্থ যত বাড়ায়, বুদ্ধিকে করে তত খাটো। আর এই বুদ্ধিতেই সে নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি কাউন্সিলে ঢুকতে চায়, তার জন্যে ঘুষের অর্থ খরচেও বেপরোয়া। একসময়ে এইসব ঘুষের মধ্যে না গিয়ে নিজেই ঠিক করে সাউথ-সুন্দরবন কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে ভোটে দাঁড়াবে। ওখানে ওর কিছু কেনা জমিদারি আছে। তাতে ভোট পাওয়ার সুবিধে। কিন্তু ওখানে তার পুরনো শত্রু রামজাদু দাঁড়াচ্ছে এই খবর পেয়েই বকুলালের পুরনো আক্রোশ দ্বিগুণিত হয়। কোনো রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার বা

দেশের মঙ্গলের জন্য নয়, বকুবাবুর ভোটে দাঁড়ানোর একমাত্র কারণ রামজাদুকে জব্দ করে পুরনো সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া! বকুলালের উন্মাদের মতো নিজ দেবতা-স্মরণের মধ্যে দৈবক্রমে শ্রীরামগিধড় শর্মার সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। এই রামগিধড় শর্মা সুন্দরবনের বাঘের দেবতা বাবা দক্ষিণ রায়ের ব্যাঘ্রপার্টির অন্যতম প্রতিনিধি-সদস্য। তারই যুক্তিতে বকুলাল একসময়ে সদস্য হয়ে সুন্দরবনে আসে দক্ষিণ রায়ের আশীর্বাদ নিতে। বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় বকুলালের হিংস্র স্বভাবের কারণ, লক্ষ্য—সব জেনে নিয়ে তাকে ব্যাঘ্রের অবয়বে রূপান্তরিত করে নেয়। ব্যাঘ্ররূপী বকুলালের তখন শত্রুদের মাংসই একমাত্র খাদ্য। গল্পের শেষে তার বার্ধক্যের বাসস্থান হয় আলিপুরের চিড়িয়াখানায়।

পরশুরামের এমন গল্পের শেষ সম্পূর্ণ লোককাহিনী নির্ভর এক দেবতার সক্রিয়তার সূত্র ধরে fantasyতে। 'দক্ষিণ রায়' গল্পটির কাহিনী ও ঘটনা মিলে, সিচুয়েশনের কুশলী অবতারণায় যে প্লট-বৃত্ত, তার জটিলতা তৈরি হয়েছে গল্পের কথক চাটুজ্যেমশাইয়ের গল্প বলার টেকনিকে। গল্পের লক্ষ্য নিশ্চয়ই বকুলাল, কিন্তু বকুলাল কথকেরই বর্ণনায় নির্মিত। পরশুরাম এমন কথকের ওপরেই বকুলালের বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পরিণতিকে শিল্প-স্বভাব দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। চাটুজ্যেমশায় লেখক নয়, লেখকের সৃষ্ট একটি বৈঠকী গল্প-বলিয়ের চরিত্র। 'দক্ষিণ রায়' গল্পটির মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এর প্লট-বৃত্ত গভীর জড়িত।

গল্পের একেবারে প্রথমেই চাটুজ্যেমশায় ও বিনোদ উকিলের দুটি সংলাপ-বিনিময়ের মধ্যে এর মূল লক্ষ্য ধরা পড়ে। 'কেবল সাহেব ধরে ধরে খাব' এমন রুদ্রপ্রয়াগের এক বাঘের কথার প্রস্তাব দেয় চাটুজ্যেমশায়, আর তার সূত্রেই বিনোদ উকিল বলে:

> 'খাসা বাঘ তো। এখানে গোটা কতক আনা যায় না? চটপট স্বরাজ হয়ে যেত,—স্বদেশী, বোমা, চরকা, কাউন্সিল ভাঙা, কিছুই দরকার হত না।'

এমন শুরু ব্যঞ্জনায় বুঝিয়ে দেয়, এ গল্পের মূলে সমকালীন বৃটিশ রাজনীতি ও দেশীয় 'মোটিভ'ই সক্রিয় হবে। পাঠকদের কাম্যও তা-ই। কিন্তু পরশুরাম গল্পের মধ্যে নিয়ে এসেছেন এমন এক বকুলাল দত্তের কাহিনী, যে রাজনীতি, দেশপ্রেম বোঝে না, বোঝে স্বার্থপরতা ও নিদারুণ আক্রোশজনিত হিংসা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার দিকগুলি। এই প্রতিহিংসা মেটাতেই পরশুরাম এনেছেন সুন্দরবন অঞ্চল, ভোটের রাজনীতি প্রসঙ্গ, অবশ্যই সাহেব, স্বরাজ—এসব নয়, দুই বাঙালি দেশীয় সুবিধাবাদী বন্ধুর সংকীর্ণ স্বার্থসর্বস্ব ও অর্থবাসনায় কাঙাল মানসিকতার নিম্নস্তরের সংঘর্ষ। গল্পের উপস্থাপনার সঙ্গে কাহিনী-লক্ষ্যের ঘটেছে বৈষম্য।

আবার পরশুরাম গল্পের শেষে বকুলালের পরিণতি দেখাতে গিয়ে এত নির্মম হয়েছেন যে দক্ষিণ রায়ের allusion দিয়ে বাস্তব বকুলালকে এক fantasy-র চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। যদিও তা রূপক এবং রূপকের অন্তরালে আছে মানুষের শয়তান শ্বাপদ-সুলভ জঘন্য হিংস্রবৃত্তি, আছে ঘুষখোর, উচ্চাভিলাষী, চরম স্বার্থপর, একেবারেই নীতিহীন এক ঘৃণ্য মানুষের রক্তমাংসের শরীর ও স্বরূপ, তাই আপাতদৃষ্টিতে গল্পের শেষের এমন 'ফ্যান্টাসি' শিল্পের মান পেয়ে যায়।

কিন্তু কাহিনী ও ঘটনার মিশেলে, সিচুয়েশনের তাৎপর্যে যে প্লটের নিখুঁত অবয়ব, তা আর থাকে না। একটি সমকালীন দেশীয় পরিবেশে একটি বিশেষ চরিত্রের শ্রেণীরূপ আঁকতে গিয়ে কাহিনী ও ঘটনার কঙ্কালে ব্যক্তিতেই তাঁর বক্তব্যকে নিবিষ্ট করে ফেলেছেন, তা থেকে ব্যঙ্গচিত্রীর বড় জায়গায় যেতে পারেননি। দক্ষিণ রায়ও ব্যঙ্গচিত্রীর হাতে নীতিবাগীশ দেবতাতেই স্থির থেকে গেছে। গল্পে নির্দিষ্ট নীতি ও নীতিহীনের প্রতি নির্মমতায় পরশুরাম একটি সীমাতেই নিজেকে সীমিত করেছেন।

কাহিনী বয়নে আর একটি দিক লক্ষরীয়। গল্পের উপস্থাপনা অংশেও অনেকটা জায়গা দখল করে আছে কলকাতা শহর। বকুলাল শহরের মানুষ, তার যাবতীয় অবস্থার যে উন্নয়ন, তা কলকাতাতেই। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে যুক্ত সুন্দরবনের কাহিনী ছোট। লেখক নায়ককে সুন্দরবনে নিয়ে গিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছেন। এমন ছককাটা (Schematic) প্রয়াসে গল্পের স্বাভাবিকতার কিছু ঘাটতি থেকে গেছে। চাটুজ্যেমশায়ের গল্পের আবহাওয়া ও পরিবেশ-বিস্তার নিয়েছে অনেকটা জায়গা, হয়তো বা কিছুটা অবান্তর, অতিকথনে মন্থরও! যদিও সে সব অংশ হাস্যরসে আকর্ষণীয়, সুন্দর, তবু নিখুঁত ছোটগল্পের সংযত মাপে তা যেন গল্পের শরীরকে ঢিলেঢালা করে দেয়। চাটুজ্যেমশায়ের মুখ দিয়ে এমন গল্প বলার কারণও এই সীমাবদ্ধতার আর এক কারণ। বকুলাল চরিত্রের ক্রমিক প্রকাশ-ধর্মেই গল্পটির গতি। কিন্তু তা গল্পের কথকের ওপর নির্ভর করায় বিবৃতিধর্ম গল্পের ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপের বিনাশ ঘটিয়েছে কিছুটা। প্রয়োজনহীন কিছুটা অতিবিস্তার গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রনির্ভর ভাবটির কেন্দ্রে ঘা মারে।

'দক্ষিণ রায়' গল্পের প্লট-বৃত্তের 'চরমক্ষণ' একটি বাক্যে রাখেননি পরশুরাম—যা আছে পূর্ববর্তী 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের মধ্যে। এ গল্পের 'চরমক্ষণ' শুরু দক্ষিণ রায়ের ক্রিয়া দিয়ে :

> 'বাবা দক্ষিণ রায় তাঁর ল্যাজটি চট্‌ করে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন।
>
> বাবা বললেন—যাও বৎস, এখন চরে খাও গে।'

বস্তুত এখানেই 'চরমক্ষণ' অংশ শেষ হতে পারত। কিন্তু লেখক 'চরমক্ষণ'টিকে আর একটু বিস্তারিত করেছেন বাবার উপযুক্ত শিষ্য রামগিধড়ের প্রতিক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগে :

> 'বকুলাল নড়েন না, কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামগিধড় ঘ্যাঁক করে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।'

ব্যঙ্গচিত্রী পরশুরাম যেন নিরাসক্ত নন, বকুলালের মতো মানুষটির প্রতি ঘৃণা ও অনেক বেশি নির্মম কঠিন হওযার কারণেই এমন শেষ চিত্রটি এঁকে গল্পটির 'মহামুহূর্ত'কে বিস্তারিত করতে আনন্দ পেয়েছেন। এর পরেই বৃদ্ধ ব্যাঘ্ররূপী বকুলালকে আলিপুরে পাঠানোর মধ্যে স্বাভাবিক উপসংহার টেনেছেন। আমাদের মনে হয়, প্লটের দুর্নিবার কারণেই একজন প্রতিষ্ঠিত সমালোচকের মতেও, এই গল্পে পরশুরামের হাস্যরস 'সম্ভাব্যতার গণ্ডী' অতিক্রম করে শীর্ণ নির্জীব হয়ে নিষ্ফলতার মধ্যে গল্পের স্রোতোবেগকে হারিয়ে ফেলেছে।

'দক্ষিণ রায়' গল্পের কাহিনী ও ঘটনা-নির্ভর প্লটে কোনো কোনো 'সিচুয়েশন', বাগভঙ্গিমা তুলনায় বেশ কিছু দূরত্বে থাকলেও, পূর্বসূরি ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভট কল্পনার রঙ্গ-ব্যঙ্গের মেজাজ আনে। পরশুরামের আগে 'ডমরুধরচরিতে' ত্রৈলোক্যনাথ বাঘের গল্প ফেঁদেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের বাঘ রঙ্গকৌতুকের, পরশুরামের বাঘ ব্যঙ্গের। 'ডমরুচরিতে'র প্রথম গল্পে ত্রৈলোক্যনাথ এক জায়গায় ভীতার্ত বাঘের পলায়নের বর্ণনার ছবি এঁকেছেন এইরকম :

> 'বাঘ পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পালাইতে পারিল না। ....প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন একটা হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল: অস্থি-মাংসের দগদগে গোটা শরীর, উপরে চর্ম নাই। পাকা আমের নীচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল।....মাংসের বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।'

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বাঘ আপন শক্তিতে নিজ চামড়া থেকে শরীর বিচ্ছিন্ন করে পালাতে পারে।

পরশুরামের বাঘের জন্য নিজ শক্তির দরকার হয় না। ব্যাঘ্ররূপী বকুলালের সমস্ত রকম ক্রিয়াকর্ম সংযত ব্যঙ্গের মোড়কে নিয়ন্ত্রিত। কেদার চাটুজ্যেমশায়ের বর্ণনায় গল্পের শেষে তার পলায়ন চিত্র এইরকম :

> 'বকুলাল নড়েন না, কেবল ভেউ ভেউ কান্না। রামগিধড় ঘ্যাঁক করে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। বকুলাল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালালেন।'

ত্রৈলোক্যনাথের বনের বাঘ আর পরশুরামের ব্যাঘ্র-রূপী বকুলাল—দুজনেরই অরণ্যে অবস্থান এবং পলায়নও অরণ্যের মধ্যেই। দুই বাঘের স্বভাবে ও কাহিনী-ঘটনার মিল-মিশ প্লটের ঔচিত্যে দূরত্ব অনেক, কিন্তু সিচুয়েশন সৃষ্টি ও মেজাজে কোথাও বুঝি সাদৃশ্য থেকে যায়! ত্রৈলোক্যনাথের কথক ডমরুধর শেষে জানায় :

> 'আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘছালের মধ্যে আমি প্রবেশ করিলাম।'

পরশুরামের কথক চাটুজ্যেমশায়ের সে দায়দায়িত্বই নেই, কারণ 'দক্ষিণ রায়' গল্পে সে বহিরাগত কথক মাত্র, কোনো চরিত্রই নয়। সংযমের স্বাভাবিক শিল্পবন্ধন আর বুদ্ধিশীলিত উইট দিয়ে পরশুরাম ব্যাঘ্ররূপী বকুলালকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তার কৌতুকরস স্বভাবী পাঠকের মগজে লঘুরসের ভরাট দেয়, ত্রৈলোক্যনাথ থেকে এখানেই পরশুরামের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও অনন্যতা।

দুই

'দক্ষিণ রায়' অবশ্যই চরিত্রাত্মক গল্প। এ গল্পের প্রধান চরিত্র বকুলাল। তার বন্ধু রামজাদুর কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কথকের বর্ণনায় নেই, প্রাসঙ্গিকতায় অপ্রত্যক্ষ থেকে

গেছে গল্পে। গৌণ চরিত্রদের মধ্যে প্রধান সহায়ক হিসেবে আছে চাটুজ্যেমশায় স্বয়ং, শ্রীরামগিধড় সিং ও বাবা দক্ষিণ রায়। বৈঠকখানার আড্ডায় অন্য যে মানুষগুলি—তারা হল উকিল বিনোদ, বংশলোচন স্বয়ং, নগেন, উদয়। এরা চাটুজ্যেমশায়কে গল্প গ্রন্থনে গতি দিয়েছে, লেখকের প্রয়োজনীয় হাস্যরসটুকু পরিবেশন করেছে, মূল গল্পের সঙ্গে, তার কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের সঙ্গে কোনো এদের যোগ নেই। গল্পের আবহাওয়া রচনাতেই এদের উপস্থাপনাগত শিল্প-যৌক্তিকতা, আর কিছু নয়।

সমস্ত বাদ দিয়ে গল্পে মজিলপুরের চরণ ঘোষের মেসো বকুলাল দত্ত, চাটুজ্যেমশায়, দক্ষিণ রায় আর শ্রীরামগিধড় সিং—এই চারটি চরিত্রই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠার সহায়ক। চাটুজ্যেমশায় গল্পের কথক। তার কথাকে ঘিরেই গল্পটির কাহিনী ও ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত, কিন্তু সেই ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রে যে স্থির গর্ত, সেখানে এই ব্যক্তিটি নেই, আছে বকুলাল দত্ত। চাটুজ্যেমশায় এত বড় একটি গল্প বলে, অথচ গল্পের মূল চরিত্রব্যক্তিত্ব বা 'থীম'-এর সঙ্গে কোনো যোগই নেই! এখানেই গল্প-কাহিনীর একটা সূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দিক ধরা পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধর আর পরশুরামের চাটুজ্যেমশায়, অন্তত এই গল্পের প্রসঙ্গে, এক লক্ষণীয় তফাত চোখে পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু তাব বলা গল্পে নিজেই চরিত্র হয়ে যায়, পরশুরামের বক্তা বিচ্ছিন্ন, একক, বহিরাগত। এখানে তার গল্পকার-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ঠিকই, কিন্তু গল্পের আঙ্গিকের মধ্যে ধরা পড়ে কিছুটা অসঙ্গতি, শৈথিল্য। চাটুজ্যেমশায় সারা গল্প জুড়ে থাকার জন্যই, এত বড় গল্প বলার জন্যই গল্পের অকারণ বিস্তৃতি ঘটেছে, যদিও সে অংশ হাস্যরস ও উদ্ভট রস-উপস্থাপনায় লেখকের শিল্পকৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করে!

চাটুজ্যেমশায় নিজেই বলে—বকুলালের 'ব্যাপারটা বড় অলৌকিক' আর বিনোদ যখন বলে, 'তিনি তো মারা গেছেন, শুনেছি কাউন্সিলে ঢুকতে পারেননি বলে মনেব দুঃখে।'—তখন চাটুজ্যেব উক্তি—'ছাই শুনেছেন। বকুবাবু আছেন, তবে চেনা দুষ্কর।'—তখনি চাটুজ্যেমশায়ের ১. গল্প বলার মধ্যে একটা অলৌকিক পরিবেশের ভূমিকা বচনার প্রয়াস ধরা পড়ে, ২. গল্পের শেষেও যে সেই অলৌকিকতারই প্রতিষ্ঠা—তার ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়। 'দক্ষিণ রায়' গল্পের 'ফ্যান্টাসি' তৈরি করেছে চাটুজ্যেই, কৃতিত্ব তার। দক্ষিণ রায়ের লোকগাথার অংশবিশেষ 'প্যারডি' করে বলাব সময়ে তিনবার কপালে হাত ঠেকায় কথক। গল্পটি আদৌ কথকতাব ঢঙে বলা নয়, এই প্রণাম জানানো কোনোক্রমেই পালাগানের কথক ঠাকুরের নকল নয়। এভাবে প্রণাম করে আসলে চাটুজ্যেমশায়, যেনবা দেবতায় গভীর ভক্তি-বিশ্বাসের ভান বা ভড়ং করে শ্রোতাদের কাছে গল্পটিকে বিশ্বাস্য করতে চেয়েছে। এটা যেমন হাস্যরস সৃষ্টির টেকনিক, তেমনি পরিবেশ যথোচিত করার প্রয়াসও।

চাটুজ্যেমশায় গল্পের মূল প্রটে বহিরাগত, হাস্যরসাত্মক, এক serio-comic চরিত্র। তাকে দিয়ে গল্পকার বাড়তি হাস্যরস পরিবেশন কবেছেন। সে গল্পে বকুলালের চরিত্র এঁকেছে, তার পরিণতি জানিয়েছে উদয়ের সঙ্গে কথায় বিশুদ্ধ কৌতুকরসের জোগান

দিয়েছে, গল্প বলার আগে নগেনের অনুরোধের পর দরজা ও জানালায় উঁকি মেরে পুলিশের গোয়েন্দা হরেন ঘোষাল বিষয়ে সাবধান হওয়ার ভানও করেছে। এসবই গল্পের বক্তব্য-উপযোগী পরিবেশ রচনার কৌশল মাত্র। গল্পের শেষেও তার কথায় বিশুদ্ধ কৌতুক। অর্থাৎ মাত্র লেখক-বাঞ্ছিত কৌতুকরস সৃষ্টিতেই তার সীমা ও শেষ।

তবু 'কজ্জলী' গ্রন্থের মাত্র দুটি গল্পে চাটুজ্যেমশায়কে আমরা পাই—দক্ষিণ রায় ও স্বয়ম্বরা। চাটুজ্যেমশায় চরিত্র পরশুরামের এক অনবদ্য Character study—এক মৌলিক সৃষ্টি। সে ত্রৈলোক্যনাথের উনিশ শতকীয় বৈঠকী গল্পের ধারাকে বিশ শতকীয় আধুনিকতায় যেমন ধরে রেখেছে, তেমনি নতুনত্ব দিয়েছে। চাটুজ্যেমশায় কিভাবে যে গল্প বলতে হয়, শ্রোতাদের তার গল্প শোনার দিকে মন ও আগ্রহ নিবিষ্ট করাতে হয়, তা জানে এবং সে বিষয়ে সচেতন। চাটুজ্যে যখন হরেন ঘোষালের মতো পুলিশের গোয়েন্দার প্রসঙ্গ আনে, তখন বংশলোচনের তাকে সতর্ক করার প্রসঙ্গে বলে ওঠা :

> 'ঠিক কথা। আর, ব্যাপারটা বড় অলৌকিক, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। নাঃ, থাক ও কথা। তারপর, উদো, তোর বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে কবে?'

এই যে হঠাৎ মূল গল্প বলা থামিয়ে, অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে একটা সিচুয়েশন তৈরির প্রয়াস, এ আর কিছুই নয়, চাটুজ্যের আগ্রহ বাড়াবার ও কথক হিসেবে নিজের কৃতিত্বকে প্রতিষ্ঠা করারই উপায়! বৈঠকী গল্পে, অলৌকিক রসের গল্পে কথকের এ এক অস্ত্র।

চাটুজ্যে এক funny চরিত্র। সে 'স্বয়ম্বরা' গল্পে ভুল, হাস্যকর ইংরেজি বলে গল্পকথা বানায়। 'দক্ষিণ রায়' গল্পে যখন বিনোদের কথায় বলে, তার কাছে থাকা তিনশো বছরের পুরনো রায়মঙ্গল পুঁথিটা থেকে সে নিজেই ডাক্তার হতে উৎসাহী :

> 'প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হতে পারলে বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।'—

তখন তার চরিত্রের অ-সাধারণ অভিজ্ঞতা (চিকিৎসার ডাক্তার ও একাডেমিক গবেষণার ডাক্তার এক নয়) ও সেই সূত্রে পাঠকদের কাছে শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের অসঙ্গতিজনিত সহজ হাস্যরসে চাটুজ্যের চরিত্রব্যক্তিত্বের চমৎকার এক আলেখ্য ধরা পড়ে।

'দক্ষিণ রায়' গল্পের নায়ক বকুবাবুর মনের কথা তার পক্ষে জানা কি করে সম্ভব হল—এমন বিনোদবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তর চাটুজ্যের ব্যক্তিত্বকে বৈঠকখানার গালগল্প ও গুল-গল্পের বিশ্বাস্যতা ও অবিশ্বাস্যতার মাঝখানে বসায় :

> 'চাটুজ্যে বলিলেন—'সে তোমরা বুঝবে না। কলিকাল, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ দু-চারটি এখনও আছেন। গরিব বটে, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানাতে পারি, মনের কথা তো কোন ছার।'

নিজের সম্পর্কে এই যে এক চরিতার্থ মানসিকতা, এই যে নিজেকে প্রশংসা, এই যে গুলগল্পের মধ্যে নিজেকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস—এই ব্যক্তিত্ব শিক্ষিত নাগরিক ব্যক্তিত্বেরই যথোচিত। চাটুজ্যে অতি আত্মসচেতন, তার কথা মিথ্যা হলেও সে মিথ্যার

মধ্যে সহজেই এক নিশ্চিত বিশ্বাসহীনতার সঙ্গে নির্মল সম্ভ্রমসূচক ও সভ্রান্ত বৈঠকী গল্পের কথকের উপযোগী কৌতুকরসের মিশেল থাকে। টক-মিষ্টি-ঝাল মেশানো আকর্ষণীয় চাটনির মতো এমন সান্নিধ্য গল্পের শ্রোতাদের টেনে রাখার বড় শর্ত। 'দক্ষিণ রায়' গল্পে নগেন ও উদয়কে ভ্যাংচানোর সংলাপ গল্পের গতি ও কৌতুকের ভিন্ন স্বাদ—দুয়ের পক্ষেই শ্রোতাদের কাছে 'মনটনি' কাটানোর টোটকা। বস্তুত পরশুরামের চাটুজ্যে, তার হাস্যরসাশ্রিত সৃষ্টি-স্বভাব তার স্রষ্টার পক্ষে বিশ্বকর্মার বিস্ময়।

প্রসঙ্গত, 'লম্বকর্ণ', 'দক্ষিণ রায়', 'স্বয়ম্বরা' গল্প তিনটিকে পরশুরাম রচিত চাটুজ্যেমশায় চরিত্র অবতারণার সূত্রে গল্পগুলির রসস্বরূপের একাত্মতার দিক ভাবা যেতে পারে। কেদার চাটুজ্যের ব্যক্তিস্বভাব ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার সফল উপস্থাপনাতেই গল্প তিনটির এক স্বতন্ত্র গৌরব ধরা পড়ে। 'গড্ডলিকা'র অন্তর্গত চতুর্থ গল্প 'লম্বকর্ণে' কেদার চাটুজ্যের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই বৈঠকী গল্পের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেকার একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসেবেই। সে বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডার একজন আড্ডাদার। এই আড্ডায় 'নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ' হয়, 'লাট সাহেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর-খুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কৃষি—কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না।' সম্প্রতি সাতদিন ধরে বাঘের বিষয় আলোচনা চলে। আর সে আলোচনায়, সামান্য হলেও, চাটুজ্যেমশায়ই বাঘের প্রসঙ্গ বিস্তারিত করে ঈষৎ। 'লম্বকর্ণে' চাটুজ্যের পরিচয় অন্যদের মতো ভোজনরসিক হিসেবেই—"ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।' এই গল্পে সে-ই ছাগলের 'লম্বকর্ণ' এমন নামটি বেছে দিয়েছে। এমন নির্বাচনে চাটুজ্যে যে একজন রসিক, তাব প্রমাণ মেলে। 'লম্বকর্ণ' গল্পে চাটুজ্যে বোঝাতে চেষ্টা করেছে বাঘের প্রসঙ্গ দিয়ে যে, বাঘ কোনো ভিন্ন জানোয়ার নয়, তা একটি অবস্থার ফের। যেমন, আরশোলা থেকে কাঁচপোকা। ডারউইনের প্রসঙ্গও তুলেছে। ছাগল বাড়িতে থাকা উচিত নয়, তার বিদায়ই শ্রেয়— এই কথায় গল্পে একটা suspence এনেছে বংশলোচনের মনে—ছাগলের আত্মা নব রূপান্তরে দেখা দিতে পারে ইত্যাদির ইঙ্গিত দিয়ে। শেষে মজিলপুরের চরণ ঘোষের 'ভুটে' নামের ছাগলের চরণের ভোজের বাড়িতে ভুটের পাঁঠার মাংসের কালিয়া খাবার গল্প শোনায়। এমনভাবে বলে যেন তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং না বিশ্বাস করবার উপায় নেই। সেই ভুটে এক বছর পরে সুন্দরবনে দেখা দেয় বাঘ হয়ে—আর চেহারা পুরো একটি বাঘের .

> 'ডাকা হ'ল—ভুটে ভুটে। ভুটে বললে—হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার করে ফিরে এল।'

এমন যে বাঘের গল্প, তা ১. লম্বকর্ণের আত্মার একদিন বাঘের আত্মায় ও অবয়বে দেখা দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বংশলোচনবাবুকে সাবধান করার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে, ২. একটি বৈঠকী গল্পে সামান্য প্রাসঙ্গিক হলেও, পরশুরাম নির্মিত কেদার চাটুজ্যে চরিত্রটির একটি অভিনব অভিজ্ঞতার ভূমিকা-চিত্র মেলে। কেদার নাগরিক শিক্ষিত

চরিত্র, রসিক এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী। তার ব্যক্তিত্ব যে তার একান্ত নিজস্ব, 'দক্ষিণ রায়' গল্পে ও 'স্বয়ম্বরা'র আমেরিকার প্রেমিকা মহিলাটির সঙ্গে আচরণে প্রমাণ হয়ে যায়। এই দুই গল্পে চাটুজ্যেই কথক ও গল্পরচয়িতা, 'লম্বকর্ণে' তা নয়। সেখানে গল্পকার পরশুরাম, চাটুজ্যে এক সদস্য মাত্র—অবশ্যই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের! সে যে এক আকর্ষণীয়, বৈঠকী গল্পের বলিয়ে-কইয়ে চরিত্র, 'লম্বকর্ণে' তার সূত্রপাত, 'দক্ষিণ রায়' ও 'স্বয়ম্বরা'য় বিস্তার। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত পরবর্তী দুই গল্পে কেদার চাটুজ্যের বিস্তারিত পরিচয় আলোচনা করেছি বলেই আপাতত আমাদের সে প্রসঙ্গ এখানেই শেষ।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বকুলাল দত্ত। তার পরিচয় যেহেতু প্রধানত কথকের বর্ণনায় নিয়ন্ত্রিত, তাই চরিত্রটির নিজস্ব নড়া-চড়া বিবৃতিধর্মিতায় কিছুটা স্থির-স্বভাবী। তার মধ্যে আছে স্বার্থপরতা, অসীম অর্থলোভ, কদর্য হিংসা, হিংসাকে কাজে লাগানোর জন্য জঘন্য উপায় অবলম্বন ইত্যাদি। একাধিক দেব-দ্বিজে ভক্তির ভান, অন্যের সম্পত্তির লোভে উল্লাস, যাবতীয় অসৎ ব্যবসায়ে অর্থ-বৃদ্ধির প্রয়াস, জীবনযাপনে ঘোর নীতিহীনতা, বন্ধু রামজাদুকে 'যেন তেন প্রকারেণ' মুগ্ধ করার সক্রিয়তা বকুলাল দত্তকে করেছে বাইরের আকারে মানুষ, ভিতরে পশু। তার শ্বাপদসুলভ স্বভাবের কারণেই গল্পকার ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের রূপকের আড়ালে চরিত্রটিকে শ্রেণীপ্রতিনিধি হিসেবে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। একটি সুস্থ সামাজিক নীতিভাবনা বকুলাল চরিত্র-পরিকল্পনায় কাজ করেছে।

এটি চরিত্র-বক্তব্যের গভীর-গম্ভীর দিক। যেহেতু গল্পটি কৌতুক-রসাত্মক গল্পের অন্তর্ভুক্ত, তাই তার মধ্যে গল্পকার যে হাস্যরসের যোগ ঘটিয়েছেন, তা আদ্যন্ত শ্লেষ-ব্যঙ্গের। কিন্তু এমন ব্যঙ্গরস চরিত্রটির অন্তর-নিহিত থাকেনি, অনেকটা আরোপিত হয়েছে। ১. বকুলাল গরিব, একেবারে আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিম্নস্তর থেকে উঠে-আসা। সে স্থূলবুদ্ধি মানুষ। তার জীবনধারণ ও জীবনযাপন জীবনের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ খড়ির গণ্ডীতে ঘেরা। তাই তার যা কিছু দেবতাদের ধ্যান, ভক্তি, তার ব্যবসা, ভাল-মন্দ—সবই যে-কোনো মধ্যবিত্ত মানুষেরই সমান। তাই তার অর্থবাসনা, নীচ হিংস্রতা, ঘুষ-নেওয়া কোনো কৌতুকরস বা ব্যঙ্গরসের স্বতঃউৎসার ঘটায় না। ২. ফ্যান্টাসির বকুলাল অর্থাৎ ব্যাঘ্রে-রূপান্তরিত বকুলাল, এককথায় 'গাধার মত রং'-এর বাঘ বকুলাল তার আকুল কান্নায়, 'আমি ভাত খাব কি রে? শোব কোথায়? সিল্কের চোগা-চাপকান পরব কি করে? গিন্নী যে আর চিনতে পারবে না গো!'—এমন সব উক্তিতে, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালানোর মধ্যে অবশ্যই যেমন বিশুদ্ধ কৌতুকরস আছে, তেমনি লেখক-নির্দিষ্ট ব্যঙ্গরস। এখানেই এর চরিত্ররূপের সার্থকতা কৌতুকরসের গল্পে। কিন্তু বকুলাল লেখকের একমাত্র নীতিভাবনার শিকার হয়ে থাকায় গল্পে ব্যঙ্গ-কৌতুকরসের ভিয়েন বসাতে পারেনি। চাটুজ্যেমশায় তার গল্প বলার টেকনিকে বরং বেশি রস পরিবেশন করেছে। গল্পে বকুলালের তুলনায় চাটুজ্যেমশায় বেশি কৌতুকরসের ব্যক্তিত্ব। গল্পের মূল আধার থেকে কৌতুকরস মাত্রায় বেশি সরে যাওয়ায় বকুলাল অনেকটাই বেগহীন শীর্ণ নির্জীব সূক্ষ্ম শিল্পের বিচারে।

গল্পের শেষে ব্যাঘ্ররূপী বৃদ্ধ বকুলালকে দেখে ডেপুটিবাবুর উক্তি :

'এমন বাঘ তো দেখিনি, গাধার মত রং। আহা শেয়ালে কামড়েছে।'

এই মন্তব্যে প্রমাণিত হয়, রূপকের ব্যাখ্যায় বকুলাল গাধা-বুদ্ধির বাঘ, আর শ্রীরামগিধড় সিং শিয়াল। রামগিধড় রাজনৈতিক মতবাদের প্রতীক-প্রতিম চরিত্র। তার আচার-আচরণ শিয়ালের মতো ধূর্ত—অসৎ রাজনীতিবিদের অনুরূপ। তার যাবতীয় সক্রিয়তা তারই প্রমাণ দেয়। রায়মঙ্গল কাব্যের দেবতা দক্ষিণ রায়কে গল্পকার কিছুটা sensible নেতার পরিচয়ে এনেছেন। প্রথমে সে মনুষ্যমূর্তির এবং সৌম্য ব্রাহ্মণের। সে বকুলালকে শেষ বর দেওয়ার আগে 'দেশের হিত' প্রসঙ্গ তোলে। পরে রামজাদুকে জব্দ করার জন্য বর দেয়। 'দেশের হিত' প্রসঙ্গ হয় রাজনীতিবিদদের, সময়-বিশেষে পোশাক বদলানো হতে পারে। কারণ তা না হলে রামগিধড় সিং-এর মতো প্রতিনিধিজাতীয় শিষ্য তথা দালাল জোটে কি করে? রামগিধড় শিয়াল। পরশুরাম সুকৌশলে তার স্বাভাবিক হিন্দি সংলাপে শিয়ালের অস্বাভাবিক ডাক শুনিয়েছেন ব্যঞ্জনায়।

'রামগিধড় বললেন বস্ হুয়া হুয়া।' 'হুয়া হুয়া, আর সব ঠিক হুয়া'।

সে 'খ্যাঁক খ্যাঁক' শব্দ ক'রে বকুলালেব পায়ে কামড়ে দেয়। এসব কথা ও আচরণ 'হুয়া' শব্দের ধ্বনিতে আছে শিয়ালেরই বৈশিষ্ট্যে। রূপক-তাৎপর্যে রামগিধড় সার্থক ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র।

তিন

মেজাজে ও লক্ষ্যে 'দক্ষিণ বায' গল্পটি অবশ্যই কৌতুক-ব্যঙ্গ রসাশ্রিত গল্প। এব কৌতুকরসের উৎসার ঘটিয়েছে গল্পের প্রধান কয়েকটি সূত্র : ক. কাহিনী ও ঘটনার একাধিক সিচুয়েশন, খ ছোট বড় চরিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি, গ. একাধিক সংলাপ, ঘ. গল্পকারেব কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। পরশুরামের লক্ষ্য বকুলাল, রামগিধড় সিং ইত্যাদি ব্যক্তিগুলির ভিতরের নীতিহীন সামাজিক ব্যক্তিত্বের সম্যক উন্মোচন, সমাজের মধ্যে এসব মানুষের যে দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থ-সন্ধিৎসু, অর্থলোলুপ হিংস্র আচরণ—তাকেই ব্যঙ্গেব মধ্য দিয়ে আঁকার চেষ্টা। বকুলালের বড়লোক হওয়ার আগের দেবতাবন্দনা ও প্রণাম, বড়লোক হওয়ার পর রামজাদুকে জব্দ করার সক্রিয়তা, নিজের ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর চরিত্রের মানসিকতা অবশ্যই হাস্যরসের মধ্যে ব্যঙ্গকেই অনড় কবে। গল্পকারের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের মূল রস ব্যঙ্গই। রামগিধড় সিংয়ের শিয়ালের স্বভাব তাকে পুষ্টি দান করেছে।

গল্পে এমন অনেক 'সিচুয়েশন' আছে, যা কৌতুকরসের জোগান দেয় অবলীলায়। গল্প বলতে বলতে চাটুজ্যেমশায়ের দরজা-জানালায় উঁকি দেওয়া, চাটুজ্যের প্রণাম করে রায়মঙ্গলের অংশবিশেষের প্যারডি পাঠ, মেসের রান্নাঘরে গিন্নির বুনে দেওয়া পশমী আসনে বসে বকুবাবুর থালায় লুচি খাওয়া ও মেসের ঠাকুরের তাকে বাতাস করার মধ্যে ঝি-ঠাকুরের প্রেমের দৃশ্য রচনায়, ভূতোর মারা যাওয়ার খবরে মানিব্যাগ উজাড় কবে পিওনকে বকশিশ দেওয়া, টিকটিকির আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বকুলালেব টেবিলে

হঠাৎ পড়ে যাওয়া, বাঘের রূপ পেয়ে বকুবাবুর কান্না ও পা কামড়ে দেওয়ায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পালিয়ে যাওয়া—এমন সব অদ্ভুত সিচুয়েশন রচনা করে পরশুরাম চমৎকার কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন গল্পে।

আবার ছোটবড় চরিত্রের অসঙ্গতি গল্পে ঘন কৌতুকরসের আবহ তৈরি করেছে। উদয়ের শ্বশুরবাড়ি ও শ্যালিকা-প্রীতির মুদ্রাদোষ, চাটুজ্যের নিজেকে 'বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান' থাকার কারণে নিজেকে যথার্থ সৎ ব্রাহ্মণ হিসেবে প্রায় 'ত্রিকালজ্ঞ' বানিয়ে তোলার প্রয়াস, বিনোদের মাঝে মাঝে সকলকে থামিয়ে চাটুজ্যেমশায়কে বড় প্রতিপন্ন করার চাপা শ্লেষ, বকুবাবুর চরিত্রের বাহির-ভিতর—এমন সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অবশ্যই হাস্যরসের এতটুকু ঘাটতি নেই। 'দক্ষিণ রায়' গল্পের হাস্যরসে এরাই যথোচিত আধার।

কিন্তু পরশুরামের এই গল্পের হাস্যরসের লক্ষ্যে আছে সেই কলকাতার নাগরিক সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর শ্রোতা। হাস্যরস তাই মর্যাদা পেয়েছে সংলাপে। সংলাপে শ্লেষ-বক্রোক্তির সফল প্রয়োগ :

> "বিনোদ। কোন্ বাবা?
> চাটুজ্যে। বাবা দক্ষিণ রায়।
> উদয় বলিল—'আমার এক পিসশ্বশুরের নাম দক্ষিণামোহন রায়'।"

এখানকার হাস্যরস innocence-এর সূত্রে স্বতঃস্ফূর্ত। আবার সফল কৌতুকরসের দৃষ্টান্ত মেলে গল্পের শেষে :

> "বিনোদবাবু বলিলেন—'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, বাবা দক্ষিণ রায় কখনও গুলি খেয়েছেন?'
> 'গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'
> 'তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা কেউ খান নি কি?'''

হাস্যরসাত্মক সংলাপ রচনায় পরশুরামের ক্ষমতা বিস্ময়কর। হাসিতে আছে চাপা বুদ্ধির আলো, বিদগ্ধ ব্যক্তির উপযোগী যুক্তি-চিন্তা-ভাবনার ভারসাম্য। চাটুজ্যের কাছে আছে তিনশো বছরের একটি 'রায়মঙ্গল' পুঁথি—যেটি ছোকরা চিমেশ মিত্তির দেড়শো টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে প্রবন্ধ লিখে ডক্টরেট হতে চায়। তাতে চাটুজ্যের রাজি না হওয়ার কারণ :

> 'প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে, ডাক্তার হতে পারলে বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।'

এমন সংলাপে আছে শ্লেষ-বক্রোক্তির বৈশিষ্ট্য যেমন, তেমনি চাটুজ্যে মশায়ের গল্প বলার মধ্যেকার নিজস্ব নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা—যা হাসির খোরাক দেয়। গল্পের মধ্যে আগ বাড়িয়ে নগেন যখন এনে ফেলে 'দক্ষিণ রায়' প্রসঙ্গ, তখন ক্রুদ্ধ, বিরক্ত চাটুজ্যেমশায়ের সংলাপকে পরশুরাম যেভাবে শুনিয়েছেন, তার অবয়ব অবশ্যই কৌতুকরসাত্মক :

> "'চাটুজ্যেমশায় মুখ খিঁচাইয়া ভেংচাইয়া বলিলেন—'দ্যাক্ষিণ রায়! তোমার ম্যাথা! গল্পোটা তুমিই ব্যালো না, আমি আর বকে মরি কেন।'"

কথকের সমূহ ক্রোধ, বিরক্তি, আড্ডা, তাচ্ছিল্য মিলে শব্দগুলির ধ্বনিতে যে বিকৃতি আনে, তা বিশুদ্ধ কৌতুকরসের আস্বাদ দেয়। এক বৃদ্ধ, গল্পে আত্মমগ্ন মানুষের এমন সংলাপ অর্বাচীনের আকস্মিক বাধাদানের কারণেই ভ্যাংচানো শোনায়। তবে গল্পের হাস্যরসে অবশ্যই কেন্দ্রচ্যুত। এখানেই সার্থক ব্যঙ্গের ছোটগল্প হিসেবে এর প্লটবৃত্ত-গত সীমা!

চার

'দক্ষিণ রায়' এমন গল্পনামে কিছুটা বিভ্রান্তি আসতেই পারে স্বভাবী পাঠকদের। গল্পটির যে 'চরমক্ষণ' সৃষ্টি, তা ঘটেছে দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাবের কারণেই। দক্ষিণ রায়ই প্রধান চরিত্র বকুলালের একেবারে সমূলে বদল ঘটিয়েছে, তাকে বলা যায়, একধরনের কঠিন শাস্তি দিয়েছে তার নীচ স্বভাবের কারণে। তাই দক্ষিণ রায়ের এমন সফল সক্রিয়তা গল্পের মধ্যে থাকায় গল্পের নাম• শিল্প-সার্থকতার দিক চিহ্নিত করে।

দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা, যা এমন নামের বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারে। সমগ্র গল্পে দক্ষিণ রায়ের আদ্যন্ত কোনো সক্রিয়তা, উপস্থিতি নেই। গল্পের প্রথম দিকে বাঘের কথা আছে, বাবা দক্ষিণ রায়ের প্রসঙ্গ এনেছে চাটুজ্যেমশায়, তা উল্লেখ মাত্র এবং তার প্যারডি রচনার পরিবেশ রচিত হয়েছে মাত্র, তাবপর গল্পের শেষে সে আবির্ভূত। তা-ও বকুলালকে বাঘে রূপান্তর করার পরেই তার অস্তিত্ব মুছে যায় গল্প থেকে। দক্ষিণ রায় এখানে এমন কোনো চরিত্রই হয়নি যাতে সমগ্র গল্পের নাম তার নামে হতে পারে। গল্পে দক্ষিণ রায় যেন গল্পকারের এক নির্দিষ্ট যাদুদণ্ড, যা দিয়ে গল্পকে এককথায় বাস্তব থেকে অবাস্তব তথা ফ্যান্টাসির মধ্যে নিয়ে যায়। তাই গল্পনামে দক্ষিণ রায়ের অস্তিত্ব গল্পের সমগ্রতায় ঠিক কিনা, সংশয় থাকে।

দেবতা 'দক্ষিণ রায়' গল্পে আরোপিত বহিরাগত ব্যক্তিত্ব, বকুলালের ভিতর থেকে উঠে-আসা কোনো আত্মিক সংকটের রূপক নয়। দক্ষিণ রায় লেখক পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক আয়ুধ—যে নায়ককে জব্দ করেছে। এমন বানানো চরিত্র এনে প্রধান চরিত্রের পবিবর্তনে হাস্যরসাত্মক গল্পে চরিত্রটি মৌলিক কোনো রসসৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ নাম হয়েছে 'দক্ষিণ রায়।' এমন নামে কেউ কেউ রসভাস-দোষ ধরতে পারেন।

তবু আমাদের মতে গল্পের মধ্যে Real ও Fantasy —এই দুয়ের মধ্যে একমাত্র যোজক সূত্র 'দক্ষিণ রায়'। বকুলালের ব্যাঘ্রে রূপান্তরীকরণেই গল্পের লেখক-লক্ষ্য নির্দিষ্ট। সেক্ষেত্রে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মধ্যবর্তী অংশ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ রায়ই গল্পের প্রধান চরিত্র ও গল্পের প্লটে বৃত্তের সম্পূর্ণতা দান করেছে, তাই তার উপস্থাপনা ক্ষণিক ও সীমিত ক্ষেত্রের হলেও তার গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই গল্প-নাম, অন্তত গল্পটির সংকীর্ণ শিল্পস্বরূপের মধ্যে, সার্থক বলে মেনে নিতে বাধা থাকে না। নাম নায়ক-চরিত্র কেন্দ্রিক পরিণামী ব্যঞ্জনায় সফল নয়, গল্পকারের নিজস্ব মানসিকতা ও লক্ষ্যকেন্দ্রিক যাথার্থ্যে মান্য।

৬.

স্বয়ম্বরা

এক

'কজ্জলী'র 'স্বয়ম্বরা' গল্পটি যখন পরশুরাম লেখেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ এবং প্রতীচ্য যুদ্ধের ফলে সেদিক থেকে প্রাচ্য ভারতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার সুযোগে বহু বিদেশি মানুষের আগমন ঘটতে শুরু করেছে। একাধিক আমেরিকান ও বৃটিশ ভবঘুরে মানুষ—পুরুষ ও রমণী—পথেঘাটে দেখা দিতে থাকে। ব্যঙ্গচিত্রী-গল্পকার পরশুরাম তাঁর কলমে এদেরও নিয়েছেন অবলীলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এইসব বিদেশি পর্যটক, সৈন্য ইত্যাদিতে দেশ প্রায় ভরে যায়। এদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, জীবনযাত্রা—যেসব ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কাছে বিসদৃশ—এবং তা-ই হওয়া স্বাভাবিক—পরশুরাম সেইরকম একটা বিষয়কে কৌতুকরসে সিক্ত করে 'স্বয়ম্বরা' গল্পে গ্রহণ করেছেন।

গল্পে মূলত লক্ষ্য মার্কিন রমণী ও তার দুই প্রেমিক। গল্পটি পরশুরাম কেদার চাটুজ্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এখানে বৈঠকী বলার রীতিতে কেদার চাটুজ্যেও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'স্বয়ম্বরা'র গল্পাংশ সামান্য। এক মাঘ মাসে পরিচিত চরণ ঘোষের অনুরোধে তার ছোট মেয়েকে তার জামাই-এর কর্মস্থল টুণ্ডলায় রাখতে যায় কেদার চাটুজ্যে। রেখে ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় প্রচণ্ড ভিড় থাকায় চরণ ঘোষের রেলের ডাক্তার-জামাই গার্ডকে বলে তাকে প্রথম শ্রেণীতেই তুলে দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত কেদার চাটুজ্যের সঙ্গে এই কামরারই দুই আমেরিকান মদে-মাতাল পুরুষ ও তাদের একটিমাত্র প্রণয়িনীর সঙ্গে পবিচয় হয়। কালিফোর্নিয়ার ঢ্যাঙা সাহেব টিমথি টোপার আর ক্রিস্টোফার কলম্বাস ব্লটো হল এই দুই পুরুষ। মহিলাটিও আমেরিকান জোন জিলটার। তিনজনেই ভারতভ্রমণে এসেছে। সঙ্গী দুটি পুরুষই একসঙ্গে ওর পাণিপ্রার্থী।

দুজনেই ক্রোড়পতি, দুটোই পাঁড় মাতাল। টোপার পাঁচটি হোটেল, দশটি জাহাজ কোম্পানি, পঁচিশটা শুঁটকি শুয়োরের কারখানা সহ দশকোটি ডলারের মালিক, ভয়ঙ্কর বদরাগী। ব্লটোরও দশ কোটি ডলার আছে, মদ্যপ অবস্থায় ছিঁচকাঁদুনে। জোনের সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ-সম্পর্ক ভাবনায় টোপার ও ব্লটো পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ট্রেনের মধ্যে এদের দুজনকে পায়ের চটি ও পদাঘাতে রীতিমতো শাসনে রাখে জোন। এই অবস্থায় জোন একসময়ে চাটুজ্যেকে বলে তার বিবাহের সমাধান করতে—এই দুজনের মধ্যে কাকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু একসময়ে টোপার ও ব্লটোর কামরার মধ্যেকার মারামারি বন্ধ করতে আসে স্টেশনেই ভ্রমণরত আর এক বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা সাহেব বিল বাউন্ডার। চাটুজ্যে জোনকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি দেয় ওই দুজনকে ছেড়ে বিলকেই বিয়ে করতে। টোপার ও ব্লটো কামরা থেকে বিদায় নেয়। জোন মেনে নেয় এবং ওদের প্রথম এনগেজমেন্টটা চাটুজ্যে বাঙালি রীতিতেই স্টেশনের কামরায় দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদে শেষ করে। আনন্দে চাটুজ্যের রামপ্রসাদী গানের সঙ্গে বিল ও জোন নাচতে থাকে। ওরা সানন্দে চাটুজ্যেকে বিদায় জানানোর সময় কলকাতায় তিন দিন পরে গ্র্যান্ড

হোটেলে দেখা করতে বলে। ওখানেই ওদের বিয়ে হবে—জানায় জোন। কথামত গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়েছিল চাটুজ্যে, কিন্তু বিয়ের পরদিনই জোন পলাতক, নিরুদ্দেশ, বিলও তার খোঁজে নিখোঁজ।

গল্পটি 'বিরিঞ্চিবাবা' বা 'জাবালি', 'দক্ষিণ রায়'-এর মতোই চরিত্রাত্মক রচনা। পরশুরামের গল্পের বড় বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন, বিচিত্র মানসিকতার চরিত্র-সমাবেশ ঘটানো। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই চমৎকার মিলে যায়—'মূর্তির পর মূর্তি রচনা করিয়াছেন' পরশুরাম। 'স্বয়ম্বরা' গল্পে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। মানুষগুলোকে বোঝাতে, চিনিয়ে দিতেই কেদার চাটুজ্যের গল্প বলার লক্ষ্য। গল্পটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল—ক. আমেরিকান তথা পাশ্চাত্য সভতায় নরনারীর প্রেম, বিবাহরীতি, পুরুষ-রমণীর স্বাধীন সম্পর্কভাবনা—যা আমাদের দেশের বিপরীত, তাকে কৌতুকরস-সরসতায় উপস্থাপিত করা, খ. এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধনস্ফীত আমেরিকানদের প্রেম ও বিবাহে ধনের গর্বঘোষণা, রমণীপ্রেমকে কুক্ষিগত করা ও বিবাহের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা, গ. আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের অস্থিত অবস্থার মধ্যে মদমত্ততায় সমাজ-অনন্বয়ী, উৎকেন্দ্রিক জীবন-স্বরূপের প্রতিচিত্রণ।

এমন বিষয়গুলি পরশুরাম কেদার চাটুজ্যের বৈঠকী গল্পের মেজাজে একমুখিন কাহিনী বয়নে শিল্পরূপ দিয়েছেন। স্বভাবে ও সংলাপে বৈপরীত্য, অসঙ্গতিকে তুলে ধরে অফুরন্ত কৌতুকরস সৃষ্টিই গল্পকারের লক্ষ্য। প্লটের সমস্ত কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ এবং সিচুয়েশনকে কৌতুকরসে সিক্ত করার কারণেই গল্পটির কাহিনী আকর্ষণীয়। গল্পটির শুরু থেকে বেশ কিছুটা অংশ কেদার চাটুজ্যের পরিবেশ ও মেজাজ রচনায় ব্যয়িত। মূল গল্পের শুরু টুণ্ডলা থেকে ট্রেনে, শেষ মোগলসরাই স্টেশনে। চাটুজ্যেকে জড়িয়েই গল্পের বাঁধুনি ও গতি। একদিকে টোপার ও ব্লটো, আর একদিকে বিল। এদের মাঝখানে চাটুজ্যে জোনের বিবাহে দৌত্য করেছে এবং তারই পরামর্শে বিল ও জোন বিবাহে মিলিত হয়। সুতরাং কাহিনীর পরিণামী অংশে চাটুজ্যের সক্রিয়তা শিল্পকৌশলে যথার্থ। সবশেষে জোনের ও বিলের যে পরিণতি—তার খবর দিয়েছে চাটুজ্যে ঠিকই, কিন্তু তার পরিণামকে তৈরি করেছে পরশুরাম অঙ্কিত চরিত্রগুলিই!

জোন নিজেই ধনী এবং স্বভাবে কিছুটা স্থিতধী, কিন্তু জীবনের স্থায়ী পার্টনার নির্বাচনে অস্থিতচিত্ত। তাকে নির্ভর করতে হয়েছে তৃতীয় ব্যক্তি চাটুজ্যের সিদ্ধান্তের ওপর। এই নির্ভরতাই কাহিনী-মধ্যে গতি এনেছে। তবে টোপার, ব্লটো, জোন, বিল—এরা সবাই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেই যেমন গল্পকে পরিণামের দিকে নিয়ে গেছে, তেমনি হাস্যরসের অন্তঃশীল ধারাটিও বজায় রেখেছে। চাটুজ্যে নিজ ব্যক্তিত্বে গল্পের কোনো চরিত্র নয়, কাহিনী ও ঘটনার সংস্থাপনে, গল্পরসের উদ্ভাবনে এক সহায়ক যোজক চরিত্র। 'স্বয়ম্বরা' গল্পের প্লট পরনির্ভরশীল।

'স্বয়ম্বরা' গল্পের বাস্তবতা ব্যঙ্গচিত্রীর কলমে কম, অনেকটা প্রহসন রচয়িতার কলমে অতিরিক্ততা পেয়েছে। এখানে একাধিক পুরুষের প্রতি প্রেম, স্ব-নির্বাচন, বিবাহভাবনা, অহংচেতনা—এসব দিয়ে লেখক যে ব্যঙ্গকৌতুক-রস পরিবেশন করতে চান, টোপার ব্লটোর প্রহসনাত্মক আচার-আচরণে, বিল-জোনের নৃত্যে, টোপার ও ব্লটোকে জোনের চটি

জুতো দিয়ে শাসনের হালকা হাস্যকৌতুকে তা ম্লান হয়ে গেছে। ব্যঙ্গ সব সময়েই সূক্ষ্ম রসের স্বাদ দেয়। তা যদি না থাকে, তবে কাহিনী-মধ্যে খেয়ালী চরিত্রগুলির উদ্ভটত্ব তাকে বাস্তবতার কেন্দ্রচ্যুত করে। 'স্বয়ম্বরা' গল্পটি র প্লট, চরিত্র যতটা লেখকের উদ্ভট কল্পনার নামাবলী জড়ায়, ততটা শ্লেষ-ব্যঙ্গের ন্যায় (logic) মানে না। 'স্বয়ম্বরা' গল্পের আখ্যায়িকায় তাই লক্ষ্য ও প্রকাশে কিছুটা শৈথিল্য ধরা পড়ে।

ছোটগল্পে যে 'চরমক্ষণ' থাকে, 'স্বয়ম্বরা' গল্পে তা আছে গল্পের একেবারে শেষতম বাক্যে—'বিয়ের পরদিনই জোন পালিয়েছে, সাহেব তাকে খুঁজতে গেছে।' এই রীতির 'মহামুহূর্ত' রচনার প্রয়াস মোপাসাঁ, ও হেনরী, এদেশীয় বনফুলের রচিত গল্পে মেলে। শেষ বাক্যের হাস্যরসাত্মক ও শ্লেষধর্মী চমক আমাদের শিল্পের আনন্দ দেয়। গল্পটির 'চরমক্ষণ' হয়তো বিল-জোনের ট্রেনের মধ্যে 'এনগেজমেন্ট'-এর পরিস্থিতিতেই হতে পারত, কিন্তু তাতে গল্পকারের শ্লেষাত্মক লক্ষ্য ধরা পড়ত না। জোনকে বোঝানোর জন্যই এর 'চরমমুহূর্ত' তাই শেষের বাক্যের ব্যঞ্জনায়।

দুই

কথাসাহিত্যের অন্যতম শাখা ছোটগল্পেও লেখকের মূলধন তাঁর অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতাকে খাটাবার আধার বা উপায় হল চরিত্র। এই চরিত্রকে গতানুগতিক না করে বৈচিত্র্যে-বৈশিষ্ট্যে নির্বিশেষ করে গল্পকারের তীব্র, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। হাস্যরসাত্মক গল্পেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য। পরশুরাম কেদার চাটুজ্যের গল্প বলার আঙ্গিকে বেশ কিছু চরিত্রকে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোয় বিশিষ্টতা দিয়েছেন 'স্বয়ম্বরা' গল্পে। সাধারণ অর্থে পরশুরামের চরিত্রগুলিই তাঁর হাস্যবস সৃষ্টির কাজে একান্ত জরুরি। 'স্বযম্বরা' গল্পের নায়িকা জোন, দুই প্রেমে-প্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক টোপার ও ব্লটো, বিল, এমনকি চাটুজ্যে স্বয়ং চরিত্রের স্বভাবধর্মে মূল কৌতুক-ব্যঙ্গকেই প্রধান রস করেছে।

গল্পে জোনকে যখন চাটুজ্যে প্রথম দেখে এবং আমরাও দেখি, তখন তার বাইরের বর্ণনায় আছে নির্ভেজাল কৌতুকরসে জারানো জমকালো শ্লেষ :

> 'মুখখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানু লম্বিত দুই বাহু, চোস্ত ঘাড়-ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শনের মতন দু'গাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরণে একটি দেড়হাতী গামছা—গোলাপী কলাগাছের মত দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্ঠি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম—হা, যষ্ঠি বটে, মাথা থেকে বুক কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব নয়, একেবারে জ্বলন্ত হাউই-এর কাঠি।'

'স্বয়ম্বরা' গল্পে এ হল নায়িকার বর্ণনা। চাটুজ্যের বলার মধ্যে রসিয়ে বলার আকর্ষণে জোন বিশুদ্ধ রসিক পাঠকদের কাছে টানে। এমন নায়িকায় গল্পের পরবর্তী অংশে কিছু নিরাসক্ত ব্যঙ্গরসের স্রোত এনেছেন গল্পকার। কিন্তু জোন চরিত্রের স্বাধীন-মনস্কতা, দুই

প্রেমিকের প্রতি তথাকথিত প্রেমাকর্ষণ, বিবাহবন্ধন ও বিবাহের পর নিরুদ্দেশ হওয়ার মধ্যে চরিত্রের যে বিকাশ আছে, অবশ্যই তার সক্রিয়তা প্রহসনের ধর্মে পরশুরামের হাতে বেশ কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়েছে। তার চটি জুতা ও পদাঘাতে প্রেমিক-প্রবরদের শাসন যে অতিরিক্ততায় হাসি আনে, তা প্রহসনের, ব্যঙ্গাত্মক সিচুয়েশন-এর নয়। জোন চরিত্রের বাস্তবতা কমেডি ও প্রহসনের মেলোড্রামায় হাসি আনে, ব্যঙ্গের নিরপেক্ষ তীক্ষ্নতায় চমৎকৃত করে না।

টিমথি টোপার আর কলম্বাস ব্লটো স্বভাবধর্মে পরস্পরের বিপরীত হতে পারে, কিন্তু মূলে এক। তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, গতি নেই। তারা দুজনে যে হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায় গল্পে ও পাঠকমনে, তা লেখক বানানো চরিত্রের নকল রস, বিশুদ্ধ কৌতুকে আমাদের অভিভূত করে না। প্রভূত অর্থের জন্য নিজেদের ক্ষমতাবান করার দিকটি পাশ্চাত্যের ধনবাদী সমাজব্যবস্থার অনুগ এবং স্বাভাবিক, তার সঙ্গে জোনের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ ও যোগের দিক দুই চরিত্রে একই বক্তব্যে গতানুগতিক। বিল সাহেব স্বাভাবিক, কিন্তু তার মধ্যে যে মুচিব ছেলে হয়ে ঘণ্টায় ছ'লাখ ডলার উপার্জনের দিক—তাতে জোনকে অর্থ দিয়ে আকর্ষণের কাজে লাগে না। মুষ্ঠিযোগে আগের প্রেমিকদের বিতাড়নেই গল্পকার তাকে কাহিনীতে যোগ করে শেষে গল্পের একটি স্থায়ী পরিণতির উপায় করেছেন। জোন কিছুটা dynamic, কিন্তু তিন বিদেশি পুরুষ চরিত্র স্বভাবে একএবং static।

অবশ্যই 'স্বয়ম্বরা' গল্পে চাটুজ্যে একটি লক্ষণীয় চরিত্র। গল্পে এই চরিত্রটির কাজ— ক. গল্পকে বৈঠকী রীতিতে বলার আগে একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, খ. গল্পের কাহিনীর মধ্যে জটিলতা নয়, একটিই প্রধান সূত্র ধরে রাখা, গ. আগাগোড়া হাস্যরসের প্রবাহটিকে সমান মাপে এবং বিচিত্র স্বাদে পাঠকদের বিতবণ করা, ঘ. বাংলা হাস্যরস-সাহিত্যে একটি অভিনব চরিত্র-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করানো। 'স্বয়ম্বরা' গল্পে অবশ্যই একটি বিবৃতিপ্রধান স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আছে। তার যে 'মনটনি', চাটুজ্যের রসিক-সুলভ উপস্থাপনা তাকে অনেকটাই সরিয়ে আকর্ষণীয় করেছে। চাটুজ্যেমশাই গল্পে না থাকলে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নায়িকা জোন চরিত্রের মধ্যে যে প্রেম ও বিবাহ ব্যাপারে দ্বিধা, সংকট, অসঙ্গতির গ্রন্থিরচনা ও মোচন—তার সমাধান হত না। এই একটি ব্যাপারেই তার সঙ্গে গল্পের প্লটের যোগ নিবিড়। স্বভাবে চাটুজ্যে বহুদর্শী, উদার, জীবনের যাবতীয় বৈপরীত্যকে, মানুষের সবরকম অসঙ্গতিকে মুক্তমনে পর্যবেক্ষণে সক্ষম। সে নিজে কোনোক্রমেই কোনো ব্যাপারেই বিচলিত হয় না, মেনে-মানিয়ে নিয়ে উদার হাসিতে চারপাশে শুভ্রতা লেপে দেয়। তার কথায় আছে বিদগ্ধ বুদ্ধির হাসি—যা কাউকে আঘাতও করে না, বুদ্ধির জায়গাকে হাস্যরসে সরস আপ্লুত, লাবণ্যময় করে কিছুটা নরম মাটি তৈরি করে। চাটুজ্যে নিজে রাগে না, কাউকে রাগায় না, কিন্তু অদ্ভুতভাবে তার কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গের কাজটি অন্তঃশীল রেখে দেয়। 'স্বয়ম্বরা' গল্পেই এমন চাটুজ্যের সাক্ষাৎ মেলে। বিলকেই বিবাহ করার জন্য জোনকে যুক্তি দেওয়া, বিল ও জোনকে ট্রেনেই মাথায় হিন্দুমতে ঘাস দিয়ে আশীর্বাদ করা, নিজে ব্রাহ্মণ হলেও ভরা দাড়ি জর্জরিত চিবুকে

জোনের চুম্বনগ্রহণ—এমন সব কিছুর মধ্যে বয়স্কের যে মমতা আছে, তা স্বাভাবিক হয় তার চরিত্রে। শেষে গিন্নির ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াতেও তার মুখে সেই কৌতুকস্নিগ্ধ স্মিত হাসির প্রলেপ। আসলে, 'স্বয়ম্বরা' গল্পে একমাত্র চাটুজ্যেই যা প্রহসন-ধর্মের বাইরের এক বাস্তব বুদ্ধির রসিক মানুষ। এই চরিত্র যেমন এই গল্পের, তেমনি গল্পকারেরও এক মূল্যবান সৃষ্টি। কথা নিয়ে বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখার নানা ধরনের মজার খেলায় কেদার চাটুজ্যে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য চরিত্র।

পরশুরামের গল্পে কেদার চাটুজ্যের বড় দায়িত্ব, সে বৈঠকী-ব্যক্তিত্বের ধারাটিকে ধরে রেখেছে। সে সম্পূর্ণ বিশ শতকের মানুষ—পুরনো সংস্কার নিয়ে সে কৌতুক করে, নিজে কিন্তু সে রক্ষণশীল হয়েই থাকে। সে জোনের চুম্বন গ্রহণ করে অবলীলায়, আর সে ঘটনাকে সমর্থন করে এমনভাবে, এমন যুক্তিতে যে হাসতে হাসতে পাঠকরা তার সহজ অনুপন্থীর ভূমিকায় চলে যায়। ওকে জোনের চুম্বন করার ঘটনাটি চমৎকার লজ্জার suspence ও কৌতুকরসে বলেছে চাটুজ্যে :

> '''মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু করে আমার সেই পাঁচ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ওপর—'
>
> বিনোদবাবু বলিলেন—'আ ছি ছি ছি।'
>
> চাটুজ্যেমশায় বলিলেন, 'দেবী চৌধুরানীতে ঐ রকম লিখেছে বটে।'
>
> 'আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, পাকা লঙ্কার আস্বাদ কি রকম লাগল?'
>
> 'তাতে ঝাল নেই, আরে, ঐ হল ওদের রেওয়াজ, ঐ রকম করেই ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়, তাতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে।'''

এমন যে সংলাপ-চিত্র, এতে ধরা পড়ে চাটুজ্যের বিশ শতকীয় যুক্তিনিষ্ঠ উদার ব্যক্তিত্বের রসময় বৈঠকী রূপ! চাটুজ্যেমশায় কৌতুকরসের পোশাকে উনিশ শতকের ধারায় খাঁটি বিশ শতকের ব্যক্তিত্ব। 'স্বয়ম্বরা' গল্পের শেষে সেই আধুনিক শ্লেষ—চাটুজ্যের স্ত্রীর স্বামীকে চুম্বনজনিত মেম-সান্নিধ্যের ঘৃণায় উড়ে নাপিতের ক্ষৌরি করানোর ব্যবস্থা, আর গঙ্গাজলে আংটি ধৌত করে নিজেরই আদর করে ব্যবহার করার বাসনা :

> '''চাটুজ্যে গিন্নী শুনে তখন কি বললেন?'
>
> 'তক্ষুণি একটা উড়ে নাপিতকে ডেকে বললেন—'দে তো রে, বুড়োর মুখখানা আচ্ছা করে চেঁচে, ম্লেচ্ছ মাগী উচ্ছিষ্টি করে দিয়েছে! তারপর সেই চুনীর আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের আঙুলে পরলেন।'''

এই চিত্রে ও ব্যবস্থায় চিরকালের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন নারী-স্বভাবের প্রতি যে শ্লেষ-কটাক্ষ কৌতুকের বাস্তবতা—তা তাকে বিশ শতকের আধুনিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেয়।

কথাকার-সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, কেদার চাটুজ্যে ত্রৈলোক্যনাথের 'তিলু' ও 'ডমরুধরের' সংযত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। এমন যথার্থ মন্তব্যের পর আমাদের সংযোজন, কেদার চাটুজ্যে খাঁটি আধুনিক ব্যক্তিত্বের মানুষ এবং তার উদার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত আছে হাস্যরস-সমৃদ্ধ অহংসর্বস্ব এক উগ্র স্বাতন্ত্র্য-চেতনা। 'দক্ষিণ রায়' গল্পে এই স্বভাব স্পষ্ট। 'স্বয়ম্বরা' গল্পে একাধিক প্রসঙ্গে চাটুজ্যের সংলাপ :

১. 'এই কেদার চাটুজ্যেকে সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পিছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিশ কোর্টের উকিল জেরা করেছে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনও ঘটেনি।'

২. 'বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া করে বললুম—আই কেদার চাটুজ্যে নো জু-গার্ডেন।'

৩. 'আমি সগর্বে উত্তর দিলুম—ইয়েস সার, হাই কাস্ট বেঙ্গলি ব্রাহ্মিণ। পইতেটা টেনে বার করে বললুম—সরি আপ কোন্ হ্যায় ম্যাডাম?'

সোজাসুজি 'আমাকে' না বলে 'এই চাটুজ্যে', 'আই কেদার চাটুজ্যে' ইত্যাদি বলার মধ্যে ভুল ইংরেজি বলা বা সংক্ষিপ্ত করে বলার হাস্যকরতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের উগ্র স্বাতন্ত্র্য দেখানোর প্রয়াস চরিত্রটিকে অনবদ্য হাস্যকরের উপাদান করেছে। কেদার চাটুজ্যে নাগরিক এবং আধুনিক মানুষ, কিন্তু সংযত উদার কৌতুকরসের উদগাতা। হাস্যরসের ধারায় নয়, এমনভাবে কথার বলার ভঙ্গির চরিত্রের কিছুটা সাক্ষাৎ মেলে তারাশঙ্করের কোনো কোনো serio-comic চরিত্রে।

তিন

যে কোনো হাসির গল্পে কৌতুকরসের যে বিচিত্র বর্ণময়তা, স্বাদ ও স্রোত—তার পরিচয় মেলে প্রধান তিনটি সূত্রে—ক. গল্পে কাহিনী ও ঘটনায় নির্মিত জটিল প্লটে সিচুয়েশন রচনায়, খ নানা বিপরীতমুখী চরিত্র নির্মাণে, গ. ফান, উইট, হিউমাব, স্যাটায়ার—রসসিক্ত এমন সব স্বাদের মনোজ্ঞ প্রয়োগে। এসবের সঙ্গে গল্পকার-নির্দিষ্ট ব্যক্তিক, সামাজিক, পাবিবারিক, কেন্দ্রীয় বিষয় ভাবনার অসঙ্গতিগুলিও সাহায্য করে। 'স্বয়ম্বরা' গল্পে এসবেব কমবেশি প্রয়োগ দুর্লক্ষ্য নয়। আগেও একবার বলেছি, তবু এখানে আবার প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেহেতু আমরা 'স্বয়ম্বরা' গল্পের হাস্যরসের চরিত্রই আলোচনা করছি, এদেশীয় এক প্রতিষ্ঠিত সমালোচকের কথা—'স্বয়ম্বরা' গল্পটি প্রহসনের মাত্রাধিক্যের জন্য সূক্ষ্ম রসিকতার মর্যাদা হারিয়েছে, এবং 'উদ্ভট খেয়াল বাস্তবতার মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য' করে 'একেবারে নিছক কল্পনার রাজ্যে উধাও' হয়েছে।

'স্বয়ম্বরা' গল্পে গল্প-শিল্পের কৌতুকের গভীর ব্যঞ্জনা, সংক্ষিপ্তি, সংযম ও স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব আছে টোপার, ব্লটো, বিলের উপযোগী সিচুয়েশন ও চরিত্রনির্মাণে, আছে চাটুজ্যের ট্রেনের মধ্যে ঘাস মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করার মধ্যে, জোনের চটি বা পদাঘাতে দুই মাতাল প্রেমিকের শাসন করার সিচুয়েশন সৃষ্টিতে, ট্রেনেব মধ্যেই বিল ও জোনের নৃত্যতে। এগুলির মধ্যে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার সীমা রক্ষিত না হওয়ায় এদের সৃষ্ট হাস্যরস প্রহসনের লঘুতায় গভীরতা হারিয়েছে। এদের কারোর সংলাপে সেই কৌতুকরস নেই যা গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনার অনুগ হয়। বিবাহের পর গ্র্যান্ড হোটেল থেকে জোনেব পলায়ন ও বিলের তার খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার পরিণামী সিচুয়েশনের মধ্যে গল্পের বাস্তবতা, শিল্প সার্থকতা মানা যায়। চাটুজ্যের গিন্নির শেষদিকে তার স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারের দুটি দিক :

১. 'তক্ষুণি একটা উড়ে নাপিত ডেকে বললেন, 'দে তো রে বুড়োর মুখখানা আচ্ছা করে চেঁচে, ম্লেচ্ছ মাগী উচ্ছিষ্টি করে দিয়েছে।'
২. 'তারপর সেই চুনির আংটিকে কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে আঙুলে পরলেন।'

সমগ্র গল্পের মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন শ্লেষের অসামান্য হাস্যরস আমাদের উতরোল করে তোলে। এই রস-সৃষ্টিতে 'স্বয়ম্বরা' গল্পের কথাকার হন সু-স্বাগত।

চাটুজ্যে-কৃত জোনের বাইরের চেহারা বর্ণনায় অবশ্যই কৌতুকরস আছে। গল্পের মধ্যে অফুরন্ত হাস্যরসের অনুষঙ্গী উপমা প্রয়োগ পরশুরামকে প্রতিভাবান হাস্যরস-শিল্পীর মর্যাদা দেয়। 'পাকা লংকার ফাঁক দিয়ে গুটি কতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল।' 'পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয়নি, মুখ যেন কদম ফুল', 'লজ্জা এসে আমায় আকর্ণ বেগনী করে দিলে,' জোন আংটি দেখতে চাইলে চাটুজ্যের প্রতিক্রিয়ার ভাষা—'আমি ভয়ে ভয়ে হাতটা এগিয়ে দিলুম, যেন আঙুল হাড়া অস্তর করছি।'—এ সমস্তই পরশুরামের কৌতুক-রসাশ্রিত চিন্তাভাবনার ও কথার সমৃদ্ধ মূল্যবান অলংকারে বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের সোনার ভাণ্ডার ভরানো!

দেশের দেশপ্রেমীদের দেশসেবার প্রতি কটাক্ষ করে, বিদেশির প্রতি প্রতিবাদের কথায়, দুই জাতির চরিত্রে যে অসঙ্গতিজনিত শ্লেষচিত্র এঁকেছেন তার রস আমাদেব মুহূর্তে সচকিত করে :

> 'বীর প্রসবিনী হয়ে কাজ নেই মা—ও আশীর্বাদ আমাদের অবলাদের জন্যই তোলা থাক। তুমি আর গরীব কালা-আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না—গুটি কতক শান্তশিষ্ট কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।'

এই সংলাপের মধ্যে শ্লেষের স্বতঃস্ফূর্ততা স্বাভাবিক ও মান্য। 'স্বয়ম্বরা' গল্পে যেটুকু বিশুদ্ধ কৌতুক, স্বতঃস্ফূর্ত শ্লেষ-বক্রোক্তি আছে, তার উৎস আছে চাটুজ্যে চরিত্রেই। তাব এমন দুটি সংলাপ আছে এই গল্পে—যা বাংলা হাস্যরসে কেন, সম্ভবত সারা বিশ্বের হাস্যরসে প্রবাদপ্রতিম উদ্ধৃতি হয়ে আছে :

১. 'আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু? বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া করে বললুম—আই কেদার চাটুজ্যে নো জু-গার্ডেন।'
২. 'মেমকে বললুম—মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক।'

বস্তুত স্বয়ম্বরা গল্পের বৈঠকী মেজাজের পরিবেশে চাটুজ্যেই যাবতীয় সীমার মধ্যে আকাশ-নীল প্রসারতা, হাস্যরসের বিশুদ্ধি ও অসীমতা বজায় রেখেছে।

চার

'স্বয়ম্বরা' গল্পের নামের লক্ষ্য নায়িকা জোন জিলটার। তাই গল্পের নায়িকা চরিত্রটির প্লট-বৃত্তে যাবতীয় সক্রিয়তায় সামগ্রিকভাবে গল্প-নামটি চরিত্র-নামে না সীমাবদ্ধ থেকে তার স্বভাবের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য-নির্দেশক তাৎপর্যে বিস্তৃতি পেয়েছে। নামের অর্থ 'বিশেষ'

(particular) না হয়ে হয়েছে নির্বিশেষ (general)। যে কোনো গল্পের নাম—তা মূল নায়ক-নায়িকা কেন্দ্রিক, বা বক্তব্যকেন্দ্রিক হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে এই বিশেষ একটি নামই গল্পের অবয়ব ও আত্মাকে ধরে রাখে। যে কোনো গল্পের নাম যেনবা দেওয়ালে গাঁথা একটি কঠিন পেরেক, যাতে গল্পের সর্বাবয়ব অস্তিত্ব তার সমূহ ভার রেখে ঝুলে থাকে। অথবা গল্পের নাম হল সেই একটিমাত্র শিকড়ের গাছ, যে শিকড়টি মাটির বুকে গাছকে ধরে রেখে তাকে বাইরের দর্শকের কাছে তুলে ধরে। 'স্বয়ম্বরা' গল্পের নামের মূলে এমন লক্ষ্য অগ্রাহ্য করার নয়।

প্রথম কথা হল, 'স্বয়ম্বরা' যখন লেখা হয়, তখনকার কাল-পরিবেশ দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থায় এমন স্বয়ম্বর হওয়ার মতো দেশীয় নারীদের ঢালাও অধিকার দেয়নি। উনিশ শতকের মতো নারীরা নিশ্চয়ই তেমন পর্দানসীন নয় ঠিক, কিন্তু নারীর পক্ষে self selection-এ কোনো পুরুষ জীবনসঙ্গীকে গ্রহণ শুধু সমাজ কেন, ব্যক্তি-অনুমোদনেও সমর্থন পেত না। এমন যে সময় ও সমাজ-পরিবেশ, সেখানে পরশুরাম এমন একটি বিষয় ও স্বয়ম্বরাদের প্রসঙ্গ এনেছেন যা তাঁর কৌতুক-ব্যঙ্গ রসাশ্রিত ভাবনার অনুগ হয়েছে। সমকালের এক বিপরীত ভাবনা নামকবণে আছে এবং তা দিয়েই গল্পের চাপা উদ্দেশ্যমূলক কটাক্ষ স্থির হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে নামটি শিল্পের স্বীকৃতি পায়।

দ্বিতীয়, 'স্বয়ম্বরা' শব্দটিতে আছে প্রাথমিকভাবে কোনো নারীর পক্ষে পতি গ্রহণে 'স্বেচ্ছায় বরণ', 'স্বচ্ছন্দে কন্যার পতি-স্বীকরণ'। স্বেচ্ছায় পতিবরণকারিণীও স্বয়ম্ববা। যে কন্যা স্বেচ্ছায় পতি অন্বেষণ করে, সে-ও স্বয়ম্বরা। আবার 'স্বয়ম্বর ধর্মে বধূভাবাপন্না' রমণীও স্বয়ম্বরা। জোন জিলটার-এর চরিত্রে বধূভাব নেই, বরং তার মধ্যে আছে স্বেচ্ছায় পতি অন্বেষণী বৃত্তি। গল্পের কথক কেদার চাটুজ্যে যখন জোনকে জিজ্ঞেস করে—'আপনি কোন্ ভালোবাসাটিকে ববণ করবেন?' তখন জোন-এব দ্বিধা ও সংকট :

> 'সে একটি সমস্যা। আমি এখনও মনস্থির কবতে পারিনি। কখনও মনে হয় টিমিই উপযুক্ত পাত্র। বেশ লম্বা পুরুষ, আমাকে ভালোবাসে খুব। .....আর ঐ ব্লটো.........কিন্তু আমার অত্যন্ত বাধ্য আর নরম মন!.....বড় মুস্কিলে পড়েছি......দুজনেই নাছোড়বান্দা।'

এই সংলাপ প্রমাণ করে, জোন স্বেচ্ছায় পতি-অন্বেষণী রমণীই! তার শেষ কথা :

> 'আমার বাপ-মা কেউ নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। দেখ চ্যাটার্জি, তোমার ওপরেই ভার দিলুম।'

গল্পে জোন স্বয়ম্বরা, কিন্তু পতি নির্বাচনের দায়িত্ব শেষে দিয়েছে কথক চাটুজ্যের ওপরেই। এবং গল্পের কাঠামো তাই লেখকের উদ্দেশ্যের উপযোগী জটিলতা ও সার্থকতা পেয়েছে। গল্প-নামের সঙ্গে মূল নায়িকার ও উদ্দেশ্যের জটিল কাঠামোর যোগ থাকায় নাম সার্থক।

তৃতীয় বক্তব্য হল, 'স্বয়ম্বরা' নামটি কিন্তু সবশেষে ব্যঙ্গ-বিষয় হয়ে উঠেছে পরশুরামের হাতে। কৌতুক-ব্যঙ্গরসের গল্পে এমন নামটি অবশ্যই সার্থক। গল্পের শেষে গ্র্যান্ডে বিল বাউন্ডার ও জোন জিলটারের বিবাহ হয়েছে প্রহসন। জোন বিলকেও

ছেড়েছে। সে স্বয়ম্বরা ঠিকই, কিন্তু স্বয়ম্বর ধর্মে বধূভাবাপন্না নয়, 'স্বেচ্ছায় পতিবরণকারিণী'র ভূমিকাতেও থাকেনি, হয়েছে যেনবা চিরকালের শুধুমাত্র পতি-অন্বেষণী রমণীধর্মেরই এক নারী! গল্পের পরিণতি-চিত্র নামের সার্থকতার দিক স্পষ্ট করে।

চতুর্থ একটি জিজ্ঞাসা, গল্পটি লিখে পরশুরাম কি এদেশীয় পরিবেশে এদেশীয় নারী-পুরুষের স্বভাবধর্মে 'স্বয়ম্বরা'-র নিষ্ফলত্বকে কৌতুক-ব্যঙ্গের গভীরে ব্যঙ্গরসে জারিত করতে চেয়েছেন? বিদেশি অর্থাৎ প্রতীচী বিবাহপ্রথা যে অস্থিত সংসার রচনার সম্ভাবনা আনে, তাকে বোঝাতে চেয়েছেন একালের প্রাচ্য সমাজব্যবস্থার পটে! একজন ব্যঙ্গ লেখকের attitude to life -এর পটে এমন নামপ্রয়োগ আর একটি মাত্রা পেয়ে যায় যেন।

৭.

কচি-সংসদ

এক

'কজ্জলী' গ্রন্থের পঞ্চম সংকলিত গল্প 'কচি-সংসদ'। এটি শহর-পটভূমিকায় মানুষদের জীবন এবং স্বভাব বৈচিত্র্যের ও বৈপরীত্যের সরস কৌতুকরসাশ্রিত গল্প। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের তৃতীয় দশকে এবং চতুর্থ দশকের প্রথম দিকেও বেশ কিছু ধনী, শিক্ষিত মানুষ ছিল, যাদের তরুণ প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিরাট অর্থ-সম্পদের জোরে নিজেদের খেয়ালখুশি নিয়েই জীবন-বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাত। এটা সে সময়ের শিক্ষিত নাগরিক সমাজ, মন ও বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পরিণাম। 'কচি-সংসদে'র নায়ক কেষ্টর প্রেমতত্ত্ব-ভাবনা ও হাইকোর্টশিপ এক উজ্জ্বল শৈল্পিক উদাহরণ। একালের কোনো কোনো সমালোচক কেষ্টর মতো নায়কের স্বভাবকে 'তৎকালীন তারুণ্যের পাগলামি' বলে চিহ্নিত করেছেন।

বিশ শতকের সময়প্রবাহে দেখা গেছে, ধারাবাহিক সমাজের এক এক স্তরে এক এক ধরনের তথাকথিত আধুনিকতার বাতিক জন্ম নেয় জনমনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে আধুনিকতায় সাধারণ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ মাতে, পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা হয় পরিত্যক্ত, নতুন ধরনের আধুনিকতা হয় স্বাগত। তথাকথিত এই আধুনিকতা হল এক ধরনের বিলাসী নেশা, আত্ম-সুখকর মোহ, ভাবালুতা। তা অবশ্যই বিশেষ কালনির্ভর উৎকট-স্বভাব চিহ্নিত। একজন ব্যঙ্গচিত্রী গল্পকারের প্রসঙ্গের পক্ষে তা অবশ্যই স্বাগত হবে। পরশুরামের 'কচি-সংসদ' গল্পের এই আধুনিকতা পরশুরামের লেখনী-স্বধিতির লক্ষ্য হয়েছে। আলোচ্য গল্পে অবশ্য, পরশুরাম স্বধর্মে তার কেন্দ্রীয় বিষয়কে রক্তাক্ত করেনি, বিশুদ্ধ হিউমারে, মিলনের মনোরম মমতায়, স্মিত হাস্যের পুষ্পল স্বভাবে তা হয়েছে লাবণ্যধন্য। কেষ্টর কাহিনীর পরিণতিতে পরশুরামের হাতে ধরা স্বধিতি সমান্তরাল শরীরভেদী হয়নি, ঊর্ধ্বাকাশের নিঃসীম নীলাচারী আকর্ষণে বিলাসের উপকরণ হয়ে উঠেছে।

'কচি-সংসদ' গল্পের পরিবেশ, উপাদান অবশ্যই নগরকেন্দ্রিক, পরিবার জীবননির্ভর,

শিক্ষিত, ধনীশ্রেণীর আশ্রয়ী। সমস্ত কিছুব কেন্দ্রে প্রেমই একমাত্র লক্ষ্য। সে প্রেম এক নতুন যৌবন-পাওয়া ধনীর সন্তান কেষ্টর—যে, পদ্মমধু বোস নামে এক তরুণীর পাণিপ্রার্থীতে উৎসাহী! পূর্ববর্তী গল্প 'স্বয়ম্বরা'রও মূল বিষয় প্রেম, কিন্তু সে প্রেম এক স্বয়ম্বরা নারীর মন দিয়ে দেখা, গড়া ও ভাঙা এবং ভাঙা দিয়ে ও নিয়েই তার চলা—অন্তত গল্পকার সেইভাবে তার বিকাশ ও পরিণতিতে ব্যঞ্জনায় বুঝিয়েছেন। 'কচি-সংসদ'-এ প্রেম এক 'কচি' তথা তরুণের 'প্রেম-হয়ে-ওঠা'-র কাহিনী, প্রেমেই তার শেষ, প্রেমেই তার যাবতীয় 'পাগলামী'র দূরীকরণ, সিদ্ধান্তে সুস্থতা ও প্রতিষ্ঠার ওষধি।

'কচি-সংসদ' গল্পের প্লট-বৃত্ত-নির্ভর কাহিনী-অংশ সামান্যই। যেহেতু আদালত বন্ধ, বাড়িতেও মক্কেলদের যাওয়া-আসা প্রায় নেই, এবং পুজোর ছুটির একটা ঢালাও পরিবেশ চারপাশে, তাই গল্পের উত্তমপুরুষ কথক আইনজীবী ব্রজেন—কথায় কথায় কিছু বিকৃত, সফেস্টিকেটেড ইংরেজি শব্দ-মেশানো বাংলা-বলা তার রসিকা স্ত্রীকে নিয়ে দার্জিলিং চলে আসে বেড়াতে। জমিয়ে আড্ডাও বসবে সেখানে, কারণ ব্রজেনের গৃহিণীর মতে তাব ঘনিষ্ঠ পরিচিত 'টুনি-দিদি তাব ননদ, সরোজিনীরা, সুকুমাসী এবং মংকি মিত্তিবদের বউ তার তেরটা এঁড়িগেঁড়ি ছানাপোনা' সেখানেই এখন আছে। এখানেই ব্রজেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় 'সম্পর্ক নির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারি মামা', ডুমরাওনের মোক্তার নকুড় চৌধুরিব। বেনাবসেব বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ-পঁচিশের যুবক কেষ্টব নিজের মামা নকুড় চৌধুবি। এই মামাই হল কেষ্টব বর্তমান অভিভাবক। নকুড়মামার এখানে আসাব কারণ কেষ্টর আরজেন্ট একটি টেলিগ্রাম—যাব বক্তব্য, কেষ্ট দার্জিলিং আসছে, উঠবে মুন-সাইন ভিলায়, এখানে এসে বিবাহ করবে। নকুড়মামা সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে দেখে, ওর আসার আগেই কেষ্ট-- সে 'কচি-সংসদ' ক্লাবেব প্রেসিডেন্ট—সেই ক্লাবের সদস্যরাও বরযাত্রীর মতো উপস্থিত।

সন্ধেয় কেষ্ট এল দার্জিলিং-এর ভিলায়। সে যে চিরাচরিত প্রেম ও বিবাহ-ব্যবস্থাব বিরোধী, তার অদ্ভুত পোশাক, কথাবার্তায় প্রমাণ মেলে। সে প্রেম ও বিবাহের পুরো পুরনো ব্যবস্থাটাই ভাঙতে চায়। কেষ্ট অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত যুবক। পিতৃদত্ত অর্থে তার নানা ব্যবসা ও আমোদ-প্রমোদের বিলাসিতায় আছে পাগলামী। দার্জিলিং এসেছে টুনিদিদিব ননদ, ভুবন বোসেব বোন পদ্মমধু বোসের সঙ্গে তার আদর্শমতো কোর্টশিপ ঠিক করে বিবাহ করতে। প্রেম বিষয়ে কেষ্টর প্রথম কথা—'প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়গ্রাপ্রপাত, আকস্মিক বিপদ—যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।' তার নিজের প্রেম-পদ্ধতিটি হল--পুরোপুরি প্রেম-বিবিক্ত কোর্টশিপ চাই। তাতে দুই যুবক-যুবতী থাকবে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাদের মাঝখানে থাকবে একজন অভিজ্ঞ 'মিড্‌ল্‌ম্যান'—যে দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দুজনের অভ্যাস, মতামত, রুচি এইসব বিচার-বিবেচনা করে সামঞ্জস্য বিধানের দিক ঠিক করবে, তার পরে হবে বিবাহ।

কেষ্টর কথামতো উকিল ব্রজেন মধ্যস্থতার ভূমিকা নেয়। ব্রজেন একটি ঘরে একান্তে বসে ওদের দুজনকে তাদেব প্রত্যেকের রুচি, মতামত ইত্যাদি বিষয়ে নানা জেরা করে।

সে এক কৌতুককর প্রহসন। সর্বশেষ ক্রুদ্ধ কেষ্টর কথা হল, ব্রজেন তার আদর্শকে লঘুভাবে নেওয়ার জন্যই তাদের বিবাহে তার আদর্শের প্রতিফলন বাধা পাচ্ছে। অমীমাংসিত থেকেই ব্রজেনের আলোচনা সেদিন রাতে শেষ হয়ে যায়। ব্রজেন ও তার গৃহিণী রাতেই নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসে। পরের দিন কিছুটা বেলার দিকে মুন-সাইন ভিলায় এসে ব্রজেন ও তার গৃহিণী শোনে, কেষ্ট ও তার মামা, ভুবন বোস ও তার বোন এবং পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে গেছে। উদ্দেশ্য, সেখানেই পদ্মর সঙ্গে কেষ্টর বিবাহ হবে। কচি-সংসদে-র সদস্যরা উদাস হয়ে এক বেদনাকীর্ণ হতাশ অবসর কাটাচ্ছে দার্জিলিং-এই! কলকাতায় কেষ্ট-পদ্মর বিবাহ শেষ, দেড়মাস পরে বিবাহিত কেষ্ট ব্রজেনের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চায়। কচি-সংসদ হয় ছত্রভঙ্গ। পরবর্তী বড়দিনের বন্ধে কেষ্ট সপরিবারে হবে ব্রজেন ও তার স্ত্রীর ভ্রমণসঙ্গী।

এমন প্রায় ঘটনাবিহীন কাহিনী-কাঠামোয় কেষ্ট-পদ্মমধু—দুয়ের প্রেম ও বিবাহই মূল কথা। কেষ্ট নায়ক, অল্প নড়াচড়ায় পদ্মমধু নায়িকা, আর এ দুয়ে প্রেম ও বিবাহের মধ্যে একটি প্রধান যোজক চরিত্র ব্রজেন উকিল। কিন্তু পরশুরাম এদের কথায় কাহিনীকে অকারণ বিস্তারিত করেছেন। গল্পের প্রথম থেকে দার্জিলিং আসার আগে পর্যন্ত ব্রজেন ও তার গৃহিণীর কথোপকথনে কেষ্ট ও পদ্মমধুর কোনো প্রসঙ্গই নেই। ব্রজেনের বাইরে বেরুনোর মানসিক প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণ ও সফেস্টিকেটেড ইংরেজি শব্দ-মেশানো বাংলা-বলা গৃহিণীর সঙ্গ-নেওয়া ও কৌতুককর সংলাপ বিনিময়ের সঙ্গে গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের কোনো যোগাযোগই নেই। কাহিনী-কাঠামোর যে লক্ষণীয় কেন্দ্রবিচ্যুত শৈথিল্য, এখানেই তা ধরা পড়ে। তাছাড়া দার্জিলিং-এ নকুড়মামার কাছে ব্রজেনের কেষ্টর খবর জানতে যাওয়ার পরেও নকুড়মামার 'সব বলছি। তুমি আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দিকি।'—বলে দার্জিলিং বেড়াতে আসা নিয়ে কৌতুককর দীর্ঘ সংলাপ বিনিময় অংশটিও গল্পের কাঠামোগত আংশিক শিথিলতার আর এক দিকও দেখায়। এগুলি প্লট-বৃত্তের শিল্পগত অনৌচিত্যতা স্পষ্ট করে।

আসলে মূল গল্প শুরু নকুড়মামার কেষ্টর স্বভাব ব্রজেনকে জানিয়ে দার্জিলিং আসার কারণ-প্রসঙ্গের অবতারণা দিয়ে। এখান থেকেই গল্পের কাহিনী ও ঘটনার সংহত, সংযত, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুসারী যাত্রা শুরু। ব্রজেনের বেড়াতে বেরুবার আগে দীর্ঘ প্রস্তুতি—যা গল্পের প্রথমে আছে, গল্পের মধ্যে—নকুড়মামার সাধারণ লোকদের দার্জিলিং বেড়াতে আসা নিয়ে যেসব কৌতুককর ধ্যান-ধারণা আছে সেগুলি—পরশুরামের হাতে অনবদ্য বিশুদ্ধ কৌতুকরসের উপাদান হয়েছে স্বীকার করতেই হয়। শিক্ষিত সহৃদয় পাঠক এসবের রসগ্রহণে অবশ্যই তৃপ্ত হবেন, কিন্তু গল্পের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে যোগ না থাকায় তা গল্পের অবয়ব ও রসাধারে নিশ্চিত বাড়াবাড়ির সৃষ্টি করে। দার্জিলিং-এর পরিবেশে নকুড়মামার মূল গল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কথাবার্তায় পরশুরাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈঠকী মেজাজটি, আড্ডার গতিশীল স্বভাবটি বজায় রাখায় কিছুটা শিল্প-সীমার প্রান্তে থাকে বটে, তবে একটি ছোট গল্পের সংহত, সংযত চেহারায় অতিকথনের দোষ ঢাকতে পারে না।

'কচি-সংসদ' গল্পটির প্লটে কচি-সংসদের সভ্যদের নিয়ে একটি বৈঠকী কথকতার ভিত, আড্ডার একটি উতরোল রসালো পরিবেশ রচনা করতে পারতেন গল্পকার, কিন্তু গল্পকার নিজে তার ধারে-কাছে যাননি যে, কেষ্ট-পদ্মর প্রসঙ্গে তার প্রমাণ মেলে। সেখানে গল্প দ্রুতগতিসম্পন্ন, অসামান্য শিল্প সংযমে অনুভব করার বিষয়। গল্পের কাহিনী ও ঘটনাগত 'মহামুহূর্ত' কেষ্টর চাকর, নেপালি ক্ষত্রিয় বোদার কৌতুক-রসাভাষ-যুক্ত সংলাপে মেলে :

"বলিল, বাবু বাগা।"

'আঁ? কেষ্টবাবু ভাগা! কাঁহা ভাগা? নিশ্চয়ই ভুবনবাবুর বাড়িতে গিয়া হোগা।'

'বুবনবাবু বাগ গিয়া! উনকি বিবি বাগ গিয়া! উনকি কোকি বাগ গিয়া। কোকিকা গোড়া বাগ গিয়া। গোরে-সিঙমিশবাবা যো থি সো বি বাগ গিয়া।'"

কেষ্ট সকলের সঙ্গে কলকাতায় গেছে এমন সংবাদই কাহিনীর 'মহামুহূর্ত'। কিন্তু গল্পটির মূল লক্ষ্য হল কেষ্ট চরিত্রের ও প্রেম-মানসিকতার বিবর্তনে। সেক্ষেত্রে ব্রজেনের জেরার সময় শেষদিকে কেষ্ট যখন উত্তেজিত হয়ে পদ্মকে বলে :

"'আচ্ছা, তোমার হাতটা দেখি একবার—কিরকম পাঞ্জার জোর—

কেষ্ট খপ করিয়া পদ্মর পদ্মহস্ত ধরিল। আমি বলিলাম, 'হাঁ, হাঁ—ও কি! সাক্ষীর ওপর হামলা!....'

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'বেশ তো, আপনি ফের কোশ্চেন করুন।'

আমি। 'আর দরকার নেই।'....."

জেরার একেবারে শেষদিকে পদ্মর পদ্মের মতো নরম হাত ধরা, কেষ্টর অপ্রতিভ হওয়া, শেষে ব্রজেনের এক বছরের জন্য কেস মুলতুবি করার প্রসঙ্গের মধ্যেই কেষ্টর পরোক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়ার স্বভাবটিতেই প্রেমের সূক্ষ্ম জাগরণের চরিত্রগত 'মহামুহূর্ত' থেকে গেছে। কেষ্টব সকলের অজ্ঞাতে পদ্মমধুদের সঙ্গে কলকাতা আসা ও বিবাহে মত দান এখানকার প্রতিক্রিয়াতেই প্রাথমিকভাবে মেলে। গল্পের শেষতম পরিচ্ছেদটি কাহিনী ও ঘটনা-পরিবৃত প্লটের উপসংহার মাত্র, বিশুদ্ধ হিউমারশীলিত। ব্রজেন ও গৃহিণী, ব্রজেন ও নকুড়মামা—প্রসঙ্গ দুটির অতি বিস্তারই গল্পের কেন্দ্রস্থ রসাস্বাদে অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করে, প্রসঙ্গগুলির মধ্যস্থ হাস্যরস বস্তুত শিল্পযুক্তিকে ঢেকে রাখে।

দুই

কোনো কোনো পাঠক এমন ভাবতে পারেন যে, পরশুরাম তাঁর সৃষ্ট ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা, অমোঘতা, বিশুদ্ধিকেই নিশ্চয়ই বোঝেন এবং গল্পের দেহে ও আত্মায় প্রয়োগে যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত, কিন্তু প্রেমের 'সার' কথায় তাঁর চিন্তাভাবনা লক্ষণীয় সীমা পেয়ে যায়। অর্থাৎ গল্পের সর্ব বিষয়ে ও উপস্থাপনায় পরশুরাম যথার্থ ব্যঙ্গশিল্পী, কিন্তু প্রেম-বিষয়ের প্রতিচিত্রণে সীমাবদ্ধ শিল্প-ক্ষমতার অধিকারী। এমন কথাটি আমরা মেনে নিতে পারি না।

অন্তত 'কজ্জলী' গ্রন্থের কয়েকটি প্রেম বিষয়ক গল্পকে বিচার করলে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা সহজেই প্রমাণিত হয়ে যায়।

'কজ্জলী' গ্রন্থের প্রথম চারটি গল্প—'বিরিঞ্চিবাবা' 'জাবালি, 'স্বয়ম্বরা' ও 'কচি-সংসদ'—এদের মধ্যে প্রেমের কথা কোথাও মাত্র প্রাসঙ্গিকতায়, খণ্ডচিত্রে, কোথাও নিষ্ফল প্রেমভাবের সূচনামাত্রে, কোথাও বা প্রেমের জটিলতম মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবে ও বিশুদ্ধ প্রেমজীবন গ্রহণের মধ্যে দিয়েও জায়গা করে নিয়েছে। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের বিরিঞ্চিবাবার স্বরূপ উদঘাটনের আগে, প্রস্তুতিপর্বে একবার মাত্র সত্যব্রত ও বুঁচকির চা-খাওয়ানোর প্রসঙ্গে উভয়ের সংলাপ বিনিময় হয়েছে। এই প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ও সত্যব্রতর বুঁচকির অনুরাগ-অনুযোগ ও তার বাবার কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গের submissive চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে কিছুটা 'রিলিফে'র স্থান পেয়েছে। কিন্তু গল্পের উপসংহার অংশ—যা মূল গল্প থেকে বিচ্ছিন্ন, অথচ প্রেম-জাগরণের পক্ষে এক অনবদ্য প্রেম-মনস্তত্ত্বের রূপচিত্র, তা আঁকা পরশুরামের পক্ষেই সম্ভব। প্রেমের রোমাঞ্চের এমন মনোরম স্বাদগ্রহণে পরশুরাম প্রেমচিত্রণের শিল্পী হিসেবে স্বাগত :

> "সত্য। আমি বুঁচকিকে বিয়ে করব।
> নিবারণ। তাতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে যদি না দেয়।
> সত্য। আলবৎ দেবে। বুঁচকির বাপ দেবে।
> নিবাবণ। বাপ না হয রাজি হল, কিন্তু মেয়ে কি বলে?
> সত্য। বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।
> নিবারণ। কি বলে বুঁচকি?
> সত্য। বললে—যাঃ
> নিবারণ। দূর গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁ।"

'জাবালি' গল্প অবশ্যই প্রেমের গল্প নয়, কিন্তু ইন্দ্র-কর্তৃক প্রেরিত স্বর্গের বারবনিতা ঘৃতাচীকে জাবালির সামনে যেভাবে অভিনয় করতে হয়েছে, তা নিপুণ দেহপসারিণী, লাস্যময়ী এক প্রেমিকারই! ঘৃতাচী প্রায়-প্রৌঢ়া, কিন্তু তার ছলাকলা প্রেম-মোহ-জাগানোর উপযোগী :

> "'অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। তুমি প্রসন্ন হও। এ সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তোমারই...সকলই তোমার। আমিও তোমার। আমার যা কিছু আছে— নাঃ থাক।'—এই পর্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নিচু করিলেন।....
> 'আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, —চিরযৌবনা নিটোলা নিখুঁতা উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছটফট করে।'"

এই সমস্ত সংলাপে অবশ্যই কৃত্রিম, নিষ্ফল প্রেম ও দেহবাসনার উপস্থাপনা আছে, কিন্তু পরশুরামেব প্রেমসূত্রে রোমান্স রসসৃষ্টির যে যথোচিত ক্ষমতা আছে, তা-ও অস্বীকার করার নয়—এইসব অংশ তার প্রমাণ দেয়।

'স্বয়ম্বরা' ও 'কচি-সংসদ' দুটিই প্রেমের গল্প, প্রেম রসাত্মক গল্প। অবশ্যই দুয়ের লক্ষ্য ও রসাস্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথম গল্পে যেমন শ্লেষ আছে, ব্যঙ্গও, দ্বিতীয় গল্পে

আছে কটাক্ষ ও বিশুদ্ধ কৌতুক। 'স্বয়ম্বরা' জোন একসঙ্গে একাধিক প্রেমিক গ্রহণে ও পরিচালনায় পারদর্শিনী, এরপর স্থায়ী নির্বাচনে তার মানসিকতা আলাদা। সে দুই স্তাবককে সহ্য করে, বশে রাখে, আবার তাড়াতেও জানে। বিল বাউন্ডারকে গ্রহণ করে, বিবাহের পর তাকেও ত্যাগে নির্দ্বিধ। তার প্রেমের রোমান্স থাকলেও তা নারী-মনস্তত্ত্বের জটিলতায় নায়িকাকে চিরকালের 'ককেট' করে তোলে। একদিক থেকে নারীব প্রেমধারণার 'সার' অংশে যে গভীর রহস্য জড়িত 'ককেটিজ্‌ম্, ছলনাময়ী স্বভাব কাজ করে, তার চমৎকার প্রমাণ রেখেছেন। জোন পরশুরামের বিদেশিনী নারী চরিত্র ও তাব প্রেম-ভাবনার প্রতি ব্যঙ্গকে অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

অন্যদিকে 'কচি-সংসদে'র কেষ্টর যে চরিত্র-বিবর্তন—যা গল্পকারের মূল লক্ষ্য, তার মধ্যেকার প্রেম বিশুদ্ধ কৌতুকরসের মর্যাদা পেয়েছে। একটি যুবককে তার উদ্ভট, উৎকট প্রেমতত্ত্ব ভাবনা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে এক নারীর প্রতি সুস্থ প্রেমের জীবনে আনতে পেরেছে, এখানে গল্পের পরিণতি। 'কচি-সংসদ' অবশ্যই খাঁটি প্রেমের গল্প—অফুরন্ত ও বিশুদ্ধ শ্লেষ-কটাক্ষের কৌতুকরসে সম্যক জারিত। শুধু সে সময়ে তরুণদেব উৎকট আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ কবার ভাবনাতেই কেষ্টকে আঁকা। আসলে কেষ্ট প্রেমিক নায়কই' এর রোমান্সে অনাবিল কৌতুকরস প্রবাহিত থাকার কারণেই রোমান্স হয়েছে লঘুলক্ষ বিহঙ্গের মতো বিস্ময়-সঞ্চারী। প্রেমেব 'সার' কথা যে পরশুরাম বোঝেন, কেষ্টর যাবতীয় সীমার মধ্যে অসীম হৃদয় আবেদনে সাড়া দেওয়াতেই তা প্রমাণ হয়ে যায়। পরশুরাম ব্যঙ্গবসেব লেখক ঠিকই, কিন্তু প্রেমের রোমান্সের 'সার' বোঝাতে তিনি অসামান্য কৌতুকরসের জোগানদার। তাঁর প্রেমের বোমান্সে কৌতুকরসের মিশেল বাংলা সাহিত্যে নতুন জাতের প্রেমের গল্পের জন্ম দিয়েছে। এই ধারায় তিনি একজন পথিকৃৎ গল্পকার।

তিন

পবশুবাম বিশ শতকের ব্যঙ্গগল্প-শিল্পী। তাই তাঁর হাতে যেমন আছে ব্যঙ্গ-কৌতুকেব ঝকঝকে কুঠার, তেমনি স্বভাবে আছে সমালোচনা করার মতো নিস্পৃহ মন। এটাই স্বাভাবিক। উনিশ শতকে বেশি ছিল শুধু সমালোচনা, বিশ শতকে আত্ম-সমালোচনা। তাঁর গল্পে তাই সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররাই প্রকট করেছে। 'কচি-সংসদ' গল্পের কেষ্ট সেরকম এক চরিত্র-আধার। সে-ই গল্পের নায়ক। তার পুরুষ-রমণীর সম্পর্ক ও বিবাহ-ভাবনা নিয়ে যে অভিনব প্রথা-বিরোধী চিন্তা—তাকেই সেকালের যুবক যুবতীদের ও তাদের অত্যাধুনিক পরিবেশের আয়নায় রেখে পবশুরাম উগ্র আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ-কৌতুকে বিচিত্র-স্বাদী করতে চেয়েছেন। তৃতীয় দশকের ধনী শিক্ষিত নাগরিক ব্যক্তিত্বের যুবকদের প্রেম-সম্পর্কিত ভাবনা ও তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচাই করার বিলাসী প্রয়াস—কেষ্টর মূল ভিত্তিতে ধরা পড়ে।

প্রেমিক কেষ্টর বিদ্রোহ ঘোষণা তার কথায় ও কাজে, তার পরিচ্ছদ ও প্রেমের বোঝাপড়ায়। পরশুরামের লেখনীতে কেষ্টর প্রাথমিক রূপ :

'কেষ্টর আপাদমস্তক বাঙালির আধুনিক বেশ বিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্বকেশরের মতন ছাঁটা, গোঁফ নাই, কিন্তু ঠোঁটের নিচে ছোট একগোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট. কোমরে বেল্ট, মালকোঁচা মারা বেগনি রঙের ধুতি, পায়ে পট্টি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁতকা, পিঠে কেম্বিসের ন্যাপসাক স্ট্রাপ দিয়া বাঁধা।'

এই চেহারা তৈরিতে পরশুরাম স্পষ্টত সেকালের সমাজের ধনী তরুণদের প্রেমিক হওয়া নিয়ে উৎকট আধুনিকতার চরম ব্যঙ্গ করেছেন বোঝা যায়। এমন যে কেষ্ট, তার নিজের মুখে বলা জীবন ও প্রেম-জীবন এবং তত্ত্ব সম্পর্কে থিওরিগুলি হল :

১. জীবনটা ছেলেখেলা নয়, আর্ট অ্যান্ড এফিশেন্সি।'

২. 'আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসিদ্ধ, বেপরোয়া।'

৩. 'প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়।'

৪. 'আমি বিবাহ করতে চাই জগতে একটা আদর্শ দেখাবার জন্যে।... আমার সিস্টেম হচ্ছে—প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই লুকোচুরি আসবে। চাই—দুজন নির্লিপ্ত সুশিক্ষিত নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ ভুক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি—যিনি নানা বিষয়ে উভয়পক্ষের মতামত বেশ করে মিলিয়ে দেখবেন।'

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং নায়কও কেষ্ট। তার যে নরনারীর প্রেম সম্পর্কে ব্যাখ্যা -- তা কিছুটা নিশ্চিত সুস্থ, বাস্তবিক অর্থে কাম্য। কিন্তু তার প্রেম যাচাইয়ের 'সিস্টেম'— যা তৃতীয় পুরুষের বিচারের অপেক্ষা রাখে—সেখানে ব্রজেনকে এনে পরশুরাম কেষ্ট-প্রসঙ্গকে কৌতুককর করেছেন। গল্পে কেষ্ট আসার পর থেকে ব্রজেনের মধ্যস্থতা করার অংশটি অনবদ্য কৌতুকরসে উজ্জ্বল। এখানে ব্যঙ্গ কম, প্রেম নিয়ে নির্ভেজাল কৌতুক। কেষ্টর বিদ্রোহ ক্রমে হয় কৌতুককর বোকামি, আর এই বোকামি তা-ই যা পুরুষ ও রমণীকে প্রাথমিক পর্বে আবশ্যিকভাবে সলজ্জ, নীরব, আড়ষ্ট ও অবনত মুখ করে। ব্রজেনের মধ্যস্থতায় 'হাইকোর্টশিপ' ভেঙে যাওয়ার পর ব্রজেনের স্ত্রী কেষ্টর যে বর্ণনা দিয়ে তার কলকাতা পলায়নকে বিবৃত করেছে, তাতে কেষ্ট ব্যঙ্গের নায়ক নয়, হয়েছে নির্মল কৌতুকের উপাদান। যাঁরা মনে করেন পরশুরাম প্রেমের 'সার' বোঝেন না, তাঁর প্রেমচিত্রে 'রোমান্স' ভালো জমেনি, তাঁরা পরশুরামের প্রেম-সম্পর্কিত গল্পের বিচার ঠিক করেন না।

ব্রজেনের 'হাইকোর্টশিপে'র মধ্যেই অসাধারণ শুভ্র সংযত কৌতুকরসের একাধিক প্রসঙ্গে কেষ্টর প্রেমিক সত্তার বিবর্তন-রূপ এঁকেছেন গল্পকার বিবর্তনের অন্তঃশীল ভাবে :

১. 'আমি।....আচ্ছা—কেষ্ট পদ্মর চেহারাটা তোমার কি রকম পছন্দ হয়?'

কেষ্ট। তা মন্দ কি।...

পদ্ম লাল হইল। কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা

হাসি হাসিয়া বলিল—'খাখ্-খাসা চেহারা। এঃ, পদ্ম আর সে পদ্ম নেই, এক্‌কেবারে—'

২. 'পদ্ম ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কেষ্টর প্রতি চকিত দৃষ্টি হানিয়া বলিল—'যেন একটি সঙ!'
কেষ্ট। তা—আ আমি না-হয় মাথার চুলটা একটা ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব।'

৩. 'তোমার মতামত জানতে পারলে আমি না-হয় আমার আদর্শ সম্বন্ধে ফের বিবেচনা করব।'

কেষ্ট-বিষয়ক এইসব প্রাসঙ্গিক চিত্রে অবশ্যই আছে প্রেমিক কেষ্টর পদ্মমধুর কাছে প্রচ্ছন্ন ভালো লাগা ও প্রেমের ক্রমিক আত্মসমর্পণের বিবর্তন-আভাস, আছে এক অদ্ভুত স্বাদের রোমান্স-কণিকাগুলি! শেষে কেষ্ট যখন পদ্মের হাত হঠাৎ ধরে ফেলে, এবং ব্রজেনের কথায় 'অপ্রতিভ' হয়, তখনই সেই প্রেমের রক্তিম সলজ্জ চিবুকের মতো এক লাবণ্যময় আভা কেষ্টর স্বভাবের গভীরে চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। আর সব শেষে ব্রজেনের গৃহিণীর সেই বর্ণনা :

> 'রাত বারোটার সময় দেখি—কেষ্ট টিপিটিপি আসছে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো। চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বললে—কেষ্ট, কি হয়েছে? কেষ্ট বললে, পদ্মের সঙ্গে বে না হলে সে আর এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তর সইছে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা অ্যাসিড।..... সে এক্ষুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক সাজবে'.....।'

প্রেমের আবেগে, বিরহে নাবীর কাছে নায়কের এমন সন্ধিপত্র রচনা ও সমর্পণের দুর্লভ চিত্র হাস্যরসে অনবদ্য। কেষ্টর অসহায়তার প্রতি পাঠকেরও বুঝিবা সূক্ষ্ম সমবেদনা জেগে ওঠে কখন! পদ্ম তাকে 'সঙ' বলেছিল, তাতে সে আদর্শ ত্যাগ করে ভব্য হতে চায়। পদ্মদের পরিবারের সঙ্গে, মামার সঙ্গে কেষ্টর পলায়ন গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি। কেষ্টর বিবর্তন স্বাভাবিক এবং শুভশ্রী কৌতুকরসসিক্ত। বস্তুত বাংলা প্রেমের ছোটগল্পে 'কচি-সংসদ' তার কাঠামোগত নিখুঁত শিল্পের সীমার পরিচয় না দিলেও একটি শ্রেষ্ঠ কৌতুকরসাশ্রিত প্রেমের গল্প।

সমগ্র গল্পের কাঠামোয় কেষ্ট চরিত্র ও তার প্রেমতত্ত্বই গল্পকারের মূল লক্ষ্য। গল্পে আবির্ভাব ও শেষে কলকাতা পলায়নের অংশটি সার্থক ছোটগল্পের মাপে নির্দিষ্ট। কেষ্ট-ব্রজেন-পদ্মর 'হাইকোর্টশিপ' অংশটি ব্যঙ্গ নয়, বিশুদ্ধ কৌতুকরসে এক অনবদ্য সিচুয়েশন। এখানে পরশুরাম অদ্বিতীয়। পরশুরামের কেষ্ট গল্পের চরিত্রমাত্র নয়, গল্পকারের একান্ত নিজস্ব মৌলিক ক্রিয়েশন। কেষ্ট শুধু তার স্রষ্টার হাতে 'কমিক' নয়, প্রেমিক। ধনীর শিক্ষিত ছেলে বিলাসী হবে—এ তো স্বাভাবিক! তার ছবি-আঁকা শেখা ছেড়ে আমসত্ত্বর কলে টাকা ওড়ানো, কচি-কাঁচাদের নিয়ে কলকাতায় সমিতি গড়ে তার সর্দারি করা, বম্বে গমন—সবই তার অস্থির-চিত্ততার সম্যক পরিচয়। গল্পের একেবারে

শেষে সে লজ্জিত, ব্রজেনের কাছে বিনীত ক্ষমাপ্রার্থী এক বিবাহিত যুবক এবং সস্ত্রীক ব্রজেনের ভ্রমণসঙ্গী। এই দু'য়ের মধ্যবর্তী অংশে কেষ্টকে নিয়ে যে হাস্যরসের turmoil তা-ই পরশুরামের লক্ষ্য যেমন, তেমনি কেষ্ট চরিত্রের বড় ঐশ্বর্য!

কেষ্ট ছাড়া 'কচি-সংসদ' গল্পে পরশুরাম একাধিক ব্যক্তিত্বকে এনেছেন। উকিল ব্রজেনের শিল্প-উপযোগিতা কেবল কেষ্ট-পদ্মর প্রেমসম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতা করা। সেটুকুতেই তা শেষ আর গল্পের কথক হিসেবে কাহিনীকে জুড়েছে গল্পের উপযোগী করে—এখানেই তার সূত্রযোগ। সে রসিক, ভ্রমণবিলাসী এবং কেষ্টকে ভ্রমণের নেশায় সহযোগী করাতেই তার চরিত্র হিসেবে সক্রিয়তার সীমা রচনা। কেষ্টর নকুড়মামা দার্জিলিং-এ যেভাবে এবং যেসব কথা বলেছে, তাতে গল্পের কৌতুকরস, কিছুটা শ্লেষ দানা বাঁধে বটে, কিন্তু গল্পের মূল লক্ষ্যে তার প্রয়োজন তেমন নেই। কাহিনীর একটি পলকা সুতো তার হাতে ধরা। কচি-সংসদের ক্লাবে তাকে ব্রজেনের ওপরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ার যুক্তি দিয়ে পাঠানোর মধ্যেই তার প্রয়োজন শেষ। নকুড়মামা কৌতুকরসের গতানুগতিক ব্যক্তিত্ব। ব্রজেনের স্ত্রী চরিত্রের প্রয়োজনও গল্প-শিল্পের সংহত, সংযত কাঠামোয় খুব বেশি নয়। সে ইংরেজি শব্দের কিছু বিকৃত, হাস্যরসের উদ্রেককারী ভঙ্গি উচ্চারণে আমাদের মজার মধ্যে আনে বটে, কিন্তু তার প্রয়োজন শুধু কেষ্টর পরিণতি চিত্র উপহারেই শেষ। এই চরিত্রের অতিরিক্ততা গল্পের ঢিলেঢালা শবীব হওয়ার জন্য অনেকটা দায়ী।

ভৃত্য বোদার নির্বোধ, বিস্ময়-বিস্ফোরক হিন্দি সংলাপ, সে সবের উচ্চারণ ভঙ্গিটুকু যে হাসির খোরাক দেয়, তাতে চরিত্রব্যক্তিত্বের কোনো হাসির উপযোগী অসঙ্গতি নেই। গল্পটির মধ্যে পরশুরাম কচি-সংসদের কয়েকজন সদস্যের যে নামে পরিচয় দিয়েছেন, তারা কেউই চরিত্র হয়ে ওঠেনি। নামগুলি হাস্যকর এবং নিশ্চিত শ্লেষ-কটাক্ষের অঙ্গুলিনির্দেশক, কিন্তু গল্পে তাদেব যোগ প্রায় নেই বললেই হয়। একবাব পেলব রায় ও লালিমা পাল (পুং) সামান্য কিছু সংলাপে নিজেদের ভূমিকার জানান দিয়েছে, কিন্তু তাতে তাদের কচি-সংসদের প্রতিনিধিত্বমূলক চারিত্র্য যেমন উঠে আসেনি, তেমনি প্রেমিক কেষ্টর বিবর্তনে তাদের কোনো ভূমিকাই ধরা পড়েনি। নিছক নামে হাসির উদ্রেক করিয়ে হাস্যরসের একটা পরিবেশ রচনাতেই এদের দায়িত্ব শেষ। অর্ধ-শতক আগেকার বঙ্গসমাজের উপযোগী শিক্ষিত আধুনিক, নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত যুবকদের ব্যঙ্গ করতেই এদের এমন নাম যেন কল্পিত, মূল গল্পে এরা যেনবা অপ্রয়োজনীয় 'প্যারাসাইট' চরিত্র।

চার

'কচি-সংসদ' গল্পটির যে হাস্যরস, তার প্রধান আধারগুলি হল—ক. যথোচিত ভাষাপ্রয়োগ, খ. প্রত্যেকটি ব্যক্তিচরিত্রের মানানসই সংলাপ, গ. সিচুয়েশন সৃষ্টির চমক, ঘ. বিষয় নির্বাচনের বিশিষ্টতা। পরশুরামের পরিহাস-কুশলতায়, বিশেষ এই গল্প ধরে আলোচনার আগে, সাধারণভাবে হাস্যরস সৃষ্টির একটি উপমানির্ভর সংজ্ঞা রাখা যেতে

পারে—যা বর্তমান গল্পকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমন অনেক আয়না আছে, যেগুলি নিখুঁত plain নয়, oval ; এবং সেগুলির কাচে এই oval বৈশিষ্ট্য কখনো কম, কখনো যথেষ্ট Irregular। এমন আয়নায় মুখ রাখলে একাধিক মানুষের মুখাবয়বে নানান হাস্যকর, ব্যঙ্গাত্মক ও বীভৎস বিম্ব ও ভঙ্গি তৈরি হয়। তা স্রষ্টার কাছে যেমন হাস্যকর, তেমনি হাসতে হাসতে কখন যেন দ্রষ্টার নিঃসঙ্গতার গভীরে নিজের মধ্যে ব্যঙ্গ, ভয়, ঘৃণা তৈরি করে দেয়।

পরশুরামের সমস্ত গল্পের হাস্যরস-স্বভাবের বৈচিত্র্যের কথা ভাবলে এমন সব আয়নার কথা মনে পড়ে যায়। এই আয়নায় যে কোনো একজন স্রষ্টা নিজের মুখকে মনে করে অন্যের মুখ, হাসি, হঠাৎ-হঠাৎ নিজের বিকৃতি ভেবে বীভৎসতায় ভয় পায়। 'কচি-সংসদ' গল্পের হাস্যরসে একসঙ্গে এত বহু বিচিত্র হাস্যরসের পরিচয় নেই, তবে হাসির মজা পাওয়ার রসদও কম নয়। 'কচি-সংসদের' মূল কথাই হল কেষ্টর প্রেম ও তার বিবর্তন, প্রেমের কমেডিসুলভ পরিণতি! তাই হাস্যরস সৃষ্টির মাটিটাই এ গল্পে সরস, স্নিগ্ধ এবং অতি-আকর্ষণীয়। আর পরশুরাম তার জন্য চমৎকার সব 'সিচুয়েশন' রচনা করেছেন। দার্জিলিং-এর মুন-সাইন ভিলায় কচি-সংসদের সদস্যদের সমবেত হওয়া, কেষ্ট-ব্রজেন-পদ্মর 'হাইকোর্টশিপ' ব্যবস্থা, কেষ্টর রাত বারোটায় টুনিদিদির ঘরের কাছে 'টিপিটিপি' আগমন—এমন সব অবস্থা নির্মল হাসির ফোয়ারা তোলে।

কিন্তু পরশুরামের হাস্যরসের যেটা বড় দিক—যথোচিত ভাষাপ্রয়োগ ও অনবদ্য ঔচিত্যপূর্ণ সংলাপ-যোজনা—তা 'কচি সংসদে'র হাস্যরসকে তুমুল করে তুলেছে। ব্রজেনের স্ত্রীর মুখে 'হোআট-হোআট-হোআট', 'হোআট ইয়ে' 'হোয়াট পাহাড়', 'হ্যাং ডালহাউসি', 'তুমি একটা ক্যাড', 'ড্যাম ফ্রয়েড', 'খবদ্দার ও মুখপোড়ার নাম করো না বলছি', 'রিপিং'—এমন সব বাংলা মেশানো ভাঙা বিকৃত ইংরেজি শব্দের অবলীলায় উচ্চারণে ও মন্তব্যে হাসি নিশ্চয়ই ঝরে পড়ে। 'পেলারামে'র 'পেলব রায়' হওয়া, 'লালিমা পাল' (পুং) হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার মধ্যেও নির্মল অথচ কিছু কটাক্ষ চিহ্নিত হাস্যরসটুকু স্বাদ নিতে আমরা নির্দ্বিধ। নকুড়মামার সংলাপও বৈঠকী 'কোটিং' পেয়ে যায় বলার গুণে ও পরিবেশের প্রভাবে।

অবশ্য এইসব হাসির টুকরো মুক্তোর মত জ্বলেছে গল্পে ঠিকই, কিন্তু গভীর গাঢ় হাস্যরসকে জমাট করেছে কেষ্ট স্বয়ং। তার আদর্শ, প্রেমতত্ত্ব, তার প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করার মতো নিজের বিদ্রোহীর পোশাক, তার কথাবার্তা নিটোল হাসির তুবড়ি-বোমা যেন! 'হাইকোর্টশিপে'র সময় সেই বোমা নানা রঙের ফুলঝুরি ঝরায় চারপাশে। 'কচি-সংসদ' সাধুগদ্যে লেখা সংলাপ চলিত রীতির। যে কোনো হাস্যরসে থাকে দুটি ধর্ম—১ বিষয়ে অসঙ্গতি ও চরিত্রে বৈপরীত্য, ২. চিন্তাভাবনার অতিশায়িতা ও অতিরিক্ততা (Excess)। কেষ্টর স্বভাবে যে excess তা সমগ্র গল্পের হাস্যরস সৃজনের কারণেই excess। তা চরিত্রে ও তার সংলাপে চমৎকার মানানসই।

'কচি-সংসদ' গল্পে ব্যঙ্গ ও সমালোচনার থেকে শুভ্র হাস্যরসই বেশি। লেখকের

সমালোচনার পাত্রী হতে পারে ব্রজেনের স্ত্রী, কচি-সংসদের সদস্যরা ও কেষ্টর পোশাক, অবয়ব, কিন্তু বাকি সমস্তই বিশুদ্ধ হিউমারে হয়েছে নির্মল স্নাত। আমরা প্রেমের গল্প পড়ি এবং উতরোল হাসির মধ্যে কখন যেন সমবেদনায় কেষ্ট ও পদ্মকে আশীর্বাদও দিয়ে ফেলি! পদ্মই এ গল্পের সবচেয়ে প্রকৃতিস্থ চরিত্র। তার পরিকল্পনাই সমগ্র গল্পের কেষ্ট-চরিত্র-নিহিত অসঙ্গতির বিস্তারকে কেন্দ্রস্থ করেছে অন্তিম পরিণতির শুভ স্বাগতম জানানোর মধ্যে। কেষ্টকে সোজাসুজি 'সঙ' বলা, দারোয়ানের কথা-প্রসঙ্গ টানা—এসবে নির্মল ঠাট্টা ও কৌতুক, আবার ব্রজেনের স্ত্রীর বর্ণনায় তার অন্তিম স্বভাব : 'পদ্ম বিগড়ে বসল। টুনি-দি বললে নে, নেঃ—নেকী!'—এসবের মধ্যে গল্পের জ্যোৎস্নায় উচ্ছল স্বভাবের হাসিতে যেমন পদ্মকে যাচাই করতে বাধ্য হই, পাঠকরাও বিশুদ্ধ হাস্যরসের আস্বাদে মগ্ন হয়ে যায়। বস্তুত, পদ্মর চরিত্রই গল্পটিকে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে স্থিত করেছে। সেই কেন্দ্রের নাম 'প্রেম'। পরশুরামের লক্ষ্যও তাই-ই: পরশুরাম যে একজন বিশুদ্ধ কৌতুকের পোশাক-ঢাকা সংযত প্রেমিকার চরিত্রনির্মাণে বিশ্বকর্মার ভূমিকায় আসতে পারেন, পদ্মমধু বোস তার নাম ও কথা এবং কাজ দিয়ে তারই প্রমাণ দেয়।

পাঁচ

গল্পের নাম 'কচি-সংসদ', কিন্তু নানা সূত্রের বিচারে এমন নাম গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। প্রথম কথা হল, নায়ক কেষ্টর প্রেমের পর যে বিয়ে হবে, তার 'বরযাত্রীদের' সঙ্গে আমাদের আগেই দেখা করিয়ে দিয়েছেন গল্পে। তারা বরযাত্রী হিসেবে দার্জিলিং মুন-ইন হোটেলে কেষ্টরই নির্দেশে সমাগত। তারা মামা নকুড়ের কথায় 'বরযাত্রী দল'। সকলেই 'কচি-সংসদের' সদস্য, কেষ্টই তার সভাপতি। নকুড়মামার কথাতেই 'কচি-সংসদ' কথাটা পাই। গল্পকার কেষ্টকে এর সভাপতি করে গল্পে তার এক সূত্র যোগ করেছেন। মনে হতে পারে, নামটার একটা শিল্প-তাৎপর্য এতে মিলতে পারে। কেষ্ট যেহেতু নায়ক, সে যেহেতু সংসদের সভাপতি, তাই নামটা অ-যথার্থ হয়নি প্রাথমিক অর্থে।

কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এইখানেই শিল্পের যাথার্থ্যের সূত্র প্রধান বিরোধিতায় উঠে আসে। কচি-সংসদের সদস্যরা পরিচিত হয় ব্রজেনদার সঙ্গে পেলব রায়ের মধ্যস্থতায়। কিন্তু ওইটুকুই, তারপর থেকে এমন পেলব রায় সহ সাতজন বিচিত্র নামের সদস্যগুলি মূল গল্পের সঙ্গে বড় প্রয়োজনে আদৌ যুক্ত হয়নি। তাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য ও গল্পের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে যোগে কোনো শিল্পগত উপযোগিতা ধরা পড়েনি। তা হলে মূল লক্ষ্য থেকে কচি-সংসদের সদস্যরা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে এমন গল্প-নামের যৌক্তিকতা শক্ত মাটি পায় না।

তৃতীয় কথা হল, গল্পের মূল লক্ষ্য কচি-সংসদের সদস্য ও সভাপতি কেষ্ট ও পদ্মর প্রেম, পরিবর্তন ও পরিণাম! একটি সমিতির সেখানে সামগ্রিক চেহারায় কোনো সক্রিয়তাই নেই! কেষ্টর প্রেম-মানসিকতা ও বিবাহবাসনার যৌক্তিকতার কথা মাথায়

রেখে গল্পকার পেলব ও মামার সামনে একসঙ্গে দুটি সিগারেট টানায় অভ্যস্ত কেষ্টর সংলাপ বিনিময়-চিত্র এইভাবে আঁকেন :

> 'পেলব রায় বলিল—কেষ্টবাবু আপনি না কচি-সংসদের সভাপতি? আপনি শেষটায় এমন হলেন?
>
> কেষ্ট। কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকবার সময় এসেছে।'

এর মধ্যে কেষ্টর পাকা হবার ঘটনায় কচি-সংসদের আদর্শভ্রষ্টতা থাকতে পারে, কিন্তু কেষ্টর বিবর্তনে সংসদের ওপর কোনো দায়িত্বই বর্তায় না। তাই মূল সভাপতি কেষ্টর সঙ্গে কচি-সংসদের যোগ বিচ্ছিন্ন। তাতে গল্পের নামে শিল্পভিত্তি সার্থক—প্রমাণ হয় না।

চতুর্থ কথা হল, ব্রজেন গল্পের শেষে জানিয়েছে :

> 'কচি সংসদ ভাঙিয়া গিয়াছে। কেষ্ট আবার একটা নূতন ক্লাব স্থাপন করিয়াছে—হৈ হয় সংঘ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হৈ হয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার সস্ত্রীক আমি ও কেষ্ট।'

কিন্তু এই পরিণতিতে কচি-সংসদের সক্রিয়তা কোথায়? গল্পের মধ্যে পেলব রায় ছাড়া, কেষ্ট প্রেমকে ধাপ্পাবাজ বললে গোটা কচি-সংসদ একবার মাত্র অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে। হতাশ হালদার বুকে হাত দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে 'ব্যথা, ব্যথা,' বলে উঠেছে। লালিমা পাল কেষ্টর কথায় প্রেমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। মুন-ইন ভিলায় ব্রজেন বিকেলে কেষ্টর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেছে :

> 'কচি-সংসদের সভ্যগণ নিজ নিজ খাটে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস,—নিশ্চয় একটা বড় রকম ব্যথা পাইয়াছে।'

এমন সব প্রসঙ্গ কিছুতেই প্রমাণ করে না, মূল বক্তব্যের সঙ্গে কচি-সংসদের গভীর-নিবিড় কোনো যোগ আছে।

অথচ যে কোনো সার্থক ছোটগল্পের এমন নাম হওয়া উচিত, যেখানে গল্পের বক্তব্য যেমন নামকে নির্দিষ্ট করে, তেমনি গল্পের নামও গল্পের বক্তব্যকে গাছের প্রধান শিকড়ের মতো ধরে রাখে। হাস্যরসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বরযাত্রী'তে সদস্যদের এক এক করে প্রেম ও বিবাহ দিয়ে ওই দলটির Totality-র শিল্প-তাৎপর্য বজায় রেখে গেছেন। 'বরযাত্রী' নাম সার্থক। তেমনি আর এক গোষ্ঠী হল 'কচি-সংসদ'। পরশুরাম গল্পে সেরকম সদস্যদের কোনো পরিণামী চিন্তা যেমন রাখেননি, তাদের দিয়ে গল্পের ব্যঞ্জনাকেও ভারী, বিশ্বাস্য করতে পারেননি। কেষ্টর প্রেম ও পরিণাম একদিকে, 'কচি-সংসদ' আর একদিকে। কচি-সংসদের হতাশা, ব্যথা ও শেষমেশ ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে যদি কেষ্টর হা-হুতাশ, যন্ত্রণার চিত্র থাকত, বা কচিদের বড় হওয়ার কোনো যুক্তি ও আদর্শের দিক দেখাতেন পরশুরাম, তা হলে এমন নামের গভীর তাৎপর্য মিলত। কচি-সংসদ গল্পে কেষ্ট একদিকে, বাকি সংসদ অন্যদিকে। দুপক্ষের গতি মূল বক্তব্যের কেন্দ্রে থেকে দ্বিমুখী হলেও বা নাম যথার্থতা পেত, কিন্তু তা-ও হয়নি। গল্পের নাম ও বক্তব্যের মধ্যে যে অনন্বয়, সেখানেই এমন, অবশ্যই নামের ক্ষেত্রে, অ-সার্থকতা।

৮.

উলট পুরাণ

এক

'উলট পুরাণ' গল্পটি যেন হাস্যরসিক পরশুরামের কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গের, গল্পের বিষয়ভাবনার ও প্রকরণ কৌশলের অভিনবত্ব সৃষ্টিতে এক চমকপ্রদ পরীক্ষা। এ গল্পের বিষয় অনেক প্রসারিত, সর্বভারতীয় সমস্যা ও দেশভাবনার সঙ্গে গভীর-নিবিড় সম্পৃক্ত। সে সমস্যা ও দেশভাবনা সেই সময়েরই ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনব্যবস্থা ও শোষিত, অত্যাচারিত ভারতবাসীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অনুগ। পরশুরাম এই গল্পে 'পুরাণের' নীতি-নির্দেশ নেননি, প্রেম-প্রসঙ্গকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, সামাজিক কোনো মানুষ বা সম্প্রদায়ের স্বার্থসর্বস্ব জীবনভাবনাকেও লক্ষ করেননি। এখানে পরশুরামের দৃষ্টি একজন সুস্থ রাজনীতিবিদের মতো, বা নিরাসক্ত সত্যসন্ধ দেশপ্রেমিকের মত। সে সময়ের তথাকথিত দেশনেতা, সমাজগোষ্ঠী, সামন্তরাজ ও তোষামোদকারী রায়সাহেব, খানসাহেবদের কথায় ও আচরণে, জীবনধারণ ও যাপনে যে স্পষ্ট অসঙ্গতি, স্বাভাবিক জীবনাচরণের বিচ্যুতি-বিকৃতি—তার হাস্যকরতাকে শ্লেষ-ব্যঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু এই গ্রহণ বিষয়-অবলম্বনের সোজা পথে ঘটেনি। এখানে বিষয়ের আধার হয়েছে রূপক এবং সেই আশ্রিত বিষয়ের মধ্যে মিশেল ঘটেছে তীক্ষ্ণ অথচ মৃদুস্বাদী শ্লেষ-কটাক্ষ। পরশুরাম মূলত ভারতবর্ষেরই রাজনৈতিক রূপ এঁকেছেন, কিন্তু উদ্ভট চিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে ভারত-অধিকৃত ইউরোপের অসহায় অবস্থা। গল্পে ইউরোপীয় ইংরেজগণ ভারতীয়দের দ্বারা অধিকৃত, চালিত ও রাজনৈতিক দিক থেকে দলিত, দমিত। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে সমস্ত চিত্র, বক্তব্য ও বিজিত জাতি রূপে বৃটিশদের অবস্থানকে গল্পের বক্তব্যে স্থির-নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এ ধরনের উলটো করে ভারতীয় ও ইংরেজদের জীবনচিত্রে দেখানোয় পরশুরামের কোনো ভাবনার অন্তঃশীল অসহায়তা কি সক্রিয় ছিল—এমন প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে! কারণ এই ধরনের গল্প সোজা, সহজ-প্রথাবদ্ধ রীতিতে লিখলে এর বিষয় তৎকালীন শাসক শোষক বিদেশি অধিপতিদের নিশ্চয়ই দৃষ্টি আকর্ষণে এবং একজন সৎ ক্ষমতাবান গল্পকারের পক্ষে রাজরোষে পড়ায় আদৌ অসুবিধে হত না। তাই উলটো দিক থেকে রাজনৈতিক পরিবেশ ও সম্পর্ক চিত্রণে সেই সম্ভাব্য পর্যুদস্ত অবস্থাকে সামলাতে চেয়েছেন পরশুরাম। দ্বিতীয় কথা হল, সোজাসুজি ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্পর্কের বৈপরীত্য ও সুবিধাভোগী কিছু ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নেতা, সামন্তরাজকে আঁকলে কটাক্ষ, শ্লেষ তেমন জমত না। ঘুরিয়ে বললে সম্ভবত বলার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য অনেক বেশি মর্মভেদী 'acute' হয়! 'উলট পুরাণ' গল্পের কাঠামোয় সেই গল্প বানানোর রীতি-পদ্ধতি অনেক বেশি তির্যক ও অমোঘ হতে পেরেছে। 'উলট পুরাণ' পরশুরামের গল্পভাবনার যেমন বিশুদ্ধ অভিনবত্বকে দেখায়, তেমনি তাঁর মৌলিকতাকে শিল্পের ও শিল্পীর ব্যক্তিত্বে এক অনড় স্থানে বসায়।

'উলট পুরাণ' গল্পের মধ্যে ছোটগল্প-প্রকরণের সাধারণ সূত্রগত বৈশিষ্ট্যে কোনো

টানা কাহিনী নেই, নেই কাহিনীর গতিসৃষ্টিকারী কোনো ঘটনার উপস্থাপনা। সে সবের কোনো প্রয়োজনও বোধ করেননি গল্পকার। যে কোনো ছোটগল্পে তার একটি প্রধান চরিত্র বা নায়ক অথবা নায়িকা গল্পের ছোট-বড় যে কোনো একটি কাহিনী ও ঘটনাকে আশ্রয় করেই গতি পায়। গল্পের পরিণামে প্লটের শেষতম দায়িত্ব কখনো 'চরমক্ষণে', কখনো বা শেষতম অনুচ্ছেদে বা বাক্যে ব্যঞ্জনার ব্যাপকতা ও নিঃসীমতায় চিহ্নিত হয়ে যায়। 'উলট পুরাণ' গল্পে তার সুযোগ নেই বললেই চলে।

গল্পের চারটি ছাড়া-ছাড়া চিত্রে খণ্ড খণ্ড কাহিনী-আভাস থাকতে পারে। গল্পটির প্রথমেই পাই রিচমণ্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালার পণ্ডিতমশায় মিস্টার ক্র্যাম ও তার ডিক, টম, হ্যারি ইত্যাদি বালকদের নিয়ে ছাত্র পড়ানোর চিত্র। চিত্রটির শেষে ছাত্র টমের কথায় নতুন খেতাব পাওয়ার কারণে খাঁসাহেব গবসন টোডির পার্টির প্রসঙ্গ আছে। তারই ক্ষীণ সূত্রে পরবর্তী খণ্ডচিত্রে এসেছে গবসন টোডির অন্দরমহলে গবসমের স্ত্রী, দুই কন্যা ও তাদের শিক্ষয়িত্রী জ্যোৎস্নাদির বাংলা ভাষা শেখানো ও সভ্যসমাজের আচার-আচরণ বিষয়ক কিছু হাস্যকর আলোচনা। তৃতীয় খণ্ডচিত্রে আছে হাইড পার্কে তিন হাজার লোকের সামনে চতুর স্বার্থান্বেষী, দেশসেবকের ভেকধারী রাজনৈতিক নেতার স্যার ট্রিক্‌সি টার্নকোটের সুযোগসন্ধানী স্ববিরোধী বক্তৃতার উপস্থাপনা। শেষ চতুর্থ খণ্ডচিত্রে মেলে ভোমস্টার্ট প্রাসাদে দেশীয় সামন্তরাজ প্রিন্স ভোমের আত্মতৃপ্ত অলস এবং বিলাসী জীবনস্বভাব-ছবি এবং শাসকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত তথাকথিত স্বাধীন সুখী জীবন ভোগ-বাসনার সঙ্গে যুক্ত আত্মরক্ষার শ্লেষাত্মক দিক। গবসন টোডির প্রসঙ্গ এখানে নেই। দ্বিতীয় চিত্রের পরে লন্ডনে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ প্রথম উদযাপিত হয়েছে। গল্পের শেষ চিত্রে দু'মাস হরতালের মধ্যে সেই যজ্ঞের সমাপ্তি ঘোষণার সংবাদ মেলে। প্রত্যেকটি খণ্ডচিত্রকে সূত্রবদ্ধ করেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের কিছু অংশের উদ্ধৃতি, কিছু সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন, রিপোর্টাজ অর্থাৎ সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। এসব থেকেই জানা যায় পুরুষজাতির দেশীয় সংসদে এতাবৎ একটানা একাধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে নারীজাতির প্রতিবাদ, আন্দোলন ইত্যাদির মতো কৌতুককর অবস্থার খবর। ট্রিকসি টার্নকোটের সরকার-গঠিত কমিশনের প্রেসিডেন্ট হওয়াতেই গল্পের শেষ।

স্বভাবতই দেখা যায় 'উলট পুরাণ' গল্পের মূল বিষয়ে ভারতীয়দের অধিকারে স্থিত ইউরোপের কৌতুককর চিত্রে ভারতের সে সময়ের রাজনৈতিক রূপকে দেখানোর চেষ্টা থাকলেও তার রূপক রূপাঙ্কনের পদ্ধতির মধ্যে সাধারণ নিয়মের ছোটগল্পের আদল নেই। তাই প্রচলিত ছোটগল্পের সংজ্ঞায় 'উলট পুরাণ' গল্পটির প্লট-কাঠামো বিচার সম্ভব নয়। গল্পে স্পষ্টত রূপক আছে এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই পরশুরামের যথার্থ স্বভাবানুগ কৌতুক শ্লেষ-ব্যঙ্গ। যে কোনো রূপক-গল্পের একমাত্র এবং বড় বৈশিষ্ট্য হল—গল্পের উপরিতলের যে অর্থ, অর্থাৎ যা বাচ্যার্থ, তার সমান ও সমান্তরাল আর একটি অর্থ অন্তঃশীল চলমান থাকে। আবার এমন রূপক গল্পে যদি ব্যঙ্গ-কৌতুক pointing finger

হয়, তবে সে রূপক গল্পের dimension তাৎপর্যে বাড়তি মাত্রা পায়। বিদেশি রূপক গল্পের গল্পকার ইংরেজ লেখক জন কোলিয়ার, ই. এম. ফস্টার, এইচ. জি. ওয়েলস্, অস্কার ওয়াইল্ড, পার লাগের্কভিস্ট প্রমুখ যেসব অসাধারণ রূপক গল্প উপহার দিয়েছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যে, বাঙালি লেখক পরশুরাম তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র মনস্বিতার স্বাক্ষর রেখেছেন 'উলট পুরাণে'। এ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় ভারতীয় রাজনীতি। শুধু রূপক নয়, ব্যঙ্গের ও শ্লেষের ক্ষুরধার দীপ্তি ও প্রসন্ন কৌতুক, সমস্তরকম জ্বালা-যন্ত্রণাহীন উদার-মানসিকতা এবং বিশেষ উদ্দেশ্যহীনতা গল্পটিকে যে কোনো বিদেশি রূপক-রঙ্গ-ব্যঙ্গের গল্পের পাশে নিয়ে যায় প্রাচ্য লেখকের নিজস্ব মর্যাদায়।

কোনো নিস্তরঙ্গ, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ জলে ভরা পুকুরের পাড় ধরে একদল মানুষ হাঁটতে থাকলে জলের গভীরে তাদের ছায়া যেমন উলটো ভঙ্গির ছবি আঁকে, 'উলট পুরাণে'র গল্পের উপস্থাপনা সেই রীতির অনুগ। গল্পটির আঙ্গিক অবশ্যই অভিনব এবং মৌলিক। গল্পটির গঠনে গল্পকার কয়েকটি কৌশল নিয়েছেন। প্রথমত, আদ্যন্ত চরিত্রদের সংলাপ-বিনিময় ও নাটকীয় রীতি এখানে প্রযুক্ত। দ্বিতীয়ত, গল্পের গতির উপযোগী একমাত্র কাহিনী, বহু ঘটনা, 'মহামুহূর্ত' জাতীয় সিচুয়েশন এখানে সম্পূর্ণ বর্জিত। তৃতীয়ত, বিভিন্ন পত্রিকার ভিন্নধর্মী সম্পাদকীয় অংশ, রিপোর্টাজ, এমনকি বিজ্ঞাপনকে অংশবিশেষে ব্যবহার করে, অনেকটা নাট্যচিত্রের ভাষ্যের মতো মাঝে মাঝে বসিয়ে গল্পের গঠনে গল্পকার লক্ষণীয় বৈদগ্ধ্যের অভূতপূর্ব প্রমাণ রেখেছেন। চতুর্থত, সংলাপ-বিনিময়ের অংশগুলিতে অবশ্যই আছে নকশার ধর্ম—যেন এক একটি ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, ছেঁড়া-ছাড়া ছবি এবং তারই মধ্যে চরিত্র-ব্যক্তিত্বের কৌতুক ও শ্লেষ-মিশ্রিত স্বভাব ধরা পড়ে। নাটকীয় দৃশ্যযোজনার মতো পাঠশালার দৃশ্য, টৌডির অন্দরমহল চিত্র, হাইড পার্কের বক্তৃতা মঞ্চ, ভোমস্টার্ট প্রাসাদ প্রসঙ্গ 'লড ব্লার্নির বেগে প্রবেশ', 'প্রিন্সের মন্ত্রী ব্যারণ ফন বিবলারের প্রবেশ', 'টার্নকোটের প্রবেশ' ইত্যাদি বন্ধনী চিহ্নে রেখে যুক্ত করে পরশুরাম রচনাটিকে যথার্থ অর্থে ছোটগল্পের সীমায় রাখেননি। বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি যেন লেখকেরই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করে তোলার উপযোগী টীকা-ভাষ্য। এবং গল্পের এমন বিচিত্র কাঠামোর মধ্যে অসাধারণ কৌতুক-কণাগুলি সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল জলধারার মতো মুক্তার বিস্ময়কর মোহ আনে স্বভাবী পাঠকদের মনে। পরশুরামের 'উলট পুরাণ' যথার্থ অর্থে ছোটগল্প নয়, রূপের নির্মোকে কৌতুক শ্লেষ ব্যঙ্গের শুভশ্রী মণ্ডিত গল্পের স্কেচ, বলা যায় 'গল্পচিত্র।'

দুই

যে কোনো রূপক গল্পের চরিত্র বিচার সাধারণ চরিত্র-আলোচনার অনুগ নয় কোনো মতেই। রূপক চবিত্রের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই চরিত্র বহুমাত্রিক হতে পারে না। যেহেতু রূপক গল্পের অভ্যন্তরে থাকে লেখকের যে কোনোভাবেই হোক একটি উদ্দেশ্য, তাই তার চরিত্র সীমায় বাঁধা। আগেও বলেছি, রূপক গল্পের বাইরের অর্থের গভীরে আর একটি অর্থ সমান্তরাল থেকে যায়। এবং এই দ্বিতীয় অর্থই রূপক গল্পের লক্ষ্য। চরিত্র এই দ্বিতীয় অর্থকে দ্যোতিত করে তার দায়িত্ব পালন করে।

'উলট পুরাণ' গল্পের মানুষগুলি রূপক-নির্মোকে বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি চরিত্রের অভ্যন্তরে আছে লেখকের মূল লক্ষ্য ও তার ব্যঞ্জনা। যেহেতু 'উলট পুরাণ' কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গে মেশানো রূপক গল্প, তাই এর দুটি দিক—১. লেখকের তথা গল্পকারের উদ্দেশ্যের দিক, ২. কৌতুকরসের স্রষ্টা পরশুরামের শ্লেষ-কটাক্ষের রক্তিম দিক। আলোচ্য গল্পে কোনো নায়ক নেই, নেই কাহিনী ও ঘটনার যোগে একক ব্যক্তিত্বের লক্ষ্যমুখিন গতিময়তা। তাই প্রত্যেকটি ছোট-বড় চরিত্রই কেন্দ্রীয় বক্তব্যে একমুখিন এবং তার দায়িত্ব পালনেই তার শিল্পসুষমা।

গবসন টোডি আপাতদৃষ্টিতে বিদেশি চরিত্র, কিন্তু ভিতর-স্বভাবে সে ভারতবর্ষে বৃটিশ উপনিবেশে লালিত-পালিত, বিদেশি শাসকের পার্শ্বচর, অনুগত, একান্ত বশংবদ খাঁসাহেব রায়সাহেবদের উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত! যে সময়ে দেশে বৃটিশ বিরোধী উত্তাল স্বদেশী আন্দোলন, সে সময়ে এরাই হল লক্ষণীয় চরিত্র, সুবিধাভোগী, আত্মসুখী, আত্মতৃপ্ত। ঠিক এই ছাঁচেই তৈরি করা ভারতের আর এক তথাকথিত রাজনীতিবিদদের প্রতিনিধি স্বার্থসর্বস্ব, সুযোগসন্ধানী রূপে অঙ্কিত ট্রিক্‌সি টার্নকোট, শাসক বৃটিশদের তোষামুদে, সামন্ত রাজাদের বিলাসিতা ও আহ্লাদেপনা, রক্তশোষক স্বভাবের উপযুক্ত প্রতিরূপ ও প্রতীকপ্রতিম মানুষ ভোমস্টার্ট প্রাসাদের প্রিন্স ভোম। গল্পকারের উলটো চিত্রাঙ্কনে এদের কাল্পনিক অস্তিত্ব ও বিচিত্রতা আমাদের বিস্ময়ে টানে, জ্বালা-যন্ত্রণা জাগায় না। ভুল ইতিহাস পড়ায় যে পণ্ডিতমশায় ক্র্যাম, 'আপস্টার্ট', তথাকথিত 'এ্যারিস্টোক্র্যাটিক' বংশের মিসেস টোডি, তার দুই কন্যা ফ্লফি ও ফ্ল্যাপি, শিক্ষয়িত্রী জ্যোৎস্নাদি, ম্যাকডুডুল, লর্ড ব্লার্নি, মন্ত্রী ব্যারন ফন বিবলাব, ল্যাং প্যাং—এদেরও বাইরের রূপকের নির্মোক খসে যায় ভারতীয়দের অন্তর্বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

তাই 'উলট পুরাণ' গল্পের চরিত্রচিত্রণ বড় কথা নয়, বড কথা হল চরিত্রের অভ্যন্তরের ভারতীয় স্বভাবের নির্লজ্জ অসঙ্গতিসূচক আচরণগুলি। আর সেই আচরণের উজ্জ্বল চিত্রণে পরশুরাম যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কটাক্ষের কুঠার আন্দোলিত করেছেন, তা আমাদের লঘুরসে আপ্লুত করে। আসলে 'উলট পুরাণ' গল্পের কৌতুকরসই প্রধান রস এবং প্রধান লক্ষ্যও সেই রসের অবাধ সৃজন। চরিত্রগুলি সেই রসের ভিয়েনে চাপানো আধার মাত্র। পরশুরামের বলার ভঙ্গিতে আছে জ্বালাহীন, নিরাসক্ত অথচ উচ্ছ্বসিত আবেগের স্বতোৎসারিত বন্যা, আছে প্রচণ্ড শ্লেষে-কটাক্ষে পালিশ করা বৈদগ্ধ্যের বৈদুর্যমণি। 'উলট পুরাণে'র হাস্যরস আমাদের, দেশপ্রেমিক মানুষদের মনে বেদনা জাগায়, আমাদের নিশ্চিত অসহায় করে, কিন্তু ক্রোধে রাগে ঘৃণায় রক্তচক্ষু করে না। পরশুরামের হাস্যরসে আছে প্রসন্ন মনের অনাবিল উদারতা। প্রখ্যাত কথাকার-সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই পরশুরামকে, হয়ত বা তাঁর রসসৃষ্টিকেও সার্থক পরিচ্ছন্ন উপমায় অলংকৃত করে বলেছেন, 'শরতের মেঘে বজ্র'।

'উলট পুরাণ' গল্পের একাধিক কৌতুক কণা নানান বর্ণবাহার আনে। গল্পের সংলাপে,

চরিত্রগুলির আচার-আচরণে, বিপরীতধর্মী সিচুয়েশনে আছে শুভ্রকৌতুক, বক্রশ্লেষ ও ধারালো ব্যঙ্গ—আর সব মিলিয়ে বিচিত্র কৌতুকরসের মৃদুস্বাদী উপভোগ্যতার শেষে উদার প্রসন্নতার মুক্ত বিহঙ্গের প্রসারিত আরাম! পণ্ডিতমশায় ক্র্যাম ছাত্রদের বোঝায় :

> 'সেকালের নাম ছিল মেডিটোরিয়ান। ইণ্ডিয়ানরা উচ্চারণ করতে পারে না বলে নাম দিয়েছে মেতিপুকুর। সেইরকম আলস্টারকে বলে বেলেস্তারা, সুইটসারল্যান্ডকে বলে ছুছুরাবাদ, বোর্দোকে বলে ভাঁটিখানা, ম্যাঞ্চেস্টারকে বলে নিম্‌তে।'

এই সংলাপ বিশুদ্ধ কৌতুকরসে সিক্ত। এর সঙ্গে ছাত্র হ্যারির 'কাছা দিয়েছে যেন স্কিপিং রোপ', মিসেস টোডির 'নো, থ্যাংক্‌স,—থুড়ি' ফ্রুফির পাঁচকে ফ্যাঁচ বলা—বিশুদ্ধ হিউমারের বেশ কয়েকটি স্বচ্ছ আয়না। মেয়েদের মুখপত্র 'দি শি-ম্যান' থেকে উদ্ধৃতির একটি অংশ :

> 'পুরুষের চেয়ে কিসে আমরা কম? আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগারেট খাই, ককটেল টানি। এর পর দরকার হয় তো মুখে কবিরাজ কেশতৈল মাখিয়া দাড়ি-গোঁফ গজাইব।'

এর মধ্যে আছে উচ্চহাস্য হিউমারের অভ্যন্তরে চাপা শ্লেষ-কটাক্ষও! পরশুরামের কটাক্ষ বৃটিশদেরও লক্ষ্য হিসেবে বাদ দেয়নি। প্রিন্স ভোম যখন চৈনিক পর্যটক ল্যাং প্যাং-এর সামনে খানসামাকে বলে :

১. কোবল্ট, এক গুলি দে বাবা, তিনটে বাজে হাই উঠছে। আহা কি জিনিসই আপনাদের পূর্বপুরুষরা আবিষ্কার করেছিলেন হের ল্যাং।'

২. আঃ জ্বালালে। একটু যে শুয়ে শুয়ে আরাম করব তার জো নেই। নিয়ে এস ডেকে। বাবা কোবল্ট, আমায় বাঁ পাশে ফিরিয়ে দে তো।'

এমন সব সংলাপে তখন মুখ্য কৌতুকরসের উচ্চহাস্য স্বভাবে বুঝিবা কিছু শ্লেষও জড়িয়ে যায় বলে উপভোগ্যতার স্বাদ মিশ্রধর্মী হয়। সামন্ততান্ত্রিক প্রিন্স ভোমের আলস্য, আবদার, শাসকশ্রেণীর দেওয়া সুখ-আরাম আর ভিক্ষে পাওয়া মর্যাদায় তার বিলাসিতা ও শারীরিক অক্ষমতা আমাদের উচ্চহাস্যে উতরোল করে :

> 'বাবা কোবল্ট, আমার নাকের ডগায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দে তো।'

এই শ্রেণী সে সময়ে জমিদার শাসকের পোষ্য ও জনগণের অর্থেই এদের সেবা। নির্লজ্জ, শাসক-নিযুক্ত, শাসকের তোষামোদকারী এই মানুষগুলির জনসংযোগের স্বরূপ কী? ল্যাং প্যাংকে প্রিন্স বলে :

> 'আমি ভারতীয় কায়দায় লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত করি, অডিয়েন্স দেওয়া আমার পোষায় না। একসঙ্গেই পাঁচ-সাতজনের দরবার শুনি। তাতে মেহনত কম হয়, গল্পগুজবও জমে।'

পরশুরাম এই ভারতীয় এক শ্রেণী-প্রতিনিধির চিত্রে শ্লেষ-ব্যঙ্গের জোগানে কার্পণ্য করেননি। এ ব্যাপারে তাঁর বৈদগ্ধ্য উদ্দেশ্যবিবিক্ত কৌতুকরস যোজনায় সফল ও চমকপ্রদ।

শাসক ইংরেজদের কাছে তাদের সোসাইটির মর্যাদা পেতে, তাদের সঙ্গে সমান তালে কথা বলার জন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করার হাস্যকর প্রয়াসে, গবসন টোডির বাথরুমে গিয়ে দু'হাতে আমের আঁটি ধরে খাওয়ার অভ্যাসে ও চোয়াল বেয়ে রস গড়ানোর হাস্যকর চিত্র রচনার মধ্যে গল্পকার পরাধীন ভারতের বেশ কিছু লজ্জাহীন স্বদেশবাসীর অনুকরণে জাতে ওঠার কটাক্ষ-কৌতুককে আকর্ষক শিল্পরূপ দিয়েছেন। ট্রিক্‌সি টার্নকোটের হাইড পার্কের বক্তৃতা এদেশের তথাকথিত দেশনেতাদের জনগণ-ভাষণের নামে প্রবঞ্চনাবৃত্তির যেন অতিবাঞ্ছিত উপাদেয় কথাসরিৎসাগর! পরশুরাম যে একজন শ্রেষ্ঠ কৌতুক-রসশিল্পী, তার প্রমাণ মেলে গল্পমধ্যস্থ সিচুয়েশনগুলিকে বিপরীত রসসৃষ্টির বৈদগ্ধ্যে শ্লেষের মনোরম স্বাদগ্রহণের ব্যবস্থাপনার মধ্যে। 'উলট পুরাণে' পুরুষজাতির মুখপত্র 'দি মিয়ার ম্যান'-এর উদ্ধৃতাংশে ক্রুদ্ধ পুরুষজাতির একই সঙ্গে চাপা ক্ষোভ ও উপভোগ বাসনার মিলন চিত্র এইরকম :

> 'দুর্বৃত্তা নারীগণ....নিরীহ পুরুষগণকে খামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু সরকারের পেয়ারের উড়িয়া পুলিশ তখন কি করিতেছিল? তারা একগাল পান মুখে পুরিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল এবং নারীগুণ্ডাগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল—'হী-হ্-হ্-হ্-হ্-। খাঁসাহেব গবসন টোডি, স্যার ট্রিক্‌সি টার্নকোট প্রভৃতি মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গা নিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জন্টগণ তাঁদের অপমান করিয়া বলিয়াছে—'এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব তো ডণ্ডা খিব।'

এর উপভোগ্যতার সঙ্গে পাঠকরাও পরশুরামের প্রসন্ন মনোভাব, মানসিক উদারতা জ্বালাহীন অ-বিদ্বিষ্ট মানস-বৈশিষ্ট্যের সমান অংশীদার হয়ে উচ্চহাস্যে উত্তরোল স্বভাব পেয়ে যায়।

'উলট পুরাণে' আছে ইংরেজ ও ভারতের ঔপনিবেশিক স্বাভাবিক সহাবস্থান নয়, বিপরীত অ-স্বাভাবিক অবস্থান। তা ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় ভারতবাসীর আকর্ষণ, ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ মোহ, ভারতীয় জনগণের অসহায়তা, একশ্রেণীর ইংরেজ তোষণ ইত্যাদিকে কৌতুকরসে সামনে আনে। ভারতবাসীর স্বভাব ইংরেজদের ওপর আরোপিত হওয়ায়, একজন এদেশীয় সমালোচক ম্‌্‌ করেন, এই গল্পে 'এক অভূতপূর্ব কমেডির সৃষ্টি হয়েছে।' কিন্তু কমেডি'র সঙ্গে তুলনা করলে পরশুরামের বাস্তব রূঢ় দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা, জাতীয় জীবন-স্বভাবের সংকীর্ণতাকে ঠিক বাস্তবতায় বোঝানো যায় না। আর এক কথাকার-সমালোচকের মন্তব্য—'একমাত্র "উলট পুরাণ" পরশুরামকেঅমর করতে পারত।' কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের ভাষায় যে প্রচ্ছন্ন 'যদি' বা 'সংশয়' থেকে গেছে, তার অন্যতম কারণ, এই রচনায় পরশুরামের 'purposive'-স্বভাব একটু বেশি প্রকট, রচনার কেন্দ্রীয় বক্তব্যও কাঠামোর সুশৃঙ্খল সজ্জায় মাপা হয়নি, এর স্কেচ-বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রাতিগ সূত্রাচ্ছিন্নতা এনে দেয়। আমাদের মতে, সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গল্পটির বিষয়ের চমৎকারিত্ব ও কাঠামোর অভিনবত্ব এবং হাস্যরসের পরিবেশনে লেখকের বৈশিষ্ট্য এর মৌলিকতাকে অননুকরণীয় করে তোলে।

তিন

'উলট পুরাণ' গল্পটির নাম আকর্ষণীয় নিশ্চয়ই। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে পুরাণের আবির্ভাব অনেক পরে। ধর্মকথা, দেবদেবী কথাকে সহজ ও লোকায়ত করার জন্যই পুরাণের জন্ম। কৌতুকরসে জমাট করে পরশুরাম যে বিপরীত কথাচিত্রে পুরাণের স্বভাব যোগ করতে ইচ্ছুক, তা এমন নাম প্রমাণ করে। গল্পনাম এতে অসার্থক হয় না শিল্পের মাপে।

আবার পুরাণে আছে অলৌকিকতা, রাতারাতি কিছু বদলে যাওয়ার বিস্ময়কর চমক। 'উলট পুরাণ' গল্পে গল্পকারের যা মৌলিক কল্পনা—তা ভূমিকম্পের মতো অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনারই এক প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি যেন। ইংরেজদের স্থান ভারতীয়দের গ্রহণ অবশ্যই অসম্ভব এবং তা কোনোদিন হয়নি, হবেও না, কাম্যও নয়, তবু গল্পকার তাকে অলৌকিক স্বভাবের মতো ঘটিয়ে এক হাস্যকর অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। পুরাণ কাহিনীর অঘটন ঘটনের মতোই গল্পটির কায়াগঠন। তা উলটোই বাস্তবগত। তাই 'উলট পুরাণে' গল্পের বিষয় ও কাঠামোয় ব্যঞ্জনা সূক্ষ্মস্তরে লেগে থাকে।

'উলট পুরাণ' নামেই আছে কৌতুকরস। যাবতীয় অসঙ্গতি, কার্য-কারণের ব্যাখ্যাহীন অসম্ভাব্যতা, উদ্দেশ্যহীন আলস্যের ভাবনা, তা আর যাই হোক, গভীর রসের অনুগমন করে না। সমস্ত কিছুর মধ্যে যদি কোনো জিনিস যে কোনোভাবে হোক, উল্টে যায়, উল্টেই চোখে পড়ে, তা যেমন কৌতূহল জাগায়, তেমনি কাছে টানে, মজার এক অভিজ্ঞতার জন্য পাঠক-দর্শককে সতর্ক করে। 'হুজুগ' 'হুল্লোড়' প্রচলিত সব কিছু থেকে সরে এসে একধরনের দায়-দায়িত্বহীন মজা পাওয়ার মধ্যেই থাকে স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরসের স্বাদগ্রহণ। এমন স্বাদ আর সাধ, এমন উলটো ব্যাপারকে দেখা ও অন্যদের দেখানোর মূলে আছে সহাস্য কৌতুকরসের মধ্যে কিছু সময় কাটানো। 'উলট পুরাণ' নামটি সেই কারণেই অতি সহজেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায় রসিক পাঠকের লঘু রসচর্বণার মধ্যে। 'উলট পুরাণ' গতানুগতিক নাম থেকে ভিন্ন-স্বভাবী। তাই শুধু নামেই যার কৌতুকরস, গল্পনামে নিশ্চিত তা গভীর তলদেশ স্পর্শ করে। এমন নামের অভিনবত্ব গল্পকারের অভিনবত্ব ও মৌলিকতা সৃষ্টির আর একটি সূত্রও!

৯.

হনুমানের স্বপ্ন

এক

যে কোনো একজন সার্থক ব্যঙ্গরসের কথাকারের পক্ষে পুরাণের প্রসঙ্গকে রচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ তাঁর ব্যঙ্গরসেব ভিয়েনে অন্য মশলাপাতির স্বাদ মেশায়। অন্য স্বাদ বলতে প্রাচীনে-নবীনে মিশেল হয়ে প্রায় পুরাণের নবসৃষ্টির পর্যায়ে চলে যাওয়া! পুরাণের মানুষগুলি সহজ, সরল স্বভাবের, মোটা দাগের। তাদের জীবনকাহিনী সহজ স্বাভাবিক পথে চলে, পথে যা বাধা আসে, সেগুলির সমাধানে তাদের জটিলতার মধ্যে যেতে হয় না, তাদের মর্ত্যে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সব অতিক্রম করার অনায়াস শর্ত কবচ-কুণ্ডলের

মতো লেগে থাকে। তাদের যা কিছু সক্রিয়তা প্রকাশ্যে। পুরাণে তাদের যাবতীয় উৎস-উন্মোচন, বিকাশ, বিবৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত বা লক্ষ্য ঋতপথের অনুসারী। একালের ব্যঙ্গরসিকের পক্ষে এমন সব পৌরাণিক কাহিনী ও ঘটনার সঙ্গে একালেরই আধুনিক জটিল-যৌগিক জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করে নতুন কথা শোনানোর সুযোগ থেকেই যায়। পুরাণের মানুষগুলি যেনবা একালের হৃদয় ও মেধার বিদ্যুৎস্পর্শে নতুন হয়ে ওঠে। একদিকে পুরাণের সহজতা, আর একদিকে অতি-আধুনিকতার জটিল অন্তর্ভাবনা—দু'য়ের সমন্বয়ে, শিল্প-রসায়নে যে অসঙ্গতির বৈপরীত্য, তা-ই ব্যঙ্গরচনাকে বিস্ময়কর স্বাদু মনোরম করে।

পুরাণ জীবন ও কাহিনীর যেখানেই আধুনিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি, সেখানেই আধুনিক সমাজের যে জটিল অ-সুস্থ উৎকেন্দ্রিকতা তার প্রয়োগ—দুয়ের মধ্যে এক হয়ে ধরা পড়ে ব্যঙ্গলেখকের শাণিত কলম। 'জাবালি'র মতো পরশুরাম রচিত 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটির জন্ম সেখানেই। পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' নামের গল্প সংকলনের আগে দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে তেরশো সালে। তেরশো একত্রিশ-এ প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা'। তৃতীয় গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় তেরশো চুয়াল্লিশ-এ। স্বভাবতই 'হনুমানের স্বপ্ন' গ্রন্থের গল্পগুলির জন্ম উনিশশো আঠাশ থেকে উনিশশো সাঁইত্রিশ-এর মধ্যবর্তী সময়ে। কোনো কোনো পরশুরামের গল্পের আলোচক তৃতীয় সংকলনের গল্পগুলির বেশির ভাগকেই তেরশো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ সালের মধ্যের লেখা মনে করেন। এই সময়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর তিনবছর আগে, চতুর্থ দশকের শেষ দিকে।

তৃতীয় গল্প সংকলনের মোট দশটি সংকলিত গল্পের প্রথম গল্পই 'হনুমানের স্বপ্ন'। গল্পটি রচনার সময় পরশুরামের মনোলোকে নিশ্চয়ই সে সময়ের সামাজিক হিন্দু বিবাহনীতি, বহুবল্লভ পুরুষদের বহুবিবাহ বাসনা, সংসারবদ্ধ নারীসমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন অসহায়তা—এ সমস্তই বিশেষ আদর্শের প্যাটার্নে উপস্থিত ছিল। 'কজ্জলী'র 'জাবালি' গল্পে পরশুরাম প্রাচীন ভারতীয় জীবন ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জাবালি ঋষির সূত্রে সর্ব সংস্কার মুক্ত এক পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বকে চিত্রিত করতে গিয়ে স্বর্গাঙ্গনা মধ্যবয়সী ঘৃতাচীকে এনে প্রেমের ছলা-কলার কিছু কৌতুকরসাত্মক 'সিচুয়েশন' সৃষ্টি করেছেন মাত্র। জাবালি ও ঘৃতাচী—দুইই পৌরাণিক প্রসঙ্গের চরিত্র। ঘৃতাচীর নকল প্রেম বা প্রেমের অভিনয়েই গল্পের গতি ও জাবালি চরিত্রের পূর্ণতার দিকে গমন ঘটে। 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে আদ্যন্ত পুরুষ-রমণীর প্রেম প্রসঙ্গ, বিবাহ বাসনার বিস্তার।

শুধু পুরাণে কেন, বিশ শতকের চতুর্থ দশকেও পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, তা সামাজিক স্বীকৃতি পেত। একজন পুরুষের একাধিক পত্নী পরস্পরের মধ্যে সপত্নীকলহ, একাধিক পত্নী নিয়ে শান্তিতে সংসার করার কৌশল রচনায় সিদ্ধ পুরুষ, বয়স্ক বৃদ্ধ মানুষের বিবাহবাসনা—এসবই দেখা গেছে। পরশুরাম এমন সব বিষয়কেই 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে হনুমানের বিবাহবাসনার আবেগরঙিন প্রকাশ-চিত্রে সংসক্ত করেছেন। 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটি প্রাচীন পুরাণের নির্মোকে বিশ শতকীয় পুরুষ-রমণীদের বিবাহ-

প্রেমবাসনার এক ব্যঙ্গ-কষায় লেখচিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তৃতীয় ও চতুর্থ দশক ধরে সমাজজীবনের অভ্যন্তরে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে নানা কারণে এক অবধারিত অসঙ্গতি মাথা চাড়া দিচ্ছিল। তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফল। সেই অসঙ্গতির মধ্যে নিশ্চয়ই ব্যঙ্গরসের আশ্রয় কিছু সাহিত্যে ও সাহিত্যিকদের মনোলোকে সত্য হত, কিন্তু ব্যাপকভাবে হয়নি, কারণ সামাজিক যে অস্থিত অবস্থা, যে বেঁচে থাকার জন্য অন্তর্বিক্ষোভ, তা যতটা কালো মেঘের ভারে ও গর্জনে গম্ভীর ছিল, ততটাই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় স্মিত হবার সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। সার্থক ব্যঙ্গ সৃষ্টির অনুকূলে সমসময়বর্তী সমাজ গঠন ও তন্নিহিত অসঙ্গতি একান্ত কাম্য হয়, চতুর্থ দশকে তার অভাব ছিল না। তবু সমসময়বর্তী সমাজ ও জীবনের বাঁচার মোটা তাগিদ এত ভারী ও স্বভাব-নিয়তির মতো অমোঘ ছিল যে, সহৃদয় মানুষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, এমন অসঙ্গতির মধ্যে র‍্যাব্‌লের সেই সার্থক উক্তিটি—"To laugh at fate through life's short span / Is the prerogative of man.' যখন ব্যঙ্গকৌতুকের জন্ম হওয়ার শস্যক্ষেতের শুষ্ক মাটিতে রসহীনতার ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছে, তখনি মোহমুক্ত মনে, জীবন ও জগতের দার্শনিক স্বভাবের অনন্বয়ে পরশুরাম লিখলেন কিছু গল্প। শুকনো ফাঁকা ফাটলের রেখা টানা মাঠে কিছু হাস্যরসের স্বর্ণবারি নিক্ষেপের মধ্যে উজ্জ্বল শস্যের বীজ! 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটি তারই সমাজ-মানুষের অসঙ্গতির কথা মনে রেখে এক মূল্যবান ফসল।

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের বিষয় সমকালের সমাজ ও মানুষের স্বভাব-বিবিক্ত কোনো উপকরণ নয়। গল্পটির কাহিনী ও ঘটনা পৌরাণিক অন্যতম নায়ক এক শ্রেষ্ঠ বীর রামভক্ত হনুমানের চরিত্রকেন্দ্রিক। রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলে হনুমানকে তার শাসিত অযোধ্যাতেই সুখে-শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। দেয় সুন্দর কদলীকাননে সাততলা কাঠের তৈরি সুদৃশ্য বাড়ি। কিন্তু কয়েক মাস কাটানোর পর তার মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। তার কারণ ক্রমশ সে স্পষ্ট করে সীতার কাছে, সীতা তাকে রাজ-অন্তঃপুরে ডেকে পাঠালে। তার আগে পর্যন্ত তার অনেক চিকিৎসা হয়েছে, শেষে ব্যাধি আধ্যাত্মিক ভেবে বশিষ্ঠ ঋষি পর্যন্ত তার নিরাময়ের জন্য বিরাট যজ্ঞেরও আয়োজন করে ফেলে। তাতেও সেই ভাবান্তর শোধরায় না। শেষে সীতার কাছে সে কবুল করে যে তাকে স্বপ্নে তার পিতৃ-পুরুষগণ বারবার দেখা দেয় এবং উদরে হাত দিয়ে তাদের অনন্ত ক্ষুধাভাব জানায়। হনুমানের চিন্তা, বাস্তবিকই তার মৃত্যুর পর কে তাদের পিণ্ড দেবে! এত বৃদ্ধ বয়সে আর বিবাহ করা তো সম্ভব নয়, এই চিন্তায় তার মানসিক অশান্তি, অনিদ্রা ও ক্ষুধাহীনতা। শেষে সীতার যুক্তিতেই হনুমান এই বয়সেও বিবাহ করার জন্য এবং সীতার পছন্দ করা মানবী নয়, নিজের পছন্দ করা বানরীকে বিবাহ করার জন্য কিষ্কিন্ধ্যা গমনের সিদ্ধান্ত নেয়। সীতাই তার ভাবী পত্নীর নাম নির্দিষ্ট করে দেয় 'হনূমতী'।

কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রার পথে এক অপরাহ্ণে অনেক গিরি নদী জলাভূমি অতিক্রম করে দণ্ডকারণ্যে আসে হনুমান। সেখানে আশ্রয় নেওয়া স্বেচ্ছা-নির্বাসনে অরণ্যে বসবাসকারী

তুম্বদেশের অধিপতি চণ্ডরীকের সঙ্গে দেখা হয় তার পর্ণকুটিরে। ক্রমশ হনুমান জানতে পারে, পরম রূপবতী ও অশেষ গুণশালিনী মহিষীর এক সঙ্গীর সঙ্গে আড়ালে একসময়ে চণ্ডরীকের রঙ্গরস কবার ব্যাপারটি মহিষী দেখতে পেলে মহিষী স্বামীর সঙ্গে কথা বন্ধ করে ক্রোধাগারে আশ্রয় নেয়। তাই এক ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল—চণ্ডরীকের তা মনে হওয়ায় মহিষীকে জব্দ করার জন্যই তার এমন নিঃসঙ্গ বসবাস! চণ্ডরীকের কাছেই শোনে হনুমান, এই অরণ্যেই বাস করে মহাতপা লোমশ মুনি। তার একশো পত্নী। বিবাহ ব্যাপারে লোমশ মুনির অভিজ্ঞতা হনুমানের পক্ষে কার্যকর। এসময় সেই রাতেই লোমশ মুনি চণ্ডরীকের পর্ণকুটিরে এলে হনুমান শোনে, লোমশ মুনি গৃহে ফিরতে অনিচ্ছুক, কারণ তার একশো স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে কলহ করে, তাতে লোমশ থাকতে না পেরে তাদের ত্যাগ করেছে। এখন সে এই বৃদ্ধ বয়সেও শান্তি ও পত্নীসুখ পেতে একটিমাত্র বিবাহ করতে ইচ্ছুক। লোমশ মুনি হনুমানকে যুক্তি দেয় তারই আশ্রমে গিয়ে হনুমান তার এক স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। ভূমার আস্বাদ তাতেই লভ্য!

হনুমান সেই রাতেই চলে আসে কিষ্কিন্ধ্যায়। সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা হলে সুগ্রীব হনুমানের বিবাহ-বাসনার কথা শুনে জানায়, সুগ্রীব নিজে খুবই সুখী তার অষ্টোত্তর সহস্র ভার্যাদের নিয়ে। তারা সুগ্রীবকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে না, কারণ সুগ্রীব তাদের প্রত্যেকের মুখে কদলীবঙ্কল দিয়ে ঠোঁট বেঁধে রাখে, শুধু প্রেমালাপের সময় খুলে দেয়। এমন শাসনে তাদের বাক্যালাপ, কলহ কোনো পীড়া দেয় না। সুগ্রীব হনুমানকে প্রথম যুক্তি দেয়, প্রবীণা, পতিসেবায় ভালো তার নিজের স্ত্রী শ্রীমতী তারাদেবীকে বিবাহ করতে, কারণ এরকম স্ত্রী তো সুগ্রীবেব প্রয়োজন নেই আর, বৃদ্ধ হনুমানের পক্ষে তাকে মানাবেও ভাল। হনুমান তারাদেবীকে তার প্রণম্যা জানালে তাকে খোঁজ দেয় কিচ্চট দেশের স্বর্গত অধিপতি প্লবংগমের রাজ্যশাসনে অভিজ্ঞা, লাবণ্যময়ী, বিদুষী ও চতুরা একমাত্র দুহিতা চিলিম্পা বানরীর কাছে যেতে। একসময়ে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে সুগ্রীবের লাঙ্গুলের কিছু অংশ তার কাছে হারাতে হয় বলে এই বানরীর ওপর তার লোভ ও আক্রোশ দুইই এখনো বর্তমান। হনুমান এখন যদি তাকে জয় করতে পারে তবে তাকেই বিয়ে করতে পারে।

হনুমান শেষে কিচ্চট রাজ্যে পৌঁছে একসময়ে চিলিম্পারই আশ্রয়ে ও উৎসাহে তার কুঞ্জবনে আসে। চিলিম্পা হনুমানকে নানা প্রশ্ন করে তার স্বামী হিসেবে ও প্রেমিক হিসেবে বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে। শেষে কথায় পর্যুদস্ত হনুমান অসহায় আবেগে প্রেম নিবেদন করলেও চিলিম্পা তাকে কালান্তক যমের মতো তার দুই মহাকায় নরকপিদের দিয়ে অপমান করতে গেলে হনুমান প্রভঞ্জনের স্মরণে সমস্ত বাধা নিমেষে উপেক্ষা করে চিলিম্পার চুল ধরে আকাশের দিকে লাফ দেয়। ফেরার পথে হনুমানের সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের অভিনন্দনের মধ্যে, চিলিম্পার তাকে ছেড়ে দেবার জন্য কাতর ও কুশলী কথাবার্তার মধ্যে একসময়ে তুঙ্গভদ্রার জলে অষ্টোত্তর সহস্র পত্নীদের নিয়ে খেলা করার অবকাশে সুগ্রীবের কাঁধের ওপর চিলিম্পাকে ফেলে দেয়। অযোধ্যায়

ফিরে এসে সীতাকে সে কথা সবিনয়ে জানায় এবং সীতার কাছে সীতা ও রামের প্রতি একমাত্র ভক্তি নিয়ে তারই বরে অমর হয়ে পূর্বপুরুষদের চিরকালের জন্য পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান আদায় করে শান্তির জীবনে প্রবেশ করে।

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের মূল কেন্দ্রে আছে সাংসারিক তথা সামাজিক প্রেম-বিবাহ তত্ত্ব ও সত্য। এই গল্পের সমস্ত সত্য রূপ নিয়েছে হনুমানকে কেন্দ্র করেই, তাই গল্পের সমস্ত ঘটনা 'invented solely to live personality'. চরিত্র অঙ্কনই পরশুরামের মূল লক্ষ্য, তাই গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্প। হনুমান চরিত্রটি নির্ভর করে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও নর-নারীর হৃদয়গত সমস্যার প্রতিচিত্রণেই। পরশুরাম তার রূপদানেই নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছেন। হনুমানের বৃদ্ধ বয়সের বিবাহ বাসনার উন্মেষ দিয়ে গল্প শুরু। ক্রমশ গল্পকার তার মানস পরিবর্তন ও বিশ্বাসের বদলকে দেখিয়েছেন চঞ্চরীক, লোমশ, সুগ্রীব প্রসঙ্গ নিপুণভাবে এঁকে, এবং শেষে চিলিম্পার সঙ্গে জড়িয়ে তার যে মনোভাবের চরম রূপ অঙ্কিত, তাতেই তার সিদ্ধান্ত ও পরিণতি যথাযথ শিল্পভিত্তি পায়।

আর চরিত্রই প্রধান হয়ে ওঠায় 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটির প্লট-বৃত্ত ও কাঠামো অবধারিতভাবে যেমন একাধিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষতায় ও পরোক্ষে গ্রহণ করেছেন লেখক, তেমনি মনস্তত্ত্বকেও নিপুণ চিত্রের স্বভাবে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। 'হনুমানের স্বপ্ন' অবশ্যই একালের জটিল প্রেম-বিষয়ক গল্প এবং প্রেমের ও বিবাহের দুঃখজনক আশাভঙ্গের কাহিনী। গল্পটির সীতা-হনুমান প্রসঙ্গ, চঞ্চরীক-হনুমান সান্নিধ্য, লোমশ মুনি-হনুমানের কাহিনী, সুগ্রীব-হনুমান সংলাপ বিনিময়—প্রত্যেকটি ছোট ছোট উপকাহিনীর মতো প্লটে গ্রথিত। কিন্তু হনুমান চরিত্রকেন্দ্রিক লেখকের লক্ষ্য এক হওয়ায় এগুলি হনুমানের প্রেম, নারী ও বিবাহ বিষয়ের জ্ঞানার্জনেব পক্ষে ছোট ছোট ঘটনাজড়িত চিত্রের স্বভাব পেয়েছে। হনুমান-সীতা প্রসঙ্গ গল্পের মুখসন্ধি (exposition) চঞ্চরীকের 'এক ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল' এমন বিশ্বাসে স্থিত হওয়ার মধ্যে পরশুরাম অকৃতদার হনুমানের সামনে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সংগুপ্ত বাসনা ও একক স্ত্রী পালনের যন্ত্রণা ও অসহায়তার দৃষ্টান্ত রাখতে চেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে লোমশ মুনির একশো পত্নীর পরস্পরের কলহে অতিষ্ঠ হয়ে সংসার ত্যাগের কথায় হনুমানকে যেন সাবধান করে দিতে চেয়েছেন লেখক একসঙ্গে বহু স্ত্রী গ্রহণের জীবন-নিষ্ফলতার অভিশাপ বিষয়ে। চঞ্চরীক ও লোমশ সমাজের হিন্দু বিবাহের বৈচিত্র্য ও ব্যর্থতার দিক বোঝায। সুগ্রীব-কাহিনীতে বহু বিবাহের যন্ত্রণা নয়, বহু বিবাহের মধ্যে ব্যক্তিত্বময় পুরুষদেব পরাধীন স্ত্রীদের কুশলী, বুদ্ধিনির্ভর অধিগত করার ও সুখী জীবন কাটানোর আশাব্যঞ্জক দিক উপহার দিয়েছেন। হনুমানের এখানেও এক অভিজ্ঞতার দিক উন্মোচিত হয। এভাবেই প্লটের কাঠামো দৃঢ়সংবদ্ধ রূপ পেয়েছে 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে।

শেষে আছে চিলিম্পা-প্রসঙ্গ। প্লটবৃত্তের এখানেই পূর্ণরূপে পরিসমাপ্তি। একবিবাহ ও বহুবিবাহ নয়, বিবাহের আগে প্রেম বলতে কি বোঝায়, প্রেমে নারী-মনস্তত্ত্ব কোনো জটিল দিক তুলে ধরে, হনুমান-চিলিম্পার অনবদ্য সংলাপ-বিনিময়ে তার সার্থক রূপ মেলে।

হনুমানের যে পূর্ব অভিজ্ঞতা, তা এখানে অন্য আস্বাদে নতুন রূপ পায়। হনুমান এখানে সহজ, সরল, অকপট, অন্তরঙ্গ, প্রায়-অসহায় এক প্রেমিক—যার পরিচয় একালে নিশ্চয়ই মেলে, আর চিলিম্পা এক বুদ্ধিমতী, বাক্‌পটু, সুন্দরী, রূপসী, জটিল নারী-মনস্তত্ত্বের প্রেমিকা রমণী। হৃদয়ের কাছে হনুমানের হার হয় ঠিকই, কিন্তু বাহুবলে যে কোনো নারী সামান্যা। সেখানে প্রেমের সূক্ষ্মতা নয়, বুদ্ধি ও পরুষ-পারবশ্যের অনুগত হওয়া নয়, বলবান পুরুষ শক্তি দিয়েই নারীকে গ্রহণ করে, বিনা প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় তাকে ত্যাগও করে। প্লটে গল্পের যে ঘটনায় শেষ, তার নিয়ন্ত্রক লেখক নন, প্রধান চরিত্র হনুমান স্বয়ং। অর্থাৎ গল্পের কাহিনী, ঘটনা ও তার জটিল বৃত্ত কল্পনার একমাত্র ধারক, বাহক ও রূপকার হনুমান, অর্থাৎ নায়কই প্রধান।

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের শুরুর অংশটি বিবৃতিপ্রধান (narrative), কিন্তু তার চিত্রের সংহতি, সংযম লেখকের কলমে বিস্ময়কর। সমস্যার উদ্ভব নায়কের অজানা ভাবান্তরে, বিস্তার শুরু নায়কের পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদানের বাসনায়, বিবাহ-বাসনা জাগরণে। গল্পকার সারা গল্পে কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখেননি অবান্তর প্রসঙ্গ এনে। দৃঢ়পিনদ্ধ এই কাহিনী বয়নে, প্লট কাঠামোর নির্ভুল নির্মাণে 'মহামুহূর্ত' এসেছে দুটি দিক থেকে। গল্পের যে ঘটনার তীব্র গতি, যা গল্পটিকে রুদ্ধশ্বাস করেছে, তার দিক থেকে অবশ্যই 'মহামুহূর্ত' এরকম একটি বাক্যে :

> 'হনুমান মুষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বানরী ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীবের স্কন্ধে নিপতিত হইল।'

কিন্তু গল্পে চরিত্র-মনস্তত্ত্বের চরম রূপ এসেছে চিলিম্পা-হনুমান সংলাপ বিনিময়ে। হনুমান কিন্তু চঞ্চরীক, লোমশ মুনি ও সুগ্রীবের সঙ্গে কথোপকথনে অল্পভাষী, নিজের প্রেমধারণা, বিবাহ-পছন্দ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি কথাও বলেনি। চিলিম্পার সঙ্গে কথোপকথনে সে প্রেমিকের ভূমিকায়। সেখানে সে vocal। তার শেষ—জোর করে চিলিম্পার কেশ ধরে আকাশপথে সাময়িক ভ্রমণ। এখানে হনুমান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ রমণী চিলিম্পাও। চিলিম্পার সর্বশেষ পরিবর্তিত ও ধূর্ত প্রেম-বক্তব্য ও হনুমানের প্রেম-অভিজ্ঞতা যৌথভাবে চিলিম্পার ব্যবহৃত দুটি বাক্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার 'চরমক্ষণ'-কে শিল্পসার্থক করে :

১. চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলেন—'হে মহাবীর আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে লও নতুবা বক্ষে ধারণ কব।'

২. চিলিম্পা বলিলেন, 'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই। হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার নাই? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেও জানি না।'

পরশুরামের মূল লক্ষ্য যে হনুমান চিলিম্পা-সম্পর্ক চিত্র রচনা, তা সমগ্র গল্পেরও মূল লক্ষ্য, সিদ্ধান্ত-ব্যঞ্জনা। এরকম নায়িকার দুটি উক্তি মনস্তত্ত্ব সম্মত চরিত্রের দিক থেকে হনুমানের অভিজ্ঞতা অর্জনের দিক থেকে অবশ্যই 'মহামুহূর্ত' অংশ।

পুরাণ-আশ্রয়ী ব্যঙ্গ গল্প রচনার ধারায় পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পটি সার্থকতম শিল্পরসের কাঠামোয় এক অনবদ্য সৃষ্টি।

দুই

আগেই বলেছি, 'হনুমানের স্বপ্ন' মূলত চরিত্রাত্মক গল্প। পুরাণের মহাবীর এর নায়ক। তার বিবাহবাসনা জাগরণের পর তার বিবাহ ও প্রেম, প্রেমিক পুরুষ ও রমণী বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভের ক্রমচিত্র অঙ্কিত, সেখানেই এর বিবর্তন ধর্মের শিল্পরূপ। একালের অবিবাহিত, সাংসারিক ও সামাজিক যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালনে অকৃতদার প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া কোনো পুরুষের নতুন করে সংসার গড়ার বাসনা উদ্ভবের বিচিত্র দিকই হনুমান চরিত্রের পুরাণ-রূপে পরশুরাম ভাবতেই পারেন। জাবালির মতো হনুমানও এ গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ। বিবাহ ও ভার্য্যাপ্রেমী সম্পর্কে হনুমানের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে চঞ্চরীকের কাছে। চঞ্চরীকের কাছে সে স্বীকার করেছে পিতৃঋণ শোধের জন্য সে এই বয়সে বিবাহ চায়। কিন্তু চঞ্চরীকের কাছে 'এক ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল', 'অল্পে সুখ নাই ভূমাতেই সুখ', 'আমার একটা ভার্যা আছেন বটে, কিন্তু আমি বৈচিত্র্যের পিপাসু' 'নারীজাতিকে বশে রাখার উপায় একমাত্র লোমশ মুনি সম্যক অবগত'—এসব শোনার পর চঞ্চরীকের কাছে স্বীকার করে, 'তোমার দাম্পত্য কাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে।'

আবার লোমশ মুনির কাছে হনুমানের আর এক অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। লোমশ মুনি চঞ্চরীকের সামনে হনুমানকেও নিজের একশত পত্নী বিষয়ে শোনায় :

১. 'প্রত্যেক গৃহই ক্রোধাগার। হতভাগিনীগণ নিরন্তর কলহ করে, তাহাদের গৃহকর্ম নাই, পতিসেবা নাই, ব্রত পূজা নাই।'
২. 'আমি উত্ত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি, এখন সেই ব্যাপিকাগণ যত ইচ্ছা কলহ করুক।'
৩. এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি শান্তি চাই এবং আর একটি বিবাহ করিয়া এক পত্নীর যে সুখ তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।'

চঞ্চরীকের নিজস্ব দাম্পত্যকাহিনী শোনার পর লোমশ মুনির বচনে 'হনুমান কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব'। লোমশ মুনির বক্তব্য চঞ্চরীকের বিপরীত। এই অভিজ্ঞতার বৈপরীত্য হনুমানকে আরও অস্থির করে।

সুগ্রীবের কাছে বহু বিবাহের আর এক অভিজ্ঞতা লাভ করে হনুমান। সুগ্রীবকে তার বিবাহের কথা জানিয়ে হনুমান বলে, 'এই অনভ্যস্ত ব্যাপারে আমি সংশয়ান্বিত।' হনুমানকে বলা সুগ্রীবের দুটি উক্তি হনুমানের নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের রসদ জোগায় :

১. 'আমি অষ্টোত্তর-সহস্র ভার্যায় পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি।'
২. 'আমি কদলীবল্কল দ্বারা তাহাদের ওষ্ঠাধর বাঁধিয়া.রাখি, কেবল প্রেমালাপ কালে খুলিয়া দিই।'
৩. 'আপাতত তুমি একটি মাত্র পত্নী গ্রহণ কর, পরে ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি করিও।'

এই বিবাহ-অভিজ্ঞতা চঞ্চরীক ও লোমশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ আর এক অভিজ্ঞতা হনুমানের। কিন্তু এর পরও যখন সুগ্রীব চিলিম্পা প্রসঙ্গ লোভে-ক্ষোভে বিস্তারিত জানায় হনুমানকে, তখন অকৃতদার হনুমান 'কিছুক্ষণ চিন্তা' করে। এই চিন্তাতেই আছে অনভিজ্ঞ হনুমানের আর এক প্রেমিক সত্তায় বদলের গোপন বীজ।

অভিজ্ঞ হনুমানের সঙ্গে চিলিম্পার কথোপকথনে হনুমান চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। চিলিম্পাকে সখী পরিবৃত হয়ে কুঞ্জবনে দেখেই হনুমান মুগ্ধ। তার মুগ্ধতায় প্রথম দর্শনে প্রেমোদগম ও স্বগতোক্তির মতো শপথ বাক্য উচ্চারণে চরিত্রের বদল স্পষ্ট :

> 'ইহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সংশয় দূর হইল। ইহাকে যদি লাভ করিতে না পারি তবে জীবনই বৃথা।'

এর মধ্যে নায়ক চরিত্রের বিবর্তন ও অন্তঃশীল গতি ব্যঞ্জনা পায়। হনুমান প্রেমে নির্বোধ ও অকপট, অন্তরঙ্গ, চিলিম্পার পাণিগ্রহণের কথা স্পষ্ট কথায় বলে, নিজের গুণকীর্তন করে সবিস্তারে। কিন্তু চিলিম্পার সঙ্গে সংলাপ বিনিময়ে সংকট দেখা দিলেও হনুমান ভাবে 'আমি অপ্রতিভ হইব না'। সে ক্রমশ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চিলিম্পার চুলের মুঠি ধরে ওপরে আকাশে লাফ দেয়। এরপর হনুমানের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে জাত এক নির্ভীক নিরাসক্তি দেখা দেয় মনের গভীরে। হনুমান যে 'বৃদ্ধবালক' হলেও বড় রসিক, তা তার সুগ্রীবের কাঁধে চিলিম্পার মতো বানরীকে নিক্ষেপেই প্রমাণ হয়ে যায়। সে বোঝে চিলিম্পা সুগ্রীবের কাছেই জব্দ হবে। তার কাছে চিলিম্পা 'সামান্যা বানরী' মাত্র, তুচ্ছ বিষয়। আজীবন রাম-সীতার ভক্ত হয়ে থাকার মধ্যেই তার চরিত্রের শেষ স্বভাব কল্পিত।

হনুমানের বিবাহ প্রসঙ্গ রামায়ণে বা প্রাচীন কোনো পুরাণেই নেই। পুরাণে হনুমানের যেখানে শেষ, পরশুরাম সেখান থেকেই চরিত্রটি শুরু করেছেন। হনুমানের সারা জীবনে যা অভাব, সেই প্রেমিকা, নারীসঙ্গ ও বিবাহ, তা দিয়ে চরিত্র ভাবনায় ও পরিকল্পনায় পরশুরামের অনবদ্য কৃতিত্ব ধরা পড়ে। হনুমান চরিত্রে আদ্যন্ত পুরাণের বৈশিষ্ট্য ও মেজাজ বজায় রেখে লেখক একালের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মানুষের বিবাহবাসনাকে রূপক নির্মাণের স্বভাব দিয়েছেন। হনুমানের সামগ্রিক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার শমেই নায়ক চরিত্রের মাহাত্ম্য ও ব্যঞ্জনা। পুরাণের জাবালি লেখকের হাতে অত্যন্ত গম্ভীর রূপ পায়। তার বলিষ্ঠতা, মহিমা, গাম্ভীর্য লঘুরসের স্বভাব থেকে বরং গম্ভীর রসকেই অন্তে প্রধান করে। হনুমান চরিত্র তা নয়। তার মধ্যে পরশুরাম অসাধারণ কৌতুকরসের জোগান দিয়েছেন। তার যাবতীয় সক্রিয়তা ও সংলাপ, তার চিন্তাভাবনা ও সাংসারিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কোথাও ব্যঙ্গে ও কোথাও বা অনাবিল বিশুদ্ধ হাস্যরসের বন্যায় আমাদের মনোজগৎকে বুঝিবা অবগাহনের মতো স্নাত করে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি গল্পেব ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস-স্বরূপের বিচারে। হনুমান চরিত্র সম্পর্কে শেষ কথা, পরশুরাম তাকে প্রাজ্ঞ, স্থিতধী ও দ্রুত রাগান্বিত হওয়া ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন চরিত্র রেখেই কৌতুকরসের নির্মল শুভ্র একটি চাদর তার ওপর ঢেকে দিয়েছেন। হনুমান পুরাণে নিশ্চয়ই এক শ্রেষ্ঠ নায়ক, আবার ছোটগল্পে সে যেন লেখকের নবসৃষ্টি। তার মধ্যেকার মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশধর্ম তাকে পুরাণের মোটা দাগ থেকে আধুনিক সূক্ষ্মরেখায় চমকপ্রদ ব্যঞ্জনার পোশাক পরায়। গল্পে সে রমণী দেহের প্রাচীন অলংকার নয়, একালের আধুনিকাদের হাতের চুড়ি।

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্প রচনায় হনুমান চরিত্র আলোচনার পর প্রায় সমান প্রাধান্য পায়

চিলিম্পা নামের বানরী চরিত্র। ছোট পরিসরে হলেও এই গল্পের নায়িকা নিশ্চিত চিলিম্পা। গল্পে চিলিম্পা প্রসঙ্গটি আমরা প্রথম পাই সুগ্রীবের সংলাপে। কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে কিচ্চট দেশের অধিপতি প্লবংগম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করলে তার মেয়ে চিলিম্পা পিতার রাজ্য শাসনের অধিকার পায়। সুগ্রীবের বর্ণনায় সে 'অতিশয় লাবণ্যবতী বিদুষী ও চতুরা।' সুগ্রীবের মতে সে দুর্বিনীতা, সুগ্রীব বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালে সে তার লেজ কেটে অপমান করে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরশুরাম হনুমানের কাছে সুগ্রীবের কথায় চিলিম্পা প্রসঙ্গ তুলে সুগ্রীবের দুটি মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন, ১. 'বানরীর উপর আমার লোভ আক্রোশ উভয়ই আছে', ২. 'তুমি যদি তাহাকে জয় কর, তবে আমার ক্ষোভ দূর হইবে।'

চিলিম্পা সম্পর্কে সুগ্রীবের এই ব্যক্তিগত রুচির বর্ণনা ও ধারণার সঙ্গে চিলিম্পার প্রতি হনুমানের প্রেম নিবেদনের ও তাকে বলপূর্বক গ্রহণের সূক্ষ্ম যোগ আছে। চিলিম্পা অবিবাহিতা যুবতী বানরী, তার ওপর অভিভাবকহীনা। সে অনেকটা স্বয়ম্বরা, নিজেই নিজের প্রেমিক ও পতি নির্বাচনে সক্ষম। তার সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত, তীক্ষ্ণ এবং একেবারে আধুনিকা সুন্দরী, আত্মঅহংকারী প্রেমিকা রমণীর মতো সপ্রতিভ। প্রথমেই সে হনুমানকে তার মতো নারীকে গ্রহণ করার মতো কি গুণ আছে জানতে চেয়েছে। হনুমানের গুণাবলী শুনে চিলিম্পা তার বীরত্ব বাদ দিয়ে নৃত্যগীত, কাব্যরচনা ইত্যাদি কান্তগুণগুলি আছে কিনা খবর নেয়। প্রেমিক নায়ক হিসেবে প্রেমিকার আনন্দ, অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি বৃত্তিতে, মূল্যবান গহনা-বাসনায় হনুমানের তাৎক্ষণিক কৃতকর্ম কিরূপ, তাও জানতে চায়। হনুমান সে সবের কোনো মনোমত উত্তর দিতে না পারায়, 'হনুমানের চিবুকে তর্জনীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর স্বরে' প্রেম প্রত্যাখ্যান করে কিষ্কিন্ধ্যার সুগ্রীবকে পাঠিয়ে দিতে বলে। সবশেষে হনুমান যখন চিলিম্পার কেশ ধরে আকাশ-পথযাত্রী হয়, তখনও চিলিম্পা হনুমানের হাত থেকে মুক্তিব জন্য তাকে পিঠে বা বুকে নিতে বলে, এমনকি প্রেমের ছলনায় তার আগের যাবতীয় সংলাপ ও আচরণ শুধু পরিহাস-মাত্র এবং সে হনুমানেরই একমাত্র অনুরাগিণী—এমন বানানো অনুনয় জানাতেও নির্দ্বিধ হয়।

বস্তুত, এমন চিলিম্পা চরিত্রটিকে লেখক সুন্দরী যুবতী রমণীদের জটিল মনস্তত্ত্বে শোভিত করেছেন। নিরেট, বুদ্ধিহীন বীরত্ব একালের সুন্দরী প্রেমিকা নারীরা চায় না, তাদেব কারো কারো কাছে প্রেম বিলাস মাত্র, আরামের, সুখের বিষয়। সে যে পুরুষের সঙ্গে প্রেমের চতুর খেলা পছন্দ করে, শেষ মুহূর্তে সুগ্রীবকে পাঠাতে অনুরোধ করার মধ্যে তারই প্রচ্ছন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় মেলে। নারীমাত্রই মনের গভীরে একাধিক পুরুষের অধিষ্ঠানের স্থানবদল আহ্বান করে। পরশুরাম এমন জটিলতম ক্রীড়াসুখে নিবিষ্ট একালের নারীদের মতো করে চিলিম্পাকে এঁকেছেন। চিলিম্পার মধ্যে আধুনিকোত্তম নায়িকার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। সুগ্রীবের কাঁধে তাঁকে নিক্ষেপ হনুমান তথা লেখকেব সার্থক শিল্পসম্মত মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র-পরিণতির নির্দেশক।

গৌণ চরিত্র চঞ্চরীক, লোমশ মুনি ও সুগ্রীব। লোমশ মুনি ও সুগ্রীবের প্রসঙ্গ প্রাচীন

পুরাণে বিস্তারিতভাবে মেলে। গল্পে এই তিন চরিত্রকে পরশুরাম এনেছেন হনুমানের অভিজ্ঞতা অর্জনের উপযোগী রসদ জোগানোর জন্য। এক স্ত্রী নয়, একাধিক স্ত্রী পুরুষের জীবনে শান্তি আনে। চঞ্চরীক তা-ই ঘোষণা করে। লোমশ মুনি বহু পত্নীর থেকে এক পত্নীতেই শান্তি খোঁজে নিশ্চিত অর্থে; সুগ্রীব সুকৌশলে বহু পত্নীর মধ্যে সুখী, শান্তির আস্বাদ পায়। এই সমস্ত কিছুই তত্ত্বগত, হনুমানের কাছে বিবাহ ও বিবাহোত্তর পুরুষ জীবনের বিচিত্র ও তিক্ত এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আনে। এদের প্রসঙ্গ হনুমানের অভিজ্ঞতা অর্জনেই দায়বদ্ধ। সুগ্রীব প্রসঙ্গ গল্পের পরিণতি দানে কিছুটা শিল্প-দায়িত্ব পায়। এরা গল্পের প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ রচনাতেও প্রয়োজন মত নিজেদের শিল্প-দায়িত্ব মিটিয়ে দেয়।

তিন

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমজনিত সম্পর্কে জটিলতা ও একজন পুরুষের পক্ষে এক বা একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ সমস্যা ও সংকট। এই বক্তব্যটিকে পরশুরাম তত্ত্বের নীরসতায় পরিবেশন করেননি, তিনি সহজেই দিয়েছেন তত্ত্বের অনবদ্য রসরূপ। আর সে রস অবশ্যই কৌতুকরস। এই কৌতুকরস নানা প্রসঙ্গে কখনো বিশুদ্ধ হয়, কখনো ব্যঙ্গাত্মক, কখনো বা শ্লেষধর্মী। কখনো কখনো স্যাটায়ার-গল্প-লেখকের হাতে কৌতুকরস কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হয়, কখনো বা নির্মল হাস্যরসের 'শরতের মেঘে বজ্র'র মতো উতরোলে হতচকিত হতে পারে। 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের কৌতুকরস শুভ্র সংযত হাস্যরসে শোভিত, একেবারে অন্তস্থলে ঠিক ব্যঙ্গ নয়, থেকে গেছে শ্লেষের পরিশীলিত ছায়া। বৃদ্ধ হনুমানের নামের সঙ্গে মিলিয়ে সীতার হনুমানের স্ত্রীকে 'হনুমতী' হিসেবে সম্বোধন বাসনা—এসবই বিশুদ্ধ কৌতুকের নির্মল আকাশকে দেখায়।

হনুমানের বুদ্ধি স্থূল, সে চঞ্চরীকের বীণার তার স্থূল অঙ্গুলি স্পর্শে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। তার নারী তথা কাল্পনিক ভার্যার চিন্তায় নারীজগৎ সম্পর্কে ভাবনার ভাষায় আছে অফুরন্ত কৌতুকরস :

> 'এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল বুদ্ধি নাই। অথচ দেখ ইহারা শিশুকে স্তন্যদান করে. কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে, তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তান পালন ও নিরর্থক বস্তু সংগ্রহই একমাত্র কার্য। ঈদৃশী কোমলাঙ্গী মসৃণবদনী পয়স্বিনী শিশুপালনী ভার্যার সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব?'

এমন চিন্তার মধ্যে যেমন কৌতুকরসের স্বতঃপ্রবাহ আছে, তেমনি অন্তঃশীল আছে পরশুরামের নারীজগৎ সম্পর্কে শ্লেষাত্মক ভাবনা। লোমশ মুনির কথায় তার একশো স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে 'মূষিকা চর্মচটিকা পেচরী ছুছুন্দকী' বলে, 'আমাকে ভল্লুক বলে'—এই বর্ণনায় বিশুদ্ধ কৌতুকের চমৎকার পরিচয়। আবার হনুমান যখন চিলিম্পার প্রশ্নের উত্তরে জানায় :

'রাবণবধের পর আমি অধীর হইয়া একবার নৃত্যগীতের উপক্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু নল নীল প্রভৃতি বানরগণ আমাকে উপহাস করে, তাহাতে আমি নিরস্ত হই। সুমিত্রানন্দন এখন আমাকে বলে—মারুতি তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি যাহা কর তাহাই নৃত্য, যাহা বল তাহাই গীত, যাহা না বল তাহাই কাব্য, ইতর 'জনের বুঝিবার শক্তি নাই।'

তখন গল্পের বিশেষ বিশেষ 'সিচুয়েশন'-এ এমন সব মন্তব্য চরিত্র নিহিত উদ্ভট রসে আমাদের চিত্তে হাস্যরসের বন্যা আনে। বানরধর্মে ভার্যাকে চপেটাঘাতে বিনীত করা, চিলিম্পা ভার্যা হলে তার রাগে অনাহারে থাকার সময় 'লৌহ কঠোর অঙ্গুলি দ্বারা তোমাকে খাওয়াইব।'—চিলিম্পাকে এমন মন্তব্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত মেলে।

গল্পের শেষ দিকে চিলিম্পার কেশ ধরে আকাশে ওড়ার সময় হনুমানের সঙ্গে চিলিম্পার সংলাপ বিনিময় অংশটুকু অফুরন্ত হাস্যরসের স্বাদ দেয় :

'চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলেন—'হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে লও নতুবা বক্ষে ধারণ কর।'

হনুমান বলিলেন—'চোপ!'

চিলিম্পা বলিলেন—'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই। হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার নাই? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেও জানি না।'

হনুমান পুনরপি বলিলেন—'চোপ!'

এই সংলাপ-চিত্রের সিচুয়েশনে হনুমানের শুধুমাত্র হিন্দি শব্দভূত 'চোপ' এমন ধরনের শব্দপ্রয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসেরই অনাবিল উৎসার ঘটায়। বিপদে পড়ে চিলিম্পা হনুমানের খোসামোদের জন্য একবার সম্বোধন করেছে 'মহাবীর' বলে, পরে 'প্রাণবল্লভ' শব্দের প্রেম নিবেদনে—এতে চিলিম্পার সুবিধাভোগী চাতুর্য ও ভান ধরা পড়ে ঠিকই, কিন্তু একেবারে বাস্তব কাতর রমণীর মতো—কেশ ছেড়ে দাও বড় লাগছে—এমন ভাবার্থক বাক্যের পুরাণ ভাবনাহীন বাস্তবতা পরশুরামের সংলাপ সৃষ্টির নিজস্বতা প্রমাণ করে। চরিত্রটির পুরাণ-খোলস অপসৃত হয়ে যায় নিমেষে। এমন প্রমাণ আমরা পাই 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের শেষে মহাদেবের সেই বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সংলাপের পুরাণ পরিবেশহীন বাস্তবতায় : 'আঃ ছাড়—ছাড়—লাগে, মাইরি এমন ইয়ারকি ভাল লাগে না—চার্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলছি।' এই হল পরশুরামের সংলাপ সৃষ্টির বড় কৃতিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। সংলাপের পুরাণ-মেজাজকে ত্যাগ করে লেখক সহজেই বাস্তবে বিচরণ করতে পারেন। তার শিল্পকৌশল লেখকের ক্ষমতায় অসামান্য।

পরশুরামের সমস্ত কৌতুক-রসাশ্রিত গল্পের প্রকাশরীতি ও ভাষাদর্শ মতোই 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পের কৌতুকরসের মর্যাদার বড় দিক তার সাধুভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গিতেই। আলোচ্য গল্পের গদ্যরীতি—কি বর্ণনায়, কি সংলাপে—উভয়তই সাধু। কিন্তু গদ্যের এই সাধু স্বভাব কথ্য গদ্যের অবয়ব ও মেজাজকে অন্তঃশীল করেই রূপ পেয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক কথ্যভাষায় হাস্যরস ব্যবহারের তীব্র বিরোধী। এই জাতীয়

ধারণা যে হাস্যকর, বাংলা সাহিত্যের একাধিক কথ্য ভাষায় লিখিত কৌতুকরসের গল্পের বড় মর্যাদাপ্রাপ্তিতে তার প্রমাণ হয়ে যায়। উক্ত সমালোচক পরশুরামের গল্প আলোচনায় এমন মন্তব্য করেন। পরশুরাম তাঁর 'লঘু গুরু' প্রবন্ধ সংকলনের 'সাধু ও চলিত' ভাষা প্রবন্ধের এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন :

> 'সাধু ভাষায় প্রকাশ শক্তি একতরফা, চলিত ভাষার অন্যরকম। দুই ভাষাই আমাদের চাই, নতুবা সাহিত্য অঙ্গহীন হবে। ভাষায় দুই ধারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, সুবিধা অসুবিধার হিসাব করে তার একটিকে গলা টিপে মারতে পারি না।'

বস্তুত 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে সাধু রীতির গদ্য ব্যবহৃত হলেও কথ্য গদ্যকে সুকৌশলে সাধুর সঙ্গে জড়িত রেখেছেন। হনুমানের কণ্ঠে উপ 'উপ রব' এর ধ্বন্যাত্মক অব্যয় প্রয়োগে কথ্য শব্দের প্রয়োগ সার্থক ও কৌতুকরসের সম্যক পরিচায়ক হয়েছে। চিলিম্পার সংলাপে 'আমি যে তোমা-বই' এবং অব্যয় প্রয়োগে, 'সখীগণ কিলকিল রবে হাসিয়া উঠিল' এমন ধ্বন্যাত্মক শব্দসহ বাক্যবন্ধে, 'হনুমান সমস্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল' এমন বাক্যাংশ-নিহিত শব্দের কথ্য প্রয়োগে সাধু গদ্যের গম্ভীর পরিবেশের কৌতুকরসে হাস্যরসের স্বাদু মিশেল ধরা পড়ে। আবার হনুমান যখন সাধু শব্দে ও গদ্যের ভারে সূর্যকে কক্ষপুটে রুদ্ধ করার জন্য চিলিম্পাকে বলে, 'এই দেখ স্ফোটিকের চিহ্ন' রাবণের রথের চূড়া চর্বণ করার কারণে দেখায়, 'এই দেখ দন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে।' বলে 'লৌহকঠোর অঙ্গুলি দ্বারা তোমাকে খাওয়াইব।' চিলিম্পাকে ধমকের শব্দ প্রয়োগ করে 'চোপ' বলে, তখন অতি সাধারণ মানুষের মুখের কথাব ভাব গুরুগম্ভীর শব্দের ভারে স্বতঃস্ফূর্ত অসঙ্গতি তুলে ধরায় সাধুগদ্য ও চলিত বিষয় মিলে-মিশে পুরাণের চরিত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে যায়। ব্যঙ্গ-কৌতুক রসাশ্রিত গল্পে পরশুরামের গদ্য এক অতি মূল্যবান কারুকার্যখচিত শিল্প-আধার।

চার

আলোচ্য গল্পটির নাম 'হনুমানের স্বপ্ন'। নায়ক চরিত্রের নামের সঙ্গে তার 'স্বপ্ন' তথা বাসনা-কামনা বা কিছু ব্যাপক অর্থে 'আদর্শ'-এর ভাব যোগ করে গল্পকার এক ব্যাখ্যামূলক তাৎপর্য দিয়েছেন গল্পের নামে। নামটি নিশ্চয়ই চরিত্রকেন্দ্রিক নয়, চরিত্রের স্বপ্ন কেন্দ্রীয় বক্তব্যে নিহিত থাকায় কিছুটা ব্যঞ্জনাময়তা আছে। হনুমান এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়কও। তারই জীবনবৃত্তান্ত দিয়ে তার স্বপ্ন-স্বরূপকে তুলে ধরাই গল্পকারের লক্ষ্য। সেখানে আদিতে স্বপ্ন ও অন্তে বাস্তবত স্বপ্নভঙ্গই দেখানো হয়েছে হনুমানের কৃতকর্মের ও ক্রম-অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাসনার মধ্য দিয়ে। এমন গল্পনাম তাই গল্পের মূল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু স্বপ্নের আদি রূপ থেকে গল্পের স্বপ্নের বিস্তার অন্য পথে গেছে বলে মনে হয়। আদিতে হনুমানের স্বপ্ন ছিল সীতার যুক্তি অনুযায়ী এমন পরিণত বয়সেও বিবাহ করা, সীতা দেওয়া নাম 'হনুমতী'কে নির্বাচন করে অযোধ্যায় নিয়ে আসা। এতে পূর্বপুরুষদের

ক্ষুধানিবৃত্তিকে 'নিশ্চিন্ত' করা সহজ হবে। হনুমানের যুক্তি ছিল, 'আমি এখন বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত, এখন যদি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে চাই তবে লোকে আমাকে ধিক্কার দেবে।' অন্যদিকে সীতা তাকে প্রেরণা দেয়, 'তুমি লোকলজ্জায় অভিভূত হইও না, এই দণ্ডে বিবাহ করিয়া পিতৃগণকে নিশ্চিন্ত কর। তোমার কী এমন বয়স হইয়াছে? আমার পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয় তোমার অপেক্ষাও অধিক বয়সে ভরত-জননীকে গৃহে আনিয়াছেন।' ওই প্রেরণায় হনুমান বিবাহ করার মন নিয়ে 'হনুমতী'র খোঁজে বেরোয়। সেই স্বপ্ন রূপান্তরিত হয় বিচিত্র সব ভার্যাদের ও স্বামীদের চরিত্র বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়াসে। স্বপ্ন স্বপ্নভঙ্গের দিকেই নিয়ে যায় হনুমানকে। সুগ্রীব তার স্বপ্নকে আবার নতুন জীবন ও গতি দেয়। শেষেও সেই স্বপ্নভঙ্গ! তাই স্বপ্নের এমন বিচিত্র ভার্যাচরিত্র-নির্ভর অভিজ্ঞতাই গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে থাকায় নাম অবশ্যই সার্থক।

'হনুমানের স্বপ্ন' প্রধানত স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। কিন্তু তার স্বপ্নভঙ্গের পরেও সে চিলিম্পাকে সুগ্রীবের কাছে ত্যাগ করে নারী তথা প্রেমিকা তথা ভার্যা জাতির প্রতি এক ধরনের অনুকম্পা প্রকাশ করে। তাদের রূপ, সৌন্দর্য, প্রেমবাসনা, অহমিকা, আত্মগৌরব, দম্ভ ইত্যাদির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। মুহূর্তের যে প্রেমাবেগ হনুমানের জেগেছিল চিলিম্পার প্রতি, তা তাকে কিছু পরেই নিরাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। নিরাসক্ত হনুমানের নিজস্ব এক স্বপ্ন তৈরি হয়। সে স্বপ্ন চিলিম্পার মতো নারীদের শাস্তিবিধান। সুগ্রীবের নারী শাসনের কৌশল চিলিম্পার মতো নারীদের উচিত শিক্ষা দেবে, এই বিশ্বাস তার নারীর প্রতি নির্মোহ স্বপ্নকে নতুন অভিজ্ঞতা ও উপায় দেখিয়ে দেয়। হনুমানের স্বপ্ন তার একান্ত নিজস্ব, তা স্বাবলম্বী, ভক্তিরসে রাম-সীতাব সেবাধর্মে নিজেকে নিযুক্ত করা। সেই শেষ বিশ্বাসের স্বপ্ন সীতাকে বোঝায় এই ভাযায :

> 'বিধাতা আমার এই বিশাল বক্ষে যে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াছেন তাহা তুমি ও রামচন্দ্র পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দারা পুত্রের স্থান নাই।........
> জননী তুমি এই বর দাও যে অমর হইয়া চিরকাল পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান করিতে পারি।'

হনুমানের চিরন্তর স্বপ্ন এটাই। সে পুরাণেব চরিত্র মধ্যে থেকে গেছে—এ অর্থেই 'হনুমানের স্বপ্ন' নামের যথার্থ শিল্পমূল্য।

১০.

ভুশণ্ডীর মাঠে

এক

পরশুরামের 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পটি তাঁর 'গড্ডলিকা' গ্রন্থের সংকলিত মোট পাঁচটি গল্পের সর্বশেষ রচনা। গ্রন্থের প্রথম তিনটি রচনা—'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা-সঙ্কট' ও আদ্যন্ত নাট্যাঙ্গিকে লেখা 'মহাবিদ্যা'য় কোনো অলৌকিক ঘটনা ও রসস্রোত নেই। গল্প তিনটির সামগ্রিক বাস্তবতা, কৌতুক ও ব্যঙ্গ এবং শ্লেষ স্বাভাবিক। চতুর্থ গল্প 'লম্বকর্ণ'-

এর মধ্যে লম্বকর্ণ 'নামের ছাগলটির উপস্থাপনায় ও চিত্র-স্বভাবে এবং রসনিষ্পত্তিতে কিছু অবাস্তব, রূপক ও ফ্যান্টাসি'-উৎসের উপযোগী বৈশিষ্ট্য মেলে। শেষ গল্প 'ভূশণ্ডীর মাঠে'-র মধ্যে প্রথম দিকে মেলে পরশুরামের মনন বৈশিষ্ট্যের উপযোগী বাস্তব যুক্তিসম্মত মনস্তাত্ত্বিব পরিবার জীবনরস, এবং কিছু পরেই সেই রসের ওপর পড়েছে রঙ্গরস সমৃদ্ধ কল্পনাময় ফ্যান্টাসির বাতাবরণ। সেই ফ্যান্টাসি গল্পের ঐহিক ঘটনা ও চরিত্রের বাস্তব পরিবেশ ও বুদ্ধি এবং ফ্যান্টাসির যথোচিত প্রয়োগে এক জাঁকজমকপূর্ণ রঙ্গরসের প্রবাহ এনেছে। রচনার সমকালের প্রেক্ষিত তাতে যেন উত্তপ্ত ভিয়েনের কাজ করেছে। গল্পকারের লক্ষ্যভেদী উদ্দেশ্য হয়েছে প্রধান 'pointing finger'।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়কও পেনেটি গ্রামের এক শিবু ভট্টাচার্য—যার এক স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ি, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সংসারে দিনযাপন অনায়াস। পিতার কাছে সামান্য যেটুকু লেখাপড়া শেখে, তাতে তার সম্পত্তি ও যজমান রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এত থাকা সত্ত্বেও শিবু অ-সুখী। এর মূলে তার আনুমানিক বছর-পঁচিশ বয়সের মজবুত গড়নের দুর্দান্ত স্বভাবের স্ত্রী নৃত্যকালী। স্বামীকে সে যত্নের তেমন কোনো ত্রুটি রাখত না, কিন্তু শিবু তার মধ্যে কোনো আনন্দ পেত না। একটুতেই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয় এবং একবার শুরু হলে নৃত্যকালী সহজে নিরস্ত হত না। সবসময় শিবুরই হত পরাজয় এমন অবস্থায়। একবার এক গুজবে নৃত্যকালী শোনে, তার স্বামীর চরিত্রদোষ দেখা দিয়েছে। এতে শিবুকে স্ত্রীর হাতের ঝাঁটার প্রহার খেতে হয়। রাগে, ক্ষোভে, বেদনায় শিবু সে রাত বাড়িতে কাটিয়ে ভোরের ট্রেনে চলে আসে কলকাতায়। কালীঘাটে এসে পাঁচ টাকার পুজো দিয়ে, ভবিষ্যতে জোড়া পাঁঠার নৈবেদ্য দেবে মনস্কামনা জানিয়ে দেবীর কাছে ঐকান্তিক কামনা জানায়, যেন স্ত্রী কলেরায় মারা যায়, সে পরে নতুন সংসার করবে। আরও কারণ তার কোনো সন্তানও হয়নি। এবপর নানান খাদ্য বিপুল পরিমাণে খাওয়া-দাওয়া করে, সারারাত থিয়েটার দেখে ভোরে পেনেটির বাড়ি ফিরলে স্ত্রীকে কাঁদিয়ে ভেদবমিতে আটঘণ্টা ভোগের পর মাবা যায়।

এবার শিবুর প্রেতাত্মা সম্পূর্ণ জনহীন, বিশাল ভুশণ্ডীর মাঠ নামক শ্মশানের এক পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়ানো তালগাছের পাশের এক নেড়া বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে বসবাস শুরু করে। মাস দুই শিবু নতুন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটায়। কিন্তু পরে ক্রমশ শিবুর এক শূন্যতাবোধ আসে। এরই মধ্যে স্ত্রী নৃত্যের বদ স্বভাবের কথা মনে পড়লেও তার যে শিবুর প্রতি একটা আন্তরিক টান ছিল, সেটাও এখন অনুভব করে। তাতে পেনেটির বাড়ির স্ত্রীর কাছাকাছি থাকার বাসনা জাগলেও ভূত-অবস্থায় তাকে লোকে স্ত্রৈণ ভাববে ভেবে তা থেকে বরং উপদেবীর সন্ধান করে। ফাল্গুন মাসের শেষবেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের ভূতের সংসারে আনন্দের মধ্যেও ভুশণ্ডীর মাঠের সীমায় পিটুলি বিলের ধারে এক দন্তহীন গাল তোবড়ানো বয়স্ক পেত্নীকে দেখে, পেত্নীটি সন্ধেয় কালো হাতে মাছ ধরে। শিবু জানে এর সঙ্গে প্রেম হওয়া অসম্ভব,

বড়জোর কিছু ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলতে পারে। এক এলোচুল শাঁকচুন্নির দিকে বারকয়েক নজর পড়ে শিবুর। তার পরনে একটি গামছা, মাথায় আর একটি, লম্বা পা বকের মতো। সে হাতের গোবরগোলা জল ছড়াতে ছড়াতে চলে যায়, তবে বয়স বেশি নয়। ওর সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে শাঁকচুন্নির প্রত্যাখ্যানে আর এগোয় না। শিবু শেষমেশ আকৃষ্ট হয় মাঠের পূর্বদিকে ক্ষীরি-বামনীর পরিত্যক্ত বাড়ির একটি ঘরে বাসকরা এক ডাকিনীর প্রতি। শিবুকে দেখে হাসে, এবং তাতে ডাকিনীর মুখশ্রীর ও সাদা দাঁতের মোহে মজে যায়। স্ত্রী নৃত্যকালীর ছিল পানতুয়ার রঙ, এর রং যেন পানতুয়ার সাদা শাঁস।

ক্রমশ শিবুর পুরুষ সঙ্গী হয় তালগাছের আর এক অবাঙালি ভূত কারিয়া পিরেত। শিবু ও কারিয়া পিরেতের পরস্পরের গানের সূত্রেই আলাপ। কারিয়া পিরেতের কাছে তামাক খেতে চাইলে পিরেত বৈদ্যবাটির বাজার থেকে সঙ্গে সঙ্গে তা এনে খাওয়ায় এবং শিবুর কথায় পিরেত নিজের জীবনের কথা বলে। ছাপরা জেলার কারিয়া পিরেত স্ত্রী মুংরির বদমেজাজ সহ্য করতে না পেরে, প্রতিবেশী ভজুয়ার বোনকে নিয়ে সন্দেহ করাতে স্ত্রীকে ছেড়ে আসে কলকাতায়। গ্রামে মুংরি বসন্তরোগে মারা যায়। পিরেত চাঁপদানির মিলে কাজ করার সময় কপিকলে মাথায় আঘাত লেগে মরে। তারপর ভূত হয়ে বাস করে তালগাছে। ওদের তামাক খাওয়ার মধ্যেই দেখা দেয় এক যক্ষ রিষড়ার নদের চাঁদ মল্লিক। সে বন্ধকী কারবার করত ঐহিক জীবনে। এখন যক হয়ে সেই সম্পত্তি আগলাচ্ছে। পদবি বসু, জাতে কায়স্থ। পেশায় দাপুটে দারোগা ছিল ভদ্রেশ্বরে। নিজেকে মহাকবি কালিদাসের ভায়রাভাই বলে পরিচয় দেয়। তার হাতে চেলা-কাঠের মার খেয়ে স্ত্রী পালালে নিঃসন্তান নদু আর বিবাহ করে না—কারণ বিবাহ করলে তার ছেলেরা সম্পত্তির অধিকারী হবে ভেবে—নিজেই এখন সমস্ত সম্পত্তি আগলায়। এখন ইঁটের পাঁজায় বসবাস।

এদিকে অনেক অনুরোধের পর ডাকিনী শিবুর ঘর করতে রাজি হয়। বিবাহের দিন সমস্ত আয়োজনের পরে সন্ধ্যে শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে শিবুর অনুরোধে ডাকিনী ঘোমটা সরাতেই শিবু চমকে দেখে—ডাকিনী ওর স্ত্রী নৃত্যকালী। নৃত্যকালী জানায় তার মৃত্যু হয় কেরোসিনের আগুনে। ডাকিনী-নৃত্যকালীর সেই আগেরই দজ্জাল স্বভাব ও সন্দেহ! এই সময় আসে পেত্নী ও শাঁকচুন্নি। আসলে এই দুজন হল শিবুর আগের দুই জন্মের দুই স্ত্রী। সঙ্গের ডাকিনী যুক্ত হওয়ায় তিন জন্মের স্ত্রীর ঘটে ত্র্যহস্পর্শ যোগ। তিন পত্নীর মধ্যে শিবুকে কেন্দ্র করে তুমুল ঝগড়া চলতে থাকে। শিবুর তখন তিন স্ত্রীর সামনে তটস্থ অবস্থা। হাতে পইতা জড়িয়ে ইষ্টমন্ত্র জপে নিবিষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাইরে কারিয়া পিরেত গান গায়। যক্ষ ও পিরেত বেড়া ভেঙে বিয়ের আসরে ঢোকে। ঘরের চাল, দেয়াল, আগড় সব ভেঙে আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। এরই মধ্যে যক্ষ ও নৃত্যকালীকে দেখে চিনতে পারে ওর আগের জন্মের স্ত্রীকে। কারিয়া পিরেত দেখে তার আগের জন্মের স্ত্রী মুংরিকে। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই দুটি ত্র্যহস্পর্শ যোগের ঘটনায় ভুশণ্ডীর মাঠ হয় ভূমিকম্পের যথোচিত ক্ষেত্র। ভূতের জগতে ঘটতে থাকে এক বিশ্বনির্ভর বাধাহীন

প্রবলতম মিশ্র জটিল প্রতিক্রিয়া। এখানেই মূল গল্পের শেষ / গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদে আছে লেখক তথা পরশুরামের নিজস্ব উপস্থিতির মধ্যে রূঢ় বাস্তব জীবন ও সমাজের সমস্যা জটিলতার সংশয় ও সংকটের ইঙ্গিত।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের সামগ্রিক প্লটে যে কাহিনী ও ঘটনা মিলেমিশে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, তার প্রধান দুটি ভাগ। গল্পের শীর্ষসংখ্যার উল্লেখহীন মোট চারটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদটিতে আছে শিবু ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী নৃত্যকালীর বাস্তবরসপুষ্ট সংসার চিত্র। পার্থিব সংসারে, ঐহিক জীবনধারণে এই চিত্র প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এই অংশের সংক্ষিপ্ত গতির মুখ শিবু ভট্টাচার্যের শান্ত সুখী জীবনের চিত্রে রূপ পেতে পারত, বাধ সেধেছে তার স্ত্রী নৃত্যকালীর অবুঝ দুর্দান্ত কলহপরায়ণা সন্দেহবাতিক, কানপাতলা স্বভাব। সেই সূত্রে দুজনের সংসার-স্বভাব এক সময়ে চূড়ান্ত অশান্তির সৃষ্টি করে। নৃত্যকালীর স্বামীর পিঠে ঝাঁটাপ্রয়োগে শিবু ভট্টাচার্য চরম ক্ষুব্ধ। ক্রুদ্ধ ও বেদনায় কলকাতা এসে কালীঘাটের কালীর কাছে পুজো দিয়ে মানত করে স্ত্রীর মৃত্যুকামনা করে। এই পর্যন্ত কাহিনী ও ঘটনা বাস্তবতায় স্বাভাবিক। পরের অংশে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ, রাত্রিজাগরণ শেষে পেনেটি গ্রামে ফিরে মাত্র আটঘণ্টায় মৃত্যুবরণ করে। এই অংশ গল্পের নায়ক শিবুর পক্ষে অ-স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক বাস্তবতা থেকে অস্বাভাবিক অবাস্তবতার শেষেই প্লটের কাহিনী ও ঘটনায় আসে অলৌকিক জগতের চিত্র, ভূত-প্রেতলোক নিয়ে এক 'ফ্যান্টাসি'র লঘুরসের পরিবেশ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শিবু হয় ভূশণ্ডীর মাঠের ভূত-প্রেতদের এক প্রধান সদস্য। একটি নেড়া বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে বসবাস করে। কাহিনীব অ-লৌকিক জটিলতায় একে একে আসে ভূশণ্ডীর মাঠের প্রান্তবর্তী পিটুলি বিলের ধারের শ্যাওড়া গাছের বাসিন্দা পেত্নী, আসে শাঁকচুন্নি, মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারের ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত বাড়ির বাসিন্দা এক ডাকিনী, অবাঙালি ছাপরা জেলার পুরুষ ভূত কারিয়া পিরেত, ইঁটের পাঁজার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এক ঐহিক জীবনে মহাজনের কারবারি যক্ষ নদেরচাঁদ মল্লিক। এদের সকলের ওপর এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহে লেখক আরোপ করেছেন পার্থিব মানুষজনের স্বভাব, ক্রিয়াকর্ম ও মানসিকতা।

কাহিনী ও ঘটনার জটে দুই জগতের মানুষজন প্লটে যে সংকট সৃষ্টি করে তা একই সঙ্গে শিবুর তিন স্ত্রী ও শিবুর স্ত্রী নৃত্যকালীর তিন স্বামীর একই সঙ্গে সাক্ষাতের সংকট চিত্রকে করে রুদ্ধশ্বাস। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে আসে গল্পের ক্লাইম্যাক্স। 'ফ্যান্টাসি' রচনায় পরশুরাম প্লটে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দুই ত্র্যহস্পর্শ যোগের বিষম অবস্থার দিক। এখানে গল্পের ক্লাইম্যাক্স শুরু হয়ে ধাপে ধাপে extreme রূপে আসে। শিবুর বিবাহ মুহূর্তে স্ত্রীকে দেখা, পরে শিবুকে স্বামী হিসেবে পেত্নী ও শাঁকচুন্নির দুজনেরই দাবিদার হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠায় কুৎসিত কলহ গল্পের 'চরমক্ষণ' রচনার সন্ধিলগ্ন নির্মাণ করে। গল্পের শেষেই ধরা পড়ে স্থায়ী চরমক্ষণের উপযোগী পরিস্থিতির নিগূঢ় দিক। শিবুর ডাকিনীকে বিবাহ সময়েই আসে যক্ষ ও কাবিয়া পিরেত :

"'ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—'একি গিন্নী। এখানে বেম্মা দত্যিটার সঙ্গে! ছিঃ ছিঃ—লজ্জার মাথা খেয়েছ? ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল 'আরে মুংরী, তোহর শরম নাহি বা?'''

এক জটিল দাম্পত্য সমস্যার ও সংকটের মধ্যেই গল্পের নিখুঁত ক্লাইম্যাক্স চিত্র। প্লটের জটিলতা 'ক্লাইম্যাক্সে'ই—যেখানে একই সঙ্গে তিনজন্মের স্ত্রী ও তিনজন্মের স্বামীর সাক্ষাতে এক বাঁধা সামাজিক উৎকট নীতি-দুর্নীতির সংকট সমাধানহীনতাই শিল্পের ব্যঞ্জনা আনে!

দুই

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের পরশুরাম একদিকে ভূত-তত্ত্বে দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়, অন্যদিকে নীতি ও শালীনতা জ্ঞান—এই দুই ভাবনাকে বস্তুতন্ত্রের সমাজনিরীক্ষায় রেখে কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে রূপ দিতে তৎপর হয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে নায়ক শিবু ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর ব্রহ্মদৈত্য হয়ে ভূশণ্ডীর মাঠের বেলগাছে বসবাস শুরু করার পর পবশুরাম তাঁর ভৌতিক ফ্যান্টাসির পক্ষে সাফাই জানাতে হিন্দু ভূতত্ত্বের প্রসঙ্গ কিছুটা বিস্তারিত করেছেন। পরশুরামের ব্যাখ্যায় ভূতদের বিষয়ে—

'.... হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল ত্বয়া হৃষীকেশ, নির্বাণ মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্র-তত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যকমত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ-বা, দশ-বিশ বৎসর পরে, কেহ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে। ....কিন্তু যাহাদের ভাগ্যক্রমে কাশীলাভ হয়,....তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।'

গল্পের মধ্যে পরশুরামের এমন হিন্দু ভূততত্ত্ব বিষয়ে বিশ্লেষণ তাঁর গল্পের পেত্নী, শাঁকচুন্নি, ডাকিনী ইত্যাদির অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বিশ্বাসের ভিত্তি দেয়।

এই ভূত বংশের চিত্র আঁকার পর লেখক ভূত-দাম্পত্যের জটিলতা ও নীতি-দুর্নীতির দিক, সমকালীন সমাজের বস্তুতন্ত্রভিত্তিক নীতি-দুর্নীতি এবং শালীনতা-অশালীনতাকে এক করে গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের দিক চিহ্নিত করেছেন। গল্পের শেষে প্রসঙ্গ এনেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রমুখের সমকালীন নীতি-শালীনতা বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুগুলি। এঁরা প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত এবং দু'দলে ভাগ হয়ে, একদল বস্তুতন্ত্রতায় গুরুত্ব দিয়ে তথাকথিত নীতিবোধের বিরোধিতা করেন, আর একদল হন রক্ষণশীলতার কট্টর রক্ষক। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর লেখার মাধ্যমে বাস্তবের রূঢ় প্রত্যক্ষ দিককে যথাযথ চিত্রণে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র এই মতের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেন। নরেশচন্দ্রের মতে

'যদি কোনো সত্যসন্ধ সাহিত্যিক সমাজের সত্য চিত্র আঁকিয়া সমস্ত সমাজের দৃষ্টি সেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেন তবে লোকে যতই বিচলিত হউক, শেষ পর্যন্ত তাহার ফল শুভ হইবেই।' এই বিশ্বাসেই তাঁর লেখায় আছে নর-নারী জীবনের সংঘাত, সংকট, প্রবৃত্তির বিচিত্র লীলা, ঈর্ষা, কামচারিতার কুণ্ঠাহীন প্রকাশ। নারীর অবদমিত আশা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপকে নরেশচন্দ্র বংশগতি, জন্মগত পাপ, ফ্রয়েড চিত্রিত মনঃসমীক্ষণরীতি দিয়ে নীতি ও শালীনতার মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন।

পরশুরাম 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে 'উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধানের ভার দিতে চেয়েছেন এই নীতি-বিগর্হিত বিষয়ের যাঁরা বিচারক তাঁদের হাতে। হিন্দুভূত শিবু ভট্টাচার্যের মতো চরিত্র এঁকে পেত্নী, শাঁকচুন্নি, ডাকিনীর মতো নারী ভূত-বধূদের গল্পে সবিস্তারে এনে ও দাম্পত্য সম্পর্কে বেঁধে দিয়ে এক অলৌকিক ফ্যান্টাসির, রঙ্গরসের সমস্যা তৈরি করেছেন। এক পুরুষের তিন স্ত্রীর আগমন, এক নারীর তিন স্বামীর উপস্থিতি একই সঙ্গে জটিলতা আনেই। এখানেই বহু স্ত্রী ও বহু স্বামীর রূপক রূপ রঙ্গরসে গল্পের শিল্পশরীরকে রসাল করেছে। 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পটির কেন্দ্রীয় বক্তব্যে এখানেই অভিনবত্ব। ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের চরম অবস্থায় পরশুরাম অঙ্কিত পরিবেশ ও চরিত্রধর্ম চিত্র এইরকম :

১. 'কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই, তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল।
২. 'ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—'একি গিন্নী। এখানে? বেহ্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?' ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।'

এই যে তিন জন্মের তিন স্ত্রীর সামনে শিবুর ইষ্টমন্ত্র জপের ছবি ও পাশেই ডাকিনীর ঘোমটা টেনে তিন স্বামীর কাছে কাঠ হয়ে বসে থাকা—এই দুই চিত্রেই শেষে নীতিশালীনতার পরীক্ষা নিয়ে বাদানুবাদে বিপর্যস্ত লোকদের শরণাপন্ন হয়েছেন পরশুরাম। 'ভুশণ্ডীর মাঠে" গল্পের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভ্রান্তি ও বিভ্রম—তা অভিনব এবং রূপকে ও রঙ্গের রসানুবৃত্তে কেন্দ্রীয় বক্তব্যের পক্ষে স্বাভাবিক।

তিন

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে ভূতদের স্বভাব-অঙ্কনে এবং তাদের রূপ ও স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্বয়ং গল্পকারের নতুন রীতির চরিত্র সৃষ্টি-ক্ষমতার বড় দিক উঠে আসে। ভূত-সংসারের মোট তিনটি নারী ও তিনটি পুরুষ এখানে সুনিপুণ তুলিতে আঁকা। তারা হল নারীদের মধ্যে পেত্নী, শাঁকচুন্নি ও ডাকিনী, পুরুষদের মধ্যে শিবু, কারিয়া পিরেত ও যক্ষ নদেরচাঁদ মল্লিক। এ গল্পে পরশুরামের ছোট-বড় সব মাপের চরিত্রে শিল্পের ও লঘু রঙ্গরসের অসাধারণত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এবং চরিত্রমতো পরিবেশের যথোচিত নৈপুণ্য দেখানোর প্রয়াস গল্পের বড় শিল্পের মর্যাদা সামনে আনে।

পরশুরাম তাঁর আঁকা চরিত্রের বাসনা অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের শেষবেলার এক অসামান্য পরিবেশ রচনা করেছেন গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নায়ক শিবুর ভূশণ্ডীর মাঠে দু-তিন মাস কেটে যাওয়ার পরের এক সময়ে। প্রসঙ্গত, যে পরিবেশ পাঠকদের সামনে চমক জাগায়, তা গল্পকারের একান্ত নিজস্ব Creative Imagination-এর অনবদ্য দৃষ্টান্ত। ভূত-রাজ্যের বসন্তকালের মেজাজ, স্বাদ ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন অভিজ্ঞতা আনে বাস্তব রস, কাল্পনিকতা ও রঙ্গরসের মিশেলে। শিবুর ভূত-শরীরে বাস্তব মানুষের স্বভাব আরোপ করে গল্পকার তার শূন্য মনে মাঠের প্রান্তবর্তী পিটুলি বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছের এক পেত্নীর কথা স্মৃতিতে ভাসান। আরও আছে এক শাঁকচুন্নির কথা। মোট ছয়টি চরিত্রের মধ্যে গল্পকার এই দুই রমণী-ভূতের কোনো অতীত প্রসঙ্গ শোনাননি। তবে আগের জন্মে তারা স্বভাবে কিরকম ছিল, তাদের চারিত্রিক ক্রিয়াকর্মে লেখক তা বুঝিয়েছেন। পেত্নীটির অন্যতম কর্ম গোলো হাতে মাছ ধরা। সে আগাগোড়া ঘেরাটোপে ঢাকা। সে বয়স্কা, সামনের দুটি দাঁত উধাও, গাল তোবড়ানো এবং তার পুরুষ দেখে লজ্জার প্রকাশ আছে। শাঁকচুন্নি আর এক নারী-ভূত যে এক গামছায় শরীর ঢাকে, আর এক গামছায় মাথা ঢেকে এলোচুলে বকের মতো লম্বা পা ফেলে হাতের হাঁড়ি থেকে গোবর-গোলা জল ছড়াতে ছড়াতে চলে যায়। শাঁকচুন্নির বয়স কম, কিন্তু কোনো পুরুষের রসিকতা তাকে ক্রুদ্ধ করে।

পেত্নী ও শাঁকচুন্নি বাস্তব ঐহিক জীবনে যে পেশা ও স্বভাবে সংসার করত, মৃত্যুর পরে তাকে ছাড়তে পারেনি। শাঁকচুন্নি ছোঁয়া-ছুঁই-এব বাতিকগ্রস্ত, খিটখিটে, রক্ষণশীলা। গল্পে এই দুই চরিত্র তাদের অতীত কোনো প্রসঙ্গ শোনায়নি প্রথমে। এই না-শোনানোর দিক গল্পকারের অন্তিম ব্যঞ্জনার আগে কোনো আভাস-ইঙ্গিত না দেওয়ারই প্রয়াস। আসলে এরা দুজনেই শিবুর পূর্ব-পূর্ব জীবনের স্ত্রী ছিল, এখন যে-যার মৃত্যু-অন্তে ভূত-সমাজের সদস্যা। প্রথম দিকে এদের সঠিক পরিচয় যদি গল্পকার দিতেন, তা হলে গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনার অভিনবত্ব, গুরুত্ব, সর্বোপরি চমক নষ্ট হত।

মূল নায়ক চরিত্র শিবু ভট্টাচার্য 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পের দুই ভিন্ন জগতের কাহিনীভাগে একমাত্র যোজক ব্যক্তিত্ব। তার সূত্রেই এসেছে শেষ স্ত্রী নৃত্যকালী—কাহিনীর বাস্তব ও অ-লৌকিক দুই অংশেই। প্রথম অংশে স্বাভাবিক স্ত্রী, দ্বিতীয় অংশে ভূত-সমাজের ডাকিনী। শিবু যখন পার্থিব জগতের গৃহী মানুষ, তখন তার বিবর্তনে মেলে সাধারণ থেকে অ-সাধারণ মনের প্রকাশ-স্বভাব। নৃত্যকালীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-বন্ধে যে শিবুর রাগ করে কলকাতায় আসা, কালীঘাটে পুজো দেওয়া, স্ত্রীর মৃত্যুকামনা— সবই একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সে যখন মন্দির থেকে ফিরে একঠোঙা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই ও আধ সের অমৃতি খায়, আবার সারাদিন ঘুরে শহরের দ্রষ্টব্যস্থানে বেড়িয়ে হোটেলে অত্যধিক পরিমাণে কারি, রোস্ট ফাউল, ডেভিল ইত্যাদি খেয়ে, সমস্ত রাত থিয়েটার দেখে ভোরে পেনেটি ফেরে, তার এই যথেষ্ট যথেচ্ছ মাত্রাতিরিক্ত সর্বসূত্রের আচরণ তাকে অ-সাধারণ করে তোলে। এক মরণ-পণ খাওয়ায় সে নিয়তি -নির্দিষ্ট! গল্পকার তার শেষ মৃত্যু ঘটিয়ে গল্পের কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে ভূতদের অ-লৌকিক জগতে নতুন রূপে নির্দিষ্ট সব জায়গায় বসায়।

শিবু চরিত্রের একদিকে আছে বস্তুতন্ত্রতা, আর একদিকে ফ্যান্টাসি। শিবুর মধ্যে একই সঙ্গে বাস্তবধর্মের রূপক প্রয়োগ, পাশাপাশি তুমুল উদ্ভট ভৌতিক দাম্পত্য বাসনার অস্থিরতা একত্রিত হওয়ায় চরিত্রটি এক রসাল অভিনবত্ব পায়। সে শেষমেশ ডাকিনীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। পেত্নী তাকে দেখে লজ্জা পেয়ে এড়িয়ে যায়, শাঁকচুন্নি তাকে ক্রোধে দূরে সরিয়ে রাখে, আর ডাকিনী 'শিবুকে দেখিয়ে নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়।' এই ডাকিনী হয় বাস্তব জীবনের সেই স্ত্রী নৃত্যকালীর ভৌতিক রূপ। বিবাহ অনুষ্ঠানে ডাকিনীকে সেভাবে চিনে ফেলার পর আসে একে একে পেত্নী ও শাঁকচুন্নি—শিবুরই আগের আগের দুই স্ত্রী—বাকি দুই জন্মের।

পেত্নী ও শাঁকচুন্নির তীব্র কুৎসিত বিরোধ, বিতর্ক ও বিবাদের মধ্যে শিবু-ভূতের অবস্থা তটস্থ।

> 'একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই, তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল।'

ঐহিক জীবনের কর্মঠ পুরোহিত শিবুর ভূত-জীবনের ট্র্যাজেডি এখানেই সবচেয়ে করুণ, অসহায় এবং স্বাভাবিক। পরশুরামের হাতে শিবু কিন্তু কিছু কিছু নায়কের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। সে প্রেমিক, প্রেমে রসিক, একই সঙ্গে একক ভূতজীবনে শূন্যতার, একাকীত্বের অভিশাপে আক্রান্ত। এই নবজীবনে তার গভীর উপলব্ধি থেকেই অচেনা ডাকিনীর কথা মনে রেখে গান গায়: 'আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী/ কারে রেখে কারে ফেলি।' এই গানের সূত্রেই কারিয়া পিরেতের সঙ্গে হয় তার পরিচয়। শিবু ব্রাহ্মণ বলেই ব্রহ্মদৈত্য এবং একই সঙ্গে পিরেত ও নদেরচাঁদ মল্লিকের কাছ থেকে শ্রদ্ধাভক্তি পায়। পরে দেখা দেয় নদেরচাঁদ মল্লিক। শিবু গল্পকারের নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি। সে লেখাপড়া জানে এবং লেখকের কল্পনায় সে 'মেঘদূত'-পড়া এক ব্রাহ্মণ, এবং সংস্কৃত কবি কালিদাসের প্রসঙ্গ তোলে নিজেই যক্ষ নদের চাঁদ মল্লিকের কাছে। এমন নিপুণ পরিবেশে কালিদাসের স্মরণ আসা বস্তুত পরশুরামেরই হাস্যরস সৃষ্টির চমৎকার সুযোগ এনে দেয়। শিবুর মতো চরিত্র সৃষ্টি করে গল্পকার রঙ্গরসিকতা ও উদ্ভট কল্পনার মধ্যে বস্তুতন্ত্রতার রূপক ব্যবহার করে অসামান্য মৌলিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। শিবু এক কৌতুকরসপ্রাণ গল্পকারের মৌলিক অভিজ্ঞান।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে ভূত-লোকে নৃত্যকালীর আবির্ভাব ঘটেছে শিবুর তীব্র বাসনা মতোই। গল্পের আর এক লক্ষণীয় সৃষ্টি নৃত্যকালীর ডাকিনী হয়ে দেখা দেওয়ার পরিকল্পনায়। দু-তিন মাস অতিবাহনের পর শিবুর অশরীরী অবস্থায় শরীরী বাস্তব যাবতীয় জীবনের লক্ষণ মেলে। গল্পকারের সচিত্র ভাষায় :

> প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হউক, নৃত্যের একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হ'ক না-হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তার পর মনে হইল—

> লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এই খানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।'

নৃত্যকালীকে কামনার মূলে আছে হিন্দু মতের ভূতের স্বাধীন চিত্ততার বোধ। লেখকের হিন্দুভূত-তত্ত্বের ব্যাখ্যামত : 'যত্রতত্র ভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যক মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে।' শিবুর নিজস্ব ভাবনার সময় জানা ছিল না নৃত্যকালীর ঐহিক জীবনের মৃত্যুর ঘটনা। শিবুর মধ্যে অব্যবহিত পূর্ব জীবনের প্রভাব গল্পকারের মতে—'যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা।'

এই তর্ক-সূত্র (logic) ধরেই গল্পকার নৃত্যকালীকে ডাকিনীর স্বভাবে গল্পে সুনিপুণ লেখনীতে আঁকেন। ডাকিনী নৃত্যকালী গল্পের বড় মাপের শিল্পমানের চমক। এক 'পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে।' শিবুর ডাকিনীর প্রতি নিবিড়তম প্রার্থনার চোখে নৃত্যকালী তথা নবাগতা ডাকিনী-চিত্রটি হল :

> 'ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরণে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রঙ! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রঙ যেন পানতুয়ার শাঁস!'

বস্তুত শিবুর চোখ দিয়েই গল্পে রচিত হয়েছে ডাকিনী তথা নৃত্যের আবির্ভাবের ভূমিকা, আবার শিবুর চাহিদামতোই শিল্পসিদ্ধি সহজ হয়েছে নৃত্যর তার পূর্বস্বামীর কাছে আসার তোড়জোড়।

শিবু বিবাহ করতে চায় ডাকিনীকে। কিন্তু সহজে সে রাজি হয়নি শিবুর প্রস্তাবে। 'অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনও কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে।' এই আচরণে নৃত্যর মধ্যে সেই অতীত ঐহিক জীবনের নারীস্বভাব চমৎকার চিত্রিত। পরলোকেও ভূত তথা ডাকিনী হয়েও শিবুর প্রতি স্বামীর অধিকার এতটুকুও ছাড়তে রাজি নয়। ভৌতিক সমাজের অন্য নারীদের প্রতি আকর্ষণে সেই সমান ঈর্ষা। সেই সঙ্গে সে যে স্বামীর জন্যই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে সেই স্বামী কাছেই এসেছে, এই নিজের স্বভাবের ভালোবাসার ভাবমূর্তিটি অক্ষুণ্ণ রাখতেও ইতস্তত করেনি। ভূত-স্বভাবের জীবনে ডাকিনী নৃত্যকালী আগের জীবনের যাবতীয় অধিকার সমানভাবে বজায় রেখেছে স্বামীর সামনে। কিন্তু বিবাহের আগে শিবুকে নিয়ে তার পূর্বজন্মের স্ত্রী পেত্নী ও শাঁকচুন্নিদের কুৎসিত ঝগড়ার প্রেক্ষিতে ডাকিনীর স্বভাব আগের জীবনের স্মৃতিকেই ধরে রাখে : 'নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগল।' যক্ষ যখন নৃত্যর আগের স্বামীর অধিকারে বলে : 'একি, গিন্নী। এখানে? বেহ্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?'—তখন ডাকিনী কোনো প্রত্যুত্তরের মধ্যে না গিয়ে 'ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।' আবার কারিয়া পিরেতের কাছে সে ছিল 'মুংরী'।

ডাকিনী নৃত্যকালীর শিল্প-উপযোগিতা হল—গল্পের মূল 'থিম'কে একটি জটিল কেন্দ্রে স্থিত করা। শিবুর আগের দুই স্ত্রী, নৃত্যর আগের দুই স্বামী—এই অতীত সম্পর্কের 'পাজল্'-এর মধ্যে পড়ে যে অন্তঃশীল রূপকসম্ভব সমাজসমস্যা ও সুগভীর উচ্ছ্বসিত রঙ্গরসের প্রবাহ তৈরি হয়েছে, তাতে শিবুর সঙ্গে নৃত্যের ভূত-সমাজে মিলনেই পূর্ণস্বাদী হয়। গল্পকারের পরিকল্পনায় চরিত্রগুলি নিখুঁত এক ছোটগল্পের বড় শিল্পমানের প্রতিষ্ঠা দেয়।

রাজশেখর বস্ অর্থাৎ পরশুরাম ভূত-তত্ত্বের ইতিহাস, আচার-আচরণ, লোককথা এবং গালগল্প ধরে চরিত্রগুলির নাম গ্রহণ করেছেন গল্পে। পেত্নী হল প্রেতসমাজের নিচু স্ত্রী জাতির অন্তর্ভুক্ত। এদের শ্মশানে লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অলক্ষে বসবাস। প্রেতলোকের আর এক শ্রেণীর নারী হল 'শাঁকচুন্নি'। এরা হল শাঁখা-চুড়ি-পরা প্রেতিনী, অর্থাৎ সধবার প্রেতমূর্তি। দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে উল্লেখ আছে—'শাঁখচুর্ণীর সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্য (করে বাসা)।' 'ডাকিনী' শব্দটি পিশাচ সমাজের অন্তর্গত। মূল অর্থ উপদ্রবকারিণী নারী, ডাইনি। এই ডাকিনীর উল্লেখ মেলে মনসামঙ্গলে, বঙ্কিমের রচনাতেও। প্রেতলোকের আর এক নারী, গল্পে নৃত্যকে বলা হয়েছে ডাকিনী। লোককথা সূত্রে পরশুরাম এমন নামগুলি ব্যবহার করে ভূশণ্ডীর মাঠে ভূত-জীবনের প্রেক্ষিত সমানভাবে রূপক ও রঙ্গরসে জারিত করেছেন। বাস্তব ও ফ্যান্টাসির সুনিবিড় মিশ্রণে গল্পটি অসামান্য বিশ্বাস্যতা দান করে রসিক পাঠকের মনে।

চার

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে গল্পকারের সর্বাবয়ব কাহিনী ও চরিত্রভাবনা, প্রেক্ষিত ও মূল-ভাব প্রতিচিত্রণ নিপুণ গঠন-পরিকল্পকে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসে দীপিত করেছে। এনেছে আর এক বাড়তি মাত্রা—বাস্তব স্বভাবে স্বাদের অভিনব স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাদ নির্মাণের একমাত্র কৃতিত্ব পরশুরামেরই, কৌতুক ও শ্লেষব্যঙ্গে তা কষায়। গোটা 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পটি গঠনে যেনবা একটি Puzzle Box। এর কেন্দ্রীয় ভাব ও সমগ্র গল্পের বিস্তার স্বভাবে মেলে পাঠকদের পক্ষে হতবুদ্ধিতা, বিস্ময়-বিমূঢ়তা, অবশ্যই হতভম্ব হবার মতো অবস্থার অভিজ্ঞতা। সমগ্র গল্পে শিবু ক্রমশ যেভাবে ঐহিক বস্তুতান্ত্রিক জীবন থেকে সরে এসে ভূতসমাজের অলৌকিক পরিবেশে এসে প্রহেলিকাময় জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটায়, পূর্ববর্তী স্ত্রী নৃত্যর ভূত-তত্ত্বের ডাকিনী এবং পেত্নী ও শাঁকচুন্নিদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়, তাতে বাস্তব-আবৃত রূপকের আড়ালে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন ও অবস্থার সামনে এসে দাঁড়ায় গল্পের পাঠকরা। গল্পের জটিল সমস্যাদীর্ণ ভাবের কেন্দ্রে এসে গল্পটি অবশ্যই গতিপ্রাণ হয় ঠিক, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। এ এমন একটা অবস্থা—যেখানে গল্পকারও স্বয়ং কৌতুকরসের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে শেষে বলে ওঠেন :

> 'রাম রাম রাম। জয় হাড়ি ঝি চণ্ডী, আজ্ঞা কর মা। কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধা করিবে? আমার কম্ম নয়।'

এর পর গল্পকার বাস্তব জীবনসত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যতীন সেন প্রমুখ সমকালীন সমাজ-নীতিতত্ত্ববিদদের সহায়তার কথা ভেবেছেন, প্রত্যক্ষ প্রস্তাবও রেখেছেন।

আসলে গল্পটি আগাগোড়া চাপা কৌতুক, হাস্যরস, একাধিক ক্ষেত্রে শ্লেষ, কোথাও বা ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে এক অতি রসাল বৈঠকী অন্তরঙ্গতায় রঙ্গব্যঙ্গের স্রোত বহিয়ে দিয়েছে। গল্পের প্রধান গতিমুখ তাই রঙ্গের রসে উত্তাল। শিবুর তিনজন্মের স্ত্রী ও নৃত্যর তিনজন্মের স্বামীদের এক জায়গায় সহাবস্থানের পরিস্থিতি রচনা করে গল্পকার চমৎকার উদ্ভুত পরিস্থিতিকে যথাযথ শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করেছেন। গল্পটির শুরুতে কোনো চমক নেই, descriptive। ক্রমশ শিবুর স্ত্রী নৃত্যর সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্লেষণে তা হয়েছে অস্বাভাবিক, শেষে মৃত্যু ও অলৌকিকতার পরিবেশ তৈরি হওয়া! বাস্তব থেকে রূপক নির্মোকে আবৃত হয়ে যখন ভূততত্ত্বে সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি ধরে, সেখানেই বর্ণনামূলকতা পরিহার করে গল্পটি হয়েছে মূল কেন্দ্রীয় ভাবের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভূত হয়ে আসার পর সকলেই রহস্যময় অন্য রাজ্যের আস্বাদ দিলেও তাদের মধ্যে বাস্তব মানুষের ব্যবহার ও অসঙ্গত ভূতদের স্বভাবের মিশেল গল্পকারের রসিক চিত্তের দিককে অভিনবত্ব দেয়।

গল্পের শেষের ব্যঞ্জনা রঙ্গরসে, গল্পকারের ভূতদের জীবনগঠনের প্রতিক্রিয়ায় যে জগতেব মধ্যে আমাদের নিয়ে যায়, তা গল্পকারের মৌলিকতার বিস্ময় জাগায়;

> 'ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল।'

এই বর্ণনায় এসেছে বিলাতী ভূতদের বাঁশি বাজিয়ে নাচের কল, এসেছে কাবুলী ভূতদের দাপাদাপি, 'মাকুন্দে চীনে-ভূতদের ডিগবাজি' খাওয়া—ইত্যাদির প্রসঙ্গে রঙ্গ ও হাস্যরসের বিপুল স্রোতের আয়োজন। পরশুরাম এখানেই ত্রৈলোক্যনাথের রঙ্গরসের যথার্থ উত্তরসূরি হয়ে উঠেছেন। গল্পের শেষ এখানে। কিন্তু পরশুরাম তাঁর গল্প লেখার উদ্দেশ্যকে সামনে এনেছেন সমসাময়িক সমাজ-নীতিবেত্তাদের দায়িত্বের কথা। প্রমাণ হয়, সরস গল্পে রসই সত্য; কিন্তু বাস্তব সমস্যাও সেই সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। পরশুরামের ভুশণ্ডীর মাঠে গল্পে সমাজের সত্যরস গভীর স্বভাবে যেমন তালরসের মতো মজেছে, তেমনি রসের সত্য সমাজের বাস্তবতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কষায কিছুটা তিক্ততার আস্বাদদানে অকৃপণ।

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্প সাধুগদ্যের রীতিতে লেখা, চরিত্রগুলির সংলাপ চলিত রীতি-অনুগ, কোথাও কোথাও কথ্য-কক্‌নি চমৎকার মানানসই হয়ে ভিন্ন আবহাওয়া তৈরি করে :

> 'পেত্নী। আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?
> শাঁকচুন্নি। আ মর বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সী।
> পেত্নী। আহা, কি আমার কণে বউ গা।

শাঁকচুন্নী। দুর মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দু-জন্ম আগের বউ।

পেত্নী। দুর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ।

শাঁকচুন্নী। মর চেঁচিয়ে, এদিকে ডাইনী মাগী মিনসেকে নিয়ে উধাও হ'ক।'

এসব সংলাপ-বিনিময়ে 'লা', 'গা, 'মাগী' 'মিন্‌সে'—এমন সব শব্দ কথ্য-কক্‌নির কঠিন রুক্ষ বাস্তব রসের নিশ্চিত আবহ রচনা করে। তেমনি যক্ষের বর্ণনায় যখন এমন বাক্য দেখি : 'সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হল।' 'আড্ডা গেড়েছি', 'ঢনঢন করছে' এমন সব প্রয়োগ, সবই তারই ভাব-ভাবনার অনুগত।

এক ফাল্গুন মাসের শেষবেলায় শিবু-ভূত হলেও বাস্তব মানুষের স্বভাবেই মনের মধ্যে নিঃসঙ্গতা বোধ করে। চাপা আনন্দের সঙ্গে এমন নিঃসঙ্গতার মিশেল আছে। শিবু ভূত সমাজে নারীসঙ্গ চায়। পরশুরাম বাস্তব পৃথিবীর প্রাকৃতিক কিছু কিছু চিত্রের সঙ্গে শিবুর স্বভাব মিশিয়ে যে রঙ্গরসাস্বাদী ছবি গদ্যের ভাষায় চিত্রিত করেছেন. তাতে 'ঠিক দুপুরবেলা/ ভূতে মাবে ঢেলা'—এমন লোককথার সূত্রে ভূতের ছড়া-আশ্রয়ী এক নিঃসঙ্গতার স্বভাব-মিল লেখকেরই কৃতিত্বকে তুলে ধরে :

> 'গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ ঝোপে গোটা কতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়সার কঙ্কালের মতো ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কালো গুবরে পোকা ভর্‌র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।.......'

এই চিত্রে আছে দাঁড়কাক ও কাকিনীর আদরের মধ্যে গদগদ কণ্ঠের ধ্বনি, কটকটে ব্যাঙের শিবুকে টিটকারি দেওয়া ও সমস্বরে রি রি করে ওঠা।

এই ছবি বাস্তবে দুপুরবেলায় ভূতের ঢেলা মারার নিঃসঙ্গতাকেই বোঝায়। কিন্তু এর সঙ্গে পরশুরাম শিবুর মনের অবস্থা বর্ণনা করেন; 'শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মাথা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।' আসলে বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে ভূতের কৌতুক রস-প্রকৃতি যোগ করে গল্পকার এক অভিনব নিজস্ব কল্পনাজাত আস্বাদ দিয়েছেন পাঠকদের। 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে প্রকৃতি বর্ণনা মৌলিকতাব অভূতপূর্ব অভিজ্ঞান। আবার গল্পের শেষেও পরশুরাম প্রকৃতির প্রচণ্ড উথাল-পাথাল অবস্থার চিত্রে বাস্তবতা ও রঙ্গরসের যোগে নতুন আর এক ভৌতিক ভাব সৃষ্টি করেছেন। এসবই বাস্তব বর্ণনা। কিন্তু বাস্তব পৃথিবী-অতীত অলৌকিক ঘটনা। কারিয়া পিরেত যখন উচ্চৈস্বরে উৎপাটন মন্ত্র পড়ে, তখন 'মড় মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।' ভূত-পৃথিবীতে আকাশ তো সবই, তার মধ্যে বাড়ি ও আকাশের কল্পনা যেমন মজাব, তেমনি অবিশ্বাস্য নয়। এখানেই রঙ্গবসেব সার্থকতা।

পরশুরামের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ অবশ্যই 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের অসামান্য কৌতুক রঙ্গ-ব্যঙ্গরসের আধারে যেনবা রীতিরই নবভাষ্য। গল্পের প্রথমে পরশুরাম লিখছেন, 'শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, ...' ইত্যাদি। এখানে 'একটি স্ত্রী'র উল্লেখ এবং স্ত্রীর পাশেই 'তিনটি গরু'র প্রসঙ্গ অবশ্যই সূক্ষ্ম শ্লেষ-কৌতুকের স্বাদ দেয়। 'মাগীকে ওলাউঠায় টেনে নাও মা'—এর মধ্যেও আছে কৌতুকাভাসের শ্লেষ! একটি স্ত্রী এবং তিনটি গরু স্বামী হিসেবে শিবুর সংসারে একসঙ্গে সমান তাৎপর্যে ও দায়িত্বে হাস্যরসিক পরশুরামের বর্ণনায় ধরা দেওয়ায় সূক্ষ্মরসের স্বাদ দেয় গল্পে পেত্নী ও শাঁকচুন্নির আচরণ, ক্রিয়াকর্ম, পোশাক, লজ্জা, রাগ অবশ্যই নির্মল কৌতুকের উপকরণ হয়। শিবুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে গান, 'আহা শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী/ কারে রেখে কারে ফেলি', তার পাশেই পরশুরাম বিহারী ভূত কারিয়া পিরেতের দেহাতী গান ও কথার সুরে শোনায় : 'চা রা রা রা রা রা/ আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ডগ্‌লুকে বিটিয়া/ কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—' ভৌতিক জগতের থেকে এক নতুন স্বাদের কৌতুকরসেব প্লাবন ঘটায়।

পরশুরামের ভাষারীতিতে গদ্যরূপে মেলে রঙ্গরস সৃষ্টির চমৎকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ডাকিনীকে বিবাহ করতে বসে শিবু যখন ঘোমটা দেওয়া নতুন বধূকে দেখে চমকে উঠে আগের জন্মের নৃত্যর সামনে, তখন নৃত্যর সংলাপ :

> 'হ্যারে মিন্‌সে। মনে করেছিলে মরে আমার কবল থেকে বাঁচবে। পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?'

তখন 'স্বভাব যায় না ম'লে' এই প্রবাদপ্রতিম শ্লেষবাক্যের এমন প্রয়োগ পাঠকদের রীতিমতো কৌতুক-রসাপ্লুত করে।

শিবু জিজ্ঞেস করে : 'এলে কি করে? ওলাউঠোয় নাকি?' নৃত্যর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর : 'ওলাউঠা শত্তুরের হ'ক। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?' শিবুর পরবর্তী সংলাপ : 'তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে।.....' এমন কেরোসিনে পুড়ে আসা স্ত্রীকে প্রথম দেখার বর্ণনায় মেলে পরশুরামের স্বভাবসুলভ বর্ণনার উতরোল কৌতুকরস : 'নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।' এমন রসাল বাক্যরীতি, গদ্য ও উপমা প্রয়োগ পরশুরামেব একান্ত নিজস্ব। এভাবে কৌতুকরস ঘনতর হয়েছে 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পে।

গল্পের যক্ষ নদের চাঁদ মল্লিকের অবির্ভাব ও রূপবর্ণনায় মেলে নির্ভেজাল কৌতুক। 'তার হামাগুলি দিয়ে দেখা দেওয়া', 'স্থূল খর্বদেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথার টাক......' ইত্যাদি বর্ণনার ভাষা-কল্পনাও রসের ঘনত্ব আনে। উপমা প্রয়োগ লক্ষ করার মতো। নদেরচাঁদ মল্লিকের 'কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে' কথায় বিরিঞ্চিবাবা ও শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের নায়কের ছায়া-স্বভাব আনে। তার 'হ্যা হ্যা' হাসি, সংগীতপ্রীতি, পাটোয়ারি বুদ্ধি—সবই নিপুণ হাস্যরসের উৎসের ব্যঞ্জনা আনে। যক্ষ গাওনা-বাজনার শুরুতে পাখোয়াজ না থাকায় যখন বলে :

'পাখোয়াজ নেই—তেমন জুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহু—ঢনঢন করছে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দে তো। ঠিক হয়েছে। চৌতাল বোঝ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন—ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে। / ধ'রে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়/ ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।....'

তখন তাল শেখানোর কথাগুলি হাসির হুল্লোড় আনে। নিজের পেট চাপড়ে ঠেকা দেওয়া, এঁটেল-মাটি মটকে পেটের মাঝখানে থাবড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গল্পকারের হাস্যরস সৃষ্টির অভিনবত্ব বোঝায়। কারিয়া পিরেতের উৎপাটন মন্ত্রের উচ্চারণ ও শব্দসৃষ্টির সমগ্র অংশটিই রঙ্গরসের তুফান তোলে।

বস্তুত, প্রেক্ষিত, বর্ণনা, চরিত্র, চলতি গদ্যের বাক্যগঠন, বিশেষ সিচুয়েশন ধরে হাসির ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্যে অতিরিক্ততা নেই, আছে ঘন রঙ্গরসের উপযোগী করে পরিমিতি বোধের বিস্ময়কর শিল্পরূপ। 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের হাস্যরস যেনবা সমগ্র গল্পের পক্ষে রঙ্গবসেব স্বর্ণখনি।

পাঁচ

'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের নাম বিশেষ স্থাননির্ভর পরিবেশ রচনার কুশলতায় নামের পক্ষে উদাহরণের সার্থক শব্দ-যুগ্ম—গল্পের ভূত-রাজ্যের বিশেষ ক্রিয়াকর্মের অলৌকিকতার অনুপন্থী, অর্থবহ।

প্রথমত, 'ভুশণ্ডী' নামে এমন দুটি অন্তর্গূঢ় অর্থ ব্যঞ্জনা পায় যা গল্পের নাম ব্যাখ্যায় অনেকটা সহায়ক। সাধারণভাবে 'ভুশণ্ডী' শব্দের প্রসঙ্গে আসে 'কাক' নামের বায়স। কাকভুশণ্ড বা কাকভুশণ্ডী অন্যভাবে হয় 'ভুশণ্ডী কাক'ও। তার ভিতরের অর্থে আসে পুবাণ প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী অমর কাক। ইনি পুরাণে একজন রামভক্ত ব্রাহ্মণ, লোমশ মুনির শাপে হন কাক। কথিত আছে এঁর প্রণীত 'ভুশুণ্ডী রামায়ণ'-এর প্রসঙ্গ মেলে তুলসীদাসের 'রামচবিত-মানসে'র উত্তরকাণ্ডে। আর একটি তাৎপর্য শুধু ভুশণ্ডী নামে মেলে। তা হল 'কাক'-এর সঙ্গে তুলনা বোঝাতে। কাকের রঙ কালো, ভুশণ্ডীর রঙ কালো, গভীর অন্ধকার। এই দ্বিতীয় তাৎপর্যগত অর্থ ধরেই পরশুরাম 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের নামে ব্যঞ্জনা এনেছেন। তা হল এমন একটি মাঠ—যা অন্ধকারে আবৃত। আর এই অন্ধকাব-সুবিস্তৃত মাঠেই ভূত-প্রেতদের বাসস্থান—তা লোককথা, গালগল্প ও ভূত-ছড়ায় অর্থদ্যুতি পায়। মৃত্যুর পর শিবু যে ভুশণ্ডীর মাঠে আশ্রয় নেয়, তা অলৌকিক অন্ধকার-ঢাকা। এই মাঠেব কাল্পনিক অবস্থান, পরিবেশ, প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য পরশুরামের বর্ণনায় এইরকম :

'(শিবুর প্রেতাত্মার) গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটি আড়-পাড় কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু-তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য, এককালে

> এখানে ইটখোলা ছিল সে জন্য সমতল নয়। কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আস্‌শ্যাওড়া, ঘেঁটু; বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ, শিবুর বড়ই পছন্দ হইল।'

এই পছন্দের আগে গল্পকার মাঠের এমন এক চিত্র এঁকেছেন, যা পাঠকদের কাছে ভূত-রাজ্যটির বিশ্বাস্য ভূমিকা সহজগ্রাহ্য হবে। এটা গল্পের রসনিষ্পত্তির এক প্রধান আশ্রয়। এর পর গল্পকারের বর্ণনা :

> 'একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তাল গাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর এক দিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।'

এবং এই নতুন বাসিন্দা ভূত-শিবুকে নিয়েই এমন ভূশণ্ডীর মাঠে চলে অভাবনীয় ভূত-প্রেতগোষ্ঠীর লীলা। লক্ষণীয়, এই মাঠের বাস্তব একটা রূপ আছে—যা বিশ্বাস্য, ঐহিক মানুষের দৃষ্টির অনুগত। কিন্তু পিছনে আছে অলৌকিক লীলা—যা সম্পূর্ণ গল্পকারের সৃষ্টি। কৌতুক, রঙ্গ, ব্যঙ্গ ইত্যাদিতে এই ভূশণ্ডীর মাঠের যথার্থ বিচরণের স্থান আঁকা হয়েছে বলেই পটভূমির অলৌকিক তাৎপর্যে নাম সার্থক। পরশুরাম 'ভূশুণ্ডী' শব্দটিতে কথ্য ব্যবহারে করেছেন 'ভূশণ্ডী'।

দ্বিতীয়ত, 'ভূশণ্ডীর মাঠে' শুধু গল্পের প্রেক্ষিতের সীমা নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ নয়, গল্পেব সব চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ, ঘটনা-দুর্ঘটনা, আচার-আচরণ সব মিলিয়ে পরিবেশের সঙ্গে রক্তের আত্মীয়তা পাতিয়েছে—যা অলৌকিক জগৎকে শিল্প-সমৃদ্ধ করেছে। ফাল্গুন মাসেব শেষবেলায় শিবুর নতুন প্রেমবাসনার জাগরণ, শেওড়া গাছে পেত্নীর তৎপরতা, গামছা-পরা শাঁকচুন্নির বিড়ালের মন ফ্যাঁচ করে উঠে রাগের প্রকাশ, তালগাছের মাথা থেকে বিহারী কারিয়া পিরিতের আবির্ভাব, ইটের পাঁজার মধ্য থেকে হামাগুড়ি দিয়ে যক্ষ নদেরচাঁদ মল্লিকের আবির্ভাব, ভূত শিবু ও ডাকিনী নৃত্যর বিবাহ-বাসর—এসবই একেবারে মাঠের সর্বাঙ্গীন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবয়বে চিত্রের বিস্ময় পেয়েছে, গল্পের পটভূমি বিষয় ও চরিত্রের অভ্যন্তরে সংমিশ্রিত হয়ে প্রেক্ষিতের গৌরব বাড়িয়েছে। গল্পের মধ্যে ভূশণ্ডীর মাঠটি এক অর্থে অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গ অলংকার হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি, ঘটনা, চরিত্র, একে অন্যে এমনভাবে ওতপ্রোত—যা এমন মাঠ না থাকলে দেখানো সম্ভব হত না। তাই 'ভূশণ্ডীর মাঠে' নাম সর্বাংশে শিল্পসার্থক অবশ্যই।

১১.

গামানুষ জাতির কথা

এক

পরশুরামের 'গড্ডলিকা'র পরবর্তী গ্রন্থ 'গল্পকল্পে'র প্রকাশ ঘটে ১৩৫২ থেকে ১৩৫৭-র মধ্যবর্তী সময়ে রচিত মোট দশটি গল্প নিয়ে। 'গড্ডলিকা'র শেষ গল্প 'ভূশণ্ডীর মাঠে'। আমাদের আলোচ্য গল্পটি আগের গল্পের পরবর্তী রচনা, 'গল্পকল্পে'র

প্রথম গল্প। রচনাকাল বাংলা ১৩৫২-য়, ইংরেজি ১৯৪৫-এ। 'গল্পকল্পে'র রচনাগুলি সমষ্টিগতভাবে ১৯৪৫-১৯৫০—এমন পাঁচটি বছরের মধ্যেকার সৃষ্টি। ১৯৪৫ সাল একেবারে প্রত্যক্ষ সাল-তারিখ ধরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করে যুদ্ধরত বিবাদী গোষ্ঠীগুলি ২রা সেপ্টেম্বর, যার শুরু সেই সেপ্টেবরের ২ তারিখেই, ১৯৩৯-এ। ১৯৪২ সালে পরশুরাম ১৯৩২-এর শিল্পীমনের নিঃসঙ্গতা, নিশ্চুপ স্বভাব কাটিয়ে আবার কৌতুকরস, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের কালিভর্তি লেখনীমুখে নতুন সৃষ্টিতে মাতেন।

দীর্ঘ দশ বছরের নীরবতার পর গল্পকারের এই আবির্ভাব, নবভাবের পুনরুত্থানের মতই সমাজ-অবক্ষয়, রাজনীতি, ব্যক্তির আদর্শহীনতা, সমাজভ্রষ্টতা, ব্যভিচার ইত্যাদির কথায় নিবিষ্ট হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে ভাঙনের সমুদ্রসমান স্রোতের তোড় আনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের সর্বাবয়বে, তাতেই পরশুরামের শৈল্পিক নিরাসক্তি আরও কঠিন থেকে কুঠারের প্রহারের ধারালো দিককে প্রস্তুত করতে থাকে। এ বিষয়ে আমরা এই গ্রন্থের শুরুতে পরশুরাম সংক্রান্ত আলোচনায় কিছু আভাস দিয়েছি। এখানে সেই সূত্রেই আমাদের কথা, প্রথম 'গামানুষ জাতির কথা' গল্পে বস্তুতান্ত্রিক নির্মমতায় তান্ত্রিকের স্থান নিয়েছেন লেখক। এ গল্পে যে মনন ও রঙ্গ, যে ঘৃণা ও জ্বালায় পরশুরাম হয়েছেন ক্ষমাহীন, উদ্ধত, সোচ্চার প্রতিবাদী, তার উৎসাহ ও উদ্যোগ উৎস ধরেছে সম-সময় ও সম-সমাজের অভ্যন্তরেই। বিকৃত সময় ও মানুষকে, রাজনীতি, রাষ্ট্রনেতা ও স্বার্থসর্বস্বতাকে কঠিন শ্লেষজর্জর স্বভাবে প্রতিচিত্রিত করতে নির্মম হয়েছেন। আর সেই কারণেই অমানবিকতাব ধিকৃত স্বভাবকে স্মরণ করে মানুষকে কল্পনা করেছেন ইঁদুরের প্রতিরূপ প্রতীকী মননে। যে নৈরাজ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েছিলেন ব্যথিত পরশুরাম, তার প্রেরণা ও প্রাণনা লেখককে তো 'গামানুষ জাতির কথা'র মত গল্পের জন্মযন্ত্রণায় অস্থির করবেই।

'গামানুষ জাতির কথা' গল্প তাই পরশুরামের গল্পধারায় এক ক্রান্তিরেখার স্বভাব-চিহ্নিত 'মাইলস্টোন'—যা তাঁর মানসিকতাকে লক্ষণীয় দুটি ভাগে নির্দিষ্ট করে দেয়। এ ব্যাপারে পরশুরাম সৃজনধর্মী মন ও মননে সময়ের শিকার। সময়ই তাঁর শিল্পী-সত্তার একমাত্র স্মারক অভিজ্ঞান। মানুষ আদর্শভ্রষ্ট হয়ে, স্বার্থে ও স্বভাবে কত নিচে নামতে পারে, শান্তি সন্ধানের নামে প্রহসন রচনা করে, নিজেদের ধ্বংসকে আহাম্মকের মতো বরণ করতে নির্দ্বিধ হয়, 'গামানুষ জাতির কথা'য় তার উজ্জ্বল ছবি, বুঝিবা তথাকথিত সভ্য মানুষের তা হয় শ্বেতপত্র।

আলোচ্য গল্পে গতানুগতিক স্বভাবে কাহিনী ও গল্প নেই, আছে চিত্রধর্মে কিছু নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের, নেতাদের স্বার্থ-নিয়ন্ত্রিত ভ্রষ্টাচার। যেটুকু কাহিনী ও ঘটনার প্রচ্ছন্ন রূপ মেলে, তা প্লট-শরীরের অনুবর্তী হয়ে আসেনি, এসেছে সোজাসুজি গল্পকারের বক্তব্য পেশের বস্তুতান্ত্রিক দাবিতে। গল্পের শুরু গল্পকারের সশরীর উপস্থিত থেকে কিছু ইতিহাস, চিত্রাত্মক নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে সচেতনভাবে পাঠকদের সামনে রাখা। প্রথমেই আছে গল্পের ঘটনাকালের সময়সীমার খবর। পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রের প্রভুদের পরস্পরের মধ্যে অনেকদিন থেকে মনেব অমিল এক চরম পর্যায়ে আসে। সেই

অবস্থায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই নিজেদের বিপক্ষ গোষ্ঠীকে নির্মূল করতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের শেষতম ভয়ানক অস্ত্র—ইউরেনিয়ম বোমার তুলনায় নবতম অ্যানাইহিলিয়ম বোমা তৈরির কথা ভাবে। উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকের বিরুদ্ধ পক্ষকে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ করে দেওয়া, নিশ্চিহ্ন করা!

এই ঘটনায় সব ধ্বংস হলেও, চিরন্তন প্রাণের যেহেতু মৃত্যু নেই, তাই কিছু ইতর প্রাণী, কিছু উদ্ভিদ ইতস্তত বেঁচে থাকে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর বেশ কিছু বড় শহরে নিচের ড্রেনগুলির মধ্যে বাস-করা ইঁদুরগুলি মরে গেলেও কিছু তরুণ-তরুণী ইঁদুর বেঁচে যায়। কিন্তু তারা বেঁচে থাকলেও বোমায় নির্গত গামারশ্মির স্পর্শে ক্রমবিবর্তনে ইঁদুররা শরীরের গঠন বদলাতে বদলাতে হয়ে ওঠে মানুষের মতো এবং যেহেতু ইঁদুর জাতি আগে থেকেই মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাই তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধির কারণে তারা প্রতিভাবান মানুষই হয়ে ওঠে। প্রাচীন স্বাভাবিক আকৃতির মানুষদের থেকে এই নতুন জন্মের ইঁদুর-মানুষদের তফাত বোঝাতে লেখকের চিন্তায় তাদের নাম হয় 'গামানুষ'—'গামা রশ্মি' প্রভাবিত মানুষ।

গল্পকার শুরুতেই জানিয়ে রেখেছেন, যে সময়ে তাঁর গল্প লেখা শুরু, তার তিরিশ বছর আগে মানবজাতির ঘটেছে সমূহ বিলোপ। তাদের মৃত্যু ও পরবর্তী গল্প রচনার শুরুর সময়—এই দু'য়ের মাঝখানের তিরিশ বছরে নবজন্মের গামানুষ জাতি হয় দ্রুতগতিসম্পন্ন সভ্যতা বিনাশের অধিকারী। এই গামানুষ তাদের উত্তরপুরুষ মানবদের সমস্ত সভ্যতার গুণগুলি ত্বরিত আয়ত্ত করে ফেলে বুদ্ধিমত্তায়। কিন্তু তাদের সমস্ত শাখা সমান সভ্য ও পরাক্রান্ত না-হওয়ায় তাদের মধ্যেও থাকে জাতিভেদ, সাদা-কালো ভেদ, রাজনীতির বিশ্বাসের ভিন্নতা, রাষ্ট্রের ছোট-বড় সাম্রাজ্যের পারস্পরিক বৈষম্য, পরাধীন প্রজাকুল ও তাদের দ্বেষহিংসা, যুদ্ধবিগ্রহ, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এর ফ-ল বিশ্বজনীন শান্তির বিঘ্ন চরম রূপ পায়। এব থেকে মুক্তির উপায় ভাবে সাধারণ গামানুষ জাতির মধ্যেকার বুদ্ধিমান বিশিষ্ট গামানুষ জাতির জ্ঞানী, গুণী লেখক ও পণ্ডিতরা। বিভিন্ন জাতির স্বার্থবুদ্ধির সমন্বয় সাধন করতে বসে এক মহতী বিশ্বসভা। সেই সভায় আসে সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীরা, আবার রঙ্গরস উপভোগ করতে আগ্রহী বহু রবাহুত মানুষজনও।

সেই সভায় যারা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতির সম্মান নিয়ে উপস্থিত হয়, তারা কৃত্রিম রূপক নামে এইরকম চিহ্নিত : সভাপতি চং লিং, কাউন্ট নটেনফ, লর্ড এ্যাবার্থ, জেনাবেল কীফক, জননেতা অবলদাসজী, মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহারাজ, কর্মযোগী ধর্মদাসজী, পণ্ডিত সত্যকামজী, বিচক্ষণ বিজ্ঞ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী, আচার্য ব্যোমবজ্র প্রমুখ। সভাপতি চং লিং বিশ্বসভার শুরুতে সভার মূল উদ্দেশ্য জানান : যে কোনো উপায়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনের উপায় নির্ণয়, তাতে ব্যর্থ হলেই নতুন দেখা দেওয়া গামানুষ জাতির বিনাশ অনিবার্য। সভাপতির ভাষণের পর তেমন উল্লেখ্য নয় এমন এক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউন্ট নটেনফের কথা—বিশ্বের বিপুল সম্পদের যে বণ্টনবৈষম্য, তাতেই বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রয়াস ব্যাহত। মুষ্টিমেয় কিছু অসৎ বড়মাপের রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের প্রসার

ঘটিয়ে, অনুগত প্রজাদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্যদের বঞ্চনা করে চলেছেন। সে ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তির জন্য পৃথিবীর সম্পত্তিকে সব রাষ্ট্রের পক্ষে অর্ধেক ভোগের ব্যবস্থাটাই জরুরি। এর উত্তরে বড় সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থের যুক্তি : ১. শান্তিরক্ষার জন্য চাই বড় সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব, ২. সেই বড় সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্য চালানোর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো, ৩. বড় সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তার মধ্যেই আছে অন্যান্য ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ৪. বিশ্বের উৎপাদিত কাঁচা পণ্যের বণ্টনেও শর্ত মেনে চলার ভাবনা। গ্র্যাবার্থের যুক্তিতে, লর্ড কীফকের রাষ্ট্রব্যবস্থায়, স্বাধীন শিল্প-কারখানার বিলোপ, ধনিক শ্রেণীকে পাত্তা না দেওয়া, শ্রমিকদের মধ্যে তার রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষকে জিইয়ে রাখা—এসবই শান্তিস্থাপনে বিঘ্নকারক। জেনারেল কীফক গ্র্যাবার্থের দিক থেকে ওঁদের দেশে সকলকে দমিত করে বিপ্লব আনার প্রয়াসের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানান।

পরাধীন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে জননেতা অবলাদাসজী জানান সমস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিয়ে, তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিবাসনাকে জাগিয়ে তোলার মধ্যেই মিলবে যাবতীয় দ্বেষ হিংসাহীন শান্তি। মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহারাজ অধ্যাত্মচেতনার জাগরণ ও প্রতিষ্ঠাতেই আসবে রাষ্ট্রীয় শ্রেয়োলাভ—এমন কথায় পরাধীন অটলদাসজীকে সে বিষয়ে সান্ত্বনা দেন। কর্মযোগী ধর্মদাসজী চরিত্র শোধনে রাষ্ট্রীয় সদবুদ্ধি আসবে, একমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রহ্মচর্য পালনেই, বিশুদ্ধ ধর্মসংগত উপায়েই মিলবে শান্তি এই মত পোষণ করেন। পণ্ডিত সত্যকামজী মত দেন, সমস্ত রাষ্ট্র, মানুষ যদি অকপটে খোলাখুলিভাবে সত্যভাষণে সনিষ্ঠ হয়, তাতেই বিশ্বশান্তি হবে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত।

লর্ড গ্র্যাবার্থের মতে মন এত জটিল, সেখান থেকে সত্য কথা বার করা দুরূহ। জেনারেল কীফক জানান সেখানে সোডিয়াম পেন্টোথাল নামের ওষুধ খাইয়ে অতি সহজেই সত্য কথা বের করে দোষ ধরে পৃথিবী থেকে তাদের সহজেই গুলি করে শেষ করার ব্যবস্থা মন্দ নয়। পাশাপাশি বিচক্ষণ, পৃথিবীখ্যাত বৃদ্ধ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দীর নিজের সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশান-এর কথা বলে কীফকের ওষুধের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে, ত্রুটিকে বুঝিয়ে নতুন তর্কের অবতারণা করেন। যখন এই যুক্তি আসে যে ওষুধে অভিপ্রায় বোঝা সহজ হবে, তখনি গ্র্যাবার্থ বলেন অভিপ্রায় প্রকাশ করে শান্তিস্থাপন প্রয়াসে ব্যস্ত হওয়া ঠিক নয়। কারণ 'অভিপ্রায় গোপন আমাদের বিধিদত্ত অধিকার'। তাই স্থূল মিথ্যা যাই হোক রাজনীতির মূলেই তো 'সুখ মিথ্যা' অত্যন্ত দামী অস্ত্র—যদি তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে, সুখতায় প্রয়োগ করা যায়। তাই তাকে ছাড়তে নারাজ গ্র্যাবার্থ। এর পর যুক্তি-তর্কে স্থির হয় পরহিতৈষিকা পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনে মানতে বাধা নেই, আন্তর্জাতিক বিষয়ে ও রাজনীতিতে তার কোনো গুরুত্ব নেই। ক্রমশ তর্কের মধ্যে থেকে উঠে আসে রাষ্ট্রের বিবেক, ধর্মজ্ঞানের কথা, কিছু স্বার্থত্যাগের কথা, কিন্তু নিজেদের লাভ-লোকসানেই সে সব আলোচনায় গুরুত্ব পেয়ে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। নটেনফ, কীফক, অবলদাসজী—প্রায় সকলেই সিদ্ধান্তে এলেন : 'শান্তিটান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভালমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবনযাপন করতে চাই।'

আলোচনার শেষ পর্বে আসে আপাত সিদ্ধান্ত টানার মতো দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রী আচার্য ব্যোমবজ্রের অব্যর্থ বিশ্বশান্তির উপায় আবিষ্কারের সংবাদ। ব্যোমবজ্র এমন এক বোমা আবিষ্কার করেছেন যার নাম বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপন বোমা—যার থেকে বেরিয়ে পড়া আকস্মিক রশ্মি কস্মিক রশ্মির থেকে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তের শুদ্ধি, ক্রোধ-লোভ ইত্যাদির দূরীভবন ও আত্মার বন্ধনমুক্তি সম্ভব। গোপনে এই বোমা তৈরির নানাভাবে প্রেরণা, রসদ ব্যোমবজ্রকে দেন গ্র্যাবার্থ, নটেনফ, কীফক—উত্তেজনায় তাঁরা তা সভায় স্বীকার করেন। ব্যোমবজ্র অবলদাসজীদেরও দলাদলি ও দুর্দশার অবসান হওয়ার কথা জানিয়ে বের করেন একটি বোঁচকা। বোঁচকাটি খোলার সময় তাকে দখল করার জন্য গ্র্যাবার্থ, নটেনফ, কীফক থেকে শুরু করে সমবেত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের সকলেরই পারস্পরিক তুমুল প্রতিযোগিতা চলে। টানাটানির জন্যে ভুঁইপটকার মত বোমা যায় ফেটে, গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সমগ্র গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঘটে লোপ!

এইখানেই শেষমেশ গ্র্যাবার্থ-এর কথায় ও আবেগে এক অত্যদ্ভুত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পরিবেশে বিশ্বভ্রাতৃপ্রেমে আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে। 'গামানুষ জাতির কথা' গল্পটি বিশ্বজনীন, আন্তর্জাতিক তত্ত্বনির্ভর এক গভীর সমস্যা, সংকট ও রাজনীতির শ্লেষ-ব্যঙ্গ জারিত মানব্য বিনাশি গল্প। গল্পটির শরীর গঠন গতানুগতিক শিল্প-মান্য নয়। গল্পটির শুরু থেকে পর পর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদে নতুন এক মানবজাতির জন্ম হওয়াব সচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন। আরম্ভে মেলে গল্পকারের descriptive method-এর রীতি-অনুসৃতি। পরবর্তী একাধিক পরিচ্ছেদে আছে ভাগ করে সারা বিশ্বের বিভিন্ন ছোট-বড় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের বিস্তারিত ছবি। ছবির শেষভাগেই মেলে গল্পের চরমক্ষণ (climax)-এর বিস্ময়কর গদ্যচিত্রধর্ম। সবশেষে পরশুরামের নিজস্ব উপসংহার ঘোষণা :

> 'মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তার পর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা ও অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাপতি হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।'

'গামানুষ জাতির কথা' গল্পে লেখকের টানা গল্প বলার প্রয়াস নেই। আছে শুরু থেকে মানবজাতির ইতিহাস বলার ছলে তাঁর গল্পের একটি দৃঢ়পিনদ্ধ পটভূমি ও প্রেক্ষিত রচনার প্রয়াস। সেই পরিবেশেই আসে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার নামে পৃথিবীর স্বার্থসর্বস্ব রাষ্ট্রীয় নেতাদের সমবেত হওয়া ও লেখকের দেওয়া পরিষ্কার রূপক-তাৎপর্যে প্রত্যেক প্রতিনিধির নাম ও পদবি ধরে গল্পের ধীর-গতি স্বভাব বর্ণনা! যুক্তি-তর্ক, উত্তেজনা ও কিছু কৌতুকরস এবং শান্তিস্থাপন situation তৈরি হয়ে ওঠার পরেও তার নিষ্ফলত্বই গল্পের ভিতরের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে করে সহজ যুক্তিগ্রাহ্য।

গল্পের শেষে দ্রুত climax তৈরি হয়, যখন ব্যোমবজ্র একটি বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমাকে তাঁর বোঁচকা থেকে প্রকাশ্য করার কৌশল নেয়। এই বোমা নিয়ে চতুর্দিকের

কৌতূহল, শাসানি ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য আত্মপক্ষের মনোভঙ্গির উদ্‌ঘাটন—তার মধ্যে গল্পের এক চমৎকার climax রচিত হয়ে যায়। climax চিত্রটি অনবদ্য :

'...... তিনি (ব্যোমবজ্র) একটি ছোট বোঁচকা খুলতে লাগলেন।

সভায় তুমুল গোলযোগ শুরু হল, গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীফক এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরা বোঁচকাটি দখল করবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন।

ধর্মদাস বললেন, ব্যোমবজ্রজী, আর দেরি করছেন কেন, ছাড়ুন না আপনার বোমা।

ব্যোমবজ্রকে কিছু করতে হল না, সদস্যদের টানাটানিতে বোমাটি তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভুঁইপটকার মত ফেটে গেল। কোনও আওয়াজ কানে এল না, কোন ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দে আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমস্ত গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।'

এর পরেও পরশুরাম 'বিমর্ষসন্ধি' (falling action)-র টেকনিকে লুপ্ত মানুষের এক রহস্যময় ভৌতিক জগৎ তৈরি করেছেন। সবশেষে কিছুটা 'space' দিয়ে catastrophae-র স্বভাবে গল্পকার পরশুরাম নিজেকে করেছেন নিরাসক্ত ভাষ্যকার এবং দর্শক। 'মৃতবৎসা বসুন্ধরা'র অবস্থার এক ব্যঙ্গমূর্তি উপহার দিয়েছেন। আসলে 'গামানুষ জাতির কথা'য় পরশুরাম পৌরাণিক পরশুরামের ব্রহ্মাণ্ড নিঃক্ষত্রিয় করার পর নিজ সৃষ্টি পৃথিবীর দিকে একবার তাকান। সেই তাকানোয় মেলে গল্পের প্লটের জটিলতার কেন্দ্রীয় স্বরূপ ও উদ্দেশ্য। গল্পের মধ্যে ঘটনায় প্লটের জটিলতা নেই, আছে পারস্পরিক স্বার্থবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় নেতাদের সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাব প্রয়াস।

'গামানুষ জাতির কথা' গল্পে গল্প-রসাস্বাদ পূর্ণ হয় লেখকের মননক্রিয়ার যথোচিত প্রতিস্থাপনে। আমরা গল্পের যে অংশটিকে গল্পকারের পটরচনার লক্ষ্য মনে করি, তাতে প্রাথমিক কথন থেকে সরে এসে মেলে গামানুষ জাতির উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য, বিশ্বসভার সূচনায় কথাকারের স্বকপোলকল্পিত মানব-আবির্ভাবের রহস্যময় পরম্পরা চিত্র, মেলে বিবদমান সংক্ষুব্ধ বিশ্বনেতাদের বিশ্বশান্তির অভিনব আয়োজন। এই অংশগুলি গল্পকারের মৌলিক অভিনব কল্পনার একান্ত অনুগ। এই চিন্তাই গল্পটির মূল বিষয়কে করেছে বিশ্বাস্য। সভার বর্ণনায় ও সভ্যদের তর্কের তৎপরতায় অবশ্যই গল্পটির প্রকরণগত কেন্দ্রীয় বিন্দু স্পষ্ট হয়। এই অংশে গল্পের স্বাদ যুক্তিতর্ক ছাড়িয়ে তখনি স্বাদের বিস্ময় জাগায়, যখন দেখি একসময় ডাক্তার নন্দী হামাগুড়ি দিয়ে এসে নটেনফের নিতম্বে ভেরাসিটিন প্রয়োগ করেন এবং নটেনফ পত্নীর স্বামীর একাধিক প্রেমিকা থাকার সন্দেহে চিৎকৃৎ সংলাপ-উচ্চারণ, শেষে ব্যোমবজ্রের বোঁচকায় বাঁধা বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমাকে সামনে আনার প্রহসনাত্মক প্রতীকী স্বীকৃতি।

গল্পটির প্লটের জটে আশ্রয় নিয়েছে রূপক-নামের চরিত্রগুলির উদ্দেশ্যমূলক ভাবনাচিন্তার ভার ও ক্রমিক পলায়নবৃত্তির প্রসারণ, compromise-এর নামে নিজেদের

অধিকারের জায়গাটি সুনিপুণ বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস। প্রতীকী ঘটনা হল ব্যোমবজ্রের ভুঁইপটকার মত বোমা ফাটানোর ঘটনা, গামানুষ জাতির এক লহমায় নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব 'বায়ুভূত' হয়ে যাওয়া! গল্পের শুরুতে গামানুষ জাতির সদ্য আবির্ভাবের যুক্তিগ্রাহ্য ছবি, শেষে এক যুগের সেই জাতির অবলোপ। এভাবেই এই গল্পের প্লটের সহজ বাঁধন ও জটিলতম তাৎপর্যের প্রতিচিত্রণের মধ্যে শিল্পের যাথার্থ্য ভিত্তি পায়। আসলে টানা কাহিনী নয়, কোনো উতরোল বা সংগুপ্ত ঘটনাদি নয়, চরিত্রের জটিল কোনো মনস্তত্ত্বও নয়, লেখক পরশুরামেরই সুস্থ উদ্দেশ্য-নির্দিষ্ট মননক্রিয়া প্লটকে অভিনব স্বভাবে শিল্পের নতুন মাত্রার যোজনা ঘটিয়েছে। এই অর্থে 'গামানুষ জাতির কথা' গল্পে প্লট-রচনা অন্যান্য গল্পের শিল্প-শরীর থেকে পৃথক, ভিন্নস্বাদী।

দুই

'গামানুষ জাতির কথা' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি মূলত গল্পের মধ্যে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থার উপযোগী নানা মতামত প্রকাশের সভা থেকেই উঠে আসে। গল্পকার পরশুরাম কথিত সেই ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিণাম না হলে গল্পকার কল্পিত তথা সারা বিশ্বের বিশেষ যুদ্ধ-সময়ের অভিঘাতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত গামানুষ জাতির মুক্তি, সান্ত্বনা, বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ স্বস্তি সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় আনুষ্ঠানিক সন্ধি-চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৫-এর ২রা সেপ্টেম্বরে, যদিও তার পরেও জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণের ঘটনা ঘটে চুক্তির শর্ত ভেঙে। গামানুষ জাতির কথা লেখা হয় যুদ্ধ শেষের পরের কাছাকাছি সময়ে। স্বভাবতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবলতম যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া থেকেই গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয়ভাবনা রূপ পায়। ডবলিউ. পি. কে.-র বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের কয়েকটি বছরেব যুদ্ধ ও শান্তির প্রবণতাগুলি বিচার করে বলেন, যুদ্ধ যে অবসিত হয়, তা কেবল কয়েকটি শর্তের লিখিত রূপেই নিবদ্ধ, ব্যবহারিক জগতে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রয়োগে সে সবের কোনো সার্থকতা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রস্তাব যে নিষ্ফল, তা ভেবেই 'গামানুষ জাতির কথা' গল্পে গল্পকার তারই প্রামাণ্য দিক শিল্পের নান্দনিক অবয়বে সফল রূপ দিয়েছেন।

তাই গল্পের মধ্যে যে সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্বশান্তি সভার আয়োজন ও তর্ক-বিতর্ক, জোড়াতালি সমাধান, তা নিছক প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। পরশুরামের গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য তথা বিষয়ভাবনা ও মূল লক্ষ্যের নির্গলিতার্থ হল তা-ই। আপাতত তর্কের সূত্রগুলি এভাবে পর পর সাজানো যায় : ১. 'জগতের সম্পদ মোটেই ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়নি। সেই কারণেই বিশ্বশান্তি হচ্ছে না।' (অনতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউন্ট নটেনফ) ২. 'জগতের শান্তিরক্ষার জন্যই আমাদের জিম্মায় বিশাল সাম্রাজ্য থাকা প্রয়োজন, সাম্রাজ্য চালনার অভিজ্ঞতা আমাদের যত আছে, তেমন আর কারও নেই।' (বৃহত্তম রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ)। ৩. 'ওঁর (গ্র্যাবার্থের) রাষ্ট্রই আমাদের সকলকে দাবিয়ে রেখেছে, ওঁরা ঘুষ দিয়ে আমাদের দেশে

বার বার বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেছেন।' (জেনাবেল কীফক)। ৪. 'কোন কালেই আমাদের দাসত্ব ঘুচবে না। এই সভার একমাত্র কর্তব্য—সমস্ত রাজ্যের লোপসাধন এবং সর্বজাতির স্বাধীনতা স্বীকার। অধীন দেশই দ্বেষ-হিংসার কারণ।' (পরাধীন দেশের জননেতা অবলদাসজী) ৫. 'আমার তপস্যার প্রভাবে তোমরা সকলেই যথাকালে শ্রেয়োলাভ করবে।' (মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহাবাজ) ৬. 'আগে সকলের চরিত্র শোধন করতে হবে তবে রাষ্ট্রীয় সদবুদ্ধি আসবে।' (কর্মযোগী ধর্মদাসজী)। ৭. 'যুক্তিতর্কে বা অলৌকিক উপায়ে কিছুই হবে না।...... আমাদের দরকার সত্যভাষণ' (পণ্ডিত সত্যকামজী)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা মনে রেখে গল্পকার পরশুরাম ঠিক এইভাবে আলোচনার স্তরগুলি সাজিয়েছেন। এর পরে জেনারেল কীফক এনেছেন সোডিয়াম পেন্টোথাল প্রয়োগ-প্রসঙ্গ যাতে তার প্রভাবে অবশতার মধ্যে সত্য কথা বলা সহজ হয়, বৃদ্ধ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বিকল্পে ভেরাসিটিন ইঞ্জেকশান দেওয়ার প্রসঙ্গ আনেন। শেষমেশ লর্ড গ্র্যাবার্থের যুক্তিগুলি এমন : 'সত্য কথা বলায় আত্মসম্মানবোধে আঘাত আসে', 'অভিপ্রায় গোপনে আমাদের বিধিদত্ত অধিকার', 'সূক্ষ্মমিথ্যা অতি মহামূল্য অস্ত্র', 'জোর যার মুলুক তার এই হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি। পরহিতৈষিতা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বেশ, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার স্থান নেই।' বড় তিন শক্তির যুক্তিসাম্যে শেষতম সিদ্ধান্ত—'শান্তিটান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভালমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবনযাপন করতে চাই।'

প্রথম বিশশতকীয় যুদ্ধের মূলে ছিল দুই বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে একদিকে জার্মানির নেতৃত্বে ইতালি, জাপান ইত্যাদি রাষ্ট্র, অন্যদিকে বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা। ই. এইচ. কার-এর একটি মন্তব্য; 'Nearly every treaty which brings a wart to an end is, in one sense, a dictated peace; for a defeated power seldom accepts willingly the consequence of its defeat.' এই ন্যায়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, তাকে সামনে রেখে একদিকে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জোটে থেকে যুদ্ধে নামে, অন্যদিকে হের হিটলারের জার্মানি, ইতালি, জাপান। ক্রমশ রাশিয়ার সমাজতন্ত্র নতুন বেগ দেয়। এই যে যুদ্ধ-প্রেক্ষিত তার নিহিত চুক্তির সূত্রগুলিকেই পরশুরাম গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে চমৎকারভাবে রূপ দিয়েছেন। সবশেষে আচার্য ব্যোমবজ্রের বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমার আবিষ্কার ও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভুঁইপটকার মতো ফেটে যাওয়া এবং গামানুষ জাতির সম্পূর্ণ লোপ ঘটানোর চিত্রে গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনা ও রসাভাস অসামান্য ব্যঙ্গরসজারিত সিদ্ধিলাভ করে।

তিন

'গামানুষ জাতির কথা' গল্পে মহতী বিশ্বসভা পরিকল্পনায় প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বহু মানুষ যোগ দেন। গল্পকারের কথায় : '...... মহা উৎসাহে এই সভায় অনেক রবাহুত

ব্যক্তিও তামাশা দেখতে এলেন। যাঁরা বক্তৃতা দিলেন, তাঁদের আসল নাম যদি গামানুষ ভাষায় ব্যক্ত করি তবে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে; সেজন্য কৃত্রিম নাম দিচ্ছি যা শুনতে ভাল এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।' এতেই বোঝা যায় গল্পের চরিত্রগুলি অবশ্যই রূপকধর্ম অনুগ। চরিত্র বড় নয়, বড় গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।

আলোচ্য-গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্প নয়, এখানে কোনো নায়ক বা নায়িকা নেই, গল্পকারের বিশেষ 'মোটিভ'ই পৌরাণিক অর্জুনের সেই লক্ষ্যভেদী বানের মুখে নির্দিষ্ট পাখির মতো! নিপুণভাবে রূপকাত্মক চরিত্রগুলি তাদের বক্তব্যকে সভায় পেশ করে। তাতে কোনো ব্যক্তিগত স্বভাবে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও মনস্তত্ত্ব প্রধান হয়নি, হয়েছে বড় বড় ও ছোট মাপের রাষ্ট্রের স্বার্থসর্বস্ব মতাদর্শের নির্লজ্জ উন্মোচন। আর এই গুরুগম্ভীর আলোচনায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকের অফুরন্ত ফোয়ারা ছুটিয়েছেন পরশুরাম। চরিত্রগুলির মতাদর্শ তাদের ব্যক্তিত্বের পরিপোষণ করেনি, রাষ্ট্রের ভিতরের লজ্জাহীন স্বার্থচিন্তা, চাতুর্য, কথার ছল ও কৌশল, আন্তর্জাতিক মানবতার সমূহ বিনাশকেই গল্পপাঠকদের সামনে ছাল-চামড়াহীন আদিম বন্য পশুদের মত বীভৎস করে তুলেছে। এটাই গল্পকারের মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রগুলিকে তাদের রূপকাত্মক মানুষ-প্রতিনিধিদের সামনে নিয়ে আসার শিল্পকৌশলে!

আর এদের ওপর আবরণ দিয়েছেন গল্পকার তীব্রতম শ্লেষ-ব্যঙ্গের, মাঝে মাঝে নির্মল কৌতুকের কষায় নুন-লেবুর স্বাদ মাখিয়ে। চিরন্তন নারীমনের ঈর্ষা, সন্দেহবাতিক স্বভাব, স্বামী-বিদ্বেষের সার্থক প্রকাশ আছে কাউন্টেস নটেনফ-এর চিৎকারে :

> "'.....দশর্কের গ্যালারি থেকে কাউন্টেস নটেনফ তারস্বরে বললেন, 'দিন জোর করে ফুঁড়ে, কাউন্ট অতি মিথ্যাবাদী, চিরকাল আমাকে ঠকিয়েছে।'
>
> এই হট্টগোলের সুযোগে ডাক্তার নন্দী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে নটেনফের নিতম্বে ভেরাসিটিন প্রয়োগ করলেন। নটেনফ পত্নী চীৎকার করে বললেন, 'এইবার কবুল কর তোমার প্রণয়িনী কে কে।'''

আবার দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রী, আচার্য ব্যোমবজ্র সম্পর্কে যখন লেখেন 'এক দিস্তা ফুলস্ক্যাপে এঁর সমস্ত উপাধি কুলয় না।'—তখন গামানুষ জাতিকে লুপ্ত করার মতো বোমা আবিষ্কার করে অমানবিক পৃথিবী ধ্বংসের উপায় নির্ণয়ে লেখকের ব্যঙ্গের কলম জর্জরিত হয়ে যায়। এত পদবি তার কৌতুকরসের উদ্রেক করে আর মানবজাতি ধ্বংসের ক্ষমতায় ব্যঙ্গের গরম গরল তার গায়েই ছিটিয়েছেন গল্পকার। বোমার বোঁচকা খোলার পর ভুঁইপটকার মতো ফেটে যাওয়ার মধ্যে চরিত্র নয়, মোটিভের প্রতি বিদ্রূপবাণ শাণিত করেছেন লেখক।

নটেনফ সিদ্ধান্তে এসে বলেন, গ্র্যাবার্থের অভিব্যক্তিবাদের প্রসঙ্গ ধরে—'আমাদের নীতিও ঠিক ওই রকম,' কীফক বলেন—'আমরাও তাই বলি'—তখন বৃহৎ শক্তিগুলির এই একপক্ষ হওয়ার দিকটি দুটি বিশ্বযুদ্ধের বিরোধী শক্তিগুলির ঘৃণ্য স্বভাবকেই প্রকট করে, এখানেও সেই শেষ। বস্তুত গল্পের সম্পূর্ণ অভিনব নামের চরিত্রগুলি মূলত যে যার মতবাদ ধরে এক জটিল স্বার্থচক্রের কেন্দ্রে স্থিত হয়ে চক্রটিকে ঘুরিয়েছে। তাবা

মতের দাসত্ব করে, স্বার্থের লালনপালন করে পোষ্য বশংবদ কুকুরের মতো। তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চরিত্রদের আলোচনাগুলিকে সবস, স্বাদযোগ্য করার জন্যই চরিত্র প্রাধান্যের দিকে লেখকের লক্ষ্য নেই, আছে মতের নির্মমতাকে প্রকট, রূঢ় বাস্তব করে তোলার দিকেই। তাই 'গামানুষ জাতির কথা' গল্পে গল্প-শিল্পের গতানুগতিক চরিত্র-বিন্যাসরীতি পরিত্যক্ত, গল্পকারের স্ব-কপোল নিয়ন্ত্রিত চরিত্রভাবনাই প্রধান। অসীম লোভ, পারস্পরিক ঘৃণ্য সন্দেহ ও মানববিদ্বেষী স্বভাব গল্পের উদ্দেশ্য ও চরিত্র-প্রকরণে একাকার হয়ে গেছে। গল্পটি সম্পর্কে একালের এক প্রতিষ্ঠিত কথাকার-সমালোচক মন্তব্য করেছেন : 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গর্বাত্মক গ্লানি ও হিংস্রতা পরশুরামকে কী পরিমাণে বিচলিত করেছিল, তার নিদর্শন 'গামানুষ জাতির কথা'। এই গল্পে একটি ফিউচারিস্ট রূপক আছে।' সময়ের শুশ্রূষা কি সভ্যতাকে নিরাময় করে? কাল যখন মহাকালের হাত ধরে চলে তখন কাল দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। মহাকাল আপন বেগে এগোয়, প্রয়োজনে প্রলয় ঘটায়। তা স্বতঃস্ফূর্ত। গল্পের রূপকাত্মক চরিত্রগুলি এবং তাদের কৃমিকীটের মতো উদ্দেশ্য গল্প-কথাকেই গৌরব দিয়েছে, পাঠকদের নিবিড়-নিবদ্ধ করার সহায়ক হয়েছে। পরশুরাম যাদের ইঁদুর বলে কল্পনা করেছেন তারা তো অত্যন্ত শিক্ষিত! 'এরা গামা-রশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে আবির্ভূত হল। এক বিষয়ে ইঁদুর জাতি আগে থেকেই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। এখন এই শক্তি আরও বেড়ে গেল। এই নবাগত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান করতে চাই না.....' এই বংশ থেকেই আসে গল্পের চরিত্রগুলি—যারা সভায় বসে তাদের 'motive'গুলিকে সামনে আনে। চরিত্রগুলি তাই ব্যঙ্গের উপযুক্ত আধার। কথাকার-সমালোচকের কথা তাই চরিত্রব্যাখ্যায় যথার্থ :

> 'যুদ্ধলিপ্সু বিশ্বসংহারোদ্যত এ-যুগের মানব-সমাজের প্রতি অসহ্য ঘৃণায় পরশুরাম তাদের ইঁদুর বলে কল্পনা করেছেন।'

চার

আমরা গোড়াতেই আলোচনার সূত্রপাতে বলেছি, গল্পটি বিশ্বজনীন তত্ত্বচিন্তানির্ভর গল্প। ঘটনাশ্রয়িতা এমন গল্পের প্রকরণ বৈশিষ্ট্যে কমবেশি হওয়া সম্ভব নয়, গল্পের ক্লাইম্যাক্স অংশটি পরিণামী ব্যঞ্জনায় অনবদ্য খাপ খেয়েছে। গামানুষ জাতির সমূহ লোপ স্বার্থান্ধ মানুষ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের অবিমিশ্র স্বার্থান্ধতায় যে সম্ভব হয়েছে, তার উপযোগী ক্লাইম্যাক্সে বোমা ফাটার কল্পনায় স্বীকৃত। এই অর্থে গল্পে ভাবের একমুখীন দিক দৃঢ়পিনদ্ধ শিল্প-অবয়ব পেয়েছে। গোড়ায় গামানুষ জাতির উদ্ভবের কথা যে কাল্পনিক এবং সূচিভেদ্য শ্লেষাত্মক স্বভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা গল্পের যথার্থ পটভূমি। এই পটভূমি ঠিক এইভাবে সংযত চিত্রে ও ইতিহাসের বর্ণনামূলক স্বভাবে না থাকলে মূল লক্ষ্য সার্থক সিদ্ধান্তে পৌঁছত না।

একথা ঠিক এক নিশ্চিত উদ্দেশ্য গল্পের আবহে সক্রিয়। এই সক্রিয়তা কঠিন আলোচনাগুলিকে করেছে সরস, কষায় এবং শ্লেষ-ব্যঙ্গজর্জর। পরশুরাম মূলত এক জাত-হাস্যরসিক শিল্পী। তিনি গল্পে যতটুকু descriptive method নেওয়া দরকার, তা গল্পের গোড়াতেই নিয়েছেন। পরে কাল্পনিক নাট্যস্বভাবী শিল্প প্রকরণের অনুগ সংলাপ নির্মাণে অসামান্য চাতুর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রকাশের চারুতা, প্রবহমানতা ও স্বচ্ছতা নির্ভর করে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের যথাযথ অবয়বনির্ভর অস্তিত্বে।

গল্পের গোড়া থেকেই পরশুরাম শ্লেষকে লেখনীর কালির সঙ্গে মিশেল দিয়েছেন। গল্প আরম্ভই করেছেন একজন ত্রিকালদর্শী নিরাসক্ত বক্তা হিসেবে। শ্রোতা, পাঠকজনতা, গামানুষ জাতির সাড়ম্বর উদ্ভবের বর্ণনার ভাষায় তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে। 'লেখক আর পাঠকরা দেশকালের অতীত, তারা ত্রিকালদর্শী ত্রিকালজ্ঞ', দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশেষ সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার, পৃথিবী জুড়ে সমৃদ্ধ শহরের ড্রেনের ভিতরে ইঁদুরের বসবাস ও বৃদ্ধি,—এসবের কথায় ও চিন্তায় মেলে শ্লেষের সরস উপভোগ। সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ফসিল' গল্পের প্রকাশরীতির মধ্যে সূক্ষ্ম স্বভাবে এইরকম শ্লেষের মন্থর প্রবাহ এনেছেন। বিবরণ নয়, পরোক্ষ ইঙ্গিত প্রকাশেব গদ্যে ও বাক্যে থেকেছে অন্তঃশীল।

গল্পের গদ্য ও ভাষা ব্যবহারে, শব্দপ্রয়োগে, চিত্রাত্মক স্বভাব রচনায় অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য রেখেছেন। তাঁর প্রযুক্ত উপমা এইরকম : 'বিজ্ঞানের এই নবতম অবদানের তুলনায় সেকেলে ইউরেনিয়ম বোমা তুলো ভরা বালিশ মাত্র।' ধ্বনিসাম্যে কোনো কোনো বাক্যাংশ যেমন কৌতুকরসের আস্বাদ দেয়, তেমনি শ্লেষের খোঁচাও কম থাকে না : '......অপরাপর পক্ষের যোগাড় শেষ হবার আগেই তাঁরা কাজ সাবাড় করবেন।' 'শুভলগ্নে ব্রহ্মাস্ত্র মোচন', 'কতকগুলি তরুণ আর তরুণী ইঁদুর', 'নবাগত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান করতে চাই না', 'ডাক্তার নন্দী বিনা বাক্যব্যয়ে আবার ফুঁড়ে দিলেন', বোমার ভুঁইপটকার মত ফেটে যাওয়া', গ্যাবার্থের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা পেয়ে যাওয়ার কথা, 'এখন একটু কোলাকুলি করা যাক',—এইসব শব্দ ও বাক্যাংশ প্রয়োগ গল্পের গদ্যভাষার উপভোগ্যতাকে মনোরম করে। গল্পকারের উদ্দেশ্য ও স্বাদুতা, বিষয়ভাবনা ও লক্ষ্য—সমস্ত কিছুকে শৈল্পিক সম্মানে ভূষিত করে।

গল্পের উপসংহারের আগে পরশুরাম অদ্ভুত প্রহসন চিত্র এঁকেছেন বোমা ফেটে যাওয়ার পর সকলের ভূত হয়ে যাওয়ার চিত্রে। প্রহসনের স্বভাবে এমন চিত্র গল্পের প্রকরণের বড় ঐশ্বর্য! নটেনফের বোমা ফাটার পরও এক আত্মতৃপ্তির নির্লজ্জ অথচ উপভোগ্য আচরণ আমাদের যেমন বিস্মিত করে, তেমনি ভাবায়। নটেনফ, কীফকরা লোভে, স্বার্থে যে অস্তিত্বহীন হয়েও নিজেদের ভাগবাঁটোয়ারা, বিশ্বাসের জগতের কথা ভোলে না, গল্পকার তার ব্যঞ্জনাকে রূপকের মোড়কে পরিবেশন করেছেন :

'..জন-পিছু সমান হিস্‌সা, কি বলেন? (নটেনফের উক্তি)

ব্যোমবজ্র সহাস্যে বললেন, কোন দরকার হবে না, আপনারা সকলেই নশ্বর দেহ

থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে গেছেন। এখন নরকে যেতে পারেন, বা আবার জন্মাতে পারেন, যার যেমন অভিরুচি।

কীফকে বললেন, আপনি কি বলতে চান আমরা মরে ভূত হয়ে গেছি? আমি ভূত মানি না।

ব্যোমবজ্র বললেন, নাই বা মানলেন, তাতে অন্য ভূতদের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।'

গল্পে পরশুরাম যে একজন নিরাসক্ত নির্মম দ্রষ্টা ও নান্দীকার, শেষতম অনুচ্ছেদের দর্শন গল্পকারের নিজস্ব জীবনদর্শনের অভিজ্ঞতাজাত সভ্যতার ভবিষ্য-দর্শন।

পাঁচ

গল্পের নাম 'গামানুষ জাতির কথা'। সামান্য এই নামেই বোঝা যায়, গল্পকার এক সম্প্রদায়ের ইতিকথা বর্ণনে আগ্রহী। গল্পকার নিজেই এমন নামের পক্ষে গোড়াতে কিছু যুক্তি রেখেছেন। সারা পৃথিবীর বড় বড় শহরে ড্রেনের নিচে বাস করত লক্ষ লক্ষ ইঁদুর। তারা এক সময়ে বোমার তেজে হয় বিলীন। কিন্তু কিছু তরুণ ও তরুণী ইঁদুর—'প্রাণ বড় কঠিন পদার্থ, তার জের মেটে না'—এই তত্ত্বে দৈবক্রমে বেঁচে যায়। বোমা থেকে নির্গত গামা-রশ্মির প্রভাবে তাদের জাতিগত লক্ষণে ঘটে বিস্ময়কর বদল। তারা এককথায় ক্রমশ মানুষের মতো লক্ষণ পেয়ে যায়। এদের আবির্ভাবের মূলে থাকে গামা-রশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি আর দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা। পরশুরাম জানিয়েছেন: 'এই গামা-রশ্মির বরপুত্রগণকে গামানুষ বলব।' সুতরাং গামানুষ হল সভ্য শিক্ষিত মানুষদেরই প্রতিনিধি। আলোচ্য গল্পে তারাই, তাদের বুদ্ধিমান প্রতিনিধিরাই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বসে। তাই গল্পের এমন নাম যথাযথ।

দ্বিতীয় কথা হল, পরশুরাম এই গামানুষ জাতির লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও নানান সক্রিয়তার চিত্র উপহার দিয়ে যুদ্ধকালীন বীভৎস মানব্য ধ্বংসের স্বরূপ উপহার দিয়েছেন। তাদের সচিত্র স্বভাব আঁকার প্রয়াস আছে গল্পকারের শৈল্পিক নিপুণতায়, তাই নাম গল্পের লক্ষ্যের সঙ্গে সমান মাপে রূপক।

তৃতীয় কথা, গল্পে যে গল্পকার বক্তা মাত্র, ইতিহাসবেত্তার মতো নিরাসক্ত-চিত্ত পুরুষ, যাদের কথা বলছেন, তারা গল্পকারের নয় বিনাশী ইতিহাসের প্রধান অনুষঙ্গ—এটা বোঝাতেই 'গামানুষ জাতির কথা'—এমন নাম দিয়েছেন, অন্য নাম সেখানে পরিত্যক্ত।

চতুর্থ কথা, গল্পে আছে আদ্যন্ত রূপকধর্ম। নামে, কাজে, লক্ষ্যে রূপকের আবরণে মেলে সাম্প্রতিকতম যুদ্ধসমস্যা ও সংকটের অসীম অব্যবস্থার ছবি। গল্পটি রূপক-আধারে কৌতুক শ্লেষব্যঙ্গের নিপুণ চালচিত্র। 'গামানুষ জাতির কথা' ছাড়া অন্য কোনো নামই এখানে ঠিক খাটে না। তাই গল্পের নাম ঐতিহাসিক ও শিল্পরসিক, তথা স্বয়ং-শিল্পীর একাধিক সৃষ্টিকর্মেরই অন্যতম ব্যঙ্গাত্মক অভিজ্ঞান।

জগদীশ গুপ্ত

জন্ম : জুলাই ১৮৮৬
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল ১৯৫৭

জগদীশ গুপ্ত কল্লোল কালিকলমের লেখক। তাঁর সমকালে কল্লোলের তরুণ লেখক-সতীর্থদের মতো তিনি বয়সে তরুণ ছিলেন না নিশ্চয়ই, কিন্তু মানসিকতায় যথার্থ অর্থেই কল্লোল-মনস্ক, একজন তরুণ কথাকার। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলের কালের লেখক-গোষ্ঠীকে যে অর্থে রবীন্দ্র-বিদ্রোহী বলেছেন, ঠিক সে অর্থে যথার্থ দ্রোহ-বুদ্ধির পরিচয় তাঁদের লেখায় ছিল না, ছিল বিশ্বপ্রতিভা-দীপ্ত রবীন্দ্র-মানসিকতার সর্বগ্রাসী প্রভাবের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। 'প্রতিক্রিয়া' আর 'বিদ্রোহ' এক নয়, হতেই পারে না। প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহের মুখ তৈরি করতে পারে, বিদ্রোহের ধর্ম পায় না। 'কল্লোল' পত্রিকায় তারুণ্যের সবল প্রতিক্রিয়াজনিত যে নতুন নতুন ভাবনা, মত-পথ দেখা গিয়েছিল, জগদীশ গুপ্ত তার পুরোধা। সম্ভবত এই লেখকই প্রথম সত্যিকারের কল্লোলের প্রাণটিকে সবলে ধরতে পেরেছিলেন। 'পয়োমুখম্' ইত্যাদি একাধিক বিভিন্ন রসের গল্পে তার প্রমাণ মেলে।

যে আধুনিকতার জন্ম দেয় কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকা, তাকে স্বরূপে চিহ্নিত করেন জগদীশ গুপ্তই প্রথম। বৈজ্ঞানিক নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টিই এই আধুনিকতার জনক। আবেগ, সেন্টিমেন্ট, হাল্কা রোমান্টিসিজ্‌ম্ নয়, নয় বিরুদ্ধতার নামে শুধুই বিরুদ্ধতা, অথবা উদ্দেশ্যহীন বিদ্রোহিতার রাজবেশ ধারণ, আসলে সত্যিকারের বাস্তবতাকে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সে সময়ের আধুনিক ভাবনার ও জগদীশ গুপ্তের কথাকার-মনস্কতার অন্যতম শর্ত। ''পয়োমুখম্'', 'পুরাতন ভৃত্য, 'বুড়োর সুখ' , 'হাড়', 'দৈবধন', 'ঘেন্নার কথা', 'যে যার কাজে', 'জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি', 'বিনোদিনীর ব্রজ' ইত্যাদি গল্প এর প্রতিনিধিত্ব করে।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্প-সংকলন 'বিনোদিনীর' প্রকাশকাল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। এই গ্রন্থের অন্যতম গল্প ''পয়োমুখম্''। 'কল্লোল' প্রকাশিত হয় ১৯২৩-এ, 'কালিকলম' ১৯২৬-এ। জগদীশ গুপ্ত প্রথম বর্ষের কালিকলম-এ লেখেন ৯ টি গল্প, পরে কল্লোলের গল্পলেখক হন। সেই সময়ের ও পত্রিকার মতাদর্শের প্রভাবকে পরিচ্ছদ করে তাঁর গল্পগুলির প্রকাশ ঘটে।

তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট আলোচনার প্রথমে পরিষ্কার বোঝা দরকার গল্পগুলির রচনাকাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়কে চিহ্নিত করে। আগেও বলেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশে পা রাখেনি, কিন্তু তার অর্থনৈতিক-সংশয়, সংকট, বৈষম্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী জীবন-স্বভাবকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে শম্বুকগতিতে। ১৯২৩-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের আগে-পরে দারিদ্র্য আমাদের পরিবার জীবনকে নানাভাবে

নাড়া দেয়। আর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ কি পেশায়, কি ব্যক্তিগত স্বভাবে নিচে নামতেও দ্বিধা করেনি। সুযোগসন্ধানী, স্বার্থসর্বস্ব মানুষ জীবনের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক-ভাবনাতেও ঘুণপোকাকে লালন করে। 'পয়োমুখম্' গল্পে পিতা কবিরাজ কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা তারই অনুগ এক চরিত্র।

কিন্তু শুধু চরিত্র-চিত্র দিয়ে জগদীশ গুপ্ত থেমে থাকেননি, তিনি সেই সময়টাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে, মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষাকে নিরাসক্ত স্বভাবে চিনতে চেয়েছিলেন বলেই চরিত্রনিহিত বাস্তবতা আতিশয্যকে বর্জন করে হয়েছে এক রূঢ় জীবনদর্শন—যা সে সময়েরই নিয়তি-নির্দেশ যেন। জগদীশ গুপ্ত এই নির্দেশকে মান্য করেছেন। জীবনে নানা পেশায় জড়িত থেকে দেখেছেন অনেক মানুষ, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে ক্রূর নিয়তির সত্যে নিজস্ব চিন্তায় যুক্ত করেছেন। এখানেই জগদীশ গুপ্ত পৃথক গোষ্ঠীর লেখক। শরৎচন্দ্রীয় বাস্তবতার প্রবল প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্ত। জীবন-সংক্রান্ত গূঢ় রূঢ় গভীর সমস্যা, যা মানবজীবনকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে, জগদীশ গুপ্ত তাকেই নির্মোহ বাস্তবে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন বলেই তাঁর সাহিত্যে, এবং 'পয়োমুখম্', 'হাড়', 'দিবসের শেষে' ইত্যাদি গল্পে লেখক-মনের বিশিষ্ট আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রোথিত থেকে গেছে।

জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের বিষয়ে যেমন আখ্যানের আড়ম্বর থাকে না তেমনি থাকে না ঘটনার আকস্মিক চমৎকারিত্ব। তাঁর দেখার চোখ একান্তভাবে নিজস্ব। এই নিজস্বতায় একাধিক গল্পে লেখক পাঠকদের এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করান যাতে পাঠক রুদ্ধশ্বাস হতভম্ব হয়ে যায়। নীচু চোখে, দু'আনা দু'পয়সা, ফাঁসি, কলঙ্কিত সম্পর্ক, অরূপের রাস, হাড়, চার পয়সায় এক আনা, শঙ্কিতা অভয়া—এসব গল্প কোনটা বিশ্বাস্য কোনটা অগ্রাহ্যের গ্রাহ্য, কোনটা অবস্থার দাসত্বে সত্য, নাকি ভাগ্য তথা বিধাতার দেয়াল লিখনের রহস্য জাগায়—বিভ্রান্তি আনবেই। জগদীশ গুপ্তের গল্পের যে ব্যঞ্জনা—তা শিল্পের জন্য শিল্প এমন মতান্ধতায় সীমা টানে না, তা ভয়ঙ্কর অস্বস্তির মধ্যে আমাদের হতবাক করে। "পয়োমুখমে"র পিতা—বাড়ির কর্তা কোথাও বুঝি আমাদের সংসারের অন্ধকার কোণে ঠেলে দেয়, যেখানে মৃত্যুই ভাগ্য, মানুষ বুঝিবা ভাগ্যের ক্রিয়ার এক যন্ত্রী।

'রতি ও বিরতি' গল্পের নায়ক রামের বিবর্তন অধোমুখী টানে চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যকে একেবারে ভিন্ন মাপ দেয়। গল্প পড়ে জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টিতে কেউ কেউ বাস্তবতার ন্যাচারালিজম্ ও রিয়ালিজমের প্রয়োগের 'তর' ও 'তম'—এসবের প্রতিতুলনার কথা ভাবেন। আসলে জগদীশ গুপ্ত বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় স্বচ্ছদৃষ্টি শিল্পী। ডস্টয়ভ্স্কি দ্বৈতের সংকটে গভীর অন্ধকারে নামতে নামতে আরো অনেক গভীরে নেমেও আলোর সন্ধানী হয়েছেন। তাঁর পাপপুণ্য কিন্তু ঝুলন্ত আলোর ছায়ায় আলো-অন্ধকারের খেলা। ডস্টয়ভ্স্কি থেকে জগদীশ গুপ্ত সমস্ত সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নির্দয়, অজানা, ভাগ্য নিপীড়নের খেলাকে জীবনের সৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে একমাত্র সত্য ভেবেছেন বলেই প্রেম ও সংস্কারের গল্পেও অবস্থার দাসত্ব ও আকুতি মেনেছেন।

১.

"পয়োমুখম্"

এক

"পয়োমুখম্" গল্পে কাহিনী বা আখ্যায়িকা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্লট, তা আছে। মনোভঙ্গিতে মৌল অর্থে পিতার থেকে ভিন্ন মানসিকতার পুত্র ভূতনাথ এবং তার পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র। এদের স্বভাবের প্রচ্ছন্ন সংকট দিয়ে গল্পের শুরু। সতেরো-আঠারো বছরের পুত্র ভূতনাথের ওপর পিতার কর্তৃত্বই একমাত্র হওয়া স্বাভাবিক। পুত্রের প্রতি পিতার কর্তৃত্বের পোশাক ছিল স্নেহের, জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবন-গঠনের উপযোগী দায়িত্ববোধের। কৃষ্ণকান্তের এই কর্তৃত্বের জোরেই ভূতনাথকে বিবাহ করতে হয় ন'বছরের বালিকা মণিমালিকাকে, তার দুঃখজনক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার অনুপমাকে, এবং অনুপমারও মৃত্যুর পর সমস্ত রকম ইচ্ছার প্রবল বিরোধিতার মধ্যে বীণাপাণিকে! আগের দুই স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত আছে স্নেহ-আকাঙ্ক্ষা ও সংসার-শান্তির ছদ্মবেশে কৃষ্ণকান্তের গোপন অর্থলিপ্সা। দুই সন্তানের পিতা কৃষ্ণকান্তের গোপনতম অভিপ্রায়ের কাছে বড় ছেলে ভূতনাথ সেই অর্থপিপাসা চরিতার্থ করার বড় মূলধন। তার স্ত্রী সহজ, সরল মাতঙ্গিনীও স্বামীর অন্তঃশীল তৎপরতা ও কৌশলের কিছুই বোঝে না। শেষে বীণাপাণির মৃত্যু ঘটানোর প্রয়াসেই কৃষ্ণকান্তের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। গল্পের শেষে পুত্র ভূতনাথের অস্বস্তিকর পিতৃশ্রদ্ধার রূপ কৃষ্ণকান্তের কাছে পিতৃশ্রাদ্ধ-বাসনার স্বরূপে ধরা পড়ে। যে ঔষধ ভূতনাথের তৃতীয় স্ত্রী বীণাপাণির মৃত্যুর জন্য কৃষ্ণকান্তের পক্ষে ছিল অব্যর্থ শর-নিক্ষেপ, তা নিজের পুত্রের হাত থেকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে পিতার কাছে পুত্রের এমন অকপট অন্তিম সংলাপে—'এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল না, বাবা। পারেন ত নিজেই খেয়ে ফেলুন। বলিয়া সে ঔষধ সমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।'

পারিবারিক জীবন-কাহিনী-নির্দিষ্ট এই প্লটের মধ্যে আছে দুটি করুণ মৃত্যুঘটনা। মৃত্যু দুটি হত্যারই নামান্তর। আর এই হত্যার পিছনে আছে মানুষের দুর্মর অর্থলোভ। এই লোভ মানুষের সমস্তরকম মানবিক সম্পর্ককে অস্বীকার, উপেক্ষা করতে শেখায়। সেই শিক্ষাই আছে ধুরন্ধর কবিরাজ, জটিল চরিত্রের পিতা কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মার মধ্যে। গল্পটি মূলত চরিত্রাত্মক ও আদ্যন্ত ক্ষুরধার ব্যঙ্গের আবরণে ঢাকা। এ গল্পের মূল সমস্যা প্রধান চরিত্রকে নিয়েই। এ এক ভয়াবহ চরিত্র-মানসিকতার চিত্রকথা। দুই বধূর অসহায় মৃত্যু-ঘটনার পর গল্পকার গোপনে কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক বীণাপাণির বাবা বলরামবাবুর প্রতি-মাসে পাঠানো দশটি টাকার রহস্য পুত্র ভূতনাথের গোচরে আনার মতো ঘটনা সাজিয়েছেন। ঘটনার এমন গতিমুখ গল্পের সমাপ্তিরেখা টানার ব্যাপারে কৃষ্ণকান্তের যথোচিত পরিণতি-চিত্র-অঙ্কনে শিল্প-সহায়ক হয়েছে। সমস্ত ছোট বড় প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ঘটনার একমুখিতা ও পরিণাম কোনোক্রমেই ঘটনাগত হয়নি, হয়েছে প্রধান চরিত্রকেন্দ্রিক—যা লেখকের মূল লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

কোনো সমালোচকের মনে হতে পারে, পুত্র ভূতনাথের কোলের কাছে মনিঅর্ডারে

আসা সাজানো দশটি টাকা ও তার শ্বশুরের নাম-লেখা কুপন দেখে 'কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যেন বাঁচিলেন'— এমন সূক্ষ্ম অপ্রস্তুত চিত্র-রচনায় গল্পটি শেষ হলে ক্ষতি ছিল না। তাতে নিজ পুত্রের কাছে ধরা-পড়ে-যাওয়া চরম অপমানিত পিতার স্বরূপ ধরা পড়ায় গল্পের সমাপ্তির শিল্প-ব্যঞ্জনা ব্যাহত হত না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র গুপ্ত কাহিনী ও ঘটনা দিয়ে গল্প শেষ করতে চাননি, তাঁর নিরাসক্ত জীবনদর্শন, রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তবতাবোধ তাঁকে কৃষ্ণকান্তের অন্তিম পরিণতি-চিত্রকে আরও নির্দয় করার পক্ষপাতী ছিল বলে ওই ঘটনার পরেও বলেছেন অকপটে—'মানুষের দুষ্কৃতি অতো সহজে নিষ্কৃতি পায় না।' কৃষ্ণকান্ত চরিত্রের নির্মম পরিণতি দেখানোই যেখানে লেখকের লক্ষ্য ও স্থির জীবন-বিশ্বাস, সেখানে আরও বড় ঘটনার আয়োজন করেছেন তার পরেও—বীণাপাণির অসুস্থ হওয়া, কৃষ্ণকান্তের তাকে গোপনে মৃত্যু-ঘটানোর ঔষধদান ও সেই ঔষধেই ভূতনাথ কর্তৃক পিতার মরণ কামনার মতো পরিস্থিতি রচনা করে। তাই "পয়োমুখম্" গল্পে ঘটনা সাংসারিক-বিধাতার নির্দেশ যেন, লক্ষ্য মানুষ, তার রক্তের স্বভাব ও ভাগ্য।

দুই

চরিত্রাত্মক গল্প বলেই "পয়োমুখম্" গল্পে কৃষ্ণকান্তের মতো প্রধান চরিত্রই জগদীশ গুপ্তের বিশেষ মানসিকতার ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। গল্প-আরম্ভেই কৃষ্ণকান্ত চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। সম্পূর্ণ বিষয়ী, ধূর্ত মানুষ কৃষ্ণকান্ত। ভূতনাথের বুদ্ধিহীনতার ব্যাখ্যায় স্ত্রী মাতঙ্গিনীকে যে গল্প শোনায়, তাতে তার নিজের সাংসারিক যাবতীয় কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান বিষয় যে অত্যন্ত প্রখর, সচেতন—প্রমাণ মেলে। সেকালে এবং সম্ভবত একালের সমাজ-ব্যবস্থাতেও যে কোনো বিষয়ী, হিসেবি, অর্থলোভী পিতার কাছে কন্যা নয়, পুত্রই একটি বড় ব্যবসায়িক মোটা মূলধনের মতো। পুত্রকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ করার কারণে কলাপ ও মুগ্ধবোধ শেখানোর প্রয়াস, তার বিবাহদানের আগে প্রখর বিষয়বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে পুত্রের গুণ ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও কৌশলপূর্ণ মিথ্যার প্রচার, একের পর এক সম্পূর্ণ অমানবিকভাবে পুত্রবধূদের জীবননাশ—তার সেই কাঙ্ক্ষিত মূলধনকে যথাযথ খাটানোর প্রয়াসকেই সত্য করে। পাটের ব্যবসায়ে মুনাফার লাভ-লোকসানের ওপরেই ভূতনাথের দ্বিতীয় স্ত্রীর সাংসারিক মূল্য ও অস্তিত্বের গুরুত্ব যাচাই হয় কৃষ্ণকান্তের কাছে।

"পয়োমুখম্" গল্পে প্রধান চরিত্র কৃষ্ণকান্তের যে জগৎ, জীবন, মানুষ ও মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, তা-ই যেন জগদীশ গুপ্তের জীবন ব্যাখ্যার উপযোগী বিশেষ দৃষ্টির অনুগ। এ-সংসারে মানুষের স্বভাবই তার নিয়তি। দ্বিতীয় স্ত্রী অনুপমার মৃত্যুর পর ভূতনাথ পুনর্বার বিবাহে তীব্র অনীহা জানালে কৃষ্ণকান্তের যুক্তি :

> '....স্ত্রী হইয়াছে আজকালকার লোকের যেন মহাগুরুর সেবা ; একটির নিপাতেই সে সম্পর্কে আর কাহাকেও যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে না।...
> আগেকারটা? সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

> ...চলাচলম্ ইদম্ সর্বম্—মরিবে সবাই, দু'দিন আগে, দু'দিন পরে। মূর্খ আর কাকে বলে?...স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে—ইহা কোন শাস্ত্রের কথা?...এই সৌখীন সন্ন্যাসের ভান আধুনিকতার ফল, যেমন ব্যাপক, তেমনি অসহ্য! মানুষ মরে বলিয়াই ত পৃথিবীতে মানুষের স্থান হয়, নতুবা এতদিন মানুষকে দলে দলে যাইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত!....'

কৃষ্ণকান্তের এমন জীবনদর্শনে তার আত্মপক্ষের সমস্তরকম সক্রিয়তার সমর্থন মেলে। ১. সেকালের একজনের একাধিক বিবাহের সুযোগ গ্রহণ সফলতার মুখ দেখাবেই। ২. মৃত যুবতী স্ত্রীর জন্য যে কোনো রোমান্টিক প্রেমানুভব প্রেমিক, মানবতাবোধে বিশ্বাসী স্বামীর পক্ষে অর্থহীন। এ জাতীয় আধুনিকতার বিরোধী কৃষ্ণকান্ত। ৩. মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু অবধারিত, তাই মৃত্যুচিন্তা ও ক্ষণস্থায়ী জীবন-ভাবনা মানুষকে তো বিষয়-ভাবনা সম্পর্কে উদাসীন, নিরাসক্ত-চিত্তই করে। অথচ কৃষ্ণকান্ত এর বিপরীত!

কিন্তু সেই কৃষ্ণকান্ত চরম আঘাত পায় একদিন নিজের পুত্রের কাছ থেকেই। এ আঘাত শুধু অপমান নয়, পুত্রের নিজের হাতে বাড়িয়ে দেওয়া বিষের বিষাক্ত মরণযন্ত্রণাকাতর জ্বালা। এতদিন যে পিতা নিজের সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে অন্যের সন্তানদের জন্য মারণযজ্ঞে নিবিষ্ট ছিল, আজ সেই পিতাই নিজের সন্তানের হাত থেকেই মৃত্যুর নির্দেশক বিষ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তার সমস্ত বিষয়-কামনা, অর্থসঞ্চয়, পুত্রস্নেহ-দুর্বলতার নামে স্বার্থসর্বস্ব সক্রিয়তা, যাবতীয় অমানবিক চিন্তাভাবনা, তার সাংসারিক জীবনধারণ-উপযোগী অস্তিত্বের মূল ধরে টান দেয়, সমস্ত কিছুই নিষ্ফল করে আত্মজের কাছ থেকে পাওয়া সকল ঘৃণাই তার বাকি জীবনের একমাত্র পাথেয় হয় তখন। যে মানুষটি 'তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুজিয়া সট্‌কা টানিতেছিলেন'—সে-ই তার নিজ পুত্রের সামনে কণ্ঠ নিঃশব্দ করে অপরিসীম ত্রাসে থরথর করে কেঁপে ওঠে।

স্নেহের ছলে পিতা কৃষ্ণকান্ত এ গল্পে হয়েছে গোপন আততায়ী, আর পিতৃভক্তি থেকে ক্রমশ পুত্র ভূতনাথ হয়ে উঠেছে বুঝি পিতার জীবিত অবস্থায় তার শ্রাদ্ধের আয়োজক। সেই পিতৃভক্ত সন্তান পিতার হত্যাকারী হতেও নির্দ্বিধ। "পয়োমুখম্" গল্পে দুই চরিত্রেরই স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে শিল্পের দিক থেকে। ভূতনাথ গোড়া থেকে পিতার ভাবধারার বিরোধী। প্রকাশ্যে বাদ-প্রতিবাদও করেছে পিতার শিক্ষাদান-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। প্রথম মণিমালিকার সঙ্গে বিবাহে সে পিতার বশংবদ। মণিমালিকা ন'বছর বয়সের বালিকা। সে ছিল খেলার সাথী মাত্র। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহে ভূতনাথ পিতার বিরোধী হয়নি। দ্বিতীয় বিবাহে স্ত্রী অনুপমা হয় যথার্থ যৌবন-সঙ্গিনী। তাই তারও দুঃখজনক মৃত্যু ভূতনাথের মানবিক ও সুগভীর রোমান্টিক প্রেমের স্মৃতিতে কান্না-ক্লান্ত নৈরাশ্যের জন্ম দেয়। আবার অনুপমার মৃত্যুর পর তৃতীয় বিবাহের কালে ভূতনাথ এক পরিবর্তিত, অভিজ্ঞ পুরুষ। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন তার তৃতীয় বিবাহদান তাকে বয়স্ক করে, তেমনি অনুপমার প্রেমের স্মৃতিও তাকে গভীরভাবে জীবন, জগৎ, সংসারকে বুঝতে সহায়তা করে। ভূতনাথের অভিজ্ঞতার তিন 'ডাইমেন্‌শান্'।

এই কারণে গোপনে তার শ্বশুরের কাছ থেকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে পিতা কৃষ্ণকান্তের নিয়মিত অর্থ-গ্রহণের ঘটনার সুগভীর তাৎপর্য দু'দিক থেকে ধরতে পারে ভূতনাথ। তার আবার বিবাহ দেওয়া ও অর্থ-আদায়ের কৌশল এবং সেই কারণেই বীণাপাণিকে জগৎ থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস—দুই-ই একদা সত্য হতে পারে। এই অভিজ্ঞতাই গল্পের সমাপ্তি টানে, ভূতনাথকে পিতৃদ্রোহী করে। মানবিক বোধ ও নিজ কর্তব্যভাবনায় গল্পের শেষে ভূতনাথ সক্রিয় হয়, সক্রিয় হয়ে ওঠে সর্বাধিক। তার যাবতীয় সক্রিয়তা তার শিল্প পরিণতির সম্যক পরিচায়ক।

"পয়োমুখম্" গল্পের অন্য পার্শ্ব-চরিত্রগুলির মধ্যে মাতঙ্গিনী প্রধান। মাতঙ্গিনী সহজ সরল বাঙালি বধূ ও মা, স্বামীর ওপরেই সমগ্রভাবে নির্ভরশীলা। পুত্রস্নেহ তার অলংকার এবং সেই সূত্রে পুত্রবধূদের জন্য তার যাবতীয় ভাব-ভাবনা, ভয়-সংশয়, অস্থিরতা-চাঞ্চল্য তার অন্তর্নিহিত সারল্যের সঙ্গেই সংমিশ্রিত থেকেছে, নিজের সুখ-দুঃখকে একান্ত কাম্য মনে করেনি। তার বধূজীবন ও মাতৃজীবন সেই স্বামী-পুত্রধন্য সংসারের জন্যই যেন নিবেদিত। মণিমালিকাকে শাসনে-আবদারে পুত্রবধূর থেকে কন্যার মতো সামলায়, অনুপমার দুরন্ত স্বভাবকে তার পুত্রের প্রতি শান্ত করার অভিপ্রায়ে ঊর্ধ্বের দয়া-ভিক্ষায় নিমগ্ন হয়। তৃতীয় বধূ বীণাপাণিকে সভয়ে চির-আয়ুষ্মতী হওয়ার আশীর্বাদও পুত্রের কথা ভেবে, অতীত সকরুণ ঘটনাগুলির আশঙ্কায় স্থির হয়ে যায়। কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র দেবনাথ গল্পের মধ্যে অতি অল্প পরিসরে নিজেকে সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী, কিছুটা অকালপক্ক রূপেই উপস্থিত করেছে। মণিমালিকার বালিকাসুলভ যাবতীয় আচার-আচরণ, অনুপমার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জিদ ও বুদ্ধি-সচেতনতা, বীণাপাণির নিজের রং ময়লা বলে স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচ ও শাশুড়ি-প্রীতি—তিন বধূর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম, ভাবনা ও অস্তিত্বের চেহারার মূলে আয়নার মতো আছে নিষ্পাপ-সুগভীর সারল্য। শেষ পর্যন্ত বীণাপাণি স্বামীর বুদ্ধিনৈপুণ্যে অর্থাৎ স্বামীভাগ্যেই বুঝিবা পশুসদৃশ অর্থলিপ্সু শ্বশুরের হত্যার মূল লক্ষ্য থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু কাহিনীর শেষ মুহূর্তেও স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনে স্বামীর উদ্বেগে ও কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতায় তার এতটুকু অবিশ্বাস আসেনি সংলাপে, বরং সারল্যই তার স্বভাবে স্তূপ রচনা করে। জগদীশ গুপ্ত মূল লক্ষ্য কৃষ্ণকান্তকে যথাযথ চিত্রিত করতে বসে অন্য চরিত্রগুলিকে বিপরীতে রেখে গল্পের শৈল্পিক আকর্ষণকে তীব্র-সুন্দর করেছেন।

তিন

"পয়োমুখম্" গল্পের রচনাভঙ্গি জগদীশ গুপ্তের নিজস্ব। এ গল্পে কাহিনী আছে, ঘটনাও আছে বড় রকমের, কিন্তু সবই যেন আয়না হয়ে ধরে আছে প্রধান কৃষ্ণকান্তের চারপাশে। ঘটনাবৃত্তান্ত চরিত্রের একমুখিতাকে নিশ্চিত করেছে। গল্পের শেষে কাহিনী-বৃত্ত ঘটনাকে নির্ভর করে কৃষ্ণকান্তের জন্যই পুত্র ভূতনাথের চরিত্রায়ণ বড় ভূমিকা নেয়। কাহিনীর গতিময়তার এই ভূমিকা অন্যথা পরিবর্তনে নতুন হয়নি, সারা গল্পে স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবে শিল্পসম্মত হয়েছে।

জগদীশ গুপ্ত গল্পের আরম্ভ এমনভাবে এঁকেছেন যার মধ্যে আছে গল্পের ও লেখকের মূল লক্ষ্যের সুসমঞ্জস পরিচয় :

> 'ভূতনাথ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে; কিন্তু কলাপই বলুন, মুগ্ধবোধই বলুন, পাঠে তেমনি ভক্তি কি আগ্রহ আর নাই। মাঝে মাঝে সে ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ বিশ্রী করিয়া ব্যাকরণের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।
>
> .....
>
> ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কবিভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন।'

লক্ষণীয়, গল্পের উপস্থাপনা থেকেই সমগ্র গল্পের সুনিশ্চিত উদ্দেশ্য-মুখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে অবলীলায়। পিতা কৃষ্ণকান্ত ও পুত্র ভূতনাথ যে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ—যার ভিত্তিতেই সমগ্র গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা—গল্পটির উপরিউক্ত প্রথম দিকের পরিচ্ছেদের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা তাই বুঝিয়ে দেয়। গল্পের আরম্ভেই গোটা গল্পের মূল লক্ষ্যের প্রচ্ছন্ন রূপ! ভূতনাথের লেখাপড়ায় প্রবলতম অনীহা তার ব্যাকরণের প্রতি মুখবিকৃতি প্রদর্শনে স্পষ্ট। অথচ পিতা কৃষ্ণকান্তের নিবিষ্ট শিক্ষাদান প্রয়াসে ক্ষান্তি নেই। "পয়োমুখম্" গল্পটির মধ্যে কৃষ্ণকান্তের দাপট ও ক্রমশ ভূতনাথের বিবাহিত জীবনের দুর্ভোগ, দুর্দশা ও দুর্দশামুক্তির নানান স্তর—এসবের মধ্যে যে করুণ ট্র্যাজেডি, তাই জগদীশ গুপ্তের লক্ষণীয় বক্তব্য। বিরোধের সূক্ষ্ম রেশ গল্পের প্রণয়চিত্রে ও বাক্যে থাকায় লেখকের গল্প রচনার শৈল্পিক কৌশল পাঠকদের ক্রমশ গল্পপাঠে নিবিষ্ট রাখে।

"পয়োমুখম্" গল্পের সর্বশেষ বাক্যেই আছে গল্পের ক্ল্যাইম্যাক্স। এই রীতি কল্লোলের কালে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হত ছোটগল্প লেখকদের রচনায়। যদি একান্তভাবে কাহিনী ও ঘটনানির্ভর গল্প হত "পয়োমুখম্", তবে তা-ও ব্যঞ্জনায় শেষ হলে লেখক হয়তো এই বাক্যে শেষ করতে পারতেন : 'বলিতে বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন-প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যেন বাঁচিলেন।' কিন্তু গল্পটি কাহিনী ও ঘটনানির্ভর আদৌ নয়, তাছাড়া গল্পকার জগদীশ গুপ্তের বিশেষ মনোভঙ্গিটি ভিন্ন গোত্রীয় বলে 'কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি অতো সুলভে নিষ্কৃতি পায় না।....' এমন পরবর্তী বাক্য-বন্ধ রেখে লেখক গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনাকে অন্যত্র টেনে এনেছেন। এর সঙ্গে গল্পকারের জীবনদৃষ্টি জড়িত। বাবার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে যেখানে লেখক বীণাপাণির খাটের পায়ার কাছে ঢেকে রাখা ওষুধসহ 'ভূতনাথ ঔষধের খল লইয়া বাহির হইয়া গেল।'—মন্তব্য করে একটি ঘটনায় শেষ টেনেছেন, সেখানেও হতে পারত, কিন্তু লেখকের লক্ষ্য কৃষ্ণকান্ত চরিত্র এবং পুত্রের হাতেই পিতার জীবন-মনে নির্মম-নির্দয় প্রহার প্রদর্শন, তাই লেখকের নিরাসক্ত জীবন-ভাবনা দুই বিপরীত ভাবের বাক্যপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে গল্পের ক্লাইম্যাক্সের সার্থকতম ব্যঞ্জনা দিতে পেরেছে। তৃতীয় পুত্রবধূর আসন্ন মৃত্যু স্থিরনিশ্চিত জেনে কৃষ্ণকান্তের মানসিক সুখ-শান্তির চিত্রটি এই রকম : 'কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুজিয়া সট্‌কা

টানিতেছিলেন—'। আর এর বিপরীতে পিতার প্রতি পুত্র ভূতনাথের সেই অমোঘ ব্যঞ্জনাগর্ভ তীব্র ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ : 'এ বৌটার পরমায়ু আছে তাই কলেরায় মরল না, বাবা। পারেন ত নিজেই খেয়ে ফেলুন। বলিয়া সে ঔষধ সমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।' কৃষ্ণকান্তের জীবন-নিয়তি এমনি নির্ম্মম, নিরাসক্ত।

চার

"পয়োমুখম্" গল্পের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ কৃষ্ণকান্তের পৈশাচিক চরিত্রস্বভাব প্রকাশের পক্ষে যথোপযুক্ত, সার্থক শিল্পসম্মত। ভাষায় কোথাও এতটুকু আবেগ নেই, নেই অতিরেক। লেখক সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, নিজেকে কোনো ভাবেই গল্পে ব্যবহার করেননি। রচনায় আছে কাঠিন্য এবং সেই সঙ্গে শিল্পের সুষম সংহতি। গল্পটি আদ্যন্ত সাধু গদ্যে লেখা। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে আছে কথ্য, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুরস-সমৃদ্ধ ভাষা। একাধিক মৃত্যু ঘটনা বর্ণনায় লেখকের নিরাসক্তি তান্ত্রিকের মতো। মণিমালিকার মৃত্যু বর্ণনা : 'শেষ রাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দুটার সময় মণির নাড়ী ছাড়িয়া গেল। .... সিঁথিভরা সিন্দুর লইয়া, লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া, আলতায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি মণি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।' এই বর্ণনায় লেখকের নিজস্ব কোনো আবেগ, ভাবালুতা, দুঃখবোধ, হাহাকার ব্যক্ত হয়নি। ঠিক এই ভাবেই অনুপমার মৃত্যুচিত্র অঙ্কিত : 'সেইদিনই ভোর রাত্রে ভেদ আরম্ভ হইয়া বিকাল নাগাদ তার ধাত্ বসিয়া গেল।....অনুপমা মণিমালিকার অনুগমন করিল।' লেখকেব এমন গদ্যভঙ্গি-নিহিত নিরাসক্তিই আধুনিক বাস্তবতার পরিচায়ক।

গল্পটির ভাষা আগাগোড়া তীব্র-তীক্ষ্ণ শ্লেষ দিয়ে মোড়া। সম্ভবত সাধুগদ্যই শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় অবলীলায় এবং অবধারিতভাবে বুকের গভীরে ঘা দেবার ক্ষমতা রাখে। ব্যঙ্গ ও শেষ মূলত বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে নির্ভর করেই সার্থক রূপ পায়। 'মেধা মানবজাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয়', 'কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারিতে পরের ঘরের অতগুলি টাকা আদায় হয় না....', 'চতুর্থতঃ—যাক উহারাই কি যথেষ্ট নহে?—', 'কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পুনরায় বিবাহ দিলেন। বলিলেন,—স্বয়ং শিব দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন।...কিন্তু অশৌচ মুক্তির পর অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী স্থির হইয়া গিয়াছিল কিনা তাহা তিনি উল্লেখ করিলেন না।'—এমন সব বাক্যে শ্লেষ শিল্পরসে স্বতঃস্ফূর্ত। বাক্যনিহিত কোনো কোনো শব্দ ব্যবহারে জগদীশ গুপ্ত একেবারে কথ্য 'ককনি'-কে সহজেই প্রয়োগ করেছেন, যেমন 'বিদ্যালয়ের তানানানা করিয়া কাটাইয়া'। এখানে 'তানানানা' শব্দ আভিধানিক নয়।

সমগ্র গল্পে বর্ণনার কোনো বাহুল্য নেই, শ্লেষে বরং রুক্ষ হয়েছে ভাষা। লেখকের নিরাসক্তি গদ্য ও তার ভাষাভঙ্গিকে চাঁছাছোলা করেছে। ঠিক যতটুকু বলা দরকার, তার অতিরিক্ত জগদীশ গুপ্তের গদ্যে নেই। রূঢ় বাস্তবতার এটিও অন্যতম শর্ত। কাব্যিকতা করেননি লেখক। জীবন ও মানুষের গড়া জগৎ-সংসারের রূপায়ণ ও ব্যাখ্যা জগদীশ

গুপ্তের হাতে কল্লোলের কালে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। জীবনের গভীরে আছে বেগ, আদিমতা, বিস্ময়কর রহস্য, কিন্তু মানুষের ব্যবহারে, প্রয়োজনে সে জীবন আবৃত হয়। জগদীশ গুপ্ত সেই কৃত্রিম জীবনের কৃত্রিমতাকে প্রকট করে এঁকে গভীর জীবনের রহস্যময়তাকে, অন্ধ-স্বভাবকে কাছের মানুষের পেশা-নেশায় রঞ্জিত করে নিস্পৃহ চোখে দেখেছেন, দেখিয়েছেন আমাদের। এখানেই 'পয়োমুখম্' গল্পে লেখকের জীবন-দৃষ্টির অনন্যতা। এমন নিস্পৃহতার প্রয়োজন ছিল শিল্পীর পক্ষে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে যে সমাজ ভঙ্গুর, অবক্ষয়ের স্বভাবে চিহ্নিত, তাকে আঁকতে বসে কঠিন নিরাসক্তির প্রয়োজন। এই নিরাসক্তি, বিষয় ও বর্ণনার নির্মমতাই কল্লোলের সময় ধরে, পরে সম্যক গ্রহণ করে 'নীলকণ্ঠ' হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত রচনায় ও জীবনধর্মে। জীবনবোধে জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়েও আত্মার আত্মীয়—এই অর্থে সমকালীন কাব্যভাবনায় কবি জীবনানন্দ দাসও।

পাঁচ

"পয়োমুখম্" গল্পটির নাম ব্যঞ্জনাত্মক। এমন নামের লক্ষ্য প্রধানত কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণকান্ত কবিরাজই। সংসারী মানুষ এই কবিরাজ। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তার সংসার। বড় ছেলের বিবাহ দিয়ে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে, তার প্রতি স্নেহ বর্ষণ করে কৃষ্ণকান্ত স্বাভাবিক সাংসারিক মানুষের মানবতারই পরিচয় দেয়। সংসারে বন্ধন তো মানবিক মায়াতেই। সংসারে রোগ-শোক-জরা আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত্যুর দুঃখ ভুলে যায় মানুষ চলমান জীবনকে সবেগে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়েই। পুত্রের একাধিক বিবাহদান তার সাংসারিক দায়িত্ব পালনের প্রধান দিক। পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্য তা কর্তব্যের ও দায়িত্ব পালনেরও সম্যক পরিচায়ক। এটাই বাস্তবসম্মত জীবনের প্রেক্ষাপট। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের অর্থলোভ, তজ্জনিত পৈশাচিক ক্রিয়াকাণ্ড, তার সমস্তরকম গোপনতম কর্মতৎপরতা তার জীবনের অন্যদিক দেখায়। সে নিজে কবিরাজ হয়ে, মানুষের জীবনদানের ব্রত গ্রহণ করে, ব্রতভ্রষ্ট হয় রোগীর অমোঘ মৃত্যু এনে দিয়ে। যথাসর্বস্ব এ জীবন তার বিষাক্ত জীবন। এমন সাংসারিক জীবন তার 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্'কে সত্য করে।

দ্বিতীয়ত, জগদীশ গুপ্তের জীবন-দৃষ্টিতে জীবন-স্বভাবের দুটি দিক স্বীকৃত—একটি আদিম অ-সংস্কৃত সরল জীবন, আর একটি মানুষের প্রয়োজনে গড়া কৃত্রিম জীবন। মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীব। সে কৃত্রিম জীবনকেই একমাত্র সত্য ভেবে সমস্ত লোভ-স্খলন-পতন দিয়ে জীবনকে বরণ করে সুখী থাকে, তৃপ্ত হয়। অথচ মূলীভূত জীবন-সত্যে তা মিথ্যা, ফাঁকা, ফাঁপা। কৃষ্ণকান্তের আচরণে আছে সেই নিয়তিনির্দিষ্ট ফাঁকা-ফাঁপা জীবন-স্বভাবের অভিনন্দন, কিন্তু সে স্বভাব একদিন নিষ্ফল হবেই। সে জীবন "পয়োমুখম্"-এর যে সত্যকে দেখায়, তা জীবন-সত্য নয়, তা কৃত্রিম জীবনের নিয়তি। জগদীশ গুপ্তের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এই সত্যই গল্পের নাম ব্যবহারে স্পষ্ট ও সার্থক।

২.

শঙ্কিতা অভয়া

এক

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের একটি গল্পগ্রন্থের নাম 'মেঘাবৃত অশনি', প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৫৪ সালে ইংরেজি ১৯৪৭-এ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের দু'বছর পরে। এই গ্রন্থভুক্ত অন্যতম একটি গল্পের নাম 'শঙ্কিতা অভয়া'। এই গল্পটিকে একসময়ে উপন্যাসে রূপ দেন লেখক—নাম হয় 'নিষেধের পটভূমিকায়'। আবার এমন উপন্যাস রূপ থেকে স্বয়ং লেখক ওই উপন্যাসের নামেই এর নাট্যরূপ দেন। স্ত্রী চারুবালা দেবীর আনুকূল্যে নাটকটির পাণ্ডুলিপি জীর্ণ অবস্থায় পরে মেলে।

যে গ্রন্থ 'মেঘাবৃত অশনি' গল্প সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭-এ, স্বভাবতই একথা প্রমাণ হয়, তার গল্পগুলি অন্তত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের বছর দু'য়েকের মধ্যেই লেখা হয়ে যায়! অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পটিব প্রকাশও চল্লিশের দশকের যুদ্ধশেষের সময় ধরেই। একই গল্পের উপন্যাসরূপ ও নাট্যরূপ দিতে যখন লেখক স্বয়ং উৎসাহী ছিলেন, তাতে প্রমাণ হয়, গল্পটিব কেন্দ্রীয় বক্তব্য এবং চরিত্র ও প্রকরণে এমন এক অন্তর্গূঢ় ভাবনার বিন্যাস ছিল, যা জগদীশচন্দ্র গুপ্তকে গল্পটি ধরে বিভিন্ন প্রসাধনে রূপাবয়ব দেওয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণিত করে। 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে আছে তিনটি চরিত্র—স্ত্রী অভয়া, স্বামী অতুল ও তাদের মেয়ে সপ্তদশী শান্তিময়ী। এদেব ত্রিভুজ কাহিনী অবয়বে আছে এক গোপন দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা। যে গল্প থেকে এই উপন্যাসের সম্প্রসারিত রূপ—তা হল 'শঙ্কিতা অভয়া'। অভয়া ও অতুলের গোপন সম্পর্কের কথা মেয়ে শান্তির কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরই দুটি বাক্যে লেখক গল্প শেষ করেছেন। উপন্যাসে শান্তির সক্রিয়তা ও পরিণতি চিত্র অনেক বেশি প্রসারিত রূপ পায়।

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে প্লটের জটিলতা আছে, কিন্তু কাহিনীর সূত্রনির্দেশ ও গঠন চরিত্র তিনটির মনোধর্মের টানাপোড়েনে নিখুঁত অন্তঃশীল। মেয়ে সপ্তদশী শান্তি যথার্থ অর্থে সুশ্রী, তন্বী, শারীরিক গঠনে পূর্ণরূপা, সুস্থ এবং বয়সোচিত চঞ্চল। মা অভয়া মেয়ের এই রূপসৌন্দর্যের বিকাশে উদ্বিগ্ন, ভয়-ব্যাকুল। মাঝে মাঝে আপন বিভ্রান্তির মধ্যে অভয়া নিজের চাপা আতঙ্ক ও শিহরণে আত্মহননের কথাও ভাবে। যৌবন বয়স হলে, মেয়ে বেশি সপ্রতিভ, হাসিখুশির হয়ে উঠলে যে কোনো বাঙালী মায়েব দুশ্চিন্তা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া বাবার সামনে মেয়ের নানা বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা অভয়া পছন্দ তো করেই না, সন্দেহ করে, ভয়ও পায়। বাবার সঙ্গে যাবতীয় আলোচনা মা অভয়ার কাছে উদ্ভট ও উৎকট মনে হয়। অশরীরী প্রেম, পরকিয়া প্রেম ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রচ্ছন্ন যৌনতা, চুম্বন, আকর্ষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শান্তি বাবার সঙ্গে প্রকাশ্যে তর্ক করে। বাবা অতুল মেয়ের সঙ্গে যাবতীয় আলোচনায় খোলামেলা, একেবারে মুক্তমন! শান্তি এই আলোচনায় বাবার কাছে জিততে চায়।

এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি মা অভয়ার। মেয়ের সঙ্গে এই সব আলোচনায় অভয়া

স্বামীকে সন্দেহ করে। পিতা-পুত্রীর এমন তর্কে কোথায় যেন ঢাকা আছে অবৈধ মতিচ্ছন্নতা! প্রকাশ্যে এসে মেয়ে ও স্বামীর সামনে শাসনের তর্জনী তোলে। মেয়ে শান্তির সহাস্য প্রতিবাদ : 'মা একেবারে ষোলো আনা সেকেলে,... মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকে; যতো গ্লানি, অপরাধ আর দুষ্টামি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুন। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করবো কেন? শিক্ষা নেবো না?'

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যবয়সী অতুল সুস্থ শরীরের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ। বাবা মেয়েকে কেতাবি বিদ্যা শেখায়, মেয়েও বাবার এসরাজ বাজানোর অনবদ্য হাতের তারিফ করে বাবার প্রতিভার প্রশংসা করে, আরও শিক্ষিত করে তোলে। বাবাকে সুরে, ছন্দে, সৌন্দর্যে প্রাণিত করতে এক অপরাহ্ণে বাবার সামনেই মুক্ত নাচের স্ফুরন্ত তালিম দেয়। নৃত্যের মধ্যে, বাবার এসরাজ ধ্বনির মোহে শান্তি যেন পুরুষ সম্পর্কহীন জাগ্রতা নারীর দুর্নিবার আত্মপ্রেমে, আত্মাদরে ও আত্মবিকাশে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যের শেষে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যময় উপশমে অভয়া স্বামীর কাছে আসে মেয়েকে সরিয়ে কিছু গোপন কথা বলতে। পিতা-পুত্রীর আচরণে জ্বলতে থাকে সে। মেয়ের বাধায় অভয়ার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

শান্তির বিদেশি বইপত্তর পড়া, সবল আনন্দের জন্য তৃষা অভয়া বোঝে না। ক্রমশ বাবাকে নিয়ে শান্তির চোখে দেখা মায়ের গোপন ভয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে শান্তি। তার একমাত্র প্রশ্ন মায়ের কাছে, বাবাকে নিয়ে মায়ের বিপদ ও ভয়ের ভাবনাটা কি—তাতে বাবার কোনো চরিত্রদোষ আছে কিনা শান্তির মায়ের কাছে সেটাই জিজ্ঞাস্য! প্রশ্ন তোলে কি কারণে মা-বাবাকে নিয়ে শান্তিরা সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব থেকে নির্বাসিত জীবন কাটায়। অভয়া মেয়েকে তার বাবার কাহিনী পরে জানাবে কথা দিলেও শান্তির অতৃপ্তি কাটে না। অভয়ার নিজ স্বামীর অতীত উন্মোচন-বাসনার মুহূর্তে অতুল মায়ের প্রশ্নের সামনে বিপন্ন বোধ করে। মেয়ে বাবার অসহায়তা দেখে এড়িয়ে যায়—বাবাকে অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য। পরে রাস্তায় একদিন বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে এক ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে বাবার তাকে এড়িয়ে যাওয়ার বিফল প্রয়াস ও মানসিক অবস্থার কথা শান্তি সরলভাবে জানায় মায়ের কাছেই। কাহিনী এইভাবে গল্পের শেষ দিকে অতুলের বানানো মিথ্যা উচ্চহাসির উপেক্ষায় ও অভয়ার বিষণ্ণ বিবেক দংশনে সত্যতায় পরিণামী স্বভাব পায়।

গল্পের চাপা কাহিনীর শেষ এক রাতে—যেদিন অতুল মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় যায়, দেরিতে ফেরে, আর অভয়ার সন্দেহ বিকৃত রূপে চরম পর্যায় আনে। সিনেমায় দেখা গল্পের কথায় অভয়া মেয়ের সামনেই অতুলের চরিত্রদোষের কথা তোলে। সরল নিষ্পাপ শান্তির সন্দেহ চরমে ওঠে। গভীর রাতে বিছানা থেকে শান্তিকে ডেকে এনে অভয়া ঘুরিয়ে বলে, ওর বাবা ওকে নষ্ট করেছে কি না। শান্তি প্রথমে মায়ের কথার মধ্যে বাবার প্রসঙ্গের কারণ, সত্যতা বুঝতেই পারেনি। শান্তির মনের মধ্যেকার ভারী পাথরের মত অনড় অবিশ্বাসের সামনে সন্দেহ-জর্জরিত অভয়ার এক এক করে স্বামীর স্বভাব-উন্মোচনের ছবি গল্পে এইরকম :

'''ও ইচ্ছে করলে যে-কোনো স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে।'

'তুমি সত্যিই খেপে গেছো মা,—একেবারে উন্মাদ হয়েছ। নইলে এমন অশ্রাব্য কথা তোমার মুখে বেরলো কি ক'রে? বাবা চরিত্রহীন, একথা তুমি অনেকবার বলেছ; কিন্তু এ কী কথা তোমার মুখে! বাবা—'

বাধা দিয়া অভয়া বলিল, 'ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়; তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম......'

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে নিঃশব্দ হইয়া গেলো—

শান্তির একটা নিঃশ্বাস পতনের শব্দ হইল— তারপর চরম নিঃশব্দে একটি-একটি করিয়া গভীর রাত্রির মন্থর মুহূর্ত কাটিতে লাগিল।'''

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পটির সর্বশেষ এমন নিবিড় নিঃসঙ্গ ব্যঞ্জনা সমগ্র গল্পের অন্তঃশীল শিল্প-শক্তির মূল্যবান নিদর্শন। আলোচ্য গল্পটি প্রধানত 'থীম'-নির্ভর গল্প। মনোলোকেই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুটি নির্মিত হয়েছে অতুল-অভয়া-শান্তি—তিনটি চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েনে। যে মনের বিকাশে অভয়ার মধ্যে সন্দেহ ও ভয় জটিলতা পায়, অতুলের সংস্কৃতি-শিল্পভাবনা এক সুস্থ সবল পরিকাঠামো সামনে আনে, শান্তির যে মানসিকতায় এক নিষ্পাপ, বিশুদ্ধ জীবন-স্বভাব রূপ পেতে থাকে, তাকে গল্পকার রূপ দিয়েছেন একমাত্র অভয়া-অতুলের নিজস্ব অন্তরালবর্তী স্বামী-স্ত্রী, এক অর্থে, সন্দেহ সম্ভাবনার নষ্ট দাম্পত্যের সূক্ষ্ম সুতোয় জড়িয়ে রেখে। শান্তি অতুলের রক্তসম্বন্ধের সন্তান নয়, সুতরাং অতুলের সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক-ভাবনায় অভয়ার সন্দেহ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায়, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ধরে অবচেতন মনের ঘন অন্ধকারে স্বাভাবিক ঘটনা-বিস্তারের বৈশিষ্ট্য পেতেই পারে।

তাই অভয়াকে নিয়ে অতুলের পালিয়ে আসা ও নিজস্ব সংসার গড়া দিয়ে প্লটের প্রাথমিক মুখ খোলে। সঙ্গে অভয়ার মেয়ে—যে ক্রমশ বড় হয় অতুলের স্বামীত্বে অভয়ার মাতৃত্বের পরিচর্যায়, তার মধ্যে প্লটের জটিলতা আর এক নতুন সূত্রের জন্ম দেয়। অতুল স্বচ্ছ মনে, শিক্ষিত জীবন সূক্ষ্ম জীবনবোধে শান্তিকে সঙ্গে নিয়েই নতুন সংসার বাঁধে। অভয়ার দ্বিতীয় সংসার প্রেমের সংসার—অন্তত অতুলের দিক থেকে নিশ্চিতই, সেখানে অভয়ার স্বভাবের limitation প্লটের মনস্তাত্ত্বিক ঘনত্ব স্বাভাবিক করে।

অভয়ার ঘোর অবিশ্বাস, অতুলের আচরণে একদা-প্রেমিক বর্তমানে স্বামী অতুলের প্রতি মনস্তাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ততার চাপ গল্পের প্লটকে যেমন চরম জটিলতা দেয়, সেই সঙ্গে গল্পের গতিকে করে তীব্র। অন্যদিকে সহজ সরল নিষ্পাপ শান্তির নিজেকে জানা, নিজেকে গড়ে তোলার যাবতীয় তৎপরতার মধ্যে অভয়ারই নিষিদ্ধ নষ্টভাবনা কন্যাচরিত্রটিকে কাহিনী তথা প্লটের দিক থেকে আর এক মাত্রা দিয়েছে। ১. অভয়ার বিকৃত সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভয়, ২. অতুলের মেয়েকে গড়ে তোলার নিষ্কলুষ সৃজনধর্মী মনের বিকাশ, ৩. শান্তির ক্রমশ আধুনিকোতম শিক্ষায় একজন সত্যিকারের নারী-ব্যক্তিত্ব হয়ে-ওঠা—এই তিন সূত্রের জটেই 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পের কাঠামোয় মূল থীমকে ঘিরে প্লট পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব।

গল্পে একে একে প্লটের গায়ে লেগে-থাকা কাহিনী ও ঘটনা পেয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বাতাবরণ। রহস্যের মতো অভয়ার বার বার অতুলকে সন্দেহ করার দিকগুলি, অতুলকে কখনো আড়ষ্ট, ভীত, বিবর্ণ করলেও, গ্রাস করতে পারেনি। বরং শান্তির মানস বিকাশে সরল মনের ওপরকার শক্ত বাদামের খোলাতে ধরিয়েছে অবধারিত চিড়। শান্তি অকপটে মায়ের কাছে, বাবার উপস্থিতিতেই এক সন্ধেয় রাস্তায় দেখা-দেওয়া বয়স্ক লোকের কথা বলেছে, যাকে আচমকা দেখে বাবার প্রতিক্রিয়া কি তারও ব্যাখ্যা দিয়েছে।..... 'নিরীহ সেই লোকটিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া তার বাবার পলায়ন করিবার সে কী চেষ্টা! তার বাবা চোর ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে.....'। এর আগে শান্তি প্রশ্ন তুলেছিল কেন তারা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের থেকে নির্বাসিত জীবন কাটায়? সবশেষে অভয়া গভীর রাতে শান্তিকে জানায় তার যথার্থ রক্তের সম্বন্ধের পিতার প্রসঙ্গ—যেখানে অতুল এই অর্থে অবৈধ পিতা। আমাদের মতে গল্পে জগদীশ গুপ্ত কাহিনী-চিত্রে অসাধারণ সংযম দেখিয়েছেন।

গল্পের প্লটে যে কাহিনীটুকু আছে তা প্লটের সঙ্গে জড়ানো। বাইরের কোনো বানানো ঘটনায় তার দীপ্তি নেই, মনের অবচেতন লোকেই তার একমাত্র গঠন-বন্ধনের আলোকময়তা। গল্পকার গল্পের শেষ ব্যঞ্জনার আগে ধীরে ধীরে শান্তির মনোলোকের আসন্ন বিষাদময়তার ছায়া রচনা করেছেন :

> ".....'মা, তোমাকেই আমি দোষ দিই। বাবার চরিত্র কু হলেও সে-ইঙ্গিত বার বার কেন করছ, আর আমার সামনে কেন করছ! আমাকে জানানো উচিত নয়।'
>
> 'তোকেও কুসংসর্গ দিচ্ছে—কেন বলবো না! পড়ায় তোকে কদর্য বই, নাচায়, কথা কয় খারাপ-খারাপ—আমি চুপ করে থাকব?'
>
> কিন্তু তারপরই তিনজন চুপ করিয়া রহিল—আনন্দে! আকাশ যেন দূষিত বাষ্পে খোলা হইয়া গেলো—এই নিরানন্দ আবহাওয়া শান্তিকেই আঘাত করিল বেশি।'"

এই যে চিত্র—এর মধ্যেই আছে পরবর্তী climax এর সীমাহীন বিষণ্ণতার পরিবেশ। বিষণ্ণতা (agony) যে গরল-স্বভাবী বিষ ক্ষরিত করে ধীর স্বভাবে, তা পান করেছে শান্তি নীলকণ্ঠ স্বভাবে—গল্পের অন্তিম নীরবতা তারই প্রতীকী বিস্ময়।

গল্পকার climax চিত্র এঁকেছেন শিল্পের সংযমে, শাসনে:

> "'বল্ সত্যি ক'রে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?'
>
> ...'নষ্ট করার মানে কী? আর "ও" বলে তুমি কার কথা বলছ?'
>
> 'ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেকে নষ্ট করার মানে বুঝিস্‌নে?'
>
> 'বুঝলাম। কিন্তু "ও" মানে কী?'
>
> 'অতুল।'
>
> ....'বাবার কথা বলছো?'
>
> 'হ্যা। ও ইচ্ছে করলে যে-কোনো স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে!'
>
> 'তুমি সত্যিই খেপে গেছো মা,—.......'
>
> 'ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়; তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম......'"

এই শেষতম বাক্যে গল্পের প্লটের প্রজ্বলিত প্রশান্তি। এর পর গল্পকার কোনো সংলাপ বসাননি। শান্তির অন্ধকার আকাশের মতো অসীম নীরবতা, একটি শ্বাসপতনের শব্দ এবং শেষের গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে শিশির পতন স্বভাবে শান্তির মনের মুহূর্ত সরতে থাকা ধীরে, অতি ধীরে। এই চিত্র শান্তির মনের ফাঁকা ফাঁপা অনিঃশেষ জীবন-উপলব্ধির প্রতীকপ্রতিম অভিব্যক্তি। এখানেই কাহিনী ও ঘটনা বজ্রকঠিন সংযম-সংক্ষিপ্তির মধ্যে প্লটের নিপুণ বুননে সবল শিল্প-সিদ্ধি।

দুই

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য, ভাববস্তু তথা লক্ষ্য (Theme) গল্পের শেষ দিকে—যেখানে বাবার সঙ্গে রাতে সিনেমা দেখার পর বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে বসে খাওয়ার মধ্যে মায়ের সঙ্গে অ-স্বাভাবিক তর্কবিতর্কের পর ঘুমের বিছানায় শান্তির একক আত্মচিন্তার ভাষ্যে মেলে : 'তাহার বাবা অবশ্য তাহাকে কুশিক্ষা দিতেছেন না—যে-সব কথাবার্তা তাঁহার সঙ্গে হয় তা এখন সর্বদেশেই সর্বজনীনভাবে আলোচিত হইতেছে—'। ভাববস্তুর প্রতিষ্ঠায় জগদীশ গুপ্ত অবশ্যই আধুনিক, প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনার আন্তর সমর্থক। শান্তিলতা তার গোপনতম মনস্তাত্ত্বিক চিন্তায় জানায় : 'মায়ের সেকেলে মনে আর শ্লীলতাবোধে তা আঘাত করিলেও মা খুব প্রকাশ্যে তাহাকেই শাসন কি সাবধান করে না—মায়ের যতো আক্রোশ বাবার প্রতি—যতো ভর্ৎসনা তাঁহাকেই......' এই ভাবনায় কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি ছোটগল্পের নিশ্চিত বিষয় হয়ে ওঠে। মেয়ে যতই বড় হতে থাক, তার সঙ্গে বাবা-মায়ের বন্ধুর মতো ব্যবহার করা উচিত। এটাই আধুনিকতম জীবন-সত্য। শিক্ষাদীক্ষা, আচার-আচরণ, প্রেম, যৌনতা ইত্যাদি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হলে মেয়েদের প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, যৌনচেতনা—সবই সুস্থ হয়ে ওঠে। গোপন নয়, খোলামেলা স্বভাবেই তার বিশুদ্ধি। শান্তি বাবার কথায় মায়ের যুক্তিতে তামাশা বলে সহাস্যে মেনে নেওয়ার দিক সমর্থন করে : 'মা একেবারে ষোল আনা সেকেলে; পাঁজির মতো কেবল নিষেধে পরিপূর্ণ। আটঘাট বেঁধে দেওয়া। '..... 'মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকে; যতো গ্লানি অপরাধ আর দুষ্টামি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুন। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করবো কেন? শিক্ষা নেবো না?' অর্থাৎ মূল লক্ষ্য—যা গল্পকার-নির্দিষ্ট, সেই ধারণায় প্রবল আঘাত হানে অভয়া। এই আঘাতেই গল্পের গতি ও চমৎকারিত্ব।

মূল ভাববস্তুতে গল্পকার আধুনিক, অভয়ার আঘাতে তৈরি হয়, উঠে আসে গভীর জটিল সংকট। বাবা-মেয়ের সম্পর্কে যে পরিচ্ছন্ন আধুনিকতা, যে সুস্থ সম্পর্কের অভিজ্ঞান, রক্তসম্বন্ধ না থাকলেও পুরুষ-রমণী সম্পর্কে যে বিশুদ্ধি, তাকে কলুষিত করে অভয়া। কিন্তু তাকে গতিপ্রাণ করেছে অভয়ার অন্য পুরুষ-প্রেমিক অতুলের সঙ্গে মেয়ে শান্তির হাত ধরে বেরিয়ে আসার ঘটনা। শান্তি রক্তের সম্বন্ধে অতুলের মেয়ে নয়, আর তাই অতুলের পিতৃত্বের আচরণে সন্দেহ স্বাভাবিক হলেও গল্পকার চিরন্তন নারীসত্তা ও পিতৃসত্তার মধ্যে এক পবিত্র, বিশুদ্ধ সম্পর্কের আলো তৈরি করেছেন, যা আধুনিকতার

আলো। অভয়া এর বিপরীত নারী। এই নারীই এতকাল পুরনো সমাজকে শাসন করে এসেছে, নতুন সমাজ তা মানবে কেন? নারী কেবল যৌনতার, দেহসর্বস্বতার যন্ত্র নয়, সে বন্ধু, সে সৌন্দর্যপ্রিয়া, চিরন্তন প্রেমিকা নিশ্চয়ই হতে পারে—যার মধ্যে মালিন্য নেই, প্রেরণা আছে, উৎকট উদ্দেশ্য নেই অমিয়ধারার মত লাবণ্য আছে। 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে গল্পকার তাকেই লেখনীমুখে একমাত্র সত্য করেছেন।

গল্পে অতুলের জীবনকে দেখার, নারী, প্রেম, সৌন্দর্য, লাবণ্য—এসবকে উপলব্ধি করার মধ্যেই অস্তিত্বের চরম সত্য নিহিত। অতুলের শান্তির সামনে বড় যুক্তি—যা শান্তির শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম সম্পদ, তা হল :

> 'নারীর উপর পুরষের অশেষ অক্ষয় আর তীব্রতম আধিপত্য ঐখানেই; পুরুষ জাগায় তবে নারী তার জীবনের পাত্র সুখের মধুতে পূর্ণ করে আর নিজেকে দান করে নিঃশেষ ক'রে। এটা হবেই; সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী করে রেখেছে ঐ নিয়মটি......।'

গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর সঙ্গে অতুল ও শান্তির একাধিক ভাব-ভাবনার বিনিময় গল্পের লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিয়েছে। তার মধ্যে অভয়ার participation গল্পের বৈপরীত্যজনিত শিল্পরসকে করেছে আকর্ষক। এভাবেই গল্পটি হয়েছে মূল্যবান এক সৃষ্টি।

তিন

জগদীশ গুপ্তের 'শঙ্কিতা অভয়া' একটি সার্থক চরিত্রপ্রধান গল্প। প্লটে টানা কোনো কাহিনী নেই, নেই কোনো এক বা একাধিক ঘটনার আকস্মিকতার চাপ। বাহিরের কাহিনীর সূত্রে ঘটনার হাত ধরে গল্পের প্লটের কাঠামো গড়ে ওঠেনি। তিনটি চরিত্রের টানাপোড়েন মূলত 'mental'। অবচেতন মনের রহস্যময় অস্থিত আলোক অন্ধকাব থেকে যে বোধের জন্ম ও বিস্তার, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অভয়া তারই আধারে সক্রিয়। গল্পের শেষে অভয়া মেয়ে শান্তিময়ীকে গভীর রাতে বিছানা থেকে তুলে এনে তার মোক্ষম কথাটি অতুলের বিরুদ্ধে শাণিত করে জানায় : 'ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়; তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম.....'

প্রথম স্বামীর সন্তান নিয়ে যে নারী পরে অতুলের মত দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গে কুলত্যাগ করতে পারে, সেই অভয়ার প্রাথমিক মানসবৈশিষ্ট্য গভীরভাবে আমাদের ভাবায়। **প্রথমত**, অভয়া অতুলকে নিয়ে যে প্রথম স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করে অবলীলায়, তাতে কি অতুলের প্রতি অভয়ার কোনো প্রেম-ভালবাসার, বিশ্বাসের, অথবা অন্তত প্রথম মোহের কোনো মাটি ছিল না? অতুলকে সে সময়ে বড় মাপের বিশ্বস্ত মনে হয়েছিল বলেই তো অভয়া একমাত্র মেয়ে শান্তিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল! **দ্বিতীয়ত**, অভয়ার যেমন ছিল দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি প্রেম, তেমনি নিজের মেয়ের প্রতিও গভীরতম স্নেহের অধিকারবোধে মানবিক টান! তাতে ক্রমশ দ্বিতীয় স্বামীর থেকে কন্যাস্নেহেই তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মজার প্রতি নিবিড় স্নেহ অতুলকে সরিয়ে প্রথম স্থানে চলে আসে!

এই দ্বিবিধ বিচারে দ্বিতীয় বিবাহের অতুলকে নিয়ে অভয়ার নিজের মেয়ের সম্পর্কে উদ্ভট চিন্তা দেখা দেয় কেন? এতে কি প্রমাণ হয় না অতুলের প্রতি অভয়ার আকর্ষণে ছিল শুধুই বাইরের মোহ, বা অতুলকে, একটি পুরুষকে কাছে রেখে মেয়ের সারা জীবনের নিরাপত্তাটুকু সুনিশ্চিত করা! আর অতুলের প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অতুলের সঙ্গে তার শিক্ষিত মনস্কতার মাপে যথেষ্ট ঘাটতি বা ফাঁক থাকায় মেয়ের প্রতি বাবার কুৎসিত সম্পর্কের ভাবনা অবচেতন মনের প্রধান নিকেত হয়ে ওঠে! অভয়ার চরিত্রের বড় সীমা—অতুলের উচ্চ মানসিকতার মাপে নিজেকে তার সমান বজায় না-রাখা! অতুল যথেষ্ট শিক্ষিত, উদার, অভয়া তার পাশে মনের দিক থেকে একেবারেই বেমানান, সংকুচিত।

বস্তুত জগদীশ গুপ্ত অভয়াকে ফ্রয়েডীয় যৌনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে চিরন্তন এক নারীর জটিল মনকে গল্পের কেন্দ্রে আদ্যন্ত সক্রিয় রেখেছেন। মানুষের মনই সবচেয়ে বাস্তব, বাইরের নিখুঁত বর্ণনা বাস্তব নয়,—এই মানবিক বাস্তবতায় অভয়া একটি জীবন্ত চরিত্র। যদি এমনও বলা যায় অভয়ার মেয়ে শান্তিলতা মাত্র সতেরো বছর বয়সের উচ্ছল-উজ্জ্বল তারুণ্যে পিতা অতুলের শিক্ষায়-দীক্ষায়, সরল স্বাস্থ্যসম্মত মনের ভঙ্গিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, অভয়া নিজের ওইরকম তারুণ্যে-যৌবনে অতুলকে কাছে এনে ভুল করেছিল! সেই অতীতের ভুলের সঙ্গে শান্তির যৌবনের মিল বিচার করে দ্বিতীয় স্বামীকে সন্দেহ করে, নিজের ভুলের মতো ভুল না করতেই শান্তিকে সাবধান করতে চায়?

অভয়া চরিত্রের আর একটি মূল দিক লক্ষণীয়। অন্য পুরুষের সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসার ঘটনা অভয়া উত্তরকালে সহজভাবে নিতে পারেনি। এখানেই তার নিজস্ব পাপবোধ ও অনুশোচনা তাকে একদিকে যেমন অতুলের প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাব জাগায়, তেমনি নিজেব মেয়ের আচরণে অনুশোচনা ও গভীর সন্দেহ জাগায়। সে সন্দেহ কুৎসিত, বিকৃত, উদ্ভট। অভয়া অতুলকে দেখে সব পুরুষ সম্পর্কে সন্দেহবাতিকতার একজাতীয় রোগে ভোগে। অভয়া মনের রোগী। গল্পের শেষদিকে মেয়েকে নিয়ে অতুল সিনেমায় গেলে, ফিরতে বেশি দেরি হওয়ার ভাবনায় যে বিকারগ্রস্ততা তীব্র হয় অভয়ার মনের গভীরে, তার স্বরূপ গল্পের পরিণাম-উপযোগী স্বচ্ছ আয়নার মতো পাঠকদের সামনে মূর্ত হয় ঃ

> 'তার মনে হইতে লাগিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে; তার অজ্ঞানতা, তার অন্ধকার, তার উত্তেজনা, ভ্রম, দুর্বুদ্ধি সবই তার পাপ; কিন্তু যথার্থ যে পাপী, যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে তাহার সম্বিৎকে উত্তাপ দিয়া দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে।'

অভয়া চরিত্রে তীব্র অশিক্ষা, সংস্কার, সন্দেহ যেমন ব্যক্তিত্বকে জটিল করেছে, তেমনি তার চরিত্রে ট্র্যাজেডির 'flaw' সৃষ্টি করেছে নিজস্ব অনুশোচনাপূর্ণ পাপবোধ। এই আত্মস্ফালনের স্বভাবে নিজস্ব পাপচিন্তা তাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

একদিকে প্রথম সংসার ত্যাগের কালে অভয়ার মোহবদ্ধ প্রেম, সংস্কারাচ্ছন্ন দ্বিধা, আর একদিকে নীতিনিষ্ঠ পাপবোধ অভয়ার চরিত্রের কিছু ডাইমেনশান নির্দিষ্ট করে। পাপবোধে অভয়ার গভীর মনের দুটি স্তর—১. স্বামী থাকতেও মেয়ে থাকতেও মেয়েকে নিয়ে প্রথম সংসার ভাঙা, আর একদিকে, ২. অতুলের সঙ্গে বেরিয়ে আসার পর অতুলের প্রতি মেয়ের আচরণ ও অতুলের ছদ্ম-পিতৃত্বের ভানে স্বকল্পিত সন্দেহের বিষপানে জর্জরিত হওয়া—এটাতেও সেই ভুল করার পাপবোধ—আর এক স্তর দেখায়। প্রথম বেরিয়ে আসায় অভয়ার লজ্জা, আত্মক্ষোভ, বিষণ্নতা ছিল, ছিল সংস্কারের নিশ্চিত সীমা! দ্বিতীয় অতুলের সঙ্গে শান্তির সম্পর্কভাবনার চিত্রগুলিতে তার মোহ ও প্রেম—দুই ভাবনার, সমূহ ভ্রষ্টরূপ স্থির বুঝে নিয়ে অতুল ও মেয়েকে সন্দেহ করা—তার পাপের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ অভয়ার আর এক দিক চিহ্নিত করে।

এই কারণে অভয়া মেরুগামী অন্তর্লোকের বৈশিষ্ট্যে আত্মহনন করতেও পারত, করেনি। প্রথম ছিল কুলত্যাগের সংস্কারের চাপ, দ্বিতীয় বারে দেখা দেয় অতুলের প্রতি সন্দেহবশত ঘৃণা অতুলকে যেমন, তেমনি তার গর্ভজাত কন্যা শান্তির আচরণ—সীমাহীন কুৎসিত চিন্তাভাবনাকে শমীবহ্নির মতো জ্বালায়। অর্থাৎ 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে অভয়ার প্রেমিকা ও মাতৃমূর্তির—দুই রূপেব সহাবস্থানে চরিত্রটিব সক্রিয়তা ও জটিলতা শেষের চিত্রকে অসাধারণ বিশ্বাস্যতা দান করেছে শিল্পের ন্যায়ের দিক থেকে। অভয়া তার মূল প্রতিবাদটি শান্তিকে জানিয়েছে গভীব বাতে নির্জন পরিবেশে তার মতো করে ভাবা সন্দেহের বিষজ্বালার উপশমেব আশায়।

এইসব ব্যাখ্যাতেই অভয়া সমগ্র গল্পে হয়েছে এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র। যে নারী স্বামীকে ছেড়ে একমাত্র কন্যাকে নিয়ে অতুলের মতো পুরুষের সঙ্গে কুলত্যাগ করে, সে আজ ভাবে— 'সে বড়ো অসহায়, আব বড়ো দুঃখিনী।' স্বামীপ্রীতির থেকে তার বড় অস্থিরতা, ভয়, উদ্বেগ, তার আত্মহননের বাসনায় গোপনতম নিস্তারলাভের কল্পনায় থাকে 'দিবারাত্র মেয়ের অশুভ পরিণাম চিন্তা।' অভয়ার মেয়ে সম্পর্কে চিন্তায় মায়েরই নিজের পূর্বস্মৃতি : 'সর্বাপেক্ষা মুগ্ধকরতার চক্ষুদুটি—মেয়ের চক্ষু ঠিক মায়ের অতীত দিনের চক্ষুর মতো—গাঢ়তম বর্ণে তা গভীর, কিন্তু গম্ভীর নয়, হাসিতে ভরা, ভারী অস্থির;'

শান্তি যখন বাবার সামনে সারল্যে, মানসিক সুস্বাস্থ্যে, আচরণে এক পবিত্র নারী, শিক্ষায়দীক্ষায় প্রসারিত মন ও বুদ্ধির বিবেকে মার্জিত, তখন, তার কাছে অভয়া 'মা একেবারে ষোলো আনা সেকেলে;' আর অতুলকে সামনে রেখে অভয়ার মেয়ে এবং তার পিতার প্রতিও শাসন : ' তোমরা সম্পর্ক ভুলেছো এমন একটা মোহের বশে যাকে ঘৃণা করতেও যেটুকু গায়ে মাখতে হয় তাও যেন পারিনে।' রাস্তায় অতুল-অভয়ার পবিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাকে অতুল মিথ্যা দিয়ে আড়াল করেছিল মেয়ের প্রশ্নের সামনে। 'কিন্তু অভয়া এই জাজ্বল্যমান মিথ্যা উক্তির দরুন নয়, যথার্থ ব্যাপার সন্দেহ করিয়া বিবেকদংশনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।' এই যে অভয়ার

বিবেকদংশনে বিষণ্ণতার চিত্র-আভাস, তা অভয়ার অতুলকে ও মেয়েকে নিয়ে কুলত্যাগের পরেও মুছে যায়নি। পিতা ও পুত্রীর সম্পর্ক-ভাবনায় বুঝিবা অভয়ার ভাবনা সীমা ছড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ পায়নি।

বস্তুত, 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে অভয়া গল্পের মূল সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছে। একদিকে সংযত চিত্ত, শিক্ষিত, শারীরিকভাবে সুস্থ মধ্যবয়সী অতুল, আর একদিকে সপ্তদশী যথার্থ সুশ্রী মেয়ে শান্তিময়ী—মধ্যে অভয়া থেকে দুটি চরিত্রের শিল্পশক্তির ভিত রচনার সহায়ক হয়েছে। অভয়ার অতুলকে ভেঙে গড়ার সাহস নেই, ছিল না, তা ছিল নিজের রক্তের সম্বন্ধের মেয়েকে শাসন করার ক্ষমতা, অধিকারবোধ আর শেষ শাসনেই অভয়া শান্তিকে হারিয়েছে, তার মধ্যে অসীম সমুদ্রের শান্ততা, গাম্ভীর্য ও আকাশব্যাপী শীতল নৈঃশব্দ্যের জন্ম দিয়েছে। সমগ্র গল্পের প্লটে অভয়ার মনের অবচেতনলোকের অন্ধকার যত বেশি জমাট হয়েছে, তার থেকেও বেশি দূরত্ব রচিত হয়েছে অতুল ও শান্তির থেকে নির্মম নিয়তির মতো। অভয়া গল্পের পরিণতির সার্থকতম রূপ উপহার দিয়েছে তার চাপা যন্ত্রণাময় স্বভাব দিয়ে। গল্পের পরিণতি চিত্রে অভয়ার মানস-সক্রিয়তা লক্ষণীয়। ১. গল্পের 'থিমে'র যে প্রধান কাহিনী তাকে একে একে ওপরে এনেছে মনের অন্তঃশীল ক্ষেত্র থেকে, 'ও তোর বাবা নয় কেউ নয়।'—এই বাক্যাংশ গল্পের ব্যঞ্জনার প্রথম স্তর দেখায়। ২. 'তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম।'—এই বাক্যে অভয়ার নিজ চরিত্র আঁকা হয়ে যায়। মেয়ের কাছে সে হয় কুলটা, কুলভ্রষ্টা, ৩. পরোক্ষে শান্তি হয় সারা জগতে যথার্থ পিতৃপরিচয় থেকে সম্যক-বিবিক্ত এক নারী ব্যক্তিত্ব। ৪. যে নারীকে সারা গল্পে দেখি অসম্ভব সপ্রাণ, মুক্তমন, স্বাধীন সরল-চিত্ত, সে হয় একা, নিঃসঙ্গ, নির্জন—তার ভিতর-প্রাণের অস্তিত্বের দিক থেকে। সমগ্র গল্পে অভয়ার মানসিক ও তথাকথিত মানবিক কর্মকাণ্ডে তার বড় শিল্পভিত্তি।

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে অতুল প্রধান এবং একমাত্র পুরুষ চরিত্র। তাকে ঘিরেই গল্পের প্লটের যত জটিলতা, অথচ অতুল জটিল নয়। সে একদিন অভয়াকে তার প্রথম সংসার থেকে বের করে আনতে পেরেছে যাবতীয় দায়িত্ব ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আর অভয়ার নাবালিকা মেয়ে শান্তির পিতৃত্ব সম্পর্কের স্বাভাবিকত্বকে উদারতায় মানিয়ে নিয়েছে। লেখকের বর্ণনায় :

> 'অতুলের বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি; শরীর সুস্থ এবং পুষ্ট, কিন্তু শরীরকে অতিক্রম কবিয়াই বিবেচ্য যে-কথাটা তা এই যে, পিতৃসঞ্চিত দেড় লক্ষ টাকার তিনভাগের এক ভাগ পাইয়া সে বড়লোক হইয়াছে। শিক্ষিতও সে খুব—বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, এম-এ পড়িবার সময় একটি ঘটনায় সে কলেজ এবং দেশ একসঙ্গেই ত্যাগ করে।
>
> শান্তিকে সে কেতাবি শিক্ষা দেয়, আবার শান্তিও তাকে শেখায়—এসরাজ বাজানো শিখাইয়া লইয়াছে এবং আরো শেখায়.....'

অতুলের মানস বৈশিষ্ট্য, জীবনযাপন পদ্ধতিটি লক্ষ রাখলেই বোঝা যাবে, অতুল যেন

গল্পকার জগদীশ গুপ্ত স্বয়ং এবং তার চোখে শান্তি যেন গল্পকারের সৃষ্টি এক মানসপ্রতিমা! স্ত্রী এবং শান্তির মা অভয়া স্বামী এবং কন্যার সম্পর্ককে কুৎসিত দৃষ্টিতে দেখে। এ এক উদ্ভট দেখা! এই দেখা তার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রবলতম বিভ্রান্তি আনে, চিত্তে অস্থিরতার জন্ম দেয়, আত্মহননের কল্পনা জাগায়। গল্পের আদ্যন্ত অভয়ার এই স্বামী ও কন্যার সম্পর্ক-ভাবনা বিকারগ্রস্ততায় 'morbid' অবস্থার পরিবেশ আনে। এর বিপরীতে অতুলের মানসিকতা গভীর উপলব্ধির মতো অন্য মেরুগামী। অতুল কন্যা শান্তিলতার সঙ্গে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে—'ফুটবল, ক্রিকেট, চলচ্চিত্র, রঙ্গালয়, এমনকি প্রেমের প্রসঙ্গ পযন্ত বাদ যায় না। .....প্লেটোনিক লাভ-ও তাদের অবাধ চর্চার অন্তর্ভুক্ত—'। পুরুষ-রমণীর যৌন-আকর্ষণ, চুম্বনস্বভাব ইত্যাদি জিজ্ঞাস্য বিষয় শান্তিলতা বাবার কাছে অবাধে জানতে পারে।

এসব আলোচনায় বাবা ও মেয়ের সামনেই অভয়ার কুৎসিত সন্দেহ ও ইঙ্গিত উদাসীন স্বভাবের অতুল তামাশার মতো তুচ্ছ করে দেওয়ার প্রসন্ন সহনশীলতায় উপেক্ষার বিষয় করে। অতুল মেয়ের মধ্যে তার শিক্ষিত, মার্জিত, নারী-স্বভাবের সমস্তরকম স্বতঃস্ফূর্ত 'Instinct' গুলিকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণা দেয় পরোক্ষে। নারী শুধু যৌনতাব, ভোগের সামগ্রী নয়। স্বয়ং গল্পকারের জীবনদর্শনকেই ব্যাখ্যা করে বোঝায় অতুল শান্তিলতার কথার উত্তরে, অবাধে, বাউলের মতো সর্বরিক্ত ঔদাস্যে :

> 'নারীর উপর পুরুষের অশেষ আর তীব্রতম আধিপত্য ঐখানেই; পুরুষ জাগায় তবে নারী তার জীবনের পাত্র সুখের মধুতে পূর্ণ করে আর নিজেকে দান করে নিঃশেষ ক'রে। এটা হবেই; সৃষ্টির ধারাকে সবল আর শক্তিশালী করে রেখেছে ঐ নিয়মটি....।'

অতুল এসরাজের তারের ঝংকারে অসীমকে সীমায় ধরতে জানে, মেয়ের নৃত্যে ও শিক্ষাদান প্রয়াসে মেয়ের এক imaginative realityকে দ্রষ্টা ও স্রষ্টার মতো নন্দিত করে।

অতুলের মেয়ে-সংক্রান্ত যাবতীয় অভিজ্ঞতা, নারীসৌন্দর্য দর্শন, তা নিষ্কলুষ, তা দুই পুরুষ-রমণীর সমস্ত জগদাতীত সম্পর্কের মধুক্ষরা দিকে। অভয়া যখন এই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে অতুলকে অপমানিত করে বিদ্ধ করে : 'আমি এখনও তোমার অন্ন খাচ্ছি, এ-ই আমার সব দুখের বড় দুঃখ।' —তখন কিন্তু অতুল কিছুমাত্র বিদ্ধ হইল না— অভয়ার বোধ অকারণ এবং অসংবদ্ধ মনে হইয়া সে উলটোভাবে হাসিতে লাগিল।' এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অতুলকে বাঁচিয়ে রাখে মেয়ের সামনে সুস্থ জীবনযাপনের প্রত্যয় দিয়ে। শান্তিময়ীর সামনে অভয়ার সমস্ত ইঙ্গিতকে চাপা প্রতিবাদে ও সাবধান বাণীতে যেভাবে উপেক্ষা করে অতুল, তা তার উচ্চ ব্যক্তিত্বেরই অভিজ্ঞান।

অতুলের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ, অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে মা-মেয়ের প্রশ্নজর্জর পরিবেশে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া-চিত্র তার ব্যক্তিত্বের বড় দিক। বস্তুত সমগ্র গল্পে অতুলের যে ধৈর্য ও সর্বরিক্ত মনের ঔদাস্য, শান্তিকে নিজের মেয়ে নয় জেনেও পিতৃত্বের স্বভাবে বড় মানবতায়, নারী-পুরুষের চিরকালীন শুদ্ধ সম্পর্কের তেজে তার গড়ে তোলার প্রয়াস, তাকে নতুন পুরুষ করে গড়ে তোলে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সূত্রে একথা

হয়তো মানা যায়, যে তরুণী বা যুবতী নারীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে বিকার-বিকলাঙ্গ সম্পর্ক হতে পারে পিতৃত্বের ভানে বা মোড়কে, অতুল শান্তির কাছে সে সবের তীব্র প্রতিবাদী হয় মানবতার দাবিতে। অতুলের পক্ষে অভয়াকে শান্তিসহ নতুন পরিবারে আশ্রয় দিয়ে সে বড় প্রেমের মর্যাদা দিয়েছে, একজন নারীর সম্পূর্ণ সুস্থ আত্মনির্ভর বিকাশের সম্ভাব্যতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অতুলের চোখে শান্তি সমস্ত আত্মনির্ভর, আত্মবিকাশে সক্ষম নারীসত্তার মূল্যবান প্রতীক! অতুল তাই অভয়ার তীব্র প্রতিবাদ, মেয়ে শান্তির বিশুদ্ধ রক্তের সম্পর্কের আত্মার আত্মীয়। এই রক্তের বিশুদ্ধি হল মুক্ত প্রাণের তুলসীমঞ্চ রচনার সমতুল, নতুন সৃষ্টির দেবত্বের মাটি!

অভয়া এক রাতে অতুলের সঙ্গে শান্তির সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে যে সন্দেহ করে, শান্তির সরল অকপট কথাগুলি শুনে সেসব বিশ্বাসই করেনি। অথচ শান্তিময়ীর বর্ণনাই তার বাবা অতুলের অসাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। মায়ের কাছে তার সরল অকপট কৌতুকরসসিক্ত বর্ণনাতেই অতুলের ব্যক্তিত্বের নিরাসক্ত, আকাশের মতো জীবন-অন্বেষা ও জীবনকে দেখার স্বভাবে মনোরম অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠা পায় :

> "'অভয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, '..... এত দেরী হল যে?'
>
> কৌতুক-পুলকে ছিটকাইয়া উঠিয়া শান্তি বলিতে লাগিল, 'বাবার কী কাণ্ড! মটোর ফেরৎ দিয়ে বললে, চলো হেঁটে যাই। তারপর রাস্তায় আসতে-আসতে বাবার বারবারই দাঁড়ানো শুরু হ'লো; ভিখিরিটা কেমন ভঙ্গি ক'রে বেঁকে-চুরে শুয়ে আছে, তা দেখল দাঁড়িয়ে; চানাচুরওয়ালার সুর ভাঁজা আর বুলি শুনল দাঁড়িয়ে; রেলিঙে লটকানো ছবি দেখল দাঁড়িয়ে; একটা শতছিন্ন কাপড়-পরা মেয়ে মানুষ ব'সে আছে পা ছড়িয়ে—একটা উলঙ্গ ছেলে আছে তার পিঠের উপর উপুড় হ'য়ে—তা দেখল দাঁড়িয়ে! ইত্যাদি। ইশ, এগারোটা বাজে যে!'"

এই কারণহীন খেয়ালীপনায় যে অসীম উদাসীন আনন্দ, যে মুক্তির শ্বাস, তাতেই অতুল স্রষ্টার স্বভাবে সত্য-শাশ্বত হয়ে ওঠে। অতুলের বড় পরিচয় এখানেই।

জগদীশচন্দ্রের গল্পকার সত্তা সৃষ্টি করেছে নতুন স্রষ্টার রূপে অতুলকে। অতুল স্রষ্টা স্বয়ং। কিন্তু অতুল জীবনের শক্তি (vital energy) নিয়ে গ্রহণ করতে উৎসুক জীবনের সৃষ্টিশক্তির (Creative energy) মূলকে। গল্পকার জীবনের শক্তি ও জীবনের সৃষ্টিশক্তি—দুইকে এক আধার রূপে এই 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে অভিনব স্বরূপে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সপ্তদশী শান্তিময়ী সেই সৃষ্টিশক্তির ধ্রুবতারার আলোর মতো উজ্জ্বল গল্পে। শান্তিময়ী শুধু অতুলের মেয়ে নয়, সে তার পিতার সৃষ্টি, সে আবার গল্পকারেরও যেনবা মানসপ্রতিমা। গল্পে অতুল ও শান্তিময়ী মিলে গল্পকারের জীবনশক্তির পূর্ণরূপের বোধন! শান্তিময়ী সতেরো বছরের সুশ্রী তরুণী, তার মুগ্ধকর দুটি চোখ ঠিক তার মা অভয়ার অতীত দিনের চোখের মতো—'গাঢ়তম বর্ণে তা গভীর' কিন্তু গম্ভীর নয়, 'হাসিতে ভরা, ভারী অস্থির।' লক্ষণীয় এই চোখ দেখেই তো প্রেমিক শিল্পী অতুল অভয়াকে নিয়ে যাবতীয় রক্ষণশীলতার সীমা অস্বীকার করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল! তাহলে এখন অভয়া যেভাবে সেই শান্তি ও তার বাবার সঙ্গে অদ্ভুত উৎকট সম্পর্কের

কথা বলে, তাতে অভয়ার অন্যতম তো এটাও একটা যে, অতুল তার মেয়ের পিতৃত্বের স্থানে মেয়ের সঙ্গে কলুষিত চিন্তাভাবনায় ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে পারে!

শান্তিময়ী সহজ, সরল, নিষ্পাপ, বুদ্ধিমতী, সুন্দরী সুন্দরের উপাসিকা তরুণী। তার সারল্যের পরিচয় গল্পে আস্তে আস্তে পাঠকদের সামনে আসে, আর শেষে সেই সদা-জিজ্ঞাসু শান্তি বাবার অভিজ্ঞতার কথা মায়ের কাছে শুনে স্তম্ভিত-বিস্ময় হয়ে যায়—শেষে তার মধ্যেকার বজ্রপতনের অভিজ্ঞতা তাকে গভীর অন্ধকার খাদের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তার মধ্যে চরমতম নিঃসঙ্গতার অভিশাপ যেন কোনো অলৌকিক অনড় শব্দের অভিজ্ঞতা দেয় . 'শান্তির একটা নিঃশ্বাস পতনের শব্দ হইল—তারপর চরম নিঃশব্দে একটি একটি করিয়া গভীর রাত্রির মন্থর মুহূর্ত কাটিতে লাগিল।'

শান্তি সমগ্র গল্পটির প্লটের কাঠামোয় চাপা কাহিনীর একাধিক জট খোলার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমদিকে সে মাকে চিনেছে এভাবে : 'মা একেবারে যোল-আনা সেকেলে।' একসময় মাকে সে বলে : 'বাবার কি চরিত্রদোষ ছিলো?' মাকে তার প্রশ্ন! 'মা, আমরা কি এখানে নির্বাসিত?' বাবার প্রতি জিজ্ঞাসা : 'তুমি কথা চাপা দিচ্ছো বাবা !' মাকে জানায় : 'বাবার চরিত্র কু হলেও সে-ইঙ্গিত বার বার কেন করছ, আর আমার সামনে কেন করছ। আমাকে জানানো উচিত নয়।' এইভাবে শান্তির যাবতীয় সরল জিজ্ঞাসা, নিষ্পাপ মনের জানতে চাওয়ার বাসনা স্তরে স্তরে প্লটকে সূক্ষ্ম কাহিনীবন্ধে সূত্রবদ্ধ করে এবং সবশেষে মায়ের উত্তেজনায় গভীর রাতের পরিবেশে তার প্রকাশ ঘটে।

গল্পের প্লটে তত্ত্বের দিক থেকে অভয়া ও অতুল যতটা যুক্ত প্লটের পরিকাঠামোয়, তার থেকেও বেশি নিবিড় হয়ে আছে শান্তি-কাহিনীও থীমের মিলন স্বভাব রচনায়। শান্তির অল্পবয়সের অভিজ্ঞতায় বাবার কাছ থেকে নতুন নতুন আচরণের অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তার চিন্তার পরিশীলন যেমন ঘটে, তেমনি একে একে চমৎকার যুক্তি মালার মতো গাঁথা হয়ে যায় 'থিমে'র অনুগ থেকে :

> 'শান্তি মায়ের উক্তির প্রতিবাদ করিল, সুন্দর ভাষায় আর সুন্দরতর ভঙ্গি-সহকারে বলিল,—মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকে; যতো গ্লানি অপরাধ আর দুষ্টামি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুণ। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করব কেন? শিক্ষা নেবো না?'

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে শান্তি স্ব-নির্ভর এবং স্ব-প্রকাশ এক নারীব্যক্তিত্ব। এই বৈশিষ্ট্যে শান্তি যে সমস্যা সামনে আনে, তা হল, জীবনের বাস্তবতা ও শিল্পের বাস্তবতা—দুইই বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষ্যে থেকেও কেন বার বার সংকট তৈরি করে! শান্তি বাবার কাছে দেহবাসনাহীন প্রেম সম্ভব কিনা তা জানতে চায়। অতুল তাকে যাবতীয় সাহিত্যপাঠে উৎসাহ দেয়, শিক্ষা দেয়। দেশি-বিদেশি সাহিত্যপাঠে, অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াসে শান্তি জীবন ও প্রেম এবং জীবনপ্রেমের সৌন্দর্য—দুইই বুঝতে চায়। বাবার দেওয়া শিক্ষা, বিদেশি সাহিত্যের শিক্ষার নির্যাস, বাবার হাতে সুর-তোলা এসরাজের অসীম ব্যঞ্জনা, বাবার সামনে পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে শান্তির মুক্ত শরীর ও মনে নৃত্যের মধ্য দিয়ে

অশরীর অস্তিত্ব রচনা—এসবে শান্তি অবশ্যই স্বয়ম্ভূতা, স্ব-নির্ভর, স্বাধীন। তার প্রকাশ তার অনুভব ও উপলব্ধির ভিতর থেকেই স্বমহিম। এখানেই নারী-ব্যক্তিত্ব বিকাশের চরম ও পরম সত্য।

অতুলের এসরাজের অলৌকিক ধ্বনি-তরঙ্গ আর শান্তির উদ্দাম পরম নৃত্যের বাধাবন্ধনহীন আবেদন—দুই মিলে গল্পকার পুরুষ-রমণী সম্পর্কের স্ব-প্রকাশ মহিমময় জীবন ছবি উপহার দিয়েছেন এমন ভাষা-চিত্রে :

> 'সে এখন মহিমময়ী—জাগ্রতা নারীর দুর্নিবার প্রেমে সে এখন প্রদীপ্ত—সে তার আত্মার সহচরের সাক্ষাৎ পাইয়াছে—সে এখন রাজ্ঞী অথচ পরিচারিকা, বিজয়িনী অথচ কোমলা, পূজারিণী অথচ উপাস্যা—রঙ্গিনী অথচ পবিত্রা—পরবশার মতো চায় সবই, কিন্তু কাঁপিয়া সারা হয়; মন চায় আর না চাহিবার ভান করে আর ভয় পায়—তারপরই সহসা একসময় কুলভাঙা উদ্‌বেল প্রেমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্বস্ব সমর্পণ করে—পুরুষের আপন হয়....—শান্তিময় পরিমণ্ডলে নিজের গভীরতম সত্তার পূর্ণ অনুভূতি আর পূর্ণাহুতি.....'

অতুলের যন্ত্রসঙ্গীতের সুর-মূর্ছনা আর শান্তির প্রত্যক্ষ নৃত্যের অসীম ব্যঞ্জনা—দুই মিলিয়ে লেখক নারীর নারীত্বের স্বনির্ভর পূর্ণ প্রকাশকে বাস্তব অথচ বাস্তবাতীত বিস্তারে সৌন্দর্যের ভোগবাসনাহীন দর্শনের পরাকাষ্ঠা বুঝিয়েছেন। তা-ই বাস্তব, তা কৃত্রিম সমাজ-বাস্তবতায় নেই, আছে মুক্তমন মানব-মানবীর বোধের উদাসীন স্বভাবের অনুগ হয়ে। এই যে চিরন্তন পুরুষ-রমণীর অনুরাগ ও আকর্ষণের চুম্বক স্বভাব—অভয়ার মতো নারীর পক্ষে বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। তাই গল্পের আদ্যন্ত যে সংকট ও সমস্যা দিয়ে অতুল-শান্তির পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক রচনায় জট পাকায় অভয়া, তা রক্ত-সম্বন্ধের বা সম্বন্ধহীনতার—যে কোনো যোগেই হোক, সমস্ত শূন্যতাকে তুচ্ছ নিষ্ফল পরিহার্য ব্যাখ্যা দিয়ে বিশুদ্ধ শিল্পের উৎসমুখ অনাবৃত করে দেখায়। সেখানে অভয়া অন্তরালে নির্বাসিত, অতুল স্রষ্টা উপাসক, শান্তিময়ী উপাসনার উপকরণ, স্রষ্টার মুক্ত আকাশ, সৃষ্টি, তিলোত্তমা।

চার

ঘটনার প্রাধান্য দিয়ে যে বিশেষ একটি ছোটগল্প রচনার মূল লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়, 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে তার শ্রেণীপরিচয় চিহ্নিত হওয়ার নয়। অবশ্যই এটি চরিত্রাত্মক গল্প—আগে বলেছি, আর চরিত্র তা এক বিশেষকে নয়, সমান মাপে তিনটি চরিত্র ধরেই মানব চরিত্রের ভিতর-স্বভাবের অপূর্বত্ব, অনালোকিত অভিনবত্বকে করেছে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে আবেগনির্ভর জটিল উপলব্ধি—যা চরিত্র তিনটির আন্তর মানসিকতার টানাপোড়েনে ক্রমশ ভাবময় দর্শনের ছায়ারূপ নিয়ে হয় প্রতীকপ্রতীম—তার শৈল্পিক স্বাদ পাঠকরা পান।

যেহেতু বাস্তব নারী-পুরুষের সমাজ-সম্পর্ক-সমস্যা, সংকট ও ভাব-ভাবনা মনস্তত্ত্বে ও স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তিম হয়েছে, তা-ই প্রাসঙ্গিকভাবে জগদীশ গুপ্তের শিল্পভাবনার স্বরূপ

প্রতিতুলনায় রাখতেই হয়। জগদীশ গুপ্ত 'শঙ্কিতা অভয়া' নিয়ে একটি উপন্যাসও লিখেছেন, যার কাহিনীর বিস্তার, ঘটনার বৃদ্ধি ও পরিণতির সুতীব্র ব্যঞ্জনা ও স্বাভাবিকত্ব আমাদের শিল্পস্বাদে বিস্বাদ আনে। ছোটগল্পে যা ছিল নিবিড়তম ব্যঞ্জনায় অনন্য, উপন্যাস রূপ 'নিষেধের পটভূমিকায়' তা শরৎচন্দ্রসুলভ সমাজ-অনুগ বৈশিষ্ট্যে হয় ছিন্নভিন্ন। উপন্যাসের প্রথম দিকে ছিল ছোটগল্পেরই সংযম ও টান, শেষে তার প্রকরণ হয় শিথিল। গল্পের অনবদ্য নারীচরিত্র সপ্তদশী শান্তিময়ী হয় সাদা-মাটা অথচ সহৃদয় সম্ভ্রান্ত সংসারের গৃহবধূ। অতুলের সঙ্গে মায়ের কুলত্যাগ করার কথায় শান্তিময়ী অতুলকে ঘৃণা করে, বিদ্রোহিনীর স্বভাবে তার নিজের পিতার সংসারে আসে আশ্রয়ের জন্য। সেখানে শিক্ষাহীন অ-সংস্কৃত সেই পরিবেশে শান্তিময়ীর বৃদ্ধের মতো নিস্পৃহ প্রথম পিতা, জীর্ণবসনা দ্বিতীয় মা ও তার ছেলেমেয়ের দারিদ্র্যের রুচিহীনতার কারণে, শান্তিকে গ্রহণ না করার বাসনা দেখে অতুলের কাছে আবার ফিরে আসে। অতুল এবার শান্তিকে কোনো ব্যথা না দিয়ে তার বিদ্রোহিতার কারণে তাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয। শেষে গল্পকার শবৎচন্দ্র-মানসিকতার মতো শান্তি জীবনে এক পরোপকারী গুরুজীর আশীর্বাদধন্য হয়ে সাংসারিক জীবন পায।

আমাদের মতে, 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসে ছোটগল্পের সেই শিল্পের সংযম চমৎকারিত্ব উপন্যাসের বড় কলেবরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট। অতুল ও শান্তিময়ীর সেই অসীম সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার পবিত্রতম সম্পর্কের ঘটে বিনাশ, এক নায়িকার জীবনে নামে শিল্পের উপেক্ষার মতো অসহায় সমাধি। 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে একই সঙ্গে অভিনব প্রসঙ্গ ও প্রকরণের যুগ্ম শিল্পবেণী রচিত হয়েছে। গল্পটি যে কত বড় মাপের নিখুঁত সৃষ্টি তা প্রমাণ করতেই তার উপন্যাস-রূপটির উল্লেখ জরুবি মনে হয় পাশাপাশি। আবার জগদীশ গুপ্তের বর্তমান গল্পটি লিখিত ও প্রকাশিত সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে বছর দশেক পরে বিমল কর ১৯৫৪ মার্চে লেখেন 'আত্মজা' নামের গল্প। দুটি গল্পের বিষয় ও লক্ষ্য এক—পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের মধ্যেকার অন্ধকার জটিল মনের জগতের উদ্ভট ভয়াবহ উন্মোচন। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সূক্ষ্ম প্রয়োগ ও বাস্তব বিশ্লেষণ—এসবে দুটি গল্পের মিলমিশ!

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে পিতা অতুল স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র। তাকে তার স্ত্রী অভয়া যতই কথায়, ব্যঙ্গে, স্বভাবসিদ্ধ পাপবোধে, অনুশোচনায়, উদ্ভট সন্দেহে অন্যায় আঘাতে বিষজর্জর করুক না কেন, অতুল স্বভাবে নির্বিকার, উদাসীন, আত্মস্থ। বিমল করের 'আত্মজা'র নায়ক হিমাংশু অতুলের মতো Innocent, মুক্ত-মন হলেও তার স্ত্রী যূথিকা পঞ্চদশী কন্যা পুতুলেব সঙ্গে তার স্বামীর আচরণের কেন্দ্রে কুৎসিত সন্দেহ ক্রমশ গভীর করে হিমাংশুকে মনের অন্ধকারতম অঞ্চলে বিকারগ্রস্ত করতে থাকে। এক জটিলতম দায়হীন সম্পর্ক-ভাবনায় হিমাংশু আত্মহননে বাধ্য হয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রয়োগ বিমল করের হাতে সরীসৃপ স্বভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। জগদীশ গুপ্তের অতুলের যে রোমান্টিক অসীম সৌন্দর্য-ভাবনা, সীমাহীন বৈদেহী কামনা-বাসনার পবিত্রতম আকর্ষণ হিমাংশুর থেকে অন্য মাত্রা দেয়। অভয়ার নিজের জীবনের প্রেম, মোহ ও সংস্কারসিদ্ধ পাপবোধ আছে। শান্তিময়ী যে অতুলের মেয়ে নয়, তার বিচার তাকে স্বার্থপর করে। যে কোনো

বড় সৌন্দর্যদর্শন ও মানবিকতার কাছে তার দু'চোখ ও অন্তর-স্পর্শানুভূতি চোখ বন্ধ করার মতো। অন্যদিকে যূথিকার চোখ আধুনিকোত্তম জটিল অবচেতন মনের অনুগ থেকে উদ্ভুট। জগদীশ গুপ্ত গল্পের মূল ভাবে থেকেছেন বিকৃতির পাশে বিশুদ্ধ দর্শনের উপলব্ধিতে, ভাবে, বিমল কর তাঁর গল্পে রূঢ় বাস্তবতায় ফ্রয়েডীয় জটিলতায় নিখুঁত রূপ উপহার দিয়েছেন। দুটি গল্পে দুজনেই স্বক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে স্ব-মহিম, একক এবং দক্ষ মনস্তাত্ত্বিক জীবন ও শিল্পেব রূপকার। জগদীশ গুপ্তের নায়ক অতুলের মধ্যে আদ্যন্ত ছিল স্বাধীন উপেক্ষা, শিল্পীর নিরাসক্তি, বিমল করের নায়ক হিমাংশুর মধ্যে তৈরি হয় নীরব আত্মগুপ্তির চরম আত্মবিনাশের উজ্জ্বল ধারালো ছুরি :

> 'এই অল্প একটু সময়ের ব্যবধানে হিমাংশু এই ঘর, পরিবেশ, সংসার, স্ত্রী-কন্যা সমস্ত থেকে ছিটকে এক বীভৎস অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে। সেখানে কিছু কি আছে? বাতাস, আলো? কিছু না। শুধু সাপের কুণ্ডলীর একটা হিমস্পর্শ, আর প্রতি পলকে শতসহস্র বিষাক্ত দংশন। যার-বিষে এখনো সে অসাড়, যার ক্রিয়ায় এখনো সে অচেতন এবং যে দংশনে তার স্নায়ু মৃত।'

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে প্রথম পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের চরম জটিলতা নিয়ে এক রোমান্টিক পরীক্ষা, 'আত্মজা' গল্পে সেই সম্পর্কের রূঢ় বাস্তব সিদ্ধি।

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে মূল ভাবের একমুখিতা, তার উপন্যাসরূপ বাদ দিয়ে শিল্পে সংযম অসামান্যতা পেয়েছে। গল্পে কোনো আখ্যান নেই, ঘটনার আড়ম্বর অনায়াস প্রয়োজনহীন হয়েছে অভয়া, অতুল ও সপ্তদশী শান্তিময়ীর নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের প্রয়োগে। যেটুকু কাহিনী-আভাস ও ঘটনার জট আছে প্লটে, তা ভাবের বিস্তারে আদৌ বাধা হতে পারেনি। কারণ চরিত্রদের সংলাপের দ্রুতিতে সংযমও স্বাভাবিকত্ব পেয়েছে। অভয়ার চরিত্রগত ভাবধর্ম ক্রমশ গল্পের পরিণামে এনেছে অমোঘতা, ব্যঞ্জনাময় আঘাত হানার উপযোগী সমুদ্রশক্তি : 'শান্তির একটা নিঃশ্বাস পতনের শব্দ হইল—তার পর চরম নিঃশব্দে একটি একটি করিয়া গভীর রাত্রির মন্থর মুহূর্ত কাটিতে লাগিল।' এই চিত্রই তো মূল ভাবের একমুখিতার অন্তে এক নির্বেদ নিঃসঙ্গতার নীরব প্রেক্ষিত রচনা!

গল্পের অবয়ব বিবৃতিমুখ্য (descriptive) নয়, প্রত্যেকটি চরিত্রনির্ভর পরোক্ষ ইঙ্গিত-ধর্মের ব্যঞ্জনার সাপেক্ষ। জগদীশ গুপ্তের গল্পে বেশি কথা না বলে মাঝে মাঝেই '.......' এমন সব ডট্ চিহ্ন, মাঝে মাঝে ড্যাস-চিহ্ন দিয়ে অকথিত কথা বলার প্রয়াস আছে। তা ইঙ্গিতবহ হয় প্রায়শই। গল্পের ভাষা ও গদ্যের সংক্ষিপ্তি ও তির্যকতা বোঝাতে লেখক জরুরি মনে করেছেন এমন সব প্রয়োগ। যুগপৎ চলিত ও সাধু শব্দের মিশেলে গল্পকার সে সময়ের গদ্যভঙ্গির শিল্প-আনুগত্য যথাযথ রক্ষা করেছেন। লেখকের নিজস্ব বর্ণনা অংশ কম। কাহিনীর সূক্ষ্ম সুতো—অতুল নয়, অভয়া, বিশেষভাবে শান্তিময়ীই তার নির্দোষ, সহজ, সরল প্রশ্ন, বিরক্তি ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। গল্পের শেষে শান্তিময়ী কিছুটা অভিজ্ঞ যে হয়েছে, তার সারল্যের দ্যুতির মধ্য দিয়ে প্রমাণ মেলে শান্তির সতর্ক, সপ্রশ্ন, সংলাপ ব্যবহারে :

"নষ্ট করার মানে কী? আর 'ও' বলে তুমি কার কথা বলছ?'
'বেটাছেলে মেয়েছেলেকে নষ্ট করার মানে বুঝিস্‌নে?'
'বুঝলাম।....''

সংলাপ ব্যবহারে গল্পকারের শিল্পীমনের সতর্কতা, শেষ দিকে অভয়া-শান্তির সংলাপ বিনিময়ের ভাষার মধ্যে অনবদ্য পরিমিতিবোধ, শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ রচনা এবং মনোলোকের চমক-সৃষ্টির কৌশল গল্পের মূল্যবান ছবি। সংলাপে একেবারে মুখের ভাষা আর লেখকের বর্ণনার গদ্যভাষা—গল্প ও গল্পকারের নিজস্ব শিল্পব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞান।

পাঁচ

জগদীশ গুপ্তের লেখা গল্পের নাম-ব্যবহারে গল্পকার খুব একটা প্রতীক ব্যবহার করেন না। নামে বাস্তব প্রয়োজনের তাৎপর্যের দিকেই বেশি নজর রাখেন, 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পেও তার প্রমাণ মেলে। নামটি সোজাসুজি নায়িকানির্ভর নয়, সঙ্গে 'শঙ্কিতা' এমন এক বিশেষণ ব্যবহৃত। নাম চরিত্রনির্ভর নয়, ব্যাখ্যামূলক—যার মধ্যে থাকে গল্পের মূলভাবের ব্যাখ্যাস্বভাব—তা-ও নয়। মূলভাবের ব্যঞ্জনাকে বোঝানোর চেষ্টাও একটি শব্দের প্রয়োগে করা হয়নি।

সোজা কথায় গল্পের নামে অভয়াকে শঙ্কিতা হিসেবে ব্যবহার করে অতুল ও কন্যা শান্তিময়ীকে অস্বীকাব করা হয়েছে। বস্তুত মা অভয়ার যে শঙ্কা-জড়িত সংস্কার ও তার সূত্রে পিতা-পুত্রীর আচরণে সংশয়, সন্দেহ, পাপপুণ্যবোধের দিক ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা গল্পের বিবরণ ও লক্ষ্য বিচার করলে স্পষ্ট হয়। তাই এমন নাম প্রাথমিক অর্থে ঠিক।

দ্বিতীয় একটি তাৎপর্য গল্পের মূল ব৫ব্যের সঙ্গে জড়ানো। অভয়ার ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, পিতা-পুত্রীর সম্পর্ককে সন্দেহ করার কারণেই গল্পের মূল ভাবকেন্দ্র হয়েছে জটিল। অতুল ও কন্যা শান্তি সম্পর্কে ঠিক। মাঝখানে অভয়ার উদ্ভট ভাবনা তাতে জটিলতা আনে। সেই জটিলতার পরিণাম শান্তির সারা জীবনের মূল ধরে নাড়া দেয়। সুতরাং অভয়ার দিক থেকে এত বড় ক্রিয়া গল্পের নামের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। গল্পে অতুল নিরাসক্ত, উদাসীন, শিক্ষিত, শিল্পীমনের অধিকারে একেবারে ভিন্ন ব্যক্তিত্বের পুরুষ। শান্তি একেবারে আলাদা সপ্তদশী। তার প্রশ্ন, সারল্য, আত্মগত জিজ্ঞাসা মায়ের সন্দেহকে ক্রমশ পরিণামী করে। গল্পের নামে এদের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় অভয়ার ব্যক্তিত্বের সবল স্বভাবের কারণে। গল্পের মূল চাবিটা আছে অভয়ার হাতেই। সে জানে শান্তি অতুলের মেয়ে নয়, তার নিজের বাবা হ'ল অভয়ার প্রথম স্বামী। এই যে কেন্দ্রীয় চক্রের কেন্দ্রবিন্দু—তা অভয়ার মনে তৈরি করে নানান জট। সুতরাং নামে অতুল ও শান্তি প্রয়োজনহীন, জরুরি হল অভয়া। তাই নাম শিল্পের মাপে ও মানে ঠিক।

তৃতীয় কথা হল, অতুল ও শান্তির সম্পর্কে আছে নিরপেক্ষভাব, অভয়ার চিন্তা আছে অন্যভাবে, তার ব্যাখ্যা অন্য। অভয়া যে আগের স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে, এতে তার মোহবদ্ধ প্রেম একদিকে, অন্যদিকে রক্ষণশীল মনের পাপবোধ কাজ করেছে। 'শঙ্কিত'

শব্দে অভয়ার সেই দ্বন্দ্বকে লেখক গল্পে রেখেছেন বলেই অভয়ার আগে বসেছে 'শঙ্কিতা' শব্দের বিশেষণ-বৈশিষ্ট্য। শান্তিকে অতুল নষ্ট করছে—এ চিন্তা তার নিজস্ব জটিল মনের প্রকাশ, কিন্তু তার মূলে ভিত্তি করেছে তার কুলত্যাগের অনুশোচনা, অন্য পুরুষকে নিয়ে বেরিয়ে আসার বর্তমান পাপবোধ। নিজের মেয়ে নয় বলেই অতুল শান্তির প্রতি আসক্ত, খোলামেলা,—এই বানানো নকল বিশ্বাসে অভয়া নিজেকেই দায়ী করেছে গোপনে। মাঝে মাঝে অতুলকে রূঢ় ইঙ্গিতও করেছে। তা হলে গল্পের নাম 'শঙ্কিতা অভয়া' করার মূলে অভয়ার জটিল সংকীর্ণ মনের দ্বন্দ্বও সক্রিয়। জগদীশ গুপ্ত অভয়ার ব্যক্তিত্বের এদিকটাও ভেবেছেন 'শঙ্কিতা অভয়া' নাম ব্যবহারে। সুতরাং গল্পের নামে ক. একদিকে মেয়েকে শাসন করার শঙ্কা, খ. অতুলকে কুৎসিত সন্দেহ করার সংকীর্ণ মনের অধিকারিণী হওয়া, গ. নিজের অতীত ভুলের অনুশোচনার আন্তর অসহায় ক্ষোভ—এমন ত্রিমুখী তাৎপর্যে নাম অবশ্য বড় ব্যাখ্যা পায়।

৩.

হাড়

এক

জগদীশ গুপ্তের 'হাড়' গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকাল-সময়সমবর্তী, কিছুটা বা 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পের গায়ে গায়ে লেখা। 'হাড়' এমন গল্প নামে উত্তরকালে একাধিক গল্প লেখা হয়েছে, যেমন, অন্যতম একটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা, বিশ শতকের তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে লেখা। আবার জগদীশ গুপ্তের গল্পের বিষয় ধরে দেখা যায়, তাঁর 'হাড়' গল্পে যেমন আছে ডাইনি প্রসঙ্গ, বিশেষভাবে তা নিয়েও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহাশ্বেতা দেবীও আদিবাসী অধ্যুষিত জীবন-চর্যায় ডাইনির প্রভাব নিয়ে অ-মানবিক ডাইনি-তন্ত্রের নিষ্ফলত্বের কথায় গল্প লিখে গেছেন। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর—দুজনেই 'ডাইনী' নামেই গল্প লিখেছেন। বিভূতিভূষণেব গল্পটির রচনাকাল ১৯৩৮ সালের কিছু আগে। তারাশঙ্করের 'ডাইনী'-র প্রকাশ ঘটে- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আট-ন'মাস পরেই।

উপরি-উক্ত তিন লেখকই ডাইনি নিয়ে অমানবিকতায় চরম বিকৃত তত্ত্বরূপ ও জীবনবিমুখ জিজ্ঞাসাকে 'pointing finger-এ নির্দিষ্ট করেছেন। জগদীশ গুপ্তের 'হাড়' গল্পে ডাইনি প্রসঙ্গ এসেছে লেখকেব ব্যক্তিগত জীবনদর্শনকে ভিত্তি করে। ডাইনির প্রতিক্রিয়া ও বিশ্বাস ডাইনিকে লক্ষ্যে রেখে নায়কের নিয়তিনির্দিষ্ট ভাগ্যের দীর্ঘশ্বাসকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। সেখানে ডাইনি নয়, নায়কের দুর্ভাগ্যের ভয়াবহতা পাঠকহৃদয় গভীর বিষণ্ণতায় আবৃত করে।

'হাড়' গল্পে আখ্যান আছে জগদীশ গুপ্তের প্লট রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরেই। টানা কাহিনী নেই, চরিত্র ধরে ঘটনার আয়োজন গল্পের প্লটকে যেমন নিবিড় বন্ধন দেয়, তেমনি কেন্দ্রীয় বক্তব্যের (Central Theme) ভিতকে করে সুদৃঢ়, কঠিন। গল্পের প্রথমেই

সংবাদ আছে সনাতনের স্ত্রী রক্ষার অসহায় মৃত্যুর কথা জানিয়ে। অসহায় কারণ রক্ষা তার বেপরোয়া চুরির দায়ে পরপর তিন মাস জেল-খাটা, স্বভাবে কটু-কর্কশ, দাম্ভিক, বদরাগী সনাতনের কথা ভাবতে ভাবতেই, ভিতরে ক্ষয়িত হতে হতেই মারা যায়। রেখে যায় দু'বছরের একটি ছেলে—নাম মথুর। রক্ষা রসি নামের এক বয়স্কাকে বলত মাসি এবং রসিকে তার মৃত্যুর পর মানুষ করার কথা বলে। মথুর কোনোক্রমেই যেন তার বাবার মত না হয়, রসির কাছে রক্ষার একমাত্র এটাই ছিল আন্তরিক অনুরোধ। রক্ষার এমন নিঃশব্দ মৃত্যুতে কাঁদে একমাত্র রসিই, আর কেউ নয়। রক্ষার মৃত্যু ও এমন অনুরোধের কথা মনে রেখেই অনেক ভাবনাচিন্তার পর রসি ঠাণ্ডা মাথায় সনাতনকে রক্ষার শেষতম অনুরোধটির কথা বলে। কারণ রসি জানে, কারোর ছেলেকে মানুষ করতে হলে তার বাবার অনুমতি প্রয়োজন।

কিন্তু বিপরীতে রসি সনাতনের কাছে সে কথা বলায় সনাতনের দিক থেকে চরম অপমানিত হয়। সনাতন কুৎসিত গালাগাল দেয় রসিকে—মাগি ডাইনি। এইভাবে রসির নারীত্বের মাতৃ-হৃদয়কে করে তীব্র অপমান সনাতন। সনাতনের কাছে রসি কাঁদেনি, কিন্তু ওর ভিতরে আগুন জ্বলতে শুরু করে। ইতিমধ্যে সারা গ্রামে রটে যায় রসি ডাইনি, মন্ত্রতন্ত্র জানে। এই ডাইনির ভয় আর সনাতনের রসিকে অপমান করা—এতে গ্রামের লোক তটস্থ থাকে। গভীর সংস্কারে তারা ভাবে রসির এই অপমানে বুঝিবা সারা গ্রামে নেমে আসবে চরম অশুভ শক্তির ছায়া। এক ঘটনায় গ্রামের দাশুর অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ মানীব ওপর মিথ্যা-কল্পনায় ভূতের ভর এবং গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হওয়ার যাবতীয় দায় গ্রামের লোকজন চাপায় রসির ওপর। রসি কিন্তু নারী হিসেবে মানবিকতায় এবং রক্ষার শেষ অনুরোধ পালন করতে মাতৃত্বের দায়েই একান্ত উৎসুক। এই ঘটনায় সনাতন রসিকে আবার আঘাত করে। গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করে রসি, সে আবার তার ছেলেকে চায়! তাছাড়া সনাতনের নিজেরও ছেলেকে দরকার, তার কাজের সঙ্গী হবে তো একমাত্র তার পুত্রই! এই মনোভঙ্গির মধ্যে একদিন সনাতন-রসি সামনাসামনি পড়ে যায়। সনাতন গালাগাল, শাসন যতই করুক রসিকে, যতই মেরে ফেলার ভয় দেখাক, রসি নীরব থাকে, কিন্তু ভিতরে রাগে জ্বলে।

গ্রামের কাছে দুজনেই ভয়ঙ্কর। এই দুজনের মধ্যে মিটমাট করতে গিয়ে গ্রামের চাটুজ্যেমশাইয়ের ন্যায্য সালিশিও ব্যর্থ হয়। মথুরের নিজের মাসি গরিব, তাছাড়া ছেলে নিজের কাছে না রাখলে চলবে না,—এই দুই যুক্তিতে ব্রাহ্মণের কথা মানে না সনাতন। একদিন রাস্তায় মাছ ধরার পথে সনাতন রসির সামনে পড়ে থুথু ফেলে অপমান করে। তাকে মাছ মারার কোঁচ দিয়ে আঘাত করার ভঙ্গি করলে রসি সক্রোধে ঈশ্বরের নামে অভিশাপ দেয়—সে মাছ মারতে যাচ্ছে বটে, কিন্তু যেন মাছই তাকে মারে—এমন ক্রুদ্ধ ভাষায়। সনাতন তাকে এতটুকুও গ্রাহ্য করে না। সঙ্গী ভুবন শেষে ভয়ে মাছ মারার সঙ্গী হতে একান্ত নারাজ হলে সনাতন একাই চলে যায় এই বিশ্বাসে : 'দরকার নেই; আমি

একাই একশো। ঐ মাগির কথায় যদি মানুষ মরত তবে তো বাঁচতাম, তোদের মুখ আর দেখতে হ'তো না।'

বর্ষার জল নদী ছাপিয়ে ধানের খেত ভাসিয়ে দিয়েছে। ডিঙি নিয়ে সনাতন একাই সেই ধানখেতে ঢোকে। সূর্যাস্ত হতে আর দেরি নেই। সনাতনের ডানহাতে ধরা উদ্যত কোঁচ, বাঁ হাতে ডিঙি ঠেলে নিয়ে যাওয়ার লগি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সনাতন স্থির। জলের ওপর মাছ যাওয়ার চেরা দাগ দেখতে পেয়ে কোঁচ ছুঁড়ে সঠিক বিদ্ধ করে মাছটাকে। কিন্তু বড় মাছের মোচড়ের ধাক্কায় ও টানে সনাতন জলে পড়ে যায় ডিঙি থেকে। জলের কাদায় রক্তে পিঙ্গল গাঢ় পরিবেশে এমন পড়ে যাওয়া কোনোদিন হয়নি সনাতনের এতদিনের মাছশিকারে। হঠাৎ সনাতনের মধ্যে কেমন ভয় জড়ায়। বড় চিতল মাছটাকে নৌকায় তোলার সময় সনাতনের বুকে আবার ধাক্কা লাগে। তবু মাছশিকারে সনাতন বিজয়ী শিকারির গর্বে মাছটা বাড়ি নিয়ে আসে। তার শিকারের বর্ণনা দেয় গ্রামবাসীদের। এত বড় মাছ কেটে গ্রামে বিতরণের উদারতায় একটা বিরল ভোজের আয়োজন হয়। কিন্তু আনন্দে পুত্র মথুরকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে একদিকে মথুরের সরল আনন্দের আবেগ, অন্যদিকে সনাতনের গলায় শ্বাসনালীর মুখে হঠাৎ মাছের হাড় আটকে শ্বাস বন্ধ হয়ে বিষণ্ণ মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে—গল্পকার গল্প শেষ করেছেন। এবং এই শেষেরও শেষ চিত্র এইরকম গল্পকারেরই ভাষায় :

> 'রসিও আসিয়াছিল; অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। লুকাইয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হইয়া গেল।'

'হাড়' গল্পে কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ কাহিনী নেই। একাধিক ছোট ছোট ঘটনাচিত্র সাজিয়ে জগদীশ গুপ্ত প্লটের এক কাঠামো নির্মাণ করেছেন, যাতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে রসি ও সনাতনের সম্পর্কসূত্রের প্রবল বৈপরীত্য! বেপরোয়া সনাতনের স্ত্রী রক্ষার মৃত্যু ও মৃত্যুপূর্বে রসি মাসির ওপর সন্তানপালনের দায়িত্ব ও নির্ভরতার কথা প্রকাশ, রসির দিক থেকে সনাতনকে তা বুঝিয়ে জানানো, সনাতনের রসির ওপর রাগ ও রসিকে ডাইনি বানানো, মাসির ভূতদর্শন এবং গর্ভ নষ্ট হওয়া, রসিকে কোঁচ দিয়ে মেরে ফেলার হুমকি, একা সনাতনের মাছ ধরা ও খাওয়ার সময় মাছের হাড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হঠাৎ সনাতনের মৃত্যু—এইসব টুকরো ঘটনায় 'হাড়' গল্পের প্লট নিশ্চয়ই জটিলতা পেয়েছে।

আর এই জটিলতায় কিছু ঘটনা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি দুটি চরিত্র—রসি ও সনাতন—গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবকে দিয়েছে সঠিক প্রতিষ্ঠা। গল্পে দুটিই প্রধান চরিত্র—শেষে সনাতন হয়েছে নায়ক। তার মধ্যে যে ক্রমশ ভাঙন ধরে আত্মবিশ্বাসে—সেই ভাবের ক্রমিক স্বভাবে স্পষ্ট হয়েছে গল্পের 'চরমক্ষণ' (Climax)। সনাতনকে—সারা সময় নীরব থেকে রসির যে ক্রোধোন্মত্ত অভিশাপ প্রদান একবারই— তা সনাতনের জীবনে ভাগ্যের পরিহাসকে বক্রোক্তিতে উজ্জ্বল করে। মাছ শিকার করার সেই নদী ও তার দুপাড়ের হাঁটুজল ধানখেতের পরিবেশই গল্পের ক্লাইম্যাক্স রচনার সঠিক ব্যঞ্জনার ভূমিকা নেয় গল্পের প্লটের যথার্থ ভিত দেওয়ার ব্যাপারে।

ক্লাইম্যাক্স সূত্র আমরা এভাবে 'হাড়' গল্পে সাজাতে পারি। **প্রথম স্তর** : মাছ মোচড় খাওয়ার পর সনাতনের জলে পড়ে যাওয়া—এখানে সনাতনের ভাবনার বকলমে ভাবনা-ভাষ্য—'এমন আর কোনদিন হয় নাই—সনাতন হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল—'। **দ্বিতীয় স্তর**: মাছের সমস্ত দেহের গতিবেগ আর ওজনটা মুদগরের মতো উঠিয়া সনাতনের বুকে লাগিল—কণ্ঠের ভিতর কেমন একটা কঠিন শব্দ হইল—পৃথিবীতে বায়ু নাই—সম্মুখে আলো নাই—', **তৃতীয় স্তর** : 'রাসির অভিসম্পাত যে কেমন করিয়া ফলিতে-ফলিতে সনাতন রক্ষা পাইয়াছে সেই লোমহর্ষক কথাটি সনাতনের মুখে অবগত হইয়া মাছের ভাগ হাতে করিয়া অনেকেই কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কাঁপুনিটা কম—' **চতুর্থ স্তর** : 'সনাতন বলিল, মাছের কাঁটা বেছে খাস; গলায় বাধবে।' ক্লাইম্যাক্সে যে অবস্থার ক্রমিক আয়োজন, তার শেষ স্তর : 'এক গ্রাস ভাত গিলিয়াই সনাতন দুই হাত দিয়া নিজেরই গলা চাপিয়া ধরিয়াছে,.......'

এর পরেই সনাতনের নিশ্চিত নিয়তির যে নির্মম রূপ, তা গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা। ডাক্তারের যুক্তিগ্রাহ্য মন্তব্য সনাতনের মৃত্যু সম্পর্কে এবং অন্ধকার থেকে রসির আস্তে আস্তে চলে যাওয়া—দুয়ের মধ্যে রসির এক তথাকথিত ডাইনি-ভাগ্যের উত্তর নিহিত আছে। সারা গল্পে প্রশ্ন ওঠে : মানুষের অন্তিম জীবন-পরিণামে দায়ী কে? তার বিশেষ বাস্তব অবস্থায় দাসত্ব, না, অদৃষ্ট নামক ভাগ্যলিপির যন্ত্রস্বভাব?

দুই

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে বাস্তবতার জ্ঞানে জগদীশ গুপ্তের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই মানতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি কল্লোলের কথাকার, আবার একাধিক কল্লোলীয় লেখক থেকে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের ও দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পী। 'হাড়' গল্পের আখ্যান ও ঘটনায় কোনো কোনো সহজ চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস নেই, আছে জীবনের অন্তর্ভেদী রহস্যের আচরণ উন্মোচনের আন্তর তাগিদ। সেটাই যে কোনো মহৎ শিল্পের কাঙ্ক্ষিত দিক। এই মহৎ শিল্প-ভাবনার অন্তঃশীল সত্যে 'হাড়' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য অবশ্যই উজ্জ্বল।

মানুষের জীবন-শক্তি (vital energy) তার অবস্থার, পারিপার্শ্বিকতার দাস, না, জীবনের সৃষ্টিশক্তিরই (creative energy) এক ক্রীড়নক হওয়ার দিক! জীবনের সৃষ্টিশক্তিই অন্তরীক্ষের অজানার এক আদিম (elemental) বিষয়। মানুষ নিজের শক্তির মাপ বোঝে, কিন্তু তার 'elemental'-এর সীমা কোনোদিনই জ্ঞানের মধ্যে বুঝতে অক্ষম। এই জীবনের সৃষ্টিশক্তি নিয়তিনির্দিষ্ট ভাগ্যের পুতুলকে সুদূর অসীম রহস্যময় ব্যাখ্যাতীত করে। তার রহস্যময় খেলা মানুষের জীবনে যেটুকু মেলে ততটুকুই, তার বাইরে সে অসীম, দুর্জ্ঞেয়।

এই কেন্দ্রীয় সত্য 'হাড়' গল্পের রসি ও সনাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বৈপরীত্যে জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েনে এক দর্শনের প্রতিষ্ঠা দেয়। জগদীশ গুপ্তের এই বিশেষ দর্শন (attitude to life) বর্তমান গল্পে বিশ্বাস-অবিশ্বাস দোলাচলতায় পাঠকমনকে অস্থির করে। মাছ ধরতে

যাওয়ার সময় সনাতন রসির মুখ থেকে ক্রোধান্ধ উক্তি শোনে : 'আমায় মারতে উঠেছিলি? ভগবান তা দেখেছেন। তুই মাছ মারতে চলেছিস্—ঐ মাছই যেন আজই তোকে মাবে।' এর উত্তরে সঙ্গী ভুবনকে অবিশ্বাসী, আত্মশক্তিতে বেপরোয়া বিশ্বাসী সনাতন বলে : 'শেপেছে আমাকে; মরি তো আমি মরবো।'....'আমি একাই একশো। ঐ মাগির কথায় যদি মানুষ মরত তবে তো বাঁচতাম, তোদের মুখ আর দেখতে হ'ত না।'

সনাতনের এই তেজ—জীবনের শক্তি—মাছ ধরার সময়েই বিশ্বাসের মূল নড়বড়ে করে। বিশাল চিতল মাছের শরীরের মোচড়ে সনাতন জলে পড়ে যায়। এতে তার অনুভব : 'এমন আর কোনদিন হয় নাই—সনাতন হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল—।' নৌকায় মাছটাকে তোলার সময় 'দেহের গতিবেগ আর ওজন মুদগরের মতো উঠিয়া সনাতনের বুকে লাগিল—কণ্ঠের ভিতর কেমন একটা শব্দ হইল—পৃথিবীতে বায়ু নাই—সম্মুখে আলো নাই—..... ব্যথাটা যেন নিঃশ্বাসের পথ ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছে না।—' এই যে জীবনের তেজে দীপ্ত ও দৃপ্ত সনাতনের আত্মগুপ্ত উপলব্ধি, তা তাকে জলের মধ্যে শেষ করেনি, খাওয়ার সময় চিতলের হাড়ের আকস্মিক শ্বাসনালীর মুখে আটকে থাকার ঘটনাতেই অন্তিম অবস্থা আনে।

সনাতনের জীবনশেষের ঘটনায় রসির কোনো দায় নেই। রসি সনাতনের জীবনে অবস্থাভেদে এক পারিপার্শ্বিক মাত্র, তবে রসির শেষ কথা সনাতনকে তাড়া করেছে অসহায় মনের গভীরে—মাছ তোলার সময়। তার মৃত্যু জীবনের সৃষ্টিশক্তিরই এক খেলা—ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস, পুতুল নিয়ে খেলার সহজতায়, উপেক্ষায় জীবনের চর্যাধর্ম।

জগদীশ গুপ্ত 'হাড়' গল্পে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর জীবনবিশ্বাসের সত্যতা, মানুষের শক্তি কোথাও জিতলেও পবিণামে রহস্যময় থেকে নিয়তির, অদৃষ্টের অনুপন্থী আঘাতেই শেষ হতে বাধ্য। মানুষের জীবন অবস্থার দাস হতে বাধ্য, কারণ নানান অবস্থাতেই জীবনের ব্যাপকতা, বিস্তার ও বাস্তবতা সত্য—তা আংশিক,—পূর্ণতা আসে জীবনের অতলান্ত সৃষ্টিশক্তির নির্দেশে নিয়তির, অদৃষ্টের কাছে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়ার স্বভাবে! সনাতনের পরিণতি বড় জীবনেরই নিশ্চিত নির্দেশ। আদিমতম বলবান প্রকৃতিশক্তির প্রতীক হল মাছ, তার 'হাড়' হল পৌরাণিক রাবণবধের মূল অস্ত্রের মতো পরিণামী অস্তিত্ব নিধানের আর এক প্রতীকী অনুষঙ্গ।

তিন

'হাড়' গল্পে প্রধান দুটি চরিত্র হল রসি ও সনাতন। তাদের জীবন, স্বভাব ও পারস্পরিক সংকট-সংঘর্ষেই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবের রূপাবয়ব মেলে। জেল-খাটা, বেপরোয়া, দাম্ভিক সনাতনের স্ত্রী রক্ষার কাছে রসি হয় মাসি। রসির 'হাড়ে জোর নাই, মুখেও দন্ত নাই; কিন্তু মনের জোর বেজায়......'। স্বামীর জন্য বাঁচার ব্যাপারে একেবারে বীতস্পৃহ রক্ষা নিঃশব্দ জ্বালা নিয়ে একদিন মারা যায়। মারা যাওয়ার আগে রসিকে বলে যায় তার ছ'বছরের পুত্র মথুরকে মানুষ করার জন্য—যেন সে তাব বাবার মতো না হয়। এমন রক্ষা ও মাসির মধ্যে মমত্বের সম্পর্কে রসি বক্ষার দুঃখে কাঁদে। রসিকে

সনাতন যে রাক্ষসী ডাইনি বলে অপমান করে, থুতু ছিটায় সামনে, নীরব রসি কিন্তু তা নয়। বরং রসি স্বয়ং সে সবের তীব্র প্রতিবাদী।

রসির মাতৃ-হৃদয়ে আছে অপমানবোধ ও আত্মসম্মানবোধ। সনাতন গালাগাল দিলে কাঁদে না, তার সুস্থ নারীসুলভ মাতৃহৃদয়ে আগুন জ্বলে। সে কাঁদে না। গ্রামের রটনায় রসি সকলের কাছে হয় ডাইনি। কিন্তু সে তা নয়। কুসংস্কারের ডাইনির মতো প্রথাসিদ্ধ কোনো মানসিকতা তার ছিল না। রসি যুক্তি দিয়ে বোঝে ছেলের অধিকার বাবারই। তাই মথুরকে পোষ্য নিতে গেলে সনাতনের অনুমতি দরকার। এই ন্যায়বোধে সে মানবিক। তার মানুষের প্রতি, অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ—যা দাশুর পুত্রবধূ মানীর প্রতি সে দেখায়—তাতে সে অনেক বড়। লেখকের বর্ণনায় রসির ভিতরের স্বভাবে এক বিশুদ্ধ রমণীহৃদয়ের গোপন বাসনা-চিত্র মেলে :

> 'রসির একান্ত ইচ্ছা, মরা মানুষের কথাটা সে রাখে। অপমান হইয়াও সে নিরস্ত হইতে চায়ে নাই। এবার সে মনের ইচ্ছাটা মানুষের মুখে গুঁজিয়া দিলো। .....ইহজন্মের রসিকে কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই..... কেহ ডাকিবে এ আশাও নাই...... তবু একটি কচি প্রাণ, প্রথমে নির্লিপ্ত.......
> তারপর ধীরে ধীরে বেড়িয়া ধরিবে— এ যে বড়ো লোভের জিনিশ......'

রসির এই মাতৃভাব বিশুদ্ধ, মানবিক, জীবন্ত, সুস্থ এক নারীর উপযুক্ত ভাবের প্রতীকপ্রতীম চিত্রাভাস।

রসি একসময়ে সনাতনকে বলে : 'তুই মাছ ধরতে চলেছিস্—ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে।' এই রসির কথা কোনো অভিশাপ নয়, এক জীবনপ্রীতি-ভিক্ষায় আতুর রমণী আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ক্রোধে কেবল প্রতিপক্ষ সনাতনকে সাবধান-বাণীটুকু শোনায়। গল্পের শেষতম চিত্রে রসি উপস্থিত। ভাগ্যের ফেরে নিয়তির আঘাতে সনাতন মারা গেলে সে দৃশ্যে রসি উপস্থিত থাকে : 'রসিও আসিয়াছিল; অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। লুকাইয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হইয়া গেল।' এই অবস্থা কল্পনায় কাম্য ডাইনির মধ্যে কোনো উল্লাস নেই। তার নীরবতা তার চরিত্রের অলংকার। সে তারাশঙ্করের ডাইনির মতোই এক মাতৃরূপিণী নারী, মানবিক ও সন্তানপিপাসায় বুভুক্ষু।

রসি 'হাড়' গল্পের মূল গতিসৃষ্টির বড় উপকরণ। তার বিপরীতে সনাতনের মতো বেপরোয়া পুরুষ থাকায় গল্পের গতিমুখ হয়েছে একমুখিন ভাবের যথার্থ উদ্বোধক। তার স্বভাবে যেমন আছে আপ্রাণ ধৈর্যরক্ষাব স্বভাববৈশিষ্ট্য, তেমনি কখনো বা ধৈর্যচ্যুতির ন্যায়ও সমান গুরুত্ব পায়। রসি ভারসাম্যপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব। সে বিপদে, অপমানে, আঘাতে নীরব থাকে। এই বৈশিষ্ট্যেই গল্পের মূল দ্বন্দ্বে তার সক্রিয়তা ভারসাম্য বজায় রাখে। রসি গল্পে অবস্থার দাসের বলিপ্রদত্ত রমণী, সনাতন অবশ্যই সবশেষে হয়ে উঠেছে তার অদৃষ্টের তথা ভাগ্যের এবং নিয়তির গড়া এক পুতুল। রসি আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম, সনাতন আত্মরক্ষা নয়, আত্মধ্বংসে দুর্বল এক উপকরণ, গল্পে তারই ট্র্যাজেডি বড় হয়ে পাঠক মনে বাজে।

সনাতন 'হাড়' গল্পের সঠিক নায়ক। 'সঠিক' এই অর্থে সে জগদীশ গুপ্তের গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য তথা জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টি-রূপ পায়! তা শিল্পরীতি অনুযায়ী যে চরিত্রকে নির্ভর করেই, তার সত্যতা প্রমাণ করে সনাতনই। সমগ্র গল্পে সনাতন তার আকস্মিক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত থেকেছে একজন বেপরোয়া যৌবনদৃপ্ত আদিম স্বভাবে উজ্জ্বল কটু-কর্কশ স্বভাবী, দাম্ভিক দাপুটে পুরুষ হয়ে। সে নিজের ছ'বছরের সন্তান মথুরকে কাছে রাখতে চায় তার নিজেরই ব্যক্তিত্বে, পৌরুষের রক্তের অধিকারে। তার জন্য গ্রামের মজলিশের কথা শোনে না, চাটুজ্যেমশায়ের বুদ্ধি সে নেয় না। এর সঙ্গে তার কিছুটা মানব্য-বোধও ছিল—তা হল তার ছেলে মথুরের আসল মাসিমা গরিব, তার সন্তানপালনে সে অপরাগ!

এমন ভালো-মন্দের চিন্তায় সনাতন সারা গল্পে রসির সুস্থ আকাঙ্ক্ষাকে না মেনে সন্তানত্যাগের প্রস্তাবে রাগে ঘৃণায় রসিকে আঁটকুড়ি ডাইনি বলতেও নির্দ্বিধ। আসলে সনাতন এমন এক জীবনীশক্তি যে তার সৃষ্টিশক্তিকে প্রতিপক্ষ ভাবতে পিছপা হয় না। তেজি, অসম্ভব শক্তিধর সনাতন এক অস্বাভাবিক বড় চিতল মাছ শিকার করে একাই জল থেকে তুলে আনতে সক্ষম হয়। এখানেই তার সমস্ত প্রতিকূল অবস্থায় জীবনস্ফূর্তির প্রমাণ মেলে, জীবনের শক্তি আপন অস্তিত্বের বেগে সব বাধা অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় তুচ্ছ করতে সক্ষম।

কিন্তু রসির সেই তুচ্ছ কথার কথা 'তুই মাছ মারতে চলেছিস্—ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে।'—তাকে মাছশিকারের কালে ভিতর থেকে কাঁপায়, এক অদৃশ্য ভয়ের শিহরন শরীরে জড়ায়। এখানেই তার নায়কের দায়দায়িত্ব বর্তে যায় তার ক্রিয়া-কাণ্ড জুড়ে! সনাতন সঙ্গী ভুবনকে ছেড়ে একাই যায় শিকারে। সেখানে কোঁচের আঘাতে মাছ মোচড় খেয়ে আচমকা উল্টে গেলে সনাতনও জলে পড়ে যায়। গাছের মতো বিশাল মাছ হল সেই আদি ও আদিম প্রকৃতির এক শক্তির উপকরণ, তার সামনে সনাতনের চিন্তা :

> 'এমন আর কোনদিন হয় নাই— সনাতন হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল—নিঃশব্দ আকাশে যেন একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—তুই মর্!
>
> কোঁচ মাটির ভিতর চাপিতে-চাপিতে সে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল দৃষ্টির পরিধির মধ্যে মানুষ কোথাও নাই, বৃত্তাকার অন্ধকার যেন কেন্দ্রের পানে গুটাইয়া জড়ো হইয়া আসিতেছে।'

এই চিন্তায় এক অশরীরী স্পর্শ সনাতনেব মুহূর্তের উপলব্ধিকে সন্ত্রস্ত করে সুক্ষ্মভাবে।

মাছ কিছুতেই নৌকায় তোলা যাচ্ছে না। 'সনাতন কোঁচ নামাইয়া আবার জলে নামিল—কিন্তু না নামিলেই ভাল হইত।' আর এক নতুন অভিজ্ঞতা মনের গভীরে প্রকৃতির সামনে পরাজয়ের বার্তা শোনায়, মাছটাকে পরে ধরে নৌকায় তুলতে গেলে ......

> 'মাছটা লাফাইয়া উঠিল।
>
> মৃতপ্রায় মাছের দেহে অতো শক্তি কোথা হইতে আসিল কে জানে—
>
> মাছের সমস্ত দেহের গতিবেগ আর ওজনটা মুদগরের মতো উঠিয়া সনাতনের

বুকে লাগিল, কণ্ঠের ভিতর কেমন একটা কঠিন শব্দ হইল—পৃথিবীতে বায়ু নাই—'

সম্মুখে আলো নাই—'

এই চিত্রের অনুষঙ্গে প্রসঙ্গত তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পের স্ত্রী সুখীকে ছেড়ে দেওয়ার পর তারিণীর জীবনাকাঙ্ক্ষার অদ্ভুত সাদৃশ্য পাওয়া যায় বৈপরীত্যে—

.... সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে (তারিণী) জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আর, আঃ —বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া ব্যাকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।' ('তারিণী মাঝি' গল্প)

তারিণীর মতো সনাতনেরও বাসনা জৈব প্রকৃতির অনুগত। সেই elemental প্রকৃতির বিরুদ্ধে—জীবনের সৃষ্টিশক্তির কাছে তার হার। তার সূচনা পরের সনাতনের উপলব্ধির মধ্যে :

'কটি মুহূর্ত চেতনার বাহিরে কাটাইয়া সনাতন যখন জাগিয়া উঠিল তখনও সে কোঁচের হাতল চাপিয়া ধরিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। বুকের উপর কয়েকবার সে বাঁ হাতখানা বুলাইয়া লইল...... ব্যথাটা যেন নিঃশ্বাসের পথ ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছে না।'

সনাতনের এই অভিজ্ঞতায় নিয়তির নির্দেশ কার্যকরী হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা আছে সনাতনের শরীরেই। সেই ব্যথার মরণ কামড় লেখক দেখিয়েছেন মাছ রান্না করে খাওয়ার আনন্দের মধ্যে একই স্থাননির্দেশে :

'এক গ্রাস ভাত গিলিয়াই সনাতন দুই হাত দিয়া নিজেরই গলা চাপিয়া ধরিয়াছে, ... চোখ ঠিকরাইয়া উঠিয়াছে, কেউ যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া দিতেছে।......
....সনাতনের দেহের আক্ষেপ শান্ত হইয়া গেছে। ....মাছের শিরদাঁড়ার হাড় বায়ুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া মধ্যপথে আটকাইয়া আছে।'

এই হল জীবনের সৃষ্টিশক্তির কাছে (creative energy) জীবনের শক্তির (vital energy) পরাজয়। এ সেই লেখকচিন্তিত জীবনভাবনা—কোনো অবস্থার দাস নয়, দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের তথা নিয়তির নিমর্মতাই জীবনবিনাশী স্বভাবের একমাত্র পোষক! 'হাড়' গল্পের সনাতন তাই গল্পকারের বিশেষ জীবন দেখার প্রতীকী আধার। 'হাড়' গল্পের লেখক অবশ্যই একজন নিরাসক্ত, নির্মম নিয়তির স্বভাব-ভাষ্যকার।

চার

'হাড়' গল্পের ভাবের একমুখিনতা স্পষ্ট হয়েছে রসি-সনাতনের দ্বন্দ্বময় গতিমুখের শেষ শমে সনাতনের জীবনস্ফূর্তির স্বাভাবিক রূপচিত্রণে। 'হাড়' অবশ্যই চরিত্রাত্মক গল্প। শেষে সনাতনের মনোলোকের মৃত্যুভয়ের মনস্তাত্ত্বিকতা গল্পের মধ্যে চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তির বাঁচা-মরায় যুক্ত হয়েছে। রসিও তার চিত্তস্বাতন্ত্র্যে নারীর মাতৃত্বভাবনার মনস্তত্ত্বে ভিন্ন মাত্রা পায়। রসি ও সনাতনের সংঘাত-সংঘর্ষ ও সংকটের জোরেই গল্পের গতির

একমুখিন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, প্রয়োজনহীন বর্ণনার, চরিত্রের situation-এর বিস্তার অনুপস্থিত। গোড়াতেই বলেছি, গল্পে আখ্যায়িকা চরিত্র ও প্লটে নিবিড় থাকায় ছোটগল্পের মূল রসসৃষ্টিতে কোনো বাধার প্রমাণ রাখেনি। বিবরণ-সর্বস্বতা নয়, গল্পকার ছোট ছোট বাক্যে, 'ড্যাস্' 'ডট্' চিহ্ন একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে শূন্যস্থানে চাপা অধিক কথনকে সংযত করতে পেরেছেন। জগদীশ গুপ্তের গদ্যরীতির এ-ও এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নিষ্ঠুর ভাগ্যের দিক, তার নির্মমত্ব, মৃত্যুর বিষাদকে, পরিণামের বিষাদকে গল্পকার অবশ্যই নিস্পৃহ ইঙ্গিতবৈশিষ্ট্যে শিল্পের বড় মান দিতে (করিতে) সক্ষম হয়েছেন। গল্পের 'মহামুহূর্ত' সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে আগে আলোচনা করেছি। আবার বলি, সনাতনের চরিত্রেই বিশেষ ভাবের অর্থাৎ অদৃষ্টের নির্মম ক্রিয়ার নির্ভরতায় 'মহামুহূর্ত' ক্ষণটি নির্মিত, সনাতনের মনোলোকই গল্পের চরম অভিজ্ঞতার উপযুক্ত কেন্দ্র দেখায়। তার মনস্তত্ত্ব চরম মুহূর্ত রচনার আশ্রয়স্থল।

'হাড়' গল্পের ভাষায় যেখানে গল্পকার উপস্থিত, সেখানে গদ্য সাধু—কিন্তু চলিত কখনো বা কথ্য ক্রিয়া, সর্বনাম ব্যবহারে তার বাঁধুনি বক্তব্যের সহজ প্রকাশে সহায়ক। গল্পকার অনবদ্য এক চিত্রস্বভাবে সনাতনের চিতল মাছ শিকারের জীবন্তচিত্র উপহার দিয়েছেন। শিল্পের মানে তা পাঠকহৃদয় লুঠ করে নেয় বিস্ময়ে ও চিত্র দেখার আবেগে। আগেও বলেছি, গল্পকার তাঁর গল্পের কোথাও বাড়তি কোনো সিচুয়েশন, চরিত্র, ঘটনার যোগ ঘটাননি। গল্পের মধ্যে অকারণ প্রকৃতি বর্ণনার সুযোগ ছিল নদীতে মাছ শিকারের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, গল্পকার তা করেননি, কিন্তু যেটুকু বা প্রকৃতিচিত্র নির্মাণ করেছেন, তা অনবদ্য, কারণ তা প্রধান চরিত্রের মনোলোকের শিকারি-মনস্কতার সঙ্গে গভীর নিবিড় জড়িত। :

> 'সনাতন ডিঙি ভাসাইয়া দিয়া ওপারের ধানের খেতে প্রবেশ করিল। একখানা যাত্রী নৌকা গুণ টানিয়া উজান দিকে বাহিয়া গেল..... সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই—সময়টি অতি সুন্দর .... মেঘের গায়ে বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহ........জলে-স্থলে সোনার আভা......গাছের মাথায় আলোর মুকুট।.......'

এই প্রাকৃতিক শান্ত পরিবেশে একজন মাছ-শিকারি এমন নিমগ্ন থাকে যে কোনো বাইরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগে হয় গভীর অনীহ। এইটুকু প্রকৃতিখণ্ড সনাতনের পক্ষে শিকার কুক্ষিগত করার দিক থেকে সঠিক উদ্যমের উদ্বোধক।

পাঁচ

'হাড়' গল্পের নাম ব্যাখ্যাশ্রয়ী নয়, একটিমাত্র শব্দনির্ভর প্রতীকী। গল্পের বিষয়, চরিত্র ও পরিণামী সিচুয়েশনে এর যোগ ও গুরুত্ব সর্বাধিক। সাধারণ অর্থে গল্পে সনাতনের গলায় হাড় আটকে থেকে তার মতো শক্তিশালী মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া— এই ঘটনাগত তাৎপর্যে নাম মেনে নিতে আপত্তি থাকে না।

দ্বিতীয়ত, 'হাড়' গল্পে মাছের হাড় গল্পের নায়ককে শ্লেষ-ব্যঙ্গে কিছুটা তো আঘাত

করে তার স্বভাব বিচারে। ছেলে মথুরকে নিয়ে বিপুল আনন্দে মাছ-ভাত খাবার সময় সনাতন ছেলেকে সতর্ক করে ঃ

'কঞ্চির মতো বড়ো-বড়ো পেটির কাঁটা পাতের গোড়ায় স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল। সনাতন বলিল, মাছের কাঁটা বেছে খাস; গলায় বাধবে।
মথুর বলিল—তাই খাচ্ছি বাবা।'

এই সাবধান করার ঠিক পরেই সনাতন শ্বাসনালীর মুখে শ্বাসরোধকারী হাড়ের চাপ অনুভব করে। হাড়ের বাধায় অসহায় চিৎকারের মধ্যে সনাতনের মৃত্যু ঘটে। ডাক্তারের মতে, মাছের শিরদাঁড়ার হাড় বায়ুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে মধ্যপথে। এই যে পুত্রকে সাবধান করার পরেই নিজের সেই দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়া—এখানেই যেন গল্পকার নায়কের প্রতি সেই আসন্ন মৃত্যুর নিশ্চিতি ও নিশ্চিন্তির কথা ভেবে তীব্র শ্লেষ জাগান পরোক্ষে। নামের ব্যঙ্গ এক কঠিন জীবনবিনাশী ভবিষ্যৎবাণীর মতো।

তৃতীয়ত, যে মাছ অতি কষ্টে সনাতন একা শিকার করে, বাড়ি নিয়ে আসে, আনন্দে খাওয়ার ব্যবস্থা করে, সেই মাছের শিরদাঁড়ার হাড়েই তার মৃত্যু ঘটে, এ যেন আদিম প্রকৃতির অভিশাপ! চিতল মাছ আদিম প্রকৃতিব শক্তিমান উপকরণ। তাকে তীব্র যন্ত্রণার আঘাত দিয়ে, তার রক্তপাত ঘটিয়ে মেরে শিকারে বিজিত হয় সনাতন। এ যেন অদৃষ্টের প্রতিশোধ সেই মাছের দিক থেকে, পরোক্ষে। আদিম সহজ সরল বন্য প্রকৃতির অভিশাপ হল সনাতনের আকস্মিক মৃত্যু। তা গল্পকারের নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ভাগ্যের পরিহাস ও প্রতিশোধ নেওয়ার অভিজ্ঞতায় প্রতিচিত্রণ। রসির কোনো অভিশাপ নয়, তবে রসির কথাব মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া সনাতনের শিকারকালে বুকে ও শ্বাসনালীতে যে ব্যথার জন্ম দেয়, জন্ম দেয় আত্মবিশ্বাসে ভীরুতা ও অসহায়তার সূক্ষ্ম রূপ, তাতেই তার মৃত্যু আসে। হাড় যেন চরম ঘটনা সংঘটনের উপায়, উপকরণ। হাড় গল্পকারের নিরাসক্ত জীবন বিনাশ-ভাবনার প্রতীক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মানুষের হাড় ছিল তাহিতি মহিলার মন্ত্রগুপ্তি দেওয়া মায়াদণ্ড, সব কিছু প্রাপ্তির আশার প্রতীক, রোমান্টিক উপচার, অন্যদিকে জগদীশ গুপ্তের হাড় নিষ্ঠুর নিয়তি-সিদ্ধ বাস্তব সত্য। তাই 'হাড়' এমন নাম গল্পের পরিণতি ও গল্পকারের জীবনদর্শনের অভিজ্ঞতা-জড়ানো নতুন মৃত্যুবাণ। দধীচির হাড় তো মৃত্যুবাণই হয়েছিল অসুর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে! বর্তমান গল্পের নাম যেন এক দর্শনের রহস্যময় তত্ত্ব-প্রতীক।

৪.

অরূপের রাস

এক

জগদীশ গুপ্তের 'অরূপের রাস' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক ব্যতিক্রমী এবং অভিনব প্রেমের গল্প। সমস্ত প্রেমের গল্পের মতোই এই গল্পে জটিল মনস্তত্ত্ব আছে, সেই সঙ্গে আছে প্রেম-সম্পর্কের সঙ্গে নিবিড় জড়ানো পুরুষ-রমণীর যৌথ দেহ-ভাবনার কথা। জগদীশ গুপ্ত প্রেম ও তৎসংক্রান্ত দেহ-সম্পর্কের ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ নিয়ে

নতুন কিছু ভাবনার যোগ ঘটিয়েছেন। এর ফলে 'অরূপের রাসে'র কেন্দ্রীয় ভাবের বিস্তারে পরিকল্পনা ও পরিণাম হয়েছে সম্পূর্ণ নব-আস্বাদী। বাংলা ছোটগল্পে এ জাতীয় প্রেমের গল্প রচনায় জগদীশ গুপ্ত হয়েছেন প্রথম পথিকৃৎ।

গল্পটির মধ্যে যেটুকু আখ্যান আছে, তার বিস্তারে আছে দুটি ভাগ। আখ্যানে মেলে প্রধান দুটি চরিত্র—রাণু ও কানু। কানুর কথা দিয়েই সমগ্র গল্পটি উত্তমপুরুষের বয়ানে প্লট-বদ্ধ। রাণু ও কানুর ছোটবেলার সহজ সরল সম্পর্কের সূত্র ধরেই গল্পের ভূমিকা। রাণুর বয়স সাত, কানুর চোদ্দ তখন। কানু ব্রাহ্মণ বংশীয়, প্রতিবেশী রাণু জাতে ছোট। এই বিষয়টা গল্পে তেমন গুরুত্ব পায়নি, তবে, খেলার ছলে দুজনের মধ্যে 'ভাব-আড়ি'র সম্পর্ক প্রায়ই দেখা দিত। রাণুর বাবা যদুগোপাল দত্ত চাকরির বেতন, ক্রমশ নিয়মমাফিক বেতন বৃদ্ধি ও কিছু উপরিপাওনার দৌলতে সাংসারিক সচ্ছলতা বজায় রাখতেন।

রাণু কানুর সঙ্গে ছোটবেলার প্রিয়তায় ওর ঘরে আসত, কানুর বন্ধুত্বে তার কোনো শাসনকে গুরুত্বই দিত না রাণু। লঘুরসে তাকে অস্বীকার করতেই অভ্যস্ত ছিল রাণু। রাণুর বয়স দশ, কানুর সতেরো। এই বয়সের স্তরে রাণু মেয়ে হিসেবে বেশ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। বই-এর ছবি দেখাতে দেখাতে কানু যখন রাণুর কোমর এক হাতে জড়িয়ে কথা বলে, রাণুর মধ্যে নিজের শরীর সম্পর্কে অদ্ভুত এক সচেতনতা চাপা স্বভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। বিস্ময় ও উৎকণ্ঠায় রাণুর এমন আচরণের উদাসীন লক্ষ্য কানু যেমন বোঝে, রাণুও ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দেয়। সবটাই কৌতুক, অথচ কানুর কাছে রাণুর হেরে যাওয়ার অব্যক্ত লাঞ্ছনা মনে চাপ সৃষ্টি করে।

এর দিন দুয়েক পরে রাণু দশ বছর বয়সেই তার বিয়ের কথা ও পাত্রপক্ষের দেখতে আসার কথা জানায় কানুকে। এই মানসিকতায় দুজনের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রচ্ছন্ন মান-অভিমানের খেলা তৈরি হয়। খেলায় রাণুর কানুর প্রতি আকর্ষণের এক মনোরম প্রেমের চিত্র আঁকেন কানুর অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্পকার। রাণু অপূর্ব সুন্দরী এবং সহজেই পাত্রপক্ষের পছন্দের তালিকায় উঠে আসে। বিনা পণে রাণুর বিবাহের দিন স্থির। এর পর কানুর সঙ্গে কথা বন্ধ করে রাণু। যেন তার বাঞ্ছিত, গোপন, মৌন কানুর বিরুদ্ধে এইভাবেই প্রতিবাদ জানাতে চায়। তার বিবাহ উপলক্ষে কানুর লেখা বিয়ের পদ্যের কাগজ উনুনে পুড়িয়ে ফেলে তার অকথিত প্রেমের আর এক চাপা অভিমানকে সোচ্চার করে।

রাণুর বিবাহ, শ্বশুরালয়ে গমন, বাপের বাড়ি ফিরে আসার পর রাণুর বয়স যখন চোদ্দতে থামে, তখন বিবাহিত রাণুর তরুণী বয়সের পূর্ণ যুবতীর সৌন্দর্য দেখে কানু আবার মুগ্ধ। কিন্তু সেই চাপা অভিমানে রাণু পিত্রালয়ে এসে কানুকে সামনাসামনি দেখলেও কথা না বলে উপেক্ষায় এড়িয়ে যায়। গল্পের কথক একসময়ে নিজের কথা বলে রাণুকে, একা পেয়ে, এই ভাষায় :

> 'আমি কানু।
>
> রাণু বলিল,—তা জানি! তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও। বলিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলো।'

এই ছোট সংঘাত চিত্রের পর রাণু স্বামীর বাড়ি যায়। গ্রামে লাগে আকস্মিক মড়ক। বহু মৃত্যুর মধ্যে রাণুর মা-বাবা বারো ঘণ্টার ব্যবধানে মারা যান। এই খবরটা রাণুকে দিয়ে কানুরা হয় দেশান্তরী। ছ'মাস বাদে আবার গ্রামে ফিরে এলে কানুর বাবা রাণুকে তাদের খালি ঘর-বাড়ির একটা ব্যবস্থা করার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলে, রাণুর চিঠির কথায়, তা বিক্রি হয়ে যায়। আর একটি চিঠি লেখে, আগের দুটি অভিমানের সম্পর্ক তুলে রাণু কানুকেও :

> 'কানুদা, তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবেই না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড় দুঃখ।.....শুধু এইটুকু জানিয়া রাখো, তোমার সে উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই।—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ করো।'

এখানেই মূল আখ্যানের প্রথম ভাগ শেষ।

দ্বিতীয় ভাগের শুরু রাণুর স্বামী বদলি হয়ে রাণুরই হস্তান্তরিত বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসার খবর দিয়ে। নতুন আস্তানায় এসে রাণুর গোপন কান্নার অসহায়তা কাটে কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সখিত্ব পেয়ে। এইখানে এসে রাণুর ছেলে বেণু হয় ইন্দিরার একান্ত পছন্দের। রাণু ছেলে বেণুকে ইন্দিরাকে দিয়ে দিতে চায়। রাণু তার এক বাসনা জানায় ইন্দিরাকে —'আয় বৌ, তুই আর আমি এক হয়ে যাই।' কানুর মধ্যে এক অদ্ভুত জটিল ঈর্ষা দেখা দেয়। রাণু তার বাসনায় এক জটিলতম নারী। একসময়ে রাণুর স্বামীর বদলির খবর আসায় আবার বিদায় নিতে হবে। যাওয়ার আগের দিন রাণু কানুকে এসে প্রণাম করে। ছেলেকে ইন্দিরার কোলে দিয়ে এক অদ্ভুত বাসনা জানায় : 'কানুদা, কাল আমরা যাবো। তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।' ইন্দিরার কাছে রাণুর কথাবার্তা, বাসনা যেন এক পাগলের। ওদের দুজনের একসঙ্গে রাত কাটানোর মধ্যে শর্ত আছে। ইন্দিরার শেষ কথায় : 'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।'

এখানেই কানুর শেষ স্বভাবচিত্র :

> 'একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গেলাম।—
> ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।.... আমি তৃপ্ত।'

এইভাবে সমগ্র গল্পের নিগূঢ় আখ্যানের জটিলতম প্রেম-ভালোবাসার জটিল মনস্তাত্ত্বিক শেষ।

জগদীশ গুপ্তের 'অরূপের রাস' গল্পে কোনো বিশেষ বিশেষ ঘটনা উত্তেজিত ছোট ছোট আখ্যানপ্লটের শক্ত সুতো তৈরি করেনি। গল্পের আখ্যান আড়ালে থেকে গেছে, গভীর জটিল মনস্তত্ত্বসম্মত এক একটি ছোট ছোট চিত্র নায়কের অভিজ্ঞতার সূত্রে প্লটকে সমৃদ্ধ করেছে। এটি এক জটিলতম ব্যতিক্রমী প্রেম-ভালোবাসার গল্প। এখানে মনের জগৎই বাস্তব, তার প্রতিচিত্রণে প্লটের জাল অবচেতনের অন্ধকারে যেন আপন থেকেই তৈরি হয়ে ওঠে। বড় বড় দু-একটি ঘটনা থাকলেও সেগুলি সংযমে ও সংহতিতে প্লটেরই ছকের এক একটি বাঁকের 'ফাঁস'-এর স্বভাব পেয়েছে।

বাল্যপ্রেমের অবোধ বাসনা দিয়ে গল্পের শুরু। উত্তমপুরুষ কথক নায়ক চোদ্দ বছরের

কানুর সঙ্গে প্রতিবেশী সাত বছরের রাণুর খেলার ছলের সখ্যতা, প্রীতি-সম্বন্ধ নিছক কৌতুকেই পছন্দে-অপছন্দে মধুর ছিল। রাণুর বয়স যখন দশ, তখন কানুর বয়স সতেরো। এই স্তরে এসে সখ্যতা কৌতুকের মোড়কে জটিল হয়ে ওঠে বিশেষ করে নায়িকা রাণুর দিক থেকে। এই বয়সে কানুকে রাণুর নিজের বিবাহের কথা জানানো ও প্রতিপক্ষে কানুর কাছ থেকে কিছু ওর কাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়ার না পাওয়ায়, এই বয়সেই একটি ছেলের সঙ্গে বয়সের স্বভাবে ও পার্থক্যে সচেতন হওয়ার প্রসঙ্গে কানুর স্বীকারোক্তি : 'অর্থটা আমার না বুঝিবার কথা নয়—এবং অক্লেশে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া দশ বছরের বালিকার এই অকাল-পরিপক্কতায় আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।' রাণুর আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে কানুর লেখা বিবাহের পদ্যের পাতাটিকে আগুনে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি রাণুর মান-অভিমানের চাপা মনস্তাত্ত্বিক খেলাগুলি গল্পের প্লটে গভীর অবচেতন লোকের চিত্রের ব্যঞ্জনা আনে।

বিবাহের পর রাণুর চোদ্দ বছর বয়সেই নায়ক কানু প্রথম দেখে অসাধারণ সুন্দরী একটি মেয়ের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যরূপ। নায়কের কামনা-বাসনার তীব্রতা এক অসামান্য দূরান্বয়ী প্রেমার্তির জন্ম দেয় গোপনতম মনোলোকে। নায়কের স্বীকারোক্তি : 'অন্তরলোকের জ্যোতির্মঞ্চের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিঃসঙ্গ দু'টি গ্রহের মতো সে আর আমি।' এর পরেই গ্রামে মড়ক, রাণুর বাবা-মার আকস্মিক মৃত্যু, রাণুর চিঠিতে তাদের ঘর-বাড়ি বিক্রি হয়ে হস্তান্তরিত হওয়া, মড়ক চলে গেলে দেশান্তরী কানুদের ফিরে আসা এবং রাণুর স্বামীর বদলি হয়ে রাণুরই হস্তান্তরিত বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসার খবর দেন গল্পকার। গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই খবরের পর থেকে কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে রাণুর সখ্যতা যেমন গভীর হয়, তেমনি গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব বা প্রেমবক্তব্য স্তরে স্তরে 'ক্লাইম্যাক্স' থেকে অন্তিম ব্যঞ্জনায় আমাদের বিস্ময়ে আপ্লুত করে।

'অরূপের রাস' গল্পে 'চরমক্ষণ' এসেছে এক বাক্যে নয়, স্তরে স্তরে রাণু, তার ছোট ছেলে বেণু, কানুর স্ত্রী ইন্দিরা ও কানুর মনের জটিল জাল বিন্যস্ত হতে হতে। ১. রাণুর নিজের ছেলেকে সখিত্বের কৌতুকে ইন্দিরাকে দিয়ে দেওয়ার বাসনা প্রকাশে, ২. রাণুর 'আয় বৌ, তুই আর আমি এক হ'য়ে যাই' ইন্দিরাকে দেওয়া প্রস্তাবে, ৩. দুজনের স্বামীর দিক থেকে, বৌ খোয়ানোর প্রস্তাবের কথায় ইন্দিরাকে বলা : 'কানুদাকে জিগগেস করিস সে খোয়াতে রাজি আছে কিনা' এমন বিকল্প ব্যবস্থা মনে করায়, এবং শেষ ৪. কানুকে বলা রাণুর প্রস্তাব : 'বৌ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে' এবং রাণুরই নিজের চুক্তিতে, ইন্দিরার কানুকে খবর দেওয়া : 'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি'—এমন চারটি যুক্তিক্রমে 'ক্লাইম্যাক্স' এক অভিনব জটিলতম দেহনির্ভর প্রেম-অভিজ্ঞতার ভিত তৈরি হয়ে যায়। গল্পের গঠনে নায়ক কানুর ক্রমিক মানসিক আলোড়ন ও চেতন-অবচেতন লোকের আন্দোলন থেকেই এমন সিদ্ধান্তবাক্য : 'ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।...... আমি তৃপ্ত।'—যেমন নায়ক ও নায়িকা চরিত্রের, তেমনি সমগ্র গল্পেরও ব্যঞ্জনাগর্ভ উপসংহার। গল্পের চারপাশ থেকে তৈরি-হওয়া পরিকাঠামোর (Plot) সিদ্ধি এভাবেই শিল্পমূর্তির অনুগ হয়ে ওঠে।

দুই

গল্পের যে কেন্দ্রীয় সত্য (Theme), তা ঘনত্ব পেয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরু থেকে শেষ উপসংহারের মধ্যে। প্রথম পরিচ্ছেদে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতিপর্ব। কেন্দ্রীয় সত্যে নিহিত আছে গল্পকার জগদীশ গুপ্তের প্রেমের নির্গলিতার্থ পরিচয়ে দেহাত্মবাদী দর্শনের (attitude to life) চিন্তাভাবনা। দেহাত্মবাদী ভাবনায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিহারীলাল চক্রবর্তীর অন্যতম অনুসারী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক 'আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ'। বিগত বিশ শতকের প্রথমার্ধে, কুড়ির দশকের প্রথম দিকে কল্লোলের আবির্ভাব কালে রবীন্দ্র প্রতিক্রিয়ার কবি মোহিতলাল হন সোচ্চাব-কণ্ঠ ঃ 'দেহের দেউলে দেবতা নিবসে তার অপমান দুর্বিষহ।' তাঁর প্রেমের দেবতাকে কল্পনা করেছেন মানুষের দেহের মধ্যেই, দেহাতীত কোনো লোকে নয়। আবার রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র একটি কবিতায় তাঁর রোমান্টিক অভিজ্ঞতায় জানান 'প্রেমে হও বলী চেও না তাহারে/আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।'

গোবিন্দচন্দ্র দাস ও মোহিতলাল দেহের গভীরতম বাসনায় প্রেমের সৌন্দর্যের স্বরূপ ধ্যান করেছেন, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত 'অরূপের রাস' গল্পের শেষার্ধে নায়ক কানু যখন রাণুর বিশেষ attitude ধরে তৃপ্তি পূর্ণতার কথা স্বীকার করে, তখন আধুনিক মনস্তত্ত্ব ধরে সেই দেহেরই স্বাগত বোধনকে বড় স্থান দিয়েছেন। গল্পে কেন্দ্রীয় সত্যকে সেখানেই প্রতিষ্ঠা দিয়ে গল্পের 'থীম'-এর অভিনবত্বকে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন।

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'lesbionism', বাংলায় যার ব্যাখ্যা নারীদের 'সমকামিতা', তা দেহবাদেরই এক জটিল দিক। দুই যুবতী রমণীর সুমধুর দেহবন্ধনে, যৌথ দেহাচারের মূলে থাকে অবচেতন স্বভাবে দৈহিক প্রেমের খেলা। জগদীশ গুপ্তের নায়িকা রাণু স্বামী-সন্তান নিয়েও বাল্যপ্রেমের খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমসৌন্দর্যের অসীম বিভোরতায় তার প্রথম প্রেমিক কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে সমকামিতায় দেহসম্ভোগে প্রেমের অসীম মুক্তি চেয়েছে। কানুর প্রতি ভালোবাসার অসীম চুম্বক আকর্ষণের তীব্রতাকে ইন্দিরার দেহভোগের বিলাস ও গ্রস্ততায় তৃপ্ত হতে চেয়েছে।

কানুর প্রতি কৈশোরিক প্রেম বিবাহিত রাণু ভুলতে পারেনি। স্বামী ও পুত্রকে পাশে রেখে সে প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সমকামিতাকে সুস্থ উপায় ভেবেছে অবচেতনায়। তাই গল্পের মধ্যে নিহিত যে লেখকের প্রেমদর্শন, তাতে সমকামিতা দেহবাসনার বিকার থাকেনি যুগ যুগ ধরে আকর্ষণের ইতিহাসে হয়েছে বিশুদ্ধ প্রেমের পরিপূরক এক তৃপ্তি-অতৃপ্তির যন্ত্রণা ও পূরণমূলক আকাঙ্ক্ষার রক্তিম রূপ। অন্যদিকে রাণুর প্রতি তার বিবাহ-উত্তরকালে গড়ে-ওঠা কানুর যে প্রেম-সৌন্দর্যের আকর্ষণ, তার ব্যর্থতার ভিতকে বিশুদ্ধি দিয়েছে রাণুর ইন্দিরার সঙ্গে সমকামিতার লাবণ্যের বিপুল সমুদ্র থেকে অমৃতভাণ্ডের উত্তোলনে। গল্পের শেষে রাণুর স্বামী বসন্তবাবুর বদলির খবর আসে। রাণু সোজাসুজি প্রেমিক কানুকেই জানায : ' তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।'...... 'আর তো দেখা হবে না।' রাণু ইন্দিরাকে প্রস্তাব দেয় রাতের শয্যায় সে হবে স্বামী, ইন্দিরা হবে স্ত্রী।

এই যে বন্দোবস্ত, এর মধ্যে যেমন রাণুর পরিকল্পিত তার প্রেমিকের চিরন্তন কাঙ্ক্ষিত প্রবল প্রেমের স্বাদ মিলবে, তেমনি তৃপ্তি আসবে কানুরও বিবাহিত, সপুত্রক রাণুর এমন দেহাত্মবাদী ভালোবাসার সূত্রে! এ প্রেমে দেহও রইল, প্রেম-সৌন্দর্য রইল, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থাকল প্রেমিক-প্রেমিকার গোপনতম যৌথ প্রেম-স্বীকৃতির ও চিরন্তন বন্ধনের শক্ত গিঁট। গল্পের কেন্দ্রীয় সত্যের দর্শন এখানেই। জগদীশ গুপ্তের প্রেম সম্পর্কিত এক নতুন conception গল্পটিকে অবশ্যই ব্যতিক্রমী করেছে। এইভাবে দুই বিবাহিতা রমণীর, তার মধ্যে এক নারীর একটি শিশুসন্তানও যেখানে মধ্যবর্তী—সমকামিতার বিস্ময়কর নিবিড়তা, ভালোবাসার কাব্য রচনা—তা সমকামিতার সীমা অতিক্রম করে রাণু ও কানুর গোপনতম প্রেমশক্তিকে অচ্ছেদ্য আকার দিয়েছে। প্রেম হয়েছে, দুই রমণীর সমকামিতাকে ছিন্ন পরিত্যক্ত বসনের মতো ফেলে রেখে, চিরকালের মানব সম্পর্কের এক অবচেতন মনের আধুনিকোত্তম সঙ্গীত। অরূপের রাসলীলায় এটাই আধুনিক জীবনের এক সবচেয়ে বাস্তব জীবনবেদ। ফ্রয়েডীয় ও অন্যান্য যৌনতত্ত্ব ব্যাখ্যাকারদের কাছে যা হয়ে আছে সমকামিতার 'সাব-কন্‌সাস' ও 'সাইকলজিক্যাল' মনের তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা, কথাশিল্পী জগদীশ গুপ্তের কলমে তার মূল্যায়ন জীবন-বাস্তবের কাব্য!

তিন

'অরূপের রাস' গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্প। রাণু, কানু ও ইন্দিরা—এই তিন চরিত্রের অভূতপূর্ব মানসরূপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গল্পের গোটা কাঠামোকে শক্ত বাঁধন দিয়েছে। গল্পে উত্তমপুরুষ কথক কানু নায়ক, রাণু অবশ্যই নায়িকা, ইন্দিরা কি প্রতিনায়িকা? এ প্রশ্ন সহজেই উঠে আসে। অন্তত গল্পের সিদ্ধান্ত-সত্য ধরে বিচার করলে ইন্দিরার উপস্থিতি ওই দিকেই চরিত্রটিকে কিছুটা জায়গা দেয়!

যদিও উত্তম পুরুষ নায়ক কানুর কথা দিয়েই গল্পের শুরু, তবু রাণু গল্পের গোড়াতেই তার একটা বড় জায়গা ধীরে ধীরে অধিকার করতে থাকে। এক অদ্ভুত জীবন্ত, বাস্তব নারী এই রাণু। প্রেমের এমন পুতুল থেকে প্রতিমারূপ রাণুর, যা এককথায় গোড়াতেই পাঠক-হৃদয় অধিকার করে নেয়। বালিকা বয়সের রাণুর কৌতুক খেয়াল-খুশির আচরণ রাণুর নিজেকেই অভিজ্ঞতায় সপ্রতিভ করে। রাণু বাংলা কথাসাহিত্যে বাল্যপ্রেমের সূচনা, বিস্তার, সিদ্ধান্তে গল্পকারের একেবারে নিজস্ব দ্বিতীয়রহিত creation। এর ক্রমিক প্রেমস্বরূপ ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান প্রেমের গল্পে নিশ্চিত তুলনারহিত। রাণুর যখন বয়স দশ, কানুর সতেরো। এই দশ বছর বয়সেই পুতুলখেলার হাল্কা মেঘ সরিয়ে রাণু স্বভাবে অন্যরকম। কানু তার কোমর জড়িয়ে ধরে সাধারণ কথা বললে রাণুকে অদ্ভুত এক আড়ষ্টতা সজাগ করে। পুরুষের স্পর্শে তার আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ তা দেখছে কি না এই অবোধ-জটিল সতর্কতা তার মানস-বিবর্তনের প্রামাণ্য হয়। কানু তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এই বোধে রাণু কানুকে অস্বীকার করে আর এক জটিল খেলায় আনন্দ পায়। রাণুর বিয়ের খবর নিজে থেকে কানুকে দিলে কানু রাণুর কথায় গুরুত্ব না দিলে রাণু

ছদ্ম অভিযান ও রাগের খেলায় মাতে। আবার বিবাহের পর চাপা কোনো অজ্ঞাত অভিমানে কানুকে এড়িয়ে চলতে চলতে চোদ্দ বছরের যুবতী রাণু এক নির্জন পরিবেশে তার দৃপ্ত প্রতিবাদী কথা শোনায় : 'তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও।' এমন কথায় আমরা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়িকা যোগবলে শাসিত শৈবলিনীর প্রতাপ সম্পর্কে এক চিন্তার কবিত্বময় রোমান্টিক উক্তি শুনি : 'সে আমার মৃত্যু।' শৈবালিনী ও রাণুর বাল্যপ্রেমের যে অন্তরতম অভিজ্ঞতা, জগদীশ গুপ্তের নায়িকা রাণুর প্রেম বাস্তবের রোমান্টিকতায় নতুন মাত্রা আনে।

এভাবেই নায়িকা রাণু হয়ে ওঠে তুলনারহিত। একসময়ে রাণু তার নানান বিরোধিতার মধ্যেও চিঠি লেখে কানুকে,—'কানুদা, তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবেই না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড় দুঃখ।' গল্পের শেষ দিকে রাণু প্রকাশ্যে কানুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী, অন্যদিকে ক্রমশ হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক দাবদাহের মধ্যে অসহায় প্রাণীর মতো পিপাসার্ত। সে এখন মা-বাবাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ, স্বামী বসন্তবাবু ও শিশুপুত্র বেণুকে নিয়ে সফল যুবতী গৃহিণী, কিন্তু ভিতরের সেই প্রেমার্তিকে মুছে ফেলতে পারছে না। বিশুদ্ধ প্রেমসৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা মজ্জাগত, প্রেমিকের সান্নিধ্যের রক্তাস্বাদে, লালসায় নিঃসঙ্গ লোলুপ। রাণু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাই গল্পকারের নায়িকা রাণু সমকামিতায় কানুর স্ত্রী ইন্দিরাকে অবাধ সখিত্বে কাছে টানে। সে ইন্দিরাকে তার রাতের শয্যার সঙ্গিনী করে। তাদের সে সম্পর্ক প্রতীকে হয়ে ওঠে অন্য সম্পর্কের—যেখানে রাণু নিজে স্বামী, ইন্দিরা তার স্ত্রী। উদ্দেশ্য—ইন্দিরার গভীরতম সান্নিধ্যের মধ্য থেকে তার প্রেমিক কানুর রক্ত, ত্বকের প্রচণ্ড উল্লাসকে শরীরে-মনে-আত্মায় আত্মস্থ করে মনের গভীরে তার প্রেমিকের আকর্ষণকে চিরন্তন করে রাখা!

এ এক অদ্ভুত নায়িকার আচরণ! ইন্দিরা বর্তমানে সন্তানহীনা—যদিও এখন বয়স পনেরো, সন্তান জন্মের প্রচুর সময় আছে তার। তবু রাণু নিজের সন্তান বেণুকে সামনে রেখে ইন্দিরার সন্তান বাসনাকে তীব্র হওয়ার সুযোগ করে দেয়। আপাতত অতৃপ্ত সন্তান-বাসনায় ইন্দিরা স্বামী কানুর কাছ থেকে প্রচণ্ড উত্তাপ, আবেগ পায় রাতের সহবাসে, রক্তের উন্মাদনায়। সমকামিতায় রাণু এক রাতে ইন্দিরাকে স্ত্রী সাজিয়ে তার শরীরের মধ্যেকার কানুর দেওয়া সমস্ত উত্তেজনা, আনন্দ, উত্তাপকে নিজের শরীরের কামনা-বাসনায় গভীর কোনো স্বাদ ভরাট করার মত অবস্থায় চলে আসতে চায়। এভাবেই রাণু স্বামীর বদলিতে অন্যত্র চলে যাবার আগে কানুর স্ত্রীর মধ্য দিয়ে কানুকে সর্বাঙ্গে রক্তের চলাচলে নিহিত করার জন্য সমকামিতার সাধনায় মাতে। এ সমকামিতার প্রাপ্তি চরমতম নিরঙ্গ প্রেমানুভূতির অফুরন্ত স্বাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করা! রাণুর স্বামী আছে, সন্তান আছে, তার সংসার জীবনের শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি আছে, কিন্তু প্রেমিকের প্রেমকে আ-মৃত্যু ধরে রাখার উপায় ছিল না। ইন্দিরার মধ্য দিয়ে প্রেমিকের প্রেমকে রক্ত-মাংস-মজ্জায় চিরন্তন করে রাখার এমন দিক বাংলা ছোটগল্পের নারীচরিত্রে দুর্লভ ছিল। রাণু তাই প্রেমিকা সত্তায় এক জটিলতম রমণী চরিত্র। শুধু দেহ নয়, শুধু রোমান্টিক কোনো আত্মা

নয়, দেহ ও আত্মার চরমতম মিলন স্বভাবে 'অরূপের রাস' গল্পের নারী চরিত্র রাণু গল্পকারের দেহাত্মবাদী স্মৃতি-সত্তা-ধৌত বিশুদ্ধ দর্শনে ব্যঞ্জনাগর্ভ symbolic।

রাণু, তার সন্তান ও পুত্র থাকা সত্ত্বেও, কানুকে এখনো তার কামনার যুক্তিও দেখিয়েছে, কৌতুকের স্বরে হলেও, ইন্দিরাকে। স্বামী কানুকে বলা ইন্দিরার রাণুর সঙ্গে তার একসময়ের ঘনিষ্ঠ সংলাপ-বিনিময় :

> "......সহজ কণ্ঠেই বলিল (ইন্দিরা), 'আমি বললাম পারো হও। কিন্তু একজনকে তা হ'লে বৌ খোয়াতে হবে।' বাণু বললে, 'কানুদাকে জিজ্ঞেস করিস সে খোয়াতে রাজি আছে কি না।'"

কৌতুকের ছলে রাণুর এমন সমাজ-বিগর্হিত উক্তি বস্তুত নায়িকার সত্যভাষণের ছলনাময় বাসনার প্রকাশ। গল্পের শেষে রাণুর যেসব কথা ও তৎপরতা, তা এক ব্যতিক্রমী নায়িকারই আত্ম-আবিষ্কার। সমকামিতার situation তৈরি করে রাণু যে তার নিঃসঙ্গ গোপনতম প্রেমের কথা বলেছে, তা নিকষিত হেম, সমকামিতার তথাকথিত আবিলতা তার কাছে একেবারেই তুচ্ছ।

'অরূপের রাস' গল্পে উত্তমপুরুষ বক্তা কানু অবশ্যই নায়ক। কানুব বাঙালি নারী সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা : 'বাঙালীর মেয়ে শিশুকাল হইতেই বিবাহের কথায় লজ্জা পায়।' রাণুর দশ বছরেই বিবাহ-ব্যবস্থা তাকে অভিজ্ঞ করে ক্রমশ। এই স্তরে কানুর ছিল বিস্ময়, উৎকণ্ঠা। কিন্তু যথার্থ একজন রূপরসিকের মতো সতেরো বছরের কানুর মনে দশ বছরের রাণুর রূপসৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ :

> 'রাণুর মুখের দিকে চাহিলাম—
> তার রাগ দেখিয়াছি, কান্না দেখিয়াছি, অবাধ্যতা দেখিয়াছি, চঞ্চলতা দেখিয়াছি—
> কিন্তু লজ্জা দেখিলাম এই প্রথম—
> রঙের এই লীলাপুলক।
> নিম্নের সকাল বাষ্পাচ্ছন্নতা অস্পষ্টতার ঊর্ধ্বে সদ্যোত্থিত সূর্যের শোণিতাভা শৈলশীর্ষে যেমন—তেমনি করিয়া রাণুর এই প্রথম লজ্জায় রক্তরাগ আমার অন্তরায়তনের সর্বোচ্চ স্থানটি দীপ্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া রহিল।'

রাণুকে পাত্রপক্ষ থেকে প্রথম দেখতে আসার সময়ে রাণুর এই পরিবর্তিত চিত্রের মহিমা কানুর মধ্যে প্রেম জাগায়। এই লজ্জায় সংস্কৃত কবি কালিদাস বর্ণিত সেই পার্বতীর লজ্জাচিত্রের ব্যঞ্জনার অনুভব ঘটে আমাদের : 'এবং বাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী/ লীলকমলপত্রানি গণয়ামাস পার্বতী।।'

কানুর মধ্যে রাণুব প্রতি প্রথম স্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রেমের জাগরণ ঘটেছে রাণুর বিবাহের পর, চোদ্দ বছর বয়সে। তার আগে রাণুর আচরণ, কথার রহস্য দুর্বোধ্যই থাকে, অস্বস্তিকর হয়। গল্পের শেষে কানুর অভিজ্ঞতা রাণু সম্পর্কে—একজন যথার্থ বিজয়ীর। নিজের স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে সখিত্বে, তাকে তার পুত্র বেণুকে দিয়ে দেওয়ার মতো খেলার ছলে,—'আয় বৌ তুই আমি এক হয়ে যাই' এমন প্রস্তাবে, সমকামিতায় নিজে

স্বামী আর ইন্দিরাকে স্ত্রীর ভূমিকা নেওয়ার মধ্যে কানু নিজেকে তৃপ্ত ভাবে। বিবাহের পর, সন্তান জন্মের পর, স্বামী থাকতেও রাণু কানুর স্ত্রী ইন্দিরার শরীর থেকে রাতের শয্যায় কানুরই স্পর্শসুখ চরম আগ্রাসে গ্রহণ করেছে রাণু। রাণুর এই প্রাপ্তির দিক কানুকে তার গভীর প্রেম-বাসনার বড় মান দিয়েছে। রাণু যে আজীবন তার আছে, থাকবে, এই দূরান্বয়ী রোমান্টিক সুখে, কানু অবশ্যই একজন বিজেতা, রাণু তার বিজিত প্রেমশক্তি। রাণু বিবাহের পরও, সন্তান পেয়েও, একমাত্র কানুরই, এই চিন্তায় কানুর শেষ উক্তি :

> 'ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।.... আমি তৃপ্ত।'

গল্পের এই পরিণতি কানুর পক্ষে যথার্থ এক নায়কোচিত প্রকাশ। ইন্দিরাকে তার বলা কথা : 'বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোশ ক'রে নিতে পারলে এরকম ব্যবস্থা কবা যায়। ......' এ যেন নায়কেরই কৌতুকছলে সত্য আন্তর-ভাষণ! কানু একজন রক্তমাংসের নায়ক।সতেরো বছবের যুবতী অপূর্ব সুন্দরী, উদ্ভিন্ন যৌবনা, বিবাহিতা রাণুর প্রতি আকর্ষণ তার মনে প্রবৃত্তির কিছু প্রকাশ জাগায় :

> '.....আমার অন্তর্গূঢ় সুখের শত্রু হইয়া উঠিল, ঈর্ষা। থাকিয়া-থাকিয়া বুক টন টন করিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, আমার নিজেরই বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটা ছবি—
>
> 'বাণু পরস্ত্রী—
>
> ...... এই জ্ঞানটা অনায়াস সুখ-সমাদরের সঙ্গে মনে-মনে লালন করিবাব বস্তু নয়— অনিবার্য অঙ্কুশ-তাড়না যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চায়।'

নায়কের এমন চিন্তাভাবনা এক প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা যা বাসনার দিকে আঙুল দেখায়। রাণুর ছেলে বেণুকে ইন্দিরার কোলে দেখে এবং বেণুর প্রশংসা যা স্ত্রীর কাছে শুনে কানুর মধ্যে জাগে রাণুর প্রতি আকর্ষণের আর এক অপ্রাপ্তিজনিত অতৃপ্তি শোচনা :

> 'কথাটা কানে গেলো, কিন্তু মন তখন অন্যদিকে ফুটিয়া চলিয়াছে......তাহারই (রাণুর) অঙ্গবিচ্যুত এই শিশু—তাহারই সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এই বিগ্রহ—তাহারই প্রাণের স্পন্দন দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দ-রস স্থানান্তবিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিযা আছে।......'

রাণুর ছেলের প্রতি ইন্দিরার ছিল অসীম বাৎসল্যের লালসা, কানুর ছিল রাণুর প্রতি প্রেমের পরম সম্ভোগের চাপা লালসা। 'কিন্তু দু'টিতে এমনি অমিল যেন হাসি আর কান্না।' রাণুর ছেলের চোখে কানু দেখে সেই রাণুর চোখ। দেখার মধ্যে কানুর অপূর্ণতা বোধ জেঁকে বসে। কানুর এই স্মৃতিনির্ভর প্রেমসৌন্দর্য বাসনা—যা ভোগেও তৃপ্ত হতে পারত—তা চরিত্রের অন্য 'dimension' আনে। আর এই অনুশোচনাই পূর্ণ তৃপ্ত হয় সমকামিতায় রাণুর ভূমিকার সুগভীর তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে। এখানেই নায়কের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য।

গল্পে নায়কের স্ত্রী ইন্দিরার স্থান কম এবং গল্পের কঠিন সিদ্ধান্ত রচনায় তার ভূমিকা মানুষের শরীরে তার শ্বাসের ভূমিকার মতো। ১. গল্পের যে দর্শন, ইন্দিরা ছাড়া সম্ভব নয়।

২. তার চরিত্রন্যায় নায়কের মানসিকতা ও স্বভাব বোঝাতে অত্যন্ত জরুরি। ৩. ইন্দিরা সহজ সরল, জটিলতা নেই, কিন্তু নিজের জীবনে স্বামী কানুর অস্তিত্বের মূল্যায়নে সতর্ক। ৪. রাণুর পুত্র বেণুকে দেখে তার যে বাৎসল্য বোধের জাগরণ, তা সমকামিতায় রাতের শয্যায় রাণুর বাসনাকে তীব্রতম করে তোলার পক্ষে একটি বড় উজ্জ্বল উপায়।

মেয়েদের সমকামিতা অর্থাৎ lesbionism বলতে যা বোঝায় ইন্দিরার স্বভাবের সহজতা ও সারল্য তাকে অস্ত্র করে রাখে। ইন্দিরা যে জটিল ব্যক্তিত্ব নয়, তার কথায় বোঝা যায়। তার বন্ধুত্ব, সঙ্গমাধুর্য রাণুকে শান্ত করার ক্ষমতা রাখে। তার সুন্দর ছেলের প্রতি বাৎসল্যের আকর্ষণ তীব্র করে। রাণু চতুরভাবে তাকে ছেলে বেণুকে দিয়ে দেওয়ার কথা বলে, অবশ্যই কৌতুকে। তাতে আপাতত সন্তানহীনা অথচ সক্ষম ইন্দিরা খুশি হয়। কানু রাণুকে 'দয়ালু' বললে ইন্দিরার লজ্জা তার sensitivenessকে জাগায়। এটাও রাতের সমকামিতায় তীব্র হওয়ার এক সূত্র। রাণুকে পাগল ভেবে তার বাসনাকে তুচ্ছ করে ভাবার মধ্যে ইন্দিরার মধ্যে আছে উদ্দেশ্যহীন অন্তরঙ্গতা ও সান্নিধ্য।

আমরা আগে বলেছি, ইন্দিরাকে প্রতিনায়িকা করা যায় কিনা—এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। শেষে একটি চিত্র—কানু-ইন্দিরার সংলাপ বিনিময়ে এমন :

> '....বলিলাম বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোশ করে নিতে পারলে এরকম বন্দোবস্ত করা যায়।......'
>
> কিন্তু হঠাৎ ইন্দিরার উৎসাহ যেন নিবিয়া গেলো।'

এই যে ইন্দিরার নিজের স্বামীকে নিয়ে আত্মগত প্রতিক্রিয়া—এর মধ্যেই আছে প্রতিনায়িকা হওয়ার মতো প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতধর্ম। কিন্তু ইন্দিরাকে সমকামিতায় রাণু এত ব্যস্ত ও উৎসুক যে ইন্দিরার অন্য দিক থমকে থাকে। গল্পে ইন্দিরা প্রধান গৌণ চরিত্র, কিন্তু তার উপস্থিতি গল্পের কাব্যদর্শনকে মূর্তিমান করেছে একান্ত স্বাভাবিকতায়।

চার

'অরূপের রাস' গল্পে ভাবের একমুখিনতা নিখুঁতভাবে রক্ষিত। গল্পটি যে একমাত্র চরিত্রাত্মক শিল্পকর্ম—একথা আগে বলেছি—তা এত আলোচনার পর পরোক্ষে তারই প্রামাণ্য দিক। গল্পকার মোট দুটি পরিচ্ছেদে গল্পটির কায়া গঠন করেছেন, নায়িকা রাণুর বালিকা বয়স, দশ বছর বয়সে, যখন নায়ক কানুর বয়স সতেরো, বিবাহের আয়োজন, বিবাহ ও পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়সে পূর্ণ যুবতীর সৌন্দর্যে নায়কের কাছে ফিরে-আসা এসবই মূল ভাবের সহায়ক ধর্ম পেয়েছে। দেহাত্মবাদী দার্শনিক তত্ত্বস্বভাবের প্রেমকথাকে, তার স্মৃতিকে শেষ পরিচ্ছেদে ঘনত্ব দেওয়া হয়েছে।

'অরূপের রাস' গল্পে গল্পকার ভাবের একমুখিনতাকে গতিপ্রাণ (dynamic) ও উপসংহার-শান্তির ব্যঞ্জনা দেওয়ার কারণের আর এক উপায় নিয়েছেন। গল্পের চরিত্রগুলির নামেই তার শিল্পসম্মত প্রমাণ। লক্ষণীয়, গল্পের নায়কের নাম 'কানু'— পৌরাণিক প্রেমিক কৃষ্ণের নামের অপভ্রংশে 'কানু'। নায়িকার নাম রাণু, সুন্দরী, রূপে লাবণ্যে রানির মতো যেনবা মহা-

ঐশ্বর্যময়ী—যাকে পাত্রপক্ষের দৃষ্টিতে দ্রুত স্বীকৃতি দান এবং রানিরই কথ্য সম্বোধন 'রাণু'। রাণুর অন্তরঙ্গ সখির নাম রাধা। কানুর স্ত্রী ইন্দিরা লক্ষ্মীর আর এক নাম—লক্ষ্মীর স্বভাবে শান্ত, মধুর। রাণুর স্বামীর নাম বসন্ত, পুত্রের নাম বেণু। বেণু ছিল কৃষ্ণের বাঁশি—বাঁশের বাঁশি—যার স্বরে মুগ্ধ হয়ে থাকত তার আরাধ্যা। এইভাবে গল্পের গোড়া থেকে গল্পকার পৌরাণিক প্রেমজগতের এক আকর্ষণীয় পরিবেশ রচনা করে গল্পের ভাবকে সমৃদ্ধ করেছেন। গল্পের মূল রস প্রেম—প্রেমের অসীম উত্তরণের দিকের প্রতিষ্ঠা করা। চরিত্রগুলির নাম সেই শিল্পপ্রয়াসে প্রচ্ছন্ন সহায়তা করে গেছে আদ্যন্ত।

গল্পে চরিত্রদের সূত্র ধরে লেখক চূড়ান্ত করেছেন মনস্তাত্ত্বিক অবচেতনলোককে, মূল সমস্যা বাল্যপ্রেমের সরলতা দিয়ে প্রেমকে আধুনিক জটিলতার মুখোমুখি এনেছেন। মেয়েদের সমকামিতা গল্পের মূল চাবিকাঠি যা দিয়ে নায়ক-নায়িকার বিদেহী প্রেমার্তিকে সামনে আনা সম্ভব হয়েছে। কানুর চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য, রাণুর প্রেমাকাঙ্ক্ষার দৃঢ়তা, বিরোধ-স্বভাবে ও শেষে আত্মসমর্পণ গতানুগতিক পথে আসেনি, এসেছে সমকামিতার প্রচণ্ড স্বভাবে দুই রমণীর যৌথ রমণ-রূপের লাবণ্যের শুদ্ধতাকে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। বাংলা গল্পে বিবাহপূর্ব প্রেমিক, প্রেমিকার বিবাহোত্তর জীবনের সন্তান সহ পূর্বপ্রেমিকের প্রেম রোমন্থনের এবং বিরহ ইত্যাদির একাধিক গল্প পাওয়া যায়, কিন্তু ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বভাবনাকে Refined করে এমনভাবে এক উত্তুঙ্গ প্রেমকল্পনার সিদ্ধ-দৃশ্য বোধহয় এই প্রথম পাওয়া গেল।

ঘটনা কম গল্পে, ঘটনা দিয়ে গল্পের বিস্তার সৃষ্টি যেটুকু প্রয়োজন, তার বাড়তি মেদ এ ব্যাপারে রাখেননি গল্পকার। প্রথম দিকে বাল্যপ্রেমের কৌতুক ও কৌশল কিছু বর্ধিত হলেও সংযমে তা শেষে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়েছে মূল উদ্দেশ্যকে মান্য করে। গল্পেব শেষে কানুর চিন্তায় যে ইঙ্গিতধর্ম—তা সমকামিতা-শোধিত ভিন্ন অভিজ্ঞতাব জন্ম দেয়। লেখকের ভাষা উত্তমপুরুষ কথকের উপযোগী বর্ণনা ও সংলাপ মিলে সাধু-চলিতের মিশ্রণে কথ্যরসকে আস্বাদ্য করে। সংলাপ চলিত, কথ্য, কিন্তু লেখকের বর্ণনায় সাধু শব্দের সঙ্গে চলিত ও কথ্যের অবাধ মিলমিশে পাঠকদের আপনত্বকে গরিমা দেয়। জগদীশ গুপ্ত বর্তমান গল্পে যেভাবে চরিত্রব্যক্তিত্ব তুলে ধরার সময় সংযম দেখিয়েছেন, মনের কথাকে শক্ত মাটির ওপর রেখে সঠিক জায়গায় গল্পের প্লটের শেষ কাঠামোটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছেন, তাতে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা ও পরীক্ষামূলক সমকামিতার সুষ্ঠু বাসনা রূপ পেয়েছে মহৎ শিল্পের মহিমময় অবয়ব।

পাঁচ

গল্পের নাম 'অরূপের রাস'। এমন নামে গল্পকার প্রতীকী প্রয়োগ করেছেন পৌরাণিক প্রেমের নায়ক কৃষ্ণের রাসলীলাকে। অরূপ হলেন কৃষ্ণ। পুরাণে আছে, কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা। রাস হল আক্ষরিক অর্থে গোপনারীদের মণ্ডলে কৃষ্ণরাধিকার নৃত্যোৎসব। সেই নৃত্যে আস্বাদ্য হয় অনির্বচনীয় আনন্দ। কৃষ্ণ সে আনন্দে রাসলীলা-রসিক আনন্দঘন প্রেমিক।

আভিধানিক অর্থে 'অরূপ' শব্দের তাৎপর্য রূপহীন বা নিরাকার। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণ লীলাই হল রাসলীলা। এই লীলায় অরূপ কৃষ্ণ বৃন্দাবনের রম্যবনে রমণ করতে আসেন। নিজের স্বামীকে কামাতুর দেখে রাধা তাঁর সঙ্গে নিবিড় হন। তত্ত্বের দিক থেকে রাসলীলা ভারতীয় ধর্মজীবনের সঙ্গে গভীর জড়িত। জ্ঞান ছাড়া ভক্তি দিয়ে অরূপের সান্নিধ্য মেলে। গোপীদের জীবনে এটাই মূল সূত্র। কৃষ্ণের বাঁশি হল অনন্তের আহ্বানের প্রতীক। অরূপ কৃষ্ণ ঈশ্বর, রাধা সেখানে মানবাত্মা। আবার রতিক্রীড়া, কামকেলি ও মৈথুন—সবেরই অর্থ রমণ। তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন একটি পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন : 'এ যৌবন ধর্ম দিব উপহার রমণে।'

এই সব তথ্য ও শিল্পের কবি-কৃতি থেকে 'অরূপের রাস' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবসত্য প্রতীকের মর্যাদায় সুদূরের ব্যঞ্জনা পায় গল্পে। বিবাহের পর নায়িকা রাণুর পক্ষে পূর্বপ্রেমিক কানুর সঙ্গে প্রেমের মিলন সম্ভব ছিল না। স্বামী সন্তান বেণুকে নিয়ে রাণু কানুকে আর যৌবনরাগরঞ্জিত ভালোবাসায় ডুবতে চাইবে কিনা কানুর সে রহস্যময় দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তা ছিল। ফলে রাণুর দিক থেকে কানুর প্রেম মর্যাদা পায় অরূপের প্রতি তীব্র প্রেম-কামের আকর্ষণমূল্যে। তাই রাণু স্বামী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও গোপনতম প্রেমশক্তিতে প্রবলতম সৌন্দর্য বাসনায় এক অভিনব রাসলীলার পথ নেয়। তা সম্পূর্ণত mental ও psychological, এবং দেহাত্মবাদ তত্ত্ব-অনুগ। কিন্তু তার আশ্রয় হয় কানুর স্ত্রী সহজ সরল শান্তশ্রী ইন্দিরার সঙ্গে রাতের শয্যায় সমকামিতায়।

পুরাণের রাধা অশরীরী তথা অরূপ কৃষ্ণের সঙ্গে কামকেলিতে বিভোর হন, একালের রাণুর রাসলীলার প্রতীকে ব্যঞ্জনায় সে কামকেলি সমকামিতার —এবং একান্তভাবে নায়িকা রাণুর কাছে। সমকামিতা যেনবা রসকুঞ্জে ঘটে গভীরতম অর্থে একটি রাতেই! একালের রমণীর যেন আর এক রাসলীলা। ইন্দিরার মধ্য দিয়ে রাণু তার প্রেমিক কানুর রক্তমাংসের জটিল সান্নিধ্যের উত্তাপ, আবেগ ও বাসনা নিজের ত্বক ও রক্তে লুঠ করে নিজের ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা দেখায়। তাই 'অরূপ' প্রতীকে 'কানু'র প্রতি চিরন্তন দেহ-আত্মার যৌথ কামাবেগে রাণু নিজের বাঞ্ছিত রমণ-তৃপ্তির মধ্যে নিঃসীম প্রেমিকা হয়ে যায়। গল্পের পরিণামী অভিজ্ঞতায় 'নব্য অরূপ ও নব্য রাসলীলা', তথা সমকামিতার ঈশ্বরীকরণ এমন গল্পনামের শিল্প-যৌক্তিকতার অনুগ হয়ে ওঠে। অরূপ-প্রতীকে যে রাসলীলা তথা কামক্রীড়া—তার নব্য ব্যাখ্যা নব রাসলীলার দ্যোতনা ও ভাষ্য পায়। গল্পটির নামের তাৎপর্যগত গভীরতা গল্পের বিষয়গত জটিলতার মতোই রহস্যময় ব্যঞ্জনাগর্ভ। আবার পুরাণে এমন ইঙ্গিতও আছে কৃষ্ণই নিজ শরীর থেকে রাধাকে বিচ্ছিন্ন করে রাসলীলায় মেতে উঠতেন রাসলীলাকুঞ্জে। সমকামিতার যে রাসলীলা একই, দুই রমণীর রাণু-ইন্দিরার সম্পর্কে সেই রাণুর বাঞ্ছিত রাসলীলার কিছুটা বা আভাস দেয়। গল্পের নায়ক সর্বশেষ 'আমি তৃপ্ত' এই স্বীকৃতির মধ্যে আছে দুজনের রাসলীলা-সত্তার পবিত্র প্রেমের পরিশীলন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪
মৃত্যু : ০১ নভেম্বর ১৯৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগে থেকেই লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার'-এ প্রকাশিত 'উপেক্ষিতা' নামের গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'র মাঘ সংখ্যায়, ১৩২৮ সালে, অর্থাৎ কল্লোলের আবির্ভাবের বছর দুই আগে। কিন্তু তিনি কল্লোলের যৌবনদীপ্ত উতরোলের মধ্য দিয়ে পদচারণা করেছেন সাহিত্যে। আর আশ্চর্য, যাকে বলে 'কল্লোলের কাল', বা 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র নিজস্ব একটা জগৎ— তা থেকে নিজেকে কোন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের বর্মে ঢেকে রেখে অন্য আলোয় বাংলা সাহিত্যকে আলোকিত করে গেছেন।

যখন রবীন্দ্র-বিরোধিতায় চারপাশ মুখর, তথাকথিত রবীন্দ্র-বিবিক্ত ভাবনায় নতুন কিছু কথা বলতে তৎপর কল্লোলের অর্বাচীন লেখককুল, তখন এই লেখক কেমন নিঃসঙ্গ থেকে সৎ আধ্যাত্মিক মানুষের মতো এক ধ্যান-তন্ময় জগৎ সন্ধানে নীরব-উন্মুখ। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব সমকালীন হৈ-চৈ-এর সঙ্গে তাল রেখে নয়, তাব তাল কেটেই বরং তাঁর বড় প্রকাশ। সে সময়ে শরৎচন্দ্র নানাভাবে অভিনন্দিত, সাহিত্যিক, বর্ষীয়ান। বাংলা গল্পে-উপন্যাসে তিনি তাঁর মতো করে পল্লীজীবন আঁকছেন, আনছেন বস্তু-জীবনের নানান সমস্যার প্রত্যক্ষ স্বভাব।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা থেকে সচেতনভাবেই অনেকটা নীরব প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সরে এলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রেখে কল্লোলের লেখককুল যেখানে নানাভাবে স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী হতে উৎসুক, উৎসাহী, বিদ্রোহের নামে প্রতিক্রিয়া-প্রবলতায় চিহ্নিত লেখক-ব্যক্তিত্ব, বিভূতিভূষণ সেখানে দলছুট কিছুটা। তাঁর 'পথের পাঁচালী'র বাস্তবতা তাঁকে নতুন পথের পথিক করে। তাঁর একাধিক গল্পও সমকালীন তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তাঁকে অন্য মেরুগামী করে তোলে। 'পুঁইমাচা', 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি', 'বুধীর বাড়ি ফেরা', 'বুড়ো হাজরা কথা কয়' ইত্যাদি একাধিক গল্পে লেখকের সেই ব্যতিক্রমী-ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট পরিচয় আছে।

কল্লোলের প্রধান প্রধান যোদ্ধাবেশী লেখকদের প্রায় সকলেই ছিলেন নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত। বিভূতিভূষণ সেই ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে হয়েছেন গ্রামীণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই নগর-ভাবনা সাহিত্যে উপকরণ হবে। এটা আমাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে দুষ্ট ভারত তথা বাংলার নিয়তি, নিয়তি তাব সাহিত্যেরও। সাহিত্য ক্রমশ নগরমুখীন হয়ে উঠবে, হয়েছেও তা-ই। রবীন্দ্রনাথেব

লেখায় নগরজীবন প্রেক্ষিত হয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তা সর্বাবয়ব রূপ পায়নি। কল্লোলের লেখকরা তাকে তাঁদের বাস্তবতায় এনে বসালেন। শরৎচন্দ্র পল্লীর দিকে মুখ রেখেই সাহিত্য রচনা করেছেন। বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের অনুসরণ করেননি, কিন্তু নিজের মতো করে নগরজীবন থেকে সরে এসে এবং নিশ্চয়ই তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোনো পলায়নী মনোবৃত্তি নয়, এক লক্ষণীয় ব্যক্তিত্বে গ্রামজীবনকে গ্রহণ করেছেন। এই গ্রাম শরৎচন্দ্রের গ্রাম নয়, অর্থাৎ এ বর্ষীয়ান লেখকের দেখা গ্রাম, বিভূতিভূষণের নয়।

আর একটি দিকও প্রসঙ্গত গ্রামজীবন-ব্যবহারের সঙ্গে লক্ষণীয়। কল্লোলের লেখককুল নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছেন সেকালে। তাদের জন্য দুঃখবোধ, মমত্ব, অসহায়তা— এসব তাঁদের বাস্তবতাকে এক ধরনের মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের দারিদ্র্যের ছবি, বিত্তহীনদের জন্য ক্লেশ-কান্না গ্রামজীবনের প্রেক্ষিতে যে মাত্রা পেয়েছে, বাস্তবতার যে শিল্পরূপে চিহ্নিত হয়েছে, কল্লোলের এই সূত্রের স্বভাব থেকে নিশ্চিতভাবে তা স্বতন্ত্র।

প্রসঙ্গত, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বাস্তবতার ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। আমাদের আলোচ্য 'পুঁইমাচা', 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি', 'বুধীর বাড়ি ফেরা', 'বুড়ো হাজরা কথা কয়' এমন সব গল্পে যে বাস্তব-জীবনের পট রচিত, যে গভীর জীবন-উপলব্ধির বিস্ময়-রস ও রহস্য ঘনীভূত, যে ব্যাখ্যাতীত সংস্কার থেকে মুক্ত আলোয় জীবনস্নানের নন্দন-স্বাদ, তার মূল ধাতু ও ধাত অন্য। বস্তুর যথাযথ তথ্য ও দৃশ্যের প্রত্যক্ষ সত্য real হতে পারে, কিন্তু reality নয়। মানুষের মনই সবচেয়ে বাস্তব। আর এই মনেই আছে শিল্পের reality। এবং তাই যদি হয়, তবে মনের সঙ্গে বস্তুভিত্তির কল্পনা যে মায়া রচনা করে তা-ই শিল্পের বড় দিক। real হল বস্তু, reality হল বস্তুর মায়া। বিভূতিভূষণ গ্রামজীবনের সত্যকে বস্তুরূপে কবিরাজী গাছ-গাছড়ার মতো জড়ো করেছেন কিন্তু তার ওপর যে বাস্তবতার প্রলেপ দেখা যায়, তা বস্তুর উপরে চাপানো নয়, বস্তু থেকেই বেরিয়ে-আসা তার সত্যরূপ। আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে বস্তুর সেই কাঙ্ক্ষিত সত্যরূপের আস্বাদ সত্য।

কল্লোলের কালে পদচারণা করেছেন বলেই, আর একটি কথা বলতে হয়, দুঃখ-দারিদ্র্যের জীবন, সহায়-সম্বলহীন মানুষের জীবনের সঙ্গে পল্লী-জীবনকথা কল্লোলের লেখকরা যেভাবে গ্রহণ করেছেন—যেমন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর কয়লাকুঠির গল্প ইত্যাদিতে, বিভূতিভূষণ সেভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি দেখেছেন বাংলার গ্রামকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আরও বড় করে। লেখকের রোমান্টিক কল্পনাই এর মূলে সক্রিয়। কোনো বিশেষ পল্লীঅঞ্চল নয়, কোনো বিশেষ জায়গার মানুষ ও প্রকৃতি নয়, তাঁর কল্পনায় পল্লীজীবন হয়েছে মানবজীবনের ছায়া—যাকে তাঁর মানুষগুলির থেকে কোনোকালেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যাবেও না। 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তি বা ক্ষেন্তির বাবা সহায়হরি চাটুজ্যেকে কি সেই গ্রাম থেকে বিবিক্ত করা সম্ভব? ভণ্ডুল মামা, বুধী, পাঁচু দাসী—এদেরও কোনোক্রমেই তার গ্রাম থেকে, নিজস্ব পরিবেশ থেকে, গ্রামীণ সংস্কার

থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না! অথচ এরা কোন গ্রামের মানুষ—কি বাংলার, কি বাংলার বাইরের!

অর্থাৎ বিভূতিভূষণ জাত-রোমান্টিকের মতোই গ্রামবাংলাকে দেখেছেন প্রকৃতি-ভাবুকতায়। রোমান্টিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল প্রকৃতি-অনুরাগ। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি দূর থেকে দেখা কোনো অস্তিত্ব নয়, বিলাসের কাম্যবস্তু নয়, প্রকৃতি তাঁর অস্তিত্বের প্রেরণা, মাটি, মাটির সজীব প্রাণ-স্বভাব। প্রকৃতিই তাঁর রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ। আর এই প্রকৃতি নগর-জীবনের কৃত্রিমতায় ধূসর নয়, গ্রামজীবনের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতায় চিরসবুজ। এমন প্রকৃতির নির্মল অথচ নির্মম স্বভাবের নামাবলী-জড়ানো গল্প তাঁর 'পুঁইমাচা', 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি'। 'পুঁইমাচা' গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় লেখকের প্রথম গল্প সংকলন 'মেঘমল্লার'এ। প্রবাসীর ১৩৩১ সালের মাঘ সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশকালের কাছাকাছি সময়ে। এই সময়ের তাপ এ গল্পে স্পর্শ করেনি, বলা ভাল, বিভূতিভূষণ এ গল্প লেখার সময় কল্লোলকে কাছে পাননি, যদি পেতেনও, তার সঙ্গে এর কোনো যোগও থাকত না নিশ্চয়ই, কারণ বিভূতিভূষণ যে কল্লোল-ছাড়া এক অন্য-মানসিকতার প্রকৃতি-প্রেমিক কথাকার এবং সে প্রকৃতিও যে একমাত্র পল্লীজীবন-সন্নদ্ধ, 'পুঁইমাচা' সে সত্যই প্রতিষ্ঠা করে।

ভণ্ডুলমামার গ্রামজীবনপ্রীতি, বুধীর নিজেকে কসাইখানা থেকে মুক্ত করার পর তার গ্রামের রাস্তা-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর পরিক্রমার পরিবেশ, 'মৌরীফুল'-এর নায়িকা সুশীলা ও সেই নগর-বধূটির যৌথ সম্পর্ক রচনায় গ্রামজীবনের প্রকৃতি-অনুষঙ্গ মৌরীফুলেব গ্রামীণ সারল্য ও সজীবতা— এসবই বিভূতিভূষণের অতি-অন্তরঙ্গ প্রকৃতি-প্রেমের অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে।

১.

পুঁইমাচা

এক

ডঃ সুকুমার সেন 'পুঁইমাচা' গল্পটিতে বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র বীজ লক্ষ করেছেন। আগেই বলেছি, 'পুঁইমাচা'র প্রথম প্রকাশ ঘটে প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩১ সালের মাঘ সংখ্যায়। 'পথের পাঁচালী'র প্রথম লেখা শুরু ১৭ই বৈশাখ, ১৩৩২। স্বভাবতই এই হিসাবে 'পুঁইমাচা' 'পথের পাঁচালী'র পূর্ববর্তী রচনা। এই দুই গল্প ও উপন্যাসে আছে বাংলার গ্রামজীবন, সহজ সরল শান্ত প্রকৃতি আর তীব্র দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বাঁধা মানব-মানবীর জীবনের উজ্জ্বল প্রেক্ষিত।

যাঁরা উপন্যাস লেখেন, তাঁদের মনের গভীরে তার একটি ছক কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যক্ষে অথবা অগোচরে তৈরি হতে থাকে। এই দিক থেকে 'পথের পাঁচালী'র খসড়া রূপ হিসেবে 'পুঁইমাচা'র কল্পনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সেই গ্রাম, সেই মানুষ, সেই প্রকৃতি যেন একই মায়ের নাড়ীর যোগে দুই ছোট-বড় সন্তানের জন্ম-রূপ তুলে ধরে এই দুই শিল্পরূপে। 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তি, সহায়হরি চাটুজ্যে, অন্নপূর্ণা যেন যথাক্রমে দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার পূর্বাগত ছায়া। তফাত শুধু ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত, সংহত, ব্যঞ্জনাময় পরিসরে শিল্পের তাগিদে ক্ষেন্তিকে বিবাহ দিতে হয়েছে, বিবাহের পর তার হয়েছে মৃত্যু, আর এই মৃত্যুই গল্পেব মধ্যে আবার বৈপরীত্যেব ব্যঞ্জনা এনেছে প্রকৃতি-মানুষের সম্পর্কের মৌল তাৎপর্যে। 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার বিবাহেব প্রয়োজন হয়নি, কারণ তাব মৃত্যু উপন্যাসের দীর্ঘ পথকে জীবন ও প্রকৃতির এবং অন্তর্নিহিত সম্পর্কের আবও বড় ডাইমেনশানের ব্যঞ্জনা দেয়।

'পুঁইমাচা' গল্পে আছে প্রকৃতির পটভূমিতে জীবন-মৃত্যুর রহস্য, জীবনের বিপরীতে প্রকৃতির নিরাসক্ত নির্মমতা। আসল কথা, এ গল্পে প্রকৃতিই একমাত্র নিয়ামক শক্তি। 'তৃণাঙ্কুর' বিভূতিভূষণের একেবারেই আত্মজীবনী ধরনের রচনা। এর এক জায়গায় লেখক বলেছেন,—'এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে। আমরা এর গাছপালার, ফুল ফল, আলো-ছায়া, আকাশ-বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে, শৈশব থেকে এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করা আমাদের বড় কঠিন হয়ে পড়ে।' বাস্তবিক পক্ষে সেই supernatural nature-কে বিভূতিভূষণ যে নানাভাবে, এই বস্তু-পৃথিবীর অন্তর্গত মানব সংসারে নানা আধারে রেখে গভীর-সন্ধিৎসু হয়েছেন, একেবারে প্রথম দিকের সার্থকতম গল্প 'পুঁইমাচা'-য় তার প্রাথমিক অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লক্ষ করি।

যে সময়ের প্রেক্ষাপটে 'পুঁইমাচা' গল্পের সৃষ্টি, সেই সময়ে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-মনস্কতার পাশে আরও কয়েকজনের প্রকৃতি-ভাবনার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয়। আমরা গ্রহসনাথ রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণ মহিমায় লক্ষ করি একালে। একালে একই আকাশে

সূর্যের পাশে চন্দ্রের মতো আছেন শরৎচন্দ্র। প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী কালের অন্তর্গূঢ় স্বদেশীয় শিল্প-প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিয়েছে 'কল্লোল-প্রগতি-কালিকলমে'র মতো পত্রিকা ও তাদের লেখক-গোষ্ঠীর কবিকুলে দেখা দিয়েছেন তরুণ কবি জীবনানন্দ দাশ। আর আছেন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে, তাঁকে প্রণাম জানিয়ে একদল রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী— যাঁদের মধ্যে কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখের নাম করতেই হয়।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এসময়ে ইংল্যান্ডে টি. এস. এলিয়ট তাঁর রচনায় স্পষ্ট করেই বলেছেন — 'We are the hollow men', বলেছেন 'Everyone is alone, or it seems to me'. —এসব কথা প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তর বুদ্ধিজীবীদের মানস- প্রতিক্রিয়ার আন্তরিক ভাষারূপ। আর এই ভাবনার সাযুজ্যে এদেশীয় কবি জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কল্লোলীয় কবি তাঁদের প্রকৃতি-ভাবনাকে সময়ের ইতি-নেতির সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ কবি রবীন্দ্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা বিরূপ-ভাবনার অস্বস্তিকে সফল করেছেন কাব্যের বিষয়ে প্রকৃতি চেতনায়।

বিভূতিভূষণকে এমন সব পরস্পর-বিরোধী প্রকৃতিরূপের ও সময়ের প্রহারের মধ্যে প্রকৃতিতে নিমজ্জিত-মুখ হতে হয়েছে। ক্রমশ প্রকৃতি-সম্পর্কিত জটিল তত্ত্বের 'ক্রশ-কারেন্ট' থেকে বেরিয়ে এসে একসময়ে তিনি হয়েছেন 'বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিচেতনার এক প্রবাদ-পুরুষ কথাকার।' বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-ভাবনা তাঁর একান্ত নিজস্ব অন্তরঙ্গ বস্তু, তার বিশেষ জীবনচর্যায় (attitude to life) নিয়ামক শক্তি। এবং এই সংজ্ঞায় যদি কোনো দর্শনের কথা মনে করায় এই লেখকের রচনা, তা প্রকৃতি-প্রভাবিত ও পরিশীলিত সর্বাংশে নিশ্চয়ই।

সমসাময়িক শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে প্রধান পটভূমি হয়েছে গ্রামবাংলা। আর এই গ্রামবাংলার ছবি, এর মানুষজন, এর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সমন্বয়ে মোটামুটি রূপ নিয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র কথাকার হিসেবে যতটা পল্লীবাংলাকে নিয়েছেন, তার মানুষজনকে নিয়েছেন, ততটুকুই থেকে গেছে সার্বিক শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে—তার কোনো উত্তরণ ঘটেনি বড় তাৎপর্যে। শরৎচন্দ্র শুধু হয়েছেন সাধারণ অর্থে সেকালের গ্রামবাংলার কথাকার। কথাটা মর্যাদা পায় রবীন্দ্রনাথের নাগরিক চেতনার পাশে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। কিন্তু সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম অর্থে রক্তের সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ প্রকৃতি-ভাবনাকে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নাটক—সর্বত্র, বলা যায়, লেপে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতির এক অভিনব সজ্জা, তাৎপর্য। এ সময়ের পাঠক রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনার সঙ্গে সম্যক পরিচিত।

পাশাপাশি জীবনানন্দের যেহেতু ছিল এক পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীপিত আধুনিক মন ও মনন, তিনি তাই তাঁর সময়ের পীড়িত পরিবেশ থেকে মুক্তির আর্তিতে সমগ্র পৃথিবীর মূলে কোথাও বুঝি কোনো গভীর ক্ষত তৈরি হতে শুরু করেছে—এমন বোধে বিশ্বাস

রেখে প্রকৃতিকে দেখতে চেয়েছেন। এই অর্থে জীবনানন্দ হলেন প্রকৃষ্টভাবে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের দ্বন্দ্ব-দীর্ণ বিশ শতকীয় সভ্যতা-সচেতন প্রকৃতির কবি। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ প্রকৃতি ভাবনায় ভিন্ন মেরুগামী। সংশয়াচ্ছন্ন দ্বন্দ্বসংকুল অস্থির সভ্যতার আর্তি তার প্রকৃতি-ভাবনায় এতটুকুও ক্রিয়া করেনি। তিনি প্রকৃতিকে জীবনের অনুষঙ্গী করে স্ব-রূপে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতি জীবনশক্তির একমাত্র নিয়ামক নিষ্ঠুর শক্তি। জীবনের পৌরুষ যতই প্রকৃতিকে জয় করুক, প্রকৃতি জীবনকে যেমন সেলাম করে, তেমনি অবলীলায় ধ্বংসও করে, তা করার পর আপন স্বভাবে নিরাসক্তিতে আপন বেগেই তার গতিময়তা! এমন একটা ভাবনা বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনায় নিহিত। এই চেতনায় কোনো দর্শন আছে কিনা পরে বিচার্য, তবে রোমান্টিক কৌতূহলে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করেছেন, তার রহস্যের জটের উৎসকে ধরতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্র-অনুজ কবিদেব হাতে কিন্তু এমন রহস্যসন্ধানী প্রকৃতিরূপ আমরা পাই না। তাঁদের প্রকৃতি চেতনায় পল্লীজীবন-ভাবনার সূত্র নিশ্চয়ই 'উপরিতলভিত্তিক' (superficial)। এই কবিদের সাধারণভাবেই চোখেব ঠিক নিচেই ছিল মন, আর এই মন দিয়েই মুখ্যত প্রকৃতির কখনো মনোরূপ, কখনো বা দুঃখময় ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপের প্রতিচিত্রণে ব্যস্ত হয়েছেন কবিতায। প্রকৃতি যা, সেইভাবেই তাকে সুন্দর করে এঁকে যাওয়ার চেষ্টাতেই এঁদের প্রকৃতি-চিন্তার গুরুত্ব।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনা বিশ্বপ্রসারী। 'গল্পগুচ্ছে' যে গ্রাম-প্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, সোনাব তরী-চিত্রা কাব্যগ্রন্থের ও পববর্তীকালেব প্রকৃতি-ভাবনার সঙ্গে তার যোগ নিবিড়তম—আয়নায দেখা কায়া ও ছায়া! রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনা মর্ত্যপ্রীতি তথা জীবনপ্রীতিব কক্ষশাযী। এবং পরিণামে জীবনেব ব্যাপক ও বড় জীবনের সম্ভাবনায় সূক্ষ্ম তাৎপর্যে সেই প্রকৃতির যথাযথ মূল্যায়ন ঘটেছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি তা থেকে অন্যপথের সন্ধানী। এ সন্ধান-প্রয়াস একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি জীবনেরই একটা অংশ। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করেছেন, তা মহৎ কবির আবেগের দীপ্ত, রঞ্জিত, বিভূতিভূষণেব সেক্ষেত্রে আছে অসীম কৌতূহল। বিভূতিভূষণের একটা কবিমন ছিল, তা অবশ্যই যুক্তি দিয়ে জীবনকে জানার ব্যগ্রতার সঙ্গে সম্যক সমন্বিত, কিন্তু এই যুক্তি নাগরিক-চেতনাজাত নয়, পল্লীজীবন ও প্রকৃতি-পরিবেশ লালিত চিরকালের মানবজীবন ও সংসাবের প্রতিরূপে বৈপরীত্য থেকে জন্ম-নেওয়া। বিভূতিভূষণ বাস্তব জীবনকে জানতে চান, বুঝতে চান তার অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, মমতা, মান-অভিমান—সব কিছুকে মানবিক বোধের মাপকাঠিতে আনতে চান। এখানে তিনি ঔপন্যাসিকের স্বভাবধর্ম সঠিক বজায় রেখেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সুলভ কৌতূহলের সঙ্গে যোগ হয়েছে রহস্যময় প্রকৃতিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে বোঝার কবিমন।

প্রধানত একজন সতর্ক কথাকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বনিহিত কবিদৃষ্টি—

দু'য়ের সমাপতনে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-ভাবনা লোভনীয় স্বাতন্ত্র্য আনে রবীন্দ্রনাথ থেকে। তিরিশের কালে কোবিদ কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনার ঋদ্ধ রূপায়ণের পাশে বিভূতিভূষণ নিজস্ব ক্ষমতার গৌরব-গরিমা বজায় রেখেছেন। এই নিজস্বতা প্রমাণ হয়ে যায় রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের প্রকৃতি-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা থেকেও। একই সময়ে কথাকার হিসেবে অসম্ভব জনপ্রিয় শরৎচন্দ্র। কথাকার বিভূতিভূষণ মোহময় জনপ্রিয়তায় নয়, সত্যিকারের জীবন ও প্রকৃতি-ব্যাখ্যায় অন্য জাতের ও ধাতের যে কথাকার হতে পেরেছেন, সময়ের পাঠক-জনতার রুচির সম্যক বদলে সহায়ক হয়েছেন, তার কারণ হল, বা তার চিহ্নিত শক্তি হল বিভূতিভূষণের রচনার প্রকৃতি-প্রয়োগের বিশিষ্টতা।

দুই

এমন প্রকৃতি-ভাবনার বিশিষ্টতায় 'পুঁইমাচা' গল্পটি 'পথের পাঁচালী'র মতোই লেখকের সার্থকতম রচনা। পুঁইমাচার কেন্দ্রীয় লক্ষ্যটিই প্রকৃতি। এই লক্ষ্যে ক্ষেন্তির মতো একটা গ্রাম-বাংলার সহজ সরল কিশোরী যুক্ত হয়ে যাওয়ায় গল্পটি কথাকারের অপরূপ শিল্প-স্বাদের ফসল হয়ে উঠেছে। 'পুঁইমাচা' গল্পের শ্রেণী নির্ণয় করতে হলে একে রোমান্টিক প্রকৃতি-ভাবনার গল্প বলাই সঙ্গত। এ গল্পের স্বাভাবিক টানের মধ্যে সমকালীন সমাজ-সমস্যা আছে, কোনো কোনো চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যও দুর্লক্ষ্য নয়, গ্রাম্য একটি দরিদ্রের সংসারের বাস্তব প্রতিরূপও আছে, কিন্তু এসব ছাড়িয়ে বড় হয়েছে রহস্যময় প্রকৃতির গভীরতম তাৎপর্য এবং সম্ভব হয়েছে মানুষের সমন্বয়ে মানুষের ভাগ্য-ব্যাখ্যায়। আমরা এমন শ্রেণীনির্ণয়ের সিদ্ধান্তে আসি এই কারণে যে, গল্পের অন্তিমে কথাকার যে প্রতীকী-ব্যঞ্জনা এনেছেন তা একেবারে প্রকৃতির মূল রহস্যের দিকে তার 'pointing finger'কে স্থির রাখে। সমস্ত অভাব-অভিযোগ, অসহায়তা, মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে যায় প্রকৃতির অমোঘ গতিময়তায়।

আবার সমগ্র গল্পটির পটভূমিতে আছে বাংলার এক প্রকৃতি-লালিত শান্ত গ্রাম, তার মানুষজন, তার গাছপালা, ফলমূল। ক্ষেন্তির বাবা সহায়হরি চাটুজ্যের যে আচার-আচরণ, সংসার-জীবনের জটিল দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে নিরাসক্তি তা-ও একান্তভাবে গ্রামেরই, কোনোমতেই শহরের নয়। তার স্ত্রী অন্নপূর্ণার যে উৎকণ্ঠা, আবেগ, স্নেহ, আর্তি, ভয়, যন্ত্রণা ও সংকট, হতাশা ও আশা— তা-ও শান্ত এক গ্রামজীবনেরই দারিদ্র্যে পোড়-খাওয়া সংসারী বধূর। যে স্বামী-স্ত্রীর সংসার-চিত্রের বাস্তবতা সমগ্র গল্পে crude reality-র জগৎকে স্বভাবী পাঠকদের সামনে আনে, তা-ও এমন প্রকৃতি-পরিবেশ-নির্ভর গ্রামেই সার্থকভাবে আঁকা সম্ভব।

'পুঁইমাচা' গল্পের যে নায়িকা বড় মেয়ে ক্ষেন্তি— সে-ও প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে রক্তের আত্মীয়তায় লেগে থাকে যে, গল্পের মধ্যে ক্ষেন্তিকে ধরে টান দিলে, গল্প থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করলে গল্পের শেষের সেই বেড়ে-ওঠা পুঁইমাচাতেও টান পড়ে প্রবলভাবে। ক্ষেন্তি সহজ, সরল, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, ভোজনপ্রিয় মেয়ে। তার স্বভাবের মধ্যেকার শান্ত রূপটি নির্বাক চলাফেরায়, বাবা-মার অনুগত স্বভাবে প্রকাশ পায়। যে স্বভাবে সে সারা

গল্পে চিত্রিত, গল্পের শেষে সেই স্বভাবেই আসে প্রকৃতি। তাই মায়ের জঠরের ভ্রূণটিকে অপরিমিত অবস্থায় প্রবল বেগে টেনে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে মায়ের যেমন প্রাণসংশয় অবধারিত হয়ে ওঠে, যেমন মাতৃশরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অক্ষম শক্তি-প্রয়োগের ফলে সপ্রাণ ভ্রূণেরও জীবনবিনাশ হওয়ার শঙ্কা সত্য হয়, তেমনি গল্পের পুঁইমাচার সঙ্গে ক্ষেন্তির সেই সম্পর্ক-ভাবনা গল্পের নায়িকা চরিত্র ও প্রকৃতির সম্পর্কটির মৌলিক মূল্যবিচারে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে বিভূতিভূষণ 'সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' যে পুঁইমাচাটির চিত্র এঁকেছেন, তা যেন তুলনায় ক্ষেন্তির অস্তিত্বকেই সারা গল্পের অবয়বে ব্যাখ্যার সহায়ক হয়, অর্থাৎ একমাত্র ক্ষেন্তিই বুঝিবা সমগ্র 'পুঁইমাচা' গল্পের একমাত্র লাবণ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল তীব্র রোমান্টিক কবি মন। তাঁর প্রতীক প্রয়োগে সেই মন সক্রিয়। মার্জোবি বুলটনের মতে একজন কবি 'chooses an image to express his own experience for himself'। 'পুঁইমাচা' গল্পের শেষে লেখক যে একটি কল্প-চিত্রকে কয়েকটি বাক্যবন্ধের গাঢ়তায় এঁকেছেন, তার মধ্যে লেখকের রোমান্টিক মনের উত্তুঙ্গ স্বভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যু মানুষের সবচেয়ে crude reality। কিন্তু এই মৃত্যুকে রোমান্টিক কবি-কথাকার যখন কোনো প্রতীকের সঙ্গে যোগে বৈপরীত্যে জীবন-দর্শনের উপযোগী বড় ব্যঞ্জনা দান করেন, তখন মৃত্যু reality থেকে romantic ideality-র গভীর-সন্নিহিত হয়ে পড়ে। ক্ষেন্তির মৃত্যু নিষ্ঠুর সত্য ও বাস্তব। লেখক তাকে নধর পুঁইগাছের সঙ্গে যোগে ব্যাপক অর্থ-তাৎপর্য দিয়েছেন। এখানেই বিভূতিভূষণের রোমান্টিক মনের বড় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষেব জীবন ও মৃত্যুর যোগে বর্তমান লেখক এক গভীর বেদনাকে অন্তঃশীল রেখেছেন। রোমান্টিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল সুখ নয় অ-সুখ, শান্তি নয় অ-শান্তি, তৃপ্তি নয় অ-তৃপ্তির মধ্যে যে এক গভীর নিরুদ্দেশ বিষাদ-বেদনা সক্রিয় থাকে, তাকেই জিইয়ে রাখা রচনাব সিদ্ধান্ত। 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তির পোঁতা 'প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' পুঁইচারাব মধ্যে বিভূতিভূষণ প্রচ্ছন্ন রেখেছেন পরোক্ষে ক্ষেন্তির জন্য গভীর দীর্ঘশ্বাস। পুঁইচারা যেন জীবন্ত ক্ষেন্তির লোভী-বাসনা ও মৃত ক্ষেন্তির অসহায় বিষাদের মিলিত অস্তিত্ব। এই চিত্রে প্রকৃতির দুর্মর, দুরন্ত, সর্বকালিক জয় ঘোষণা আছে ঠিকই, কিন্তু এসবের অধিতলে মহাভারতের শেষে যদুবংশ ধ্বংসের পর্বে কালপুরুষের ছায়ার সবার অলক্ষ্যে নিশ্চুপ সঞ্চরমান থাকার মতো ক্ষেন্তির অসহায় মৃত্যুজনিত দুঃখের বেদনা ও বিষাদের ছায়া লেগেই থাকে। তা হল রোমান্টিক প্রকৃতি-প্রেমীর সেই 'ইমেজ' সৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ বিপরীত ভাব-সংঘর্ষজাত উল্লাস-বিষাদের মিশ্র-ক্রিয়ার বিস্ময়কর দিক। 'পুঁইমাচা' গল্পের প্রকৃতি এক রোমান্টিক কবি-কথাকারের তৃতীয় নয়নের সামনে ধরা স্বচ্ছ আয়নার প্রতিবিম্ব।

তিন

'পুঁইমাচা' গল্পের কাহিনী অংশ নগণ্য। কাহিনীর নিজস্ব কোনো অভাবিত চমক নেই, নেই কোনো আকর্ষণীয় অভিনবত্ব। অতি সাধারণ সহজ সরল গল্প। ঘটনাও যা ঘটেছে, সবই গ্রাম্য পরিবেশে ছোটখাটো পারিবারিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই। গল্পের নায়িকা ক্ষেন্তি সহজ, সরল এবং ভোজনপ্রিয়। তার ভোজনপ্রিয়তা আধুনিক কোনো রুচির অনুবর্তী নয়, গ্রামেরই পরিবেশে সাধারণ সহজলভ্য কোনো প্রকৃতি-খাদ্যকে লক্ষ্যে রেখেই নিয়ন্ত্রিত। সামান্য এই লোভ ও বাসনাটুকু নিয়েই অতি-দারিদ্র্যের সংসারে মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। বিরোধ একতরফে, অর্থাৎ মা তার এই স্বভাবের বিরোধী। অন্নপূর্ণা মেয়েকে শাসন করে এমন লোভের জন্য, শাসন করে মেয়ে বড় হয়েও গ্রামের পথে বনে-বাদাড়ে বাবার সঙ্গে ঘুরে, কখনো বা একা, কখনো ছোট দুই মেয়ের সঙ্গে ঘুরে খাদ্যের উপযোগী শাক-পাতা সংগ্রহ করার জন্য। মেয়ে বড় হয়েছে, তার বিয়ের কথাও মাকে তাড়িত করে। এসব নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার ঝগড়া হয়। অতি দারিদ্র্যের সংসারে এসব নিয়েই খুঁটিনাটি বিষয়-নির্ভর ঘটনা ঘটে। কোনো বড় মাপের ঘটনা এ কাহিনীতে নেই অবান্তর। বড় ঘটনা বলতে একমাত্র ক্ষেন্তির মৃত্যু। তা-ও লেখক এমনভাবে ঘটিয়েছেন যা সেকালের সেই গ্রাম্য সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যেনবা সদা সর্বজনগ্রাহ্য।

তবু ক্ষেন্তির মৃত্যু কাহিনীকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। অনেক বয়স বেশি এক পুরুষের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিয়ে হয় একদিন। স্বামীর ঘরে চলে যাওয়ার পর পণের টাকা ঠিকমতো না দেওয়ায় তার শাশুড়ির অপবাদ দেওয়া এবং ক্ষেন্তির ভোজনপ্রিয়তার 'অশালীন' রূপের জন্যে ক্ষেন্তির সঙ্গে পিত্রালয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। শ্বশুরালয়ের দুর্ব্যবহারে, অবজ্ঞায়, অবহেলায় ক্ষেন্তির একদিন বসন্তরোগে মৃত্যু ঘটে। কাহিনীর শেষে এক সন্ধেয় পিঠে-পুলি তৈরির পরিবেশে অন্নপূর্ণার স্মৃতিতে ধরা, ক্ষেন্তির দুই ছোট বোন রাধী-পুঁটির কথোপকথনে ক্ষেন্তির স্মৃতি বড় হয়ে আসে। সেই স্মৃতির ব্যঞ্জনা ক্ষেন্তির রোপণ করা পুঁইগাছের বিবৃদ্ধি ও পুঁইমাচায় তার অবস্থানের প্রতীক হয়ে গল্পের সমাপ্তি আনে।

কাহিনীর শেষ ক্ষেন্তির মৃত্যুতে, কারণ ক্ষেন্তিই এই গল্পের নায়িকা, কিন্তু গল্পের শেষ লেখকের সেই সূত্রে ব্যবহৃত প্রতীকের ব্যঞ্জনায়। তাই কাহিনী বড় নয়, বড় হয়েছে লেখকের মানব ও প্রকৃতি-সম্পর্কিত রহস্য-গভীর ভাবনার কেন্দ্রই। 'পুঁইমাচা' গল্পের কাহিনীর বস্তুভিত্তি থাকলেও তা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, তার ঘটনাও লেখকের বাস্তবতার বিশেষ জ্ঞানে ধরা। কাহিনী এখানে কাঠামো মাত্র, গল্পের এক জটিল উদ্দেশ্যকে বহন করার উপযোগী আধার মাত্র। আবার অন্য অর্থে এই কাহিনীর অঙ্গে জড়িয়ে আছে গল্পের মূল লক্ষ্যও। তাই কাহিনী সহজ সরল কাঠামো হতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে সূত্রবদ্ধ বলেই কাহিনী-বৃত্ত যথোচিত শিল্পমর্যাদা-সম্পন্ন। গল্পের প্রথম দিকে যে পুঁইচারাটি অসময়ে মাটিতে পুঁতে রেখে ক্ষেন্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তার অন্তর-রহস্যের প্রকাশ ঘটায়, গল্পের শেষে সেই পুঁইচারাই ক্ষেন্তির মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে প্রকৃতিপ্রদত্ত আপন জীবন-

বেগে বড় হয়ে ওঠে, গল্পের ব্যঞ্জনায় গভীরতর সত্যটি স্পষ্ট করে। কাহিনীবৃত্তের এই সামান্য অংশটুকু ছোটগল্পের প্লটের অপরূপত্ব পেয়েছে। কাহিনী ও ঘটনাকে একেবারে সহজ, সরল, সাদামাটা রেখে গল্প বা উপন্যাসের আধারের শিল্পমর্যাদাকে বড় গৌরব দানের ক্ষমতা সেকালে একমাত্র বিভূতিভূষণের লেখনীতেই অসামান্য মূল্য পেয়েছে— এ-ব্যাপারে অন্য গল্পকার থেকে বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য স্থায়ী।

চার

গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের অভিজ্ঞতা হল তাঁর শিল্পভাবনার একমাত্র মূলধন, আব এই মূলধনকে খাটানোর প্রধান আধার হল চরিত্র। কাহিনীবৃত্ত বা প্লট সেই অত্যদ্ভুত অভিজ্ঞতার বাহক চরিত্রগুলিকে যেনবা স্রোতের টানে বেগ দেয়। বিভূতিভূষণেব 'পুঁইমাচা' গল্পের চরিত্রগুলি, আগেই বলেছি, সাদামাটা এবং গল্পের মূল লক্ষ্যকে ব্যঞ্জনাগর্ভ ও দীপিত করার কাজটুকু সমাধা করেই তারা তাদের শিল্পেব সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছে। তাই চরিত্র-প্রধান গল্পের মতো, যেমন, একাধিক সার্থক গল্পের লেখক তারাশঙ্করেব চরিত্র-চিত্রণের মতো, 'পুঁইমাচা' গুরুত্ব পায়নি।

'পুঁইমাচা' গল্পে একাধিক চরিত্র আছে— ক্ষেন্তি, ক্ষেন্তির পিতা সহায়হরি চাটুজ্যে, মা অন্নপূর্ণা এরাই আমাদের প্রধান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা ছাড়া কালীময় চৌধুরী, বিষ্ণু সরকার, এমনকি ক্ষেন্তির দুই বোন পুঁটি ও রাধীদেরও গল্পে কিছু নড়াচড়া লক্ষ করি। চরিত্র হিসেবে ক্ষেন্তিই গল্পের মূল লক্ষ্য এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু এই চবিত্র যেন গ্রাম্য-প্রকৃতির রাংতায় মোড়া। সে কথা বলে.কম, তার ভোজনপ্রিয়তা স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দারিদ্র্যের সংসারে তার ভোজনপ্রিযতা তার উদগ্র ঔদরিক স্বভাবের গ্লানি আনে না, ববং এক গ্রাম্য কিশোরীর একেবারে স্বাভাবিক জীবনযাপন-বৃত্তির সঙ্গে তা ওতপ্রোত থাকে। তাই ক্ষেন্তির মৃত্যু আমাদের হৃদয়, মমত্ববোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে টানে। তার মৃত্যু আমাদের যেমন বেদনা জাগায়, তার চলে যাওয়ার স্মৃতিসূত্রটি যখন লেখক তারই লাগানো পুঁইগাছ ও পুঁইমাচার ব্যঞ্জনায় এনে হঠাৎ নীরব হয়ে যান, তখন তার বেঁচে থাকার অসহায়তা ও তার প্রতি নিয়তির নির্মম প্রহার আমাদের একেবাবে মর্মে গিয়ে ঘা মাবে। গল্পের অন্তিম প্রতীক বিশেষ এক ক্ষেন্তির সাধারণ চরিত্ররূপকে অসাধাবণ, অলৌকিক এক চবিত্র-স্বরূপে নির্বিশেষ করে তোলে। একাধিক ক্ষেত্রে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়েও তার সভয় সত্যভাষণ, যে পুঁইশাক চিংড়ি মাছ দিয়ে খাওয়ার লোভ সেই পুঁইচারা রোপণ ও তাকে খেলার ছলেই বড় করার গোপন-মধুর বাসনা, পৌষ সংক্রান্তিতে দারিদ্র্যের সংসারে পিঠে খাওয়ার অদম্য আবেগ এবং স্বাদগ্রহণের কৌতূহল—এসব আমাদের ক্ষেন্তির অনেক কাছের করে তোলে। মায়ের নিবন্তর স্নেহে-শাসনে ক্ষেন্তির সত্যিকাবের স্বভাব অন্নপূর্ণার ভাবনাতেই ব্যক্ত— 'ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনে নি'। এমন ক্ষেন্তি বিবাহের পরেও

বাবা-মাকে ভুলতে পারেনি। বস্তুত এমন ক্ষেন্তি চরিত্রটি গ্রামের প্রাকৃতিক পটভূমিতে প্রকৃতিরই লাবণ্য, বিভা। নীরব প্রকৃতি আর জীবনে-মরণে নিশ্চুপ ক্ষেন্তি এক।

সহায়হরি চাটুজ্যে গ্রামেরই উপযোগী এক উদাসীন সংসারী মানুষ। তার সাংসারিক দারিদ্র্য তাকে জ্বালা ধরায় না, ক্ষোভে ভেঙে দেয় না, বরং সে-ও মেয়ের মতো প্রকৃতির বুকে সাংসারিক সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতা ও অসঙ্গতি থেকে মুক্তির স্বাদ নেয়। তার মধ্যে কন্যার প্রতি স্নেহ যেমন প্রবল, তেমনি কন্যার অপাত্রে বিবাহ-দানের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতার দিকও স্পষ্ট। দুঃখের কারণে তার আভিজাত্যের গৌরব এতটুকু ম্লান হয়নি তার মধ্যে। তার স্নেহ-মমতা, দোষ-ত্রুটি সবই মানানসই। অন্নপূর্ণা দরিদ্র গ্রাম্যজননীর সার্থক প্রতিরূপ। যেন মাটির ঘ্রাণ তার চরিত্রে মেলে। একদিকে ক্ষোভ-দুঃখ-অসহায়তা, অন্যদিকে কন্যাদের প্রতি, বিশেষ করে ক্ষেন্তির প্রতি চন্দন গন্ধের মতো গভীর স্নেহ, মমতা তাকে প্রকৃতির অঙ্কশায়ী চরিত্র করে তুলেছে।

কালীময় চৌধুরী গল্পের সে সময়ের সমাজ-ব্যবস্থার যথাযথ প্রতিরূপ অঙ্কনের ক্ষেত্রে সার্থক চরিত্র। সমাজপতিদের স্বার্থসর্বস্বতা, ধূর্তামি, ভণ্ডামি যে কি রূপ নেয় এই চরিত্র তা প্রমাণ করে। বিষ্ণু সরকার প্রসঙ্গটি সেকালের পণপ্রথার মানবতাহীন পরিণামকে তুলে ধরে। হিন্দুমতে আদিতে ছিল যে কোনো দানে দক্ষিণা প্রদানের রীতি এবং সেই সূত্রেই পিতা কর্তৃক বিবাহে তার কন্যাদানে সামান্য দক্ষিণা প্রদত্ত হত। ক্রমশ সেই দক্ষিণাই হয় যৌতুক। পণপ্রথাটি আসে বরপক্ষের দাবি হয়ে। সহায়হরি কন্যার বিবাহে সেই পণ যথাযথ দিতে পারেনি বলে যেভাবে ক্ষেন্তির প্রতি অমানবিক অত্যাচার হয় এবং ক্ষেন্তির মৃত্যু ঘটে, তা 'পুঁইমাচা' গল্পে দলিল হয়ে লিখিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের সমকালীন সমাজ-ভাবনা, যে সমাজ-ভাবনার প্রথম প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পে, 'পুঁইমাচা' গল্পে তা-ই কঠিন বাস্তবতায় অঙ্কিত। 'পুঁইমাচা' গল্পের চরিত্রগুলি যে সমকালীন সমাজ-ন্যায়কে মেনে নিয়েই অঙ্কিত এবং কাহিনী-সূত্র নায়িকার সঙ্গে প্রকৃতির স্বভাবের বৈপরীত্যেই নায়িকার মূল্যায়নে যথার্থতা পেয়েছে, সেখানেই এদের অনন্যতা।

পাঁচ

এ কথা সহজবোধ্য যে পুঁইমাচা কোনোক্রমেই ঘটনা-আশ্রয়ী গল্প নয়, নয় চরিত্র-কেন্দ্রিক। অনেকটা লেখকের বিশেষ attitude-এর সঙ্গে ওতপ্রোত এক বিশেষ ভাবের বাহক হল এই গল্প। এবং আমরা লক্ষ করেছি, এইভাবেই চরম অবস্থা এসে রূপ নিয়েছে গল্পের পরিসমাপ্তি-নির্দেশক এমন অনুচ্ছেদে, 'যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডালগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহিরে দুলিতেছে,

নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'

কোনো আকস্মিক ঘটনার দীপ্তিতে, বা ঘা মারার চমকে এই শেষ চিত্র তৈরি হয়নি।

এমন শেষ গল্পের প্রকৃতির সঙ্গে parallel, গল্পের নায়িকার স্বভাবের সঙ্গে সমান মাপে বিপরীত। এখানে চরিত্র একবারে গৌণ। গল্পে অকারণ কোনো বিস্তার নেই। এমন climax অংশ একজন কথাকারকে প্রকৃতি-প্রেমিক কবিপ্রাণতার বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। লেখকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গল্পের গোটা দেহ থেকে অতি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগোতে এগোতে climax অংশে প্রকৃতির প্রতীক ব্যবহারে লেখকের প্রকৃতি-দর্শনের অনন্য মর্যাদা এনে দিয়েছে।

ছয়

বিভূতিভূষণের গল্পের ভাষা তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশের যথার্থ অনুসারী। গল্পের আরম্ভই সহায়হরির কথায় প্রকৃতির সঙ্গে সূত্রবদ্ধ,— 'তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।' সারা গল্পের আবহে আছে ক্ষেন্তির পুঁইশাকের স্বাদু রসাস্বাদ গ্রহণের গভীর গোপন বাসনা, এটা তার ভোজনপ্রিয়তার সামিল। পিতার রস খাওয়ার বাসনা আব তারই বড় মেয়ের রসাস্বাদের জন্য অস্থিরতাবোধ— দু'য়ে কোথায় যেন মিল। গল্পের শেষে সেই প্রকৃতির অন্যতম আধার পুঁইগাছের রসপুষ্ট নবীন চেহারার চিত্রণে— 'কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাথা হইতে বাহিব হইয়া দুলিতেছে সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।' ছোটগল্পের এমন আঁটসাঁট গড়নের রচনারীতি গল্পটির অন্যতম শিল্পগৌরব। এই প্রতীকেব মধ্যে গল্পের বিষয়ের দুই মেরুসদৃশ বন্ধনে গল্পটির গঠন অনবদ্য।

ভাষায় মাঝে মাঝেই চরিত্রগুলির অন্তর-নিহিত sentiment-এর প্রয়োগ গল্পে গতি এনেছে। স্ত্রীর রাগের সময় সহায়হরির পলায়নেব যুক্তি ও লেখকের ভাষা প্রয়োগ, ক্ষেন্তির হাতের চুড়িতে লাগানো সেপ্‌টিপিনের বর্ণনায়—'পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়।'— এমন বাক্য প্রযোগ, 'পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত'— এজাতীয় স্বতঃস্ফূর্ত বেদনাবিধুর স্মৃতি-রোমন্থনের অশ্রুসজল সংক্ষিপ্ত অর্ধসমাপ্ত বাক্যাংশের ব্যবহার বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের ভাষায় আটপৌরে বৈশিষ্ট্যে গাঢ়তা এনেছে। এই গাঢ়তা ক্রমশ তরল কৌতুকরস থেকে গল্পরসের ঘনতায় বিস্ময়কর। গল্পের শেষে যেভাবে শীতের সন্ধ্যার বর্ণনা, জ্যোৎস্নার পরিবেশ ক্রমশ শান্ত নির্জনতা পার হয়ে চরিত্রদেব মানসিকতায় আলোড়ন তুলে প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রতীকে অমোঘতা পেয়েছে, তা এক সার্থক গল্পেব ও কৃতী গল্পকারের অনবদ্য ভাষাচিত্র রচনার ক্ষমতাকে ধরিয়ে দেয়। 'পুঁইমাচা' গল্পের রচনারীতি ও ভাষাবৈশিষ্ট্য তার অঙ্গবাহিত প্রকৃতি-লাবণ্যের অনুগামী, তার নায়িকা ক্ষেন্তির মতোই সহজ, সরল, কিন্তু প্রয়োজনে অসম্ভব বিষাদঘন হয়ে ওঠাব পক্ষে বলবান।

সাত

'পুঁইমাচা' গল্পটির এমন নামের সঙ্গে কাহিনী ও বিষয়ের যোগ যেমন নিবিড়, তেমনি

গল্পটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এবং লেখকের বিশেষ প্রকৃতি-মনস্কতার সঙ্গেও এর সম্পর্ক-সূত্রটি কঠিন বন্ধনে ব্যঞ্জনাময়। সমগ্র গল্পটির প্রেক্ষিতে শান্ত সরল ঘন প্রকৃতি-পরিবেশ থাকার কারণে, এবং তা গল্পের রসকেন্দ্রে অন্য ব্যঞ্জনা দেওয়ার জন্যই লেখকের প্রকৃতি-ভাবনা পুঁইমাচা নামের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এমন নাম যেন লেখক-ব্যক্তিত্বের বিভা! অন্য কোনো নামেই এই গল্পটিকে চিহ্নিত করা যেত না।

গল্পের একেবারে প্রথম দিকেই কাহিনী-বর্ণনার সূত্রে ক্ষেন্তির হাতেই দেখি পুঁইগাছ, যে পুঁইগাছ গল্পের শেষে ক্ষেন্তির জীবন-মৃত্যুর পাশাপাশি হয়েছে এক প্রতীকী অস্তিত্ব লেখকের বর্ণনায় :

> 'তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে, হল্‌দে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহার পাকা পুঁইগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল। মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে।'

এই বর্ণনার পাশেই আছে ক্ষেন্তির পার্শ্ববর্তিনী ছোট বোনের হাতের 'দুই-তিন পাকা পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।' ক্ষেন্তি বাবার কাছে 'পাতা জড়ানো দ্রব্যটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল চিংড়ি মাছ, বাবা।' ক্ষেন্তির পরবর্তী সংলাপে বোঝা যায়, মাছউলি গয়া-বুড়ি ওর বাবার কাছে দু'পয়সা বাকি থাকায় ওই চিংড়িমাছগুলি দিতে চায়নি, পরে ক্ষেন্তির কথায় দিয়েছে, 'আর এই পুঁইগাছগুলো ঘাটের ধারে রায়কাকা বললে, নিয়ে যা— কেমন মোটা মোটা...'

এই খণ্ডচিত্র ও সংলাপে আমরা সেকালের দরিদ্র-মলিন গ্রামবাংলার রূপ যেমন প্রত্যক্ষ করি, তেমনি এই গল্পে তার চিত্রের পাশাপাশি গল্পটির নামের উপযোগী বিষয়-বিন্যাসটিকে বুঝতে পারি। গ্রাম্য বাঙালির পক্ষে পুঁইশাক যেমন একান্ত উপাদেয় ও সহজলভ্য খাদ্য, তেমনি তার মধ্যে চিংড়ির স্বাদ-যোগের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবে স্বাদু রন্ধন-প্রয়াস সহজেই ভোজন-বাসনা তীব্র করে। ক্ষেন্তির এই তৎপরতা, মায়ের কাছ থেকে তার জন্য অসম্ভব ভর্ৎসনা প্রাপ্তি ও চাপা অভিমানে অশ্রুসজল হওয়ায় সেই পুঁইশাকের পাতা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এনে চুপি চুপি পুঁইগাছের 'তরকারি বানানো', খাওয়ার সময় পরম লোভের টানে তা নিঃশেষ করে খাওয়া—এমন সব স্পর্শকাতর অভিমান-রঞ্জিত, খুবই ছোট ছোট মান-অভিমানের পারিবারিক চিত্র 'পুঁইমাচা' গল্পে প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। গ্রাম-মানুষের অসহায় দারিদ্র্যের মধ্যে এই জীবনধারণ-পদ্ধতি যেমন অসামান্য বাস্তবতায় আঁকা, তেমনি গল্পের অঙ্গে এদের অবস্থান মূল্যবান প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব আনে। গল্পের পরবর্তী অংশে আছে অকালে ক্ষেন্তির শীর্ণকায় পুঁইগাছের চারা লাগিয়ে তাকে বড় করে তোলার, বাঁচিয়ে রাখার আন্তরিক তৎপরতা। ক্ষেন্তির লোভের সঙ্গে, খাদ্যপ্রীতির সঙ্গে, রসনার সঙ্গে, এইসব খেয়াল ও খেলা গল্পের শেষে অজ্ঞাতে তার নিয়তির লীলার প্রতিরূপ আর এক সত্যকে তুলে ধরে। তাই 'পুঁইমাচা' নাম গল্পের কাহিনী ও বিষয়ের ব্যাখ্যায় সার্থক।

গল্পটির নাম 'পুঁইশাক' বা 'পুঁইচারা'-ও লেখক রাখতে পারতেন, বিষয়ের সঙ্গে এতটুকু অসঙ্গত হত না। কিন্তু লেখক তা না করে রেখেছেন 'পুঁইমাচা'। 'মাচা' অর্থে

'মঞ্চ'। আর ছোট ছোট কঞ্চি বা চেরা বাঁশের টুকরো দিয়ে মঞ্চ না করে দিলে পুঁইচারার বৃদ্ধি ঘটে না। মাটিতে বেড়ে ওঠায় তার গৌরবহীনতা, মাচার অধিষ্ঠানে তার গৌরব প্রতিষ্ঠা। গল্পে মাচাতেই পুঁইগাছটি অফুরন্ত প্রাণস্বভাবে 'মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে—সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।' অথচ তাকে যে এত বড় হওয়ার সুযোগ করে দেয়, সেই ক্ষেন্তি পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত। ক্ষেন্তি ও পুঁইগাছের স্বভাবে যে বৈপরীত্য, তা অসাধারণ শিল্পের ব্যঞ্জনা পেয়েছে পুঁইগাছের এমন বাড়-বাড়ন্ত স্বভাব হয়ে ওঠার জন্যই। পুঁইমাচায় পুঁইগাছের এই বিবৃদ্ধির চিত্র গল্পের নামের গভীরতর ব্যঞ্জনা আনে। নাম নিশ্চয়ই শিল্প-তাৎপর্যে গভীর অর্থবহ।

আর একটি ব্যাখ্যা 'পুঁইমাচা' নামের মধ্যে মেলে। তা লেখক-ব্যক্তিত্বের স্বরূপে চিহ্নিত শিল্প-সত্য। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি তাঁর আত্মার আত্মীয়। এই প্রকৃতিকে এ গল্পে পুঁইগাছের প্রতীকে ঘনপিনদ্ধ করেছেন। লেখক প্রকৃতির মধ্যে গভীর রহস্যের সন্ধান করেছেন নানাভাবে। এখানে সেই সন্ধান এক রোমান্টিক অভীপ্সায় পুঁইগাছের প্রতীকে অপরূপত্বে স্থির হয়েছে। সেই নায়িকার জীবন ও পুঁই-এর জীবনের বৈপরীত্যের মূলেই প্রকৃতি-ভাবনার সূত্রে লেখক-ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। মানুষের জীবন তো প্রকৃতির সমস্ত উপকরণ ও স্বভাব দিয়েই গড়া, মৃত্যুতে তার প্রকৃতিতেই বিলীন হওয়া! যে অস্তিত্ব প্রকৃতিরই, তার সীমা আছে, প্রকৃতি কিন্তু অসীম! মানুষ মায়া, মমতা, প্রেম, সুখ, দুঃখ, লোভ-স্বার্থ—এসব দিয়ে প্রকৃতি-প্রদত্ত জীবনকে নিজের মতো করে রাখে, প্রকৃতি তাকে ভাঙে, তার সব কিছু গ্রাস করে মৃত্যু দিয়ে। প্রকৃতির আপন প্রাণ-বেগ, শক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ মানুষকে তুচ্ছ কবে দেয়। ক্ষেন্তির সামগ্রিক জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতিরই খেলা। এই খেলা নির্মম নিরাসক্ত। তা না হলে ক্ষেন্তির চলে যাওয়ার পরেও কোন রহস্যে তারই শিশুকালে লালন করা বড় আদরের পুঁইগাছটি 'সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য পায়! প্রকৃতির রহস্য-সন্ধানী লেখক মাচায় বেড়ে ওঠা পুঁইগাছকে প্রতীক করে নিজের বিশেষ দৃষ্টিকে গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে pointing finger করেছেন। লেখক-ব্যক্তিত্বের অসাধারণ গুরুত্বে এমন নামের স্থায়ী ব্যঞ্জনা।

২.

মৌরীফুল

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৌরীফুল' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকার তেরশো তিরিশ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে গেছে। এমন পত্রিকা-কেন্দ্রিক কিছু তরুণ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্র-মনোভঙ্গির বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধোত্তর সমাজরূপের প্রতিবাদী বিদ্রোহী যৌবন স্বভাবের উতরোল বাংলা সাহিত্যে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। বিভূতিভূষণ শুরু থেকেই ছিলেন মানস-স্বরূপে সম্পূর্ণত অ-কল্লোলীয় এবং

নগর জীবন-ভাবনা-বিবিক্ত গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, সমাজ-পরিবার ও তার সদস্য তুচ্ছ মানুষগুলিকে নিয়ে বাংলা ছোটগল্প এবং উপন্যাসেও নতুন টীকা-ভাষ্যে পাঠকদের সামনে আনতে ব্রাত্য। 'মৌরীফুল' গল্পটি সেই গ্রামীণ পরিবার, মানুষ আর প্রকৃতির কথায় একটি সরল বিচিত্র স্বভাবী বধূর অসহায়তার চিত্রধর্মে অভিনব।

'মৌরীফুল' গল্পটি সম্পূর্ণত পরিবার জীবনকেন্দ্রিক এক সার্থক শিল্পকর্ম। বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রগুলি সাধারণভাবে দোষে-গুণে প্রকৃতির নামাবলী, কোনো না কোনো ভাবে প্রকৃতিকে স্বভাবে নিহিত করে আমাদের সামনে আসে। 'মৌরীফুলে'র নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় চরিত্র গৃহবধূ সুশীলা আমাদের সামনে আসে তার স্বভাব-নিহিত প্রকৃতির বিস্ময় নিয়ে। বিভিন্ন মামলার প্রধান সাক্ষী হওয়াই যে মানুষটির চাকরি বা ব্যবসা বলা যায়, সেই রামতনু মুখুজ্যের পুত্রবধূ হয় আঠারো বছর বয়সের তরুণী সুশীলা। তার স্বামী পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের কিশোরী, চৌধুরীদের জমিদারি কাছারির ন'টাকা বেতনের মুহুরি। সুশীলার সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির বিরোধ-বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকে। গল্পকারের ভাষায় সুশীলা 'অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে চাহিলে ক্ষেপিয়া যায়।'

গল্পের প্রথমে এমন সুশীলার সঙ্গে শ্বশুরের তুমুল বিবাদ বাধে শ্বশুরের আহুতি দেওয়ার জন্য রাখা এক পোয়া খাঁটি ঘিকে সুশীলার না-জানিয়ে খাবার তৈরি করা নিয়ে। সেই দিনের সেই বিবাদের জের সুশীলার মধ্যে অভিমান তৈরি করে এবং রাতে স্বামী কিশোরীর সঙ্গে সুশীলার উদ্যোগেই তীব্র দাম্পত্য মনোমালিন্য ও সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। পরের দিন সকালেও তার জের চলে। শ্বশুর জমিদার চৌধুরীদের বাড়িতে নতুন সাক্ষীর তালিম দিতে যাওয়ার আগে সুশীলাকে তাড়াতাড়ি ভাত রান্নার কথা বলে যায়, সুশীলা সে কাজও করে না। সে বরং শ্বশুবের সামনেই— শাশুড়ি মোক্ষদার তাঁর সম্পর্কে সমস্ত রকম শ্লেষাত্মক কথার—সমানে পাল্টা জবাব দেয়। এই ঝগড়ার মধ্যেই গ্রামের গরিব মৃত আতুর আলি ঘরামির দশ-বারো বছরের ম্যালেরিয়া রোগের জীর্ণ-শীর্ণ ছেলেটি হাপু গান গেয়ে ভিক্ষে চাইতে এলে সুশীলার মন তার দুঃখে গলে যায়, সে গোপনে ছেলেটিকে একটি নতুন মোটা চাদরই দান করে। এতে মন তার নরম হয়ে যায়, শ্বশুরের ওপর থেকে রাগও চলে যায়, কিন্তু তাতে সুশীলার বাঞ্ছিত শান্তির স্নিগ্ধ বারিটুকু বর্ষিত হয় না তার শ্বশুর-শাশুড়ির পক্ষ থেকে।

স্বামী কিশোবীর স্বভাব অনেক রাতে বাড়ি ফেরা। একদিন সুশীলা রাতে তার সান্নিধ্য-সুখে মুক্তি পেতে বুভুক্ষু। কিন্তু বিবাহের পর প্রথম প্রথম যেভাবে কিশোরী তাকে কাছে গ্রহণ করত, তার পছন্দমতো গল্প, রূপকথা শোনাত, এখন তা কিছুই করে না। সুশীলার ক্রমাগত আবদার, অভিমান, পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে কিশোরী বরং সুশীলার সারাদিনেব ঝগড়া-বিবাদের স্বভাবকেই শ্লেষাত্মক কথায় দায়ী করে বসে। আব 'এটাই ছিল সুশীলার ব্যথাব স্থান।' নিজের স্বামীর কাছে এই অভিযোগ তাকে আরও একগুঁয়ে, জেদি ও কঠিন অভিমানে স্থির করে। কিশোরী তাকে প্রহার করতেও নির্দ্বিধ হয়ে ওঠে।

সে রাতে সুশীলাও স্বামীর সান্নিধ্য থেকে সরে এসে ঘরের দোরের বাইরে আঁচল পেতে অকাতরে ঘুমিয়ে নিজের জিদ ও অভিমান বজায় রাখে।

পরের দিন সকালে শাশুড়ির কথামতো সুশীলা জমিদার চৌধুরীদের বাড়ির লোকজনেব সঙ্গে শাশুড়ির শিবতলায় পুজো দিতে যাওয়ার সঙ্গী হয়। নৌকায় দু'ঘণ্টার পথে কলকাতা থেকে আসা চৌধুরীবাড়ির নবাগতা অতিথি এক বধূর সঙ্গে পরিচিত হয় সুশীলা। বউটি কোনোদিন গ্রামে আসেনি। ধনী স্বামীর গৃহিণীটি রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে চৌধুরীবাড়িতে আসে। নৌকায় সুশীলাকে বউটির খুব ভাল লাগে। নৌকায় জলপথের পাশে উন্মুক্ত মাঠে মৌরীফুলের ক্ষেত দেখে। গ্রামের এই সুশীলাই তাকে এমন মৌরীফুলের সঙ্গে পরিচয় করায়। নবাগতা বধূটি সুশীলার সুন্দর মুখশ্রী ও স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে তার সখী হিসেবে নাম দেয় 'মৌরীফুল'। এই আকস্মিক বন্ধুত্বের, সখীত্বের কারণে সুশীলা মুগ্ধ, অভিভূত। আর শিবতলায় পুজো দিতে গিয়েই সুশীলা শাশুড়িকে গোপন করে স্বামীকে বশ করার জন্য এক বুড়ির কাছ থেকে শিকড় কিনে নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে মনের গভীবে নিয়ে আসে কলকাতার সেই নবপরিচিত বধূটির দেওয়া 'মৌরীফুল' সম্বোধনের সঙ্গে অকৃত্রিম, অভাবনীয়, বিস্ময়কর বন্ধুত্ব, ভালোবাসা।

এরপরে একদিন ঘবে রান্নার কাঠকুটো কিছু নেই দেখে রাগেক্ষোভে সকালে রান্না করেনি সুশীলা শাশুড়ির বলে-যাওয়া সত্ত্বেও। শাশুড়ি সুশীলার ওপর রান্নার দায়িত্ব চাপিয়ে গিয়েছিল জমিদার-গৃহিণীর সাবিত্রীব্রত প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য কবতে। শ্বশুর অত্যন্ত কৃপণ, কাঠ নেই বারবার জানানো সত্ত্বেও খরচ কমানোর জন্য কাঠ আনেনি এতদিন, সে ব্যাপারে সুশীলাই এদিক-ওদিক থেকে কাঠকুটো এনে রান্নার ব্যবস্থা করে এসেছে এতদিন। তার ওপর বাড়িতে ঝি-ও রাখেনি সংসারকর্তা রামতনু। সুশীলা বিরক্ত হয়ে রান্না সেদিন একেবারে বন্ধই করে দেয়। ইতিমধ্যে শ্বশুরের জাঠতুতো ভাই দরিদ্র রামলোচন মুখুজ্যের অসহায় পুত্রবধূ একা তেল ধার নিতে এলে সে তার সব তেলই তাকে দিয়ে দেয় স্বতঃস্ফূর্ত গভীর মানবিকতাবোধে। সে-ও বারবার সুশীলাকে রান্না চাপাবার কথা বলে, সুশীলা শোনে না। বেলায় একে একে শাশুড়ি, শ্বশুর ফিরে এসে দেখে, রান্নাবান্না কিছু নেই। শাশুড়ির সঙ্গে তীব্র ঝগড়া বাধে সুশীলার। স্বামী এই সময় ফিরে এই অবস্থায় সুশীলাকে বাটনা বাটতে দেখে তার চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে, শুকনো কাঠ দিয়ে মারতে মারতে উঠোনে নামায়। শেষে দর্শক প্রতিবেশীদের ভিড় থেকে রামলোচন মুখুজ্যের পুত্রবধূই তাকে সরিয়ে নিয়ে যায় আড়ালে।

পরের দিন কিশোরীর খাওয়ার সময় রান্নাঘরে আড়ালে সুশীলাব সেই গাছের শিকড়-বাটা কিশোরীর তরকারিতে মেশানোর সময় মোক্ষদা দেখে ফেললে এক তুলকালাম কাণ্ড বাধে। মোক্ষদার কথায় শ্বশুর, স্বামী, প্রতিবেশীরা সকলেই বিশ্বাস করে, সেটি বিষ। তার চরম শাস্তি— রাতে স্বামীসঙ্গ থেকে আলাদা করে শুতে দেওয়া ও পবদিন তাকে বাপেব বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা কবে তোলা। সারা রাত সুশীলার মনের গভীবে সেই কলকাতার নববধূ, তার দেওয়া 'মৌবীফুল' সম্বোধন কেমন এক মোহেব মধ্যে দূবের ডাক শোনায়। কিন্তু পরের দিন সকালে সুশীলার প্রবল জ্বরের মধ্যে অঘোর অচৈতন্য

অবস্থা এবং দুপুরের পর জ্বরের ঘোরেই ভুল বকার জন্য শ্বশুর ডাক্তার আনলেও সন্ধের আগেই সুশীলার জীবনে মৃত্যু নেমে আসে। মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ আসে মেঘলতা— দু'চোখ জুড়ানো সুন্দর মেয়ে, কর্মপটু, হুঁশিয়ার, গোছানো, নূতন-বউ-এর লক্ষ্মীভাগ্যেই ঘটে স্বামী কিশোরীর নতুন ভালো চাকরিলাভ। অলক্ষ্মীরূপা সুশীলার স্মৃতি সে সংসারে হয়ে যায় চিরবিস্মৃত।

'মৌরীফুল' গল্পটির প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যে বিভূতিভূষণ একজন অত্যন্ত সচেতন গল্পকার। গল্পটির শুরু থেকেই যে বিভূতিভূষণ সতর্ক, এর কাহিনীনির্মাণ ও তুচ্ছ ঘটনাগুলির উপস্থাপনাই ক্রমশ তা বুঝিয়ে দেয়। গল্পটির কাহিনী অংশ তুচ্ছ, ঘটনাও পারিবারিক জীবনের ছোটখাটো মনোমালিন্য, স্বার্থচিন্তা, মান-অভিমান দিয়ে জড়ানো, অর্থাৎ গল্পের প্লট-বৃত্তের জট আমাদের রুদ্ধশ্বাস করে না। গৃহবধূ সুশীলার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সমগ্র গল্পের প্লট-বৃত্ত। গল্পের শুরু এমন এক প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা দিয়ে :

> 'অন্ধকার তখনও হয় নাই। মুখুজ্যে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকির দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশবনের কিছুটা সূর্যাস্তের শেষ-আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় মুখুজ্যেদের অন্দরবাড়ী হইতে এক তুমুল কলরব আর হৈচৈ উঠিল।'

এমন সন্ধের প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনার মধ্যেই আছে ছোট গল্পের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির উপযোগী নিবিড় বৈপরীত্য। পরিবেশ যখন বেশ কবিত্বপূর্ণ, তখনি সেই স্বপ্নভঙ্গের চিৎকারে সহজ অনাড়ম্বর মধুর শান্তির বুকে প্রবল অশান্তির অভিঘাত!

এমন পটভূমির মধ্যেই দেখা দেবে সুশীলার মতো চরিত্র, আর সুশীলার সঙ্গে ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে একাধিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ পারিবারিক ঘটনা ঐকতানে তাকে নিক্ষেপ করবে অসহায় মৃত্যুর অতল সাগরে! যে পারিবারিক জীবনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ বিক্ষোভের প্রকৃতি-পট গল্পের শুরুতে, তার শান্তি আসে এমন এক সন্ধেয় সুশীলার মৃত্যুতে। গল্পের সর্বশেষ ব্যঞ্জনা কেন্দ্রীয় চরিত্রটির এক সন্ধেয় মৃত্যু দিয়েই এঁকেছেন বিভূতিভূষণ। তাই 'মৌরীফুল' গল্পের শুরু আর শেষ একই প্রকৃতির সূত্রে গাঁথা, সুশীলার চরম জীবনভাগ্যের নিষ্ঠুর নির্দেশক। এইভাবে গল্পের শুরু ও শেষ ঘটিয়ে বিভূতিভূষণ ছোটগল্পের একটি সুমিত রূপ ব্যঞ্জনার দূরান্বয়ী স্বভাবে আমাদের সামনে রেখেছেন।

গল্পটির ভিতরে যতই প্রবেশ করা যায়, চোখে পড়ে গল্পকারের নিরাসক্ত বর্ণনার মধ্যে একটি অষ্টাদশী প্রাণোচ্ছল তরুণীর, নিষ্পাপ সরলা, জেদি সুশীলার ক্রমশ পরিণামী বিষাদময়তার ছায়ারূপ। মুখুজ্যেবাড়ির অর্থভিত্তিক কৃপণস্বভাবের মধ্যে তরুণীটির যাবতীয় শ্রম, প্রীতি, একনিষ্ঠতা, উদার হৃদয়-স্বভাব সমূলে নষ্ট হতে থাকে। তার মায়া-মমতা, গুরুজনদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিজেরই কঠিন জিদের কারণে, চাপা অশ্রুসজল অভিমানে বিরূপ রূপ গল্পের সমগ্র কাহিনী-আভাসকে, একাধিক ম্রিয়মাণ ঘটনার সমন্বয়ে চরিত্রটির স্তম্ভ-ব্যক্তিত্বকেই গড়ে তোলে। এমন কাহিনী ও ঘটনার যৌথ রূপে যে

প্লটবৃত্তের জটিলতা আসে, তা নিছক গল্পের কথা হয় না, চরিত্র ভাগ্যের কথাতেই দীপিত হয়ে ওঠে। সুশীলা সেই চরিত্র যে নিজ ব্যক্তিত্বে স্বস্থানে স্বরাট।

বিভূতিভূষণ অত্যন্ত সচেতনভাবেই কাহিনীবিন্যাস ঘটিয়েছেন, ঘটনার সূত্র ধরেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রকে সামনে রেখে। আতর আলি ঘরামির ছেলে মুখুজ্যেদের বাড়ি হাপু গান গাইতে আসার আগে পর্যন্ত কিশোরীর সঙ্গে সুশীলার রাতের দাম্পত্য সম্পর্কের সাময়িক সংঘর্ষের চিত্রশেষে সুশীলার শ্বশুরবাড়ির সংকীর্ণ পরিবার-জীবনসত্তার পরিচয় মেলে। হাপু গানের ছেলেটিকে সুশীলা নতুন চাদর দান করে দেয় মানবিক সহমর্মিতাব স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। এই অংশে সুশীলা পরিবারজীবন-কেন্দ্র থেকে মানবিক উদারতায় বাইরের জীবনে যুক্ত হয়। পরেই আসে কলকাতার সেই নববধূ— যে সুশীলাকে গভীর বন্ধুত্বে 'মৌরীফুল' নাম দেয় অকৃত্রিম, অন্তরঙ্গ সখী-স্বভাবের। সুশীলা এই স্তরে পরিবার জীবন ছাড়িয়ে মানুষ ও প্রকৃতির সংস্পর্শে নিজেকে অনেক বড় করে তোলে। এই স্তরের যে শিক্ষা, হৃদয়-পরিবর্তন, তা সংকীর্ণ পারিবারিক জীবনে বেমানান যেমন, তেমনি সুশীলার স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম আনন্দের জীবনে ও মনে বড় বাধা। আবার সুশীলার জীবনে ও মনে অত্যাচার নেমে আসে শ্বশুর-শাশুড়ির। সর্বশেষে স্বামীর অকথ্য অত্যাচার তাকে অভিমানে, অপমানে কালি করে দেয়। তা সুশীলার জীবনে অপ্রত্যাশিত। বস্তুত সে একক স্বামী-সান্নিধ্য চায়, স্বামীর ভালো চায়, তার ভালো চাকরি হোক এমন কামনা করে, স্বামী নিয়ে স্বতন্ত্র সংসার সাজাবার স্বপ্ন দেখে— যা চিরন্তন, যে কোনো বাঙালি বধূব জটিল সুস্থ মনেরই অন্তঃশীল সত্য। অথচ সেই স্বামীর কাছে নির্যাতন তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। সেখানে তার একমাত্র আশা, আকর্ষণ সেই কলকাতার বধূর তার মৌরীফুলের ভালোবাসা! এইভাবে বিভূতিভূষণ সুশীলার মনোভঙ্গির ও জীবন-স্বভাবেব বিকাশ ধরে কাহিনী ও ঘটনাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন— যেখানে গল্পের সুমিত স্বভাব বিস্ময়কর শিল্পরসের আস্বাদ দেয়।

'মৌরীফুল' গল্পটি অবশ্যই পরিবারজীবন-নির্ভর চরিত্রাত্মক গল্প। এই শ্রেণী-পরিচয়ে মুখুজ্যে পরিবারের সমস্যা ও মনোভঙ্গি ধরে সুশীলা চরিত্রের বিবর্তন ও ব্যঞ্জনাধর্মী পরিণাম-চিত্র আঁকাই গল্পকারের লক্ষ্য। এই গল্পের 'চরমমুহূর্ত' চিহ্নিত করার ব্যাপারে দুটি সূত্র এখানে আসে। গল্পের পট, পরিবার ও কাহিনী বয়নের শিল্প-স্বভাব ধরলে এর 'চরমমুহূর্ত' চিত্রিত হয়ে যায় সুশীলা-নববধূর দীর্ঘ সময় ধরে নদীর বুকে নৌকায় বন্ধুত্ব রচনার চিত্রে। কারণ এখানেই সুশীলার সংকীর্ণ জীবন বিশাল প্রেক্ষিতে একেবারে ভিন্ন এক ডাইমেনশন পায়, যা তার চরিত্রের শক্তি হয়, শক্তি হয় মৃত্যুকেও বরণ করার মানসিকতা রচনায়। আর একটি সূত্র পট, পরিবার, কাহিনী নয়, সুশীলার ব্যক্তিত্বচিহ্নিত চরিত্র ধরলে গল্পের শেষে এক অবচেতন মনোলোকে মৌরীফুল সম্পর্কে এমন ভাব— 'জগতে কেউ তাহাকে ভালোবাসে না— কেবল ভালোবাসে তাহার মৌবীফুল'— এর মধ্যেই 'চরমমুহূর্ত' শুরু। ঈষৎ বিস্তারিত হয়ে চরিত্রই ধরে 'চরমমুহূর্ত' শেষ হয় এমন বাক্যে :

'আচ্ছা, পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়ে গেল না কেন? লাল চৌকো খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখানো ...'।

'মৌরীফুল' এমন পাতানো সখী-নামের সম্পর্কেই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের 'চরমমুহূর্ত' অংশটি গল্পের মহত্তম ব্যঞ্জনা আনে।

গল্পটির যে কেন্দ্রীয় বক্তব্য, তা এই গল্পের 'চরমক্ষণে'ই ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়। তার পরে 'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে মারা গেল'— এই বাক্যেই গল্পের শেষ হতে পারত। বিভূতিভূষণ কিশোরীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রসঙ্গ, নতুন বধূ মেঘলতার বর্ণনা দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়িতে তার অভিনন্দনের, ঘটার সংক্ষিপ্ত সংযত চিত্রও এঁকেছেন। সবশেষে প্রসঙ্গ তুলেছেন স্বাভাবিকভাবে বিস্মরণে মুছে যাওয়া 'সংসারের অলক্ষ্মীরূপা আগের পক্ষের বউ-এর নাম।' মনে হতে পারে শেষ অংশটি গল্পের পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, অতিরিক্ততা দোষে দুষ্ট। কিন্তু তা নয় আদৌ। লক্ষণীয়, বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পের শেষ-এর মতো মোটা বরপণে নায়কের দ্বিতীয় বিবাহ প্রসঙ্গ আনেননি, এনেছেন দ্বিতীয় বধূর সুন্দর রূপ আর কাঙ্ক্ষিত স্বভাবচিত্র এঁকে। এটা মুখুজ্যে পরিবারের শিক্ষণীয় কোনো বিষয় নয়, এটা হল তাদের নির্মমতাকে আরও কঠিন শ্লেষে এঁকে সুশীলার মতো এক নিষ্পাপ অসাধারণ মানবিক তরুণী চরিত্রকে জীবন্ত করা! বিভূতিভূষণের দৃষ্টি আদৌ সুশীলার জন্য করুণ সজল হয়নি, তিনি ছোটগল্পকারের নির্মম নিরাসক্তি দিয়ে জগৎ সংসারের মানুষজনকে এঁকেছেন। 'মৌরীফুল' গল্পে প্লটবৃত্ত পরিষ্কার বোঝায় এই গল্পের স্রষ্টা আদৌ কারুণ্যে সৃষ্ট নায়িকার জন্য অশ্রু ফেলেননি, নিরপেক্ষ, নির্মোহ স্রষ্টা হয়ে শিল্পীর আসনে স্থিত থেকেছেন। 'মৌরীফুল' গল্পের কাহিনী, প্লট ও চরিত্রের যোগ গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের ওপর শিল্পের সুষম শাসনভার চাপায়, ফটোগ্রাফির সেই নিখুঁত পরিমিত আলোকসজ্জাও ঘটায়।

দুই

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বড় বৈশিষ্ট্য, শিল্পের মাপে ও সাধারণ সংসারেও একেবারে তুচ্ছ, অবহেলার, উপেক্ষার মানুষগুলিকে প্রকৃতির বুকে রেখে, অথবা প্রকৃতিকেই দৈনানুদৈনিক জীবনধারণ ও জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষগুলির সঙ্গে জড়িত করে ছোট প্রকৃতিকে বড় প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনায়, মানবতাকে সর্বজনীন মহামানবতায়, আন্তর্জাতিক মানবতাবোধে তিনি মহিমাদীপ্ত করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র প্রকৃতির স্বভাবে, মানবপ্রাণের ধর্মে এক অলৌকিক রসাস্বাদ দেয়। চরিত্রের বাস্তবতা প্রকৃতি-মানবের যুগ্মবেণীর স্বভাবে পূর্ণ জীবনের বিস্ময় ও রহস্যকে বিদ্যুচ্চমকে ধরিয়ে দেয়। এখানেই বিভূতিভূষণের চরিত্র-সৃষ্টির অন্যতম দিক এবং কল্লোলের উতরোল পরিবেশে চরিত্রের নিঃসঙ্গ স্বভাব থেকে সঙ্গ-মাধুর্যের মধ্যে অবগাহন ঘটে। 'মৌরীফুল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুশীলা এই শিল্প-ন্যায়ে বিশিষ্ট।

সুশীলা চরিত্রের অন্তস্তলে আছে দু'টি বিপরীত ভাব— একদিকে সে অত্যন্ত জেদি, একগুঁয়ে, ব্যক্তিত্বের আত্মস্বাতন্ত্র্যে উন্নতশীর্ষ; আর একদিকে মহৎ মানবতার গুণে কোমল-

প্রাণ মানবদরদী। ব্যক্তিত্বের এমন বিপরীতধর্মী সহাবস্থানে মেলে বিশ্বপ্রকৃতিরই গোপন স্বভাবের পরিচয়। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াকর্ম যাবতীয় ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে—তা-ই জগতের বিধান। সুশীলার ব্যক্তিত্বের স্বভাবে আছে সেই পারিবারিক সমস্ত রকম ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে চরিত্রটির উদাসীন, নিস্পৃহ এক মানস-ক্রিয়া। সুশীলার শ্বশুরের সঙ্গে দুর্বিনীত আচরণ, শাশুড়ির উৎপীড়নের প্রবলতম প্রতিপক্ষ হওয়া, স্বামী কিশোরীর সঙ্গে মান-অভিমান— সবই সুশীলার চরিত্র-ন্যায়ে মেলে না। সে সংসারে থেকেও এক স্বার্থপূর্ণ সংসার-বিবিক্ত মন নিয়ে দিন কাটানোয় বেশি উৎসাহী অবচেতন মনে। অন্যদিকে সে স্বতঃস্ফূর্ত হয় অভাবনীয়ভাবে আতর আলি ঘরামির ছেলের দুঃখে নতুন চাদরটিকেই দানের বিষয় করার মধ্যে, এমনকি শ্বশুরের ভাই রামলোচন মুখুজ্যের পুত্রবধূকে নিজেদের সমস্ত রান্নার তেলটুকু নির্দ্বিধায় দিয়ে দেওয়ার মধ্যে। তার এমন দুই মেরুর আচরণ, সক্রিয়তা স্বার্থসর্বস্ব বিষয়ী মানুষ রামতনু, মোক্ষদা, স্বামী কিশোরী কেউই বুঝতে পারে না, পারবেও না কোনোদিন।

লক্ষণীয়, সুশীলার যে সরল, নিষ্পাপ গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও প্রবল প্রতিবাদী স্বভাব, তার জিদ ও একগুঁয়েমি, তার 'অত্যন্ত আনাড়ি' মনোভঙ্গি—তার মূল কিন্তু চরিত্রটির সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে নয়। সে যে অত্যন্ত অসহায়, মুখুজ্যে বাড়ির কার্পণ্য, নির্দয়তা, স্বামী কিশোরীলালের নিজ স্ত্রীর প্রতি ঔদাসীন্যই তা বুঝিয়ে দেয়। সুশীলা রামতনুর সান্ধ্য-আহুতির ঘি-কে খাবার তৈরির কাজে লাগায়। সম্ভবত সে অবচেতন মনের গভীরে অনুভব করে রামতনুর মিথ্যা সাক্ষীর সঙ্গে পুজো-আহুতির মধ্যেকার দোষ-স্খালনের প্রয়াসে ধর্মীয় চেতনার নিষ্ফলত্ব। তাছাড়া সংসারের অভাবের একটি প্রতিক্রিয়াও কাজ করেছে। রামতনুর তাড়াতাড়ি ভাত চাপানোর অনুরোধ সত্ত্বেও সুশীলা তা করে না, তার যুক্তি :

> 'সকাল থেকে বসে আছি কি? এত খাটুনি সেরে আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো— মানুষের তো আর শরীর নয়—'।

সুশীলা কোন সংসারের বধূ এবং তার সমস্ত ক্রিয়াকর্মের স্বরূপ ও প্রতিদানে সংসারের কাছ থেকে তার প্রাপ্যটুকু কেমন? :

> 'এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনদিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই যদিও পূর্বে বাড়িতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল— যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভৃত্যের মতো খাটিয়াও বিরক্ত হইত না।'

এমন যার পরিবেশ এবং এই যার অন্তঃশীল স্বভাব, তার সঙ্গে শাশুড়ি-সহ সংসারের আর সকলের সংঘর্ষ বধূটিব সমস্ত প্রতিবাদের পক্ষেই সমর্থন জানায়।

'শান্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ নায়িকা চন্দনার কঠিন অভিমান, আভিজাত্যকে যেমন কেন্দ্রস্থ করেছেন স্বামীর প্রতি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার কারণে, তেমনি সুশীলাও স্বামীর দিক থেকে আঘাত, অপমান পাওয়ায় তার নিজের পায়ের তলার মাটিটুকু কোথাও বুঝি নিশ্চিত

আলগা হতে দেখে। রাতে স্বামীর পাশে বিছানায় শুয়ে সে ক্রমশ অনুভব করে স্বামীর বিরক্তিজনিত ঘৃণা, উপেক্ষা এবং অসম্মান। যে মানুষটি তার একমাত্র প্রেয় ও শ্রেয়, সংসারের সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যে একমাত্র আশ্রয়, তার কাছে শোনে:

> 'সমস্ত দিন তো গলাবাজিতে বাড়ি সরগরম রাখবে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?'
> এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান।'

সুশীলার পারিবারিক মনস্কতার বড় দিকও দুর্লক্ষ্য নয়। কিভাবে প্রতিদিন রান্না করে সুশীলা, সে খোঁজ কেউ রাখে না। একাই এখান-ওখান থেকে কাঠকুটো জোগাড় করে নীরবে সারা বাড়ির অন্নের ব্যবস্থা করে সে। আর কৃপণ গৃহকর্তা রামতনুর সুবিধাভোগী মানসরূপ:

> 'কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা— আনিলেই একটা টাকা খরচ তো! পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনি উহার স্বভাব।'

এমন যে সাংসারিক পরিবেশ ও গৃহসভ্যদের দায়দায়িত্বহীন চিন্তাভাবনা, সেখানে সুশীলার সমস্ত সোচ্চার-কণ্ঠ প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া তার সরল নিষ্পাপ স্বভাবকে ম্লান করে না এতটুকুও। শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী— সকলের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ সঙ্গত, অর্থপূর্ণ, চরিত্রন্যায়ে সঠিক। সুশীলার চরিত্রে যথার্থ আধুনিক শিক্ষাহীন গ্রাম্যবধূর মতো আছে লোকসংস্কার— গাছের শিকড়বাটা খাইয়ে স্বামীকে বশ করার গোপন কৌশল প্রয়োগ। বিভূতিভূষণ এমন তাঁর নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ লোকসংস্কারের অনুরাগেই 'বুড়ো হাজরা কথা কয়' গল্পে যেমন, তেমনি 'মৌরীফুলে'র সুশীলার মানসিকতাতেও তাকে শিল্পন্যায়ে ব্যবহার করেছেন। সুশীলা শিল্পীরই মানস-প্রতিমা।

এখানেই সুশীলার জীবনধারণ যেমন, যাপনেও তেমনি সীমা প্রকট হয়ে ওঠে, অসীমের ব্যঞ্জনাও পাশাপাশি কাজ করে। শ্বশুর তিরস্কার করে, শাশুড়ি তার নামে মিথ্যা রটায়, স্বামীও তার শরীরে নির্মম আঘাতের মতো অপমানের কাঁটা বিঁধতে পারে। সুশীলা এসবের ঊর্ধ্বে বলেই সে মোক্ষদার বিষ মাখানোর সন্দেহের সামনে নিশ্চুপ থাকে, স্বামীর প্রহার সহ্য করে, সহজেই মৃত্যুর মধ্যে চলে যেতে পারে। সংসার, মানুষ, জীবন, জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ না হলে, কঠিন নিরাসক্তিতে বুকের গভীরে লালন না করলে এত অত্যাচারের পর মৃত্যুকেই সত্য করে না কেউ। বিভূতিভূষণ এক কঠিন ব্যক্তিত্বের নারীকে এঁকেছেন সুশীলার মধ্যে। সুশীলার স্নেহ-আকাঙ্ক্ষার চিত্র গতানুগতিক মোটা দাগের স্নেহার্তির মতো আদৌ নয়, তার বুভুক্ষা যেমন অকৃত্রিম, তেমনি সকলের কাছ থেকে সে তা চায়ও না। বিভূতিভূষণ অসাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতার স্পর্শ দিয়ে সুশীলার স্বভাবকে দেখেছেন। শ্বশুর রামতনুর প্রতি সমস্ত বিরোধও শ্রদ্ধা, তার কাছ থেকে স্নেহভিক্ষার স্বরূপ যেমন নিখাদ, তেমনি জটিল মনস্তত্ত্ব-নিহিতও :

> 'সে গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল— আপনাকে কিছু দেব বাবা?...

.... রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ... রামতনু পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, ...'

এমনি সুশীলার মনোলোক। সে সারাদিনের শেষে স্বামীর কাছে ভালোবাসাটুকু চায়, পায় না। সে কলকাতার নববধূর কাছে সম্মান পায় তার অস্তিত্বের, তার হৃদয়-স্বভাবের, তাব উজাড়-করা ভালোবাসাকে নিঃস্বার্থ দান করার। সুশীলার অন্তর্গূঢ় ব্যক্তিত্বে এই এক বিশাল নিঃসীম আকাশ, তা বিষয়ী মানুষের সংসারে থাকার নয়। থাকতেও পারে যদি বিষয়ী মানুষ এমনি রমণীর মনোধর্মে তাকে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়।

বস্তুত 'মৌরীফুল' গল্পের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য যেখানে চরিত্রাত্মক গল্প, সেখানে সুশীলাই তার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। সুশীলা বিভূতিভূষণের অনবদ্য সৃষ্টি, সে নিছক গভীর বিষয়াসক্ত এক পরিবারের মানুষগুলির মূল্যায়নে বধূমাত্র নয়, সে শিল্পীর সৃষ্টি নারী— যার ব্যক্তিত্ব 'এ্যাভারেজ' বধূদের থেকে যোজন দূরের বিষয়। চরিত্রটির ক্রমবিকাশে প্রথমে আছে পরিবার জীবনে অভ্যস্ত রূপ, দ্বিতীয় স্তরে সে আরও সাধাবণ দুঃখী মানুষের সঙ্গে যোগে মহৎ মানবতায় দীপ্ত নারী, তৃতীয় স্তরে সে সব ছাড়িয়ে প্রকৃতি ও মানুষের মিশ্রণে বড় প্রাণের রমণী— কলকাতার নববধূর সংসর্গে তার বিশাল মুক্ত, সরল, নিষ্পাপ প্রকৃতি-লেপা রূপ, চতুর্থ স্তরে আবার প্রত্যাবর্তন সংসার সীমায়, কিন্তু 'মৌরীফুল' নামের ব্যঞ্জনায় সংসার বিবিক্ত প্রসারিত প্রাণের রমণী, শেষ স্তরে সমস্ত সংসার, জগৎ-বিচ্ছিন্ন, কেবল পাতানো 'মৌরীফুলে'র সংসর্গের ব্যবধান জনিত অন্তর্গূঢ় বেদনায় মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত মুখ রমণী। সুশীলা সেই রমণী যার বুকে গভীরভাবে বাজে স্বামীর কাছে পাওয়া অপমান— অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের চন্দরার মতো। সুশীলা যে বাইবের রূপে, স্বভাবের সারল্যে, হৃদয়ের প্রসারতায় কত বড় এক ব্যক্তিত্বের নারী, কলকাতার নববধূর প্রথম গ্রাম দেখার চোখই সেক্ষেত্রে কষ্টিপাথর হয়, হয় দক্ষ জহুরির যাচাই করার মতো নিবিড় ঘন দৃষ্টি। তাই চরিত্রের দিক থেকে 'চরমক্ষণ' নির্ণয়ে নববধূটিই হল তার যথার্থ নিরিখ।

সুশীলার সঙ্গে 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তীর যেমন মিল, তেমনি অমিল। সুশীলা ও ক্ষেন্তি— দুজনকেই বিভূতিভূষণ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে প্রকৃতির গভীর কেন্দ্র থেকে তুলে এনেছেন। দুজনেরই মৃত্যুতে প্রকৃতি হয়েছে পটভূমি। কিন্তু অমিল বিস্ময়কর। ক্ষেন্তি শান্ত, মুখে কোনো প্রতিবাদ থাকে না তার মায়ের শাসনের, কঠিন কথার বিরুদ্ধে, সুশীলা এর বিপরীত। ক্ষেন্তি বিয়ের পর শুধু চেয়েছে বাপের বাড়ি একবার ঘুরে আসার, সুশীলা স্বপ্ন দেখেছে স্বামীর ভাল চাকরির, আলাদা সংসারের, সংসার নিজের মতো করে গোছানোর, পেতে চেয়েছে বাপের বাড়ির কিছু নয়, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এক শহুরে বধূর অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি, বন্ধুত্ব-সখীত্ব। ক্ষেন্তির মৃত্যুতে তার পোঁতা পুঁইগাছ হয়েছে জীবনের প্রতীক, সুশীলার মৃত্যুতে তার ফেলে-যাওয়া শ্বশুরবাড়ি হয়েছে তার অস্তিত্বের সমূল বিস্মরণের আশ্রয়। সুশীলা সংসারের বধূ ছিল, কিন্তু মনের গভীরে এক অনিকেত জীবন তৈরি হচ্ছিল কবে থেকে যেন! গল্পের অন্তিমে তারই সফল রূপ, রূপায়ণ। সুশীলা এক

দক্ষ গল্পকারের হাতে আঁকা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের, অনন্য ব্যক্তিত্বের, জগৎ সংসারের, বিষয়ী মানুষের এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী গৃহবধূ চরিত্র।

এর পাশাপাশি শ্বশুর রামতনু মুখুজ্যে, শাশুড়ি মোক্ষদাসুন্দরী, স্বামী কিশোরীলাল অনেক ছোট হয়ে যায়। শাশুড়ির ভূমিকা সবটাই টাইপ চরিত্রের। গভীর বিষয়ী, কৃপণ, মিথ্যা মামলার সাক্ষী রামতনু বৌমার প্রতিবাদের কাছে যেমন অসহায়, তেমনি অক্ষম। প্রায়শই নির্বিকার। কেবল কিশোরীলালের নির্মম অমানবিক প্রহারের সময় সুশীলা যখন মুখ থুবড়ে উঠোনে পড়ে যায়, 'মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।' —এইটুকুই যা গল্পের মধ্যে সুশীলার প্রতি তার মানবিক মানসিকতার প্রলেপদান, কাহিনীতে কিছুটা সক্রিয় অংশগ্রহণ। পুত্র কিশোরীলাল অশিক্ষিত, সাংসারিক জ্ঞানহীন, স্বামী হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ব্যক্তিত্বের যুবক। সে সন্ধেয় কাজ থেকে বাড়ি ফিরে নিশ্চুপ থেকে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় প্রতিদিনের আড্ডায়। 'ও-পাড়ায় রায়বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্মা যুবকদিগের যাত্রার আখড়াই ও রিহার্সেলে' অনেক সময় কাটিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে অভ্যস্ত। স্ত্রীর ভালোলাগা, মান-অভিমান, আবদার, ভিক্ষা— কোনো কিছুতে সে তার কর্তব্য ও হার্দ্য দায়িত্ব বোঝে না, উদাসীন। কিশোরীলাল সুশীলার মতো স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, তাকে সংসার ও প্রতিবেশী-পরিজনদের কাছে অপমানে কালি করে নির্বিবাদে, নির্বিচারে— এখানেই তার স্বামীসত্তার পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও ব্যর্থতা।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীদের বাড়ি আগত কলকাতার নববধূটি গল্পের মধ্যে 'চরমমুহূর্ত' আনে যেমন কাহিনীর, তেমনি সুশীলার চরিত্রেরও। সে সুশীলার সমবয়সী এবং গ্রামজীবন ও গ্রাম্যপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নববধূ কিশোরী, শিক্ষিত, দেশ-বিদেশের কিছু খবর সে জানে এবং বয়স্কদের নীরস আলোচনা তার কাছে বিরক্তিকর। স্বভাবতই নৌকার মধ্যে ক্রমশ সুশীলা তার আপন হয়ে ওঠে। নিজে থেকেই সুশীলার জবুথবু পোশাক-পরা ও স্বভাবের বিপরীতে ঘোমটাটি খুলে দেয়। আর সেই মুহূর্তে তার যে সুশীলাকে দেখা—তাতে পাঠকদের কাছে নতুন করে পরিচয় করানোই যেন বিভূতিভূষণের মূল লক্ষ্য :

> 'সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল, রং যদিও ততটা ফর্সা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই। নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ শ্যাম কলমী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারা মুখখানায় মাখানো।'

নববধূর চোখে, নৌকায় প্রকৃতির উদার নিঃসীম প্রেক্ষিতে সুশীলার এই রূপ তার পারিবারিক সংকীর্ণ পরিবেশের দামাল রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রাম্য প্রকৃতির নিজ অজ্ঞতা বিষয়ে নববধূর অকপট স্বীকৃতি, সুশীলার সরল নিষ্পাপ বিস্ময়, তার ভয় সরে যাওয়া, সঙ্গিনীর প্রতি স্নেহ জন্মানো, নববধূর মুখে তার স্বামীর আদরের গল্প শুনে সুশীলার অতীত স্মৃতি রোমন্থন ও বর্তমানের ফাঁকা ফাঁপা মনে স্বামীসঙ্গ বিচ্ছিন্ন গভীর

হতাশার জাগরণ— এসব দিয়েই এই নাগরিক বধূটি গল্পের কাহিনীর 'চরমক্ষণ' ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের 'চরমক্ষণ' একই সঙ্গে তুলে ধরে। নববধূটি সুশীলার ভিতরের বড় শক্তির জাগরণ ঘটায়:

১. '... পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম— তোমায় কখনো ভুলবো না।
সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে, ঝগড়াটে।'

২. 'এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরীফুলকে ভুলে যাবে না।'

৩. '... তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল...
...তুমি হলে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল— তোমায় কি ভুলতে পারি ...'

সুশীলার মধ্যে এই উক্তি ও ভাবনাগুলি তার গভীর অন্তস্তলকে পাঠকের সামনে আনে। নববধূই এর একমাত্র উদ্দীপন বিভাব। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নায়িকা চন্দরা ফাঁসিতে যাওয়ার আগে একমাত্র মায়ের কথা স্মরণ করেছে, 'মৌরীফুল' গল্পের নায়িকা তার উপযোগী চরম মানসমুক্তির ক্ষণে মনে করেছে মাকে, মায়ের দেওয়া অঙ্গুরীয়ের অভিজ্ঞানকে। রবীন্দ্রনাথ চন্দরাকে এঁকেছেন বুদ্ধি দিয়ে, বিভূতিভূষণ এমন 'সিচুয়েশন' নির্মাণ করেছেন প্রকৃতির জীবন স্বভাব মিশ্রিত করে। নবাগতা শহুরে গৃহবধূর কোনো স্বতন্ত্র নাম রাখেননি বিভূতিভূষণ। এক নিরপেক্ষ নববধূর চরিত্র এঁকে গল্পকার মূলত চরিত্রের 'মহামুহূর্ত' অংশটির স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন। গল্পের প্লট-বৃত্তে এই নববধূর আগমণ-নির্গমন শিল্পের স্বাভাবিকত্বে একান্ত গ্রাহ্য।

তিন

'মৌরীফুল' গল্পের আরম্ভেই যে ইঙ্গিতধর্ম আছে, সে কথা আগেই কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আরম্ভের ব্যঞ্জনাগত বিন্যাসে মূল লক্ষ্য যে সুশীলার মনোভঙ্গির বিবর্তন ও অন্তিম শোকাবহ পরিণতি, তার পূর্ণতা ঘটে এক সন্ধের কিছু আগে সুশীলার সকরুণ মৃত্যুবরণে। গল্পের আদি ও অন্তে এই যে শুধু প্লট-বৃত্ত নয়, নায়িকার মানস-বৃত্তের সংহত, সংযত রূপ, তার চমৎকারিত্ব ও প্রকরণগত কৌশল এবং সুমিত রূপ গল্পটির রীতিগত ঐশ্বর্য।

আমরা আগে আরও বলেছি, 'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে মারা গেল'— এমন বাক্যে গল্পের শেষ হতে পারত, পরবর্তী অংশ হয়তো অতিশায়িতা দোষে দুষ্ট, কিন্তু পরবর্তী অংশ গল্পকারের উদ্দেশ্যেব উপযোগী প্রকরণ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরে। সুশীলার মৃত্যু যদি তার নিজের জিদের কারণেও হয়, তা হলে তার যে চিরকালীন বিস্মরণ তার স্বামী-সংসার থেকে, তার মূলে সুশীলা নয়, তার স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি-সহ এই জগৎ-সংসারই দায়ী। মানুষ স্বার্থপর বলেই অরণ্যের শোভা সপ্রাণ বৃক্ষরাশি কেটে বসত তৈরি করে, সাংসারিক মানুষও সম্পূর্ণত স্বার্থজীবী বলেই কাছের মানুষটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে

দিয়ে আরও সুখের জন্য লালায়িত হয়। সুশীলার সেই পরিণতি দেখানোর জন্যই শেষ দুটি অনুচ্ছেদ গল্পে যুক্ত। সুতরাং 'মৌরীফুল' গল্পের প্রকরণে লেখকের সংযম ও লক্ষ্য শিল্পযাথার্থ্যে সমানুপাতী।

গল্পটি অবশ্যই কিছুটা সাধুগদ্যের বিবৃতিধর্ম (narrativeness) পেয়েছে, কিন্তু কোথাও সে সব অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। গল্পের সংলাপ চলিত রীতির অনুগ। গল্পটিতে বিভূতিভূষণের বিবৃতিধর্ম বিবৃতি-সর্বস্বতায় সীমা পায়নি, তাঁর বর্ণনার সারল্য বাহির থেকে অন্তরের গভীরে সহজেই পাঠককে নিয়ে যায়, সেখানে পাঠক হয় বেদনার্ত। সুশীলার পাবিবারিক জীবনচিত্র, তার নিষ্পাপ মনের অসহায়তা সেই মানসিক মমতাময়তাকে জাগায়। সংলাপে ও আগের আচরণে সুশীলা-ব্যক্তিত্বের এক ইঙ্গিতধর্ম মনস্তত্ত্বের আলোকার্থী অন্ধকার জগতের পর্দা সরে যায়। এই অন্ধকারেই আছে সুশীলার ভাগ্যের নীতি-নিয়ম। ছোটগল্পের পরিসরে সুশীলার জীবন-ভাগ্যের শেষ পর্যায়ে তার জ্বরে বিভোর চিন্তার ভাষায় আছে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীকপ্রতিম ব্যঞ্জনা:

> 'তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজিয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ওরকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে, ... আচ্চা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিযে গেল না কেন? লাল চৌকো খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখানো ...'

'মৌরীফুল' গল্পের বিবৃতিধর্ম ভাষার বাস্তবরস-সিক্ত ইঙ্গিতময়তা এবং চরিত্রের বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ দেয়।

বিভূতিভূষণের গল্পের ভাষা সহজ, সরল, আর এই প্রকাশরীতি ভাষার, গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ইস্পাত-কঠিন করেছে। গল্পের বলার ভঙ্গির সহজতা ও আয়াসহীনতা অন্তরঙ্গ স্বভাবে পাঠক-হৃদয় জয় করে নেয়। বিষয়ের সঙ্গে ভাষার যোগ, তার চিত্রল স্বভাব নায়িকার সত্য পরিচয়পত্র। মৃত্যুর আগের রাতে সুশীলার মনে ভাসে তার প্রথম নববধূ হওয়ার স্বামী-সঙ্গে প্রথম দিনের রাতের স্মৃতি, যেনবা তাকে সেই স্মৃতি নতুন করে টানে, নতুন জীবনের স্বাগত ভাষণকে ইঙ্গিতময় করে :

> 'রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরও ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায় ... দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের শিমূলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে ... পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ভরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখির আনন্দ কাকলী ... বসন্ত-লক্ষ্মী প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাটকা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।...
>
> জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ওগুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না রাতে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?...'

এমন যে অতীত আর বর্তমানেব রোমান্স-চিত্রের ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষারূপ, সুশীলার আসন্ন নিয়তিনির্দিষ্ট জীবনের, কামনা-বাসনার যেন নান্দী! গল্পের শেষে এই গাঢ়-গম্ভীর উপলব্ধি, অত্যন্ত স্বাভাবিক চরিত্র-ন্যায়ে যাচাই করা। বিভূতিভূষণ এ গল্পের মৃত্যুসংবাদ দানে একেবারে নিরাসক্তের ভূমিকায় থেকেছেন। 'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে মারা গেল'— এমন একটিমাত্র স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদের বাক্যে গল্পকারের সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি উদাসীন নিরাসক্ত-চিত্ততা ধরা পড়ে। অনুকম্পার, করুণার কোনো একটি বাড়তি বাক্য ব্যবহার করেননি তিনি। গল্পের শেষতম বাক্যটিও একই ধাতে গড়া।

আমরা মনে করি, বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটগল্পে উপেক্ষিত জীবন জগৎ ও মানুষের তমসুক রচনা করে গেছেন। তারই মধ্যে তাঁর জীবনদর্শনের স্বরূপ ধরা পড়ে। বাস্তবতাই তাঁর কবচকুণ্ডল, প্রকৃতি তার পটভূমির মর্যাদায় চরিত্রদের ক্ষেত্রে মাতৃরূপা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জীবনভাগ্য, অসহায়তা বা জীবনের প্রত্যয়ে ফিরে আসা, আশ্রয়গ্রহণ—সমস্তই তিনি গল্পকারের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি সমকালীন কোলাহল থেকে দূরে নিঃসঙ্গ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তুচ্ছ, উপেক্ষিত মানব সাহচর্যে তিনি ছিলেন নির্ভীক। সে সাহচর্য অকৃত্রিম। সেই কৃত্রিমতাহীন জীবন-সহবাসে তুচ্ছ, অবহেলিত মাটির মানুষগুলিকে বুকের মধ্যেকার হৃদয়ের শব্দে জড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁর বিস্ময় জীবন-ব্যবস্থার, জীবন-স্ফূর্তির সাবলীল স্বভাবদর্শনে বিস্ময়। যে জীবন সত্য, যে জীবনগতি অপ্রতিরোধ্য, তার স্বরূপ যে তার মধ্যে নেই, তার সঙ্গে প্রকৃতির যোগেই তার পূর্ণতা— তা জন্ম, উল্লাস, মৃত্যু যে ভাবেই ধরা দিক, 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তি, 'মৌরীফুলে'র সুশীলা তা-ই দেখায়, বোঝায়। তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি তাঁরই নিজস্ব দর্শনের দর্পণ।

চার

'মৌরীফুল' গল্পটির এমন নামে বিভূতিভূষণ ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃতির অনুষঙ্গে নামের সেই ব্যঞ্জনা দিগন্তপ্রসারী সুদূরতা পায়। 'পুঁইমাচা'র মতো 'মৌরীফুল' নামও প্রকৃতিস্বভাব চিহ্নিত, সেই সঙ্গে গল্পের কেন্দ্রস্থ চরিত্র-সন্নিহিত। 'মৌরীফুল' বলতে লেখক সুশীলাকেই বুঝিয়েছেন। কলকাতা থেকে আসা নববধূর সখ্যতার অভিজ্ঞানে 'মৌরীফুল' নামকরণ। তার মধ্যে সুশীলার যে একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে উঠে-আসা, সেখানেই এমন নামকরণের সার্থকতা। কলকাতার নববধূটি সুশীলার বর্তমান জীবন-স্তর থেকে তাকে চিরকালীন এক প্রসারিত জীবন স্তরে তুলে এনেছে এমন নাম দিয়ে। গল্পের নামে তার প্রাথমিক ব্যঞ্জনা, তাই এমন নাম যুক্তিযুক্ত— শিল্পের প্রাথমিক শর্তে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, মৌরীফুল দেখতে সুন্দর। বিশাল নিঃসীম আকাশের নিচেই তার অন্তের স্বভাবে সমবেতভাবে প্রস্ফুটিত হওয়া! সেখানে যে সৌন্দর্য, সুশীলার রূপ ও স্বরূপে নবাগতা বধূটি তা-ই অনুভব করে। তার সরল দৃষ্টিতে সুশীলার স্বভাবের যে ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে, যে উদার সুষমাময় স্বরূপ স্পষ্ট হয়, সুশীলা ঠিক তা-ই! প্রতিদিনের

জীবনে সুশীলাকে সকলে ভিন্ন রূপে ও স্বভাবে দেখে। কিন্তু উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে সুশীলার স্বভাব মৌরীফুলের মতোই শোভাময়, লাবণ্যময়। যেহেতু এটাই লেখকের মূল লক্ষ্য, তাই নামকরণে তার চরিত্রগত সার্থকতার ব্যঞ্জনাগর্ভ পরিচয় আছে।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যার দিক আছে। মৌরীক্ষেত দেখে শহুরে মুগ্ধ নববধূর সামনে সুশীলা বলে— 'তুমি ফুলের গন্ধ দেখে বুঝতে পার না ভাই? ও তো মৌরীর ক্ষেত।..... মৌরীর গন্ধ কখনো পাওনি?' মৌরীফুলের সুগন্ধ, তার উচ্ছ্বসিত ঘ্রাণের মাদকতা, শাকের সুখাদ্য হিসেবে মর্যাদা পাওয়া— এসবই সুশীলার স্বভাবের গভীরে প্রতীক-প্রতিমে ওতপ্রোত। সুশীলা জেদি, একগুঁয়ে, প্রতিবাদী ঠিকই, কিন্তু তার গভীরে অন্তরালে আছে তার প্রসারিত হৃদয়, তার স্বভাবের লাবণ্য, তার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের মমতাময় মাধুর্য। এই হল গল্পকারের কেন্দ্রীয় চরিত্র-স্বরূপ। নামের সঙ্গে গল্পনামের এমন যোগে নাম সার্থক।

চতুর্থ ব্যাখ্যা— মৌরীফুল প্রকৃতির সম্পদ। তা থেকেই তার ফলরূপ 'মৌরী' খাদ্য হিসেবে আমাদের সামনে আসে। সেই মৌরীর কাঁচা অবস্থায় মিষ্টি-কষায় এক স্বাদ, আবার শুকনো করে ভাজলে আর এক স্বাদ তিক্ততা ও মিষ্টত্ব মিশিয়ে। এমন যে মৌরী— তার ফুলের সঙ্গে তার জন্মের যোগ— তা-ই সুশীলার চরিত্রগত প্রতীকী ব্যাখ্যায় মেলে। এদিক থেকেও সুশীলার স্বভাবের যোগে নামকরণ আলাদা মর্যাদা পায়।

শেষ ব্যাখ্যাটি হল— মৌরীফুল নববধূ ও সুশীলার সম্পর্ক তৈরির এক সুন্দর যোজক-অস্তিত্ব। নববধূর রোমান্টিক ভালোলাগা, নিষ্পাপ আকর্ষণ, সুশীলার স্নেহ-বুভুক্ষায় আত্মবিস্ফার— দুজনেরই বন্ধুত্বে, সখীত্বে মধ্যস্থতা করে ব্যঞ্জনায় মৌরীফুলই। তাই মৌরীফুল দু'টি নারীর নিষ্পাপ সরল মন ও সম্পর্কের টীকাকার বলেই এমন গল্প-নাম সার্থক। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি দৃষ্টি, চরিত্রদের প্রকৃতির কোলে রেখে প্রকৃতি-মানুষের যুগ্ম স্বভাব আঁকার প্রয়াসে গল্পটির মৌরীফুল নামকরণে তাঁর প্রকৃতিদর্শনও আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়।

৩.

ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পটি তাঁর তেরশো পঞ্চাশ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থভুক্ত সঠিক তারিখ অনুযায়ী উনিশশো চুয়াল্লিশের পঁচিশে জানুয়ারি প্রকাশিত 'নবাগত' নামের গ্রন্থের একটি অতি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই সময়ে যেহেতু গ্রন্থটি প্রকাশিত, বোঝাই যায়, এই গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম-সময়ে লেখা। বিভূতিভূষণের গল্পমালায় আমাদের আলোচ্য গল্পটির প্রধান গুরুত্ব, এটি নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় নাগরিক চরিত্রের নায়কত্ব দিয়ে লেখা। প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ, গ্রামীণ উপেক্ষিত মানুষজনের ছোট ছোট জীবনচিত্র রচয়িতা বিভূতিভূষণ এই গল্পে সম্পূর্ণত নাগরিক (urban)। এ গল্পে গ্রামের প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে চরিত্র-ন্যায়ে যতটুকু গ্রাম দরকার, ততটুকুই স্থান পেয়েছে। গ্রাম জীবন, প্রকৃতি বরং আলোচ্য

গল্পের নায়কের মনে বিপরীত ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তার কারণ আমরা বর্তমান গল্পটির আলোচনার মধ্যে প্রাসঙ্গিক সূত্র ধরে একটু বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করব।

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পটির আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে বিভূতিভূষণের নগর-মনস্কতা ও চরিত্র খুঁজে বেড়ানোর বিশেষ তৎপরতা নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখব। প্রথম এবং প্রধান কথা, বিভূতিভূষণ সাধারণ মানুষ সম্পর্কে এক নির্মল, জটিলতাহীন উদারতাকে মনের গভীরে পোষণ করেন। তারা সমাজ-ন্যায়ে আর নীতিধর্মে স্খলিত, পতিত— যাই হোক না কেন, তাদের ওপর লেখকের প্রতিশোধের কলম, শ্লেষ-ব্যঙ্গের আঘাত, তাদের 'ভিলেনি' দেখানোর মনোভঙ্গি কাজ করে না। দ্বিতীয় কথা, বিভূতিভূষণ নিজেই তাঁর 'অভিযাত্রিক' নামের ডায়েরিটিতে এক জায়গায় প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন:

> 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎকে ধরা দেয়। তাই দেখতে পথে বার হওয়া।...
>
> মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই।...'

এই ভাবনা থেকেই বোঝা যায়, বিভূতিভূষণ চরিত্রের মনোলোকের অধ্যাত্মজগতের অদ্ভুত, রহস্যময়তার অনুসন্ধানী। তার জন্য মানুষের মধ্যেকার জীবনযাপনের মূলীভূত অসহায়তাকে অন্ধকার থেকে আলোকের জগতে ধরতে উৎসাহী। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের কৃষ্ণলাল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকা। তৃতীয় একটি বড় দিক হল, চরিত্রের মধ্যেকার মানবিক বোধের রসের বৈচিত্র্যের অভিনব আস্বাদদানই তাঁর লক্ষ্য, যুগের সমস্যা, সংকট, ক্রান্তিলগ্নে দ্বিধাদীর্ণ দিক এড়ানো নয়, অপ্রাসঙ্গিক থেকে যায়। এটা বিভূতিভূষণের ত্রুটি নয়, তাঁর একান্ত নিজস্ব মানব ভাবনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্প-সমষ্টির মধ্যে এক গ্রামীণ মার্কোপোলো সিঁদুরচরণের অভিনব প্রকৃতি-ভাবনা, জীবন খোঁজার দিক দেখেছি, আবার কৃষ্ণলালে দেখেছি নাগরিক জীবনের রুক্ষ অসহায় জীবন-পরিবেশে এক একালের নগরপ্রাণ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রৌঢ় জীবনের অবৈধ নীতি-বিগর্হিত ভালোবাসার জীবনে শেষ স্বস্তির আশ্রয় অনুসন্ধানের প্রয়াস। বিভূতিভূষণের সর্বাংশে গ্রামীণ সিঁদুরচরণের বিয়ে না করে কাত্যায়নী ওরফে কাতুর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর 'লিভ টুগেদারে' অভ্যস্ত হওয়া, গল্পের শেষ সেই কাতুর কাছে ভালোবাসার জীবন-আশ্রয়ে স্থিত হওয়া। কৃষ্ণলালের অনিকেত জীবন স্বভাবও সেই গোলাপীর ছোট্ট দৈনন্দিন জীবনে স্থিত হওয়া। কৃষ্ণলাল-গোলাপীর পরস্পরের সম্পর্কেও সেই নীতিহীন 'লিভ টুগেদার'। আমরা একেই বলি রক্ষিতা রেখে জীবন অতিবাহন—যা উনিশ শতকের ধনী বাবুদের ছিল সামাজিক মর্যাদায় বড় মাপের গৌরব-সমুন্নত আভিজাত্য—যার বিস্তৃত পরিচয় আছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য়।

বিভূতিভূষণ এমনি এক নীতিহীন অথচ বিশ্বাস্য সম্পর্ক দিয়ে কৃষ্ণলালের জীবনকথা শুনিয়েছেন 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পে। গল্পটির কাহিনী অংশ ছোটখাটো ঘটনায় ঈষৎ বিস্তৃত হলেও শিল্পের সংযমে তা সুন্দর ও আকর্ষক। বর্তমানে কৃষ্ণলাল একজন প্রৌঢ় ক্যানভাসার। শিয়ালদা থেকে বারাসাত ও বারাসত থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত তার ক্যানভাস করার ভৌগোলিক সীমা। সে ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেটের তৈরি দত্তপুকুরের বাতের তেল

ট্রেনে নিয়মিত ফিরি করবে। চাকরি তার এইটাই। তার শেষ কাজ ক্যানভাসিং-এর হিসেব-পত্তরের কাজ চুকিয়ে রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানির কলকাতার অফিসে বিক্রির সমস্ত টাকা জমা দেওয়া। এমন হাতে কাঁচা পয়সা আসার চাকরিতে কৃষ্ণলাল নিজেকে সৎ রাখতে পারে না সবসময়। কোম্পানির ক্যাশ ভেঙে টাকা পয়সা নয়ছয় করে। এর জন্য একাধিকবার সে মালিকের কাছ থেকে সাবধানবাণী শুনেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার অর্থনৈতিক অসহায়তায় খরচ করেই ফেলে।

শেষে একদিন আগের ধার কাবুলিওয়ালার কাছে তারই চাপে অনিচ্ছায় শোধ করায়, কোম্পানির টাকা জমা না দেওয়ায় তার সত্যিই চাকরি গেল। সেদিন গড়ানো দুপুর পর্যন্ত অনেক তদ্বির করেও চাকরিটা রাখতে পারল না। অগত্যা শুকনো মুখে মেসে ফিরে নিচের পাইস হোটেলে সামান্য ডাল-ভাত খেয়ে সে তার রক্ষিতা গোলাপীর কাছে গেল। গোলাপী এখন রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া। সে যে একদিন সত্যি গোলাপের মতোই সুন্দরী ছিল, তা এখন দেখলেই বোঝা যায়। ষোল-সতেরো বছরের যৌবন বয়সে একদিন সুপুরুষ, সুদর্শন, রীতিমতো মেয়েদের মন-কেড়ে-নেওয়ার মতো বলিয়ে-কইয়ে ক্যানভাসার কৃষ্ণলালের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে এক উদ্দাম-উন্মত্ত জীবন দুজনের। নতুন বাড়িতে সংসার সাজায়। অসাধাবণ সুখী জীবন ওদের। এরপর ক্রমশ বদলায় দিন। ওর কোম্পানির বাতের তেলের অনেক নতুন নতুন নমুনা বাজারে বেরুল ভিন্ন সব কোম্পানির। কৃষ্ণলালের আয় গেল কমে। গোলাপী আবার কম পয়সার ঘরে সংসার নিয়ে এল। কিন্তু গোলাপী প্রেমে একনিষ্ঠ, কৃষ্ণলালের ও নিজের দুর্দিনে কৃষ্ণলালকে ভোলেনি, বিশ্বাসঘাতকতাও করেনি।

এমন প্রৌঢ় বয়সে চাকরি চলে গেলেও বেকার কৃষ্ণলালকে আশ্রয় দিতে ও সাহায্য করতে নির্দ্বিধ হয় গোলাপী। তার জন্যে ঝি-এর কাজ নিতেও তাব আপত্তি নেই। কিন্তু কৃষ্ণলালের নিজস্ব একটি আভিজাত্যবোধ আছে বংশ-মর্যাদা সূত্রে ও ক্যানভাসার হিসেবে। সে গোলাপীর পয়সায় না খেয়ে বাইরে, শহরের বুকে অনেক চেষ্টা করেও যখন কাজ পেল না, মেসের ভাড়ার ধারও মেটাতে পারল না, তখন মেস ছেড়ে পথে পথে ক'দিন কাটিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে যায়। বনজঙ্গলে ঘেরা নিজের পৈতৃক ভিটেয় বেশ কিছুদিন কাটানোর পর বোঝে, গ্রামের নিস্তরঙ্গ অলস ছোট জীবন তার কাছে একান্ত বিরক্তিকর, অপদার্থতার। সে কাজ চায়, নিজের উপায় চায়। আবার কলকাতায় ফিরে আসে। পুরনো মেসেই বারান্দায় থাকার একটা ব্যবস্থা করে নেয়। চাকরি আর পায় না। অল্পবয়সী ক্যানভাসারদের কাছে তার যেন পরাজয়ই সত্য হতে থাকে। শেষে কৃষ্ণলাল ভাবে, তার এভাবে ক্যানভাসিং-কাজ ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। সে নিজের টিনের স্যুটকেশ নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে গলা তুলে বক্তৃতা দিয়ে দত্তপুকুরের বাতের তেলের বিজ্ঞাপন করে। তার কাছে তেলই নেই, সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে যারা কিনতে উৎসুক, তাদের একটা স্লিপ দিয়ে কোম্পানির কাছ থেকে নিজে গিয়ে কিনে নিতে বলে। সে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান ড্রাগ সিন্ডিকেটের প্রচার বিভাগের প্রতিনিধি!

এই অভিনব কৌশলে কৃষ্ণলালের হয় অসাধারণ জিত। কোম্পানির মালিক ক'দিন

ধরে তাদের বাতের তেলের এমন হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধিতে বিস্মিত হয়ে ডালহৌসিতে এসে প্রত্যক্ষ করে তাদের পুরনো ক্যানভাসার কৃষ্ণলালকে। খুশি হয়ে তাকে নতুন করে নিয়োগ করে ষাট টাকার মাইনের হেড ক্যানভাসার পদে। তার সঙ্গে উপরি থাকছে আলাদা কমিশনও। এখন তার কাজ ক্যানভাসারদের ওপর খবরদারি করা ও ক্যানভাসিং শেখানো। এমন একটি মোটা টাকার চাকরি নিয়ে সন্ধেয় কৃষ্ণলাল এবার চলে আসে গোলাপীর কাছে। হাত তার খুশিতে কেনা জিনিসপত্তরে ভরা।

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' নাগরিক জীবনের পটে ধৃত চরিত্রাত্মক গল্প। যে কোনো চরিত্রাত্মক গল্পের অভ্যন্তরে থাকে মনস্তত্ত্ব, মুখ্য বা গৌণ অর্থে সমকালীন সমাজ সমস্যা এবং নায়ক-নায়িকার (যদি সেভাবে নায়ক ও নায়িকা দুই-ই থাকে) ব্যক্তি-সম্পর্কের জট তৈরি হওয়া ও উন্মোচন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কোনো চরিত্রনির্ভর গল্পে থাকবেই কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের ব্যক্তিত্বের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য, থাকবে তার জীবন ও মনের বিকাশের সচল সক্রিয়তা-নির্ভর ক্রম-অভিব্যক্ত রূপ, এবং থাকবে সব শেষে পাঠকের হৃদয়ে অবলীলায় এবং চমকের দীপ্তি ও রহস্যের ঘা মারার মতো এক অজানা অসীমতার কল্পনাময় ব্যঞ্জনা। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পে এসবের চমৎকার শিল্পসম্মত বুনন!

কিন্তু বিশেষ একটি চরিত্র— কৃষ্ণলালের মতো— গল্পের কেন্দ্রে রেখে গল্পকার যে প্লট-বৃত্ত রচনা করেছেন, তাতে ফাঁক নেই, অতিকথন নেই। যে কোনো গল্পের শিল্প-কাঠামোর বড় দিক তিনটি— গল্পের শুরু, গল্পের 'মহামুহূর্ত' এবং গল্পের শেষ— যেখানে 'শেষ হয়ে না হইল শেষ।' 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের শুরু অবশ্যই কৃষ্ণলাল-নির্ভর জীবন-অভিজ্ঞতার আকস্মিক একটি ঘটনার টুকরো দিয়ে। 'চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না।'— এই যে কাহিনীর শুরু, এর বিস্তার ঘটেছে স্তরে স্তরে— ক. কৃষ্ণলালের চাকরি যাওয়ার কারণ-চিত্র ও নায়ক চরিত্রের অসহায়তা, খ. রক্ষিতা গোলাপীর সঙ্গে কৃষ্ণলালের সপ্রেম সাক্ষাৎ-চিত্র আঁকার সূত্রে উভয়ের অতীত জীবনের রক্তিম জীবনযাপন প্রসঙ্গের উপস্থাপন, গ. মেস ছেড়ে কৃষ্ণলালের গ্রামে যাওয়া ও আবার শহরে ফিরে আসা, ঘ. সবশেষে নায়কের ডালহৌসি অঞ্চলে আগের কোম্পানির পক্ষে বাতের তেলের স্বার্থহীন ক্যানভাস করা ও কোম্পানির মালিক কর্তৃক নতুন করে উচ্চপদে কৃষ্ণলালের নিয়োগের ঘটনা, ঙ. দিনের শেষে রক্ষিতা গোলাপীর আশ্রয়ে কৃষ্ণলালের খুশি ও আনন্দে আগমন।

কাহিনী ও প্লট-বৃত্তের বিন্যাসে এতটুকু অতিরিক্ততা নেই। গল্পের 'মহামুহূর্ত' হল চরিত্র ধরেই— শুরু কৃষ্ণলালের অযাচিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে আগের মালিকের বাতের তেলের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া, শেষ— মালিকের এমন কথায়:

> 'আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যানভাসার এ্যাপয়েন্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক করে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না?'

গল্পটির শেষতম ব্যঞ্জনায় আছে কৃষ্ণলাল-গোলাপীর গভীর প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক-সৌন্দর্যে এক

প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ার love এবং security-র যৌথ ভাবের প্রত্যয়। গল্পটির মধ্যে ঘটনা আছে বড় মাপে নয়, নায়ক চরিত্রের সঙ্গে অবশ্যই শিল্প-মাপে মানানসই হয়ে। বিভূতিভূষণ তাঁর একাধিক গল্পে ঘটনাকে কখনোই বড় করে দেখেন না, ঘটনা সবসময়েই আড়ালে থাকে, প্রধান হয় চরিত্রের ভাবলোক। গল্পে কোথাও মৃত্যুর মতো ঘটনা প্রধান তাৎপর্যে সত্য হলেও গল্পকার অদ্ভুত নিরাসক্তি দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখেন এবং তার বিষাদময় তাৎপর্যটুকুই গল্পের বৃত্তে শিল্পের লাবণ্যে মনোরম করেন। 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তি এবং 'মৌরীফুলে'র সুশীলা এর প্রমাণ। আলোচ্য গল্পে কৃষ্ণলাল যে 'চরমক্ষণ' এনেছে, তা ঘটনায় নয়, চরিত্রের ভাবমূলক প্রকাশ ভঙ্গিতেই। হতাশ কৃষ্ণলালের চাকরি পাওয়া ও গোলাপীর কাছে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে ভাবমূলক মনস্তত্ত্ব-প্রয়োগে আছে নিশ্চিত গভীরতা ও এক প্রৌঢ়ার বিষণ্ণ প্রেমের প্রদীপের প্রজ্বলন!

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের মূল ভাবকেন্দ্র নায়ক চরিত্রের সক্রিয়তায় নিশ্চিত নিয়ন্ত্রিত। নায়ককে ভারসাম্য দিতেই গল্পকার এনেছেন গোলাপীকে— উভয়ের, দীর্ঘকালের প্রেমে— এটা প্লটের দিক। আর নায়ক চরিত্রের বড় তাৎপর্যের দিক থেকে গোলাপীর সঙ্গে নায়কের প্রেম, প্রচলিত নীতিবর্জিত রক্ষিতার সঙ্গে প্রেম হলেও, গল্পকার অতি স্বাভাবিক ক্ষোভহীন উদাসী নিস্পৃহ মনে সমাজনীতি-বিবিক্ত এক পরিণত মনের প্রেমের বিভাকেই উজ্জ্বল রঙে আমাদের উপহার দিয়েছেন:

> 'সন্ধ্যাবেলা। ... নবীন কুণ্ডু লেনে খোলা সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্ত্রা-কাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময়ে বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল— গোলাপী, ও গোলাপী, বাইরে এসে এই জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেঙে গিয়েছে—'

গল্পের অন্তিমের ব্যঞ্জনায় এই কণ্ঠস্বরের অন্তরঙ্গতা— একদিকে গোলাপীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কষ্ট, আর একদিকে গোলাপীর কাছে বহু দিনের অ-দৃশ্য কৃষ্ণলালের খুশির কণ্ঠ, দুয়ের বৈপরীত্যে ব্যঞ্জনা আমাদের প্রত্যাশার দিগন্ত অতিক্রম করায় নিমেষে। গল্পের শুরুর চিত্র গভীর হতাশার, বিষণ্ণতার, জীবনধারণের পক্ষে কঠিন বিমুখতার:

> 'চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না।'

আর গল্পের শেষে চাকরি পাওয়ার খুশি ও কৃষ্ণলালের সাম্প্রতিক অনিকেত জীবনধারণ গোলাপীর কাছে আশ্রয়ী জীবনযাপনের ঘেরাটোপে দীপ্ত হয়ে ওঠে। গল্পের শুরু ও শেষ দিয়ে এই যে গল্পের কাহিনী ও অন্তর্নিহিত ভাবের নিটোল রূপ রূপায়ণ, তা গল্পকার বিভূতিভূষণের এক শিল্প-সার্থক গল্প উপহার দেওয়ার বিস্ময়কর কৃতিত্ব। গল্পটির ভাবের একমুখিতা এইভাবেই গল্পের মেদবর্জিত অবয়বে সংযত শিল্পের সুমিত রূপে সার্থকতা পেয়ে যায়।

দুই

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের নায়ক কৃষ্ণলাল। সে বিত্ত বিচারে অবশ্যই নিম্নবিত্ত। সে

যে নগরজীবনে একান্তভাবেই অভ্যস্ত, তার শহর থেকে প্রথমে গ্রামে যাওয়া ও গ্রাম থেকে শহরে প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য-চিত্রে প্রমাণিত হয়ে যায়। তার যৌবন বয়সে নিচের মহলের নারীদের কাছে নৈশ জীবনযাপন, তার গোলাপীর মতো সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে প্রণয় ও রক্ষিতার মতো সংসর্গ রচনা, গ্রাম জীবনের প্রতি ঘৃণা ও শহর জীবনে আকর্ষণ তাকে অবশ্যই নাগরিক চরিত্র করে তোলে। গ্রাম জীবন ও প্রকৃতি প্রেমের একনিষ্ঠ গল্পকার বিভূতিভূষণ অত্যন্ত সতর্কভাবেই এমন এক নাগরিক ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছেন আমাদের।

কৃষ্ণলাল একজন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ক্যানভাসার হতে পারে, তার দারিদ্র্যের জন্য নিচু মাপের জীবনধারণ ও নীতিহীন প্রেমে রক্ষিতার সঙ্গে জীবনযাপন সাধারণ মাপে তুচ্ছ, উপেক্ষিত মানুষ করতে পারে তাকে, কিন্তু তার চরিত্রেও তার নিজস্ব একটা বলয় আছে বর্মের মতো— তা তার সচেতন আভিজাত্যবোধ। চাকরি যাওয়ার পর সে ঠাট্টা করে গোলাপীকে বলে বটে, 'তোর রোজগারে এবার খাই দিনকতক— সে সাধ আমার আছে অনেক দিন থেকেই।' এটা গভীর ভালোবাসার সম্পর্কে পারস্পরিক সূক্ষ্ম কৌতুকই, কিন্তু বেকার থেকে একদিনও সেই সুযোগ সে নেয়নি। লেখক তার মানসিকতা এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

> 'তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ী কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে— এমন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের।'

এই অর্থেই কৃষ্ণলালের আভিজাত্যবোধ 'এ্যাভারেজ' মানুষদের থেকে বেশি এবং তা স্বাভাবিক। কৃষ্ণলাল কোনো উন্মূলিত জীবন থেকে, বংশ-পরম্পরাহীন জীবন-সম্পর্ক থেকে উঠে-আসা মানুষ নয়। তার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালিতে নিজের জমিজমা ও খড়ের ঘর আছে। সে ব্যক্তিত্বে ও আভিজাত্যে অত্যন্ত সজাগ বলেই, গলির মধ্যে হারমোনিয়াম গলায় বাঁধা ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে গোলাপী লঘু চালে কৃষ্ণলালের ক্যানভাস করার তুলনা করলে, রাগে বাধা দেয়:

> 'কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখছি— তারা হল ফিরিওয়ালা— আমরা হলুম ক্যানভাসার— হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের ব'লো না।'

এভাবেই বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিভূতিভূষণ এঁকেছেন কৃষ্ণলালকে, তার গল্প-শিল্পের এক গৌরবময় ব্যক্তিত্ব।

এমন যে কৃষ্ণলাল তার চরিত্রের গভীরে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে ধরা পড়ে তিন 'ডাইমেনশন': ১. কৃষ্ণলালের নাগরিক জীবন পরিবেশে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জীবনধারণে আছে অস্তিত্ব রক্ষার রূঢ় বাস্তবতা; ২. তার চাকুরিনির্ভর যে ক্যানভাসিং-এর দিক তার মধ্যে আছে তার পেশাকে জীবনযাপনের সঙ্গে গভীরভাবে সমন্বিত করা; ৩. কৃষ্ণলাল জীবনধারণ ও জীবনযাপনকে এক করতে পেরেছে বলেই সে একজন বড় শিল্পী— তার

পেশায় ও নেশায়। তার পেশা তার কাছে অন্যের অনুগ্রহ: তার নেশা তার ক্যানভাসিংকে শিল্প করা— সেখানে সে যথার্থ শিল্পী। আর যখনি সে পেশা ও নেশাকে, বাঁচার রসদ ও শিল্পের মর্যাদাকে এক করতে পেরেছে, তখনি সে বড় জীবন-শিল্পী হয়ে গেছে। গোলাপী তার কাছে এই একরূপে দুই বেণীবন্ধনের প্রেরণাদাত্রী।

কৃষ্ণলাল সামান্য একটু খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্য হন্যে হয়ে নতুন চাকরি খোঁজে চাকরি যাওয়ার পর। তার জন্যে সে মেসবাড়ির মালিকের কাছে অপমান সহ্য করেছে, পথে পথে ঘুরে অভুক্ত থেকেছে, নতুন ক্যানভাসারদের দেখলে সেই কাজে নিজের মতো লেগে থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, একসময়ে শহর ছেড়ে নিজের গ্রামে গিয়েও বাঁচার জন্য পথ খুঁজেছে। এটা চরিত্রের মূল জীবনধারণের দিক। কিন্তু তার চরিত্রের আর একদিক— সে তার পেশাকে ভালোবাসে গভীরভাবে। কিভাবে খদ্দের টানা যায় ট্রেনের মধ্যে: তার জন্য রীতিমতো ভাবে, সুন্দর করে বক্তৃতাদানের চেষ্টা করে। চাকরির মধ্যে পেশার সৌন্দর্যে সে শিল্পী করে তোলে নিজেকে :

> 'তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার কি করিয়া ভুলিয়া যাইত— জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।'

এখানেই কৃষ্ণলালের পেশার জীবনে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বিপুল সার্থকতা! চাকরি চলে গেলে গোলাপী যখন তার বেশি বয়সের প্রসঙ্গ তুলে চাকরি আর না-পাওয়ার আশা প্রকাশ করে, তখন আবেগে, উত্তেজনায়, হেরে না যাওয়ার প্রত্যয়ে-শপথে তার সামনেই ক্যানভাসিংয়ের বক্তৃতা সেই সুন্দর ঢঙে শুনিয়ে দেয়। প্রমাণ করে কৃষ্ণলাল একজন ক্যানভাসারদের মধ্যে পেশায় শিল্পী! কৃষ্ণলাল কর্মিষ্ঠ মানুষ; আলস্য তার কাছে ঘৃণা। ক্যানভাসিং যে তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত, তার ভাবনায় তার পরিচয়:

> 'আচ্ছা, সে ক্যানভাসিং ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরী নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চা অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যান্‌ভাসারেরা কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে।'

এই পরাজয়ের ভয়, এই হতাশা, এই শিল্পপ্রীতি থেকেই আবার সে ডালহৌসি পাড়ায় আসে নিঃস্বার্থভাবেই সেই পুরনো বাতের তেল ক্যানভাসিং-এ! এই সক্রিয়তা তার প্রাক্তন কোম্পানির প্রতি কৃতজ্ঞতা বা প্রীতি নয়, বাতের তেলের মহিমাজনিত বিস্ময় প্রকাশেও নেই, এটি তার ক্যানভাস করাও যে এক শিল্প— তার প্রতি শ্রদ্ধাই!

তাই কৃষ্ণলালের জীবনধারণের যখন স্থায়ী ব্যবস্থা হল প্রাক্তন মালিকের কাছে, তার সঙ্গে তার অর্থভাগ্য ও শিল্পপ্রীতি— দুই-ই সমান মর্যাদা পায়। এখানেই চরিত্রটির প্রৌঢ় বয়সের মনোবাসনার পূর্ণতা, জীবনের স্থিতি। তারপরেই সে আসে গোলাপীর আশ্রয়ে। কৃষ্ণলালের গোলাপী-প্রেম তার অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম আশ্রয়। তার নীতিগত জীবনচর্যা— গোলাপীর সূত্রে— সমাজ ন্যায়ের দিক থেকে নিশ্চয়ই অপ্রশংসার, তা চরিত্রহীনতার নামান্তর মাত্র ঠিকই, কিন্তু তার মতো অতি তুচ্ছ সাধারণ মানুষটির যে মনোবাসনার উত্তরণ পেশাকে শিল্প কবার ও অল্পবয়স থেকে রক্ষিতাকে প্রৌঢ় বয়সেও

সম্মান দেওয়ার— তাতেই সে অনেক বড় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। কৃষ্ণলাল তার অভাব ও বেকারির দিনেও অসম্মান করেনি গোলাপীর। কৃষ্ণলালের চাকুরি তার জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তার ক্যানভাসিং-কে নিজের চেষ্টায়, যত্নে ও কৃতিত্বে শিল্প করা এবং তার গোলাপীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম তার জীবনযাপনেরই উপযুক্ত। বিভূতিভূষণের কৃষ্ণলাল চরিত্রটি ত্রিমাত্রিক (Three dimentional) বৈশিষ্ট্যে কঠিন শিল্পের সহজ এক অনবদ্য সৃষ্টি।

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পে গোলাপী চরিত্রটি কৃষ্ণলালের পাশে যথেষ্ট সংযত ও মানানসই। তার অতীত ও বর্তমান মিলিয়ে বিভূতিভূষণ গোলাপীর যে পট ও প্রকৃতি এঁকেছেন গল্পে, তাতে সে যে সমাজে অস্পৃশ্য পতিত রমণী, একজন বারবিলাসিনী, সেই সঙ্গে কৃষ্ণলালের রক্ষিতা এবং প্রেমিকা— তা যেমন সহজবোধ্য হয়, তেমনি তার নৈতিকতা নিয়ে আমাদের কোনো বিরূপ মনোভাব আসে না। তার কারণ, কৃষ্ণলাল চরিত্রের সঙ্গে তার ছায়ার মতো যোগ! সমাজের বিচার-ব্যবস্থায় অথবা নীতি-দুর্নীতির নিরিখে সে যে স্তরেই থাকুক, সে আমাদের সমবেদনা অবলীলায় আদায় করে নেয়। গোলাপী শহরের মেয়ে নয় মূলে, গ্রাম থেকে শহরে আসা, পরে শহরেরই নিচের তলার অন্ধকার জীবনে তৈরি করা বারো ঘর সঙ্গিনীর একজন—তা তার সংলাপ ও প্রসঙ্গাদি বুঝিয়ে দেয়:

১. ' গোলাপীর তখন বয়স ষোলো সতেরো। রূপ দেখিয়া রাস্তার লোক চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মা'র হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে।'
২. 'কৃষ্ণলালের মেসের ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্র স্ত্রীলোক ঢুকিতে দেবে না।'
৩. 'গোলাপীরা নতুন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল— ওগো, একটু রয়ে সয়ে নিস— দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে— খুব বরাত তোর যা হোক গোলাপী।'
৪. 'তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে এই বাড়ীটিতে থাকিতে হয়।'

এই সমস্ত বর্ণনার খণ্ডচিত্রে ও প্রসঙ্গে গোলাপীকে বিভূতিভূষণ সেকালের কলকাতার অশিক্ষিত দেহজীবী রমণীদের অন্যতম রূপে পরিচয় করিয়েছেন।

কিন্তু গোলাপীর বড় পরিচয় সে কৃষ্ণলালের রক্ষিতা, প্রেমিকা, অবসরের সঙ্গী, নিশীথ-সহচরী। এই অর্থে সে ব্যতিক্রম। তার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব তার কৃষ্ণলালের প্রতি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম। কৃষ্ণলালের সঙ্গে যোগাযোগের পর সে এতকাল 'বাঁধা মেয়ে মানুষ' থেকেছে। কৃষ্ণলাল তাকে ছাড়েনি, ভোলেনি, সে-ও কখনো তার ভালোবাসা থেকে আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে নিবৃত্ত হয়নি। গল্পে কৃষ্ণলালের চাকরি যাওয়ার পর গোলাপীর কাছে এসে যখন কৃষ্ণলাল তার ট্রেনে ক্যানভাসিং-এর রাজকীয় বক্তৃতা-অংশ শোনায় গোলাপীকে, যখন গোলাপী তাকে কাঁধে হারমোনিয়াম ঝোলানো ফেরিওয়ালাদের

সঙ্গে তুলনা করে, তখন কৃষ্ণলালের অকৃত্রিম রাগ ও প্রতিবাদ গোলাপীকে তাদের দীর্ঘ-প্রবাহিত প্রেমের আভিজাত্যকেই স্মরণ করায়:

> 'গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। এতদিন পর যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল, ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে টানিয়া সরাইয়া দিল।'

গোলাপী অকৃতজ্ঞ নয়, চাকুরিবিহীন কৃষ্ণলালের অসহায়তার দিনে এই প্রৌঢ় বয়সেও কৃষ্ণলালের সঙ্গে দেখা করার জন্য 'একদিন দু'ঘণ্টা মেসের বাইরের ফুটপাতে বসিয়া ছিল তাহার অপেক্ষায়—।' প্রৌঢ় বয়সে কৃষ্ণলালের জন্য ঝি-বৃত্তিতে বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করে না। সে অতি দরিদ্র, বর্তমানে কুরূপা প্রৌঢ়া, তবু কৃষ্ণলালের কাছে সে প্রেরণা হয়, কৃষ্ণলালের চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনা গোলাপীকেও নতুন উদ্যমে পরিশ্রমের কাজ গ্রহণে প্রেরণা দেয়:

> 'গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল— যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন!
>
> — তা হলে বলো চাকুরীতে নেবে কিনা?
>
> — নেবে না আবার? একশো বার নেবে— আমি যাই এখন ঝি-গিরি করে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি— নিজেই খেতে পাবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে!'

গোলাপী ও কৃষ্ণলালের সম্পর্কের অতীত ইতিহাস ধরে বর্তমানে প্রৌঢ় অবস্থায় পরস্পরের মধ্যেকার অন্তরঙ্গ নির্ভরতার চিত্র, যে বিষণ্ণ ভালোবাসার মানসিক লেনদেন, তাতে রক্ষিতা গোলাপী যেমন তার সীমা হারিয়ে জীবনের গভীরে মহৎ মূল্য পেয়ে যায়, কৃষ্ণলালও তেমনি অনিকেত জীবন থেকে নিজের ঘরে ফিরে আসে। গোলাপী ও কৃষ্ণলাল কেন্দ্রাতিগ জীবন থেকে কেন্দ্রানুগ জীবনে স্থিতি পায় গভীর প্রেমে ও বিশ্বাস্য নির্ভরতায়। বিভূতিভূষণ যে যথার্থ জীবন-প্রেমিক কথাকার, এমন আশাবাদের উপান্ত চিত্রে তার প্রমাণ মেলে। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রীয় পতিতার পরিচয় মিলেছে, কিন্তু বিভূতিভূষণের পতিতা অন্য ধাতুতে গড়া— সে ধাতু শিল্পের বাস্তবতার অন্য মাত্রায় যাচাই করার উপযোগী।

তিন

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পে গল্পকার বিভূতিভূষণ সাধু গদ্যে যে গল্পে অবয়ব নির্মাণ করেছেন, তা তীব্র গতিসম্পন্ন। তার মধ্যে চমক যেমন আছে, তেমনি আছে বিস্ময়কর চলনধর্ম। গল্পটির আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঔৎসুক্য বজায় থাকে পাঠকের। কৃষ্ণলাল-গোলাপীর অতীত যৌথ-জীবন চিত্রণে বিভূতিভূষণ 'ফ্ল্যাশব্যাক'-এর রীতি নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রসঙ্গটি কৃষ্ণলালের জীবন ও চরিত্রেরই ছায়ার মতো গল্পে প্রাসঙ্গিক থেকেছে। বর্ণনা করেছেন লেখক স্বয়ং, কিন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কৃষ্ণলালই তার স্মৃতিসূত্রে ওই অংশের চিত্রকর। ফ্ল্যাশব্যাক অংশটির সূত্রপাত এইভাবে:

'তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্তমানে রূপ-যৌবনহীনা প্রৌঢ়া, পরণে আধ-ময়লা খয়েরী রঙের শাড়ী, হাতে গাছা কয়েক কাঁচের চুড়ি, দু'গাছা সোনা বাঁধানো পেটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রঙ এখনও বেশ ফর্সা।'

এই যে গোলাপীর বর্ণনা, তা যেন লেখকের নয়, কৃষ্ণলালেরই সদ্য চাকরি পাওয়ার পর নতুন করে গোলাপীকে দেখা! আর এই অংশের পর যখন ত্রিশ বছর আগের প্রসঙ্গ সামনের পর্দা সরে যাওয়ার মতো ওঠে, তখন বুঝিবা কৃষ্ণলালের স্মৃতিলোক উন্মোচিত হয় তার নিজেরই মনের অধিতল থেকে। এইভাবে অতীত-উন্মোচনের রীতি-প্রয়োগ ছোটগল্প রীতির সুমিত ব্যবহারে শিল্প-ধন্য।

কৃষ্ণলালের গ্রামজীবনের প্রসঙ্গে এসে গ্রামজীবন ও প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ অবলীলায় নিরাসক্ত থেকেছেন। সে গ্রামজীবন শহুরে কৃষ্ণলালের দৃষ্টিতে দেখা। এখানে বিভূতিভূষণের সেই অ-লৌকিক দৃষ্টি নেই, আছে রুক্ষ গ্রামজীবন ও স্বভাবের বর্ণনা। তার অর্থনীতি, নৃতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, পরিবেশ কৃষ্ণলালের মধ্য দিয়ে দেখা। কৃষ্ণলালের জীবনের বৈপরীত্য দেখানোও লেখকের উদ্দেশ্য। এই গ্রামজীবন চিত্র নিছক বিবৃতি-সর্বস্বতায় আঁকা হয়নি, এব সামগ্রিক ইঙ্গিতধর্ম নায়ক-চরিত্র ন্যায়ে ও গল্প-শিল্প ন্যায়ে মাপা। বর্ণনার সংযম ও সীমায় আছে রীতির স্বাভাবিক শাসন।

সংলাপ রচনায় বিভূতিভূষণ এক অনবদ্য শিল্পী। কৃষ্ণলাল বিক্রির সব টাকা খরচ করে ফেলেছে, মালিকের সামনে তার দ্বিধার ও অসহায়তার ভাষা এইরকম:

'... যাক, ক্যাশ এনেছেন এখন?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল— ক্যাশটা আনিগে যাই— না— একটু মুশকিল হয়েছে, আচ্ছা আসি—'

সংলাপে এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। গল্পের শেষ কৃষ্ণলালের সংলাপের ব্যঞ্জনায় আলোময়। সেখানে গোলাপীর হাড়ভাঙা কষ্টের, দারিদ্র্যেব চিত্রের বিপরীতে কৃষ্ণলালের চাপা খুশি ও উচ্ছ্বাস-উল্লাসের, সেই সঙ্গে আনন্দঘন প্রসন্ন নির্ভরতার, বিবাহ-সম্পর্কহীন সংসার জীবনেও পারিবারিক পরিতৃপ্তির নিবিড় ব্যঞ্জনা:

'—গোলাপী, ও গোলাপী, বাইরে এসে এই জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেঙে গিয়েচে—'।

লক্ষণীয় গল্পের শেষতম সংলাপ বাক্যের একেবারে অন্তিমে বিভূতিভূষণ কোনো পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন বসাননি। তা-ই প্রতীকী তাৎপর্য— গোলাপী-কৃষ্ণলালের বিরতিহীন জীবনযাপন ও ধাবণের continuity। এসবের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের রক্তিম আলো গোলাপীর কষ্টের জীবন-চিত্রের পাশে মনোরম আশাব্যঞ্জক জীবনপ্রীতির সাহস ও স্বাদ দেয়। গল্পটির বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্যনির্ভর ভাষা ও রীতিপ্রয়োগ নিশ্চিত উপভোগ্য।

চার

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' চরিত্রাত্মক গল্প এবং এই গল্পটির নামেও নায়ক-চরিত্রকেন্দ্রিক

নামকরণ-বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়েছে। গল্পটির মূল বিষয়বস্তু ও কাহিনী ধারায় নায়ক কৃষ্ণলালেরই একমাত্র সক্রিয়তা। তারই সূত্রে এসেছে গোলাপী। সে প্রধান পার্শ্বচরিত্র এবং কৃষ্ণলালের সূত্রেই আগমন হলেও তার গুরুত্ব গল্পে কম নয়। তবু গল্পটির নাম 'কৃষ্ণলাল ও গোলাপী' এমন হতে পারত যদি চরিত্র ধরে নামকরণকে কেন্দ্রীয় বক্তব্যে ওতপ্রোত করতে লেখক আরও এক সুযোগ নিতেন। কারণ গল্পের শেষে সেই কৃষ্ণলালের গোলাপীর কাছেই চিরকালীন আশ্রয় গ্রহণের ব্যঞ্জনা! কিন্তু গল্পের 'লাইমলাইট' কৃষ্ণলালকে নিয়েই সব সময় থেকেছে। তার ব্যক্তিত্বে, অভিমানে, অহংকারে, আত্মমর্যাদাবোধে কৃষ্ণলালকে যত করুণা ও সহমর্মিতায় পাঠক গ্রহণ করে তার সবরকম নীতিবিগর্হিত কাজ ও অসততার মধ্য দিয়ে, গোলাপী ততটা টানে না। গল্পে গোলাপী তো কৃষ্ণলালের ছায়া— কেবল প্রেম-সম্পর্কের দিক থেকে। কৃষ্ণলালের পেশায় সে কিছু প্রেরণা, সবটা নয়। তাই গোলাপীর নাম বাদ দিয়ে প্রৌঢ় কৃষ্ণলালের জীবনের একক দুঃসময়কে ধরে সুসময়ে নিয়ে আসার কাহিনী ও লক্ষ্য আছে বলেই নায়কের নাম ধরে নামকরণ যথার্থ।

নামকরণ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় একটা ব্যাখ্যা আসে কৃষ্ণলালের নামের আগে 'ক্যানভ্যাসার' কথাটির সংযোজনে। 'ক্যানভাসার' শব্দটি ইংরেজি এবং নায়কের প্রধান পেশার পরিচয় সূত্র। যেমন 'পকেট', 'গ্লাস' ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ বাংলার কথ্যপ্রয়োগে প্রচলিত হয়ে গেছে সহজেই, 'ক্যানভাসার' শব্দটিও তা-ই। কৃষ্ণলালের পেশার পরিচয় দিয়ে গল্পের নাম। কৃষ্ণলাল বস্তুত 'বিশেষণে সবিশেষ' এ গল্পে। এই বিশেষ বিশেষণযুক্ত কৃষ্ণলাল গল্পের নামে থাকায় অবশ্যই তা সার্থক। কারণ কৃষ্ণলালের পেশা শুধু অর্থ উপার্জনের দিক নির্দিষ্ট করে না, তার জীবনধারণের মূলকে ধরে রাখে। কৃষ্ণলাল জীবনধারণের প্রয়োজনের সঙ্গে তার পেশাকে গভীরভাবে ভালোবাসার দিকও তুলে ধরে। তার পেশাকে গোলাপী একসময় শ্লেষ করলে, হারমোনিয়াম কাঁধে নাচ-গান করা ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে তুলনা করলে সে ক্ষুব্ধ হয়, অপমান বোধ করে। তাই পেশাই তার ধ্যান-জ্ঞান-জীবন। সুতরাং গল্পের নামে বিভূতিভূষণ যে 'ক্যানভাসার' শব্দটি সহ 'কৃষ্ণলাল' নাম প্রয়োগ করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনেছেন, তা গল্পের নামকরণে অবশ্যই শিল্পসার্থক।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা নামকরণের চরিত্রনির্ভরতা থেকে ব্যঞ্জনায় বিশেষ চরিত্রেরই সূত্রে আরও গভীরে নিয়ে যায় পাঠকদের। কৃষ্ণলালের কাছে ক্যানভাসিং নিশ্চয়ই তার জীবন, কিন্তু তার তাকে ভালোবাসায় থাকে এক শিল্পী মন। কিভাবে সে তার ক্রেতাদের আকর্ষণ করবে তার কথা সে ভাবে, তার বক্তৃতা সুন্দর করে, অমোঘ আকর্ষণে ক্রেতাদের মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। 'তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত— জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।' তার কাছে ক্যানভাসিং যে শিল্প, তা তার গোলাপীর কাছে প্রাসঙ্গিক আবেগাত্মক কথায় প্রমাণ হয়ে যায়। এই প্রৌঢ় বয়সেও সে বেকার হয়ে যাবার পর তার ক্যানভাসিং-এর শিল্পিত কৌশল প্রমাণ করতে নেমে পড়ে। সে যে একজন বড় মাপের ক্যানভাসার, ক্যানভাসারদের ক্যানভাসার, তার দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবে ডালহৌসির ধারে

পেশাকে নেশার মতো করে বক্তৃতাদানে তার পরিচয় মেলে। বাজারে তার প্রতিপক্ষের সামনে নির্ভীকভাবে তার ক্ষমতার প্রমাণ দেয়, চর্চা সমানে রাখে :

> 'সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জোটে কিনা সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যাহা গলা আছে, থিয়েটারের রামের মত গলাওয়ালা কোন্ ছোকরা ক্যান্‌ভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়।'

অর্থাৎ ক্যানভাসার কৃষ্ণলালের কাছে ক্যানভাসিং শুধু পেশা নয়, জীবনধারণের উপায় মাত্রও নয়, তা তার জীবনযাপন, পেশাকে শিল্প করে তোলার বড় এক সাধনা, শক্তি, এক শিল্পী-ব্যক্তিত্বের শিল্প-চেতনা! তাই নামে 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' ব্যবহারে কৃষ্ণলালের মূল চরিত্রকেন্দ্রটির ব্যঙ্গাত্মক প্রমাণ মেলে।

চতুর্থ ব্যাখ্যাটি কৃষ্ণলালের 'ক্যানভাসার' ছাপ-মারা নামের বিপরীত ভিন্ন তাৎপর্যের নামের শিল্প-গরিমা কিছুটা প্রমাণ করে। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' এমন নামে প্রৌঢ় ওই ব্যক্তিটি সমাজের নিচের এক শ্রেণীর, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে নির্দিষ্ট করে দেয়। পেশার দিক থেকে তুচ্ছ, মানুষটাই তাই অবহেলার, উপেক্ষার। প্রাথমিকভাবে এমন নামে 'এ্যাভারেজ' পাঠকদের সেই ধারণা সত্য হয। কিন্তু এই কৃষ্ণলাল যে সাধারণ ক্যানভাসারদের থেকে স্বতন্ত্র, উঁচু মাপের ও মনের, তার রক্ষিতা-নির্ভর নীতিহীন অ-সাংসারিক জীবন, রক্ষিতার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, তার প্রেমে আত্মকেন্দ্রিক নিস্পৃহতা, তার যাবতীয় অসতর্কতা, অসৎ-চরিত্রতা সত্ত্বেও তাকে বড় প্রাণের মাপে ধরে রাখে। সে পেশার জায়গায় অসৎ হতে পারে, কোম্পানির ক্যাশ ভেঙে টাকা আত্মসাৎ করতে পারে, সে একজন তুচ্ছ বারবণিতার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পারে, কিন্তু এক জায়গায় সে অনেক বড়। প্রেমে তার অসততা নেই, মিথ্যাচার নেই। যুক্তি দিয়ে সে গোলাপীর সঙ্গে সম্পর্কের বিচার করে। মেসে না ঢুকতে দেওয়ায় গোলাপী যখন মেসের বাইরে ফুটপাতে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করে, তা দূর থেকে দেখে কৃষ্ণলাল লুকিয়ে পড়ে। এর পিছনে পলায়নী মনোবৃত্তি নয়, যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তই সত্য:

> 'দশ বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্তিত হইয়াছে— তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে এই বাড়ীটিতে থাকিতে হয়। তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জন, এইখানে তাহার সদ্ব্যয়।'

এমন যে কৃষ্ণলালের বিশ্বাস, নির্ভরতা, তা নিচের তলার কোনো সাধারণ ক্যানভাসারের নয়, তা সর্বকালীন মানবতার দ্যোতক। কৃষ্ণলাল-গোলাপীর সম্পর্ক সর্বকালের মানবিক বোধে বাঁধা। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্প-নামে এই একটি জীবনের বড় মাপ লেখক দেখিয়েছেন। বিশেষ গল্প-নামটি ও গল্পটি সম্পূর্ণ পাঠ করার পরে পাঠকের চিত্তের উপলব্ধি নামের সীমাকে দিগন্ত-ছড়ানো ব্যঞ্জনায় গৌরবময় করে। এমন নামকরণ ও স্বভাবী পাঠক-উপলব্ধির প্রসাবতায় পাঠকদের বিপরীত অভিজ্ঞতা আনে বলেই নামকরণ সম্পূর্ণত শিল্প সার্থক।

৪.

নসুমামা ও আমি

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপলক্ষ্য' নামের গল্প-সংগ্রহের চতুর্থ গল্পটি হল 'নসুমামা ও আমি'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল তেরশো বাহান্ন-র বৈশাখ, ইংরেজি ষোলই এপ্রিল, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। এই প্রকাশ সময় দেখেই বোঝা যায় 'নসুমামা ও আমি' গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-শেষের আগেই রচিত। গল্পটি অবশ্যই এক বালিকার সেই আট বছর বয়স থেকেই ক্রমশ একটি বিচিত্র স্বভাবী ছোটবেলার পুরুষ সাথীকে ভালো-লাগা, যৌবনে আত্মস্থ ভালোবাসা ও তার গোপন হৃদয়ের রহস্যময় রিক্ততার জটিল মনস্তত্ত্ব-সম্মত কাহিনী। এককথায়, 'নসুমামা ও আমি' প্রেমের গল্প, কিন্তু এর মধ্যে দুই নর-নারীর বিবাহ-বাসনা নেই, তার আয়োজন নেই, সম্পর্কে কোনো সাংসারিক বন্ধন নেই, কোনো সূক্ষ্ম যৌনতাও নেই (অবশ্যই বিভূতিভূষণ এরকম কোনো বিষয়কে কোনো প্রেম বিবাহ বা অনৈতিক সম্পর্কের নর-নারী চিত্রে কোনোভাবেই ভাবেননি), আছে এক নিরাসক্তচিত্ত, উদাসীন হৃদয়ের নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক-ভাবনা। তা যেমন জটিল, তেমনি রহস্যে-বিস্ময়ে দূরান্বয়ী চিন্তায় পাঠকদের নিবিষ্ট রাখে। যেহেতু গল্পটি একটি নারীর দৃষ্টিতে এক পুরুষ ও তার জীবন ও চরিত্র-বিবর্তনকে দেখা, এবং সেই দেখার মধ্য দিয়েই নিজের অস্তিত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও জীবন-উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা, তাই মনের জটিল স্বভাবকেই বিভূতিভূষণ এই গল্পের প্রধান সূত্র করেছেন। আমরা জানি, সত্যিকারের 'বাস্তব' বলতে মানুষের মনই, বাইরের যাবতীয় অস্তিত্ব নিছক নিরেট 'বস্তু' মাত্র। 'নসুমামা ও আমি' গল্পে প্রেম আছে, প্রেমের অনন্বয়ের বেদনা আছে, অদ্ভুত উদাসীনতা আছে, আছে গভীর গাঢ় এক অ-লৌকিক নিরাসক্তি, কিন্তু এসবের উপলব্ধি গল্পের উত্তমপুরুষ কথক-নায়িকার মনের জটিল গ্রন্থি-উন্মোচনেই শিল্পমূল্য পায়।

বিভূতিভূষণের অন্য একাধিক গল্পের মতো এ গল্পেও ঘটনা নেই। কাহিনীর সূত্র গল্পের উত্তমপুরুষ কথক-নায়িকার চোখ দিয়ে সাজানো বলেই বড় ঘটনার থেকে নায়িকার মনোলোকের ক্রমিক বিস্তার বিশ্লেষণেই মোটা কাহিনী-রূপ নয়, ছিন্ন সুতোর একাধিক গিঁট দেওয়া স্বভাব আনে। গল্পের উত্তমপুরুষ কথক-নায়িকার পোশাকী নাম 'নির্মলা', গল্পকার আগাগোড়া কথক নায়িকার মুখে ও চিন্তাভাবনায় তার ডাক নাম 'পাঁচী' ব্যবহার করে গেছেন। বিভূতিভূষণের গল্পের নায়ক, বিশেষ করে নায়িকাদের নাম ব্যবহারে একটা সচেতন বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য থেকেই যায়। তিনি নায়ক-নায়িকাদের নামের কোনো 'এ্যারিস্টোক্র্যাসি' বা 'সফিস্টিকেশান্'-এর ধার ধারেন না। একাধিক ক্ষেত্রের পোশাকি নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেও তার ডাকনাম, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, অবহেলার অন্তরঙ্গ ঘরোয়া নামই ব্যবহার করে গেছেন। ক্ষেন্তি, পাঁচী, ভণ্ডুলমামা, কাতু, হাজু, পাঁচুমামা, পাঁচুদাসী— এমন সব নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় প্রমাণ হিসেবে। আসলে, বিভূতিভূষণ সচেতনভাবেই চরিত্রগুলি যে জীবনে ও সাহিত্যে এতাবৎকাল তথাকথিত পাঙ্‌ক্তেয় নয়,

একবারেই তুচ্ছ, উপেক্ষার— এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, এই উপেক্ষার মানুষগুলিকে দিয়েই গল্পকার বলিষ্ঠ জীবনের, বড় মানবতার বিস্ময়কর উপলব্ধির কথা বলেছেন। এটা, গল্পকারের একেবারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তারা গ্রামের মানুষ, সভ্যতার তথাকথিত পরিচ্ছন্ন, মার্জিত পরিবেশ থেকে দূরের মানুষ, গল্পকার এভাবেই তাদের শহর থেকে দূরত্বে গ্রামে-গঞ্জেই স্থিত রেখেছেন।

এইরকম স্তরের চরিত্র 'নসুমামা ও আমি' গল্পের নসু ও পাঁচী। আট বছর বয়সেই গল্পের উত্তমপুরুষ কথক-নায়িকা পাঁচীর বিয়ের সম্বন্ধ করে তার লালন-পালন কর্ত্রী দিদিমা, তার সইয়ের ছেলে অতুলের সঙ্গে। মাত্র আট বছর বয়সে বিবাহের তাৎপর্য বোঝা পাঁচীর পক্ষে সম্ভব নয়, তবু পাঁচী সোজাসুজি দিদিমাকে জানায়, সে অতুলকে নয়, নসুকে বিয়ে করবে। এমন বিচারবোধহীন, নির্মল, সহজ-সরল খেলাধুলোর বয়সে পাঁচী অতুলের থেকে মুখুজ্যে-বাড়ির নসুর তফাতটা বুঝেছিল নিজের মতো করে। লেখাপড়ায় খুবই ভালো, ষোল-সতেরো বছরের অতুলের কথাবার্তা পছন্দ হত না পাঁচীর, তার বয়সও নসুর থেকে বেশি। তাছাড়া তখন থেকেই নসু সুন্দর ফর্সা চেহারার, সুন্দর মুখের কিশোর। পাঁচীর থেকে সামান্য একটু বড়। তার কথায় বলায় পাঁচী মুগ্ধ। এমন নসুর সঙ্গে নিজেই নানা অজুহাত তৈরি করে খেলতে চাইত পাঁচী সেই বালিকা বয়সেই।

ক্রমশ শৈশব ও বাল্যকাল সরে গিয়ে পাঁচীর তেরো বছর বয়স হলে, আড়ংঘাটার কাছে শিকারপুর গ্রামে পাঁচীর বিয়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে নসু অনেকগুলি ভাইদের মধ্যে সংসারের সদা-উপেক্ষিত অবহেলিত। চিররুগ্‌ণ মায়ের জন্য সে নিজেই রান্না করে, মায়ের সংসার সামলায়। নসুকে পাঁচী নিজের বিয়ের আগে অন্যত্র বিয়ে হওয়ার কথা জানালে সে কোনো আগ্রহই দেখায় না। পাঁচীর বিয়ের নিমন্ত্রণে এসেও বিয়ের রাতে পাঁচীর সঙ্গে দেখাও করে না। পাঁচীর শ্বশুরবাড়ি ভালো লাগেনি, তবু মানিয়ে নেয় পাঁচী। স্বামী তার কাকার খাবারের দোকানে বিনা মাহিনায় কাজ করে। এমন কাজের জন্য পাঁচীর গ্রামে তার তাড়ু-ঘোঁটা স্বামী জামাই হওয়ায় অন্যদের মতো সমান মর্যাদা পায় না। তাতে পাঁচীর দুঃখ কম নয়। স্বামীর প্রতি তার মায়াও ছিল। এই পাঁচীর একটি সন্তান হয়ে মারা যায়। পরে স্বামীর মৃত্যু ঘটে আকস্মিকভাবে। এসব বিয়ের পরের তিন-চার বছরের ঘটনা।

এরই মধ্যে পাঁচী যতবাব গ্রামে এসেছে, নসুমামার সঙ্গে দেখা করে। নসুমামার মেয়েদের মতো কাজকর্ম ভালো লাগত না পাঁচীর। দাদারা পয়সা দেয় না বলে নসুমামাব লেখাপড়া হল না। তাতে পাঁচী কষ্ট পেতো বিয়ের আগেই। ইতিমধ্যে নসু ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছে বেশি। রোজ শিবপুজো করে। নিজের নতুন সংসারে আবদ্ধ পাঁচী নিজের গ্রামে এলেই প্রতিবার নসুমামার সঙ্গে দেখা করে। স্বামীর মৃত্যুর পর গ্রামে এসে শোনে, নসুমামার যাবতীয় পূজা-অর্চনা নিয়ে প্রচারিত পাগলামির কথা। কিন্তু নসুমামার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে পাঁচীর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় নসুমামার ওপর। নসুমামা নাকি এক 'জীবনের আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায়' দিন কাটাচ্ছে। নসুমামা সাধারণ মানুষ নয়, নিজের বিষয়-আশয় সব ভাইদের নিঃস্বার্থ দিয়ে নিরাসক্ত নির্মোহ পুরুষ যেন!

পাঁচী বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতেই থাকে, বৃদ্ধা বিধবা শাশুড়ির সেবা করে, সংসার সামলায়। একদা শাশুড়ির মৃত্যুর পর তাঁর পরিচিত প্রতিবেশী সান্যাল জ্যাঠার বাড়ি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ শুনতে যায়। পাঁচীর সংসারে নিরাসক্তি ক্রমশ বেড়েই চলে। এসবের আগে শাশুড়ির বেঁচে থাকার সময়েই শোনে পাঁচী, নসুমামা ওর শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এক কলুর বাড়ি চাকরী করে—জল তোলে, গরুর জাব কাটে। পাঁচী দেখা করে নসুমামার সঙ্গে। তখন সারা শরীরে জড়ানো নসুমামার সম্পূর্ণ মেয়েলি পোশাক—মাথায় বড় চুল, শাড়িপরা, আধ-ঘোমটা দেওয়া, হাতে কাঁচের চুড়ি, অথচ মুখে ঈষৎ গোঁফ-দাড়ি, কণ্ঠে মেয়েলি সুর। কৌতুককর হলেও পাঁচী নসুমামার এই কাজকে নিরাসক্তভাবে মেনে নেয়। নসুমামার সঙ্গে একদিন সান্যাল জ্যাঠারও পরিচয় হয়, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠের আয়োজনে সে-ও পরে সদস্য হয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন শোনে পাঁচী, কলুবাড়ির বাকি দু'মাসের মাইনে না নিয়েই নসুর সেই গ্রাম ত্যাগের কথা! কলেরায় গ্রাম যখন উজাড় হতে বসেছে, নসু তাদের মধ্যে সেবায় ক্লান্তিহীন ছিল। তার মধ্যেই পাঁচী সান্যাল জ্যাঠাকে বলে নসুমামাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল, সান্যাল জ্যাঠা যুক্তি দিয়ে সামলায়। কিন্তু নসুমামার ওদের গ্রাম থেকে আকস্মিক অন্তর্ধানে পাঁচীর এক খুড়শাশুড়ি নসুমামার সঙ্গে পাঁচীর সম্পর্কের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অর্থে কোনো ইঙ্গিতের শ্লেষ-কণ্ঠ শোনালে পাঁচী তা মেনে নিয়ে প্রতিবাদে দীপ্ত হয়ে ওঠে। তা ঘটে ওই একবারই। গল্পের শেষ—পাঁচীর কঠিন চাপা মনের শক্তিতে নিঃস্ব অবস্থায় প্রতিদিন বিকেলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ-কথা শোনার আয়োজনে! সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, রিক্তচিত্ত পাঁচীর মনোবাসনাতেই উত্তমপুরুষ কথক-নায়িকার ব্যঞ্জনাময় সিদ্ধান্ত।

'নসুমামা ও আমি' গল্পের কাহিনী-বস্তু একেবারেই সাদামাটা, ঘটনাবিহীন। পাঁচীর অন্যত্র বিবাহ-আয়োজন, আগে পুত্র ও পরে স্বামীর মৃত্যু ঘটনা কোনো বড় মাপে ও তাৎপর্যে গল্পে স্থান পায়নি। জীবনধারণের অতি স্বাভাবিক নিয়মেই সেসব গল্পের মধ্যে যুক্ত রয়েছে। গল্পের শুরু পাঁচীর খেলাধূলা করার সহজ সরল বালিকা বয়স দিয়ে, গল্পের শেষ এক যুবতী বিধবার সমস্তরকম বিষয়-আশয়ের প্রতি গৈরিক আসক্তিহীনতার চিত্র-স্বভাবে। সুতরাং গল্পটির কাহিনী-বিন্যাস সাধারণ গল্পের মতো নয় নিশ্চয়ই, আর তা হবেও না। কারণ আরও আছে। গোটা গল্পটি বলেছে একটি নারী— যার বিবৃতি শৈশব থেকে তার যুবতী বয়সের চিন্তা ও স্মৃতি-ক্রমে ধরা। উত্তমপুরুষ কথকের কথায় গল্পটির কাহিনী ও ঘটনা সাজানো বলেই এর প্লট-বৃত্ত ভিন্ন শিল্প-স্বভাবী। আত্মকথনরীতি গল্পের অবয়বে থাকায় কাহিনী ও ঘটনার উপস্থাপনা ও বিন্যাসে কিছু সীমা থেকেই যায়!

এই গল্পে যেটুকু কাহিনী-আভাস আছে, ঘটনার যোগ আছে— সে সমস্তই অনেকটা নিরাসক্ত বাউলের স্বভাবে, পথ চলার একটানা স্বভাবে পথিক-দৃষ্টি নসু ও পাঁচীর হাত ধরেই। অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা—দুই চরিত্র ধরেই গল্পের কাহিনী ও ঘটনার পরিমিত উপস্থাপনা। তা মানলে গল্পের 'মহামুহূর্ত' নির্দিষ্ট করায় দ্বিধা ও বৈচিত্র্য আসে। দ্বিধার একটি দিক—পাঁচীর মানস-বিবর্তনকে মুখ্য হিসেবে ধরলে। সমগ্র গল্পে কোথাও পরিণত

বয়সে পাঁচী নসুমামার প্রতি তার গোপন আকর্ষণের দিক প্রকাশ্যে বলেনি, বুঝতে দেয়নি—যদিও ছোটবেলায় খেলার ছলে নসুমামার প্রতি তার আকর্ষণ স্পষ্টত এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে। যৌবন বয়সে বিধবা হবার পরেও নসুমামার সঙ্গে সংযম-সিদ্ধ সাক্ষাতের একাধিক 'সিচুয়েশন' আছে। এরই মধ্যে যখন সে গল্পের শেষে খুড়শাশুড়ির শ্লেষ-তির্যক মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদী হয়, তখন 'মহামুহূর্তে'র প্রচ্ছন্ন একটি দিক অনুভূত হয় যেন:

'খুড়শাশুড়ি .... মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বৌমার বাপের বাড়ির লোক। খুব কষ্ট হয়েছে বৌমা তোমার— না? যখন-তখন দেখা হোত তো! অন্য গাঁ থাকতে এ গাঁয়ে এসেছিল সে জন্যেই তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি— নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।'

এমন প্রতিবাদের ভাষায় কোথাও বুঝি গভীর-প্রচ্ছন্ন থাকে পাঁচীর নসুর প্রতি প্রচণ্ড প্রীতি-স্নিগ্ধ মনের কথা। কাহিনীর তুচ্ছ স্পর্শ-দেওয়া পাঁচীর এমন সক্রিয়তায় 'মহামুহূর্ত' ক্ষণটি চিহ্নিত হতে পারে।

আবার, পাঁচীরই আত্মকথনে নির্মিত যেহেতু গল্পটি, তাই সমগ্র গল্পের 'মহামুহূর্ত' ধরা পড়ে গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদটিতে—যেখানে গল্প শেষ, গল্পের সিদ্ধান্ত ও ব্যঞ্জনা এবং পাঁচীরও মনোলোকের অভাবনীয় উদ্ভাস (epiphamy) :

'আবার ফাল্গুনে বনে বনে ফুল ফুটেচে, আবার কোকিলের ডাক পথে পথে। মুচুকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রানা ভুরভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশায়ের বৈঠকখানায় যোগবাশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়েই বোধ হয় সেখানে পৌঁছুতে হয়।'

এমন যে যৌবনদীপ্ত বসন্ত প্রকৃতি ও সর্ব-রিক্ত মানবমনের বৈপরীত্য ও বিষণ্ণ নিঃস্বতা—এর মধ্য দিয়েই সমগ্র গল্পের মহামুহূর্তের ক্রান্তিরেখা ব্যঞ্জনা পায় স্বভাবী পাঠকের মনোলোকে।

আবার, যদি নসুমামার চরিত্র ধরা যায়, তার রহস্যময় ব্যক্তিত্বটিও গল্পে আর একটি 'মহামুহূর্তে'র স্থান নির্দিষ্ট করে। গোটা গল্পে নসু একবারও পাঁচীর কাছে তার মনের সামান্যতম অংশও প্রকাশ করেনি। সে প্রসঙ্গে আমরা আমাদের পরবর্তী চরিত্র আলোচনার অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত 'মহামুহূর্ত' নির্বাচন বিষয়ে বলি, গল্পের শেষে পাঁচীর শ্বশুরবাড়ির গ্রাম থেকে কলুর বাড়ি চাকরি ছেড়ে হঠাৎ পলায়নের বেশ কয়েকদিন আগে পাঁচীর সঙ্গে নসুর সংলাপ-বিনিময়-চিত্রটি এমন :

'বল্লাম—হরি কলুর বাড়ি গোয়াল-পরিষ্কার আমি করে দেবো।

—না পাঁচী, লক্ষ্মীটি, লোকে কি বলবে?

—আমি গ্রাহ্য করি নে।

—আমি করি।

—মিথ্যে কথা, তুমি কিছু গ্রাহ্য কর না, কলুবাড়ী বাসন মাজচো অথচ—

—পাঁচী, এ সব তুই বুঝবিনে। ওসব করিসনে কক্ষনো।'

এই চিত্রে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে নসুর দিক থেকে অতি-প্রচ্ছন্ন এক হৃদয়-সম্পর্কের ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে। পাঁচী নসুর সঙ্গে কলুদের বাড়ি চাকরানির কাজ করলে লোকে কি বলবে এবং কি ভাববে, পাঁচীর বোঝার ক্ষমতা নেই নসুর মতে— এই প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক-চিত্রে নসু চরিত্র ধরে আর এক 'মহামুহূর্ত'-ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়।

আমাদের মতে, দুই চরিত্র পৃথকভাবে ধরলে গল্পের 'চরমক্ষণ' দু'টি জায়গায় থেকেই যায়, এবং তা সমগ্র গল্পে 'মহামুহূর্ত' হয় না। কিন্তু গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু— যা উত্তমপুরুষ কথক নায়িকার বর্ণনায় ধরা গল্পে স্থির-নির্দিষ্ট, তার দিকে লক্ষ রাখলে গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদটিতেই গল্পের 'মহামুহূর্ত' ও পরিণামী অনন্তস্বভাবী ব্যঞ্জনা এক হতে দেখা যায়। গল্পের 'মহামুহূর্ত' গল্পের শেষেই প্রধানত চিহ্নিত। গল্পটির মধ্যে অবশ্যই সমন্বিত থেকেছে লেখকের শিল্পী-মানসিকতার অন্তর্গূঢ় স্বভাব—যাকে তাঁর জীবনদর্শন সংলগ্ন attitude to life বলতে আমরা নির্দ্বিধ। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ইত্যাদি উপন্যাস এবং একাধিক গল্পও ধরলে বোঝা যায়, 'বিভূতিভূষণ স্ব-স্বভাবে কোথাও বুঝি 'বোহেমিয়ান', তা জগৎকে, বাস্তব সংসারকে সবদিক থেকে মেনে নিয়েই। তেরশো সাতান্নর অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে শিবদাস চক্রবর্তী তাঁর 'অপুর দেশে একদিন' রচনায় পরলোক-প্রত্যয়ী বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগতভাবে বলা একটি সমর্থনসূচক সংলাপ উল্লেখ করেন :

> 'জীবনমৃত্যুর রহস্য নিয়ে যত বেশী ভাববে, ততই দেখবে মন বিশ্বাসের দিকে যাবে। চৈতন্যের অনন্ত প্রবাহে জীবন এক একটা বুদ্বুদ-মাত্র। আর দেখ পরলোকে বিশ্বাস জীবনকে একটা উদার উপলব্ধির মাঝে টেনে নিয়ে যায়।'

জীবনকে এইভাবে দেখতে, ভাবতে অভ্যস্ত বিভূতিভূষণ। 'নসুমামা ও আমি' গল্পে এই অন্তর-নিহিত জীবন-বীক্ষণের পরিচয় পাই পাঁচীর আপন বিশ্বাসে ও ভাবনার উত্তরণে, পাই নসুমামার চরিত্রগত জীবনচর্যায়। তাই নসুমামার 'আমার আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায় আছি' সংলাপে, পাঁচীর সর্বশেষ হীরকখণ্ডের মতো মূল্যবান আত্মদর্শন তথা জীবনদর্শন-উক্তিতে— 'সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়েই বোধ হয় সেখানে পৌঁছতে হয়।'—প্রমাণিত হয়ে যায় বিভূতিভূষণ কথিত 'পরলোকে বিশ্বাস জীবনকে একটি উদার উপলব্ধির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়'— এই জীবনাতীত জীবনভাষ্যের গূঢ়তম দিক। 'নসুমামা ও আমি' গল্পটি বস্তুত বিভূতিভূষণের জীবনদর্শনেরই এক উজ্জ্বল-বিন্দু বিম্বন।

দুই

'নসুমামা ও আমি' গল্পটি নিশ্চয়ই এক অ-লৌকিক প্রেম-ভাবনার রচনা, কিন্তু তার আধার হল প্রধান দুটি চরিত্র— নসুমামা ও পাঁচী। নসুমামা চরিত্রটি অসামান্য সংযম ও দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন বিভূতিভূষণ। তার ছোটবেলা থেকেই যে নিরাসক্তি, যে একটি

নরম মানবিক মনের স্বরূপ আমাদের সামনে আসে, তা অকৃত্রিম। নায়িকার বালিকা বয়সের অভিজ্ঞতায়—নসুমামার 'কি সুন্দর ফর্সা চেহারা, ননী-ননী গড়ন, ডাগর চোখ দুটি, বেশ হাসি-হাসি মুখখানি।... হাসলে তার মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরতো—... এমন সুন্দর মুখ আমার আট বছরের জীবনে এ অজ পাড়াগাঁয়ে ক'টাই বা দেখেছি!..... সে যা বলতো তা যেন মধুর, অতি মধুর!' এসব হল নায়িকার বালিকা বয়সের গভীর ভালোলাগার অকৃত্রিম নিষ্পাপ অভিব্যক্তি।

কিন্তু নসুর স্বভাব নায়িকাকে ক্রমশ আরও গভীরে টানে। নায়িকার কথাতেই, ওই বিশ্লেষণেই নসুর রহস্য স্বভাব ধরা পড়ে। পাঁচী বলেছে:

> 'নসুকে পাকা বকুল খাওয়াতে ইচ্ছে করে।.... নসুকে খেতে দিয়ে যেন আমার তৃপ্তি, সে সুযোগ ও আমায় দিত কই।'

এই হল নসুর স্বভাবসিদ্ধ নিরাসক্তচিত্ততা। পাঁচীর বিয়ে হবে—এ কথা শুনে 'নসুমামা একটা কথাও জিজ্ঞেস করলে না সে সম্বন্ধে।' পাঁচীর বিয়ের রাতে নিমন্ত্রণ খেয়েছে। 'কিন্তু না এল একবার বিয়ে দেখতে। না একবার বাসরঘরে উঁকি মেরে দেখলে।' এমন জাগতিক কৌতূহলহীন নির্মোহ স্বভাব নসুর ছোটবেলা থেকেই। নিজের ভাইদের জন্য, মায়ের জন্য নসুর সেবা ও আত্মত্যাগ, সমস্ত নিজের ভাগের সম্পত্তি নির্দ্বিধায় স্বার্থশূন্যভাবে দান করে বিষয়-আশয়ে আসক্তিশূন্য হওয়ার মধ্যেও তার সেই এক পরিচয়।

নসুর বিবর্তন ভোগে নয়, ত্যাগের মহিমায় বিশিষ্ট। সে বড় হয়ে মেয়েদের মতো শিবপুজো করে, মেয়েদের মতো পোশাক-আশাক, কাঁচের চুড়ি পরে। তার কণ্ঠে মেয়েলি সুর। বাইরে সে নপুংসকের মতো, ভিতরে পৃথিবীর স্থূল বাস্তব প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করার গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী, আসক্তিহীন, জীবনকে নির্মোহ স্বভাবে পরিশীলিত করে অসীমের অনুসন্ধিৎসু। জীবনের 'আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায়' তার বেঁচে-থাকা। তা পেতে জাতপাতের ঊর্ধ্বে বড় মানবধর্মে সে ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও কলুবাড়ি চাকরের কাজ নেয়, কলেরায় অসাধারণ শুভ্র নির্মল উদার মানবিকতায় সেবা করে চলে। একসময়ে অদ্ভুতভাবে সে সব ছেড়ে কোথায় হারিয়ে ফেলে নিজেকে! পাঁচীর সঙ্গে সম্পর্ক তার কী, সে বুঝতে দেয় না। কিন্তু সে পাঁচীর শ্বশুরবাড়ির গ্রামে, কাছেই কলুর বাড়িতে কাজ নেয়। প্রশ্ন ওঠে, এমন জায়গায় কাজ নেওয়ার মধ্যে কি কোনো অন্য গোপনতম অতি-প্রচ্ছন্ন আত্মতৃপ্তির দিক আছে? পাঁচীর কাছাকাছি থাকা? তা-ও চরম নিরাসক্তি ও গোপন অবচেতন মনের আকর্ষণে? পাঁচী তার হয়ে কলুর বাড়ি গোয়ালের কাজগুলি করবে এমন অন্তরঙ্গ বাসনা প্রকাশ করলে সে লোকের বলা ও নিন্দার ভয় পায় কিসে?

এই প্রশ্নেই, নসু বোধ হয় ধরা পড়ে যায় আমাদের কাছে,—পাঁচীর প্রতি তার এক দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণের দিক থেকে। এ এক অ-লৌকিক সম্পর্ক— যা বুঝিবা পাঁচীও বোঝেনি! বা বোঝে, কিন্তু সেই বোধগম্যতা নসুর জগতের অতীত কোনো অস্তিত্বের নিরলস সন্ধানের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো! নসু লেখকের নিজস্ব দর্শনে গড়া। তাকে দিয়ে জগৎ-

সংসারের অতীত এক লোকের অনুসন্ধান করেছেন গল্পকার। তা না হলে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠের আসরে, গল্পের শেষে বিভূতিভূষণ নসুকে কেন নিয়ে এসে বসাবেন? নসুর হঠাৎ গ্রাম থেকে অন্তর্হিত হওয়া তার চরিত্র-স্বভাবের একান্ত অনুগ দিক। তার নিজস্ব মা-ভাইদের সংকীর্ণ সংসার থেকে ঈশ্বরবিশ্বাসে ক্রমশ নিমজ্জিত হওয়া, কলুদের বাড়িতে চাকরি নিয়ে সেই অসামান্য মানবসেবায় ব্রাত্য হওয়া, শেষে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রচ্ছন্ন প্রভাবেই বুঝিবা সুদূরে চলে যাওয়া—সব একে একে তার চরিত্রের অসামান্যতার দিক তুলে ধরে। তার প্রেম, সংসার-প্রেম. জাগতিক মানবপ্রেম থেকে এক অ-লৌকিক জীবনপ্রেমে ধন্য হয়েছে। পাঁচীব প্রতি তার আত্মগোপনে পরোক্ষ কোনো অবচেতন মনের দায়বদ্ধতা অবশ্যই অ-শরীরী। সে পাঁচীকে তারই জীবন পথে গভীর আকর্ষণের শিখাটুকু পরোক্ষে দীপ্যমান করে নিজের জগতাতীত সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

পরিণত বয়সে ও মনে পাঁচীর সঙ্গে নসুর এক জায়গায় যোগ ঘটেছে সান্যাল জ্যাঠার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠের আসরে। তার আগে পর্যন্ত পাঁচী নসুকে কাছে পায়নি। পাঁচীর চরিত্র ছোটবেলা থেকে এক বিচিত্র স্বভাবে ছন্নছাড়া। সে ছোটবেলা থেকে নসুর যে কোনো তৃপ্তির মধ্যে নিজের তৃপ্তি খোঁজে, পেতে আর্ত, কিন্তু নসু সে সুযোগ দেয় না। আর এখানেই নসুর প্রতি পাঁচীর চিরকালের আকর্ষণ অন্তর্গূঢ় থেকে যায়। পাঁচীর নিজের বিয়ের কথা নসুমামাকে জানালে তা শোনার অনাগ্রহ নিশ্চিত তারই স্বভাবসম্মত, কিন্তু তাতে পাঁচীর প্রতিক্রিয়া নদীর চোরা ঢেউয়ের মতো মনের গভীরে একই সঙ্গে বেগের আবেগ ও সন্নিহিত শূন্যতা তৈবি করে :

১. 'আমার বিয়ের কথা বল্লাম। নসুমামা বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করলে না। ও যদি একটুও আগ্রহ প্রকাশ করতো, শুনতো কোথায় আমার বিয়ে হচ্চে ইত্যাদি, তা হোলে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু নাঃ, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। নসুমামা একটা কথাও জিজ্ঞেস করলে না সে সম্বন্ধে।'

২. 'আমার বিয়ের রাতে নসু নেমন্তন্ন খেয়ে এল পেট পুরে, কিন্তু না এল একবার বিয়ে দেখতে, না একবার বাসর ঘরে উঁকি মেরে দেখলে। আমার মনটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ও যদি আসতো তবে খুব ভালো লাগতো। মনের মধ্যে ডুব দেবার বয়স আমাব নয় তখন, তবুও কি যেন একটা হয়ে গেল, এত বাজনা, এত খাবার দাবার, এত লোকজনের যাতায়াত, আমার নতুন কাপড় গয়না— কিছুই ভালো লাগলো না। মনে উৎসাহ নেই।'

এই হল পাঁচীর বয়ঃসন্ধিব মনের প্রেম-বিলাস, কিন্তু তার পাশাপাশি এক গভীরতম অনাসক্তির গেরুয়া রঙের নির্ভুল মিশেল! নায়িকা পাঁচীর মনের জগৎটিকে গল্পকার আসামান্য মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক—যৌথ তাৎপর্যে আমাদেব সামনে এনেছেন।

পাঁচীর পা কিন্তু কঠোর বাস্তবেব মাটিতেই! সে নসুকে ভালোবাসে, জীবনকেও ভালোবাসে। নসুকে ভালোবাসায় আছে 'প্লেটনিক' এক স্বভাব, জীবনকে ভালোবাসায় আছে বাস্তবকে মেনে নিয়ে এক নিরাসক্তি দিয়ে সফল বিচারণা। সে স্বামীকে অপছন্দ

করে না। তার সন্তানও হয় এবং মারা যায়। স্বামীর দিক থেকে তার প্রতি ভালোবাসা কম নেই। সে স্বামীব জন্য, তার প্রতি তার গ্রামের লোকদের অসৌজন্যকর ব্যবহারের জন্য দুঃখ পায়। স্বামীর মৃত্যুতে পাঁচী নিরাসক্ত। সে অদৃষ্টবাদী। তার কথায় 'মানুষটার ওপর মায়া জন্মেছিল বটে, তাকে আর দেখতে পাবো না। এইটুকু যা কষ্ট।' অর্থাৎ এই মানসিকতাতেই পাঁচীর মধ্যে নসুর প্রতি প্রেম থাকলেও তা ছিল উদাসীনতায়, কিছু চাওয়া-পাওয়ার অতীত এক বোধে ভিন্নস্বাদী, তা অ-লৌকিক, পার্থিব দায়-দায়িত্বহীন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠের আসর বিধবা পাঁচীর জীবনের বড় মোড় ফেরানোর জায়গা। সেখানে নিয়মিত যাওয়ার মধ্যে, পাঁচীর নিজের কথায় :

> কেমন যেন মন বদলে যাচ্চে, যে মন আমার কোনো কালেই ছিল না—তা আরও নিরাসক্ত হয়ে পড়েচে।'

আসলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণই হয় পাঁচীর মনের কষ্টিপাথর। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক বোঝায়। দেবর্ষি বশিষ্ঠ রামায়ণের রামকে শোনায় বেদান্ত তত্ত্বের কথা, আত্মার চিরশান্তির স্বরূপ। সে বিষয়ে প্রচুর উপদেশ আছে এই রামায়ণে। এই রামায়ণের যে ছ'টি প্রকরণ—বৈরাগ্যের স্বরূপ ও সিদ্ধি, মুক্তি পিপাসুর আচার-আচরণ, জীবনের উৎপত্তি ও স্থিতি, জীবনের উপসর্গ ও নির্বাণ লাভ— এই সমস্তই পাঁচীর আর বৈধব্যের জীবনে উপলব্ধি করে কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবে পাঁচীর চরিত্র বদলের এক ক্রান্তিস্থল মনোজগতে তৈরি হতে থাকে। এর সঙ্গে সান্যাল জ্যাঠার পাঠের আসরে আসে নসুও।

দুই নায়ক-নায়িকার স্বভাবের এখানেই এক অ-দৃশ্য যোগ ঘটে যায়। পাঁচী তার মনোলোকের অভিজ্ঞতা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছে :

> 'বাতাবী লেবু ফুটলো ফাগুন মাসে—পথে পথে অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে। ঘেঁটু ফুলে বাঁশবনের তলা ভর্তি হয়ে গেল। কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে ওঠে, কত কথা ভাবি,....... আমার মন বলে কি এক জিনিসের ঠিকানা মিলেছে—যার দরুন অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার আজ আমার কাছে খোলা। অন্য সব কিছু যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে।'

এমন ক্রমিক উপলব্ধির মধ্যেই একদিন নসুর সঙ্গে দেখা হয় পাঁচীর। নসু আসে রামায়ণপাঠের আসরে, সান্যাল জ্যাঠার কাছে সে হয় 'শুদ্ধসত্ত্ব'। তার পরের চিত্র নসুর গ্রাম-ত্যাগ ও খুড়শাশুড়ির ঠেস-দেওয়া কথার প্রতিবাদে পাঁচীর বিদ্রোহের মতো নসুর সঙ্গে তার সম্পর্কের অন্তর্নিহিত কষ্টের কথাকে স্বীকার! নসুর সঙ্গে এইভাবে এক মানস-সম্মিলনে পাঁচীর ঘটে এক ভাবসম্মিলনে অসীম উত্তরণ। নসুর যে বাস্তব জীবন-বিবিক্ত এক অসীমের প্রতি আর্তি, পাঁচীরও তাতেই মিলন ঘটে যায় উপলব্ধির দিক থেকে। বিভূতিভূষণের নায়ক-নায়িকা গল্পকারের দর্শনের অনুগ থেকে এক ঊর্ধ্বায়িত, বৈদেহী জগতে প্রেমের শান্তি লাভ করে। তাই গল্পের দার্শনিক সত্য ও প্রেমের সত্য একটি বাক্যেই নায়িকার স্বভাবসিদ্ধ থেকে ধরা পড়ে :

'সম্পূর্ণ নিঃস্ব রিক্ত হয়েই বোধ হয় সেখানে পৌঁছুতে হয়।'
এখানে পাঁচী-চিহ্নিত 'সেখানে' বলতে নসুর স্বেচ্ছা-নির্বাসনের জগতে, নসুর সঙ্গে তার সংসার সম্পর্কহীন নির্মোহ, নিরাসক্ত আলোকময় প্রেমের জগতে। এ প্রেম কোনো বিশেষ ঈশ্বরে বাঁধা নয়, তা কায়াহীন ঈথারের মতো স্বচ্ছ, অ-দৃশ্য অথচ কাম্য। নায়িকার এই প্রাপ্তি ও উপলব্ধি তার চরিত্রের লক্ষ্য। গল্পেরও।

'নসুমামা ও আমি' গল্পের বক্তব্যে আর একটি দিক প্রসঙ্গত থেকে যায়। সম্ভবত বিভূতিভূষণ এক নপুংসকের জগৎ-সম্পর্কহীন বাঁচার প্রশ্নকেই যাচাই করতে চেয়েছেন অলৌকিকের, ঈশ্বরের, মানবপ্রেমের উপলব্ধি দিয়ে। নসুর দিক থেকে জগৎকে উপেক্ষা করা, তার নিরাসক্তি তা স্বাভাবিক তার শারীরিক সীমার মধ্যে। শরীর থেকে মন, প্রাণ, আত্মায় ডুব দিতে দিতে মানুষ শবীর ভুলে যায়, কখন যেন আত্মার অধিগত হয়ে যায় মূল্যবান জীবন! সেখানেই বড় মুক্তি, সত্য মুক্তি, সত্য লাভ। নসুর তা-ই ঘটেছে স্বাভাবিকতায়। পাঁচী জাগতিক সম্পর্কের সমস্ত সুস্থতা নিয়েও জগতের সার কথায় অন্য উপলব্ধির জগতে বিচরণ করে। তার জগৎপ্রেমও অনিকেত অধ্যাত্মলোকে মুক্তি খোঁজে। মানুষের মধ্যে—সর্বস্তরেব মানুষের মধ্যেই— এমন এক পরিণামী নির্বিন্ন সত্তা জন্ম থেকেই সুপ্ত থাকে, যা সত্য, শাশ্বত। পাঁচীর তা-ই বড় হয়েছে প্রাথমিক প্রেম থেকে জীবনের বড় অভিজ্ঞতায়। নসুর সাহচর্যে তারই অন্তিম বিস্ফার। সুতরাং নসু ও পাঁচীর যে প্রেম, তা উপায় মাত্র জীবনযাপনের, তা মোক্ষ নয়। প্রেম যখন মোক্ষ চায়, তখন সে যোগবাশিষ্ঠের শিক্ষাই বড় করে দেখে। বৈরাগ্য জীবন-শেষের সত্য, জীবনের মূলীভূত সত্য। তাকে অস্বীকার করা যায় না। যারা জীবনের মর্মস্থলে বসে জীবনকে দেখতে পারে, তারা এই জগৎ সংসারে নিরাসক্ত, নির্মোহ হতে বাধ্য। জীবনের এমন নির্মোহ স্বভাবই তার নিয়তি। নসু ও পাঁচী এই নিযতির উপযুক্ত উপকরণ, তারা দুজনে প্রেমিক-প্রেমিকা, কিন্তু এক অলৌকিক জগতের যাত্রী। তাদের সন্ধিৎসা আত্মপ্রেম, জীবনপ্রেম থেকে অলৌকিকের মধ্যে নিঃস্বার্থ নিমজ্জন।

তিন

অত্যন্ত কঠিন কথাকে, বিষয়কে অতি সহজ করে বলার বিস্ময়কর যাদুদণ্ড হল বিভূতিভূষণের লেখনী। 'নসুমামা ও আমি' গল্পের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শে তার যথার্থ প্রমাণ মেলে। এই গল্পের ভাষা অবশ্যই সহজ, সরল এবং তাব পরিচ্ছন্ন শিল্পিত বাস্তবতাই তার কবচকুণ্ডল। এই বাস্তবতা কঠিন কথাকে সহজ করে, সহজ ভাষাকে কঠিনের অভিমুখীন করে তোলে। গল্পটি নায়িকার আত্মকথনরীতিতে লেখা। এর ভাষা তাই আরও চরিত্রের অন্তরঙ্গ। একটিমাত্র চরিত্রের মনোলোক দিয়ে গল্পটির সব কিছু দেখা। তাই ভাষার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা শ্লথ-মন্থর গতি আছে, চিন্তা-ক্লান্ত বেগ আছে যা গদ্যবীতির অন্তঃশীল বৈশিষ্ট্য।

যেহেতু খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্রে গল্পের সুতোয় একের পর এক গিঁট দেওয়া, তাই এই

গতিমন্থরতা আদৌ ক্লান্ত করে না পাঠকদের, বরং উন্মুখ করে রাখে পরিণামী ব্যঞ্জনাগর্ভ সিদ্ধান্তের জন্য। পাঁচীর অভিজ্ঞতার দিক থেকে আত্মকথনরীতির তিনটি ভাগ—১. বাল্যকালের খেলার ছলে দেখা দার্শনিক অভিজ্ঞতায় অন্তর্গূঢ় প্রস্তুতির দিক, ২. পাঁচীর তেরো বছর বয়সে বিবাহ হওয়া ও স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য গ্রহণের কথা, ৩. ক্রমশ সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে সর্বরিক্ত, সর্বশূন্য, বিষয়আসক্তিহীন, উদাসীন, নির্মোহ জীবন-প্রাণের অভিমুখী হওয়ার দিক। এই তিনটি দিককে কথক পাঁচী অতি শান্ত সংযতভাবে বর্ণনা করেছে। কোথাও এতটুকু আতিশয্য নেই, অকারণ উচ্ছ্বাস-আবেগ নেই গদ্যের অবয়বে। আগাগোড়া এক গেরুয়া নিরাসক্তি বজায় রেখেছে বলেই এই নিরাসক্তি 'নসুমামা ও আমি' গল্পের গদ্যের বিস্ময়কর আকর্ষণ-স্বভাবী পাঠকদের কাছে।

রীতি যেহেতু আত্মকথনের, অন্যদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনাও তার নিজস্ব, কিন্তু পাঁচীর বলার মধ্যে এমন কিছু বাক্য বিভূতিভূষণ যোগ করেছেন, যা দিয়ে তার চারপাশের মানুষদের বোঝা যায়, বোঝা যায় নসুকেও। পাঁচীকে আমরা যেমন বুঝতে পারি, তেমনি বুঝতে পারি তার ভালোবাসার নসুকে, শ্বশুরবাড়িকে, তার বৈধব্যজীবনের সংসার-আসক্তিহীনতাকে। ফ্ল্যাশব্যাকে মাঝে মাঝে 'নস্ট্যালজিয়া'য় নায়িকার চিন্তাক্রমকে সাজানোয় গল্পকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। প্রত্যেকটি স্মৃতিখণ্ডে মেলে নিছক বিবৃতিমূলকতা ও সংবাদদান থেকে বরং প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতধর্ম— যা চরিত্রকে আলোকময় করে। গল্পের বিষয়বস্তু তুচ্ছ নয়, ক্রমশ এক অসীমের ব্যঞ্জনায় তার অবয়বহীনতা, কিন্তু ভাষা ক্রমশ সেই অবয়বহীনতাকে প্রতীক-প্রতিম গদ্যভাষায় রূপ দেয়।

শাশুড়ি বেঁচে থাকতে থাকতেই সান্যাল জ্যাঠার সঙ্গে পরিচয় হয় পাঁচীর। রামায়ণ পাঠের আসরে তার যাতায়াত নিয়মিত হয়। তারই মধ্যে তার প্রকৃতির ভরা বসন্তের চিত্রে বিপরীত মানসিকতার স্বরূপ অঙ্কনে গল্পকারের চিত্ররচনা ও গদ্যভাষা ভিন্ন মাত্রা পায়:

> 'বাতাবী লেবু ফুটলো ফাগুন মাসে পথে পথে অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে। ঘেঁটুফুলে বাঁশবনের তলা ভর্তি হয়ে গেল। কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে ওঠে, কত কথা ভাবি। বাল্যকালের কথা, মা-বাবার কথা, স্বামীর কথা— জীবনে কিছু না পেয়েই যেন সব কিছু পেয়েচি।'

পাঁচী এখন যথার্থ যুবতী, কিন্তু ভরা বসন্তের দামাল দিনগুলিতে তার সর্বরিক্ততায় যে মনের সাধনা—তার ভাষায় পাঁচীর অন্তর-স্বভাব যথার্থ মূর্তি পায়। প্রকৃতি-চিত্রের সঙ্গে মানবমনের বৈপরীত্য বোঝাতে গল্পকারের ভাষা সংযত মনের ভাষা! গল্পের সর্বশেষ ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকৃতির সেই ফাল্গুন মাসের উথাল-পাথাল যৌবন চিত্র আর পাঁচীর সবকিছু ত্যাগের মন—দু'য়ের মধ্যে পাঠকচিত্ত ব্যঞ্জনায় সুদূর হয়ে যায়। 'পুঁইমাচা' গল্পের সেই প্রকৃতি—যা পুঁইগাছকে ভরা যৌবন-প্রাণে বেগবান করে, কিন্তু তার পিছনে আছে ক্ষেন্তির অসহায় মৃত্যু দিয়ে মানবজীবনকে উপেক্ষা করার ব্যঞ্জনা। 'নসুমামা ও আমি' গল্পের শেষ প্রকৃতিও তেমনি স্ব-স্বভাবে ঠিক, কিন্তু মানব স্বভাবে তা বর্জিত হয়। ক্ষেন্তির

কাছে প্রকৃতির বেগে পুঁইগাছ জিতে যায়, পাঁচীর কাছে, মানুষের জীবনের বেগের কাছে ফাল্গুনের প্রকৃতির নবজীবনের বেগ যায় হেরে। দুই গল্পের শেষে যেন গল্পকারের দুই ধরনের পরীক্ষা। বোধ হয় প্রকৃতির নিয়মই এই— কখনো প্রকৃতি জেতে, মানুষ হারে, কখনো বা এই নিয়মের বিপরীত! গল্পের ভাষা শুধু নয়, চিত্রের ব্যঞ্জনায় চিত্রকল্পের স্বভাবে তার সার্থকতা 'নসুমামা ও আমি' গল্পের অভিনবত্ব। বিখ্যাত এক বিদেশি সমালোচক কবিতার চিত্রকল্পের স্বরূপ বোঝাতে যে কথা বলেছেন—চিত্রকল্প হল কবির পক্ষে—'to express his own experience for himself'— এখানেও কবি বিভূতিভূষণের প্রকাশরীতিতে তারই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা।

চার

'নসুমামা ও আমি' গল্পটির নামে স্পষ্টত চরিত্রনির্ভরতা যে সত্য, তা বোঝা যায়। নায়ক যদি নসুমামা হয়, কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়িকা যদি গল্পের 'আমি' অর্থাৎ 'পাঁচী' ওরফেই 'নির্মলা' হয়, তা হলে গল্পের নাম দু'টি চরিত্রের দিকেই পাঠকদের নিবিষ্ট করে। যেহেতু গল্পটি নসু ও পাঁচীর এক রহস্যময় সম্পর্কের কথারূপ, তাই, নাম সাধারণ অর্থে স্বাভাবিক, সার্থক। গল্পটির কথাবস্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগে নামের শিল্প-ব্যাখ্যা স্বীকৃত।

'নসু'-কে 'মামা' সম্বোধন কোনো প্রত্যক্ষ আত্মীয়তার সেই সম্পর্ক নেই পাঁচীর দিক থেকে। আসলে আমরা যেমন সাধারণভাবে 'দাদা', 'ভাই', 'কাকা' ইত্যাদি সম্পর্ক পাতিয়ে অনাত্মীয়দের কাছের করি, নসুকে পাঁচীর 'মামা' সম্বোধন সেই দিক থেকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেওয়ার মতো! কিন্তু নামকরণে দু'টি নাম-সংযোজক অব্যয় 'ও' প্রয়োগের পৃথক ব্যবহারে বিভূতিভূষণ দু'টি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। নসুর ব্যক্তিত্ব ও পাঁচীর ব্যক্তিত্ব যে আলাদা, এমন নাম তা বুঝিয়ে দেয়।

আবার দুয়ের আকর্ষণেই আছে দুই নামের মূল যোগফল—এক গৈরিক নিরাসক্তিতে বরণ করার—যা জগৎকে, ব্যবহারিক জীবনকে, তার সীমাকে উপেক্ষা করতে শেখায়। উপেক্ষা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর স্বভাবে নয়, জীবনভোগের, মানুষকে ভালোবাসার মতো বৃহত্তর মহত্তর তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে ত্যাগ করার দিক থেকে মূল্য পায়। নসুর ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরসেবা ও মানবসেবা পলায়নী মনোবৃত্তি নয়, জীবনকে স্বীকার করারই বড় দিক। পাঁচীর বিবাহ, সংসারজীবনও তারই প্রামাণ্য। এই দুই চরিত্রের যে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসা— নামকরণের দুই নামের যোগফলে তা-ই। গল্পের উপসংহারে তারই ব্যঞ্জনা। দুয়ের দূরান্বয়ী মানসিক তথা আত্মিক যোগেই গল্পের সমাপ্তি।

আবাব পাঁচীর ব্যক্তিত্ব, তার অহং যদি 'আমি' হয়, তবে সেখানে তার আত্মকথনে আছে সেই ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বন। সে নিজেকে দিয়ে দেখেছে নসুকে। নসু তার কাছে দূরের, আবার কাছেরও। সেই কাছের করা ব্যাপারটি রোমান্টিক—শেষ এক মিস্টিক ভালোবাসায় ঘটেছে! পাঁচীর আত্মকথন যেমন তাকে অহং ব্যক্তিত্বের প্রতীক করে তার 'আমি'কে, তেমন তার 'আমিত্ব' নির্ভরশীলতা পায় এক পুরুষ নসুমামার মধ্যে। 'অহং'

একক থাকলে পূর্ণ হয় না, তার পূর্ণতার জন্য চাই আর এক অস্তিত্ব। আসলে 'নসুমামা ও আমি' গল্পটি পাঁচীরই আত্মকথা, অহং-ব্যক্তিত্বের বিচারণার গল্প। সেখানে নসু তা প্রকাশের উপায়। আবার উপায় হয়ে উঠেছে পাঁচীর পক্ষে প্রধান ভূমি। এই যে তার আদ্যন্ত আত্মবিচারণা ও আত্মবিকাশের দিকে, তা একক স্বভাবে না থেকে নসুর আশ্রয়ে পূর্ণ শিল্পরূপ পেয়েছে, এমন ব্যাখ্যায় গল্পের নাম শিল্পের আশ্রয় পেয়ে যায়। নিশ্চয়ই এক মনস্তত্ত্বসম্মত গৈরিক প্রেমের গল্প 'নসুমামা ও আমি', কিন্তু দুই ব্যক্তিত্বের যৌথ দায়িত্ব অনস্বীকার্য বলেই বিভূতিভূষণ নামে দুজনের উল্লেখ রেখেছেন। 'নসুমামা ও আমি' এমন নাম দুই ব্যক্তিত্বের নিরন্তর আকর্ষণ ও স্বাভাবিক উত্তরণের দিক মেনে নেয়।

৫.

ভণ্ডুলমামার বাড়ি

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থগুলির প্রকাশকালের ক্রম ধরলে 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটি সংকলিত হয়েছে তাঁর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'যাত্রাবদলে'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল বাংলা তেরশো একচল্লিশের কার্তিক, ইংরেজি উনিশশো চৌত্রিশ। সংকলনে 'যাত্রাবদল' নাম-গল্পটি আছে সব শেষে, শুরু 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটি দিয়ে। প্রকাশকাল ধরলে আমাদের আলোচ্য গল্পটি কল্লোলের প্রকাশ শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত—তৃতীয় দশক ধরে এই দুই সময়-সীমার ঠিক মধ্যবর্তী পরিবেশকে নির্দিষ্ট করলেও আসলে তিরিশের দশকের প্রথম চারটি বছরই তার সামাজিক-পারিবারিক-অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে সামনে আসে। এই সময়ের যে কোনো মধ্যবিত্ত চাকুরে সাংসারিক মানুষের দারিদ্র্য— শহরজীবন বাদ দিয়ে— গ্রামীণ জীবনের মানুষকে সমান অসহায় করে রাখে। গল্পের ভণ্ডুলমামার যে অর্থকষ্ট তার চরিত্র-ন্যায় এই সূত্রে লক্ষণীয়।

এই সঙ্গে আর একটি দিকও লক্ষ করার মতো। নানা ব্যাধি-আক্রান্ত গ্রাম বাংলা তখন তার প্রচলিত স্বভাবকে স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে নিয়তির মতো অভিশাপকে অস্বীকার করতে পারছে না। বিভূতিভূষণ কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মতো প্রীতিধন্য মানস-স্বভাবে গ্রামজীবনকে দেখেননি, আবার তিরিশের দশকে বসে জীবনানন্দের আত্মিক অসুস্থতা, অবক্ষয়, আধুনিক যন্ত্রণা, সংশয় দিয়েও গ্রামকে দেখেননি, তবে গ্রামজীবন যে বদলাচ্ছে, বিষয়ী মানুষ যে গ্রামীণ প্রকৃতি, জীবন ধারণ ও যাপনের তরঙ্গহীন অন্তরঙ্গতায় আর তৃপ্ত নয়, বাস্তব প্রয়োজন যে গ্রাম থেকে তাদের উৎক্ষিপ্ত হওয়াকে নিশ্চিত করছে, এই বদলকে বুঝেছিলেন; তাই 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের ভণ্ডুলমামার বাড়ি করবার সমস্ত প্রয়াস তার অসচ্ছল অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও গ্রাম্য পরিবেশের শহরমুখী হওয়ার কারণে ভাঙন— দু'য়ের প্রচ্ছন্ন অভিঘাতে নিষ্ফলত্বকেই দীর্ঘকালের মতো গল্পের আবহে বুঝিয়ে দেয়। অবশ্যই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর বিচারে এহ বাহ্য।

লক্ষণীয় এসবের স্বাভাবিকত্বে গল্পে ভণ্ডুলমামার সমস্ত প্রয়াস, বাসনা, ভালোবাসা—

তার বাড়ির প্রতি —এক রহস্যময় জীবনার্তিকে প্রতীকী মর্যাদা দেয় দর্শনের ব্যঞ্জনাগর্ভ বিস্তারে। এখানেই বিভূতিভূষণ 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পে এক অসাধারণ কৃতী গল্পলেখক। তিনি গল্পের পরিবেশে নিয়েছেন ভাগ্যহত এক দরিদ্র গ্রাম ও মানুষকে, কিন্তু সে সবের সূত্রে পাঠকের কাছে এমন এক অভিজ্ঞতার জগৎ উন্মোচন করেন আয়াসহীনতার মধ্যে, যেখানে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অতীত শিল্পের শোভন-সুন্দর নিরঞ্জন উপলব্ধিই একমাত্র সত্য।

'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির কাহিনীবস্তু একেবারেই সাদা-মাটা। লেখক একজন স্কুল ইনস্পেক্টরকে গল্পের মধ্যে এনে প্রথম থেকেই তার জবানি দিয়ে গল্প শুরু করেছেন। সে এখানে উত্তমপুরুষ কথক। কিন্তু গল্পের কাহিনী ও কেন্দ্রীয় ভাববস্তু ইনস্পেক্টরের কথায় রূপ পায়নি, তারই দেখা গ্রামের স্কুলের বিয়াল্লিশ বছর বয়সের হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর কথাতেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। আবার অবিনাশবাবু যে কথা বলেছেন বিস্তারিতভাবে, সমগ্র গল্প জুড়ে, তা আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কথা নয়, তাঁর দেখা একটি গৃহী মানুষের— সেই ভণ্ডুলমামার বাড়ি-করা ও তা অসমাপ্ত রেখে মৃত্যুবরণের কথা। গল্পের শেষতম বাক্যটি কিন্তু সেই ইনস্পেক্টরবাবুর, সেই উত্তমপুরুষ কথক ব্যক্তিটির সচেতনা দিয়েই নির্দিষ্ট : 'অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।'

মূল উত্তমপুরুষ কথক ইনস্পেক্টরের দৃষ্টিতে অবিনাশবাবু ভাবুক লোক, নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে ভালোবাসেন। তিনি স্কুলের প্রধানশিক্ষক। মাইনর স্কুলটি ভিজিট করতে এসে তিনি এই হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর এখানেই ওঠেন, থাকেন। গল্পের শুরু এক কার্তিক মাসের শেষে হেমন্তসন্ধ্যায়। স্কুলের বারান্দায় বসে অবিনাশবাবুর কাছ থেকে কাহিনীটি শোনেন তিনি। কাহিনীটি অবিনাশবাবুর মামার বাড়ি হুগলি জেলার যে গ্রামটিতে, সেই গ্রামেরই মামাদের প্রতিবেশী এক পাতানো ভণ্ডুলমামার নিজের বাড়ি করার অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত। অবিনাশবাবু ছোটবেলায় মামার বাড়ি যেতেন মাঝে মাঝে। বছর পাঁচেক বয়স তখন, সে সময়ে মামার বাড়ি এসে দেখেন, গ্রামেই ওঁর মামার বাড়ি থেকে সামান্য দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে একটি কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায়। কেন যেন সেই ছোটবেলার শিশুমনের কৌতূহলে ওই বাড়িটা মনের মধ্যে লেগে থাকে। আট বছর বয়সে মামার বাড়ি বেড়াতে এসেও দেখেন বাড়িটার গাঁথা এখনো শেষ হয়নি। তখনো জানতেন না বাড়িটা কাদের! দিদিমার কাছে জানতে পারেন ওটা ওঁদের এক প্রতিবেশী ভণ্ডুলমামার বাড়ি।

অবিনাশবাবু যত বড় হতে থাকেন, ক্রমশ ভণ্ডুলমামার পরিচয় পান। গ্রামের মুখুজ্যেবাড়ির ভাগ্নে তিনি। ছোটবেলায় মামার বাড়িতেই মানুষ। এখন রেলে লালমণির হাটে চাকরি করেন। সংসারী মানুষ। চাকরি বাইরে, চাকরি করতে করতেই ছেলে-পুলের সংসারের ভবিষ্যৎ স্থায়ী আশ্রয়ের কথা ভেবে গ্রামের বাড়িটি করছেন। টাকা পাঠিয়ে দেন। মামারা সেই বাড়ি তৈরি করেন যেমন-যেমন টাকা আসে সেইমতো। ভণ্ডুলমামার সংসারে স্ত্রী ছাড়া দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি অবিনাশবাবুরই বয়সী। অবিনাশবাবু ক্রমশ বড় হয়ে একা একা একাধিকবার এসেছেন গ্রামে, কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ি গাঁথা

কোনোদিন শেষ দেখতে পাননি। তবু গ্রামে যখনি আসতেন একা ওই অসম্পূর্ণ বাড়িটায় যেতেন, সারা বাড়ি খুঁটিয়ে দেখতেন। কল্পনা করতেন ভণ্ডুলমামার সংসার এখানে এনে স্থায়ী আশ্রয় নিয়ে কত সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশে জীবন কাটাবেন! তখন চারপাশে জঙ্গল থাকবে না। ওর মতো কিশোরের ভয়ও চলে যাবে। কিশোরকালের শেষ ধাপে অবিনাশবাবু দেখেন সেই বাড়ির ছাদ পেটানো হয়েছে, দালান-রোয়াক হয়েছে সিমেন্টের, শুধু দরজা-জানলা বসানো বাকি।

এরপর সময়ের এক সুদীর্ঘ ব্যবধান। অবিনাশবাবু যৌবন বয়সে এন্ট্রান্স পাস করে কলেজে পড়তে ঢুকেছেন। দু'বছর পড়ারও শেষ, পরীক্ষাও শেষ। প্রথমে মামারবাড়ি এসে প্রথম ভণ্ডুলমামাকে চাক্ষুষ দেখেন ওঁদের বাড়িতেই। তখন অবিনাশবাবুর নিজেরই দৃষ্টিভঙ্গির অনেক বদল ঘটেছে। তাঁর পুরনো দিনের আদর্শ ও কৌতূহলের ওপর পড়েছে অভিজ্ঞতাজনিত আবরণ। এই অবস্থায় 'ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটি মাদুলি বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি।' সেই ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক্রমশ গভীর হল। তিনি এখন কলকাতার বাসিন্দা। বাসা করে সংসার নিয়ে থাকেন। তবে গ্রামের বাড়ি একটু একটু করে একদিন শেষ করবেনই, না হলে ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে থাকবে কোথায়—এই হল ভণ্ডুলমামার যুক্তি। একদিন অবিনাশবাবু ভণ্ডুলমামার অনুরোধে তাঁর কলকাতার বাসায় গিয়ে বোঝেন, ভণ্ডুলমামা যতই বাড়ি শেষ করুন না কেন, স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরা কেউই সেখানে যেতে চায় না। তাদের বাস্তব বুদ্ধি ও যুক্তি অনেক বেশি। ইতিমধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িও শেষ হয়নি। তবু ভণ্ডুলমামা যে কোনো ছুটি-ছাটায় একাই সে বাড়িতে এসে থাকেন, তৈরি করা ঘরদোর, পরিবেশ পরিষ্কার করেন। এই অবস্থায় গ্রামে ভণ্ডুলমামার সঙ্গে অবিনাশবাবুর দেখা হলে তিনি তাঁর আশাবাদের কথা জানান, ছেলেরা একদিন না একদিন ঠিক কলকাতার বাসা ছেড়ে এখানে থাকবে।

এরপর অবিনাশবাবুর গ্রামে যাওয়া অনেক কমে যায়। গ্রাম প্রায় মনুষ্যহীন জঙ্গল হয়ে যেতে থাকে দারিদ্র্যের ও ম্যালেরিয়া ব্যাধির কারণে। পাকা নির্জন গ্রামে অবিনাশবাবুর মামারাও আর থাকেন না, কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় অবিনাশবাবুর মামার ছেলের অন্নপ্রাশনে দেখা হয় নিমন্ত্রিত ভণ্ডুলমামার। শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ, চাকরি থেকে রিটায়ার্ড, অত্যন্ত দরিদ্র, দীনহীন চেহারা। ছেলেরা কেউ আসতে না চাইলেও উনি একা গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করেই অন্নের সংস্থান করেন। গ্রাম থেকেই এসেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, চার-পাঁচ দিন অবিনাশবাবুর মামার বাড়িতে কাটিয়ে আবার গ্রামে চলে গেলেন। যাবার সময় অবিনাশবাবুকে সেই গ্রামের বাড়িটা দেখে আসার জন্য নিমন্ত্রণও করেন। ভণ্ডুলমামার কথায়—'বাড়িটা দেখে এস আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিল এখনও যা বাকি।' এরপর ভণ্ডুলমামার বড় ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় দেখা হলে উনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন, গ্রামের বাড়িতে ভণ্ডুলমামাকে একাই থাকতে হবে! এটাই তাঁর নিয়তি। এরপর তিন

বছর কোনো সংবাদ পাননি অবিনাশবাবু। একদিন শোনেন অত্যন্ত অবজ্ঞায়, অশ্রদ্ধায় অসহায় মৃত্যু ঘটেছে ভণ্ডুলমামার নিজের বাড়িতেই ক'দিনের অসুখ-বিসুখে, গভীরতম নিঃসঙ্গতার মধ্যে।

ভণ্ডুলমামার বাড়ির সমস্ত স্মৃতি ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির গল্পের ছলে অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন অবিনাশবাবুই। সেই কথক অবিনাশবাবুর বিস্ময়—তাঁর জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়ির এমন যোগ কি করে ঘটল, এমন সব অতিতুচ্ছ বিষয় কেন সারা মন ঢেকে থাকে, আর বিশেষ করে শীতের সন্ধেতেই এইসব মনে পড়ে! এই জটিল জিজ্ঞাসা দিয়েই অবিনাশবাবুর গল্প শেষ ও তাঁকে এবং ইনস্পেক্টরবাবুকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে এনে গল্পটির শেষ রেখা টেনেছেন বিভূতিভূষণ।

'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির সামগ্রিক বিচারে প্রধানভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো একটা ছোটগল্প বিচারে সাধারণ যে কতকগুলি নীতি নির্দিষ্ট থাকে, বা সূত্র তৈরি করা যায়, এ গল্পের বিচার তার মাপে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। গল্পটির বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য এ দিক থেকে লক্ষণীয়। প্রথমেই বিচার্য, একে এর ভাবনিষ্পত্তি ধরে কোন শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে! এক প্রতিষ্ঠিত কথাকার-সমালোচক একে বলেছেন 'বিচিত্র রসের গল্প'। আমাদের বিচারে গল্পটির বক্তব্য লক্ষ্যে রাখলে, এটা পরিষ্কার যে ভণ্ডুলমামা গৌণ, মুখ্য হল তার বাড়ি। তা-ই যদি হয়, তবে লক্ষ্যে আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক আদর্শ বা সত্য নিশ্চয়ই নয়, সাংসারিক সত্যই উঠে আসতে পারে। সংসার জীবনে অবস্থার চাপে অনেক মানুষই তার বাসনা-কামনার চরিতার্থ রূপ দিতে অক্ষম, ভণ্ডুলমামার সে-ই অবস্থা হয়েছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় সে বাড়ি শেষ করতে পারেনি। সুতরাং সাংসারিক একটা সত্য তার বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তাতে গল্পটিকে চরিত্রমূলক গল্প বলা যেতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ ভণ্ডুলমামার বাড়ি তৈরি ও সম্পূর্ণ করার বাসনা ও প্রয়াসের সঙ্গে আরো অন্যতর অসীম এক মানসিকতা ছায়ার মতো জড়িয়ে আছে। সেখানে তত্ত্বের কথা ওঠে। চরিত্রমূলকতা নয়, নয় রূপকাশ্রয়িতাও, আসলে এক অসীম তত্ত্বই বিভূতিভূষণ চাপাননি, চাপাতেও হয়নি, অবিনাশবাবু ও ভণ্ডুলমামা— দুজনের চরিত্র চিত্রধর্মের সঙ্গে যে ব্যঞ্জনা সমন্বিত, তারই অন্তরাল থেকে উঠে আসে তত্ত্বের ব্যঞ্জনা, তা স্বতঃস্ফূর্ত, তা নীল আকাশের নিচে অযত্নে গড়ে-ওঠা সবুজ প্রকৃতির মতো মনোরম, জীবনকেন্দ্রানুগ সুন্দর। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটি অবশ্যই জীবননিষ্ঠ এক তত্ত্বাশ্রয়ী গল্প।

এই গল্পের কাহিনী-কাঠামো ও প্লট-বৃত্তও ছোটগল্পের এতাবৎ প্রচলিত সহজ নিয়মের অনুবর্তী নয়। গল্পের আরম্ভ, বিস্তারে সেই 'চরমক্ষণ', অন্তিমের অনন্তশায়ী ব্যঞ্জনা— স্বাভাবিক নিয়মের মাপে মেলে না। গল্পটি অবশ্যই কিছু বিবৃতিমূলক, কিন্তু বিবৃতিসর্বস্ব নয়। গল্পের মূল কথক ইনস্পেক্টর অবিনাশবাবুর বর্ণনা দিয়েছে, পরিচয় স্পষ্ট করেছে, আবার অবিনাশবাবুর চরিত্রটি ভণ্ডুলমামার জীবনচিত্র এঁকেছে বাড়ি করবার সুত্রে— যেখানে কিছু ঘটনাশ্রয়ী স্বভাব আদৌ নেই, নেই স্পষ্টত ভাবের কোনো পরিবহন। কিছুটা অবিনাশবাবুর চরিত্রের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা আছে ইনস্পেক্টরের দেখার দৃষ্টিতে, কিন্তু তা

বিবৃতিতেই শেষ। ভণ্ডুলমামা সম্পর্কে অবিনাশবাবুর যে 'স্টাডি', তার মধ্যে চরিত্রটির ভাবমুখ্যতা যতটা আছে, ততটা তার রূঢ় বাস্তব আচরণ নেই।

এমন অবস্থায় গল্পের 'মহামুহূর্ত'-অংশ চিহ্নিত করা দুরূহ। সমগ্র গল্পের কাহিনী-অবয়ব ও প্লট-গঠন তিন ব্যক্তিত্বের ডাইমেনশানে ধরা। গল্পের মূল কথক স্কুল-ইনস্পেক্টর, হেডমাস্টার অবিনাশবাবু এবং ভণ্ডুলমামা— এই তিনজনই সেই ত্রিমাত্রিকতার ধারক। মূল কাহিনী বলেছেন অবিনাশবাবু, মূল চরিত্র কিন্তু ভণ্ডুলমামা, আবার এই দুজনকে একসঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে গল্পের উত্তম-পুরুষ কথক ইনস্পেক্টর। এমনও মনে হতে পারে ইনস্পেক্টরকে গল্প থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করে একা অবিনাশবাবুর জবানিতেই ভণ্ডুলমামার কথা বলা যেতে পারত, তাতে গল্পের কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অবিনাশবাবু ও ভণ্ডুলমামা—দুজনকে নিয়ে, জড়িয়ে যে গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, বড় অসীম সত্য—যা চিরন্তন জীবনদর্শনের সঙ্গে জড়িত—তাকে ব্যঞ্জনায় দেখানো সম্ভব হত না। ইনস্পেক্টর নিজে দুজনকে দেখেছে, দেখিয়েছে আমাদের—প্রত্যক্ষে অবিনাশবাবু, পরোক্ষে—অবিনাশবাবুর বর্ণনায় ভণ্ডুলমামাকে। গল্পের কাহিনী ও প্লট তাই সংস্কৃত কথাসাহিত্যের মতো গল্পের মধ্যে গল্পযোজনাকে শিল্পের মাপেই অবধারিত করেছে। এখানেই গল্পের প্লট-কাঠামোর প্রচলিত গল্পরীতিও থেকে লক্ষণীয়ভাবে সরে-আসা!

তা হলেই 'মহামুহূর্ত' নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দেয়। গল্পের আরম্ভ বাস্তব বিষয় দিয়ে, শেষও তা-ই। মাঝখানে যে অবিনাশবাবুর গল্প—যা ইনস্পেক্টরের দেখানো, আর ভণ্ডুলমামার গল্প যা অবিনাশবাবুর বলা—দু'য়ের ভাবগত সাদৃশ্য রচনায় লেখক অদ্ভুত এক মিশ্র কৌশল নিয়েছেন 'মহামুহূর্ত' ও শেষতম ব্যঞ্জনা সৃষ্টির শিল্পরূপ দানে। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের 'মহামুহূর্ত' কখনো বড় ঘটনায় চকিত হবে না, হওয়া উচিত নয়। ভণ্ডুলমামার ছাপোষা জীবনে ঘটনা কোথায়? তার জীবন যদি একটি পায়ে চলার অনন্তমুখীন পথ হয়, তবে অনেক কাঁটা ও কাঁটাঝোপ, উঁচু-নিচু পথ প্রতিবাদহীন অতিক্রমণের পর তার সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার পরিণতিকেই লক্ষণীয় করে। ভণ্ডুলমামা যখন মরে, সে একা, সবরকম মানবিক সহযোগিতা ও পরিচর্যাবিহীন অবস্থায়। দু-তিন দিন তার মৃতদেহ পড়েই থাকে ঘরে, কেউ টের পায়নি। কিন্তু একটা বড় কথা, সে তার নিজের বাড়িতেই মরেছে, ছেলেরা কলকাতায় সচ্ছল থাকার পরেও। এখানেই ভণ্ডুলমামার নির্ঝঞ্ঝাট জীবন 'মহামুহূর্ত' দেখিয়ে দেয় 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের। এখানে কিন্তু সমগ্র গল্পের সেই রহস্যময় ব্যঞ্জনা নেই। তার জন্য পাঠকদের অপেক্ষা করতে হয়েছে অবিনাশবাবুর শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য :

> 'আমার জীবনেব সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি করে ঘটল, সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল। অথচ কত বড়

বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে। বিশেষ বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।'

সমগ্র গল্পের যে ব্যঞ্জনা, বিভূতিভূষণই এই শেষের কথাগুলির মধ্যে তাকেই নিবিড় করে রেখেছেন। এর ব্যঞ্জনার প্রাথমিক পরিচয় আছে গল্পের প্রথম দিকেই। পরে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমাদের মতে, এইভাবেই বিভূতিভূষণ গল্পের প্রথম ও শেষ—দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র রেখে ছোটগল্পের সংহত শিল্পরূপকে মেনে নিয়েছেন। এত সূক্ষ্ম সে প্রয়োগ, একালের কোনো কোনো সমালোচক সম্ভবত সেদিন লক্ষ না করেই মন্তব্য করেই বসেছেন:

'ছোটগল্পের আঙ্গিকে বিভূতিভূষণের নিখুঁত পারিপাট্যের অভাব।..... গঠনেব শিথিল আকস্মিকতা, দ্বিধাকম্পিত রেখাপ্রবণতা ও কেন্দ্র সংহতির অভাবের জন্য তাঁহার অনেক গল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।'

'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের 'মহামুহূর্ত' অংশের তীব্রতা নেই ঘটনার শান্ত জটিলতাহীন, নির্বিরোধ স্বভাবের জন্য, কিন্তু দার্শনিক গভীরতা তাকে তত্ত্বধর্মী গল্পের যথার্থতা দান করেছে।

অবশ্যই যদি অবিনাশবাবুর বলা কাহিনীসূত্রেই অবিনাশবাবুরই একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি ধরে গল্পটির 'মহামুহূর্ত' অংশটি যুক্তির সূত্রে নির্দিষ্ট করার কথায় আসি, তা হলে অবিনাশবাবুর ব্যক্তিগত উপলব্ধির অংশই গল্পের 'মহামুহূর্ত'। আবার এই 'মহামুহূর্ত'ই গল্পের মধ্যে গল্পকারের মানবজীবন সংক্রান্ত মূল প্রতিপাদ্য—দর্শনতত্ত্বসমৃদ্ধ cosmic realisation! যৌবন বয়সের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোয় অবিনাশবাবু দেখে ভণ্ডুলমামার বাড়ির এমন অসম্পূর্ণ থাকার রহস্য ও বিস্ময়কাতরতাকে:

'ভণ্ডুলমামা বললেন ত চোদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে... যেন অনাদিকাল, অনাদি যুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইঁট একখানির পর আর একখানি উঠছে.... আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে—ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।'

এমন উপলব্ধি ভাবেরই, কাহিনী ও ঘটনার চমকের নয়। তাই 'মহামুহূর্ত'কে নাটকীয় বলা যাবে না, বিশেষ ঘটনা-নির্ভরও নয়। এমন উপলব্ধি যেমন মনস্তত্ত্ব-সম্মত, তেমনি দার্শনিক উপলব্ধির একান্ত অনুগত এবং একই সঙ্গে সমগ্র গল্পের পক্ষে গল্পকারের প্রতিপাদ্যের নিশ্চিত অনুপন্থীও।

দুই

'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পে সাধারণ অর্থে চরিত্র বলতে তিন ব্যক্তি—স্কুল-ইনস্পেক্টর—যার আলাদা নাম গল্পে কোথাও নেই, অবিনাশবাবু—যিনি পেশায় শিক্ষক, কিন্তু স্বভাবে

একজন স্পর্শকাতর, আত্মসচেতন, রোমান্টিক পুরুষ, আর ভণ্ডুলমামা— রূঢ় বাস্তব এক সংসারী মানুষ, কিন্তু মনের গভীরে এক নিরাসক্ত জীবনশিল্পী, সংসারে বেমানান—সমগ্র জগতের অতীত এক নিষ্ঠুর সত্য তথা মানবভাগ্যকে আমৃত্যু বহন করে বেড়িয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি, গল্পের প্রথম এবং প্রধান উত্তমপুরুষ কথক না থাকলে গল্পটির কাহিনী-কাঠামো ও কেন্দ্রীয় ভাববস্তু তার কেন্দ্রটিকে পাঠকদের পক্ষে চিনিয়ে দিতে পারত না। ইনস্পেক্টরটির স্বভাব-পরিচয় গল্পের পক্ষে অবান্তর। তার কাজ স্কুল-পরিদর্শন, কিন্তু সে করেছে তার জীবন পরিদর্শন, বিশাল জগতে জীবনের নিয়তিনির্দিষ্ট মূল সত্যের অনুসন্ধান। তাই সেই প্রয়োজনেই তার সামনে এসেছে অবিনাশবাবুর মতো চরিত্র, যে আবার স্মৃতিসূত্রে এনেছে ভণ্ডুলমামার মতো মানুষ, তার জীবন ও তার বাসনা-কামনাকে। ইনস্পেক্টর অবিনাশবাবুকে চিনিয়েছে, আবার অবিনাশের বর্ণনায় ভণ্ডুলমামাকে চিনিয়ে দিয়েছে আমাদের। অবিনাশবাবু মানুষটি কিরকম এবং যার পরিচয়েই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নির্দিষ্ট—তা বুঝিয়ে দেন ইনস্পেক্টর। অবিনাশবাবু লোক ভালো, নির্ঝঞ্ঝাট, ভাবুক। জীবনের বাধাকে অতিক্রম করে এগোনোর থেকে প্রতিবাদহীন নিস্তরঙ্গ জীবনই তাঁর কাম্য। এই স্বভাবটি ইনস্পেক্টরই দেখিয়ে দেয়। অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে অন্যমন হয়ে যান, আড্ডার মধ্যে গল্প ফাঁদতে ভালোবাসেন। ভালো শ্রোতা পেলে নিজের অতীত জীবন নিয়ে এক 'নস্ট্যালজিক' প্রস্তাবনায় যেতে নির্দ্বিধ।

আমাদের কথা হল, ইনস্পেক্টর মানুষটি গল্পের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব অবিনাশবাবু ও ভণ্ডুলমামার যোজক পুরুষ। মানুষটি যখন গল্পের প্রথমেই অবিনাশবাবু প্রসঙ্গে বলে :

> 'বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সে সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা কিছু অভিজ্ঞতা, যা কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় করে।'

তখন বোঝা যায়, অবিনাশবাবু ও ভণ্ডুলমামার মধ্যে সমব্যক্তিত্বের এক নিবিড় আত্মীয়তার দিক চিহ্নিত করাই মূল কথা। এখানেই ইনস্পেক্টর চরিত্রটির শিল্পমূল্য স্বীকৃত। গল্পটির কাহিনী-কাঠামোর ও প্লট-বৃত্তের মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টিতে ইনস্পেক্টর মানুষটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গল্পটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য দুটি দিক থেকে তাৎপর্য পায় শিল্পে। এক, ভণ্ডুলমামার বাড়ি করার অক্লান্ত প্রয়াস ও কৃচ্ছ্রতা, শেষ জঙ্গলের ওই বাড়ির মধ্যে অকারণ মৃত্যুবরণের বিষাদনির্বিন্ন কারুণ্য একটি মানবজীবনের বিষাদময়তাকে বাস্তবতায় রূঢ় রূপ দেয়। এটা গল্পটির একদিকের শিল্প-তাৎপর্য। দুই, ভণ্ডুলমামা তুচ্ছ, তুচ্ছ অবিনাশবাবুও, আসলে এদের অতীত এক দার্শনিক জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসায় গল্পটির লেখকের এক Romantic exaltation-এ দার্শনিক রহস্যময় তত্ত্ব অথচ নিষ্ঠুর কঠিন সত্য কঠিন সৎ তান্ত্রিকের রক্তাম্বর নিয়ে নেয়। গল্পের এই যে দ্বিতীয় নির্গলিতার্থ, এ সম্পর্কে একালের এক কথাকার-সমালোচকের সঙ্গে আমরা একমত:

> 'এই বাড়িটি গড়ে ওঠা-না-ওঠার সঙ্গে গল্পের বক্তা অবিনাশবাবুর যে মনস্তাত্ত্বিক

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে, গল্পটির আসল রস সেইখানে। শুধু মনস্তত্ত্বই নয়— এর মধ্যে একটা দার্শনিক বিরাটত্বও নিহিত আছে।'

বর্তমান গল্পটির চরিত্রপরিকল্পনার আলোচনায় অবিনাশবাবু চরিত্রটির শিল্প-মর্যাদা বিচারে সমালোচকের এই মন্তব্যটিকেই জরুরি মনে করি। আমরা মনে করি, একা অবিনাশবাবু নন, ভণ্ডুলমামা চরিত্রটির সঙ্গে সম্যক মিলে-মিশেই যেমন গল্পের দর্শনতত্ত্বের পূর্ণতা, তেমনি দুই চরিত্রেরও পূর্ণ বিকাশ। অবিনাশবাবু ভণ্ডুলমামার পাশে সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষটি আদৌ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন, যথার্থ শিক্ষিত এবং সে শিক্ষাজীবনের জটিলতায় যাচাই না করে, নিজেকে নির্ঝঞ্ঝাট নিরাসক্ত রেখে দেবলহাটি নামে এক গণ্ডগ্রামের মাইনর স্কুলের প্রধানশিক্ষক করেছে অবিনাশবাবুকে। বাস্তব সাংসারিক জীবন সম্পর্কে এক অদ্ভুত নিরাসক্তির সঙ্গে রহস্যময় সাদৃশ্য থেকে যায় অবিনাশবাবুর যোগের দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই দুই চিত্রের মূলেই অবিনাশবাবু মানুষটির ও গল্পে অবিনাশবাবুর শৈল্পিক প্রয়োজনের গুরুত্ব ব্যঞ্জনায় পাঠক বুঝে নেয়:

১. গল্পের প্রথম দিকে প্রধান উত্তমপুরুষ কথক ইনস্পেক্টরের বর্ণনায়:

> 'বেচারীব জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সে সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় করে।

২. গল্পের শেষ দিকে অবিনাশবাবুর নিজের স্মৃতিচারণমূলক আত্মোক্তিতে:

> 'আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি করে ঘটল, সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!'

অবিনাশবাবুর বর্ণনায় ভণ্ডুলমামার জীবনপথ ও বাড়ি অনেকটাই সূক্ষ্ম প্রতীকের শরীর পেয়ে যায়, ইনস্পেক্টরের বর্ণনায় অবিনাশবাবু হয়ে যান রূঢ় বাস্তব জীবনের সাক্ষী, হয়তো বা উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। অবিনাশবাবু চরিত্রের কৈশোর এঁকেছেন লেখক তাঁর বিস্ময়, কৌতূহল ও সেই বয়সের রোমান্টিক অভিজ্ঞতা দিয়ে। এটি তাঁর চরিত্রের প্রস্তাবনা, পরবর্তী অংশে তাঁর যৌবনকালের অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষা। ভণ্ডুলমামাকে প্রথম দেখার সময়ে তাঁর নিজের মানসিকতার ব্যাখ্যা:

> 'মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল—বয়স হয়েচে, কলেজে পড়ি; নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশেচি, সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেচি। স্বদেশী মিটিংয়ে ভলান্টিয়ারি করেচি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই গেচে বদলে—'

এই বদল রূঢ় বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে অবিনাশবাবু ভণ্ডুলমামার জীবন ও কোঠাবাড়ি নির্মাণের পর্যায় ও তাৎপর্যে ভেবেছেন। আজকের অবিনাশবাবু শৈশব-কৈশোর এবং সেই দীপ্ত যৌবন অতিক্রান্ত বিয়াল্লিশ বছরের এক নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবয়সী পুরুষ। জীবন বিকাশের

ত্রিস্তর মনস্তত্ত্বের শেষ স্বরূপে অবিনাশবাবু গভীর গোপন অভিজ্ঞতা গল্পের লক্ষ্যকেই নিবিড়তম করে তোলে স্বতঃস্ফূর্ত মনস্তাত্ত্বিক বিচারে :

> 'ভণ্ডুলমামা বললেন ত চোদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠচে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে......যেন অনাদিকাল, অনাদি যুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইঁট একখানির পর একখানি উঠচে.....শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম বালক থেকে কৈশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত আকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেচে..... ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্ত নেই।'

অবিনাশবাবুর নিজেকে জড়িয়ে গল্প বলার উদ্দেশ্য এবং বিভূতিভূষণের সমগ্র গল্পটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এক হয়ে যায়। অবিনাশবাবুর জীবনের ত্রিস্তর অভিজ্ঞতা অবশ্যই মনস্তত্ত্ব-সম্মত, কিন্তু তা ক্রমশ crude realism থেকে romantic imagination-এর ঊর্ধ্বলোক অতিক্রম করে এক cosmic realisation-এ উন্নীত হয়ে যায়। অবিনাশবাবু অবশ্যই বাস্তব চরিত্র, realism-romanticism-এর মিশ্রিত এক সূক্ষ্ম শিল্পের রাঙ্‌তা জড়ানো, কিন্তু দার্শনিক।

এমন দার্শনিক টীকা-ভাষ্য অবিনাশবাবুর চরিত্র বাস্তবতায়, কিন্তু সেই দার্শনিকতা তত্ত্বে-সত্যে ব্যঞ্জনা পায় ভণ্ডুলমামা চরিত্র ধরে, তার বাড়ি বানানোর কামনা-বাসনার একমুখিন স্বভাব-বৈচিত্র্যে। ভণ্ডুলমামা অবশ্যই দোষে-গুণে সাংসারিক মানুষ, কিন্তু তার বাড়ি করার বাসনা, বুঝিবা স্বপ্ন, আদর্শ—তা একজন খাঁটি সাংসারিক বিষয়ী মানুষেরই অনুগ বিষয়। ভণ্ডুলমামার চরিত্র-বিষয় হয়েছে প্রতীক, কিন্তু সে অবশ্যই real এবং individual। অবিনাশবাবুর থেকে তার স্বপ্ন, আদর্শ আলাদা। ভণ্ডুলমামা গল্প, অবিনাশবাবু তার টীকা-ভাষ্য। গল্পের আধার আর টীকাকারের attitude এক হওয়ার জন্য 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের মূল লক্ষ্যে দুজনেই সমান স্থিত।

কিন্তু ভণ্ডুলমামা বাইরে বিষয়ী মানুষ হলেও ভিতরে সে একজন বিষয়বন্ধনহীন নিরাসক্তচিত্ত শিল্পী-প্রাণ মানুষ। অবিনাশবাবুকে একসময়ে তার বাড়ি সম্পূর্ণ করার অর্থনৈতিক অসুবিধের কথা নানাভাবে বুঝিয়ে বলেছে, 'জায়গাটা বড় ভালবাসি।' তার এই যে অকপট অন্তরঙ্গ মৃত্তিকাপ্রেম, এখানেই তার সংগুপ্ত নিবিড় শিল্পী-সত্তার পরিচয়। অবিনাশবাবুর কথায় এমন শিল্পী-প্রাণের টীকা-ভাষ্য স্পষ্ট :

> 'বলে কি! এখনও বাকি! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসচি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠচে! এ তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থাকা দেখে যেতে পারব তো।'

ভণ্ডুলমামা বিষয়ী মানুষ, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিসাধনও তা-ই। কিন্তু দুজনের মধ্যে চমৎকার পার্থক্যটি ধরা পড়ে অবলীলায়। হরিসাধনের মতে :

> 'বুদ্ধিশুদ্ধি ত কিছু ছিল না বাবার, নেইও।—সারাজীবন যা রোজগার করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে?....

বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেচেন? কে নিতে যাবে,......'

পুত্র খাঁটি বিষয়ী। অন্যদিকে ভণ্ডুলমামার কাছে এই বাড়ি এক স্বপ্ন, আদর্শ, যেন বা নিজেরই আদর্শের creation। ভণ্ডুলমামা নিশ্চয়ই বিষয়ী মানুষ, কিন্তু তার বিষয়-নির্ভর তৎপরতা— গ্রামে ব্যবসাবুদ্ধিহীনভাবে মুদির দোকান খোলা, গ্রামে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া ও চড়া সুদ আদায় করা—সবই শুধু সেই স্বপ্ন, সেই নিজের বাড়িটুকু নির্মাণের কারণেই লক্ষ্য হয়ে থেকেছে। তাই ভণ্ডুলমামা মূলগত স্বভাবে একটা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ব্রাত্য! তার পরিচয় অবিনাশবাবুর বর্ণিত অভিজ্ঞতা-চিত্রে মেলে:

১. 'মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেচি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধচেন, এ গাছটা খুঁড়চেন, ও-গাছটা কাটচেন।'

২. 'মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনো দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন।'

এই যে ভণ্ডুলমামাব বাড়ি নিয়ে মমত্ববোধের চিত্র, তা এক সংসার-অনভিজ্ঞ, অথবা সংসাব উদাসীন বৈরাগী শিল্পীর অন্তর-গত মানসিকতাকেই বুঝিয়ে দেয়। সংসারে থেকেও, পরিবার-পুত্রদের স্নেহটুকু দিয়েও কোথাও বুঝি ভণ্ডুলমামা সংসাব-বিবিক্ত মানুষ। তার বাড়ি তার স্বপ্নের, মৃত্তিকাপ্রেমের 'তাজমহল'-ই বটে!

বস্তুত মানুষ নিজের মনের দিক থেকে কিছুটা অন্তত নিরাসক্তচিত্ত, ছন্নছাড়া স্বভাবের না হলে শিল্প বোঝে না, বুঝতেই পারবে না কোনোদিন। পুত্র হরিসাধন তা নয়। ভণ্ডুলমামা অবশ্যই ভিতরে শিল্পী-প্রাণ। তার বাড়ি করতে গিয়ে যাবতীয় প্রয়াস করতে করতে অনুসন্ধান—সব কিছু ত্যাগ করতে কালের কাছে মুক্তি খোঁজা, তার কাছেই আত্মসমর্পণ। তাব মৃত্যু এমন নির্বিরোধ আত্মসমর্পণের সমতুল। ভণ্ডুলমামার মৃত্যুঘটনা আত্মীয়-বন্ধুহীন, কোনোরকম মানবিক সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন এক কঠিন নির্মম নিয়তির মতো। তার মৃত্যু প্রমাণ কবে যে মানুষটা নিঃসঙ্গ। শিল্প-প্রেম এইভাবেই মানুষকে নিঃসঙ্গ করে, একা কবে দেয়।

এই সঙ্গে আর একটি দিক লক্ষণীয়। ভণ্ডুলমামার বাস্তব জীবন আদৌ অনিকেত ছিল না। পুত্র-স্ত্রীব সংসার ছিল, অভাব থাকারও কথা নয়। কিন্তু সেই মানুষটি একে একে দারিদ্র্যের চরম সীমায়, হীনম্মন্যতার কঠিন ক্রান্তিরেখায় দাঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়। ভণ্ডুলমামা বাড়ি নির্মাণে অবশ্যই ব্রাত্য। সে ভিক্ষা করে দিন কাটায়। তার শেষ বয়সের হীনম্মন্যতায় ভরা জীবনধারণ সেই বাড়ির জন্যই যেন বা জীবনযাপনে উন্নীত হয়ে যায়! তার যে বদল তার মূলে সেই বাড়ির প্রতি ভালোবাসা। ভণ্ডুলমামার মৃত্তিকাপ্রেম বস্তুত জীবপ্রেমেরই নামান্তর! যে মানুষটা জীবন ধারণ ও যাপনে দীনতার শেষ সীমায় পৌঁছেছে, তার সঙ্গে

অবিনাশবাবুর আত্মীয়তার সূক্ষ্ম সূত্রটি একসময় নস্ট্যালজিয়ার মধ্যে ধরে নেন। মামার ছেলের অন্নপ্রাশনে এসে চার-পাঁচদিন কাটিয়ে মামারই দানের চটি জোড়া পরে যখন শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ ভণ্ডুলমামা ওখান থেকে চাল-ডালের মোটের ভারে ঝুঁকে স্টেশনের দিকে যায় গ্রামের উদ্দেশে, তখন অবিনাশবাবুর স্বগতোক্তি:

> 'হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল।'

এইভাবে ভণ্ডুলমামার সঙ্গে অবিনাশবাবুর সম্পর্কের সূত্রটি ধরা পড়ে গল্পের মধ্যে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভণ্ডুলমামাকে সর্বরিক্ত, সংসার-অনুপযোগী এক দীন ভিখারির স্তরে এনে তার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। আমাদের মনে হয়, জগতে যারা ব্রাত্য, যারা বাঁচার বড় অর্থ-সন্ধানে তৎপর, যারা জগতের ও জীবনের সীমাকে মেনে নিয়ে স্বপ্ন সফলের সন্ধানী, তাদের যে এমন দীনহীন হতেই হয়—এটাই ভণ্ডুলমামার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন গল্পকার। বাস্তবে ভণ্ডুলমামা ঠিক, কিন্তু গল্পের প্রয়োজনে সে হয়ে উঠেছে এক দার্শনিক তত্ত্বের প্রামাণ্য বিষয়। বস্তুসত্য থেকে গভীরতম দার্শনিক ভাবসত্যে উত্তরণেই 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির কেন্দ্রীয় শিল্প-সত্য।

তিন

'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের মূল ভাবটি অবশ্যই একমুখিন। সেই ভাব গভীর একটি সত্যে স্থিত হয়েছে অবিনাশবাবু ও ভণ্ডুলমামা— দুই চরিত্র-বেণীর একক বন্ধনে, বলা যায়, দুই চরিত্রের ভাবসত্যের যুগলবন্দি অবস্থায়। অবিনাশবাবুর দিক থেকে ভণ্ডুলমামার জীবন বিশ্লেষণ আর ভণ্ডুলমামার পক্ষে বাড়ি তৈরি—দুয়ের মধ্যে কোনো অতিবিস্তৃত কাহিনী-ঘটনা নেই। দুটি মানুষই তুলনাদণ্ডে সমান জায়গা নিয়েছে। কিন্তু 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের ভাবসত্য বা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবস্তুটি নানাভাবে একাধিক তাৎপর্যে আমাদের সামনে আসে। এর সঙ্গে লেখক ব্যক্তিত্বের যোগ নিবিড়।

বস্তুত বিভূতিভূষণের লেখক-ব্যক্তিত্ব তাঁর দেশ-সম্পর্কিত ভাবনা, তাঁর কালচেতনা ও তাঁর বিশেষভাবে দেখার দৃষ্টি (observative power)— এই তিনের সমবায়ে নির্মিত। তাঁর জীবনদর্শন তাঁর উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও অন্তর্গূঢ়। তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক, প্রকৃতিকে নিজের অন্তরলোকের অলৌকিক অভিজ্ঞতায় দেখতে সদা-অভ্যস্ত। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পে তিনি ভণ্ডুলমামার বাড়ির পরিবেশকে করেছেন গ্রামীণ নির্জন জঙ্গলে 'বিশেষ'। ভণ্ডুলমামাকে এনেছেন প্রকৃতির পরিবেশে, তিনি খুঁজেছেন মানুষের এই কালের প্রেক্ষিতে ক্ষমতার সীমা, অনিত্যতা, অসহায়তার দিক। ভণ্ডুলমামা কোনোদিনই বাড়ি শেষ করতে পারেনি, তার কারণ মানুষের জীবনের মধ্যেই এক অপার্থিব ক্ষমতার সীমা থেকে গেছে— যা মানুষকে তা অতিক্রম করতে বাধা দেয় নিরন্তর। ভণ্ডুলমামা তারই শিকার। ভণ্ডুলমামা বাড়ি শেষ করে কি চেয়েছে? তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের স্থিতির নিশ্চিন্তি, নাকি, তারও অতিরিক্ত কিছু?

আসলে আমরা সকলেই জগৎসীমায় এক অলৌকিক আনন্দের অনুসন্ধানী। কেউ

সংসারবদ্ধ জীবনে মায়ার মোহে আনন্দ পেতে চাই, কেউ এসবের ঊর্ধ্বে নিজের স্বপ্ন, আদর্শকে শিল্পীর নিরাসক্তি দিয়ে আনন্দের অন্য স্বাদে পেতে ইচ্ছুক। কেউবা সব কিছু ছেড়ে এক জগতাতীত ঈশ্বর-অস্তিত্বের চিন্তায় ঈশ্বর-অনুধ্যানে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে আনন্দের আলোকার্থী। আসলে সকলেই কোনো না কোনো মাপে সাধক। জগতে কেউ বিযয়েব সাধনায় বিষয়ী সাধক, কেউ বিষয়-বিবিক্ত থেকে পরমানন্দের সাধক। বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-মানুষ মেনে নিয়ে, জগৎ মেনে নিয়ে এক পরমানন্দের সাধক। তাঁর সমসময়বর্তী কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুশল পাহাড়ী' গল্প পড়ে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, সাধারণ অর্থে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে তা-ই সত্য:

> 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিভূতিভূষণ ছিলেন সাধক। অমৃতময় আনন্দই ছিল তাঁর ইষ্ট—তারই মধ্যে তিনি তাঁর পরমপুরুষকে পাইবার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। আজিকার এই বস্তু বিজ্ঞান সর্বস্বতার যুগে তাঁকে সম্যক উপলব্ধি করার মত মানসিক গঠন শক্তি নিশ্চিত রূপে হ্রাস পাইয়াছে।'

ভণ্ডুলমামার যে বাড়ির জন্য সন্ন্যাসীসুলভ কৃচ্ছ্রসাধন ও পরিণতি, সেখানেও যেন লেখকের সেই আনন্দময় পরমপুরুষের মতো কিছু পাওয়ার বিষয় ব্যঞ্জনা পায়।

আসলে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা হল পার্থিব মানুষের এক desire, স্বপ্ন, আদর্শ। কিন্তু মানুষ তো অসীম আকাশের নিচে, জাগতিক কালের অনুবর্তনের পক্ষে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মানুষ। তার যাবতীয় আস্ফালন, প্রয়াস মৃত্যু দিয়ে মহাকালের সুতোয় গাঁথা। সেই সুতোয় এক একটি মানুষের মৃত্যু এক একটি গিঁট। সেই জায়গায় তাকে থামতেই হবে, চলে যেতে হবে। তাই মানুষের কোনো স্বপ্নই, কোনো বাসনাই কোনো দিন পূর্ণ হবার নয়। পৃথিবীর চলা অনন্তকাল ব্যাপি, মানুষের বাসনা, স্বপ্নও অনন্তকাল অপূর্ণ থেকে চলে। অবিনাশবাবুব গভীরতম উপলব্ধির ভাষায়:

> '. ... আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠচে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছনের দিকে ফিরে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে .... যেন অনাদিকাল অনাদি যুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠচে...... আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেচে..... ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।'

অবিনাশবাবুর উপলব্ধিই এই গল্পের মূল সত্যকে পরিষ্কার বোঝায়। মানুষের জীবন, জগতের সঙ্গে যোগে ভণ্ডুলমামার বাড়ি সূক্ষ্ম প্রতীক-প্রতিম স্বভাবে কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর দ্যোতক বিষয় হয়।

সেই সঙ্গে এই মূল বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে চলমান আধুনিক সভ্যতার কিছু নির্মম দিক। ভণ্ডুলমামা গ্রামের তার নিজের মামার বাড়ির জায়গায় যখন জমি কিনে বাড়ি আরম্ভ করে, তখন গ্রামে বসতি আছে ঘন। মানুষ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বসবাস করে। কিন্তু যখন বাড়ি অসম্পূর্ণ থেকেও কিছুটা সম্পূর্ণতা পেতে চলেছে, তখন

অবিনাশবাবুর মামার বাড়ির লোক ও অন্যান্যরা' গ্রাম ছেড়ে কলকাতাবাসী। গ্রাম বসতিহীন, জঙ্গলে পরিপূর্ণ ভণ্ডুলমামার বাড়ির পরিবেশ। তার ওপর ম্যালেরিয়া রোগ ও মশার উপদ্রব। এই যে নতুন সভ্যতা শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে ক্রমশ, ইতিহাসের ও সভ্যতার এমন নিয়তির মতো শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিকভাবে আঁকতে ভোলেননি বিভূতিভূষণ। অবশ্যই তা ভাবের একমুখিতা বিনষ্ট করেনি। কালের প্রেক্ষাপটে আধুনিক সভ্যতা ও সময়ের অভিঘাতে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' গ্রামগুলির যে বদল অবধারিত তা বুঝেছিলেন লেখক, তাই অবিনাশবাবুর কথায় তারই জীবন্ত ছবি প্রসঙ্গটিকে ইতিহাসের সত্য ও শিল্পের সত্যে প্রামাণ্য করে:

> 'সন্ধ্যা-রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ-হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্চে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধরে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশ পাখির ডানা-ঝটাপটি!'

এমন গ্রাম বদলের অবধারিত চিত্রকে ভণ্ডুলমামার বাড়ি তৈরির নিষ্ফলত্বের সঙ্গে অসাধারণ নৈপুণ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন গল্পকার। অপ্রাসঙ্গিক হয়েও তা একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক!

যে তত্ত্বটি দার্শনিক সত্যে 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির নির্গলিতার্থ থেকে উঠে আসে, তা যে আদৌ আরোপিত নয়, অভাবনীয়ভাবে এবং কাব্যিক চমৎকারিত্বে অন্তর্নিহিত থেকে গেছে, গল্পটির গৌরব এখানেই। কাল যখন নিরবধি, তখন সে মহাকাল অভিধা পায়। মহাকালের বুকেই দেখা দেয় এক একটি কাল। মানুষ, তার সভ্যতা, সমাজ এক একটি কালসীমার বিষয় মাত্র। মানুষের জীবনে এমন সময় বা কাল বড় নির্মম। সে যেমন মহাকালের কাছে বাঁধা, মানুষও তেমনি তার বাসনা-কামনা নিয়ে কালের বুকে লক্ষ্যহীন, মাপা। কালের নির্মম স্বভাব কোনো মানুষেরই লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিতে চায় না, পারেও না। আমরা কোনো কিছুই সমাপ্ত করে যেতে পারি না! এমন অসমাপ্ত থাকাটাই আমাদের জীবনের জন্মমুহূর্ত থেকে বিধাতার উল্কি-আঁকা নির্দেশ। ভণ্ডুলমামার বাড়ি সম্পূর্ণ করার যে নিষ্ফল, অসম্পূর্ণ বাসনা, তা-ই আমাদের বোঝায়। এমন তত্ত্বকথা ভণ্ডুলমামার কাজে, অবিনাশবাবুর সহমর্মী টীকাভাষ্যে আমরা বুঝে নিই। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য নিহিত আছে তত্ত্ব জীবন্ত হয়ে ওঠার মধ্যেই। সমরেশ বসু বিভূতিভূষণের উত্তরকালের অনুজ কথাকার। তাঁর 'কিমলিস' নামক গল্পে বেচনের যে সাচ্চা কমিউনিস্ট হয়ে ওঠা এবং তার সমস্ত সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে যে কমিউনিজ্‌মের তত্ত্বের যথার্থ সংজ্ঞা নির্মিত হওয়া—তা একমাত্র চরিত্রন্যায়েই উঠে আসে, লেখকের বানানো বা উদ্দেশ্যমূলকতাকে কোথাও এতটুকুও মনে করায় না! ঠিক তেমনি 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের যে বিরাট জীবনদর্শনের মূল্যবান শাশ্বত সত্যের তত্ত্বরূপ, তা-ও গল্পের স্বাভাবিকত্ব থেকে তৈরি হওয়া অসামান্য ফল। এখানেই গল্পটির তুলনারহিত শিল্পমূল্য। গল্পের ভাবসত্য গল্পকারের স্বাভাবিক লেখার গুণে যে তার কারুকর্মকেও প্রভাবিত করে, তাকে অতিক্রম করার পরে এক সর্বকালিক সর্বমানবিক জীবনদর্শনকে সামনে আনতে

পারে, ভণ্ডুলমামার বাড়ি সেই শিল্পরূপের নিশ্চিত এক দলিল যেন। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সাহিত্যেও নয়, আন্তর্জাতিক সাহিত্য-মানে সারা বিশ্বসাহিত্যে বিভূতিভূষণের 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটি স্ব-মুকুট শ্রেষ্ঠ গল্পের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য!

চার

গল্পটির প্রকাশভঙ্গিতে বিভূতিভূষণ যেমন সহজ সরল কথাকারের ভূমিকায় থেকেছেন, তেমনি তার মধ্যে জীবনের গভীরে ডুব দেওয়ার মতো প্রাজ্ঞ হতে পেরেছেন আপন স্বভাববৈশিষ্ট্যে। গল্পে বিবৃতিমূলকতা আছে, তা গৌণ, কিন্তু তারই মধ্যে ইঙ্গিত-ধর্মকে(Suggestiveness) রাখতে ভোলেননি। আমরা আগেও বলেছি, 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির আরম্ভ ও শেষের বন্ধনে একটি নিটোল বৃত্তের সম্পূর্ণতা আছে। প্রথম দিকে দেবলহাটি গ্রামের মাইনর স্কুলের প্রধানশিক্ষক অবিনাশবাবুর স্বভাবটি বুঝিয়ে দিয়েছে ইনস্পেক্টর তাঁর সঙ্গে সান্ধ্য গল্পের আসরে বসে। গল্পের শেষে সেই অবিনাশবাবুর বিস্ময় দিয়ে পরিণামচিত্রের ব্যঞ্জনা! প্রথম ও শেষের এমন বন্ধন শিল্পের সার্থকতা প্রমাণ করে।

বিভূতিভূষণ তিনটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব দিয়ে গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন। কিন্তু গল্পের কথকই অপর দুই প্রধান ব্যক্তিত্বের যোজক চরিত্র। গল্পের মধ্যে গল্প যোগ করেছেন বিভূতিভূষণ। গল্পের জটিলতায় তা-ই চমৎকারিত্ব আনে। গল্পের মূল কথক উত্তমপুরুষে বলে অবিনাশবাবুর কথা, আবার অবিনাশবাবু বলেন ভণ্ডুলমামার কথা, আসলে তা-ও গল্পের মূল কথক আমাদেরই শোনায়। সুতরাং গল্পের মধ্যে যে জটিলতার জাল—তা লেখকেরই অভিনব বলার রীতির অনুপন্থী শিল্পকৌশল।

গল্পটি পাঠ করতে করতে স্বভাবী পাঠক সহজেই সবকিছু ত্যাগ করে অবিনাশবাবুর কথায় ভণ্ডুলমামার সঙ্গী হয়ে যায়, তার নিষ্ফল প্রয়াসের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। গল্পের আরম্ভ কার্তিক মাসের শেষের এক হেমন্ত-সন্ধ্যায়। কিন্তু অবিনাশবাবুর গল্প এমন ভাবে উপস্থাপিত, পাঠক বাস্তব জগৎ থেকে যেন বা কোনো ভণ্ডুলমামার জগতে চলে যায়। একসময়ে অবিনাশবাবুর শেষতম জিজ্ঞাসার সঙ্গে নিজেদের জিজ্ঞাসাকেও এক করে ফেলে। এই যে বাস্তব পৃথিবী থেকে সরে গিয়ে এক রোমান্টিক উপলব্ধির জগতে, কখনো বা নস্ট্যালজিয়ায় সহমর্মী হয়ে ওঠার দিক ঘটে, তা থেকে গল্পকার সেই ইনস্পেক্টরের বর্ণনা মতো পাঠকদের আবার বাস্তবে নিয়ে আসে শিল্পের ন্যায়েই। গল্পের শেষতম বাক্যটি তাই—'অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।' এমন যে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন তা গল্পের চমক নয়, রুদ্ধশ্বাস কল্পলোক থেকে বৈপরীত্যে বাস্তবে প্রত্যাবর্তনে শিল্পের চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস। এই কৌশল গল্পকারের প্রকরণগত সার্থক প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যই।

বিভূতিভূষণের ভাষায় যে সহজতা, সারল্য, অকপটতা—তা এ গল্পে দুর্লক্ষ্য নয়। তিনি এ গল্পে অবলীলায় অন্তরঙ্গ হতে পেরেছেন। একজন শিশু, কিশোরের যে রোমান্টিক মন, একজন শিক্ষিত যুবকের যে অভিজ্ঞ মনের প্রয়াস ও মনস্তত্ত্ব, একজন মধ্যবয়সীর নস্ট্যালজিয়া—সমস্তই মনস্তত্ত্বের সৌন্দর্যে গল্পে বিম্বিত। আবার অবিনাশবাবুর

মধ্যবয়সের যে গভীর গাঢ় উপলব্ধির ভাষা—তা মনস্তত্ত্বের সীমা অতিক্রম করে উপলব্ধিজাত বড় দর্শনের অঙ্কশায়ী হয়ে যায়। সেখানে অবিনাশবাবুর নিজ জীবনের সঙ্গে সকল মানুষের জন্মান্তরীণ যোগ-অনুভবে ও তার অসীম-অনন্ত পরিবর্তনের স্বভাবে শুধু চলাই সার হয়ে ওঠার যে প্রকাশ-জনিত ভাষা ব্যবহার, সেখানে গল্পের ভাষা বিস্ময়কর গতি পেয়ে যায়। এই দার্শনিক উপলব্ধির ভাষা সেখানে আবেগাত্মক, তেমনি আবার শেষতম সিদ্ধান্তের জিজ্ঞাসাগুলির গদ্যে আছে বিবেকধর্মী যুক্তি-চিন্তার প্রশ্ন-চিহ্ন। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পে শৈশবের নির্বোধ জিজ্ঞাসা, কৈশোরের কৌতূহল ও অকারণ অন্বেষণ, যৌবনের অভিজ্ঞতার ভার, মধ্যবয়সীর আবেগ ও বিবেকের সহাবস্থান—এসবের প্রত্যেক স্তরের ভাষায় গল্পকার প্রতি প্রসঙ্গেই সেই-সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের চিত্র যথার্থ করেছেন। গল্পের যে স্বচ্ছন্দ গতি, এমন সব ভাব ও ভাষার বিচিত্র তরঙ্গ-বিক্ষেপে তীব্রতা পেয়েছে। তাই 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ স্বতঃস্ফূর্ত ও নিশ্চিত ব্যঙ্গাত্মক। এমন একটি শ্রেষ্ঠগল্পের ভাষা অসীম উপলব্ধির ও কঠিন দার্শনিক সত্যকে যথার্থ ধারণ করার পক্ষে যথোচিত শিল্পধন্য।

পাঁচ

'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির নাম নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এমন নাম একটি শব্দে প্রতীকী হয়নি, একটি বিশেষ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব নির্দেশক নামে সবিশেষ হয়নি, এটি অবশ্যই ব্যাখ্যা করেছে নায়কের desire-কে। নাম অবশ্য ব্যাখ্যার আশ্রয়ে থাকলেও ব্যঞ্জনাকেই লক্ষ্যে রাখে। গল্পের নাম শুধু 'ভণ্ডুলমামা' রাখলে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকত কি শিল্পের দিক থেকে? অথবা, যেখানে অবিনাশবাবুরই দেখা ও বলা সমগ্র গল্পটি, তাই অবিনাশবাবুর দিক থেকে নাম রাখলে কি ক্ষতি হত? আরও, অবিনাশবাবুর বিশেষ উপলব্ধির বিষয়কে একটি শব্দে ব্যঞ্জনায় রাখলে হয়তো আরও মানাত! এমন সব একাধিক যুক্তি 'ভণ্ডুলমামার গল্প' এমন নামের বদলে রাখা যায় বলে কোনো কোনো পাঠক ভাবতেই পারেন। কিন্তু আমাদের মতে, নামের বিচার ওই গল্পকারের দেওয়া বিশেষ নামকে প্রধান করেই ব্যাখ্যা করা শ্রেয়। তাতে বিভ্রান্তি অনেক কমে যাবে শুরুতেই।

গোড়াতেই একটা কথা মনে রাখা দরকার, গল্পের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব—অনিবাশবাবু ও ভণ্ডুলমামা—দুজনেরই মামার বাড়ির কথাকেই কাহিনী-কেন্দ্রে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অবিনাশবাবুর মামার বাড়ি যে গ্রামে, ভণ্ডুলমামা— যদিও প্রতিবেশী হওয়ার সূত্রে 'মামা' সম্পর্কিত—তবু তার কোঠা বাড়ি নির্মাণের চেষ্টাও মামার বাড়ির গ্রামে। দুই চরিত্রের প্রত্যেকের গ্রাম-সূত্রে সম্পর্কের সাদৃশ্য ভাববার বিষয়। মামার বাড়ি মানেই প্রত্যেকের মায়ের সূত্রে যোগ! যে মা আমাদের জন্মদাত্রী, সেই মায়ের আবাসস্থল ও আশ্রয়ভূমির প্রতি এক রক্তের সম্পর্কে আকর্ষণ থাকেই, সে আকর্ষণ যেমন গভীর, তেমনি নাড়ীর যোগে বিশিষ্ট। অবিনাশবাবুর যে মামার বাড়ির জন্য দুঃখবোধ, ভণ্ডুলমামার যে মামার বাড়িতেই জমি কিনে বাড়ি বানানোর বাসনা—কোথায় যেন দুই ব্যক্তিত্বকে এক সূত্রে ধরে রাখে ব্যঞ্জনায়।

অবিনাশবাবু যখন গল্প শুরু করেন ইনস্পেক্টরের কাছে, শুরুতে তাঁর মামার বাড়ি নিয়ে একটা রহস্য তৈরি করে রাখেন:

'—হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'ছিল' কেন? এখন নেই?

—সে কথা পরে বলচি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।'

এই যে মামার বাড়ি নিয়ে গল্পের শুরুতেই একজাতীয় প্রস্তাবনার মতো রহস্যের ব্যঞ্জনা, তা গল্পনাম ও অবিনাশবাবুর চরিত্র এবং তাঁর বলার কাহিনীকে ভিন্ন মাত্রা দেয়।

অন্যদিকে ভণ্ডুলমামার গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক কিরকম? আট বছর বয়সে মামার বাড়িতে এসে গ্রামের এক বনজঙ্গলের মধ্যে গাঁথা হতে থাকা কোঠাবাড়ি দেখে অবিনাশবাবু দিদিমার কাছে গভীর কৌতূহলে তাঁর জিজ্ঞাসার যে জবাব পান, তা এই রকম:

'.... ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?.....

—ভণ্ডুল রেলে চাকরী করে, লালমনিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকত, বাড়িঘর ছিল না। ও-পাড়ার মুখুজ্যে বাড়ির ভাগ্নে, এখন চাকরিবাকরি করচে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই।'

এই হল ভণ্ডুলমামার সঙ্গে অবিনাশবাবুর গ্রামের সম্পর্ক। ভণ্ডুলমামার সম্পর্ক বাইরের অর্থে অস্থায়ী, মামার বাড়ি মানুষ, প্রতিপালিত, অবিনাশবাবুর এর সঙ্গে মৃত্তিকা সূত্রে যোগ।

কিন্তু দুজনের যে যোগ, তার বিয়োগ ঘটেছে দুভাবে। একদিন অবিনাশবাবুর মামারা চলে আসে কলকাতায়। গ্রামের জীবন থেকে ছিন্ন হয়ে যায় অবিনাশবাবুর সম্পর্ক। আবার যে গ্রামে ভণ্ডুলমামার প্রতিপালিত হওয়া কিছু কাল থেকে, সেই গ্রামের স্থায়ী শিকড়ের মতো সম্পর্ক করে ভণ্ডুলমামা কোঠাবাড়ি নির্মাণ করে। এমন দুই ব্যক্তির মামার বাড়ির যোগ দু'ভাবে ঘটেছে। সবার ওপরে অবিনাশবাবুর নিজস্ব Sentiment যুক্ত হয়েছে ভণ্ডুলমামার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে। মামারা চলে এসেছে কলকাতায় ঠিকই, কিন্তু ভণ্ডুলমামার কোঠাবাড়ির সূত্রে এক রোমান্টিক যোগ ছিল অবিনাশবাবুর। এ যোগ ভণ্ডুলমামার স্বভাবের সঙ্গে অবিনাশবাবুর মিল থাকার কারণেই। তাই ভণ্ডুলমামার মৃত্যু ও কোঠাবাড়ি অসমাপ্ত থাকা, আর অবিনাশবাবুর এক প্রতিবাদহীন, উচ্চাশাহীন, বিষয়-আসক্তিহীন স্বভাবে জীবন অতিবাহন—দুয়ের যোগে গল্পটির নামে ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে।

ভণ্ডুলমামার 'ভণ্ডুল' এমন নামেই বুঝিবা তার ভাগ্যের পরিহাস। 'ভণ্ডুল' শব্দের অর্থ যে কোনো কাজে সিদ্ধ না হওয়া, গোলমাল হয়ে যাওয়া! ভণ্ডুলমামার বাড়িটি কোনোদিন হল না সম্পূর্ণ, কেউ সে বাড়িতে বাস করল না— এই যে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার, স্বপ্নের, আদর্শের, বাসনা-কামনার নিষ্ফলত্ব, মনে হল অলক্ষ্যে তার পিতৃদত্ত নামের তাৎপর্যগত পরিহাসেরই পরিণামী রূপ। তাই 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' নামে গল্পের পরিণতি নির্দেশক এক সহজ ব্যাখ্যা রাখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গল্পের কাহিনীবৃত্ত ধরে রাখতে আমাদের আপত্তি থাকে না।

ভণ্ডুলমামার গল্প বলেছেন অবিনাশবাবু। তাঁর বলা গল্পেই গল্প শেষ। অবিনাশবাবুর যে লক্ষ্য—অসম্পূর্ণ কোঠাবাড়ি এবং যে কোঠাবাড়ি ভণ্ডুলমামার জীবনের অপূর্ণতার কথাকে সত্য করে, তা-ই গল্পের আদ্যন্ত নিবিড় যুক্ত থাকায় গল্পের এমন নাম সাধারণ অর্থে মান্য হয়। অবশ্যই এ ব্যাখ্যা সাধারণ অর্থটুকুই বোঝায়।

তৃতীয় ব্যাখ্যা হল, 'বাড়িটি একটি প্রতীক মাত্র—যা পাঠকদের লক্ষ্য, আদর্শ, স্বপ্নকে ব্যঞ্জনা দেয়। প্রত্যেকটি মানুষেরই, বিষয়ী মানুষের বিশেষত, সংসার জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যে স্বপ্ন থাকে। সংসারকে সচ্ছল করার, পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ওই বাসনা থাকে। ভণ্ডুলমামার বাড়িটি তা-ই। কিন্তু সে স্বপ্ন, সে আশা কখনও পরিপূর্ণতা পায় না মানসিক দিক থেকে। জীবনের, জগতের, মহাকালের সঙ্গে যোগে তার এমন অসম্পূর্ণ নিয়তি-নির্দেশ। আমরা কেউই ঠিকঠাক থেকে জীবন কাটাতে পারি না, চরিতার্থতা লাভ করতে পারি না। জন্ম-জন্মান্তরে এই অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। তাই অবিনাশবাবুর গভীর উপলব্ধিতে যে দার্শনিক assessment, তা-ই গল্পের মূল সত্য :

> 'আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠচে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে..... যেন অনাদিকাল, অনাদি যুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর একখানি উঠচে...... আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে ...... ওরও বুঝি আদি নেই, অন্তও নেই।'

এই উপলব্ধি জাত টীকাভাষ্যে গল্পের নাম সার্থক হয়ে ওঠে। সেখানে অন্য কোনো নাম বড় শিল্পের, গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সমর্থন পাবে না।

গল্পনামের শিল্পগত তাৎপর্যের চতুর্থ একটি ব্যাখ্যা রাখা যায়। গল্পের শুরুতে অবিনাশবাবু মূল উত্তমপুরুষ কথককে জানান, মামার বাড়ির গ্রামের সঙ্গে আগে সম্পর্ক 'ছিল', এখন নেই। কিন্তু 'কেন যে নেই, তার সঙ্গে গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।'—এই যে বক্তব্য, তা নামের ব্যাখ্যাকে আর এক মাত্রা দেয় লক্ষণীয়ভাবে। ভণ্ডুলমামার বাড়ি তৈরির গল্পটি আদ্যন্ত বলেছেন অবিনাশবাবু এবং সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহেই :

> 'মুড়ি আনুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইনস্পেক্টরবাবু এই রকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে।'

আবার গল্পের শেষ টেনেছেন অবিনাশবাবু গল্পের সঙ্গে নিজেরই বক্তব্য যোগ করে:

> 'আমার জীবনেব সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল, সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। এমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েচে।
>
> বিশেষ করে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্যে যে, পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।'

পরিষ্কার বোঝা যায়, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে ও তার বাড়ির সঙ্গে নিজের একটা আত্মিক যোগ আছে বলেই অবিনাশবাবু বিস্তারিতভাবে এবং গভীর অন্তরঙ্গতায় গল্পটি বলেছেন। আমরা আগেই দেখিয়েছি, ভণ্ডুলমামা ও তার বাড়ির সঙ্গে অবিনাশবাবুর ব্যক্তিগত জীবন স্বভাব ও ভাগ্যের সূক্ষ্ম প্রতীকী যোগের দিক। তিনি যেভাবে ভণ্ডুলমামার বাড়ির দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যেও অবিনাশবাবুর সঙ্গে বাড়ি ও ভণ্ডুলমামার গভীর নিবিড় আত্মীয়তা ধরা পড়ে। অর্থাৎ ভণ্ডুলমামা এক অর্থে বক্তা অবিনাশবাবুর self-projection। সেই বাড়ির মধ্যে নিজ জীবনের তথা বিশ্বসত্যের মৌল দিক অনুভব করেছেন অবিনাশবাবু। ভণ্ডুলমামার প্রয়াসের, কামনা-বাসনার নিষ্ফলত্ব, অসম্পূর্ণতা অবিনাশবাবুর অতি সাধারণ জীবনযাপন ও বিষয়াসক্তিহীন গ্রামীণ শিক্ষকতার জীবনচর্যা একই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির এপিঠ-ওপিঠ। তাই 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' আসলে অবিনাশবাবুর desire। ছোটবেলা থেকেই শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে যে মধ্যবয়সে আসা—সমস্ত স্তরে ভণ্ডুলমামাই তার প্রচ্ছন্ন, গূঢ় নিয়ন্ত্রক শক্তি। ভণ্ডুলমামার পরোক্ষ শিক্ষা তারই স্বভাবের বিশ্বাস ও নিয়ন্ত্রক। সুতরাং গল্পনাম যে 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি', তা প্রতীকী অর্থে অবিনাশবাবুরও জীবন স্বভাবেব আয়না। তাই এই একটিমাত্র নামেই দুই ব্যক্তিত্বের যোগ থাকায় নাম অবশ্য বড় ব্যঞ্জনা পায়।

৬.

বুধীর বাড়ি ফেরা

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম গল্প সংকলন 'কিন্নরদল' গ্রন্থটির মোট সংকলিত এগারোটি গল্পের মধ্যে 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটির স্থান অষ্টম গল্প হিসেবে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল তেরশো পঁয়তাল্লিশের কার্তিক, ইংরেজি উনিশশো আটত্রিশ। এমন গ্রন্থভুক্ত হওয়ার পরেও গল্পটি বিখ্যাত 'কথাশিল্প' উনিশশো ছেচল্লিশের, বাংলা তেরোশো তিপ্পান্ন সালের সংকলনে নির্বাচিত হয়। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটি মূলত বুধী নামের এক গৃহপালিত গাভীর কসাইখানার মৃত্যু-ভয়, কসাইখানা থেকে পলায়নে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দের উজ্জ্বল অভিজ্ঞতার সঙ্গে একসময়ে নিজের পালকদের আশ্রয়ে ফিরে আসার কাহিনী। পশুদের এমন জীবন-স্বভাব-নির্ভর গল্প বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যে একাধিক লেখা হয়েছে। লিখেছেন 'মহেশ' গল্পনামে শরৎচন্দ্র, 'আদরিণী' নামে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'লম্বকর্ণ' নামে পরশুরাম প্রমুখ। বিভূতিভূষণের সমকালের লেখক তারাশঙ্করও 'কামধেনু', 'কালাপাহাড়' নামে পশুনির্ভর গল্প লিখে গেছেন।

একান্তভাবেই পশুনির্ভর গল্প রচনা কঠিন। কারণ পশুরা মূক প্রাণী, তাদের বোবা ভাষা, বোবা আনন্দ, সুখ, কান্না বোঝা দুরূহ। সাহিত্যিকরা আপন কল্পনায় সেই সব বিষয়কে গল্পে রূপ দিতেই পারেন। কুকুর মানুষের ভাষাকে, এমন কি কিছু কিছু পাখিও মানুষের স্বর, কথাকে দ্রুত বুঝে নিতে পারে। তাই কুকুররা সহজেই মানুষের পালিত হয়ে

যায়। পাখিও মানুষের শখের পোষা হয়ে উঠতে পারে। বিভূতিভূষণের বুধী গাভীও সেইরকম এক গৃহপালিত পশু যে আমাদের আলোচ্য গল্পটির একমাত্র চরিত্র এবং লেখকের লক্ষ্যও।

কিন্তু 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পে বুধীর যেসব তৎপরতা, বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগ ও বিস্তার, তা পশুর স্বভাব থেকে বরং পশুর সঙ্গে মানুষের রূপক ধর্মকেই বেশি সামনে আনে। গল্পে বুধী সবটাই মানুষের চেতন-অচেতন লোক, মনস্তত্ত্ব—এসবের পরিচয় দিয়েছে। দেখা গেছে, বোবা মানুষরা বেশি স্পর্শকাতর (sensitive) হয়। তারা সহজেই পরিবেশের সঙ্গী-সাথীদের সাহচর্যে বেশি নড়েচড়ে ওঠে। বুধীকে যদি কোনো মূক মাতৃজাতীয় রমণী ভাবা যায়, তা হলে চিরন্তন মানুষের মৃত্যুভয় ও মুক্তিবাসনা গল্পটির সর্বাবয়ব তাৎপর্যে চমৎকার মিলে যায়।

কিন্তু একথাও ঠিক, মূক প্রাণীরা আপন বোধবুদ্ধিতে আদিম স্বভাবটুকু নিশ্চিত জীবন পরম্পরায় বজায় রাখে। তাদের যা কিছু সক্রিয়তা জীবনধারণের উপযোগী, তা তাদের জন্মসূত্রেই পাওয়া। তারা তা বদলাতে পারে না। অবশ্যই সেই পাওয়ার মধ্যেই আছে তাদের সীমা। তারাও আনন্দ পায়, সুখী হয়, কষ্ট পায়, ভয়ও পায় শিকারি, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের। তাদের থেকে পালাতেও সক্ষম হয়। কিন্তু এ সবের নির্দিষ্ট সীমা আছে। মানুষ তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের নিয়ে যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁরা এই অকৃত্রিম, আদিম মূক প্রাণীদের স্বভাবে বাড়তি মাত্রা যোগ করেন, মানুষের স্বভাব আরোপ করেন শিল্পের চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পে বুধী গাভীটির শিল্পীর হাতে ঘটেছে নবজন্ম। তাতে বুধীর কোনো কৃতিত্ব নেই, কৃতিত্ব শিল্পীর। তাই বুধী গাভীটি অবশ্যই রূপক, কিন্তু বিভূতিভূষণের কলমে সেই রূপকের মধ্যে পশুপ্রাণের কিছু স্বাভাবিক দিকও যুক্ত হয়েছে। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটিকে তাই জনৈক সমালোচক কথিত 'পশুভূমিক গল্প' না বলে বরং রূপকাশ্রিত চিরন্তন মানবপ্রাণের গল্প বলাই শ্রেয় বলে আমরা মনে করি। লেখকের জীবনদর্শন-এর সঙ্গে আদ্যন্ত জড়িত বলেই পশুনির্ভর গল্প থেকে ঘটেছে বড় জায়গায় উত্তরণ। বুধীকে দেখে কেবলমাত্র একটা পশু বলে মনে হয় না! নিশ্চয়ই পশুর ভয়, ভালবাসা, মুক্তি-পিপাসা, সুখ সবই আছে, কিন্তু তাতে পশুর প্রতি করুণা জাগে, জাগায় মানব প্রাণের বড় দিক। এখানেই 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটির স্তরের বদল ঘটে যায়।

'বুধীব বাড়ি ফেরা' গল্পের কাহিনী অংশ সামান্যই। প্লটে কোনো জটিলতা নেই। একটি প্রাণীর মৃত্যুভয়, তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চতুষ্পার্শ্বের নানান মানুষ ও পশুর সাহচর্য জনিত অভিজ্ঞতার ফসল নিয়ে নিজের পরিচিত আশ্রয়ে শেষে ফিরে-আসা ও শান্তির জীবনে আকর্ষণ বোধ-করা। এই বিষয়গুলিকেই বিভূতিভূষণ কাহিনী বিন্যাসে ও প্লট হয়ে ওঠার উপযোগী কয়েকটি ছোট-ছোট ঘটনার সূত্রে বিন্যস্ত করেছেন।

বুধী একটি প্রৌঢ় গাভী, সাত-আটটি সন্তানের জননী। যে বাড়িতে সে প্রতিপালিত, সেই বাড়ির লোক একদিন এক গো-ব্যবসায়ীর কাছে তাকে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সেই গো-

ব্যবসায়ী চালানে পালে তাকে না বিক্রি করে কলকাতার কসাইখানায় বিক্রি করে দেয়। এসব বুধীর জানার বা বোঝার কথা নয়। কসাইখানায় গিয়ে বুধীর যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং দুঃখজনক। সে সেই কসাইখানায় বহু গরুর ভিড়ে, ঠেলাঠেলির মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করে। এমন অনভ্যাস অবাঞ্ছিত জীবনে তার একের পর এক অভিজ্ঞতা তাকে রীতিমতো ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। সে লক্ষ করে, তার চারপাশের নোংরা পরিবেশে গরুগুলির মধ্যে থেকে দুজন লোক বিশেষ স্ট্যাম্প মেরে চিহ্নিত করে রেখে একসময় আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর তারা কোনোদিন ফেরে না। চারপাশের বিকট শব্দ যেমন তাকে ভয় দেখায় তেমনি একসময় যখন নাকে রক্তের গন্ধ আসে তখন সে ভয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। নিজের জীবন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন তার সন্দেহ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখনি সে মরিয়া হয়ে গলায় বাঁধা দড়িকে সজোরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। বেরিয়ে আসে কসাইখানা থেকে বাইরে সকলের অলক্ষ্যে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বুধী নতুন করে যেন মুক্ত জীবনের স্বাদ নেয়। ভয়ঙ্কর ভয় থেকে দূরে সরে যায় দ্রুত দৌড়নোর মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ দু'মাস ধরে বুধী নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেঁচে থাকে। ক্রমশ শীর্ণ হয়ে যায়, ক্লান্ত অবশ হয়। আশাহীনতার মধ্যে আবার আশার রঙিন ফুলও দেখে। কত গ্রাম, মাঠ, ঘাট, মানুষজন, স্বজাতির সংসর্গ, অপরিচিত রাস্তা-ঘাট অতিক্রম করে, কত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উপবাস, কষ্ট, অনিশ্চয়তাকে জয় করে, নদী, সবুজ মাঠ, ফসল পিছনে রেখে একদিন সে তার প্রিয়তম পুরনো আস্তানাটি খুঁজে পায়। তখন সন্ধে হতে দেরি নেই। তার পরিচিত বাড়িটির গাছতলায় ছিল আনারসের জমি, জমিটি বেড়া দিয়ে ঘেরা। বুধী বিপুল আনন্দে ও উৎসাহে সেই বেড়া ভেঙে ছুটতে ছুটতে চলে আসে বাড়ির উঠানে। তার প্রিয় ছোট খুকির নরম কাঁচা দুটি হাতের স্পর্শ ও তার নরম আদরের কণ্ঠেই হয় তার সাদর অভিনন্দনের অভিজ্ঞতা। খুকির ঠাকুমাও সবাক বিস্ময়ে বুধীকে সহমর্মিতায় ও গভীর মানবতার বোধে পালিকার স্নেহার্দ্র দায়িত্বে গোয়ালে তার স্থান করে দেয়। উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় বুধীর চারপাশের কাঙ্ক্ষিত মানবতার পরিবেশটুকু তাকে তার জীবন-বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

> 'কাল সকালে নদীর ধারে তার প্রিয়, পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাইবে। আর একটা সাথী বন্ধু জুটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।'

'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটির কাহিনী-কাঠামো ও প্লট-বৃত্ত একটিমাত্র চরিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সে হল বুধী গাভী। গল্পের কাহিনী-নির্মাণ প্রধানত চরিত্রকেন্দ্রিক। গল্পটির ভাবগত নিষ্পত্তির দিকে দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার হয়, গল্পটি অবশ্যই চরিত্রাত্মক গল্প, কিন্তু চরিত্রে যেহেতু রূপক ধর্মই প্রধান, তাই বুধীর বাড়ি ফেরা চরিত্রনির্ভর রূপকাশ্রয়ী গল্প। রূপকের নির্মোক সরালে স্পষ্ট হয় ছোট ছোট চিত্রে সামাজিক সত্য যেমন, যেমন মনস্তত্ত্বের নানা রং, তেমনি সাংসারিক সত্যও। আর এইসব ছোট ছোট চিত্র মিলে বিভূতিভূষণ এক গভীর জীবনসত্যকে ব্যঞ্জনায় এনেছেন। তা তত্ত্বের আকার পায়নি, পেয়েছে সর্বকালের সর্বদেশের মানবজীবনের মৌল সত্য। যে কেউ এই পৃথিবীতে বাঁচতে

চায়। এই পৃথিবীর নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, এর সুখদুঃখের জীবন স্বভাব বুকে নিয়ে মানুষ মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনের বাঁচার আনন্দ পেতে চায়। জীবনের মূলীভূত সত্য এবং লক্ষ্যও তা-ই। তা কোনো তত্ত্ব নয়, তা জীবন থেকে উঠে আসা সত্য। এই জীবনের শক্তি, তা মহান সৃষ্টিশক্তিরই জন্ম দেওয়া শক্তি। তা জীবনের শক্তি। এই জীবনের শক্তি তার সৃষ্টিশক্তির কাছে বাঁধা। মানুষ জীবনের শক্তিকে আনন্দের মধ্যে ধরতে চায়। জীবনের বন্ধন আছে, কিন্তু তার মুক্তিও আছে। এই যে বন্ধন আর মুক্তির টানাপোড়েন—এটাই জীবনে কাম্য। মৃত্যু সেখানে তুচ্ছ, যদিও মৃত্যু পরিণামে অবধারিত। বুধী সেই মুক্তি ও আনন্দের মধ্যে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখার শক্তি চায়। তার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা প্রাণের স্বাভাবিক বিস্তারই।

এই বক্তব্যটিকে বিভূতিভূষণ যে কাহিনী-কাঠামোয় এনেছেন, তাতে বুধীই একমাত্র এবং প্রধান চরিত্র। বুধীকে কেন্দ্রে রেখে জীবনের তিনটি স্তর কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে রচিত। ১. মৃত্যুভয়ে ভীত এক বদ্ধ জীবন স্বরূপ; ২. এক মুক্ত, আদিগন্ত ঘেরা প্রান্তরের সমস্ত শিকল-ছেঁড়া প্রাণের আনন্দের প্রকাশ-স্বরূপ ৩. শান্তির নীড় গৃহকোণে মানুষের জীবনপ্রাণের গভীর শান্তির দিক এবং সেখানে থেকেই বহির্জীবনের মধ্যে প্রাণকে বিস্তারিত করার বাসনা। এমন তিনটি বিষয় বুধীর কসাইখানা থেকে বেরিয়ে আসা, দু'মাস ধরে মাঠ-ঘাট নদী প্রান্তর চষে ফেলা ও শেষে পুরনো পরিচিত আপন আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তনে চমৎকার ছোট গল্পের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রধর্ম পেয়েছে।

প্লটে জটিলতা নেই, আছে স্তরে স্তরে বুধীর মনোবিশ্লেষণ ও বিস্তার। সাধারণ বিচারে এ গল্পের 'মহামুহূর্ত' কোথায় চিহ্নিত করা যায় সেরকম জিজ্ঞাসা আসেই। আগেই বলেছি, গল্পের ঘটনাক্রমে তিনটি ভাগ—বুধীর কসাইখানা থেকে বেরিয়ে আসার আকস্মিকতা, দু'মাস ধরে শহর থেকে গ্রামের পথ-ঘাট-মাঠ-নদীতীরে ভ্রমণ, পরিচিত জায়গায় সানন্দে প্রত্যাবর্তন। এই তিন ভাগের মধ্যে আমাদের মনে হয়, বুধীর desire-কে মর্যাদা দিলে এর 'মহামুহূর্ত'টি ধরা পড়ে তার গল্পের সর্বশেষ অংশের একটিমাত্র বাক্যে।

> 'বুধী দৌড় দিল; তখন আনন্দে সে জ্ঞানশূন্য।'

বুধীর চরিত্র, মানসিকতা ও মনস্তত্ত্ব ধরলে গল্পের 'চরমক্ষণ'টি এই বাক্যেই সত্য হয়। গল্পের শেষ গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় নির্দেশক। কিন্তু সে ব্যঞ্জনা বড় মনোরম পরিবেশে বুধীর তথা একজন জীবন-প্রেমিকের পিপাসার্ত জীবন-প্রেমই :

> 'কাল সকালে নদীর ধারে তার প্রিয়, পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাইবে।
> আর একটা সাথী বন্ধু জুটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।'

বুধীর চরিত্রের প্রকাশমূলক বৈশিষ্ট্যের যেমন 'মহামুহূর্ত' অংশ চিহ্নিত, তেমনি এর কাহিনী-কাঠামোর তথা প্লট-বৃত্তের সার্থক শিল্প-ভিত্তি সেই একই সূত্রে মান্য!

দুই

আমাদের আলোচনায় গোড়াতেই বুধীর গুরুত্ব মেনে নিয়ে সমগ্র গল্পের ভাবগত একমুখিনতার দিক ব্যাখ্যা করাই যথার্থ। বুধীর সমস্তরকম মানস-তৎপরতা তার মনস্তত্ত্বের

শিল্পরূপ রচনা করে। সমগ্র গল্পটিই যেন একটি বৃহৎ স্বগতোক্তি বা স্বগতভাষণ। কেবল গল্পের প্রথম বাক্যটিই, যা লেখকের বর্ণনার ক্ষুদ্রতম অংশ—গল্পের সূচনা-মুখ:

'ঘোর দুঃস্বপ্ন হইতে বুধী জাগিয়া উঠিল।'

এটি একটি সংবাদের মতো, কিন্তু গল্পের চমক আছে প্রথম বাক্যেই। গল্পের প্রথম কিছুটা অংশে বোঝা যায় না বুধী কে—মানুষ, না পশু! ক্রমশ বোধগম্য হয় সে এক গাভী। তার চিন্তাক্রমেই গল্পে কাঠামো ও গতি। কসাইখানার ভয়ঙ্কর পরিবেশে বুধীর অভিজ্ঞতা তাকে রুদ্ধশ্বাস করে তোলে। সে যখন বোঝে যে তার চারপাশের টাটকা তাজা রক্তের গন্ধের সঙ্গে কঠিন মৃত্যুর যোগ, তখন সে ভয়ে, আতঙ্কে, শিহরনে রুদ্ধশ্বাস হয়ে গলার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে বাইরে চলে আসে। কসাইখানার মধ্যে তার প্রতিপালকদের স্মরণে আসা সেই ছোটখুকির নরম, মধুর, প্রিয়তম সাহচর্যের সুখানুভব, সেই উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে বিচরণের মুক্তি-স্বাদ, সুন্দর পাখিটির তার শিং-এর ওপর বসে তাকে সঙ্গসুখের পরম তৃপ্তিদান—সবই তাকে মনের গভীরে কসাইখানার বদ্ধ জীবনের প্রতি আরও বিরূপতা আনে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রকৃতি ও মানবপ্রেম বুধীর অসহায় জীবনের কাছে হয় বড় আকর্ষণীয় শক্তি।

কসাইখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর বিভূতিভূষণ বুধীর চিন্তায় প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেম এবং সুস্থ আশ্রয়বাসনা ও মৃত্তিকাপ্রেমকেই সত্যরূপ দিয়েছেন। গভীর মনস্তত্ত্বই সেখানে গল্পকারের একমাত্র কৌশল। মুক্ত জীবনে সে তার অতীতের পরিচিত পথেরই সন্ধানী! কারণ তার মুক্ত জীবন-আকাঙ্ক্ষা তখন পূর্ণতা পাবে যখন তা পৃথিবীর মানুষের মানবিক সম্পর্কে, মমত্ববোধে, অন্তরঙ্গ হৃদয় সম্পর্কে যাচাই হবে :

'সে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল—মুক্তি মিথ্যা, এত অপ্রচুর নরম কচি ঘাস মিথ্যা, নীল আকাশের তলায় বড় বড় মাঠের নিরঙ্কুশ, নিরাপদ নির্জনতা আর হু হু উন্মুক্ত হাওয়া সব মিথ্যা—যদি সে তাহার আজন্ম সুপরিচিত সেই গ্রামটিতে না ফিরিতে পারে, ছোট খুকির দুটি ছোট্ট স্নেহ-হস্তের স্পর্শ পুনরায় সে না পায়।'

এমন গভীর চিন্তার মধ্যেই আছে গল্পকারের মৃত্তিকাগন্ধী পরম জীবনপ্রেম, জীবনদর্শন। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পে গল্পকার মূলত মৃত্যুর সামনে জীবনের গৌরব ও অহংকার, তার আবেগময়তা ও সবল শক্তির রক্তিম দিক ঘোষণা করেছেন। গল্পটির এই মৌল ভাব একমুখিন হয়েছে চরিত্রটির একাধিক চিন্তায় ও মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গগুলির সূত্রবদ্ধতায়।

এই সূত্রেই আছে একাধিক ঘটনাচিত্র। একটি ছেলের এক দুপুরে তার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া ও তার মায়ের তাকে অচেনা গরু ভেবে মুক্তি দেওয়া, তার প্রতি তার স্বজাতীয়দের সহানুভূতিহীন আচরণ, দুটি ছোট ছেলে-মেয়ের তাকে দেখে ভয় পাওয়া ও তাকে বিতাড়িত করা, কোনো কোনো পুরুষের তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, বার্ধক্যজনিত করুণ অসহায়তায় নদীর জলটুকু পান করতে গিয়ে কাদার মধ্যে পা ডুবে আটকে যাওয়া ও নৌকার যাত্রী বধূর তার প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো—এই সমস্তই ছোট ছোট ঘটনাচিত্রে এঁকে গল্পকার গল্পে অসামান্য শিল্পের গতি এনেছেন।

আর এসবের মাঝে মাঝেই সুমধুর কোনো বাঁশির সুর শোনার মতো তার সেই ছোট খুকির কথা মনে পড়েছে।

বস্তুত সমগ্র গল্পে ভাববস্তুটি চরিত্রের নিজস্ব চিন্তার সূত্র ধরেই নিটোল গল্পের অবয়বে শিল্প সার্থকতা পেয়েছে। কাহিনী মূল চরিত্রের মনস্তত্ত্বে অবশ্যই সংযত এবং কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর একমাত্র অনুগামী। লক্ষণীয়, গল্পটির মধ্যে কসাইখানার উল্লেখ থাকলেও সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতার সামান্যতম ইঙ্গিতটুকুও নেই। গল্পকারের কাছে মৃত্যুভয়ই একমাত্র লক্ষ্য নয়, তার ক্ষেত্র ও উৎস, তার কোনো সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য থেকে গল্পকার বৃহত্তর মানবতা বোধে ও যুগপৎ জীবন এবং মৃত্তিকাপ্রেমে সহজেই সরে থাকতে পেরেছেন। বুধীর চরম, বিড়ম্বিত জীবন-পরিণতিচিত্র নতুন করে জীবন শুরুর, এক নির্মল, নিরঞ্জন প্রশান্তির:

> 'কাল সকালে নদীর ধারে তার প্রিয়, পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাইবে। আর একটা সাথী বন্ধু জুটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।'

বুধীর হতভাগ্য জীবনের এই যে উত্তরণ তা-ই গল্পের লক্ষ্য, ভাবগত সত্য গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা অবশ্যই তার অনুগ।

তিন

প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পের বিশিষ্টতা লক্ষ করার মতো। গল্পটির গাভীর রূপকের আড়ালে আছে সর্বজনীন মানব প্রাণের মৃত্যুভয়, বাঁচার আর্তি ও নতুন করে বাঁচার শপথগ্রহণ। মূলত তা বলিষ্ঠ জীবনের দিকে ফেরা! বিবৃতি নয়, ইঙ্গিত দিয়েই গল্পকার প্রকাশ-সৌন্দর্যকে স্বাদু, মনোরম করেছেন। বুধীর চিন্তা, স্বগতভাষণ মনস্তত্ত্বসম্মত, তা মানবস্বভাবের। পশুর জীবনেও এই বাঁচার প্রয়াস আছে, বোবা আর্তি আছে, পলায়ন আছে, মুক্তির অভিজ্ঞতাও আছে, কিন্তু তা নির্বোধের, তা ভাবনাচিন্তাহীন আদিম সারল্যে মানানসই। তা তার জীবনধারণের নিয়মমাত্র, জীবনযাপনের অধিগত থেকে জটিল নয়। তাই এ গল্প একটি পশুর নয়, সর্বজনীন মানুষের বেঁচে থাকার যাবতীয় প্রয়াসের যথার্থ তমসুক।

গল্পটির মধ্যেকার ভাষায় আছে একাধিক সিচুয়েশনে নির্মল কৌতুক। এমন সূক্ষ্ম স্বতঃস্ফূর্ত হাসির হীরকখণ্ডগুলি বুধীর মনস্তত্ত্বের বকলমে আছে বলেই গল্প স্বভাবী পাঠকের কাছে উপভোগ্য। বয়সের ভেদ ভাবনায় সংলাপের প্রয়োগরীতির মধ্যে সেই হাস্যরস ধরা পড়ে:

> 'বিলের ধারে আরও কয়েকটি গরু চরিতেছিল।
> একজন বলিল--- এ বুড়ী কোত্থেকে এসে জুটলো হে? একে তো চিনিনে! আর একজন বলিল---চেহারা দেখ না---যে কসাইখানার ফেরতা! হাড়পাঁজরা গুণে নেওয়া যাচ্চে! মরি মরি, কি যে রূপ! বলি, ওগো, তোমার বাড়ি কোথায়?'
> ইহারা বুধীর সন্তানের বয়সী, ইহাদের ফাজলামি তাহার ভাল লাগিল না।'

বুধীর তীব্র আত্মসম্মানবোধ প্রকাশের ভাষায় বিভূতিভূষণ নির্মল প্রসন্ন কৌতুকের আবরণ রেখেছেন:

> 'একটা গরু বলিয়া উঠিল—আস্পর্ধা দেখো না ভিখিরীটার!.....বুধী বড় অপমান বোধ করিল। জগৎটা যে এত খারাপ তাহা সে আগে জানিত না। এতটুকু সহানুভূতি সে স্বজাতীয়ের কাছে আশা করিতে পারে না? আবার ভিখিরী বলিয়া অপমান করা?..... পরের টিটকারী সে সহ্য করিতে পারিবে না—বিশেষতঃ স্বজাতীয়দের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অসহ্য—তার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়াও ভালো।'

জন-মনুষ্যহীন চাঁপাবেড়ের চরে বুধী কাদায় পুঁতে গেলে নিজে আর উঠতে পারে না। তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু নৌকার সেই তরুণী বধূটি তাকে চর থেকে টেনে তুলে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তার জিদেই সে যাত্রা বেঁচে ওঠে বুধী। তাই বধূটির নৌকা চলে গেলে বুধীর অন্তরঙ্গ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে বিশুদ্ধ হিউমার গল্পের গতিই বাড়ায়:

> 'বুধী কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে?
>
> .....ওগো অপরিচিতা, জীবনের বড্ড শেষের দিকে তুমি এলে। তোমার মত মানুষের সঙ্গে যদি আগে দেখা হোত।'

এমন অভিব্যক্তির অকপট ভঙ্গিটি গল্পের প্রকাশরীতির বিশিষ্টতা দেখায়।

গল্পটি বিভূতিভূষণ রচনা করেছেন সাধু গদ্যে। গল্পকারের সাধু গদ্য গল্পের বর্ণনায় যেমন আছে, তেমনি সমস্ত সংলাপেও তা ব্যবহৃত। এই সাধুরীতির প্রচ্ছন্ন চলিত গদ্য স্বভাবের সন্নিহিত থাকে বলেই গদ্য অনাড়ষ্ট, গতিময়। গল্পের টেকনিকের আরও দুটি দিক লক্ষণীয়। গল্পের শুরুতেই বুধীর দুঃস্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। সে দুঃস্বপ্ন ভয়ঙ্কর নির্মম নৃশংস অবস্থার মধ্যে মৃত্যুবরণের। গল্পের শেষে কিন্তু তা অন্য মেরুর আনন্দের মধ্যে যুক্তিকে প্রধান করেছে। দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে সুখস্বপ্নে বিভোর হওয়ার এই দুইমেরুর ভাবগত বন্ধনে গল্পটি থাকায় এর প্রকরণ নিটোল, নিখুঁত। আবার গল্পের প্রথম দিকে বুধী এমন একটি কালের কথা ভেবেছে, যা তার কঠিন ভাগ্যেরই ব্যঙ্গাত্মক ভূমিকা যেন! একসময় বুধীর মাঠে ঘাস খাওয়ার কালে একটি সুন্দর পাখির সঙ্গে শিং নিয়ে ছোট ছোট খেলার সূত্রে মিত্রতার বন্ধন ঘটেছিল। তার প্রতিপালিকা সেই বুড়িটি ঘাস খাওয়ার জন্য মাঠে বেঁধে রেখে যেত, সন্ধেয় তাকে ঘরে নিয়ে যেত সেই বুড়ি। এই মধ্যের অবসরে পাখিটির সঙ্গে তার বন্ধুত্বের আয়াসহীন খেলার ছলে বিস্তার! সেই বন্ধুত্বের স্মৃতি কিন্তু কসাইখানায় বুধীর নিজেরই সাম্প্রতিক জীবনেরই অনুরূপ প্রতীক-প্রতিম ঘটনা:

> 'একদিন সেই মাঠে ফাঁদ পাতিয়া কাহারা পাখী ধরিতে আসিল। পোষা ডাহুকের ডাক শুনিয়া বন্য পাখীরা খাঁচার নিকটে যাইতেই ফাঁদে পড়িয়া গেল। শিকারীরা তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় ছোট পাখিটার কি করুণ আর্তনাদ।'

মুক্ত জীবন থেকে পাখিটির বন্ধ নির্মম জীবনে প্রবেশ বুধীর কসাইখানায় আসার সমতুল। যেন বা বুধীর এমন জীবনভাগ্যের প্রাকভূমিকা এই চিত্রেই ব্যঞ্জনায় আঁকা!

'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে আর একটি শিল্পকৌশল অবলম্বন গল্পটিকে বড় শিল্পমাত্রা দেয়। কসাইখানার মধ্যে যেমন, তেমনি কসাইখানার বাইরে বেরিয়ে এসে বুধী তার দু'মাসের পলায়ন-চিত্রগুলিতে মাঝে মাঝেই সেই খুকির কথা ভেবেছে। তার কোমল নিষ্পাপ কণ্ঠস্বর, তার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, তার হাতের স্পর্শ, তার স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তব-প্রয়োজনহীন মানসিকতা-বোধের আকর্ষণ বারবার অনুভব করেছে। বুধীর এমন একটানা স্মৃতিচারণের মধ্যে খুকির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে ও তার সান্নিধ্য-কামনা বস্তুত গল্পটির মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে মধুর জীবনদায়ী আবহসঙ্গীতের মতো! বাড়ির ছোটখুকির যেন বাড়ির বিধিব্যবস্থার তীব্রতম প্রতিবাদ—যা খুকির মা-ও প্রকারান্তরে বোঝায় বুধীর ফিরে আসার পর:

> 'তোমরা তখন শুনলে না—ভাবলে বুড়ো গরু দুধ তো আর দেবে না—বেচে ফেলে আপদ মিলিয়ে দিই।'

এমন প্রয়োগে বিভূতিভূষণ যথার্থ একজন সচেতন আর্টিস্ট।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রেমিক তাঁর বিশেষ মানসিকতায়। এই গল্পে তিনি প্রকৃতিকে বুধীর ভাবনা দিয়ে নানাখানা করে দেখেছেন, দেখিয়েছেন। এই যে উদার নীল মুক্ত আকাশের নিচে বুধীর দু'মাস ধরে পরিভ্রমণ, তার সঙ্গে নামাবলীর মত জড়ানো আছে প্রকৃতি। কসাইখানার মধ্যেকার ভ্যাপসা গন্ধের পরিবেশে বুধী ভেবেছে তার অতীত মুক্ত-জীবনের প্রকৃতি-পরিবেশের কথা:

> 'বুধীর জীবন কাটিয়াছে এই বিশ্রী জায়গা হইতে বহুদূরে। কত দূর তাহার ঠিক নাই, ... মাঠের ধারে কলস্বনা নদী, নদীর কিনারায় জলের ধার পর্যন্ত নানাজাতীয় ঘাসের ও জলজ শাকের বন—ঠাণ্ডা, নরম, তাজা—কি অপূর্ব তাদের সুগন্ধ। স্বাদ তো আছেই ভাল কিন্তু সেই নতুন-ওঠা বর্ষা-সতেজ কচি ঘাস ও কলমিলতার তাজা গন্ধের কথা যখনই মনে হয় তখন মনে পড়ে এক হাঁটু দীর্ঘ, ঘনশ্যাম তৃণরাজির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া পেট ভরিয়া সে তৃপ্তির ভোজ—'

কসাইখানা থেকে মুক্ত জীবনে আসার পর বুধীর আরও একাধিক প্রত্যক্ষ প্রকৃতি-ভোগের চিত্রে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রাণতার কাব্যিক নিদর্শন মেলে।

চার

'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পের নাম একটি স্পর্শকাতর পশুর স্বভাবের যথার্থ অনুগ এক conditioned refled! গৃহপালিত পশুদের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আছে। তারা মানুষের কাছে, মানুষের সংসারে পালিত হলে এক অদ্ভুত পরিচয়ের প্রামাণ্যে, মায়া-মমতায় জড়িয়ে যায়। গরু, কুকুর, বিড়াল, বানর, হাতি, পাখি, ঘোড়া— এদের স্বভাবে তার পরিচয় আছে। পরশুরাম 'লম্বকর্ণ' গল্পে ছাগলকে দিয়ে সেরকম বৈশিষ্ট্য এঁকেছেন। প্রভু রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সে-ই সে খবর দেয় তার বাড়িতে। তাকে একটা কোথাও ছেড়ে দিয়ে এলে একাই বাড়ি চিনে ফিরে আসে। বিভূতিভূষণের গাভী বুধীর বাড়ি ফেরাও তেমন ঘটনা।

গল্পটির এমন নামের সমর্থনে প্রথম কথা হল, সমগ্র গল্পে কাহিনীর যেটুকু পরিচয়, তাতে পরিষ্কার যে বুধী নামের গাভীটি বাস্তব অর্থেই একদিন তার আগের আশ্রয়ে ফিরে আসে। সে ঠিক বিভ্রান্ত হয়ে, হতাশার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঠিক নিজের পুরনো আশ্রয় চিনে ফেলে, সেখানেই স্থিত হয়। গল্পটি গাভীর মনস্তত্ত্বে বর্ণিত, কিন্তু গাভীর প্রত্যাবর্তন-বর্ণনাই মূল লক্ষ্য। তাই নাম প্রাথমিক অর্থে যথার্থ।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, গল্পের বক্তব্যের দিকে নামের ব্যঙ্গাত্মক বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না। বুধী তার বদ্ধ, ভয়ের, মুমূর্ষুর জীবন থেকে মুমুক্ষুর জীবনে, নতুন করে বাঁচার জীবনে ফিরে এসেছে। তার যে ফেরার কাহিনী, তার প্রথম প্রান্তে মৃত্যুভয়, শেষ প্রান্তে জীবনবরণ। দুই মেরুর বন্ধনেই বুধীর বাড়ি ফেরার সুগভীর তাৎপর্য এবং গল্পের মূল লক্ষ্যও। তাই কেন্দ্রীয় ভাববস্তু ব্যঞ্জনাকে নামে ধরিয়ে দেয় বলেই গল্পনাম শিল্পসম্মত।

তৃতীয় ব্যাখ্যাটি অন্যভাবে রাখা যায়। বুধীর বাড়ি ফেরা সহজে হয়নি। অনেক শ্রম, ঘাম, দুঃখ-কষ্ট, আশা-আশাহীনতার ঢেউ-এ ভাসতে ভাসতে শেষে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং বুধীর যে প্রত্যাবর্তন তা বিশেষ গুরুত্ব পায় পরোক্ষে এমন দু'মাস ধরে একটানা কষ্টের চিত্রে। বুধী সেখানে নিমিত্ত, আসলে তার ফেরার যে যন্ত্রণাময় দিক গল্পের লক্ষ্য সেখানেই স্থির-নিবিষ্ট। সেই সঙ্গে, বুধীর বাড়ি ফেরা শুধু পরিচিত গোয়ালে এসে বাস করা নয়, তার খুকির কাছে ফেরা। যে খুকিটি তার জীবনেব সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা। বৃদ্ধা ঠাকুমা তাকে বিক্রি করে দিতে পারে, কিন্তু তার পরবর্তী দুই 'জেনারেশান' খুকির মা ও খুকি যে তার স্বপক্ষে! সেখানেই তার একমাত্র নিরাপত্তা। বুধী মুক্তজীবনে এসে বহু কষ্টের মধ্যেও ভাবে :

> 'এখন মরিলেও তার দুঃখ নাই—শিয়াল শকুনে তার জীর্ণ দেহকে খাইয়া ফেলিলেও দুঃখ নাই—তবে ছোট্ট খুকীটাকে একবার দেখিয়া সে মরিবে—'

এই যে ভাবনা—প্রকারান্তরে এটা তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ভাবনা! খুকির মার থেকে খুকির কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা অনেক বেশি। তার ফেরা যেন নিজের গোয়াল ঘরটিতে ফেরা, এক তীক্ষ্ণ মিষ্টি ক্ষুদ্র মেয়েলি কণ্ঠের আনন্দ ও বিস্ময়ভরা চিৎকার-এর, খুকির উচ্চকণ্ঠের ঘেরাটোপের মধ্যে ফেরা :

> 'এই তাহার আপনার গৃহ—এখনও তাহার বিশ্বাস হইতেছে না যে সে সত্যিই বাড়ি ফিরিয়াছে। এই তাহার আবাল্য পরিচিত গোহাল, এই সেই বিচালির গাদা, সেইরকম ঘন সাঁজালের ধোঁয়ায় গোহাল অন্ধকার— একটাও মশা নাই, বড় বাছুরটা একপাশে সানি খাইতেছে। খুকীদের রান্নাঘরে খুকীর মা রাঁধিতেছে, খুকীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতেছে।'

প্রতীকী প্রয়োগে গল্পের শেষ, গল্পের নামের তাৎপর্যও প্রতীকের প্রসারিত ব্যঞ্জনায় নিখুঁত শিল্পের মায়া-ধন্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জন্ম: ২৪ অক্টোবর ১৮৯৪

লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর নিজস্ব কথামতো, তাঁর শহরজীবন দেখার অভিজ্ঞতা ছিল রক্ষণশীল পরিবারের পরিবেশে বন্দি থেকে 'জানালা দিয়ে দেখা' শহরসীমায়। তাঁর যাবতীয় লেখায় যে কল্পনার উত্তুঙ্গতা, তা তাঁর অগ্রজ লেখিকাদের লেখা নিয়মিত পড়ার গোপন আগ্রহের লালন-পালনেই! তাঁর রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে ছিল লোহার গারদ ঘেরার মতো শাসন। প্রতিতুলনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণায় একান্নবর্তী পারিবারিক পরিবেশকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাঙালি হয়েও বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রত্যক্ষ অর্থে 'প্রবাসী বাঙালি'। সেই সঙ্গে পারিবারিক জীবন ধারণ ও যাপনের নিপুণ দ্রষ্টা হয়ে ওঠেন তিনি। এমন দ্রষ্টা আর স্রষ্টা মনের যুগ্ম অবয়বে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হয়েছেন বড় অর্থে বাস্তবে ও গভীর প্রেরণায় পরিবার জীবনের কথাকার। এই প্রসঙ্গেই তাঁর পরিবার ভাবনার গুরুত্বের কথায় একটি চিঠির লিখিত মন্তব্য স্মরণ করি : 'যে মন বাংলার খাস বাঙালি জীবন থেকে বৈচিত্র্য আহরণ করতে পারল না, সে এদেরই বিচিত্র জগত নিয়ে রইল পড়ে।' 'এদেরই' বলতে প্রবাস জীবনের পারিবারিক পরিবেশ, সঙ্গী, প্রকৃতি ইত্যাদি।

পরিবার জীবনকে মূলে মনে রেখে বিভূতিভূষণ তাঁর লেখার বিষয়কে যে প্রসারিত করেছেন, তা তাঁর,—'আশাপূর্ণার পরনির্ভর (Dependent) কল্পনার পরাধীনতা ছাড়িয়ে' তাঁকে, অনেক বড় মাপের ভূমিতে মাটির রসের জোগান দিয়েছে। বিভূতিভূষণের কর্মজীবনের অস্থিরতা তাঁকে তাঁর সাহিত্যের বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছে যথেষ্ট। বাঙালি জীবনকে গভীরভাবে না দেখার জন্য কোনো ক্ষোভ ছিল কিনা জানি না, তবে স্বাধীন চিন্তায় তিনি যে আপন কল্পনাকে উদারভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সৃষ্টিকর্মে নিয়ে যেতে পেরেছেন এখানেই তাঁর আপনত্ব, স্বকীয়তা। বিভূতিভূষণের কর্মজীবনের বৈচিত্র্য, নানান সমস্যা, কখনো কখনো বাঁধা চাকরি ছেড়ে নিরঙ্কুশ অবকাশের জীবন গ্রহণ তাঁর সাহিত্যিক কল্পনার মূল্যবান বাস্তব ভিত্তি ও শক্তি দেয়। বিভূতিভূষণ একাধিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, একাধিকবার শিক্ষকতা ছেড়ে গৃহশিক্ষকতায় সময় দিয়েছেন, দ্বারভাঙার রাজা রামেশ্বর সিং-এর সেক্রেটারি হয়েছেন, তাঁর বাড়ির গৃহশিক্ষকও, কখনো বা অলস কারণহীন অবসর তৈরি করে সময়ের মধ্যে মনকে বুঝিবা নতুন কোনো সৃষ্টির উপযোগী শক্তিসঞ্চয়ে আত্মমুখীন থেকেছেন। কাজের অস্থিরতাতেই বিভূতিভূষণ ১৯১৬ থেকে ১৯৪২-এর মধ্যে নিজের অস্থিতচিত্ততায় দ্বারভাঙা থেকে মজঃফরপুর, আবার

মজঃফরপুর ছেড়ে দ্বারভাঙায়, পাণ্ডুলে, পাটনায় একে একে কর্মজীবনের সূত্রে আবাস বদল করেন। এমনটা তো শিল্পীমনেরই বোহেমিয়ানিজম।

একই সঙ্গে গৃহশিক্ষক, স্কুলশিক্ষক, ভ্রমণবিলাসী ও ফুটবল খেলোয়াড় বিভূতিভূষণের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের উন্নত ললাটে অভিজ্ঞান হয় স্থায়ী টিকার মতো কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনী। তাঁর স্থায়ী সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২-এর মধ্য-সময়ে। বিভূতিভূষণ কল্লোলে লিখেছেন, কিন্তু কল্লোলীয় নন কোনোভাবেই। বস্তুত কল্লোলীয় হওয়ার ক্ষমতা ও মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকাল থেকেই ছিলেন কট্টর আদর্শবাদী। ব্যক্তি বিভূতিভূষণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে তাঁর বিশ্বাসে ও ধর্মে সাহিত্যে চলাফেরা শুরু করেন। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্র ভাব-ভাবনার তীব্র প্রতিক্রিয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পরোক্ষ যুদ্ধের ঘুণপোকা স্বভাবে খাঁটি কল্লোলীয় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ যেভাবে নিজেদের ভাঙা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছুটা বিদ্রোহের স্বভাবে যুক্তিসিদ্ধ নতুন কথা বলতে শুরু করেন, তার সমকক্ষ ও সামিল হওয়ার ক্ষমতা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আদৌ ছিল না। কল্লোলে লিখেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকে জীবনকে নিজের করে দেখার উপযোগী জীবনাগ্রহ দিয়ে, জীবনদর্শন দিয়ে কথাসাহিত্যে স্বরাজ্যে-স্বরাট-এর শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সেখানে একেবারেই সীমিত ক্ষমতার লেখক। যথার্থ কল্লোলীয়রা দিক হারাননি শিল্প-ভাবনায়। চতুর্দিকের আক্রমণের মধ্যে থেকে নতুন প্রতিবাদী ভূমিকায় সরব হয়েছিলেন তাঁরা —তা কল্লোলেরই ধর্ম। তার বাইরে থেকে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ — দুই বন্দ্যোপাধ্যায় অ-কল্লোলীয় থেকে নিজস্ব দর্শনের ভাষ্যকার হয়ে নতুন পথ খুঁড়েছেন। তুলনায় প্রবাসী-লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আদৌ প্রতিক্রিয়ার স্বভাবে নতুন কোনো কথা বলেননি। তাঁর কোনো বিশেষ জীবনদর্শন (attitude to life) ছিল না। তথাকথিত বংশগত শুচিতাবোধ, নীতিভাবনা তরুণ তুর্কি কল্লোলীয়দের নতুন ভাবনার শিল্পরূপকে কেউ কেউ 'বিকার' মনে করেছিলেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে একজন শিল্পীর নিরাসক্ত শিল্পভাবনার সীমা এখানেই। কল্লোলীয়দের সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচকের এমন কথা: 'তারা না মানে গৃহশৃঙ্খলা, না জানে নীতিকথা, না শোনে ধর্মোপদেশ'—এমন জীবনগঠনে একটা বিকারের স্পর্শ থাকা স্বাভাবিক' — এই ভ্রান্ত যুক্তিতে নাকি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কল্লোলীয় হননি, আমাদের মতে এই ভাবনা একেবারেই ভুল যুক্তির সিদ্ধান্ত! সমাজ ও মানুষের সমস্ত ভ্রষ্টতার কথা বলে, তার মধ্যে নিবিষ্ট থেকেও যে সমাজের ও মানুষের মঙ্গল করা যায়—শিল্পের এমন মাপজোক অনেকে ভুলে যান। বিভূতিভূষণের কল্পনাময় মানসগঠন ১. আধার করে একান্নবর্তী পরিবার জীবন ও মন, ২. পরিবার জীবন-সম্ভূত নির্যাসের মতো বাৎসল্য রসের উৎসার, ৩. পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত স্বতঃস্ফূর্ত নির্মম কৌতুক ও হাস্যরস, ৪. প্রবাসী বাঙালি লেখকের পক্ষে যথাযথ পরিপার্শ্ব-চিহ্নিত সমাজ চেতনা। রাণুর প্রথম,

দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগের বাৎসল্য রস ও প্রসন্নতা সার্থক উদাহরণ। 'ননীচোরা' গল্প এরই অন্যতম দৃষ্টান্ত। বিভূতিভূষণের ছিল ব্যক্তিগত জীবনে সংসারহীন প্রেমজীবনের বাসনা। একদা তা দিয়েই তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়'র প্রকাশ ঘটে। লেখক প্রবাসী জীবনের পরিবেশে প্রথম লেখেন গল্প। তাঁর সদ্য-তরুণ বয়সে লেখা প্রথম গল্প 'অবিচার' প্রথম কুন্তলীন পুরস্কার পায়। সেকালের কল্লোল, মানসী ও মর্মবাণী, ধ্বনি, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী, উপাসনা, ভারতবর্ষ ইত্যাদিতে নিয়মিত লিখতে থাকেন উত্তরকালে। প্রবাসী পত্রিকার গ্রাহকদের বিচারে বিভূতিভূষণ এককভাবে 'রাণুর প্রথমভাগ' গল্পটির জন্য পুরস্কৃত হন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর একাধিক গল্পে শিশু ও বালকদের স্বভাব ও মনকে বিষয় করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এসব গল্পের মূলে আছে বাৎসল্য রস — পরিবার ও তার নির্যাসের করুণ রস — দুয়ের মিলনে গল্পগুলির স্বাদের স্বাতন্ত্র্য চমৎকৃতি জাগায়। বাস্তব জীবনে বিভূতিভূষণ নিজস্ব সংসার করেননি, একান্নবর্তী পরিবারের আশ্রয়ে থেকে তিনি শিশুদের নিয়ে বুঝিবা এক ধরনের খেলার আনন্দ পেয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যে গদ্যকার চার্লস্‌ ল্যাম্বের রচনা 'Dream Children' লেখার সেই শিশুদের কথা মনে পড়ে, যাদের নিজ কল্পনায় ল্যাম্ব জন্ম দিয়ে নানান কথায় এক অদ্ভুত শিশুমনস্তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বিভূতিভূষণের গল্পগুলির একাধিক চরিত্রের নাম মনে পড়ে — রাণু, পোনু, পীতু, বাদল ইত্যাদি। মিনুর স্বপ্ন, কালোবাজার, অনাচার, বাঘ, গোলাপি রেশম, মাসি, খোকা, লেতিচ্চিৎ —এমন সব নামের গল্পগুলি নতুন নতুন শিশুদের জন্মদাতা বিভূতিভূষণের স্বরাজ্যের খবর দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু যেমন ক্লাসিক মর্যাদায় জীবনের সন্ধিৎসু হয়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শিশুরা সংসার রস ও বাৎসল্য রস —এসবে মাখামাখি হয়ে কখনো কৌতুক কখনো করুণ রসের দিশায় আমাদের টানে। এখানেও লেখকের সীমা স্পষ্টরেখ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বসূরি, সমকাল ও উত্তরসূরি লেখকদের লেখা ভোলেননি। তাঁর গল্পের মধ্যে অনেকেরই ভাবনার সাযুজ্য চোখে পড়ে। 'ননীচোরা' কি প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পের ভক্তির মেজাজে পারিবারিক রসের স্বাদ কিছুটা দেয় না? 'ননীচোরা'র বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য রস ও 'দেবী'র গাঢ় ভক্তিরস গভীরতর শিল্পকৃতিত্বে একই স্বাদের অভিজ্ঞতা আনে না? প্রভাতকুমারের গল্পে যে চরিত্রবিন্যাস, ঘটনার সাজসজ্জা ও সিচুয়েশন সৃষ্টির চমৎকারিত্ব, তা তো বিভূতিভূষণের কোনো কোনো গল্পের প্রকরণে স্পষ্ট ধরা পড়ে! 'বরযাত্রী' ইত্যাদি গল্প তার পক্ষের দৃষ্টান্ত। অবশ্যই এমন পরিচ্ছন্ন কৌতুকরস সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণের প্রতিভা বিস্ময়কর অনন্যতায় অন্য মানে মানী।

বিভূতিভূষণ ছিলেন নিঃসঙ্গ। শিবপুর অঞ্চলের চোদ্দ বছরের এক অচেনা অথচ বাস্তবে দেখা প্রতিবেশী কিশোরীর সঙ্গে মনের অলৌকিক শিহরনের একাকীত্বে বিচ্ছিন্নতার বেদনা চেপে বসে লেখকের মধ্যে। লেখকের চিরন্তন যৌবনকে চিরকালীন

অভাবের অস্বস্তিতে উজ্জ্বল করে রাখে। তা মেশে এক শূন্যতার মধ্যে। কিন্তু তা হারানোর গ্লানি আনে না, তা সাহিত্যে-শিল্পে (নীলাঙ্গুরীয়) মহৎ শিল্পের উদাসীনতায় হীরক-অঙ্গুরীয় হয়। এতেই বিভূতিভূষণের উল্লেখ্য একটি প্রসঙ্গ হয়—পুরুষ-রমণীর রোমান্টিক প্রেম। আর প্রেমের উদ্দীপন বিভাবগুলি কখনো বিমর্ষতাকে তৈরি করেনি, এনেছে কৌতুকহাস্যের নানান রূপ, ডাইমেনশান, কখনো সহজ সরল সরস প্রসন্নতা। শিশুপ্রীতি তাঁর গল্পের আর এক না-ছোড় উপকরণ। মধুর রসের জন্যই তো ননীচোরা, রাণুর প্রথম ভাগ ইত্যাদি এত আপন আমাদের!

ব্যক্তিগত জীবনের নিঃসঙ্গতা আর সমাজজীবনের সখ্যই সারা প্রবাসীজীবনে অন্তরঙ্গতায় দেখা সাধারণ মানুষ নিয়ে জীবনের প্রচণ্ড কলরবকে মিলিয়ে-মিশিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের একটি একক ধারা রচনা করে গেছেন। তা লেখকের শিল্পীমনের একান্ত স্বনির্ভরতার প্রমাণ। তাঁর একাধিক গল্পগ্রন্থ রাণুর প্রথম ভাগ থেকে তৃতীয় ভাগ, বর্ষায়, রাণুর কথামালা, বসন্তে, শারদীয়া, বরযাত্রী, চৈতালী, অতঃ কিম, হৈমন্তী, কায়কল্প, দৈনন্দিন ইত্যাদি—আমাদের আলোচনার মতামতের পক্ষে কঠিন মাটি। বাংলা ভাষায় আজীবন প্রবাসী বাঙালি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নিঃসঙ্গ একক জীবনে বাংলা ও বাঙালির সত্য-স্বভাবে মাটির রসে নতুন স্বাদে ও স্বভাবে আমাদেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন, এখানেই তিনি শুধু প্রবাসী নন, প্রবাস-প্রাণিত নিজ জন্মভূমির কথা-গাথা রচয়িতা শিল্পী।

১.

বরযাত্রী

এক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ নামের একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৪৯ সালে, ইংরেজি ১৯৪২-এ। এই গ্রন্থের নামগল্পটি লেখকের একটি বিখ্যাত গল্প এবং রীতিমতো জনপ্রিয়। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় কৌতুক-রসাত্মক, রঙ্গব্যঙ্গ মূলক শ্রেণী-চিহ্নিত এই গল্পটি অবশ্যই এক লক্ষণীয় সংযোজন। দেখা গেছে ব্যঙ্গরসাত্মক গল্পের প্রধান লক্ষ্য হয় সমাজ, রাজনীতি, কখনো কখনো পুরুষ-রমণীর যৌন সমস্যার জটিলতা। এই ধারার গল্পের মূলে থাকে ক্ষুরধার বক্রতা, চাপা আঘাতের জ্বালা, কিন্তু ‘কোটিং’ হয়ে থাকে হাসির, কৌতুকরসের প্রলেপ। এই সূত্রেই বলা, নিছক কৌতুকরসের গল্পও বাংলা সাহিত্যে কম নয়। ‘অসঙ্গতি’ কৌতুকরস প্রকাশের প্রধান ভিত্তি। ‘বরযাত্রী’ গল্পটি বাঙালি হিন্দু বিবাহরীতির অন্যতম বিষয় বাসরঘরকে কেন্দ্র করে একদল যুবকের আবেগধর্মী চরম কৌতুককর দুরবস্থার অসহায় অপ্রস্তুত হওয়ায় চিত্র সামনে আনে।

গল্পটিতে একই সঙ্গে নির্মল কৌতুক, শ্লেষ ইত্যাদি কৌতুকরসের উপকরণ একত্র সংমিশ্রিত হয়ে অভিনব স্বাদ দেয় পাঠকদের। এর কাহিনী-অংশ সামান্য, অবশ্যই আছে দলবদ্ধভাবে একদল যুবক—যাদের মধ্যে পরস্পরে আছে ঠাট্টা-মশ্‌করার, প্রীতি, সখ্যতা ও অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক, নিবিড়তম বন্ধুত্বের বোঝাপড়া—তাদের—যেনবা এক বন্ধুর বিবাহের রাতে বাসরঘর অভিযানের উত্তাল কৌতুকরস ও বিফলতার সচিত্র রূপ।

গল্পের আদিতে আছে বন্ধু ত্রিলোচনের বিবাহের দিন সন্ধেয় তার বাড়ির একতলায় তার পাঁচ বন্ধু—রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনা এবং গণেশ—এদের জমায়েত, ছোটখাটো আড্ডা ও বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী যাওয়ার আগের তোড়জোড়ের চিত্র। এদের মধ্যে কে. গুপ্ত বিহারী, ছাপরার ছেলে, তার কথায় কিছু দেহাতি টান। গণেশ তোতলা, কিন্তু বর ত্রিলোচনকে বিবাহবাসরের উপযুক্ত ও বিবাহের পরবর্তী পরিবেশে মানানসই করার জন্য নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে। রাজেন কবি, ত্রিলোচনের বিবাহ উপলক্ষে বিয়ের পদ্য লিখে ছেপে বিয়ের যাত্রী হয়েছে। কনের বাড়ি সেগুলি বিলি করতে চায় সে। গোরাচাঁদ বিবাহের দিনের কন্যাপক্ষের বাড়িতে এবং তার আগে বরপক্ষের বাড়িতেও বেশ কিছু মুখরোচক খাদ্য খাওয়ার বিলাসিতায় অস্থির হয়। বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্তর গুছিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-মশ্‌করায় বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যাপক্ষের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে তৈরি হয়।

অন্যদিকে আর একটি দলে সামিল হয় বরের পক্ষের গুরুজন স্থানীয়রা। এদের মধ্যে আছে ত্রিলোচনের বাবা, বরের দুজন মেসোমশাই, সেজ পিসেমশাই, প্রতিবেশী সহায়-রামবাবু, বাড়ির বাঁধা পুরুত নিজে যেতে অক্ষম হওয়ায় যাবে তারই কাকা ন্যায়রত্ন মশাই, আর দীনে নাপিত। এই দলের পুরুতের কাকা বুড়ো ন্যায়রত্ন এক অদ্ভুত মানুষ। তার সম্পর্কে ঘোঁৎনার ভাষ্য: ‘সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার

সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!' মূল বর ত্রিলোচনের সিদ্ধান্ত—অসুবিধে নেই সে ব্যাপারে সামলাবে দীনে নাপিত। সেই সঙ্গে প্রতিবেশী সহায়রাম চাটুজ্জের প্রসঙ্গও ভাবনা আনে, যা রাজেনেব মন্তব্যে মেলে : 'একা দীনে বেটা কজনকে সামলাবে? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্জ্যে যাওয়া মানেই বোতলের শ্রাদ্ধ।' বর ত্রিলোচন স্বয়ং সামলায় ও চিন্তা করতে বারণ করে এই বলে: 'সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই চলে আসবে; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল? দু'পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দু'ডজন চপ-কাটলেট—' এই অবস্থায় বরযাত্রীরা একসময় কন্যাপক্ষের বাড়ি চলে আসে 'কালসিটে গোকুলপুর' গ্রামে।

গ্রাম ডায়মন্ডহারবারের কাছাকাছি, স্টেশন থেকে মাইল তিন-চার দূরে। গ্রামের মূল নাম 'গোকুলপুর', এই গ্রামের লোক এক মাতাল গোরার দলকে বেদম প্রহার করে বলে গ্রামের নাম হয় 'কালসিটে গোকুলপুর', পরে মুখে মুখে হয় শুধু 'কালসিটে' গ্রাম। বিয়েবাড়িটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সব বাড়ি একই রকম দেখতে। ফাঁকা জায়গায় জঙ্গল না থাকলেও আছে জলভর্তি পুকুর-খাল-ডোবা। পুকুরের ঘাটের কাছে জল পরিষ্কার, বাকি সবটাই ঘন সতেজ পানায় ঢাকা। বাড়ির সদরের কাছে বর বসার ছোট শামিয়ানা। সেখানেই বরাসন। বরকে ঘিরে বসে বন্ধুরা। এদিকে প্রায় সকলে মদে অপ্রকৃতিস্থ, মত্ততার ঘোরে উল্টোপাল্টা কথা বলে গ্রামেব লোকদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করে। এর মধ্যে কবি রাজেন তার ছেপে-আনা বিয়ের পদ্য বিলি করতে পারে না ঘোঁৎনার আপত্তিতে। ইতিমধ্যে তিলুর বাবাও মদে বিভোর বেহুঁশ হয়ে গণেশ গোরাচাঁদদের কন্যাপক্ষের বাড়ি খাওয়া-দাওযা করতে বারণ করে ভুল বকার মতো।

এই পরিবেশে একসময় কিছুটা সামাল দিয়ে গণেশ-ঘোঁৎনারা ছাঁদনাতলা ও বাসরঘরের মজার ক্রিয়াকর্ম দেখার তোড়জোড় করে নিঃশব্দে। যেখানে বাসরঘর তার পিছনে স্বাভাবিক রাস্তা নেই। ছাই ময়লা ফেলার স্তূপ, পেঁপে ইত্যাদি গাছ। তা পেরিয়ে গেলে ফাঁকা মাঠ। বাসরঘবের জানালায় যখন বন্ধুরা ভিড় করেছে, কিছু পরে তার পাশের খিড়কি দরজা খুলে কন্যাপক্ষের কাজের লোক বাড়ির নিমন্ত্রিতদের উচ্ছিষ্ট একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গ্লাস বাসরঘরের বাইরে ফেললে অন্ধকারে বন্ধু-দর্শকদের মাথায় কাঁধে পিঠে তা আছড়ে পড়ে। তারপর তাদের 'ডাকাত ডাকাত' চিৎকারে দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিলুর বন্ধুরা প্রথমে হয় হতভম্ব। সদরের দিকে নয়, কে. গুপ্ত যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই পালায়। ঘোঁৎনা পালাতে গিয়ে পেঁপে গাছে ধাক্কা খেয়ে গাছে উঠে যায়। গণেশ গোরাচাঁদের কোমরের চাদরটা ছিনিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে দৌড় দেয়। রাজেনও লাফিয়ে গণেশদের সঙ্গে দেয় দৌড়। শেষে সামনে জমি একটু নেমে যাওয়া ফাঁকা মাঠ ভেবে দৌড়তে গিয়ে পানাভর্তি পুকুরের জলে ঝাঁপায়।

কন্যাপক্ষের বাড়ির লোকদের ডাকাতের ভয় ও চিৎকার, গ্রামের লোকদের তটস্থ হওয়া, তিলুর বন্ধুদের চরম অপ্রস্তুত অবস্থা, মেয়ের কাকা ভজুদার শাসানি ও দাবড়ানি, বন্দুক নিয়ে প্রতিবেশীদের ঘোরাফেরার তুমুল কাণ্ডের মধ্যে একসময়ে গণেশরা সত্যিই

চিহ্নিত হয় বরের বন্ধু হিসেবে। বাসরঘর থেকে বেরিয়ে এসে শ্বশুরের সঙ্গে তিলুই প্রায় আসন্ন বিপদ ও লজ্জা থেকে অসহায় বন্ধুদের বাঁচায়। কন্যাপক্ষের সন্দেহ কেটে যাবার পর তাঁদের জন্যে দ্রুত তিনখানা শুকনো কাপড়, জামা, র‍্যাপার আনার কথা বলে কন্যাপক্ষের লোক। চা-খাওয়ানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থাও নিতে বলে। গল্পের শেষতম চিত্র সংক্ষিপ্ত এবং শ্লেষাত্মক :

> 'কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ। একটু মিষ্টি ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।'

'বরযাত্রী' গল্পে টানা কোনো কাহিনী নেই, নেই বিশেষ কোনো নায়ক বা নায়িকার আশ্রয়ে গড়ে-ওঠা প্লটের জটিলতা। লেখক বিশেষ কয়েকটি ঘটনার খণ্ড ভাষাচিত্র এঁকে তাদের সমবায়ে গল্পের মূল বিষয়কে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। গল্পটি মোট চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা। প্রথমভাগে বিবাহ উপলক্ষে বরের বন্ধুদের প্রস্তুতিপর্ব, দ্বিতীয়ভাগে কন্যাপক্ষের বাড়ি গিয়ে বরপক্ষের মদ্যপ কর্তাব্যক্তি ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের গোপন তৎপরতা, তৃতীয়ভাগে বন্ধুদের তিলুর বাসরঘর দর্শনে সেইদিকে নিঃশব্দ যাত্রার তোড়জোড়, শেষভাগে বরের বন্ধুদের চরম দুর্গতি ও হেনস্থার চিত্র। মুক্ত অট্টহাস্যের মধ্যেই গল্পের শেষ।

গল্পটি যেহেতু একদল যুবকের সংঘবদ্ধভাবে বিশেষ লঘু বাসনাব পরিতৃপ্তি সাধনের সক্রিয়তা ও নিষ্ফলত্ব দেখানো, লাঞ্ছনার আঘাতে দুর্গতি ও অসহায়তা অঙ্কন, তাই গল্পে এক নায়ক বা নায়িকা অনুপস্থিত। প্লটে কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অনুপস্থিত, আসলে পূর্বসূরি প্রভাতকুমারের গল্পের মতো চরিত্রদের ধরে জরুরি ঘটনার উপস্থাপন, সিচুয়েশন তৈরির কৌশলগত চমৎকৃতি সৃষ্টি, যে ঘটনা প্রত্যাশিত নয় তাকে বিশ্বাস্য করার টেকনিক—সে সবই ক্রমশ গড়ে ওঠা প্লটের জটকে দুর্ভেদ্য করে। গল্পের চরিত্রগুলি ভেবেছিল বাসরঘরে বর তিলুর ভয়, উদ্বেগ আড়ষ্টতায় পরিবেশের চাপ এক মেলোড্রামার দিক দেখাবে, কিন্তু তার পিঠ গেছে উলটে,- আসলে বরযাত্রীরাই বরের থেকে চরম কৌতুকের, হাস্যকর অপ্রস্তুত অবস্থার শিকার হয়েছে। তিলু কিন্তু স্থির, অনেকটাই স্থিতধী এমন অল্পকষায় কৌতুকরসে সিক্ত বাসরঘরের স্নায়ুচাপে যুক্ত থেকে!

গল্পের শুরুতেই ধরা পড়ে, বাসরঘরই গল্পের প্লটের কেন্দ্রস্থ লক্ষ্য। বন্ধুদের সমবায়িক ও যৌথ উদ্দেশ্য সমগ্র গল্পে সেই লক্ষ্যের দিকে যখন ধাবিত, তখন কোনো ব্যক্তিচরিত্র নয়, এক যুবগোষ্ঠীর 'team' প্লটের বন্ধনকে শক্ত করতে সাহায্য করেছে। ঘটনানির্ভর এক একটি ছবি পর পর সাজানোর মধ্য দিয়েই শিল্পের অন্তিম শক্ত সূত্র মেলে। প্লট পাঠকদের টেনে রাখে গল্পকারের কৌতুকরস সৃষ্টি, সংলাপের effect-এর তাৎক্ষণিকতা, ঘটনাকে চরিত্রে নিপুণ জড়িয়ে রাখার সুকৌশলের মধ্যে। যেহেতু প্লটে নায়ক বা নায়িকাকেন্দ্রিক কাহিনী নেই, তাই গল্পের কৌতুকরস, চরিত্রদের প্রত্যুৎপন্নমতি

বুদ্ধিখণ্ডগুলি, প্রেক্ষিত প্লটের প্রতিটি বুননের গিঁটে শক্ত জট তৈরি করেছে। তাতেই এমন গল্পে এক গোষ্ঠীবন্ধের কারিগরি দিক গল্পশিল্পের মূলের রীতি-অনুগ স্বভাবী।

'বরযাত্রী' গল্পের অন্তর্ভুক্ত সমবায়িক দলবদ্ধ বন্ধুদের আচরণ থেকে তৈরি হওয়া কৌতুক-হাস্যরসের উতরোল আড়ম্বর গল্পের ক্লাইম্যাক্স রচনার ক্ষেত্রটিকে অন্য আকার দিয়েছে। একনায়ককেন্দ্রিক ছোটগল্পের গতিমুখে অল্প কথায় বা একক চরিত্রের সংলাপে এখানে ক্লাইম্যাক্স তৈরি হয়নি। আসলে গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদে গল্পকার একটি গল্পের মোড়-ফেরানো ঘটনার চিত্র এঁকেছেন :

> 'ওগো বাবা গো, ডাকাত'—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়াব বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি, সবগুলা যেন এক মুহূর্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।'

এই চিত্রেই সমগ্র গল্পের প্রাথমিকভাবে climax (চরমক্ষণ)-এর শুরু। এর পর কিছু মুহূর্তের থমথমে ভাব। নিবিষ্ট পাঠকরাও এখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবেনই।

> 'দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্মের প্রেরণায় কাজ। কোন রকমে বাঁচিতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক না কেন।'

বাসরঘরের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের দর্শক পাঁচ বন্ধু ছত্রভঙ্গ হতে রুদ্ধশ্বাস পলায়নে ব্যস্ত। এখানেই ক্লাইম্যাক্সের পরবর্তী ঘটনার বিস্তার। নাটকের কাঠামোগত তত্ত্বের পরিভাষায় এই অংশের নাম ইংরেজিতে 'Falling action' (বিমর্ষ সন্ধি)। বরযাত্রী দল পালাতে গিয়ে তিনজন রাজেন, গণেশ ও গোরাচাঁদ ঘাসঢাকা মাটি ভেবে পানা ঢাকা পুকুরের মধ্যে পড়ে। ঘোঁৎনা মোটা পেঁপে গাছের পাতার ভিড়ে আড়াল হয়। দৌড়ে পালিয়ে লুকোয় কে. গুপ্ত। যেখানে শেষমেশ বন্ধুদের কন্যাপক্ষের কাছে ধরা পড়ার মতো ঘটনার সমাপ্তি, পরিচয়ের সত্য উদ্‌ঘাটন, সেখানেই গল্পের কৌতুকরসের বেগ ও আবেগ শমে এসে স্থির হয়। যে গল্পে সমবায়িক স্বভাবে একটা বন্ধুগোষ্ঠীর 'team' প্লটের কেন্দ্রে থেকে গল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে এইভাবেই ক্লাইম্যাক্সের পরবর্তী ব্যঞ্জনা পাঠকমনে বাজতে থাকে। 'বরযাত্রী' গল্পের এমন প্রকরণগত গঠন গল্পের সাধারণ শিল্প-নিয়মের অনুগ নয়, হতে পারে না।

গল্পটি কোনো মনস্তত্ত্বের কথায় বিশিষ্ট নয়, বরং বাইরের জীবন ও তার যাবতীয় বাস্তব ক্রিয়াকলাপ প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের লক্ষ্যে একমাত্র সত্য অবিবাহিত বন্ধুগোষ্ঠীর বিবাহ-উৎসবে কল্পনার 'বাসরঘর' বাস্তব দেখার বাসনা। যেহেতু একজন নয় বন্ধুগোষ্ঠী, তাই কোনো বিশেষ চরিত্র প্লটের দায়ভাগ নিতে অক্ষম। প্রভাতকুমারের 'বলবান জামাতা' গল্পে যেমন একক নায়ক হলেও নিপুণ সিচুয়েশন সৃষ্টি ছোট-বড় ঘটনার চমৎকৃতি, ভ্রান্তিবিলাস কৌতুকরসের সঙ্গে সঙ্গে এক কারুণ্যকে, অসহায়তাকে সামনে সহজেই আনে, তেমনি 'বরযাত্রী' গল্পেও একজন নয় পাঁচজন বন্ধু ও বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের লোকজন বাস্তব আচার-আচরণের বৈষম্যে গল্পে প্লটের বাঁধুনিকে মজবুত করেছে, বলা

যায়, যেখানে প্লট নিটোল স্বভাব পেতে অক্ষম, সেখানে প্লটকে স্বাভাবিক স্বভাবের শিল্পরূপ দিয়েছে, বাস্তবতার অনুপন্থী করেছে।

দুই

'বরযাত্রী' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য একমাত্র বাঙালি হিন্দু বিবাহোৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান বাসরঘরকে প্রধান করেই রূপ পেয়েছে। বরের বন্ধুবর্গ অবিবাহিত যুবকদের বাসরঘরে উপস্থিত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার শ্যালিকাবৃন্দ, রসিক ঠান্‌দিদের উপস্থিতি জামাইকে নিয়ে সূক্ষ্ম আদিরস থেকে সমাগতদের কারো কারো গান-গাওয়ার আড়ম্বর, ঠাট্টা-ইয়ার্কি ইত্যাদি নানান ক্রিয়াকর্মে যে রসাল রোমান্টিক পরিবেশ তৈরি হয়—তার স্বাদ পরম কৌতূহলে চরিতার্থ করার আত্মগত প্রয়াসেই গুরুত্ব পায়। 'বরযাত্রী' গল্পের বরের অনুগামী বন্ধুগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে সেই সূত্রেই সামনে আনে।

কন্যাপক্ষের দিক থেকে অতিথি আপ্যায়নের পর পাঁচ বন্ধু খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন কিছু সময় শামিয়ানার নিচে শুয়ে-বসে বিশ্রামরত, তারই মধ্যে গণেশ নিচু স্বরে জানায়, 'তিতলুর বাসরঘর দেখে এলাম।' এই একটিমাত্র কথাতেই বন্ধুর দল প্রবল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কে. গুপ্তের বাসরে ত্রিলোচনের বিশেষ খবর কিছু জানার কৌতূহলকে বাড়িয়ে দিয়ে গণেশ জানায় : 'আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্রলোচন ইন্দ্র হয়ে ব'সে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি—' রাজেনের তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাস : 'উঃ যেতে হবে মাইরি।' বাসরঘরের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রের কল্পনায় সকলেই আসে—নানা অসুবিধে সত্ত্বেও, বাসরঘরে পিছনের অন্ধকার পরিবেশে দুটি জানালার গায়ে নিবিষ্ট হয়ে কষ্টকর দাঁড়াতে পারার সুযোগে। ঘরের মধ্যে এক ষোড়শী তখন কৌতুক করার ছলে কনের ঘোমটা সরিয়ে তার মুখ দেখানোর প্রস্তাব ত্রিলোচনকে দেয়। এমন সুন্দর মুখ দেখানোর জন্য ষোড়শী মেয়েটি তার বদলে গান শোনানোর আবদার জানায়। এক কিশোরীর প্রস্তাব শ্লেষকৌতুকে জানায় আখের রস যেমন না থেঁতো করলে পাওয়া মুশকিল, বরের গান শুনতে হলে চাই ওর কানে মোচড়—অর্থাৎ কানমোলা! এই মতের সমর্থক বাসরঘরে তখন একাধিক। অগত্যা সুন্দরীদের চাপে ত্রিলোচন বাংলা নয় এমন গান গাইতে রাজি হয়ে একবার বন্ধু গণেশকে ডেকে আনার কথা বলে। বাসরঘবে গণেশের নাম নিয়েই তখন হাসি-ঠাট্টা।

এই যে ছোট ছোট কিছু মন্তব্য শুনিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাসরচিত্র এঁকেছেন—তার রসেই হঠাৎ কানে শোনে 'ডাকাত' পড়ার ভয়ের তুমুল চিৎকার। বাসরঘরের রসে তখন রসহানির তুমুল অবস্থার সূত্রপাত এবং বাকি গল্পের সবটাই বন্ধুদের বাসর দেখার কৌতুকপ্রবণতা, খুশি-আনন্দ নিমেষেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই বাসরঘরেই গল্পের ক্লাইম্যাক্সের শুরু ও বিস্তার। 'বরযাত্রী' গল্পে কোনো বড় জীবনার্তি নেই, নেই গল্পকারের কোনো বিশেষ দর্শনের চাপা ঘোষণা! চমৎকার সিচুয়েশন তৈরি করে ঘটনাসংস্থান ও মনোরম সব পরিস্থিতির চমৎকারিত্ব ও প্রয়োগের কৌশলকে গল্পকার ট্র্যাজেডি নয়, হাস্যরসাত্মক অথচ করুণ comedy of circumstancesকে সফল

শিল্পরূপ দিয়েছেন। আগেও বলেছি, গোটা গল্পের প্লটে আদ্যন্ত ধরা পড়ে তুমুল কৌতুকরসের প্লাবন। গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে তাই একমাত্র বাসরঘরকেই প্রধান প্রধান ঘটনার 'সুইচবোর্ড' করে একই সঙ্গে কৌতুকরস, শ্লেষ, প্রসন্ন করুণরস, অসহায়তাজনিত বিষণ্ণতা ও দুঃখ—সবের মিলমিশে অট্টহাসির সূর্যালোকিত আকাশের মুক্ত আসন ছড়িয়ে পড়ে। 'বরযাত্রী' গল্পে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হাস্যরসের ব্যবহারে ও স্বাদবৈচিত্র্যে পূর্বসূরি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থেকে অনেক বড় মাপের আসন দাবি করতেই পারেন। 'বরযাত্রী'র লেখক একজন বড় মাপের ব্যতিক্রমী কৌতুকরস-স্রষ্টা, হাস্যরসের প্লাবনে গল্পের পথে তাঁর 'বরযাত্রী' অনড় 'মাইলস্টোন'!

তিন

'বরযাত্রী' অবশ্যই চরিত্রাত্মক গল্প নয়, অথচ গল্পটির প্রধান কাঠামোয়—হাড়, মাংস, মজ্জা, রক্তের এবং সর্বোপরি প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে চরিত্রই—চরিত্র সমূহ। আমাদের কথা, যে কোনো সাধারণ সার্থক গল্পের মতো এ গল্পে একক কোনো দায়িত্ব কোনো বিশেষ পুরুষ বা নারী নেয়নি, একটা সমমনোভাবাপন্ন রসিক যুবগোষ্ঠী তাদের বুদ্ধি-অবুদ্ধি, ভুল-ভ্রান্তি, আবেগ-কৌতূহল, সহায়তা-অসহায়তা—এসব চিন্তাভাবনা দিয়ে এক কৌতুকরসের পাঁচালী গদ্যে রচনা করেছে। চরিত্রগুলি সকলেই—যে সময়ে গল্পটি রচিত—সে সময়ের আধুনিকতায় জীবন্ত, সপ্রাণ।

যেহেতু একটি গোষ্ঠীই এখানে প্রধান, তাই গল্পের কোনো বিশেষ চরিত্র আলোচনা অর্থহীন। এমনিতে মোটামুটি গৌণ চরিত্রের স্বভাবে সব চরিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট মাপের সীমায়, কিন্তু সমগ্র গল্পের লক্ষ্যের নির্দেশে তারা Individual নয়। তাদের কেউ কেউ 'type', কোথাও বা একে অন্যের সান্নিধ্যে পরাধীন!

'বরযাত্রী' গল্পের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষজন প্রবল গতিমুখে ও সক্রিয়তায় রূপ পেয়েছে, তাদের মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করাই সঙ্গত—ভাগগুলি মানুষজনের শ্রেণী বা গোষ্ঠী ধরে বিবেচ্য। আবার শ্রেণী বা গোষ্ঠী ওই বিবাহের রাতের প্রধান প্রয়োজনের সূত্রেই গল্পে গৃহীত। গল্পের একমাত্র উপলক্ষ্য ত্রিলোচনের বিবাহ। আর এই উপলক্ষ্যেই যারা সমবেত—তারা পাঁচটি ভাগে নিজেদের সীমাসচেতন হয়েই থাকে। ১. বরযাত্রী তথা বর ত্রিলোচন তথা তিলুব বন্ধুগোষ্ঠী—রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ ও গণেশ। ২. বরকর্তা ও বরের পক্ষের অভিভাবকরূপে বড়দের দল—পাত্রের বাবা, দুজন মেসো, সেজপিসে, প্রতিবেশী সহায়রাম বাবু, পুরুতের কাকা ন্যায়রত্ন মশাই ও দিনে নাপিত। ৩. কন্যাকর্তা ও কন্যাপক্ষের লোকজন, মেয়ের কাকা জগুদা ইত্যাদি, ৪. বাসরঘরের বাসর জাগানি সদস্য ও সদস্যারা। ৫. কন্যাপক্ষের সাধারণ লোকজন ও প্রতিবেশী গ্রামবাসীরা।

গল্পের শুরুতে গণেশের তোতলামি ও সপ্রতিভতা, শ্লেষাত্মক কথা বলার ভঙ্গি, কে. গুপ্তের 'একটু বড় দেখে নিতবর' নেওযার প্রস্তাব, ঘোঁৎনার পুরুত ঠাকুরের রাতকানা কাকা সম্পর্কে মন্তব্য, গোরাচাঁদের বিয়ের বাড়ির অপর্যাপ্ত খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ, কবি রাজেনের কথায়

কবিত্ব প্রকাশের হাস্যকরতা—সবই চরিত্রগুলির নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের কিছু দিক দেখালেও বরযাত্রী গোষ্ঠীর Team work-কে গল্পের গতি সৃষ্টির সহায়ক উপকরণ করে।

অন্যদিকে বরের বাবা ভবতারণবাবু, পিসে, মেসো, সহায়রাম চাটুজ্জে, রাতকানা পুরোহিত, এমনকি দিনে নাপিতের কিছু সামান্য মদ্যপানের চিত্রস্বভাবে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নয়, মদে বেহেড হয়ে অপ্রকৃতিস্থ কথাবার্তা সামগ্রিকভাবে তাদের type ভূমিকা তুলে ধরে। সেকালের বিয়েবাড়ির বাস্তব পরিবেশের পক্ষে এগুলি যথাযথ উপকরণ। বাসরঘর-কেন্দ্রিক নারী-পুরুষ পূর্ণ চরিত্রের রূপ পায়নি। কন্যাপক্ষের কনের কাকা ভজুদা ও সেই নামহীন ফাজিল ছোকরার কথার মধ্যে জ্বালা-ধরা ফোড়ন কাটার স্বভাব ছোট ছোট চিত্রের স্বভাবে বিয়েবাড়ির বাস্তবতার দিক ভারসাম্য পায়।

'বরযাত্রী' গল্পের এতসব মানুষজন —বর ও কনে উভয়পক্ষের আমন্ত্রিতদের বাস্তবতাব প্রতি সম্পূর্ণ শিল্পরসের আনুগত্যেই যথার্থ। আসলে বিয়েবাড়ির বিচিত্র সব মানুষজনের উভয়পক্ষের বুদ্ধি ও ভাবনার, উৎসবের উল্লাস ও বিচিত্র পরিস্থিতি সৃষ্টির নিখুঁত সুযোগে কৌতুকরসের সমগ্রতার স্বাদ দিয়েছে, সকলেরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ওপর পড়েছে আবরণ।

চার

তাঁর 'বরযাত্রী' গল্পে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছোটগল্পের অন্যতম দিক ভাবের একমুখিতাকে অসাধাবণ সংযমে, মেদহীনতায় সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছেন। নেই কোথাও অতিরিক্ততা (Excessiveness)। গল্পটি বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহ-বিষয়ক অনুষ্ঠানের নিপুণ কথাচিত্র। এর মধ্যে সাংসারিক, সামাজিক কোনো সমস্যা, তত্ত্ব আদৌ স্থান পায়নি, গল্পটি কোনো বিশেষ ব্যক্তিচরিত্রের নায়কত্বকে শুরু থেকেই অস্বীকার করেছে। গল্পে অবশ্যই আছে উৎসব নিহিত ব্যবহারিক জীবনের নানান সংঘর্ষের রূপ, কিন্তু সব ঢাকা পড়ে গেছে কোনো অসীম জীবনবেদী দর্শনে নয়, গল্পকারের হাস্যরসাত্মক বৈঠকী গল্পের উত্তাল রস-সরতায়। সে রস কৌতুকের স্বভাবে উচ্চ অট্টহাস্যের অনুগ মুক্ত আনন্দের হৃদয়ভরা তুমুল মুক্তির দিক।

গল্পের তাগিদেই এর মধ্যে এসেছে ছোট ছোট ঘটনার বিদ্যুৎ-ঝলক। তাদের একে একে সূত্রবদ্ধ করলে দেখা যায়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাকে স্বীকার করে পরিস্থিতির, অসঙ্গতিজনিত কারুকর্মে কৌতুকরসের মহাপ্লাবনে সব ঢাকা পড়ে গেছে। বিশেষ ভাবাশ্রয়িতা নয়, ঘটনা নির্ভরতা নয়, সমবেত মানুষজনদের বুদ্ধি-নির্বুদ্ধির খেলার পরিণাম হয়েছে চমৎকারিত্বে মনোহর, মনোরম। ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার—এঁদের গল্পের সান্নিধ্যে থেকে বিভূতিভূষণ বাইরের আয়োজন সম্পূর্ণ করে এসে পাঠকদের পৌঁছে দেন মুক্ত আলোর প্রসারিত প্রচ্ছদে বৈঠকী অন্তরঙ্গতার আপনত্বে—অমলিন স্বাদে রসিকের চরিতার্থতায়।

গল্পের বর্ণনা সাধুগদ্যে, কিন্তু সংলাপে আছে চলিত ও কথ্যরীতির মিশ্রণ, সংলাপ দীর্ঘ

নয়, নাটকীয়। একাধিক সংলাপের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গল্পটির বড় ঐশ্বর্য। গল্পের কোনো অংশে সংলাপ ও বর্ণনার অতিরিক্ততা নেই। চরিত্রদের উদ্দেশ্য ও কার্যসিদ্ধির তীব্র আকর্ষণে গল্পের পরিণামী চিত্র আমাদের অট্টহাস্যের অংশীদার করে। কোনো অসীম ইঙ্গিতময়তা সৃষ্টির প্রয়াস গল্পের শেষে থাকতে পারে না, আছে চমৎকার শ্লেষ-কৌতুকের স্বাদ দানের সংক্ষিপ্ত সমারোহ! আর এসবের মূলে আছে বাস্তবতা। বিয়েবাড়ির বাস্তব পরিবেশ রচনা করতে গিয়ে গল্পকার সংলাপে কোথাও অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতার সীমা ছাড়াননি।

এই প্রসঙ্গেই আসে 'বরযাত্রী' গল্পের চরিত্রদের বিচিত্র সব সংলাপের অভূতপূর্ব স্বাভাবিকত্ব। 'বরযাত্রী' গল্পের আদ্যন্ত এক শৈল্পিক স্বাভাবিকত্বই এর প্রাণ, এর মূল্যবান সম্পদ। লেখক কোথাও স্বয়ং উপস্থিত নন। নিরপেক্ষ থেকে চাপা স্মিত হাস্যে শেষচিত্রের অন্তরস্থিত তাৎপর্যের বক্রতাকে রসের খাঁটি ঔজ্জ্বল্যে চিত্রল করেছেন :

> 'ওরে, শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।
> কাপড় জামা র‍্যাপার—শিগগির।
> চা করতে ব'লে দে, দেরি না হয়।
> আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো —
> সেই ছেলেটা বলিল, কষ্ট ক'রে বললেই হ'ত জগুদাকে।
> ওরে নিয়ে এলি কাপড়? দেরি কেন?
> কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী, চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ। একটু মিষ্টি ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, বাসরঘবে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।'

যে বাসরঘরের জন্য তরতাজা শিক্ষিত যুবকদের ছিল তীব্র, উদ্যোগী, কৌতূহলী দুর্ধর্ষ রোমান্টিক অভিযান, তাদের চার জনের জন্য সেই বাসরঘর থেকেই এক কিশোরীর হাত দিয়ে আসে 'বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারটি সায়া, চারটি ব্লাউজ', এবং যুবকদের বাসরঘরে যাওয়ার জন্য সকৌতুক আমন্ত্রণ। এর শ্লেষবক্রোক্তি থেকে তৈরি হওয়া চমকপ্রদ অট্টহাসি যুবকদের অসহায়তা ও দুর্ভোগের অভিজ্ঞতার ওপর লজ্জাসমেত কিছুটা জড়তা যুক্তির মলম দেয়। গল্পের সব শেষে এই সিচুয়েশন সৃষ্টি যেমন বাস্তবতায় স্বাভাবিক, তেমনি গল্পকাবের অনবদ্য কৌতুকরস সৃষ্টির উজ্জ্বল অভিজ্ঞানও।

বরযাত্রী গল্পের মূল রস কৌতুক বা হাস্যরস। পূর্বসূরি ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমার ঘটনা বৈচিত্র্য ও পরিস্থিতি রচনার নৈপুণ্যে হাস্যরসের সঙ্গে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের তুমুল প্রবাহ সমন্বিত করেছেন—বিশেষ করে ত্রৈলোক্যনাথ। প্রভাতকুমার কৌতুকরসের গল্পে নির্মল কৌতুকের সার্থক নমুনা রেখেছেন। উত্তরসূরি বিভূতিভূষণ সার্থক সংযত সংলাপ রচনা করে স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করেছেন সরস গল্পের রাস্তায়। অবশ্য ইতিপূর্বে পরশুরাম সংলাপে চূড়ান্ত সিদ্ধির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বর্তমান গল্পে বিভূতিভূষণের পরিস্থিতির বিশেষ রূপরচনা ও সুযোগ গ্রহণ চিত্র, চরিত্রদের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ের আকস্মিকতা, লেখকের ছোটখাটো বর্ণনার গদ্য-অংশ উদ্ধৃত করে গল্পকারের স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল প্রমাণ রাখা যাক :

১. 'তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এরপর আমার নি-ন্নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গণশা তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ করগে।' (গণেশ/রাজেনের কথার উত্তরে)

২. ত্রিলোচন বলিল, ছজনে মিলে, আর এ একলা, গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গণশা, যতটা হালকা হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আবার নয় তখন—গোরাচাঁদ বলিল, তা হলে তো নাককান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়। গণশা বলিল, বরং ক-ক্বন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভালো হয়। দেখবে, বরের গ-গ গলারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে। (বাসরঘর নিয়ে ত্রিলোচন গোরাচাঁদ-গণশার সংলাপ বিনিময়)

৩. 'সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!' (পুরুত সম্পর্কে ঘোঁৎনার সংলাপ)

৪. 'বে-ব্বেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করবার সময় করবে?' (বর সম্পর্কে গণেশের সংলাপ)

৫. 'কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মত ভদ্রলোক দেখিনি, তা কোনমতেই মানবেন না? ভারি জ্বালা তো!' (ত্রিলোচনের মাতাল পিসের সংলাপ)

৬. '... আমি কখন শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দেবো'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার সন্ন্যাসীপ্রদত্ত দদ্রুভৈরবের হ্যাণ্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা ক'রে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস'ও দিয়ে দেবে।' (রাজেনের লেখা ও ছাপা তিলুর বিয়ের পদ্য বিযেব আসরে বিলি করতে না পেরে তাকে গোরাচাঁদের সান্ত্বনা)

৭. গণশা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাবব্যাকুল চোখ দুইটি তুলিয়া গুণ গুণ করিয়া গাইতে লাগিল—মুহ পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি/চিত মোর ব্যা-ব্যান্ধা (বরাসনে বসে গণেশের তিলুকে শেখানো রাজেনের লেখা গানের সুর স্মরণ করানো)

৮. 'বললাম, বরযাত্রী—স্ত্রী আচার দেখছি।
শুনে সুখী হলাম। একলা যে? বললাম, তারা আসব আসব করছে।
শুনে সুখী হলাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না। কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে?' (স্ত্রী-আচার দেখা নিয়ে জগুদা-রাজেন সংলাপ বিনিময়)

৯. 'বাহিরেব বারান্দায় দিনে নাপতে কাজকর্ম সারিয়া কর্তাদের বোতল ঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল তাহাতেই তাহার ষোলআনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।' (মাতাল নাপিত দিনের বর্ণনা)

১০. 'ডাকাতরা বলছে বরযাত্রী? তা আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখ না হয়।' (ডাকাত সন্দেহে বরের বন্ধুদের কথায় পুরোহিতের মন্তব্য)

১১. 'রাজেন বলিল, এরা বলছে—এঁরা বলছেন বরযাত্রীরা ডাকাত।
ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?' (ন্যায়রত্নের হাস্যকর যুক্তি-সন্ধান)

বরযাত্রী গল্পে এরকম একাধিক উক্তি-প্রত্যুক্তি ও সিচুয়েশন বর্ণনা গল্পটির অঙ্গ-সৌষ্ঠবে খচিত মূল্যবান মণিমুক্তার মতো! গল্পকার সৃষ্ট হাস্যরসের ঘনত্ব ও পটভূমির আকর্ষণ পাঠকদের যেনবা অট্টহাস্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোটখাটো 'রিলিফ' দেয়।

পাঁচ

গল্পের নাম 'বরযাত্রী', বরযাত্রী এমন নামে চিহ্নিত করার মধ্যে একটি group-কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে—যারা বিবাহ-উৎসবে বরানুগমনে অন্তরঙ্গ সঙ্গীর ভূমিকা নেয়। কোনো ব্যক্তিনাম বা গভীর ব্যঞ্জনা এমন মূল তাৎপর্য ধরে ব্যক্ত হয়নি।

তবু কেউ কেউ ভাবতে পারেন, গল্পের নাম 'বাসরঘর' হলে কেন্দ্রীয় বক্তব্য এমন নামে কেন্দ্রচ্যুত হত না! কারণ বরের যে পাঁচজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তাদের প্রধান লক্ষ্যই হল বন্ধুর বিবাহে বাসরঘরের আলাপচারিতার রসাস্বাদ নেওয়া! গল্পের প্রথমেই সেই বাসরঘর নিয়েই বর ত্রিলোচনের বন্ধু-সেনাপতি, তরুণ তুর্কী রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনা ও গণেশের যাবতীয় আলাপ-আলোচনা, প্রস্তুতির প্রমাণ মেলে। কদিন ধরে স্বযং গণেশ যে ত্রিলোচনকে দাম্পত্যনীতিতে জোর তালিম দিয়ে, 'বিশেষ করিয়া দাম্পত্যরাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্বে' বাসর-দুর্গটি কি করে অতিক্রম করতে হবে, তার কৌশলকানুন অধিগত করার কৌশল ঠিক করে দেয। সবচেয়ে বড় কথা, সমগ্র গল্পে 'বাসরঘর'ই প্রধান লক্ষ্য হয় এবং পরিণামী ব্যঞ্জনায় বাসরঘরই একমাত্র সত্য রূপ পেয়েছে। সুতরাং যুক্তির দিক থেকে 'বাসরঘর' নামটির গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করার নয়।

কিন্তু 'বরযাত্রী' নামটির আলোচ্য গল্পে তাৎপর্য অনেক বেশি। বরযাত্রী বললে কিন্তু শুধু পাঁচ বন্ধু বোঝায় না, তার সঙ্গে পাত্রপক্ষের গুরুজন, অন্যান্য অতিথি, সেই সঙ্গে বিবাহ বাড়ির পরিবেশের গুরুত্বও স্থান পায়। সেই পরিবেশ রচনা করেছেন গল্পকার মাতাল পাত্রপক্ষ বাড়ির গুরুজনদের ছবি এঁকে। যখন বাসরঘর থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধুরা গভীর বিপাকে ডাকাত সন্দেহে নাজেহাল হয়, তখন বরের বাড়ির কর্তা ও লোকজনকে নিয়ে এক গভীর সরস হাস্যকর অবস্থাও চিত্রিত হয়ে যায়। এই যে বরযাত্রীদের শুধু বাসরঘর নয়, সমগ্র বিবাহবাড়িটাই গল্পের পাঁচটি চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, এতেই 'বরযাত্রী' নামটি অনেক বেশি অর্থের দ্যোতনা পায়। 'বাসরঘর' যদি নাম হত, তা হলে গল্পের ভূমিকা অংশ হত সংক্ষিপ্ত। তিলুর বাবা, দুই মেসো, পিসি, ন্যায়রত্ন, দিনে নাপিত—সকলেই, তাদের মাতলামি নিয়ে এতটা গুরুত্ব পেত না। তাই, আমাদেব মতে, 'বরযাত্রী' নাম গল্পের বড়মাপের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানানসই, নামে শিল্পের গুরুত্বে সার্থক।

২.
ননীচোরা
এক

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শিশুদের নিয়ে বাৎসল্যরসের গল্প একাধিক লেখা হয়েছে। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের শিশুচরিত্র আমাদের বিস্ময়। শরৎচন্দ্র একাধিক রচনায় শিশু, বালক, সদ্যকিশোর ইত্যাদির মতো চরিত্র রচনা করে পারিবারিক জীবনের যেনবা পাঁচালী রচনা করে গেছেন। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ইত্যাদি আমাদের এমন মন্তব্যের যথোচিত দৃষ্টান্ত। প্রবাসের একান্নবর্তী পরিবারে দীর্ঘজীবন কাটিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে বিচিত্র সব শিশুর উপহার দিয়েছেন। তাদের মনের বিচিত্রতা রীতিমতো আকর্ষণীয়। রাণু, পীতু, বাদল, পোনু ইত্যাদি সর্বকালের শিশু স্বভাব ও মনস্তত্ত্বের নির্ভরযোগ্য দলিল যেন। 'ননীচোরা' গল্পটি সেই ধারায় এক লক্ষণীয় সংযোজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গল্পকারের 'অনাচার' নামের গল্পটির সঙ্গে 'ননীচোরা'র সৌসাদৃশ্য ননীচোরার বাৎসল্যরসের স্বাদকে আরও গভীর মর্যাদা দেয়।

'রাণুর প্রথমভাগ' গল্পের আট বছরের মেয়ে রাণু চরিত্র চিত্রে যে প্রবীণা গৃহিণীর স্বভাব আরোপ করে গল্পকার এক শিশু-বালিকার সংসার-ভাবনার প্রেক্ষিত রচনা করেছেন আদ্যন্ত, তা হাস্যরসের লঘুরস আস্বাদ্য করালেও তার মধ্যে চাপা বাৎসল্যের বিস্ময়—গল্পকারের দিক থেকে—আদৌ উপেক্ষার নয়। বরং 'ননীচোরা' গল্পে বালক কৃষ্ণের চিত্রমাধুর্যে শিশুটি হয়েছে শাশুড়ির ভক্তিবিহ্বল সংলাপে ও আচবণে, বিশ্বাসে ও ধর্মীয় মমতায় পারিবারিক দেবতার প্রতীকী বোধন! যে বালক এখনো মাতৃস্তন্য ছাড়েনি, তার আধো আধো বুলি, রাগ-অভিমানের ক্ষণিক প্রকাশ ও তিরোহিত হওয়ার খেলায় খণ্ডচিত্রগুলি হয়েছে কৌতুকে সুগভীর স্নেহার্ত।

বিভূতিভূযণের আলোচ্য গল্পে ঘটনাবহুল কাহিনী-অংশ অনুপস্থিত। শাশুড়ির বিশ্বাসের নিষ্ঠায় ও আর্তির মধ্য দিয়েই গল্পের কাঠামো প্রতিমা-রূপ পেয়েছে। পৌরাণিক বা লৌকিক শিশু ও বালক কৃষ্ণকে নিয়ে যে গল্পসূত্র এখানে শিল্পরূপ পায়, তা বৈষ্ণব ধর্মভাবনা-বিবিক্ত বিষয় নয়, তা পরমুখাপেক্ষী (dependent), তা একমাত্র শাশুড়ির মনের ধ্যানের চোখে দেখা ও বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত।

একটি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে বিধবা শাশুড়ি, তাঁর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি শিশুসন্তান, এবং সেই শিশুসন্তানের দৌরাত্ম্যের মিষ্টিমধুর পরিবেশে অবিবাহিত ছোটছেলে সহ শিশুর অজ্ঞান ছদ্ম-দৌরাত্ম্যের চিত্র দিয়ে 'ননীচোরা' গল্পের কাহিনীর শুরু। বাড়ির সমস্ত কাজে বড়বউ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে। শাশুড়ি পারিবারিক ধর্মীয় কাজে, পুজোয়, কৃচ্ছ্রসাধনের স্নানে ব্যস্ত থাকেন। বাড়ির একমাত্র শিশুটি এর মধ্যে মাকে আদরে আবদারে জিদে ব্যতিব্যস্ত করে, কখনো তার কাকার সঙ্গে খেলায় মেতে থাকে। নির্মল অবোধ কাজে, আধো আধো কথায়, দুরন্তপনায় সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখে শিশুটি। তাকে কেন্দ্র করে এক মধুর সংসার। মাঝে মাঝে শিশুটি অচেনা অজ্ঞ খেলার

স্বভাবেই পুজোর ব্যাপারে একান্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত ঠাকুমাকে স্পর্শ করতে যায়। ঠাকুমার গভীর সস্নেহ রাগে-শাসনে-কৌতুকে, খেলায়, বাৎসল্যে শিশুকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তা পরিবারে জীবন-স্বাদের অভূতপূর্ব গাঢ়তা আনে। শিশুটির খেলার বিষয় হয়তো পাখির ডাকের নকলনবিশি, তিন-চার দিনের কোনো বাছুর, বধূর দেবর—তার সঙ্গে মিথ্যে খেলার সঙ্গদানের ছল, মায়ের চুম্বনের ও স্তন্যপানের আদর নেওয়া, ঠাকুমার পুজোর ঘরে সঙ্গী হওয়া ইত্যাদি। শাশুড়ি মাঝে মাঝেই শিশুটিকে বলে তার পুজোর ঘরে আরাধ্য গোপাল আসার জন্য অপেক্ষা করার কথা। শিশুটি এসব বোঝে না!

নিজের পুজোর মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে শাশুড়ি পর পর কদিন ধ্যানে মন স্থির রাখতে পারেননি। তাঁর দেওয়া নৈবেদ্যের নাড়ুও ঘরের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অমঙ্গলের ভয়ে শাশুড়ি চিন্তিত। ইতিমধ্যে শাশুড়ি তাঁর স্বামীর বাড়িতে আরাধ্য দেবতা গোপালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও স্বামীর স্বপ্নে দেখা বিগ্রহের সূত্রে অভিনব অভিজ্ঞতার কথা গল্প করেন। নানা অস্থিরতার মধ্যে এক ছুটির দিনে, রোববার শাশুড়ির ঠাকুরঘরে ধ্যানে গোপালকে দেখার বাসনাকে গভীর, গাঢ় করে তোলার ব্যবস্থা করেন শাশুড়ি; বৌমার সঙ্গে চুক্তি করেন। রোববার বড় ছেলের অফিস যাওয়ার তাড়া নেই, ছুটির কারণে আড্ডায় চলে যায়। ছোটছেলে ক্যারাম প্রতিযোগিতার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। শিশুকে নিয়ে বধূ পাশের বাড়ি সময় কাটাতে যায়। শাশুড়ি ইতিমধ্যে রাত থাকতেই স্নান সেরে শুচিতার সঙ্গে ধ্যানের আয়োজন শেষ করেন বৌমাকে নিয়ে—তার পাশেব বাড়ি যাওয়ার আগে।

ঠাকুরঘরে ধ্যানের আসনে স্থির শাশুড়ি। আগে শিশুটি আধো বুলির স্বভাবে ঠাকুমাকে জানিয়েছিল চোখ বন্ধ করার কথা। তিনি স্থির সেভাবে। হঠাৎ ছোটকাকা ভাইপোর খোঁজে বাড়ি ঢুকে দেখে, শিশুটি ঠাকুরঘরের জানালার নিচে পেট চেপে দাঁড়িয়ে একাগ্র হয়ে উঁকি দিচ্ছে ঠাকুরঘরের ভিতরে। দেখে দেবর বৌদিকে পাশের বাড়ি থেকে ডেকে আনে। এসে দেখে শিশুটি আর জানালার কাছে নেই। ঘরের ভিতর দৃষ্টি পড়তে দেখে বধূ—শাশুড়ির দু'চোখ বোজানো চোখে টানা নীরব অশ্রুর ধারা, আর কালো পাথরের পাত্রে ক্ষীরের মধ্যে হাত ডুবিয়ে শিশুটি সতর্ক দৃষ্টিতে ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে। পালাবার জন্যে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আছে। বধূ এবং দেবরের শিশুটির প্রতি প্রচ্ছন্ন স্নেহার্দ্র তর্জন গর্জন সব চাপা দিয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে আসনে বসিয়ে শিশুর ক্ষীরমাখা হাত তুলে ধরে শাশুড়ি বলেন :

> 'এই তাঁর হাত বৌমা, এই তাঁর চাঁদ মুখ। বউমা বললে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না, আজ গোপাল এসেছিলেন। ধ্যান করবার সময় মনে হ'ল যেন ঘর আলো ক'রে এলেন, ক্ষীরের বাটির মধ্যে হাত ডুবুলেন, এমন সময় তোমাদের গলা শুনে জেগে উঠলাম।....'

এর পর বউমাকে শাশুড়ির শেষ আদেশ : 'কাল থেকে খোকার জন্যে ছোট্ট একটি নৈবিদ্যি আমার আসনের পাশে রাখা থাকবে বউমা, যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে।'

এখানেই গল্পের শেষ।

ননীচোরা গল্পে কোনো টানা কাহিনী, এক বা একাধিক ছোটবড় ঘটনা নেই—যা সূত্রবদ্ধ হয়ে একটি নির্দিষ্ট প্লটের কাঠামো তৈরি করতে পারে। গল্পের শুরু থেকেই শিশুটির—যাকে 'খোকা' নামে ডাকা হয়, যার অন্য কোনো নাম নেই,—মা, ঠাকুমা, কাকাদের সঙ্গে বিচিত্র দৌরাত্ম্য, আদর-আবদার, অভিমান, কান্না, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে টুকরো টুকরো ছবি ধরা পড়ে, সেগুলি এক একটি বাৎসল্য রসের মনোরম, সুস্বাদু সম্পর্কচিত্র মাত্র। সেগুলি গল্পের পরিবেশ রচনা করে কৌতুক ছলে বাস্তবরসের প্রতিষ্ঠায়। গল্পের মূল লক্ষ্য গল্পকার একমাত্র বিধবা শাশুড়ির আরাধ্য গোপাল প্রীতি ও নাতির প্রতি স্নেহাকর্ষণে ধরা পড়ে। এর মধ্যে আখ্যান নেই, ঘটনার সহায়তা নেই। একেবারে শেষে খোকার লুকিয়ে ক্ষীর খাওয়ার বিষয়টি যদি প্লটের উপযোগী সামান্য ঘটনাও হয়, তা কোনোভাবেই প্লটের জটিলতায় আশ্রয় নেয় না। আসলে শাশুড়ির একান্ত একক ধর্মীয় ভক্তিভাবনা ও বাৎসল্য-রসভাবনায় গল্পের মেরুদণ্ড প্লটগঠনে শিথিলতা পায়।

'ননীচোরা' গল্পের বাৎসল্যরসই মুখ্য বলে এবং একক শাশুড়ির বিশ্বাসের একমাত্র অনুবর্তী বলে গল্পের আখ্যানহীনতার সীমা বাৎসল্যরসই ঢেকে দেয়। গল্পের কাঠামোর জটিলতা, বাঁধন একমুখিনতায় আবেগধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেয় বলেই গল্পে জটিলতা নেই। যদিও গল্পের একটি সিদ্ধান্তমূলক পরিণতি আছে, তাতে গল্পের 'চরমক্ষণ' (Climax) শাশুড়ির মনোলোকই বানিয়ে দেয়। খোকার লুকিয়ে ক্ষীরভক্ষণ ও শাশুড়ির তাকে গোপালের আবির্ভাব হিসেবে ভাবনায় গ্রহণ করার সিচুয়েশনে গল্পের ভাবগত ক্লাইম্যাক্সের কিছু ব্যঞ্জনা মেলে। যে গল্প আদ্যন্ত বাৎসল্য রসে মোড়া, শাশুড়ির মতো বালককৃষ্ণপ্রীতিতে অনড় মোহবদ্ধ, কাহিনী ও ঘটনাবিবিক্ত মনোলোকের ভক্তিসর্বস্বতায় তার গঠন শিথিল দুর্বল হতে বাধ্য। গল্পের বিষয়, চরিত্র, লক্ষ্য রূপায়ণে আছে গল্পকারের শিল্পসৃষ্টির সীমা। 'ননীচোরা' গল্পের প্লটের প্রকরণ অবশ্যই দুর্বল।

দুই

'ননীচোরা' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য ব্যক্তিগত ধর্মীয় ভক্তি, ঈশ্বরবিশ্বাস ও বাৎসল্যকে সমবেতভাবে আশ্রয় করে কোনো বড় জীবনের কথা বলে না। এখানে আছে একমাত্র সত্য হিসেবে বাৎসল্য রসের লৌকিক অবস্থান থেকে অলৌকিকে প্রতিষ্ঠা। অথবা, কথাটা এইভাবেও বলা যায়, বাৎসল্যরসেরই বাস্তব মাটির গন্ধ-আকুল ভূমি থেকে অবাস্তব অলৌকিক অবিশ্বাস্য অসীমে উত্তরণ। প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পে রূঢ় বাস্তব এক গৃহবধূর ওপর চরম ধর্মীয় ভক্তিভাবনায় দেবীত্বের মহিমা আরোপে অসীমকে নয়, ফিরে এসে জীবনের রূঢ় বাস্তববাদিতার দিককেই দেবীর আত্মহননে দেখানো হয়েছে। 'ননীচোরা'য় মূল বক্তব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক বালক কৃষ্ণের স্বভাব আরোপে শেষে বাৎসল্য রসেরই সমর্থিত দিককে স্বীকার করা হয়েছে। আবার বাঙালির আগমনী-বিজয়া গানে যে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য রস, তাতে ধর্ম ও পুরাণ অনুমোদিত হয়ে বাৎসল্য রসকে করা হয়েছে প্রতীকী। 'ননীচোরা'য় বাৎসল্য রসের সে প্রতীকধর্ম নেই। আচার-আচরণে

খোকা শিশু হিসেবে যা, গোপালের প্রতীকে তা-ই! শাশুড়ির বাসনা দুই স্বভাবেই এক। গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব গল্পের শিল্প-অবয়বের স্থিতিপ্রাণ (static)।

'ননীচোরা' গল্পের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যে পরিবেশ নির্মাণ, তা অন্তে স্বভাবী পাঠকদের একই বিশ্বাসে নিয়ে যায়। মাঝখানে শুধু শাশুড়ির একান্ত নিজস্ব বিশ্বাসের Imposition। গল্পের মধ্যেকার লেখক-ভাবিত attitude to life —এখানে বাৎসল্য রস, গল্পের গতিমুখকে কিছুটা শ্লথ-মন্থর করেছে। খোকার আচার-আচরণ, দৌরাত্ম্য, খেলা, সবই শাশুড়ির ধ্যানের গোপালের সবই মিলে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সত্যের তেমন চমৎকারিত্ব নেই। গল্পের শিশু চরিত্র অনবদ্য, কিন্তু তাকে নিয়ে শাশুড়ির নিজ বিশ্বাসে ও ধ্যানে যে মানসভূমির revealation, তা চরিত্রের পরিণতি নির্দেশক হলেও গল্পের শৈল্পিক লক্ষ্যের দিককে শক্ত মাটি দেয় না।

আমাদের মতে, গল্পে চিত্রিত জীবনকে দেখার দৃষ্টির যে সীমাবদ্ধতা, তাতে কল্পনার উত্তুঙ্গ স্বভাব দানে যে অক্ষমতা, তাতেই 'ননীচোরা' শিল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সর্বাবয়বে 'good' হয়েছে, 'great' হতে পারেনি। গভীর প্রেক্ষণে কখনো বা এমনও মনে হয়, একটি বৈষ্ণব ধর্মপ্রাণা বিধবার দিক থেকে গল্পটি চিত্রের স্বভাব পেয়েছে, দেয় না জটিল মনস্তত্ত্ব সম্মত গল্পের অন্তর্গূঢ় আনন্দ ও বিস্ময়। গল্পের মোট চারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম দুই পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আছে খোকা-বউমা-শাশুড়ির মধ্যে শিশুকে নিয়ে মনের আনন্দের বাৎসল্য রসসিক্ত খেলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে মেলে শাশুড়ির শ্বশুরবাড়ির বংশে বৈষ্ণব ধর্মাচারের এবং ঐতিহ্যবাহিত সংস্কারের ইতিহাস ও বিশ্বাস এবং বাড়ির কর্তার স্বপ্নদেখা সূত্রে অলৌকিক কাহিনী। চতুর্থ পরিচ্ছেদে গল্পে উপসংহার, খোকাকে নিয়ে তার ওপর বাস্তবতা ছেড়ে অলৌকিকের বিশ্বাস-আরোপের ঘটনা। খেলা থেকে লীলা! সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, খোকাকে 'গোপাল' ভাবনার মধ্যে কোন সত্যে গল্পকার একজন কথাশিল্পী? এর উত্তর গল্পটির পাঠকদের জিজ্ঞাসাকে অস্থির, অথবা ব্যঙ্গ-রসাস্বাদী করে না।

তিন

'ননীচোরা' গল্পের কাহিনীহীনতা, ঘটনার বিবিক্তি গল্পটির চরিত্রের সম্পদ বিস্তারে হয়েছে বাধা। চরিত্র কম থাকলে প্রকরণে ক্ষতি হয় না, হওয়ার কথাও নয়, তবু শাশুড়ির চরিত্র-ব্যক্তিত্বই এককভাবে এবং একমাত্র গল্পটির মূলে থাকায় চরিত্রের 'ডাইমেনশান' রসবৈচিত্র্যের সুযোগ ব্যাহত করেছে বলে মনে হয়। গল্পে চারটি প্রধান চরিত্র—যদি খোকাকে গণনার মধ্যে ধরা হয় তাহলে। সেগুলি হল—খোকা, বড় ছেলের বউ এবং শাশুড়ি, ও খোকার একমাত্র কাকা। এই চারজনেরই স্বতন্ত্র নাম রাখার দায় নেননি গল্পকার। কাকার সঙ্গে খোকার খেলার ছোট ছোট চিত্রগুলি কাকার কোনো স্বাতন্ত্র্য দেখায় না, খোকার সম্পর্কেই তার গল্পে প্রবেশ ও প্রস্থান। খোকাকে আদৌ চরিত্র বলা যাবে না, কারণ সে অবুঝ, বুদ্ধিহীন, সহজ, সরল মানব-শিশু-অস্তিত্বের প্রতীক। সে যা করেছে, তার দিক থেকে কোনো যুক্তি নেই, তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং অচেতন অবজ্ঞাজনিত। তার

স্বভাব গল্পে গতি দিয়েছে ঠিক, তাতে চরিত্র হয়ে ওঠার উপকরণ নেই। তার অজ্ঞাতে তার স্বভাব বাৎসল্য রসের প্লাবন ঘটিয়েছে। খোকা অবশ্যই তার ভাবের ও রসের পরনির্ভর (dependent) প্রকাশন। বিশ্বের মহামানবতার ব্যাখ্যায় সমস্ত শিশুর ওই বয়সে মহাপ্রতীক হয়ে যায়! একজন গল্পকারের সৃষ্টির মায়ার সম্পূর্ণ উর্ধ্বেই এমন শিশুর মিছিল। খোকার মা একজন 'টিপিক্যাল' গৃহবধূ, স্নেহশীলা মা! খোকার প্রতি তার আকর্ষণ, মাতৃত্বের অধিকারেই যাবতীয় শাসনতর্জন, আদর-আবদার—তার বাৎসল্য ভাবকে ঘনরসের আস্বাদ্য করেছে। শাশুড়ির সঙ্গে পারিবারিক রমণীয় সম্পর্কের যোগে এই বধূ-মা অবশ্যই logic (ন্যায়)-এর অনুবর্তী বাঙালি মা শুধু নয়, বিশ্ব-মা!

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নামহীন বিধবা শাশুড়ি। গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের উৎস বিকাশ ও পরিণামে তাঁরই গুরুত্ব সর্বাধিক। তাঁর খোকাকে নিয়ে যাবতীয় ছোঁয়া-ছুঁই-এর সংস্কার-অনড় তাঁকে ধর্মীয় দেবদেবী মহিমা নিয়ে স্বতন্ত্র স্বভাবের রমণী করেছে। যে ভাব ও ধ্যানে তিনি তাঁদের বাড়ির খোকাকে শেষে বালক কৃষ্ণের দূত ভাবেন, পারিবারিক গৃহদেবতা ভেবে বসেন, তার এমন পরিণামী চিন্তাভাবনার উপযোগী ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে গল্পের বধূ-মা ও শাশুড়ির সংলাপ-বিনিময়ে :

> 'পাখিটা মাঝখানের শব্দটায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিল, গেরস্তর খোক্কা হোক।
>
> কি বলে পাখি সেই জানে; কিন্তু এই সূত্রে মানুষের সঙ্গে তাহার একটা গাঢ় আত্মীয়তা আছে। ঘরে-ঘরে তাহার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর, কথাকাটাকাটি চলে।...
>
> বধূ বলিল, আর খোকার প্রার্থনায় কাজ নেই বাপু, ঢের হয়েছে, একটি সামলাতেই মানুষের প্রাণান্ত—
>
> ওমা! অমন কথা ব'লো না, বউমা; ওই একটিতে ঢের হয়েছে? পাখির মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, কোলে পিঠে জায়গা না থাক্, ঘর আমার ভরে উঠুক দিন দিন।'

শাশুড়ির এই বাসনা প্রমাণ করে, তিনি বাৎসল্য রসে বিভোর ধর্মপ্রাণা মহিলা যিনি শেষে খোকার মধ্যে শিশু-কৃষ্ণকেই দেখবেন। তাঁর মধ্যে সংস্কার আছে, স্বামীর সূত্রে পাওয়া গোঁসাইয়ের বংশের রক্তসম্বন্ধ আছে। সংস্কারে মোড়া পাপপুণ্যের হিসেবে শাশুড়ি যেভাবে গল্পে আঁকা, তাতে অন্তিমে খোকার গোপালে রূপান্তরে মানবপুত্রের দেবপুত্রের অবয়বে পরিণতিভাবনায় চরিত্রটি কোনো বৈচিত্র্য, ব্যঞ্জনা, বিস্ময়, চমৎকৃতি আনে না। শাশুড়ি হয়ে ওঠে স্থিতিপ্রাণতায় আক্রান্ত এক গতানুগতিক চরিত্র। শাশুড়ির গল্প-মধ্যেকার যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম, ভাব-ভাবনা কেন্দ্রীয় চরিত্রের সীমাকে পরিষ্কার ধরে দেয় পাঠকদের সামনে। শাশুড়ির চরিত্র-বিস্তারে ও পরিণতিতে গল্পকারের কোনো কৃতিত্ব নেই। আগাগোড়া তাঁর 'হয়ে-ওঠা' নয়, তিনি গল্পকারের সীমাবদ্ধ কল্পনায় প্রকরণের 'হওয়াই'! কেন্দ্রীয় চরিত্রের এমন নিজস্ব 'হওয়াই' চরিত্র এবং শিল্পীর—দু'পক্ষেরই ব্যক্তিত্ব-বিবিক্তির প্রমাণ।

গল্পের শেষে শাশুড়ির যে ধ্যানের সূত্রে গোপালের অস্তিত্ব অনুভব তা তাঁর একান্ত

নিজস্ব! বাস্তবে একান্ত অন্তরঙ্গতম করে খোকাকে দেখা আর ধ্যানে গোপাল কল্পনার এই যে মিলন-মিশ্রণ—সবই শাশুড়ির দীর্ঘকাল সঞ্চিত রক্তসম্পর্ক মহিমার:

> 'বউমা বললে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না, আজ গোপাল এসেছিলেন। ধ্যান করবার সময় মনে হ'ল যেন ঘর আলো ক'রে এলেন, ক্ষীরের বাটির মধ্যে হাত ডুবুলেন........'

এ অনুভব সংস্কারের, চরিত্রের আপন অভিরুচির! বিভূতিভূষণ এর পর গল্পের সিদ্ধান্ত হিসেবে লিখছেন :

> 'খোকার কীর্তি রাষ্ট্র হইয়া গেল। কত মুখে বিদ্রূপের হলাহল উদ্‌গীরিত হইতেও লাগিল। বধূরও ভ্রান্তি ঘুচিল বোধ হয়; কিন্তু একজনের মনে কেমন করিয়া সত্যের একটি শিখা অম্লান আলোয় জ্বলিয়া রহিল।....'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'দেবী' গল্পে মানুষের ওপর ঈশ্বরভাবনা আরোপ করে পরে বধূর আত্মহননে মৃত্যু ঘটিয়ে আবার মানব বিশ্বাসে ফিরে এসেছেন। বিভূতিভূষণ তাঁর সৃষ্ট কেন্দ্রীয় চরিত্রে ঈশ্বরের ভাবনার বিশ্বাসের ভ্রান্তিকে সত্য করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের কল্পিত দেবী সর্বমানুষের মাটির মায়ায় মানব-মহিমাময়ী, বিভূতিভূষণের দেবতা লেখক ও চরিত্রের যৌথ বিশ্বাসের মোহে দেবতাতেই সীমা পেয়ে যায়। তাঁর চরিত্র ব্যক্তিক, 'Universal' নয়।

চার

'ননীচোরা' এক বিশেষ চরিত্রনির্ভর গভীর এবং রহস্যজড়িত উপলব্ধির ধর্মীয় দার্শনিকতার গল্প। গল্পের নামহীন বিধবা শাশুড়ির গভীর বিশ্বাস ও সংস্কারের অনুবর্তী এক অলৌকিক ঈশ্বর-অভিজ্ঞতাব কথাকে গল্পরসে সচিত্র করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ ছাপোষা বাঙালি ধর্মান্ধ পরিবারের পরিবেশে বাড়ির এক শিশুসন্তানেব আচার-আচরণের কৌতুকরস ও বাৎসল্য রস সম্মিলিতভাবে গল্পটির নির্মাণকর্ম সিদ্ধ করেছে।

গল্পটি আদৌ ঘটনাশ্রয়ী নয়। একটি বিশেষ ভাব—যা বাৎসল্য রসে বিশিষ্ট, তাকেই খোকার মতো শিশুপুত্রের মুক্ত, সরল, সরস, অবোধ রোমাঞ্চ স্বভাবে অভিনব তাৎপর্যে প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু একমাত্র বিধবা ধর্মপ্রাণা সংস্কার-আচ্ছন্ন শাশুড়ি চরিত্রেই এই তাৎপর্য গভীর নিবিড় জড়িত, তাই গল্পের 'ক্লাইম্যাক্স' বিশেষ চরিত্রের ক্রমপরিণতিতেই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু ক্লাইম্যাক্স-এর যে তীব্রতা বা গভীরতা থাকে, বর্তমান গল্পে তা নেই। এ সম্পর্কে আমরা আগে কিছু আলোচনা করেছি। যে শাশুড়ি শিশুদের দিয়ে ঘর ভরিয়ে রাখার প্রবল বাসনা পোষণ করেন, তাঁর শেষ ঘরের শিশুর সঙ্গে পৌরাণিক ও লৌকিক শিশু কৃষ্ণ তথা গোপালের স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেবত্বের ভাবনা ভারসাম্য বজায় রাখে না। গল্পের 'মহামুহূর্ত' তার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় শিল্পের শক্তি হারায়।

অবশ্যই এই সূত্রে ভাবের একমুখিনতার প্রসঙ্গ আসে। গল্পে যেহেতু কাহিনী ও ঘটনার

অতিবিস্তার নেই, নেই টানা কাহিনীর প্লটবৈশিষ্ট্য। শাশুড়ির মানস-প্রবণতা ও যাবতীয় সক্রিয়তা ধর্মভাবনা, পারিবারিক গৃহদেবতার ওপর কঠিন দৃঢ় বিশ্বাস ও গোপাল দর্শন এবং খোকার ওপর আরোপে আহ্লাদের প্রকাশে তাই ছোটগল্পের শরীরী অবয়বে বিশ্বাস আনে।

গল্পের প্রকাশভঙ্গিতে গল্পকারের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। বিস্তারিত বিবৃতিধর্ম থেকে পরোক্ষ ব্যঞ্জনার আনন্দ শাশুড়ির স্বভাবে মেলে। গল্পের বর্ণনায় মেলে সাধুগদ্য, সংলাপে চলিত ও কথ্যরীতির মিশ্রণ। বাঙালির মাটির গুণ—'এদেশে কানু ছাড়া কোন গীত নাই'। কৃষ্ণের নানা বয়সের নানা লীলা, বিশেষ করে শিশুরূপে ননী চুরি করে খাওয়ার মতো বাস্তব শিশুসুলভ আচরণ বাঙালি পরিবার জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যা অনেক সময় দার্শনিক পর্যায়ে চলে যায়। গল্পকার সেই জীবনের ও জীবনদর্শনের একজন ঘোষক। শাশুড়ির বিশ্বাসে মেলে লেখকের জীবনকে ধর্মীয়ভাব দেখার গভীর বাসনা। শাশুড়ি যখন বউমাকে বলেন, 'আজ গোপাল .... যেন ঘর আলো ক'রে এলেন', যখন বধূকে সর্বশেষ এক আদেশ করেন : 'কাল থেকে খোকার জন্যে ছোট্ট একটি নৈবিদ্যি আমার আসনের পাশে রাখা থাকবে বউমা, যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে।'—তখন এই গল্পের পরিণতি চিত্রে বাঙালির দেশ-কাল-জীবন প্রবাহিত প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসই দর্শনের দাবিতে প্রতিষ্ঠা পায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অবিবাহিত ছিলেন, সারাজীবন একান্নবর্তী পরিবারে থেকে বাৎসল্যে পারিবারিক শিশুদের নানা খেলা, কথা, দুরন্ত স্বভাব, কৌতুককর আচরণ উপভোগ করেছেন। বর্তমান গল্পে সেই পারিবারিক জীবনের অন্তঃশীল নিবিড় অভিজ্ঞতাই বুঝিবা শাশুড়ির কথাচিত্রে থেকেছে ওতপ্রোত। পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে অবশ্য লেখক বেরিয়ে আসতে পারেননি, হয়তো চাননিও! তবে শিল্পের শরীরে তার উত্তরণ একান্ত কাম্য, নবভাষ্যের অন্তরশক্তিতে তার অসীম স্বভাব বাঞ্ছনীয়।

পাঁচ

গল্পের নাম 'ননীচোরা'। এই নামে কোনো চরিত্র-ব্যক্তিত্ব গল্পে নেই। তবে পুরাণ ও লোকশ্রুতি প্রবাহিত আখ্যান ধরলে স্বভাবের ব্যঞ্জনায় এমন শব্দ মেলে শিশু ও বালক কৃষ্ণের, দেবতার কৌতুককর চিত্রের পটে। বিধবা শাশুড়ির প্রিয় নাতি, 'খোকা' যার সাধারণ ডাকনাম, তার ওপর যখন বালক গোপালের ভাবমূর্তির আরোপ ঘটে, তখন তা 'ননীচোরা' গল্পের মূল বিষয়ের সামীপ্য পায়।

শাশুড়ির একমাত্র আরাধ্য ধর্ম ও সংস্কারের দেবতা কৃষ্ণই। তাঁর সারাদিনের কাজে-কর্মে, পুজোর ঘরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারের ধ্যানে কৃষ্ণই, তাঁর সাক্ষাৎলাভের বাসনাই চরম ও পরম সত্য। সেই সত্যের প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর প্রেম ভক্তি প্রীতির মঙ্গলঘট ও নৈবেদ্য সাজানো। গল্পের শেষে সকলের আড়ালে খোকার যে বাটির ক্ষীর খাওয়া—তা পুরাণকাহিনীর সমান ও সমান্তরাল ছবি। যদি বলা যায় খোকার গোপনে ক্ষীর খাওয়ায় ওই বাস্তব চরিত্রের বিবর্তন স্পষ্ট ও লক্ষ্য, তা হলে 'ননীচোরা' নাম সাধারণভাবে যথার্থ।

কিন্তু গল্পের গভীর তাৎপর্যে শাশুড়ির ধ্যানে ধরা গোপালই হয়েছে 'খোকা'। তাঁর শিশুপ্রীতি দেবতাপ্রীতিই। আবার সেই শিশুপ্রীতি তাঁর পরিবারের প্রিয় সদস্য 'খোকা'র মধ্য দিয়ে মূর্ত হওয়ার মুখে। অর্থাৎ খোকার ভালবাসার, দৌরাত্ম্য, আবেগ-আবদার-অভিমান, দুরন্তপনা, চুরি করে ক্ষীর খাওয়া, খেলার ছলে সারা বাড়ি চষে বেড়ানো—সবই প্রতীকী হয় পুরাণের গোপালের আখ্যানধর্মে। গল্পের নামে বাস্তব খোকা ও পুরাণের গোপাল হয়েছে একাকার। শাশুড়ির কাছে খোকা ও গোপাল যৌথরূপে ও স্বভাবে এক। মূল বিষয়ের সঙ্গে এমন নাম এই সূত্রে সার্থক।

৩.

হৈমন্তী

এক

'হৈমন্তী' গল্পটি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি পরিচিত প্রেমের গল্প। 'হৈমন্তী' নামে গল্পকারের একটি গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে ১৩৫১ সালে ইংরেজি ১৯৪৪-এ। তারই অন্যতম নামগল্পটি বর্তমানে আলোচ্য। যিনি সাহিত্যজীবনে শিশুদের নিয়ে একাধিক গল্প লিখে স্বতন্ত্র আসন পেয়েছেন, প্রবল হাস্যরসের প্রবাহে একাধিক গল্পে প্রায় অবগাহন-স্নানে একজন মুক্ত-শিল্পী, তিনি প্রেমের গল্প রচনায় কোন আবেগ-মনস্কতার অধিকারী? বিশেষ করে 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে প্রেম বিষয় নিয়ে লেখক স্বয়ং যখন এমন মন্তব্য করেন :

> 'একে একটা মোহ, নিতান্তই রূপ মোহ ভিন্ন আর কি বলা চলে? একটা ইনফ্যাচুয়েশান (Infatuation)। এফিমিরিয়েল (Ephimerial) নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, অলীকই বলা চলে, তাকে এথেরিয়াল (Etherial), স্বর্গীয়, সুতরাং কালজয়ী করে দেখানো; এসে যায় না কি ভেজাল এগিয়ে দেওয়ার কথা'।

বারবার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কল্পনাময় পরিভ্রমণেই তো একজন স্রষ্টার সৃষ্টির উন্মাদনা বড় তাৎপর্যে কবিত্বময়তা পায়। আপন এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায়, বিপরীত দাবি নিয়েও স্বাভাবিক হতেই পারে। এটা কোন চিন্তাভাবনার বিচ্যুতি নয়, জীবনকে নানা-খানা দেখার চঞ্চল আর্তি, অসীম অপূর্ণতার নিত্য বোধন। সমস্ত সচেতন শিল্পীরই এই মানসবিকাশ গ্রহণীয়।

যাই হোক, অন্য একটি প্রসঙ্গ কিছু অংশে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'হৈমন্তী' নামে একটি গল্প লেখেন। হৈমন্তী একটি বধূ চরিত্র যার মধ্যে দেনাপাওনার হিসেব নিয়ে নারীর মনের বিচার প্রধান হয়, তার মিথ্যার পৃথিবী পরিত্যক্ত হয় মৃত্যুর অক্ষয় সত্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ধর্মে। নিশ্চয়ই কোনো প্রতিতুলনা নয়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় আক্ষরিক অর্থে হেমন্ত ঋতুকে ব্যবহার করেছেন গল্পে, যেখানে হেমন্তের বিষণ্নতা, সব হারানোর বেদনা এক আটচল্লিশ বছরের অবিবাহিত মধ্যবয়সের ব্যর্থ প্রেমিক পুরুষকে তার প্রান্তীয় জীবন স্মরণ করায়। একই নামের দুটি গল্পের মধ্যে বিষয়ের বিভ্রান্তি ঘটানোর দিক সামলাতেই আমরা দুটি গল্পের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনার প্রথম পর্যায়ে স্মরণ করাচ্ছি।

'হৈমন্তী' গল্পের আখ্যান-অংশ সামান্য। গল্পের একমাত্র নায়ক সুরেশ্বর গুপ্ত এখন আটচল্লিশ বছর বয়সের অবিবাহিত, পেশায় একজন সফলতম ইঞ্জিনিয়ার। ইনি ছিলেন আজ থেকে বছর কুড়ি আগের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'ফার্স্ট বয়', বর্তমানে সফল কৃতী, তার কাজে একবারে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ। সুদর্শন, সুপুরুষ সেই সুরেশ্বর নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ দিকে এসে ফিরে তাকায় তার কুড়ি বছর আগের দিনগুলির দিকে, ভেসে ওঠে সে সময়ের সাত দিনের প্রথম ও শেষ রোমান্সের দিনগুলির নস্ট্যাল্‌জিক একাধিক স্মৃতিখণ্ড। সেগুলি যেন নায়কের এলোমেলো চিন্তার মধ্যে জাগিয়ে দেয় নতুনভাবে মনের গভীরে জীবনের লাভ-লোকসানের খতিয়ান। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, একমাত্র তপস্যা ছিল কাজ। কাজের মোহে, প্রীতি ও দায়িত্বে, কর্তব্যনিষ্ঠায় সুরেশ্বর একদিনও নিজের দিকে তাকাবার সুযোগ পায়নি। বর্তমানে অফিসের স্টেনো-টাইপিস্ট নিয়োগে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজন মহিলাকে ইন্টারভিউ-এর সময় দেখে অতীত যেন বেজে ওঠে ধীরে ধীরে। প্রার্থীর নাম অমিতা সেন। । সদ্য পাস করে সুরেশ্বর তখন এক ফটোর দোকানে নিজের ছবি তোলে। দোকানের মালিক সুরেশ্বরের ছবিটিকে শো-কেসে দেখায় সুরেশ্বরের মতো নিয়েই। আর ছবির পাশেই একটি সুন্দর মেয়ের ছবি দেখে। ছবি দেখে সুরেশ্বরের মনের গভীরে তীব্র রোমান্টিক প্রেম-ভাবনার জন্ম হয়। ক্রমশ প্রকাশ পায়, মেয়েটির পরিচয় দোকানের মালিক জানে। মেয়েটি ওর কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। একদিন দোকানেই মেয়েটিকে দেখে সুরেশ্বর ওর ছোটভাই ও বড় ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে। সামান্য আলাপ হয়। সুরেশ্বর ও অমিতা সেনের ছবি শো-কেসে পাশাপাশি থাকায় ভ্রাতৃজায়া ও ভাই মানিয়ে যাওয়ার জন্য কৌতুকও করে। অমিতা সেন তখন লাজুক, নম্র, সুরেশ্বরের কাছে নিজেকে আড়াল করে সেই স্বভাবসিদ্ধ লজ্জায়। মাত্র সাতদিনের আত্মগত রোমান্সে সুরেশ্বর বিভোর হয় কিন্তু সদ্য পাস করা সুদর্শন, কৃতী ছাত্র সুরেশ্বর পরিচয় পর্বের সাতদিন পরেই এক বড় কন্ট্রাক্টরের ফার্মে নতুন কাজে যোগ দেওয়ার নিয়োগপত্র পেয়ে হাল্কা রোমান্সের জীবন ছেড়ে কাজে যোগ দেয়। সেই কাজই তার সাফল্যের আগুনে তার রোমান্স-রসসমৃদ্ধ জীবনের পরিপূর্ণ ইতি এনে দেয়। আজ ইন্টারভিউয়ে দেখা সেই অবিবাহিতা তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়সের অমিতা সেনকে দেখে স্মৃতি ধরে চিনতে পারে ক্রমশ। অমিতা সেন ওকে চিনতেই পারে না এই কুড়ি বছরের ব্যবধানে সুদূরতায়। অমিতা সেনকে নিতে পারেনি সুরেশ্বব সেই কাজ ও তার মধ্যেকার বিষণ্ণ বেদনার বোধ ও যন্ত্রণায়। বর্তমান চেহারায় অমিতা সেন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মনে জাগে সুরেশ্বরের, কিন্তু সেই আগের রোমান্সে বর্তমান অমিতা সেন একেবারেই অধরা। কাজপাগল ও কাজসফল ব্রতধারী সুরেশ্বর সেই বিষণ্ণতা ও নিঃসঙ্গতা নিয়েই একা হয়ে যায়। কেবল দীর্ঘশ্বাসেই তার মন-প্রাণ হয় সুদূর, ব্যর্থ।

হৈমন্তী গল্পের যে আখ্যাননির্ভর কাঠামো, তাঁর নির্মাণে লেখক একমাত্র সুরেশ্ববের ওপরেই দায়িত্ব দিয়েছেন। গল্পে ঘটনা নেই, বদলে আছে নায়কের নিজস্ব মনোভূমি থেকে জাত বিরহ-বেদনা-বিষণ্ণতার এক উদাসীন বিকাশ। কাহিনী আড়ম্বরপূর্ণ নয়, ঘটনা

আখ্যানের কোনো সূত্রবদ্ধতায় সহায়ক শিল্পমাধ্যম হয়নি। অথচ গল্পে প্লট আছে, প্লটের ক্লাইম্যাক্সও অ-স্বচ্ছ নয়। এক মধ্যবয়সী অবিবাহিত, ক্লান্ত পুরুষের গল্প বলতে গিয়ে গল্পকার কিছু সূক্ষ্ম অসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতার দিককে মেনে নিয়েছেন। ১. গল্পে ব্যানার্জিবাবুর দোকানে অমিতা সেনের ভ্রাতৃজায়া ও ছোটভাই—এদের সঙ্গে যুবক সুরেশ্বরের পরিচয় হয়ে যায়, 'পরিচয়ে পরিচয়ে একটু সম্বন্ধও বাহির হইয়া পড়িল', মিস্টার ব্যানার্জির সমর্থনসূচক সকৌতুক মন্তব্য : 'আপনাদের বৈদ্যদেব তো সম্বন্ধ না বেরুলেই আশ্চর্য'—এবং 'নূতন প্রীতিতে হাসি একটু বেশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, নিমন্ত্রণ পর্যন্ত গিয়া উঠিল,'—সেখানে নায়কের হঠাৎ প্রথম ও নতুন চাকরির কাজের চাপ সদ্য রোমান্স ও সম্পর্ককে ক্রমশ একেবারে আড়াল করবে—এই কাহিনীর শিল্প-ন্যায় (logic)-এ তা কিছুটা অস্বাভাবিকতা, অসঙ্গতি দেখায় না কি? ২. গল্পে নায়ক জানায় তার অমিতা সেন, তার ছবি দেখার পুলকের মধ্যে সাতদিনের বোমান্স-এর কথা বলেছেন। শুধু ফটোর ছবি দেখে, এক সময় চাক্ষুষ মেয়েটিকে দেখার পর থেকে মোট সাতদিনের অস্থিরতায় দিন কাটানোর পর (প্রথম দর্শনেই এই প্রবচনবাক্য মেনে নিলেও) বলা যায়, একজন যুবক মেয়েটির সঙ্গে পরিপূর্ণ অদর্শনের প্রৌঢ়ত্বে এসে সেই আবেগে চরম আতিশয্যে রোমান্সকে স্মরণ করবে—এটাও কি কাহিনীর যুক্তিপরম্পরাকে দুর্বল করে না? ৩. প্রথম তীব্র রোমান্সের দেখার পর থেকে কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে অমিতা সেনও কি সুরেশ্বরকে একবারও মনে করতে পারত না! অমিতার দিক থেকে কোনো সামান্যতম সন্দেহ বা প্রতিক্রিয়া না থাকায় মনের সূত্র-সংযোজনে কাহিনীর মধ্যে কোথাও ফাঁক তৈরি হয়! ৪. ক্রমশ মানসিক সংশয়ের মধ্যে অমিতা সেনকে ক্রমে ক্রমে চিনতে শুরু করার পর, আটচল্লিশ বছর বয়সের নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতায়, ক্লান্তিতে কি সুরেশ্বর অমিতাকে চাকরি দিয়ে বয়সের আশ্রয় বলে ভাবতে পারত না—যেখানে মেয়ে স্টেনো রাখার মালিক সুরেশ্বর নিজেই? আমাদের মনে হয়, এই সূত্রে কাহিনীর মধ্যে প্লটের জট কঠিন ও শিল্পসম্মত হত।

আসলে গল্পকার এমনভাবে কাহিনীর জট ভেবেছেন, যা নায়কের দিক থেকে সম্পূর্ণ একপক্ষীয়। অমিতা সেনের কোনো মানসিক দায়-দায়িত্বই নেই। এইভাবেই গল্পের প্রকরণে অন্তঃশীল স্বভাবে আছে শৈথিল্য। শুধু সুরেশ্বরের কাজপ্রীতি ও কর্মব্যস্ততা কাজের আনন্দ ও সাফল্যজনিত অন্ধ মোহ প্লটের সীমায় অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। নায়কের রোমান্স, তার আবেগ শিল্প-ন্যায়ের গুরুত্ব হারায়। চাকরি পাওযার আনন্দের আবেগ ক্রমশ শিথিল হলে আটচল্লিশ বছরের জীবনে সুবেশ্ববের মানস ভিত্তি কি একটানা নিজের সম্পর্কে যুক্তিহীনই থেকে যায়!

গল্পের 'চরমক্ষণ' অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স বিচারে যদি নায়ক চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে ভাবা যায়, তবে নায়কের এমন ভাবনাতেই তার যথার্থ স্বরূপ : 'কী একটা আনন্দ! কী আনন্দ—এক মুহূর্তেই কোথায় ভাসিয়া গেল রোমান্স! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফার্স্ট বয়—সে কি এই ফিনফিনে হালকা একটা রোমান্সের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল? সুরেশ্বরের

জীবনের রোমান্স তো কাজ—কাজ—শুধুই কাজ—' এখানেই চরিত্রের চরম অভিজ্ঞতার নিষ্ফলত্ব, তার নিয়তি। আবার যদি সমগ্র গল্পের প্লটনিহিত 'চরমক্ষণ'টিকে বিচার করি, তা হলে চরিত্রই সব নয়, তা মেলে গল্পের মূল ভাবের রসনিঃসৃত শৈল্পিক যথাযথতায় সাঁওতাল পুরুষ-রমণী-র প্রতীকে নায়কেব আত্মগত ভাবনায় :

> .....'কোথায় যেন সুরেশ্বর আরও দুইজনকে দেখিতে পাইতেছেন মাঝে মাঝে — দুইজনেই অনেক আগে-পিছে, নিঃসঙ্গ শ্রান্ত ব্যর্থ.....কেহ কাহাকেও পাইবে না জীবনে। নীড় নাই সোনার ফসলও নাই; শ্রান্ত সন্ধ্যায় কোথায় গিয়া কি গুছাইয়া তুলিবে?'

সমগ্র প্লটের এমন 'চরমক্ষণে'ব চিত্রে গল্পকার আর এক অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছেন। সুরেশ্বর তো একবারও অমিতা সেনকে নিজের মতো করে তার আচারে ব্যবহারে ইন্টারভিউ-এর সময় দেখেনি, তা বোঝায়ওনি। অমিতা সেন তো তাকে চিনতে পারেনি। সেরকম কোনো মনোভাব গল্পে তিলমাত্র নেই। তাহলে অমিতা সেনকে জড়িয়ে দুজনের সেই 'নিঃসঙ্গ শ্রান্ত ব্যর্থ' জীবনেব কথা ভাবে কেন? কোন শৈল্পিক আধারে সুরেশ্বরের এই যৌথজীবন মিলিয়ে আক্ষেপ? সমগ্র গল্পে তার চিত্র-স্বীকৃতি নেই। গল্পের শেষতম প্রতীকপ্রতিম বাক্য : 'অস্তবাগের শেষতম আভাসটুকুও আকাশে মুছিয়া গেল।' গল্পের একেবারে প্রথম প্যারাগ্রাফ-চিত্র ও গল্পেব শেষতম পরিণতি-বাক্যের ব্যঞ্জনায় লেখক-চিন্তিত গল্পের মূলসুর রক্ষিত।

দুই

'হৈমন্তী' গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ইংবেজি ১৯৪৪ সাল, অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রবল প্রতাপে পা ফেলতে ফেলতে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ঔপনিবেশিক ভাবত তথা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে চলেছে। গ্রন্থভুক্ত 'হৈমন্তী' গল্পটি যে এমন এক উত্তাল সময়ে বচিত, সহজবোধ্য হয়। যুদ্ধ-সমকালে দেশজুড়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলে—তা স্বাভাবিক। বিদেশি সাহেবদের আনাগোনা চোখে পড়ার মতো। যুদ্ধের আগে বাংলা তথা ভারতে পারিবারিক একান্নবর্তিতা রীতিমতো ভাঙতে থাকে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাঙালি মেয়েরাও সংসার ছেড়ে বাইরের কাজে নিজেদের যুক্ত করে। 'হৈমন্তী' গল্পে যে যুদ্ধের পরোক্ষ পটভূমি আছে, গল্পের নিবিড় পাঠে সহজেই তা বোঝা যায়। যুদ্ধের প্রয়োজনে, কখনো বা স্বল্প প্রয়োজনের তাগিদে বেশ বড় বড় কনস্ট্রাকশন-এর কাজ চলতে থাকে। গল্পের নায়ক সুরেশ্বরের কথায় : 'পাশের জংশন স্টেশন হইতে প্রায়ই সাহেব-সুবোরা দেখিতে আসে কৌতূহলী দর্শক হিসাবে, এমনকি হাওড়া-লিলুয়া থেকেও ছুটি-ছাটায় অজ্ঞাতকুলশীল সাহেবদের আমদানি হয়।' নায়ক সুরেশ্বর প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর 'ফার্স্টবয়' হিসেবে পাস করেই বড় কন্ট্রাক্টারের ফার্মে বড় দায়িত্বের কাজ পায়। সুবেশ্বর অমিতা সেনকে স্টেনো-টাইপিস্টের কাজে নিয়োগ নিয়ে জটিল চিন্তার মধ্যে এমন কথা ভাবে : 'বাঙালি মেয়েরাও তো আপিসে বাহির হইতেছে আজকাল—'

এইসব পরোক্ষ চিন্তাভাবনা ও মন্তব্যে বোঝা যায়, গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রচিত। বিভূতিভূষণের নায়ক সুরেশ্বর এই পরিবেশে বড় কাজের দায়িত্বে থেকে কাজ, তার সাফল্য, তার জন্য পাওয়া প্রশংসা, অক্লান্ত পরিশ্রম, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন, নীরস কাজের মধ্যে নিজেকে সর্বাংশ বিক্রি করে দেওয়া—এসব বৈশিষ্ট্যে এক যন্ত্রের মতো মানুষ। তার কাজ তাকে সেই চাকরির সূচনাকাল থেকে এই আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সবরকম রোমান্সবিমুখ নিগূঢ় বাস্তব স্বভাবে কর্মব্রতী করেছে।

আমাদের কথা হল, এই যে একজন সফল কর্মীর কথা দিয়ে গল্পের মূল ভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন গল্পকার, তা অবশ্যই গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে গভীর নিবিড় জড়িত। এই কেন্দ্রীয় ভাবটি বিশ্বাস্য শিল্পরস-মণ্ডিত হয়েছে একমাত্র নায়ক সুরেশ্বরের মধ্য দিয়েই। অপরাহ্নের ম্লানিমা, বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা, অসীম কাজের গতির বিপরীত দিকের অভিজ্ঞান। সুরেশ্বর কুড়ি বছর পরে আটচল্লিশ বছরের প্রায়-গত মধ্যবয়সে এসে তার জীবনে প্রথম দেখা অমিতা সেনের স্মৃতিতে বার বার বেদনাহত হচ্ছে। এটা তার কাজের নিয়তি। জীবনের পূর্ণতা এক মেরু ধরে আসে না। জীবনের মধ্যাহ্ন অবস্থা অতিক্রম করে অপরাহ্ণে সুরেশ্বর, এখন তার প্রাণাবেগ স্তিমিত।

ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ এসেছে কাজের অতিরিক্ততার, সাফল্যের প্রীতির ভিতর থেকে। কাজে ছিল প্রবলতম প্রাণশক্তির আবেগ, জীবনের মর্মমূলে এনেছে নিরাবেগ। যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির বিকাশে প্রবল বাধা যন্ত্রনির্ভর জীবনের ধাতব শক্তি। সুরেশ্বর তারই শিকার। যখন সে বোধ আসে, তখন তাব অসহায়তা সীমাহীন, সমস্তরকম মীমাংসার, প্রত্যয়ের অতীত। 'হৈমন্তী' গল্পে কেন্দ্রীয় ভাব তথা বক্তব্যে এই চিন্তা থাকার জন্যই গল্পটির লক্ষ্য—যা লেখকেরও বিশেষ জীবন-দেখার অনুগ, তার শিল্পভিত্তি—একপক্ষীয় হলেও মান্য।

তিন

'হৈমন্তী' গল্পের চরিত্র বিচারে বৈচিত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। গল্পের একটিমাত্র চরিত্র—নায়ক সুরেশ্বরই সমগ্র গল্পের চরিত্র—ছোট বড়—সকলকেই—আচ্ছন্ন করেছে। আমরা সুরেশ্বরকে শিল্পের মাপে বিচার করব, কিন্তু আত্মকথনে ও আত্মআবিষ্কারে সুরেশ্বর আমাদের দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকাতে বাধা সৃষ্টি করে। সুরেশ্বরের কারণেই অন্যসব ছোট চরিত্র ছায়াবৃত। সুরেশ্বর নায়ক এবং তারই ব্যর্থতা, হতাশ্বাস, বিষণ্ণতা, অসহায়তা এমন দীর্ঘভাবে শ্বসিত সারা গল্পে যে, অন্য গৌণ চরিত্র একবারেই পাঠকদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় অনায়াসে।

অমিতা সেন একেবারেই গৌণ হয়ে গেছে গল্পকারের নায়ক চরিত্র উন্মোচনের প্রয়াসে। অথচ অমিতা নায়িকা হতে পারত। ব্যানার্জির ফটোর দোকানে নিজের ছবির পাশে তরুণী অমিতার ছবি দেখে রোমান্টিক স্বভাবে মুগ্ধ সুরেশ্বর গল্পে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং সব ছেড়ে বড় মাপের কাজে যোগ দিয়েছে বড় কাজের গুরুভার দায়িত্ব

নিয়ে, তাতে অমিতা সেন যেনবা 'কাব্যে উপেক্ষিতা'! মিস সেনের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয় সুরেশ্বরের। স্বাভাবিক লজ্জায় দুজনেই আড়ষ্ট। অমিতা সেন সুরেশ্বরকে যখন নমস্কার জানায়, তখন সুরেশ্বরের রোমান্টিক মনের স্বীকৃতি : 'কত মধুর। হৃদয়ের মধ্যে কি নূতন জগতের তোরণ খুলিয়া গেছে, নমস্কার নয় তো, করজোড়ে সেই স্মিতময়ীকে যেন সেই নূতন জগতে আমন্ত্রণ করিয়া লওয়া।' তারপর লক্ষ্ণৌয়ে সুরেশ্বরের কাকার ডঃ হেম গুপ্তের সঙ্গে আত্মীয়তার পরিচয়ে মিসেস সেনের অন্তরঙ্গ আচরণ, ব্যানার্জিবাবুর বৈদ্যদের মধ্যেকার পারস্পরিক সখ্যতার সম্বন্ধ নিয়ে কৌতুক, অমিতার ভাই ও ভ্রাতৃজায়ার সুরেশ্বরের পাশে অমিতার ছবির সুন্দর মিলে কৌতূহলী হওয়া, অমিতার লজ্জা, সুরেশ্বর ও অমিতাকে ছবি দেখার জন্য অনুরোধ, অমিতার সলজ্জ এড়িয়ে যাওয়া, — সুরেশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তায় মিসেস সেনের নিমন্ত্রণের পর্যায়ে সম্পর্ককে চিন্তা করা—এসবই কিন্তু সুরেশ্বরের সঙ্গে অমিতাদের স্থায়ী সম্পর্ক হওয়ার প্রাথমিক পর্ব সূচিত করে। তাতে বড় চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও কেন সুরেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকল না—এটাই বিস্ময় জাগায়। অমিতা সেন এখানেই মূল গল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে ইন্টারভিউয়ের সময় অমিতার সুরেশ্বর নাম ও তাকে চাক্ষুষ দর্শনেও Passive থেকে যায়। ফলে অমিতা একেবারেই গৌণ হয় কেন, তাতে চরিত্রের চিত্রে অসঙ্গতি স্পষ্ট হয়।

সুরেশ্বর চাকরি ক্ষেত্রে কাজের প্রবল চাপ, কাজের একের পর সিঁড়ি অতিক্রমে ক্রমশ ওপরে ওঠার সাফল্যজনিত প্রীতি এবং সুখ, কাজের প্রশংসার মোহ নিয়ে জীবনের রোমান্সের দিক বিস্মৃত হয়। কিন্তু আমাদের কথা, চাকরি ক্ষেত্রে তো নিয়মিত নির্দিষ্ট ছুটি থাকে, তা ওভারটাইমে অনিয়ম মানলেও কাজের চাপ কমলে তা ভোগে অসুবিধে হয় না। তা হলে সুরেশ্বরের পক্ষে আটচল্লিশ বছরের চাকরি জীবনে রোমান্সে নিজেকে রাখতে পারেনি, এই যুক্তিতে গল্পকারের চরিত্র আঁকায় ফাঁক স্পষ্ট হয়। গল্পের শিল্পন্যায়ে সুরেশ্বর চরিত্র সীমা পায়। তাছাড়া এক তরুণীর সাতদিনের মধ্যে তার ফটো দেখে যে প্রবলতম রোমান্সে মেতে ওঠে, তাতে যদিও পাত্রীর ফটো দেখেও পুরুষদের প্রেম ও বিবাহের যোগাযোগে অস্বাভাবিকতা থাকে না, তবু সুরেশ্বরের সাতদিনের মনোভঙ্গির আতিশয্য (Excess) চরিত্র শিল্পের সম্ভাব্যতাকে (Probability of art) কিছুটা অবিশ্বাস্য করে। সুরেশ্বরকে নিয়ে যে গল্প, তাতে তার মধ্যবয়সের প্রেমহীন বিবাহহীন সংসারহীন ব্যর্থ, বিষাদগ্রস্ত, কাজপাগল সত্তার নৈরাশ্য, হতাশা, নিঃসঙ্গতার সুন্দর চিত্র সামনে আনে। কিন্তু সেই শেষ বয়সে যখন অমিতা সেন অবিবাহিত থেকে তার সামনে আসে তাকে চিনতে না পেরেও, তাতে সুরেশ্বর মধ্যবয়সের গভীর শূন্যতার দাবিতেও তো অমিতার সঙ্গে একই মঞ্চে জীবন শুরু করতে পারল না কেন? সুরেশ্বর চরিত্রের এই নীরবতা চরিত্রের ন্যায়ে কোথাও বুঝি ঘাটতি দেখায়।

গল্পের শেষে সুরেশ্বরের বকলমে গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বুঝিবা তাঁর আঁকা চরিত্রের ভিতরপ্রদেশ দেখিয়েছেন এই ভাষায় :

......'একটানা কর্মের জীবন—সাফল্যের পর সাফল্য, যশের পর যশ, উন্মাদনার

> গায়ে উন্মাদনা—ডাইনে বাঁয়ে দেখিবার অবসর হয় নাই। রোমান্স এমন গেল ধুইয়া মুছিয়া যে অতি ঘরোয়া যে রোমান্স বিবাহ, সেটাও কেমন যেন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল—প্রায় হেয় একটা ব্যাপার।'

রেলের প্রখ্যাত কন্ট্রাক্টর সুরেশ্বর ইন্টারভিউয়ের পর মিস. অমিতা সেনের কথা নতুন করে ভেবেছে। সুরেশ্বর কিন্তু অমিতা সেনের স্মৃতি ধরে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস শোনায়নি, তার কর্মের জীবনের অসম্ভব ব্যস্ততায় নিবদ্ধ থাকার কারণে যে উন্মাদনাময় যশপ্রাপ্তি—তাতেই তার ব্যর্থ জীবনের 'victim'। এত বছর পরে অমিতা উপলক্ষ্য। সাধারণভাবে দেখা যায়, ছেলেরা চাকরি না পেলে, পালিত বোন, ভাই, আত্মীয়দের মানুষ করার ব্রতে, পারিবারিক ঝামেলায় নিজের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনবরণ করতে বাধ্য হয়। সুরেশ্বর তা নয়। এতদিন পরে সে যখন ভাবে নিজের কথা—যা লেখকেরই নিজস্ব জিজ্ঞাসা:

> 'কে ছিল অমিতা? সেই সচ্ছল অবস্থা কোথায় গেল? কেন গেল? অমিতাও বিবাহ করিল না কেন? আজ আসিয়াছিল কেন সে? জানিয়া শুনিয়াই কি? আর আশ্চর্য—একটিমাত্র বাঙালির মেয়েকে বাছিলেন সুরেশ্বর—সেই অন্য কেহ নয়, সে বিশ বৎসর আগেকার সেই অমিতা, এত আশ্চর্য ব্যাপারও ঘটে জীবনে। অমিতাকে যায় না আর ফিরাইয়া আনা?'

এত প্রশ্ন-এর উত্তর অমিতার সঙ্গে এতদিনের নিরঙ্কুশ বিচ্ছিন্নতার পর, অমিতাব অচেনা হয়ে ওঠার পর মিথ্যা, প্রয়োজনহীন আর এক বিলাসের স্বাদ দেয়। প্রশ্ন ওঠে, সুরেশ্বরের এই সব কথা কি আটচল্লিশের মধ্যবয়সী সময়ে যুক্তিসঙ্গত, মানানসই? সারা গল্পে সুরেশ্বরের বিবর্ণ, বিষাদময়, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, শ্রান্ত ব্যর্থ জীবনের যে অভিজ্ঞতা আনে, তাকে গল্পের সামগ্রিক পরিবেশে সুন্দর চিত্রিত স্বাদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্যে, কিন্তু নায়ক চরিত্রের একাধিক শিল্প-সীমা পাঠকদের অতৃপ্তির দিক বড় করে দেখায়।

চার

'হৈমন্তী' গল্পে গৌণ চরিত্রের কোনো প্রাধান্য নেই; একটিই মাত্র প্রধান চরিত্র—সুরেশ্বর। তার জীবনের চরম ব্যর্থতার চিত্র আঁকতে গিয়ে গল্পকার ভাবের একমুখিতার দিক নিশ্চয়ই লক্ষ্যে রেখেছেন। গল্পটি চরিত্রাত্মক। চরিত্রাত্মক গল্পের বৈশিষ্ট্য মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক এবং নর-নারীর সম্পর্ক প্রধান অবয়ব পায়। সুরেশ্বরের চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য, তার মনের বিশেষ ভাবের ক্রমিক অভিব্যক্তি এবং শেষে বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থতার হাহাকার-এ যে দীর্ঘশ্বাস কানে বাজে, তাতেই গল্পের সিদ্ধান্ত সঠিক, তবে গল্পের প্রথম দিকে গল্পকার কিছুটা নায়কের মানসিকতার পূর্ণরূপের চিত্রে বাড়তি বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন—যা অবশ্যই ছোট হতে পারত। আখ্যায়িকার প্রবণতা না থাকায় গল্পের অবয়ব মেদহীন।

গল্পের শুরুর চিত্র যথার্থই সমগ্র গল্পের লক্ষ্য-বিন্দুর যথোচিত সহায়ক। যে সাঁওতাল পুরুষ-রমণী ও তাদের শিশুসন্তানের চিত্র ও স্বভাব ধরে হেমন্তের অপরাহ্নের পরিবেশের

সঙ্গে লেখক তাঁর পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাতে আছে সমগ্র গল্প বিষয়ে প্রতীকী প্রত্যয়। গল্পের শুরুই বোঝায় গল্পটি কোন রসের এবং গল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য কোন দিকে আঙুল তোলে? গল্প আরম্ভে গল্পকার একটি বিশেষ চিত্র রচনা করে গল্পের চরিত্র ও সিদ্ধান্তকে সমগ্রভাবে কেন্দ্রস্থ প্রতীক করেছেন :

> 'অতি সামান্যই একটি দৃশ্য,—বহুদূরে খোলা মাঠের উপর দিয়া চলিয়াছে একটি সাঁওতাল দম্পতি। পুরুষটির মাথায় এক বোঝা ধান, স্ত্রীলোকটির কোলে একটি শিশু। দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে গল্প হইতেছে, স্ত্রীলোকটি এক একবার মুখ তুলিয়া সঙ্গীর পানে চাহিতেছে। ......আজ হেমন্ত-অপরাহ্ণে এই ফসল তোলার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যটুকু সুরেশ্বরকে কেমন অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে; দুইটি কেমন যেন এক সুরে বাঁধা—সময় আর এই ঘরমুখী গতি;'

আটচল্লিশটি বছর অতিবাহিত করে বিখ্যাত কাজপাগল কৃতী অবিবাহিত নায়ক সুরেশ্বর একক জীবনের যেন এক অপরাহ্ণের শূন্যতার, নিঃসঙ্গতার, ব্যর্থতার পরিবেশে দেখছেন নিজেকে সাঁওতাল দম্পতির পূর্ণ জীবন-স্বভাবের আয়নায়। সাঁওতাল পরিবারের জীবনচিত্র একাধিকবার গল্পের মধ্যে ব্যবহার করেছেন গল্পকার তাঁর নায়কের মনের বিকাশের উত্থান-পতনের মেজাজ ধরে। পথের ধারে ক্ষণিক বিশ্রাম, আবার ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে তাদের উৎসাহিত গতির চাঞ্চল্য, হেমন্ত গোধূলির প্রেক্ষিতে নদীর বালুতটে সাঁওতাল পুরুষের জলের স্পর্শে শ্রান্তি বিনোদন, স্ত্রীর মাথার খোঁপায় জবাফুল গোঁজার সুখ-তৃপ্তি, প্রথম সূর্যাস্তে যত মেঘের গায়ের রঙ জড়িয়ে নিয়ে সাঁওতাল দম্পতির মন্থর-গতি প্রত্যাবর্তন, সবশেষে প্রতীকের পরিণত ব্যঞ্জনায় গল্পকার প্রতীকের সত্য ও নায়কের জীবনসত্য এক করে নিবিড় ব্যঞ্জনার স্বাদ দিয়েছেন আমাদের। বস্তুত সমগ্র গল্পে সাঁওতাল-দম্পতির জীবন-সুখের যে পূর্ণতার সীমায় বিবর্তনের স্বরূপ, তা সুরেশ্বরের শূন্য জীবনে একাকার হয়ে বিপরীত হতাশাকে নিবিড় করে। সাঁওতাল চিত্রের অপরাহ্ন-স্পর্শের হৈমন্তিক ব্যঞ্জনা ও সুরেশ্বরের মন একাকার। সমগ্র গল্পে এই প্রতীকের সার্থক ব্যবহার 'হৈমন্তী' গল্পের শিল্প-মর্যাদা বাড়ায় :

> .... 'সাঁওতালী দম্পতি নদী পারাইয়া গেছে, তীরে ঢালুতে দুইটি কালো রেখার মত তাহাদের দেখা যায়—গতি মন্থর; তবু প্রাণবন্ত। পুরুষটির মাথায় ধানের ফসল সোহাগের দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছে।
>
> এরই পাশে কোথায় যেন সুরেশ্বর আরও দুইজনকে দেখিতে পাইতেছেন মাঝে মাঝে—দুইজনেরই অনেক আগে-পিছে, নিঃসঙ্গ শ্রান্ত ব্যর্থ .....কেহ কাহাকেও পাইবে না জীবনে। নীড় নাই সোনার ফসলও নাই;'

সুরেশ্বর অমিতা সেন ও নিজেকে যুগলবন্দী করার মানসিকতায় অস্তরাগের শেষতম আভাসের মুছে যাওয়া ও অতন্দ্র অন্ধকারের বরণকেই নিয়তি-নির্দিষ্ট ভাগ্য মনে করে। কাজের উন্মাদনা থেকে সরে এসে নিজের বাসস্থানের ডেকচেয়ারে অলস বসে থেকে

সারা গল্পে যে নায়কের মানসিক নিঃসঙ্গতার 'Soliloquy' (স্বগতভাষণ) লেখক রচনা করেছেন, গল্পের প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বই তার অন্যতম শিল্প-সম্পদ।

গল্পটি নায়কের মন ধরে সাধুগদ্যে রচিত আদ্যন্ত। ভাষাগত এই রীতি গল্পরসকে ব্যাহত করেনি।

পাঁচ

গল্পের নাম 'হৈমন্তী'। প্রকৃতিতে হেমন্তকাল বলতে বোঝানো হয় হেমন্তের সময় দিয়ে। হেমন্তকাল বলতে মূলত অগ্রহায়ণ মাসকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। হেমন্তের পরেই 'শীত'। হেমন্তের পরিবেশ বেশি দিন থাকে না। কিন্তু এর প্রকৃতির মধ্যে এক বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা নিহিত থাকে। 'হৈমন্তী' গল্পে গল্পকার সেই পরিবেশ দিয়ে নায়কের মনের শূন্যতা বোঝাতে সাঁওতাল দম্পতির ফসল নিয়ে বাড়ি ফেরার চিত্র এঁকেছেন। সাঁওতাল দম্পতিকে ক্রমশ পূর্ণ সচ্ছল সুখী জীবনের প্রতীক করে এঁকেছেন গল্পকার। কিন্তু গল্পের সুরেশ্বরের জীবনে সেই পূর্ণতা নেই। হেমন্তের মতোই তার মনের সঙ্গীহীনতা বেদনাবিধুর, বিষাদময়। নিঃসঙ্গ সংসারশূন্য নায়ক শেষমেশ অন্ধকারকেই বরণ করেছে। তার কর্মপ্রীতি, কর্মের সাফল্যের তৃপ্তি তার আবেগের, হৃদয়ের, পূর্ণ জীবনের সমস্ত কিছুকে নষ্ট করে দিয়েছে। হৈমন্তী পরিবেশ ক্রমশ শীত আনে। ফসল সোনার হয় তার মধ্য দিয়ে বসন্তে। নাযক সেদিক থেকে বঞ্চিত। তাই পরিবেশের প্রতীক দিয়ে নায়কের মন ও জীবনভাগ্য এঁকেছেন বলেই গল্পের হৈমন্তী নামে তার ব্যঞ্জনার সার্থকতা হয়েছে চিত্রল। নাম বিষয-ভাবনা ও চরিত্র-তাৎপর্যে যথাযথ হওযায় গল্পের এমন নামের শিল্পদায়িত্ব মান্য।

৪.

কুইন অ্যান

এক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়েব 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থভুক্ত একটি ভিন্নরসের গল্প 'কুইন অ্যান'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল বাংলা ১৩৪৫ সাল। ইংরেজি ১৯৩৮-এ প্রকাশিত গল্পগুলি, আমরা ধরে নিতে পারি, লিখিত হয়েছে স্বাধীনতালাভের বছর দশেক আগের বা মধ্যের সময়ে। তখনও ভারত পরাধীন, ব্রিটিশ শাসন-শোযণে বিধ্বস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। সে সময়ে ব্রিটিশ প্রভুদের তোষামোদকারী, মেরুদণ্ডহীন ও সুবিধাভোগী কিছু বড় পদের চাকুরে মানুষ ছিল যারা ওপরওয়ালাদের খুশি করতে বা তাদের দযায় জীবনের সবরকম স্বার্থসিদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকত। সেই তৎকালীন সমাজ ও তন্নিহিত মানুষদের কথা বিভূতিভূষণ লিখতে বসে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীকে রেয়াত কবেননি। চরম ও পরম সুবিধাভোগী ব্রিটিশ প্রভুদের পার্শ্বচর মানুষরা, তোষামুদেরা একটা শ্রেণী গড়েছিল।

এই স্তরের একটি মানুযের চরিত্র এঁকে গল্পকাব সেই ব্যক্তি ও সমাজের উদ্দেশে

ব্যঙ্গের চাবুক হাতে নিয়েছেন। 'কুইন অ্যান' গল্পের নির্লজ্জ, অক্ষম ননীগোপাল চক্রবর্তী সেরকম একটি মানুষ। 'কুইন অ্যান' গল্প পড়ার পর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজটীকা' (আশ্বিন, ১৩৫৫ সালে লেখা) গল্পের নবেন্দুশেখরকে এঁকে এই শ্রেণীর ও ব্যক্তির পূর্বসূরির খোঁজ দিয়েছেন। 'কুইন অ্যান'-এর নায়ক রায়সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখে নবেন্দুশেখরকে কলকাতায় এনে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন—'আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।'—সেই কথা মনে পড়ে যায়।

'কুইন অ্যান' গল্পের বিষয়ের কেন্দ্রে আছে একটি পোষ্য অশ্ববিষয়ক পশুর প্রসঙ্গ। অশ্বের নাম জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্ন সাহেবের দেওয়া 'কুইন অ্যান'। প্রসঙ্গত বলতে হয়, বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শরৎচন্দ্র 'মহেশ' নামের ষাঁড়কে নিয়ে গল্প লিখেছেন, লিখেছেন প্রভাতকুমার হাতি নিয়ে 'আদরিণী' গল্প, গৃহপালিত গাভী নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'বুধীর বাড়ি ফেরা', তারাশঙ্কর লিখেছেন 'কালাপাহাড়'। কিন্তু এঁদের গল্পগুলি পশুপ্রীতির একজাতীয় বাৎসল রসের প্রকাশক বিষয় হয়েছে। বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'কুইন অ্যান' সম্পূর্ণ ভিন্ন attitude নেওয়ায় বাৎসল্য কোনো রস নয়, অশ্বকে একমাত্র উপলক্ষ করে এক ব্রিটিশ ব্যক্তিত্বের প্রভুত্বকে সদা স্মরণে রেখে এক বাঙালি রায়সাহেবের আত্মাদরের নির্লজ্জ কাহিনী। নায়কের পদমর্যাদা বজায় রাখতে যাবতীয় মিথ্যাচার, এক অশ্বকে নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের আত্মলোপ চরিত্রের মেরুদণ্ডহীনতাকে পাকা কাঁঠালেব ছিন্নভিন্ন মাছি ভনভন ভূতির মতো ঘৃণ্য করেছে। বস্তুত দীর্ঘ দু'শোর বেশি কাল ঔপনিবেশিক প্রভুত্বে স্বার্থসর্বস্ব চিন্তায় ডুবে থাকতে থাকতে এমন একদল সমাজ-মানুষের শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাদের শ্রেণী-প্রতিনিধি ধবে গল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নিখুঁত করেছে. তাঁর 'কুইন অ্যান' গল্পে।

গল্পের আখ্যাননির্ভর কাহিনী অবয়ব স্পষ্টত অনুপস্থিত, তবে রায়বাহাদুর ননীগোপাল চক্রবর্তীর মতো বিদেশি প্রভুর পদানত থেকে রায়সাহেবের যাবতীয় তৎপরতা একটি ঘটনাহীন কাহিনী-আশ্রয়ে প্লটের কেন্দ্রীয় বন্ধনকে রূপ দেয়। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্ন সাহেব অবসর নিয়েছেন, ফিরছেন স্বদেশ বিলেতে। সঙ্গেব জিনিসপত্তর কিছু বিক্রয়, কিছু দানধ্যানে কমিয়ে এনেছেন। কিন্তু তাঁর পোষ্য ও ব্যবহৃত ঘোড়া—'কুইন অ্যান' নামে পরিচিত—সেটি বিক্রি করতে পারছেন না। ঘোড়াটি ওয়েলার জাতীয, দামী, বিক্রি কবতে গিয়ে দাম পাচ্ছেন না ঠিকমতো। তাছাড়া নিজে ব্যবহার না করে যদি জাত মিথ্যে ব'লে, জাত ভাঁড়িয়ে কেউ বিক্রি করে, এটাও সাহেবের পছন্দ নয়। তার ওপর তাঁর গত দশ বছরে আদরযত্নে পালিত ঘোড়াটি এখন যদি কষ্ট পায় অন্য মালিকের কাছে, সাহেবের তাতেও আপত্তি। এ সময়ে রায়সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটকে মনে পড়ে যায়। একদিন চক্রবর্তী সাহেবের হাত থেকেই খেতাব নিয়েছিলেন, তাঁর খাতিরে যদি ঘোড়া রাখতে রাজি হন—এরকম একটা চিন্তা মাথায় আসে।

উডবার্ন সাহেবের অনুরোধেই রায়সাহেব কুইন অ্যানকে গ্রহণ করেন। নিজেকে সাহেবের একান্ত বিশ্বাসভাজন—এমন স্বীকৃতি মেলায় ধন্যবাদ জানান রায়সাহেব। উডবার্ন সাহেবের ধারণা হয় রায়সাহেব একজন যথার্থ সমঝদার ও হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ার, এবং যথার্থ দক্ষ ব্যক্তি। রায়সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে প্রশংসায় লজ্জিত হয়ে জানান,—'ঘোড়া জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে চড়ার অভ্যাস আছে।' কথাটি প্রায় সম্পূর্ণ মিথ্যা। একবার কেনার বাসনায় সার্কাসেব টাট্টুতে চড়ে নাজেহাল হন। সেই আতঙ্কে এবং স্বাস্থ্যোন্নতির কারণে রেসের ঘোড়া কেনার কথা যখন ভাবেন, তখনই 'কুইন অ্যান' ঘোড়াটি নেওয়ার প্রস্তাব আসে। তাতে ঘোড়ার সঙ্গে আসে সাহেবের সহিস আমির হোসেন। এর পর আমির হোসেনের সাহায্যে ও নির্দেশে ঘোড়ায় চাপতে গিয়ে রীতিমতো ভিতরে ভীত-সন্ত্রস্ত হন। ঘোড়া সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাঁর! কুইন অ্যান-এর পরিপূর্ণ, দীর্ঘদেহী উন্নত গ্রীবার স্বাস্থ্য, তিরের মতো গতি, সেক্ষেত্রে তার রাশ টেনে ধরার দুরন্ত শ্রম, না দৌড়নোর স্থবির স্বভাব, বায়বাহাদুরকে চিন্তিত করে। চাপা ভয়ে রায়সাহেব ঘোড়া কিছু না খেলে, দৌড়নো বন্ধ রাখলে খুশি হন। রায়সাহেবের পক্ষে ঘোড়ার পিঠে ওঠাই একটা বড় সমস্যা। ফটোগ্রাফার এসেছে রায়সাহেবের ঘোড়ায় চড়ার দুর্দান্ত সব ছবি তুলতে। একেবারে অনভ্যস্ত রায়বাহাদুর ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে হন বেসামাল। ঘোড়ায় চড়তে যে ভয় পাচ্ছেন তিনি, পাবিষদদের কাছে তা প্রকাশ করতে আভিজাত্যে লাগে রায়বাহাদুরের। কোনোরকমে ঘোড়ায় চড়তে পারাব পর ঘোড়ার চলার দাপটে তার অসহায়তা ও ফটোগ্রাফারের পলায়নে দৃশ্য প্রহসনের হয়। শেষে তিনি খোঁড়াতে থাকেন এবং আসন্ন শীতের পরে ঘোড়া বিক্রয় করারই সিদ্ধান্ত নেন।

'কুইন অ্যান' গল্পের প্লটগঠন কোনো সূত্রবদ্ধ কাহিনী ও ঘটনার অনুগ নয়, তা চরিত্রকেন্দ্রিক। রায়সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট-এর বিশেষ মানসিকতা, ঘোড়া কুইন অ্যান-কে নির্ভর করে তাঁর যাবতীয় অক্ষম সক্রিয়তা ও অশ্বারোহণে ক্ষমতার ব্যর্থতা এবং নিষ্ফলত্বই গল্পের প্লটগঠনে সাহায্য করেছে। কোনো কাহিনী ও ঘটনার কর্তৃত্ব প্লটের ওপর নেই। প্লট সব সময়েই গল্পেব কেন্দ্রীয় ভাবের অনুগ থেকে এক জটিল জাল রচনা করে, গল্পের উপান্তে এসে সেই প্লট কেন্দ্রীয় বক্তব্যের লক্ষ্যে জটের মূলে ব্যঞ্জনা আনে। প্রকরণের দিক থেকে একাধিক গল্পে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। কুইন অ্যান গল্পে ঘোড়াটি উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য—একমাত্র ননীগোপাল চক্রবর্তীর আত্মমর্যাদা ও পদমর্যাদা রক্ষায় মনোলোকের বিলাসী রূপ রূপায়ণ। এমন চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পে 'চরমক্ষণ' ধরা পড়ে গল্পের শেষেই, যেখানে জমিদারের নিষ্ফল আত্মমর্যাদার শেষরক্ষায় ব্যঙ্গাত্মক দ্বৈত মানসিকতার সুন্দর ছবি মেলে :

> 'রায়সাহেব একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। পারিষদেরা উপস্থিতই ছিল। অনন্তকে বলিলেন, তুমি ঠিক বলেছ অনন্ত, বাতটা একেবারে

সেরে না গেলে ঘোড়া চড়াটা কাজের কথা নয়। দিব্যি পছন্দ হয়েছিল ঘুড়ীটা হে, ... কাল দেখলাম কিনা একটু নেড়ে-চেড়ে।......'

নিজের সম্পূর্ণ অক্ষমতা ঢাকতে এমন চতুর মিথ্যাভাষণ গল্পের প্লটের জট-কেন্দ্রকে স্পষ্ট করে, সেই সঙ্গে পরবর্তী ভাষণে ও সিদ্ধান্তে চরিত্রভাষ্যই একমাত্র লক্ষ্যে চলে আসে। গল্পের শেষ পঙ্‌ক্তি : 'পারিষদদের মধ্যে একটি নিশ্চিন্ততায় দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।'— পারিষদদের এই নিশ্চিন্তি যে মালিক জমিদার চরিত্রের প্রতি চাপা কটাক্ষ ও উদাসীন উপেক্ষা—তা প্রমাণ করে। প্লটের গতি ও জটিলতার অবসানে কুইন অ্যান নয় জমিদারের দিকেই থাকে প্রধানতম Pointing finger'। এমন কাহিনী ও ঘটনাহীন একমাত্র চরিত্রনির্ভর গল্প রচনায় গল্পকার বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের শিল্প-কৃতিত্ব স্বতন্ত্র শিল্পী-সত্তার প্রমাণ দেয়।

দুই

'কুইন অ্যান' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য জমিদার ননীগোপাল চক্রবর্তীর সামগ্রিক মানস বিলাসেই নির্দিষ্ট। আগেই বলেছি, গল্পটি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে দুষ্ট ভারত তথা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রচিত। গল্পকারের লক্ষ্য যুদ্ধে পর্যুদস্ত দেশে সর্বত্র 'Divide and Rule' এমন নীতিতে সমাজের সর্বস্তরের নতুন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটার দিক দেখানো! তখন সারা ভাবতে জমিদারি প্রথা অক্টোপাসের মতো জড়ানো। জমিদারদের ওপর ইংরেজ প্রভুদের নির্ভরতা ও তাদের দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস জমিদারদের মেরুদণ্ড ভাঙতে থাকে। তাতে ব্রিটিশ প্রভুদের লাভ, শাসন-শোষণে অবাধ সুবিধা, অন্যদিকে জমিদাররা হয়ে ওঠে অত্যাচারী, স্বার্থপর, লোভীর 'টাইপ'। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের জমিদার ও তার তোষামোদ বাসনা, উৎপীড়নের স্বভাব আমাদের মন্তব্যের দৃষ্টান্তের মতো স্মারকচিহ্ন। বিদেশি প্রভু-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধস্তন জমিদারদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য জমিদারদের জীবনের প্রতি ছিল একান্ত কাঙ্ক্ষিত চরম ও পরম আশীর্বাদ।

এমন আশীর্বাদ-ধন্য গল্পের ননীগোপাল সেই জমিদার যিনি প্রভুদের কাছ থেকে দয়া ও দান-গ্রহণে সদা উন্মুখ। জমিদারি রক্তে ছিল নতুন নতুন তোষণ ও তোষামোদের উদ্ভাবন। এর ফলে তাঁরা নির্লজ্জভাবে ব্যক্তিত্বকে মেরুদণ্ডহীনতায় বিসর্জন দিয়ে স্বার্থসিদ্ধিতে ধ্যানস্থ হন। কুইন অ্যানকে ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্নের কাছ থেকে পাওয়ার সুযোগ এলে তাঁর মানসিকতা কি হতে পারে? উডবার্ন সাহেবের ভাবনা : জমিদার পেয়েছেন..... 'তাহার হাতের দেওয়া খেতাব, লোকটা খাতির রাখিলেও রাখিতে পারে। সাহেব ভাবিলেন, দেখাই যাক না ভেজে কি না,..... 'দেখা গেল ভিজিয়া থাকাটাই রায়সাহেবদের স্বাভাবিক অবস্থা, বেশি করিতে হইল না।'

নানা ভাবে ভঙ্গিতে ভাযায় রায়সাহেব বিদেশি প্রভুকে তোষামোদে আপ্লুত করেন, সাহেবের ইতিবাচক স্বীকৃতিও রায়সাহেব মৌলিকভাবে আদায় করে নেন। এইভাবে

'কুইন অ্যান' নামের ঘোড়া রায়সাহেবের কাছে আসে। তার পরে রায়সাহেবের অশ্ব-ব্যবহারে নাজেহাল চিত্র এঁকেছেন গল্পকার। এই নিপুণ চিত্রই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবকে বিস্তারিত করে পারিষদ ও সহিস আমির হোসেনদের স্বভাবের জীবন্ত, বিদ্রূপাত্মক, কৌতুক রসসিক্ত চিত্রে। রায়সাহেব কোনোদিনই ঘোড়া ব্যবহার করেননি তবু তাঁর মিথ্যাভাষণে উডবার্নের কাছ থেকে নিয়ে যে ব্যক্তিত্বহীনতার, ভিক্ষাবৃত্তির অপ্রস্তুত অবস্থার স্বাক্ষর রেখেছেন, কেন্দ্রীয়ভাবের সম্যক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যেই। গল্পকার যুদ্ধ-পূর্ববর্তী কালে এই মেরুদণ্ডহীন নবসৃষ্ট নতুন শ্রেণীর জীবদের কথাই কেন্দ্রীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

তিন

'কুইন অ্যান' গল্পে কুইন অ্যান একটি চরিত্র হতে পারত, কিন্তু সহিস আমির হোসেনের সর্বাবয়ব পরিচালনায় সে হয়েছে গল্পের উপলক্ষ্য এবং গৌণ, তবে রায়সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে গল্পে তার অবস্থান চোখে পড়ে। তবু আলাদা কোনো চরিত্র বা চরিত্রের সে প্রতীক নয়। আমির হোসেন সহিস এবং সে মাঝে মাঝে পারিষদবর্গের গোপন নির্দেশে নিজেকে সংযত করেছে। তার সারল্য ও বুদ্ধি গল্পের প্রধান চরিত্রনির্ভর গতিময়তা সৃষ্টির সহায়ক। পারিষদবর্গ রায়সাহেবকে চেনে, তারা রায়সাহেবের যাবতীয় ঘোড়ায় ওঠা ও ঘোড়ার বিষয় জানা সংক্রান্ত বিষয়ে কৌতুক ও শ্লেষ ব্যবহারে তৎপব। রায়সাহেবকে নিয়ে কৌতুক ও সংকট-সংশয় তাদের মধ্যে সতর্কতার অঙ্গুলিও দেখায়। পারিষদদের একজন অনন্তর কথায় তার প্রমাণ। গল্পের শেষে পারিষদদের সর্বতোভাবে 'একটি নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিঃশ্বাস' পড়ার মতো চিত্রে তাদেরও মধ্যে কিছুটা চরিত্রে চিত্রেব রসাভাস মেলে। চরিত্র মর্যাদায় অবশ্যই তারা গৌণ কিন্তু কমবেশি সক্রিয় মূল রসসৃষ্টিতে।

ঘোড়ায় চড়া নিয়ে ভয়ে, দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে, সংকটে-সংশয়ে, অসহায়তা ও মিথ্যা Vanity-তে, পদের বানানো ও দয়ায় পাওয়া মিথ্যা আভিজাত্যবোধে রায়সাহেব হাস্যকর চরিত্র হয়ে উঠেছে। তার ব্যক্তিত্বনিহিত রস ব্যঙ্গই। গল্পের শেষে যেভাবে খোঁড়া পা নিয়ে হাঁটা-চলা, পরে পারিষদদের নতুন ঘোড়া কেনাব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে মানসিকতার পরিচয় দেন তাতে চরিত্রটি হয়েছে 'Serio-comic' অনেকাংশে।

গল্পের শুরু থেকেই রায়সাহেব যেভাবে নিরঙ্কুশ মিথ্যাভাষণে ও অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্নের কথার মিথ্যা সমর্থনে আমাদের সামনে আসেন তাতেই ধরা পড়ে তাঁর সামগ্রিক চরিত্র নিহিত 'tragic flaw' অর্থাৎ ট্র্যাজেডি ঘটার রন্ধ্রপথটি। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্ন সাহেব 'কুইন অ্যান'কে তাঁকে দেওয়ার ব্যাপারে হোমরা-চোমরাদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই বিশ্বাসভাজন মনে করেছেন এতে তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের আহ্লাদ ধরা পড়ে। যদি উপহার হয়, তা তাঁর কাছে গৌরবের। রায়সাহেব-সুলভ নানা বিনয়-

ভাষণে তাঁর কথা : '......হুজুরের দান দেখে অধীন না হয় সর্বদা হুজুরকে স্মরণ করবে.....।' এমন নানা কথার মধ্যে রায়সাহেবের আসল কথা —

> 'বার্থ ডে অনার্সের সময়টা আসছে, হুজুর যাচ্ছেন। ......(রায়সাহেবের কথায়) আর মান থাকে না। লোকে গালাগাল দেওয়ার জন্যে আজকাল কথাটা ব্যবহার করছে।
>
> সাহেব কথা দিলেন, আগন্তুক ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজ ফর্দ দিবার সময় তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন।'

রায়সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী যে 'রায়সাহেব' থেকে আরও বড় মর্যাদার পদ পেতে লোলুপ, সেইভাবেই উডবার্ন সাহেবের তোষামোদ ও ভজনা করেন। এই যে একজন এদেশীয় পদপ্রাপ্তির বড় মাপের মানুষ, তাঁর ভিক্ষাবৃত্তি যে অসম্মানকর, অমর্যাদার, ভিক্ষা নিয়ে নিজেকে বড় মর্যাদার মানুষ প্রমাণ করা—তাতে এক শ্রেণীর 'টাইপ' হয়ে যান।

উডবার্ন সাহেবের বড় এক সান্ত্বনা পাওয়ার মত যে বিশ্বাস ঘোড়াটিকে রায়সাহেবের কাছে রাখা নিয়ে, তাতে রায়সাহেব একজন সমঝদার আর হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ার হওয়ার প্রশংসা পেলে তাতে মিথ্যে লজ্জার বিনয় জানানোর মধ্যে হীনতা ও ধূর্ততার প্রমাণ মেলে। বিপরীতে নিজের সম্পর্কে নিজেরই প্রশংসাবাক্য শোনানো : 'না, তেমন কিছু নয়, তবে ঘোড়া জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে চড়ার অভ্যাস আছে, এই যা।' এই প্রসঙ্গে গল্পকারের মন্তব্য : 'কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তবে পনেরো আনা বাড়াইয়া বলা।' অর্থাৎ একবার রায়সাহেবের নূতন পৈতা হওয়ার সময় একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্যবসাদারের সার্কাসের ঘোড়ায় চেপে ফটো তুলে রাখার শখের বালকোচিত সভয় ও আড়ষ্ট, আতঙ্ক ভাবের প্রসঙ্গটাই একমাত্র ও শেষ প্রমাণ। এই ঘটনাকে মিথ্যাচার দিয়ে, কৃতিত্ব জানিয়ে রায়সাহেবের আর এক ব্যক্তিত্বের ভণ্ডামি প্রমাণ করে।

রায়সাহেবের ঘোড়ায় চড়ার মোহ কি জাতীয় দুর্ভোগের দিক দেখায়, গল্পের বাকি অংশে তার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন গল্পকার। চোদ্দ বছরের প্রথম এবং শেষ ঘোড়ায় চড়ার প্রচণ্ড আতঙ্কও রায়সাহেবের মোহকে দমিত করেনি। 'কুইন অ্যান' ঘোড়া দিয়ে তার বিস্তার ও চরম বিপর্যস্ততা। ঘোড়ার নিয়ম হল তাকে সব সময় সচল রাখা, তাতেই তার সজীবতা, তার গতিমুখরতা, তার সপ্রাণ স্বভাব অটুট থাকে। ভয়ে, পাছে এখনি ঘোড়ায় চড়তে হয় এই আতঙ্ক ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে ঘোড়া সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ রায়সাহেবের যুক্তি : 'ঘোড়ার নিয়ম হচ্ছে, মাঝে মাঝে দিন কতক বসিয়ে রাখা।' এই মন্তব্যের হাস্যকরতা রায়সাহেবকে নিচে নামায়। সহিসের কাছে এই ঘোড়া তিরের মতো দৌড়য় শুনে রায়সাহেবের মুখ বিবর্ণ। গতিময় ঘোড়াকে কোনো ইশারায় থামানো যায়, এই কথায় রায়সাহেব আবার সেই ছোটবেলায় ঘোড়ায় চড়ার মিথ্যা প্রসঙ্গ তুলে পারিষদবর্গের কাছে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত হওয়া! নিজ মর্যাদা বিষয়ে

আত্মসচেতন অথচ ঘোড়ায় চাপতে ভীত রায়সাহেব ও সহিস আমির হোসেনের এক সংলাপ বিমিনয় চিত্র :

> 'না, আর ভয় নেই হুজুর, বসুন সিধে হয়ে। ভয় কথাটা বোধহয় পৌরুষে বেশি ঘা দিল;'

এইরকম সব উপলব্ধির চিত্র রায়সাহেবের ব্যক্তিত্বের পক্ষে একাধিক প্রসঙ্গে গল্পের মধ্যে ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও কৌতুকের জন্ম দেয়। ফটোগ্রাফার নিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ার ছবি তোলার সখ হাস্যকর অথচ বেদনাদায়ক বাহানায় পরিণত হয়। গল্পের সব শেষে মিথ্যে মর্যাদা রক্ষার মোহে 'মচকায় তবু ভাঙে না' এমন প্রবচনের সাদৃশ্যে রায়সাহেবের শেষ বাসনা :

> 'তুমি ঠিক বলেছ অনন্ত, বাতটা একেবারে সেরে না গেলে ঘোড়ায় চড়াটা কাজের কথা নয়। দিব্যি পছন্দ হয়েছিল ঘুড়ীটা হে, যেমন দেখতে, তেমনই তেজী, কাল দেখলাম কিনা একটু নেড়েচেড়ে। ভেবেছিলাম মনের মতনটি করে গড়ে নোব। কিন্তু না, তুমি দিয়ে দাও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন। সামনের শীতটা যাক, তখন আর একটা কিনে নিতেই বা কতক্ষণ?'

গল্পের নায়ক ননীগোপাল চক্রবর্তী—একদিকে রায়বাহাদুর খেতাবপ্রাপ্ত, জমিদার ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, এক সাহেবের ঘোড়ার মালিক হয়ে তার মতোই ঘোড়ায় বসে মর্যাদায় সমান হতে চেয়েছিলেন, মোহ-অহংকার ও ভিক্ষাবৃত্তি, ভয়হীন পৌরুষের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বার্থসর্বস্ব আত্মতৃপ্ত মানুষ ননীগোপাল। 'কুইন অ্যান' নামে সাহেব-পালিত ঘোড়াটি বর্তমান মালিকের পাশে এর বিপরীত সত্য-গতির বলিষ্ঠ প্রতীক। সবল সুস্থ ঘোড়াটি যেন দুর্বল নায়কের বিফল ও বিকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষাব পাশে সার্থক শ্লেষ-বিদ্রূপ।

চার

'কুইন অ্যান' গল্পটি কোনোক্রমেই আখ্যান ও ঘটনাশ্রয়ী গল্প নয়, বরং বিশেষ একটি ভাবের পরিবহনে বিশেষ একটি চরিত্রের প্রকাশমূলক গল্প। সেই চরিত্রটি হল এক রায়সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। মানুষটি যে বিশেষ দেশকালে স্থিত আপন পদমর্যাদা থেকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী থেকে বিদেশি সাহেবের কাছে মর্যাদা ও পদোন্নতির জন্য ভিক্ষার্থী ও তোষামোদকারী—তাঁর সেই ভাবের নিপুণ চিত্র এঁকেছেন গল্পকার তীব্র গতিময়তায। চরিত্রটির কর্মতৎপরতা, ঘোড়ায় চড়ার বাসনা, প্রয়াস, আত্মপ্রচারের জন্য ফটোগ্রাফার এনে বিশেষ ছবি তোলার ব্যবস্থা ও শেষে ব্যর্থতা ও হতাশা এবং পরেও মোহ জাগিয়ে রাখার চাতুর্যময় বাসনাব প্রকাশ—এসবই গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় চরিত্রের মনের গভীর তলদেশ আলোড়িত করে এঁকেছেন।

গল্পের একমুখিতা অবশ্যই রক্ষিত। কুইন অ্যান নামের ঘোড়াটি থাকায় এবং তাকে কেন্দ্র করেই নায়কের যাবতীয় ব্যর্থতা, অপদস্থ হওয়া, তথাকথিত উচ্চ ব্যক্তিত্বের পরম ভ্রান্তির দিকগুলি সংক্ষিপ্ত ও সংযত চিত্রে অঙ্কিত। অতিবিস্তার-এর সুযোগই গল্পে নেই। কাহিনী ও ঘটনায় মেদ না থাকায় প্রকরণে কোনো বাড়তি বিষয় আসেনি। প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বিবরণ ধর্ম নেই। একেবারে মূল লক্ষ্য ধরে বিষয়ের অবতারণা! ভাষায় আছে তীব্র ব্যঙ্গ, শ্লেষ, কখনো বা নির্মল কৌতুক। নায়কের আচরণ, সংলাপ, ঘোড়ায় বসা অবস্থায় অস্থিরচিত্ততা, ভয়, ভয় থেকে মুক্তি পেতে সহিস আমির হোসেনকে নানা ধরনের কথা ও অনুরোধ, ঘোড়াদের নানান নিয়ম সম্বন্ধে মন্তব্য—নির্মল কৌতুক ও শ্লেষের স্বাদ দেয়। গল্পকার চিত্ররস পরিবেশনে নিরাসক্ত নির্মম বিদ্রূপের চাবুক মেরে এই শ্রেণীকে তার উচিত শিক্ষা জাতীয় প্রাপ্য স্বভাবের বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। গল্পটির বর্ণনায় আছে সাধুগদ্য, সংলাপে চলিত। সর্বশেষ রায়সাহেবের খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনন্তকে বলা শেষ সংলাপ : 'সামনের শীতটা যাক, তখন আর একটা কিনে নিতেই বা কতক্ষণ?'—এর মধ্যে ঘোড়ার বিষয় এবং ঘোড়ায় চড়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ব্যক্তিত্বহীন রায়সাহেবের মানসিকতার হাস্যকরতা পাঠকদের যেনবা হাসির অট্টহাস্য স্বভাবেই এক 'relief' দেয়।

পাঁচ

গল্পের নাম 'কুইন অ্যান'। 'কুইন অ্যান' ঘোড়াটি কোনো চরিত্র হতে পারেনি, উপলক্ষ্য মাত্র. অথচ তাকে ভেবেই গল্পকার নাম রেখেছেন 'কুইন অ্যান'। গল্পে ঘোড়াটি তার নানা আচরণে নিজেকে যেমন চিনিয়েছে, তেমনি তার ব্যবহারে ননীগোপালও নিজেকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দেওয়ায় সর্বাবয়বে সাহায্য করেছে। সুতরাং এক অর্থে গল্পের নাম শিল্প-মানে ঠিক।

'কুইন-অ্যান' এমন নাম নিয়ে গল্পে একসময়ে রায়সাহেব পারিষদ ও আমির হোসেনের মধ্যে কিন্তু সংলাপ বিনিময় হয় :

> 'রায়সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, 'তা হ'লে? এ যে একবারে সামনে উঠছে, একবার উঠছে, এ কোন্ দেশি ফুর্তি আমির হোসেন? বাপরে, যেন কাপড়-কাচা করছে!
>
> সাহেব পিঠে হাত ঠুকে বলতেন, 'ডার্লিং, প্রিটি ডিয়ার!' তাই বলুন না হুজুর!
>
> পারিষদদের মধ্যে একজন বলিল, 'ডার্লিং তো মেমকে বলে সাহেবরা, সেকথা উনি ঘুড়ীকে কেমন করে—
>
> আওয়াজ পাইয়া রায়সাহেব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, তোমরা বুঝি সব তামাশা দেখছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? মেমসাহেবকে বলে—কেন, একে বললে কি অন্যায়টা হয়? ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং.....

'কুইন অ্যান' নয় সম্বোধনে 'প্রিটি ডিয়ার', 'ডার্লিং', ব্যবহার করলে ঘোড়ার কাছে তা প্রেরণাদায়ক হয় স্বতঃস্ফূর্ততায়। এমন নামের বদলে আদরের নাম উচ্চারণে কাজ দেয় বেশি। 'কুইন অ্যান' কথার অর্থ 'রাণী অ্যান'। কিন্তু পোশাকী নাম নয়, প্রিয় আদরের নাম কুইন অ্যানের কাছে বড় স্বীকৃতি পায়, তাতে যেহেতু ঘোড়ার গতি বাড়ে, খেলা বাড়ে, তাই ঘোড়ার নামের ব্যবহারে বৈচিত্র্য ঘোড়াটির যেনবা বড় দিক। পোশাকি নাম ছাড়া প্রিয় নামে গুরুত্ব বেশি বলে গল্পের নামে বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা গুরুত্ব পায়। 'কুইন অ্যান' নাম গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব ও লক্ষ্যের দিক বিশেষ কার্যকরী হওয়ায় নাম সার্থক।

৫.

পীতু

এক

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'পীতু' গল্পটি সাধারণ ছোটগল্পের মতো একক কোনো আখ্যান, ঘটনা ও বিশেষ চরিত্রনির্ভর মনস্তাত্ত্বিক গল্প নয়, কোনো রূপক গল্পও নয়, বাঙালি তথা চিরকালের সমগ্র শিশুজগৎকে সামনে রেখে শিশুদের সম্পূর্ণ ভাবমূলক এক আত্মগত কল্পনাময়তার বিস্ময়কর জগৎ উন্মোচনের গল্প। বিভূতিভূষণের বহু গল্পের বিষয়ে যে শৈশব-অভিজ্ঞতা সচিত্র হয়ে ওঠে, 'পীতু'র অভিজ্ঞতা তুলনায় ভিন্ন রসাস্বাদী। একান্নবর্তী পরিবার-অনুগ শিশুদের নিয়েই লেখকের উত্তুঙ্গ কল্পনার জাল একাধিক শিশুসংক্রান্ত গল্পে মেলে, কিন্তু 'পীতু' গল্পের পরিবেশ ও লক্ষ্য, অবোধ শিশুগুলি—সব কিছু মিলে মৃত্তিকাহীন এক নতুন জগতের যাত্রী বানিয়ে নেয় পাঠকদের। বিভূতিভূষণের শিশুরা নানাভাবে বয়স্কদের, বিষয়ী মানুষদের উপেক্ষার, শাসনের 'victim' যেমন হয় বাস্তব বোধ ও বুদ্ধির হিসেবি সংশয় ভাবনার চাপে অবহেলিত, তেমনি আবার কোনো প্রয়োজনীয় জগৎ নয়, কোনো রূঢ়তার রক্ষচক্ষু নয়, সম্পূর্ণ বিষয়ী ভাবনাকে পাশে সরিয়ে রেখে আপন মনের জগতে এক অ-লৌকিক জগৎ তৈরি করে নতুন স্বাদে মজিয়ে দিতেও পারে। 'পীতু' গল্পের দুই শিশুর—ছবি ও পীতুর—নিষ্পাপ মনের বিস্ময়রস-সমৃদ্ধ দেখার দৃষ্টি —যাকে বলা যায় Highly Imaginative observation লেখকের আঁকা অন্যান্য শিশুদল থেকে অবশ্যই আমাদের অন্য আত্মীয়তা আনে।

'পীতু' গল্পে আখ্যান উপেক্ষা করার মতোই, ঘটনা যা চরিত্র ও আখ্যান যৌথ শিল্পধর্মে জড়িয়ে ঘটে যায়, তা-ও 'negligible'। শুধু ছবি ও পীতুর মতো দুটি শিশুর নিজেদের কল্পনাময় অভিজ্ঞতা আছে বাস্তবজগতের ঊর্ধ্বে আকাশ-ভরা গান আর বিশ্বভরা প্রার্থনায়, তা রীতিমতো স্বাদের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। বিভূতিভূষণের সৃষ্ট সেই 'মেজকা' এখানে যেনবা গল্পের 'সূত্রধার'। ছবির বয়স পাঁচ—গল্পের কথক মেজদার ভাইঝি, আর ছবির পরিচিত 'গুরু'-সমান পীতুর বয়স চার থেকে সাত-এর মধ্যে,

ধানবাদের এক শিশু। 'মেজকা'র সঙ্গে কথায় ছবির ভগবান সম্পর্কে পরিচয় দান, যা পীতুর কাছ থেকেই পাওয়া—ভগবান আকাশ থেকে বড়, হাতির থেকেই বেশি খেতে পারেন, আর দৌড়ন রেলগাড়ির থেকে আরও অনেক জোরে। আরো কথা—আকাশ থেকে পড়া বৃষ্টি হল আকাশের মতো বড় পুকুর থেকে পিঠে পাখাওলা হাতিদের সংখ্যাতীত কলসির স্বর্গের রাস্তায় ছড়ানো জল, রেলের এঞ্জিনের শব্দ হল রাক্ষসদের হাঁকডাক, তারই এক ছোট মেয়ে গ্রামোফোনের মধ্যে গায় মিষ্টি গান, মাছেরা পুকুরে কথা বলতে পারে না, কথা বলতে গেলে হাঁ-মুখে জল ঢুকে যাবার ভয়ে ইত্যাদি। সবেরই একমাত্র শ্রোতা 'মেজকা' যিনি ছবির মতে পীতুর কাছে শোনা এবং পীতুর একান্ত নিজেরই অভিজ্ঞতায় ধরা। আর পীতুর এমন দেখা ও জানার সক্ষমতার পাশে ছবির মেজকা একেবারেই অজ্ঞ।

এইভাবে 'পীতু' গল্পের প্রসঙ্গে ছবির কথাবার্তার ও পীতুর অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্যে আসে সূর্য, চাঁদ, ভগবান। তাঁর বাড়ির কোথায় অবস্থান, ভগবানের বাড়ি যাওয়ার পথের হদিশ, পরীদের জগৎ, সেই পথ দিয়ে ছবি-পীতু কখনো দুজনে যায়, 'পীতু' প্রায়ই যায় একা, পীতুর মায়ের ভগবানকে নিয়ে ভাবনা, ভগবানকে ভালোবাসলেও তাঁর কাছে নয়, পৃথিবীতে পীতু ওদের বাড়িতে মায়ের কাছেই থাকবে, সেই সঙ্গে ভগবানও থাকবেন। ঘুম ভেঙে সকালে পীতুর নিজের মায়ের কাছে একভাবে শুয়ে থাকার শান্তি—এসব অসীম কৌতূহল ও বিশ্বাসে ছবি বলে যায়। পীতুর চোখ দিয়ে ও কল্পনায় দেখা সব কিছুই ছবির কথায় ও বিশ্বাসে একাকার হয়ে গল্পের এক অদ্ভুত জগতে পাঠকদের নিশ্চিত ঘোর লাগে।

গল্পের সমগ্র অবয়বে যে চিত্র তা আগেও বলেছি, চরিত্রমূলক নয়, ঘটনার নির্ভরতায়, দুই শিশুমনের চিরকালীন কল্পনাকে, রূপকথার জগৎকে ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপ দেয়। বিভূতিভূষণ টানা কোনো কাহিনী বলেননি, বড় কোনো একটি ঘটনার হাত ধরে গল্পের স্রষ্টা ও গল্পের আঁকা চরিত্রবৈশিষ্ট্য—দু'য়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট প্লট তৈরি হয়নি। তিনটি চরিত্র—মেজকা, ছবি ও পীতু—এদের মধ্যে যে সব শিশুমনের মজার সব সংলাপ-বিনিময়ের চিত্র তৈরি হয়েছে, তাতে কৌতুকরস সিক্ত নাট্য-আস্বাদ মেলে বলেই—বলা যায়, ছোট ছোট ছবিগুলি মিলে এক অচিন্ত্যনীয় ভাবজগতের, কল্পলোকের মায়াকে রূপের অবয়ব-স্বভাব দিয়েছে। সুতরাং প্লট এখানে সম্পূর্ণত গভীর ভাবমূলক—হালকা চালে গাঁথা, গতানুগতিক প্লটতত্ত্বের ভিত নেই। যে কোনো সার্থক গল্পে একটি তো climax (চরমক্ষণ) অবস্থা আসবেই। যেহেতু আখ্যান ও ঘটনা-বিবিক্ত গল্প 'পীতু', তাই 'চরমক্ষণে'র ভাবগত ভারসাম্যের জটিলতা, তার প্লটনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু মেলে 'পীতু' গল্পের শেষে। এখানে চিত্রের ব্যঞ্জনা পীতুর স্বপ্নময়তার মধ্যে বাস্তব ভূমির প্রবল টান, শিশুর মায়ের প্রতি অসম্ভব স্নেহের আকর্ষণ—যা লেখকের একান্ত কাম্য :

'আর মেজকাকা, কি আশ্চর্য জান?

প্রশ্ন করলাম, কি?

আঁচল কেটে পীতু চ'লে গিয়েছিল না? উঠে দেখলে একটুও কাটা নেই। ভগবান যদি আসেন নি তো কে জুড়ে দিয়ে গেল মেজকাকা?.......ভগবানের পাহাড়ের বাড়ির ওপরে নতুন সুয্যির আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে—কত গান হচ্ছে—মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, আর রাঙা মেঘ দিয়ে গড়া সোনার সিঁড়ি বেয়ে ভগবান, তার পরীরা আর সোনার পোষাক প'রে বাজনা বাজিয়ে যারা সঙ্গে এসেছিল—সব ফিরে যাচ্ছে ......হ্যাঁ দেখলে পীতু মেজকাকা;'

এই যে প্রকৃতি বর্ণনা এবং পীতুর রোমান্টিক মনের অনুভাবনায় মায়ের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা, সমস্তই গল্পের এক 'চরমক্ষণে'র ব্যঞ্জনা আনে। গল্পের শেষতম সন্দেহ, সংশয়, কৌতূহল, বিস্ময় মেশানো ছবির কণ্ঠে, তা-ই সমগ্র গল্পে ছবি ও পীতুর চিরন্তন কল্পনাময়তার নিহিত আবেগধর্মের ব্যঙ্গই:

'তখন আর একটু মনও কেমন করছিল—মনে হচ্ছিল, ভগবান এত ভাল এত লক্ষ্মী; কিন্তু পরীরা যে বললে পীতুর মায়ের কাছে থাকবেন সর্বদা—যদি ভুলে গিয়ে না-থাকেন কোন দিন!.......'

দুই

'পীতু' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য ছবির মুখ থেকে কৌতুকে—অপার বিস্ময়ে বিষয়বিহীন কল্পনাময়তায় ও কৌতূহলের মধ্যে থেকে গল্পকার নিজেই গল্পের শেষদিকের রূপকথা-আশ্রয়ী রূপক ভাবনা থেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। শিশুর মনের চিরন্তন স্বভাব অনুযায়ী—যা বিশুদ্ধ নিত্য আদর্শ সৌন্দর্যের আকর্ষণের চিত্ররূপ—তা ছবির কথার মধ্যে, যা পীতুরও কথা সমান যাথার্থ্যে—গল্পকার গল্পের মূল লক্ষ্যের একান্ত অনুগামী করেছেন। পীতুর প্রসঙ্গে ছবির যে প্রতিক্রিয়া পীতুর কাছে শোনা কথার গুরুত্বে, যা ছবি নিজের শিশুমনের পবিত্রতায় বলেছে, তার মধ্যেই গল্পকারের কথাব ধ্বনি :

'ছবি একটি স্বপ্নের মধ্যে ছিল যেন, মুখে একটি শান্ত করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু ভাবুকতার সঙ্গে, একটু ক্ষমাব সঙ্গে, একটু আর একটা কি অনির্বচনীয়তার সঙ্গে স্মিতহাস্যের সহিত ধীরকণ্ঠে বলিল, না মেজকাকা, ভগবান যে বড্ড ভাল। পীতুকেও যেমন ভালোবাসেন, ওর মাকেও সেই রকম ভালোবাসেন কিনা! আর ওপরে গেলেন না, আর অন্ধকারও রইল না।..... (পরীরাও বলে) তোমার মায়ের কাছেই এবার থেকে তোমার জন্যে ভগবান থাকবেন পীতু; সেইখানেই তোমার জন্যে ধ্রুবলোক গ'ড়ে দেবেন।'

পীতু সম্পর্কে ছবির এই যে অবোধ নিষ্পাপ কল্পনাময় দৃষ্টিভঙ্গি, তা গল্পকারেরও

প্রতিপাদ্য বিষয় সমগ্র গল্পে। এ কথার প্রসারিত অর্থবহতা, বাসনাময়তা মেজকার কাছে, গল্পকারের ভাষায় লেখা—ছবির সংলাপ গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনারই প্রধান সমর্থক। তা ব্যক্ত হয়েছে শিশুর জিজ্ঞাসায়:

> '...তারপর আবার কত আলোর মধ্যে দিয়ে ...পীতুকে নামিয়ে নিয়ে এলেন।... হ্যাঁ নিয়ে এলেন নামিয়ে, না হলে পীতু যখন উঠল, কি ক'রে দেখলে ঠিক যেমন করে মায়ের হাত বুকে নিয়ে শুয়ে ছিল, সেইরকম করেই রয়েছে?'

পীতুর শিশুসুলভ মনে অ-লৌকিকের প্রতি রোমান্টিক কৌতূহলী মনের বিস্ময়ে চরম আকর্ষণ, তা ভারসাম্য পায় লৌকিক মা-বোনের পরিবারের মধ্যবর্তী দোলাচলতায়। 'পীতু' গল্পের Pointing finger নির্দিষ্ট হয়েছে ছবি ও পীতুর প্রসঙ্গ ধরে লেখকেরই শৈশবকালীন বিশুদ্ধ, নিত্য, আদর্শ ভাবময়তার চূড়ান্ত প্রীতিধর্মে।

তিন

আগেই বলেছি 'পীতু' গল্পে গল্পকার শিশু ও তার শৈশবকালকে নিখুঁত দেখাতে চেয়েছেন, অন্যান্য শিশুবিষয়ক গল্পের মধ্যে বাস্তব সংসারের মধ্যেকার কোনো নিষ্ঠুর নিগ্রহের, অবহেলাব কথা বলতে চাননি। তাই প্রথাগত চরিত্র এ গল্পে নেই। ছবি ও পীতুর স্বভাব ধরে তাদের রোমান্টিক কৌতুহলকে অপার বিস্ময়বোধ, অসীম জিজ্ঞাসা ইত্যাদির বৈচিত্র্যে প্রতিষ্ঠা দিতে আগ্রহী গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। গল্পে পীতু যদি ছবির গুরু হয় লেখকের কৌতুকরসাত্মক মন্তব্যে, তা হলে পীতু হয় কাযা, ছবি হয় তারই ছায়া। বয়স্ক অভিজ্ঞ মেজকা সেখানে বিপরীত হয়ে কৌতূকরসের তুফান এনেছেন রচনায়। পীতুর চিন্তাই ছবির মূল্যবান বিশ্বাস ও সংগ্রহ।

গল্প থেকে বোঝা যায়, পীতু সাধারণ দরিদ্র ঘরের এক শিশু। এক বোন আছে, আছে অনিয়মিতভাবে দেখা তার বাবা। পীতুর মধ্যে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বভাবের শিশু-ব্যক্তিত্ব কাজ করে। সে স্বপ্ন দেখতে জানে, জানে নিজের মতো করে দেখতে। গল্পকারের বর্ণনায়: 'ছবির কাছ থেকে যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে ধানবাদের দিকের পৃথিবীটা সে একাই যে রকম ভবাট করিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে;. ..'। এই বর্ণনায যে কৌতুকরস তার ভিতরে আড়াল করা আছে পীতুর অসম্ভব কল্পনার বিপুল ক্ষমতার দিক। ছবির কাছে 'পীতু যে অসামান্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'... 'পীতুর সব বিষয়ে নিজস্ব একটি মত আছে ..... যে-কোনো পাড়ার যে কোন শিশুমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেই পীতুর নাম এবং এক-আধটা অভিমত কানে আসিবে।'

আসলে পীতু হল গল্পকারের এক স্ব-কপোল-কল্পিত এমন শিশু—যার মধ্যে সর্বকালের শিশুর ধর্ম, মেজাজ, কল্পনা নিহিত আছে। আর এই পীতুর সমর্থক ছায়া ছবিই। দুজনেই কল্পনার সৃষ্টি, দুজনেই এক বিশ্বাসের ও কল্পনার উপকরণ। গল্পকাবেব কল্পনায় দুজনের অস্তিত্বের বড় দিক:

'(ছবির) চোখে কোন্ এক অজানা লোকের আলোক ঝলমল করিতে থাকে ......'
ছবির কথা লেখকের ভাষায়: 'পীতু জানে বইকি, ছবিও জানে। পীতুতে ছবিতে মিলিয়া কতবার গিয়াছে।'

ভগবানের পথ জানার ব্যাপারে মেজকা প্রশ্ন করলে ছবি পীতুকে উপায় ভাবে। পীতুর মধ্য দিয়ে প্রাচীন পুরাণ আখ্যান, ধ্রুবর কথা, সারা প্রকৃতির বুকে পাহাড়ের পিছনে ভগবানের অস্তিত্বের কল্পনা অসম্ভব ব্যঞ্জনা পায়। সবই শিশুর কল্পনায় আঁকা, কিন্তু দার্শনিক জিজ্ঞাসায় তার প্রতীকপ্রতিম হয়ে উঠতে অসুবিধে থাকে না। এখানেই ছবি ও পীতু চরিত্র ধরে গল্পের প্রতীকী ভাষণ নিগূঢ় সমর্থন পায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'পীতু' গল্পে ছবি ও পীতুকে আপন উদ্দেশ্য-চিহ্নিত করেছেন। শিশুর কল্পনার জগতেও সত্য আছে যা শিশুর নিষ্পাপ অস্তিত্ব, অবোধ মুখাবয়ব, সরল কণ্ঠ ও সংলাপ ধরে বড় জীবন-শিক্ষার অভিজ্ঞান।

চার

যেহেতু পীতু আদৌ পরিণত বয়স ও বুদ্ধির চরিত্র নয়, তাই গল্পটি একান্তভাবেই লেখকের পক্ষে গভীর ভাবমূলক গল্প। এতে মনস্তত্ত্ব নেই, আছে অবাধ মুখর ঝর্নার মতো বেগে ও ধর্মে প্রবহমান এক অভিজ্ঞতা অর্জনের সূত্র। ভাবের পরিবহনে গল্পটির গভীরতা পাঠকদের বুকে অনুরণন তোলে। পীতুর যে মনেব প্রথম খবর মেলে মেজকার সঙ্গে ছবির সংলাপ বিনিময়ে, তা থেকে গল্পের শেষে তার এক করুণ পরিণতির শ্বাস মেলে। ভাবের একমুখিন স্বভাব শিল্প-ন্যায়ে উজ্জ্বল। আখ্যায়িকা নেই, ঘটনার ঘনঘটা নেই, আছে বিশুদ্ধ নির্মল হাস্যরস পরিবেশনে লেখকের বিবৃতিধর্মের সংক্ষিপ্ততা ও সহজ অনাবিল আকর্ষণ।

'পীতু' গল্পের গৌরব এর কৌতুক হাস্যরস সৃষ্টিতে। মেজকার সঙ্গে ছবির একাধিক সংলাপ বিনিময়ে, মাঝে মাঝে গল্পকারের মেজকা হিসেবে ছবির সরল অবোধ কথার ভাষ্য করা ও টীকা-টিপ্পনির সংযোগ গল্পটিতে অসম্ভব স্বাদুতা ও Relief দেওয়ার ধর্মে সিদ্ধি দিয়েছে। **প্রথমত**, গল্পের একাধিক রূপক ব্যবহার করেছেন গল্পকার। ধ্রুব আখ্যান এর অন্যতম উদাহরণ। **দ্বিতীয়ত**, গল্পের কৌতুকরস অসাধারণ গতিময় করেছে গল্পের পরিবেশ ও উপস্থাপনার দিকগুলিকে, তৃতীয়ত, গল্পকার বর্ণনায় মেদ বৃদ্ধি বিষয়ে সতর্ক। **চতুর্থত**, গল্পের প্রথম দিকে যে বর্ণনা তাতে ছবি ও মেজকার ভূমিকা পাঠকদের স্বভাবতই আগ্রহান্বিত করে। শেষ দিকে লেখক আর সংলাপ-বিনিময়ের সূত্রে ছবিকে বড় জায়গা দেননি। নিজের ভাবনা-চিন্তায় নিজের ভাষাতেই বক্তব্যের মধ্যে চলনধর্ম বজায় রেখেছেন, ছবির কিছু প্রশ্ন স্মরণে বর্ণনা করেছেন গল্পের বিষয়। **পঞ্চমত**, গল্পের ভাবনিষ্পত্তি কোনো সামাজিক বা সাংসারিক সত্যে জড়িয়ে থাকেনি, পীতুর মৃত্তিকা-জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ভাবমূলক স্বভাবে ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

গল্পেব ভাষা বিষয়ের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগী স্বভাবে দীপ্ত, বিশ্বাস্য। গল্পের অনায়াস ভঙ্গি কৌতুকরসে ও রোমান্টিক কল্পনাময়তায় ভাষাকে করেছে মনোরম। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বহু শিশুদের নিয়ে বিচিত্র সব গল্প লিখেছেন। 'পীতু' সেখানে এক লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অকৃতদার আজীবন। তাঁর একান্নবর্তী পরিবারের অভিজ্ঞতা ধরে শিল্প-জীবনভাবনা তাঁর লেখক ব্যক্তিত্বের বিকাশের ভূমিকা রচনা করে। শিশুদের তিনি নানাখানা করে দেখেছেন। রাণুর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের 'রাণু' ও 'পীতু-ছবি'— দু'য়ে কত তফাত! শিশু চরিত্র ও ভাবনার বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে লেখক অনন্য।

পাঁচ

গল্পের নাম পীতু। চরিত্র ধরে এই নাম। আসলে ছবি গৌণ চরিত্র হয়ে মুখ্য চবিত্রের মূল ছায়াস্বভাব পেয়েছে। গল্পের বলার টেকনিকে ছবিকে এনে তার মধ্য দিয়ে পীতুব কথা বলা ও তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। লেখক একজন শিশুর কথা, তার কল্পনা ও বাসনাকে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। তার মধ্য দিয়েই এই শিশুব সর্বকালের প্রতিষ্ঠা চান গল্পকার। পীতু তার প্রতিনিধি। আসলে চরিত্র আঁকা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য শিশুকে কেন্দ্র কবে নিজের শিশুভাবনার অভিনবত্ব দেখানোই বিভূতিভূষণের লক্ষ্য। সেই বিচারে গল্পনাম সার্থক। ছবি-ই পীতু—এই ছায়া-কায়ার সম্পর্কে 'ছবি ও পীতু' গল্পনাম হতে পারত, কিন্তু পীতুর সবটাই ছবির মধ্যে থাকায তাব প্রয়োজন নেই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ২৩ আগস্ট ১৮৯৮

প্রথম ছোটগল্প লিখেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবন শুরু। 'রসকলি' সেই গল্পের নাম, তার প্রকাশ-আধার হল ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'কল্লোল' পত্রিকা, এ তথ্য সর্বজনবিদিত। এবং বাংলা সাহিত্যে ক্রমিক পরিচিতি ও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বস্তুত গল্প ও উপন্যাস দুই শাখা দিয়েই। গল্প ও উপন্যাস দুই শিল্প-শাখায় তিনি ছিলেন সব্যসাচীর ক্ষমতা-সম্পন্ন। তাঁর আবির্ভাব-কাল তিন দশক। তিনি নিজে জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বংশগত সূত্রে যুক্ত ছিলেন—যদিও সে জমিদারতন্ত্র তাঁর সময়ে প্রদীপের গহ্বরে নিঃশেষ তেলটুকু নিয়ে জ্বলে থাকার শিখার মতো মলিন, ক্ষীয়মাণ। তিনি গান্ধী প্রাণিত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে কারাবরণ করেছেন সেকালে। নাট্যকার হওয়ার বাসনা তাঁর মধ্যে লালিত হয়েছিল গভীরভাবে, কিন্তু এই বাসনার বাস্তব প্রয়োগে ব্যর্থকাম হন। তাঁর সমাজতন্ত্র-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা রাজনীতির সূত্রে স্বদেশভাবনা, তাঁর নাট্যকার হওয়ার আন্তরিক প্রয়াস ও ব্যর্থতা সবকিছু সম্ভব হয়েছিল তাঁর স্বদেশ, গ্রাম -বাংলার জন্মক্ষেত্র বীরভূম অঞ্চলের লালমাটির পরিবেশে ও প্রেরণায়।

এ সমস্তই প্রমাণ করে তারাশঙ্কর মাটি থেকে মুখ না তোলার শিক্ষা সাহিত্যজীবনের শুরুতেই পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' থেকেই এর প্রমাণ মেলে। তিনের দশকে তারাশঙ্কর গ্রাম-বাংলার লেখক, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রামীণ লেখক নন। আঞ্চলিক জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের সীমা রচনা করেনি, ব্যাপ্তি দিয়েছে। এই ব্যাপ্তির উৎস তাঁর অসম্ভব শিল্প-ক্ষমতার কেন্দ্রেই স্থিত। তিনি জীবনযাপনের নানা সূত্রে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন স্বকীয়তায়, মানুষকে সংলগ্ন সন্নিহিত করেছেন বিশিষ্ট সব চরিত্র-ভাবনায়, তাঁর সমস্ত বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন tale-ধর্মী বিবৃতি বৈশিষ্ট্যে ও ছোট ঘটনার অভাবনীয় নাটকীয়তায়। তারাশঙ্করের সামগ্রিক শিল্পকর্ম তাঁর জীবনচর্যাজাত শিক্ষারই অবধারিত অঙ্গ।

গল্পে এসবের স্বাক্ষর আছে, উপন্যাসে তা বিস্তৃতভাবেই। তারাশঙ্করের আভির্ভাবকাল প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালেই, কল্লোল-প্রগতি-কালিকলমের উতরোল পরিবেশে। ঔপনিবেশিক শাসনে পর্যুদস্ত জাতীয় আন্দোলনে কখনো দীপ্ত, কখনো মন্থর, বেকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সম্মুখীন-শূন্যতা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র শাসিত সংস্কৃতি-জগতের পাশে তাঁকেও ভয়ঙ্করভাবে তাড়িত করে। তারাশঙ্কর এসবের প্রতিক্রিয়ার শিল্পী, বিদ্রোহের নন। গ্রাম থেকে উঠে-আসা মানুষ শহরকে দেখেছেন, গ্রামের সঙ্গে তার মিল-অমিল বিচার করতে বসেছেন, কল্লোলপন্থী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র,

শৈলজানন্দ প্রমুখ তরুণদের সরব চিৎকার, যৌনভাবনা, অস্বীকার, অনিশ্চয়তাবোধ তাঁকে চকিত করে তৃপ্ত করেনি, আকর্ষণে তাঁর স্বভাবের বদল ঘটাতে পারেনি। তারাশঙ্কর কল্লোলে লিখেছেন, কিন্তু কল্লোলের তথাকথিত দ্রোহভাবনার শিকার হননি। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, 'আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনোদিন হয়নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে একথা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।'

স্বভাবতই এই আত্মবিশ্লেষণ তাঁকে আলাদা পথের সাধক প্রমাণ করে। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি—এই মানব্য-ভাবনা তাঁর বিষয়-নিহিত মৌল প্রেরণা। আগেই বলেছি, তিনি গ্রামের মানুষ, গ্রামের পুরনো-নতুন মাটির গন্ধ, তৃণ, বাতাস, স্বভাব—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে হয়ে-ওঠা এক সচেতন মানুষ। তাঁর পক্ষে নাগরিক জীবন-উদ্ভূত শূন্যবাদের প্রতিক্রিয়া তাঁকে গ্রাস করতে পারে না। আর পারেনি বলেই তারাশঙ্কর যত গল্প লিখেছেন সেই সঙ্গে উপন্যাসও, সে সবের মধ্যে আপন দৃষ্টিকোণে সৎ তান্ত্রিকের মতো স্থিত থেকেছেন। কখনো বিচ্যুতি ঘটলে তাঁর ব্যর্থতাই আমাদের কাছে প্রকট হয়ে পড়ে।

তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের একজন স্বভাবী-পাঠক ও গুণগ্রাহী। একজন আগামী দিনের প্রতিষ্ঠিত লেখকের পক্ষে পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ মনের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য-ভাবনা বস্তুত উত্তরসূরির ওপরে প্রভাবের কথাই মনে করায়। তারাশঙ্করকে, তাঁর শিল্পবোধকে তৈরি করেছে পূর্বসূরি এই দুই লেখকের শিল্পশিক্ষাও। তারাশঙ্করের সমস্ত গল্পে আছে আদিম জীবন স্বভাবের সন্ধান, আছে প্রেমের রক্ত-মাংস-মজ্জার স্বরূপে বিচারণা, আছে এসব থেকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে এক অধ্যাত্ম আলোক-দীপ্তির পরিপূর্ণ উদ্ভাস। এসবই তাঁর attitude to life-এর সম্যক অনুগত।

কিন্তু এসব বিষয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যে রীতির অনুশাসনকে অনুপন্থী করেছেন আপন শিল্প-চিন্তায়, তা তাঁকে নতুন পরীক্ষায় তাড়িত ও প্রাণিত করেনি। সমকালের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিকে মুখ্য বিষয় করে গ্রামীণ মানুষের যোগে এক রহস্যময় প্রকৃতিদর্শনের সমীপে শিল্প-ভাবনাকে প্রোজ্জ্বল করেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে, সত্যিকারের আধুনিক মন ও মননে তাঁর শিল্পবিষয়কে সেকালে আধুনিকতম করার প্রয়াসী হন, তারাশঙ্করের বিষয়ভাবনা এঁদের থেকে নিশ্চিতভাবে স্বতন্ত্র।

এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর গল্পের কাঠামোয় মেলে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, কিছুটা তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতাও বটে, কিছুটা পূর্বসূরি-নির্দিষ্ট প্রথার প্রতি আন্তরিক আনুগত্যও বলা যায়, লেখককে কিন্তু অন্য সতীর্থদের থেকে স্বতন্ত্র আসন দেয়। প্রথমত, একটি নিটোল কাহিনীবৃত্ত ও একাধিক ছোট বড় ঘটনার সমাবেশ তাঁর গল্পে অনিবার্যভাবে এসে

পড়ে। দ্বিতীয়ত, ঘটনা থাকলেই যে নাটকীয়তা থাকবে তা নয়, ঘটনা গভীর ব্যঞ্জনার অনুবর্তী থেকে আত্মগোপন করে ব্যঞ্জনাকেই প্রতীকে প্রতিমা করতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পে ঘটনার সঙ্গে আছে নাটকীয়তা, চমক, বিস্ময়কর আকর্ষণ। আবার কোথাও কোথাও মেলোড্রামার অঙ্কশায়ী হয়ে ওঠে কোনো কোনো ঘটনার সংযোজন। তৃতীয়ত, কাহিনী আছে, ঘটনা আছে, কিন্তু চরিত্রই লেখকের একমাত্র উদ্দিষ্ট। সেক্ষেত্রে চরিত্রনিহিত জটিল মনস্তত্ত্বটি কাহিনী ও ঘটনার ওপরেই একান্ত নির্ভরশীল হয়। মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্য বিশেষ চরিত্রের পক্ষে আত্মনির্ভরশীল না হয়ে বহিঃঅস্তিত্বের মুখাপেক্ষী হওয়ায় একটি আধুনিক চরিত্রের 'brooding' বৈশিষ্ট্য থেকে যে ব্যক্তিত্বের উন্মোচন, তা না হয়ে চরিত্র-মাত্রার স্বভাব অন্য মাত্রা আনে। চরিত্র মনের জটিল আলোয় আলোকিত হওয়ার থেকে ঘটনা-তাড়িত হয়ে তার ভাগ্যচিত্রে সফল হয়। চতুর্থত, কাহিনী হয় বিবৃতিধর্মী। কাহিনীর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত টানা বিবরণ tale-এর পর্যায়ে চলে আসে। রীতি ও গদ্যের এই বিবৃতিধর্ম বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-অনুমোদিত। তারাশঙ্করের শিক্ষাদীক্ষা তাকেই মান্য করে। প্রতীকের অসম্ভব কল্পনাসুন্দর কাব্যিকতা, সূক্ষ্মতা, মনন তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে কম প্রয়োগ করেছেন। এখানেই তার নিজস্ব বক্তব্য। তিনি প্রখর বুদ্ধি ও মানবতা, গভীর শিল্পজ্ঞান ও জীবনদর্শন দিয়ে সব কিছু দেখেছেন, কিন্তু প্রকাশ করেছেন অকপটে। তাঁর হাতে চোরা-লণ্ঠনের আলো নেই, আছে ট্রেনের হেডলাইট, আর গতিময় ট্রেনের শব্দের অনুরূপ কোনো শব্দ-যন্ত্র। তারাশঙ্করের গল্প যেন অনেক শব্দের সমাহার, প্রভূত আলোয় ধরা জীবন-সমগ্রতা। এ সমস্তই কিন্তু লেখকের শিল্পভাবনার সীমাবদ্ধতা যেমন, তেমনি তাঁর অসাধারণ শিল্প-ক্ষমতার মূল চাবিকাঠিও। তারাশঙ্করের 'না', 'তারিণী মাঝি', 'অগ্রদাণী', 'ডাইনী', 'জলসাঘর', 'নারী ও নাগিণী', 'রসকলি', 'কালাপাহাড়', 'বেদেনী', 'পৌষলক্ষ্মী', 'কামধেনু' ইত্যাদি একাধিক গল্পে আমরা এসবের পরিচয় পাই।

১.

না

এক

'না' মূলত চরিত্র-ভিত্তিক গল্প। যে গল্পে চরিত্রই একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে, আর সব তার রাজার বশংবদ পারিষদবর্গের মতো, সে গল্পের রসকেন্দ্র ভিন্ন স্বাদের দ্বারস্থ! কথাসাহিত্য তো 'prose of man's life'। যে চরিত্র গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের কঠিন পাথরটিকে শিল্পরসে গলাতে চায়, সে চরিত্রের একটি মাত্র dimension থাকে না। তার সমাজ-ভিত্তি, পারিবারিক ঐতিহ্য, ভালোলাগা-মন্দলাগা, তার মনস্তত্ত্ব এবং সর্বোপরি তার সূত্রে চিরকালের নর-নারীর জটিল সম্পর্ক-সমস্যাও প্রধান হয়ে উঠে নানান dimension দেবে তাকে। ১. গল্পে বিশেষ চরিত্রের নির্বিশেষ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে তার আচার-আচরণজাত চিত্ত-স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই। ২. চরিত্রের ন্যায়-সম্মত বিকাশ চরিত্র-ভিত্তিক গল্পে একান্ত কাম্য। ৩. তার শেষ চিত্র গল্পের সিদ্ধান্ত যেমন, লেখকের মুখ্য বক্তব্যের নিশ্চিত ঘোষণাও। চরিত্র অপূর্বত্ব পায় সেখানেই। ৪. চরিত্র কখনো স্বাবলম্বী হতে পারে তার মনোভাবনার রহস্য প্রকাশে, অথবা কাহিনী ও ঘটনার প্রয়োগগত তাৎপর্যের অনুগতও হয়ে উঠতে পারে। ৫. চরিত্র তো ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো এক অস্তিত্ব। তাই মানব-ভাগ্যের অনুপন্থী ট্র্যাজেডি ভাবনা বা কমেডির আনন্দ চরিত্র-পরিণতিতে আসতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যে চরিত্র-নির্ভর গল্প লিখতে বসে একাধিক কমেডি-চরিত্র এঁকে বিপুল আনন্দরস পরিবেশন করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

'না' গল্পে আছে ট্র্যাজেডির বিষাদ। এই গভীর ঘন বিষাদ কাহিনী ও ঘটনা-পরম্পরাতেই তৈরি হয়ে যায় পরিণামী অংশে। আগেই বলেছি, তারাশঙ্করের গল্পে কাহিনী ও ঘটনা নিটোল রূপ নিয়ে আসবেই। 'না' গল্পে তার সম্যক পরিচয় মেলে। এই কাহিনীবৃত্ত দীর্ঘ, ও দীর্ঘ-সময়ব্যাপী হলেও গল্পাংশ তুলনায় সামান্য। জমিদার-পুত্র অনন্ত মামাতো ভাই, কালীনাথ তার পিসতুতো ভাই। তুলনা করলে বোঝা যায়, কালীনাথের চেয়ে বয়সে বছর চারেক বড় হলেও দুজনে ছোটবেলা থেকেই একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন। স্বভাবে অনন্ত দুরন্ত। সে লেখাপড়া তেমন শেখেনি বটে, কিন্তু গুলিভরা বন্দুক ব্যবহারে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। জমিদারি আভিজাত্য ও দক্ষতাতেই যেন সে কথায় কথায় পাখি, জীবজন্তু শিকার করতে পারে। কালীনাথ বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত এক যুবক। অনন্তের সাহসিকতার পাশে সে অনেকটা ম্লান। বিবাহের বয়সে ঘটক যখন একসঙ্গে দুজনেরই পাত্রী ঠিক করে তখন অনন্তর সরল স্বাভাবিক কৌতুককর খেলার ছলে ও যুক্তিতে অনন্ত নিজে যায় কালীনাথের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রী দেখতে, কালীনাথ যায় অনন্তর পাত্রী-দর্শনে।

এখানেই সামান্য ঘটনা সূত্রে গল্পের ট্র্যাজেডির অতি সূক্ষ্ম বীজটির বপন হয়ে যায়। অনন্তর জন্য নির্দিষ্ট পাত্রী ব্রজরাণীকে কালীনাথের মনের গভীর গোপন প্রদেশে পছন্দ হয়ে যায়। সে তার মনের কথা গোপন রেখে অতি সংগোপনে ব্রজরাণীর বাড়িতে

অনন্তর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো বিরূপ চিত্র তুলে একটি চিঠি লেখে। আর কালীনাথের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রী—যাকে অনন্ত দেখতে যায়— তার বাড়িতে দেয় নিজের নামে মিথ্যাভাষণ দিয়ে আর একটি গোপন পত্র—যাতে কালীনাথকে তারা অপছন্দ করে। এই যে চরিত্রগত ভ্রান্তি—এখান থেকে গল্পের ট্র্যাজেডির বিস্তার উৎসমুখ ধরে।

ঘটকের সহায়তায় কালীনাথের সঙ্গে ব্রজরাণীর বিবাহ হয়ে যায় ও অনন্তের সঙ্গে বিবাহ হয় কালীনাথের জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট পাত্রীর। অনন্তর স্ত্রী ছিল সেই সময়ের কলকাতার নিকটবর্তী এক আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত প্রাচীন জমিদার বাড়ির মেয়ে। ব্রজরাণীর সঙ্গে কালীনাথের চমৎকার মিল হয়ে যায়। কিন্তু অনন্তর জীবন ক্ষতবিক্ষত বিষময় হয়ে ওঠে তার আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত বিসদৃশ ব্যবহারে। শেষে অনন্তর কাছে ধরা পড়ে কালীনাথের সেই গোপন চিঠির কথা—যা কালীনাথ অনন্তব বর্তমান শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিল বিয়ের আগে। অনন্তর মানসিক অবস্থা তখন শ্বশুরের নির্মম ব্যবহার ও অপমানবোধে তিক্ততা ও রাগের তুঙ্গে। ঠিক সেই মানসিকতায় একদিন সামনে পড়ে যায় কালীনাথ। ব্রজরাণী তখন তার ব্রত সাঙ্গ কর্বার জন্যেই ডাকে অনন্তকে। আত্মক্ষোভে পর্যুদস্ত, প্রায়-বিধ্বস্ত, অন্তরে ক্ষয়িত অনন্ত নিজের রিভলভার দিয়ে আত্মহননের কথাই ভাবছিল। কিন্তু কালীনাথকে সেখানে দেখে—সে-ই তার জীবনের এমন দুঃসহ অপমানকর অবস্থার কারণ—মনে পড়ায় নিজেরই বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারে কালীনাথকে ব্রজরাণীর সামনেই। তারপর বেরিয়ে এসে আত্মহত্যার সময়ে দেখে তার বন্দুকের গুলি নিঃশেষিত।

এখানে কাহিনীর আর এক মোড় ফেরে। দুই চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। কালীনাথকে মারার দশদিন পর যখন অনন্ত ধরা পড়ে, তখন সে উন্মাদ। সেই অবস্থায় তার জেলবাস ঘটে দীর্ঘ আট বছর, পরে তাকে বিচারকের কাঠগড়ায় আনা হয় ব্রজরাণীর পক্ষে তাকে দিয়ে প্রকৃত খুনির শনাক্তকরণের জন্য। ব্রজরাণী—যে এই দীর্ঘ আট বছর ধরে তেলহীন কেশে ও কঠিন প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে প্রতীক্ষায় ছিল—সে চিনিয়ে দেবে খুনিকে তার যথার্থ বিচারের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে দুরন্ত ভয়ঙ্কর প্রাণশক্তিবান যুবক অনন্ত একদিন কালীনাথকে ব্রজরাণীর সামনে খুন করেছিল—তাকে দেখতে না পেয়ে—তার চেহারা, শুভ্রকেশ, শীর্ণ-ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করার সবিনয় শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গি দেখে ব্রজরাণী প্রবল আবেগের আচ্ছন্নতায় তার প্রকৃত স্বামী-হন্তারককে খুনি হিসেবে শনাক্ত করতে অস্বীকার করে। এ যেন এক ক্ষমা। এতেই ব্রজরাণীর যেন দীর্ঘ আট বছরের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রগাঢ় প্রশান্তি!

কাহিনীবৃত্তের এখানেই শেষ। 'না' গল্পের আরম্ভ তোড়জোড় করে অনন্তর শেষ-বিচার-আয়োজনের ঘটনা দিয়েই। কিন্তু কিছু অংশ পরেই শুরু হয়েছে ফ্ল্যাশব্যাকে অতীতের ঘটনা বর্ণনা। এই ঘটনাকে গ্রথিত করেছেন লেখক জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী দুই কিশোর থেকে যুবক হয়ে-ওঠা অনন্ত ও কালীনাথের কাহিনী রচনায়। সেই দীর্ঘ কাহিনী যেখানে শেষ, তারপরেই আবার বিচারদৃশ্য এবং ব্রজরাণীর আবির্ভাবে

গল্পের সমাপ্তি। 'পুঁইমাচা' গল্পে বিভূতিভূষণ অতি সামান্য কাহিনীবৃত্তটিকে রেখেছেন এক বছরের দুই প্রান্তের মাঝখানে, তারাশঙ্করের 'না' গল্পের কাহিনীতে আছে দীর্ঘ আট বছরের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। গল্পের গঠনের দিক থেকে তারাশঙ্কর উপন্যাসের যেন একটা খসড়া-রূপের প্রতিলিপি রেখেছেন এখানে। এ গল্পে একাধিক ঘটনা ঘটেছে। বিবাহের জন্য মেয়ে দেখা থেকে শুরু করে, বিবাহ, শ্বশুরালয়ে অনন্তর ভয়ঙ্করভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার চিত্র, শ্বশুরের জমিদারি-আভিজাত্যে জামাতাকে বেত্রাঘাত, গোপন পত্র প্রসঙ্গে জানাজানি হওয়া, ব্রজরাণীর ব্রত সাঙ্গ হওয়ার মুখে অনন্তর ঘটনাস্থলে আগমন, কালীনাথকে হত্যা, অনন্তর জেলজীবন গ্রহণ, আবার সুস্থ হয়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো—সমস্ত ঘটনা আপন আপন বৈশিষ্ট্যে বড় কাহিনীকে রুদ্ধশ্বাস গতি দিয়েছে। এখানেই গল্পের এক কৃতিত্ব ঠিকই, কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে ঘটনা হয়েছে অতিনাটকীয়। ব্রজরাণীর ব্রত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অনন্তর আবির্ভাব মেলোড্রামাটিক। তবু মেলোড্রামাকে যদি শিল্পসম্মতভাবে ঘটানো যায়, তা-ও সার্থক হতে পারে বলে একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার যে মত পোষণ করেছেন, সেই ন্যায়ে 'না' গল্পের মেলোড্রামাকে মেনে নেওয়া যায়।

কিন্তু টানা কাহিনীর অভ্যন্তরে যে গল্পাংশ তা চরিত্র বিকাশের কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কাহিনী ও ঘটনা প্রমাণ করে তারাশঙ্করের মূল লক্ষ্য ব্রজরাণী। সতী-সাধ্বী বাঙালি স্ত্রীর চাবিত্রিক দৃঢ়তা, কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যক্তিত্ব, স্নেহ-মায়া-মমতা-মাখানো ঔদার্য ও ক্ষমাবোধ তারাশঙ্করকে এমন গল্পরচনায় প্রাণিত করে বলেই মনে হয়। কাহিনী অংশে সর্বত্র আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিকাশ ঘটেনি। লেখকের বিবরণেই সেই মনস্তত্ত্ব চিত্ররূপ পেয়েছে। এ গল্পে লেখক যতটা প্লট-আশ্রয়ী, ততটা চরিত্র-আত্মা-সন্ধানী ডুবুরি হননি। কালীনাথের হত্যার পর অনন্তর যে আসল যন্ত্রণা তার চাবিকাঠি চরিত্রে নেই, আছে লেখকের বর্ণনায় ও বিবৃতিতে। বিধবা ব্রজরাণীর যে তৎপরতা, তা-ও চরিত্রনিহিত হয়েছে কিছুটা, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তাকে শিল্পের ন্যায় দেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে আনতে হয়েছে ব্রজরাণীর মা, দাদা হরদাসকে, তার ছোট মামাশ্বশুর ও বেয়াই প্রসঙ্গ। গল্পের শেষেও ব্রজরাণীর কাহিনী শেষ করতে বসে তারাশঙ্কর সেই মা, দাদাকে আবার এনেছেন। ব্রজরাণীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা এই চরিত্রের স্বনির্ভরতায় সম্ভব হয়নি, কাহিনী ও ঘটনা তার হাত ধরে।

দুই

'না' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্রই কাহিনী ও ঘটনাকে বর্জন করে বড় হয়ে ওঠে, চরিত্র কাহিনীরস ও ঘটনাবৈচিত্র্যের অভিনবত্বকে গ্রহণ করে সাপের খোলসের মতো তাকে ত্যাগ করে গভীরতর ব্যঞ্জনার সূত্রে। সমগ্র গল্পে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ব্রজরাণী, কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র অনন্ত। ব্রজরাণীর জীবনে যে ট্র্যাজেডির ঘন মেঘ আকস্মিক বজ্রপাত ঘটায়, তার জীবনকে সুস্থ ভিত্তি থেকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়, তা তার চরিত্রনিহিত ভ্রান্তি

নয়, তা তার ভাগ্য—যার কাছে সব মানুষই অসহায়। তারাশঙ্কর এমন একটি সূত্রই এই চরিত্রে রেখেছেন। ব্রজরাণীর ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণত তার পরিপার্শ্ব থেকে উদ্ভূত। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা অতুলনীয়, সেই সঙ্গে দেবর অনন্তের প্রতি তার বিশ্বাস, স্নেহ-প্রীতি-মমতা, করুণাও অসীম, দেবপূজার ধূপ-ধুনো-ফলমূলের গন্ধের মতো পবিত্র, শুচিশুভ্র। অনন্ত যে একদিন তার স্বামীকে খুন করতে পারে, এই চিন্তাই তার ছিল না। তবু তার মতো রমণীর জীবন হয় গভীরতম বিষাদাত্মক (tragic)। ব্রজরাণীর যে খুনি অনন্তকে চরম শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন, তা অনন্তকে তার দীর্ঘ আট বছরের কারাবাসের পরে দেখেই কেমন অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

'না' গল্পে ব্রজরাণী চরিত্রটির স্বভাবগত মাত্রা তিন দিক থেকে লক্ষ করার মতো—১. স্বামী কালীনাথের সঙ্গে স্ত্রী সম্পর্কে, ২. অনন্তর বিষয়ে একই সঙ্গে দেবর ও স্বামী-হত্যাকারীর ভাবনায়, ৩. তার একান্তভাবে নিজেরই সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার বিচারে। স্বামী কালীনাথের প্রতি ব্রজরাণীর ভক্তিপ্রীতিতে এতটুকুও ঘাটতি নেই। সে একেবারে আদর্শ ভারতীয় রমণী ও বধূ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নারী চরিত্র আঁকতে বসে ভারতীয় নারীত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যসম্মত আদর্শের চরম রূপটি গ্রহণ করেছেন। সে চরিত্রে খাদ নেই। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত স্বামীর হৃদয়-রাজ্যের 'রাণী' সম্বোধনের থেকে পছন্দ করে—তারই কথায় 'সবাই যা বলে তাই বলবে—'ওগো'—এই সম্বোধন। তার 'অবৈধব্য ব্রত' পালনের ব্যবস্থা তাকে প্রাচীন ঐতিহ্যে শক্তিময়ী নারী করে তোলে। তার স্বামীপ্রেম সমগ্র ভারতীয় বিবাহিতা নারী-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে।

অন্যদিকে তার দেবরের প্রতি স্নেহ, প্রীতি, মায়া-মমতা, করুণা একেবারে খাঁটি এবং সমান মাপের। সেখানেও এতটুকু মিশেল নেই। অনন্তর প্রতি আতিথেয়তার ঔজ্জ্বল্য নিজের স্বামীর বন্ধু হিসেবে যেমন, সম্পর্কিত দেবর হিসেবেও তেমনি মর্যাদা পায়। এখানেও তার স্বভাব এক মেরুগামী। আবার যখন সেই অনন্ত স্বামী-হন্তারক—তখন তার ঘৃণা নয়, রাগ, ক্ষোভ, বড় অভিমান আর এক মেরুগামী হয়ে ওঠে। সেখানে সে চরম কঠিনতম বিচারের রায়দানের পক্ষে নির্মম একজন বিচারক। অর্থাৎ ব্রজরাণীর যে মনোভাব—তাতে অন্তঃশীল থাকে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বই তাকে মানবিক করে তোলে। সে সেবায়, ভালোবাসায়, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় বাস্তবিক অর্থে দেবীর আসনেই বসেছিল স্বামীর মৃত্যুর আগে। বিচারের দৃশ্যে সে হয় মানবিক দ্বন্দ্বের জীবন্ত চরিত্র। যে দ্বন্দ্ব রক্ত-মাংসের মানুষের। 'ব্রজরাণী স্তম্ভিত হইয়া খুঁজিতেছিল, কোথায় সেই দৃপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবা? কই, সে কোথায়? এ কি সেই মানুষ? না, না, এ সে নয়, হইতে পারে না। তাহার অন্তরের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল'। এমন দ্বন্দ্বের সঙ্গে অভিযুক্ত অনন্ত সম্পর্কে আর একটি চিন্তাও তার মধ্যে জড়িয়ে থাকে, তা সর্বকালের মানবিক চিন্তা— 'পৃথিবীর দীনতা—পুঞ্জীভূত হীনতায় জীর্ণ, ঘৃণাহত ঐ হতভাগ্য, হায়রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে! এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার!' এখানে ব্রজরাণীর সেই ক্ষমার দিব্য-জ্যোতি চরিত্রকেন্দ্র থেকে মূল্যবান

সুগন্ধি ধূপের গন্ধের মতো, চন্দনের স্নিগ্ধ ঘ্রাণের লাবণ্যের মতো প্রকাশোন্মুখ। মনস্তত্ত্বসম্মত এই দ্বন্দ্বের স্বভাবে আর এক মেরু চিহ্নিত হয়ে ওঠে।

সমগ্র গল্পে ব্রজরাণীর পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্র-নিরপেক্ষ নিজস্ব একটা সত্তাও সক্রিয়। বিধবা হওয়ার পর তার মামাশ্বশুর ও নিজের শ্বশুর যখন মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে বার বার আসে, তখন তার দৃপ্ত উত্তর 'না'। অনন্তর হয়ে ক্ষমা চায় অনন্তর পিতা, এ প্রস্তাবের কথা দাদা হরদাস ব্রজরাণীর সামনে তার মাকে শোনালে ব্রজরাণী নিশ্চুপ থাকে। কিন্তু যখন অনন্তর শ্বশুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার মেয়েকে দয়া করার বিনিময়ে ব্রজরাণীর পিতৃহীন-পুত্রের ভরণপোষণ দানের ইঙ্গিত করে তার সামনে হরদাসের মুখ-দিয়ে-বলা তার মাকে শোনানোর মধ্য দিয়ে, তখনি—'জ্যা-মুক্ত শরের মত মুহূর্তে ব্রজরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া গেল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না।' সে ক্ষমার প্রসঙ্গে নীরব, অন্যের করুণা দয়া তার কাছে অশালীন, ঘৃণ্য মনে হয়। বিচারের দৃশ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বেব অবসানে যে যখন অনন্তকে শনাক্তকরণের অন্তিম উত্তরে 'না' বলে, তখনো তার কাছে বিবেকের সংকল্পই একমাত্র সত্য হয়। অর্থাৎ ব্রজরাণীর সমস্ত কিছু থেকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন স্বাবলম্বী একটা সত্তা ছিল, তা তার ব্যক্তিত্বের। এই ব্যক্তিত্বের জোরেই সে 'না'-কে ধরে রাখার জিদে অনড় কঠিন থাকে।

ব্রজরাণী অনেকটা ভারতীয় নারী-আদর্শের প্রতীকী চরিত্র হলেও তার ব্যক্তিত্ব, সর্বশেষ দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত তাকে রক্তমাংসের চরিত্র করে তোলে। ব্রজরাণী চেয়েছিল নিজের বিচারে সেই আট বছর আগের দৃপ্ত, বলশালী যুবক স্বামীহন্তাকে চরম শাস্তি দিতে, কিন্তু অনন্তর উন্মাদগ্রস্ততার পর কারাজীবনে তার যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তিত রূপ—তা ব্রজরাণীর মধ্যে গভীর-জটিল স্নেহ-মায়া-মমতায় ক্ষমাসুন্দর চোখ ও মনকেই প্রধান করে। যে মানুষ আত্মক্ষোভে ও অন্তর্দাহে মাত্র আট বছরের কারাজীবনেই এমন নিষ্করুণ রূপ পায়, তাকে আর নতুন শাস্তি কি দেবে সে? সে তার শাস্তি তো পেয়েই গেছে। আরও, শনাক্তকরণের মুহূর্তে ব্রজরাণীর অতীত স্মৃতিতে ধরা অনন্তর প্রতি মমতাময় ভাবনাগুলি এবং অনন্তর দিক থেকেও বৌদির প্রতি আবেগদীপ্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশগুলির স্মৃতি একটা মহামানবিক বিন্দুতে স্থিত হতেই যেনবা বিস্ফোরণ ঘটায় ব্রজরাণীর চরিত্রে। তার সিদ্ধান্ত যায় বদলে। সে হয় শান্ত, তৃপ্ত। প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে সে নির্ভয় হয়, নিজেকেও আর তার যেন ভয় নেই, দুঃস্বপ্ন আর তাকে তাড়া করে না।

অন্যদিকে অনন্তর জীবন-ট্র্যাজেডির চিত্র আর এক রঙে আঁকা। সবচেয়ে বেশি ভাগ্যের কাছে তাড়িত নায়ক অনন্ত। সে যথার্থ অর্থেই ট্র্যাজেডির নায়ক। এ ট্র্যাজেডি চরিত্রনিহিত নয়, তার ভাগ্য ও পরিবেশ তার সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রীশক্তি। তার স্বভাবে যে জ্বালা, ক্ষোভ, দুঃখ, বিষময় অস্বস্তি—সেসবই তাকে চরম পরিণতির দিকে অনিবার্যভাবে ঠেলে দেয়। ট্র্যাজেডির নায়ক, সমালোচকের ভাষায়—'a man of high magnitude'। জমিদার-তনয় অনন্ত সেই রকম মানুষ। তার কালীনাথের মতো আধুনিক

শিক্ষা নেই, নেই কোনো জটিলতা। সে সরল, অকপট, উন্মুক্ত মনের শক্তিমান পুরুষ। তার মধ্যে জমিদারি রক্ত বর্তমান। সে উদারমনা। তার কৌতুকরস-বোধও তার চরিত্রকে স্বচ্ছ করে।

কিন্তু তার আদিম বৃত্তি অর্থাৎ পশু-পাখি শিকার বৃত্তিটি যে একদিন কালীনাথকে হত্যায় অন্তঃপ্রেরণা হবে, এ ধারণা কারোর ছিল না। অনন্ত চরিত্র পরিকল্পনা তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের জমিদারি অভিজ্ঞতা ও সামন্ততন্ত্র ভাবনা থেকে জাত। অনন্তর সামন্ততান্ত্রিকআভিজাত্যের শিক্ষা থেকে তার স্ত্রীর শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরনো জমিদার বংশের এই রমণীর সঙ্গে তার বিরোধ তাই তীব্রতম। অনন্ত সারা গল্পে যেন মহাভারতের অভিমন্যুর মতো। কালীনাথের গোপন চিঠির প্রতিক্রিয়া, নববিবাহিতা স্ত্রীর অশালীন অসৌজন্যকর, বিরূপ, অপমানজনক ব্যবহার, শ্বশুরালয়ের সামগ্রিক বিরুদ্ধ আচার-আচরণ, নিজের পিতার বিরুদ্ধতা, শ্বশুরের কাছে অকৃত্রিম ক্ষমা চাওয়ার মুহূর্তে নির্মম বেত্রাঘাতপ্রাপ্তি—এই সমস্ত ঘটনা ও আচরণ অনন্তকে সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো অসহায় নিয়তিনির্দিষ্ট জীবন-স্বরূপে নিয়ে যায়।

এসবের পরিণাম গভীর শূন্যতা। তার ট্র্যাজেডি সেই শূন্যতাবোধ থেকেই উদ্ভুত। আসলে অনন্তর ট্র্যাজেডি তার জমিদারি আভিজাত্য-জাতীয় জিদে। এটাই তার tragic flaw। সে সচেতনভাবেই লেখাপড়া শিখতে অস্বীকার করে। 'অনন্তর ইচ্ছা হইল, সে দৃপ্ত হুঙ্কারে বলিয়া উঠে—না, না, না।' আবার যখন নিজে থেকে লেখাপড়ার কথা ঠিক করে, তখনি বাইরের আঘাত তাব স্থির মনকে ভেঙে টুকরো করে দেয়। একদিকে তার ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্যবোধের জিদ, আর একদিকে স্ত্রী, সংসার, শ্বশুরালয়ের সঙ্গে অবিরাম আপোস করার মনোবাসনা, কালীনাথের চিঠির কথা জেনেও দেবীর মতো বৌদির কথা ভেবে তা সহজ করে নেওয়া—এসবের মধ্যে চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। সবশেষে শূন্যতাবোধ থেকে বাঁচার জন্য আত্মযন্ত্রণায় আত্মহননের বাসনা এবং আকস্মিকভাবে কালীনাথ-হত্যায় তাকে যথার্থ ট্র্যাজেডির নায়কের গৌরবই দিয়েছে।

অনন্তর চরিত্র-নিহিত tragic flaw তার আয়ত্তের বাইরে। সেখানে সে অসহায়। 'না' গল্পে ব্রজরাণীর অসহায়তার পাশে অনন্তরও একই অসহায় অস্তিত্বের পরিচয় পাই। কালীনাথ-হত্যার আগে অনন্ত এক বলিষ্ঠ, সরল, অকপট, পৌরুষদীপ্ত মানবিক চরিত্র। শেষ বিচারকের কাঠগড়ায় তার অন্য রূপ—'একটি লোক—শুভ্রকেশ, শীর্ণ, ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।...অকস্মাৎ ওই শীর্ণ জীর্ণ হতভাগ্য যেন স্মৃতিকে খুঁজিয়া পাইল—সে পরম মুগ্ধ দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধায় তাহার দিকে চাহিয়া বার বার ঘাড় নাড়িয়া যেন নিজেকেই সমর্থন করিয়া বলিল—দেবী! দেবী! স্বর্গের দেবী! তুমি বউদি।' এ মূর্তি ট্র্যাজেডির নায়কের মৃত্যুকালীন সুন্দর মূর্তি।

গল্পের অন্যতম চরিত্র কালীনাথ ব্রজরাণী ও অনন্তর পাশে অনেক ম্লান, নিষ্প্রভ। ব্রজরাণী ও অনন্তর পাশে সে কিছুটা পৌরুষহীন, সংকীর্ণ এক মেরুদণ্ডহীন পুরুষ। এমন ম্লানিমা তার ছোট স্বভাবের কারণেই। কালীনাথ একালের শিক্ষায় শিক্ষিত। তার আধুনিক

শিক্ষা তাকে বুদ্ধি শেখায়, শেখায় চাতুর্য, কৌশল। কালীনাথের কথাবার্তা অনন্তর মতো অকপট, স্বচ্ছ নয়। তার সূক্ষ্মবোধ ও জ্ঞান তাকে যেমন গোপনতার শিক্ষা দেয়, তেমনি তার বোধ-বুদ্ধি নারীর রূপ ও স্বরূপ নির্বাচনে সঠিক দৃষ্টি দেয়। অনন্তর জন্য নির্দিষ্ট পাত্রী যে যথার্থ জীবনসহধর্মিণী করার উপযোগী রমণী—এই ভাবনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার পরিচয় মেলে। ব্রজরাণী যে যে-কোনো আদর্শ সংসারের পক্ষে মূল্যবান অতি দুর্লভ মুক্তার মতো নারী, এই বোধ কালীনাথকে যথার্থ জহুরি করে তুলেছে। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সহজ সরল অনন্তর প্রতি তার গোপন ব্যবহার তার চরিত্রে কালি-কলুষ লাগিয়েছে। এখানেই আধুনিক শিক্ষার সীমা।

তারাশঙ্করের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব প্রায়শ দেখা যায় গল্প-উপন্যাসের সূত্রে। তিনি আধুনিক যুগের মানুষ হলেও প্রাচীনের প্রতি কিঞ্চিৎ মোহ-মুগ্ধ লেখক। তাই ব্রজরাণীকে অসামান্য মহান করে এঁকেছেন, প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি অনন্তর মধ্যে স্বতন্ত্র মহানুভবতা রক্ষা করেছেন। কিন্তু কালীনাথের আধুনিক সূক্ষ্ম চাতুর্য ও বুদ্ধি কিছুটা যেনবা কলঙ্কের মতো আমাদের দেখিয়েছেন। এই একই ভাবনা সক্রিয় অনন্তর স্ত্রী-চরিত্র পরিকল্পনায়। অনন্তর স্ত্রী জমিদার বংশের হলেও আধুনিক শিক্ষার আলো পেয়ে যেভাবে অনন্তর সঙ্গে আদ্যন্ত ব্যবহার করেছে, তার অমানবিকতা তার চরিত্রের নিশ্চিত কলঙ্কস্বরূপ। অনন্তর স্ত্রী চরিত্রেও আছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ছিটেফোঁটা আভিজাত্যবোধ ও দম্ভ, আর তার সঙ্গে যুক্ত আধুনিক শিক্ষার নিষ্ফল মোহ। এ হল লেখকের বিশেষ মানসপ্রবণতা। ব্রজরাণীর মায়ের চরিত্রটিকে সামান্য সময় পাই গল্পে। সেই চরিত্রটি ব্রজরাণীর মা হবার মতোই উপযুক্ত চরিত্র। পুত্র হরদাস ব্রজরাণীর মামাশ্বশুরের ও শ্বশুরের হয়ে কথা বলতে এলে, প্রকারান্তরে শ্বশুরের টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ এলে চাপা ব্যঙ্গ, তীব্র আপত্তি জানিয়ে ব্রজর মা মেয়ের স্বভাবের অনুরূপ নারী হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষে ব্রজরাণীর মা যথার্থ সাংসারিক বাস্তব মায়ের পরিচয়েই উপস্থিত।

তিন

'না' গল্পটিতে গল্পকার তারাশঙ্করের ব্যক্তিত্ব নানাভাবে ধরা পড়ে। গল্পটি মূলত চরিত্রাত্মক বলেই এর ক্লাইম্যাক্স চরিত্রের সূত্রেই আসা স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক এমনভাবে কাহিনী ও ঘটনা সাজিয়েছেন, যাতে কাহিনী ও ঘটনা যৌথ শিল্প-ন্যায়েই শেষ বিচারের দৃশ্যে 'জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল—না'—এই বাক্যেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, সে ক্ষেত্রে শিল্পের দাবি অনুযায়ী ক্লাইম্যাক্স হল 'ব্রজরাণীর সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া গেল' এই বাক্যেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবত চরিত্রের প্রাধান্যে এই বাক্যেও তাই ক্লাইম্যাক্স নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু চরিত্রকে লক্ষ্যে রেখেই যদি ক্লাইম্যাক্সটি নির্দিষ্ট করতে যাই, তবে 'জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল—না'—এই বাক্যেই তার ক্লাইম্যাক্স অংশ থেমে গিয়ে catastrophae-কেও চিহ্নিত করে।

অর্থাৎ আমাদের মতে উপরি-উক্ত অংশেই গল্পের সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল। খাঁটি

শিল্পের বিচারে, পরবর্তী অংশ বাড়তি। কিন্তু তারাশঙ্কর যেখানে নিশ্চিত নিদ্রার মধ্যে ব্রজকে নিয়ে এসে গল্প শেষ করেছেন, সেখানে যেমন catastrophae স্বীকৃত হলেও গল্পের শিল্প-কাঠামো কিন্তু শিথিল হয়ে যায়। ব্যঞ্জনায় যেখানে শেষ হতে পারত, বিস্তারে তার শৈথিল্য ধরা পড়ে যায়। ঘুমের মধ্যে আগের মতো স্বপ্ন দেখে আর ব্রজরাণী চেঁচিয়ে উঠবে না, ভয় পাবে না—এই ব্যাপারে পাঠকদের ব্রজরাণীর মুখ থেকে 'না' শোনানোর জন্য লেখকের যে প্রয়াস এবং ব্রজরাণীর চরিত্রের অন্তিম রূপ আঁকার যে পরিকল্পনা তা সূক্ষ্ম শিল্পের পক্ষে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক। 'জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল—না' এর মধ্যেই ব্রজরাণীর চরিত্রের পরবর্তী রূপ গভীর ব্যঞ্জনায় অন্তর্গূঢ় হয়ে ওঠে।

চরিত্রনিহিত ভাব নিশ্চয়ই রক্ষিত, কিন্তু লেখক-বর্ণিত বৃত্তান্ত অংশ দীর্ঘ হওয়ার কারণে অঙ্গ-শৈথিল্য স্বভাবী পাঠক-মনে অস্বস্তি জাগায়। শৈথিল্য মূলত বিবৃতি-ধর্মে—যা লেখকের কলম দিয়ে তৈরি, চরিত্রের মর্ম দিয়ে সূত্রবন্ধনে গ্রথিত নয়। বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পে যে ইঙ্গিতার্থ (suggestiveness) এসেছে প্রতীকে, ব্যঞ্জনায়, 'না' গল্পে তা আসেনি। এব ব্যঞ্জনা সৃষ্ট-চরিত্রের আচরণে, ভাবনায়, মনের দ্বন্দ্বে। এবং দুই গল্পের মেজাজ অনুযায়ী এমন তফাত হওয়া স্বাভাবিক।

'না' গল্পের পূর্ব কাহিনীটি দীর্ঘ ঘটনাবহুল এবং tale-ধর্মী। এর বর্ণনা গল্পটির বিশেষ চরিত্রের স্বভাবসূত্র ধবে আসেনি, তা শিল্পসম্মত ফ্ল্যাশব্যাক নয়। লেখকের ব্যক্তিগত মনোনয়নে ও রচনাকৌশলে তা উপস্থিত! তারাশঙ্করের মাপা, ছককাটা এক কাঠামোর পরিকল্পনা এখানে শিল্প-কৌশল হওয়ায় তা কৃত্রিমতায় খাটো হয়ে যাওয়ার সীমায় দাঁড়িয়ে। এবং অবশ্যই এই বীতি গল্পকার তারাশঙ্করের নিজস্ব এক শিল্প-কৌশল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তারাশঙ্কর স্বযং গল্পটিকে একই নামে উত্তরকালে উপন্যাসে রূপান্তবিত করেন। আর একটা কথাও লক্ষণীয়, ব্রজরাণীর তুলনায় কালীনাথ-অনন্তর প্রসঙ্গটি এর অসাধারণ শৈল্পিক আকর্ষণ সত্ত্বেও শিল্পগত প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মাত্রায় স্থান পেয়েছে—এটি ছোটগল্পের আঙ্গিকের নিশ্চিত শৈথিল্য। মূল কাহিনীর বিচারে অনন্তই গোটা কাহিনীর ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্র। তার উত্থান-পতন তাকে উপযুক্ত নায়কের মর্যাদা দেয়। কিন্তু লেখকের চরিত্রকেন্দ্রিক লক্ষ্যবস্তুর দিক থেকে ব্রজরাণী কেন্দ্রীয চরিত্র। লেখকের লক্ষ্য ব্রজরাণীই, অনন্ত গৌণ। কিন্তু সারা গল্পে অনন্তর নিরঙ্কুশ আধিপত্য গল্পের কেন্দ্রীয় রসে বিভ্রান্তি আনতে পারে। অনন্তর সক্রিয়তা ব্রজরাণীর সম্যক বিকাশ ও পরিণতির একমাত্র নিয়ামক, কিন্তু অন্তর-পরিণতি তার নিজস্ব। সে সারা গল্পে সবচেয়ে স্বাধীন, মুক্ত চরিত্র। গল্পের কাহিনীতে যত কিছু ঘটনা ও ছোট-বড় সিদ্ধান্ত তাকেই কেন্দ্র করে, তা অনন্তব তৈরি করা, অনন্তরই স্বভাবের আনুকূল্যে ধরা। কেবল কালীনাথের সেই গোপন চিঠিটি একটি বোমা বিস্ফোরণের উপযোগী অগ্নি-ইন্ধনটুকু হয়েছে। সেই চিঠি বুঝিবা শেক্সপিযরের 'ওথেলো' নাটকে ইয়াগো-ব্যবহৃত ডেসডিমোনার জীবন-নিয়তি নির্দেশক রুমাল।

তারাশঙ্করের সারা জীবনের সাহিত্য-সাধনার মূলে ছিল মানব-মানবীর আদিম বৃত্তির

রহস্য-সন্ধিৎসা। 'না' গল্পে অনন্তর পশু-পাখি শিকার, শেষে কালীনাথ হত্যায় সেই বৃত্তির সূক্ষ্ম স্বীকৃতি দেখি। এই সূত্রেই লেখক-ব্যক্তিত্ব কিছুটা চিহ্নিত হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্বে প্রাচীনের প্রতি কিছুটা মমতাবোধকে লালন করেছেন, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে নানাভাবে, নানা সূত্রে, গল্প-উপন্যাসের নানা আধারে লেখক আনতে উৎসাহী! এসব বীজাকারে 'না' গল্পে মেলে। লেখক-ব্যক্তিত্ব—যা তাঁর রচনার মূল বক্তব্যের সঙ্গে জড়িয়ে জীবনদর্শনকে রূপায়িত করার উপযোগী হয়, 'না' তার কিছুটা সহায়ক গল্প।

চার

'না' গল্পের ভাষা বিবরণধর্মী গদ্যের। সাধু গদ্যরীতিতে গল্পটি আগাগোড়া লিখিত। ব্যঞ্জনার থেকে বিবরণ-ধর্ম এর বর্ণনায় উপস্থিত। গদ্যের আরম্ভে কোনো প্রতীকী বক্তব্য নেই বাক্যগুলিতে—যা সারা গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে দ্যোতিত করতে পারে। বরং আছে কাহিনীর আরম্ভের আকস্মিকতা ও চমক। কাহিনী বর্ণনা দিয়েই গল্প শুরু। শেষ বিচাবেব দৃশ্যটির আগেব দিনের কথাচিত্র গল্পের প্রথমে। কিন্তু সেই চিত্রের সামান্য অংশটুকু অঙ্কনের পরেই গল্পের গতি থেমে যায়। তার স্বতঃস্ফূর্ততা আসে শেষে। মধ্যের অংশটির রশি লেখকের হাতে ধরা। লেখকই আমাদের কাহিনীটি শুনিয়েছেন। এই বর্ণনার গদ্যরীতি ও ভাষা লেখকের মতো করেই গোছানো।

ভাষার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর চরিত্রের বিশেষ মোড়-ফেরানো মানসিকতার তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রতীকী বিষয় ও গদ্য প্রয়োগ করেছেন। সেই গদ্য ও অন্তর্নিহিত বিষয় সমগ্র গল্পের চরম পবিণতি-নির্দেশক বটে। যেমন একই গৃহে কালীনাথ ও অনন্তর বিবাহ সংগঠিত হওয়াব পব সেই বাড়িতেই ফুলশয্যাব রাতে স্ত্রীর ব্যবহারে বিরক্ত অনন্ত শয্যা ছেড়ে কালীনাথের ফুলশয্যা গৃহের দরজায় এসে তাদের অন্তরঙ্গ ভালোবাসার কথোপকথন শোনার পর নীরব নিথর অনন্তর মানসিক অবস্থার বর্ণনা এইরকম :

> 'অনন্ত কালীনাথকে আর ডাকিল না, আপনার ঘরে আসিয়া আবার জানালার ধারে দাঁড়াইল। তাহার ভাগ্য! নতুন এই মেয়ে তো তাহার স্কন্ধে পড়িবার নয়! নারিকেল গাছের মাথায় পেচকটা কর্কশস্বরে আবার ডাকিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অনন্তের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল ঐ কর্কশকণ্ঠ নিশাচর পাখিটার উপর। সে ঘরের কোণ হইতে তাহার রিপীটরটা লইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। আকস্মিক ভীষণ শব্দগর্জনে রাত্রিটা কাঁপিয়া উঠিল, নারিকেল গাছের মাথাটায় একটা আলোড়ন বহিয়া গেল, কি একটা নীচে সশব্দে খসিয়া পড়িল।'

এই বর্ণনা ক্ষুব্ধ অনন্তর সেই মুহূর্তের মানসিক বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র নয়, তার ভাগ্যের নির্দেশকও। পেচকটিকে হত্যা করে নিজের বিরক্তি থেকে স্বস্তির বাসনা

উত্তরকালে কালীনাথকে হত্যা করে শান্তি কামনার প্রতীক-প্রতিম ভূমিকা হতে পারে। ভাষায় প্রতীকী ব্যঞ্জনার থেকে analogy-এর বিস্তৃত ব্যাখ্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তারাশঙ্কর একাধিক গল্পে আঞ্চলিক পরিবেশে গল্পের চরিত্রদের নিয়ে এসে তাদের মুখের ভাষা, আচার-আচরণ গদ্যে ব্যবহার করেছেন। 'না' গল্পের সমস্যা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র শ্রেণীর আভিজাত্য, জিদ ও হৃদয়দ্বন্দ্বের গল্প। এর ভাষায় পরিচ্ছন্ন ভদ্র জীবনের ভাষা, পরিবেশ ও সংলাপ ব্যবহৃত। তারাশঙ্করের গদ্য-ভাষার গতি তাঁর বিষয়-ভাবনা ও চরিত্র-ন্যায়ের পক্ষে সম্যক শিল্প-সমন্বিত।

পাঁচ

'না' গল্পের নামে লেখক ব্যঞ্জনাকে তীব্র করেছেন। এই 'না' শব্দটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক শব্দ। 'না' শব্দটির তাৎপর্যগত প্রতিশব্দ হতে পারে ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক 'জিদ'। 'না' (Negation)-এর উল্টোপিঠে বা বিপরীতে আছে 'হ্যাঁ' (Affirmation)। যেখানেই positive-এর দিকে চরিত্রকে টানতে চাইছে, সেখানেই 'না' (Negative) এসে বাধা দেয়।

'না' গল্পে ব্রজরাণীর চরিত্রে এই 'না' শব্দটি একাধিকভাবে উচ্চারিত। প্রথমত, ব্রজরাণীর স্বভাবের ত্রিস্তর ব্যঞ্জনা অনুযায়ী 'না'-এর ব্যাখ্যায় নামকরণের শিল্পমূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়। 'না' শব্দটি তার শপথের মতো সংকল্পকে, তার দৃঢ়তাকে বজ্র-কঠোর করে। কোনো জাগতিক লোভ, পার্থিব বিনিময় তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে না। 'না' ক্ষমার উদারতা এনেছে ব্রজরাণীর স্বরে অন্তিম বিচারের সময়। 'না' তাঁর 'হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় প্রশান্তি' আনে বিচারের দৃশ্য শেষ হওয়ার পরও। তাই ব্রজরাণী চরিত্র ব্যাখ্যায় নাম তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, বড় ব্যঞ্জনার দিক হল, সেই দৃপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবক অনন্তকে দেখতে না পেয়ে ব্রজরাণী কোর্টের কাঠগড়ায় দেখে আত্মদংশনে শুভ্রকেশ, শীর্ণ, ন্যুব্জদেহ খুনের অপরাধে ভঙ্গিযুক্ত, স্তিমিত-বিহ্বল-দৃষ্টি আজকের অনন্তকে—সে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তার এই বৌদির কাছে ক্ষমাপ্রার্থীর মতো অসহায়। এখানে ব্রজরাণীর সেই অনন্তকে চিনতে না-পারা বা শনাক্তকরণে অনন্তর বাহির-ভিতর-স্বভাব সাহায্য না করায় গল্পের নাম ব্যঞ্জনাধর্মী।

তৃতীয়ত, 'না' শব্দের আরও একটি ব্যঞ্জনা আছে। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অনন্ত নীতিগত অর্থে 'খুনি' চরিত্র নয়। তার পরিপার্শ্বই তাকে 'খুনি' করে তোলে। সে পারিপার্শ্বিকতার দাসত্ব করেছে মাত্র। তার অন্তর্যন্ত্রণা, আত্মহনন বাসনা তাকে পেশাদার খুনির অসম্মান দেয় না। তাই সে ক্ষমার যোগ্য ব্যক্তি। এই ক্ষমার আলোয় 'না' নামকরণ যথার্থ।

চতুর্থত, গল্পের 'না' নামের মধ্যে অনন্ত চরিত্রের জিদ-এর স্বভাবও নিহিত থেকে যায় নামের পক্ষে অংশত ব্যাখ্যায়। স্ত্রীর সঙ্গে সে কোনো compromise-এ যেতে অক্ষম

হয় বার বার। তাতেই সে ধাক্কা খায়। স্ত্রী তার কাছে, তার জীবনে একটা negative অস্তিত্ব, চিরকালের এক negative চিহ্ন। এই negative-ই তার জীবন-অস্তিত্বে নিয়তি নির্দিষ্ট ভাগ্য। যখন তাকে তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি বার বার অনুরোধ করে কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য, তখনো সে তার জিদের কথা জানায়। 'অনন্তর ইচ্ছা হইল সে দৃপ্ত হুঙ্কারে বলিয়া উঠে, না, না, না।' বিচারের কাঠগড়ায় ব্রজরাণীর দিকে তাকিয়ে তার ভাবপ্রকাশ, সেখানে জীবন-ধ্বংস যে কাম্য নয়, তারই সূক্ষ্ম পরিচয় আছে। এখানেও মনোভঙ্গিতে সেই 'না'। সুতরাং অনন্তর চরিত্র-সূত্রেও 'না' নামের ব্যঞ্জনা থেকে যায়।

২.

তারিণী মাঝি

এক

কল্লোলের কালে লিখতে বসে তারাশঙ্কর কল্লোলীয় তরুণ-তুর্কী লেখক-গোষ্ঠীর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের মানসিকতা ও সাহিত্য জীবন সম্পর্কে সংশয়, বিশ্বাসহীনতা মেনে নেননি। তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে বরং মানবজীবন নিয়ে নানান পরীক্ষা করেছেন। এ পরীক্ষায় তাঁর মানুষের ওপর বিশ্বাসই বড় হয়ে উঠেছে, বড় হয়েছে জীবন-প্রেম। বলিষ্ঠ বিশ্বাসের মাটি তৈরি করেছেন লেখক মানব-জীবনের ও তন্নিহিত প্রেমার্তিকে নানা-খানা করে চিত্রিত করে। জীবনের ও জীবনপ্রেমের মূলীভূত রহস্যকে বুঝতে গিয়ে তিনি সভ্য-ভদ্রজীবন ও তার মানুষগুলিকে আধার হিসেবে নেননি সবসময়ে, নেমে এসেছেন একেবারে অশিক্ষিত, অমার্জিত, আদিম জৈব কামনা-বাসনায় ভরপুর জীবন-পরিবেশে, তার সত্যে লালিত মানব-মানবীদের ভিড়ে।

'তারিণী মাঝি' গল্পটি লেখকের এমন জীবন-ভাবনার প্রকৃষ্ট এক উদাহরণ। শুধু গল্পকার তারাশঙ্করের নয়, বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যে গল্পটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারাশঙ্করের রচনা-শৈলীর অন্যতম সূত্র হল, নিটোল কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যে চরিত্র ও প্রতিপাদ্যকে দীপ্ত করা। কোথাও দীর্ঘ হয়ে পরিণতিকে আকস্মিক ব্যঞ্জনা দেয়, কোথাও কাহিনী সংক্ষিপ্ত, সংযত, কিন্তু এই চরিত্রই একটি অন্তঃশীল কাহিনী-স্রোতে গতিপ্রাণ (dynamic) হয়ে লেখক-বক্তব্যকে সম্যক শিল্প-স্বভাব দেয়। কোনো কোনো রচনায় কাহিনী দীর্ঘ হতে হতে ইঙ্গিতময়তা থেকে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় চরিত্র-বিকাশে শিল্পকর্মের শেষে কাহিনী-নিহিত ঘটনার আকস্মিক পরিণতিতেই গল্পের বৃহত্তর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। 'তারিণী মাঝি' গল্পের কাহিনী এমন যা কেন্দ্রীয় চরিত্রের ছায়া, চরিত্রের যাবতীয় নড়া-চড়া তার সচলতা, বিবৃদ্ধি। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর অস্তিত্ব চরিত্রের অবয়বে অবধারিত হয়ে থেকেছে।

আলোচ্য গল্পের গল্পাংশ সামান্যই। এর নায়ক অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী নিঃসন্তান তারিণী ময়ূরাক্ষী নদীর সংলগ্ন গনুটিয়া ঘাটে খেয়া পারাপার করে। এই নেশায় তার একমাত্র সঙ্গী কালাচাঁদ। ডোঙা করে পার করে দেয় যাত্রীদের তারিণী। কিন্তু বর্ষার দিনের উত্তাল,

ভয়াল ময়ূরাক্ষীর বুকে বেশি যাত্রী একসঙ্গে নিয়ে যাওয়ার বিপদও কম নয়। ময়ূরাক্ষী নদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপরেই তারিণীর মাঝি-জীবনের ভাগ্য প্রধানত নিয়ন্ত্রিত। ময়ূরাক্ষীর নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্য আছে। সে আট মাস থাকে মরুভূমির মতো শুষ্ক, কিন্তু বর্ষা এলেই সে হয় 'রাক্ষসীর মত ভয়ংকরী'। তখন যে কোনো দিন, যে কোনো মুহূর্তে অসম্ভব প্লাবনে দুকূল অতিক্রম করে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম, বাড়ি, ধনসম্পদ, লোকজন ভাসিয়ে দিতে পারে, জীবনহানি ঘটাতে পারে অসংখ্য মানুষের। এই ময়ূরাক্ষী আর তারিণী বুঝিবা একই জীবন-বৈশিষ্ট্যে আত্মীয়। ময়ূরাক্ষী নদী জীবিকার সূত্রে তারিণীর জীবনধারণে সহায়তা করে। তারিণীর আছে সুখীর মতো স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় এতটুকুও খাদ নেই। সমস্ত রকম ছোট-বড় সুখ-দুঃখ বিপদের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্তভাবে আপন হয়ে থাকে। ময়ূরাক্ষীর বুকে কারোর জলে ডুবে যাওয়ার মতো বিপদ আসন্ন হলে তারিণী বাঁচায়, পয়সা, অলংকার, খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপড় নানারকম উপহার পায়। সুখীকে সেসব দিয়ে খুশি করে, নিজের সুখের জীবন ভরিয়ে রাখে। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর জীবন সব সময় সমান তালে চলে না। একসময় দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির কারণে তারিণীর পেশা বন্ধ হয়ে যায়। আশপাশের গ্রামে আসে মড়ক। সব পালায় গ্রাম ছেড়ে। শেষে তারিণী আর সুখীও গ্রাম ত্যাগ করে। কিন্তু আবার আকাশে বর্ষার মেঘ ও তা থেকে ঘনবর্ষণ হওয়ায় তারা ফিরে আসে। ক্রমশ আকাশের অবিরাম বর্ষণ আর বন্যায় এমন রূপ হয়ে ওঠে নদীর যে, তারিণী আর সুখীও তাদের ভাঙা ঘর-বাড়ি ছেড়ে নদীর বুকে প্রতিকূল অবস্থায় ভাসতে থাকে। শেষে উভয়েই অবধারিত জীবন-সংশয়ের কালে, নিশ্চিত মৃত্যু থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাকে আপ্রাণ জড়িয়ে-ধরা তারিণীব প্রেমের একমাত্র আপনজন তার স্ত্রী সুখীর গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে তারিণী শেষে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। আলো আর মাটির আশ্রয়ে তারিণী বুক ভরে শ্বাস নেয়। এখানেই গল্পের শেষ।

'তারিণী মাঝি' গল্পে প্রত্যক্ষ কাহিনী আছে, কিন্তু গল্পাংশ কম। মাত্র দুটি চরিত্র তারিণী আর সুখী—এদেরই গল্প। এর সঙ্গে আর একটি চরিত্র ময়ূরাক্ষী নদী। লেখকের বর্ণনার গুণে ও আপন প্রকৃতিদর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শিল্পিত প্রয়াসে নদীটিও একটি অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের মধ্যে কাহিনীবৃত্তটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সংযত। কাহিনীর আরম্ভে আছে শিল্পের শাসন, শেষেও তা-ই। আরম্ভ হয়েছে তারিণীর কথায়, তার সহজ স্বাভাবিক যাত্রী পারাপারের ঘটনা দিয়ে, শেষ হয়েছে অস্বাভাবিক পরিবেশে তারিণীর জীবনরক্ষার চিত্র রচনায়।

বোঝা যায়, তারিণীই কাহিনীকে ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে সাহায্য করেছে ময়ূরাক্ষী নদীর স্রোত ও পরিবেশ। কাহিনীর মধ্যে তারিণীকে বাদ দিয়ে ময়ূরাক্ষীর অস্তিত্ব বর্ণনা একেবারেই মূল্যহীন, আবার ময়ূরাক্ষীকে অস্বীকার করলে তারিণী চরিত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। এমনভাবে কাহিনী ও ঘটনা এবং চরিত্র—একত্র মিলেমিশে কাহিনীর একটি নির্দিষ্ট আকার-ধারণ ও গল্পাংশকে রক্তমাংসের মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াস তারাশঙ্করের খুব কম গল্পেই আছে।

গল্পের শুরুতে কাহিনী-নিহিত গল্পাংশের হাত ধরেছে তারিণী মাঝি স্বয়ং। অম্বুবাচীতে আষাঢ় মাসে ফেরত-গঙ্গাযাত্রীর ভিড়ে তারিণীর ডোঙায় পারাপারের ঘটনায় তারিণী কাহিনীর সামনে থাকে। পারাপারের সময়টুকুর মধ্যে ঘোষদের বউ-এর ডুবে যাওয়ার ঘটনায় ময়ূরাক্ষী নদী কাহিনীর হাত ধরে তারিণীর সঙ্গে একত্রে। কাহিনী-বয়নে তারাশঙ্করের অতি-সচেতন সংযত শিল্পভাবনা এখানে লক্ষ করার মতো, এতটুকুও বাড়তি অংশ নেই। এইভাবে ময়ূরাক্ষী ও তারিণীর যৌথভাবে কাহিনীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই আসে তারিণীর প্রিয়তমা স্ত্রী সুখী, সুখীর লোভনীয় দুর্বার প্রেম একদিকে, আর একদিকে ময়ূরাক্ষীর শুকনো রূপে তারিণীর প্রতি প্রেমহীনতা! কাহিনীর এই অংশে ময়ূরাক্ষীর রুক্ষ পরিবেশ যেন সুখী-তারিণীর প্রেমের গভীরতা পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়। কাহিনী ঠিক ধরে রাখে তারিণী ও ময়ূরাক্ষীকে। শেষে ময়ূরাক্ষীর প্রবল বন্যার টানে তারিণী ময়ূরাক্ষীর গভীর-সংলগ্ন হয়ে একসময়ে জৈব আদিম জীবন-প্রেমে জাগতিক মানব-প্রেমকে অস্বীকার করে। সুখীকে অস্বীকার করে তার মৃত্যু ঘটিয়ে তারিণী আপন জীবনকে মুক্ত আলো-বাতাসে মেলে ধরে। কাহিনীর শেষ অংশে ময়ূরাক্ষী আর তারিণী উভয়ই কাহিনীর সূত্র কঠিনভাবে ধরে রাখে।

'তারিণী মাঝি' গল্পের কাহিনীবৃত্ত নিটোল এবং পরিমিত, সংযত। লেখকের মূল বক্তব্যের .পক্ষে যতটুকু জরুরি, ততটুকুই লেখক উপস্থাপিত করেছেন। এই গল্পে তারাশঙ্করের সার্থক গল্পের উপযোগী কাহিনী-বয়ন-ক্ষমতায় ঘটেছে সিদ্ধি। কাহিনী-অংশে ঘটনা-অংশও কম। ঘোষেদের বউয়ের ময়ূবাক্ষীর বুকে ডুবে যাওয়ার ঘটনা, শুকনো ময়ূরাক্ষীর বুকে মড়ক নামার ঘটনা, আর তার অব্যবহিত পরবর্তী ময়ূরাক্ষীর প্লাবনে গল্পের পরিণামী সুখীর গলা টিপে হত্যার ঘটনা দিয়েই গল্পের অলংকৃত রূপ সামনে আসে। কাহিনীতে ঘটনার ভার নেই, অতি নাটকীয়তা নেই, অতিকথন নেই, এবং সর্বোপরি কাহিনীটি কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র ও ময়ূরাক্ষী নদী—দু'য়ের ছায়া-কায়ার সম্বন্ধ-সূত্রে এমনভাবে গতিশীল হয়েছে—যা একটি সার্থকতম ছোটগল্পের মর্যাদা পাওয়ার পক্ষে সত্য।

দুই

আগেই বলেছি, 'তারিণী মাঝি' গল্পের প্রধান চরিত্র তিনটি, তারিণী স্বয়ং, তার স্ত্রী সুখী, আর ময়ূরাক্ষী নদী। এমন একটি নদী চরিত্র হওয়ায় গল্পের অভিনবত্ব বেড়েছে যেমন, তেমনি তারাশঙ্করের ওই আদিম জীবনভাবনা সংক্রান্ত বক্তব্য দর্শনোপযোগী মর্যাদা পেয়েছে। 'তারিণী মাঝি' চরিত্রাত্মক গল্প এবং নামেই তার প্রমাণ। তারাশঙ্কর এ গল্পে শ্রমজীবী মানুষকে নায়ক করেছেন। তারিণী একসময়ে আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়ায় এবং নদীর বুকে শ্রমহীন জীবন-ধারণের কালে গ্রাম ত্যাগ করার কথা ভাবে, সুখীকে বলে—'লে সুখী, খান চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট আঁচলে বেঁধে লে। আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাব। দিন-খাটুনি ত মিলবে।'

এইভাবেই গ্রামের জনমজুর হয়েছে শহরের কুলিমজুর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের পেশার বদল ঘটিয়েছে। কিন্তু তারাশঙ্কর তারিণীর মধ্যে বাস্তুত্যাগের, গ্রাম ছাড়া ও পেশা বদল করার জন্য গভীর দুঃখবোধকে দেখিয়েছেন। নদীর সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তারিণী নদী গ্রাম ত্যাগ করতে চায়নি। সে নদীর জলে, বালিতে, রোদে-স্রোতে গড়াপেটা মানুষ। ময়ূরাক্ষী তার যেমন জীবন, তেমনি নিয়তিও। তারিণী তাই আবার ফিরে এসেছে তার গ্রামে।

তারিণীর সামগ্রিক স্বভাবটাই সবকিছুর চরম রূপ দিয়ে গড়া। সে নদীকে প্রতিপক্ষ মনে করে না বলেই অবলীলায় নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে ঘোষদের বউকে বাঁচাতে পেরেছে। বাঁচানোর পুরস্কার পেয়ে বাড়ি ফিরে সব সুখীকে দিয়ে সাজিয়ে তার প্রেমের পরম ও চরম প্রতিষ্ঠা করেছে। সুখী সন্তান দিতে পারেনি, এই ঘাটতি তারিণীকে দমিত করেনি, বরং বিপুল মানবিক প্রেমের সম্পর্কে তারিণীকে সুখীর প্রেয় ও শ্রেয় মানুষ করে তুলেছে। এই তারিণী আবার শেষতম বন্যার সময় নির্দ্বিধায় সুখীকে নিয়ে বিপুল বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। এখানেও তার চরম মানবিকতার পরিচয়।

কিন্তু তারিণীর সুখীর প্রতি এমন খাঁটি মানবিক প্রেম তুচ্ছ হয়ে গেছে তার আদিম জৈব-জীবনের স্বভাব-সংলগ্ন জীবন-তৃষ্ণার কাছে। সে হয়ে উঠেছে লেখকের বিশেষ প্রকৃতি-দর্শনের অনুগ চরিত্র। সুখীকে গলা টিপে মেরে ফেলার পর তার বাঁচার যে প্রয়াস তা যে তারাশঙ্কর চিন্তিত আদিম জীবন-স্বভাবের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বীকৃতি-মাত্র, গল্পের পরিণতি-চিত্র তা প্রমাণ করে। আদিম জীবনের নিজস্ব একটা রূপ আছে, তারাশঙ্করের তারিণী তারই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তারিণী তারাশঙ্করের প্রকৃতি-দর্শনের দর্পণ।

সুখী শ্রেণী হিসেবে নীচের তলার মানুষ, কিন্তু তার মধ্যে যে প্রেম ও পাতিব্রত্যের বৈশিষ্ট্য এঁকেছেন তারাশঙ্কর, তা চিরন্তন ভারতীয় নারী-আদর্শ এবং চরিত্র-মধ্যে লেখকের বিশ্বাস মতোই অন্তঃশীল থেকে গেছে। আনন্দের দিনে, দুঃখের দিনে, দুর্ভিক্ষের দিনে এবং মারাত্মক বন্যার মধ্যেও সুখী প্রেম দিয়ে নির্ভরতা চেয়েছে তারিণীর। তার চাওয়া মানবিক সম্পর্কের অধিকারের চাওয়া, শুধু বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে চাওয়া নয়। তাই শেষে বন্যার জলের স্রোতে অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার একমাত্র আশ্রয় ও গভীরতম বিশ্বাস ছিল তারিণীর ওপরেই। শুধু স্বামী হিসেবে নয়, মানবিক সম্পর্কেও তারিণীর সুখীকে বাঁচানোর কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তে সুখীর এতদিনেব সান্নিধ্যের উত্তাপ, মানবতার সম্পর্ক তারিণীর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। যে জীবন সুখী ও তারিণীর কাছে সমমূল্যে মূল্যবান ছিল, মুহূর্তে তা মিথ্যে হয়ে যাওয়ায় সুখীর মৃত্যু ঘটে অসহায়ভাবেই। সুখী চরিত্রের উপস্থাপনা, বিকাশ ও পরিণতি লেখকের নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত। গল্পটির পরিণতি চিত্রে তারিণীর কাছে সুখী তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর।

অর্থাৎ মানুষের জীবনতৃষ্ণা, আদিম জীবন-স্বভাবে বাঁচার উদগ্র বাসনা জাগতিক সমস্ত মানবিক আদিম সম্পর্ককে কৃত্রিম, সীমিত শক্তির অস্তিত্ব, তুচ্ছ অবহেলার বস্তু করে তোলে। প্রকৃতির নির্মমতা আর আদিম জীবন-স্বভাব-নিহিত জৈবশক্তির প্রকাশ

একই। তাই ময়ূরাক্ষীকে প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পর্কের এক জীবন্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দিয়ে তারাশঙ্কর কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণীকে আদিম প্রকৃতির অঙ্কশায়ী করে এঁকেছেন। তারিণীর পেশা ও নেশার জীবনে যে প্রাকৃতিক স্বভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তার কাছে সুখী কিছুই নয়। ময়ূরাক্ষীর পরিবেশ-কল্পনা ও সচল সপ্রাণ স্বভাব তারিণীকে কৃত্রিম জীবনাকর্ষণকে ত্যাগ করার শিক্ষা দেয়। এককথায়, তারাশঙ্কর বিশ্বাস করেন, আদিম জীবনপ্রাণ সভ্য মানুষকেও জৈববৃত্তিতে পশুত্বের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে। এটা তার সচেতন প্রয়াস নয়, স্বতঃস্ফূর্ত অ-সচেতন আত্মার প্রকাশ। এখানে মানুষ নিজেই নিজের ক্রীড়নক। গড়া সমাজ, মানুষ তার শিক্ষা-দীক্ষার অভ্যন্তরে সেই আদিম বৃত্তি থাকেই। তার প্রকাশ জীবন-বিকাশের মহাসংকটে হঠাৎই হয়ে যায়। ময়ূরাক্ষী একটা চরিত্র বলেই 'তারিণী মাঝি' গল্পে তার শিক্ষা এই বোধের সম্যক অনুবর্তী।

তিন

যে কোনো চরিত্রাত্মক গল্পের climax সৃষ্টি হয় চরিত্রকে কেন্দ্র করেই। তারই সক্রিয়তায় একটি জটিল অবস্থায় চরম মুহূর্তটি এগিয়ে আসে। 'তারিণী মাঝি' গল্পে ঘটনা আছে স্বাভাবিক গল্পের স্রোতে, লেখকের একটি ভাবও সুখী চরিত্র ও ময়ূরাক্ষীর পরিবেশে তারিণীকে সক্রিয় করে অন্তর্নিহিত থেকেছে, কিন্তু বিশেষ ভাবটি তারিণীর শেষতম প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই অভিব্যক্ত হয়েছে। তারিণীর যে সুখীকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলার প্রয়াস, তা তার সচেতন ইচ্ছাজাত নয়, তার জীবন-পিপাসার অনুসারী আলো ও মাটির স্পর্শপ্রাপ্তির চরম আর্তিরই স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে সম্ভব হয়েছে :

> 'ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামাচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আর, আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া ব্যাকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।'

এই চিত্রে যে জীবন-পিপাসা, তা সর্বকালের মানুষের আদিম জৈব প্রকৃতির অনুসারী। অন্যকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার, জীবনের শ্বাস নিজের মতো করে গ্রহণ করার বাসনাতেই মানুষের স্বার্থ, মানুষের অস্তিত্ব। এই ধারণা সহজাত (instinct), একে ঢেকে রেখেই মানুষ মানুষে-মানুষে সম্পর্কের স্থায়িত্বের কথা ভাবে, মানবতার বড় ব্যাখ্যা

দেয়। লেখক যখন তারিণীর তৎকালীন মানসিকতায় লেখেন—'সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে'—তখন তারিণীর মধ্যেকার শক্তি আদিম অ-সংস্কৃত জৈব প্রকৃতিরই অনুসারী। এখানে কোনো সাংসারিক বা জাগতিক সম্পর্কের compromise নেই, নেই পার্থিব ভাল-মন্দের বিচার-বাসনা। তারিণীর এই বাঁচার প্রয়াস অন্যজনকে পাশবিকভাবে হত্যারই নামান্তর। কিন্তু তার শক্তি হল জীবনের শক্তি (vital energy), আর এই energy-কে অনন্ত শক্তি দেয় জীবনের সৃষ্টিশক্তি। জীবনের সৃষ্টিশক্তিই (creative energy) হল crude আদিম জৈব শক্তি ও বাসনা।

এই বক্তব্যকে বা attitude to life-কে লেখক একমুখিন করেছেন, 'তারিণী মাঝি' গল্পে ময়ূরাক্ষীর পরিবেশে তারিণী চরিত্র মাধ্যমেই। লেখকের সংযম ও সংক্ষিপ্তিবোধ, আখ্যায়িকাব পরিমিত পরিকল্পনাতেই তা শিল্পসম্ভব হয়েছে। গল্পে বিবৃতিমূলকতা কম এবং প্রকৃতির suggestiveness তারিণী চরিত্রের রক্তের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ায় ইঙ্গিতধর্ম চরিত্রকে গল্পের পরিণামে যথার্থতা দিয়েছে। তারিণী তারাশঙ্করের জীবন-বিশ্বাসের কথাই বলে। ডারউইনের তত্ত্বের মাপে তারিণীর বেঁচে-ওঠা ও বেঁচে থাকার দাবি তো স্বাভাবিক। এটাই নিয়ম। প্রকৃতির নির্মম ঝাড়াই-বাছাই-এ দুজনের একজনকে সংকট-মুহূর্তে সরে যেতে হবেই। সুখীর প্রতি যে তারিণীর প্রেম তা পার্থিব সংসারের তাগিদ থেকেই সম্ভব হয়েছে। তার উৎস পার্থিব জীবন-স্বভাবের প্রয়োজনে। একত্রে বাস করতে করতে একে অপরের কাছে হয়েছে মহামূল্যবান মানবিক অস্তিত্ব। এই বন্ধন জাগতিক প্রয়োজন থেকে অপার্থিব মহামানবিক যোগে উন্নীত ও উন্নতরূপ পেয়েছে।

কিন্তু প্রেমশক্তি আর প্রাণশক্তির মধ্যে মূলগত ভেদ আছে। প্রেমশক্তি যদি জীবনের শক্তি (vital energy) হয়, মৌল প্রাণশক্তি হল জীবনের সৃষ্টিশক্তি (creative energy)। জীবনের শক্তি জীবনের সৃষ্টিশক্তির কাছে কখনো কখনো হার মানে। তাই চরম অসহায় অবস্থায় সুখীর মৃত্যু স্বাভাবিক হয়েছে তারিণীর জীবনার্তির পাশে। তারিণীর মধ্যে জীবনের সৃষ্টিশক্তির যে প্রাণস্বভাব তা প্রেমশক্তিকেও অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে। এমন হত্যার কোনো নীতিনির্দিষ্ট পাপ তারিণীকে স্পর্শ করে না। আদিম জীবনযাপনে তো কোনো পাপ ছিল না। সব বহিঃপ্রকাশই প্রকৃতির মৌল শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। সচেতন তারিণীর স্বার্থপরতা নেই সুখীকে শ্বাসরুদ্ধ করার মধ্যে, আছে অচেতন ও অ-সচেতন তারিণীর আদিম জৈববৃত্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ। অন্য একটি প্রসঙ্গ প্রশ্নচিহ্ন নিয়েই এই বিষয়ের মধ্যে থেকে যায়। সুখীর সঙ্গে তারিণীর কোনো প্রত্যক্ষ রক্তের সম্বন্ধ ছিল না, একমাত্র দুজনেই মানব-মানবী—এই সাধারণ ব্যাখ্যাটুকু ছাড়া। তাই সুখীর মৃত্যু তারিণীর পক্ষে সেই মুহূর্তে ঘটানো সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু যদি সুখীর বদলে ওই জায়গায় তারিণীর কোনো পুত্র থাকত, তাহলে তারিণীর বাঁচার জন্য আদিম জৈববৃত্তির কি রূপ দেখা দিত? তখন সে কি individual থাকত না, না কি পারিবারিক জীবনের সূত্রে পিতৃত্বের অপ-প্রযুক্তির বড় দায়ে দায়ী হত?

প্রসঙ্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতার থেকে তারাশঙ্করের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা উল্লেখ করতে হয়। স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা মূলত উভয়ের প্রকৃতি ভাবনা তথা প্রকৃতি-দর্শনের দিক থেকেই লক্ষ করার মতো। তারাশঙ্কর প্রকৃতিকে 'তারিণী মাঝি' গল্পে মানব চরিত্রের স্বভাবে ও ভাগ্যে সংলগ্ন করে দেখতে উৎসাহী। সেখানে প্রকৃতি হয়েছে আদিম ভাবনার সংশ্লিষ্ট প্রধানতম বিষয়। বিভূতিভূষণ 'পুঁইমাচা' গল্পে প্রকৃতিকে করেছেন রোমান্টিক চিত্রকল্পের সঙ্গে সমন্বিত। বিভূতিভূষণের ক্ষেন্তির মৃত্যুর পরবর্তী বিষাদঘন ভাবনা প্রকৃতির অনন্ত, অখণ্ড জীবন স্বভাবের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বিষাদ-আনন্দের সমান্তরাল থেকেছে। তারাশঙ্করের সুখীর মৃত্যুর জন্য দায়ী তারিণী তথা মানুষের আদিমতম পশুবৃত্তি—যা সভ্যতায় চাপা দেওয়া, কিন্তু সুযোগসন্ধানী মূলীভূত প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সদা-সঙ্গী। বিভূতিভূষণের ক্ষেন্তির মৃত্যু সর্বকালের প্রকৃতির আপন নিরাসক্ত স্বভাবের, তারই সৃষ্টির প্রতি অমোঘ উপেক্ষার অনুবর্তী ঘটনা। প্রকৃতির মধ্যে আছে creative energy, তা vital energy-কেও নির্মমভাবে উপেক্ষা করে চলে যায়। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের সেই বৌদ্ধভিক্ষুটির মতো—যিনি সকলের অস্পৃশ্য চণ্ডালিকার কাছ থেকে জল গ্রহণ করে তার মনে নতুন এক জীবন-প্রাণের জন্ম দিয়ে তাকেই নিরাসক্তিতে অস্বীকার করার মতো।

অর্থাৎ স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করেন, তখনো সৃজন-আনন্দের ভিতরে থাকে যে নিরাসক্তি, সৃষ্টির পরেও থাকে তা থেকে আর এক নিরাসক্তচিত্ততা। প্রকৃতির সৃষ্টি সুখী ও তারিণী দু'জনেই। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ক্ষেন্তিকে মৃত্যুর নির্মমতায় নিমজ্জিত করে নিজের অনন্ত প্রাণের জয়-ঘোষণায় উল্লসিত প্রাণ। অন্যদিকে তাবাশঙ্করের প্রকৃতি আদিম পশু-স্বভাবেই তারিণীকে তাড়িত করে সুখীর গলা টিপে মৃত্যু ঘটানোর জন্য। তারিণীর আদিম বৃত্তির জাগরণ তার নিজেরই স্বতঃস্ফূর্ত বাঁচার বাসনায়। সে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আগ্রহী। তারাশঙ্করের প্রকৃতির স্বভাব প্রকাশে আধাব হয়েছে মানব চরিত্র তারিণী মাঝি, বিভূতিভূষণের হয়েছে রোমান্টিক-প্রাণতার উপযোগী চিত্রকল্প—পুঁইগাছ। অবশ্যই দুই লেখক প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও মূলে সেই আদিম-প্রকৃতি-স্বভাবেরই মৌলিক টীকাকার।

চার

'তারিণী মাঝি' গল্পের ভাষায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী গ্রাম অঞ্চলের বিশেষ ভাষা-বৈশিষ্ট্য যোগ করেছেন চরিত্রদের সংলাপে। বর্ণনা লেখকের নিজের সাধুরীতির সন্নিহিত গদ্যের বিশিষ্টতা-প্রাপ্ত। এই ভাষার গতি বর্ণনার বেগে তীব্রতা পেয়েছে। ময়ূরাক্ষীর বর্ণনাই তাকে চরিত্র করেছে স্বতন্ত্রভাবে। তার কোমল-কঠোর রূপের প্রতিচিত্রণে তারাশঙ্কর যে গদ্যভঙ্গি ব্যবহার করেছেন সেখানে সংলাপের আঞ্চলিক স্বভাব, তারিণী-সুখীর প্রেম-ভালোবাসার চিত্ররূপ, যাত্রীদের ফেরার তৎপরতায় জটলার কলকণ্ঠ—সবই একমুখিন করেছে মূল বক্তব্যকে। ময়ূরাক্ষীর জীবন্ত, দুর্দান্ত স্বভাবের বর্ণনা নদীকে কতটা প্রাণময় ভয়ঙ্কর শক্তিসম্পন্ন করেছে, দু-একটি

বাক্যের উদ্ধৃতিতেই তার প্রমাণ মেলে। যেমন : 'গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চীৎকার! কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চীৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনইভাবে।' এমন বর্ণনায় যে তুলনাবাচক বাক্য ব্যবহৃত, তা পরিবেশের সময়োপযোগী স্বভাবকেই প্রাণবন্ত করে। গল্পের অন্তিম অনুচ্ছেদটির বাক্যগঠন, সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যঞ্জনা ও তির্যক স্বভাব বর্ণনার অমোঘতা, পরিমিতিবোধ ও ক্লাইম্যাক্সের শ্বাসরুদ্ধকারী গম্ভীর রূপসৃষ্টি লেখকের ভাষা-গঠনের অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক। বর্ণনা অংশের তারিণী চরিত্র ভাষানিহিত গভীর ব্যঞ্জনায় যেন কথাশিল্পীকে ছেড়ে দিয়ে স্ব-স্বভাবেই নড়াচড়া করে। সৃষ্টি আপন বেগে চলে, স্রষ্টার নিরপেক্ষ ভূমিকা ছাড়া অন্য তাৎপর্য যেন অন্তর্হিত। চরিত্রের স্বাধীন বেগের কারণেই এ-গল্পে ভাষা নিরাসক্ত, আবেগহীন, নির্মম ও অমোঘ রূপ পেয়েছে। বস্তুত 'তারিণী মাঝি' গল্পের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ এক কথায় অনবদ্য।

পাঁচ

চরিত্রাত্মক গল্প 'না', কিন্তু চরিত্রের নামে গল্পের নাম নয়। তাই সেখানে নামে আছে ব্যঞ্জনা। অন্যদিকে, ১. 'তারিণী মাঝি' সম্পূর্ণত চরিত্র-নির্ভর গল্প। তাই এর নায়ক যে সে-ই এবং তারই স্বভাব ও স্বভাবের অন্তিম বৈশিষ্ট্যই গল্পের বক্তব্য, উপস্থিত এটা মেনে নিয়ে বলতে হয়, নাম সার্থক। ২. গল্পের পরিণামী-ব্যঞ্জনায় তারিণী সুখীকে তুচ্ছ করেছে, এমনকি ময়ূরাক্ষীর প্রতিকূল শক্তিকেও জয় করে নিজেকে আলো-মাটির স্পর্শে স্থিত করতে পেরেছে। নায়ক চরিত্রের এই যে সর্বজয়ী স্বভাবের সম্যক বিকাশ দিয়ে গল্পের শেষ টানা, এতেই নামকরণ ব্যাপক ব্যঞ্জনা পায়। ৩. নায়কের নাম তারিণী মাঝি, তার কাজও মানুষকে নদী পারাপারে ত্রাণ করা। সে বাঁচিয়েছে ঘোষেদের বউকেও। সুতরাং তার নামের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে যোগ আছে তার স্বভাবের। অথচ অন্তিমে সে সুখীকে বাঁচাতে অক্ষম হল আপন জৈব শক্তির পারবশ্য করে। এই পারবশ্য ইচ্ছাকৃত নয়। তা আদিম জীবনধর্মের সঙ্গে সম্যক সমন্বিত। তবু সে পারেনি, অথচ তার নামের অর্থে পারা উচিত ছিল; এই বিপরীত অর্থের প্রচ্ছন্ন শ্লেষে 'তারিণী মাঝি' নামের আর একটা ব্যাখ্যাও সম্ভবত করা যায়।

৩.

ডাইনী

এক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনী' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলা তেরশো সাতচল্লিশ সালের আষাঢ় সংখ্যার মাসিক 'প্রবাসী'র পাতায়। অর্থাৎ ইংরেজি উনিশশো চল্লিশ সালের আগস্ট মাসে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আট-ন'মাস পরেই 'ডাইনী' গল্পটির

সঙ্গে পরিচিত হয় সেকালের পাঠকরা। ডাকিনী বিদ্যা আর ডাইনী তন্ত্র প্রাচীনতম এক সংস্কার যার সঙ্গে ধর্মভয় মেশানো থাকে, আবার লোকমুখে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার, ভয়, পাপবোধ, ঘৃণা—এসবও যুক্ত হয়ে যায়। 'ডাইনী' নামে তারাশঙ্করের সহযাত্রী লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি গল্প লিখেছেন ইংরেজি উনিশশো আটত্রিশ সালে বা তার কিছু আগে। অর্থাৎ সে গল্পটির প্রকাশকাল ধরলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বের রচনা হয় তা। একেবারে একালেও মহাশ্বেতা দেবী ডাইনীকে নিয়ে গল্প লিখে গেছেন এক দক্ষ কথাকারের কলমে।

অর্থাৎ 'ডাইনী তন্ত্র' বা ডাকিনী বিদ্যা এমন এক বিষয় যা সর্বকালের সচেতন লেখকদের কাছে সসম্মানে গৃহীত হয়েছে, গল্পের শিল্পমূল্যে যা বড় মানবিক মর্যাদায় অভিনন্দিত হয়েছে। অবশ্যই তুলনায় তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পটি অনেক বেশি বলিষ্ঠ পরিণত শিল্পরূপে চিহ্নিত। বিভূতিভূষণের নায়ক ডাইনীর যাবতীয় সংস্কারকে অস্বীকার করে, আধুনিক মনে-মননে ও যুক্তিতে ঘৃণা করতেও ছাড়ে না, তা থেকে সে দূরে সরে যায় গল্পের শেষে। কিন্তু কমলা নামের স্বামীহারা, একাধিক অসুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে দিতে তাদের শোচনীয় মৃত্যুদর্শনে বধূটি কঠিন-হৃদয় হওয়ার পরেই এই সন্তান-বাৎসল্যময়ী অন্যের সন্তান-বাৎসল্যে ডাইনীর অভিধা পেতে থাকে। বিভূতিভূষণ ডাইনীর মধ্য দিয়ে, ডাইনীর নিজের কথায়, ভাবনায় মনস্তত্ত্ব দিয়ে ডাইনী গল্প লেখেননি, লিখতে চানওনি। সভ্য মানুষের কাছে ডাইনী বিষয়টা যে একান্তই উপেক্ষার, যুক্তিহীনতার—তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন লেখক। একালে ডাইনী নিয়ে লিখতে বসে মহাশ্বেতা দেবীও একেবারে বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের আঞ্চলিক অন্ধবিশ্বাস, সংস্কারের পরিবেশেই ডাইনী চরিত্রের অ-মানবিক রূপ ও নিষ্ফলত্বকে প্রায় প্রমাণই করেছেন।

তারাশঙ্করের 'ডাইনী' এঁদের রচনা থেকে স্বতন্ত্র। এ গল্পের ডাইনী নামে এক বৃদ্ধার জটিল অকপট মনস্তত্ত্বই এর গৌরব, এর বিষয়গত মূল্যবান সম্পদ। তারাশঙ্করের গল্পটি অবশ্যই চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু চরিত্রের মূল নাম গল্পে ব্যবহার করা হয়নি। তাকে বলা হয়েছে ডাইনী। অর্থাৎ লোকপ্রচলিত তথাকথিত স্বভাবধর্ম দিয়েই সমগ্র গল্পে তার কেন্দ্রীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। তার প্রেম-সম্পর্কের ভাবনার খণ্ডচিত্রেই তার নাম জেনেছি আমরা। কিন্তু সে নামের ব্যবহার যেমন গল্পে নেই, তেমনি নেই গল্পের বিশেষ নামেও। অর্থাৎ শ্রেণীবৈশিষ্ট্য গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় ও চরিত্র দু'য়ের যোগে চিহ্নিত।

প্রসঙ্গত ভিক্টর হুগো রচিত বিখ্যাত 'হাঞ্চব্যাক অফ নটরডাম' নামের বিদেশি উপন্যাসের সেই বিকৃতদর্শন কুঁজো মানুষটির কথা মনে পড়ে তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পটির বিষয়ভিত্তিক শিল্পমূল্য আলোচনার ভূমিকা অংশে। কদাকার পশুর মতো বোবা সেই কুঁজো মানুষটির অন্তরলোকে ছিল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ছিল না-পাওয়ার জন্য এক আর্তি-অতৃপ্তি, যা একান্তই মানবিক এবং স্বাভাবিক, ছিল ভয়, প্রেম, ঠিক সাধারণ মানুষের মতোই যন্ত্রণার, স্নেহ-ভালোবাসার বোধ। কিন্তু বাইরের মানুষ

তাকে ভুল বোঝে, ভয়ে এবং ঘৃণায় তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পের প্রধান নারীটি এমনি এক চির অবজ্ঞার শিকার এবং এখানে এই অবজ্ঞার মূলে কাজ করেছে মানুষের মানবতাবিধ্বংসী আদিম বিশ্বাস ও অন্ধ কুসংস্কার। সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের কাছে, রক্তের আত্মীয়তার আদিমতম মানসিকতার সঙ্গে জড়িত থেকে নারীটি হয়ে উঠেছে 'One having supernatural power in the natural world specially to work evil....'

এমন একটি নারী চরিত্র 'ডাইনী' অভিধায় চিহ্নিত হয়ে তারাশঙ্করের গল্পে হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্পটি তাই নিশ্চয়ই চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীতে আসতেই পারে, কিন্তু গল্পটি যে একজন নারীর, যার পিতৃদত্ত নাম 'সোরধনি' (সুরধনী) ওরফে 'সরা'— তা অস্বীকৃত। লোকের অন্ধবিশ্বাসের কুসংস্কারের মোড়কে যে নাম তা-ই ব্যবহৃত। সুতরাং এমন শ্রেণী নির্ণয়ে গল্পের ওই ভাবগত নিষ্পত্তির দিক সামনে আসে। এ বক্তব্যে আছে একটি সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্কের সুস্থ নারীকে সম্পূর্ণ অমানবিক, নিষ্ঠুর কুসংস্কারের নির্মোকে মুড়ে তার সমস্ত কোমল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বৃত্তিগুলিকে সমূলে অস্বীকার করার দিক। তাই এর শ্রেণী পরিচয় শুধু চরিত্রাত্মক নয়, তা ছাড়িয়ে এক ভয়াবহ 'তান্ত্রিক' বিশ্বাস সুলভ আদিম ভাবসমৃদ্ধ চরিত্রভাগ্যের গল্প। যে ডাকিনী বিদ্যাকে একালে বলা হয় Black magic; এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তার ধারে-কাছে যায় না।

'ডাইনী' গল্পে কাহিনী অংশ সামান্যই—এক সাধারণ নিম্নশ্রেণীর সম্পূর্ণ সুস্থ নারীর অশ্রুসিক্ত বাহির ও অন্তর—দুয়ের সজল করুণ কাহিনী। অতি রুক্ষ, নানা কুসংস্কার ও বিশ্বাসে অ-লৌকিক হয়ে ওঠা ছাতিফাটার মাঠের পূর্বপ্রান্তে রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেখানে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিশপ্ত জীবন কাটায় বৃদ্ধা এক নারী, সংস্কারাচ্ছন্ন লোকবিশ্বাসের 'ডাকিনী' অভিধা নিয়ে। সামান্য কিছু ভিক্ষান্নে তার জীবন চলে। একা, নিঃসঙ্গ এই জীবনে সে সদা কুড়োয় মানুষের অবজ্ঞা, ঘৃণা, ভয়, তাচ্ছিল্য। তার চোখে নাকি সর্বনাশী লোলুপ শক্তি যা দিয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে অবলীলায়। যে কোনো মানুষের খাওয়ার সময় বাইরের কোনো লোভী মানুষের নজর পড়লে তার ক্ষতি হয়, খাদ্য সহ্য হয় না, মারা যায়—এমন এক অন্ধ লোক-বিশ্বাসের শিকার এই বৃদ্ধা রমণীটি ছোটবেলা থেকেই। সে যখন পিতৃমাতৃহীন দশ-এগারো বছরের নিষ্পাপ বালিকা, তখন প্রথম হারু চৌধুরী তার ছেলের খাবারের ওপর নজর দেওয়ায় তাকে বলে ডাইনী। তার ওপর শারীরিকভাবে অত্যাচার করে। কারণ তার জন্যই ছেলের পেটের যন্ত্রণা, অবশ্য পরে সে বার দুয়েক বমি করায় সুস্থ হয়! সেই থেকেই তার নিজের বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে সে সত্যিই ডাইনী, কাবণ গ্রাম-গ্রামান্তরে সে কথা প্রচার হয়ে গেলে সকলের কাছে সে ভয়ঙ্কর ভয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। সে গ্রাম থেকে পলাতক হয়, তাকে একজন অচ্ছুৎ ডোম যুবক বিবাহ করে, কিন্তু স্বামীর যক্ষ্মারোগে অকালমৃত্যুর কারণ তার মনে সন্দেহ জাগায়—তার ডাইনী হওয়াতেই এমন মৃত্যু! ছাতিফাটার মাঠ পার হতে গিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে তার কাছে জল খেয়ে অসুস্থ হলে, বা মরে গেলে লোকে ডাইনীর দোষ

দেয়। তার কুটিরের নির্জন জায়গায় স্বামী-পরিত্যক্তা বাউরীদের মেয়েটির সঙ্গে বাউরী যুবকের প্রেম-বিনিময়ের কালে এই রমণী আপন হৃদয় স্বভাবে স্নেহবুভুক্ষায় কিছু সাহায্য করতে গেলেও সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন তথাকথিত ডাইনী-স্বভাবে তার স্বতোৎসারিত হৃদয়স্বভাব ধিক্কৃত হয়। তাকে ভয় পেয়ে বাউরী যুবক-প্রেমিক সন্ধের অন্ধকারে পালাতে গিয়ে পায়ে হাড় ফুটে রক্তপাতের ঘটনার মধ্যেও সারা গ্রামে বিশ্বাস জন্মায়, এটা ডাইনীর বাণমারার ঘটনা। সারা গ্রামের সমবেত ও তীব্র প্রতিবাদের ভয়ে এমন বৃদ্ধ বয়সেও সে তার একদিনের আশ্রয়টুকু ছেড়ে সেদিন সন্ধেয় পালাতে চায়, বেরিয়ে পড়ে তার ঘর থেকে। কিন্তু দীর্ঘ ছাতিফাটার মাঠ পার হওয়ার সময় সন্ধের আড়ষ্ট, তাপদগ্ধ পরিবেশে আসে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাসহ করালমূর্তি কালবৈশাখীর ঝড়। 'সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দান্ত ঘূর্ণীঝড়। সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি!' পরের দিন সকালে কাঁটায় ভর্তি খৈরীগুল্মের একটি ছুঁচের মতো শীর্ষে তাকে বিদ্ধ হয়ে মৃত হয়ে দেখা যায়। 'মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমান বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে। নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।' গল্পের শেষ এখানেই।

'ডাইনী' গল্পে টানা কোনো কাহিনী নেই, একাধিক ঘটনা এসেছে কোথাও অতীত স্মৃতি-সূত্রে, কোথাও বর্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার যোগে। ফলে ঠিক গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা বাদ দিয়েই এর প্লট-বৃত্ত বচিত। এখানে একটি মাত্র চরিত্র ডাইনী। গল্পের প্লটে জটিলতা এনেছে তার তিন ডাইমেনশান্—ডাইনীর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় জড়িত তীব্র স্মৃতি-চকিত অতীত, বর্তমান বৃদ্ধ বয়সের প্রত্যক্ষ ঘটনার অভিজ্ঞতা, আর ডাইনীর প্রতীকে ওই বৃদ্ধার একান্ত নিজস্ব মনোলোক, অনেকটাই মনস্তত্ত্বের মতো। এই তিন মিলে এমন চরিত্রকেন্দ্রিক প্লট রচনা করতে বসে তারাশঙ্কর নানান বৈপরীত্যের চমৎকারিত্বে গল্পের অসাধারণ অবয়ব নির্মাণ করেছেন। ডাইনীর স্মৃতিখণ্ডগুলি তার জীবন কাহিনী বলেছে ছোটবেলা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। আর তার মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে তার কঠিন বাস্তব মানবিক মন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘটনার সমাবেশে—এতটুকুও মোটা দাগে ও মেলোড্রামায় নয়—সূক্ষ্ম মননধর্মে উজ্জ্বল হয়েছে স্মৃতিখণ্ডগুলির সংযোজন।

'ডাইনী' গল্পের প্লট-বৃত্ত অভিনব রীতিতে নির্মিত। স্মৃতি এখানে গতানুগতিকতায় আসেনি। তার প্রথম দিনের স্মৃতিতে আছে অতি অল্প বয়সে বাবা-মা-মরা এই বালিকার হারু সরকারের কাছে চরম শারীরিক লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা। লাঞ্ছনার কারণ, হারু সরকারের ছেলের আম আর মুড়ি খাওয়ার সময় তার দৃষ্টি পড়া এবং তাতে ছেলের পেট-বেদনা ও বমির উদ্রেক। এমন লাঞ্ছনার স্মৃতির সঙ্গে তারাশঙ্কর যোগ করেছেন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে মাছভাজার গন্ধে তার লোভের জাগরণের মানসিকতা। এই দুটি স্মৃতিখণ্ড শেষ করেই লেখক বর্তমানের সঙ্গে তার অতীত ঘটনার যোগ ঘটিয়েছেন, ছাতিফাটার মাঠ নির্মম গরমের দিনে পার হয়ে আসা এক মা ও

শিশুসন্তান তার কাছে এসে ও পিপাসার্ত হয়ে জল খাওয়ার করুণ চিত্র দিয়ে। সেই অতিথি-মায়ের ডাইনী-ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনীর আবার অতীতে ডুব দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসেছে তারই বয়সী স্বজাতীয় সাবিত্রীর নবজাত সন্তানের প্রতি নির্মল স্নেহ-উদ্রেকের কারণে মানসিকভাবে অত্যাচারিত হওয়ার দিক। আবার ডাইনী ফিরে আসে বর্তমানে। একসময়ে আসে যুবক বাউরী ও তার এক স্বামী-পরিত্যক্তা যুবতীর প্রতি প্রেম-প্রসঙ্গ। সেই সূত্রে নিজের প্রেম, বিবাহ ও স্বামী-মৃত্যুর স্মৃতি, বর্তমানে বাউরী যুবক-যুবতীর প্রেমচিত্রে নিজের স্নেহকোমল মনের যোগ এবং শেষে বর্তমানের পলাতক জীবনবরণ—বাউরী যুবকের পায়ে হাড় ফোটার কারণে গ্রামবাসীদের সমবেত প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াবার অক্ষমতার দিক।

অর্থাৎ স্মৃতি ও বর্তমান—দু'য়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাতেই 'ডাইনী' গল্পটির প্লটবৃত্তের জটিলতা, পরিকাঠামো ও অন্তঃশীল গতি রূপ পেয়েছে। এক বিদেশি সমালোচক বলেছেন— প্লট হল কঙ্কাল, তার ওপর মাংস-মজ্জা-রক্ত-ত্বকের আবোপে যে লাবণ্য তা-ই তার পূর্ণতা। ডাইনী গল্পের প্লটের যে শ্রীবৃদ্ধি, তা সম্ভব হয়েছে ডাইনী চরিত্রেরই অন্তর্স্বভাব যোগে। গল্পের শেষে আছে ডাইনীর মৃত্যু! 'ডাইনী' গল্পটি যতই অন্ধ সংস্কারের করুণ পরিণতির ভাষাচিত্র হোক না কেন, তার 'চরমমুহূর্ত' রচিত হয়েছে গল্পের বিষয়ের দিক থেকে ডাইনীর প্রেম ও স্বামী ভাবনায়। বাউরী যুবক ও তার প্রেমিকার প্রসঙ্গ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হল ডাইনীর মানব্য-ভাবনা। আর সেখানেই ক্লাইম্যাক্সের অর্থাৎ চরম মুহূর্তের 'সিচুয়েশন' নির্মিত। গল্পটি প্রধান চরিত্র ধরে প্লটরীতিতে চরমক্ষণের সূচনা করে স্বামী-পরিত্যক্তা উচ্ছল বাউরী মেয়ে ও প্রেমিক বাউরী ছেলেটির গল্পেব মধ্যে আসার সময় থেকেই। সেই সূত্রে জাগে ডাইনীর নিজের প্রেম ও স্বামীর প্রেমের পট। আর তারই প্রেরণায় অতৃপ্ত স্নেহবুভুক্ষু বাসনার যোগে ও তাগিদে বাউরী যুবকের কাছে এসে দাঁড়ানোর চিত্রেই চরম মুহূর্তের টান টান দিক :

> 'মাটিতে হাতের ভর দিয়া উঠিয়া কুঁজীর মত সেই ছেলেটির কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোক আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল—বলি ওহে লাগর—শুনছ?
>
> দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিযা উঠিল, পর মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।
>
> মুহূর্তে বৃদ্ধারও একটা অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধা মার্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল—মর্ মর্! তুই মর্! সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।
>
> ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল! পরমুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।'

এমন একটি ছোট চিত্রখণ্ডে তারাশঙ্কর অসামান্য শিল্পক্ষমতায় চরম মুহূর্তটি এঁকেছেন। চরম মুহূর্ত তৈরি হয়েছে গল্পের প্লট-বৃত্তের ঘটনা ও চরিত্রের মানসভূমির সম্মিলিত রূপাবয়বে। একই সঙ্গে বৃদ্ধা ডাইনীর মধ্যেকার মাতৃসত্তা ও বিপরীত ডাইনী সত্তার অব্যবহিত জাগরণ মহামুহূর্তটিকে শিল্পকৃতিত্বে সুষমামণ্ডিত করেছে। আবার এই চিত্রটুকুর শেষতম বাক্যেই আছে গল্পের পরিণতির তথা ডাইনীর চরম ভাগ্যপরিণতি নির্দেশক দিক—বাউরী যুবকের আর্তনাদে পলায়নের মধ্যে বসে পড়া ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে পলায়নের প্রয়াস। এর পরেই গ্রামের সমস্ত মানুষের দৃঢ় বদ্ধমূল ধারণা হবে :

> 'ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়াটা পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরো সে মন্ত্রপুত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে।'

আর এই ধারণার কারণেই ডাইনীর ঘটবে গৃহত্যাগের ঘটনা ও শোচনীয় বীভৎস মৃত্যু।

সুতরাং 'ডাইনী' গল্পের প্লট একেবারে নিখুঁত শিল্পের সংযত পরিকাঠামোয় নির্মিত। গল্পের শেষে আছে ডাইনীর মৃত্যু। গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা তার মৃত্যুতে যেমন, তেমনি তার মৃত্যু ছাড়িয়ে সেই মরণের বীভৎস অ-মানবিক রূপাবয়ব নির্মাণে। এমন কোনো কোনো সমালোচকের মনে হতেও পারে, আরও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাগর্ভ করতে অন্তত ডাইনী চরিত্রের দিক থেকে—এখানেই গল্পটির শেষ সীমা টানলে শিল্পের দিক থেকে কোনো ক্ষতি হত না :

> 'কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কিছু ধূলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দান্ত ঘূর্ণিঝড়! সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি!'

কিন্তু লেখক তা না করে পরবর্তী আরও ছোট তিনটি পরিচ্ছেদ যোগ করেছেন। তা মূলত ডাইনীর মৃত্যু-পরবর্তী বীভৎস মৃত্যু-পরিবেশ রচনা। গল্পের কাহিনী ও ঘটনা সম্বলিত প্লটের এই শেষ পরিণামী নির্মাণ-রূপ বস্তুত সমস্ত মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারে উন্মত্ত সব মানুষেরই তৈরি-করা মিথ্যার কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত এক মানবিক বোধসম্পন্ন রমণীর প্রতি অবিচারের অমানবিক, অধোমুখ সভ্যতার প্রতিচিত্রণ। বস্তুত তার তুলে ধরার প্রয়াসই সত্য গল্পকারের দিক থেকে। গল্পে ডাইনীর মৃত্যু ঘটনা মাত্র। তার মৃত্যুর মধ্যে যে নিষ্ঠুর, নির্মম মানব্যবোধহীন সত্য, তা-ই গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা পায় গল্পকারের হাতে। তাই প্লটের কঠিন-কাঠামোয় শেষতম চিত্রটি লেখকচিন্তিত সংযম-শাসনেরই যথোচিত বৃত্ত-পূর্ণতা! ডাইনী গল্পের কাঠামো রচনায় তারাশঙ্কর একালের বিশ্বকর্মা। এই সূত্রে একটি শ্রেষ্ঠ গল্পের পরিচয় মেলে এখানে। বিশেষত এই জাতীয় গল্পের 'মহামুহূর্ত' অংশ রচনায় ও পরিণামী ভয়ঙ্কর শেষাংশ চিত্রের ব্যঞ্জনায় তিনি আজও দ্বিতীয়রহিত কথাকার। 'না', 'জলসাঘর' গল্পের কাঠামোয় তবু কিছু মন্থরতা, বিবৃতি-প্রাধান্য গল্পের কাঠামোয় ফাঁক রেখে দেয়—তাতে অবশ্য গল্পের ক্ষতি হয়নি, কিন্তু ডাইনী গল্পের প্লট-বৃত্ত একেবারে

দৃঢ়পিনদ্ধ এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রভাগ্যের সঙ্গে যোগে প্লট ও চরিত্র একে অন্যের নিশ্চিত নির্ভরশীল শিল্প-অঙ্গ!

দুই

আমরা প্লট-বৃত্ত আলোচনায় ডাইনী চরিত্রের কিছুটা পরিচয় ইতিমধ্যেই দিয়েছি। সে চরিত্র-পরিচয় গল্পের শিল্পরূপ অর্থাৎ প্রকরণের সঙ্গে জড়ানো। আমাদের মতে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পেব ধারায ডাইনী চরিত্রটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পের শ্রেণীপরিচয়ে এর স্বরূপ ও সক্রিয়তা এক অতি মূল্যবান অভিজ্ঞান। কাহিনী ও ঘটনা সম্মিলিত একক রূপ-পরিচয়ে ডাইনীর তিনটি শিল্পমুখ—তার অতীত, তার বর্তমান এবং তার একান্ত নিজস্ব মনোলোক। এদের তাৎপর্য প্লটের আলোচনায় আছে। কেবল ডাইনী চবিত্রটি ধরলে, তার মনের গভীরে দুই সত্তার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে তার মধ্যে ক্রমশ তৈরি হয়ে ওঠা কুসংস্কার সত্তা—তা তার নিজস্ব; আর একদিকে তার মধ্যেকার তারই একান্ত বাঞ্ছিত মানবিক সত্তা। প্রথম সত্তা একান্তই কৃত্রিম, এই সত্তায় সে বাইরের অন্ধ সংস্কারের অগণন মানুষগুলির শ্রেণীতেই নিজেকে রাখে। দ্বিতীয় সত্তায় সে চিরকালের মানবী নারী—যে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যকেই ক্ষণিক স্বভাবে ঝর্ণার বৈশিষ্ট্য দিয়ে দেয়।

ডাইনীর ঈশ্বরবিশ্বাস তাকে সংস্কারের অনুবর্তী করে। তার অসহায়তা বার বার ঈশ্ববের কাছে প্রতিহত হওয়ার যন্ত্রণাকে সত্য করলেও যে যখন নিজেকেই ডাইনী ভেবে বসে, তখন সে নিজেরই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তার মনোলোকের দুঃখভারজর্জর যুক্তিচিন্তা অসহায় ঈশ্বরের পায়েই নিবেদিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। সংস্কারের ইতিবাচক দিকগুলিই তার কাছে মান্য হয়। হারু সরকারের অন্ধবিশ্বাসের কঠিন শাসনের কালে সে মনে মনে তার লোভ হওয়ার কথা স্বীকার করে। কিন্তু পাশাপাশি তার মধ্যে থেকে গভীর অকৃত্রিম বিস্ময় ঠেলে ওঠে :

> 'সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—সে হারু সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল,—হে ঠাকুর, ভাল করে দাও, ওকে ভাল করে দাও! কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম!'

জীবনের বালককালে একবারে প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে ডাইনীর যে স্মৃতি অনুষঙ্গ, সেখানে নিজেকে যেমন অভিযুক্ত করেছে, তেমনি নিয়তি-নির্দিষ্ট এক অজ্ঞান রহস্যকে ঈশ্বর প্রসঙ্গে মেনে নিয়েছে। তার মধ্যে লজ্জা ছিল—যা মানবিক বৈশিষ্ট্যই। 'নরুণ দিয়ে চেরা, ছুরির মতো' দুটি চোখ, 'বিড়ালীর মতো দৃষ্টি'র অশুভ দিক তার কাছেও ক্রমশ বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিল।

আসলে বাইরের ঘটনার সঙ্গে ডাইনীর মনের সংস্কার-ভাবনার যোগের যে নির্ভুল

coincidence, তা-ই তাকে ডাইনী হয়ে ওঠার পক্ষে বিশ্বাস জোগায়। কোনো গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা চাওয়ার সময় মাছভাজার গন্ধে তার মতো অনাথ অভাবী, ক্ষুধার্ত মেয়ের পক্ষে লোভের লালা মুখে দেখা দেওয়া একেবারেই মানুষের মনের বিশেষ এক বৃত্তির স্বাভাবিক দিক। কিন্তু তার এই বৃত্তিকে সে ভাবে অন্যায়, আর তা যেন ডাইনী মানসিকতার অঙ্গীভূত। প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে ছাতিফাটার মাঠ পেরিয়ে যে তৃষ্ণার্ত অসহায় মা তার ঘর্মাক্ত শিশুকোলে ডাইনীর কাছে জল খেতে আসে, খায়ও, তার অক্লান্ত ঘেমে যাওয়া শিশুটিকে দেখে সে তার মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ ঘটায় মনের গভীরে এই ভাবে ও ভাষায় :

> 'সে তাহার কি করিবে? কেন তাহার সম্মুখে আসিল? কেন আসিল? ঐ কোমল নধরদহ শিশু ময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া....., জীর্ণ জর জর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।'

এই যে মানবিক অনুভূতি, এর সঙ্গে ডাইনী নিজেরই সংস্কারের বিশ্বাসে মনে মনে আর্তস্বরে বলে ওঠে :

> 'খেয়ে ফেললাম! ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে! পালা, পালা—তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি!'

ডাইনীর যে মাতৃহৃদয়ের সুস্থ সবল বুভুক্ষা, তাকে সে নিজেই পরিপার্শ্বের চাপে অশুভ এক লোভ বলে ভাবতে অভ্যস্ত :

> 'কিন্তু সে কি করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিবিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি!'

এমন অনুশোচনা-চকিত আত্মবিকারের জন্মের মূলে কোনো সুস্থ যুক্তি নেই, কিন্তু ডাইনীর নিজস্ব সংস্কার তাকে এই দিকেই নিয়ে যায়।

ডাইনীর হৃদয়ের গভীরে অনন্তকাল জমে থাকা অসীম স্নেহ-ভালোবাসাই তাকে সুস্থ মানুষ করে রাখে, কিন্তু স্বজাতীয়া সাবিত্রীর নবজাতক পুত্রকে নিয়ে তার শাশুড়ি যেভাবে ঘৃণার চোখে দেখে ডাইনীকে, তাতে তার মর্মান্তিক দুঃখে আহত হওয়াই স্বাভাবিক। আর এমন স্বাভাবিক বোধেই সে নিজেকে ভাবে অস্বাভাবিক :

> 'ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলই বা সে ডাইনী, —কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল—তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বছর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে! দিয়া প্রমাণ করিয়া দিও সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালোবাসি।'

সাবিত্রীর পুত্রকে নিয়ে এমন ঘটনার পর গ্রাম থেকে পালায় ডাইনী। জঙ্গলের মধ্যে নিজের শরীরকে নিজেই কষ্ট দিয়ে মুখ থেকে বেরুনো রক্ত দেখে সে নিশ্চিত হয়

'আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা'য়। এখানেও সেই সংস্কার! কিন্তু সংস্কার-মুক্ত হতে তার প্রার্থনা বাকুলের জাগ্রত মা তারা দেবীর কাছে :

> 'মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।'

ডাইনী চরিত্রের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব—ডাইনী সত্তা থেকে মানবী সত্তায় বা মানবী সত্তা থেকে ডাইনী সত্তাকেই সত্য করে ভেবে বসা, এটাই এই চরিত্রের অন্তর্নিহিত গতিময় চমৎকারিত্বের দিক। তারাশঙ্কর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে এই দ্বন্দ্বের এক নিপুণ ভাষাচিত্র উপহার দিয়েছেন ডাইনী চরিত্রে।

বাউরী যুবকের পায়ে হাড়ের টুকরো ফুটে যাওয়ার দায়িত্ব যেমন সে তার ডাইনীর স্বভাবে স্বীকার করে নেয়, তেমনি তার যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত অতিপ্রিয় স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুকেও তার ডাইনী স্বভাবের কারণ হিসেবে মেনে নিতে নির্দ্বিধ। স্বামীর সেই মৃত্যুর পরেই তাকে জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য পালাতে হয়েছিল। তার মূলেও ছিল তার নিজেরই ডাইনী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস :

> 'সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল; কলের সেই হাড়ীদের শংকরীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে একদিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।'

বস্তুত এখানেই ডাইনী চরিত্রের বিষাদময় পরিণতি ঘটার নিশ্চিত রন্ধ্রপথ। বাইরের মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারজাত স্বার্থসর্বস্ব চাপানো সংস্কার, আর 'সোরধনি' ডাকনাম 'সরা' নামের সেই নিষ্পাপ মেয়েটির নিজস্ব সংস্কার—দুই মিলেই ডাইনীর জীবনে আনে কঠিন নিয়তির নির্দেশ।

লোকে বিশ্বাস করে সে ডাইনী, ডাইনীর মতোই তার আচরণ, তার ডাকিনীবিদ্যা জানার অলৌকিক ক্ষমতা। সাধারণ মানুষের কাছে তার ছাতিফাটার মাঠের ধারে আবির্ভাব বৃত্তান্ত এই রকম :

> 'বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ জানে না। তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিনি চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতিফাটার মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে! নির্জনতাই উহারা ভালবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।'

এই ধারণা সাধারণ মানুষের অলৌকিক, দৈবী সংস্কার থেকে জন্ম নেওয়া এবং লোকের মুখে মুখে সেই প্রাচীন কাল থেকে প্রচারিত হওয়ার বিষয়। কিন্তু তারাশঙ্করের ডাইনীর চিন্তা-ভাবনা লোকধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যে একমাত্র মানবী, রক্তমাংসের সজ্ঞান, সচেতন নারীই, তার প্রমাণ তার কথায় :

> 'ইচ্ছা হয় এই ছাতিফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে—জানিলে কিন্তু ভাল হইত! গাছের উপর

> বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত! কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলো শোনা হইত না! উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।'

ডাইনীর এই ভাবনায় আছে তার একান্ত ব্যক্তিমনের সজীব রোমান্টিক বাসনা। সে যে অনেক বেশি মনের দিক থেকে মানবিক-বোধ-সমন্বিত, তা তার বাউরী যুবক ও যুবতীর নিষিদ্ধ প্রেমকথা শোনার বাসনা প্রকাশেই প্রমাণ হয়ে যায়।

আসলে তারাশঙ্করের ডাইনী ডাইনী নয়, সে সুরধুনী নামের এক ডোম মেয়ে, ডাইনীর নিজের কথায় সে 'সোরধনি', ডাকনামে 'সরা'। অন্ধবিশ্বাস আর সংস্কারে আবদ্ধ, আদিম অলৌকিকে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ তাকে ডাইনী বানিয়েছে। ডাইনীর সমস্ত রকম মাতৃহৃদয়, প্রেমিকা হৃদয় তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তার সমস্ত ক্ষেত্রেই মাতৃসত্তার জাগরণ স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তি। তার নরুণ-চেরা চোখ, বিড়ালীর মতো দৃষ্টি তার শরীরের সৌন্দর্য। লোকে তাকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সংস্কারকে প্রতিষ্ঠা করতে! সে নির্জনে থাকে, না-পাওয়ার বেদনায় তার মেজাজ মাঝে মাঝেই হয় রুক্ষ, প্রতিবাদী। সমাজের কাছে যাবতীয় উপেক্ষা, অপমান, তার বয়সের রুক্ষ জটিল দিক তাকে প্রায় পাগল করে দেয়। তাকে পাগলিনীর মতো করে, ডাইনীর রূপ বাইরে চাপিয়ে যে এক নিঃসঙ্গতার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক, তা তার ডাইনী নামের পক্ষে অনবদ্য :

> 'বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির-মূর্তি যেন কোথায় নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাটধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসম গতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল, অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল —বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙ্গুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও বুঝিতে পারা গেল না।
>
> প্রহৃত পশু যেমন মরিয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ আঁ গর্জন করিয়া উঠে ঠিক তেমনি একটা হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শনের মত চুলগুলিকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতিফাটার মাঠের দিকে নরুণ-চেরা চোখের চিলেব মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।'

গল্পে ডাইনী চরিত্রের অন্তিম পরিণতিতে আছে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু তার বিষাদময়তা প্রমাণ করে, তার মৃত্যু নয়, মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একালের তথা চিরকালের মানবগোষ্ঠীর আর এক মানুষেরই প্রতি ঘৃণা, উপেক্ষা, অমানবিক কঠিন যন্ত্রণাবিদ্ধ আচরণের জীবন্ত প্রতিচিত্রণ। ডাইনীর ছিল নিরন্তর সুস্থ জীবনের জন্য, নিঃসঙ্গ, নিজের মতো করে গড়া জীবনের জন্য আর্তি। বেঁচে থাকার আর্তিতেই তার বার বার ঘটেছে পলায়ন, বাসা বদলের ঘটনা। এমনকি নিজের সংসার গড়েও সেখানে সে থাকতে পারেনি। তার নিরন্তর ভিক্ষা-বৃত্তি তার জীবনধারণেরই প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মানুষের অন্ধ সংস্কার তাকে ঘর

বাঁধতে দেয়নি। তার মানবিক বৃত্তিকে করেছে অপমান। গল্পের শেষে সে-ও আবার পালাতে চেয়েছে নির্ভর আশ্রয়ের আশায়। ঝড়ের মধ্যে ছাতিফাটার মাঠে তার বীভৎস মৃত্যু ঘটেছে। সে যে সত্যিকারের চিরন্তন নারী, পালাবার সময় ঘূর্ণিঝড়ের অসহায়তার মধ্যে সে তার স্বামীকে করেছে স্মরণ। একটি নারীজীবনের প্রেয় ও শ্রেয়—একই সঙ্গে একমাত্র তার স্বামীই হতে পারে। মৃত্যুর আগে অসহায়তায় তার স্বামী-স্মরণ প্রমাণ করে, সে ডাইনী নয়, সাধারণ বাস্তব বোধবুদ্ধিসম্পন্ন নারীই। তারাশঙ্কর গভীর মমতায় ও মানবিকতায় এক অবহেলিতা, সাধারণ মানুষের অমানবিক আচাব-আচরণে বিধ্বস্ত এক নারীকেই গল্পে এঁকেছেন।

কিন্তু তার মৃত্যুচিত্র নির্মম, অসহনীয়। মৃত্যুর মুহূর্তে প্রকৃতির ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি যেন বা তার রক্তাক্ত অভিমান-আহত হৃদয়ের ওপর শীতল আশীর্বাদ! একজন মানুষকে তারই মানবগোষ্ঠীর একদল মানুষ এইভাবে হননের জন্য মত্ত হয়, সেই প্রয়াস সুস্থ সভ্যতার প্রতিস্পর্ধী সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত দিক। পারসিক জাতির ধর্মাচরণে মৃত্যু বিষয়ে প্রধান বিধান আছে, মৃত ব্যক্তিকে অগ্নি, বারি ও মৃত্তিকায় নিশ্চিহ্ন করা যাবে না, কারণ সে ব্যবস্থায় এই প্রকৃতি মধ্যস্থ তিন দেবতার অসম্মান হয়, পাপ হয়, তাই মৃত ব্যক্তিদের মাংসভুক নৃশংস পাখিদের দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। সে ব্যবস্থায় মানুষেরই সৃষ্ট ও ভাবিত যুক্তি আছে দর্শনের, আধ্যাত্মিক চেতনার। কিন্তু মানুষের মৃতের সম্মান তাতে রক্ষিত হয় কিনা, তা নিশ্চিত ভাববার বিষয়। ডাইনীর শেষতম মৃত্যুপরবর্তী দৃশ্যরচনায় আছে তেমনি অমানবিকতার এক চূড়ান্ত নির্দশন। 'নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।'—গল্পকারের এই চিত্র রচনায় আছে ডাইনীর মৃত্যু নিয়ে অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারে আবদ্ধ সভ্যতা-ধ্বংসকারী, মানবতার অপমানকারী মানবগোষ্ঠীর প্রতি চাপা প্রবল ধিক্কার। এই ব্যঞ্জনায় 'ডাইনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিল্প অবয়বে অসীম।

গল্পের ছোট ছোট চরিত্রে আছে হারু সরকার, সরকার-গিন্নি, সাবিত্রীর শাশুড়ি, সেই ছাতিফাটার মাঠ পেরিয়ে-আসা সন্তান বুকে এক তৃষ্ণার্ত মা, প্রেমিক বাউরী যুবক, ডাইনীর নিজের নামহীন স্বামী ইত্যাদি। ডাইনীর স্বামীর প্রেম সবল, সার্থক, কিন্তু তার ঘরবাঁধার মধ্যে জীবনকে ভালোবাসার দিক থাকলেও তার যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু নিয়তি হয়। বাকি সব চরিত্রই ডাইনীকে কেন্দ্র করে সংস্কারকে বড় করেছে। এরা ডাইনীর জন্যই গল্পে সক্রিয়। স্বামী-পরিত্যক্তা বাউরী যুবতীর সঙ্গে বাউরী যুবকের ছোট প্রেমচিত্রটি নীচুশ্রেণীর প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কের মধ্যে অর্থের লেনদেনের ও মেয়েদের পক্ষ থেকে তা আদায়ের রীতিকে বুঝিয়ে দেয়। তারাশঙ্করের এখানে এক অভিজ্ঞতা কাজ করে। প্রেমের সবচেয়ে জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন তারাশঙ্কর 'সরা' ও সেই ইঞ্জিনের ফার্নেসে কয়লার জোগানদার যুবক-স্বামীর প্রেমের সম্পর্কের ভাবনায়। 'সোরধনি' যে কত জীবন্ত, বাস্তব, সপ্রাণ নারী, তার সমস্ত ভালোবাসা যে কত বাস্তব, তা বোঝাতেই তার প্রেমচিত্র এত রঙিন হয়েছে। একটি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ নারীর প্রেমের এমন বলিষ্ঠ রূপও বাংলা ছোটগল্পে বিরল দৃষ্টান্ত। আলোচ্য গল্পের অমোঘ গতির উপযোগী এ চিত্র সংক্ষিপ্ত, সংযত ও শিল্পসুন্দর।

সেই প্রেম ও সংসার জীবনের পরিণতি যে বিষাদময়, তার এই বৈশিষ্ট্য গল্পের মূল লক্ষ্যকেও পরিণামে গতি দেয়। এখানেই এই প্রেমচিত্র ও সন্নিহিত দুই চরিত্র অঙ্কনের সার্থকতা। এমন চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পে তারাশঙ্কর একজন সার্থক চরিত্রসৃষ্টির দক্ষ রূপকার।

তিন

তারাশঙ্কর 'ডাইনী' গল্পের প্রথমেই ছাতিফাটার মাঠের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে এক রহস্যময় প্রকৃতিচিত্র এঁকেছেন। এই চিত্রের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যেই আছে তাঁর গল্পের যেমন মূল বক্তব্য, তেমনি তাঁর নিজস্ব দেখা, কাল ও জীবনদর্শন দিয়ে গড়া এক স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—এ হল তারাশঙ্করের জীবন দর্শনের প্রধান ভিত্তি।

'ডাইনী' গল্পের ডাইনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গল্পকার তার মানবিক বৃত্তির যে সত্য রূপ এঁকেছেন, যে করুণ অসহায় রূপের পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর মানব-ভাবনা চিত্রের বৈপরীত্যে ধরা পড়ে। কিন্তু তিনি যেমন মানুষকে ভালোবাসেন, তেমনি মানুষের যাবতীয় বৃত্তির বিচার করেন আদিমতা দিয়ে। ডাইনীর মধ্যে যে আদিমতা আছে, তার যে সারল্য ও অকপটতা আছে, তা সংস্কারে আচ্ছন্ন হলেও তার শুভশ্রী দিকই গল্পকারের একমাত্র লক্ষ্য। গল্পের প্রথমে বিশাল 'প্যানরামিক' প্রকৃতি চিত্রে, গল্পের মধ্যেকার খণ্ড খণ্ড প্রকৃতি বর্ণনায় এবং গল্পেব শেষের বিষাদঘন প্রকৃতিময়তায় আছে সেই আদিম স্বভাব—যা দিয়ে ডাইনীর এত অতিলৌকিক অবিশ্বাস্য আবরণ সূক্ষ্ম স্বভাবে পাঠকদের নিবিষ্ট রাখে।

প্রকৃতি এবং মানুষ—দু'য়ের সমান্তরাল ছায়া এবং পরস্পরের যোগ—এসব দিয়েই 'ডাইনী' গল্পের শিল্প অবয়বের অভ্যন্তরে থেকেছে গল্পকারের জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টি। আদিম তান্ত্রিক ও অলৌকিক সংস্কারে ও বিশ্বাসে ডাইনী নারীটি হয়ে উঠেছে এক পশুর মতো—সাধারণের কাছে সে সর্বনাশী, সে 'রাক্ষসী', এবং তা-ও অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসে বশবর্তী হওয়ার কারণেই। এই যে ডাইনীর কুৎসিত স্বভাবের প্রতিচিত্রণ—এর মর্মমূলে আছে চরিত্রটির লক্ষণীয় বৈপরীত্য—মানবিক অপত্য স্নেহের, শোভন জীবন আকর্ষণেরও এক আদিমবৃত্তির মহান তাগিদ। অর্থাৎ বাইরের বিকৃতি ভিতরের ভয়াল যন্ত্রণাকে ঢেকে রেখে ডাইনীকে করেছে অসহায়। ডাইনীর অন্তরের যে আদিম স্নেহ-প্রবৃত্তি, তা সংস্কারের মরুভূমির বুকে শুকিয়ে যেতে বাধ্য হয়। জাগতিক সংস্কারের কাছে মানব প্রকৃতির পরাজয়। তার স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয় বৃত্তির একমাত্র প্রতিবন্ধক তার ওপর চাপানো লোকজীবন-সম্ভূত অনড় সংস্কার।

অর্থাৎ আদিম সংস্কার আর সৃষ্টিমূলের আদি মহৎ বৃত্তি—দু'য়ের দ্বন্দ্বে তারাশঙ্কর যে জীবনভাষ্য রচনা করেছেন গল্পে, সেখানেই তাঁর জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ। ছাতিফাটার মাঠের দিগন্তবিস্তারী নির্জন রূপ, ডাইনীর নিঃসঙ্গ জীবনবেদনা ও তারাশঙ্করের attitude গল্পের আত্মায় এক অভিশাপকেই স্থিত করে। এটা মানুষের

ভাগ্য। ছাতিফাটার মাঠের ভয়াল বর্ণনার সঙ্গে এক সমালোচক হার্ডির 'দি রিটার্ন অফ দি নেটিভ' উপন্যাসের 'এগডন হীথ'-এর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে বিখ্যাত ভৌতিক গল্পকার ডব্লিউ. আর. জেম্‌সের 'দি এ্যাশ ট্রি' গল্পে ডাইনীতন্ত্রের রূপায়ণ, তার থেকেই তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পের মর্যাদা পেয়ে যায় ক্লাসিক সাহিত্যের স্তরে। আসলে তারাশঙ্কর মানবপ্রেমিক এবং সেই মানবপ্রেমেই দেখেছেন ডাইনী স্বভাবের মেয়েটিকে। প্রকৃতি ও মানবস্বভাবের আদিমতার সঙ্গে সর্বকালের মানুষের মহত্তম বৃত্তির যোগেই 'ডাইনী' গল্পের সমূহ সর্বকালীন আবেদন।

গল্পের সিদ্ধান্তে এসে তারাশঙ্কর প্রথম 'ছাতিফাটার মাঠে'র চিত্রের যেনবা continuation-এই আর এক সিদ্ধান্ত এঁকেছেন এই ভাষায় :

> 'অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতিফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমান বিন্দু ক্রমশ আকাবে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে। নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।'

এখানে চিত্রের যে ভয়ঙ্কর রূপ, তা গল্পের প্রথম চিত্রেরই এক বিবর্তিত জীবন্ত প্রতিরূপ। তারাশঙ্কর প্রকৃতির আদিমতা দিয়ে মানুষের আদিম স্বভাবের প্রতিষ্ঠা করতে বসে মানুষের মধ্যেকার নিয়তির অসহায়তাকে দীর্ঘশ্বাসের পতনের পরিবেশে ভয়াল বীভৎস করেছেন। এখানেই তাঁর গল্প থেকে উঠে আসা বিশেষ জীবনদৃষ্টি। ডাইনীর যে সর্বরিক্ত ভয়াল পরিণতি, তা অন্ধ সংস্কারের অভিশাপ, তা চিরকালীন মানববৃত্তির চরম অপমান। সংস্কারের পাশে মানুষের মানবিক আদিবৃত্তিগুলি যে কত খাঁটি, গ্রাহ্য, কত মূল্যবান জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে, 'ডাইনী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তার মৃত্যু দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যায়। তারাশঙ্কর প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখেননি। আব সে প্রকৃতি প্রবৃত্তি হয়ে যে মানুষের মধ্যেই অধিষ্ঠিত, তা-ও দেখিয়েছেন 'তারিণী মাঝি' গল্পে। সেখানে আদিমতম প্রবৃত্তি মানুষকে, স্বার্থপরের মতো হলেও, বাঁচায়। ডাইনীর প্রকৃতি ডাইনীর মধ্যে সংস্কারের বিকৃত রূপ নিয়ে ডাইনীর মধ্যেই স্থান নেয়। কিন্তু মনোলোকের দ্বন্দ্ব ও পরিণাম বোঝায় বৃত্তির কৃত্রিমতা নয়, অকৃত্রিমতাই মানব প্রাণেব একমাত্র সম্পদ। এই বিশ্বাসে তারাশঙ্করের জীবন দর্শন 'ডাইনী' গল্পে আর এক ভাষ্য দেয়।

চার

'ডাইনী' গল্পের সামগ্রিকভাবে প্রকাশরীতির মধ্যে আছে স্পষ্টত নিবিড় ঘন ব্যঞ্জনা। তারাশঙ্কর তাঁব একাধিক রচনায় রাখেন নাটকীয়তা, আবেগ, কাহিনী ও ঘটনার উতরোল প্রবাহ। আলোচ্য গল্পে সেগুলি অদ্ভুতভাবে অপসৃত। এ গল্পের শিল্পকাঠামোয় তারাশঙ্করের গল্পকার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ সংযমে ও সুষমায় আকর্ষণীয়। প্রথমেই প্রকাশরীতির প্রাসঙ্গিকতায় আছে এর প্রকৃতি চিত্রের ব্যঞ্জনাধর্ম। এমন প্রকৃতি প্রথম দুটি

পরিচ্ছেদে গভীর, জমাট, অলৌকিক স্বভাবে স্থির। সেই প্রকৃতিই খণ্ড খণ্ড ভাবে গল্পের গতির মধ্যে রচিত হয়ে আছে। গল্পের শেষে আছে তার যেনবা খাদক রূপ!

অর্থাৎ গল্পের প্রথমেই যে প্রকৃতি তা-ই যে সমগ্র গল্পের পট ও সিদ্ধান্তকে বুঝিয়ে দেয়, তারাশঙ্করের বিস্তারিত চিত্র রচনায় তা প্রমাণিত হয়ে যায়। গল্পের প্রথম ও শেষ অংশ—শুরুর বিস্ময় ও শেষের ব্যঞ্জনা একই তারে বাঁধা। এখানেই 'ডাইনী' গল্পের প্রকাশভঙ্গির লক্ষণীয় অনন্যতা। গল্প থেকে কয়েকটি প্রকৃতি চিত্রের খণ্ড অংশ এভাবে সাজানো যায় :

> ১. 'ছাতিফাটার মাঠ! জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে।'

(এখানেই প্রথম 'মৃত্যু' প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়ে গল্পকার মূল গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনার সঙ্গে এক সূক্ষ্ম ভাবের যোগ ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন।)

> ২. 'যেন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম ধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ! ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে।'

(এই অংশের প্রকৃতি চিত্রে গল্পকার ব্যবহার করেছেন 'ভয়ঙ্কর', 'চিতাভস্ম', 'ফ্যাকাশে রঙ' এমন সব শব্দ—যেগুলির সঙ্গে ব্যঞ্জনায় গল্পের শেষতম পরিচ্ছেদ তিনটির সূক্ষ্ম সূত্র আবিষ্কার দুরূহ নয়)

> ৩. 'তাহারা বলে, কোন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসত করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমান পতঙ্গ-সঙ্গীও পঙ্গু হইয়া ঝরা পাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।'
>
> সে নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনো কমে নাই।'

(এই প্রকৃতিবর্ণনায় মহানাগের বিষ প্রসঙ্গ, শক্তি পুড়ে ক্ষার হওয়া, পতঙ্গ-সঙ্গীর পঙ্গু হয়ে নীচে পড়া, মহানাগের গ্রাস, বিষজর্জর স্বভাব—এমন সব শব্দচিত্রে আছে সেই গল্পের পরিণতি-নির্দেশক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যঞ্জনা।)

> ৪. 'ছাতিফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্রমাস—বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি

ঝিলিমিলির মত কি একটা যেন হাঁটিয়া চলিয়াছে। একটা ফুৎকার যদি সে দেয় তবে মাঠের ধূলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।'

(গল্পের মধ্য অংশের এই প্রকৃতির খণ্ডচিত্রে এক অলৌকিকতা, এক সংশয়, ডাইনীর নিজস্ব ভাবনার যোগ—এসবে আছে প্রথম দিকের প্রকৃতির চরিত্রানুগ প্রয়োগ।)

৫. 'বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের সেই আবর্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধূলা হু হু করিয়া উড়িয়া ধূলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা? এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘূরণ পাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে! একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে।'

(এই প্রকৃতি চিত্র, গল্পের প্রথমেই স্থির অনড় স্তব্ধ প্রকৃতি চিত্রের ব্যঞ্জনাগর্ভ জীবন যে অলৌকিক রস ডাইনীর দৃষ্টি দিয়ে ধরা—তার নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গী। এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে ডাইনীর যে খেলা প্রকৃতির যে অলৌকিক রস-স্বভাবের বিকাশ—তা পরিণামী ব্যঞ্জনার অনুকূলেই সচল।)

৬. 'শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশপথে যাইতে যাইতে ঐ গুনীনের মন্ত্র প্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটির নীচে ছাতফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।'

(এই প্রকৃতির রূপ ও স্বভাব গল্পের সিদ্ধান্ত অংশে ব্যঞ্জনায় বাস্তব রাক্ষসীর রূপকে সামনে আনে। ডাইনীর এভাবে মৃত্যু যেনবা প্রকৃতিরই মানুষ-ভক্ষণ!)

তারাশঙ্কর সমগ্র গল্পে এইভাবে প্রকৃতিকেই একটি চরিত্র করেছেন। প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে ডাইনীকে। প্রকৃতি এ গল্পের জীবন্ত এক পরিবেশ। প্রথমে সে স্তব্ধ, ধীর, গম্ভীর, অলৌকিক কোন দৈবী স্বভাবে রহস্যময়, ধ্বংসরূপিনী। গল্পের মধ্যে ডাইনীর সঙ্গে ক্রমশ জীবন্ত সম্পর্কে খেলার ছলে হয়েছে তার জীবনসঙ্গিনী, তার নিঃসঙ্গ জীবনের প্রাণসখী। গল্পের শেষে প্রকৃতিই রাক্ষসীর ভূমিকা নিয়ে তাকে করেছেন গ্রাস। তারাশঙ্কর অভাবনীয় শিল্পক্ষমতায় এইভাবে স্তর-পরম্পরায় একে একে প্রকৃতির এক জীবন্ত স্বভাব এঁকেছেন—যে স্বভাব আদিম, অপ্রতিরোধ্য, ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র, নিরাসক্ত। গল্পের প্রকাশভঙ্গিতে এই প্রকৃতি যেমন এক মূল্যবান প্রাসঙ্গিক বিষয়, তেমনি শিল্প-অবয়বও। প্রকৃতি তার এই স্বভাবে থাকার কারণেই এখানে বিবরণধর্মিতা হয়েছে পরিত্যক্ত, সত্য হয়েছে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্ম।

গল্পের যে লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য, সেই অনুযায়ী এর ভাষাবৈশিষ্ট্য গ্রহণীয়। ভাষা বিষয় ও পরিবেশের সঙ্গে অদ্ভুত সহযোগিতা করেছেন আদ্যন্ত। বলার ভঙ্গি আয়াসহীন এবং রুদ্ধশ্বাস করে তোলে পাঠকদের, তা পাঠকদের বিস্ময়কে যেন লুঠ করে নেয় অবলীলায়। খণ্ড খণ্ড ভাষাচিত্রে আছে সংশয়বাচক অলংকার প্রয়োগ। 'গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত

শিশুটির ঘর্মাক্ত দেহ', 'ছুরির মত চোখ', 'গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান', 'মন্ত্র প্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মত'—এমন সব অলংকৃত বাক্যাংশের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, ভয় ও বীভৎসতা ভাষাকে প্রতিবেশ ও চরিত্রের পক্ষে যথোচিত শিল্পশক্তি দিয়েছে। কোন কোন মন্তব্য—যেমন—'ভালবাসার কি ভয় আছে' প্রবাদপ্রতিম মর্যাদা পেয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ গল্পের ভাষায় নেই অতিরিক্ততা, নেই এতটুকু অসংযম ও আবেগ। ডাইনীর নিজস্ব আচরণে কখনো কখনো নাটকের স্বাদ মেলে, কিন্তু চরিত্রন্যায়ে তা এমনি নিশ্চিত যে তাকে স্বতন্ত্র স্বভাবে ধরে রাখা যায় না। 'ডাইনী' গল্পের প্রকাশরীতি, ভাষা বৈশিষ্ট্য গল্পটির কবচকুণ্ডল।

পাঁচ

গল্পটির 'ডাইনী' এমন নাম অবশ্যই চরিত্রকেন্দ্রিক, কিন্তু এর অভ্যন্তরে ব্যঞ্জনায় ধরা আছে গল্পের মূল লক্ষ্যটিও—গল্পকারের দিক থেকে। সমগ্র গল্পে এই চরিত্রটির স্বতন্ত্র নাম 'সোরধনি' (সুরধুনী) ওরফে ডাকনাম 'সরা' থাকলেও গল্পকার ব্যবহার করেননি। এর কারণ কি পাঠকদের একেবারে মূলে গল্পের প্রধান ভাবনাকে যুক্ত করার জন্যেই তা বর্জন করেছেন—এমন একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায়। ছোটবেলায় 'সুরধুনী' বড় হয়ে হয়েছে নামকে বিস্মৃতির অতলে পাঠিয়ে 'ডাইনী', অর্থাৎ বিশেষ হয়েছে নির্বিশেষ স্বভাবে ডাইনী।

ডাইনী অর্থাৎ ডাকিনীবৃত্তি কোনো পেশা নয়, তা, লোক-সংস্কারের বিচারে এক নারীর অলৌকিক ক্ষমতার ও অশুভ স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। গল্পে কিন্তু 'সুরধুনীর' সেইরকম ডাইনী হবার মতো কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। সে একেবারেই বাস্তব নারী, সমস্ত রকম মানবিক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন। তা হলে তাকে ডাইনী নামে ডাকার কোনো যৌক্তিকতাই নেই! লেখক তাকে ডাইনী বলে এবং গ্রন্থনামে বসিয়ে তার নামের তাৎপর্যগত নিষ্ফলত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন। তাই নামের ব্যঞ্জনা এখানে এই অর্থে মেলে।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র গল্পে ডাইনী স্বভাবেই 'সুরধুনী'র যত কিছু তৎপরতা। সে নিজেও বিশ্বাস করে সে ডাইনী। গল্পকারের মূল প্রতিপাদ্যও হল ডাইনী তন্ত্রের অসহায়তা ও বিষাদময়তার দিক। ডাইনীর মৃত্যুতেই গল্পের শেষ। ডাইনী গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, বক্তব্যের দিক থেকে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যও। সুতরাং গল্পনাম শিল্পের যৌক্তিকতা পেয়ে যায়।

তৃতীয়ত, 'সুরধুনী', যার ডাইনীর নিজস্ব প্রয়োগে বিকৃত রূপ 'সোরধনি' ওরফে 'সরা', তার আভিধানিক অর্থ হল 'সুরের' অর্থাৎ দেবতার 'ধুনী' অর্থাৎ 'নদী'। এক কথায় সুরনদী, অর্থে গঙ্গা, ভাগীরথী। গল্পের চরিত্র 'সোরধনি' অর্থাৎ সুরধুনী ছোটবেলা থেকেই গঙ্গার মতো পবিত্র একটি নারী। তার হৃদয়ে সংগুপ্ত আছে অসীম স্নেহের জলধারা। সে স্নেহ অপত্য স্নেহ। অবলীলায় তার প্রকাশ ঘটে। এই সত্তাতেই সে ছাতিফাটার মাঠ পেরিয়ে আসা মায়ের কোলের শিশুর প্রতি স্নেহবুভুক্ষু হয়, সাবিত্রীর নবজাতকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। তা বিশুদ্ধ, নিত্য, পবিত্র। তাকে আবৃত করেছে অন্ধ লোকসংস্কার আরোপিত ডাইনী সত্তা। অকৃত্রিম হল 'সুরধুনী' সত্তা, কৃত্রিম হল

ডাইনী সত্তা। সমগ্র গল্পে এই কৃত্রিম ও অকৃত্রিম দুই সত্তার দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে জাত কৃত্রিম সত্তার কর্তৃত্বই বড় হওয়ায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে ডাইনীকে। 'সুরধুনী' সত্তা সব সময়েই পরাজিত হয়েছে ডাইনীর মধ্যে, কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত শুষ্ক হয়ে যায়নি। এই সত্তার সদা সক্রিয়তাতেই তো তার নির্যাতন, যন্ত্রণাভোগ, তাকে ভুল বোঝার অবকাশ তৈরি হয়। তারাশঙ্কর নায়িকার নাম 'সুরধুনী' ব্যবহার করেননি, কারণ হল প্রতিপাদ্য ডাইনী সত্তার, কৃত্রিম সত্তার করুণ রূপচিত্রণ বাসনা। এই ডাইনী নামই গল্পের চরিত্রে হয়েছে প্রধান, গল্পের নামেও সেই কারণে গৃহীত।

তাই 'ডাইনী' গল্পের নাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার দুটি নাম—একটি মা-বাবার দেওয়া, আর একটি অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের মানুষদের বানানো। একটি আসল, অন্যটি নকল। ডাইনী নিজেই বোঝে তার ডাইনীর মতো কোনো ক্ষমতা নেই। তবু সে জনতার প্রভাবকে ভুলতে পারেনি। অথচ তার মধ্যেকার 'সুরধুনী' অর্থাৎ গঙ্গার নির্মল স্রোতের মতো, বেগের মতো, অপত্য স্নেহের মতো চিরন্তন মানবিক দৃষ্টিকেও ছাড়তে পারেনি। সংস্কারের নামে সে জীবন দিয়েছে, বাবা-মায়ের দেওয়া আসল নামে সে যন্ত্রণা ভোগ করেছে, অতৃপ্তির জ্বালায় জর্জরিত হয়েছে। চরিত্রের ব্যক্তিত্বের এই দুই দিকে গল্পের মূল সংঘাতের স্থান। সংস্কারকে ডাইনী মেনেছে, তবু তার মূল নামের মাহাত্ম্য সে স্বভাবকে ত্যাগ করেনি। বাউরী যুবকের প্রতি তার সে এই বৃদ্ধ বয়সেও আকর্ষণ, তা তার অতৃপ্তিব অসহনীয় যন্ত্রণা মেটানোর তাগিদ। সে সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বেঁচে থাকার। তাই ছাতিফাটার মাঠের পাশে আমবাগানের পর্ণ দরিদ্র কুটির ছেড়ে নতুন করে বাঁচার জন্যই ভয়ে পালাতে চেয়েছিল। তার নিয়তি তাকে শেষ করে। গল্পের নামে তার এই মৃত্যু এক গভীর বিষাদময়তা ও অসহায়তাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। ভিতরের স্নেহার্তির দুর্জয় স্বভাবকে জীইয়ে রেখেই সে মৃত্যুর মধ্যে চলে যায়। গল্পের 'ডাইনী' এমন নামে তাই আছে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ। এই অর্থে অবশ্যই গল্পনাম সার্থক।

৪.

রসকলি

এক

'রসকলি' তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের অবশ্যই উল্লেখযোগ্য গল্প। বাংলা সাহিত্যে এই লেখকের আবির্ভাবের সূচনা-সূচক প্রথম সীমা চিহ্নিত করে এই গল্প। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে বিশিষ্ট 'কল্লোল' পত্রিকায়, বাংলা তেরশো চৌত্রিশের ফাল্গুন সংখ্যায়। 'কল্লোল' তার রবীন্দ্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে 'রসকলি'র প্রকাশের বছর চারেক আগেই, ইংরেজি উনিশশো তেইশ সালে। তারাশঙ্করের লেখক জীবনে এমন 'রসকলি'র গুরুত্ব কয়েকটি দিক থেকে লক্ষ করার মতো। (১) উপন্যাস নয়, গল্প লিখেই যে তারাশঙ্করের বাংলা সাহিত্যে প্রথম পদক্ষেপ, আলোচ্য গল্প তার প্রথম দৃষ্টান্ত হয়। (২) তারাশঙ্কর কোনোক্রমেই কল্লোলীয় নন, হতে পারেননি, চানওনি, অথচ তাঁর

প্রথম আবির্ভাব কল্লোলের আশ্রয়ে। এটা ঘটনা, কারণ কল্লোলীয় এবং অ-কল্লোলীয়—দুই ধারার লেখকদের সেকালে যে সীমা চিহ্নিতকরণ—'রসকলি' দু'য়ের মাঝখানের গল্প তারাশঙ্করের দিক থেকে। (৩) তারাশঙ্কর তাঁর 'স্বনির্বাচিত গল্পে'র 'গোড়ার কথা' অংশে নিজস্ব হস্তলিপিতেই জানিয়েছেন—'আমি জানি এবং পাঠকরাও জানেন—প্রেমের গল্প আমার বেশী নেই; প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।' প্রথম গল্প 'রসকলি' এর নিশ্চিত প্রতিবাদী ভূমিকা নেয়। (৪) অভিযোগ অর্থে নয়, পরিষ্কার বোঝা যায় তারাশঙ্করের উত্তরকালের একাধিক গল্প পড়ে, তিনি গল্পের প্রকরণে যত্নবান হননি। একাধিক গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর রচনার বিষয়ের বিস্ময়কর বেগ আর প্রকরণের বিস্তারিত শৈথিল্য তাঁর গল্পকে নিখুঁত ছোটগল্প হয়ে ওঠার মধ্যে প্রকটতর দ্বিধা এনে দিয়েছে। 'রসকলি' গল্পে তার স্পষ্ট ভূমিকা আছে। (৫) তারাশঙ্কর যে সময় গল্প লেখেন, তখনি তিনি স্বয়ং একজন জমিদার শ্রেণী-চিহ্নিত গ্রাম্য মানুষ। তাঁর বীরভূম-এর পরিবেশ তাঁর কাছে হয় সাহিত্যের পটভূমির উপযোগী নামাবলী—উত্তরকালেও এর প্রমাণ মেলে উপন্যাসে ও গল্পে। 'রসকলি' গল্পের আকর্ষণ এর পটভূমিকৃত অঞ্চল বিশেষের প্রয়োগ-শিল্পের কারণে এবং এতাবৎকাল বাংলা সাহিত্যে ঠিক এভাবে অ-দৃষ্ট বৈষ্ণব জীবনের পরিচয়ে। কল্লোলের পরিচালক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর স্বাদের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য এই কারণে ছিল বলেই তিনি 'রসকলি' লিখে তাঁদের দিক থেকে স্বাগত হয়েছিলেন—এমন তথ্যের খবর আছে।

'রসকলি' গল্পের কাহিনী অংশ নানা ছোট-বড় ঘটনার গাঁথা মালায় রূপ পেয়েছে। এটি প্রেমের গল্প এবং স্পষ্টতই ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। ত্রিকোণ প্রেমের কথায় আছে এক নায়ক পুলিন দাস, আর দুই নায়িকা গোপিনী ও মঞ্জরী। পুলিন দেখতে সুন্দর, বুদ্ধি তার যত মোটাই হোক। মঞ্জরী আর পুলিন ছোটবেলায় যখন খেলার সাথী, তখনই তারা পরস্পরে 'রসকলি' সম্পর্ক পাতায়। দুজনের বাল্যকালের সখ্যতা যৌবনে একই স্বভাবে থেকে যায়। পুলিন দাসের পালক হল গৃহী-বৈরাগী কাকা রামদাস, পিতা শ্যামদাস। শ্যামদাস ভাইয়ের কাছে পুত্রকে রেখে মারা যায়। রামদাস পুলিনের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ।

রামদাসের অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু তার স্ত্রী শ্রীমতী স্বামীর কুশ্রী চেহারার জন্য একদিন তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এর পর স্ত্রীর খোঁজে ব্যর্থ হয়ে, স্ত্রী আর না ফেরায় পোশাক বদলে পুরোপুরি বৈরাগী হলেও সংসারে থেকে যেতে বাধ্য হয় রামদাস। এই অবস্থায় গ্রামের যুবতী মঞ্জরীর মা সৌরভী পুলিনের সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে দেওয়ার কথা বলে। সৌরভী ছিল গোপার মেয়ে, ভেক নিয়ে বৈষ্ণবী। অনেক আপত্তি অজুহাতের পর শেষে মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দিতে রাজি হয় রামদাস। মঞ্জরীর অবশ্য দশ বছর বয়সেই একবার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু স্বামীকে মঞ্জরীর পছন্দ না হওয়ায় ত্যাগ করে। তার স্বামী অনেক চেষ্টা করেও তাকে ফেরাতে না পেরে অন্যত্র বিয়ে করে সংসারী হয়।

কিন্তু হোলির সময় শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে রামদাস হঠাৎ দেখতে পায় পথে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকা তার স্ত্রী শ্রীমতীকে। সঙ্গে শ্রীমতীর গর্ভজাত জাত-বষ্টুম বাউল

প্রেমদাসের বারো বছরের তরুণী মেয়ে গোপিনী। শ্রীমতীকে ছেড়ে রামদাস বাড়ি ফিরে গোপিনীর সঙ্গে পুলিনের বিবাহ দেয়, বদলে সৌরভীকে দুশো টাকা দেয়। সৌরভী মেয়েকে অন্য জায়গায় বিয়েতে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে একসময়ে মেয়েকে একা রেখেই বৃন্দাবনে চলে যায়।

এর পর থেকেই 'রসকলি' গল্পের কাহিনী ত্রিকোণ প্রেমের জটে নতুন গতি পায়। পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিয়ে হওয়ায় মঞ্জরী নিভৃতে কাঁদে, পরে সহজ হয়ে ওঠে, রসকলি কাটে, হাসিখুশির জীবনে ফিরে আসে। সবই ঠিকঠাক চলে, কিন্তু জীবনে দ্বিতীয়বার বিয়েতে গেল না সে। বিয়ের পর পুলিন গোপিনীতে গভীর নিবিষ্ট থাকে বেশ কিছুদিন, তার লজ্জা তাকে এমন নিঃসঙ্গতা শেখায়। পুলিনের বন্ধু বলাই-এর গাঁজার আড্ডাও সে ছাড়ে। শেষে মঞ্জরীই গোপিনীর সঙ্গে নিজের মানসিক দুঃখের মধ্যে যেচে আলাপ করে আসার পর একদিন পুলিনকে ডেকে আনে। পুলিনের লজ্জা ভাঙে। ক্রমশ পুলিন গোপিনীকে ছেড়ে মঞ্জরীকে নিয়েই মজে থাকে। মঞ্জরীও সুখী।

বৃদ্ধ মোহান্ত গোপিনীর স্বামী-সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন দুর্দশা দেখে ক্ষোভে-দুঃখে মৃত্যুর আগে সমস্ত সম্পত্তি গোপিনীকে দিয়ে যায়। মঞ্জরীকে মৃত্যুর আগে সামনে দেখে রাগে 'বেশ্যা' বলে গালাগাল দেয় গ্রামবাসীদের সামনেই। সে সময়ে পুলিনও সে কথা শোনে। রামদাসের মৃত্যুর পর পুলিন গোপিনীর সংসর্গ প্রায় ছেড়েই দেয়। এ সময় মঞ্জরীর ভালোবাসাই তার কাছে একমাত্র সত্য, ধ্যান-জ্ঞান। সম্পত্তি গোপিনীকে সব দিয়ে দেওয়ায় গোপিনীর নতুন পাওয়া অধিকারের বাইরে পুলিন নিজের বাড়িতেই আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে। গোপিনীর সঙ্গে মঞ্জরীর পুলিনকে কেন্দ্র করে নানা সময়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা কাটাকাটি হয়। মঞ্জরী স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে তার জ্বালা সহ্য করে। পুলিন একসময়ে এসে মঞ্জরীর কাছেই স্থায়ী আশ্রয় চায়। মঞ্জরী সংগুপ্ত প্রেমে চাপা দুঃখে, কষ্টে, চোখের জলে পুলিনকে শান্ত করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

এদিকে গোপিনীকে একা থাকতে দেখে পুলিনের বন্ধু বলাই তাকে বৈষ্ণবীয় মতেই নিজের জীবনের সঙ্গে বাঁধার প্রস্তাব দেয়। পুলিনের কাছে এসে যুক্তি দেয়, তার পালক রামদাস যখন নিজের কাকা, গোপিনীর পক্ষে সৎ-বাবা মাত্র, তাতে রামদাসের আসল ওয়ারিশ হল পুলিনই, গোপিনী তার সম্পত্তির কোনো অংশীদারই হতে পারে না। এই ব্যাপারটা গ্রামের জমিদারের কাছে গিয়ে সহজেই ফয়সালা করে নিতে বলে। আরও জানায়, এর পর রসকলিকে শুধু ভালোবাসাই নয়, রসকলিকেই বিয়ে করে নিতে পারবে। কিন্তু গোপিনীর প্রতি অমানবিক আচরণের কথা ভেবে পুলিন সে ব্যাপারে নিরস্ত হয়। এর পর পুলিনের কাছে জমিদারের দিক থেকে তলব আসে দেখা করার।

জমিদারের তলব অনুযায়ী আসে গোপিনী ও মঞ্জরীও। যুবতী সুন্দরী মঞ্জরীকে প্রথম দেখে জমিদার মুগ্ধ হয়ে যায়। জমিদারের বিচার-ব্যবস্থামতো সম্পত্তি ত্যাগে ও গ্রহণে পুলিন ও গোপিনী কেউই রাজি হয় না, মত দেয় না পাঁচশো টাকা দিতে তাদের সালিশির জন্য। গোপিনীর সঙ্গে পুলিনের একসঙ্গে থাকাতেও আপত্তি ওঠে জমিদারের কথায়

দুজনের দিক থেকে। শেষে জমিদার পুলিনের মঞ্জরীর সঙ্গে প্রেম-সম্পর্ক বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, মঞ্জরীকে বলে তার নিজের রক্ষিতা হয়ে থাকতে। মঞ্জরীর সঙ্গে কথার মার-প্যাঁচে হেরে গেলে রাগে জমিদার মঞ্জরীকে গালাগাল দেয়, ভূত সিং-কে ডেকে অপমান করার তোড়জোড় করে। প্রবল বাধা দেয় লাজুক, নিরেট-বুদ্ধি প্রেমিক পুলিন জমিদারেব সামনেই। বলাই এর মধ্যে জমিদারকে স্মরণ করিয়ে দেয় মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাসী থানার দারোগার স্ত্রীর গভীর সহমতের কথা। জমিদার নিরস্ত হয়। মঞ্জরী পুলিন আর গোপিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে রামদাসের বাড়ি। সেখানে মঞ্জরীই ওদের দু'হাত এক করে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিয়ে দেয়। এমন কাজে গোপিনী ও পুলিন দুজনেই বিস্মিত। বিকেলের দিকে মঞ্জরী পুলিনকে জানিয়ে যায় গ্রামের হালচাল দেখতে সে বেরুবে, ওরা যেন আদৌ বাড়ির বাইরে না বেরোয়। প্রয়োজন হলে থানায় যাবে মঞ্জরী নিজেই, রাতে না ফিরতেও পারে। সত্যিই রাতে ফেরেনি মঞ্জরী। পরের দিন সকালে বলাই যে খবর দেয়, তাতে বোঝা যায় মঞ্জরী পুলিনের হয়ে পুলিনের পাঠানো বলে জমিদারকে জরিমানা দিয়ে এসেছে পঞ্চাশ টাকা। জমিদাব মঞ্জরীকেও মাপ করেছে।

সব শেষে মঞ্জরী ছোট একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে দেখা করতে আসে পুলিন গোপিনীর সঙ্গে। পরনে তীর্থে যাবার সাজ। পুলিন তার 'রসকলি', সেও পুলিনের এবং তার গোপিনীর। এই সম্পর্কের স্মৃতিটুকু রেখে মঞ্জরী বিদায় নেয় ওদের কাছ থেকে। পুলিনের চাপা অভিমান, গোপিনীর কিছুতেই না যেতে দেওয়ার অনুরোধ—কিছুই মঞ্জরী গুরুত্ব দেয় না। সে আবার আসবে, গোপিনীর অনুরোধে উত্তর দিয়ে তার প্রিয় গানটি গাইতে গাইতে মঞ্জরী পথে নামে। তার বিদায়ের মধ্যে কোনো দুঃখ নেই, আছে সেই রসকলিব স্বভাবসিদ্ধ হাসি, রসোচ্ছল যৌবনের সর্বাঙ্গসুন্দর রহস্যের মায়া-মাধুরী।

মঞ্জরীর পুলিন-গোপিনীর কাছ থেকে, নিজের গ্রাম থেকেও এমন বিদায়ের চিত্র এঁকেই 'রসকলি' গল্পের কাহিনীর শেষ। গল্পটিতে তারাশঙ্কর একাধিক ছোট ছোট কাহিনী এবং ঘটনা মূল কাহিনীর সঙ্গে যোগ করে কাহিনীর অবয়ব নির্মাণ করেছেন। মূল কাহিনী গোপিনী-পুলিন-মঞ্জরীর ত্রিকোণ প্রেমের কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুলিনের পালক খুড়ো রামদাসের স্ত্রী শ্রীমতীর কাহিনী, সৌরভী-মঞ্জরীর প্রসঙ্গে মঞ্জরীর প্রথম বিবাহ ও অপছন্দ স্বামী ত্যাগের কথা, পুলিনের বন্ধু বলাই দাসের সক্রিয়তা-চিত্র, গ্রামের জমিদারের সামন্ততান্ত্রিক আচার-আচরণ। এতগুলি কাহিনী-সারাংশ মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় প্লট-বৃত্ত স্বভাবতই ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীকে গতি দিয়েছে।

কিন্তু অপ্রধান কাহিনীগুলির বিস্তার গল্পের প্লটকে করেছে শিথিল-বদ্ধ, অতিকথনে মন্থর। পরবর্তী 'পৌষলক্ষ্মী' গল্প আলোচনায় আমরা বলেছি যে, তারাশঙ্করের কোনো কোনো উপন্যাস-ভাবনার স্কেচ গল্পে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই গল্পের অবয়ব শিথিল হতে বাধ্য। 'রসকলি' থেকে গল্পকার নাকি উত্তরকালে একটা বড় উপন্যাস রচনা করেন। 'রসকলি' গল্পের কাঠামো তাই প্লটবৃত্তের সংহতি হারিয়েছে। গোপিনীর সঙ্গে পুলিনের বিবাহেই আসল গল্পের একমুখিনতা শুরু। তার আগের অংশে গল্পের শুরু থেকে পুলিন-

বলাই দাসের রামদাসের প্রাক্-মৃত্যু পর্বের সংলাপ বিনিময়, কৌতুকরসে সিক্ত পুলিনের বাল্যশিক্ষার চরিত্রগত অসঙ্গতি প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট হয়ে যায়। রামদাসের বিস্তারিত জীবন পরিচয়ও গল্পের একমুখিনতা নষ্ট করে। সৌরভীর সঙ্গে রামদাসের পুলিনের বিবাহ সম্পর্কিত কথাবার্তার কতটা ছোটগল্পের যৌক্তিকতা মেনে চলে, সেখানেও সন্দেহ দেখা দেয়।

আসলে তারাশঙ্কর গল্পের প্রসঙ্গ নির্বাচনে একজন কৃতী লেখক, কিন্তু প্রকরণ ভাবনায় তেমন মনোযোগ দেননি। ফলে 'রসকলি' গল্পের যে প্লট-বৃত্ত তা পূর্ণাবয়ব পেলেও প্রকরণগত শৈথিল্যে ছোটগল্পের সংহত বৃত্ত পরিকল্পনার বিরোধ হয়ে ওঠে। গল্পের 'মহামুহূর্ত' রচনা অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে এসেছে গোপিনী-পুলিন-মঞ্জরীর ত্রিকোণ সম্পর্কের সূত্রে। গল্পের শেষে এসেছে গ্রামের জমিদাব রামদাসের সমস্ত সম্পত্তি গোপিনীকে দিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গের বিচার-বিবেচনায়। এই জমিদারের সামনেই পুলিনের বুদ্ধিহীন লাজুক স্বভাব থেকে প্রেমে বলিষ্ঠ হওয়ার দিক 'মহামুহূর্তে'র ব্যঞ্জনা আনে। জমিদারের সঙ্গে মঞ্জরীর সংলাপ-বিনিময় দিয়েই মহামুহূর্তের সূচনা :

> 'মঞ্জরী বলিল, ... আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আবার নতুন গাঁথি।
> বাবু কহিলেন, বেশ তবে ও বলাকে পত্র করুক।
> ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।
> গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল, না না।
> বাবু কহিলেন, তবে কী মতলব শুনি? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েশি চলবে না।
> পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে কাহারও খেয়াল আসিল না। সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, যেন স্থৈর্য আর থাকে না।'

নিজের স্ত্রী বিষয়ে জমিদারের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ যে পুলিনকে বিরক্ত করছে, পুলিনের নীরব আচরণে তার প্রমাণ। আর এখানেই পুলিনকে লক্ষ্যে রেখেই গল্পের প্লট-বৃত্তে 'চরমক্ষণ' এর সূচনা। এর পর যখন জমিদারের নিজের বাড়িতে মঞ্জরীকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে মঞ্জরী কথার কৌশলে একে একে নাকচ করে দেয়, স্পর্ধিত শ্লেষে জমিদারের আদেশে দেখায় উপেক্ষা, উদাসীনতা, তখনি তার পরবর্তী চিত্রে সেই পুলিনকে কেন্দ্র করেই ঈষৎ বিস্তারিত 'মহামুহূর্তে'র ঘটে পূর্ণ রূপ :

> 'মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে কি আর বলব!—সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ—না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না, সে যে যা বলবে বলুক।
> বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মতো চীৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী? ভূত সিং, লাগাও জুত্তি হারামজাদীকো।
> ....পুলিনের মনের দরজায় ঠিক জায়গায় হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল, খবরদার!

> রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্ঠির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।'

গোপিনী প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে যে চাপা ক্রোধের জাগরণ পুলিনের মনের গভীরে, মঞ্জরী প্রসঙ্গে তারই সশব্দ বিস্ফোরণে 'চরমক্ষণে'র চিত্রটি পূর্ণরূপ পায়। 'রসকলি' গল্পের শেষতম পরিণতিতে আছে মঞ্জরীর নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা। সে যাত্রা-চিত্রে বিষাদ নেই, যৌবনরসে সিক্ত হাসির মধ্য দিয়ে এক রহস্যময় যৌবন-মাধুরীর প্রকাশ ঘটিয়ে মঞ্জরীর যে উদাসীন বাউলের স্বভাবে চলে-যাওয়া, তাতেই আছে 'রসকলি' গল্পের এক বৈষ্ণবী চরিত্র-নির্ভর সর্বনির্মুক্ত অনন্ত প্রেমের অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা। তা বিশেষ কোনো ধর্মের, দর্শনের তত্ত্বের দিক দেখায় না, চিরন্তন প্রেমে দীপ্ত মানবপ্রাণের সম্পর্ক ভাবনাকেই নির্দিষ্ট করে। তা বাস্তব মানব-মানবীরই সংসার বিচ্ছিন্ন রহস্যময় জীবনার্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দুই

'রসকলি' গল্পের সবচেয়ে বড় সম্পদ এর মঞ্জরী চরিত্র। তার সফল মনস্তাত্ত্বিক রূপ রূপায়ণে তারাশঙ্কর একজন কৃতী গল্প-শিল্পী! বাংলা ছোটগল্পে প্রেমিকা নারীর রূপ ও স্বরূপ বিবর্তনের কথায় মঞ্জরী যেনবা এক নিশ্চিত চরিত্র-অধ্যায়। 'রসকলি' অবশ্যই জটিল কোনো বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব বা দর্শনের গল্প নয়, তা ধর্মভাবনাহীন বৈষ্ণবীয় সম্পর্কের গল্প— বাস্তব এবং চিরন্তন মানব-মানবীয় প্রেমের কথাতেই যার প্রতিষ্ঠা। মঞ্জরী এক প্রেমিকা নারী, যে মা সৌরভীর মতো ভেক ধরা বৈষ্ণবীয় মেয়ে হলেও প্রেম-স্বভাবে গভীর রহস্যময় স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী।

প্লটের জটে মঞ্জরী চরিত্রের তিন মাত্রা—(ক) তার পুলিনের সঙ্গে রসকলি পাতানো বাল্যপ্রেম, (খ) তার দশ বছর বয়সের বাল্যবিবাহ ও অপছন্দের কারণে স্বামীত্যাগ, এবং (গ) তার যুবতী প্রেমে পুলিন-গোপিনীর মাঝখানে থেকে প্রেমকে গভীরে নিয়ে গিয়ে যাচাই করার জটিল মানসিকতা। এই তিন ডাইমেনশানে মঞ্জরী সচল থেকেছে সারা গল্পে। সে তার প্রেমে একাত্ম নির্ভয় বলেই, গভীর আত্মবিশ্বাসী বলেই মা সৌরভীর পছন্দ-করা পাত্রকে নির্দ্বিধায় খারিজ করে, বিবাহিত স্বামীকেও —স্বামী ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য তার শত অনুরোধও বর্জন করেছে নির্মমভাবে। মৃত্যুর আগে তার উদ্দেশে রামদাসের তাকে 'বেশ্যা' অভিধা দানে মঞ্জরীর প্রতিক্রিয়া-চিত্র অদ্ভুত এক উদাসীনতার, উপেক্ষার, গভীর শান্ত মানসিকতার বিস্ময় আনে:

> 'কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়া ছিল। বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ....পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না;
>
> কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল, যাচ্ছ কোথায়? পুলিন কহিল, আর এ বাড়িতে নয়।
>
> মঞ্জরী কহিল, ছিঃ এই কি রাগের সময়। এসো, খুড়ার মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।'

মঞ্জরী এমন অবস্থায় ও অপমানের সময়েও অদ্ভুত বিস্ময়কর স্থিত-চিত্ত, এতেই প্রমাণ

হয়ে যায়, সে প্রেমে সমস্ত গ্রাম্য সমাজের প্রতিক্রিয়া-জাত কলঙ্ককে জয় করেছে বৈষ্ণবীয় রাধার মতোই। তারাশঙ্কর এই চরিত্রে বৈষ্ণবীয় রাধার কোনো তত্ত্ব নয়, অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিতে তার প্রেমকে এঁকেছেন নির্মম শিল্পীর নিরাসক্তি দিয়ে।

জমিদারের কাছেও মঞ্জরীর আচরণ সচেতন আত্মশক্তিতে কঠিন। মঞ্জরী নির্ভীক, নির্বিকার ঔদাসীন্যে শ্লেষ প্রয়োগে যে মার্জিত বুদ্ধি ও স্থিতধীর পরিচয়, মঞ্জরীর চরিত্রমূলে তারই স্থিতি। মঞ্জরী অত্যন্ত চতুরা এবং তার প্রসঙ্গে জমিদারের মূল লক্ষ্যটি বুঝতে পেরেছে বলেই নির্ভয়ে তার সামনে বলতে পেরেছে: 'আমার পোড়ার মুখকে কি বলব!— সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়, আপনি রাজা আপনিও শেষ—।' এখানে এবং এর পরবর্তী চিত্রে সক্রিয় থাকে মঞ্জরীর সেই উপেক্ষা, লোকজনের গঞ্জনার প্রতি উদাসীনতা, এবং সেই কারণেই গোপিনী ও পুলিনকে নিয়ে সহজে সেখান থেকে চলে আসতে পারে।

অর্থাৎ, মঞ্জরী এমন এক নায়িকা যার মধ্যে আছে খাঁটি প্রেমের এক ভয়ঙ্কর শক্তি। সে যেমন তার আকর্ষণীয় উপস্থিতি দিয়ে বাস্তব সংসার তছনছ করতে পারে অবলীলায়, তেমনি সহজেই ভাঙা সংসার নিঃস্বার্থভাবে গড়েও দিতে পারে। এ নারী সমাজে সামান্য, স্বভাবে অপরূপা, প্রেমে অনন্যা। অবশ্যই একান্ত ব্যক্তিক মনে প্রেমিকা নারী হিসেবে মঞ্জরীকে আঁকতে বসে গল্পকার নারী মনস্তত্ত্বের প্রয়োগে আদৌ ব্যর্থ হননি। মঞ্জরীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব পুলিন আর গোপিনীর মাঝখানে নতুন প্রেমের উজ্জ্বল দীপশিখা অম্লান রাখে। দীপের আলোয় নিজে পুড়ে খাঁটি সোনা হয, অন্যদের পুড়িয়ে তাদেরই নতুন সংসারের উপযোগী করে। পুলিন আর গোপিনীর সংসার বন্ধন তাই মঞ্জরীর জ্বালা আগুনে শুদ্ধ করা এক জাগতিক প্রেম-বন্ধন। মঞ্জরী নিজে এসবের ঊর্ধ্বে। মঞ্জরী নিজে সেই শমীবৃক্ষ যার ভিতরটা আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়, বাইরে তার কোনো চিহ্নই থাকে না, সে একান্ত স্বাভাবিক!

প্লটের পরিকাঠামোয় মঞ্জরীর গুরুত্ব যাই থাক, ত্রিকোণ প্রেমের কেন্দ্রে মঞ্জরী চরিত্র মনস্তত্ত্বের জটকে অদ্ভুত রহস্যময় করেছে। মঞ্জরীর বাইরের রূপ আর স্বভাবের স্বরূপে আপাত অমিল যে কোনো পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তার বাইরের রূপের বর্ণনা গল্পকারের ভাষায় এই রকম:

> 'মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, নজরে-ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব, সেই ভাবে সে চঞ্চল, চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইযা দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে। কথার ধরণটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।'

এ চিত্র মঞ্জরীর বাইরে রূপের অপরূপা দিক। কিন্তু এই যুবতী মেয়েটির ত্রিকোণ প্রেমের

জটিল টানাপোড়েনের মধ্যে ক্রমশ সার্থক প্রসাধনকলা থেকে অসীম সাধনবেগে উত্তরণ ঘটে। বিয়ের আগেই মঞ্জরী ও পুলিন পরস্পর 'রসকলি' পাতায়। প্রেমের রসকলার গাঢ় ভাব মঞ্জরীর রূপে যেমন, তেমনি তার এই স্বভাবের প্রকাশের ভাষাতেও। পুলিনের কথার উত্তরে সে বলে 'তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে।' এই যে কাম ও প্রেমের মিশ্রিত আকর্ষণের ভাষা, তা স্তব্ধ হয় গোপিনীর সঙ্গে পুলিনের বিবাহ হওয়ার পরেই।

বিবাহের পর থেকেই শুরু হয় ত্রিকোণ প্রেমে মঞ্জরীর প্রেমের সাধনবেগের পরীক্ষা। পুলিনের সঙ্গে বিবাহ না হওয়ায় মঞ্জরী নিঃসঙ্গ থেকে কাঁদে, পরে নিজেকে সহজ করে রসকলি কেটে, পুলিন বিবাহের পর দেখা না করায় তার বাড়ি আসে অযাচিতভাবে। কিন্তু সেখানে নববধূ গোপিনীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বাড়ি ফিরে আবার তার প্রেমিকা চিত্তের শোধন ঘটে অলক্ষ্যে: 'তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।' অবশ্যই প্রেমের খেলায় মঞ্জরী হারতে জানে না। পুলিনকে ডেকে, তার লজ্জা ভেঙে নিজের করে বেশি করে। রামদাসের মৃত্যুর আগে তার 'বেশ্যা' সম্বোধনে মঞ্জরী অসাধারণ অচঞ্চল। গোপিনীকে দেয় পরম সান্ত্বনার আলিঙ্গন। মোহান্ত রামদাসের মৃত্যুর সময় মঞ্জরীর শান্ত শীতল আচরণ লক্ষণীয়। মৃত্যুর পর গোপিনীর মঞ্জরীর প্রতি সাপিনীর মতো ঈর্ষার আচরণ মঞ্জরীর মনেও ঈর্ষার আগুন জ্বালায়। কিন্তু পরে ওর বাড়িতেই অসহায় প্রেমিক পুলিনকে দেখে ক্রমশ যেন জয়ী হয় মঞ্জরী নিজের মধ্যে। তা নিঃস্বার্থ প্রেমেরই জয়।

কোনো দেহসম্পর্ক নয়, দেহ দিয়ে জয়ের বাসনাও নয়, ভিতরের আগুনে পুড়তে পুড়তে মঞ্জরীর প্রেম খাঁটি সোনা হতে থাকে: 'শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।' মঞ্জরীর প্রেম সংযমের, শাসনের, বৈদেহী। তার গান তাই তারই চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাবের দ্যোতনা আনে: 'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী, /সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।' ভিতরের আগুনে যখন মঞ্জরীর দগ্ধ হওয়ার শেষ, তখনি শমীবৃক্ষের স্বভাবে সে গল্পের শেষে গোপিনী-পুলিনের মিলন ঘটিয়ে বিদায় নিয়েছে। মঞ্জরীর পক্ষে তার নিজস্ব প্রেম আলম্বন বিভাব, পুলিনের সংস্পর্শে উদ্দীপন বিভাবে তার ঘটেছে প্রজ্বলন। তারপর যৌবন-বেদনাময় প্রেম জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যে প্রেম পড়ে থাকে, তা বিশ্বের কারোর নয়, তা মঞ্জরীরই প্রসাধনকলা-মুক্ত প্রেম। সেই প্রেমেই সে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। সে প্রেম অসীম, চিররহস্যময়। মঞ্জরী তাই দেহমালিন্যহীন প্রেমের প্রতীক!

'রসকলি' গল্পে সম্ভবত মঞ্জরীই অন্য প্রধান দুই চরিত্র পুলিন ও গোপিনীকে বেশ কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। তবে পুলিন চরিত্রটির কিছু বিশিষ্টতা গল্পে মেলে। ছোটবেলা থেকে পুলিন-মঞ্জরীর মধ্যে পরস্পরের 'রসকলি' আঁকার সূত্রে সখ্যতা ছিল। তাতেই ভালোবাসা গড়ে উঠেছে। কিন্তু পরিণত মনে মঞ্জরী পুলিনের কি দেখে ভালোবাসায় গভীরভাবে মজে থেকেছে, তার কোনো বুদ্ধিনিষ্ঠ পরিচয় পুলিনের স্বভাবের, ব্যক্তিত্বের মধ্যে নেই, মঞ্জরীর কথার মধ্যেও মেলে না। পুলিন দেখতে খুবই সুন্দর এটাই তার একটা গুণ। কিন্তু মঞ্জরীর মতো এক বুদ্ধিদীপ্ত, সতর্ক, যৌবনবতী মেয়ে একটি দেখতে সুন্দর

পুরুষের প্রতি কেবল সেই কারণেই পাগল হয়ে থাকবে, লোক-চরিত্রের যুক্তিতে তার সমাধান হয় না। প্রেমে যুক্তি-বিচারহীন আবেগই সত্য— এই প্রেমতত্ত্বে বিশ্বাস রাখলে মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে হয়। সৌরভীর অভাবের দিনে অর্থ দিয়ে পুলিনের সাহায্যের উদারতা দেখানোর মধ্যে যে কোনো সাধারণ প্রেমিকের বৈশিষ্ট্যই সমর্থন পায়, এতে পুলিন বিশেষ কোনো প্রেমিক নয়। বরং এই প্রসঙ্গে মঞ্জরীর মনের বিশালতা বিশুদ্ধ, স্বার্থ-সম্পর্কহীন মনোভঙ্গি আমাদের খুশি করে।

লেখাপড়া ও অন্যান্য বিচার-বুদ্ধিতে পুলিন-ব্যক্তিত্ব একেবারেই গণনার মধ্যে আসে না। তবে তার মধ্যে এক চিরন্তন প্রেমিক হৃদয় আছে। তার মধ্যে যে গভীর মানবতাবোধ আছে তার প্রমাণও গল্পে নিশ্চিত মেলে। সেখানেই তার চরিত্রের কঠিন মাটি। বলাই যখন পুলিনকে বলে,—'রসকলিকে পত্র করবি, ও মরুকগে—যা মন করুক গে। তোর কি?'—তখন পুলিনের প্রতিক্রিয়া-চিত্র এই রকম:

> 'সে যে নেহাত অমানুষী হয়, হাজার হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের মোচড় দিয়া উঠিল।...
>
> পুলিন বলিল, না মিতে, তা হয় না।'

এর মধ্যে পুলিনের স্বামী-ব্যক্তিত্ব-নির্ভর মানসিক বোধের পরিচয় আছে। জমিদারের সামনেও পুলিনের বেশ কিছুটা দৃঢ়চিত্ত পরিণত মনের পরিচয় মেলে। জমিদার যখন গোপিনীকে বলে বলাইকে পত্র করতে, তাতে প্রবল প্রতিবাদ জানায় গোপিনী নিজেই, সেই সঙ্গে পুলিনও চাপা প্রতিবাদে, স্থৈর্যহীন থেকে রাগে নিজের ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলাব চেষ্টা করে। শেষে জমিদারেব অত্যন্ত অসম্মানজনক গালাগালিতে প্রেমিকা মঞ্জরীর অপমানে পুলিন রাগে জ্বলে ওঠে ব্যক্তিত্বেব অগ্নিদীপ্তি নিয়ে। পুলিনের এমন স্বামী-সত্তা ও প্রেমিক-সত্তার সফল জাগরণ তার চরিত্রকে নিশ্চয়ই নায়ক স্বভাবে প্রতিষ্ঠা দেয়।

প্রেমিক হিসেবে সে মঞ্জরীর কাছে অসহায়। মঞ্জরীর ঘরে রাত কাটিয়েও তাকে কাছে পায় না। প্রেমিক হিসেবে সে দুর্বল, অল্পেই খুশি, তৃপ্ত। মঞ্জরীর হাতের উষ্ণ স্পর্শই তাকে তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমের সান্ত্বনা জোগায়। মঞ্জরীর বাইরে থেকে শিকল টেনে বন্ধ-করা ঘরে তারই সযত্নে পাতা বিছানায় নিঃসঙ্গ রাত কাটিয়ে সে অসহায় প্রেম উপলব্ধি নিয়েই নিজের নিঃস্বতাকে মেনে নেয়। পুলিন শেষে মঞ্জরীর কৌশলেই স্ত্রীকে পায়, প্রেমিকাকে পায় না। এভাবেই তার স্বামী-সত্তা ও প্রেমিক-সত্তার সীমা নিশ্চিত হয়ে ওঠে। পুলিনের প্রেমের গভীর দুঃখ আমাদের তেমনভাবে নাড়া দেয় না। আসলে প্রেমিকা মঞ্জরীর পাশে পুলিন প্রেমিক হিসেবে একান্তই দুর্বল চরিত্র।

অন্য দিকে গোপিনী মঞ্জরীর প্রায় সমান সমান্তরাল প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র। প্রসঙ্গত 'রসকলি' গল্পে গোপিনী সম্পর্কিত সংবাদ-দানে লেখকের কিছু অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করতেই হয়। নানা টানাপোড়েনের পর বৃদ্ধ মোহান্ত, পুলিনের খুড়া রামদাস মঞ্জরীর মা সৌরভীকে কথা দেয় পুলিনের সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে দেবে। ঠিক হয়, হোলির সময় রামদাস শ্রীধাম যাবে এবং ফিরলে বিবাহ হবে। কিন্তু শ্রীধামে রামদাস হঠাৎ তার দীর্ঘদিনের

নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীকে পথের গাছতলায় অসুস্থ শ্রীমতীর পাশে দেখে: 'বারো-তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী বসিয়া অঝোর ঝরে কাঁদিতেছিল।' অথচ গল্পের প্রথমদিকে গল্পকার গোপিনীর পরিচয় দিয়েছেন পুলিনের স্বভাবের কৌতুককর দিকের প্রসঙ্গ ধরে: 'পুলিনের স্ত্রীর বয়স আঠারো-উনিশ, গোলগাল আঁট-সাঁট দেহ, নাম গোপিনী।' গোপিনীর বয়সের এমন ছয়-সাত বছরের ব্যবধানের দিক গল্পের কাহিনী বর্ণনায় কোথাও কোনো কার্য-কারণে সমর্থিত হয় না। যখন শ্রীধাম থেকে এনে পুলিনের সঙ্গে রামদাস বিয়ে দেয় গোপিনীর, তখন যদি বারো-তেরো বয়স হয় তবে, সতেরো-আঠারোয় পা দেওয়ার মধ্যবর্তী বয়সের ব্যাখ্যা গল্পে মেলে না। অসঙ্গতি এখানেই।

যাই হোক, গোপিনীর কাহিনী মধ্যে প্রবেশ ঘটেছে অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ভূমিকায় নায়িকা কুন্দর স্বপ্নে দেখা তার মায়ের নির্দেশের মতো—হীরা ও নগেন্দ্রকে দেখিয়ে তাদের সম্বন্ধে মায়ের সাবধান বাণী উচ্চারণে! শ্রীধামে অসুস্থ শ্রীমতী স্বামী রামদাসকে দেখে গোপিনীকে তার হাতে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবসম্মতভাবেই গোপিনীকে সাবধান বাণী শোনায়: 'আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িসনি, হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।' গোপিনীর মায়ের এমন সতর্কবাণী বিষবৃক্ষের কুন্দর মায়ের কথার অনুরূপ। অবশ্যই শ্রীমতীর শোনানো গোপিনীকে এমন সাবধান বাণী যে গোপিনী পুলিনের সঙ্গে বিবাহের পর অক্ষরে অক্ষরে দৃঢ়চিত্তে পালন করেছে, গোপিনী চরিত্রের ন্যায় তাতে সমর্থন পায়।

পুলিনের বিবাহের পর কিছুদিন বিষণ্ণ থেকে মঞ্জরী নিজেই আসে গোপিনীকে যাচাই করতে। সে চিত্রে মঞ্জরীর প্রতিটি কথার জবাবে গোপিনী যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও স্বাভাবিক স্ত্রীসুলভ ঈর্ষার জ্বালার প্রকাশ ঘটিয়েছে, তাতে বোঝা যায় গোপিনী অনেকটাই মঞ্জরীর ধাতের রমণী। সে মঞ্জরীর মতো নারীর চোখেও জল আনতে সক্ষম। নির্বোধ স্বামীর প্রতি তার তীব্র অভিমান, মঞ্জরীর তাকে 'সাপিনী' বলায় চাপা ক্ষোভ, ক্রোধ, জ্বালা তার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকেই বোঝায়। গোপিনী রাগে, দুঃখে, মঞ্জরীর সঙ্গে কথার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক সময়ে মঞ্জরীর মুখের ওপর ক্রোধে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিতেও নির্দ্বিধ হয়। কিন্তু একসময়ে জমিদারের কাছে সে মঞ্জরীর সখ্যর স্বার্থহীনতাকে ঠিকই উপলব্ধি করে। মঞ্জরীর যে মানস-পরিবর্তন, পুলিনের প্রেমকে মনের গভীরে লালিত ও গোপন করেই সহজে তাকে ছেড়ে যাওয়ার যে গোপন বাসনা, তা তার আচরণেই স্পষ্ট হয় জমিদারের সামনে। গোপিনী মঞ্জরীকে নতুন করে দেখে:

> 'মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।
>
> আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়। গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি! উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি?'

এমন যে নতুন করে দুজনের মধ্যে জমিদারের সামনেই বন্ধুত্বের সূচনা, এখান থেকেই

গল্পের মোড় ফেরে, মোড় ফেরে গোপিনীর ভাগ্যের। মঞ্জরীব দিক থেকে দুজনের সংসার বন্ধন দৃঢ় করে দূরে চলে যাওয়ার 'নান্দী' রচিত হয় পরোক্ষে! পরে পুলিনের বাড়িতে মঞ্জরী দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে গোপিনীর মিত্রতার মন জয় করে, ওদের দুজনকেই মুক্তির স্বাদে বড় সংসার-বন্ধনে বেঁধে দিয়ে চলে যায়। গোপিনীর জীবনে পুলিনকে স্থায়ীভাবে পাওয়া এক বড় পাওয়া, এক বড় জিৎ। গোপিনীর সংসার বাঁধাতেই আনন্দ, মায়ের নির্দেশ সে ঠিক-ঠিক পালন করেছে। অন্যদিকে মঞ্জরী প্রেমের সর্ব মালিন্যহীন চিরকালীন রূপে আত্মমগ্ন থেকে গোপিনীর বিপরীত মেরুর দিকে যাত্রা করেছে। গল্পকারের হাতে দুই নারী দুই রূপে দুই প্রতিমা— একজন গৃহিণী, অন্যজন সন্ন্যাসিনী, একজন প্রেমের আনন্দকে ধরে সীমায়, অন্যজন বাউল প্রাণের অসীমতায়। দুই মেরুর ব্যবধানে এই দুই নারী তারাশঙ্করের অনন্য সৃষ্টি।

'রসকলি' গল্পের বাকি গৌণ চরিত্রের মধ্যে গ্রামের জমিদার— যে 'বাবু' হিসেবে চিহ্নিত, মোহান্ত রামদাস, বলাই ও সৌরভীর প্রসঙ্গ আসে। শ্রীধামে আকস্মিকভাবে শ্রীমতীর সাক্ষাৎ বৃদ্ধ রামদাসের মানস পরিবর্তন ঘটালেও শ্রীমতীর অবতাবণা অবশ্যই মেলোড্রামাটিক। তার অনুশোচনা, স্বামী সম্পর্কে উপলব্ধি এত আকস্মিক যে গল্পেব ও চরিত্রের স্বাভাবিক শিল্পন্যায়কে সমর্থন করে না। সৌরভীর কন্যা মঞ্জরীর প্রতি তার মায়ের স্নেহ গৌণ হয়ে যায় মোহান্ত রামদাসের কাছে টাকা পাওয়ার পর। সে এক অভাবের সংসারের বাস্তব, নীতিহীন মা। জাতে ধোপার মেয়ে, ভেক নিয়েছে বৈষ্ণবীর। গল্পে তার উপস্থিতি মূল ত্রিকোণ প্রেমের গল্পের সঙ্গে নিবিড় যোগে ও ন্যায়ে ধরা নয়। পুলিনের বন্ধু বলাই দাস সুযোগসন্ধানী, জমিদারের তোষামুদে। সুযোগ বুঝে সে পুলিনের বউ গোপিনীকে নিজের করে নিতে চেষ্টা করে। নিজের চেষ্টায় ব্যর্থ হলে জমিদারকে দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চায়। পুলিনকে সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় যুক্তিদান-এর উদ্দেশ্যের মূলেও সেই একই লক্ষ্য। জমিদার অর্থাৎ 'বাবু' চরিত্রটি স্বল্প পরিসরে আঁকা। এই ব্যক্তিটি প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি—যে যুবতী নারীদের ভোগের সামগ্রী ও জমিদারের দান-করা স্থাবর সম্পত্তির মতো ভাবে। সেই কারণেই সে যেমন গোপিনীকে বলে বলাইয়ের সঙ্গে পত্র করতে, তেমনি মঞ্জরীকেও চায় রক্ষিতা হিসেবে। গল্পকার তার সামন্ততান্ত্রিক অনৈতিক ভোগবাদিতা, ভিতরের কুৎসিত স্বভাব ও শাসক-শোষক শ্রেণীর মনোভঙ্গির চিত্র এভাবে জীবন্ত করে এঁকেছেন।

> 'বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন,...আমাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ করে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে,— বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মতো, কেমন যেন বিশ্রী কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।
>
> মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে কী আর বলব?—সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ—। না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না। সে যে যা বলবে বলুক।
>
> বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মত

চীৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী? ভূত সিং লাগাও জুত্তি হারামজাদীকো।'

জমিদারের এই খণ্ডচিত্র গল্পে জীবন্ত এবং পুলিনের ব্যক্তিত্বের বিকাশে, গোপিনী ও মঞ্জরীর মধ্যে 'রসকলি'র নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক। জমিদার যে নিজের আইনের ওপরে দেশের সরকারি পুলিশি আইনকে ভয় পায়, তোষামুদে বলাইয়ের পরামর্শে ও আকস্মিকভাবে নিজেকে সংযত করার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।

'রসকলি' গল্পে বৃদ্ধ মোহান্ত রামদাস বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে আছে। তার জাম্ববান সদৃশ বদ রূপ, স্ত্রী শ্রীমতীর পলায়ন, গৃহী-বৈরাগী সাজলেও সংসারের অর্থ ও সম্পদের প্রবল আকর্ষণে সংসার ত্যাগ না করা, দাদা শ্যামদাসের পুত্র পুলিনকে সস্নেহে মানুষ করা, গোপিনীর সঙ্গে বিবাহদান ও শেষে দুঃখে-ক্ষোভে সমস্ত সম্পত্তি গোপিনীকে দান করে মৃত্যুবরণ—সবটাই এত বিস্তারিত যে তা উপন্যাসেই মানায়, ছোটগল্পের সংহতিকে করে বিনষ্ট। মোহান্ত প্রসঙ্গ যেমন পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর মিলনে সহায়তা করেছে, তেমনি তার বিশাল সম্পত্তি পুলিন ও গোপিনীর মধ্যে এনেছে লক্ষণীয় বিরোধ ও বিবাদ। আর সেই সূত্র ধরে মঞ্জরীকেও পুলিনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার একান্ত সহায়ক হয়েছে। এটাই গল্পকারের একমাত্র লক্ষ্যও। কিন্তু একথা ঠিক, এমন সব গৌণ চরিত্রের ভিড় 'রসকলি' গল্পের সার্থক ছোটগল্পের প্রকরণকে সরিয়ে বড় উপন্যাসের ছক (Scheme)-কে সামনে আনে। তাই শুধু প্লটবৃত্ত নয়, চরিত্রের উপস্থাপনাতেও আছে গল্পকারের যথার্থ ছোটগল্প স্বভাব-বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুতি।

তিন

তারাশঙ্করের মূল লেখক-ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে প্রধানত দুটি সূত্রে— ক. তাঁর রচনায় ব্যবহৃত গ্রামীণ মৃত্তিকাগন্ধী বিশেষ পরিবেশ, পটভূমি অবলম্বন করে; খ. তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রেমহীনতা, জীবনার্তি ও মৃত্যুচেতনা— এসব মিলিয়ে-মিশিয়ে এক রহস্যময় দেখার দৃষ্টিতে। পটভূমি-ধৃত চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাঁর গভীরতম জীবনদর্শন উচ্চকিত। 'রসকলি' লেখকের বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে আবির্ভাবের প্রথম রচনা, এ গল্পেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। আমাদের মতে, 'রসকলি' গল্পে লেখকের দেশভাবনা, কালচেতনা ও জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টি উত্তরকালের স্থায়ী জীবনদর্শনের বীজ ধরিয়ে দেয়।

'রসকলি' গল্পের বিষয়-সম্পদ প্রধানত দুটি দিক থেকে লক্ষণীয়: ১. সেকালের সহজ বৈষ্ণবীয় সমাজের সমস্ত নীতিশাসন-মুক্ত পরকীয়া প্রেম-বিষয় অবলম্বন, ২. তারই অনুবর্তী কয়েকটি জীবন্ত চরিত্র অঙ্কন। 'রসকলি' গল্পের পটভূমি রাঢ়দেশ এবং তার মাটির সঙ্গে নিবিড় যুক্ত, বলা যায় মাটি থেকেই উদ্ভূত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নর-নারীর সামাজিক সমস্ত রকম শাসন-বহির্ভূত হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় সম্পর্ক চিত্রণই গল্পকারের লক্ষ্য। প্রাচীন বৈষ্ণবীয় কালচারের সঙ্গে সম্পর্ক বীরভূমের

দীর্ঘদিনের। এই লাল মাটি বীরভূমেই যেমন বীরাচার তান্ত্রিকদের সাক্ষাৎ মেলে, তেমনি মেলে অজয় নদের তীরের সেই জয়দেবের প্রেমগাথার গোপন গুঞ্জন। বীরভূমেই নানুরে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্মসূত্রে গড়ে ওঠে বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য। তারাশঙ্কর স্বয়ং বলেছেন, বীরভূম হল আউল-বাউল দরবেশেরই দেশ।

এমন প্রেমের কথায় তারাশঙ্কর-কল্পলোকে রাধাকৃষ্ণের স্মরণে এসেছে এক বৈদেহী প্রেমলীলার রসমধুর রূপ। 'রসকলি' গল্পের ত্রিকোণ প্রেমে তারই ব্যঞ্জনা। বাউল-বৈষ্ণব সহজিয়াদের পার্থক্যকে গল্পকার লক্ষ্যে না রেখে তাদের নির্যাসে যেন তত্ত্বহীন, ধর্মহীন, দর্শনহীন এক গভীর বাস্তব মনস্তত্ত্বে নরনারীর চিরকালের প্রেম সম্পর্কের আকাশপ্রদীপ রচনা করেছেন আলোচ্য গল্পে। মঞ্জরী সেই আকাশপ্রদীপ যে বৈষ্ণব হয়েও সে সবের অতীত এক চিরন্তন প্রেমবিগ্রহ! প্রার্থিতকে পেয়েও তাকে ছেড়ে এক গভীর সর্ববিমুক্ত আত্মপ্রেমে নিজেকে অসীমের উদ্দেশে ভাসিয়ে দেওয়ায় যার মধ্যে বিপুল আনন্দ—তার বিস্ময়কর রূপকে অন্তর্গূঢ় করেছেন গল্পকার আলোচ্য গল্পের ত্রিকোণ প্রেমের জটে ও জট-মুক্ত পরিণামে।

'রসকলি' গল্পে প্রেম আছে বৈষ্ণবীয় ধর্মে, দর্শনে, তত্ত্বে নয়, বৈষ্ণবীয় সম্পর্কে এবং তা তাই হয় সর্বজনীন। এখানেই তারাশঙ্করের শিল্পী-মনের যে দর্শন তার বীজ ধবা পড়ে। তারাশঙ্কর নিজে ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন জমিদার বাড়ির সন্তান। জমিদারি সীমার মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন কমলিনী বৈরাগীকে। সে যে ব্যক্তি তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তারই আর এক রূপ শিল্পীর কলমে আঁকা মঞ্জরী। গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝেই বৈষ্ণবীয় সমাজবৈশিষ্ট্য, নর-নারীর বিবাহধর্ম ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গল্পকার বীরভূমের আঞ্চলিক জীবনের বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের স্বরূপ ও যথোচিত প্রয়োজনীয় পরিবেশ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বৈষ্ণবদের এক শ্রেণীর রমণীরা সহজেই স্বামীত্যাগ করতে পারে, অবাধ মেলামেশায় দয়িতকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করার সুযোগ পায়, আবার যে কোনো বয়সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনের আশ্রয় গ্রহণে বিমুখ হয় না। সংসারে থেকেও সংসার-বিরাগী হতে পারে রাঙানো বসনে-মনে। এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই 'রসকলি' গল্পের মঞ্জরী সব ছেড়ে রসোচ্ছল যৌবনেই বৃহত্তর এক প্রেমের শান্তিতে বাউল মনে অনির্দিষ্টের পথে যায়। পুলিনকে নিজের করে পেয়েও, লোভে আর্তিতে স্পর্শ-সুখেও কোনো যৌনতার মধ্যে যায়নি মঞ্জরী, চোখের জলে প্রেম ভিজিয়ে একা রাত কাটায় তারই ঢেঁকিঘরে। এই যে চরিত্র-কল্পনা—তা তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের সঙ্গে সম্যকভাবে মেশানো। এমন যে আঞ্চলিক জীবন ও বিশেষ দেশজ ধর্মের সঙ্গে যোগে নর-নারীর চরিত্র এঁকে এক শিল্পীর নিজস্ব একটি জীবন-ব্যাখ্যাকে পাঠকদের সামনে অবলীলায় তুলে ধরার প্রয়াস, তা গল্পকারের পরবর্তী একাধিক রচনায় আরও বিস্তারিত হয়েছে ভিন্ন আধারে ভিন্ন আধেয়কে নিয়ে। 'রসকলি' গল্প গল্পকার তারাশঙ্করের প্রথম পথিকৃৎ রচনা, কিন্তু তা তাঁর জীবনদর্শনের উৎসমুখ চিহ্নিত করে।

চার

'রসকলি' গল্পের প্রকরণ-শৈথিল্য যে স্পষ্ট, আমরা আগে প্রসঙ্গত বলেছি। 'রসকলি'-র মধ্যে, গল্পের ভাবগত একমুখিনতা রক্ষা গল্পকারের যে অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত, তা মানা হয়নি। গল্পটি গোপিনী-পুলিন-মঞ্জরীর ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা ও সংকটের কেন্দ্রেই পাঠকদের নিয়ে যায়। কিন্তু সেই ত্রিকোণ প্রেমের জটিলতার শুরু ও শেষ ধরতে গিয়ে গল্পকার একাধিক ছোট ছোট episode এনেছেন, যেগুলির মধ্যে আবার কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র গল্পের আকার পেতে পারে। বৃদ্ধ মোহান্ত রামদাস-শ্রীমতীর কাহিনী-আভাস, সৌরভী-মঞ্জরী-পুলিনের প্রসঙ্গ, গোপিনী-বলাই দাস সম্পর্ক ভাবনা, এমনকি জমিদার-মঞ্জরীর আকর্ষণও কিছু —এইসব খণ্ডচিত্রের স্বভাব পায়। এগুলির উপস্থাপনা নিশ্চয়ই গল্পকে আকর্ষণীয় করলেও সচেতন পাঠকের কাছে তাদের শিল্প-সীমার প্রয়োজনকে অবধারিত মনে করায় না।

বস্তুত ভাবের একমুখিনতা মঞ্জরী চরিত্র ধরে ঠিক আছে, কিন্তু গল্পের অবয়বে অনাবশ্যক অতি-বিস্তার গল্পটিকে আকারে যেমন দীর্ঘ করেছে, তেমনি বৃত্তান্তের প্রবণতা ও বিবৃতিমূলকতা গল্পের সংযমকে করেছে বিনষ্ট। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, গল্পের যেখানে রাতে পুলিনকে নিজের করে বিছানা পেতে শুইয়ে বাইরে থেকে শিকল এঁটে মঞ্জরী নিজের ঢেঁকিঘরে সজল চোখে রাত কাটায়, গল্পটি সেখানেই শেষ হলে ভাল হত। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ মঞ্জরী চরিত্রের ও তার কাহিনীর ভারসাম্য পুলিন-গোপিনীর সংসার বন্ধনে মিলন ঘটানো ও মঞ্জরীর সর্বরিক্ত হয়ে গান গাইতে গাইতে অনির্দেশের দিকে যাওয়াতেই সম্ভব। গল্পকারের লক্ষ্য ও চরিত্রন্যায়—দু'দিক থেকে এটাই কাম্য। গল্পকার তা-ই সম্ভব করেছেন গল্পের পরবর্তী ও পরিণতি-চিত্রের ব্যঞ্জনায়।

প্রকরণের শৈথিল্য ত্রিকোণ প্রেমের জটে নেই, আছে ইঙ্গিতধর্মবর্জিত কাহিনীর বিবৃতিমূলকতার মধ্যেই। আসলে এর এই সীমা এসেছে গল্পের মধ্যে উপন্যাসের ছক অন্তরালে সক্রিয় থাকার কারণে। আমরা মনে করি, উপন্যাসের কাঠামোগত পরিকল্পনার কোনো অংশ যদি গল্পের অবয়বে থাকে, সে গল্প নিখুঁত ছোটগল্পের মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। 'রসকলি'র প্রকরণ সৌষ্ঠব এই অর্থে ব্যাহত। এ গল্পের সম্পদ হল প্রেম-মনস্তত্ত্ব—যা গোপিনী-মঞ্জরী, পুলিন-মঞ্জরী, পুলিন-গোপিনীর সম্পর্ক ধরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এগুলি ছাড়া গল্পের বাকি অংশ নিশ্চয়ই সংক্ষিপ্ত সংযত হয়ে মূল মনস্তত্ত্বের জটিলতাকে তির্যক তীব্রতম করতে পারত। 'রসকলি' গল্পে তার অভাব প্রকরণ শৈথিল্যের অন্যতম প্রমাণ।

'রসকলি' গল্পের ভাষা অবশ্যই বিষয়ের উপযোগী। ভাষার যথাযথ শিল্পসম্মত সহযোগিতা থাকার জন্যই মঞ্জরী, গোপিনী চরিত্র অন্তঃস্বভাবে হয়েছে নিখুঁত, তাদের মনস্তত্ত্ব হয়েছে জটিল সংঘর্ষ-চিত্র রচনার অনুবর্তী। কিন্তু গল্পের প্রথম দিকে তারাশঙ্কর পুলিনের অন্তরঙ্গ স্বভাব বর্ণনায় যে কৌতুকরসের প্রবাহ এনেছেন, তা গল্পের মুল লক্ষ্য ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখায় না। অতিকথনদোষে তা হয়েছে দুষ্ট, অর্থাৎ কৌতুকরসের মূল অসঙ্গতির দিক খণ্ডচিত্রের মর্যাদায় অসামান্য। গল্পকার গল্পে একাধিক

ব্যাখ্যামূলক উপমা ব্যবহার করেছেন। এগুলি গল্পে চরিত্র ও তার বিশেষ মানসিকতা বোঝাতে অমোঘ ব্যঞ্জনার প্রকাশক:

১. 'লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।' (মঞ্জরীর স্বভাবের দৃঢ়তা বোঝাতে)

২. 'গর্তের মধ্যে সাপ ধরা পড়িবার পূর্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া যেমন ঘোরে, তেমন ভাবেই তাহার মন পাক খাইতেছিল।' (গোপিনীকে জমিদারের নির্দেশসূচক অপমান-বাক্য ব্যবহারে পুলিনের প্রতিক্রিয়া বোঝাতে)

৩. 'বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মতো, কেমন যেন বিশ্রী কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।' (জমিদাবের নারীলোলুপ নোংরা স্বভাব বোঝাতে)

৪. 'বদ্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গল খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না, খুলিয়া যায়। পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল,...' (পুলিনের মনে মঞ্জরীর প্রতি জমিদারের অসম্মানজনক উক্তিব প্রবলতম প্রতিক্রিয়া বোঝাতে)

এমন সব বাক্যের বিস্তারিত উপমাচিত্র 'রসকলি' গল্পের ভাষারীতির অনুগ উজ্জ্বল মণিখণ্ড।

'রসকলি' গল্পের শেষতম বাক্যটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাগর্ভ, কিন্তু তা মূল নায়িকাচরিত্র-দ্যোতনায় সুন্দরতম। প্রেমের যে সর্ববিমুক্ত, রিক্ত, শুদ্ধ দৈবরূপ, যা অসীমকে বরণে টানে, যা বিষাদের নয়, চিরযৌবনেব রোমান্টিক স্বভাবে শুভশ্রীমণ্ডিত, মঞ্জরীর শেষ বিদায়চিত্রের এমন বাক্যপ্রয়োগ গল্পেব শেযকে, 'শেয হয়ে না হইল শেষ'-এর রহস্যকে অপার মহিমা দেয়। মঞ্জরীর যে আত্মত্যাগ, বাস্তব-জীবনরিক্ত আর্তি তা পুলিনের প্রেম না পাওয়ার জন্য যেন নয়, তা তো তুচ্ছ, তা প্রেমের দুই রূপ—ভোগসর্বস্ব ও ভোগাতীত—এদের প্রথমটিকে অবলীলায় অস্বীকার করে দ্বিতীয়টিকে সহাস্যে অনন্ত যৌবন স্বভাবে বরণেই মহৎ মূল্য পায়। শেয বিদায়চিত্র মঞ্জরীর গানে বৈষ্ণবীয় প্রেমের গূঢ়তা আনে, কিন্তু গাঢ়তা পায় এক বিস্ময়কর মানবী প্রাণের পৌরুষ দীপ্তির শুকতারা স্বভাবে:

'নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।'

শেষের এই চিত্রাত্মক ভাষার সুদূরশায়ী আকর্ষণ গল্পের পরিণতির অনন্ত শিল্পসুযমা ধরায়। সেই সঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণীয়। তারাশঙ্করের লেখায় থাকে নাটকীয়তা। ত্রিকোণ প্রেমের ছকে তিন প্রধান চরিত্রের সংলাপে ও সংঘর্ষচিত্রের নাটকীয়তা শিল্পসম্মত এবং মনস্তত্ত্বের বিস্তারে অনবদ্য। নাটকীয়তা গল্পের চমৎকার গতি সৃষ্টি করেছে। 'রসকলি' গল্পে তা সুপ্রযুক্ত।

পাঁচ

'রসকলি' শব্দটি বৈষ্ণবীয় ধর্মের আচারে আচরণে মেলে। বৈষ্ণবী তার নাকের শীর্ষে গোপীচন্দন রসের পুষ্পকলিকার আকারে যে তিলক আঁকে, তা-ই রসকলি। বস্তুত, রসকলি মিত্রতার প্রতীক —অন্তত তারাশঙ্কর তাঁর 'রসকলি' গল্পে এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করেছেন চরিত্রগুলির পরস্পরের সম্পর্কভাবনায়। ধোপার মেয়ে সৌরভী ভেক নিয়ে বৈষ্ণবী হলেও তার মেয়ে মঞ্জরী যথার্থ বৈষ্ণবীর মতোই 'নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা।' পুলিন মঞ্জরীর বাল্যসাথী এবং মঞ্জরীর বাড়ি পুলিনের যাতায়াত আছে। দুজনে 'রসকলি' পাতিয়েছে। পুলিন মঞ্জরীকে রসকলি সম্বোধন করে, মঞ্জরীও পুলিনকে। তাই পরস্পরের মিত্রতার প্রতীকে গল্পের নামে 'রসকলি' শব্দপ্রয়োগে তাৎপর্যের একটা প্রাথমিক অর্থ মেলে।

দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা হল, মঞ্জরী চরিত্রই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। তাকে 'রসকলি' সম্পর্কের প্রধান মর্যাদা দিয়ে গল্পকার তার বৈষ্ণবীয় আচার-আচরণ ও মানসিকতার চরম রূপ এঁকেছেন। গল্পে মঞ্জরীর যে তৎপরতা—পুলিনের সঙ্গে এবং পরে গোপিনীর সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে, তাতে এমন শীর্ষনাম যথোচিত সমর্থন পায়।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা রাখা যায় গোপিনীর সঙ্গে মঞ্জরীর ঘনিষ্ঠতার চিত্রে। সেই সঙ্গে পুলিনও জড়িত থাকে। অর্থাৎ গল্পের শেষে যেনবা পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর সম্পর্কের শেষ সিদ্ধান্ত বোঝায় মঞ্জরী সেই চিত্রে। সেখানে 'রসকলি' এঁকে অন্তরঙ্গ হওযাটাই প্রধান সম্পর্ক-সূত্র। জমিদার বাড়ি থেকে পুলিন ও গোপিনীকে নিয়ে আসার পর পুলিনের বাড়িতেই মঞ্জরীর এক রহস্যময় সক্রিয়তার পবিচয় মেলে:

> '....মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন নেশায ভোর হইয়া বসিয়া ছিল। সহসা হাসিয়া সে কহিল, রসকলি!
>
> গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিযাদের হাসি, যেমন মলিন ফুলটি।
>
> মঞ্জরী বলিল, এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছ, 'না' বললে তো চলবে না।
>
> গোপিনী কহিল, হ্যাঁ।
>
> মঞ্জরী বলিল, তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমায় দিই,— যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—
>
> তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁযিয়া বসিয়া কহিল, তুমি ভাই আগে বলেছ, আগে তোমার পালা দাও, আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও। বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।
>
> হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।....
>
> পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্তবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।
>
> পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল, আমি দিচ্ছি, 'না' বোলো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত, নির্বাক।'

এই চিত্রের আগে জমিদারেব দম্ভ অহংকারের সামনে একটি চিত্র আছে গোপিনীর স্বভাবের:

'....মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়; গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি।

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি?'

এই চিত্রে আছে ভয়ঙ্কর ভয়ের মধ্যে গোপিনীর মঞ্জরীর ওপর ভরসা পাওয়ার দিক, আর মঞ্জরীর আছে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়ে মঞ্জরীর মালিন্যহীন উন্মুক্ত অন্তরঙ্গতার চিত্র। আগের চিত্র তারই ধারাবাহিক পরিণতি। এর আগের চিত্রটিতে নিজের প্রিয়তম পুলিনের হাতে সহজেই গোপিনীকে দিয়ে দেওয়ার মধ্যে মঞ্জরী বুঝিবা তার নিজেরই প্রেমের বিকল্পকে ভেবেছে গোপিনীর মধ্য দিয়ে! এই ব্যঞ্জনায় গল্পের নামের অর্থগত সীমা অনেক বেড়ে যায়।

আমাদের মতে, চতুর্থ অর্থাৎ শেষ একটি ব্যাখ্যার সূত্রও নামের গভীরে মেলে। গোপিনী যখন স্বাভাবিকভাবেই অদ্ভুত সন্ধিস্থাপনে পুলিন ও নিজের জীবনের মধ্যে মঞ্জরীকে ডেকে বলে:

'. ...তুমি সুদ্ধ এসো আমরা দু বোনে—

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলাব মতোই কহিল, দূর আমি যে রসকলি।'

এখানে রসকলি হওয়ার বড় দায়িত্ব মঞ্জরী নিজেই নিজের কাছে নিয়ে নেয়। মঞ্জরীর এই যে পরিবর্তন, তা প্রমাণ করে, গল্পের নামে যে 'রসকলি' শব্দ, তা গল্পকারের গভীর বাসনামতো মঞ্জরীই। বাস্তব সংসারে রসকলির সম্পর্ক মঞ্জরী মীমাংসা করে দিয়েছে পুলিন-গোপিনীর সংসার-বন্ধনের ব্যবস্থায়। এবার সে নিজে রসকলি। তার মধ্যে বিষাদ নেই, বেদনা নেই, সর্বরিক্ত, সর্ববন্ধনতুচ্ছ এক বাউল জীবনের সে অনুগামিনী, সে সুদূরের পিয়াসী। তার স্বভাবে আছে সত্যিকারের এক বৈষ্ণবীয় তত্ত্বহীন রোমান্টিক প্রেমের আকুতি। রাধা বৈষ্ণবেব, তার ধর্মের, কিন্তু রাধার মধ্যে আর একটা দিক থাকে, তার ব্যক্তিক প্রেম-যন্ত্রণার, তার এক নিঃসঙ্গ আধ্যাত্মিকতাব। গল্পকারের এই বিশেষ ব্যাখ্যা মঞ্জরীর নিজস্ব রসকলি সত্তায় একমাত্র সত্য হয়েছে। তার শেষের গানটি: 'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী/সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,/আমি গরবিনী।' এখানে রসকলি মঞ্জরী চিরকালীন প্রেমের প্রতীক হয়ে যায়। তার গানই এই গল্পের ধুয়া, লক্ষ্যও। আর তার প্রতিমা-রূপ, মঞ্জরীতে মঞ্জরীর নিজস্ব রসকলি সত্তায়। এই বিশেষ মঞ্জরীর নির্বিশেষ 'রসকলি' হওয়ার মধ্যেই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের ব্যঞ্জনা, চরিত্রটির প্রেমের বিস্ময়কর বিশালতা। এই গল্পের নাম বড় ব্যঞ্জনায় সার্থক।

৫.

কালাপাহাড়

এক

তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' গল্পটির প্রকাশকাল তেরশো পঁয়তাল্লিশের বৈশাখ। সে সময়ে লেখকের 'রসকলি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তারই একটি অন্যতম গল্প 'কালাপাহাড়'। গ্রন্থের প্রকাশকাল দেখে বোঝা যায়, গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের রচনা। এই গল্পটি পোষমানা একটি মহিষের মানব-স্বভাব-সমুখ অন্তর্যন্ত্রণা ও তার বিষাদঘন পরিণতির কথাই শোনায়। এমন গল্পের আগে বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'—একটি ষাঁড়কে নিয়ে লেখা গল্প। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'আদরিণী' গল্প। তারাশঙ্করের সমকালে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'বুধীর বাড়ী ফেরা' গল্প—সেখানে বুধী নামের একটি গাভীর মৃত্যুভয় ও তার পুরনো প্রভুর গোয়ালে শেষে ফিরে আসার চিত্র আঁকা হয়েছে রুদ্ধশ্বাস গল্প-বৈশিষ্ট্যে। বিভূতিভূষণ এমন পশুর স্বভাবের অন্তর্নিহিত পোষ্য-হওয়ার স্নেহমমতা-সম্পর্কের বন্ধনকে দেখিয়েছেন, অবশ্যই গৌণ সংক্ষিপ্ত চিত্রে, 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে। পশুর পোষ্য হওয়ার প্রসঙ্গ আছে সেখানে।

'কালাপাহাড়' গল্পের কাহিনী-নির্যাস অংশটি ঘটনাবহুল এবং সংক্ষিপ্ত। প্রথম শ্রেণীর জমি ও বিপুল পরিমাণে জোতজমার অধিকারী বড় সম্পন্ন এক চাষী রংলাল তার চাষের উন্নতির জন্য ও প্রতিবেশীদের কাছে তার গরুর আভিজাত্য প্রমাণ করতে গরু-মহিষের হাটে নতুন একজোড়া গরু কিনতে গিয়ে খুব পছন্দ হওয়ায় একজোড়া বিশালকায় মহিষই কিনে আনে। পুত্র যশোদা ও স্ত্রীর অপছন্দের মধ্যেই সে তাদের প্রথাবিহিত আড়ম্বরেই ঘরে তোলে। নিজেই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, মাঠে তাদের চরাতে নিয়ে যায়। তাদের দুটির নাম দিয়েছে রংলাল কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ। মহিষ দুটি খুবই দুরন্ত, বলবান, কিন্তু একমাত্র রংলালের শাসনে-স্নেহে তারা একান্ত বশীভূত। রংলাল মহিষের ডাকের অনুকরণ করে ডাকলে তারাও সেই শব্দ করতে করতে কাছে আসে। তাদের দিয়ে চাষ করিয়ে চাষের উন্নতিতে রংলাল খুশি। মাঝে মাঝে কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ পরস্পর যুদ্ধে মাতলে রংলাল হাতের লাঠির শাসনে শাস্তি আর স্নেহ দিয়ে মিটিয়ে দেয়। এইভাবে বছর তিনেক কেটে যাবার পর একদিন মাঠের মধ্যে চিতাবাঘ আসায় এবং রংলালকেই আক্রমণ করার আগে কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ এগিয়ে আসে তাদের প্রভুকে বাঁচাতে। রংলাল বাঁচে, কিন্তু চিতাবাঘ যেমন মারা যায়, তেমনি প্রভুর দিকে সজল চোখে তাকিয়ে বাঘের কামড়ে কুম্ভকর্ণও মারা গেল।

এর পর নিঃসঙ্গ কালাপাহাড়কে নিয়েই রংলালের হয় মহাবিপত্তি। কালাপাহাড় কুম্ভকর্ণ চলে যাওয়ায় ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং একা। সে তার একমাত্র প্রভুকে ছাড়া আর কাউকে সহ্য করতে পারে না। রংলাল মহিষের জোড় করার জন্য বেশি দামেই আর একটি মহিষ কিনে আনে। কালাপাহাড়ের কাছে সে-ও একেবারেই অসহ্য। কালাপাহাড় রংলাল নিযুক্ত

রাখালকেও সহ্য করতে পারে না। সে কেবল ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ডাকে, কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। একসময় একটি গরুর বাছুরকেও — যে আগে কুম্ভকর্ণ আর ওর কাছ থেকে স্নেহ পেয়ে এসেছে—মেরে ফেলে।

যখন কিছুতেই আর তাকে সামলানো যাচ্ছে না, তখন রংলালের ছেলে যশোদা কালাপাহাড়কে এক পাইকারীর কাছে বিক্রি করে অল্প টাকায়। রংলাল ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হয়। কিন্তু পাইকারের কাছেও কালাপাহাড় থাকতে চায় না, তার সঙ্গে যেতেও চায় না, তাকেও মারতে যায়। আবার ফিরে আসে রংলালের কাছে। শেষে রংলাল এমন পাগলাটে মহিষকে ভিন্ন এক হাটে বিক্রি করে কালাপাহাড়কে বুঝতে না দিয়ে ট্রেনে ফিরে আসে। কালাপাহাড় পরে নতুন ক্রেতার কাছ থেকে দড়ি ছিঁড়ে রংলাল ও তার পুরনো আস্তানার খোঁজে পালাতে থাকে। পথ ভুল করে ঢোকে জনবহুল শহরের রাস্তায়। সেখানেই মোটব গাড়ির চালক সাহেবের রিভলবারের গুলিতে প্রাণ দেয়। এমন দুঃখজনক মৃত্যুতেই কালাপাহাড় গল্পের শেষ।

গল্পেব প্লটবৃত্ত আদৌ জটিল নয়। টানা কাহিনী আছে এবং কাহিনীর মধ্যে গল্প জমানোর মতো ছোটবড় ঘটনাও প্রকট। গল্পটির কাহিনী ও ঘটনা-মিশ্রিত প্লটের অবয়ব অনেকটাই 'টেল'-ধর্মী। প্লটে লেখকেব নিছক বর্ণনা ও বানানোব স্বভাব প্লটকে সহজ ও একমুখিন করেছে। আধুনিক ছোটগল্পের প্লটে যে কাহিনী ও ঘটনার মূল চরিত্রকেন্দ্রিক জটিল-যৌগিক মিশ্রণ থাকে, 'কালাপাহাড়' গল্পের প্লটে তা আদৌ নেই। গল্পের প্লটের পরিকাঠামোয় পুত্র যশোদারঞ্জন ও রংলালের স্ত্রীর কোনো বড় ভূমিকাও নেই। তারা গল্প থেকে বর্জিত হলে গল্পের কাঠামো যেমন কাহিনী ও ঘটনার ঘন বুননে শিল্পের সংযম পেত, তেমনি গল্পের সর্বাবয়বের শৈথিল্য এড়ানো সহজ হত। গল্পের প্রথম দিকে রংলালের গো-মহিষ হাটে গরু কেনার জন্য যাওয়ার আগে পর্যন্ত অংশটি এক নিখুঁত গল্পের প্রকরণে ও গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মী সিদ্ধান্তে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, অকারণ বর্ধিত, বিবৃত।

প্লটবৃত্তে তারাশঙ্কর ঘটনাকালের মধ্যে তিন বছরের সময়কে ব্যবহাব করেছেন। এর ফলে গল্পের প্রকরণ-সৌষ্ঠব টেল-ধর্মী শিল্প-স্বভাবে আধুনিক প্লটকে অস্বীকার করেছে, কোনো জটিল মনস্তত্ত্ব নেই। রংলাল ও কালাপাহাড় চরিত্র দুটি এত স্পষ্ট ও মানবসম্পর্কে এমন এক সত্যকে ধরায় যা বহু-আচরিত এবং ছোটগল্পেব অসীম ব্যঞ্জনার শিল্প-চমক বহির্ভূত। তাই গল্পের শেষে কাহিনীর পরিণতির চিত্রেই এমন একটি তীব্র এ্যাডভেঞ্চার-ধর্মী ঘটনা ঘটিয়েছেন লেখক, যেখানে গল্পের চরম মুহূর্ত ও পরিণামী ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মহামুহূর্ত' এ গল্পে স্বতন্ত্র শিল্প-আভিজাত্যে আসেনি। কাহিনী ধরেই মোটা দাগের ঘটনার আকস্মিকতায় তার পরিচয় মেলে। গল্পটির প্লট তার কাহিনীর শৈথিল্যে জটিলতার চমৎকারিত্ব হারিয়েছে! অনেক জায়গাতেই গল্পের প্লটে আছে অতিনাটকীয়তা— যা বাইবের রূপ-প্রকরণ, ব্যঞ্জনার আদৌ অনুগত নয়।

নাটকীয়তার কারণেই গল্পে এসেছে চিতাবাঘকে দিয়ে কুম্ভকর্ণের শোচনীয় মৃত্যু ঘটানো।

এ যেন রূপকথার বাঘ-মানুষের গল্পের আমেজ আনে। কাহিনীর আবহে লেখক তিনবছরের ব্যবধান দিয়ে গল্প শোনানোর ব্যবস্থা করায় গল্পের যে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের একমুখিন স্বভাব, তার ঘটেছে সম্যক বিনষ্টি। গল্পটি অবশ্যই চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প— অন্তত শ্রেণীগত বিচারে। কিন্তু কুম্ভকর্ণের মৃত্যু না ঘটলে কালাপাহাড়কে গল্পের ব্যঞ্জনায় ধরা যাবে না যে — একথা তারাশঙ্কর জানতেন। তাতে কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গল্পাংশ শিল্পের দিক থেকে এতই প্রয়োজনহীন বিস্তারে আমাদের সামনে আসে যে গল্পপাঠের যে বিস্ময় ও মোহ, যে চমৎকারিত্বের বিভা— তা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। গল্পের প্লটে জমিয়ে তোলার মতো কাহিনীর উপযোগী উপকরণ আছে, আছে ঘটনার চড়া রঙ, কিন্তু সবই কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে ব্যঞ্জনায় সীমাতিশায়ী করে না বলেই প্লটবৃত্তটি শুধুমাত্র কাহিনীর পরিণামকেই আলোকিত করে, চরিত্রের অন্তরলোকের বা স্বভাবের বিস্ময়কর উদ্ভাসকে অথবা লেখকের জীবনভাবনার তির্যক রূপদানে ততটা সহায়তা করে না।

দুই

'কালাপাহাড়' গল্পের চরিত্র উপস্থাপনা ও পরিকল্পনা বাহির থেকে ভিতরের স্বভাবের ব্যঞ্জনায় একাধিক কোনো অর্থের মাত্রা আনে না। গল্পে রংলালের ম্যাট্রিক পাস ছেলে যশোদারঞ্জন ও তার মায়ের ভূমিকা সার্থক গৌণ চরিত্র হিসেবেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ব্যর্থতা গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য ও প্রধান চরিত্র দুটির স্বভাব-উন্মোচনের শিল্প-তাৎপর্যগত অক্ষমতার কারণে। গল্পটি পড়েই বোঝা যায়, চরিত্র দুটি গল্পে না থাকলে কোনো ক্ষতিই হত না। এরা গল্পের কাহিনী ও ঘটনা দিয়ে গড়া প্লটের অবয়বেও যুক্ত হতে পারেনি।

গল্পের অন্যতম চরিত্র রংলাল। সে সম্পন্ন, বোদ্ধা, পরিশ্রমী চাষী। চাষ কিভাবে ভাল হয়, মাটি থেকে কিভাবে ভাল ফসল তোলা যায় বোঝে :

> 'রংলাল বেশ বড় চাষী,..... চাষের ওপর যত্ন অপরিসীম। কেবল যেমন বলশালী প্রকাণ্ড তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মতো—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখন অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ।'

যে চাষীর এরকম শখ, সে কিন্তু বাজারে গিয়ে গরু না কিনে মহিষই পছন্দ করে। লেখকের বর্ণনার সঙ্গে তার গল্পের মধ্যেকার আচরণে কিছুটা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। রংলাল গরু কেনার ব্যাপারে ছেলে যশোদার মতের বিরোধী হয় এবং তার এই বিরোধিতা শুধু গল্প কেন, রংলাল চরিত্রেও কোনো বড় ছাপ বা প্রভাব রাখে না, যা চরিত্রের কোনো শিল্পগত-অভাবকে পূরণ করে।

লেখক গল্পের মধ্যে বাজার থেকে মহিষ দুটি কিনে ফেরার পথে রংলালের কল্প-জগৎকে যথার্থ যোগ্য চাষীর মর্যাদায় এভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন:

> 'মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে— মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো

করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।'

একজন যোগ্য চাষীর মৃত্তিকাপ্রীতি ও ভূমিচাষের দায়িত্ববোধ এখানে বর্ণনায় অপূর্বত্ব পায়। আবার এই রংলাল মহিষ দুটিকে যখন কাজে লাগায় চাষের, তখনকার লেখকচিত্রিত ভাষারূপ রংলালেরই কৃষকপ্রাণের পক্ষে প্রামাণ্য হয়:

'মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলার ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে; রংলাল হাসে।'

এইভাবে তারাশঙ্কর রংলালের কৃষকপ্রাণের প্রতি আমাদের যে কৌতূহল জাগিয়েছেন, কালাপাহাড়ের সঙ্গে তার সম্পর্কে সেই কৌতূহলকে নির্দিষ্ট করেননি, তাকে সরিয়ে কালাপাহাড়ের সঙ্গে তার হৃদয় সম্পর্ককেই বড় করে তুলেছেন— যা চাষের পদ্ধতি ও জমির সঙ্গে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্য ব্যঞ্জনা আনে না। এখানেই, এক সমালোচক-কথিত— পাঠকের 'কৌতূহল মনুষ্য ও পশুজগতের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত' হয়ে 'রসানুভূতিতে বাধা' পেয়েছে।

কালাপাহাড়ের সঙ্গে রংলালের যে সম্পর্ক তা কৃষকশ্রেণীর কোনো সমস্যা নয়— যা 'মহেশ' গল্পে মহেশের সঙ্গে গফুরের ছিল প্রত্যক্ষভাবে। কৃষক সত্তা ও ব্যক্তিগত হৃদয় সত্তার যে মিশ্রণ গফুরের মধ্যে ছিল, তারাশঙ্করের রংলাল চরিত্রে তা নেই। এই অর্থে রংলাল একমাত্রিক চরিত্র। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে পোষমানানো রংলালের প্রধান কাজ। এটা তার কাছে এক গভীর নেশা। দুটি মহিষই তার একান্ত অনুগত হয়ে ওঠে। তার পোষ মানানোর কারণেই মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে; কুম্ভকর্ণের চোখে জল আসে, কালাপাহাড় একমাত্র তার বর্তমান প্রভু রংলাল ছাড়া কারোর কাছেই যেতে অনীহ। পুত্র যশোদা রংলালের অপেক্ষা না করেই কালাপাহাড়কে বিক্রয় করলে রংলাল ব্যথা পায় ঠিকই, কিন্তু অর্থ-ক্ষতি ও চাষেব ক্ষতির থেকে কালাপাহাড়ের প্রতি মমতাই তাকে বেশি ধরে রাখে। রংলাল তাকে শেষ পাইকারের কাছে বিক্রি করে কালাপাহাড়কে লুকিয়ে ট্রেনে চেপে পালিয়ে আসে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুর মহেশের জন্যই বাস্তুভিটা, গ্রাম ত্যাগ করে শ্রমিক হওয়ার কথা ভাবে, কাজেও সেদিকে গন্তব্য ঠিক করে। রংলাল তা নয়। সেরকম কোনো ডাইমেনশান বংলাল চরিত্রে নেই। পশুপ্রীতিতে রংলাল পালক হিসেবে তার চরিত্র-মাত্রা বাড়ালেও কৃষক রংলালের মানসিকতা থেকে যে বিচ্যুতি, তা তার চরিত্রের অন্য সীমা দেয়।

কেন্দ্রীয় চরিত্র কালাপাহাড়। তার সক্রিয়তা একেবারে গল্পের কাহিনী ও ঘটনার বেশ কিছুটা বিস্তৃতির পর। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ— দুজনেরই সমান পরিচয় রংলালের স্নেহধন্য হয়ে ওঠার চারিত্র্যে। সেখানে স্বতন্ত্র কোনো স্বভাব তার নেই। রংলালকে

চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে চিতাবাঘের সংঘর্ষের কালে কালাপাহাড়ও প্রভুভক্তির কারণে এবং সঙ্গী কুম্ভকর্ণকে সাহায্য করতে তৎপর হয়। কুম্ভকর্ণ মারা যাওয়ার পর থেকেই কালাপাহাড় পাঠকদের সামনে আসে তার একান্ত নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগত মেজাজ, মর্জি ও স্বভাব নিয়ে।

কালাপাহাড়ের একাকীত্ববোধ কুম্ভকর্ণর না থাকার কারণে ঠিকই, কিন্তু অন্য মহিষ এনে তার পাশে রেখেও রংলাল তার এমন নিঃসঙ্গতা সরাতে পারেনি। এখানেই কালাপাহাড় চরিত্রের লক্ষণীয় দিক। কালাপাহাড়ের যে প্রভুভক্তি, তার পাশাপাশি আরও বেশি তীব্র ও একক হয়ে আছে কুম্ভকর্ণের স্মৃতি ও বেদনাবোধ। সেই রাগে সে তার কোনো ক্রেতা ও পাইকারকেও পাত্তা দেয়নি। কালাপাহাড় চরিত্র আঁকায় এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব। একটা মূক প্রাণী, আদিম প্রকৃতির স্বভাবে তার সঙ্গীর বিচ্ছেদে যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার স্বজাতীয় সঙ্গপ্রীতি যে কত বন্য, আদিম হতে পারে, কালাপাহাড় তা প্রমাণ করে। তার ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কুম্ভকর্ণের অনুসন্ধান প্রয়াস, দড়ি ছিঁড়ে ডাকতে ডাকতে নদীর ধারে চলে যাওয়া, রংলাল ছাড়া অন্য যে কাউকে চরম অস্বীকার করা, আগের মধুর সম্পর্কের একটি গোশাবককে পর্যন্ত রাগে মেরে ফেলার সক্রিয়তার মধ্যে তারাশঙ্কর আদিম প্রাণীর স্বাভাবিক অথচ উদগ্র প্রীতির দিক জীবন্ত মানব ব্যবহারের অনুরূপ মাত্রা যোগ করেছেন। সর্বশেষ রংলালের ও তার পুরনো আস্তানার খোঁজ না পেয়ে শহরে প্রবেশের কারণে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। কালাপাহাড় চরিত্রটির পরিণামী সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, এ গল্পে রংলাল চাষীর কৃষকজীবন মূল লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল, আদিম প্রাণীর মধ্যেও মানব লীলার আদিম দিকের প্রতিচিত্রণ, তার যে Inner force তা সভ্য মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ করা দুরূহ। সে শক্তি ভীষণ এবং অপ্রতিরোধ্য এই শক্তিকে মানুষ না বুঝেই তার ধ্বংস সাধনে ব্যস্ত হয়, কালাপাহাড়ের বিষাদময় পরিণতি ঘটে যান্ত্রিক শক্তির বীভৎসতার কাছে।

তিন

প্রকৃতিলালিত পশুর মধ্যেও আছে দয়া, ভালোবাসা, সখ্য। তা মানব সমাজের সমর্থন পেলে অনেক তীব্র হতে পারে। তাকে সামাজিক মানুষের পক্ষে সামলানো দুরূহ হয় কখনো-কখনো। আদিম প্রাণীর মধ্যেও যে জৈবশক্তির বিকাশ ঘটে এক মঙ্গলময় কল্যাণাত্মিক স্বভাবে, তা আমাদের বিস্মিত করে। আমরা আদিম পশুদের যান্ত্রিক সভ্যতার উপযোগী যন্ত্র দিয়েই মোকাবিলা করতে সদা সচেষ্ট। কিন্তু তাদের মধ্যেও যে অকৃত্রিম হৃদয় আছে, সখ্য ও স্নেহবোধ আছে মানুষের সংস্পর্শে তার জাগরণ চমৎকারিত্ব আনে,—'কালাপাহাড়' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু এই অর্থ-তাৎপর্যে নিহিত। কালাপাহাড়ের প্রতি রংলালের পোষমানানো আচার-আচরণ এই পশুটিকে বোধ ও অনুভূতিতে মানবিক স্বভাবের জগতে নিয়ে যায়।

কিন্তু তার পরিণতি সামলাতে পারেনি রংলাল। সে তাকে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য

হয়। আবার মোটরকারে চেপে-আসা পুলিশও শহরের বুকে তার বীভৎস মৃত্যু এনেছে অন্যভাবে তাকে বোঝার চেষ্টা করেনি। কালাপাহাড়ের আত্মচেতনার জাগরণ তার মৃত্যুর অমোঘ বিষাদঘন পরিণতিরই প্রস্তাবনা। পশুর আদিম, অকৃত্রিম ও অসীম অন্তর-লীলাকে ধারণ করা ও সংযত করার ক্ষমতা পার্থিব মানুষের নেই। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তাকে বিচার করে, হৃদয় দিয়ে তাকে সামলাতে পারে না। রংলাল বুদ্ধি দিয়ে তার কাছ থেকে সরে এসেছে, হৃদয় দিয়ে তার অন্তঃশক্তির মঙ্গলময় দিকের জাগরণ ঘটিয়ে তার বেগ ও প্রতিবেগকে সামলাতে অক্ষম থেকেছে। এখানেই মানুষের জৈবশক্তির সঙ্গে পশুর আদিম জৈবশক্তির মূলগত প্রভেদ।

কালাপাহাড়ের অনাবৃত জৈবশক্তির বিকাশের দিক গল্পের প্রকরণে সংযমে-শাসনে ব্যবহৃত হয়নি। তারাশঙ্করের লক্ষ্য যা, তা গল্পের প্রথম দিকে অকারণ ভিন্ন বিষয়ের বিস্তারে অনুপস্থিত। গল্পের শেষ চিত্রে পাঠক আশা করে, কৃষক রংলালের কৃষিজীবনকে ভিত্তি করেই গল্পের পরিণাম ব্যঞ্জনাগর্ভ হবে। কারণ রংলাল কৃষির উন্নতির কারণেই বার বার ভাল গরু কেনার কথা বলে, উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করে। এই অংশে তার পশুপ্রীতির জন্য কোনো বাক্য ব্যবহার হয়নি। প্রথম দিকে প্রসঙ্গটি এত দীর্ঘ যে কালাপাহাড় আসার পর তার সক্রিয়তার আগের প্রসঙ্গ উপেক্ষার হয় এবং কেন্দ্রীয় বিষয় শিল্পগত দ্বিধার জন্ম দেয়। প্রকৃতি-মানুষের মন-প্রাণ-আত্মার নিবিড় যোগ বিস্ময় আনে, কিন্তু এই যোগ নব্য সভ্যতার যন্ত্রভিত্তির কাছে পরাজিত হয়। আদিম অমার্জিত সভ্যতা মানব সভ্যতার শুভঙ্করী দিকের অনুগত হতে পারে, কিন্তু মানব সভ্যতা তাকে গ্রহণ করতে অক্ষম, তার শক্তিকে মনে করে প্রতিস্পর্ধী, ধ্বংসকারী। এই বিরোধের ব্যঞ্জনাও 'কালাপাহাড়' গল্পের পরিণামে কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুগ আছে বলেই মনে হয়।

চার

'কালাপাহাড়' গল্পের প্রকাশরীতিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে বিবরণধর্মিতা, নেই কোনো ইঙ্গিতধর্ম। আগেই বলেছি, গল্পটির প্লট-বুননে আছে 'টেল'-ধর্ম। গল্পে রংলাল চরিত্রের কোনো জটপাকানো মনস্তত্ত্ব নেই— যা আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম বড় দিক। গল্পের আরম্ভে আছে ম্যাট্রিক পাস কৃষক-পুত্র যশোদার সঙ্গে অ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত চাষী রংলালের মতবিরোধের চিত্র। কিন্তু তার সঙ্গে গল্পের শেষের কালাপাহাড়ের আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক মোটরকার ও তার আরোহীর আচরণজাত সংঘর্ষের ব্যঞ্জনাগত কোনো মিল নেই। তারাশঙ্কর এমন প্রকাশভঙ্গিতে রূপকথার স্বভাব ও রোমান্সকে ব্যবহার করেছেন। হাটে গরু কিনতে গিয়ে দুটি মহিষকে দেখে তাদের পছন্দ করে রংলাল। কিন্তু মহিষ দুটির বিশালকায় রূপ-বর্ণনা রূপকথার অস্বাভাবিকত্বকে কিছুটা বা মেজাজে ধরায়।

গল্পে চিতাবাঘের সঙ্গে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের যে যুদ্ধ, রংলালের যে সাহসিক তৎপরতা, সেখানেও আছে প্রাচীন রূপকথার অ্যাডভেঞ্চার! বাঘ-মহিষ-মানুষের এমন যুদ্ধ-পরিকল্পনা আদিম জগতের নাটকীয়তাকে সামনে আনে, মধ্যযুগীয় কোনো কোনো

রূপকথা সর্বস্ব মঙ্গলকাব্যের কথা মনে করায়। গল্পের বিবৃতিমূলকতায় হঠাৎ এমন চিত্র উপহার মূল গল্পের বক্তব্যের সমর্থনে সর্বতোভাবে শিল্পভিত্তি পায় না। গল্পে কুম্ভকর্ণের মৃত্যুই পাঠকের কৌতূহলে এনেছে দ্বিধাবিভক্তি।

শেষ ক্রেতা পাইকারের কাছ থেকে কালাপাহাড়ের পলায়নের চিত্রটি বিভূতিভূষণের 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পের বুধীর শেষ আচরণকে মনে করায়। বুধী নামে ষাঁড়টি ঠিক এইভাবেই মৃত্যুভয়ে তার পুরনো আশ্রয়ের দিকে দৌড়য়। বুধী তার শেষ আশ্রয় খুঁজে পায়, কালাপাহাড় শহরের বুকে পথভ্রান্তিতে ও রাগে-দুঃখে যান্ত্রিক সভ্যতার শিকার হয়। বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দেয়। বিভূতিভূষণের গল্পের লক্ষ্য জীবনের অস্তিবাদী দিকের প্রতিচিত্রণ, তারাশঙ্করের গল্পের লক্ষ্য আদিম পশুর জীবনকেন্দ্রিক আদিবৃত্তির স্বরূপ উদঘাটন। আমরা আগেও বলেছি, গফুরের মতো চাষীর পশুপ্রীতির সঙ্গে তারাশঙ্করের চাষী রংলালের পশু-প্রীতির বিশেষ লক্ষণীয় তফাত আছে। গফুর দরিদ্রতম চাষী, রংলাল সম্ভ্রান্ত চাষী। গফুরের কাছে মহেশ তার প্রাণ, তার জীবিকা ও অন্তর— দুয়ের সমান আশ্রয়, লেখক তা বলেননি। বরং রংলালের লুকিয়ে ট্রেনে পালিয়ে আসার মধ্যে একজাতীয় নির্মমতা ও উদাসীনতা প্রামাণ্য হয়, যদিও কালাপাহাড়ের জন্য তার সামনাসামনি তার বিষাদ-ঘন দুঃখের পরিচয় আমরা পাই।

অর্থাৎ গল্পের প্রকাশরীতিতে এমন এক শৈথিল্য আছে যে গল্পটি প্রকরণের দিক থেবে মধ্য-অংশে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গল্পের সর্বশেষ ঘটনায় সাহেবের কালাপাহাড়কে হত্যা করার পরেই বলা ' ডোমলোগকা বোলাও'-এর মধ্যে আছে কৃত্রিম মানব সভ্যতার যান্ত্রিকতা— যা কালাপাহাড়ের স্বতঃস্ফূর্ত সখ্যপ্রীতির আবেগ ও তা হারানোর দুঃখের পাশে নির্মমতা, নিষ্ঠুরতাকেই তুলে ধরে। তারাশঙ্কর গল্পের ব্যঞ্জনায় যন্ত্রসভ্যতার কৃত্রিমতাকে এখানে দেখাতে চেয়েছেন বলে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত টানতে পারেন।

গল্পের ভাষায় কোনো ব্যঞ্জনা নেই। সহজ সরল বিবরণের ধর্মে গল্পের বাক্যগঠন ও ঘটনানির্মাণ পূর্বানুবৃত্ত গদ্যভাষার সমর্থক হয়ে ওঠে। সাধারণ সাধুরীতির গদ্যে যে গতি আছে, তা 'tale' রচনার উপযোগী। কোনো গভীর মনস্তত্ত্ব, তার জটিলতা ও বিস্ময়কর চমৎকৃতি এবং তীব্র ব্যঞ্জনাশক্তি না থাকায় 'কালাপাহাড়' গল্পের গদ্য সাদা-মাটা।

পাঁচ

'কালাপাহাড়' অবশ্যই গল্পের চরিত্র-নির্ভর নাম-পদ্ধতির বাস্তবতাকে বুঝিযে দেয। গল্পের মূল লক্ষ্য যে কালাপাহাড় নামের মহিষটা, তা গল্পের শুরু থেকে বোঝা যায় না। কারণ কালাপাহাড়ের এমন নাম নিয়ে গল্পে প্রবেশ ঘটেছে অনেক পরে। গল্পের নামে গভীর ব্যঞ্জনা থাকতে পাবত, লেখক সেদিকেও যেমন ভাবেননি, গল্পের ব্যঞ্জনার লক্ষ্যেও তার আভাস নেই।

মহিষ দুটিকে দেখে রংলালের স্ত্রীর বিস্ময়-চকিত নির্বাক ভাবনা— ' হোক ভয়ংকর, তবুও একটা রূপ আছে— যাহাব আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়।' এই যশোদার মা-ই শেষে বলে:

'যে কালাপাহাড়েব মতো চেহারা!'

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়। —এইটা, এইটাই বেশী মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়!'

মহিষটির এমন নামে তার আকৃতির ভীষণতা ব্যঞ্জনা পেলেও গল্পের নামে সেই ব্যঞ্জনা স্বভাবে কিছুটা ধরা পড়ে কালাপাহাড়ের শেষতম আচরণে:

'কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।.....

পাইকারটা কয়েক জনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সামনের লোকটাকেই শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল।'

এমন যে কালাপাহাড়, তার শুধু আকৃতি নয়, স্বভাবও ভয়ঙ্কর, কালাপাহাড়ের মতোই দুর্দম ও প্রচণ্ড গতিবেগ-সম্পন্ন। গল্পের শেষে এই স্বরূপ থাকায় কেন্দ্রীয় চরিত্রের দায়িত্বে গল্পনাম সার্থক।

দ্বিতীয় কথা হল, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও লক্ষ্য কালাপাহাড় নামের মহিষটি। তারই বিষাদময পরিণতিচিত্র অঙ্কন গল্পকারের লক্ষ্য। গল্পের মধ্যভাগ থেকে তার সক্রিয়তার চিত্র অঙ্কিত হলেও গল্পের যে বিষাদঘন পবিণতি, তার মূলে কালাপাহাড়ই। তার মানবিক বৃত্তিব থেকে পার্থিব আদিম বৃত্তির যে প্রচণ্ড বেগবান রূপ, তার মূল শক্তি এখানে:

'কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তাবস্বরে ডাকিতেছিল।'

মোটরকারকে দেখে তার যে আশ্রয় প্রার্থনা, তা সেই পোষ্যজীবনেরই মূল আশ্রয়ের জন্য স্বাভাবিক আর্তি। গল্পের শেষে এইভাবে তার মনোলোকের চিত্রণে গল্পকার নামের গুরুত্ব কিছুটা বাড়িয়েছেন, অন্য ব্যঞ্জনা চবিত্রের গভীরে নেই। আদিম শক্তির প্রতীকে এই এক ব্যঞ্জনা নামে থাকায় গল্পনাম শিল্পভিত্তি পায় কিছুটা।

৬.

জলসাঘর

এক

'জলসাঘর' গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলা তেরশো একচল্লিশের বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। সম্পাদক তখন সজনীকান্ত দাস। ইংরেজি উনিশশো চৌত্রিশ সাল হলে গল্পের রচনাকাল অবশ্যই বিশ শতকের তিরিশেব দশকের মধ্যবর্তী সময। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ ইতিপূর্বে বন্ধ হয়ে গেছে উনিশশো উনতিরিশে—টানা ছটি বছর পাশাপাশি 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' পত্রিকাকে পাশে নিয়ে চলার পর—যদিও 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' 'কল্লোলে'র দু-তিন বছর পরের ব্যবধানে দেখা দেয়। ভারতবর্ষ তখন বৃটিশ

উপনিবেশের অন্যতম রাষ্ট্র। তার অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় ভারত চালিত। বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামেই সামন্ততন্ত্রের কঠিন শৃঙ্খল ধাতব আঘাত ও বন্ধনে বর্তমান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তঃশীল প্রস্তুতি চলেছে আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে কিছুটা নীরবে, নিভৃতে, অর্থ-ন্যায় ও সমাজ-ন্যায়ের নিয়তিনির্দেশে।

'জলসাঘর' গল্পের ভূমিকা রচনার আগেও একটা ভূমিকা থেকে যায়— যা মূলত নানা সূত্রে পাওয়া ও লেখকের দেওয়া তথ্যের। সেগুলি না দিলে গল্পটির সামগ্রিক আলোচনার ভিতরচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারাশঙ্কর স্বয়ং জানিয়েছেন :

> 'আরও দু'টি গল্প লিখে 'জলসাঘর' নাম দিয়েই একটি বই প্রকাশ করব। প্রথম জলসাঘর গড়ে ওঠা ('রায়বাড়ি' ভারতবর্ষ', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩), দ্বিতীয় জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুষ, তৃতীয় এবং শেষেরটি আগেই লেখা হয়ে আছে। ....জলসাঘরের মাঝের গল্প আর লেখা হয়নি, লিখিনি। এর এক বছর পরেই 'জলসাঘর' বই প্রকাশিত হল।...ঐ দু'টিকে এক করেই জলসাঘরের পালা শেষ করলাম।'

'জলসাঘর' গল্পটির দুই খণ্ডে এক অভিজাত বংশের মধ্যাহ্ন গৌরব ও সায়াহ্ন ম্লানিমা পাশাপাশি প্রদর্শিত। গ্রন্থরূপে প্রকাশকাল উনিশশো সাঁইতিরিশ। 'জলসাঘর' পড়েই সম্ভবত, তারাশঙ্করের গল্পকে রবীন্দ্রনাথেব ভালোবাসার ভাষা এই রকম :

> 'তার ভিতরে আছে একটা স্মৃতি — যার সঙ্গে পূর্বেকার ওই যেমন জমিদারের ঘরে যা ঘটে থাকে শাসন, পালন, শোষণ দেখিয়েছে, খুব সত্য করে তুলেছে তার লেখা।'

'জলসাঘর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের গল্প 'রায়বাড়ি'। 'রায়বাড়ি' আর 'জলসাঘর' গল্পের মিল এক জায়গায়—দুই গল্পেরই বিষয় গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের শাসন, পালন ও শোষণের ভালো-মন্দের দিক। 'রায়বাড়ি' গল্পে আছে রাবণেশ্বর রায়ের বিচিত্র চরিত্রের চিত্ররূপ। এর উল্লেখ আছে 'জলসাঘর' গল্পে নায়ক বিশ্বম্ভর রায়ের চিন্তায়। রাবণেশ্বর রায়ের অকপট বীরত্ব, ভোগবৃত্তি, ঈশ্বরভক্তি, প্রজাদের জন্য দান-ধ্যান, সেই সঙ্গে শত্রুর প্রতি প্রতিস্পর্ধী মনোভাবের কাঠিন্য, কাপুরুষ সুলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি— এসব মিলে-মিশে এক যৌবনের রক্তিম মত্ত দিক গল্পে চিত্ররূপ পেয়েছে। পরবর্তী 'জলসাঘর' গল্পে সেই সামন্ততন্ত্রেরই পরিণামমুখিন বিষাদখিন্ন বিম্বন।

আমাদের আলোচ্য গল্প একমাত্র 'জলসাঘর'ই। এই গল্পের সমস্ত রকম শিল্পের গৌরব-সমুন্নতি 'রায়বাড়ি' ব্যতিরেকেই বিস্ময় জাগায়। গল্পটি বাংলা সাহিত্যে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্প সার্থক ছোটগল্প—তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প নিঃসন্দেহে। লেখক-ব্যক্তিত্বে 'জলসাঘর' গল্পটি তাঁর উন্নত ললাটে উজ্জ্বল এক রক্তটিকা। তারাশঙ্কর গল্প শুরু করেছেন গল্পের নায়ক অন্যমনস্ক আত্মমগ্ন নতশির প্রৌঢ় বিশ্বম্ভর রায়ের রাত্রিশেষে ভোর তিনটেয় ছাদে নিঃসঙ্গ পায়চারি করার চিত্র দিয়ে। এমন ভোরের প্রাকৃতিক পরিবেশে চোখে পড়ে আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উজ্জ্বল শুকতারা। রায়বাড়ি থেকে

দূরে উঁচু প্রাসাদের মাথায় জ্বলে উঠত বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের অকম্পিত বিজলী-বাতি। একসময়ে তাদের ছাদের পেটা-ঘড়িতে তিনটের সঙ্কেত বাজে। চারপাশে সমারোহ বসন্ত থাকলেও রায়বাড়ির জীর্ণ অবস্থা তাকে যথাযোগ্য আমন্ত্রণ জানাতে অক্ষম। এই পরিবেশে রায়বাড়ির পুরনো খানসামা অনন্ত বিশ্বম্ভরের পুরনো জমিদারি অভ্যাসের দৈনন্দিনের বিধিব্যবস্থাগুলি দিনের ঠিক শুরুতেই ঠিকঠাক সাজিয়ে বিশ্বম্ভরকে সচেতন করে ফরসির মাথায় বসানো কলিকা সহ নলটি হাতে ধরিয়ে দেয়।

এই পরিবেশে আস্তাবল থেকে সর্বশেষ পুবনো বৃদ্ধ ঘোড়া তুফান ডেকে উঠে। যুবক বয়স থেকে জমিদার বিশ্বম্ভর রায় এরই পিঠে চেপে ভোরে বেড়াতে বেরুত, বাঘ-মারা খেলার শিকারেও বেরুত। তুফানের চিৎকার থামাতে তার খোঁজ নেয় বিশ্বম্ভর, সহিস নিতাইকে ডাকতে নির্দেশ দেয় অনন্তকে। একসময়ে সদ্যফোটা মুচকুন্দ ফুল দিয়ে শরবত খাওয়ার সেই পুরনো অভ্যাসের ভাবনায় অনন্তকে তা-ও খাওয়াতে বলে। নানান চিন্তার মধ্যে তুফানকে দেখার বাসনায় আজ সকালে দীর্ঘ দু'বছর পর, এই প্রথম নীচে নামে। নীচে এখনো আছে মাহুত রহমতের তত্ত্বাবধানে হস্তিনী মতি, বিশ্বম্ভরের প্রিয়তম আদরেব নাম দেওয়া 'ছোটগিন্নী'। এই হাতিটি বিশ্বম্ভরবাবুর মায়েব বিবাহের ছিল যৌতুক। এদেব সকলকে নিখুঁত করে দেখা আর খোঁজখবর নেওয়ার মধ্যেই এই সকালে দূরে গাঙ্গুলীবাবুদের বাড়িতে বাবুর ছেলের ভাত উপলক্ষে ব্যান্ড বেজে ওঠে, আর তারই তালে তালে তুফান ও ছোটগিন্নীর নাচ শুরু হয়ে যায়।

বিশ্বম্ভরের মনে পড়ে যায় গাঙ্গুলীবাবুদেব নিমন্ত্রণের কথা। মনে পড়ে যায় ওদেরও নহবতখানায় এককালে এভাবে বাজনা বাজত, নাচত তুফান ও ছোটগিন্নী। ওপরে উঠে এসে অনন্তকে নির্দেশ দেয় প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্নকে পাঠিয়ে দিতে। বিশ্বম্ভর রায অর্থে একেবারেই হীনবল। তবু নায়েব এলে তাকে নির্দেশ দেয় একটি গিনি ও কাঁসার একটি থালা সঙ্গে নিয়ে ছোটগিন্নীকে ঠিকমতো সাজিয়ে জমিদারি প্রথামতো তার পিঠে চেপে গাঙ্গুলীবাড়িতে সেগুলি পৌঁছে দিতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নায়েব তা করে। একদিন এমন উৎসবের দিনেই কলেরায় বিশ্বম্ভর রায় স্ত্রী, দুই পুত্র, কন্যা হারায। তার পরেও জলসাঘরের বিলাস জীবন কাটালেও ক্রমশ অর্থের গরিমা নষ্ট হতে হতে নিঃস্ব হয় শেষ জমিদার বিশ্বম্ভব। প্রিভি কাউন্সিলের বিচাবে রায় বংশের সমস্ত ভূসম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। থাকে শুধু বাড়িঘর আর লাখেরাজের কায়েমী বন্দোবস্ত। তাতেই তুফান, ছোটগিন্নী ও তার সামান্য দৈনন্দিনের বন্দোবস্তটুকুর খরচ চলে। আর এভাবে যেটুকু চলে, তা-ও নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ হয়ে থাকে। প্রচ্ছন্ন রেষারেষি বজায় রাখে এরা ঈর্ষায়, অহংকারে।

অপরাহ্নে মহিম গাঙ্গুলী তার ঝকঝকে মোটর নিয়ে-বায়বাড়ির ভাঙা দেউলে আসে। মহিমের পিতা জনার্দন বংশ পরম্পরায় চিরদিন রায়-দপ্তরের মহাজনি করেছে। জমিদারের প্রতি তাদের ব্যবহাব ছিল অধস্তন কর্মচারীর মতো। এখন মহিম সেই সম্মান দেয় না সচেতন ভাবনাতেই। জমিদারি সুগন্ধ শরবত খায় মহিম, বিশ্বম্ভরকে ঠাকুর্দা বলে

সম্বোধন করে তার বাড়ির অন্নপ্রাশন উৎসবে সশরীরে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানায়, খবর দেয় বাড়ির জলসায় লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজি আসার, এবং তাদের কদর যে বিশ্বম্ভর ছাড়া কেউ বুঝবে না তা-ও বিশ্বম্ভরের সামনে স্বীকার করে। বৃদ্ধ বয়সের শারীরিক অসুবিধের মধ্যে উপস্থিত থাকার অক্ষমতার কথা জানায় বিশ্বম্ভর। শেষে জমিদার বাড়ির জীর্ণ রূপ মেরামতের উপদেশ দিয়ে মহিম গাঙ্গুলী চলে যায়।

মহিমের বাড়ির উৎসবে তিন দিনের বায়নার জায়গায় পাঁচ দিন ধরে বাঈজী নাচের ধুমধাম অনুষ্ঠান চলে। শেষে মহিম যুক্তি দেয় বাঈজীদের বিশ্বম্ভর রায়ের মতো সমঝদার আমীর লোকের বাড়ি যেতে। সেখানে জলসার চুক্তি হতে পারে। বাঈজীরা এলে তারাপ্রসন্ন তার প্রভুকে বেশ্যা দিয়ে অপমান করানোর হীন কূটকৌশলে ক্ষুব্ধ হলেও বিশ্বম্ভর আপন জমিদারি আভিজাত্যে তাদের নিয়ে পুরনো, দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত জলসাঘরেই নাচ-গানের ব্যবস্থা করে। সেইমতো সকলকে নির্দেশ দেয় আসর সাজাবার। বাঈজীর খরচের ব্যবস্থা করে রায়বংশের মাঙ্গলিক সিঁথিটিকে দেবোত্তরের খাতায় জমা দিয়ে তার বদলে দেড়শো টাকার খরচ লিখে এবং আদায়ের সূত্র ধরে। বিশ্বম্ভর সেই অতীত দিনের জলসাঘরে বসার বিলাসী পোশাক পরে। নতুন করে জলসাঘর গম গম করে ওঠে। এখানে অনেক নিমন্ত্রিতদের মধ্যে মহিম গাঙ্গুলীও। বিশ্বম্ভরের উপস্থিতিতে জলসা চলার মধ্যে মহিম নিয়ম ভেঙে বয়োজ্যেষ্ঠা বাঈজীর গানের পর কৃষ্ণাবাঈ নাচে-গানে মাতিয়ে দিলে তাকে বকশিশ দিয়ে বসে। এমন জলসায় প্রথম ইনাম দেবার অধিকার গৃহস্বামীর। নিজের কাছে দেবার মতো ইনাম না থাকায় বিশ্বম্ভর ওপরে চলে আসে। পরে তারাপ্রসন্নই ইনাম দিয়ে যায় ও বুকের ব্যথার জন্য বিশ্বম্ভর আসতে পারবে না জানালে মজলিশ বন্ধ হয়।

পরে শূন্য জলসাঘরে আবার আসে বিশ্বম্ভর, সেখানে একা কৃষ্ণাবাঈ বিশ্বম্ভরের চোখে সেই অতীতের চন্দ্রাবাঈ। জলসায় একা বসে সুরাপান আর এসরাজ বাদনে বিশ্বম্ভর এখন এক মোহবদ্ধ রোমান্টিক আবেগের অন্য মানুষ, এক যুবক জমিদার যেন! জলসার মদ, উজ্জ্বল ঝলমল আলো আর বাঈজীর কামনামদির রূপ-সৌন্দর্য ও নৃত্যের মধ্যে এসরাজ বাজাতে বাজাতে প্রৌঢ় বিশ্বম্ভরের যেন নতুন বসন্ত জাগে, নতুন মোহ সঞ্চারিত হয়। তারই মধ্যে দেখে নবাগতা বাঈজী কৃষ্ণাবাঈয়ের মধ্যে তার যৌবনকালের প্রেম-মদিরার প্রিয়তমা দিল্লীওয়ালী চন্দ্রাবাঈকে। নবাগতা পিয়ারীর নাচের মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের জোহরার ছবিও ভাসতে থাকে। পুরনো জমিদারের অভিজাত রক্ত, মোহ, আবেগ, আকর্ষণ বিশ্বম্ভরকে মাতাল ক'রে তোলে, বয়স কমিয়ে দিয়ে বিভ্রম আনে, নতুন বসন্তে বিশ্বম্ভর রায় একবারে অন্য মানুষ। এখন কৃষ্ণাবাঈ বিশ্বম্ভরের সেই চন্দ্রাবাঈ, সেই যৌবনকালের জমিদারি আভিজাত্য ও বিলাস-মোহে জড়ানো প্রেমিকা!

রাত্রি শেষে ভোরের দিকে ফরাসের ওপর বাঈজী অবশ দেহ ক্লান্তিতে তন্দ্রায় এলিয়ে দিলে, বিশ্বম্ভর স্মিত হাসিতে তাকে সযত্নে শুইয়ে দেয়। পরেও চলে একটানা সুরাপান আর নিজের হাতে এসরাজ-বাদন। দ্বিতীয় বোতল শেষ হলেও রাত্রি শেষ হয় না।

গাঙ্গুলী বাড়ির ঘড়িব ঘণ্টা তিনটের সংকেত দিলে বিশ্বম্ভর সচেতন হয় প্রতিদিনের অভ্যাসমতো। নিদ্রিত কৃষ্ণাবাঈকে চন্দ্রবাঈ ভেবে আদর করে। শেষে অনন্তকে দিয়ে সেই পুরনো দিনের পাগড়ি, সওয়ারের পোশাক আনায়, পরে নেয় একে একে, সহিস নিতাইকে তুফানের পিঠে জিন দিতে বলে। এক গভীর মোহে, নতুন জাগ্রত বসন্ত-চেতনায় বিশ্বম্ভর তুফান ছুটিয়ে দূরে চলে যায়। কিন্তু কুসুমডিহি গ্রাম ধরে হারানো লাট কীর্তিহাটের সামনে এসে পথচারীদের পুরনো জমিদার সম্পর্কিত সশ্রদ্ধ কথাবার্তায় সম্বিৎ ফিরে আসে। নিজেব ভুল বুঝতে পেরে জোবে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের বাড়ি ফেরে। রক্তাক্ত মুখ তুফানও বিধ্বস্ত। রুদ্ধশ্বাস বিশ্বম্ভব বেশি বয়সের পরিশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত। সহিসের হাতে তুফানকে দিয়ে বিশ্বম্ভর ওপরে আসে। ফেরার পথে এখনো আলোকিত জলসাঘর দেখে, দৃপ্ত রায়বংশধরদের দেওয়ালে ঝোলানো ছবিগুলিতে মত্ত হাসিমুখ দেখে। তা যেন দর্পণ, আর তাতেই বিশ্বম্ভর নিজেব মোহকে চিনতে পারে। কিন্তু এই চেনার মুহূর্তেই ভীতার্ত নিজেকে বিশ্বম্ভর বুঝতে পেবে সম্পূর্ণ অপবিচিত অস্বাভাবিক এক কণ্ঠে অনন্তকে জলসাঘরের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দেওয়ার, সমস্ত দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। হাতের চাবুক জলসাঘরের দরজায় আছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিত বিশ্বম্ভর রায় হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ নির্বাক, নিস্পন্দ।

তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' গল্পের প্লটে তেমন জটিলতা নেই। গল্পেব নাম 'জলসাঘব', কিন্তু গল্পের প্লট-বৃত্ত জলসাঘবটিকে ছোট একটি প্রেক্ষিত কবে উন্মোচিত করেছে বিশ্বম্ভব রায়েব অস্তগামী সূর্যেব মতো স্বমহিম স্বভাবকে। অর্থাৎ এক অর্থে এই চরিত্রই তারাশঙ্করের প্রধান লক্ষ্য। জলসাঘর তার ভিতরটাকে বুঝিয়ে দেওযার, তুলে ধরার একটি কেন্দ্রীয় আধাব। তারাশঙ্কর যতটা বিষয় সচেতন, ততটা রীতি সচেতন নন। 'রীতি' বলতে শিল্পের এবং তা ছোটগল্পের কাহিনী ও ঘটনার প্রয়োগে ধরা, অর্থাৎ প্লট-বৃত্তকেও যা টেনে আনে। প্লট-বৃত্তেব স্বরূপ, গতি ও জট বুঝতে হলে তাঁব নিজস্ব চরিত্র-ভাবনা, নাটকীয় বিন্যাস বৈশিষ্ট্য, নাট্যরস সৃষ্টি, রোমান্টিক আবেগ ধর্ম এবং বড় বড়, এক অর্থে মোটা মাপের ঘটনাব সমাবেশের অব্যর্থতাকে মেনে নিতে হবে। 'জলসাঘর' গল্পেব প্লটে আমরা তা নিশ্চিত পাই।

আমরা অবশ্যই একথা বলছি না, তারাশঙ্করের রীতি অ-সচেতনতা তাঁর ত্রুটি বা দুবর্লতা, আমাদের মতে, বিশ্বম্ভরের মুগ্ধতা তাঁর গল্প বলাব রীতিগত সারল্যকে অবধারিত করেছে। চরিত্র আঁকাব বলিষ্ঠতা গল্পের কাহিনী ও ঘটনার যৌথ অমোঘতাকে নিশ্চিত করে তুলেছে। 'জলসাঘবে'র কাহিনীজট তথা প্লটবৃত্তে আছে গল্পরস। আর তাকে সংহতি দিয়েছে বড় মাপের ব্যঞ্জনাগর্ভ কাহিনী-শিল্পকে সংযম ও শাসনের প্রযোগধর্মে। এই কাবণেই সমালোচক কথিত 'আঙ্গিকের দিক থেকে ''জলসাঘর'' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ'— এমন মন্তব্য বেশ খাপ খেয়ে যায়।

'জলসাঘর' গল্পেব শুরু বিশ্বম্ভরেব ভোর তিনটেয় ছাদে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো নিদ্রাশেষের চিন্তাকুল পায়চারির খবব দিয়ে। গল্পে গাঙ্গুলীবাবুর ছেলের ভাত প্রসঙ্গ

আসার আগে পর্যন্ত লেখক কখনো অনন্ত, সহিস নিতাই, মাহুত রহমত— এদের সঙ্গে তুফান, ছোটগিন্নী নামের হাতির প্রসঙ্গ ইত্যাদি সংলাপে ও ছোট ছোট বর্ণনায় যেমন পরিবেশ রচনা করেছেন, তেমনি কাহিনীও এসবে প্রচ্ছন্ন থেকে এগোতে থাকে। মাঝে মাঝে আসে তারাপ্রসন্নের সঙ্গে অতীতের সংলাপ-বিনিময়ের স্মৃতি, বিশ্বম্ভর রায়ের নিজস্ব ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা ও লেখকেরই টেলধর্মী কিছু বিবৃতি। এমন উপস্থাপনা কৌশল কাহিনী জটে রহস্য মেশায়। এর পরে গাঙ্গুলীবাবুর বাড়ি ছোটগিন্নীর পিঠে চেপে তারাপ্রসন্নের উপহার নিয়ে যাওয়া, মহিম গাঙ্গুলীর নিজের গাড়ি চেপে বিশ্বম্ভরকে নিমন্ত্রণ করতে আসা, বাঈজীদের আগমন ও জলসাঘরে গানের ও নাচের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ—সবই কাহিনীর একটা আদি-মধ্য-অন্তের স্বভাবে তুলে ধরতে থাকে।

প্লটবৃত্তের জটিলতা আসে বিশ্বম্ভর রায়ের বাঈজী কৃষ্ণাবাঈকে চন্দ্রাবাঈ ভেবে জটিল মনস্তত্ত্বমূলক মোহের আবেগের 'চরমমুহূর্ত' রচনায়। অবশ্যই এই অংশ কাহিনীর একটি বড় গ্রন্থি। এর পরেই বিশ্বম্ভরের তুফানকে নিয়ে এই প্রৌঢ় বয়সেই যৌবন বয়সের নিষ্ফল মোহে বেরিয়ে পড়া ও মোহভঙ্গ এবং বিশ্বম্ভরের জলসাঘরের সামনে শোচনীয় মৃত্যুর মতো ঘটনা। কাহিনীর যে জট, তা মূলত চরিত্রের জট-মোচনেরই প্রস্তুতি। বিশ্বম্ভরের রোমান্টিক আবেগই মূলত প্লট-বৃত্তের শেষ অংশে গতি এনেছে। লেখককে তার জন্য স্বতন্ত্র কোনো প্রয়াস নিতে হয়নি। তবু গল্পের যেসব জায়গায় লেখক স্বয়ং উপস্থিত থেকে কিছু কথা-অংশ যোগ করেছেন, সেখানে গল্পকার তার সংক্ষিপ্ত আকারের পিছনে উপন্যাসের বিস্তারকে নিয়ে পাঠকদের সচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত কাহিনী অংশগুলি আলোচ্য বড় গল্পের অঙ্গকে এতটুকুও শিথিল করেনি, এখানেই আকারে বড় 'জলসাঘরে'র ছোটগল্প হিসেবে প্রধান সার্থকতা। সেই কাহিনীগুলি কোথাও প্রধান চরিত্রের শিল্প-দাবিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠে রসাভাস-দোষ ঘটায়নি। অনেকটা নিজস্ব বলার স্বর-ভঙ্গির প্রচ্ছন্ন বক্রোক্তি এনে নিজের রীতি-অসচেতনাকে সমর্থন করেছেন গল্পকার 'পজিটিভ' সমর্থন জানিয়ে—'আবার নিজের মনে বিশেষ ঘটনা বা পাত্র-পাত্রী—এই সবই প্রধান,—এরাই সুখ-দুঃখের ঢেউ হয়ে আসে, —বলবার কৌশলটা আলাদা করে ভাববার জিনিস কী?'

আসলে, 'জলসাঘর' গল্পটি প্লট-বৃত্তের পোস্টমর্টেমে স্টিভেনশন কথিত 'Story of character' হয়ে ওঠে আর তার সূত্রেই আসে লেখকের প্রয়োজনীয় এবং নিজস্ব পছন্দমতো 'incidents and situation to develop it.' বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র-পরিণতি চিত্রে অবশ্যই তারাশঙ্কর চরিত্রের ও ছোটগল্প রীতির প্রয়োজনে এনেছেন 'মহামুহূর্ত' এবং তা-ও কোনো একটি বাক্যে বা একটি ছোট অনুচ্ছেদে, অথবা গল্পের শেষতম বাক্যের 'চরমমুহূর্ত'-এ ধরা পড়েনি। তা বিস্তারিত রূপ পেয়েছে শুরু থেকে ধীরে ধীরে নায়কের মানসিক জট ছাড়ানোর তুঙ্গে এসে। 'জলসাঘর' গল্পে 'চরমমুহূর্ত'-situation তৈরি হয়েছে জমিদারের জলসাঘরেই, বাঈজী কৃষ্ণাবাঈ ও বিশ্বম্ভরের নিঃসঙ্গ সামনা-সামনি উপস্থিত হওয়ার মধ্যে:

'রায় এস্রাজ ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন?

মৃদুস্বরে তিনি ডাকিলেন—চন্দ্রা—চন্দ্রা!

তাঁহার চন্দ্রা! এ গানও যে চন্দ্রার! বাহির হইতে মিঠা গলায় কে ডাকিল, জনাব!

রায় ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন,—চন্দ্রা,—চন্দ্রা, আও, ইধর আও। দোস্ত লোক চলা গিয়া। চন্দ্রা!

কৃষ্ণা স্মিত লাজুক মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অতি মধুর করিযা যে গানটি তিনি এস্রাজে বাজাইতেছিলেন, তাহার শেষ চরণ গাহিল—...'

এমন চিত্রে গল্পের চরমমুহূর্তের গোপন ব্যঞ্জনার শুরু শেষ দুটি বাক্যে:

'একবার শুধু নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে আদর করিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী! তারপর বারান্দার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!'

দেখা দেয় প্রৌঢ় জমিদারের মনের গভীরে কঠিন আভিজাত্যবোধ ও মোহের-ক্রমিক জাগরণের মধ্যে গল্পের চরমমুহূর্তের বিস্তার এবং তারই বেগ-প্রতিবেগে প্রৌঢ় নায়ক তুফানকে নিয়ে ভোরের ভ্রমণে বেরিয়ে আসার স্থির-নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ। গল্পের মহামুহূর্তটি যেন কোনো প্রদীপের সলতে নিঃশেষে পুড়ে যাওয়া ও তেল ফুবিয়ে আসাব ঠিক আগের মুহূর্তের শিখাদীপ্ত প্রজ্বলন।

গল্পের প্লটবৃত্তে কাহিনীরস আস্বাদনে স্বভাবী গল্প-পাঠক এমন কথা কোনো কোনো মুহূর্তে মনে করতে পারেন, অতি সূক্ষ্ম সংকেত ও সুদূরের ব্যঞ্জনায় 'জলসাঘর' গল্প এমন বাক্যে শেষ হলে ক্ষতি হত না রসনিষ্পত্তির দিক থেকে—'অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই।' লেখক তা করেননি, কাবণ চরিত্র নয়, অন্তত গল্পের পরিণতিতে তিনি ব্যঞ্জনাগর্ভ করেছেন জমিদার তথা সামন্ততন্ত্রের অন্যতম উজ্জ্বল প্রতীকপ্রতিম 'জলসাঘর'-টিকেই। তাই বিশ্বম্ভরের নির্দেশসূচক বিযাদখিন্ন, অসহায় বাক্যেই গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা:

'বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর—জলসাঘরের—'

গল্পের শেষে Individual বিশ্বম্ভর রায় নয়, জলসাঘরই ব্যঞ্জনার কেন্দ্রীয ভূমিতে স্থির হয়ে যায়। শেষতম বাক্যটি— 'হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরেব দবজায় আছড়াইয়া পড়িল'—এর লক্ষ্যও সেই জলসাঘর। অতীতের মোহ তথা সামন্ততন্ত্রের মৃত্তিকাপ্রোথিত আভিজাত্যবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়ার যে যন্ত্রণা, খেদ, বিষাদ, কান্না, তা দিয়েই তারাশঙ্কর অতীতকে অস্বীকারের ঘোষণা শুনিয়েছেন পরোক্ষে। জলসাঘবের দিন শেষ, জমিদারের মৃত্যু নয়, তার হাতের চাবুক তা-ই জানায়।

আমরা আগেই বলেছি, তারাশঙ্করের গল্পে নাটক জমাট বাধা আছে, তবে তার সঙ্গে অতিনাটকীয়তা মাঝে-মধ্যেই উঠে আসে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে বিশ্বম্ভরের ওই আবেগাত্মক অথচ বিযাদখিন্ন উক্তি অতিনাটকীয়তার প্রত্যয় আনে সূক্ষ্মভাবে। কুসুমডিহি গ্রামের পথে তুফানের পিঠে চড়ে বিশ্বম্ভরের উত্তেজক ভ্রমণের মধ্যে দুজন হাটের পথে যাওয়া তরকারি বোঝাই গাড়ির আরোহীদের বিশেষ সংলাপ-বিনিময়চিত্রও এই রকম:

'কয়টা কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল, গাঙ্গুলীবাবুরা কিনে থেকে—
রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতি রোধ করিলেন।
তখনো গাড়ির আরোহী বলিতেছিল খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না।
সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে—
চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া রায় চমকিয়া উঠিলেন।'

এই চিত্রে গাড়ির আরোহীদের বলা ও বিশ্বম্ভরের শোনা কথার coincidence-এর মধ্যে আছে সেই অতিনাটকীয়তা। কিন্তু সমগ্র গল্পটি ধরলে এমন সব situation ক্রটিকে দেখায় না। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক জানিয়েছেন মেলোড্রামার ব্যবহারে আপত্তি নেই যদি তাকে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়। তারাশঙ্করের এই গল্পে তার প্রয়োগ সুস্থ, সম্পূর্ণ শিল্পের মর্যাদা আনে প্লট-বৃত্তটির পূর্ণতাদানে। 'জলসাঘর' গল্পের প্লট গল্পটির শিল্প-মহিমা দানে সার্থক বুননে বিশিষ্ট।

দুই

দীর্ঘকাল প্রবাহিত মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিশশতকীয় ক্ষীয়মান পাণ্ডুর অবয়বে গড়া 'জলসাঘর' গল্পের জমিদার নায়ক বিশ্বম্ভব রায়। গল্পে তার গৌরব ও মহিমায় মণ্ডিত উজ্জ্বল অতীত-পরিচয় আছে পিতৃ-পিতামহদের সূত্রে, বর্তমানে সে একা ভারমুক্ত। ভারমুক্ত সে তার পারিবারিক জীবনে। উপনয়ন বাড়ির উৎসবমুখর বিলাসের মধ্যে সাত দিনের দিন বিলাস থেকে বিষ হয়ে ওঠে পরিবেশ, পরিবার—স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয়সহ কলেরায় শেষ হয়ে যায়। 'শুধু বিশ্বম্ভর বায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা' নিয়ে বসে থাকে। এটা অবশ্যই তার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত পরিবার জীবনে আঘাত। এ আঘাত প্রাথমিক—কারণ এর পরেও দু'বছর জলসাঘরের আলো সমানে জ্বলে, বিলাসের থাকে চরম রূপ। দু'বছর পরে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি চলে গেলে, বাড়িঘর ও লাখেরাজের কায়েমী স্বার্থটুকু বজায় থাকার মধ্যে বিশ্বম্ভর রায় হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

অর্থাৎ গল্পকারের বর্ণনায় বিশ্বম্ভর রায় হয় তার ভিতর থেকে ভারহীন, জমিদারি স্বভাবের দিক থেকেও দায়-দায়িত্বহীন। কিন্তু তার যাবতীয় সক্রিয়তা আশ্রয় করে একাধিক ঘটনা ও ঘটনা-নির্ভর সংশয়-সংকটের ওপর। 'জলসাঘর' গল্পের নায়ক বর্তমানে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভর। তার দৈনন্দিন জীবনধারণের একমাত্র সহায়ক তার পুরনো খানসামা অনন্ত, পালিত তার দুর্দান্ত বাহন ঘোড়া তুফানের সহিস নিতাই, পালিত হস্তিনী 'ছোটগিন্নী'র মাহুত রহমত, নায়েব তারাপ্রসন্ন। জীবনসায়াহ্নে বিশ্বম্ভর রায় একেবারেই নিঃসঙ্গ। তার অনিকেত জীবনযাপনে আছে স্পষ্ট বৈপরীত্য। একদিকে প্রৌঢ় জীবনের বয়সেব অসহায় ভার, বিপর্যস্ত অহমিকা-সর্বস্ব সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সকরুণ দিক, আর একদিকে আছে, ক্ষীণ হলেও, পুরনো প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যের গর্ব ও গরিমাবোধ।

এই দুই বিপরীত অবস্থার মানসিক ক্রিয়া ও সংকটের ফলিত দিক ধরেই তারাশঙ্কর

তাঁর জলসাঘর গল্পের নায়ককে এঁকেছেন। নায়ক চরিত্রের যে বিবর্তন এই দুই মানসিকতার টানা-পোড়েনের সংকট-সংঘর্ষেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পে বিশ্বম্ভর রায় যেমন অতীত জমিদার-তন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু টাইপ, তেমনি নিশ্চয়ই Individual । তবে টাইপ ভূমিকা থেকে Individual দিয়েই তার মানসপ্রবণতার বিবৃদ্ধি ও পরিণতির দিক দেখিয়েছেন গল্পকার। এই Individual বৈশিষ্ট্যই তাকে সজাগ ও সতর্ক করে মহিম গাঙ্গুলীর মতো নতুন ধনী। মহিম গাঙ্গুলী ও তার কথাবার্তা, যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ যে প্রতিপক্ষের স্পর্ধা, বিশ্বম্ভর রায় তা মনে করে। মূল সামন্ততন্ত্রের পটেই ছিল শক্তি ও দম্ভ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কঠিন মন। অপরাজিত মনের অহংকার ও কঠিন আভিজাত্যবোধ— এই দুই ছিল জমিদারদের ও জীবনের পক্ষে কবচকুণ্ডল। মহিম গাঙ্গুলী বিশ্বম্ভর রায়ের মধ্যে তা-ই জাগিয়ে দেয়।

সাধারণভাবে তারাশঙ্করের এই জাতীয় চরিত্র আঁকার যে মনোভঙ্গি, তা বিশ্বম্ভরের শিল্প-ভিত্তিক চরিত্রমূলে অ-দৃশ্য নয়, অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকতায় এই চরিত্রে নিবিষ্ট। এইরকম দুটি বৈশিষ্ট্য— ১. চরিত্রের বিবর্তনে কাহিনী ও ঘটনার সূত্রে সুস্পষ্ট নাট্যরসের সফল বিন্যাস, ২. চরিত্রের অন্তর্নিহিত আবেগধর্ম। বিশ্বম্ভরের জীবন-ছকে আছে পুরনো জীবনস্বভাব, তাকে ধাক্কা দিতে আসে নতুন রোমান্টিক বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি মহিম গাঙ্গুলী। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ পুরনো সামন্ততন্ত্রেই দীর্ঘকাল প্রবাহিত সমাজের স্বাক্ষর বহন করেছে। বিশ্বম্ভর চরিত্রের শিকড় সেই আদিম মাটিতে প্রোথিত। তাই পুরনো জীবনের প্রতীক-প্রতিভূ বিশ্বম্ভরের সঙ্গে নব্য ধনতন্ত্রের ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতিনিধি মহিম গাঙ্গুলীর সংঘাতেই আসে বিশ্বম্ভর চরিত্রে নাটকীয়তা ও নাট্যরস, আসে স্বাভাবিক আবেগধর্ম। সামন্ততন্ত্রের মূলেই ছিল যুক্তি-চিন্তাহীন আবেগ। মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে বিশ্বম্ভর সেই আবেগকে ত্যাগ করতে পারেনি।

আর সেই আবেগই উন্মুক্ত-দ্বার হয়েছে ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের মনের জগৎ— এসেছে কৃষ্ণাবাঈয়ের অবয়বে অতীত প্রেমিকা, জমিদারি আভিজাত্যে নির্বাচিত প্রেমিকা চন্দ্রাবাঈ। দীর্ঘদিন পরে জলসাঘর সাজানো, বিশ্বম্ভরের ঘরে বসে মদ্যপান, বাঈজীর সামনে এসরাজবাদন, জমিদারের জলসাঘরের বিলাসের জন্য নির্বাচিত পোশাক পরিধান, চন্দ্রাবাঈ ভেবে কৃষ্ণাবাঈকে আদর করা, শেষে গভীর তীব্র উত্তেজনা এক উত্তাল ঝোঁকে এই প্রৌঢ় বয়সেও তুফানের পিঠে চেপে ভোরে ভ্রমণে বেরিয়ে আসা— সমস্ত কিছু ঘটেছে সেই আবেগে এবং সেই নাটকীয়তায়—যা তারাশঙ্করের এই জাতীয় চরিত্র অঙ্কনে প্রধান শিল্প-রসদ।

নায়েব তারাপ্রসন্নকে ' ছোটগিন্নী' হস্তিনীর পিঠে চড়ে মহিম গাঙ্গুলীর বাড়ি নিমন্ত্রণে লৌকিকতা পাঠানোর নির্দেশে আছে সেই পুরনো আভিজাত্যবোধ। মহিম আসে তার মোটর নিয়ে, জমিদারের সেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রায়-নিঃস্ব বিশ্বম্ভরের নায়েবের হাত দিয়ে দু'টি মোহর-রাখা রেকাব জলসাঘরে নাচের আসরে কৃষ্ণাবাঈয়ের জন্য পাঠানোর মধ্যেও আছে সেই নিষ্ফল আভিজাত্যবোধ। একদিকে নতুন করে জমিদারি

আভিজাত্যবোধ ও গৌরবকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, আর একদিকে ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের চন্দ্রাবাঈয়ের রোমান্টিক প্রেমের স্মৃতি। অনেকটাই নস্ট্যালজিয়ার মতো—জমিদারের টাইপ ভূমিকা ও ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের মানসভূমির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সেব শারীরিক অক্ষমতার মধ্যে বিশ্বম্ভরের মনের গভীরে মোহের জাগরণ, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ও উত্তেজনা তার মৃত্যু ডেকে আনে।

গল্পের প্রথম দিকে অভিজাত, হৃত-সর্বস্ব, পুরনো জমিদারের তথা সামন্ততন্ত্রের যে পরিবেশ, জলসাঘরে একবার, শুধু একটা রাতের জন্য তা জ্বলে ওঠে। এমন হঠাৎ প্রজ্বলন সচেতন মুমূর্ষু কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর আগের মুহূর্তে বুঝিবা ক্ষণিক-সুস্থতাবোধের প্রকাশ। বিশ্বম্ভরের ব্যক্তি-স্বভাব জলসাঘরের রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের পর ভোরের দিকে তুফানকে নিয়ে আবেগে-উত্তেজনায় বেরিয়ে পড়ায় তার স্বাক্ষর। দুরন্ত অভিজাত যৌবন-স্বভাব থেকে বিশ্বম্ভর আবার ফিরে আসে বর্তমান মানসিকতায়। হারানো হাট কীর্তিহাটেব সামনে থেকে তার ফিরে আসার পরবর্তী চিত্র এইরকম:

> 'তিনি হাঁপাইতেছিলেন; অনুভব করিলেন, তুফানও থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পড়িলেন। .... তুফান মুখ তুলিতে পারিল না। সুরার মোহ বোধ করি তখনও তাঁহাব সম্পূর্ণ যায় নাই। বলিলেন, ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি বেটা তুফান! ওঠ্‌-ওঠ্‌ ।'

এই কথাগুলি বস্তুত বিশ্বম্ভরের নিজেকে বলা, নিজেকে বর্তমান দিয়ে চেনা। কিন্তু যখন তার এই চেনা নিজেকে, সে সময়টা শেষের সময়। ওপরে ওঠার সময় জলসাঘরের খোলা দরজা দিয়ে তার বিধ্বস্ত, অসংলগ্ন রূপ দেখে। তারই মধ্যে সামনে আসে পূর্বপুরুষদের ছবি:

> 'দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন — মোহ' কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহর এই ঘরে জমিয়া আছে।'

এমন যে মুহূর্তে বিশ্বম্ভরের সভয় আত্মসচেতনতার বহিঃপ্রকাশ, পরমুহূর্তেই তার আসন্ন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব-মুহূর্তের অনন্তকে ভয়ার্ত কণ্ঠে সম্বোধনের ঘটনা! গল্পের অন্তিম শৈল্পিক ব্যঞ্জনা এখানেই ধরা পড়ে। ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের মৃত্যুর ব্যঞ্জনাতেই গল্প শেষ।

আগেই বলেছি, তারাশঙ্করের শিল্পী-মনের উপযোগী বৈশিষ্ট্য যে চরিত্রে নাটকীয়তাকে জড়িত করা — এখানে তার আর এক প্রমাণ। ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের অতীত প্রেমিকা চন্দ্রাবাঈয়ের স্মৃতির গাঢ় অনুষঙ্গে যে মোহের জাগরণ, তার শেষ মোহভঙ্গ ঘটেছে ব্যক্তি থেকে জমিদার বিশ্বম্ভরের জমিদারি মোহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার মানসিকতায়:

> 'রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে — জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর — জলসাঘরের —আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।'

এই শেযতম ভাঙা সংলাপ ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের নয়, গল্পকার জমিদার কথা ভেবেই

বসিয়েছেন। দরজায় চাবুকের আঘাতের অর্থই অতীতের জমিদারি মোহকে তীব্র অস্বীকার, আর তাতে এটাও প্রমাণ হয়ে যায় জলসাঘরের দিনও শেষ। ব্যক্তি বিশ্বম্ভর রায়কে দিয়ে গল্পের 'মহামুহূর্ত' রচনা, জমিদার বিশ্বম্ভরকে দিয়ে তার অন্তিম শৈল্পিক ব্যঞ্জনার বিস্তার। বিশ্বম্ভরের মৃত্যুতে যে বেদনা, বিষাদময়তা, যে অশ্রুসজল অসহায়তা, তার মধ্যে তারাশঙ্করের পুরাতনের প্রতি শেষমুহূর্তে এক চাপা সহানুভূতি ও মমত্ববোধ থেকে যায়। শেষ সংলাপের প্রয়োগে সূক্ষ্ম মেলোড্রামা ও চরিত্রন্যায় পরিশীলিত শিল্প-অবয়বে সুষম।

পুরনো জমিদার তন্ত্রের পাশাপাশি নব্য বণিক সভ্যতা থেকে উদ্ভূত নতুন ধনী মহিম গাঙ্গুলীর চরিত্র 'জলসাঘর' গল্পে বিশ্বম্ভর রায়ের সামগ্রিক রূপনির্মাণে ও বিকাশে সহায়ক টাইপ। গল্পে তার পরিকল্পনায় তারাশঙ্কর যথেষ্ট সচেতন থেকেছেন। তার কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, সে কেবল নতুন সভ্যতার উপকরণ ও সামাজিকতা নিয়েই উপস্থিত। রোমান্টিক বণিক বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অর্থনীতি, যে বিশেষ প্রবণতা ও লক্ষণ, সেগুলির সমবায়েই তার পূর্ণ অবয়ব এই গল্পে। স্পষ্টত তার মধ্যে রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব এবং পুরনো জমিদার তন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা, উপহাস ও ব্যঙ্গ।

গল্পে মহিম গাঙ্গুলী আরও বড়লোক। তারাশঙ্কর পুরনো জমিদারি আভিজাত্যের পাশে এই জাতীয় টাইপ ব্যক্তিত্বকে কিছুটা ছোট করে দেখাতে স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুত থাকেন — অবশ্যই গল্পের শিল্পের প্রয়োজনে তা খাপ খেয়ে যায়। জীবন ধারণে ও যাপনে মহিম আধুনিক, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিপোষক। তার বাড়ির ছাদে জ্বলে বিজলীবাতি, তার নব্য আভিজাত্যের অহংকার ও পরিচয় মেলে পেটা ঘড়ির শব্দে, মোটর গাড়ি ব্যবহারে, জমিদাবি ব্যবস্থার অনুরূপ পুত্রের অন্নপ্রাশনে ব্যান্ড বাজনায়, পাঁচদিন ধরে বাঈজী এনে নাচগানের আসর বসানোয়।

> 'মহিম উঠিয়া তাচ্ছিল্যময় আলস্যভরে একটা আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া বলিল, উঠি তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।'

নতুন বণিকতন্ত্রে 'সাহেব' তোষণ একটা বৈশিষ্ট্য। তা জমিদারি আভিজাত্য থেকে স্বতন্ত্র, ব্যক্তিত্বহীনতা ও তোষামোদ জাতীয় স্বভাবে ভিন্ন দিক চিহ্নিত করে।

মহিমের বাড়ির আসর আলোর ঐশ্বর্যে আধুনিক জীবনকে তুলে ধরে। আসরে বয়োজ্যেষ্ঠা নর্তকীর গানে ক্লান্তি এলে মহিম ভদ্রতায় প্রশংসা করে গান শেষ হওয়ার আগেই। পরের চপলগতি কণ্ঠসঙ্গীত আর চটুল নৃত্যে আসর জমে উঠলে মহিম তাদের আরও তিনদিন উৎসবের আসর মাতিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। জমিদারি জলসাঘরের পাশে মহিমের আসর যে একান্তই কৃত্রিম, একান্তই যান্ত্রিক, হৃদয়সর্বস্বহীন, তারাশঙ্কর মহিম চরিত্রের অন্তর-স্বভাবে তারই প্রতীকী চিত্র এঁকেছেন। মহিমের রসবোধ যে অভিজাত নয়, হঠাৎ-বড়লোক হওয়ার কারণে কৃত্রিম, অশিক্ষিত, জলসাঘরে বিশ্বম্ভরের সামনে মহিমের আচরণ তা প্রমাণ করে:

> 'অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে, চপলসঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফানুস উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুৎ আচ্ছা।

রায়-কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।'

এই চিত্রে তারাশঙ্কর মহিম চরিত্রে নতুন ধনী হওয়ার কারণে অসঙ্গত রসবোধের প্রতি শ্লেষ করেছেন।

জমিদার রায়-দপ্তরের এলাকায় গাঙ্গুলী বংশ চিরদিন মহাজনি করেছে। মহিমের বাবা জনার্দন রায়বাড়ির কর্তাকে বলত 'হুজুর'। বিশ্বম্ভরকে সেই সম্মান দেয় না মহিম। বরং নিজের অর্থগৌরব ও রুচির আভিজাত্য জানাতে লক্ষ্ণৌ-এর বাঈজীকে তার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে নিয়ে আসার প্রসঙ্গ জানিয়ে ধনগর্বের স্পর্ধা জানায়। বিশ্বম্ভরের সামনেই, 'বাড়িটা করে রেখেছেন কি ঠাকুরদা, মেরামত করানো দবকার যে,' — বিশ্বম্ভরের কাছ থেকে ফিরে যাবার সময় এমন কথা বলে যাওয়ার মধ্যে জমিদারের অর্থদৈন্য ও অক্ষমতাকে, তার অবশ্যম্ভাবী পতনের অসহায়তাকে শ্লেষ করে যায় মহিম। মহিম তার বাড়িতে আগত নর্তকীদের পাঠায় বিশ্বম্ভর রায়ের বাড়ি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই। সেখানেও সেই বণিক সভ্যতার দম্ভ প্রধান। ক্রুদ্ধ নায়েব তারাপ্রসন্নের চিন্তা — 'এ ওই কুটিল মহিম গাঙ্গুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে।'

এইভাবে তারাশঙ্কর মহিমের চরিত্রে অন্তর্নিহিত রেখেছেন তার টাইপ ভূমিকা। নতুন ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যে কৃত্রিম এবং যান্ত্রিক, কিছুটা ব্যক্তির প্রতি মমত্ববোধহীন, সূক্ষ্ম অর্থে অমানবিক, বিশ্বম্ভর রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে তার পরিচয় মেলে। মহিমেব পুত্রের অন্নপ্রাশনে বিশ্বম্ভর নিমন্ত্রণে যায়নি তার জন্য অভিযোগ জানাতে ও বাঈজী আনার চাপা গৌরব ও অহংকার জানাতে এসে মহিমের আচরণ তাবই প্রমাণ দেয়:

'মহিম বলিল, আমার ভারি দুঃখ হয়েছে ঠাকুরদা ।.... হাসিয়া বিশ্বম্ভব বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদা বলে ভুলে যাও ভাই। বুড়ো মানুষ, নিয়মের ব্যতিক্রম দেহে সহ্য হয় না।

মহিম বলিল, সে দুঃখ ভুলব, কিন্তু রাত্রে পায়ের ধুলো দিতেই হবে। .... শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম, বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মাঝে মাঝে বড় কাতর করে আমাকে। মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তা হ'লে উঠি ঠাকুরদা। আমায় আবার যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার, তারা সব আসবেন কি না।'

এই সংলাপ-বিনিময়ের মধ্যে মহিম বিশ্বম্ভরের অসুস্থতার কথা শুনে একবারও কোনো মানবিক মমত্ববোধের ও সান্ত্বনা-বাক্যের কথা বলেনি। এমন যান্ত্রিক কৃত্রিম ব্যবহারে তারাশঙ্কর সম্ভবত নতুন অর্থগর্বী বুর্জোয়া সভ্যতার যান্ত্রিকতার দিক তুলে ধরেছেন।

মহিমের একাধিক আচরণ প্রমাণ করে, জমিদার ও ব্যক্তি বিশ্বম্ভর রায়ের পাশে সে কৃত্রিম, টাইপ চরিত্র। এরা নতুন অর্থভিত্তিক এক আভিজাত্যের জনক। গল্পের মধ্যে

তারাশঙ্কর মহিম চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে যে সংবাদ দিয়েছেন বিশ্বম্ভর রায়ের জমিদারি স্বত্বের ও ভোগব্যবস্থার, তাতেই তার পরিচয় মেলে:

> 'জীর্ণ ফাটল-ধরা রায়বাড়ির নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।
>
> সেইটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ। তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতিব বেশী। মহিম গাঙ্গুলী ভাবে, মরা-পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে।'

এই হল মহিম গাঙ্গুলী, তথা পুরনো ও নতুনের মধ্যে মৌল দ্বন্দ্বের প্রধান দিক। 'জলসাঘর' গল্পে মহিমের যে চরিত্র ব্যাখ্যা , তার প্রধান লক্ষ্য বিশ্বম্ভরই। বিশ্বম্ভরের জমিদার হিসেবে ও ব্যক্তি হিসেবে ব্যর্থতার করুণ বিষাদময় চিত্র আঁকার কারণই গল্পে মহিমের তৎপরতা। আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতার ধনগর্বী মহিম গাঙ্গুলী প্রাচীন মৃত্তিকাপ্রোথিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের বিপরীত। এই বৈপরীত্যই গল্পের শিল্প-অবয়বকে দিয়েছে গতি।

তিন

'জলসাঘর' গল্পটিতে এর কেন্দ্রীয় ভাবের একমুখিতা অবশ্যই রক্ষিত । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির শুরুতে এনেছেন জমিদার বিশ্বম্ভর রায়কে — তার যাবতীয় অতীত আভিজাত্য ও বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু রূপাবয়ব চিত্রিত করে, সেই সঙ্গে পরিণতি চিত্রেও বিশ্বম্ভরের মৃত্যুতে তার সফল রূপ এঁকেছেন দক্ষ শিল্পীর কলমে। গল্পের মধ্যে সামান্য কিছু বৃত্তান্ত অংশ আছে লেখকের নিজস্ব কলমে শিল্পের অধিকারেই, কিন্তু তা অনাবশ্যক নয়। বিশ্বম্ভর রায়ের অতীত পাঁচ পুরুষের পরিচয় দান, তাদের জীবনধারণ ও জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের পরিণাম ইত্যাদি এবং বর্তমান নবীন সভ্যতার সঙ্গে এই রায় বংশের বিরোধ চিত্র উপস্থাপনায় বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু তা ছোটগল্পের পরিমিত শিল্পকৌশলে সংযত।

'জলসাঘর' গল্পের যে কেন্দ্রীয় ভাব তা পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্বের স্বরূপ অঙ্কনে বিশিষ্ট। কিন্তু এই ভাবকেন্দ্র ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের ও টাইপ মহিমের সংঘর্ষে আর এক মাত্রা পায়। পুরনো সামন্ততন্ত্রের প্রতি মোহ থেকেই বুঝিবা 'জলসাঘর' গল্পের জন্ম। লেখকের এই মোহ পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্বের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাসে রূপ নিয়েছে লেখকের দিক থেকে বিশ্বম্ভর রায়ের মৃত্যুতে ব্যঞ্জনার মধ্যে। নতুন সভ্যতায় মহিম গাঙ্গুলীর আবির্ভাব শুধু নূতন-পুরাতন দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য নয়, জমিদারি ব্যবস্থা যে সাধারণ প্রজাদের কাছে কী ছিল, তার একটা সূক্ষ্ম চিত্রও লেখক ছাড়া ছাড়া ভাবে এঁকেছেন এ গল্পে।

জমিদার শ্রেণী অবলুপ্ত হলে, অন্তত সভ্যতার অগ্রগমনের নিয়মে ভঙ্গুর, অক্ষম হলে

তার স্থান কে নেবে, নিতে পারে, তারাশঙ্কর তা ভেবেছেন সূক্ষ্মভাবে। তাই বিশ্বম্ভর রায়ের পাশে এঁকেছেন মহিম গাঙ্গুলীকে। আবার মহিম গাঙ্গুলীরা জমিদারেরই ছিল অধীন। জমিদারের অর্থানুকূল্যেই তাদের বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা। 'গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায় দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে' — এমন সংবাদে প্রমাণ হয় প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনায় — সামন্ততন্ত্রের রন্ধ্রপথেই দেখা দেয় ধনতন্ত্র। মহিম গাঙ্গুলী সেই ধনতন্ত্রের প্রতীক। আবার পুত্রের মধ্যেই যেমন থাকে নিজ পিতৃহত্যার একমাত্র বড়শক্তি, তেমনি ধনতন্ত্রই পারে সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে। মহিম গাঙ্গুলীর প্রয়াস জমিদার তন্ত্রের নিজ ভাগ্যেরই নিশ্চিত নির্দেশ।

এই বিষয়টিকে তারাশঙ্কর গল্পের ব্যঞ্জনায় সঠিক রাখতে পেরেছেন। দেশীয় সেন্টিমেন্ট নয়, মাটির অধিকার নয়, নব মানবতার ব্যাখ্যায় জমিদারদের বিদায় নিতে হবে, শাসক শ্রেণীর আইন তাই শেখায়, জানায়। তাই প্রিভি কাউন্সিলের রায় জমিদারের পক্ষে যে থাকতে পারে না, নব আলোকিত সভ্যতার শর্তই তাই। সেখানে জমিদারদের সরিয়ে যে অবধারিতভাবে মহিমরা আসবে — এটাও ইতিহাসের নির্দেশ এবং নির্মম সত্যও। তারাশঙ্কর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তিরিশের দশকে বসে এই সত্য বুঝেছিলেন বলেই 'জলসাঘর' গল্পে তাকে কাজে লাগিয়েছেন। 'জলসাঘর' গল্পে এই দূরদর্শিতা অবশ্যই সশ্রদ্ধায় মান্য।

কিন্তু এই লেখক জমিদারি প্রথার পাশে নব সভ্যতার বুর্জোয়া অর্থনীতি-ব্যবস্থার প্রতি, তন্নিহিত মানব সম্পর্কের অকপটতার প্রতি যে বিশ্বাসী হতে পারেননি সে সময়ে, তার চিত্র জীবন্ত হয়ে আছে গল্পের শেষে :

> 'মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ধূলার ঘূর্ণী উড়াইয়া তুফান তুফানের বেগে ছুটিয়াছিল। ... প্রান্তর শেষ হইয়া গ্রাম — গ্রামখানার নাম কুসুমডিহি। পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাড়ি চলিয়াছে। আরোহী তাহাতে দুই জন। বোধ হয় তাহারা হাটে চলিয়াছিল। কয়টা কথা তাহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল, গাঙ্গুলীবাবুরা কিসে থেকে —
>
> রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতি রোধ করিলেন। তখনো গাড়ির আরোহী বলিতেছিল, খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে—
>
> চারিদিকে চাহিয়া রায় চমকিয়া উঠিলেন।'

এই চিত্রে তারাশঙ্কর জমিদারি আমলের প্রজাবৃন্দের সুখ ও নব সভ্যতার অর্থ-ব্যবস্থার কারণে প্রজাদের অকপট অতৃপ্তিজনিত স্বীকারোক্তির দিক স্পষ্ট করেছেন। গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব যে সঠিক প্রজাদের ক্ষেত্রে, নববুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থা যে গ্রামবাসীদের কিছু বিপর্যয়ের কারণ হয়, এই চিত্রে তার প্রমাণ মেলে। তারাশঙ্কর প্রকারান্তরে জমিদারি আভিজাত্য ও অর্থ-ব্যবস্থার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছেন।

বাঈজী নাচের আসরে মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস, পুত্রের অন্নপ্রাশনের জলসায় বেশ্যাদের নিয়ে আসার রুচি, জলসাঘরের আসরে মহিমের পিয়ারীকে নিয়মভঙ্গ করে বকশিশ দান, বকশিশ দেবার সময় বিশ্বম্ভরের অতিথি হয়ে তার সামনেই মহিমের বলা — 'কৃষ্ণাবাঈ, থোড়া ইনাম ইধার' — এসব আচরণও নব্য ধনীদের বিকারগ্রস্ততা ও অর্থমদের মত্ততাকে শ্লেষচিত্রের ব্যঞ্জনা দেয়। বস্তুত গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবটিকে তারাশঙ্কর ধনুকে টান টান ছিলা পরানোর মতো রেখে নতুন সভ্যতার বিকারকে প্রচ্ছন্নভাবে এবং বিদায়ী জমিদারি প্রথার জন্য বিষাদময়তা স্পষ্ট করে কেন্দ্রীয় ভাবের ঔজ্জ্বল্য বজায় রেখেছেন। 'জলসাঘর' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বা ভাববস্তু এর নিটোল প্লট-বৃত্ত ও সার্থক চরিত্রের সক্রিয়তায় এবং স্বভাবে অসামান্য ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে উঠেছে।

চার

আগেও বলেছি, তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে সাধারণভাবে থাকে নাটকীয়তা, বিবৃতিধর্মিতা, আবেগাতিশায়িতা আদর্শবাদ এবং সেই সঙ্গে চরিত্রচিত্রণ-সর্বস্বতা। ব্যক্তিজীবনের মনের জগতে যে জটিল অন্ধকার আছে, আছে গোপন রহস্য, তার সন্ধানী তারাশঙ্কর নন — যে অর্থে ফ্রয়েডীয় অন্ধকার বেশ কিছু লেখককে টানে। 'জলসাঘর' গল্পে আছে কাহিনী ও ঘটনা, আছে নায়ক চরিত্রের মনোলোকের উত্থান, সেই সঙ্গে নবীন মহিমের সঙ্গে রায়-এর সামাজিক স্ব-স্ব-স্থান ও জীবনদৃষ্টি নিয়ে সংঘাত।

এসব আঁকতে গিয়ে তারাশঙ্কর গল্পের গোড়াতেই চমৎকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। পর পর দুটি অনুচ্ছেদে আছে হতমান ও ক্ষীয়মান জমিদারতন্ত্রের প্রতীকী চিত্ররচনার প্রয়াস। বিশ্বম্ভরের ভোরে ওঠার অভ্যাস, খানসামা অনন্তর সহায়তা, রায়বাড়ির কালীমন্দিরের তলদেশে শুভ্র স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার ক্ষীণধারায় বয়ে যাওয়া, রায়বাড়িতে ঘড়ির ঘণ্টা না-বাজা, প্রকাণ্ড ফাটলধরা জীর্ণ প্রাসাদ, মালীর অভাবে শুকনো ফুলের বাগান—এসব দিয়ে গল্পকার জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের অসহায় অবস্থার দিক বুঝিয়েছেন। এরই মধ্যে আবার গাঙ্গুলীদের বাড়ির 'প্রাসাদশিখরে বহুশক্তি বিশিষ্ট একটা বিজলী বাতির অকম্পিত ভাবে' জ্বলা, ছাদের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহর ঘোষণা — চিত্রের বৈপরীত্যে গল্পের মূল বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্বম্ভরের স্মৃতিতে নহবৎ, প্রত্যক্ষভাবে কানে বাজে ব্যান্ডপার্টির সুর। গাঙ্গুলীদের ঝকঝকে মোটর, তার পাশে জমিদারের হস্তিনীর পিছনে বসা নায়েব। এইসব বিপরীত স্বভাবের বিষয় দিয়ে গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবের যথোচিত শিল্পবিকাশকে পাঠকের কাছে রেখেছেন গল্পকার।

আসলে গল্পে তারাশঙ্করের প্রকাশভঙ্গিতে যেমন আছে বিবৃতিধর্ম, তেমনি নাটকীয়তা। ইঙ্গিতধর্ম সক্রিয় ও সচিত্র হয়েছে লেখকের বর্ণনাকৌশলে। বর্ণনার মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে গল্পকার শ্লেষ ব্যবহার করেছেন। বিশ্বম্ভরের জমিদারি ব্যবস্থার প্রতি যেমন মহিম শ্লেষাত্মক কথা বলেছে, তেমনি লেখক স্বয়ং মহিমের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ব্যবহার থেকে বিরত হননি। মহিম সিগারেটে টান দিয়ে, জলসাঘরের মধ্যেকার নিবন্ত বাতিগুলির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে :

'কটা বাতি নিবে গেল যে হে! ... নায়েববাবু! ... দেখুন আলো বেশ খোলে নি।
আমার ড্রাইভারকে বলে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।'

জমিদারের প্রতি মহিমের এই শ্লেষাত্মক সংলাপ গল্পকারের প্রকাশরীতির সৌন্দর্য বাড়ায়।

'জলসাঘর' গল্পের গদ্যরীতি সাধুভাষাব অনুপন্থী। এই ভাষায় জমিদারি ব্যবস্থা ও জমিদার চিত্র তার গাম্ভীর্য যথাযথ বজায় রেখেছে। সংলাপগুলির প্রয়োগে আছে চলিতরীতিও। একাধিক ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর নিজেই কিছু কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। সে সব ক্ষেত্রে গল্পের গতি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। কাহিনীর আকর্ষণ চরিত্র-ব্যতিরেকে থাকলে বিবৃতিধর্মের সীমা থেকে যায়। তারাশঙ্করের বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের সে গতি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। বিশ্বম্ভরের চরিত্র, মনোলোক, সক্রিয়তা তার বাড়ির ও নিজের ইতিহাসের বর্ণনার সঙ্গে এমনভাবে মিশ্রিত করেছেন গল্পকার যে, কোথাও গল্পের পাঠক থেমে থাকার 'মনটনি'তে আক্রান্ত হবার সুযোগই পায় না। গল্পটির 'মহামুহূর্ত' অংশটি একটু দীর্ঘ, কিন্তু জলসাঘরের চমৎকার পরিবেশে তার তীব্রতা, রোমাঞ্চকর মুহূর্ত ও গতিময়তা গল্পের শেষ চিত্রের পক্ষে অবধারিত যথাযথ ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সমর্থক হয়েছে। গল্পের শেষতম অংশ নাটকীয় মনে হতেই পারে, কিন্তু চরিত্রন্যায়ে তা একান্ত স্বাভাবিক। শুধু বিশ্বম্ভর রায়ের মৃত্যু নয়, জমিদারতন্ত্রের শেষ পতনের ছবি তার ব্যঞ্জনায় অন্তঃশীল থাকায় গল্পের পরিণামী আঘাতে আছে প্রতীকী তাৎপর্য। তা হল নতুনের পাশে পুরনোর পরাজয়ের বিষাদমাখা শেষ শ্বাসের পতন!

পাঁচ

'জলসাঘর' গল্পের নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এই নামে যেমন এক জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের মনোভঙ্গির প্রকাশ-তাৎপর্য স্পষ্ট হয়, তেমনি গল্পের কাহিনী-আবহে জমিদার শ্রেণীর দীর্ঘদিন-আচরিত বিলাসবহুল জীবনের বিশেষ অধ্যায়টির সঙ্গে পাঠকের সম্যক পরিচয় ঘটে। সাধারণ ব্যাখ্যায় সমগ্র গল্পে বিশ্বম্ভর রায়ের জলসাঘর— যা অর্থাভাবে এবং জমিদারি আভিজাত্যের ও অহমিকার শেষ পাণ্ডুর দিনগুলিতে প্রায়-পরিত্যক্ত, তার নবসজ্জা ও তাকে নতুন বাঈজীর নাচের কারণে ব্যবহার করার মধ্যে উল্লেখ্য হয়ে ওঠে। আবার এই জলসাঘরেই বিশ্বম্ভরের এই প্রৌঢ় বয়সেও নতুন করে মদ্যপান, এসরাজ বাজানোর বিলাস, অতীত প্রেমিকা চন্দ্রাবাঈ-এর প্রসঙ্গে পুরনো প্রেমের স্মরণ এবং মোহ জাগরণের মধ্য দিয়ে উত্তেজনার আবেগে তুফানকে নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ— এসবে জমিদারের অন্তিম মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটে যায়। সমস্ত কিছুর মূলে সেই জলসাঘর। তাই প্লট-বৃত্তে পুরনো জলসাঘরের নতুন গুরুত্ব পাওয়ায় নামের সার্থকতা মোটামুটি শিল্পের ভূমি পেয়ে যায়।

দ্বিতীয় একটি তাৎপর্য 'জলসাঘর' নামটিকে শিল্পে-ন্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। গল্পের শেষে বৃদ্ধ তুফানকে নিয়ে বিশ্বম্ভর বাড়ি ফেরে। দুজনেই খুবই ক্লান্ত। এমন অসহনীয় ক্লান্তির মধ্যে বিশ্বম্ভর তুফানকে বলে 'ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল।

লজ্জা কি বেটা তুফান! ওঠ্—ওঠ্।' এই নতুন করে প্রেরণা দেওয়ার ভাষার মধ্যেও আছে সুরার মোহ। কিন্তু এই বিশ্বম্ভর বাড়ির মধ্যে ঢুকে যখন দোতলায় শূন্য জলসাঘর দেখে, কিছু আলো এখনও জ্বলতে দেখে এবং সেই আলোয় দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়-বংশধরগণের মুখে মত্ত হাসি দেখার বিভ্রমে পড়ে, তখন—

> 'সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।'

বিশ্বম্ভর রায়ের এই দর্শন ও ভাবনার মধ্যেই গল্পনামের সার্থকতা লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জলসাঘর আর কিছুই নয়, জমিদারদের মোহকে লালন-পালন করার বংশানুক্রমিক এক আশ্রয়। তাদের আভিজাত্য প্রকাশের, তাদের বিলাসকে আড়ম্বরপূর্ণ আকর্ষণীয় করার কারণেই জলসাঘরের জন্ম ও তার রক্ষণাবেক্ষণ। জলসাঘর বাদ দিয়ে জমিদারি আভিজাত্যই বিলুপ্ত হয়ে যায়। মোহের আকর্ষণেই যার অস্তিত্বের মূল্যায়ন, সমগ্র গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভরের জীবনে তা-ই হয় শেষ নিয়তি। আসলে, সমস্ত জমিদারের যে প্রচুর অর্থব্যয়ে, বিলাসে-বৈভবে জলসাঘরের নির্মাণ, তা তাদের নিয়তিরই ঘোষক হয়ে ওঠে পরিণামে। গল্পের অন্তিমে তারই প্রতিচিত্রণে নাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিল্পের সুষমায়।

তৃতীয় ব্যাখ্যাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নামের শিল্পভিত্তি ব্যাখ্যায়। জলসাঘর হল একটি প্রতীক, সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক অভিজ্ঞান। প্রজাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কর আদায়ে বা শাসনে-শোষণে যে অর্থাগম, তাকে নিজেদের বিলাসের স্বার্থে ব্যয় করা হয়েছে এখানে। তার ওপর জমিদারদের বিলাসের মধ্যে ছিল যে সঙ্গীতপ্রীতি, যে সূক্ষ্ম সঙ্গীত শিল্প ঘরানার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, তাকে স্থায়ী করেছে এই জলসাঘর। নৃত্যগীতের ইতিহাসে জলসাঘর-এর অবদান সামন্ততন্ত্রের পক্ষে কম নয়। প্রজাদের শোষণে-শাসনে হোক, বা সংগৃহীত করের অপচয় হোক, ভারতীয় সূক্ষ্ম সঙ্গীত-নৃত্যশিল্পে জলসাঘর এক আকর্ষক বিষয়। সেটি বিশ্বম্ভর রায় নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছে তার নিজের এসরাজ বাজানোর মধ্য দিয়ে এবং উঠতি বড়লোক মহিম গাঙ্গুলীর পাশে যথার্থ গান ও নাচের তারিফ করে। কৃষ্ণাবাঈ বেশ্যা হতে পারে, কিন্তু তার অবয়বে বিশ্বম্ভর রায় দেখেছে চন্দ্রাবাঈয়ের উপস্থিতি, তার অনবদ্য সুর ও কণ্ঠ, গানের মাদকতা ও মোহ, যথার্থ প্রাচীন বাঈজী নৃত্যের নিখুঁত প্রয়োগ বৈচিত্র্য— যা মহিমের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এই যে প্রাচীন নৃত্য-গীত ঘরানার পুনর্জন্ম ঘটল জলসাঘরে—তা সাময়িক হলেও —তারাশঙ্কর তাকেই এখানে বড় করে দেখেছেন। তাই জলসাঘর শুধু মোহের উদ্রেক করে না, তা যেমন বনেদি আলোকসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটায়, তেমনি পুরনো ক্লাসিক্যাল গীত-নৃত্যের আসরকেও আমাদের, একালের মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। গল্পে 'জলসাঘর' নামের এক গভীর প্রোথিত ব্যঞ্জনার অনুরণন আছে— যা ঐতিহাসিক মর্যাদায় ধন্যও। বিশ্বম্ভরের মোহ জাগরণ, প্রেমবোধ, অসহায়তা ও মৃত্যু দিয়ে এমন জলসাঘরের তাৎপর্য গল্পের শিল্পে যোগ হলেও এই জলসাঘর তার নিজস্ব

ঐতিহ্যানুসারী মর্যাদাকে হারায় না। তাই নাম জলসাঘরের নিজ গুরুত্ব ও গল্পের চরিত্রের গুরুত্ব দুয়ে মিলে বড় ব্যাখ্যা পেয়ে যায়।

চতুর্থ এবং শেষ ব্যাখ্যায়, এমন নামের পক্ষে, গুরুত্ব পায় মহিম গাঙ্গুলীর পুত্রের অন্নপ্রাশনে তার বাড়িতে জলসাঘর আয়োজনের বৈপরীত্যের দিক থেকে। নতুন ধনী মহিম। জমিদারের দাপট ও আভিজাত্য খর্ব করতে, তাকে অতিক্রম করতে সে-ও জলসার আয়োজন করে কিন্তু তার নেই সঙ্গীতশিল্প সম্পর্কে কোনো রসবোধ। শুধু অর্থের গর্বই তার একমাত্র মূলধন। মাটির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন, এই ভুঁইফোড় ধনীর দল বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনীতির ধারক ও বাহক হতে চলেছে। আর যা কিছু মূলকে অস্বীকার করে বাঁচতে চায়, তা তো ক্ষণিক, আত্মবিধ্বংসী! মহিম গাঙ্গুলী কৃষ্ণাবাঈদের আরও তিনদিন রেখে দেয় জলসার গান-বাজনা শোনার জন্য। কোনো ক্লাসিক্যাল গৌরব সমুন্নতি নেই সেই বাসনার মধ্যে। হালকা, চটুল রস-রসিকতাবোধই মহিম গাঙ্গুলীর একমাত্র সঙ্গীতবোধের আশ্রয়। তার পাশে বিশ্বম্ভর রায়ের জলসাঘর দেখায় সত্যিকারের সঙ্গীত-নৃত্যের তাবিফ করার মতো আভিজাত্য কাকে বলে। বিশ্বম্ভর রায়ের পাশে মহিম গাঙ্গুলীর আচরণ জলসাঘবেব পক্ষেই বিসদৃশ! যেখান থেকে গল্পের জলসাঘর সাজানো ও গানের আসর বসার ঘটনা ঘটে, তার পরে মহিমের জলসাঘর ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত মহিমই ছোট হয়ে যায় বিশ্বম্ভরের সঙ্গীতজ্ঞান ও নৃত্যপ্রীতির মহিমা থেকে। এই বৈপরীত্যই গল্পের মূল গতিব সূত্র। মহিমের বাড়ির জলসা ও মহিমের রসবোধ এবং বিশ্বম্ভরের জলসাঘরের জলসা ও তার নৃত্যগীতের প্রতি সংযত প্রাজ্ঞ আকর্ষণ—দুইকে দেখানোর কারণেই তারাশঙ্কব জলসাঘরকে গুরুত্ব দিয়েছেন আর এক অর্থে। তাই গল্পের নামের সঙ্গে নূতন-পুরাতনেব প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষ ব্যঞ্জনায় পাঠকচিত্ত অবলীলায় অধিকার করে বসে।

৭.

অগ্রদানী

এক

বাংলা তেবশো তেতাল্লিশের চৈত্র সংখ্যা মাসিক 'প্রবাসী'র পাতায় প্রথম প্রকাশ ঘটে তারাশঙ্করের বিখ্যাত 'অগ্রদানী' গল্পটির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তখনো প্রায় তিন বছর বাকি। বিশ শতকের তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর যে সমস্ত গল্প লিখেছেন সেগুলির মধ্যে গ্রামীণ জীবন, মানুষ, বিশেষ করে বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া অঞ্চলের একটি স্থানিক ভৌগোলিক জীবন ও মানবস্বভাব, অঞ্চল ও তার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিশ্চিত জায়গা কবে নিতে থাকে। বোঝা যায়, তাবাশঙ্কর তাঁব গল্পে বিশেষ অঞ্চল, পরিবেশ এবং সেই সবের মধ্যে বিচিত্র-স্বভাবী মানুষদেরই গ্রহণ করেছেন। পবিবেশ রচনা এবং চরিত্র-সন্ধান দুই মিলে যে এই গল্পকারের এক বিশেষ জীবনদর্শন রচিত হবে, তিরিশের দশকেব রচনায় তার প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি মেলে।

'অগ্রদানী' সে রকম একটি গল্প, যার মধ্যে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থায় মানুষের আদিম স্বভাবের সঙ্গে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের নিষ্ঠুর দিক নানাভাবে স্পষ্ট হতে থাকে। তারাশঙ্কর বীরভূম অঞ্চলের মানুষ, শিল্পী হিসেবে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন বর্ধমান ও বাঁকুড়ার দিকেও, আর তাতে যে সব মানুষ 'প্যানোরামিক' পটে এসে যায়, এদের গল্পকার সমাজ-অর্থনীতির বাস্তব ন্যায়েই অন্তত কিছুটা আঁকতে চেয়েছেন। 'অগ্রদানী' গল্পের নায়ক পূর্ণ চক্রবর্তী সেরকম এক নির্বাচন। পূর্ণ চক্রবর্তীর পেশা পৌরোহিত্য, যার মূলে কোনো কায়িক শ্রম নেই, নেই কোনো মানসিক শ্রমের অনুগত জটিল হিসেব-নিকেশের ব্যাপার। পৌরোহিত্যের অর্থই হল অলস, পরভোজী, কঠিন শ্রম-বিবিক্ত জীবন স্বভাব। সে সময়ের বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের জীবনধারণের ভিতে ছিল জমিচাষের অপরিণত বিধিব্যবস্থা। বেকারত্ব ছিল গ্রামবাসীদের কাছে নিশ্চিত নির্দেশ। পূর্ণ চক্রবর্তীর যে সমগ্র গল্পে সক্রিয়তা, তা সেই এক বেকার পুরুষের আলস্যকেই মেনে নিয়ে জীবনকে ভাগ্যের কাছে সমর্পণ করা।

আর এই ভাগ্য জয়ের প্রয়াস ও কর্মোদ্যম দিয়ে 'অগ্রদানী' গল্পের পূর্ণ চক্রবর্তীর যে তৎপরতা, তার পরিণাম তীব্র শোচনীয়তায় নিয়তির নির্মম প্রহারে গল্পকার কঠিন কলমে এঁকেছেন। 'অগ্রদানী' শ্রমবিমুখ বিলাসী পূর্ণ চক্রবর্তী নামে এক পুরোহিতের গল্প। পূর্ণ চক্রবর্তী গরিব ব্রাহ্মণ এবং তার বিলাস ভালো ভালো খাদ্যের আহারের আদিম লোভে। এই লোভ সূক্ষ্ম বিলাসে থাকেনি, স্থির হয়েছে স্থূল ঔদরিক স্বভাবে। সে রাক্ষসের মতোই প্রচুর খেতে ভালোবাসে। কিন্তু তার খাওয়া নিজের সামর্থ্যে নয়, অন্যের দান-করা খাদ্যে, কখনো আত্মসম্মানবোধ-হীন ভিক্ষায়, কখনো বা সম্মানীয় পুরোহিত সম্পর্কের জোরের দাবিতে। এমন নির্লজ্জ আহার গ্রহণের একাধিক খণ্ড খণ্ড চিত্র ব্যঞ্জনার ভূমিকা দিয়েই কৌতুকে-শ্লেষে তারাশঙ্কর 'অগ্রদানী' গল্পটি শুরু করেছেন।

প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তী গ্রামের ছেলেদের কাছে খুব প্রিয়। কারণ সে সহজেই গাছের উঁচু ডাল ধরে নেড়ে গাছের পাকা ফল পাড়তে পারে। তাতে ছেলেরা সে ফলের সহজ ভাগও পায়। কিন্তু পূর্ণ চক্রবর্তীর নিজের লোভীর মতো ফল খাওয়ার বাসনা নির্লজ্জভাবে তৃপ্ত হয় ছেলেদের অনেক সময় বঞ্চিত করেই। তবে ছেলেদের খুশি করার জন্যও অন্যের বাগানে আম-জাম-পেয়ারা ইত্যাদি পেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে এই পুরোহিত চক্রবর্তী। গ্রামের স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসের পর পর পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই মারা যাওয়ায় শ্যামাদাস বর্তমানে—স্ত্রী শিবরানী পুনরায় সন্তান-সম্ভবা হওয়ায়—স্বস্ত্যয়নের নামে শেষবারের মতো পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করে বিশালভাবে। সেখানে ব্রাহ্মণভোজনের বিরাট আয়োজন। পূর্ণ চক্রবর্তী সেখানে নিমন্ত্রিত।

এমন নিমন্ত্রণে চক্রবর্তী তার নিজেব ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে এসে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে। তার ওপর দু'পাতার খাবার ছাঁদা বাঁধে। ছেলেদের পাতে কিছু অবশিষ্ট নষ্ট হবার মতো পড়ে থাকলে নিজেই পরিপূর্ণ খাওয়ার পরেও তৃপ্তির সঙ্গে সেসবই খেয়ে নেয়। খাবার পাতে মিষ্টি কম হলে রীতিমতো ঝগড়া করে। এমন অশালীন উদরসর্বস্ব উৎকট

লোভী ব্রাহ্মণ ছাঁদা বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এসেও রাতে স্ত্রীকে লুকিয়ে, ছেলেদের বঞ্চিত করে, বাকি খাবার খেতে দ্বিধা করে না। চক্রবর্তীর স্ত্রী পাঁচ সন্তানের জননী ঠিকই, কিন্তু সত্যিকারের রূপসী, সোনার প্রতিমা এমন শীর্ণ দেহ, রুক্ষ চুল ও ছিন্ন মলিন বস্ত্রের মধ্যেও। প্রসূতি হিসেবে হৈমবতীর বড় কৃতিত্ব, তার আজ পর্যন্ত একটিও সন্তান মারা যায়নি এবং বর্তমানে হৈমবতী আরও একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো অবস্থায় এক পরিণত রূপের অন্তঃসত্ত্বা।

শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রী শিবরানীর বাসনা সন্তান প্রসবের কালে আঁতুড়ঘরের দরজার সামনে অন্যান্য বারের মতো এবারেও যেন পূর্ণ চক্রবর্তী শোয়। কারণ প্রচলিত প্রথায় সূতিকা ঘরের সামনে রাতে একজন ব্রাহ্মণকে রাখতে হয়। এবারের সন্তান-জন্ম বাসনায় যেন কল্যাণের সমস্ত দিক ঠিকমতো রক্ষিত হয়। হৈমবতীর একটি সন্তানও মারা যায়নি, এই পবিত্রতায় ও মঙ্গলবোধে পূর্ণ চক্রবর্তীকেও শ্যামাদাস-গৃহিণীর নির্বাচন। আবার ঠিক এই সময়েই হৈমবতীরও সন্তান জন্ম হওয়ার সময়। শ্যামাদাস পূর্ণ চক্রবর্তীকে তার স্ত্রীর প্রসবের রাতে থাকার ব্যাপারে আলোচনার সময় প্রচুর আহারের ব্যবস্থা করে, পরিপূর্ণ আহারেব পরেও পূর্ণ চক্রবর্তী—সামনে দিয়ে শ্যামাদাসের খানসামা বাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালা নিয়ে যাওয়ার সময়—থালায় অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া দেখে 'রাজার প্রসাদ' খাওয়ার যুক্তিতে তা-ও খেয়ে নেয়। এমন নির্লজ্জ লোভীর সামনে শ্যামাদাস প্রস্তাব দেয়, পূর্ণ চক্রবর্তীর কল্যাণে যদি তার মনের বাসনা পূর্ণ হয়, যদি সন্তান বাঁচে তা হলে চক্রবর্তী দান হিসেবে পাবে দশ বিঘে জমি ও আজীবন সিংহবাহিনীর একটা করে রাজভোগের মতো প্রসাদ।

পূর্ণ চক্রবর্তী রাজি হয়, কিন্তু শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহের যেদিন সন্ধেয় শিববাণীর সন্তান-জন্মের ব্যথা ওঠে, সে রাতেই হৈমবতীরও প্রসববেদনা শুরু হয়। হৈমবতী স্বামীকে তার কাছে না থেকে জমিদার গৃহিণীর আঁতুড়ঘরের দরজার সামনেই থাকতে বলে, কারণ তাদের গরিবের সংসারে এতগুলি ছেলেকে মানুষ করার জন্য শ্যামাদাস প্রস্তাবিত দশ বিঘে জমি পাওয়ার মতো ভাগ্যের জয়টাই বেশি জরুরি। স্ত্রীর এই অবস্থায় বিব্রত পূর্ণ চক্রবর্তী স্ত্রীর যুক্তিতে স্ত্রীর সামনেই গভীর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামাদাসের বাড়ি চলে আসে। সেখানে সন্ধেয় প্রচুর ভোজের আয়োজনে পূর্ণ চক্রবর্তী উদর পরিতৃপ্ত করে। ইতিমধ্যে পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে ওর বড় ছেলে তার মা হৈমবতীর সুন্দর এক সন্তান হওয়ার খবর দেয়। সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থও। চক্রবর্তী নিজেদের দাই না পাওয়ায় শূদ্রদের দাই দিয়ে নাড়ী কাটার সব ব্যবস্থা করে আবার স্ত্রীর চাপেই শ্যামাদাসের বাড়ি আসে আঁতুড়ঘরের দরজায় সে রাতে শোয়ার জন্য।

রাতে শিবরানী সন্তান প্রসব করলেও পরের দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানেব অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ডাক্তার দেখিয়েও কিছু করা সম্ভব হয়নি। অপরাহ্নে বড় ডাক্তার সন্তান দেখে হতাশ হয় এবং তার এই অবস্থার কারণ যে শ্যামাদাসের যৌবনেব উচ্ছৃঙ্খল অবৈধ যৌন জীবনযাপনের পরিণতি, তা বুঝে নবজাত সন্তানের আসন্ন

অকালমৃত্যুকেই একমাত্র নিযতি জানিয়ে বিদায় নেয়। প্রসূতির কোলে নবজাত সন্তানের মৃত্যু দারুণ অশুভের কারণ— শ্যামাদাসের মাসিমার এই সংস্কারে নবজাতককে সূতিকা-ঘরের বাইরে বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় শুইয়ে দেওয় হয়। কাছে থাকে দাই আর প্রহরায় থাকে পূর্ণ চক্রবর্তী। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত। চারপাশের সকলেই নিদ্রিত। অস্থির অনিদ্রার মধ্যে পূর্ণ চক্রবর্তীর মনের গভীরে দেখা দেয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তীব্র আলোড়ন। একদিকে শিবরানীর মৃতপুত্রের কারণে তার দশ বিঘা জমি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া হওয়ার কঠিন হতাশাবোধ, অন্যদিকে নিজের অর্থনৈতিক ভাগ্যবদল, নিজের সন্তানের জন্য সমস্ত সম্পত্তির অধিকার বাসনা—দু'য়ের টানাপোড়েনে বর্ষণমুখর রাতে পূর্ণ চক্রবর্তী সকলের অলক্ষ্যে নিঃসাড়ে শিবরানীর সন্তানকে বদল করে নিজের সদ্যোজাত সুস্থ-সুন্দর সন্তানের সঙ্গে। শ্যামাদাস তার স্ত্রীর কাছ থেকে সুস্থ বংশধর পেয়ে পূর্ণ চক্রবর্তীকে প্রস্তাবমতো সবই দেয়। হৈমবতী শান্ত হয়, পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থা ফেরে। ছেলেরা স্কুলে পড়াশুনা শুরু করে সভ্য হয়।

কিন্তু পূর্ণ চক্রবর্তীর তেমন বদল হয় না। সে সেইরকমই ঔদরিক। দশ বছর বাদে শিবরানীর আকস্মিক মৃত্যুতে যে বিশাল শ্রাদ্ধের আয়োজন শ্যামাদাসের বাড়িতে, তাতে নিমন্ত্রিত পূর্ণ চক্রবর্তীকেই শেষ পর্যন্ত অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অভাবে সেই অগ্রদানীর ভূমিকায় নিজ পুত্র, যে বর্তমানে শ্যামাদাসের বংশধব হিসেবে চিহ্নিত, তার হাত থেকে পিণ্ডগ্রহণ করতে বাধ্য হয। দান ও পুবস্কার হিসেবে শ্যামাদাসের কাছ থেকে পায় প্রচুব দানসামগ্রী, পঁচিশ বিঘে জমি, আর বছবে পঞ্চাশ টাকা করে জমিদারি সম্পত্তিব মুনাফা। গোশালায় বসে পুত্রের দেওয়া পিণ্ডকে গোগ্রাসে খেতেও সে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। এই শ্রাদ্ধের চোদ্দ বছর পরে শ্যামাদাসবাবুর বংশধর অর্থাৎ মূলত পূর্ণ চক্রবর্তীর বিবাহিত এক সন্তানের জনক পুত্রটি মাবা গেলে তার শ্রাদ্ধেও চক্রবর্তী—প্রবল প্রতিবাদেও অসহায় হয়ে শ্যামাদাসের বিধবা পুত্রবধূব হাত থেকে পিণ্ডগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জীবন নিযতির এমন নির্মম, নিষ্করুণ পরিহাসের চিত্রেই 'অগ্রদানী' গল্পের কাহিনীর পবিণতি ঘটে।

'অগ্রদানী' গল্পের প্লট অবশ্যই নিখুঁত। তারাশঙ্কর কাহিনী বিবরণে মূল চরিত্র ধরেই একাধিক ঘটনাকে নিখুঁত মাপে বয়ন করেছেন। কোথাও বাড়তি মেদ-মাংস গল্পের কাহিনী ও ঘটনার যৌথরূপে নেই। শ্যামাদাসের অতীত কাহিনী, যা তারাশঙ্করের হাতে বিস্তারিত হতে পারত, তাকে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ এতটুকুও দেননি গল্পকার। গল্পেব মূল লক্ষ্য যেহেতু স্থির, তাই গল্পকারের প্লট-বৃত্ত রচনায় সংযম হয়েছে স্বাভাবিক। এমনকি শ্যামাদাসের যৌবন বয়সের অবৈধ উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবনযাপনেব কারণেই যে পর পর পাঁচ সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে, এই তথ্যকেও গল্পকার বিস্তারিত না করে ব্যঞ্জনায় রেখেছেন পঞ্চম সন্তান জন্মের পর সদর থেকে আনা ডাক্তারের মতামত জানানোর চিত্রে :

> 'ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?
>
> বলুন।

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন করিয়া বলিল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হল আপনার সন্তানদের অকালমৃত্যুর কারণ।'

প্লট-পরিকাঠামোয় গল্পকারের সংক্ষিপ্তি বোধ ও সংযম 'অগ্রদানী' গল্পের শিল্পরূপের সার্থকতাকে স্পষ্ট করে।

গল্পের গতির তীব্রতা প্রধান হয়েছে পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রবলতম সক্রিয়তায়। প্লটে কাহিনী ও ঘটনার মালায় অস্থির পূর্ণ চক্রবর্তীব একাধিক খণ্ডচিত্র এমনভাবে সংযোজিত, যা গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে অমোঘ, ব্যঙ্গাত্মক করেছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা রোগা পূর্ণ চক্রবর্তীর খাদ্যের লোভে অন্যের বাগানে ফল সংগ্রহে উদর পূরণ করার স্বাভাবিক তৎপরতা দিয়ে গল্প শুরু, শ্যামাদাসের একাধিকবার নিমন্ত্রণ খাওয়ানো, নিজের বাড়িতে চক্রবর্তীর স্ত্রীর সঙ্গে তার খাওয়া নিয়ে নির্লজ্জ মানসিকতার বাদানুবাদ, দশ বিঘে জমি পাওয়ার পরেও বাঁড়ুজ্যেদের মেয়ের তত্ত্বে নির্দ্বিধায় যাওয়া, গভীর রাতে সন্তান বদল, শিবরানী ও শ্যামাদাসেব বংশধর তথা নিজের ছেলের মৃত্যুতে একে একে অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ভূমিকায় থেকে পিণ্ডগ্রহণ — এমন প্রত্যেকটি ঘটনানির্ভর চরিত্রচিত্র গল্পটির প্লটবৃত্তের মধ্যে এনেছে জটিলতা ও জটিলতা থেকে মোচনের শিল্পসম্মত দিক।

'অগ্রদানী' গল্পের 'চরমমুহূর্ত' একই সঙ্গে কাহিনীব সূত্র ও চরিত্র-সূত্র—দু'য়ের সমান যোগে অসাধাবণ শিল্পরূপ পায়। গল্পের মধ্যে তীব্র মানসিক সংকট, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পূর্ণ চক্রবর্তীব সন্তান বদলের রুদ্ধশ্বাস অংশটুকুই 'মহামুহূর্ত' বচনার উজ্জ্বল প্রমাণ। একই সঙ্গে তার মধ্যে কাহিনীর ঘটেছে মোড়-ফেরানো ও নায়ক চরিত্রেব ভাগ্যবদলের একই এবং একটিই কেন্দ্রবিন্দু-নির্দেশ:

> 'চক্রবর্তীব চক্ষে সত্য সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশ-জোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যেব কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যকথাও এমনই অন্ধকাব। আঃ, ছেলেটা যদি যাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া ওঠে?'

এখানেই গল্পের চরম মুহূর্তটি গড়ে ওঠার লক্ষণীয় সূচনা। এই অংশ চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব ধরে আঁকা। এর পবেই চরমমুহূর্তেব পবিণত দ্বন্দ্বে-সংশয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এক মানস-রূপ পূর্ণ চক্রবর্তীব :

> 'কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন আগুন জ্বলিতেছে।
>
> উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দবিদ্রের সন্তান হইলেও জননীব কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে। উঃ।
>
> ...চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুব নিকটে আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। পবমুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।'

এই নিবিড় চিত্রেই আছে 'মহামুহূর্তে'র দ্বিধাদীর্ণ ব্যঞ্জনা। গল্পের শেষে একে একে ঘটে নিবিড় অবাঞ্ছিত পিণ্ডগ্রহণের ঘটনা পূর্ণ চক্রবর্তীর দিক থেকে। চরমমুহূর্তের যে ব্যঞ্জনার মহনীয়তা, তা আনন্দের উপভোগ আনে না, আনে নায়ক চরিত্রে নিয়তির নির্মম বিষাদঘন অসহায় পরিহাসের চাপা যন্ত্রণাবিদ্ধ রূপ।

দুই

'অগ্রদানী' গল্পের অবয়বে বসানো আছে সেই 'চোরালণ্ঠন', যা দিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঠিক ভাগ্যকেই একমাত্র নির্দিষ্ট ও আলোকিত করা যায়। সেই আলো বার বার ঘোরে-ফেরে ধনী শ্যামাদাস, পূর্ণ চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমবতী — এই সব চরিত্রের ওপর, কিন্তু মূল লক্ষ্যে এসে একেবারে স্থির হয়ে যায় — সে হল পূর্ণ চক্রবর্তী। শ্যামাদাসের সন্তান বাসনায় কঠিন নিষ্ফলত্ব নিহিত আছে তার যৌবন বয়সেব উচ্ছৃঙ্খল জীবন ইতিহাসের মূলেই, তবু তার যে বাসনা স্ত্রী শিবরানীর পঞ্চম সন্তানে তৃপ্তি পায়, তার নকল দিক শ্যামাদাসেরই ভাগ্যের পরিহাস। কিন্তু সে পরিহাস সম্পর্কে শ্যামাদাস সম্পূর্ণ অজ্ঞ। লেখক তাকে এ ব্যাপারে অজ্ঞ রেখেই পূর্ণ চক্রবর্তীর মূল চরিত্র-ধর্মকে অসামান্য শিল্পরূপ দিয়েছেন।

আবার পূর্ণ চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমবতীর চরিত্রও পূর্ণ চক্রবর্তীব সর্বাবয়ব রূপ আঁকায় প্রধান সহায়ক হয়েছে। তার চরম দারিদ্র্যের সংসারেও আরও একটি সুন্দর, সুস্থ, সন্তান প্রসব, শ্যামাদাসের প্রতিশ্রুত দশবিঘে জমি ও সিংহবাহিনীর রাজভোগের তুল্য আজীবন প্রসাদের নির্ভরতার ভাবনা, লোভ, সেই অর্থে ও সম্পদে ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়াস — সবই কেন্দ্রস্থ হয়েছে স্বামীর স্বরূপকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। হৈমবতী উপযুক্ত স্ত্রী। স্বামীকে সে চেনে এবং চেনে বলেই তার স্বভাবকে নিষেধ না করে তাকে আশ্রয় করেই সচ্ছল এক সংসার গড়ার কথা ভাবে। লেখকের বর্ণনায়:

> 'চোখ দুইটি আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময় কান্না লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি, প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতোই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া ওঠে।'

হৈমবতীর সন্তান জন্ম নেওয়ার পর চিত্রটি এইভাবে এঁকেছেন গল্পকার ·

> 'দাই নাড়ি কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হয়েছে বাপু। মা-বাপ সোন্দর না হলে কি ছেলে সোন্দর হয়। মা কেমন— তা দেখতে হবে।
>
> হৈম বলিল, যা যা, বকিস নি বাপু; কাজ হল তোর, তুই যা।'

এমন চিত্রে আছে হৈমর সুন্দর সন্তানের গর্ব যেমন, তেমনি তার নিজের রূপের গর্বও। এতে তাদের স্বামী-স্ত্রীব সহবাসের ভোগে হৈমব দায়িত্বও আছে। গল্পকার শ্যামাদাস ও হৈমবতী চরিত্র দুটিকে পূর্ণ চক্রবর্তীর পাশে ঠিক মাপে এঁকেছেন। এরা সেই চোরালণ্ঠনের চঞ্চল অনুসন্ধানী আলো, যেসব আলোর মুখ ঘুরিয়ে এই গৌণ চরিত্র একসময়ে আলোটিকে স্থির করে দেয়, দিতে সাহায্য করে কেন্দ্রীয় চরিত্র পূর্ণ চক্রবর্তীর ওপর।

পূর্ণ চক্রবর্তী মানুষটি তারাশঙ্করের এক অসাধারণ সৃষ্টি। এই চরিত্রটির অন্তর্নিহিত গভীর স্বভাববৈশিষ্ট্যে এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রায় সব সমালোচকই এক উদর-সর্বস্ব, নীচু স্তরের লোভী মানুষের উৎকট, বীভৎস রূপই দেখেছেন, দেখেছেন সেই একই লোভকে শেষ দুটি পিণ্ডগ্রহণের মধ্যেও। আমাদের মতে, এই ধারণায় পূর্ণ চক্রবর্তী চরিত্রটির লক্ষণীয় বিবর্তনটিকে অস্বীকার করতে হয়। আত্মসম্মানবোধহীন, কুৎসিত লোভ তার ছিল ঠিকই, কিন্তু গল্পের শেষদিকে ক্রমশ তার মধ্যে এমন লোভের আত্মগত প্রতিক্রিয়া তাকে অন্য ব্যক্তিত্বের ছায়ায় নিয়ে এসেছে। সে যে লোভীর স্বাক্ষর রাখে গল্পের প্রথমদিকে, শেষদিকে সে লোভের আকর্ষণেই শ্রাদ্ধের পিণ্ডগ্রহণ করেনি।

এই চরিত্র-স্বভাব বিবর্তনে পূর্ণ চক্রবর্তীর লোভ ও ভোগবাসনাকে প্রধান চারটি মাত্রায় চিহ্নিত করা যায়:

১. উদর-সর্বস্ব লোভ ও আহারের ভোগবাসনার প্রমাণ গল্পকার গল্পের মধ্যেই একাধিক চিত্রে স্পষ্টভাবে রেখেছেন। তার ছেলেদের নিয়ে গাছের ফল পেড়ে খাওয়া, একাধিক নিমন্ত্রণ বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষায় ও রন্ধনশালায় নিজে থেকে সেই আহারের তোড়জোড়ের ব্যগ্রতার মধ্যে সে পরিচয় চমৎকার মেলে।

২. এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার খাদ্যগ্রহণের লোভ শুধু নয়, তার অসীম সম্পদ বাসনা ও জীবনধারণের উপযোগী আজীবন খাদ্যের নিরাপত্তার ভাবনা। ধনী শ্যামাদাস তাকে সমগ্র গল্পে তিন কিস্তিতে পঁয়তাল্লিশ বিঘে জমি, পঞ্চাশ টাকা জমিদারি সম্পত্তির মুনাফা, আজীবন সিংহবাহিনীর প্রসাদ ও প্রচুর দানসামগ্রী জোগান দিয়েছে। এসব তো তার স্থাবর সম্পদের লোভ ও ভোগবাসনা। কুৎসিত লোভীব মতো আহারবাসনা নয়, এ এক স্থায়ী বিষয়সম্পত্তির ভোগাকর্ষণ।

৩. তৃতীয় একটি মাত্রাও এই চরিত্রের স্বভাবে মেলে গৌণ ভোগের দিক থেকে। ধনী শ্যামাদাসের স্ত্রী শিবরানীর ছটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার মধ্যে স্বামী-সহবাসের এক যুক্তিনিষ্ঠ কারণ আছে, সেখানে শ্যামাদাসের বংশরক্ষার জন্য সন্তানবাসনা ও একে একে সব সন্তান মারা যাওয়ায় নিঃসন্তান থাকার নিঃসঙ্গতা সত্য। পূর্ণ চক্রবর্তীর দরিদ্রের সংসারে এতগুলি সন্তানের জন্ম কি বিষয়কে সমর্থন জানায় — প্রশ্ন ওঠেই! যেখানে হৈমবতীর দেহ শীর্ণ, সারা শরীরে চরম দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞান, সেখানে তার অটুট রূপ, আয়তসুন্দর দুটি চোখ কাঞ্চনিভ দেহবর্ণে সোনার প্রতিমার আকর্ষণ যে পূর্ণ চক্রবর্তীকে একাধিক নিশীথশয্যায় যৌনসম্ভোগে মত্ত করে, এক অর্থে নারীদেহ ভোগে লোভী করে, তা অনস্বীকার্য। এমন স্ত্রী ও তার এতগুলি সন্তান প্রমাণ করে পূর্ণ চক্রবর্তী রমণীর দেহ সম্ভোগবাসনায় এক আদিম প্রবৃত্তির জীব!

৪. চতুর্থ মাত্রাটি হল, এসব ছাড়াও পূর্ণ চক্রবর্তীর মনোলোকের গভীরে ছিল জীবনধারণের নিরাপত্তার জন্য একক নিরাসক্ত চিন্তা। সে হীন লোভী, ঔদরিক, কুৎসিত প্রবৃত্তির দাস, আত্মসম্মানবোধহীন ঠিকই, কিন্তু এসবের অন্তরালে তার যে একটি তীব্র আত্মসচেতন ব্যক্তিমনে গোপন পরিকল্পনা কাজ করে, তার কথায় ও আচরণে গল্পের

শেষেই প্রমাণ মেলে। বড় ছেলে স্কুলে পড়ে যখন ভব্যতা শেখে, তখন তার পিতা সম্পর্কে মন্তব্য এক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে পূর্ণ চক্রবর্তীর মনে:

> 'হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিযা হৈমও চমকিয়া উঠিল।'
> চক্রবর্তী বলিল, চলে যাব আমি সন্ন্যাসী হয়ে।
> ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত।'

এতগুলি সন্তানের পিতা, নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যে পর্যুদস্ত এক সংসারের এই অভিভাবক পূর্ণ চক্রবর্তী তাব অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্ট্যাটাস সম্পর্কে যে গভীর গোপন মনের ভূমিতে সচেতন, এই চিত্রে তারই আকস্মিক প্রকাশ। শুধু বাইরের ভোগ নয়, পূর্ণ চক্রবর্তীর সারা জীবনের নিরাপত্তার ভিক্ষার্থী। একজন অলস শ্রমবিমুখ মানুষের অসহায় চাওয়া!

আর একটি চিত্র এইরকম। মাঝরাতে শিবরানীর পুত্রসন্তান হলে জমিদার-বাড়ি শঙ্খধ্বনিতে হয় মুখরিত। পূর্ণ চক্রবর্তী সাবারাত সেখানে কাটিযে সকালে নিজের বাড়ি ফেরে:

> 'প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল, ওগো ছেলেটার ভোররাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।
> চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল, হুঁ তা —
> অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম, তখন যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলে ? কিসে যে কী হয় — হুঁ।'

পূর্ণ চক্রবর্তীর এই যে আকস্মিক চমকে ওঠা, এব পিছনে তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যচেতনা, নবজাতকের জন্য চিন্তা যেমন আছে, তেমনি প্রচ্ছন্ন আছে শ্যামাদাসের পুত্র হওয়ার শুভ সংবাদে শঙ্খধ্বনির পিছনে নিজের নিরাপত্তার উপযোগী দশবিঘা জমি না-পাওয়ার এক হতাশাও। এর পরেও শিবরানীর মুমূর্ষু সন্তানের প্রসঙ্গে গভীর রাতে সন্তান বদলানোর পাপচিন্তায় তার এমন ভাবনা:

> 'উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দরিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে! উঃ।'

এই ভাবনাব মধ্যে আছে এক পিতাব, সংসাব অভিভাবকের সন্তান-স্নেহবুভুক্ষার আশ্রয়ে নিরাপত্তা-আর্তির ব্যঞ্জনা!

এইভাবেই পূর্ণ চক্রবর্তীর চরিত্রের স্বাভাবিক বিবর্তনে এসেছে চতুর্থ মাত্রা। গল্পের শেষে পুত্রের হাত থেকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হয়ে পিণ্ডগ্রহণে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়নি, কিন্তু পরোক্ষে প্রমাণ মেলে তার সেই বিপুল সম্পত্তির নিরাপত্তাভোগের গূঢ় বাসনালোক।

গল্পের শেষে পূর্ণ চক্রবর্তীর শ্যামাদাসের বংশধর, বকলমে নিজেরই মৃত পুত্রের

বধূর হাত থেকে শ্রাদ্ধের পিণ্ডগ্রহণে যে নির্মমতা, তা তার চরম শাস্তি, ভয়ঙ্কব এক নীতিহীন জীবন-পরিণতির ইঙ্গিতবহ। কিন্তু তার আগে প্রৌঢ় পূর্ণ চক্রবর্তীর শ্যামাদাসবাবুব পা দুটি জড়িয়ে ধরে, 'পারব না বাবু, আমি পারব না' বলার মধ্যে একটি মানুযের যে সর্বলোভ-বিচ্ছিন্ন করুণ কঠিন অসহায় কান্নায় অভিশাপের সামঞ্জস্যে হৃদয়-আর্তির প্রকাশ, এবং শেষে 'চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া চলিয়া আসিল।' —চিত্রে শেষ দশবিঘা জমিদানের কারণে লোভ তুচ্ছ হয়ে যাওয়া, তাতেই পূর্ণ চক্রবর্তীর জীবন-পরিণতির চরম বিষাদঘন রূপ আমাদের ব্যথিত করে। তার অসহায়তা আমাদের চোখে স্বতঃস্ফূর্ত অশ্রু এনে দেয়। পূর্ণ চক্রবর্তীর চরিত্র-ভাগ্য এবং অন্তিম পরিণতি তারই আদিমতম বাসনা ও জীবনভূমির কেন্দ্র থেকে জাত।

তিন

বাস্তব জীবনের পক্ষে যা কিছু আদিম, স্ব-প্রকাশ, যা কিন্তু সভ্যজগতের পরিবেশে বৈপরীত্যে প্রাচীনতম জীবজীবনের ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়, তা-ই হয তার নিয়তি। পূর্ণ চক্রবর্তী তাই 'অগ্রদানী' গল্পে গল্পকারের জীবনদর্শনকে সহজেই প্রতিষ্ঠা করে দেয়। তার ভোগাকাঙ্ক্ষা বুঝিবা তার নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরের এক অস্তিত্ব। প্রতিটি মানুযের জীবনের মধ্যে জীবনেরই এক কঠিন চালিকা শক্তি কাজ করে। সে জীবনকে করে নিয়ন্ত্রণ। তা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত নির্মম শক্তি দিয়ে গডা। তা-অবশ্যই অ-দৃশ্য। মানুয তাকে বুদ্ধি দিযে, বিচাব দিয়ে বুঝতে চায়, কিন্তু কোনোদিনই তার কোনো সীমা পায় না। তা জীবনের শক্তিরও বেশি এক অ-লৌকিক শক্তি। সে শক্তি জীবনেরই সৃষ্টিশক্তি।

জীবনকে যে সৃষ্টি করে, সেই শক্তির কাছে জীবনের শক্তিও হার মেনে যায়। 'তারিণী মাঝি' গল্পের তারিণী সেই শক্তির কাছে পরাজয় মানতে বাধ্য। তাই স্ত্রীর গলা টিপে তাকে মেবে ফেলার মতো পাপ তথা নিয়তি-নির্দিষ্ট ক্রিয়ার কাছে সে পুতুল। 'অগ্রদানী' গল্পে পূর্ণ চক্রবর্তীর যে লোভ, যে সম্পত্তি- ভোগ বাসনা, যে সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে যৌন-সঙ্গমে একাধিক সন্তানের জন্মদান-প্রয়াস—সবই আদিমতাব শীর্ষ ছোঁয়। সেখানে সে তাকে সংযত করতে পারে না, বুঝিবা চায়ও না। তার আদিম প্রবৃত্তিই তাকে নিযন্ত্রিত করে। যৌবনেব প্রচণ্ড বেগে সে সব কিছু প্রবল অস্বীকাব করে আত্মতৃপ্তির ঘোরের মধ্যে কাটায়।

কিন্তু জীবন তো থেমে নেই। তাকে যে সৃষ্টিশক্তি চালায, সে-ই তার পরিণতি নির্দিষ্ট কবে দেয়। পূর্ণ চক্রবর্তীর জৈব শক্তির যেখানে শেয, সেখানেই সে জীবনের সৃষ্টিশক্তির দাস। জীবনের শক্তি তাকে জৈব ভোগে, পশুবৃত্তির দিকে বার বার ঠেলেছে। কিন্তু জীবনের সৃষ্টিশক্তি শেষমেশ তাকে নিয়ে এসেছে এক নির্বিন্ন গৈরিক জীবনের সিদ্ধান্তে। সেখানে সে সর্বজাতীয় ভোগ-বিচ্ছিন্ন এক ভয়ঙ্কর শক্তির ক্রীড়নক, এক বিশাল সমুদ্রে ভাসা খড়কুটো। তাই গল্পের শেষে তার যে অসহায ক্রন্দন — 'পারব না বাবু, আমি

পারব না', এবং শ্যামাদাস বাবুর কাছ থেকে চক্রবর্তীর নিরুপায়ভাবে চলে আসা ও পিণ্ডগ্রহণ—সবই সেই আদিমতম প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির দাস হয়েই মেনে নেয়। তার সমস্ত বাসনা তিরোহিত, তার সমস্ত সক্রিয়তা নিরাসক্তভাবে ভাগ্যকেই মেনে নেওয়াকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

এখানেই 'অগ্রদানী' গল্পে তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের চমৎকার পরিচয় মেলে। তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে এবং উপন্যাসেও সেই আদিম প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির এক যথার্থ ডুবুরির মতো অনুসন্ধান করেছেন। তা এক শিল্পীর জীবনকে তৃতীয় নয়নের আলোয় ধরতে চেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য-সন্ধিৎসা এরই সূত্রে ভিন্ন মাত্রা পায়। আদিম জৈব প্রবৃত্তি হয় অনাবৃত, সভ্যতা তাকে আবরণ দিতে চায়। কিন্তু তা তো স্ব-প্রকাশ। যখন তার নিশ্চিত মহিমময় প্রকাশ ঘটে, তখন তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয় মোহবদ্ধ মানুষ, পরিণামে তার বিষাদঘন নিষ্করুণ রূপ যতই দেখা দিক।

পূর্ণ চক্রবর্তীর তার আদিম লোভ, ভোগবাসনার তীব্রতা নিয়ে জীবনের শক্তির দাসত্ব করে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃশীল নিষ্ঠুর নিয়মের কাছে সে করুণভাবে পরাজিত। তাই তার পরাজয়ের সময়ের অক্ষমতার, অসহায়তার আর্তি তাকে নিরুপায় সর্ববিচ্ছিন্ন এক চরম পরাজিত মানুষ করে তোলে। তারাশঙ্করের যথোচিত জীবনদর্শনেব একান্ত অনুগ এই চরিত্র। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে, 'তারিণী মাঝি'র নায়কের অসম্ভব ক্ষমতার মধ্যে 'ডাইনী' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে, ' পৌষলক্ষ্মী'র মুকুন্দ পালের ভয়ঙ্কর শক্তিবাসনার মধ্যে, 'বেদেনী'র নায়িকার সীমাহীন, নীতিবর্জিত যৌন ও প্রেমজীবন কামনায সেই আদিম জৈব প্রবৃত্তির লাগামছাড়া স্বভাবের প্রতিচিত্রণ। পূর্ণ চক্রবর্তী তাদেরই সমগোত্রীয়, অন্য আধারে আর এক আদিম ভোগবাসনাব ক্রীড়নক মানুষ। বস্তুত দেশ ও কালের পটে গল্পকার 'অগ্রদানী' গল্পে তাঁর জীবনদর্শনকে সম্পূর্ণ সফলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পেরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয বক্তব্য লেখকের নির্দিষ্ট জীবনদর্শনেরই আর এক টীকাভাষ্য।

চার

'অগ্রদানী' গল্পের প্রকরণ খাঁটি ছোটগল্পের অবয়বকেই মান্য করে। গল্পের একেবাবে শুরুতেই গল্পকার পূর্ণ চক্রবর্তীর লোলুপ অপরিমেয় খাদ্যবাসনা ও দুর্বার লোভী রসনার জীবন্ত চিত্রের ব্যঞ্জনাকে পাঠকদের মনে ধরে রেখেছেন। গল্পের একেবারে শেষে সেই খাওয়াবই, সেই ভোগেরই কথা। কিন্তু দু'যের দুই মেরু ব্যবহাবে কত পার্থক্য! গল্পের প্রথমে পূর্ণ চক্রবর্তীর খাদ্যভোগে কী তেজ, কী উৎসাহ, বাসনার কী বেগবান প্রকাশ, গল্পের শেষে সে ভোগবাসনা গৈরিক বর্ণের বিষণ্ণ, ক্লান্ত, নিঃশেষিত! প্রথম চিত্রে গল্পের কথামুখে তার উদ্বোধন, আহ্বান, বরণ, শেষতম চিত্রে তার বিদায়ের করুণ স্বভাব।

অর্থাৎ গল্পের প্রকরণে তারাশঙ্কর একজন জাতশিল্পীর উপযুক্ত লেখনী ব্যবহার করেছেন। প্রকরণের আর একটি দিক লক্ষণীয়। গল্পে বিবৃতিসর্বস্বতা নেই, অকারণ বিস্তার নেই। মেদহীন শরীরের সপ্রতিভ স্বভাবে 'অগ্রাদানী' গল্প অনবদ্য। অবশ্যই

একাধিক চিত্রে আছে গল্পকারের শিল্পী-স্বভাবনিহিত স্বকীয়তা, কিন্তু তা কোথাও সীমা হারিয়ে অতিনাটকীয়তার চমক সৃষ্টি করেনি। সন্তান বদলের ঘটনা কারো কারো কাছে অতিনাটকীয় মনে হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ চক্রবর্তীর চরিত্র-ন্যায়ে, তার মানসিক দ্বন্দ্ব, সংকট ও উৎকণ্ঠার স্বরূপ বিচার করলে এ ঘটনা অবশ্যই নিখুঁত শিল্পের মাপে স্বাভাবিক মনে হবে। এখানে কোনো নাটকীয়তাও নেই, চরিত্রের মনস্তত্ত্বের এক জটিল দ্বন্দ্বের—পাপ ও পাপমুক্তির—স্বাভাবিক পরিচয় আছে।

আলোচ্য গল্পের মধ্যে গল্পকারের নিজস্ব উপস্থিতি এর প্রকরণের মধ্যে লক্ষণীয় বৈচিত্র্য আনে। গল্পের প্রথম দিকে পূর্ণ চক্রবর্তীর একটি উদরসর্বস্ব লোভের চড়া রঙের চিত্র উপহার দেওয়ার পরেই গল্পকার লিখছেন:

> 'ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেদিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষ্যে ছিল ব্রাহ্মণ ভোজন।'

এইভাবে প্রকারান্তরে কাহিনী বলতে বসে তারাশঙ্কর স্বয়ং গল্পের সূত্রটির প্রান্ত একসময় ধরেছেন। কিন্তু তার পরেই গল্প আপন নিয়মে দ্রুতগতিতে ধাবমান হয়েছে। গল্পের শেষে, যেনবা চরিত্রের পক্ষে মঞ্চের আড়ালে বসা প্রম্পটারের মতো, নিজেই পাঠকদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

> 'গল্পের এখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।'

এইভাবে পাঠকদের সামনে গল্পকারের সশরীরে আবির্ভাবের মধ্যে দুটি বড় কাজ শিল্পসমস্যা তোলে। ১. গল্পের শেষ যথার্থ অর্থে কোথায়, বুঝিবা পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রথম পিণ্ডগ্রহণের ঘটনার সমস্যা তোলে। ২. গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের চরম নিয়তি-শাসনকে প্রত্যক্ষভাবেই পাঠকদের সামনে রাখা দরকার, তাতে গল্পের যে বিষাদাত্মক পরিণতি, যে ভয়াল রুদ্ধশ্বাস রূপ, তা এক নিখুঁত শিল্পের আনন্দদানে সমর্থ হবে। এবং সে ক্ষেত্রে লেখক নিজে না বললে পরবর্তী চিত্র আঁকায় অসুবিধে থেকে যায়।

পূর্ণ চক্রবর্তীর পক্ষে নিজের ছেলের হাতে পিণ্ডগ্রহণেই গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি বিশ্বাস্য হয়, চক্রবর্তীর পাপের শাস্তির যথোচিত শিল্পরূপ ধরা পড়ে। দ্বিতীয় পিণ্ডগ্রহণের ঘটনার যে সংযোজন, তা যেন গল্পকারেরই বিচারকের ভূমিকায় থেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত-চিত্তে চক্রবর্তীর ক্রূর নিয়তিকে সামনে আনা! চক্রবর্তীর যে পাপ তা তার নিজের জীবনীশক্তির ক্রিয়ার থেকেও বড় বিশ্বসৃষ্টির শক্তির প্রকাশ। এটা বোঝাতেই মৃত পুত্রের পিণ্ডকেও চক্রবর্তীকে খাওয়ানো হয়েছে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির যে বাধাহীন শক্তির রূপ, তার শাস্তি তারই মধ্যে থেকে উঠে-আসা আর এক শক্তির দেওয়া। এই জীবনদর্শনের সরল রূপের প্রতিষ্ঠা আছে গল্পের শেষে।

আসলে 'অগ্রদানী' গল্পের শেষে পুত্রের পিণ্ড খাওয়ার চিত্র গল্পের পরিণামী শিল্পব্যঞ্জনা সৃষ্টির অনুগ। এখানে লেখকের জীবনদর্শন ও গল্পের শেষের ব্যঞ্জনা মিলেমিশে এক। প্রকরণের অভিনবত্বে গল্পকারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি গল্পটিকে নতুন এক

শিল্পরীতির সামীপ্য করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসরীতিতে লেখকের উপস্থিতির সঙ্গে এই রীতির মিল থাকলেও গল্পকারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মধ্যে তাঁর কঠিন জীবনদর্শন যুক্ত থাকায় এর বিচার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়।

গল্পের প্রথমেই আছে ভাষায় তীব্র শ্লেষ। কৌতুকমিশ্রিত এই শ্লেষের চিত্রে আছে পূর্ণ চক্রবর্তীর শারীরিক গঠনের অস্বাভাবিকতা, তার উদরপ্রধান লোভের স্বপক্ষে যুক্তি, তার যাবতীয় তৎপরতা। গল্পের মধ্যেও এই ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে আছে প্রতিবেশীদের যথোচিত আঘাত করার মতো কৌতুকের কোটিং-দেওয়া শ্লেষ-বিদ্রূপ, কিন্তু সবই পরিণতি পায় গল্পের শেষে কঠিন ব্যঙ্গে। নিয়তির যে শাস্তি চক্রবর্তী পায়, সেখানে আছে নিরাসক্ত ব্যঙ্গ। গল্পের শেষের ব্যঞ্জনার ভাষায় তার সব কিছু ছাঁট-কাট করা স্বভাব:

> 'শ্রাদ্ধের দিন গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।
>
> পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।'

এই যে সবরকম অলংকারহীন নির্মম ভাষাচিত্র, তা পুত্রের পিণ্ডগ্রহণে চক্রবর্তীর প্রতি তীব্রতম ব্যঙ্গকেই জ্বালায় প্রজ্বলিত করে। গল্পের ভাষায় গল্পকারের এমন চিত্র রচনা তাঁর সার্থক ছোটগল্পের প্রকরণের অসাধারণ শিল্পকৃতিত্ব প্রমাণ করে।

প্রকরণ ভাবনার সূত্রে 'অগ্রদানী' গল্পের বিষয়নিহিত আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে। 'অগ্রদানী' অবশ্যই পুরোহিতকে নিয়ে গল্প। এ গল্পে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূর্ণ চক্রবর্তীর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম পুরোহিত তন্ত্রকে কিছুটা তুলে ধরে। পুরোহিত হওয়ার কারণে শ্যামাদাসের কাছে শ্রাদ্ধে দানগ্রহণ, নিমন্ত্রণে বিশেষভাবে আহারের ব্যবস্থা, পুরোহিত পূর্ণ চক্রবর্তীর পর শ্যামাদাসের আহার করার ব্যবস্থা, 'চক্রবর্তীর পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্পর্শ' করার ঘটনা— এসবে পুরোহিত তন্ত্রের অনুগ কিছু আচারের কথা আছে গল্পে। গল্পের প্রথম দিকে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বাগানের ফল পেড়ে অফুরন্ত রসাস্বাদ গ্রহণের কালে ছেলেদের মধ্য থেকে বিস্ময়চিহ্নিত আপত্তি ও চক্রবর্তীর যুক্তি:

> 'বাঃ পুন্নকাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ? ঠাকুর পুজো করবে না?
>
> পূর্ণ উত্তর দিত, ফল ফল, ভাত মুড়ি তো নয়, ফল ফল।'

এমন সব বক্তব্যে আছে পুরোহিতদের আচার-আচরণের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ। আমাদের বক্তব্য, তারাশঙ্কর কি এই গল্পে পুরোহিত তন্ত্রের প্রতি ব্যঙ্গের লেখনীকে pointing finger-এর বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন? অগ্রদানী ব্রাহ্মণের যখন সত্যিকারেব অভাব, শিবরানীর শ্রাদ্ধে সহজে তা মিলছে না, তখন গল্পকার এমন একটি 'সিচুয়েশন' এঁকেছেন·

> 'কে একজন বলিয়া উঠিল, তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে। চক্রবর্তী নাও না কেন দান, ক্ষতি কি? পতিত করে আর কে কি করবে তোমার?'

জমিদারের কাছ থেকে চক্রবর্তী অযাচিতভাবে অনেক পেয়েছে। সুতরাং পুরোহিতের পৌরোহিত্যের মর্যাদা তো দান পাওয়ার মধ্যেই থাকে। পতিত হওয়া সেখানে কোনো ব্যাপারই নয় একজন পুরোহিতের পক্ষে। এইসব বক্তব্যে কি পুরোহিত তন্ত্রের প্রতি

গল্পকারের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও ব্যঙ্গ কাজ করে— এমন প্রশ্ন ওঠে! একালে পুরোহিত তন্ত্রে আছে কৃত্রিমতা, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত, আচার-আচরণ সর্বস্ব অর্থলোলুপতা। পুরোহিতেরা পুজো উপলক্ষে পায় প্রচুর, সব বিক্রি করে দেয় প্রায় একজন ঝানু ব্যবসাদারের মতো, তাতে পুরোহিত জীবনের সম্পদ-লালসা ও অর্থবাসনা মেটায়। তারাশঙ্কর কি সেকালে বসে পূর্ণ চক্রবর্তীর মধ্যে তারই সূক্ষ্ম প্রতিরূপ দেখে ব্যঙ্গের অঙ্গুলি তুলেছেন? একজন পুরোহিত যখন ভাবে 'আঃ ছেলেটা যদি যাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া ওঠে?' এই ভাবনায় কি মন্ত্র-প্রয়োগনির্ভর তথাকথিত পুরোহিততন্ত্রকেই পরোক্ষে শ্লেষ করা হয় না? আমাদের মতে, সমগ্র অগ্রদানী গল্পের অবয়বে প্রকরণের আর এক স্বচ্ছ আবরণ—পুরোহিততন্ত্রের প্রতি তারাশঙ্করের প্রচ্ছন্ন শ্লেষকষায় প্রয়োগ-সার্থকতা সক্রিয় থেকেছে। চক্রবর্তীর চিন্তায় বিদ্রূপের হাসির আবির্ভাব, নিজের মনোমতো বিধিলিপি-ভাবনা: 'তাহার শিশুটা মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত'— এসবে আছে সেই শ্লেষ-ব্যবহারের বাস্তবভূমি।

পাঁচ

'অগ্রদানী' গল্পের নামে আছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্পষ্ট নির্দেশ। নাম পূর্ণ চক্রবর্তী, কিন্তু গল্পের নামে ব্যবহৃত হয়েছে তার পুরোহিত বৈশিষ্ট্য, তার অলস জীবনের পেশা। অর্থাৎ চরিত্রাত্মক গল্পের সহজ, সরল ব্যাখ্যা নামে সরে গিয়ে একটা চরিত্র-ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা পাঠক মনে ছায়া ফেলে। 'অগ্রদানী' গল্পের প্রথম থেকে শিবরানীর শ্রাদ্ধের আগে পর্যন্ত পূর্ণ চক্রবর্তী একজন সাধারণ পুরোহিত মাত্র, শ্রাদ্ধের সময় থেকেই সে সাধারণ পুরোহিত থেকে হয়েছে বিশেষ অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এবং সেই বিশেষ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার সকরুণ নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতি চিত্র জীবন্ত হয়েছে গল্পে। তাই পূর্ণ চক্রবর্তীর পেশার বিবর্তনে এক অগ্রদানী ব্রাহ্মণের স্বভাবে সমস্ত কিছুর শম নির্দিষ্ট হওয়ায় গল্প-নাম সার্থকতা পায়।

কিন্তু অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হওয়া একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণের পক্ষে পেশায় ও জীবনধারণে তার 'পতিত' হওয়াকেই বোঝায়। তাদের সংখ্যা কম। সহজে এই পেশায় আধুনিক কালের কোনো পুরোহিত যেতে চায় না:

> 'কর্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।
>
> তা হলে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হলে তো শ্রাদ্ধ হয় না।
>
> আচ্ছা, তাই দেখি। অগ্রদানী তো বড় বেশী নেই, দশ বিশ ক্রোশ অন্তর একঘর আধঘর।'

এই যে সমাজে একেবারেই উপেক্ষিত এক অনুন্নত অচ্ছুৎ পুরোহিত বংশ, তার মধ্যে নেমে আসে পূর্ণ চক্রবর্তী। এখানেও শ্যামাদাসের দেওয়া লোভের টোপ গিলে নেয়। গল্পে তার সূত্রে আসে তার শোচনীয় পরিণাম, তার আত্মবিধ্বংসী জীবন-নিয়তি। তাই গল্পের নামে নায়কের চরিত্রের আর এক মাত্রার পরিচয় থাকায় নামের তাৎপর্য বেড়ে যায়।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যায় পূর্ণ চক্রবর্তীর সাধারণ 'পুরোহিত' সত্তা ও 'অগ্রদানী' ব্রাহ্মণ সত্তার মধ্যে 'তর-তম'-বৈশিষ্ট্যে চরিত্রের ভাগ্যের অমোঘ গতিকে সূক্ষ্মভাবে বোঝা যায়। যখন সে পুরোহিত থেকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হয় তখন তার এক ভিখিরির স্বভাব বাইরে, ভিতরে সে কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে শ্যামাদাসবাবুর বাড়িরই এক সম্মানীয় বাসিন্দা। শ্যামাদাসের দানে সে কিছুটা বিত্তবান। তার ছেলেরা স্কুলের শিক্ষা পায়। তার স্ত্রী অনেকটাই শান্ত। এই অবস্থায় সে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হতে বাধ্য হয়েছে। তখনো তার সেই উদরসর্বস্ব আদিম লোভে ঘাটতি পড়েনি। এই যে পূর্ণ চক্রবর্তীর পেশায় পতন শুরু, তা তাকে জীবনের এক ভয়ঙ্কর 'পতিত' অবস্থায় নিক্ষেপ করে। তাকে তারই পুত্রের পিণ্ডগ্রহণে বাধ্য করে। নিজ পুত্রের হাতে শিবরানীর পিণ্ড সে গোগ্রাসে খেয়েছে। এখানে তার এক ধাপ পতন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হিসেবে, শেষে নিজপুত্রের পিণ্ডগ্রহণ তার বধূর হাত থেকে—এ হল নিয়তির নির্মম পরিহাস ও শাস্তি। এখানে চক্রবর্তী সচেতন, অন্তর্জ্বালায় অসহায়। এক পুরোহিতের 'অগ্রদানী' সত্তায় নিজের সমুচিত বিধ্বংসী সত্তাকে সমর্থন। অগ্রদানী ব্রাহ্মণের সত্তাতেই গল্পের পরিণতি, চরিত্রের পরিণতি যেমন, তেমনি গল্পকারের নিরাসক্ত জীবনদর্শনের সম্যক প্রতিষ্ঠাও। নিজেকে একজন নিবাসক্ত তান্ত্রিকের মতোই বিচারের আসনে বসিয়ে গল্পকার হিসেবে নায়ক চরিত্রের পরিণামকে দেখিয়েছেন। অগ্রদানী সত্তায় তার অদ্ভুত ব্যঞ্জনা থাকায় গল্পের নাম সমগ্র গল্পের পক্ষে তৃতীয় নয়নের আলোর বিচ্ছুরণের মতো অভাবনীয় ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব ও আনন্দ দেয়।

৮.

বেদেনী

এক

তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পটি প্রথম পত্রস্থ হয় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার তেরশো ছেচল্লিশের কার্তিক সংখ্যায়, অর্থাৎ ইংরেজি তিরিশের দশকের একেবারে শেষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সমসময়ে। এই গল্পেব আগেই লিখেছেন এক এক করে 'জলসাঘর', 'নারী ও নাগিনী', 'তারিণী মাঝি', 'অগ্রদানী' তিনশূন্য' ইত্যাদির মতো জীবনের আদিমতম স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সন্নদ্ধ জটিল মনোলোকের ও মানুষের কথা। কোথাও উদ্ভট যৌনতা, কোথাও বা জীবনের সহজ ও অমার্জিত প্রবৃত্তি, আবার কোথাও সমাজ-নীতি নির্দিষ্ট শাসনের, নিয়মের বাইরে উন্মুলিত জীবন স্বভাবে জীবনের আয়াসহীন উদ্দেশ্যহীন বেগবান দিকগুলিই গল্পের মধ্যে এক জীবন-নির্ভর অথচ জীবনাতিশায়ী নীহারিকামুখিন ভাবকে সামনে আনে।

তারাশঙ্কর যখন গল্প লিখতে বসেন, তখন কল্লোলের প্রথা ভাঙার উতরোল কাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বেকারদের বেকারত্ব, ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশীয় যুবকপ্রাণের রাজনৈতিক জীবনে নানান ব্যর্থতা সেকালের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আনে সংকট, সংশয়, ক্ষোভ। এসব থেকেই আসে মনের অধিতলে নৈরাজ্যের শূন্যতা, অবাধ

মুক্ত যৌনতার প্রতি আকর্ষণ, প্রচলিত সবকিছুর ওপর মোহভঙ্গ হওয়া, সর্বোপরি পাশ্চাত্য আধুনিকতার শিক্ষার কারণে গৈরিক রিক্ততা। এগুলি কল্লোলীয়দের মনে প্রতিক্রিয়া জাগায় স্পষ্টভাবে। তারাশঙ্কর কল্লোলীয় নন, কিন্তু তাঁর মনের জগতেও একেবারে তাঁর মতো করেই এক অমার্জিত জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অন্তঃশীল থাকে। সেই যুগের শূন্যলোক থেকেই তাঁর মনে জন্ম নেয় সাঁওতাল, বাউরী, বেদে, কাহার ইত্যাদির জীবনের প্রতি আকর্ষণ, বিকলাঙ্গ, রুগ্‌ণ, রূঢ়, পাশব আদিম বৃত্তির প্রতি শৈল্পিক তাৎপর্য খোঁজার প্রয়াস। অবশ্যই ব্যক্তিজীবনে নিজস্ব বাসভূমির পরিবেশ থেকে আগত বিচিত্র উপকরণও এসবের মূলে সহায়ক হয়।

সেই সন্ধিৎসারই অন্যতম ফল 'বেদেনী' গল্প। আদিম জৈবশক্তি কোনো বাধা মানে না, তা অধরা, তা একান্তভাবে নিজের শক্তিতেই চলে। কোনো মানুষ তার সীমা পায় না, কোনো সমাজ তাকে বাঁধতে জানে না, সে কৃত্রিম সমাজের চোখে বিকৃত হতে পারে, কিন্তু নিষ্পাপ লক্ষ্যহীনতার স্বভাবে ঝর্ণার মতো তার গতিময়তা। এই 'বেদিনী' গল্পের ধূসর নৈরাজ্য, জীবন-মদের মাদকতার ভয়ঙ্কর বীভৎস রূপাঙ্কন এক নতুন দিক চিনিয়ে দেয় হৃদয়-স্বভাবের ও তার শেষ সীমার আধ্যাত্মিক সংকট ও স্থায়ী সমাধানের প্রয়াসনিহিত নিষ্ফলত্বকে।

'বেদেনী' গল্পের কথাবস্তু সংক্ষিপ্ত কিন্তু যেমন রুদ্ধশ্বাস, তেমনি রোমহর্ষক। সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মানুষের দল এই গল্পের শেষ পাঠ করে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মা কঙ্কালী এস্টেটের মেলায় প্রতি বছরে আসে শম্ভু বাজিকর তার যুবতী স্ত্রী রাধিকাকে নিয়ে সার্কাসের খেলা দেখাতে। এ মেলায় এই জাতীয় খেলা দেখাতে সে যেন স্বরাজ্যে স্বরাট! সার্কাসে আছে 'গোলকধাম'-এর খেলা, বন্দি চিতাবাঘের সঙ্গে রাধিকার বিচিত্র সব খেলা— তার পিঠে বসে তার মুখ ঘুরিয়ে বাঘের মুখে চুমা খাওয়া, বাঘের মুখের মধ্যে চুলের খোঁপা পুরে দিয়ে যেনবা মুখটিকেই বাঘের মুখের মধ্যে পুরে দেওয়ার খেলা—এমন সব। এসব ছাড়াও রাধিকা একটি ছাগল, দুটি বাঁদর আর কিছু সাপ নিয়ে খেলা দেখাতে গ্রামের মধ্যে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি যায় মেলার মরশুমে। এ বছরেই প্রথম আসে শম্ভুর সার্কাসের প্রতিদ্বন্দ্বী যুবক কিষ্টোবেদের সার্কাস—শম্ভুর সার্কাসের তুলনায় এর তাঁবু অনেক বড়, সার্কাসের কৌশল এবং উপকরণ অভিনবত্বে অনেক বেশি দর্শক টানতে সক্ষম। এতেই কিষ্টোর সার্কাসের প্রতি শম্ভুর জাগে প্রবল ঈর্ষা, রাধিকাও হিংসায়, রাগে জ্বলে ওঠে। কিষ্টোবেদে রাগে না, বন্ধুত্বে শম্ভু আর রাধিকাকে মদ খাওয়ায় তাঁবুর মধ্যে তার অবৈধভাবে রাখা চোলাই মদের সঞ্চয় থেকে। কিন্তু এসবের মধ্যে ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বাইশ বছরের মোহময়ী যুবতী রাধিকার প্রতি কিষ্টোবেদের গোপন অথচ প্রবল আকর্ষণ, মোহ, মাদকতা জন্মায়।

চোদ্দ বছর বয়সে রাধিকার বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছরের শিবপদর সঙ্গে। একদিন যুবক শম্ভুর আকর্ষণে, তার পৌরুষের মোহে শান্তির স্বামীঘর শিবপদর সংসার ছেড়ে চলে আসে রাধিকা। তারই সঙ্গে আনা অর্থে শম্ভুবেদে সার্কাসকে সাজায়। কিন্তু মদের

নেশায় শম্ভুর সার্কাসের অবস্থা ক্রমশ হয় দীন। তবু রাধিকা তাকে ত্যাগ করেনি, সমান তালে শম্ভুর সঙ্গে সার্কাস নিয়ে মেতে থাকে। কিষ্টোবেদেকে দেখার পর শম্ভু সন্দেহ করে রাধিকার কিষ্টোবেদের প্রতি গোপন আকর্ষণ বিষয়ে। রাধিকা জ্বলে ওঠে ভেতরে। তবু রাধিকা, শম্ভুর সঙ্গে তার বেশি বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবে না। শম্ভুর সঙ্গেই সমান তাল রেখে সে কিষ্টোবেদের প্রতি হিংসায় তার তাঁবুতে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা করে। শম্ভু কিষ্টোর প্রতি ঈর্ষায় গোপনে পুলিশকে জানিয়ে আসে তার তাঁবুতে অবৈধভাবে চোলাই মদ রাখার বিষয়।

তার এই গোপন তৎপরতার খবর রাধিকা জানত না। পুলিশ এলে রাধিকা কৌশলে কিষ্টোর তাঁবু থেকে অবৈধ মদের বোতল বের করে আনে, তার এমন কাজের কথা খুশি হয়ে শম্ভুকেও জানায়। কিষ্টোবেদের বিরুদ্ধে নিজের পরিকল্পনা নষ্ট হওয়ায় শম্ভু রাধিকাকে রাগে ক্ষোভে মারধোর করে অমানুষিক। কিষ্টোবেদে আগেই সার্কাসের খেলা আরম্ভ করে দেয়, দর্শক টানে বেশি। শম্ভু ও রাধিকার তা সহ্য হয় না। শম্ভুর কাছে মার খাওয়ার সময় শম্ভুর কিষ্টো-বিরোধী পরিকল্পনার তাৎপর্য বুঝে প্রতিবাদ না করে, রাধিকা শম্ভুর সঙ্গে যুক্তি না করেই কেরোসিন কিনে আনে গোপনে। দুজনে মদ খেয়ে যুক্তি করে গভীর রাতে কিষ্টোবেদের তাঁবুতে আগুন লাগানোর। শম্ভু মদের ঘুমে গভীর অচেতন। রাধিকা কেরোসিন ও দেশলাই নিয়ে কিষ্টোবেদের তাঁবুতে যখন ঢোকে, তখন সামনেই ঘুমন্ত কিষ্টোকে দেখে। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির আগুনে দেখে:

> 'কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুড়ের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে! ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন।'

এখন শম্ভু রাধিকার বয়সের তুলনায় বৃদ্ধ। কিন্তু শম্ভুর যৌবনে প্রথম তাকে দেখে যে আলোড়ন হয়েছিল বুকের গভীরে, এই মুহূর্তে ঠিক সেই অভিজ্ঞতাই কিষ্টোকে দেখে! দেশলাই কাঠির আলো নিভে যেতে রাধিকা কিষ্টোর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিষ্টো এতটুকু না চমকিয়ে গ্রহণ করে বেদেনীকে। শেষে বেদেনীর যুক্তিতেই ওরা দুজন দেশান্তরী হওয়ার বাসনায় তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। বেদেনীর ভয়ঙ্কর ছলনায় ও কৌতুকের নিষ্ফল যুক্তিতেই কিষ্টো তার তাঁবু আর সবকিছু ফেলে আসে শম্ভুর জন্য। কিন্তু সর্বশেষ পলায়নকালে বেদেনীর সিদ্ধান্ত শম্ভুর তাঁবুতেই সব কেরোসিন ঢেলে সেখান থেকে ঘাসের ওপর ছড়াতে ছড়াতে তাতেও শেষে আগুন ধরিয়ে শম্ভুকে পুড়িয়ে মারার প্রয়াসে চিহ্নিত হয়ে যায়। গল্পকথার এখানেই ব্যঞ্জনাগর্ভ সমাপ্তি।

'বেদেনী' গল্পের শুরু শম্ভু বাজিকরের মেলায় দেখানো সার্কাসের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে। সেই প্রসঙ্গেই কাহিনীর প্রথম পর্বেই শম্ভুবেদে যেন ছায়া হয়ে গৌণ হয়, কায়াব মতো কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে বেদেনী রাধিকা। গল্পের শেষে বেদেনী রাধিকার ঘটে স্থানবদল, শম্ভুর পাশ থেকে সে চলে আসে কিষ্টোবেদের পাশে। কাহিনী ও ঘটনা নিয়ে যে প্লট-

বৃত্ত, তাতে শুধু কাহিনীর ব্যঞ্জনাগর্ভ Turmoil-ই নয়, গল্পের শেষে একমাত্র নায়িকা বেদেনীর চরিত্রও বদলে যায়। প্লটের গঠনে তারাশঙ্কর এ গল্পে অসাধারণ সংযমের স্বাক্ষর রেখেছেন। যেটুকু লেখকের বিবৃতির মতো অংশ আছে, তা-ও বেদেনীর একান্ত নিজস্ব নিঃসঙ্গ গোপন মনের প্রতিক্রিয়ায় ধরা। শম্ভু যখন সন্দেহ করে কিষ্টো সম্পর্কে বেদেনীকে বলে: 'ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর', তখনি বেদেনীর মনের গভীরে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া, তারই অবধারিত বর্ণনা চিত্র হয় বেদেনী-শম্ভুর অতীত সম্পর্কের ইতিহাস—তা বেদেনীরই চিন্তায় ভাষ্যে যেন! 'সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো।'

এই বেদেনীর জীবনে অতীত চিত্র সংক্ষেপে আঁকা গল্পের তীব্র গতিময়তার মধ্যে, তা যে বেদেনীরই, তারাশঙ্কর চিত্রটির সমাপ্তিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন:

> 'সেই রাধিকার আনীত অর্থে শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল, সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজকার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়। কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্যও দুঃখ করে নাই। আর সেই বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।'

লক্ষণীয়, গল্পের বেদেনী নির্ভর মূল কাহিনীতে বেদেনীর সঙ্গে কিষ্টোর সম্পর্ক তৃতীয় মাত্রা রচনার আগেই রাধিকা-শিবপদর একটা জট ছিল। সেই জট রাধিকার অভিমানক্ষুব্ধ মানসিকতার মধ্য দিয়ে গল্পকার পাঠকদের ধরিয়ে দিয়েছেন।

অর্থাৎ কেন্দ্রীয় এবং একমাত্র নায়িকা চরিত্র বেদেনী গল্পে এবং তার নিজস্ব স্বভাবে তিনটি জট তৈরি করতে সহায়ক হয়েছে— ক. শিবপদ-রাধিকা, খ. শম্ভু-রাধিকা এবং শেষ গ. কিষ্টোবেদে-রাধিকা। প্লট-বৃত্তের গঠন, গতি ও পরিণতির মধ্যে এই তিন জট অবশ্যই রাধিকা-কেন্দ্রিক। তাই প্লটের এমন চমৎকার পরিকল্পনা হয়েছে সার্থক ছোটগল্পের নিখুঁত প্রকরণ-অনুগ। বেদেনীই প্লটের উদ্ভাবক, অথবা প্লট বেদেনীকে একমাত্র লক্ষ্যে রেখেই গল্পের আদ্যন্ত বুননে সফল। প্লটে ঘটনা আছে ছোট-বড়, কিন্তু তা প্রধান অর্থে শম্ভু নয়, কিষ্টোও নয়, বেদেনীর স্বভাব, মনোলোক ও জৈবস্বভাবের জীবন্ত নিষ্ঠুর নির্মম স্বভাবকে গড়ে তোলার জন্যই সংযুক্ত। কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন দিতে গিয়ে শম্ভুর তাঁবু পুড়িয়ে দেওয়ার যে বেদেনী-কৃত পরিকল্পনা, তা গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ঘটনামাত্র হয়ে থাকেনি, ব্যঞ্জনায় প্রতীকধর্ম পেয়ে যায়। এ বিষয়ে বেদেনী চরিত্র আলোচনায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

অবশ্য প্লট জটিল হয়েছে বেদেনীর জটিল মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্রে রেখে। তার অবচেতন আদিম বৃত্তির নগ্ন খেলা—সরল এবং তারও অধিকারের বাইরের এক শক্তি, তা-ই গল্পের প্লট-বৃত্তের পরিণতি দানে প্রধান সহায়ক। গল্পের যে গাঁথুনির রুদ্ধশ্বাস চমৎকারিত্ব, তার মূলে আছে কেন্দ্রীয় নায়িকা চরিত্রের মনোলোকের অনাবিল উদ্ভাসন। গল্পের চরম মুহূর্ত অংশটি তাই একেবারে মনোলোকের বিষয়। যা অন্ধকারে ছিল ঢাকা, যা হিংসায়,

প্রতিশোধ-স্পৃহায় ছিল জ্বালাময়, তা হয় প্রেমের বেগ-প্রতিবেগে সুন্দর, বিস্ময়কর। গল্পের 'মহামুহূর্ত' অংশ এখানে:

> 'সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার! সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতবে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।
>
> তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো অসুরের মতো পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতেই লাগিল। কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে! ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষত চিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিভিয়া গেল। রাধিকার বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, ...'

এমন দেশলাই কাঠির আলো জ্বলে ওঠা দিয়ে মহামুহূর্তের বিস্তার শুরু, শেষ আলো নিভে যাওয়া ও বেদেনীব জটিল মনের প্রতিক্রিয়া! মহামুহূর্ত অংশের এই সংযত চিত্রের মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে। গল্পের প্লটের এ এক ঘনীভূত অংশ—অনেকটা ফোটানো দুধের ক্ষীর অংশ যেন।

এর পবেই একমাত্র বেদেনীর গোপন নিশ্চুপ সক্রিয়তার সংক্ষিপ্ত চলচ্ছবি এঁকেই তারাশঙ্কর প্লটের শেষ বৃত্তাংশের পূর্ণতা দিয়েছেন। 'উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ' দিয়ে পড়া বেদেনীর, কিষ্টোর পক্ষে 'ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ' করে 'চুমায় চুমায় মুখ ভরে দেওয়া', বেদেনীর বদলে কিষ্টোকে তাঁবু দিয়ে দেওয়ার ছলনামুখর কৌতুকরসসিক্ত প্রস্তাব বেদেনীর, সব শেষে শম্ভুর তাঁবুতে কেরোসিন ঢেলে মাঠের ঘাসে তা ছড়াতে ছড়াতে শেষে ভেজা ঘাসে আগুন লাগিয়ে তাঁবু পোড়ানোর অন্তিম প্রয়াসের পর 'খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—মরুক বুড়া পুড়্যা।' —এমন সংলাপে গল্পের শেষতম পরিণতি চিত্র অসামান্য গতি পেয়ে যায়। ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ওঠে বেদেনীর এমন পরিবর্তিত বিস্ময়কর মানসিকতার প্রতীকপ্রতিম প্রয়োগে। সার্থক ছোটগল্পের প্লটের প্রকরণ বৈচিত্র্যে 'বেদেনী'র গঠন গল্পকারের বিস্ময়কর শিল্পবোধের অভিজ্ঞান।

দুই

রাধিকার একক নায়িকা স্বভাবকে কেন্দ্র করেই 'বেদেনী' গল্পের বেদেনী চরিত্র পরিচয় সমগ্র গল্পে তীব্র গতিপ্রাণ হয়ে উঠেছে। রাধিকার অর্থাৎ বেদেনী চরিত্রটি ত্রিমাত্রিক—(3-Dimensional)। সে প্রথমে শিবদাস বেদের বিবাহিত স্ত্রী, বয়স তখন তার চোদ্দ, স্বামীর বয়স সতেরো। রাধিকার সতেরো বছর বয়সে ওর জীবনে আসে শম্ভুবেদে দীর্ঘ দশ বছর নিরুদ্দেশ জীবন কাট্যাবার পর। বেদেনীর বিবাহিত জীবনে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে জয় করে নেয়। কারণ, তখন তার মাঠ থেকে কেটে আনা টাটকা সবজির

মতো সবুজ, সপ্রাণ সাহসী যৌবন! বেদেনীর তখন বয়স বাইশ, শম্ভুর চল্লিশ। রাধিকার বর্তমান শম্ভুবেদে সম্পর্কে চিন্তা:

> 'ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এত বড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে?'

গল্পের শেষে রাধিকার নতুন সঙ্গী হয় কিষ্টোবেদে— এক নবযৌবন সম্পন্ন দীর্ঘদেহী দুরন্ত স্বভাবের পুরুষ-ব্যক্তিত্ব।

রাধিকার জীবনের এমন তিন বিশিষ্ট মাত্রার বিন্যাসে গড়ে উঠেছে 'বেদেনী' গল্পের পূর্ণ চরিত্ররূপ। শম্ভুর সঙ্গে তার সার্কাসের জীবনে জড়িয়ে থাকার মধ্যেও সে তার বাইশ বছরের জীবনে এসে সেই শিবপদর কথা ভাবে—'আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়।' অথচ শম্ভুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার মুহূর্তে নির্মমভাবে সেদিন স্বামীর চোখের জলের বাধাকে অস্বীকার, উপেক্ষা করে:

> 'রাধিকার মমতা হওয়া দূরের কথা, লজ্জা দূরে থাক, স্থানীয় বীতরাগে তাহার অন্তর রি রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাবা, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।'

অন্যদিকে শম্ভুর কাছে এসে শিবপদর উপার্জন করা সমস্ত অর্থ দিয়েই শম্ভুর ব্যবসার প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ সাহায্য করে। নেশায় শম্ভু নষ্ট করে সেই মূলধন। এই অবস্থার কারণে রাধার মনের গভীরে অকপট স্বীকৃতি: 'রাধিকা একটি দিনের জন্যও দুঃখ করে নাই।' কিষ্টোবেদের সঙ্গে তার আকর্ষণের সম্পর্ক কল্পনা করেই শম্ভুবেদে যখন এতদিনের সম্পর্কে সন্দেহ করে, তখন তার চাপা রাগ ও অভিমানে এমন ভাবনা আপনা-আপনি মনের গভীরে তৈরি হয়ে যায়। তৃতীয় মাত্রায় সে শম্ভুবেদেকেও ছাড়ে, ছাড়ে চরম ঘৃণায় এবং কিষ্টোবেদের প্রতি অসম্ভব আকর্ষণে। সে আকর্ষণ তার যৌবনের অদম্য স্বভাবের।

বস্তুত এই তিনমাত্রায় বেদেনীর যে মানস পরিবর্তন, তার মূলে আছে তার যৌবনরাগরঞ্জিত প্রাণের দুর্বার ও দুর্মদ আকুতি। যৌবন জীবনের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য, শ্রেষ্ঠও। তা দিয়েই জীবনের ধ্যান ও মান, আকর্ষণ ও আনন্দ মর্যাদা পায়। চোদ্দ বছর থেকে কৈশোর-যৌবন ও উদ্দাম যৌবনের মাদকতা, জৈব আদিম আকর্ষণের ঘ্রাণ স্বভাবে নিয়ে বেদেনী থেকেছে চরম অস্থির। সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। যৌবনের ধর্মই এই। বিশেষ করে বেদে রমণীর যাযাবরত্ব যেমন মনকে করে নিরাসক্ত, কঠিন, নির্মম, তেমনি যৌবনের পরম চাহিদা প্রেমকেও করে স্বভাবে যাযাবর। মানুষ তো আদিম জীবনে ছিল যাযাবরই। সমাজ তখনো গড়েনি মানুষ। সেই আদিম জীবন স্বভাব বেদেনীর জীবনে ও রক্তে প্রোথিত বলেই, ছায়া-কায়ার সম্পর্কে স্থিত বলেই, আধ্যাত্মিক চেতনার মতো সংশ্লিষ্ট ও অবধারিত বলেই রাধিকা শুধু মাদকতায় ও মোহের মধ্যেই থেকেছে, আর সব

বিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন, নির্মোহ। সামাজিক আচার-আচরণের সীমা চুরমার করে এগিয়ে যাওয়াই তো যাযাবর বেদেদের জীবনবেদ।

বেদেনী সেই কারণে গল্পের মধ্যে নিজেকে বিস্ময়কর স্বভাবে তুলে ধরে। শিবদাস বেদে এক সামাজিক নারীর জীবনে অবশ্যই 'Ideal', রাধিকা তা বোঝে, কিন্তু বেদে নারীর রক্তে আছে বীরভোগ্যা হওয়ার বাসনা। পুরুষকে সে নিজের যৌবন তেজে সমান প্রতিস্পর্ধী করেই সামনে পেতে চায়। আদিম জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষাই তা-ই। শিবপদ তার কাছে তাই তুচ্ছ শক্তি। বেদেনী শম্ভুর কাছে দুঃখের দিনে ভাবে, শিবপদ তার কাছে ছিল ক্রীতদাসের মতো। যে নারী আদিম জীবনের ঘ্রাণ ও মোহ, মাদকতা ও বেগ নিয়ে চলে, সে কোনো পুরুষের ক্রীতদাসত্ব সহ্য করতে পারে না। তাই একদিন নির্মমভাবে শিবপদর মতো স্বামীকে ছেড়ে আসতে পেরেছে রাধিকা।

তার সামনে তখন শম্ভুবেদের আকর্ষণ, 'উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধত দৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠ দেহ' শম্ভুকে দেখে তার অপাপ বিস্ময়ের জাগরণ, তারপর তার কাছে অকপটে ধরা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। তখন শম্ভুবেদের বয়স তার বাধা হয়নি। কারণ বেদেনীর আকর্যণের মূলে শম্ভুবেদে নয়, আকর্ষণের লক্ষ্য ছিল তার সাহস, শক্তি, প্রাণের আদিম বলিষ্ঠতাই। কিষ্টোবেদের আকর্ষণের মূলেও তাই— কারণ শম্ভুবেদের স্বভাবের ও প্রাণের পার্থক্য তার যৌবনের উন্মাদনাকে বাধা দেয়, তাকে অতৃপ্ত রেখে দেয়। এই অতৃপ্তিই আবার তাকে কিষ্টোবেদের দিকে ঠেলে দেয়।

এককথায়, শিবপদর স্বভাবের চরম পৌরুষহীনতা, শম্ভুবেদের বয়সের যৌবনশক্তিহীন বিষণ্ণতা ও অক্ষমতা রাধিকার মতো বেদেনীর উচ্ছল যৌবন স্বভাবের বড় বাধা হয়ে ওঠে বলেই বেদেনী যুক্ত হয়ে যায় কিষ্টোবেদের সঙ্গে। বেদেনী শরীর দিয়ে গোপনে কিষ্টোবেদের মধ্যে মোহ জাগায়, মাদকতা আনে, কালো রূপের আদিম আকর্ষণে কিষ্টোবেদে সম্পূর্ণ নতুন জীবনের স্বাদ পায়। বেদের মেয়ে রাধিকার মধ্যে আছে মোহময় মাদকতার প্রতীকপ্রতিম বৈশিষ্ট্য, তা আকর্ষণ করে, আবার তার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার দিক একজন পুরুষকে, তার হৃদয়কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে পারে। এই একই আধারে দুই বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে বেদেনীর কিষ্টোর প্রতি মোহ ও কৌতূক, হিংসা সমান মাপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শম্ভুবেদের পাশে থেকে বেদেনী কিষ্টোবেদের সার্কাসের তাঁবু জ্বালিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে। অথচ কিষ্টোবেদের পৌরুষদীপ্ত আকৃতি ও সার্কাসের নিপুণ সক্রিয়তা তার মনের গভীরে নেশা জাগায়। আকর্ষণ ও হিংসা একসঙ্গে মিলেমিশে হয়ে ওঠে এমন এক নেশা—যা বেদেনীকে কিষ্টোবেদের তাঁবুর মধ্যে পাঠায় অন্ধকারে—মদ খেয়ে শম্ভুর নিজের তাঁবুতে অচেতন ঘুমের মধ্যে ডুবে থাকার কালেই!

শম্ভুবেদের গোপন খবরে কিষ্টোবেদের তাঁবুতে পুলিশ চোলাই মদের বোতল ধরতে এলে বেদেনী কৌশলে কিষ্টোবেদেকে বাঁচায় মদের বোতলগুলি বের করে এনে। এমন সহৃদয় স্বভাব তার গোপন এক নেশার দিকের প্রমাণ। আবার শম্ভুবেদের কাছে মার খেয়েও শম্ভুবেদের জনাই কিষ্টোবেদের তাঁবুতে আগুন লাগানোর সক্রিয়তাকে হিংসা

নামের আর এক আদিমবৃত্তির নেশাই বলা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ার নেশা। দুই বৃত্তিই আদিম। কিন্তু এই আদিম বৃত্তির মধ্যে কিষ্টোকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরুর প্রয়াসে আছে তার উদ্দাম যৌবন বরণের সমস্তরকম নীতিবোধশূন্য যৌবন প্রাণেরই চিরন্তন তাগিদ। বেদের যুবতী মেয়ের প্রেম সবকিছু ভেঙে ফেলে আদিম সত্তারই প্রসারণকে একমাত্র মান্য করে। পুরুষের সাহস, পৌরুষ, দুর্বার, দুর্দমনীয়কে জয় করার যে প্রাণঘাতী অসীম বাসনা, শক্তি —বেদের যুবতী এই বেদেনী তার সঙ্গেই নিজেকে মেলাতে চায়। জীবনের শক্তিকে (vital force) আদিম জীবনের সৃষ্টিশক্তির (creative force) সঙ্গে এক করতে চায়। বেদেনী চরিত্র তারই একমাত্র সমর্থক। প্রাচীনত্ব, জীবনের স্থবিরত্ব ও স্থাণুত্ব, বয়সের জরার ভার— এসবের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহই শম্ভুবেদের তাঁবুতে পর্যন্ত আগুন ধরাতে নির্দ্বিধ করে তোলে তাকে। এখানেই বেদেনী হয়ে ওঠে আদিম জৈব জীবনের শক্তির এক প্রতীকপ্রতিম নারী। শেষতম ধ্বংসের চিত্রেও তারাশঙ্কর উচ্ছল যৌবনপ্রাণের আবেগে ধরা বেদেনীকে অনবদ্য স্বভাবে এঁকেছেন:

> 'দেশান্তরে? ই তাঁবুটাবু—
> থাক পর‍্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উহাকে দাম দিবা না?
> সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।
> উন্মত্ত বেদিয়া—তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চল।
> চলিতে গিয়া রাধা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।
> সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।
> টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুইড়্যা।'

এ হল স্থির, স্থবির, যৌবনহীনতা তথা বার্ধক্যের বিরুদ্ধে উচ্ছল আদিম জৈব প্রকৃতির দুরন্ত যৌবন মোহের ও ধর্মের, ঘৃণা, উপেক্ষা ও অকৃত্রিম আপোসহীন জয় ঘোষণা। বেদেনী চরিত্রটি বাংলা ছোটগল্পের চরিত্রমালায় এক নবসৃষ্ট নক্ষত্র।

'বেদেনী' গল্পে তিনটি পুরুষ চরিত্র আছে—শিবপদবেদে, শম্ভুবেদে ও কিষ্টোবেদে। বেদেনীর প্রথম স্বামী প্রত্যক্ষভাবে গল্পে উপস্থিত নেই। সে এসেছে বেদেনীর চিন্তা-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতায় পরোক্ষে। প্রত্যক্ষভাবে আছে শম্ভুবেদে ও কিষ্টোবেদে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই তিন পুরুষ চরিত্রই বেদেনীর স্বভাব ব্যাখ্যার ও স্বরূপের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্যই অঙ্কিত। শিবপদবেদে পৌরুষহীন, যুবতী প্রেমিকা রমণীর কাছে সম্পূর্ণ অবহেলার মানুষ। শম্ভুবেদে বেদেনীর পাশে বয়সের হিসেবে পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য। কিষ্টোবেদে উদ্দাম যৌবন স্বভাবের রক্তিম প্রেমের, সাহসের, বীর্যের পুরুষ। সে-ই বেদেনীর কাছে হয়েছে, পরমতম অভ্যর্থিত। এসবের মধ্যেই প্রমাণ হয়, তিনটি পুরুষ চরিত্র ব্যক্তির থেকে টাইপ ভূমিকার দিকেই একমাত্র তাৎপর্য পায়। কিষ্টোবেদের বেদেনীর প্রতি আকর্ষণের একমুখিন স্বভাব তাকে কিছুটা জীবন্ত স্বভাবধর্ম দেয়, কিন্তু বেদেনীর মোহ ও হিংসা, আদিম ও অকৃত্রিম মোহ এবং কামনা-বাসনার দুর্বার স্বভাবের

পাশে জ্বালা-ধরা ধ্বংসকারী হিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা তার চরিত্রের ডাইমেনশনকে একাধিক মাত্রায় দ্বন্দ্বময় করে। তাই বেদেনীর পাশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পুরুষ তিনটির টাইপ ভূমিকার স্থির বৈশিষ্ট্য।

তিন

'বেদেনী' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য যাযাবর বেদেজীবনের সূত্রেই চিত্রিত। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পের বিষয়ে ও চরিত্র অঙ্কনে নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন অবহেলিতদের মধ্যে। সাঁওতাল, বীরবংশী, কাহার-দুলে, বাউরী-বাগদী, বেদে-যাযাবর, সাপুড়িয়া— এইসব আদিম মানুষ তাঁর গল্পের শুধু নয় উপন্যাসেরও চরিত্র হয়ে দেখা যায়। এমন গল্পের আধার নির্মাণে গল্পকারের জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের তিনি আদিম (elemental) দিক থেকে কবিরাজি অব্যর্থ ঔষধের উপযোগী গাছগাছালির মতো এনে তাতে সূক্ষ্ম শিল্পের 'কোটিং' দিয়েছেন। 'বেদেনী' গল্পের বেদিনী রাধিকা একটি 'আ-কামা' অর্থাৎ বিষদাঁত ভাঙা হয়নি এমন একটি বিষধর কেউটের বাচ্চা নিজে কাপড়ের ভিতর থেকে বের করে কিষ্টোবেদের দিকে কিছুটা রোমান্টিক কৌতূহলের মতোই খেলার ছলে ছুঁড়ে দেয়। কিষ্টোবেদেও সেটা নির্ভয়ে হাতের মুঠোয় ধরে সঙ্গে সঙ্গে তার বিষদাঁত ভেঙে বেদেনীকে ফেরত দিয়ে দেয়। এতে বেদেনীর রাগ চরমে ওঠে। পরাজয়ের জন্যই কিষ্টোবেদের উচ্চ হাসির সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আসলে এভাবেই বিপরীত স্বভাবে কিষ্টোবেদের প্রতি বেদেনীর এক অদ্ভুত মোহ জন্মাতে থাকে।

তারাশঙ্কর বেদেনীকে শম্ভুবেদের চিতাবাঘের মাথায় চাপিয়ে তার ঠোঁটে বেদেনীর বার বার চুমা খাওয়ার চিত্র আঁকেন। স্থবির শিথিলদেহ বাঘ সম্পর্কে বেদেনীর আছে ঘৃণা। সে কিষ্টোবেদের মতো যুবক বাঘেব প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করে। অন্যদিকে কিষ্টোবেদেও ঘোড়া, বাঘকে বশ করে যেভাবে অবলীলায় খেলা দেখায়, তাতে বেদের উষ্ণ রক্তের প্রবাহ প্রবল হয়। এইভাবে বেদেদেব সঙ্গে আদিম পশুবৃত্তির যোগ ঘটিয়ে এক জান্তব আদিম প্রবৃত্তির জগৎ নির্মাণ করেন গল্পকার। 'বেদেনী' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য তথা তারাশঙ্করের জীবনদর্শন এরই মর্মমূল থেকে গড়ে ওঠে।

'বেদেনী' গল্পে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার, যে কামনা-বাসনার উদগ্র রূপ নিয়ে বেদেনী সচল, তা সমস্ত সামাজিক নীতি-নিয়ম বহির্ভূত। যাযাবর স্বভাবের ধর্মই এই—তা কোথাও স্থির থাকে না, কোথাও তার আসক্তি চিরকালীন সম্পর্কে বাঁধা পড়ে না। সে এই চলমান পৃথিবীর মতো সব কিছু ফেলতে ফেলতে, ত্যাগ করতে করতে এগিয়ে চলে। তারাশঙ্কর 'বেদেনী' গল্পে তারই প্রতিচিত্রণ করেছেন রাধিকা ও কিষ্টোর মধ্য দিয়ে। বস্তুত মানুষের গড়া সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত অমার্জিত, মানুষের আদিমতম পশুবৃত্তির সারল্য ও অমোঘতাই বেদেনী ও কিষ্টোবেদে, শম্ভুবেদে—সকলের জীবনার্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বয়সের ধর্মে ও গতানুগতিকতায় শম্ভুবেদে পরাজিত হয়। বেদেনী তাকে নির্মমভাবে ত্যাগ করে, শেষে ধ্বংসও করে। বয়সের ধর্মেই কিষ্টোবেদে যৌবনের বিপুল সম্ভোগের

ক্ষমতা পায়, তাই সে বেদেনীকে চরম ভোগের সামগ্রী হিসেবে পায়। সেই বয়সের ধর্মেই বেদেনীও অতীতকে অস্বীকার করতে দেখে, বর্তমানকে রাজবেশ দিয়ে গ্রহণ করতে হয় নির্দ্বিধ। আসলে এইসব মানুষ জৈবপ্রবৃত্তিরই দাসত্ব করে এবং কিছুতেই সেই আদিম প্রবৃত্তির চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে না। শম্ভুবেদের নিয়তি তার বেদে জীবনেই ওতপ্রোত। বেদেনী ও কিষ্টোবেদের যৌথ প্রাণের নীহারিকা-স্বভাব তাদের স্ব স্ব চরিত্রে ও যৌথ জীবনাচারেই সম্পৃক্ত। জীবন এইভাবে যাযাবর হয়, চলে, একে একে সকলকে নিয়ে, ত্যাগ করে নিজের পরিণতিকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

'বেদেনী' গল্পে তারাশঙ্কর ধর্মাধর্মহীন সমস্ত রকম নীতিবিবিক্ত জৈব শক্তির মোহ, মাদকতা ও মত্ততাকে এঁকেছেন বেদেনীর তৎপরতাতেই। এই বেদেনীই গল্পটির মধ্যে গল্পকারের জীবননীতির, জীবনদর্শনের যথোচিত ঘোষক। অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে ঘুমন্ত কিষ্টোবেদেকে দেখে রাধিকার যে চিত্তস্বভাব তা অবশ্যই গভীর ব্যঞ্জনার দ্যোতক—সে ব্যঞ্জনা জীবন-স্বভাব ব্যাখ্যার বড় সূত্র:

> 'রাধিকার বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত, সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।'

এই যে আবেগের প্রবল সমুদ্রপ্রবাহের মতো বেগ—এ তো জীবনের মর্মমূলের বেগ। শিবপদবেদের কাছে যা ছিল ম্রিয়মাণ, ম্লান, শম্ভুবেদের কাছে তা ছিল ক্ষণিক দীপ্ত, কিষ্টোবেদের কাছে পরস্পরের সমান ক্ষমতায় ও হৃদয়সম্পর্কের প্রেমের ও যৌনতার চাহিদায় তা আদিমতার দাবি নিয়ে আর এক জীবনেরই সত্য! বেদেনীর এমন সব আচরণ, আকাঙ্ক্ষা ও আর্তি তারাশঙ্করেব আঁকা আদিম মানুষগুলির স্বভাবেরই নিখুঁত প্রতিনিধিত্ব করে। 'বেদেনী' গল্প তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের যথোচিত প্রকাশক এক অভিজ্ঞানপত্র যেন।

চার

'ডাইনী' গল্পের মতো 'বেদেনী' গল্পও যেমন চরিত্রাত্মক গল্প, তেমনি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে গল্পের মূল লক্ষ্যের ব্যঞ্জনা। রাধিকা বেদের মেয়ে, স্বভাবে ও মানসিকতায় আছে যাযাবরত্ব, তাই রাধিকা ও বেদেনী— একই নারী হয়েও গল্পের মূল বিষয় প্রকাশে যৌথ দায়িত্ব বহন করে। এই বেদেনীর কথায় গল্পকার প্রকাশরীতির মধ্যে যেমন একাধিক প্রতীকী ঘটনা, সিচুয়েশন তৈরি করেছেন, তেমনি ভাষাতেও দুটি মাত্রা যোগ করে গল্পের শিল্প সংযম ও চরিত্রের বেগ এবং জটিল মনস্তত্ত্বকে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

গল্পের শুরু শম্ভু বাজিকরের কথায়, শেষ সিদ্ধান্তে এসেছে কিষ্টোবেদে ও বেদেনী। মাঝখানের অংশে যখনি এসেছে কিষ্টো, তখনি শম্ভুর সূত্রে রাধিকাই গল্পের মূল সূত্রটা ধরিয়ে দেয়, ধরে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসার জৈব বৃত্তিতেই আসে বেদেনী, কিষ্টোবেদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। গল্পের মধ্যে তারাশঙ্কর স্পষ্টতই এবং সচেতনভাবেই

বিবৃতিধর্মকে পরিহার করেছেন। বেদেনীর অতীতটুকু এসেছে তার বিক্ষুব্ধ চিন্তার সূত্রেই। এ সম্বন্ধে আগেই আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি।

গল্পের প্রথম দিকে বর্ণনায় ও চরিত্রভাষ্যে ব্যঞ্জনাত্মক সিচুয়েশন নেই, বেদেনী সূক্ষ্ম কাহিনীসূত্রে যুক্ত হতেই আসে প্রকাশভঙ্গিতে প্রতীকী নানা উপকরণ ও চরিত্রনির্ভর সক্রিয়তা। মূল গল্পে অর্থাৎ কিষ্টোবেদের প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে বেদেনীর যোগ নাটকীয় এবং স্বভাব বৈপরীত্যে চমৎকৃতি আনে। যখন শম্ভুবেদে কিষ্টোর তাঁবু দেখে হিংসায় ক্রোধে ভয়াবহ হয়ে ওঠে, তার পাশাপাশি বেদেনীর মানসিকতাও এইরকম:

> 'রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে, ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে, তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল, সে বলিল, দাঁড়া খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা।'

পরের অংশে এই রাধিকার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুগামী, কারণ ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা জোয়ান পুরুষ কিষ্টোবেদেকে দেখে তার লক্ষণীয় বদল:

> 'শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, রাধিকা কখন আসিয়া শম্ভুর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?'

এমন যে সংলাপে বেদেনীর স্বভাব বদল, তা-ই গল্পের পরবর্তী একাধিক 'সিচুয়েশন'-এর মধ্যে অভাবনীয় গতি এনেছে। বিস্ময়ের মোহে কিষ্টোবেদের চোখে-মুখে মনের অধিতলে যখন বেদেনীর কালোরূপের মধ্য থেকে মহুয়াফুলের গন্ধের মাদকতাকে আস্বাদ্য করে, তখনি সেই উন্মুক্ত অকৃত্রিম হাসির মধ্যে বেদেনীর কথা বেজে ওঠে, 'বাক হর‍্যা গেল যে নাগরের?' এইভাবেই বেদেনী গল্পেব কেন্দ্রে চলে আসে, শম্ভুবেদে ক্রমশ গৌণ হয়ে যায়।

কিষ্টোবেদের গায়ে আ-কামা কেউটের বাচ্চা ছুঁড়ে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা, রাগে ইট ছুঁড়ে তাকে মারার প্রয়াস, শম্ভুবেদে মদে বিভোর হয়ে গুম হয়ে গেলে কিষ্টো ও বেদেনীর মধ্যে একটানা কথা বিনিময়, কিষ্টোবেদের তাঁবুতে খেলা দেখানোর সময় বেদেনীর তাঁবুর মধ্যেও দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের ব্যঞ্জনাগর্ভ দৃষ্টির যোগ—এইভাবে গল্পকার এক এক করে বেদেনীকে কেন্দ্রীয় চবিত্রেব মর্যাদায় এনেছেন। অর্থাৎ গল্পের মধ্যে বেদেনীর যে ক্রমশ কিষ্টোবেদের দিকে নানান বিপরীত মানস-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, শেযে চবম ক্ষতি করার অদম্য উৎসাহে কিষ্টোবেদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে প্রতিশোধস্পৃহা মেটানোর প্রয়াস, এবং সবশেষে তার নিষ্ফলত্ব ও কিষ্টোবেদেকে নিয়ে বেদেনীর দেশান্তরী হওয়ার চিত্রের চমৎকারিত্ব ও বিস্ময় গল্পের প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে আমাদের নিবিষ্ট করে রাখে। বেদেনী ও কিষ্টোবেদের সম্পর্ক রচনা আদ্যন্ত কাহিনী-নিহিত ব্যঞ্জনায় রূপ পেয়েছে।

গল্পের শেষতম অংশে প্রচ্ছন্ন নাটকীয়তা এতটুকু কৃত্রিম হয়নি, বেদেনী ও কিষ্টোবেদের স্বভাবানুগত্যে তা অবশ্যই শিল্পবেগে সুষম, সুন্দর ও সহনীয়। তারাশঙ্করের গল্পবৈশিষ্ট্যে যে স্বাভাবিক নাট্যরস থাকে, থাকে নাটকীয়তার গতি ও চমক, বেদেনী তা থেকে বিবিক্ত নয়। কিন্তু গল্পকারের নাট্যরস প্রয়োগের অদ্ভুত শিল্পসংযম ও শিল্পক্ষমতা আমাদের

বিস্মিত করে। বেদেনীর ব্যবহারেই আছে নাটকীয়তা, কিন্তু সবই চরিত্রের অধিতল থেকে উঠে আসা। তার মনস্তত্ত্বই তার স্বভাবের নাটকীয়তার একমাত্র গুরু। বেদেনীর যাযাবরত্ব ও আদিম জৈবভাবনা, পাশববৃত্তি কিষ্টোবেদের সঙ্গে মিলেমিশে যে সব dramatic situation তৈরি করে তা মন থেকে মননশীলতার দিকে টেনে নিয়ে যায় পাঠকদের। প্রকাশরীতির এই অনন্যতা এ গল্পে গল্পকারের নিজস্বতার একান্ত সূচক।

গল্পের ভাষা অবশ্যই ব্যঞ্জনাধর্মী এবং এই ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গির জন্ম হয়েছে মনস্তত্ত্বের অন্ধকার জগতের ক্রমিক উন্মোচনে। তারাশঙ্করের বেদেনী গল্পের ভাষা চরিত্রন্যায়ে ধরা। বেদেদের আঞ্চলিক ভাষার যোগ থাকায় ভাষায় মধ্যে আদিমতার নেশা ও আমেজ আনে। বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা—দু'ভাবে গল্পে শরীর ও ভাষ্য রচনা করেছে। সাধুগদ্যের মধ্যে চলতি ভাবের কথ্যভঙ্গির অন্তরঙ্গতা মিশ্রিত থাকায় 'বেদেনী'র ভাষা হয়েছে গল্পের শিল্পশক্তি।

পাঁচ

গল্পের নাম 'বেদেনী', তার কারণ গল্পটি এক বেদে যুবতী রমণীর জটিল মনোলোকের, জৈব আদিম বাসনার কথাচিত্র। কিন্তু বেদেনী চরিত্রটির অন্তরালে আছে তার নিজস্ব নাম 'রাধিকা'। তারাশঙ্কর গল্পের নামে চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীচিহ্ন অনুযায়ী 'রাধিকা' না রেখে নাম দিয়েছেন 'বেদেনী'। অর্থাৎ গল্পের নামের মধ্যেই সোনার পাত লাগানোর মতো আবরণ আছে বেদেনী।

প্রথমত, গল্প-নামে রাধিকা ও বেদেনী হয়েছে একাকার। রাধিকা বিয়ে করেছিল শিবপদবেদেকে—সেই চোদ্দ বছর বয়সে। অবশ্য এ বিয়ে তার বাবা-মার ও সমাজের মত নিয়েই হয়। সেখানে তার রাধিকা সত্তার প্রাধান্য। কিন্তু যৌবন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বেদে জাতের রক্ত প্রধান হয়। বেদে মেয়েদের কিশোরী সত্তায় স্বভাবে, শরীরে ও মনে যা চাপা থাকে, যৌবনে তা একেবারে এক উদ্ধত স্বভাবে ফেটে পড়ে। তাই বেদেনীর বর্ণনায়, কিষ্টোবেদের দৃষ্টিতে, তার জীবন্ত রূপ এঁকেছেন গল্পকার:

> 'সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সদ্য সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও চোখে ধরাইয়া দেয় নেশা। শুধু রাধিকাই নয়, এই বেদেজাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের মধ্যে একটা যেন প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে;'

এই যে বেদেনীর রূপ, তা তার বাইশ বছরের যুবতী জীবনের ও ধর্মের। এই বেদেনীই গল্পের নামে পেয়েছে প্রতীকী স্বভাব—যেহেতু বেদেনীর কথাই সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য তাই নামের শিল্পমূল্য মানতে হয়।

দ্বিতীয়ত, এমন প্রতীকের মধ্যে আছে অন্তঃশীল স্বভাব-বৈপরীত্য। তা স্বাভাবিক মোহে মাদকতায় টানে, কিন্তু তা ভয় দেখায়, ধ্বংসের অবধারিত দিককেও চিহ্নিত করে:

'কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মতো ধার, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়; মোহের মধ্যে ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।'

বেদেনীর আচরণ সমগ্র গল্পে এই বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। গল্পের শেষে রাতের অন্ধকারে বেদেনীকে বুকের মধ্যে নিয়ে কিষ্টোবেদে যখন চুমায় চুমায় তার মুখ ভরে দেয়, মদ আনার প্রসঙ্গ তোলে, তখন বেদেনীর ব্যবহার এই বক্তব্যকে প্রধান করে:

'না। চল, উঠি, এখুনই ইখান থেক্যে পালাই চল। রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল, কুথা?

হু-ই দেশান্তরে।

দেশান্তরে? ই তাঁবুটাবু—

থাক পর্য়া। উ উই শম্ভু লিবে।'

এইভাবেই বেদেনীর প্রেম, তার উন্মাদনা কিষ্টোর সাময়িক স্থিত জীবনকে যথার্থ অর্থেই ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বেদেনীর প্রেমে ভয় এখানেই। হৃদয় মথিত করা যে আদিম জীবনের জান্তব আকর্ষণ, তা দুর্বার, তা গড়ে না, ভাঙে। তা পুরুষকেও দেশান্তরী করে। এই বক্তব্যেই গল্পের পরিণামী সিদ্ধান্ত হওয়ায় বেদেনীর গুরুত্ব গল্পে সবচেয়ে বেশি। নামের সঙ্গে বেদেনীর যোগ তাই নিবিড়।

তৃতীয় আর একটি নামের পক্ষে ব্যঞ্জনানির্ভর ব্যাখ্যা হল, গল্পের নামে রাধিকা সত্তা আবৃত, বেদেনীই প্রধান। রাধিকা মূলে বেদেনী, গল্পে সে স্বভাবে হয়েছে বেদেনী। বাইশ বছরেব যৌবনবতী রাধিকার বেদেনী সত্তাই সত্য। রাধিকার চরিত্রের প্রতীকী গভীরতা হয়ে ওঠে বেদেনী সত্তা। রাধিকা প্রেমিকা শুধু, বৈষ্ণবীয় ধর্ম ও তত্ত্ব-নির্ভরতায়, কিন্তু সেই সত্তা দিয়ে তো গল্পের মূল ব্যঞ্জনা প্রতিষ্ঠা পায় না। রাধিকার প্রেমিকা সত্তা থেকে এসেছে বেদেনীর যাযাবর সত্তার জ্বালা, হিংসা, ভয়মেশানো আর এক মাত্রা। রাধিকা একটিমাত্র সত্তার অধিকারিণী, বেদেনীর আছে দ্বৈত সত্তা। কিষ্টোবেদের রাধিকার প্রতি যে কৌতুককর সংলাপ প্রয়োগ, তা প্রতীকী :

'নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টোবদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার নাম যে রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল......'

কিষ্টোর নামেব সঙ্গে রাধিকা যোগ, রাধিকা নয়, 'রাধিকা বেদেনী' এমন কথার মধ্যেই আছে প্রেমিকা ও যাযাবর হিংসা, ভয়, আদিমতার সমন্বয়। প্রেম ও প্রেমের ভয়াল রূপ মিশে বেদেনী সত্তার যে বিজেতা রূপ, গল্পের নামে তারই স্বীকৃতি। বেদেনী রাধিকার মূল সত্তা।

৯.

পৌষলক্ষ্মী

এক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটির প্রথম প্রকাশকাল বাংলা তেরশো একান্ন সাল, প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায়। ইংরেজি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে বাংলাদেশে ভয়াল মহামন্বন্তর দেখা দেয়। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদার্পণ ঘটে চতুর্থ বর্ষে। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে মানুষের তৈরি মন্বন্তর, তার করুণ ছবি 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে মেলে। তারাশঙ্কর একেবারে সমকালের বাস্তব প্রেক্ষিতকে এমন গল্প লিখতে বসে অস্বীকার করতে পারেননি। উনিশশো চুয়াল্লিশে লেখা এই গল্পটি '১৩৫০' এমন নামের গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। এই গল্পগ্রন্থটির প্রকাশ ঘটে বাংলা তেরশো একান্ন সালে। 'পৌষলক্ষ্মী'কে নিয়ে গল্প-সংকলনের মোট গল্পসংখ্যা চার। গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে তারাশঙ্কর গ্রন্থ-নাম বদল করে রাখেন 'পৌষলক্ষ্মী', সেই সঙ্গে এই গল্প-সংকলনে আরও দু'টি নতুন গল্প সংযোজিত হয়। এর প্রকাশকাল ইংরেজি উনিশশো ষাট সাল, বাংলা তেরশো সাতষট্টির শ্রাবণ মাস।

এইসব তথ্য প্রমাণ করে, তারাশঙ্করের ছোটগল্পের ধারায় 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটির গুরুত্ব। সমালোচকরা বলেছেন, এটি তারাশঙ্করের 'একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প'। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, ''তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র অগ্রদূত ও বীজগল্প হিসেবে 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটি উল্লেখ্য।'' তাঁরা শেষে এমন কথাও বলেছেন, ''পৌষলক্ষ্মী' গল্প না লিখলে সম্ভবত তাবাশঙ্কর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস লিখতেন না।'' 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটির বিস্তারিত আলোচনায় প্রসঙ্গত এমন সব মন্তব্যের কিছু বিচার পরে আমরা গল্পের প্রকরণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় রাখব। আপাতত গল্পের কাহিনী অংশের ও ভাববস্তুর স্বরূপের সঙ্গে আমাদের কিছু প্রাথমিক পরিচয় প্রয়োজন।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের কাহিনীবস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় গভীর ওতপ্রোত। এতে সেই পটভূমির পরিচয় যেমন ছড়ানো আছে, তেমনি প্রধান হয়ে উঠেছে এক গ্রাম্য সৎ চাষীর জমিচাষকে নির্ভর করে তার স্বপ্ন, জীবনপ্রেম, মাটির প্রতি ভালোবাসা ও অফুরন্ত জীবনীশক্তির দম্ভ নিয়ে মৃত্যু-প্রতিরোধী বাসনার নিষ্ফল করুণ পরিণামী অস্তিত্বের দিক। গ্রামের বৃদ্ধ চাষীদের মধ্যে গল্পের নায়ক মুকুন্দ পালের বয়স সব থেকে বেশি—-ষাট-পঁয়ষট্টির মধ্যে। বয়সের ভারে এবং ম্যালেরিয়ায় বারকয়েক ভুগে দুর্বল হয়েছে মুকুন্দ পাল ঠিকই, কিন্তু যৌবনকাল থেকেই সে যে শরীরের এক ভয়ঙ্কর শক্তিধর চাষী, বিরাট শক্তসমর্থ চেহারার অফুরন্ত প্রাণশক্তির মানুষ—এখনো দেখলে বোঝা যায়। মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রমে যার একমাত্র চাষ করে যাওয়ার কথা, পাকা ফসল ঘরে তোলাব কথা, এখন সে আর তা পারে না। শারীরিক অক্ষমতা তাকে ক্লান্ত করে। লজ্জায় মাথা হেঁট কবে দেয়।

তার শরীরের বিস্ময়কর সবল গড়ন তাব কাজ করার বাসনা ও ক্ষমতার কারণে

ছোটবেলার সঙ্গীদের কাছে সে ছিল 'গদা', যৌবনে মুরুব্বিরা নাম দেয় তার 'ভীম', প্রৌঢ় বয়সে সে হয় নামে 'মোটা মোড়ল' গ্রামের সঙ্গীদের কাছে। অথচ এই শরীর ভেঙে যাওয়ার ফলে তাকে ঠাট্টা, শ্লেষ, অবজ্ঞা করে তার কঠিন প্রতিপক্ষ যুবক শ্রীকৃষ্ণ পাল—গ্রামের আর এক সবচেয়ে সম্পন্ন চাষী—যার কাছে মুকুন্দ এমন অভাবের দিনে নিজের কিছু জমি বিক্রি করে, যার সঙ্গে মুকুন্দের সম্পর্কও ঠাকুর্দা-নাতির, অর্থাৎ ঠাট্টারই। কিন্তু এমন ঠাট্টা শরীরের কষ্টে অক্ষম মুকুন্দ পালের পক্ষে মর্মান্তিক। শ্রীকৃষ্ণ পাল, ডাকনামে হয়েছে 'চিকেষ্ট', মুকুন্দের কাছে 'চেকা'। মুকুন্দর নিজের কৃষাণ জ্বরে পড়েছে বলে মুকুন্দ নিজেই একা পৌষের পাকা ধান কাটতে লেগে যায় মনের জোরে, কিন্তু শরীরে বার্ধক্যজনিত অসহায় ক্লান্তি থাকায় পারে না। তা দেখে চেকা ঠাট্টা করে। চেকাকে নিজের মাঠের চাষ ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে মুকুন্দ, তার জ্বর হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে, চেকা গর্ব করে মদ আর মাংস খেয়ে সবরকম জ্বর তাড়ানোর কথা, তাকে তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা করার কথা জানায় ঘুরিয়ে। মুকুন্দ পালের অসহায়তার মধ্যে মজা ও ঠাট্টা করেই থাই চাপড়ে হাতাহাতি যুদ্ধ করার জন্য ডাকে। এসবেই মুকুন্দ পালের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে, মনের গভীরে জ্বালা ধরে। চেকার বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিপক্ষে জীবনকে চাষের মধ্য দিয়ে জীবনমুখী প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার বাসনা জাগে মুকুন্দ পালের।

এই বয়সে একা এমনভাবে চাষের কাজে হাত দিলে বন্ধু-চাষী সমবয়স্ক যোগেন্দ্র তাকে বাধা দেয়, নিষেধ করে। মুকুন্দ তা শোনে না। মনের গভীরে বাজতে থাকে চেকার স্পর্ধিত কথাগুলি, তার আস্ফালন। নতুন আবেগি উৎসাহে, যৌবন-প্রাণের উন্মাদনায় সে ধান কাটার কাজে মেতে থাকে। মাঠে নাতনি সরস্বতীর অবাক বিস্ময়াত্মক কণ্ঠ শুনে সামনেই উচ্চহাস্য করে ওঠে। চাষ থেকে বাড়ি ফিরে এলে মেয়ে লক্ষ্মী, নাতনি সরস্বতী মুকুন্দর সঙ্গে কথাবার্তায় তার উচ্চহাসির বহর দেখে ভয় পায়। এই বয়সে মুকুন্দ কুস্তিগীরের মতো ব্যায়াম করে, নিজে বৈষ্ণব হয়ে মদের গন্ধ যে কোনোদিন সহ্য করতে পারত না, সে-ই এখন নিজে থেকে বলদ দুটিকে 'মেয়া রশি' খাওয়ায়—এসব দেখে বাবার আসন্ন মৃত্যুর গোপন চিন্তায় ভয় পায় মেয়ে লক্ষ্মী, নাতনি সরস্বতীও। বন্ধু যোগেন্দ্র যখন দেখে ওর সামনেই মুকুন্দ চোলাই মদ আর মাংস খাচ্ছে, অবাক হয়ে যায়। যোগেন্দ্রকেও মদ খাওয়ায় মুকুন্দ।

এরই মধ্যে চেকা মোড়ল এসে মুকুন্দর নাক বেঁকে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে। নাক বাঁকলে দু'মাসের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত—এই বিশ্বাসেই মুকুন্দ চেকার ঠাট্টাকে ক্রমশ গুরুত্ব দেয়। প্রথমে তাকে উচ্চহাসি দিয়ে উপেক্ষা করে, পরে থাই চাপড়ে একসময়ে চেকাকেও হাতাহাতি যুদ্ধে ডাকে। মদের ঘোরে জ্যোৎস্না রাতে মুকুন্দ একাধিকবার অস্বাভাবিক হাসির মধ্যে সমস্ত ধান কেটে ঘরে তোলার স্বপ্ন দেখে। আশি বছরেও সোজা হয়ে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কথা বলে যোগেন্দ্রকে; আসন্ন পৌষলক্ষ্মীর দিনে ভাসান গানের বিস্তারিত পরিকল্পনা শোনায়। মাঠভর্তি পাকা ধান। মন্বন্তর চলে গিয়ে আবার নতুন করে প্রচুর ফসল হওয়ার, ধান জন্মাবার সময় এসেছে।

যোগেন্দ্রকে নিয়ে মুকুন্দ রাতের জ্যোৎস্নায় বিশাল জমির মধ্যে তারই প্রতিচ্ছবি দেখে। তার নিজের বনযৌবনের শপথ, প্রতিজ্ঞা, কর্মোদ্যম, তার আসন্ন পৌষলক্ষ্মীর স্বপ্ন, আদর্শ, সচ্ছলতার বিষয়-ভাবনা তাকে তার অবর্তমানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভবিষ্যৎ সংসার-ভাবনার স্বস্তি দেয়। এই ঝোঁকে মাঠ থেকে ধান কেটে তোলার সময়ে মুকুন্দ চেকার ধান বোঝাই-করা গাড়ি ও তার ডাঁই করা খড়ের স্তূপের মাথায় চেকাকে দেখে, যৌবন প্রতিষ্ঠার উৎসাহে কাজের উদ্যম যায় আরও বেড়ে মুকুন্দর। কিন্তু ক্রমশ নিজের গাড়িতে ধানের আঁটি তুলতে তুলতে হাঁপ ধরে মুকুন্দর। শরীর আরও দুর্বল, আরও অসহায় হয়। এরই মধ্যে গ্রামের রমণকাকার মৃত্যুর খবর শোনে শশীর মুখে। তার কেলে বলদ আর গাড়ি টানতে পারে না। মুকুন্দ নিজেই গাড়ি ঠেলতে থাকে। চাকা আর নড়ে না। মুকুন্দ পাল দুই হাতের মুঠো ভর্তি ধান নিয়ে একসময়ে মৃত্যুর মধ্যে ঢলে পড়ে। সংক্রান্তির শেষ রাতে পাশের বাড়ির পৌষ আগলাতে এসে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কোনো শঙ্খধ্বনি নয়, বিষাদময় কান্নাতেই তার সমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুভয়ের ভাবনায় নিশ্চুপ যোগেন্দ্র সশব্দে ঘরের জানালা বন্ধ করে।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের কাহিনীর এখানেই শেষ। গল্পটির নাম 'পৌষলক্ষ্মী' হলেও এটি চরিত্রাত্মক গল্প। আর মুকুন্দ পাল চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই গল্পের যাবতীয় ঘটনা একাধিক ছোট ছোট কাহিনী-খণ্ড অবলম্বন করে গল্পের প্লট নির্মাণ করেছে। গল্পকার মুকুন্দ পালের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতের প্রবল সামর্থ্যের দিনগুলির অনুষঙ্গ বার বাব ব্যবহার করেছেন প্রাসঙ্গিকতার মধ্য দিয়ে। বর্তমানকে আবার দু'ভাবে দেখিয়েছেন—(ক) মুকুন্দ পালের জরা ও অসুস্থ শরীরজনিত খেদ, (খ) চেকার উপস্থিতি—এমন দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার মাধ্যমে। গল্পের যে প্লটবৃত্ত—তা এভাবেই ছোট ছোট ঘটনার সমবায়ে পূর্ণরূপ পেয়েছে। ছোটবেলার সঙ্গীদের কথা, যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি, চেকার বয়সের মাপে নাতি হওয়ার অধিকারে মুকুন্দ পালকে নিয়ে মজা, ঠাট্টা ও প্রচ্ছন্ন শ্লেষচিত্র, যোগেন্দ্রর সঙ্গে জীবন ও মৃত্যু নিয়ে নানা দার্শনিক সংলাপ বিনিময়, কন্যা লক্ষ্মী ও নাতনি সরস্বতীর সাহচর্য, চেকার কথামতো ক্রমশ বৈষ্ণবীয় ধর্মাচার ছেড়ে মদ-মাংস গ্রহণ ও যোগেন্দ্রকে তার সামিল করা, শেষে সম্পন্ন চাষী এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী চেকার ধান কেটে বাড়ি ফেরার পথে তাকে দেখতে পেয়ে উত্তেজক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেকে মুকুন্দর নতুন যৌবনশক্তিতে নিয়োজিত করা—এ সমস্তই গল্পের প্লটকে একটি নিটোল রূপ দেয়। এই সব খণ্ডচিত্র অবশ্যই নায়ককেন্দ্রিক। তাই 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের প্লট খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমষ্টি নিয়েই মূল চরিত্রের জটিলতা সৃষ্টি করে।

মুকুন্দ পালের অতীত মানসিকতা ও জীবনধর্ম ও দ্বিধাবিভক্ত বর্তমান মানকিসতার একদিকে জরাগ্রস্ত, অক্ষম স্থির-স্থবির প্রাণশক্তি, অন্যদিকে যুবক চাষী চেকার সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতার ধর্মে উদ্দীপিত হওয়ার ভাবনাসমূহ—গল্পের প্লটকে কাহিনী ও ঘটনার জটিল জটে রূপ দেয়নি, তবে নায়ক চরিত্রের স্বধর্মকে বোঝার সহায়ক করেছে। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের প্লট বিবৃতিপ্রধান গল্পের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। আর এই কারণেই

প্লটের মধ্যে যে 'মহামুহূর্ত' দেখা দেওয়া স্বাভাবিক রীতি—তা এসেছে মুকুন্দ পালের চরিত্র ধরেই। যদি গল্পের টানা কাহিনী ও তাৎপর্যময় ঘটনাগুলির সূত্র ধরে 'মহামুহূর্ত' নির্দিষ্ট করতে হয়, তাতে মুকুন্দর শেষ মৃত্যুমুহূর্তের জায়গাটিকেই এ ব্যাপারে বাছতে হয়।

কিন্তু বস্তুত এই গল্পের 'মহামুহূর্ত' এসেছে প্রধান চরিত্র ধরেই। চরিত্রেব অন্তর্নিহিত পরিবর্তন-ধর্মী স্বভাব ব্যঞ্জনাতেই এমন 'চরমক্ষণ' বেশি শিল্পমর্যাদা পায়। গল্পের 'মহামুহূর্ত' অংশটি কিছুটা বিস্তারিত চিত্রের মর্যাদা-ধন্য। তৃতীয় পরিচ্ছেদে যেখানে মুকুন্দ পাল এক সন্ধেয় যোগেন্দ্রকে ডেকে তার নব-যৌবনশক্তির কারণ জানানোর জন্য প্রস্তুতি নেয়, সেখানেই 'মহামুহূর্তে'র শুরু। প্রধান চরিত্র ধরেই ক্রমশই সেই শিল্প-প্রকরণের বিস্তার। গল্পকার মুকুন্দর এমন প্রাণশক্তির জাগরণের মূলকে গোপন রেখেছেন গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আগে পর্যন্ত। চোলাই করা মদের বোতল ও গ্লাস বের করার পর যোগেন্দ্রর ভাবনা ও মুকুন্দ পালের সঙ্গে তার সংলাপ-বিনিময়েই 'মহামুহূর্তে'র ব্যঞ্জনা একে একে পাঠকের অনুভবে আসে :

> 'সাওড়াপুরের ভল্লা বাগদীরা তৈরি করে নদীর ধারে। এখানকার অনেকে গোপনে কিনে খায়। এ গাঁয়েরও দু-একজন খায়; চেকা মোড়লই খায়। কিন্তু তা বলে যোগেন্দ্র খাবে কি বলে? পালই বা খায় কি বলে? বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা তাদের, বয়স হয়েছে, যাকে বলে এক পা ডোঙায়, এক পা ডাঙায়। আজ পালের এ কি আচরণ?
>
> ততক্ষণে ছোট গেলাসে খানিকটা ঢেলে ঢুক করে ওযুধ খাওয়ার মতো খেয়ে ফেলে পাল বললে, জ্বর পালাতে পথ পাবে না, তিন দিনে গায় তাগদ পাবে; আমার মতন খাটতে পারবে।
>
> গেলাসটায় যোগেন্দ্রর জন্যই খানিকটা ঢালতে ঢালতে সে বললে, ওই শালা চেকা, চেকা শালা একদিন আমাকে বলেছিল। বুঝলে, আমার খানিক আশ্চর্য লাগত, সবাই জ্বরে ওলট-পালট খেলে, ওই শালার একবার বই জ্বর হল না কেন? তা শালাই আমাকে বললে, সেই যে, যেদিন থাই ঠুকে আমায় ঠাট্টা করেছিল। সেইদিন বলেছিল।—মদ-মাংস খাই, জ্বর আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তা দেখলাম, হ্যাঁ পথ্যিটা উপকারী বটে। তাগদ আমি পেয়েছি।'

এখানেই গল্পের 'মহামুহূর্তে'র শীর্ষবিন্দু। আর এই শীর্ষবিন্দুতে স্থিত থেকেই মুকুন্দ পালের এমন নতুন যৌবন-প্রাণ বরণের উপযোগী মুক্তমনের স্বীকৃতি :

> 'আশি বছর। আশি বছরে তো সোজা হয়ে বেড়াব হে যগন্দ!
>
> যোগেন্দ্র বললে, কিন্তু ধর্ম আছে তো!
>
> হ্যাঁ। আছে বইকি? আলবৎ আছে। এ তো ওযুধ। ধম্মতে ওষুধ খেতে বারণ করে নাকি? ধম্মতে বলে নাকি, ওযুধ না খেয়ে রোগে ভুগে খক খক করে কেশে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমাব ধান তুলে দেবে? ধম্ম।..'

মুকুন্দ পালের বয়সান্তিক জীবনের যে ধর্ম, তা একজন জাত-চাষীর ধর্ম—চায করে সোনার ফসল ফলানো, তাকে ঘরে তোলা। এই সমস্ত সংস্কার-মুক্ত থেকে ফসলকেই জীবনের সত্য ভাবার মধ্যেই 'চরমক্ষণে'র সার্থক শিল্পরূপ। নিজের হাত যোগেন্দ্রর দিকে বাড়িয়ে মুকুন্দ বলে—

> 'দেখ শরীরটা কদিনেই কেমন বেঁধেছে দেখ। বুড়ো। বুড়ো বয়স।
> যোগেন্দ্র হাতখানা নেড়ে দেখতে বাধ্য হল, কারণ পাল একরকম হাতখানা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে গেল যোগেন্দ্র।
> সত্যই, আরে সে রকম তলতলে ঝলমলে নয় চামড়া। অনেকটা শক্ত হয়েছে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হল।'

যোগেন্দ্রের এই যে বন্ধু মুকুন্দ পাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—এখানেই বিস্তারিত মহামুহূর্ত চিত্রের শেষ।

গল্পের প্লট যেভাবে একটিমাত্র চরিত্রকে নির্ভর করে একটি বৃত্ত-স্বভাব পেয়েছে তাতে গল্পের কাহিনীর শুরু এবং মধ্যবর্তী অংশের 'চরমক্ষণ' নির্মাণ ও শেষতম মুকুন্দ পালের মৃত্যুদৃশ্য রচনায় একটি শিল্পন্যায় (logic) বজায় থাকে। গল্পের চতুর্থ পবিচ্ছেদ—যে পরিচ্ছেদ মুকুন্দ পালের মৃত্যুতেই এক মহান বিষাদময় পরিণতির শিল্পগৌরব পায়, সেখানেও এসেছে চেকা। মাঠ থেকে ধান গাড়িতে তুলে বোঝাই ধানের মাথায় সে একা আসীন। তাকে দেখা, তার শ্লেষাত্মক হাসি, পুরনো ঠাট্টা—এসব নিয়েই মুকুন্দর জীবনমৃত্যুর বিষাদময়তার দিকে অবধারিতভাবে এগোয়। কাহিনী প্লটরচনার দায়িত্বে কিছুটা জট পাকিয়েছিল মুকুন্দর মদ্যপানের অভ্যাস দিয়ে, শেষে সেই জট মুক্ত হয় মুকুন্দর মৃত্যুতে। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের প্লট-জটিলতা একমাত্র নায়ক চরিত্রনির্ভর, গল্পের বিষয়কেন্দ্রিক নয়, যদিও গল্পের নামপ্রয়োগে আছে সেই বিষয়েরই নির্মোক।

দুই

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটি আকারে বড় গল্পের স্বভাব তুলে ধরে। তাই এর মধ্যে যেমন ঘটনার প্রাধান্য আছে অতীত ও বর্তমানের প্রসঙ্গ ধরে, তেমনি আছে চরিত্রের ভিড়। চরিত্রগুলি হল—মুকুন্দ পাল, চেকা, যোগেন্দ্র, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শশী এমনকি পরোক্ষে রমণকাকাও। নুকুন্দ নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র বলেই তাকে যেন ব্যাখ্যা করার জন্যই, তার স্বরূপ তুলে ধরার জন্যই এমন সব ছোট ছোট চরিত্র আঁকার প্রয়াস দেখা গেছে গল্পকারের দিক থেকে। কিন্তু গল্পের মধ্যে এত বেশি উপকাহিনীর আভাস জমা হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ কোনো উপন্যাসের খসড়াকে বুঝিবা ধরিয়ে দেয়!

যাই হোক, মুকুন্দ পালের জন্যই গৌণ চরিত্রের আগমন ঘটেছে এমন বড় গল্পে। চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে মুকুন্দ পালের আবির্ভাব ঘটেছে প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রথম দিকে। কিন্তু তার আবির্ভাব বৃদ্ধ বয়সের জরাগ্রস্ত শরীরের কয়েকটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই। এই মুকুন্দ একজন সৎ চাষী, তার কাছে জমি, তার চাষ-বাস,

তার ফসল ঘরে তোলা, তার সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির যোগে পৌষলক্ষ্মীর ভাসান-গান চিন্তা—এসবই একমাত্র সত্য হয়। আর এসব ঠিকমতো বজায় রাখতে গিয়ে তার দরকার দুরন্ত যৌবনের উপযোগী শরীর-স্বভাব। তার প্রাণের গভীরে আছে অফুরন্ত শক্তি, শরীরে আছে অসহায়, নিষ্করুণ শক্তিহীনতা। এই বৈপরীত্যে মুকুন্দ পাল জর্জরিত অনুশোচনায়, লজ্জায়।

মুকুন্দ পালের জীবনপ্রাণের যে অসহায়তা, তা দুদিক থেকে উঠে আসে—(১) বয়সের ভারে শ্লথমন্থর, অক্ষম জীবনের ভূমি থেকে, (২) তার প্রতিস্পর্ধী কৃষক যুবক চেকার দাম্ভিক, শ্লেষাত্মক অথচ কৌতুককর আচার-আচরণ থেকে। মুকুন্দ নতুন করে যৌবন-শক্তির কৃপাপ্রার্থী। মূলে সে সৎ কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামন্বন্তরের যে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল সে সময়ের কৃষক ও কৃষিজীবনে এবং কৃষিব্যবস্থায়, মুকুন্দ পাল তার পরে আবার নতুন জীবন বরণে, রঙিন আশার জীবন রূপায়ণে নতুন শক্তি চায়। তার যৌবনশক্তির প্রয়োগে যা কিছু কামনা-বাসনা সবটাই ভূমিনির্ভর। এখানেই এই চরিত্রের এক অনন্য রূপ। তার বলিষ্ঠ জীবনকামনা—এই বৃদ্ধ বয়সেও—নিজের ভোগের জন্য নয়, কৃষিজীবন ও কৃষিভূমিকে সবুজ প্রাণের স্পন্দনে দীপ্ত করার জন্যই।

মুকুন্দ পালের জীবনশক্তি তার অন্তর-নিহিত প্রাণশক্তির সঙ্গে সমন্বিত। সে 'গদা' থেকে 'ভীম' এবং শেষে 'মোটা মোড়ল' উপাধিতে ভূষিত হয়ে তার দৈহিক শক্তি ও প্রাণশক্তির সমন্বয় করে চলে অতীত জীবন সূত্রে। বর্তমান বৃদ্ধ-জীবনে, জরাগ্রস্ত শরীরে সে অতীত জীবনাকাঙ্ক্ষী, কারণ লক্ষ্য তার জমির মাটি, কৃষিকাজ, সোনার ফসল, আর সব মিলিয়ে গ্রামের পৌষলক্ষ্মী পুজোর আবাহন। বয়সের সঙ্গে শক্তি কমে আসে এটা মুকুন্দও বোঝে, কিন্তু যেখানে কর্মই জীবন, মাটি ও তাতে সোনার অফুরন্ত ফসল ফলানোই জীবন, সেখানে সে তুচ্ছ করতে চায় আধি-ব্যাধিতে পর্যুদস্ত জরার জীবনকে। এই যে বিধিপ্রদত্ত নিয়তির বিরুদ্ধে চিরকালের মানবপ্রাণের সংগ্রাম—মুকুন্দ পাল তারই প্রতীকী চরিত্র।

মৃত্যু নিয়ে মুকুন্দর মনে আছে দ্বন্দ্ব, জটিল ভাবনা :

> 'যগন্দ বললে, লা এসে ঘাটে লেগেছে। আর দেরি নাই। যগন্দর গলা কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও চোয়ালের নীচের সমস্ত মাংসটা থর থর করে কাঁপতে লাগল।......যগন্দ তাকে হুঁকোর কথা মনে পড়িয়ে দিল, খাও।
>
> হুঁকোয় সে শুধু মুখই দিলে, টানলে না। তারপর হঠাৎ বললে, লায়ে পার হতে তো ভয় নেই যগন্দ, 'হরি' বলে নাপিয়ে লায়ে চড়তে পারতাম তবে তো। কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হ্যাঁ হে, তিন চার মাসের কটা জ্বরে এ কি হল বল তো?'

মুকুন্দর যে জীবন-সন্ধিৎসা—তা মাটি চাষ ও ফসল ফলানোর ভাবনার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েই এগিয়েছে। তাই জীবনের যে জরা-স্বভাব তা তার সরল মনকে বিস্মিত করে, ভাবায়।

মুকুন্দ নিজের জীবনের শক্তি দিয়ে জীবনের সৃষ্টিশক্তির বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। চেকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পাল সে ক্ষেত্রে উদ্দীপন বিভাগের কাজ করে। চেকা নিমিত্ত মাত্র, মুকুন্দব নিজের মধ্যেই আছে বিশুদ্ধ প্রাণশক্তি, তা পাকা ফসলে পূর্ণ মাঠের যে মৃত্তিকাশক্তি, তার মতোই সদা-সজীব, গতিময়। এই ভিতরের শক্তিকে মুকুন্দ কাজে লাগাতে গিয়ে আশ্রয় নেয় মদ-মাংসের।

বস্তুত, এই যে মদ-মাংসের শক্তি, তা মুকুন্দ চরিত্রে আরোপিত। মুকুন্দব প্রাণশক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটেছে বাইরের কৃত্রিম শক্তির প্রয়োগে—মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণের মতো পুষ্টিকারক দ্রব্যের বিনিময়ে। মুকুন্দর যা বয়স, তাতে জরা অপসাবিত হওয়া সম্ভব নয়। তাতে ক্ষণিকতায় তাজা করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থাই মুকুন্দব জীবনে বিষাদময় করুণ পরিণতি আনে—তাব মৃত্যু ঘটায়। মুকুন্দর জীবনে শেষ বিষাদঘন পরিণতির নিশ্চিত রন্ধ্র-পথটি মদ-মাংসের যোগেই নির্মিত। মুকুন্দর উচ্চ-হাসি, নাতনির প্রতি কৌতুক বচন প্রয়োগ, বাড়িতে 'কুস্তিগীবের মতো কাপড় সেঁটে রীতিমত বৈঠক' দেওয়া, চেকার আচবণকে তুচ্ছ করে তাব প্রতিদ্বন্দ্বী হওযার বাসনা ও প্রত্যক্ষ প্রযাস—সবই এসেছে মদ্যপানের উত্তেজনা থেকে, নতুন এক জীবনস্বাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে, অবশ্যই তা কৃত্রিম। শরীরের অভ্যন্তব থেকে তা আগত নয়, বাহির থেকে আরোপিত।

মাটি ও তার ফসলেব প্রতি গভীর প্রীতি ও আকর্ষণে, নবযৌবন বরণে মুকুন্দ পাল দেহের বার্ধক্যের অভিজ্ঞানগুলিকে অস্বীকার করেছে, জীবন ও যৌবনশক্তিব প্রবলতম বেগে এই বৃদ্ধ বয়সেও সেকালের গ্রামীণ পরিবেশে তথাকথিত অশিক্ষিত সৎ মৃত্তিকাপ্রেমী এক কৃষক আজন্ম সংস্কাবের ধর্মবিশ্বাসকে, এতদিনের বৈষ্ণবীয় সমস্ত আচার-আচরণকে নির্বিচারে ত্যাগ করেছে। মদ-মাংস খাওয়াকে সে জোর গলায় সমর্থন করে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়েই:

> 'এ তো ওযুধ। ধম্মতে ওষুধ খেতে বারণ করে নাকি? ধম্মতে বলে নাকি, ওষুধ না খেয়ে রোগে ভুগে খক খক করে কেশে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম?'

মুকুন্দ চরিত্রের এই বিবর্তন তার পরিবর্তনেরই বড় দিক দেখায়। সে একজন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের গ্রামীণ কৃষক। উঠানের গোলাগুলির পূর্ণ করা ধান আর নগদ টাকার প্রাচুর্যে শ্রীকৃষ্ণ পাল ওরফে চেকা গ্রামেব সবচেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী। অভাবের দিনে মুকুন্দ ওর কাছেই 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘে' জমি বিক্রি করে দেয়। চেকার যৌবন আর আর্থিক সংগতি মুকুন্দকে অস্থির করে, জ্বালা ধরায় মনের গভীরে। তার নতুন করে যৌবনেব তেজ ও শক্তির আর্তি আব এক কারণে:

> 'সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না করে সে মরতে পারবে না। তা হলে ওই চেকাই সর্বনাশ করে দেবে। সরস্বতীর উপর নজরও যে সে না দিতে পাবে, এমনও নয়;'

চেকার সঙ্গে তার যে বিরোধ, তা শুধুমাত্র দুজনের যৌবন-প্রাণ স্বভাবে বড় রকমের তাবতম্য নিয়ে নয়, অর্থে ও সামর্থ্যে চেকার নৈতিক চরিত্র ও নিজের বিধবা যুবতী নাতনি সরস্বতীর প্রতি চেকার গোপন অবৈধ আকর্ষণের ভাবনাও এর মূলে সক্রিয় থাকে। মুকুন্দ পাল নিজের মৃত্যুর পরের লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভবিষ্যৎ সংস্থানের কথাও ভাবে। কৃষিজীবন ও সংসারজীবন—দুই মিলে মুকুন্দ পালের নবযৌবন বরণেব খাঁটি আবেগপ্রাণতাকে চিত্রিত করেছেন গল্পকার তাঁর 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে।

মুকুন্দ পাল একজন সাংসারিক ব্যক্তি থেকে যথার্থ কৃতী কৃষকের মর্যাদায় পাঠকের সামনে আসে তার সঙ্গে ধান রোপণ করা মাঠের প্রকৃতিব সম্পর্ক উপলব্ধি করে:

> 'বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াশায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধবধবে সাদা মখমলের চাদর দিয়ে ঘুমন্ত মা বসুমতীকে ঢেকে দিয়েছে। মদ অতি সামান্য খেয়েচে তারা। তবু অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে তাই চনমন করছে। পাল বললে, চল, মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে আসি একটু।
>
> দুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। দুধ-ববণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সোনার-বরণ মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। দু'চোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।
>
> পাল বললে, যগন্দ।
>
> আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী শুয়ে আছেন তুমি দেখ। তাই বলছি যগন্দ, এইবার দিন ফিরল, তুমি দেখো।

যোগেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে সামান্য মদ্যপানেব মেজাজে মুকুন্দ যে প্রকৃতি দেখেছে, তা ফসলে যেন পূর্ণ প্রাণের যুবতী এক কৃষি-ভূমি। তার প্রকৃতি-প্রেম তার মনের অধিতলে মহামন্বন্তরের একদিকের বিরাট বিনষ্টির পাশে আর এক সৃষ্টির আশাকে জাগায়। আবেগে-উচ্ছ্বাসে মুকুন্দ বলে ওঠে:

> 'এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুঃখেব কাল গিয়েছে যগন্দ, আসছে পঞ্চাশ বছর, দেখো তুমি সুখের কাল হবে, দেখো, আমি বললাম। এই ত্রিশ টাকা মন চাল, এই মড়ক—এই গেল দুর্ভোগের শেষ। এইবার, দেখ তুমি মাঠের দিকে দেখিয়ে, মা-লক্ষ্মী এবার এলেন।'

মুকুন্দর এই যে আশা ও আত্মপ্রত্যয়—এ এক নিপুণ কৃষকেরই মনের স্বাভাবিক বিকাশ—প্রকৃতিপ্রেম থেকে গভীর আশাবাদে মনোলোকের উত্তরণ। সবশেষে নতুন কবে আর একটু মদ্যপানের প্রসঙ্গ মুকুন্দ তুললে যোগেন্দ্র যখন বাধা দেয়:

> 'মা-লক্ষ্মী আবার গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী, বষ্টুমের ঘরের বউ।'

তার উত্তরে মুকুন্দর যে উক্তি, সেখানে আছে একজন জাত কৃষকের কৃষিজীবন ও তার ফসলের প্রতি যেমন তীব্রতম আকর্ষণ, প্রীতি, তেমনি তাকে যথাযথ করার গভীর বাসনাও:

'হুঁ। একটু ভেবে পাল বললে, তা বলে। তা—

যোগেন্দ্র বলে, বুঝে দেখ তুমি।

ধানকাটা হয়ে যাক, তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে?

দেখছো তো ধান। এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি করে?'

গল্পের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদে মুকুন্দ পালের মৃত্যু ঘটেছে। তার মৃত্যুদৃশ্য-উপস্থাপনা বিস্তারিত প্রস্তুতি-চিত্রে বর্ণাঢ্য। মুকুন্দর ধান কাটার আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও একটানা পরিশ্রমের মধ্যে এসেছে প্রত্যক্ষভাবে চেকার উপস্থিতি, রমণকাকার মৃত্যুসংবাদ। চেকাব উপস্থিতির উত্তেজনা মুকুন্দকে তীব্রতম অস্থিরতার মধ্যে নিয়ে যায়। রমণকাকার মৃত্যু তাকে গভীর ব্যথিত করে এমন এক সময়ে যখন মুকুন্দ চায় সারা শরীরে এক প্রবল শক্তি মাঠ থেকে ধান তোলা ও গাড়িতে সেগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়ার। ব্যর্থ হয় মুকুন্দ। তার ব্যর্থতার চিত্র যেমন করুণ, তেমনি গভীর মর্মস্পর্শী:

> 'পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মতো। বার কতক পা দুটো ছুঁড়লে— নাকটা ঘষলে মুখটা ক্ষেতের ধুলোর উপর, এক মুখ ধূলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধানভরা মুঠা-বাঁধা হাত দু'খানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্তে।'

মাটির ওপর ক্ষেতের ধুলোয় মুখ রক্তে মাখামাখি হওয়া ও প্রসারিত দু'হাতের মুঠোয় ধানভর্তি হওয়ার মধ্যে চিরকালের জন্য চেতনা লুপ্ত হওয়ার বর্ণনায় মুকুন্দ পাল চরিত্রটি সর্বকালের যথার্থ কৃষিপ্রেমিক শ্রমিকের প্রতীকপ্রতিম মর্যাদায় মহনীয় রূপ পেয়ে যায়। এক বৃদ্ধ কৃষকের চাষের সূত্রেই কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের নায়কের মহিমাঘন বিষাদাত্মক মৃত্যুরই শিল্প-সম্মান পেয়ে যায়।

মুকুন্দ পালের পাশাপাশি 'শ্রীকৃষ্ণ পাল' অর্থাৎ 'চিকেষ্ট' ওরফে 'চেকা' অবশ্যই গৌণ চরিত্র। একাধিক সমালোচক মুকুন্দর পাশে চেকার কথা মনে রেখে দু'য়ের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব দেখেছেন— যা তারাশঙ্করের একাধিক গল্পে ও উপন্যাসে আছে। কিন্তু 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে মুকুন্দর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পালের যে প্রভেদ—তা শুধু বয়সের। মুকুন্দ ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ, চেকা এক যুবক কৃষক। সামাজিক মর্যাদায় মহামন্বন্তরের কারণে মুকুন্দ তার অর্থগরিমা থেকে নেমে এসেছে, অভাবে কিছু জমি বিক্রি করেছে চেকারই কাছে। আব চেকা এই যুবক বয়সেই হয়েছে গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন চাষী ও একমাত্র মহাজন।

শুধু বয়সে পঙ্গু ও ব্যাধিতে পর্যুদস্ত মুকুন্দকে যদি প্রাচীন বলা হয়, আর তার পাশে চেকাকে যুবক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণেব নবীন মানুষ বলা হয়, তবে প্রাচীন ও নবীনে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বড় কোনো শিল্পের ন্যায় (logic) মানে না 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে। তা তো স্বাভাবিকই এবং এক বয়সে ও অক্ষমতাব অসহায়তায় প্রবীণের কাছে একজন নাতির বয়সী তরতাজা যুবক তো নবীন বয়সের যৌবন নিয়ে ঠাট্টা করতেই পারে! প্রবীণ ও নবীনের

দ্বন্দ্বের দিক এভাবে গল্পের চরিত্র-ন্যায়ে কঠিন জমি পায় না। লক্ষণীয়, মুকুন্দ প্রবীণ ও জরাগ্রস্ত হলেও প্রাণশক্তির অফুরন্ত স্বভাবে সে অনেক বড় মানুষ। নদীর গতিতে যেমন আবর্জনা জমে না, মুকুন্দর প্রাণশক্তিতে কোনো কৃত্রিমতা নেই, মালিন্য নেই। সে কৃষক, ধান চাষ, কাটা ও ঘরে তোলার জন্যই তাব নতুন যৌবনের জন্য রক্তিম আর্তি। আর এরই ফলে সে হয় মুক্তমনের পুরুষ, সে সংস্কারমুক্ত হয়ে মদ্যপান ও মাংসভক্ষণ করে। এই যে আধুনিকতা, তার সঙ্গে আধুনিক চেকার দ্বন্দ্ব কোথায়? মুকুন্দ যে স্বপ্ন দেখে, তা তো আধুনিক মনেরই যথোচিত চাহিদা! সেকালের একজন প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এমনভাবে মদ্যপানে নিজের শক্তি সঞ্চয় করে, আচারসর্বস্ব ধর্ম ও ধর্মাচারকে উপেক্ষা করে মাটির জন্য, ফসলের জন্য! সে তো আধুনিক মনের মানুষ!

চেকাও একালের যুবক, অবস্থাপন্ন চাষী। গোলায় প্রচুর ধান ও সঞ্চিত অর্থ হিসেবে কাঁচা টাকা রাখার ক্ষমতা রাখে। মদ-মাংসে তার লোভ এতটুকু কম নয়। সে মহাজন হয় এবং সুদে টাকা খাটায়। সে-ও একালের মানুষ। মুকুন্দ পালের ভাবনা থেকে ধারণা হয়, চেকা মুকুন্দর একটিমাত্র সন্তান নিয়ে বিধবা নাতনি যুবতী 'সরস্বতীর উপর নজরও যে সে না দিতে পারে, এমনও নয়;' এ সমস্তই প্রমাণ করে, চেকা এক বিকৃত আধুনিক মনের, নবীন-প্রাণের মানুষ। মুকুন্দ যথার্থ অর্থে সুস্থ রুচির আধুনিক ও সর্বকালের কৃষক। তাই দুজনের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব সন্ধান নিরর্থক বলেই আমরা মনে কবি— অন্তত দুই চরিত্রের অন্তঃস্বভাবের বৈশিষ্ট্যে।

আসলে তারাশঙ্কর মুকুন্দর সঙ্গে চেকার যে সংঘর্ষ চিত্র এঁকেছেন কৌতুক, শ্লেষ ও চেকার দম্ভ দিয়ে, তা বয়সের ও আভিজাত্যেব সংঘর্ষ, গভীর অর্থে প্রাচীন ও নবীনের নয়। চেকার যে পরিচয় মুকুন্দর ভাবনায় একে একে পাই, তা প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘর্ষের ব্যঞ্জনাকে বোঝায় না, বোঝায একই ভূমিতে দাঁড়ানো দুই চাষীর আভিজাত্যের সংঘর্ষকে:

> ১. 'শালা চেকা। শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণা পুজো করবে এবার। হিংসুটে বদমাস। রক্তেব তেজ, জোয়ানীর দেমাক, আব টাকার গরমে ধরাকে সরার মতো দেখছে। এবার লক্ষ্মী পুজোর বারোয়ারী থেকে ভাসান গান ঠিক হয়েছে। ও অমনই অন্নপূর্ণা পুজোর ধুয়ো তুলেছে। তুলুক, দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারী। ওর একার পুজো।'
>
> ২. 'এ গাঁয়ের মহাজন ওই চেকা। ওই ওরই দোরে আর যেতে হবে না। বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ থই-থই করা ধান, খামারভর্তি গোলাভর্তি ঘরভর্তি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আব যাবে না।'

চেকা সম্পর্কে এইসব ভাবনা নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব নয়, দ্বন্দ্ব বোঝায় গরিব চাষী ও মহাজন চাষীর মধ্যেকার অর্থনৈতিক স্তরভেদের।

গল্পে চেকার কাজ মুকুন্দকে তার নিজের কাঙ্ক্ষিত নবীন প্রাণের স্বভাবে উদ্দীপিত করা। তাই ঠাট্টা-কৌতুকে, বয়স নিয়ে শ্লেষ করার মধ্যে কুস্তি করার ইঙ্গিত দিয়ে পিতামহ

স্বভাবের মুকুন্দকে রাগিয়ে আনন্দ পায় চেকা। তার টাকার অহংকার ও মহাজন হওয়ার আভিজাত্য বোধ তাকে মুকুন্দর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো প্রেরণা দেয়। চেকার কথাতেই মুকুন্দ মদ-মাংস ধরে। গল্পের তিন পরিচ্ছেদে চেকার সাক্ষাৎ থেকে শ্লেষ-কষায় সংলাপ ব্যবহারের চিত্র মেলে সেখানে চেকা মুকুন্দর আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী নাক বেঁকে যাওয়ার বিষয় দিয়ে নির্মম ঠাট্টা করে। গল্পের শেষ চার পরিচ্ছেদেও চেকাকে গল্পকার এনেছেন ধান কেটে গাড়িতে বোঝাই করা স্তুপের মাথায় বসিয়ে—উদ্দেশ্য সেই মুকুন্দর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেষারেষির তীব্রতা সৃষ্টি করা, যা মুকুন্দর মৃত্যু পরিণামকে নিশ্চিত করার পক্ষে অন্যতম সহায়ক হয়। বস্তুত চেকা মানুষটি তারাশঙ্করের নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক। মুকুন্দর মধ্যে নতুন প্রাণের উন্মাদনা জাগানোর একমাত্র উপায় চেকার কৌতুক, শ্লেষ, সক্রিয়তা। এখানেই সার্থক গৌণ চরিত্র হিসেবে এর দায়িত্ব ও মর্যাদা।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে মুকুন্দর সমবয়সী যোগেন্দ্র ঘোষ আর একটি গৌণ চরিত্র। এই চরিত্রের উপস্থাপনাগত উদ্দেশ্যও হল মুকুন্দ পালের স্বভাবকে ব্যাখ্যা করা। যোগেন্দ্র বয়সের ভাবজনিত মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ। সে ধর্মভীরু। কিছুটা যুক্তিনিষ্ঠ হল এই যোগেন্দ্র। একবার চেকার সঙ্গে মুকুন্দ কুস্তিতে মাততে গেলে যোগেন্দ্রই যুক্তি দিয়ে সেই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাকে নিবৃত্ত করে। চেকা মুকুন্দকে বয়সের অক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা করে গেলে যোগেন্দ্র মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতার কথা শোনায় মুকুন্দকে। 'লা এসে ঘাটে লেগেছে। আর দেরি নাই।' মুকুন্দর মনে মৃত্যুভয়কে সত্য করে তোলাই এব কাজ। তা দিয়ে মুকুন্দর নতুন করে বাঁচার বাসনা তীব্র হওয়ার সুযোগ পায়। মুকুন্দব প্রাণশক্তি, উচ্চ হাসি, কর্মক্ষমতা, অদম্য উৎসাহ দেখে সে বিস্মিত হয়, ভীত হয়।

এই যোগেন্দ্রই শেষে ধর্মভয় থেকে সরে এসে মুকুন্দর দেওয়া চোলাই মদ খায়, নেশা করে। মুকুন্দর আচবণ তাব কাছে প্রথমে মনে হয় উন্মাদগ্রস্ত হওয়াব ভূমিকা, পবে সে মুকুন্দর চাপে তাব পথেই পা ফেলে। পালের লোকভয়, সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। এর সঙ্গে মৃত্যুভয় তাকে সদা-আড়ষ্ঠ করে রাখে। যোগেন্দ্র যুবক বয়সে অভিনয় করত ভাসানের গানে, মুকুন্দব সঙ্গেই। এমন বন্ধুত্ব দিয়ে, নিজের ভয়, সংস্কার দিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে মদ্যপান করে সে যেমন মুকুন্দকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে, সে নিজেও তেমনি মদেব নেশায় মুকুন্দর কথার প্রত্যুত্তরে ও সিদ্ধান্তে নিজের মনের বদলকে মেনে নিয়েছে নব যৌবনের শিহরনে:

> 'এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি, খুব বাঁচব। দু'টো গোলা নির্দিষ্ট রেখে দোব আমাব কম্মের জন্যে। বাকি যা থাকবে, ওরা যা খুশি তাই করবে।
>
> যোগেন্দ্র বলল, ভাল যুক্তি, ভাল যুক্তি। আমাকে এমতই বন্দোবস্ত করতে হবে।
>
> করতে হবে নয়, করে ফেলাও।
>
> কাল ভোরে যখন যাবে মাঠে, ডেকো আমাকে। আর বোতলটা বরং নিয়ে এসো। একঢোক না খেয়ে তো যেতে পারব না মাঠে।'

এমন সিচুয়েশনে মুকুন্দর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার সময়েও 'যোগেন্দ্র বললে, ভোরে ডেকো যেন।'

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে যোগেন্দ্র গৌণ চরিত্র হলেও তার বিবর্তন আছে, বদল দেখিয়েছেন গল্পকার মানসিকতায়। গল্পের একেবারে শেষ চিত্রটি যোগেন্দ্রকে দিয়েই এঁকেছেন গল্পকার :

> 'যোগেন্দ্র উঠে বসেছিল ঘরে চুপ করে। রমণ মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার—সে দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে দিলে।'

এই শেষতম চিত্রে বন্ধু মুকুন্দর মৃত্যুর পর আছে যোগেন্দ্রর সেই মৃত্যুভয়। কিন্তু গল্পের বাঁধুনির দিক থেকে, শেষতম ব্যঞ্জনার তাৎপর্যে যোগেন্দ্রর এই চিত্র কতটা শিল্পের দাবির কাছে অমোঘ, তাতে সন্দেহ থেকে যায়। যোগেন্দ্রর সমগ্র গল্পে সক্রিয়তা মুকুন্দর মধ্যকার মৃত্যুভয়কে জাগিয়ে তাকে অতিক্রম করার মতো নায়ক চরিত্রে প্রেরণা দিয়েছে পরোক্ষে ঠিকই, কিন্তু মুকুন্দর কথা শেষ হওয়ার পরেও যোগেন্দ্রর মৃত্যুভয় দেখানোয গল্পশিল্প পরিণামী যথার্থতা পায় না।

তিন

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে তারাশঙ্করের মানবজীবনকে দেখাব নিজস্ব দৃষ্টির প্রতিফলন অ-দৃশ্য নয়। তারাশঙ্করের প্রায় সমস্ত গল্পেই বিভিন্ন পেশা ও নেশার মাটির মানুষদের সাক্ষাৎ মেলে। সাঁওতাল, বাউরী, বাগদি, ডোম, কাহার— এইসব প্রায়-সর্বহারা শ্রেণীর কিছু যাযাবর, কিছু সংসারী মানুষদের যেমন দেখা মেলে, তেমনি চাষবাসের ওপর নির্ভর করে যেসব কৃষক জীবন কাটায়, কলে শ্রমিকের জীবন নিয়ে যারা প্রাণপাত করে, তাদের কথাও বলেছেন সমান দরদে। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের মুকুন্দ পাল সেইরকম এক কৃষক— যার মধ্যে প্রধানত ফসল ফলানোর নিষ্ঠায় দেখা দিয়েছে বৃদ্ধ বয়সেও নবযৌবনের উদগ্র বাসনা। মৃত্যুকে পাশে সরিয়ে রেখে জীবনকে বলিষ্ঠতায় আলিঙ্গন করার বাসনা এবং সেই বাসনারই নিষ্ফলত্ব দিয়ে নায়কের মহাকাব্যিক গরিমার মৃত্যুচিত্র এঁকে গল্পকার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার চিরকালীন দীর্ঘশ্বাসের শব্দহীন শব্দকে শুনিয়েছেন।

অর্থাৎ 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে গল্পকার যাট-পঁয়যট্টির মুকুন্দ পালকে করেছেন এক আদিম ক্ষমতার অধিকারী মানব-অস্তিত্ব। যে প্রাণের বেগে প্রকৃতির বুকে সব কিছু স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রকাশ পায়—গাছ, মাটি, জল, বাতাস, মেঘ সেই বেগকে জরাগ্রস্ত শরীরেও চায় তারাশঙ্করের নায়ক. উদ্দেশ্য—মাটির বুকে জীবনের ও যৌবনের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। জীবনবিনাশী অমোঘ মৃত্যুকে কিছু সময়ের জন্য থমকে দাঁড় করানো! মুকুন্দ পাল মৃত্যুকে ভয় পায় না, মৃত্যু একদিন আসবেই, সে বিষয়ে সচেতন। সে স্বীকার করে:

> ১. 'এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি, খুব বাঁচব।'
>
> ২. 'কিসের বুড়ো বয়স হে? বুড়ো বয়স কিসের? বুড়ো বয়স! কই ডেকে আন তোমার কে ছোকরা আছে, আন আমার কাছে। বুড়ো বয়স।'
>
> ৩. 'আশি বছর। আশি বছরে তো সোজা হয়ে বেড়াব হে যগন্দ!'

কিন্তু এই বাড়তি যৌবনের প্রয়োজন মৃত্তিকাপ্রেমের কারণেই। একজন নিষ্ঠাবান কৃষকের মৃত্তিকাপ্রেমের যথার্থ অভিজ্ঞান হল তার চষা ক্ষেত, ফসল, সেই বিপুল ফসলের সম্ভারে উত্তরকালের জীবনকে সচ্ছল করা!

মুকুন্দ পালের এই জীবনতৃষ্ণা কিন্তু সার্থকতা পায় না। অমোঘ নিয়তির নির্দেশ তা-ই। কোনো এক সময়ে তার শেষ আসবেই। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে পারস্পরিক চ্যালেঞ্জ—তার চিত্রই তারাশঙ্করের জীবনদর্শনকে দ্যোতিত করে। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে তার প্রতিচিত্রণ সুন্দর শিল্প-সুষমা মণ্ডিত। সে সময়ের দেশের যুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষিতে মহামন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় এই গল্পটি রচিত বলেই গল্পকার যে যথার্থ অর্থে কাল সচেতন, গল্পের প্রেক্ষাপটে তার প্রমাণ মেলে। মহামন্বন্তরের জন্যই মুকুন্দ পাল নিজের জমি চেকাকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে মুকুন্দর চিন্তায় ধরা আছে সেই মহামন্বন্তরের সকরুণ চিত্র। তার পাশাপাশি আছে নতুন করে বাঁচার কথা, নতুন ফসল ওঠার কথা, সমূহ সমৃদ্ধির দিক। একদিকে নৈরাশ্য আর একদিকে আশাবাদ। নায়কের বাসনালোকে জ্বলে যায় এমন আশাবাদের উজ্জ্বল প্রদীপ, তা থেকেই আসন্ন পৌষলক্ষ্মীর আয়োজনের বাসনা তীব্র হয়।

তারাশঙ্কর অন্তিমে মৃত্যু এনেছেন ঠিকই, কিন্তু জীবনের জয়ঘোষণাকে আঁকতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি। তাঁর attitude to life সবসময়েই জীবনেব জয়ঘোষণায় সোচ্চার হয়, কিন্তু অন্তিমে মৃত্যুর সম্ভাব্যতা জীবনের সীমাকে দেখালেও জীবনের ভিতরের শক্তিকে কোথাও বুঝি সূক্ষ্মভাবেও অম্লান রাখে। মৃত্যুর পাশে জীবন-মহিমার উজ্জ্বল দীপ্তিই 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে গল্পকারের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। প্রতীকী তাৎপর্যে তারাশঙ্করের নায়ক মৃত্যুর মুহূর্তেও জীবনের দাবি থেকে সবে আসতে চায়নি:

> 'সে দুই হাত আঁকড়ে ধরলে তাব গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে পড়ে যাবে সে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এলো মুঠা ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল।'

এমন যে শেষতম চিত্র, এর মধ্যেই আছে মুকুন্দ পালের জীবনকে গভীবভাবে ভালোবাসার প্রতি গল্পকারের প্রচ্ছন্ন মমত্ববোধ ও সমর্থন। তাবাশঙ্কর মৃত্যুর নিয়তিকে অস্বীকার করতে চাননি, কিন্তু তাব পাশে জীবনের শক্তিকে ভুলতেও চাননি। 'তারিণী মাঝি' গল্পের নায়কের মতো মুকুন্দ পালের ভিন্ন প্রেক্ষিতে যৌবনবরণেব অভীপ্সা গল্পকারের জীবনদর্শনেরই সমর্থক।

চার

আমরা আমাদের আলোচনার শুরুতেই জানিয়েছি, কোনো কোনো সমালোচক এমনও মন্তব্য করেছেন, 'পৌষলক্ষ্মী' গল্প না লিখলে তারাশঙ্কর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' লিখতেন না। এই গল্পটা নাকি ওই উপন্যাসের 'অগ্রদূত ও বীজগল্প'। এমন ধারণা,

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের ক্ষেত্রে অবশ্যই, তারাশঙ্করের অন্তত ছোটগল্প রচনার ক্ষমতার বিপক্ষেই যায়। তারাশঙ্করের কি ছোটগল্প, কি উপন্যাস—উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ের গৌরব ও গাম্ভীর্য, মৌলিকতা ও আধুনিকতা, শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য তাঁকে তাঁর সমকালের ও উত্তরকালের লেখকদের মধ্যে সমুচ্চ রাজকীয় মর্যাদার আসন দেয়। এক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়করভাবে অনন্য। কিন্তু যে কোনো রচনার প্রকরণ ভাবনায় তিনি ততটা যত্নশীল হতে পারেননি অনেক ক্ষেত্রে— এটাই আমাদেব ধারণা। প্রসঙ্গত 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পই একটি দৃষ্টান্ত। একটি ছোটগল্প যদি পরবর্তী কোনো বিখ্যাত বৃহৎ উপন্যাসের খসড়া হয়, তবে ছোটগল্প হিসেবে তার প্রকরণগত শৈথিল্য থাকতে বাধ্য। শরৎচন্দ্রের একাধিক গল্প—যেমন 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি—তাঁর উপন্যাসের স্কেচ। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের প্রকরণে একাধিক সূত্রের শৈথিল্য এর নিখুঁত শিল্পকাঠামোর পরিপন্থী হয়েছে।

মুকুন্দ পালের বার্ধক্য বোঝাতে, মন্বন্তরের দিনে গাঁয়ের বাগদী-কাহার-মুচিদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কারণে দিনমজুরি খাটার লোকদের চাষের কাজে না পাওয়ার সংবাদ দিতে গিয়ে গল্পকার যে বিবরণের আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে, তা অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীকৃষ্ণ পালের বিস্তারিত জীবন পরিচয় মুকুন্দ পালের জীবনস্বভাব বোঝাতে অপ্রয়োজনীয়। মুকুন্দ পালের অতীত স্মৃতিচারণে একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন গল্পের শিল্প কাঠামোকে শিথিল করেছে নিঃসন্দেহে। তিন অধ্যায়ের প্রথম দুই পরিচ্ছেদের মধ্যে আছে পুনরুক্তির একাধিক অংশ। যৌবন বয়সে ভাসানের গানে মুকুন্দ, যোগেন্দ্র প্রমুখের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার বিস্তারিত সংবাদও বাতিল করলে বা সংক্ষিপ্ত করলে গল্পের প্রকরণগত কোনো ক্ষতি হয় না। চার অধ্যায়ের বিবৃতি ধর্ম এবং মুকুন্দর মৃত্যুপ্রস্তুতির চিত্রে অতিকথন গল্পের পরিণামী গাঢ়তাকে বিনষ্ট করে।

আসলে এই কথাই ঠিক, 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের অবয়বে আছে উপন্যাসের স্কেচ, যা কিছু উপন্যাসের আঙ্গিকে স্বাভাবিক বিস্তৃতি পেত, সে সবই 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে অতি সংক্ষেপে স্থান পাওয়ায় সার্থক ছোটগল্পের অবয়ব হয়েছে নষ্ট। তার ওপর তারাশঙ্করের গল্পে যে ক'টি বৈশিষ্ট্য—(ক) Descriptive method-এ গল্প বলার প্রয়াস, (খ) নাটকীয়তা ও অতিনাটকীয়তাকে গল্পে স্বীকৃতি দান, (গ) গল্পে অতিরিক্ত চরিত্রের ভিড় জমানো, (ঘ) জটিল মনস্তত্ত্ব নয়, মানব স্বভাবের বিচিত্র বৈপরীত্য দিয়ে চরিত্র আঁকাব প্রয়াস, (ঙ) গদ্যে Narrative style-কেই একমাত্র আধার কবা—এসবই 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের কিছু প্রকরণগত সীমাকে সামনে আনে।

এককথায় উপন্যাসের অতি প্রচ্ছন্ন একটি ছক এবং বর্ণনাধর্মী অতিকথন 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের সার্থক ছোটগল্পের প্রকরণগত সংযমকেই বিনষ্ট করেছে। গল্পের বিষয়ে আছে অভাবনীয় আকর্ষণ, নায়ক চরিত্রের বিবর্তনে আছে গল্পকারের অসামান্য ক্ষমতার প্রয়োগধর্ম, কিন্তু তারাশঙ্কর কিভাবে গল্প লিখতে হবে, এ সম্পর্কে চিন্তায় বেশি সময় দিতে চাননি। এ বিষয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের অনুগামী থেকেছেন। লক্ষণীয়, 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে মুকুন্দ পাল যখন 'চার' অধ্যায়ে মাঠের ধান তুলতে নিবিষ্ট, বয়সের ভারে ও

স্বাভাবিক ব্যাধিতে বিপর্যস্তপ্রায়, ঠিক তখনি গল্পের পাঠকদের কাছে প্রাসঙ্গিকতায় একেবারে অপরিচিত এমন শশীকে দিয়ে রমণকাকার মৃত্যুখবর শোনানো অবশ্যই অতিনাটকীয়তার প্রমাণ দেয়। যদিও মুকুন্দর ওই অবস্থায় এই সংবাদ তার আসন্ন মৃত্যুর পক্ষে অনেকটা 'নান্দী'র কাজ করে, তবু উপস্থাপনারীতি শিল্পের সংযমে ধরা নয়।

গল্পের ভাবের একমুখিতা রক্ষিত হওয়ার কথা মুকুন্দ পালের চরিত্র-বিবর্তন দিয়েই, গল্পকার সে দিক সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু অনাবশ্যক অতিবিস্তাব গল্পের সেই একমুখিতাকে সূক্ষ্ম অর্থে গতিহীন, বাধাগ্রস্ত করেছে। মুকুন্দর নবযৌবন-বাসনা যথার্থ, কিন্তু তার বর্তমান ভাবনা ও অতীতে তার সমান্তরাল অথচ বিপরীত সূত্রসন্ধান-প্রয়াস বিস্তারিত হওয়ার কারণে সহৃদয় পাঠকদের রসবোধে আঘাত হানে। যেহেতু গল্পের কেন্দ্রে কোনো জটিল মনস্তত্ত্বের বিচারণা নেই, তাই বিবৃতিমূলকতা বড় হয়ে অতি গভীর ইঙ্গিতধর্ম আড়ালে থেকে গেছে। মুকুন্দ পালের শেষ মৃত্যুর ঘটনা অবশ্যই ব্যঞ্জনায় প্রতীকী তাৎপর্য পায়।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের ভাষা নায়ক ও পার্শ্ব চরিত্রগুলির যথার্থ অনুগামী। আসন্ন মৃত্যুর দিকে অভিযাত্রী যে নায়ক, 'চাব' অধ্যায়েব সেই সর্বশেষ ভাষারীতি অবশ্যই সে সময়ের সিচুয়েশনের অনুপন্থী, বিষয় ও কেন্দ্রীয় ভাববস্তু গল্পের ভাষার যথার্থ অনুগ। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের অন্তিম দুটি অনুচ্ছেদ নিয়ে পাঠকের প্রশ্ন থাকতেই পাবে। মুকুন্দ পালের বিষাদময় মৃত্যুর পরে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সংক্রান্তিব শেষ রাতে কান্না, তার মধ্যে পুজোর ছড়া কাটার প্রসঙ্গ গল্পের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত কিনা সন্দেহ থেকে যায়। তারও পরে যোগেন্দ্রব মৃত্যুভয়ের সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ দিয়ে যে চিত্র রচনা, তা-ই বা গল্পের প্রকরণে কতটা অবধারিত শিল্পের দিক থেকে, সংশয় নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। গল্পেব মূল লক্ষ্য হল মুকুন্দ পাল ও তাব স্বপ্নের পৌষলক্ষ্মীর পুজোর আয়োজন। সেখানে এই দুটি অনুচ্ছেদ একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। এখানেও সেই উপন্যাসের স্কেচের ভাবনা মাথায় থেকে যায়। মুকুন্দর সঙ্গে মদ্যপান করে যে যোগেন্দ্র নতুন জীবনের স্বাদ পায়, তার গল্প আলাদা। তাকে দিয়ে তাব মৃত্যুভয় দিয়ে এই গল্পের শেষ হলে তা আর একটি নতুন গল্পের সূচনামুখ ধরিয়ে দেয়, 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের পরিণাম নির্দিষ্ট করে না। তাই আলোচ্য গল্পের শেষ শিল্পের মাপে বর্জনীয় বিষয়।

পাঁচ

গল্পটির 'পৌষলক্ষ্মী' এমন নাম অবশ্যই কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুসারী। অর্থাৎ নামে আছে কোনো বিশেষ চরিত্র নয়, মূল লক্ষ্যের ব্যঞ্জনা। অথচ গল্পটির তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত পড়ার পর এক নায়ক মুকুন্দ পালই সব সময় পাঠকদের গভীর-নিবিষ্ট করে রাখে। 'চার' অধ্যায়েও মুকুন্দর সক্রিয়তা, অসহায়তা ও মৃত্যু তাকেই পাঠকদের লক্ষ্যে স্থির রাখে। হতে পারত গল্পের নাম এর মূল চরিত্র ধরে, গল্পকার তা থেকে বিরত থেকেছেন। নামে রেখেছেন স্পষ্টত ব্যঙ্গ। তাই আপাতদৃষ্টিতে নাম কিছুটা বা দ্বিধা জাগায়।

কিন্তু গল্পের পটভূমি, নায়কের চিন্তাভাবনা ও লেখকের জীবনদর্শনকে মনে রাখলে এমন নামের শিল্পধর্ম বিচারে আপাত-দ্বিধা কেটে যাবে বলে আমরা মনে করি।

প্রথমত, গল্পকার গল্পের শুরু থেকেই মাঠের ধানের চাষ, ধান তোলার সমস্যা ও চাষীর জীবনের সঙ্গে ধানের নিবিড় যোগের কথা প্রসঙ্গত একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। 'সকল সুখের মূল যখন লক্ষ্মী, তখন এবার ওরা আসবে এই ভরসা নিয়ে খানিকটা শান্তি পায় পাল মশায়রা।'—দিন মজুরি খাটার লোকেরা—যারা মহামন্বন্তরের দিনে গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল—তাদের দিয়ে চাষের ভাবনায় এমন চিন্তার মধ্যে ধান-নির্ভর লক্ষ্মী-ভাবনা স্থান পায়। তাদের অসীম উৎকণ্ঠা—'থই থই-করা মাঠ-ভরা ধান, এ তারা তুলবে কী করে? এ থেকেই মুকুন্দ পালের জমির ধান-কাটা, ফসল তোলার চিন্তা অত্যন্ত জরুরি হয়। মুকুন্দ পাল মেয়ে লক্ষ্মীকে বলেছে—'জানিস মা, এবার যা ধান হয়েছে। আ-হা-হা ধান নয় মা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' একজন সৎ কর্মিষ্ঠ চাষীর ফসলপ্রীতি নিয়েই গল্পের শেষে মুকুন্দ পাল মৃত্যুবরণ করে। মুকুন্দর এমন কথা—'এবার পৌষলক্ষ্মীর দিনে ভাসান গান করতে হবে, আগে যেমন হত।', মুকুন্দর অতীত চিন্তা—'মাঘ মাসে মুলো খেতে নাই, লক্ষ্মীর রাত্রে "মুলোমচ্ছি" মূলোতে মাছে অম্বল হত।'—এসব বিষয় নায়কের চিন্তায় একমাত্র সত্য হয়ে থাকায় গল্পের 'পৌষলক্ষ্মী' নামের সার্থকতা প্রাথমিকভাবে মানতেই হয়।

দ্বিতীয়ত, 'পৌষলক্ষ্মী' শব্দের অর্থ পৌষমাসে যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়, যে পুজোর ব্যবস্থা হয় লক্ষ্মীর, হয় সে উপলক্ষ্যে যে ভাসানের গান—তার ব্যঞ্জনা বোঝায়। কিন্তু 'লক্ষ্মী' এখানে শুধু লোক-পুরাণের দেবী নন, তা চাষীর চাষ-করা ফসলই:

> 'দুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। দুধ-ববণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সোনার বরণ মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। দু'চোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।
>
> পাল বলল, যগন্দ।
>
> আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী শুয়ে আছেন, তুমি দেখ।'

এই প্রাকৃতিক বর্ণনায় পাকা ধানের ফসলই হয়েছে লক্ষ্মী আর তা এমন পৌষমাসেই! এই পৌষের 'লক্ষ্মী'কে সাদবে বরণ করার লক্ষ্যে গল্পের নাম ভিন্ন তাৎপর্য আনে।

তৃতীয়ত, গল্পে যে পৌষলক্ষ্মীর ভাবনা, তার অনুষ্ঠানগত সময়কাল এক ক্রান্তি লগ্নকে চিহ্নিত করে। মুকুন্দ পালের লক্ষ্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে মাঠে নেমে সোনার ফসল ঘরে তুলে পৌষলক্ষ্মীর ভাসানের গান সাড়ম্বরে করা। আর তার কথাতেই মেলে পৌষলক্ষ্মীর এমন ক্রান্তিলগ্নের তাৎপর্য:

> 'পাল বললে এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুঃখের কাল গিয়েছে যগন্দ, আসছে পঞ্চাশ বছর, দেখো তুমি সুখের কাল হবে, দেখো, আমি বললাম। এই ত্রিশ টাকা মণ চাল, এই মড়ক—এই গেল দুর্যোগের শেষ। এইবার, দেখ তুমি মাঠের দিকে তাকিয়ে, মা লক্ষ্মী আবার এলেন।....দেখ তুমি, আবার আগেকার মতো কাল আসবে। বছর বছর জল হবে। মাঠ ভরে ধান হবে। আবার সব তেমনই হবে!'

এবারের পৌষলক্ষ্মীর ভাসান গান তাই তাৎপর্যপূর্ণ। মুকুন্দর সমস্ত তৎপরতা ও মৃত্যুবরণ গল্পের বিষয়গত 'চরমক্ষণে'র সঙ্গে যোগে বিশেষ গুরুত্ব পায়। যোগেন্দ্রকে মুকুন্দ বলেছে:

> 'যগন্দ, লক্ষ্মী রাতে এবারে ভাসানের গান করব। এবার মা-লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে আসছেন। অনেকদিন পরে সত্যি পৌষলক্ষ্মী হবে!'

বস্তুত দুটি কালের যোজক হল এই পৌষলক্ষ্মীর অনুষ্ঠান। আর তারই চরম লক্ষ্যে নায়কের নব জীবন ও যৌবনতৃষ্ণার বেগের আবেগ গল্পের প্লটে ও কেন্দ্রীয় বক্তব্যে নিহিত বলেই গল্পটির এমন নাম হয় স্বাগত।

চতুর্থত, প্রকৃতির বুকে, দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশে, যুদ্ধজনিত রাজনীতির জটিলতার মধ্যে নতুন আশা-ভরসার সংকেত ধরতে পারে মুকুন্দ পাল। তার চরিত্রের যে বদল, এমন পরিপার্শ্বের বদলের সঙ্গে চমৎকার খাপ-খাওয়ানো! 'চার' অধ্যায়ে মাঠে ধান কাটার মধ্যে মুকুন্দ ভেবেছে পৌষলক্ষ্মীর মনোরম চিত্র:

> 'এস পৌষ বোসো পৌষ জন্ম-জন্ম থাকো; গেরস্থ ভরিয়ে থাকো, দুধে ভাতে রাখো।' এবার সেই দুধে-ভাতে রাখার পৌষ এসেছে। পঞ্চাশ বছর দুঃখের পর পঞ্চাশ বছর সুখ।....পৌষ সংক্রান্তির ভোররাত্রে তারা যখন প্রদীপ জ্বেলে, ধূপ দিয়ে, রঙ-করা চালগুঁড়োর আলপনা এঁকে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে—পৌষ পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় উঠে বসো, পৌষ তখন কি যেতে পারবে? পঞ্চাশ সাল, শয়ে শূন্যের অর্ধেক হল পঞ্চাশ— এটা হল সর্বনাশের বছর। হয়েছেও সর্বনাশ, কাল যুদ্ধে নাকি লাখে লাখে মানুষ মরছে,...সর্বনাশের আর বাকি কী? কিন্তু অতি মন্দর পরেই নাকি ভাল আসে, শুকনো গাছে ফুল ফোটার মতো এবার সেই ভালর নমুনা দেখা দিয়েছে মাঠ ভরা ধানে।'

এই পালের ধারণা, এর মধ্যেই মুকুন্দর সর্বশেষ চরিত্র-ভাবনার সমর্থন মেলে। মুকুন্দর মদ্যপান যে সাময়িক, ধান তোলার জন্য শক্তি-বাসনার উপায় মাত্র, তা তার কথাতে মেলে। পৌষলক্ষ্মীর আয়োজনেই তার সমস্তরকম প্রাচীন সংস্কার থেকে সরে-আসার চেষ্টা। পাকা ধানে সাদা শিশির-ভেজা মাঠের আলের ঘাসের ওপর বসে নতুন করে মদ খাওয়ার প্রসঙ্গ এলে যোগেন্দ্র বলে:

> 'মা লক্ষ্মী আবার গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী, বষ্টুমের ঘরের বউ।...বুঝে দেখ তুমি।'
>
> ধানকাটা হয়ে যাক, তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে? দেখছ তো ধান। এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি করে?'

মুকুন্দ পালের নিজের থেকেই অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এই মদ্যাসক্তি ও তাকে আবার বর্জনের বাসনা প্রকাশ অবশেষে, তার সীমা আছে পৌষলক্ষ্মী অনুষ্ঠানের কাল পর্যন্ত। পৌষলক্ষ্মী এমন এক অনুষ্ঠান, যা নায়কের স্বভাবের সুস্থতাকে শমে আনার ব্যঞ্জনা দেয়। অবশ্য তার আগেই নায়কের জীবনে বিষাদঘন করুণ পরিণতি আসে। গল্পের নামের ব্যঞ্জনা এখানেও গুরুত্ব পায়।

১০.

নারী ও নাগিনী

এক

'নারী ও নাগিনী' গল্পটি তারাশঙ্করের এমন একটি রচনা, যা বিষয়-ভাবনার অভিনবত্বে ও প্রকরণের কঠিন সংযত সৌষ্ঠবে বাংলা গল্পসাহিত্যের মালায় অতি মূল্যবান হীরকখণ্ড। হীরকের আপন দ্যুতি যেমন মানব-সৌভাগ্যের অনায়াস নিয়ামক, তেমনি এই গল্পটি রাজাসনে উপবিষ্ট বাংলা ছোট গল্পের মুকুটে খচিত এক নক্ষত্র-স্বভাবী আলোকবলয়। গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে সে সময়ের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার বিশেষ শারদীয়া সংখ্যায়, তেরশো একচল্লিশ সালে। ইংরেজি উনিশশো চৌত্রিশ সালে প্রকাশিত এই গল্পে 'কল্লোল' পরবর্তী সময়েও সেই কল্লোলীয় আদিম জীবন-ভাবনার সান্নিধ্য নেই, আছে তারাশঙ্করের একান্ত নিজস্ব জীবনদর্শন সিক্ত নবস্বাদী আদিম জৈব জীবনের স্বভাব। সেই নৈরাজ্যে কল্লোলীয়দের ধাতের নয়, তারাশঙ্করেরই গল্পের বিষয়ে বৈচিত্র্যের সন্ধানে বেরিয়ে নতুন করে জীবন স্বভাবের elemental দিকের অনুসন্ধিৎসার অনুগত ভূমি-পরিচয়।

একালের এক কথাকার-সমালোচক 'নারী ও নাগিনী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'শিল্পকুশলতার দিক থেকে এইটিই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প।' এমন মন্তব্যটি মেনে নিতে আপত্তি নেই। যে কটি শ্রেষ্ঠ গল্প—তাঁর নিজস্ব গল্পের সীমায় ও ভারতীয় গল্পের সীমায় শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে উপহার দিয়েছেন, লিপিকুশলতায় এর অনন্যতা সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবেই আকর্ষক। বাস্তবিকই, এর বিষয় ও প্রকরণ স্বভাবী পাঠকের কাছে চির বিস্ময়ের। এর কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, শেষতম ব্যঞ্জনা, 'মহামুহূর্ত' রচনার প্রয়াস, গল্পটি একটানা বলে যাওয়ার মধ্যে গতির অমোঘতা, এর মনস্তত্ত্ব ও আদিম জীবন-চরিত্রের ব্যঞ্জনাগর্ভ নগ্ন প্রকাশ চিরকালের বিস্ময়কে ধরে রাখে।

'নারী ও নাগিনী' গল্পের কাহিনী অংশ সামান্য, সংক্ষিপ্ত। গল্পে শুরুতে নায়ক খোঁড়া শেখ নিজের মনেই ইঁটের পাঁজা থেকে ইঁট ছাড়াতে ব্যস্ত, এরই মধ্যে অদাই অর্থাৎ ওয়ায়েদ শেখ অদূরে তার গরুর গাড়িতে আসার সময় হঠাৎ একটি উদয়নাগ নামের সুন্দর দেখতে বিরল প্রজাতির বিষাক্ত সাপের বাচ্চা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এবং মারতে উদ্যত হয়। খোঁড়া শেখ যেমন জন-মজুর খাটে, তেমনি তার বড় পেশা সাপ ধরে খেলানো—সে সাপের ওঝা। অদাইকে সঙ্গে সঙ্গে মারতে বারণ করে। অদাই আর না মারলেও সাপটা খোঁড়া শেখের হাতে ধরা পড়ার আগেই ইঁটের পাঁজার মধ্যে ঢুকে যায়। পরের দিন ভোরে গাঢ় লাল রঙের সাপটা পাঁজা থেকে বেরিয়ে ফণা তুলে খেলতে শুরু করলেই খোঁড়া শেখ তাকে ধরে। ধরার পরেই বোঝে সাপটা পুরুষ নয়, সাপিনী। ছ'মাস সাপটাকে বাড়িতে রেখে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ দেয় খোঁড়া শেখ। বাড়িতে তার বৌ জোবেদা থাকে। সে জানে তার স্বামীর গভীর সর্পপ্রীতির কথা, কিন্তু তার অবাক হওয়ার মধ্যে খোঁড়া শেখ যখন সাপটার নাকে একটি মিনি নাকছাবি পরিয়ে দেয়, তাকে ঠাট্টা করে আর এক বিবির সম্মান দিয়ে মাথায় দেয় সিঁদুর, উদয়নাগ সাপটার তার হাত লেজ

দিয়ে জড়িয়ে ধরার মধ্যে সাপের সংগমের কথা বলে, জোবেদা বিরক্ত হয়। স্বামীকে সাবধান করে বলে, 'তোর খেলাও ওই শেষ করবে, বুঝিস!' স্বামীর এমন সব আচরণ ও সাপটার থেকে দূরে দূরেই থাকে জোবেদা।

এই ঘটনার আরও কয়েক মাস পরে দুরন্ত বর্ষার দিনে সাপটির গা থেকে বেরোয় মিষ্টি অথচ নূতন এক গন্ধ। দিনদুয়েক বৃষ্টির কারণে বাইরে আটকে থাকার পর ঘরে ফিরে খোঁড়া শেখ বোঝে, এ হল তার বিবি সাপিনীর পুরুষ সাপের সঙ্গে দেখা করার সময়। মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসে খোঁড়া শেখ তার পোষা অতিপ্রিয় এই বিবি সাপিনীকে। জোবেদাও তা-ই চায়, ও পরিষ্কার বলে স্বামীকে সাপটাকে ও সহ্য কবতে পারে না। বড় হওয়ায় নতুন দাঁত উঠেছে সাপিনীর, কামানো হয়নি। ওকে মাঠে ছেড়ে দেওয়া সে সমর্থন করে। কিন্তু মাঠে ছাড়ার পর খোঁড়া শেখের মন বিষণ্ণ। এই বিষণ্ণতা সরাতে জোবেদা স্বামীকে সঙ্গ দেয়, আদর করে, খোঁড়াও জোবেদাকে আদরে-চুম্বনের মধ্যে জোবেদার প্রতি তার জীবনের গভীরতম ভালোবাসার কথা জানায়। এই আদরের মধ্যেই জোবেদা হঠাৎ দেখতে পায় ঘরের নালার জলে সেই ফি'রে-আসা ফণা-তোলা সাপিনীকে। খোঁড়া শেখ তাকে ধরতে গেলে জোবেদা নিষেধ করে, সাপিনীকে তাড়াতে থাকে এবং একখানা ঘুঁটে ছুঁড়ে সাপিনীকে মারলে রাগে সাপিনী ফণা তুলে মাটির ওপর ছোবল মারতে মারতে চলে যায়।

রাত দ্বিপ্রহরে সেই সাপিনীই ফিরে আসে অন্ধকারে, ঘুমন্ত জোবেদার পায়ে ছোবল বসায়। তাতে মারা যায় জোবেদা। আগে ভেবেছিল খোঁড়া শেখ, এতে তার স্ত্রী মারা গেলে সে সাপিনীকেও শেষ করবে, কিন্তু কিছুই করে না, ছেড়ে দেয়। এক ওস্তাদের কথার প্রতিবাদ করে খোঁড়া শেখ তাকে জানায়, না, সাপিনী তাকে কামড়াতে আসেনি। খোঁড়া শেখ হয ফকির জোবেদার মৃত্যুর পর। তার ভিটে হয় বনজঙ্গলে ধ্বংসস্তূপ আর উদয়নাগ সাপেদের বড় আস্তানা। গল্পের শেষ খোঁড়া শেখের সাপিনীকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ জানিয়ে। খোঁড়া শেখের কথার তাৎপর্য হল, জোবেদা ও সাপিনীর মধ্যে ছিল ঈর্ষা।

(কাহিনী ও ঘটনা-সম্বলিত যে প্লট-পরিকাঠামো, তাতে বাইরের জট কম, প্লটে বাঁধা তিনটি চরিত্রই কাহিনীতে জটিলতা এনেছে তাদের স্বভাবের ভিতরের মনস্তত্ত্বের অন্ধকারে। তাই প্লট যতটা মনোলোককে জড়ায়) ততটা কাহিনী-রস ও ঘটনার নাটকীয়তায় দীপ্ত, স্পষ্ট হয় না। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশ্চয়ই খোঁড়া শেখ, কিন্তু গল্পের Central turmoil নাগিনীকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়। খোঁড়া শেখের পাতানো বিবি ওই নাগিনী নিশ্চয়ই একটি লক্ষণীয় চরিত্র, কিন্তু তাকে কেন্দ্রীয় না বলাই ভাল। খোঁড়া শেখের মধ্য দিয়েই তার যাবতীয় সক্রিয়তা গল্পের মধ্যে। গল্পের শুরুই হয়েছে খোঁড়া শেখের বীভৎস চেহারার বর্ণনা দিয়ে এবং তার পরেই এসেছে নাগিনী প্রসঙ্গ। (খোঁড়া শেখ ও নাগিনীর মধ্যে গল্পকার যখন ধীরে ধীরে একটা সম্পর্ক তৈরি কবে চলেছেন, তখন কিন্তু স্ত্রী জোবেদা ততটা গুরুত্ব পায়নি। জোবেদা এসব থেকে দূরে দূরেই থেকেছে।)

অর্থাৎ খোঁড়া শেখের জীবনগাথায় যুক্ত হয়েছে নাগিনী। গল্পে নাগিনীর জন্যই

গল্পকার প্রথমে ছ'মাস ও পরে আরও কয়েক মাস সময় নিয়েছেন। কিন্তু এই সময়ের বিস্তার প্লটের দিক থেকে পাঠককে ক্লান্ত করে না, কারণ, (ক) এতে নাগিনীর স্বভাবের ও সক্রিয়তার বদল লক্ষণীয় হয়েছে, (খ) খোঁড়া শেখের যে মানসিকতা তা আরও গভীর ও মনস্তত্ত্বসম্মত রূপ পেয়েছে। নাগিনীর সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল খেলার ও কৌতুকের, তা ক্রমশ সরে গিয়ে সম্পর্কের মধ্যে চাপা মনস্তাত্ত্বিক দায়িত্ব বেড়েছে। নাগিনীর সঙ্গে খোঁড়া শেখের বিচ্ছেদেই তা প্রমাণিত হয়। আর এই দায়িত্ব যখন মনস্তাত্ত্বিকতায় বিশিষ্ট, তখনি খোঁড়ার স্ত্রী জোবেদা স্বামীর পাশে এসে অন্তরঙ্গ স্ত্রী-সুলভ বিশিষ্ট আচরণ করে। জোবেদা তার স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। নাগিনীর আকস্মিক জলের নালায় আবির্ভাব, খোঁড়া শেখের তাকে ধরতে যাওয়া, জোবেদার নিষেধ ও ঘুঁটে ছুঁড়ে তাকে মারা, নাগিনীর ফণা তুলে মাটির ওপর তা আছাড় মারতে মারতে অন্তর্ধান—এসবই প্লট-কাঠামোর গঠনকে সার্থক ছোটগল্পের উপযোগী একমুখিনতা দেয়।

অর্থাৎ গল্পের শেষ দিকে জোবেদা ও নাগিনী, মাঝখানে খোঁড়া শেখ—এই ত্রিকোণ প্রেম-প্রস্তুতির জটিলতম যৌনতার উপযোগী তিন চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে। এর পরেই জোবেদার সর্পদংশনে মৃত্যু, নাগিনীর ঘরের চালে ঝোলানো চুপড়ীর গায়ে আশ্রয়গ্রহণ, খোঁড়া শেখের অসহায়তা, ফকিরি নেওয়া, সবশেষে নাগিনী না মেরে স্ত্রী ও নাগিনীকে স্বভাবে এক প্রতিপন্ন করে সিদ্ধান্ত বাক্য প্রয়োগ বস্তুত গল্পকারের মূল লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে দেয়। তারাশঙ্কর গল্পের প্লটে আদৌ কোনো বিস্তারিত গল্পরস, ঘটনার বড় দিক দেখাতে চাননি, গভীর জটিল মনস্তত্ত্বই এর মূলে প্রধান হওয়ায় প্লট টানা কাহিনী ও ছোটবড় ঘটনার অস্তিত্বকে করেছে অস্বীকার। 'নারী ও নাগিনী' গল্প তাই শ্রেণী পরিচয়ে হয়েছে এক জটিলতম মনস্তাত্ত্বিক গল্প। মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ করার মন ও মনন এই গল্পের মূলে প্রেরণার কাজ করেছে। নিশ্চয়ই আলোচ্য গল্পটির বিষয়ের সঙ্গে কোনো মিল নেই, কিন্তু জন স্টেইনবেকের 'Snake of one's Own' গল্পের ভয়াবহ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অন্ধকার রহস্যের মতো 'নারী ও নাগিনী' গল্পটিও এক শূন্যতার অনুভবে পিছল জায়গায় আমাদের দাঁড় করায় যেখানে আদিম পাশব বৃত্তি নারী-স্বভাবের ভয়ঙ্কর রূপকে প্রতিষ্ঠা করে দেয়।

গল্পের 'মহামুহূর্ত' অংশটি গল্পকার এক আশ্চর্য চমৎকৃতির মধ্যে এনেছেন প্লটের অনায়াস গতির স্বাভাবিতায়:

> 'খোঁড়া বলিল, বিবির লেগে মন কি করছে রে।... মনটা বড় খারাপ করছে।
> জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেনে রে, আমাকে তোর ভালো লাগে না?
> সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। ই আমার জানের চেয়ে বেশী।
> জোবেদা বলিয়া উঠিল, দেখ্, দেখ্ বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ্—নালার মধ্যে।

> জলনিকাশী নালার মধ্যে সত্যই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।
> খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, ধ'রে আনি, দাঁড়া।
> জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না।
> তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলিল, বেরো, বেরো, হেট্, হেট্।
> বাঁ হাতে করিয়া একখানি ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল।
> সাপিনী সক্রোধে মাটির উপর কয়েকটা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।'

এমন যে তিনটি চরিত্রকে পাশাপাশি এনে তিনটি মানসিক স্বভাব আঁকার প্রয়াস, সে স্বভাবে আছে পরস্পরের বিপরীত বাসনা-কামনার সঙ্গে যোগ, এর মধ্যেই 'মহামুহূর্তে'র স্থির কম্পমান রূপ! জোবেদাকে যে নাগিনী দংশন করবে রাতে, তার প্রস্তুতি এখানেই। গল্পের পরিণতির ব্যঞ্জনায় এখানেই মূল বিষয়-ভাবনার পরবর্তী তীব্র গতিগ্রহণের অন্তঃশীল প্রস্তুতি! এই 'মহামুহূর্ত' রচনা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বনির্ভর নিখুঁত প্লট-পরিকাঠামোরই নির্ভুল অঙ্কের উত্তর মেলানো!

দুই

'নারী ও নাগিনী' গল্পে প্রধান তিনটি চরিত্র—জোবেদা, খোঁড়া শেখ এবং নাগিনী। এবং আমাদের মতে, নাগিনীকে ধরেই গল্পের লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করার প্রথম এবং প্রধান শিল্পদায়িত্ব থেকে যায়। একটি বিষাক্ত সরীসৃপ প্রাণীর এমন গল্পে চরিত্রের সম্মান পাওয়ায় আছে গল্পকারের বিশেষ ভাবনা ও জীবনদর্শন। জোবেদা ও খোঁড়া শেখকে বোঝা যায়, যেহেতু তারা মানুষ, বোঝা দুরূহ হয় পালিত নাগিনীকে, অথচ এই নাগিনীই পক্ষে বা বিপক্ষে, সমর্থনে বা বৈপরীত্যে অন্য দুই চরিত্রকে দিয়েছে গতি। অধিকাংশ সমালোচক এতাবৎকাল জোবেদা ও খোঁড়া শেখকে ধরেই 'নারী ও নাগিনী' গল্পের মূল ব্যাখ্যায় ব্যস্ত থেকেছেন, তাতে চরিত্রের বিবর্তনে নাগিনী ও খোঁড়া শেখের পরিণতির সফল ব্যাখ্যা মেলে না। আসলে তাঁদের ভ্রান্তিটা হল নাগিনীকে আলোচনায় গৌণ করে রাখায়, তাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব না ভাবায়!

নাগিনীর একটি অদ্ভুত বিবর্তন আছে গল্পে। গল্পকার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সঠিক লক্ষ্যে দৃষ্টি রেখে এই নাগিনীর সক্রিয়তা গল্পে এঁকেছেন। গল্পের একবারে শেষে সে খোঁড়া শেখের কথায় নিশ্চয়ই লেখকেরই প্রতীকী ভাবনার ব্যঞ্জনাত্মক অস্তিত্ব হয়েছে, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সে গল্পকারের দ্বারা চালিত নয়, এই মূক সরীসৃপ প্রাণী নিজের ব্যবহারে নিজের বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠা করে। যেদিন খোঁড়া শেখ তাকে প্রথম দেখে অদাই শেখের কথায়, পরের দিনই সে তাকে ধরার জন্য প্রত্যুষে ইঁটের পাঁজার সামনে বসে। সেখানে নাগিনীর রূপ ও স্বভাব এইরকম:

> 'ঈষদ্দূরে প্রান্তরের বুকে বোধ হয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো

চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখির মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতোই সে মনোরম।'

এমন যে নাগিনী সে কিন্তু কিশোর হলেও গর্জন তুলে ছোবল মারে। সে সাপিনী। এই সাপিনীকে ছ'মাস পরে ভালোবেসে, পোষ্য করে তাকে মিনি পরায়, কাঁধে নিয়ে ঘোরে, চুমু খায় খোঁড়া শেখ। কিন্তু সেই সঙ্গে নাগিনীর আচরণ—জোবেদাকে দেখিয়ে খোঁড়া শেখের কথায়:

'দেখ্, দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ্ দেখি। জানিস্, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনই ক'রে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস্ কখনও? আ! সে যে কি বাহারে খেলা মাইরি।'

এই যে সেই কিশোর সাপিনীর একটু বড় হয়ে খোঁড়া শেখের আদরে, ভালোবাসায় পোষ্য হয়ে তার পুরুষের হাত জড়িয়ে থাকা— এখানেই সাপিনীর চরিত্র বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়। বোঝা যায়, আস্তে আস্তে সাপিনী এক পুরুষের সান্নিধ্যে অন্য স্বাদে বা প্রাণে নতুন নয়!

আরও কয়েক মাস পরে সেই বর্ষার পরিবেশে সাপিনীর আর এক বদল। তার গা থেকে আসে যুবতী বয়সের সঙ্গমবাসনার গন্ধ। তাকে পাশের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার আগে আবার খোঁড়া বলে জোবেদাকে: 'দেখ্, দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ্।' খোঁড়া শেখের হাত এভাবে জড়ানোর মধ্যে গল্পকার ভিন্ন ইঙ্গিত করেছেন। (জোবেদা-খোঁড়ার মধ্যে পরস্পরের আদর-চুম্বন বিনিময়ের কালেই জলের নালায় বিবির ফিরে আসা, জোবেদার হাতে ঘুঁটের মার খেয়ে সক্রোধদীপ্ত ফণায় প্রতিবাদ জানিয়ে বার বার মাটিতে ছোবল মারার মধ্যেও সেই সাপিনীর প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ। সর্বশেষ জোবেদাকে দংশনে ও একটা ঝোলানো হাঁড়িতে বেড় দিয়ে নাগিনীর ধীরে ধীরে আশ্রয় গ্রহণে সেই সাপিনীর অন্তিম স্বভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে চায় জোবেদাকে সরিয়ে খোঁড়া শেখের বাড়ি আশ্রয়। এসবই মূক সরীসৃপ প্রাণীর মানুষের সংসারে পোষ্য হয়ে ওঠার স্বাভাবিক অধিকার যেন!)

আমাদের মতে সাপিনীর এই যে বিবর্তন, চিত্ররূপ, তা তার স্বভাবেরই ক্রমপরিণতির পথ ধরেই ঘটেছে। খোঁড়া শেখ ও এই দম্পতির যৌথ জীবনে সাপিনীর এমন উপস্থিতিই গল্পের বাকি দু'টি চরিত্রের ভিন্ন তাৎপর্য আনে। প্রকৃতির উপকরণ এক সরল পশু আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে মানব দম্পতির গড়ে তোলা কৃত্রিম সংসারের যোগের ফলেই সাপিনীর গুরুত্ব অনেক বেশি। বস্তুত গোটা গল্পের যে বুনন তা তাকে নিয়েই, তাকে এক বিশিষ্ট চরিত্র হিসেবে তৈরি করা দিয়েই সম্ভব হয়েছে। আর এই সাপিনীর যে স্বরূপ ও বিবর্তন তার মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে জোবেদা ও খোঁড়া শেখ চরিত্র ও তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের শিল্পসীমা।

এখানেই প্রথম প্রসঙ্গ হিসেবে আসে খোঁড়া শেখ চরিত্র। সে গল্পের প্রথমেই উপস্থিত। তার মূল অস্তিত্বের ভয়াবহতা তারাশঙ্কর এক নির্মম কলম দিয়ে এঁকেছেন। এবং এমন আঁকার প্রয়োজন ছিল গল্পের মধ্য-অংশ ও পরিণতির তাৎপর্যের গুরুত্বে। খোঁড়া শেখের আসল নাম কেউ জানে না, সে নিজেও না। অর্থাৎ সে পৃথিবীতে একক, পারিবারিক

সামাজিক ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এক আদিম মানুষের মতো। আদিমতা ও বিকৃতি শুধু নামে নয়, তার বাইরের চেহারার বর্ণনাতেও। তার বাঁ পা ভাঙা, কুৎসিত ব্যাধিতে বাম নাকের জায়গায় বীভৎস গহ্বর, তার ওপর সারা মুখে বসন্তের দাগে সবটাই ভয়ঙ্কর। এমন মানুষই তো পারে আদিম বিষাক্ত ভয়ঙ্কর সাপকে আপন করতে আদিম স্বভাব-সাদৃশ্যে।

খোঁড়া শেখের জীবন চলে জন খাটার শ্রমিক হিসেবে, তার নেশা এবং তা-ই আবার পেশা হয় সাপ ধরে খেলা করা ও খেলা দেখানোয়। উদয়নাগকে দেখতে পাওয়ায় খোঁড়া শেখের প্রথম কথা:

> 'উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হত রে'

এতেই প্রমাণ হয়ে যায়, যে কোনো সাপ, এবং তার ওপর যদি কোনো বিরল প্রজাতির এক সুন্দর সাপ হয়, তবে তা তার পেশার পক্ষে অনেক বেশি আর্থিক আনুকূল্য আনতে সক্ষম। প্রথম দিকে সাপিনীর প্রতি তাব যে নজর তা পেশারই অনুগত। সাপের ওঝা যেমন খোঁড়া শেখ, তেমনি সাপ নিয়ে খেলাও দেখায়। খোঁড়া শেখেব জীবনধারণের তিনটি পথ—(ক) জনমজুরি খাটা, (খ) সাপ খেলানো, (গ) দু'য়ের অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি।

প্রসঙ্গত এখানে একটা কথাই বড়, সাপুড়ে হিসেবে যেমন রোজগার করে, তেমনি সাপকে পোষ মানানোয় তার এক নেশার মতো মন কাজ করে। আর তাতেই উদয়নাগ সাপটি পোষ্য হিসেবে খোঁড়া শেখকে বিশেষভাবে টানে। এই সাপিনীকে সে সাজায়, আদর করে, তাকে পোষ মানানোয় আনন্দ পায়। তাকে চুম্বন করে নির্দ্বিধায়। এমনকি সাপ নিয়ে যেমন খেলা দেখায়, তেমনি নিজেও সাপিনীকে নিয়ে ব্যক্তিগত খেলায় মাতে। এখানে তার নেশা কৌতুকে ভবে ওঠে। সাপিনীকে বলে বিবি।

> 'খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটা কাঠের ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটা নকল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।'

তার এসময়ের গান—গোকুল ছেড়ে কেষ্টর মথুরাতে যাওয়ার তাৎপর্য হল—জোবেদার প্রেমের থেকে নিজেরই এক দুরন্ত স্বভাবের মধ্যে যাওয়া! অর্থাৎ সাপিনী হল খোঁড়া শেখের পোষ মানানোয় পেশার জিনিসকে নেশার মর্যাদায় উন্নীত করা। এই নেশাই খোঁড়ার আদিম অবচেতন পাশব বৃত্তির এক ধাপ।

সাপিনীর প্রতি এই যে আকর্ষণ, তা কিন্তু জোবেদার প্রতি তার আকর্ষণকে আদৌ খাটো করে না। এক সমালোচক এমন ভেবেছেন, 'তারাশঙ্করের "নারী ও নাগিনী" গল্পে জোবেদার প্রতি খোঁড়া শেখের সেরকম কোন তীব্র টানের চিহ্ন নেই।' আমাদের মতে এই মন্তব্য ভ্রান্ত। খোঁড়া শেখ জোবেদার জীবনের ও সংসারের সঙ্গে জড়ানো সংসারী মানুষ। খোঁড়া যখন পচাই মদে, তার দুঃখের ও অর্থাভাবের দিনেও ডুবে থাকে, তবে তার জোবেদার কাছে যাবতীয় স্বীকারোক্তি তার জোবেদার প্রতি ভালোবাসাব গভীরতাকেই প্রমাণ করে। যে মানুষ মদ্যপানের ঘোরে নিজের কথা বলে, সে কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়

তার অবচেতন মনের ভিতরের সত্য কথাই বলে ফেলে। জোবেদাকে দারিদ্র্যের ও নিজের দুরবস্থার কারণে ভাল করে খাওয়াতে পারে না, ভালো একটা নতুন কাপড় দিতে পারে না—এমন সব স্বীকৃতি জোবেদার প্রতি খোঁড়ার গভীর ভালোবাসাই বোঝায়। গল্পের মধ্যেই খোঁড়া শেখের মন খারাপের কারণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলে জোবেদা ও তাকে আর ভালো না লাগার অভিযোগ করে যখন সন্দেহ জাগায়, তখন খোঁড়ার উক্তি: 'তোর জন্যেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু আমার জানের চেয়ে বেশি।' আবার এই খোঁড়াই নাগিনীর ছোবলে জোবেদা চরম অসুস্থ হয়ে পড়লে নাগিনীর উদ্দেশে বলে: 'জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।' এসব অকপট সরল কথায় প্রমাণ হয়ে যায় খোঁড়া স্ত্রীকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

তা হলেই ধরা পড়ে যায়, নাগিনীর প্রতি তার যে আকর্ষণ তা অনেকটাই সাপকে পোষ মানানোর নেশার ঝোঁকে এক খেলার ছলে সাপকে কাছে আনার দিক মাত্র। কিন্তু যখনি পাশের জঙ্গলে সাপিনীকে ছেড়ে আসার পর সে গভীর বিমর্ষ বোধ করে, তখনি খোঁড়া শেখ চরিত্রের মাত্রা এক নতুন তাৎপর্য পেতে শুরু করে। একটা স্বীকৃত দিক হল, যে কোনো পোষ্য প্রাণী— এ ক্ষেত্রে পোষা সরীসৃপ জীবই, পালকের কাছ থেকে সরে গেলে পালকের মন বিষণ্ণ হতে বাধ্য। এর সঙ্গে একটা গভীর তাৎপর্য তারাশঙ্কর বোঝাতে চেয়েছেন, আদিম স্বভাবের খোঁড়া শেখ ও আদিমতম নারী প্রকৃতির বিষয় নাগিনী বিবির মধ্যে কোথাও বুঝি অজ্ঞাতে এক 'পাশব' সম্পর্কের সূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক এই চিত্রের মধ্যে জোবেদা-খোঁড়ার দাম্পত্য আদর-চুম্বনের মধ্যে নাগিনীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। গল্পের শেষে সেই চিত্র থেকেই জাত নাগিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার কারণে জোবেদাকে মরণ-কামড় দেওয়াব ঘটনা।

বস্তুত খোঁড়া শেখের ফকির হওয়ার মূলে জোবেদার প্রেম থেকে বিচ্যুত হওয়ার দিকই সত্য। কিন্তু সে শেষে জোবেদা মারা গেলেও নাগিনীকে মেরে ফেলেনি। সে জানে নাগিনী জোবেদাকেই কামড়াতে এসেছে। নাগিনী তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের নিষ্ঠুর নিয়তি। এই নিয়তির নির্দেশেই সে সংসার ত্যাগী ফকির হয়ে ওঠে। জোবেদা তার উন্মূলিত জীবনগঠনে একটা বড় আশ্রয়। নাগিনী তা নষ্ট করে দেয়। তার আদিম বৃত্তিই তাকে উৎকেন্দ্রিক জীবনের দিকে নিক্ষেপ করে। সে যখন বলে নাগিনীকে জোবেদার মৃত্যুর পর ছেড়ে দেওয়ার সময়—'তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।'—তাতেই নাগিনী হয়ে ওঠে লেখকের নির্দেশেই প্রতীকী! এই তাৎপর্যে গল্পের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়, স্পষ্ট হয় তারাশঙ্করের আদিম পাশব বৃত্তির দর্শনও! খোঁড়া শেখ বিবিকে মারেনি, এমন না মারতে পারার মধ্যেই গল্পকার স্বয়ং তাঁর লক্ষ্য নিয়ে উপস্থিত। খোঁড়া শেখ তারাশঙ্করের আদিম জৈব প্রবৃত্তির যে দর্শন, নারী প্রকৃতির মধ্যেকার আদিম স্বভাবে যে সর্বজনীন ঈর্ষা—তার ব্যাখ্যাকেই বলেছে। তাই খোঁড়া শেখ হয়েছে জীবন্ত বাস্তব চরিত্র, তার সৃষ্ট নাগিনী হয়েছে গল্পের central turmoil সৃষ্টির উপযোগী একমাত্র প্রতীক। আর এখানে অবশ্যই গল্পের চরিত্র ও বক্তব্য ব্যঞ্জনায় একাত্ম। গল্পের পরিণতি চিত্রে গল্পকারের লিপিকুশলতা অনন্য শিল্পশ্রীমণ্ডিত।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে জোবেদাই সবচেয়ে স্বাভাবিক চরিত্র। তার স্বামীপ্রীতি, সর্পভীতি, স্বামীর গভীর বিষণ্নতার কারণে নাগিনীর প্রতি ঘৃণা, উপেক্ষা ও তাকে আঘাত করার মধ্যে বাস্তব-অতিরিক্ত কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই—অন্তত চরিত্রটির আদ্যন্ত গঠন তা-ই প্রমাণ করে। খোঁড়া শেখ যখন মদ খেয়ে ভালোবাসার কথায় খেদ প্রকাশ করে তার কাছে নিজের ক্ষমতার কথা বলে, সে হাসে। জোবেদা নিজেও বলেছে খোঁড়া শেখকে—'যতই তেজ না থাক, ও-জাতকে বিশ্বাস নেই।' এই সংলাপে কোনো দ্বিতীয় মাত্রা নেই। নাগিনীকে আদর করলে, চুমু খেলে জোবেদা বিস্মিত হয় না খোঁড়ার চরিত্রের ধর্মের কারণে, কিন্তু বিরক্ত হয়, নিষেধ করে, সাবধান-বাণী শোনায় 'তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝিস্।'— এমন কথা বলে। বিবিকে জঙ্গলে ছেড়ে আসার পর তার কারণেই খোঁড়ার মন খারাপ জোবেদাকে সে তা জানালেও জোবেদা তখনো হাসে। স্বামীকে আদরের সময় নাগিনীকে দেখে স্বাভাবিক ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তাকে ঘুঁটে ছুঁড়ে মারে, তাড়াতে চায়।

সুতরাং জোবেদা চরিত্রে জটিলতা কম, প্রায় নেই বললেই চলে। একবার শুধু 'কেনেবে আমাকে তোর ভালো লাগে না?'— এমন জিজ্ঞাসার মধ্যেও আছে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি গভীর আদরের মুহূর্তে কিছুটা ঠাট্টাই। সুতরাং জোবেদা যে সমগ্র গল্পে নাগিনীর প্রতিস্পর্ধী ঈর্ষার উপযোগী নারী, তা কিন্তু চরিত্র থেকে উঠে আসে না। আসলে জোবেদা তারাশঙ্করের সৃষ্টি এবং খোঁড়া শেখের পাশে তার উপস্থিতির কারণ আদিম জৈব বৃত্তির ভয়াবহ দিক প্রতিষ্ঠার উপায়কে সামনে রাখা। গল্পের শেষে জোবেদা খোঁড়া শেখের পাশে একটা জীবনদর্শনকে তাৎপর্যদানের উপযোগী অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে। গল্পের আদ্যন্ত খোঁড়া শেখ ও নাগিনীর সমান প্রাধান্য, দাপট, জোবেদা সেখানে এই দুই সম্পর্কের মাঝখানে মূল বক্তব্যের পরিপূর্ণতা সৃষ্টির সহায়ক শিল্পিত অস্তিত্ব।

তিন

'নারী ও নাগিনী' গল্পে তারাশঙ্করের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য অর্থাৎ তাঁর মৌলিক জীবনদর্শন সেই আদিম প্রবৃত্তির পাশব দিককে আদিম স্বভাবেই উপস্থাপিত করা! আদিম প্রকৃতির বাসনা-কামনা সভ্য জীবনের পাশে, মানবিক জীবনের পক্ষে ভয়ঙ্কর, বীভৎস। তার কাছে মানবজাতির 'প্যাশন', 'প্রেম' 'যৌনতা' তুচ্ছ হয়ে যায়। আলোচ্য গল্পে মানববৃত্তির একটা চিরন্তন দিক যে 'ঈর্ষা' তাকেই কেন্দ্রস্থ করেছেন গল্পকার। সেই সঙ্গে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে উৎকট আদিম বৃত্তি থাকে, মাটির নীচে আগ্নেয়গিরির গরম লাভার মতো নিঃশব্দে তা যেমন সচল থাকে, পুরুষ খোঁড়া শেখের আচার-আচরণে তা-ই সত্য হয়ে উঠেছে।

গল্পে তারাশঙ্কর নিয়েছেন একেবারে নীচের তলার জীবনকে, যারা জীবন ধারণে ও যাপনে একই সূত্র ধরে চলে। পটভূমি তাই সাপুড়েদের জীবন-সংলগ্ন, মানুষগুলি একই সঙ্গে জীবনব্যবস্থার সমাজকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। খোঁড়া শেখ চরিত্র-পরিকল্পনা তা-ই। তার কামনা-ব্যর্থতা, তার জীবন-স্বভাব ও সংসার নির্মাণ ও সংসার ত্যাগ সবই নীচের তলায় মানানসই। গল্পকার সেভাবেই তাদের এঁকেছেন। এইসব মানুষ প্রচলিত প্রত্যয়ের

অনুমোদনে বাড়ে না, সক্রিয় হয় না, তারা তাদেরই ভিতরের শক্তিতে এগিয়ে চলে। পরিপার্শ্বের চাপে তারা বাধ্য হতে জানে না। 'ডাইনী'র সোরধন 'বেদেনী'র রাধিকা, 'নারী ও নাগিনী'র খোঁড়া শেখ— এরা একই ধাতুতে গড়া, শুধু ভিন্ন পটভূমিতে থেকেও আকাবে তারা আলাদা। প্রকৃতিতে অবশ্যই এক—'elemental'।

তারাশঙ্করের জীবনদর্শন এসবের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। অন্ধ অনাবৃত পশুবৃত্তির সঙ্গে গভীর জড়িত এক 'elemental' সত্তার প্রতিমিশ্রণে তারাশঙ্কর এক দক্ষ শিল্পী। মানব প্রবৃত্তি পৃথিবীর সৃষ্টিমূলের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ বলেই তা মৌলিক। এই মৌলিক সত্তা এবং প্রবৃত্তিকে ধরতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। তা নগ্ন, সরল, অকৃত্রিম। তার যাবতীয় চাহিদা মানবপ্রাণের কাছেই—যে মানবপ্রাণ সভ্যতাকে গ্রাহ্য করে না, যে সত্তা মানুষেরই কাছে আধুনিক সভ্যতার ব্যাখ্যায় অবচেতন সত্তার মর্যাদা পায়, অথচ যা সত্য ও ভয়ঙ্কর সুন্দর, তারাশঙ্কর তারই অন্বিষ্ট গল্পকার। খোঁড়া শেখ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তারই কথা বলতে চেয়েছেন। বিবির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, সেখানেই তাঁর attitude to life-এর পরিচয়। জোবেদা স্বামীকে সামলাতে পারে না, বুঝতে পারে না বলেই স্বামীর অনেক কাজ তার মনে বিস্ময় জাগায়, সেইসঙ্গে বিরক্তিও! দুর্বোধ্য বলেই জোবেদার কাছে তা হয় বিরক্তির বস্তু।

অর্থাৎ সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন খোঁড়া শেখ। জন্মের মূলেই আছে মানুষের সমাজ সূত্র থেকে নিজের অবধারিত অনন্বয়, গল্পের শেষেও সে মানুষের সমাজসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনন্বয়কেই সত্য করে তার ফকির স্বভাবে। খোঁড়া শেখের যে কামনা-বাসনা নাগিনীকে কেন্দ্র করে—তা যতই পেশার হোক বা নেশার কারণে পোষ্য করার সূত্রে কৌতুককর ও খেলার ছলের বিষয় হোক, অভ্যন্তরে অন্তঃশীল আছে তার নিজস্ব আদিম বৃত্তি। তার নিয়তিই তাই আদিতে নামহীন হয়ে, সংসার বিবিক্ত হয়ে ফকিরি স্বভাবে অসীম হয়ে যাওয়া! যা কিছু আদিম, তা বাঁধে না, দূরে সরায়। কারণ তার অন্ধকার অভ্যন্তরে এক উৎকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার শক্তি আছে। খোঁড়া শেখ তারই victim। এই চরিত্র তাই একমাত্র তারাশঙ্করই তৈরি করতে পারেন, কারণ গল্পকারের নিজস্ব দর্শনের পক্ষে তা-ই সমান মাপে খাপ-খাওয়ানো। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে তারাশঙ্কর অসম্ভব কল্পনা-ক্ষমতায়, নিপুণ পর্যবেক্ষণে, উপস্থাপনাগত উজ্জ্বল প্রকরণে, শিল্পের সংযমে-শাসনে ও ইঙ্গিতময়তায় তার জীবনদর্শনকে উপস্থিত করতে পেরেছেন বলেই গল্পটি সৃজন-ধর্মের মৌলিকত্বে এক মূল্যবান স্বর্ণফসল।

চার

প্রকাশরীতির দিক থেকে তারাশঙ্কর 'নারী ও নাগিনী' গল্পে একজন সচেতন সতর্ক শিল্পী। গল্পের বর্ণনায় ও উপস্থাপনায় কোনো বিবরণ-ধর্ম নেই। গল্পকারের বড় বৈশিষ্ট্য চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে গল্পের গতি নির্ধারিত করার সফল প্রয়াস। এতে চরিত্র ঘটনার আশ্রয় নেয়, সেই সূত্রে চরিত্রই কাহিনীর একটি Round অবয়ব নির্মাণ করে দেয় অনেক ক্ষেত্রে। আলোচ্য গল্পের কাহিনী-আভাস যেটুকু আছে, তা উঠে এসেছে চরিত্রের

শিল্পসম্মত সক্রিয়তার মধ্য থেকে। খোঁড়া শেখের বাইরের রূপ ও তার জীবনধারণের স্বভাব-চিত্র দিয়ে গল্পের শুরুর চিত্র। অবশ্যই তা গভীর ব্যঞ্জনাত্মক, কারণ গল্পের শেষের পরিণামী ব্যঞ্জনায় এর স্বাভাবিক প্রতিবিম্বন চোখে পড়ে।

(খোঁড়া শেখ অবচেতনলোক জাত স্বভাবে আদিমতম জৈববৃত্তির একান্ত অনুগত দাস। তা না হলে প্রকৃতির এক বীভৎস উপকরণ সাপের প্রতি এমন আকর্ষণ সম্ভব হত না। যেখানে তার স্ত্রী জোবেদার অনীহা, ভয়, বিরক্তি, উপেক্ষা, সেখানে খোঁড়া নিজেকে নির্দ্বিধ করে রাখে নাগিনীর সঙ্গে তার যাবতীয় আচার-আচরণে।) তার এই elemental মনোভঙ্গিই তারাশঙ্করের লক্ষ্য। প্রকাশরীতিতে তাই চরিত্রের এমন 'inner personality'-র উন্মোচন সম্ভব হয়েছে চরিত্রটির সমূহ-তৎপরতায়। এই চিত্র রচনায় কোনো বাড়তি অংশ নেই। একমুখিন এই চরিত্র উদয়নাগকে ধরার সূচনা থেকে তাকে আদর করা, নাকছাবি পরানো, বিবি হিসেবে জোবেদার সতীন বানানো, তাকে পোষ মানানো ও গা থেকে মধুর গন্ধ বেরুলে বিবিকে জঙ্গলে ছেড়ে আসা এবং খোঁড়ার বিষণ্ন হয়ে পড়ার মধ্যে লেখকের কলমে যে বর্ণনার সংক্ষিপ্তি, সংযম এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবের অন্তর্গূঢ় প্রয়োগ আছে, গল্পের সার্থক প্রকাশভঙ্গির অনুগই সেসব।

জোবেদার কিছু সংলাপ:

১ যতই তেজ না থাক, ও জাত-কে বিশ্বাস নাই।

২ তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝিস।

৩ ওটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো!

৪ কেনে রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না?

খোঁড়া শেখের ব্যবহৃত সংলাপ;

১ জানিস, নাগিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনই করে জড়াজড়ি করে ওরা।

২ ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।

৩ বিবির লগে মন কি করছে রে।

৪ তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু আমার জীবনের চেয়ে বেশি।

৫ জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

এবং গল্পে খোঁড়া শেখের বলা শেষতম বাক্য— এসবই চবিত্র দুটির মনের অন্ধকার জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ভাষা দেয় অসাধারণ সংক্ষিপ্তি ও সংযম-শাসনে। চরিত্রের বিবর্তনে এমন সংলাপ প্রয়োগ গল্পের সার্থক প্রকাশভঙ্গির সুষমা ও গুরুত্ব পায়।

'নারী ও নাগিনী' গল্পের ভাষা চরিত্রের, বক্তব্যের ও সিচুয়েশনের যথার্থ অনুগামী। গল্পের ভাষা মূল বক্তব্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে অবলীলায়। যে আদিম জান্তব জীবন-ভাবনা পাঠকদের অপরিচিত, অজ্ঞাত, যে মনোলোকে পাঠকদের বিচরণ সব সময় হয় না, তারাশঙ্কর তার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার ভাষা করেছেন তির্যক ও চেতনাকে অবলীলায় ঘা মারার উপযোগী। খোঁড়া শেখের ভাষায় আছে কৌতুক, সাপিনীর সঙ্গে ব্যবহারের লঘুতা। কিন্তু গল্পের শেষে সেই লঘুতা, কৌতুক অবসিত, জোবেদার অসহায় মৃত্যুর বিষণ্নতা খোঁড়া শেখকে করে ফকির। সেক্ষেত্রে জীবন উপলব্ধি ও ব্যক্তিগত

জীবনাচরণকে যে ভাষায় ও গদ্যের ঋজু লক্ষ্যে পরিবেশন করেছেন গল্পকার, ভাষাভিত্তিক প্রকাশরীতিটির বিকল্প বস্তুত চিন্তাতীত। বর্ণনায় সাধু-গদ্য, সংলাপে চলিত বিশেষ করে কথ্যভাষার প্রয়োগ আছে। সাধুগদ্যের গাম্ভীর্য ও কথ্যভাষার অন্তরঙ্গতার মিলমিশ আলোচ্য গল্পের বক্তব্যের শৈল্পিক আভিজাত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

পাঁচ

'নারী ও নাগিনী' গল্পের এমন নাম চরিত্রনির্ভর হলেও এবং দুয়ের একত্র থাকায় কিছুটা প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যার দিক থাকলেও এর গভীরে আছে ব্যঞ্জনা। নারী ও নাগিনীর সম্পর্ক-চিন্তা গল্পনামে লক্ষ্য হয়। আবার নারী ও নাগিনী দুটি সত্তার মিল বা বৈপরীত্য ভাবনাও ব্যঞ্জনায় পাঠকমনে প্রশ্ন তুলতে পারে। নামে জোবেদা ও খোঁড়া শেখের নতুন বিবির কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়নি, অথচ এই দুইকে গ্রহণ করেই এমন গল্পনাম।

প্রথমত, আলোচ্য গল্পে প্রকৃত অর্থে লেখক-চিত্রিত চরিত্র জোবেদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর একটি বিষয় গুরুত্ব পায় উদয়নাগ নামের স্ত্রী-সর্প। তাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই খোঁড়া শেখের যাবতীয় তৎপরতা কখনো মিলেমিশে, কখনো বা স্পষ্ট বৈপরীত্যে আঁকা হয়েছে। জোবেদা নাগিনীর বিপরীত চিন্তার ধারণা পোষণ করে। সে নাগিনীকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে নাগিনী লেখকের কলমে খোঁড়া শেখের প্রিয় হয়ে ওঠে। এই দুই টানাপোড়েনেই গল্পের পরিণামী চিত্র স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাই গল্পের এই চিহ্নিত বিষয়ের সমর্থন গল্পের বর্ণনায় থাকায় নাম সার্থক প্রাথমিক অর্থে।

দ্বিতীয়ত, জোবেদাকে যদি মানব নারী প্রকৃতির প্রতীক করা যায়, নাগিনী উদয়নাগ তেমনি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী সমাজের স্ত্রী-স্বভাবের প্রতীকত্বে নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ ও সরীসৃপ প্রাণী স্বভাব এক হতে পারে না। নারীর মন, প্রাণ, আত্মা আছে, সরীসৃপ জাতীয় স্ত্রী-নাগিনীর এসব থাকার কথা নয়। এরা আদিম স্বভাবের অনুবর্তীর থেকে সেই আদিকাল থেকে তাদের বংশরক্ষা করে চলে, তাদের বিবর্তন আছে, পরিবর্তন নেই। কিন্তু মানুষে সঙ্গ-বৈশিষ্ট্যে একজন মানবী নারীর যেমন বদল হয় মনের, তেমনি এক সরীসৃপ স্ত্রী নাগেরও লক্ষণীয় বদল ঘটে পোষ্য হওয়ার কারণে সেই আদিম স্বভাবেরই আনুগত্যের মধ্যে। গল্পে জোবেদা ও নাগিনীর সম্পর্কের সংঘাত খোঁড়া শেখের মধ্য দিয়ে যেভাবে ঘটেছে, সেটাই দেখায় ও পরিণাম সেইভাবেই চিহ্নিত করে বলে নাম সার্থক।

তৃতীয়ত, তারাশঙ্করের নিজস্ব প্রতিপাদ্য জীবনকে বিশেষ আদিম জান্তব জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে জোবেদা ও বিবির যে সাধর্মকে ভেবেছেন গল্পকার, তার ভিত্তি ঈর্ষাবৃত্তি। নারী প্রকৃতির প্রতিকৃতি, আবার সভ্যতার আলোয় তা অন্ধকারে লুকোয় মানব প্রবৃত্তির পক্ষে, কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে তা হয় প্রত্যক্ষ এবং elemental। এই প্রত্যক্ষ ঈর্ষা, মানুষের ঢেকে রাখা ঈর্ষারই আর এক পিঠ! জোবেদার ঈর্ষা ও উদয়নাগের ঈর্ষা কোথাও যেন এক কেন্দ্রে লেগে যায়। দুই ঈর্ষার সংঘর্ষে যে জ্বালা, তাতে জোবেদা মারা যায়, খোঁড়া শেখ ফকির হয়, আদিম জীবন তার স্বভাবেই খোঁড়ার জঙ্গল-ঢাকা ভিটেয় বংশবৃদ্ধি করে বেঁচে থাকে। আদিম প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মানুষের কাছে মানুষের পরাজয় স্বাভাবিক। তাই নাম সার্থক।

বনফুল

জন্ম : ১৯ জুলাই ১৮৯৯

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'বনফুল', আর এই ছদ্মনামেই সেকালের চিকিৎসক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় খ্যাতকীর্তি গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি হিসেবে পরিচিত হয়ে যান বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে। একালে তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবেই স্বভাবী ও সাধারণ পাঠকদের কাছে সর্বাধিক বন্দিত। তাঁর আবির্ভাবের সময়টি হল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালেই, 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশের সম-সময়ে, কিন্তু আশ্চর্যভাবে কল্লোলের লেখক হতে পারেননি। সে সময়ে 'কল্লোলের' অনেক আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত মাসিক 'প্রবাসী'-র জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল, আর এই 'প্রবাসী' পত্রিকারই ১৩২৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম গল্প লেখেন 'চোখ গেল'। লেখক তখনো কলকাতার মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার অধ্যয়ন-সাধনায় তিনি গভীর-নিবিষ্ট।

'চোখ গেল' গল্পেই বনফুল জীবনের রহস্য সন্ধানে উৎসুক হয়েছেন। কিন্তু এই রহস্য-সন্ধান প্রয়াস তারাশঙ্করেব মতো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতো ছোটগল্পের কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রের বিস্তারিত রূপের মধ্য দিয়ে আসেনি, এসেছে ছোটগল্পের অতিসংক্ষিপ্ত শিল্পপ্রকরণেব মধ্য দিয়ে। তিনি সাহিত্য-জীবন গ্রহণের প্রথম থেকেই গল্পের অঙ্গগঠনে সচেতন, সতর্ক, মিতবাক। একটি গোপন রহস্য সব সময়েই তাঁর গল্পে এমনভাবে অন্তর্গূঢ় অথচ গতিশীল থাকে যাকে বুঝতে হলে, ধরতে হলে গল্পের শেষ বাক্যটি পাঠকদের পড়তেই হবে। পাঠকদের কাছে লেখকের পক্ষে তাঁর গল্প পড়ার এই শর্ত—command। বনফুলের গল্পে কাহিনী আছে, ঘটনা আছে, কিন্তু তারা কিছু বলে না, বলিয়ে নেয়। বনফুল এমনভাবে বাক্য সাজান, ঘটনা তৈরি করেন এমনভাবে সংলাপের গুরুত্ব ও দায়িত্ব ওজন করেন, যা স্বর্ণকারের স্বর্ণ ওজনের সমতুল।

কথাটার আর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বনফুল বাস্তব জীবন থেকে কখনোই সরে যাননি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই জীবনচিত্র লেখকের বর্ণনায় হয় নিরাসক্ত। লেখক দূরে থেকে সেই জীবন দেখেন, দেখান। আর দেখাবার সময় শিল্পকৌশলে তিনি সতর্ক হয়ে ওঠেন। ঠিক যেটুকু দরকার সেইটুকুই রেখে গল্পের অবয়ব গঠনে অতিরেক বর্জন করেন। স্বভাবতই পাঠকের মনোনিবেশ অবলীলায় ঘটে যায় তাঁর গল্পপাঠের সময়। বিজ্ঞানীর শিক্ষা ছিল বনফুলের স্বভাবে, মনে। তাই গল্পগুলি হয় যেমন প্রয়োজনহীন উপাদানগুলির কাট-ছাঁট করে সংক্ষিপ্ত, সংযত শিল্পরূপের এক পরীক্ষাগার, তেমনি

প্রসঙ্গের উপস্থাপনেও থাকে মন ও মননের প্রয়োজনমতো প্রয়োগবৈচিত্র্য। বনফুল কখনো চরিত্রের বা মূল ভাবের মননে নিজেকে নিবিষ্ট রাখেননি, চরিত্রগুলির আচার-আচরণ, সংলাপ ও ঘটনানির্ভর sequence থেকে যদি কোনো মন বা স্বভাব পাঠকদের তাড়িত করে, তারই জন্য লেখকের গল্প প্রতীক্ষার ব্যবস্থা করে দেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

'বনফুলের আরো গল্প' নামের এই দ্বিতীয় গল্প-সংকলন বেরোয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে উপনীত। এই গ্রন্থ পড়ে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে পত্রে জানান—'জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা, তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান করে দেখার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক, তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে—তোমাদের ভয় পাছে তার অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট করে ফেলো।' বনফুল তাঁর গল্পে তুচ্ছ বিষয়কে নিলেও কৌতূহল দিয়ে তাকে অন্য স্বাদ দিয়েছেন। বনফুলের গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল বজায় থাকে, সে কৌতূহল গল্পের 'ফর্ম' থেকে ক্রমশ content -এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এমন ব্যঞ্জনা আনে— যাতে পাঠকদের মনে ঔৎসুক্য থাকে এই অর্থে—'শেষ হয়ে না হইল শেষ'। এই কৌতূহলের সঙ্গে মিশে থাকে প্রচ্ছন্ন কৌতুক—তার নানান রকমফেরে শ্লেষ, ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গোক্তি, নির্মল পরিহাস-রসিকতা ইত্যাদি সব কিছুই। 'ব্যতিক্রম' নামের গল্পটি উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বঞ্চিত নয়।

এবং শুধু 'ব্যতিক্রম' নয়, বনফুলের সমস্ত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি স্মরণে রেখে একথা বলতে আমরা নির্দ্বিধ যে, এই লেখক গল্পের বিষয়ে আধুনিক জীবনকে যেমন গ্রহণ করতে ভোলেননি, তেমনি সেই জীবনের সমস্ত ভালো-মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, জীবনের নানা অভিঘাতে পর্যুদস্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষগুলির অনাড়ম্বর অসহায়তাকে স্বকীয় দৃষ্টিতে যাচাই করেছেন। এমন যাচাই করা সম্ভব হয়েছে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। অবশ্যই সে দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের গম্ভীর বিক্ষত রূপের বিচারণা নেই আছে লঘু কৌতুক-ব্যঙ্গের সঙ্গে আপন মমতা, মানবিকতাবোধ ও সহমর্মিতা মিশিয়ে এক করুণ জীবন-স্বভাবের প্রতিচিত্রন। তাঁর গল্পের বিষয়ের জীবনরূপে তন্নিষ্ঠ, দৃষ্টিভঙ্গি তন্ময়, কিন্তু তার পরিবেশন পরিহাস ও কারুণ্যের মিশ্রণে বিচিত্র স্বাদে বর্ণময়।

বনফুল একাধিক ব্যঙ্গ কবিতা লিখে গেছেন 'শনিবারের চিঠি'তে, আর তা-ই প্রসৃত হয়েছে একাধিক গল্পে। 'শ্রীপতি সামন্ত', 'সনাতনপুরের অধিবাসিবৃন্দ', 'জৈবিক নিয়ম', 'সমাধান', 'অজান্তে', 'ছেলে মেয়ে', 'ক্যানভাসার' ইত্যাদি গল্পে তার প্রমাণ মেলে। শ্রীপতি সামন্তের অতি দরিদ্র, গ্রাম্য আচরণের পাশে বিনা চিকিটের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ভদ্রলোকের নকল রূপ উৎকট হয়ে ধরা পড়ে পাঠকদের কাছে। 'সনাতনপুরের অধিবাসিবৃন্দ' গল্পের শৈলেশ্বর মোক্তার ও শ্যামা ধোপানির অন্তর্ধান গ্রামের মানুষদের

যে মিথ্যা কুৎসায় নিবিষ্ট করে, গল্পের শেষে তার লজ্জাহীন নোংরা স্বভাবকে ব্যঙ্গে যেন কশাঘাত করেছেন গল্পকার। 'জৈবিক নিয়ম' গল্পের সেই বছর কুড়ি বয়সের তরুণের স্টেশনে এক অপরিচিত তরুণীর সামনে যেভাবে যৌবনের আত্মপ্রচার প্রয়াস এবং শেষে চলন্ত ট্রেনের তলায় মৃত্যুবরণ, তার স্বভাবের ও যৌবনধর্মের অসঙ্গতিতে গল্পকার লঘুরসে বেদনাও যুক্ত করেছেন। 'ক্যানভাসার' গল্পের হীরালালের দাঁতের মাজন বিক্রির সময় একজনের সঙ্গে বচসায় নকল দাঁত খুলে পড়ায়, 'অজান্তে' গল্পের এক ভিক্ষুকের কথায়, 'সমাধান' গল্পের কালো বিকৃতদর্শন শিশুকন্যার জন্য লেখকের করুণা, সেই ট্রেনের আর.এম.এস. ভ্যানে একের পর এক অন্যের চিঠি পড়ার মধ্যে পাঠকের নিজেরই তৃতীয় পক্ষের যুবতীর অন্য এক প্রেমিককে লেখা চিঠি পড়ে ফেলায় বজ্রপাত সুলভ আকস্মিকতার মধ্যে গল্পকারের শেষ-চমকে গল্পরচনারীতির বিশেষ পরিচয় মেলে। গল্প এবং উপন্যাস—উভয়তই বনফুল এক নির্দিষ্ট রোমান্টিক সমাজ-আদর্শবাদে দীক্ষিত কথাকার।

১.

ব্যতিক্রম

এক

'ব্যতিক্রম' গল্পটি বনফুলের একটি উল্লেখযোগ্য প্রেম-ভাবনার গল্প। চিকিৎসক বা মেডিক্যাল ছাত্রের স্বভাব নিয়ে বনফুল যেন গল্পের প্রেমবক্তব্যটিকে ডিসেক্‌শান টেবিলে রেখে মানব-চরিত্রের অভ্যন্তরে অতি নিপুণভাবে অনুসন্ধানী হয়েছেন। সমাজের শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে কখন যে প্রেমের উদ্ভব হয়, বা হবে, এ রহস্য মনস্তত্ত্ববিদ অনুসন্ধান করতে পারেন নির্দিষ্ট থিওরি মেনে, লেখক করেন চরিত্রের বাস্তবতায় পারিপার্শ্বিকের অভিঘাতে চরিত্র-আত্মার নিজস্ব উন্মোচনে। লেখক শুধু ঘটনা বলে যাবেন, চরিত্রগুলির চলা-ফেরা, স্থিরতা-অস্থিরতা, গোপন মানসিকতা দেখিয়ে দেবেন, স্রষ্টার বা পাঠকের তা থেকে বুঝে নিতে হবে।

এই হল বনফুলের গল্পের বৈশিষ্ট্য। 'ব্যতিক্রম' গল্পের কাহিনী ও ঘটনা বিচারে তার প্রমাণ মেলে। গল্পের কাহিনী অংশ সামান্য। সবদিক থেকে শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়স্বজন শূন্য সুরেন এখনো অবিবাহিত এবং বিবাহে আর তেমন রুচিও নেই, কারণ আধুনিকা নারীদের দেখে তাদের একজনকে বধূ করে আনার ব্যাপারে যথোচিত মোহভঙ্গ ঘটেছে। এসবই তার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতায় হয়নি, চারপাশ ও বন্ধুদের দেখে ধারণা হয়েছে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের বি.এ. পাস বউ আভার স্বামী ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ঘটনাই তার ধারণার সত্যতা যাচাইয়ের পক্ষে প্রকৃত প্রমাণ। সুরেন থাকে পশ্চিমের একটা শহরে, তীরবর্তী গঙ্গার সংলগ্ন একটি বাসাবাড়িতে। এখানেই একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হয় ললিতের স্ত্রী আভা। সুরেন তার ভদ্রতা, শিক্ষা, সৌজন্যবোধ ইত্যাদির মধ্যে আভার একাধিকবার ওর বাসায় আগমনে অপ্রস্তুত বোধ করে। আভা আসে তার স্বামীর বন্ধু হিসেবে তাকে কিছু বলতে।

কিন্তু যখন আসে কিছুতেই আর সেসব বলা হয়ে ওঠে না। এদিকে আভার মতো সুন্দরী রমণীর সাহচর্য কখন যেন সুরেনের কাছে গোপনে রমণীয় হয়ে ওঠে। আভা ওখানে স্কুলের শিক্ষিকা। কিন্তু স্কুল সেক্রেটারি মুরারিবাবু আভার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় আভা বিরক্ত হয়। ইতিমধ্যে মুরারি সুরেন-আভার সম্পর্কে কিছু সন্দেহ করে সুরেনকে সচেতন করে যায়। আভার সেই প্রায়-নিয়মিত-আসা বিলম্বিত ও ক্রমশ বন্ধ হওয়ায় সুরেন আভাকে চিঠি লেখার মনস্থ করে এবং লেখেও। আর যেদিন লেখে সেইদিনই আভা আসে ওর বাসায়, জানায় ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে মুরারিবাবু ও আরও অনেকের অস্বস্তিকর ব্যবহারের কারণে। তার কথাতেই জানা যায়, ললিতের সঙ্গে ওর বিচ্ছেদের কারণ—ললিতের এক আর্টিস্ট বন্ধুর আভাকে লেখা চিঠি। ললিত তা দেখতে পেলে সাংসারিক অশান্তি চরমে ওঠে। এবং তাতেই আভা চলে আসে। কিন্তু আভার সেই চিঠি থেকে পরিত্রাণ কোথায়! আগে যেমন এখানেও সেই গোপন পত্রাঘাত সহ্য করতে হয় বিভিন্ন সূত্র থেকে। আভার কাছে সুরেনই একমাত্র ব্যতিক্রম যে এতদিনের

পরিচয়ে একবারও কোনো চিঠি লিখে বিরক্ত করেনি। আভা ললিতের কাছ থেকে যা শুনেছিল, প্রত্যক্ষ পরিচয়ে দেখা গেল তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—সুরেন বাস্তবিক অর্থেই নারী-সম্পর্ক বিষয়ে একজন 'পিউরিটান' মানুষ। এই কথার পর আভা বিদায় নেয়। সুরেনের নিরুত্তর, নির্বাক অবস্থা দিয়েই গল্পের শেষ।

'ব্যতিক্রম' গল্প এবং অন্যান্য গল্পেও দেখা যায়, গল্পের কাহিনী যতই ছোট হোক, তা আরম্ভের পর শেষ না হওয়া পর্যন্ত কখনো থেমে থাকে না, কোনো ঘটনা—ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, তাকে থামিয়ে দেয় না, কোনো চরিত্র—কেন্দ্রীয় বা নায়ক-নায়িকা অথবা পার্শ্বচরিত্র, কেউই কাহিনীকে মুহূর্তের জন্যও থামিয়ে রাখার পক্ষে দায়বদ্ধ নয়। কাহিনীর আছে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি, তার দায়িত্ব, প্লটকে যথাযথ করে লেখকের বক্তব্যের অভিব্যঞ্জনার জায়গায় নিয়ে আসা। 'ব্যতিক্রম' গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক নায়ক সুরেনের কয়েকটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন। এগুলি সমগ্র গল্পের আবহ, গতি, বক্তব্যের একমুখিতা, অন্তের শৈল্পিক ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির সহায়ক নিঃসন্দেহে।

কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদের যে কাহিনী-অংশ তা সম্পূর্ণ লেখকেরই উদ্দিষ্ট বিষয়। লেখক এ গল্পে নিজেকে আড়ালে রাখেননি। তিনিই যে এই গল্প লিখছেন, এসবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, এই কথা তাঁর উক্তিতেই মেলে। 'ছয়' পরিচ্ছেদে লেখক লিখছেন—'যাক, কি মনে হইয়াছে তাহা আর নাই লিখিলাম, আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি, কাব্য নয়।' এই রীতি বঙ্কিমী নিঃসন্দেহে। লেখকের সশরীর উপস্থিতিতে আছে সূক্ষ্ম শ্লেষমিশ্রিত চাপা পরিহাস আর কাহিনী ও গল্পকে চরিত্রে থামিয়ে না রেখে তাকে অবলীলায় গতি দেওয়ার প্রয়াস।

কাহিনীবৃত্তে ঘটনা সামান্যই। সুরেনের মতো পুরুষের কাছে আভার মতো বিবাহিতা সুন্দরী, স্মার্ট রমণীর অকস্মাৎ আগমন নিশ্চয়ই ঘটনা। এছাড়া বড় ঘটনা আর নেই। মুরারিবাবুর আবির্ভাব গল্পের মোড় আরও গভীরে ঘোরায়। গল্পের শেষের ঘটনা আর বাইরে নেই, চরিত্রের ভিতরে। সে চরিত্র সুরেন। ঘটনা সেখানে অপ্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় পাঠকদের পক্ষেও। কারণ গল্পের শেষের ব্যঞ্জনা সুরেনকে কেন্দ্র করে পাঠকমনে কৌতুক ও কৌতূহল রচনা করবে বিচিত্র স্বভাবে। বনফুলের কাহিনী ও ঘটনা রচনার বিশিষ্টতা এখানেই। সমস্ত চমক শেষ বাক্যে—'সত্যি বলছি, আপনি-ই একমাত্র ভদ্রলোক যিনি সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করেছেন, চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করেননি ... ঠিকই দেখছি, স্ট্রিক্ট্‌লি পিউরিটান আপনি।' অথচ এই কথা বলার সময় সুরেনের সামনের টেবিলে নতুন-কেনা প্যাডের তলায় চাপা দিয়ে রাখা আছে আভাকে লেখা সুরেনের দীর্ঘ চিঠিখানি।

দুই

'ব্যতিক্রম' চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প। এই গল্পে প্রধান চরিত্র দু'টি—ললিতের স্ত্রী আভা ও বন্ধু সুরেন। সুরেন এই গল্পের নায়ক। তার অন্তরলোকের উন্মোচনেই গল্পের

পরিণামী-আঘাত পাঠকদের শিল্প-রসানন্দে আপ্লুত করবে। সুরেনের রক্ষণশীলতা, শিক্ষিত হলেও আধুনিকা নারীদের সম্পর্কে তিক্ত, বিরূপ তাত্ত্বিক ধারণা তাকে নায়কের স্বাতন্ত্র্য দেয়। তার নিস্তরঙ্গ গতানুগতিক জীবনে তরঙ্গ তোলে। তার পক্ষে আধুনিকা নারীদের সংসার ভাঙার মতো উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সম্পর্কিত চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের স্ত্রী আভা। তার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতেই সুরেনের সমস্ত অঙ্ক ভুল হয়ে যায়।

সুন্দরী, শিক্ষিত, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানোর পর নিঃসঙ্গ আভাকে প্রথম দেখে এবং বার বার দেখতে দেখতে সুরেন ভিতরে বদলাতে থাকে। সে পরিবর্তন কখন যেন গোপন প্রেমবোধে জ্বলে ওঠে! অপ্রকাশ্য, গোপন-লালিত এই প্রেমানুভূতি দীপ্ত হয় মুরারিবাবুর ঈর্ষাদগ্ধ সংবাদ দানে। সুরেনের চিঠি লেখার প্রয়াসে সেই প্রেমের একটা স্থায়ী প্রকাশ্য রূপ যখন পাঠক পেতে উৎসুক, অন্তত কৌতূহলী, তখনি আভার দিক থেকে সমস্ত কিছুর উদ্‌ঘাটন সুরেনকে, তার চরিত্র-শক্তিকে ধরাশায়ী করে দেয়। সুরেন আত্মশক্তিতে, চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যে নির্বোধের ভূমিকায় চলে আসে। একদিকে তার প্রথম প্রেমিক-অন্তরের গোপনতম নির্মম পরাজয় স্বীকার—দু'য়ের মধ্যে সুরেনের অন্তিম পরিণতি পাঠকদের বিষণ্ণ করে। সুরেনের নবোদ্ভূত প্রেম-ভাবনার নীতি ও পিউরিটান স্বভাবের কঠিন নীতি—দুই-এর সম্যক ধ্বংসে সুরেন চরিত্রের বিষাদময় রূপ গল্পের অন্তিমে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে আভা চরিত্রটি উগ্র আধুনিকা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময়ী এক চরিত্র। তবু তার মধ্যে যে চিরন্তন নারী-স্বভাব আছে—যার ভিত্তি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল্যে যাচাই করেই একমাত্র সত্য হয়, যেখানে স্বামী-নির্ভরতাই মেয়েদের একমাত্র জীবন সত্য—এই বিশ্বাসের কঠিন মাটি অভিজ্ঞতার আলোয় তৈরি হয়ে যায়, সেখানে সে বিপরীত প্রেমের রমণী। তার চরিত্রের দৃঢ়তা তাকে বড় করে ঠিকই, কিন্তু লেখকের গল্পের মূল লক্ষ্যে সেই দৃঢ়চিত্ততা, সিদ্ধান্তের বদল নায়ককেই বড় আকার দেয়। তার জন্য দায়ী আভা নয়। আভার অভিজ্ঞতা ও স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন, আর সুরেনের নব হার্দ্য অভিজ্ঞতা ও আভা সম্পর্কিত মোহভঙ্গ—দুই বিপরীত কোটির সংঘাত গল্পের মধ্যে গোপনেই ঘটে যায়।

আভার সক্রিয়তা লেখক এঁকেছেন সুরেনকে স্পষ্ট করার জন্যই। আভার প্রেম স্বামী-প্রেমেই স্থির আছে। কেবল পারিবারিক মান-অভিমানে স্বামীসঙ্গ থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়ে যে পরিপার্শ্বের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তা তার পারিবারিক জীবনের সুস্থ পূর্ণ রূপ গঠনের সহায়ক নিশ্চয়ই। কিন্তু তার প্রেম নয়, তার বহির্জীবনের সক্রিয়তা সুরেনের ব্যক্তিত্বের মূলকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে যায়—যা লেখকের লক্ষ্য। সুরেন যেমন নব প্রেমবোধে ব্যর্থ হল আভা-নিরপেক্ষভাবেই মনে মনে, তেমনি তার চরিত্রেও কলঙ্ক জুটল আর সব পুরুষের মতো গোপন চরিত্রভ্রষ্টতার নালিশ তৈরি হয়ে। এসবের মূলে অবশ্যই আভার উপস্থিতি গুরুত্ব পায়। আভা চরিত্র সমগ্র গল্পে ও সুরেনের জীবনে এক অতি-প্রয়োজনীয় উদ্দীপন বিভাব।

মুরারিমোহন পুরকায়স্থের চরিত্ররূপ গল্পের 'সাত' পরিচ্ছেদেই প্রত্যক্ষত দেখি, আর গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে আভার সুরেনকে বলা কথায় কিছু জানি। সে এসে কয়েকটি কাজ করে গেছে গল্পে: ১. আভার প্রতি তার যে গভীর-গোপন আকর্ষণ আছে তা স্থায়ী করতে তৎপর হয়ে গল্পের প্রেম সমস্যাকে কিছুটা জটিল করতে চেয়েছে, ২. সুরেনের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ও সুরেনের মনোভাব জেনে এগোবার পথ পরিষ্কার করেছে, ৩. গল্পে সুরেনের মনে অত্যন্ত জটিলভাবে আভার প্রতি সুরেনের আকর্ষণকে আরও জটিল ও অমোঘ করতে সহায়তা করেছে, ৪. গল্পের প্লটকে নিটোল, নিখুঁত, একমুখী করতেও মুরারিমোহনের সক্রিয়তার প্রয়োজন আছে।

তিন

'ব্যতিক্রম' গল্পটি প্রসঙ্গে আগেই বলেছি, এটি বনফুলের একটি সার্থক প্রেমের গল্প। প্রেম সম্পর্কে নারী—কি প্রাচীনা বা আধুনিকা যাই হোক—এ গল্পে অবশ্যই আধুনিকা—তার ধারণা এখানে আভার মাধ্যমে ব্যক্ত। প্রেম পুরুষদের কাছে কিরকম, কিভাবেই বা তাদের মধ্যে ক্রিয়া করে, তারও স্বরূপ সুরেনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা পাই। নারী সাধারণ অর্থে সমগ্র পুরুষ জাতির কাছে যে সব সময়েই আকর্ষণের--এই তত্ত্বচিন্তা শুধু সুরেন নয়, মুরারিমোহন, অন্যান্য পুরুষ—যারা একাধিক চিঠি লেখে আভাকে—তাদের সামগ্রিক মানসিকতায় প্রতিষ্ঠা করে। 'ব্যতিক্রম' গল্পের শ্রেণীনির্ণয় এভাবেই প্রেমের গল্পের সারিতে চলে আসে।

গল্পের মহাক্ষণ অর্থাৎ 'ক্লাইম্যাক্স' লেখক বনফুল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে 'ব্যতিক্রম' গল্পে রেখেছেন। একেবারে শেষে গল্পের চরম situation -চিত্র। আগের কাহিনী বিস্তৃত করে বলার পর আভা যখন সুরেনকে বলে সে-ই একমাত্র ব্যতিক্রম, অন্যদের মতো চিঠি লিখে বিরক্ত করেননি, স্বভাবে সত্যিকারের পিউরিটান, সেখানেই গল্পের চরম মুহূর্ত ঠিক হয়ে যায়। কারণ সুরেন চরিত্রের প্রেমবিলাস ও সে বোধে ভাঙন এবং তাকে সমস্ত পুরুষের সারিতে বসানোর বক্তব্যেই গল্পের পরিণামী আঘাত আছে। আভার সংলাপে ক্লাইম্যাক্স, আর সুরেনের বিবর্ণ মুখের হাসি ও নিস্তব্ধ বসে থাকাতেই গল্পের 'ক্যাটাস্ট্রফি' নেমে আসে। কোনো বিশেষ ভাব নয়, ঘটনার অভিঘাত নয়, চরিত্র বিকাশের জটিল একটা জটেই গল্পের ব্যঞ্জনার একটা রক্তিম রূপ চিহ্নিত। বনফুলের গল্পটির উদ্দেশ্য যা, কাহিনী-নির্দিষ্ট গল্প ও প্লটের দৃঢ়বন্ধন তাকে এতটুকু অবান্তর অংশের মধ্যে নিয়ে যায় না, অতি সতর্ক, নিশ্ছিদ্র দেহরক্ষীদের দ্বারা বেষ্টিত কোনো ব্যক্তির মতো গল্পের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে শেষে পৌঁছে গেছে। বনফুল গল্পের ইঙ্গিতধর্ম রক্ষা করেছেন চরিত্রের সংলাপে। আভা তার কথা—যা গল্পের শেষে বলেছে, তা বলতে এসেও প্রথম দর্শনে বলতে পারেনি, পরে ব্যস্ততায় আর বলা হয়নি— শহর ও চাকরি ছেড়ে চলে যাবার সময়েই তার বলার সুযোগ হল—এভাবে চরিত্রের সংলাপের সংক্ষিপ্তি ও subtleness-এ গল্পের লক্ষ্য চমৎকৃতি লাভ করেছে।

চার

'ব্যতিক্রম' গল্পে গল্পকার বনফুলের বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় নিশ্চয়ই মেলে। তিনি গল্প বলার সময় চরিত্রের স্বাধীন সত্তায় ডুব দেন না, চরিত্রকে দূরে দাঁড় করিয়ে তাকে চিনিয়ে দেন। তারাশঙ্কর যেমন কাহিনী নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করেন, গল্পকে তার সঙ্গে ওতপ্রোত করেন কিন্তু তাকে ছেড়ে চলে আসেন বিশেষ বক্তব্যে, তাই চরিত্রের সর্বশেষ অভিব্যক্তিই সেখানে বিশেষ দর্শনে দীপ্ত হয়, বনফুলের গল্পে তা হয় না। বনফুল কাহিনীকে গল্পের আবহে সব সময় ধরে রাখেন। গল্প-কথন তাঁর সমানভাবে চলে। সবশেষে গল্পের পরিণামী-ব্যঞ্জনা চকিত হয়ে যায় কাহিনীর বিশেষ এক ধাক্কায়। 'ব্যতিক্রম' গল্পে তার প্রমাণ আছে।

এই গল্পে সমকালীন শিক্ষা, আধুনিকা নারীজাতির বৈশিষ্ট্য—এসব যথাযথ রেখেছেন। নারী-পুরুষের সম্পর্ক-নির্ণয়ে তিনি মূল জিজ্ঞাসায় গেছেন। নারী স্বামী ছাড়া অন্যত্র যে কোনোভাবে হোক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে বাধ্য। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ প্রকৃতিদত্ত ধর্ম যেমন, তেমনি অধিকার-সচেতন ব্যবস্থা হিসেবে আসবেই। বনফুল এই ভাবটিকে গল্পের কাঠামোর অভ্যন্তরে অন্তঃশীল রেখে সুরেনকে বিচার করতে বসেছেন। সুরেনের যে ভ্রান্তি তা তার চরিত্র-নিহিত কোনো ট্র্যাজেডির নয়, তার অবস্থা-বিপাকে পড়া জীবন-অসঙ্গতির বিষয় মাত্র। প্রেম সমস্ত নারী-পুরুষের পক্ষে নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরভাবে সত্য; কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তাকে নানা রঙ, বৈশিষ্ট্য দিতে পারে। আভার স্বামীপ্রেমের শেষতম উপলব্ধি ও সুরেনের নবপ্রেমের নিষ্ফলত্ব এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনজনিত পরাজয় যে pathos আনে, তা বনফুলের জীবনভাবনাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরে। সেখানে জীবনে কোনো গভীরতলাশ্রয়ী বক্তব্যের স্বভাব নেই, আছে জীবনযাপনের পক্ষে কয়েকটি স্বাভাবিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন। এখানেই বনফুলের লেখক-মানসের স্বধর্ম এবং 'ব্যতিক্রম' তার পক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সবচেয়ে বড় কথা, বনফুল তাঁর গল্প লিখেছেন আগাগোড়া প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও শ্লেষ মিশিয়েই। গল্পের আরম্ভ এরকম—'স্বাস্থ্যবান, সুরূপ, লেখাপড়া শেষ করিয়াছে, উপার্জন করিতেছে, অথচ বিবাহ করে নাই, এহেন সুরেনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বিশেষ কিছু বলে না, খালি একটু হাসে।' এমন বাক্যগঠনে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও শ্লেষটুকু সচেতন-স্বভাবী পাঠকের দৃষ্টি ও অনুভূতির স্নায়ু এড়ায় না। এই পরিহাস সারা গল্পে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। সুরেনের আধুনিকা নারী সম্পর্কে নিরাসক্তির পাশে তার মনের মধ্যেকার ক্ষুধিত কামনার কথায়, আভার সঙ্গে একাধিক ব্যবহারে, আভাকে চিঠি লেখার জন্য দামী খাম ও প্যাড কেনার প্রয়াসে, আভার জন্য একাধিক গোপন প্রতীক্ষার বাসনায় সুন্দর সরস পরিহাস ও শ্লেষ লেগে আছে। গল্পের শেষেও আভার দিক থেকে কোনো চিঠি না লেখার জন্য সুরেনের প্রশংসা এবং তাকে স্ট্রিক্‌ট্‌লি পিউরিটান বলার মধ্যে যে শ্লেষ তা যেন সুরেনের গালেই সশব্দে চড় মেরে বসে। পরিহাস, শ্লেষ ও ব্যঙ্গে বনফুল 'ব্যতিক্রম' গল্পে এবং অন্যান্য গল্পেও এমন এক মেজাজ তৈরি করেন, যা

সেকালে অন্য কোনো লেখকের ছিল না। 'ব্যতিক্রম' গল্পের শেষের একটি বাক্য— 'সুরেন বিবর্ণমুখে একটু হাসিবার ভান করিল।' এই বাক্য যেন সুরেনের গালে পরিহাস-রসিক বনফুলেরই দেওয়া চপেটাঘাত।

প্রসঙ্গত বলি, গল্পটির ভাষাবৈশিষ্ট্যেও স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত মেজাজ আনে এমন পরিহাস থাকার কারণে। আগাগোড়া সাধুরীতির গদ্যে লেখা গল্প। বনফুলের ব্যঙ্গপ্রাণতা সেই গদ্যকে চকিত, রসালাপী করেছে। গদ্য ভাবাতিরেক বর্জিত, কাটছাঁট। কাহিনীর গতিতে গদ্য স্বচ্ছন্দ সাবলীল। সংলাপও কোথাও দীর্ঘ নয়। তারা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে গল্পকে পরবর্তী অংশে ঠেলে দিয়ে ক্রমশ অমোঘ পরিণামমুখিন করেছে নায়ক চরিত্রের অন্তর-নিহিত ভাব-ভাবনাকে। এখানেই বনফুলের গদ্যের নিরাসক্ত পোশাক ও স্বাতন্ত্র্য।

পাঁচ

গল্পটির নায়ক চরিত্র সুরেন, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বনফুল গল্পটির নাম রেখেছেন—আপাতদৃষ্টিতে তা-ই প্রমাণ হয়। গল্পের শেষে আভা যখন সাড়ম্বরে সুরেনকে জানায়—'আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম', তখন নামকরণের কেন্দ্রবিন্দুটি পাঠকরা সহজেই বুঝে নেয়। কিন্তু নামের মধ্যে একাধিক ব্যঞ্জনাও আছে। দ্বিতীয় তাৎপর্য হল, সারা গল্পে ব্যতিক্রম হল সুরেনের চোখে আভাও। 'আভা দেবীর সংস্পর্শে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে তাহার মতামতের উগ্রতা কমিয়া গিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হয় না, মতামত একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে।' অর্থাৎ শিক্ষিতা আধুনিকাদের মধ্যে, সুরেনের চোখে, আভা ব্যতিক্রম। এই অর্থে নাম অন্য ব্যঞ্জনা আনে। তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা রাখা যায়। সে সুরেন কোনোক্রমেই বিবাহে রাজি ছিল না, সে আভার সাহচর্যে বিবাহের কথাও প্রচ্ছন্নভাবে ভেবেছে প্রেমভাবনার সূত্রে সূক্ষ্ম গভীর জটিলভাবে— এটাও সুরেনের স্বভাবের পক্ষে ব্যতিক্রম। চতুর্থ ব্যাখ্যাটি হল, সুরেন প্রেমভাবনায় যার প্রতি আকৃষ্ট হয় গভীর গোপন অন্তর-ভাবনায়, সে একজন বিবাহিতা মহিলা, বন্ধুর স্ত্রী। অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে ফাটল ধরানোর পক্ষে এমন একটি situation- সৃষ্টি লক্ষ করার মতোই। বন্ধুকে কিছু না জানিয়ে বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে প্রেম এবং তা-ও সুরেনের মতো নীতিবাগীশ মানুষের পক্ষে—এই চরিত্র-পরিবর্তন সুরেনের মতো ব্যক্তির সমস্ত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পরেও ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মের লক্ষণীয় ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে। তাই 'ব্যতিক্রম' নামের ব্যঞ্জনা একমাত্র চরিত্র-নিহিত নয়, লেখকের দৃষ্টিনিবদ্ধ অন্য একাধিক ব্যাখ্যায় মেলে।

বনফুলের ছোটগল্পে লেখকের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় আছে। ছোটগল্প কত ছোট হতে পারে, বনফুল তার পরীক্ষা করে গেছেন সচেতনভাবেই। প্রসঙ্গত 'নিমগাছ', 'আয়না', 'সমাধান', 'রূপকথা', 'অজান্তে' ইত্যাদি গল্প স্মরণীয়। বিদেশি সাহিত্যের মোপাসাঁ, চেখভ, ও হেনরি প্রমুখ তাঁদের ছোটগল্পে গল্পের পরিণামী সিদ্ধান্তে এসে যে চমক ও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, বনফুলের গল্প লেখার সময় তা মনে ছিল নিশ্চয়ই। তাই গল্পের শেষ ব্যঞ্জনা পাঠকদের গল্পটি পাঠের সময়ে ক্রমশ প্রস্তুত রেখেও শেষে

অপ্রস্তুত করে তোলার মতো জায়গায় নিয়ে যায়। আভা সুন্দরী, শিক্ষিতা, তার প্রতি প্রেম নিবেদন করতে চায় একাধিক পুরুষ—বিবাহিতা জেনেও। সে প্রেম নিবেদনে সূত্র হয় তাদের গোপন পত্র। স্বামী ললিতের সঙ্গে যে মানসিক সংঘর্ষ, সাময়িক বিচ্ছেদ, তার মূলেও এমন চিঠি। আভার জীবনে স্বামীর বন্ধু সুরেন ব্যতিক্রম, কারণ তাকে সুরেন অন্তত কোনো চিঠি দেয়নি, চিঠি দিয়ে বিরক্তও করেনি। অথচ সুরেনও একদিন, আভা ক্রমশ তার কাছে আসা বন্ধ করায়, চিঠি লেখে। আভা তার শিক্ষিকার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ও তার কারণ জানিয়ে সুরেনকে তার ব্যতিক্রম হিসেবে প্রশংসাপত্র দিতে এলে বিষয়টার ভিতরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ থেকেই যায়। যে আভা ভেবেছিল সুরেন তাকে কোনো চিঠি না লেখায় ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, কিন্তু সেই সুরেনই ভিতরে অন্য মানুষ! গল্পে আভার ধারণা ও বিশ্বাস এবং সুরেনের তার বিপরীত স্বভাবের গোপন রূপ—দু'য়ের বৈপরীত্যে গল্পের নাম ভিন্ন তাৎপর্য পেয়ে যায়।

২.

ছোটলোক

এক

'ছোটলোক' গল্পটি প্রথম সংকলিত হয় বনফুলের 'বিন্দু-বিসর্গ' নামের গল্প সংকলনে। এই গল্প সংকলনটির প্রথম প্রকাশকাল বাংলা তেরশো একান্ন সালের (ইংরেজি ১৯৪৪) বৈশাখ মাস। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা তেরশো বাহান্ন সালের শ্রাবণে। তখন তিনি ভাগলপুরে থাকতেন। সেখানেই তাঁর নিবিষ্ট ব্যস্ত লেখার জীবন কাটে। ইংরেজি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে বেরোয় 'বাহুল্য' নামের গল্প সংকলন, বেরোয় 'অগ্নি', 'নঞ-তৎপুরুষ' উপন্যাস দুটি উনিশশো ছেচল্লিশে। বস্তুত উনিশশো তেতাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশের মধ্যেই এক সময়ে বিন্দু-বিসর্গের গল্পগুলি সংকলনভুক্ত হয়। বনফুলের বয়স তখন চুয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশের মধ্যবর্তী সময়ের কোষ্ঠীর অভিজ্ঞানে মাপা।

লক্ষ করার বিষয়, এই বিশেষ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসম্ভব অগ্নিদাহে বিশ্বমানবতার সম্যক বিনাশি স্বভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে জটিলতম একাধিক সমস্যা ও সংকটকে সামনে আনে। যুদ্ধের এমন পরিবেশ সৃষ্টির অব্যবহিত আগে থেকেই 'বিন্দু-বিসর্গ' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির প্রকাশ ঘটতে শুরু হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে আধার করে। ভাগলপুরের চিকিৎসা-পেশায় ব্যস্ত থাকতে থাকতেই তাঁর প্রতিদিনের লেখনী-স্বভাব দুই ভিন্ন মেরুগামী হয়—এক, পেশার সূত্রে আগত রোগীদের নীরোগদানের উপযোগী 'প্রেসক্রিপশন' রচনায়, দুই, বস্তুজীবন নয়, ভাবজীবনের অন্তর্মুখ প্রেরণার অনুষঙ্গে শিল্পের অভিনব রূপাবয়ব রচনায়। একজন সচেতন বিজ্ঞানী ও শিল্পী যৌথ বেগ ও আবেগে পেশা আর নেশার জগতে বিস্ময় জাগান।

এই সময়কালে বনফুল তখন 'সচিত্র ভারত' ও 'শনিবারের চিঠি'র নিয়মিত লেখক

হয়ে ওঠেন। সে সময়ের সচিত্র ভারত ও শনিবারের চিঠির পাঠকরা জানতেন—এই সব পত্রিকায় অধিকাংশ গল্প লেখা হত কৌতুক শ্লেষ ব্যঙ্গ মেশানো। শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত দাস ও সচিত্র ভারতের সম্পাদকের দৃষ্টিতে ছিল সমাজ সমালোচনা ও সমসময়বর্তী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের লেখা নিয়ে নিয়মিত ব্যঙ্গ-নিপুণ, শ্লেষাত্মক ভাব-ভাবনা মেশানো আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। এই দেশীয় ভাব-পরিবেশে নতুন করে আর এক ভাবের প্রবাহ দেখা দেয় উনিশশো আঠারো সালের রাশিয়ায় জারের শাসন ছাড়িয়ে নতুন করে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার সবল প্রকাশে। বাংলাদেশে গোপনে উনিশশো আঠাশ সালে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়। অবশ্যই তার আগে সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মেঘের স্বভাবে নতুন চেতনার জাগরণ ঘটায় শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনার সূত্র ধরে। ভারত তথা বাংলাদেশ সেই বিশ্বপ্রসারী ভাবঋদ্ধ দিককে মুখ ফিরিয়ে অস্বীকার করতে পারেনি।

'ছোটলোক' গল্পের আলোচনায় এমন সব প্রেক্ষাপট-ভাবনা অবশ্যই পাঠকদের মনোলোকে অঙ্কুর-স্বভাব পায়। বিন্দু-বিসর্গের 'পাকা রুই', 'নাথুনির মা', 'কাকের কাণ্ড', 'তপন', 'করুণা-ভাজন' 'লাল বনাত', 'ইতিহাস' ইত্যাদি গল্পে, 'বাহুল্য' গ্রন্থের 'প্রভু-ভৃত্য', 'প্রান্তর সমস্যা', 'যূথিকা' ইত্যাদি গল্পগুলিতেও যে সংক্ষিপ্তি ও চমক পাঠকমনে ব্যঞ্জনা পায়, কাঠামোর কারিগরি-বুদ্ধি বিস্ময়ও জাগায়, সবই বনফুলের সমসাময়িক মানসিকতার অনুগ। তাঁর এমন কৌতুক-ব্যঙ্গ রচনার মনটি নির্মাণে সম্পাদক-বন্ধু সজনীকান্ত দাস, পরিমল গোস্বামী—দুজন তাঁকে নানাভাবে প্রেরণা দেন। 'যখন সম্পাদক ছিলাম' এমন আত্মোক্তিমূলক রচনায় পরিমল গোস্বামী জানান : 'বনফুলকে উস্‌কে দিলে তার উৎসাহের অন্ত থাকে না। যেমন তাকে সাহিত্য-বৃত্তিকে উস্‌কানি দেওয়াতে লেখা দিয়ে সে ক্রমে বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছে, তাকে এখন ঠেকানো দুঃসাধ্য...।' এমন প্রেরণায় বনফুল যে অজস্র একই সঙ্গে ছোট ও বড় মাপের ছোটগল্প লিখেছেন, সেগুলির আকার ছোট, আরও ছোট, এবং গঠনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ছোট হতে হতে এক-একটা পোস্টকার্ডের আকারের মাপ পেয়ে যায়।

এখানেই তাঁর দেখা দেয় ব্যতিক্রমী শিল্পী-মন। বনফুল নিজেই একসময়ে বলেন, মেডিকেল ছাত্র থাকাকালীন গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করতে করতে এক একটা ছোটগল্প লিখে ফেলেছিলেন অবলীলায়। বনফুলের দৈনন্দিন জীবনধারণের তাগিদে পেশাকে তিনি ব্যস্ততার মধ্যে বিস্তৃত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করতে পারেননি, তবু এই জীবনধারণের অতি-ব্যস্ততার মধ্যে ছোট আকারের—একালের 'মিনিগল্প'-এর সংজ্ঞায়—গল্প লিখে গেছেন। প্রেরণা—সজনীকান্ত দাস ও পরিমল গোস্বামী এবং পত্র-পত্রিকার নিরন্তর চাহিদা।

ছোটগল্পের সব ক্ষেত্রে নয়, তবু সাহিত্যের বিষয়-ভাবনা ও কারিগরি কৌশল অবলম্বনে বনফুল উনিশ শতকীয় ত্রৈলোক্যনাথের বৈঠকী গল্পের উদ্ভট কল্পনার অঙ্কশায়ী কিছু কিছু মন্তব্যকে তাঁর 'মিনিগল্পে' কাজে লাগিয়েছেন পরোক্ষে, পরশুরামেব চরিত্র চাটুজ্জের কথা ধরে ছোটগল্পের টেকনিক ভেবেছেন। একালে রেস্তোরাঁ ইত্যাদির টেবিলে

শিবরামীয় চুটকি জাতীয় হাসি, শ্লেষ-এর টুকরো পাই খরিদ্দারদের আলাপ-আলোচনায়, একেবারে সাম্প্রতিক দূরদর্শনের একাধিক বিজ্ঞাপনের কাহিনী-আভাসে পাই একেবারে ছোট চেহারার এক-একটি গল্প স্বভাবের ব্যঞ্জনা—এসবই বনফুলের 'মিনিগল্প' ধরে পরোক্ষ অনুসৃতি। বনফুল এসব নিয়ে সচেতন সাহিত্য করেছেন, শিল্পরূপ দিয়েছেন।

'ছোটলোক' গল্প এভাবেই জন্ম নিয়েছে কৃতী লেখকের হাতে। আমরা যে পটভূমির কথা বললাম এই আলোচনায় প্রাক-কথন হিসেবে, তাতে এই জাতীয় গল্প লেখার মনটি বনফুলের ছোট মাপের গল্প-সমষ্টি ধরে তাঁর মানস প্রবণতার প্রেরণা জোগায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে, ১. বনফুলের বিজ্ঞানী মন ও চিকিৎসক স্বভাব রচনা করে 'প্রেসক্রিপশান', শিল্পী-স্বভাবে জন্ম নেয় রসিক পাঠকদের সাদরে গ্রহণযোগ্য 'ক্রিয়েশান'। ২. পেশা ও ব্যস্ততার মধ্যে জন্ম নেয় বলেই তাঁর গল্পগুলি হয়ে যায় ক্রমশ ছোট থেকে আরও ছোট। বড়গল্প লেখার সময় কোথায় তাঁর? ৩. সজনীকান্ত দাস ও পরিমল গোস্বামীদের বন্ধুত্ব, তাঁদের পত্রিকার 'মিশন' তাঁর ছোট চুটকি জাতীয় ছোটগল্প, শ্লেষ-ব্যঙ্গ-কৌতুককে করে নিশ্চিত লক্ষ্য। ৪. বনফুলের স্ব-কালচেতনা ছিল প্রখর। সেই কালের কাছে স্থিত হতে তিনি ছোটমাপের গল্পেও বিষয়-ভাবনায় সূক্ষ্ম প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নিয়েছেন শিল্পের তাগিদেই।

'ছোটলোক' বিশ শতকীয় সময় চেতনার সার্থক সূক্ষ্ম অভিজ্ঞানে চিহ্নিত বনফুলের শ্রেণী ভাবনার ও শ্রেণী সংঘর্ষের চরিত্রাত্মক 'মিনিগল্প'।

দুই

বনফুলের 'ছোটলোক' গল্পটি অন্যান্য এই মাপের গল্পের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে, তাঁর গল্পে টানা কাহিনী ও জোরালো ঘটনা নেই। আমাদের মতে তা থাকতে পারে না, কারণ পেশায় ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সময়ের বড় অভাব ছিল ছোট গল্পকার ও শিল্পী বনফুলের দায়বদ্ধতার দিকগুলি মেটাতে। রোগীর নীরোগ স্বাস্থ্যের প্রেসক্রিপশান হত নিখুঁত। সেখানে তাঁর মনের ভাবনার যে নিবিষ্টতা ও নিষ্ঠা, তা শিল্পীর নিষ্ঠাকে সমান মর্যাদাদানে অবসর দিল না। প্লট তথা কাহিনীর টানে স্বভাব ও ঘটনার বিচিত্র অভিঘাত ছোটগল্পের উপযোগী হওয়ার ফুরসত পেত না। ফলে ছোটমাপের গল্পে ছিল না কাহিনী ও ঘটনার নিটোল বন্ধন।

বদলে বনফুলের শিল্পী-মন একমাত্র আধার করেছিল বিশেষ বিশেষ বক্তব্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী চরিত্রদের। কাহিনী ও ঘটনা-বিবিক্ত চরিত্রের চিত্র রচনায় গল্পের কারিগরির দায় বেশি থাকে না, থাকে না কোনো ঘটনার অনুসৃতি, মনস্তত্ত্বের জটিলতম জিজ্ঞাসার একই সঙ্গে জট-পাকানো ও জট-মুক্তিরও ব্যঞ্জনাগর্ভ দিক। 'মিনিগল্প' 'ছোটলোক'-এ তাই কাহিনী একেবারেই বর্জিত। চেহারায় ও স্বভাবে রাঘব সরকার সাধারণ মানুষদের থেকে ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব। যথার্থ অর্থে পরোপকারী, কিন্তু নিজে কখনো কারোর উপকার নেয় না। বাইরের পোশাকে সাদাসিধে, নিজের শারীরিক যত্নে অন্যমন, কষ্টসহিষ্ণু, আদর্শবাদী। পথচারী এই মানুষটাকে এক দীপ্ত মধ্যাহ্নের মধ্যে অনুসরণকারী

শীর্ণ চেহারার রিকশাওয়ালা নিজের রিকশার খদ্দের করার বাসনায় একভাবে অনুসরণ ও অনুরোধ করে। নেই-আঁকড়ার মতো তার পিছু নেয়। রাঘব সরকারের দিক থেকে আদর্শ হল—কারোর কাঁধে চড়ে যাওয়া অন্যায়, পাপ, অমানবিক, তার জীবন-আদর্শের পরিপন্থী। কিন্তু নাছোড় অনুসরণকারী রিকশাওয়ালাকে দেখে একসময়ে তার দয়া জাগে। শেষে তাকে শিবতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছ'টি পয়সায় ভাড়া করে। অবশ্য শত অনুরোধেও রাঘব সরকার নিজে রিকশায় না উঠে গন্তব্য পর্যন্ত রিকশাওয়ালাকে নিয়ে যায়। পৌঁছে আগের কথামতো ছ'টি পয়সা রিকশাওয়ালাকে দিতে গেলে সে তা নিতে প্রবলভাবে অস্বীকার করে। যে আদৌ রিকশায় চড়লই না, তার কাছ থেকে ভাড়া নিতে রিকশা-শ্রমিকটি নাবাজ। কারণ যে মানুষের কাছে রিকশা চড়া পাপ, যে না চড়েই ভাড়া দেয়, তার কাছে এই মনোভঙ্গিই হল দয়ার দান। রিকশাওয়ালা আদৌ ভিক্ষার্থী নয়, খেটে-খাওয়া মানুষ। উপেক্ষা ও অবজ্ঞায় রিকশাওয়ালা ছ'টি পয়সা না নিয়েই সরকারকে ছেড়ে তার পথে আড়াল হয়ে যায়।

অতি ক্ষুদ্র এই কথাচিত্রে কাহিনী নেই, ঘটনা নেই, যেটুকু কাহিনী ও ঘটনা অস্পষ্ট স্বভাবে মেলে, তা দুটি চরিত্রের ভিতরেই তৈরি হওয়া—চরিত্রের ছায়ার মতো। এখানে প্লটের বন্ধন বাইরে নয় চরিত্র দু'টির ভিতরে। যেনবা একটা 'থিম' হয়েছে এমন মিনিগল্পের কেন্দ্রিত শক্তি। দুপুর রোদে রাঘব সরকার ও রিকশাওয়ালার হঠাৎ সাক্ষাৎ পরিবেশ ও চরিত্রধর্মেই আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠেছে। সত্যিকারের আদর্শ ছোটগল্পের যে বাঁধন তা এখানে প্রয়োজনহীন। যতই রোদের মধ্যাহ্নে দীপ্তির পরিবেশ থাক, মানুষ কাজে বেরুবেই। রিকশাওয়ালা তাকেই তার পেশার খরিদ্দার হিসেবে কাঙ্ক্ষিত করে। এই যে পথে দুজনের হঠাৎ দেখা—তা হঠাৎ নয়, পরিবেশের বাধ্যতার নিয়মানুগ ফল। সূক্ষ্ম এই কাহিনী-আভাস চরিত্রের ছায়া-চরিত্র থেকে বিচিত্র কোনো বিষয় নয়।

এই দুজনের সাক্ষাতের পর থেকেই গল্পের গতি দ্রুত। এই দ্রুতিও দুই চরিত্রের বিপরীত ভাবের সংঘাতনির্ভর। গল্পটির প্রথম দিকে রাঘব সরকারের মনে 'দয়ার সঞ্চার' হওয়া থেকে শুরু হয়ে 'রিকশা চড়া পাপ' এই সংলাপ-বচন পর্যন্ত অংশটির চিত্র স্বভাব নির্মিত হয় রাঘব সরকারের চরিত্র-ন্যায় ধরেই। এই অংশে রাঘব সরকার 'অ্যাকটিভ', বিকশাওয়ালা 'প্যাসিভ'। বাবুর কাছে রিকশা শ্রমিকটি ব্যবসায়ী, শ্রমিকের স্বভাবে বিনীত। এর পরেই—'ও। তা আগে বলতেই পারতেন', এখান থেকে শেষ রিকশাওয়ালার অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত রাঘব সরকারের থেকে কাহিনীর ছায়া শ্রমিকের চরিত্র-ধর্মে তৈরি হয়ে উঠেছে। অতি সূক্ষ্ম কাহিনীর পরিণতিমুখীন দ্রুত স্বভাব মিনিগল্পের অতি-গৌরবের প্রতিষ্ঠা দেয়। এমন ছোটগল্পে বনফুলের সূক্ষ্ম কারিগরির দিক বিস্ময়কর সংযমে, সংক্ষিপ্তিতে ও স্বতঃস্ফূর্ততায়।

বনফুল আরও, ছোটগল্পে যে যথার্থ বডগল্পের সংযম সীমা আনতে পেরেছেন, এখানেই তাঁর গল্পকার স্বভাবের আতস কাঁচের বিচিত্র বর্ণের আলো। এমন ছোটগল্পের কাঠামোর মধ্যে মেলে সেই চরমমুহূর্ত (climax), সেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভিতরে আড়াল

করা ট্র্যাজেডির বিবাদ ও বাঞ্ছিত আলো। 'ছোটলোক' গল্পটির ক্লাইম্যাক্সের চকিত চমক শুরু হয়েছে 'হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।'—এমন বাক্য থেকে ক্লাইম্যাক্স অংশের প্রসার ও অন্তিম পূর্ণচ্ছেদ রাঘব সরকারের রিকশাওয়ালাকে বলা 'আচ্ছা আয়',—এমন দুটি শব্দের সিদ্ধান্ত-ব্যঞ্জনার শব্দ স্বভাবে। গল্পটির গঠনে লক্ষ করার মতো দিক—প্রথম থেকে শেষের আগে পর্যন্ত রাঘব সরকারই গতি সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে সচল থেকেছে, শেষে রাঘব পরাজিত, জয়ী হয়েছে রিকশাওয়ালা—লেখকের মূল লক্ষ্যের চরিত্র—রিকশাওয়ালা—সেই 'ছোটলোক'।

মনে রাখা দরকার, 'ছোটলোক' চরিত্রাত্মক গল্প। এর একজন কেন্দ্রীয় চরিত্র—রিকশাওয়ালা, অন্যজন প্রধান চরিত্র—রাঘব সরকার। ছায়া-কাহিনীর ও প্লটের তাই দুটি ভাগ—রাঘব সরকার প্রসঙ্গ, তা সরে গিয়ে শেষে রিকশাওয়ালা প্রসঙ্গ। তাই কাহিনী ও ঘটনা হয়েছে গৌণ। আর চরিত্রকে দিয়েই গল্পের সামগ্রিক কায়া গঠনে বনফুল তাঁর মিনিগল্পে এক অদ্বিতীয় শিল্পী-পুরুষ। ডাক্তারি বিজ্ঞানের নিখুঁত 'প্রেসক্রিপশান' শুধু রোগীর প্রাণদানেই শেষ হয়নি, শিল্পরসিক, সহৃদয় পাঠকদের মধ্যে 'প্রাণবান সত্তা'র চলন ধর্মে তাকে স্বাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন বনফুল। সে স্বাদ আনন্দের স্বভাবে চিরন্তন। 'ছোটলোক' গল্পের কায়া গঠন, বৃত্ত পরিকল্পনা, পরিণতিচিত্র, চরিত্র-চিত্রের 'থিমে'ই অভিনব। বনফুল এত ছোট মাপের গল্পে এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম পথিকৃৎ।

তিন

আমরা আবার স্মরণ করি, বনফুলের 'বিন্দু-বিসর্গ' গল্প সংকলনের প্রকাশকাল ধরে 'ছোটলোক' নামের গল্পটির সম্ভাব্য রচনাকাল। 'ছোটলোক' নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের রচনা। তাই এর মধ্যে সমকালের নবাগত ও দীক্ষিত সাম্যবাদীদের নানান কাজকর্ম, নীতিগত ভাবের প্রয়োগ ও প্রক্রিয়ার উত্তাপ থাকা অসম্ভব নয়। আমাদের আলোচনায় তার প্রসঙ্গ উল্লেখও অন্যায্য হতে পারে না। সে সময়ে সাম্যবাদীরা নবাগত মত ও পথে গভীর-জড়িত থেকে যেমন যুদ্ধের প্রবলতম বিরোধী পক্ষ হয়ে ওঠে, তেমনি তত্ত্বগতভাবে সমাজের বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে 'শ্রেণী', 'শ্রেণী-সংগ্রাম' ইত্যাদির বিশুদ্ধ ভাবনায় বুঝিবা ব্রতধারী হয়ে ওঠে।

মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্বে সে সময়ে প্রধান লক্ষ্য হয় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের শাসন-শোষণে পর্যুদস্ত বুর্জোয়া সমাজের অসহায়তা ও নিষ্ফলত্বের দিক। শাসকরা তখন বুর্জোয়া সমাজকেই জিইয়ে রাখে আপ্রাণ। এতে বড় সুবিধা তাদের বিভেদের চরম অব্যবস্থায় শৃঙ্খলিত রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির সফল প্রয়োগে। যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ভাবনা তখন সারা ভারত তথা বাংলাদেশে শিকড় গেড়ে উপস্থিত তা শ্রেণী-বৈষম্যের, শ্রেণী-সংঘাতের। বুর্জোয়া অর্থনীতির ভিতরের স্বরূপ বালির স্তূপের মতো মানুষের বেঁচে থাকার জীবনকে দেয় ভঙ্গুর অন্ধকারতম জীবনরূপের রুদ্ধশ্বাস অবয়ব, প্রত্যয়। সাধারণ মানুষ 'শ্রেণী' শব্দের অর্থ বুঝতে অভ্যস্ত এইভাবে—গরিব-

ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধার্মিক-অধার্মিক এমন সব অভিধায়। কিন্তু নবাগত সাম্যবাদী ধারণার মার্কসীয় ব্যাখ্যায় 'শ্রেণী' হল সামাজিক মানুষের এক-একটি গোষ্ঠী—যাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আর একটি গোষ্ঠীর শ্রমের অংশ ও ফল ভোগ করতে পারে। শ্রমজীবী মানুষবা এইভাবে নিজ নিজ গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। পুরনো সমাজ-প্রণালী ও ন্যায়ের ধারায় এমন শ্রমের ভাগ ও অধিকার চেতনা স্বীকৃত হয়। 'শ্রেণী' প্রসঙ্গে কথাটি এইভাবে সাজানো যায়—মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া) অর্থনীতি ও সমাজনীতি বোঝায়—সমাজ-মানুষের বড় বড় গোষ্ঠীই হল এক-একটি শ্রেণী—যারা একে অন্যের থেকে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যে একক।

'ছোটলোক' গল্পে রাজীব সরকার ও নামহীন রিকশা-শ্রমিক দুই শ্রেণীর আশ্রিত সমাজ-মানুষ। দুজনের বাঁচার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য দ্বিমুখী। রাজীব সরকার বুর্জোয়া শ্রেণীর, রিকশা-শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর। যুদ্ধ-সমকালে লেখা এই গল্পে বনফুল দুটি চরিত্র নিয়ে কেন্দ্রীয় 'থিম' রচনায় এরকম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কথা যে ভাবেননি, বা সময়ের দাবিতে প্রভাবিত হননি, একথা বলা যাবে না। যে কোনো বড় লেখক কাল সচেতন হতে বাধ্য, কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছেন কিনা, তা পরের ভাবনা। প্রখ্যাত চিনা সাম্যবাদী তাত্ত্বিক লিউ শাও চি ভেবেছিলেন, সাম্যবাদী শ্রমিক-বিপ্লব ঘটাতে হলে শ্রমিক-সাম্যবাদীকে আত্মসংগঠনে 'নিজেকে ইস্পাতের মতো করে তুলতে হবে।' গল্পে রিকশা-শ্রমিকের মতো একজন সচেতন শ্রমিক থাকার কারণেই শ্রমিক-বিপ্লবে কট্টর বিশ্বাসী ও নিবেদিত প্রাণ মাও-সে-তুং জানান—'কর্মের মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করো; আবার কর্মের মধ্য দিয়েই সত্যকে যাচাই করো ও বিকশিত করো।' সাম্যবাদী তত্ত্বে এরকম বিশ্বাসও গভীর মৃত্তিকা-প্রোথিত : 'শ্রমিক বিপ্লব সমস্ত শোষণ, পীড়ন ও শ্রেণী বিলুপ্ত করার বিপ্লব। ... শ্রমিক শ্রেণী নিজেরা শোষিত, কিন্তু অন্যকে শোষণ করে না, . . .। '

বনফুলের রিকশা-শ্রমিকটি বিপ্লবের কথা ভাবে না, কিন্তু তার ভিতরের ব্যক্তিত্বের ইস্পাত-কঠিন প্রতিবাদে, উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় আগামী দিনের সাচ্চা দ্রোহ-বুদ্ধির অধিকারী হয়ে উঠেছে সে—এই ধারণা অমূলক নয়। যুদ্ধ সমকালের প্রেক্ষিতে রিকশা-শ্রমিকের বিস্ময়কর আচরণ সাম্যবাদী শ্রমিক-ভাবনার স্বচ্ছ আলোকমূর্তি দেখায়। যুদ্ধ-সমকালে ছিল ধনতন্ত্রী সমাজ, সেখানে রিকশা-শ্রমিকটির মাথা উঁচু করা বাচনভঙ্গি কালের নতুন ধারারই সৃষ্টি যেনবা! গল্পের রিকশা-শ্রমিকটি সর্বহারা শ্রেণীর। বনফুল কি সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতার কথা ভাবেননি, প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে? গল্পে রাজীব সরকার রিকশা-শ্রমিকটিকে বুর্জোয়া সমাজ-মানুষের স্বভাবেই নীচু শ্রেণীকে দয়া দেখানোর মানসিকতায় বুঝতে চেয়েছে। রাজীব সরকার বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি, রিকশা-শ্রমিক 'প্রোলেতারিয়েত'দের এক পূর্বসূরি—সময় এলে এর মতো মানুষরাই একদিন বিপ্লবে সামিল হবে। এই সম্ভাবনায় রাজীব সরকার ও রিকশাওয়ালা মূল 'থিমে'র কেন্দ্রে পরস্পর বিপরীত ভাবধারার প্রতীক-স্বভাব পেয়ে যায়।

রাজীব সরকার যতই মানবিক বোধসম্পন্ন হোক না কেন, তার আচরণ, ধ্যান-ধারণা

বুর্জোয়া মানসিকতার অনুগ, আর অনুগ বলেই সর্বহারা শ্রমিকটির প্রতি সে দয়া দেখাতে কার্পণ্য করেনি। কাউকে দয়া করা, ভিক্ষা দান বা ভিক্ষাকেই বকলমে উপকার করার মানসিকতার প্রকাশ্যেই মেলে মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরম পরাকাষ্ঠা। সে রিকশাওয়ালার সঙ্গে পয়সার চুক্তি করে নিজের আদর্শের প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেই। রিকশা চড়ে না, রিকশা চড়া পাপ—এই সব Ideology তাকে মধ্যবিত্ত মানসিকতার অনুরূপে অযাচিত দয়া-দাক্ষিণ্যে প্রমাণ করতে চায়। তার কাছে রিকশা-শ্রমিক নিচুস্তরের মানুষ, একজন ছোটলোক। তাই তার আচরণে শ্রমিকটির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার দিক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ছ'টি পয়সা পকেট থেকে বার করে এনে সে বলে, 'এই নে'। বলে, 'পয়সাটা নিয়ে যা', রিকশা না চড়ে বার বার একই কথা বলে, 'তুই আয় না'। এমন সব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো শব্দ ও সম্বোধনাত্মক সর্বনামে রাঘব সরকার অবশ্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আচরণ প্রকট করে।

পাশাপাশি আগাগোড়া রিকশাওয়ালা করেছে 'আপনি' সম্বোধন। সে রিকশা-শ্রমিক হলেও কথায় নিজের এক্তিয়ার ছাড়ে না, অতিক্রম করে না। গল্পটিতে রাঘব সরকার ও রিকশা-শ্রমিকের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার দ্বন্দ্ব, উভয় পক্ষের আত্মাদর ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব প্রত্যেকের জীবনাদর্শের সূত্রে—যেখানে দুই শ্রেণীর নবাগত সংঘাত-সংঘর্যই মনোলোকের বিকাশের বৈপরীত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। অহং-বোধ প্রকৃতপক্ষে দুই শ্রেণীরই আছে। কিন্তু রাঘব সরকারের যে অহংবোধ—তা তার নিজস্ব বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা। রিকশা-শ্রমিকের যে অহং চেতনা—তা তার নবজাগ্রত ব্যক্তিত্বের যেনবা শুভ উদ্বোধন এ গল্পে। গল্পের সব শেষে মেলে মধ্যবিত্তের নয়, সর্বহারা শ্রেণীরই দাবিতে আত্মিক সাহস ও সদিচ্ছার নবজাগরণ। এক কর্মিষ্ঠ মানুষ, শ্রমিক মানুষ জীবনে কর্মসংস্কৃতির বিনিময়ে সুস্থ বাঁচার কথা ভাবে, যেখানে তার পক্ষে ভিক্ষার অপমান অসহনীয়। 'ছোটলোক' গল্পের পরস্পরের শেষ দু'টি বাক্যের সংলাপ-বিনিময় অতি সংক্ষিপ্ত এবং গল্পটির মধ্যেকার 'থিম'-নির্ভর কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের প্রকাশক। 'ছোটলোক' গল্পে শ্রমিক-শ্রেণীর শ্রম-নির্ভর কর্ম-কাণ্ডের প্রতি গভীর আন্তর, সনিষ্ঠ, জীবনমুখিন বিশ্বাস—তা সর্বহারা শ্রেণীর উৎস-মুখ চিহ্নিত করে। রাঘব সরকারের Ideology সর্বহারা শ্রেণীর decision এ নতুন ঊষার রক্তিম আকাশের প্রথম আলোর ঝলকানি দেয়।

চার

কল্লোলীয় লেখক নন বনফুল, কিন্তু তিরিশের দশকের কিছু আগে থেকে বাংলা ছোটগল্পের পদসঞ্চারে তাঁর দেখা মানুষজনকে নিয়ে গল্প সাজিয়েছেন, গল্পের চরিত্রদের টীকা-ভাষ্যে নতুন কথা বলতে চেয়েছেন। এসময়ে আর এক অ-কল্লোলীয় কথাকার, বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিশাল স্তম্ভ তারাশঙ্কর চরিত্রকে ধরেই তাঁর গল্প-উপন্যাসের কথা ভেবে গেছেন। 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—এ ছিল তারাশঙ্করের মানুষ সম্পর্কে শিল্পের 'ম্যানডেট্'। তারাশঙ্করের কাছে চরিত্রই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার

রূপরূপায়ণে বড় আধার। বনফুলেরও তা-ই। প্রায় একই সময়ে লিখতে বসে দুজনেই তিরিশের দশক ধরে পরবর্তী যুদ্ধোত্তর কালের রচনায় চরিত্র-প্রাধান্যে স্থিত থেকেছেন।

'ছোটলোক' গল্পে সেই চরিত্রই লেখককে প্রাণিত করে তাদের কথা বলতে। বনফুল ছিলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক—রূঢ় বাস্তব নরনারী ছিল তাঁর লেখার উপাদান সরবরাহের বড় মাপের agent। তারাশঙ্কর এমন মানুষ পেয়েছেন তাঁর বীরভূম অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাটি থেকে, বনফুল লিখেছেন গ্রামীণ মানুষজন নয়, Urban জীবনধর্মে বিশিষ্ট বেছে নেওয়া জনমানুষ। রাঘব সরকার শহরেরই মধ্যবিত্ত মানুষ। তিরিশের দশকে ছিল লেখকদের মধ্যে রোমান্টিক আদর্শ-চেতনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার—এঁরা রোমান্টিসিজমের খোলস ত্যাগ করে বাস্তব মানুষজনের কথা ভেবেছেন কমবেশি। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শহর, গ্রাম মিলিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা মতো মানুষকে নিয়েছেন, বনফুল সেক্ষেত্রে ছিলেন বেশি আদর্শবাদী। তাই রাঘব সরকার মূলগতভাবে আদর্শবাদী হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে।

'ছোটলোক' গল্পের প্রথমেই চিত্রের স্বভাবে এসেছে রাঘব সরকার। চিত্রটি একটি অনুচ্ছেদে রচিত—যার মধ্যে মেলে রাঘব সরকারের বাইরের রূপ। সত্যিকারের মাথা-উঁচু ব্যক্তিত্বের মানুষ, খর রোদকে উপেক্ষা-করা বয়সের তেজ ও সাহস তার মধ্যে মেলে। পোশাক-আশাক খদ্দরের, মাথায় ছাতার আড়াল নেই, পায়ের জুতা জীর্ণ—শুধু দ্রুত নয় স্বাভাবিকভাবে হাঁটার পক্ষেও তা একান্ত অন্তরায়। এর পরেই লেখকের নিজস্ব বর্ণনা তার ব্যক্তিত্বের—কঠিন নীতিবিদ, বিশেষভাবে পরোপকারী, কিন্তু নিজে কারো কাছ থেকে উপকার নেয় না। তার জীবনের সাধনাই হল সর্বদিকেই মাথা উঁচু করে জীবন-অতিবাহন। এমন রৌদ্রদীপ্ত দুপুরে যখন এক রিকশাওয়ালা তাকে রিকশা নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ী অনুরোধ করে, সে তার অনুরোধ তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেয়। এ যেন আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই প্রসিদ্ধ উক্তির বাস্তব প্রয়োগ : 'As I would not be a slave so I would not be a master.'

কিন্তু রিকশা-শ্রমিকের অস্থিচর্মসার চেহারা ও শেষে তার রিকশায় যাত্রী নিয়ে দিনের গ্রাসাচ্ছাদনের, অনাহারের দিন কাটানোর কথা ভেবে একসময়ে রিকশা ভাড়া করে, কিন্তু না উঠে সঙ্গে নিয়ে যায় গন্তব্য পর্যন্ত। এই অংশেই মেলে রাঘব সরকারের একসঙ্গে বৃহৎ মানবতাবোধ ও ক্রমশ বুর্জোয়া মানসিকতার প্রকাশ। রিকশা-শ্রমিকটি একজন সচেতন মানুষ, সেও একজন মানুষ। একজন মানুষ হয়ে আর একজন মানুষের কাঁধে চেপে যাওয়া ঘোরতর অমানবিক। কোনোদিন রাঘব সরকার তো রিকশা শ্রমিকের মতো মানুষকে কাঁধে নিতে পারবে না। এমন মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ন্যায়ে রাঘব সরকার বড় মানবতার সম্পূর্ণ সমর্থক। এই চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই বৃহত্তর মানবিকতাবোধ, তথা বিশ্বজনীন মানবতাবোধের যথোচিত অভিজ্ঞান।

দ্বিতীয়ত, এই সূত্র ধরে রাঘব সরকারের পরবর্তী আচরণ বুর্জোয়া মনের অনুপন্থী হয়ে ওঠে। মানুষের অসহায়তার দিকে দেখে তাকে করুণা করা মধ্যবিত্ত মনোধর্মের পরিচায়ক।

এতে সমস্ত দারিদ্র্য, সর্বহারাদের ওপর যাবতীয় অত্যাচারের মতবাদকে সরিয়ে রাঘব সরকার রিকশা-শ্রমিকের প্রতি করুণা করে। তাকে সাহায্য করতে তৎপর হয়।

তৃতীয়ত, রাঘব সরকারের মধ্যে জন্ম নেয় দয়ার ভাব। 'হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল'। যে মানুষ কোনোমতেই রিকশা, পালকিতে বাহিত হওয়ার বিরোধী, যে কেবল দয়া পরবশ হয়ে রিকশা সঙ্গে নেয়, বুর্জোয়া মানসিকতার প্রয়োগ রাঘব চরিত্র ধরে এই বৈশিষ্ট্যে মেলে।

চতুর্থত, রাঘব যে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ নয়, তার পরিচয় মেলে রিকশার ভাড়া সম্পর্কিত প্রসঙ্গ তোলার মধ্যে। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ রিকশা ভাড়া করার সময় দরকষাকষি করে নিখুঁত চাল বা কৌশলে। ছ'পয়সার জায়গায় পাঁচ বা চার পয়সার রফা করার মতো শোষণ-সুলভ জিদও ধরে। রাঘব সরকার তা করেনি। কারণ রাঘব সরকারের মধ্যে সত্যিকারের এক অভিজাত মধ্যবিত্ত মন আছে। এখানেই চরিত্রটির আর এক বাস্তবতা।

পঞ্চমত, রিকশায় না চড়ে রাঘব সরকার পয়সা দিতে চায়, এখানে সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা যা তাকে ভুলিয়ে দেয় এই অবস্থায় ভাড়া-মেটানোর অর্থই হল ভিক্ষা দেওয়া — যা দয়া দেখানোর আর এক বাস্তব উপায়, তথাকথিত পরোপকার করার মানসিকতা। 'আমি রিকশা চড়ি না' 'রিকশা চড়া পাপ' এমন কথায় তার আদর্শের ঘোষণা আছে, মানবতার প্রমাণও মেলে, কিন্তু তার পোষণ ও প্রকাশে আছে সেই 'টিপিক্যাল' বুর্জোয়া ভঙ্গি।

তাই 'ছোটলোক' গল্পে রাঘব সরকার একজন বুর্জোয়া রোমান্টিক আদর্শবাদী চরিত্র। তার বুর্জোয়া স্বভাব মেলে রিকশার শ্রমিকের প্রতি তুচ্ছার্থবোধক সংলাপ প্রয়োগে। 'ক পয়সা নিবি', 'আচ্ছা, আয়', 'তুই আয় না' পয়সা দেওয়ার উপক্রমে 'এই নে', শেষে 'পয়সাটা নিয়ে যা'—এমন সব ব্যবহার সর্বহারা শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ককে তুচ্ছ করা পরিচিত বুর্জোয়া ভাষা-ভঙ্গিই। সংসারে যারা অবহেলিত, তুচ্ছ জাত-পাতে অস্পৃশ্য, অর্থনীতিতে তার কৌলীন্যে একেবারে ভাঙামানুষ, তাদের প্রতি অবজ্ঞায় বুর্জোয়া শ্রেণীর আচরণ এমনি অপমানকর।

বনফুল গল্পের শেষে প্রধান চরিত্র রাঘব সরকারের এক নীরব অপমানের অসম্মানের বাতাবরণ রচনা করেছেন। তার অহংবোধ নিষ্ঠুর ধাক্কা খেয়েছে রিকশা-শ্রমিকের কাছে। বস্তুত সমগ্র গল্পটি দুই অ-সম ব্যক্তিত্বের সংঘাত চিত্র যেমন, তেমনি দুই বিপরীত শ্রেণীর আত্ম-সচেতন, অহংবোধ ও দ্বন্দ্বের নিপুণ ভাষাচিত্র! গল্পের 'থিমে'র অন্তর্নিহিত নিখুঁত স্বভাব মেলে রাঘব সরকারের Ideologyতে, Decision মেলে রিকশা-শ্রমিকের কথায় ও আচরণে। রিকশা-শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্যই হল হাতের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যাত্রী ধরা। তাদের প্রতিদিনের উপায়ে তাদের চলে জীবন অতিবাহন, দিন গুজরান। তাই দুপুরে একা দ্রুতগতি, ঘর্মাক্ত রাঘব সরকারকে দেখে রিকশা-শ্রমিকের মনে যেমন, ১. যাত্রী ধরার বাসনা কাজ করে, তেমনি হয়তো ২. একটি মানুষের প্রতি তাৎক্ষণিক সাহায্য করার মতো কিছু সহানুভূতির মনও থাকতে পারে! অন্তত তিরিশের ও চল্লিশের দশকে এ জাতীয় মানসিকতা রিকশা-শ্রমিকদের পক্ষে থাকাটা বাস্তবত অসম্ভব ছিল না।

রাঘব সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন রিকশা-শ্রমিকটি পিছু পিছু আসে এবং যখন 'ঘণ্টা বাজাইয়া রিকশাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই। কোথায় যাবেন!' — তখন শুধু যাত্রীভাড়ার পয়সাটুকু পাওয়ার বাসনা ছাড়াও এমন আচরণের অধিতলে আছে সূক্ষ্মতম মানবিকতাবোধ, প্রচ্ছন্ন মমতা ও সহানুভূতিবোধ রিকশা-শ্রমিকের দিক থেকে।

এমন রিকশাওয়ালা রাঘবের দৃষ্টিতে 'অস্থিচর্মসার লোকটা', ' লোলুপ দৃষ্টি'র 'বেচারা' স্বভাবের। অথচ এই সর্বহারা মানুষটির মনের মধ্যে আছে এক উজ্জ্বল অহংবোধ। যে সর্বহারা মানুষটির ছিল কিছু আগে বিনয়, উপায়-ভাবনার ও অতিরিক্ততার তাৎপর্যে যাত্রীর প্রতি মমতাময় মন, সে হয়ে ওঠে উন্নত মস্তক। এই সেই মানুষ যে প্রতিবাদী হয় এমন কথায়—'তা আগে বললেই পারতেন'। রিকশা-শ্রমিকটি কর্মিষ্ঠ পুরুষ, শ্রম দিয়ে দিনযাপনের, প্রাণধারণের সঙ্গতি সম্পদ উপার্জন করে, ভিক্ষা সে করে না। তার কাছে বিনা শ্রমে রাঘবের ভাড়ার পয়সা নেওয়ার অর্থই হল ভিক্ষাগ্রহণ।

রিকশাচালকের দিক থেকে অনেকে এমনও ভাবতে পারে, রাঘব সরকার যখন ভাড়া করেও রিকশায় উঠছে না, তখন নিজে থেকেই তার পিছু না নিয়ে বিরত হওয়া ও অন্য দিকে চলে যাওয়া—চরিত্রটির বাস্তবতার দিক থেকে শিল্পসম্মত হতে পারত। কিন্তু, আমাদের মতে, গল্পে তা না থাকলেও, এমন অনেক সময় হয়, যখন কোনো কোনো মানুষ বাড়ির কোনো যাত্রীর প্রয়োজনে দূর থেকে রিকশা ডেকে আনে নিজে চড়ে বা তাকে বাড়ি পর্যন্ত হাঁটিয়ে। গল্পের রিকশাওয়ালার কাছে সে রকম কোনো প্রস্তাব পরোক্ষে ছিল না। কিন্তু আমাদের এই সম্ভাব্য ভাবনার কোনো ভিত্তি না থাকলেও শ্রমিকটির আচরণে এক কৌতূহলও থেকে যায়। ছটি পয়সা রোজগারের জরুরি দিকের সঙ্গে রাঘব সরকারের আচরণে প্রচ্ছন্ন কৌতূহল ও পরিণতি বোঝার উৎসাহ শ্রমিকটিকে যাত্রীর পিছু ছাড়ার অন্তরায় করে কিছুটা।

আগেই বলেছি, এমন ছোটমাপের গল্পে রিকশাওয়ালাই মূল গল্পের 'সিদ্ধান্ত'। 'ও! তা আগেই বলতে পারতেন।'— এমন যুক্তি দেওয়ার মধ্যে শ্রমিকটির পরিবর্তিত অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হতে শুরু করে। সে সাধারণ রিকশা-শ্রমিক নয়, যে এতকাল যাত্রীদের অবহেলা, ভাড়া দেওয়ার পক্ষে দর-কষাকষির স্বার্থপর ভাবনাকে মেনে নিয়েছে। এ যেন এতকাল শোষিত শ্রমিকদের পক্ষে বুর্জোয়া শোষকদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর দ্রোহ-স্বভাবেব দিক। এর প্রমাণ আছে রাঘব সরকারের প্রতি শেষতম আচরণের সচিত্র কয়েকটি বাক্যে: ১. 'লোকটার চোখে-মুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল'। ২. 'সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।' ৩. 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না।'

ব্যবসাশাস্ত্রে, পেশার সম্পর্কে খদ্দের জাতীয় মানুষ হল ' লক্ষ্মী', মঙ্গল। আয়-সংক্রান্ত যোগাযোগে একজন খদ্দের মানুষ ক্রমশ আপন হয়ে যায়। কিন্তু গল্পের রিকশা-শ্রমিকের চোখেমুখে যে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তঃশীল ধিক্কার জাতীয় অবজ্ঞার, অসম্মানের ভাব জন্ম নেয়, তার স্বাদ ভিন্ন। এতকালের বুর্জোয়া সংস্কৃতির কাম্য দাস-মনোভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। রাঘব সরকারের মতো উন্নত মস্তক ব্যক্তির মুকুটে যেন বা প্রতিবাদী আচরণের

কালি ছিটানো। এটা এককালে মনে হত নিচু শ্রেণীর স্পর্ধা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে নানান আন্দোলন ও গণজাগরণের মধ্যে তা স্বাভাবিক, মান্য। শরীরের 'ঘাম' হল একজন মানুষের কর্ম-সংস্কৃতির যোগ্য প্রতীক। রিকশাওয়ালা ঘাম মুছে যখন রাঘব সরকারকে ছেড়ে চলে যেতে থাকে, তা তখন তার নতুন করে কর্মের উদ্যোগে নিবিষ্ট হওয়াটাই প্রমাণ করে। একজন যাত্রী তার কাছে কিছুই নয়, তার কর্মই তার জীবন, তার আশ্রয়, তার বাঁচার বড় দিক। এই বিশ্বাসে ও স্বভাবের তেজে, আত্মশক্তির, আত্মার বাসনা থেকে সরে এসে আত্মোপলব্ধির বড় দিক প্রমাণ করে। সে বুঝে যায়, কর্মহীন অবস্থায় থেকে অর্থ নেওয়া হল ভিক্ষাগ্রহণ।

রাঘব সরকারের প্রাথমিক সহানুভূতি অবশ্যই মানবিক, কিন্তু যখনই তা হয় করুণা, তা থেকে দয়া দেখা দেয়, তা থেকে উপকার করার অভিপ্রায়ে সওয়ার না হওয়া সত্ত্বেও ভাড়া দেওয়ার মনোভঙ্গি, তা এতকালের বুর্জোয়া সংস্কৃতি অনুগ হয়। এই বিশেষ মনোভঙ্গি একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষাদানেরই সমতুল, অপমানকর রিকশা-শ্রমিকের কাছে। এটাই অসহায় মানুষের প্রতি একদল মানুষের প্রেম নয় দয়ার সূত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অবমাননার অপমান করার দিক। রিকশা-শ্রমিকের সচেতন ব্যক্তিত্বে সেখানেই আঘাত। এই যে উদ্ধত ভঙ্গি তা তার নবব্যক্তিত্বের উদ্বোধক। 'ছোটলোক' গল্পে দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যেকার সম্পর্কের সমস্যা ও সংকটের পরিণতি ঘটেছে রাঘব সরকারের পরোক্ষে নৈতিক পরাজয়ে। এতদিনের উন্নতমস্তক এই ব্যক্তি তথা শ্রেণীর অহংকার যে ধূলিলুণ্ঠিত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে, পরিণতিচিত্র তারই পরিচায়ক। লেখক গল্পে রিকশা-শ্রমিকের ব্যঞ্জনাগর্ভ শেষ সংলাপের পর রাঘব সরকারের দিক থেকে কোনো যুক্তি বা কথা বসাননি। এটি মিনি গল্প—আর কিছু বলার দরকারও ছিল না। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তার অদৃশ্য হওয়ার আচরণেই এতকালের 'মৌরসী পাট্টা'র স্বভাবে উঁচু শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, অস্বীকার, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রমাণ হয়ে যায়। এভাবেই এক ব্যক্তি তথা শ্রেণীর ঘটেছে বিষাদময় অসহায়তা ও পরাজয়। বিজেতা হল রিকশা-শ্রমিক। যথোচিত জবাব ও আচরণে সে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের গরিমা বজায় রেখেছে লেখকের লক্ষ্যের অনুসারী করে। রাঘব সরকারের যে নৈতিক পতন, আদর্শের যে limitation—তা গল্পের পরিণামে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির একমাত্র সহায়ক। এই গল্পে মনস্তত্ত্ব সোজা অর্থে নেই ঠিকই, কিন্তু মনের ক্রিয়ায় একজন মানুষ যেভাবে নিজেকে গড়ে তোলে, তার নিস্ফলত্ব, সীমাবদ্ধতা তার জীবন-আদর্শ ও আচরণের ভ্রান্তি আনে, রিকশা-শ্রমিকের পাশে বনফুল অতি সার্থকভাবে তা এঁকেছেন। 'ছোটলোক' গল্পটি প্রগতিশীল সময়ের ও সমস্যার নিপুণ শিল্পিত প্রতিচিত্রণ।

পাঁচ

'ছোটলোক' গল্পের অবয়ব যে কোনো শিল্প-সার্থক গল্পেরই অল্পবিস্তর প্রামাণ্য প্রকরণ সুষমা। গল্পের মূল বিষয় দুটি চরিত্রের প্রত্যেকটির Individual ও type—দুই অলংকৃত

রূপকে মেনেই dynamic হয়েছে। এমন মিনিগল্পে action-এর তীব্রতা বিস্ময়করভাবে পরিণামী ব্যঞ্জনার পক্ষে উদ্দীপন স্বভাব নেবে। দ্রুততা, সংক্ষিপ্তি, বাহুল্য বর্জন, প্রতীকধর্ম, রুদ্ধশ্বাস বুনোট-এর চুম্বক আকর্ষণকে এই গল্পের প্রকবণ করলে নিশ্চিত তা অলংকার। ভাবের একমুখিনতা অবশ্যই হবে মান্য। মিনিগল্প যেন বা এক-একটি একাঙ্কের ক্ষীর-স্বভাব নির্যাস। গল্পের প্রথমেই আছে 'দ্বিপ্রহরে নিদারুণ রৌদ্র'-এর পরিবেশ। অল্প চিত্র-স্বভাবে প্রধান চরিত্র রাঘব সরকারের স্বভাব বোঝাতেই এমন সংক্ষিপ্ত প্রকৃতি -খণ্ড। কৃতবিদ্য চরিত্রটির মধ্যে মানবতাবাদের জন্ম ও আদর্শের রূপাঙ্কন, করুণা ও দয়াভাবের প্রকাশ, পয়সা দিয়ে উপকারের ধর্মে ভিক্ষা দেওয়ার প্রচ্ছন্ন স্বভাব—এসব লেখক এঁকেছেন অতি ছোট ছোট বাক্য, সংলাপ ও স্বভাবধর্মে। এই প্রকরণ গল্পটির শিল্প-প্রকরণের বড় সম্পদ।

গল্পটি আগাগোড়া সাধুগদ্যে লেখা, সংলাপে আছে চলতি তথা কথ্যরীতি। গল্পের বাস্তবতা রক্ষায় এই রীতি অবশ্যই সার্থক। দুই ভিন্ন মানসিকতার মানুষ বোঝাতে রিকশাওয়ালার কথায় 'আপনি' ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগে বিনয়-নম্র সম্ভ্রম জাগানো ও রাঘব সরকারের পক্ষে 'তুই', 'আয়', 'নে', 'নিয়ে যা' এমন তুচ্ছার্থক শব্দপ্রয়োগে শ্রেণী-বৈষম্যের প্রাথমিক রূপকে চমৎকার তুলে ধরে। গল্পের বর্ণনার টেকনিকে স্বয়ং লেখককে দুবার উপস্থিত হতে দেখি। গল্পের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ তার প্রথম অন্যতম প্রমাণ। তা রাঘব সরকারকে বোঝানোর উপায়। আবার পরে লেখক যখন নিজেই পাঠকদের জানাতে বসেন—'মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।'—তখন মিনিগল্পের মধ্যে Repeatition বন্ধে লেখকের শিল্প-সচেতনা ও সতর্কতা ধরা পড়ে। রাঘব সরকার ও রিকশা-শ্রমিক —দুয়ের নাছোড় স্বভাবের পুনরুক্তিসুলভ সংলাপ-বিনিময়ের গতানুগতিক'ম্যানারিজম্'-এ ছেদ টেনেছেন লেখক ।

সাধু গদ্যভঙ্গি গল্পটির বড় অলংকার। দুটি চরিত্রই অন্তঃশীল শ্লেষাত্মক স্বভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আগাগোড়া। রাঘব-ব্যক্তিত্বের বর্ণনা অযথা নয়, তা গল্পের মূল বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার স্বভাবে গভীর-জড়িত। আবার চলতির মেজাজে লেখা সাধু গদ্যের আপাত-মাধুর্যে সাধুরীতি যত আপন করতে পারে পাঠকদের সহজে, অন্যভাবে ততটা ব্যঞ্জনা পায় না। একাধিক বাক্যাংশে মেলে চরিত্রের স্বভাব, বাসনা, ভাবনা। 'খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না চাই না।'— এখানে রাঘব সরকার যে সাদা-মাটা জীবন-চর্যায় অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী, রুমাল না-ব্যবহারে তা বিশ্বাস্য হয়। আবার গল্পের শেষে একটিমাত্র তুলনায় দীর্ঘ বাক্যে বনফুল এই চিত্রটি এঁকেছেন: 'ঠুন ঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।' কোনো কোনো সমালোচক ও সহৃদয় পাঠক মনে করতে পারেন, এই বাক্যটির কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না।'— এই বাক্যেই গল্পটি শেষ হলে যথার্থ হত। কিন্তু শেষ বাক্যটিই, আমাদের মতে, গল্পের পক্ষে অমোঘ এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ও দুই চরিত্র-সংঘাতে অপরিহার্য। আগের কথাটুকু বলে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে যাওয়ার মধ্যে চরিত্রের উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অস্বীকার, উদাসীনতা যত

বড় হয়ে ওঠে, তা অন্য কোনোভাবে হয় না। রিকশাওয়ালার হাতের ঘণ্টার ঠুন ঠুন শব্দ তো পরবর্তী কর্মের প্রেরণা, নতুন যাত্রী নেওয়ার সংকেত। কর্মিষ্ঠ শ্রমিক যে কাজেই জীবন-গতি পায়, এই বাক্য তারই স্বভাবকে ইঙ্গিতময় করে। সে যে আর কোনো যুক্তি চায় না, তার কথাই শেষ কথা, অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে তারই ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য। গল্পের মধ্যে রাঘব সরকারের চিন্তায় সমকালীন সব 'ইজ্‌ম্', দেশসেবা, দেশের দারিদ্র্যভাবনা, কলকারখানার উন্নতি, সামন্ততন্ত্র, শ্রমিক সমস্যা—একসঙ্গে এক চিন্তায় চকিত স্বভাবে উল্লেখ করেছেন, বর্ণনার এমন সংক্ষিপ্তি ও আকস্মিকতা লেখকের চরিত্র-গঠনের অভিনব ক্ষমতার স্বাক্ষর দেয়।

ছোটগল্পে বনফুল অনেক ক্ষেত্রে রাশিয়ান কথাকার আন্তন চেখভের অনুসারী হয়েছেন। গল্পের শেষের যে চমক, আকস্মিকতার পরিণামী আঘাত ও অভিজ্ঞতা চেখভকে মনে করায়। 'ছোটলোক' গল্পের পরিণামে মেলে দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাতজাত এক আনন্দ-উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বোধন। গল্পের আরম্ভে আছে রাঘব সরকারের স্বভাব ও সক্রিয়তার চিত্র, শেষে রিকশা-শ্রমিকের তৎপরতা ও সংঘাতে তীব্র মনের প্রতিবাদী প্রকাশ। গল্পের মূল ভাব-ঐক্যের (Unity of Impression) দিক থেকে এর চমৎকৃতি অনস্বীকার্য। গদ্যের সহজ, সরল সাবলীলতা, বর্ণনাভঙ্গির সংযম, সিচুয়েশন সৃষ্টির সপ্রতিভ দিক, পুরনো জীবনদৃষ্টির মধ্যে থেকে নতুন প্রগতিশীল আদর্শের প্রাথমিক উদ্বোধন, আড়াল-করা দ্বন্দ্বের সংগুপ্ত স্বভাব 'ছোটলোক' গল্পটিকে এক সু-উন্নতমানের মর্যাদা দেয়।

ছয়

বনফুলের 'ছোটলোক' গল্পের এমন নামে মেলে লেখকেরই গল্প-বিষয় নির্বাচনের স্বকীয়তা। আগেও বলেছি, বনফুল তারাশঙ্করের মতো চরিত্র ধরে, ব্যক্তির কথা মনে রেখে গল্পের বিষয় ভাবেন। বা ঘুরিয়ে বলা যায়, ছোটগল্পে কোনো বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে বসে চরিত্রকেই একমাত্র আধার করেন। 'ছোটলোক' এমন নাম চরিত্রকেন্দ্রিক, কিন্তু কখনোই সোজা ব্যক্তি-নামে চিহ্নিত নয়। এ নামে মেলে স্বভাবের ব্যঞ্জনা, কিছুটা বা বুর্জোয়া সমাজের বিভক্ত শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যের।

প্রথমত, ছোটলোক বলতে আপাতদৃষ্টিতে রিকশা-শ্রমিককে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু গল্পে কোথাও তার নির্দিষ্ট নাম নেই। পাশাপাশি রাঘব সরকারের নাম বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক অর্থে রিকশা-শ্রমিকের নাম না থাকলেও তার শ্রেণীবৈষম্যের ধারণায় বিশেষ স্বভাব গল্পে বর্ণিত। নাম তাই অ-যথার্থ নয়।

দ্বিতীয়ত, এমন নাম আরও গভীরতর ব্যঞ্জনা আনে। এতকাল সমাজে এরাই ছোটলোক বলে অভিহিত হয়েছে। অশিক্ষিত, উৎপীড়িত, সর্বহারা, হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে ছোটলোকই। বাড়ির ভৃত্যজাতীয় কাজের লোক, ব্যক্তিত্বহীন বেগার খাটা শ্রমিক, দরিদ্র নিচু জাতপাতের মানুষজন হয়েছে ছোটলোক। রাঘব সরকারের কাছে রিকশা-শ্রমিক তা-ই। সুতরাং 'ছোটলোক' গল্পনাম অ-যথার্থ নয়, কারণ তারই সক্রিয়তায় গল্প শেষ।

তৃতীয়ত, আর একটি গভীর ব্যাখ্যায় 'ছোটলোক' নাম তাৎপর্যপূর্ণ হয়। রাঘবের কাছে রিকশা-শ্রমিক, ব্যক্তিত্বহীন ভিক্ষার্থীর মতো হলেও আসলে তা নয়। রিকশা-শ্রমিক শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করে। সে স্বাবলম্বী। সে যে ছোটলোক নয়, তার ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে যায় শেষে। তার পেশার কোনো কাজ না করে কারোর কাছে সে অর্থ নেয় না, নেবে না। এই যে সততা, আপন কাজের ওপর বিশ্বাস, নির্ভরতা তাতে সে অনেক বড় মাপের মানুষ। ছোটলোক তাই কোনো মতেই ছোটমাপের নয়।

চতুর্থত, নিচু শ্রেণীর মানুষ আর্থিক অব্যবস্থায় অসহায় হতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্রভাব অসহায়তার অনুবর্তী হয় না। অহংচেতনা, ব্যক্তিত্বের বোধ পেশার সীমায় বাঁধা নয়, তা তার আত্মপ্রকাশের উল্লাসকে বন্ধ করতে পারে না। অত্যাচারিত, অবহেলিত হতে হতে তারা আত্মোপলব্ধির উজ্জীবন ঘটাতে সক্ষম। গল্পের ছোটলোক স্বাবলম্বী, সরল আত্মবিশ্বাসী, তাই পয়সা না নিয়ে নতুন কাজে যুক্ত হতে নির্দ্বিধ, এখানেই নামের সার্থকতা। পয়সা না-নেওয়াটা তার ত্যাগ নয়, অর্থের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মোহহীন উপেক্ষাই।

পঞ্চমত, 'ছোটলোক' এমন গল্প-নামে আছে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ। ছোটলোক শব্দের বিপরীত সাধারণ অর্থে 'বড়লোক' শব্দটি উঠে আসে। 'বড়লোক' দু'অর্থে হতে পারে—'অর্থ-সম্পদে ধনীলোক' ও 'বড়মাপের লোক'। গল্পের প্রধান চরিত্র রাঘব সরকার যে ধনীলোক নয়, বোঝা যায় লেখকের বর্ণনায়। মোটা খদ্দর-পরনে ও এক শতচ্ছিন্ন কণ্টকিত পরিত্যাজ্য জুতা ব্যবহারে। অবশ্যই হতেও পারে একজন যথার্থ আদর্শবাদীর পোশাকও এমন সহজ সরল দারিদ্র্যচিহ্নিত। কিন্তু গল্পে রাঘব সরকারকে আঁকা হয়েছে বড়-মাপের মানুষ হিসেবে। সে শিক্ষিত, সুনির্দিষ্ট নীতি-অনুসরণকারী, অনমনীয়, উন্নতমস্তক, পরোপকারী, অন্যের কাছ থেকে অনুগ্রহের অপ্রত্যাশী, সাধারণভাবে মানবতাবাদী। এইসব গুণে রাঘব সরকার বড় মাপের মানুষ। তার পাশে রিকশা-শ্রমিকটি দীন-দরিদ্র—দেহ, মন ও পেশা—সব দিক থেকেই। কিন্তু রাঘব সরকারের পাশে একেবারে ছোট মাপের মানুষটিই কথায়, কাজে, রাঘবের পয়সাকে প্রত্যাখ্যান করে যে নিজ জীবন-সত্যের পরকাষ্ঠা দেখায় নীরব অবজ্ঞায়, ভাড়ার নামে ভিক্ষায় তীব্র অনীহা দেখিয়ে, তাতে রাঘবের মতো বড় মাপের লোক হয় অপমানিত, অসম্মানিত একজন রিকশা-শ্রমিকের কাছে। 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না'—এমন উদ্ধত, কঠিন শাসনের মতো আচরণ রাঘব কোনওদিনই কারোর কাছ থেকে আশা করেনি। তার এতদিনের উন্নত মাথা হয় অবনমিত, অসম্মানিত। যাকে রাঘব সরকারের মতো মানুষ অহংচেতনায়, অভিজাত ব্যক্তিত্বে নিচের তলায় স্থান দেয়, তাব কাছ থেকে সে পায় চাবুকের মতো আঘাত। অপমানে হয় দীন। এই যে রিকশা-শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত বিপরীত ব্যবহারে আছে গভীর শ্লেষ, তাতে বাঘব হয়ে যায় ব্যক্তিত্বে ছোট মাপের মানুষ, রিকশা-শ্রমিক বড় ব্যক্তিত্বের, মর্যাদার। এই তাৎপর্যেই গল্পের নাম শ্লেষধর্মী ও শিল্প-সার্থক। নাম যথার্থই রিকশা-শ্রমিকের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে ব্যঞ্জনা পাওয়ায় শ্লেষ লেখকেরই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য-নিহিত নিঃসন্দেহে।

৩.

বুধ্‌নী

এক

বনফুলের 'বুধ্‌নী' গল্পটি আলোচনার শুরুতেই কথাকারের আলোচ্য গল্পের সৃজন-সময়ের মানস বৈশিষ্ট্য অবশ্যই উপস্থাপনার তাগিদ ধরে আসে। বনফুল মেডিকেল কলেজের ছাত্র তখন। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গল্পলেখা! এক ডাক্তারি-পড়া ছাত্রের সাহিত্য-শিল্পের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহল ও আবেগেই এমন সব অণুগল্প লেখা হয়ে যায়। ক্লাসের মধ্যে বসে গল্প লেখায় 'বড় গল্প' লেখার সময় কোথায়? চিন্তাটাকে দ্রুত শেষ করার, গল্পে রূপ দেওয়ার তাগিদ কাজ করায় আকারে সংক্ষিপ্তি ও দ্রুততা কাজ করে। তাই গোড়া থেকেই তিনি একজন সার্থক অণুগল্পের রচয়িতা হতে থাকেন।

বাংলা সাহিত্যে এখানেই বনফুল পুরোধা, পথিকৃৎ। এসবের আগে রবীন্দ্রনাথের লিপিকার গদ্য-গল্প কি অণুগল্প পাঠের বিদ্যুৎ চমক আনে না? সে যাক, তবু বনফুল গল্পের ফর্মে বিস্ময়কর মৌলিকতা এনেছেন! বৈঠকখানার আড্ডার টানা গল্পে মাঝে মাঝে অন্য ছোট প্রসঙ্গে হঠাৎ-হঠাৎ হাসি-কান্না-কারুণ্যের যে চমক, টীকা-টিপ্পনি—অণুগল্পে তাব আঁচ মেলে। বনফুল তাকে অণুগল্পের অবয়ব দিয়েছেন। গল্পের আকার নিয়ে অসম্ভব সব পরীক্ষা করেছেন। অনেকটা সত্যেন্দ্রীয় ছন্দরূপের নানাখানা করে কৌশল ও কারিগরি, দৃশ্যত বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসই। এককথায় অণুগল্পের শরীরে বনফুল একজন বিশ্বকর্মা! বিস্ময়ের জীবনবিস্তারী জিজ্ঞাসা ও অশরীরী অস্তিত্ব রচনায় বনফুল কৃতী নন। তাৎক্ষণিকতার বিদ্যুৎ-স্বভাব অণুগল্পের শেষ কথা। বড় জীবনের আর্তি ও ব্যঞ্জনাকে ধারণ করার ক্ষমতা অণুগল্পের থাকে না। অবশ্য গল্পপাঠে পাঠক পীড়িত হন না, কারণ ক্ষণিকের মধ্যে চিরকালীন অজানাকে জানানোর জন্য যে জীবন-স্বভাবের খণ্ড-ক্ষুদ্র অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য প্রয়োজন—তাকে শিল্পীর কৃতিত্বে মান্য করেছেন গল্পকার। গল্পে কখনো কৌতুক, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো কারুণ্য, কখনো বা বিবর্ণ বিষাদ, কখনো আদিম জীবনের হিংস্রতা বা প্রতিদিনের সংসারের খুঁটিনাটি তুচ্ছতা-মহনীয়তা—এসবকেই নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করতে পেরেছেন বিষয় নির্বাচনে!

'বুধ্‌নী' গল্প শুধু নয়, 'ক্যানভাসার', 'তিলোত্তমা', 'তাজমহল', 'নিমগাছ'—এমন আমাদের আলোচ্য গল্পগুলি—আগে বলা প্রসঙ্গগুলির সহজ সমর্থন পায়। এগুলির সবই সার্থক অণুগল্প। 'বনফুলের গল্প' নামে যে গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে ১৯৩৬-এ, তার অন্যতম গল্প 'বুধ্‌নী'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনটি বড় গল্প বাদ দেওয়ার কথায়-কৈফিয়তে লেখক যখন জানান,—'বেমানান' বলে তিনটি বড় গল্প বাদ দিয়েছেন সংকলন থেকে, তখন বলা যায় লেখক তাঁর গল্পের 'অণুগল্পের বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। এক বনফুল-গবেষক জানান বর্তমান গল্প-সংকলনের 'অনেকগুলো গল্প বলাইচাঁদ যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তখন লিখেছিলেন। এক পাতা, দেড় পাতা, দু পাতায় ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গল্প লিখে রাখতেন।' একদিকে ডাক্তারি বিষয়ে পড়াশুনার

সময়, আবার ক্লাসে গল্প শেষ করার ব্যস্ততা—দুই বিরোধী মনের টানাপোড়েনে এই অণুগল্প লেখাই তো স্বাভাবিক! 'বুধ্‌নী' অণুগল্পটি তাই মানসিকভাবেই জন্ম-যন্ত্রণার একটি ফসল!

'বুধ্‌নী' গল্পের আখ্যান ছোট হলেও একান্তভাবে একনায়ক-কেন্দ্রিক। নায়কের নাম বিল্টু। সে নিশ্চিত ফাঁসির আসামী। ফাঁসি পরের দিনই। যেদিন ফাঁসি, তার আগের দিন লেখক স্বয়ং জেলখানায় বেড়াতে গিয়ে তাকে দেখেন, সে জেলের মধ্যে করুণ আর্তিতে তার স্ত্রী বুধ্‌নীর নাম বার বার আবেগে শোকে যন্ত্রণায় চিৎকারে একভাবে উচ্চারণ করে চলেছে। হাজারিবাগের পার্বত্য প্রদেশের এক পল্লীর অধিবাসী বিল্টু। সে ধনুকধারী। শিকার সন্ধান করার সময় একদিন মহুয়া গাছের তলায় সে দেখে বুধ্‌নীকে। বুধ্‌নী কৃষ্ণাঙ্গী, কিশোরী। তাকে দেখে বিল্টু প্রেমে উন্মাদপ্রায়। তার তাড়া খেয়ে বুধ্‌নী সাময়িক নিস্তার পায় বটে, কিন্তু বিল্টু কোনোমতেই তার পিছু ছাড়ে না। শেষে বিচিত্র প্রথায় বুধ্‌নীর সঙ্গে বিল্টুর বিয়ে হয় শর্তসাপেক্ষে। বিয়ে তো নয় সিঁদুর পরিয়ে রীতিমতো শর্ত-সম্মত ক্রমাগত শক্তির পরীক্ষা দিয়ে বিল্টু একদিনের শেষে সন্ধেয় বুধ্‌নীকে ঘরে আনে। তা বুধ্‌নীকে একেবারে জয় করার মতো বীরত্বের স্বীকৃতি! দু'বছর ধরে সংসারজীবনে বিল্টু একবারও তার গভীর আদিম প্রেমে বুধ্‌নীকে কাছছাড়া করেনি। অবশেষে বুধ্‌নীর এক সন্তান হয়। নব মাতৃত্বের বাসনায় ও বোধে বুধ্‌নীর এক কল্যাণী নারীত্বের মধ্যে উত্তরণ ঘটে। বিল্টুর চোখে পড়ে তার শিশুসন্তানটা বুধ্‌নীকে সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে। বুধ্‌নী আর বিল্টুর একার অধিকারে নেই। এক অসহনীয় রাগে হিংসায় হতাশায় বিল্টু শিশুকে নৃশংসভাবে খুন করে। এই শিশুহত্যার কারণেই বিল্টুর অবধারিত ফাঁসির দিন কালই।

অণুগল্প হলেও লেখক শিল্পের কৌশলে গল্পের আখ্যানকে পূর্ণরূপ দিয়েছেন। গল্পে একাধিক ঘটনার এতটুকু খামতি নেই। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্‌নীকে দেখে বিল্টুর আদিম বাসনার রুদ্ধশ্বাস প্রকাশ, আদিবাসীদের জটিল বিবাহ-প্রথা মেনে নিয়ে বুধ্‌নীকে জয় করার গর্বে সংসারে নিয়ে আসা ও সংসার-করা, বুধ্‌নীর স্বাভাবিক সন্তান জন্মের খবর—এসবই তো চমকপ্রদ ঘটনার শিল্পশ্রী আলোকদ্যুতি! গল্পের প্লট আখ্যান ও ঘটনার যোগাযোগে জাঁকজমক কেন্দ্র-অভিমুখী জটিলতা পায়। বিল্টুর প্রেমের উদ্দামতা, স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, অভিমান ও অধিকার চেতনা নায়ক-স্বভাবের সূত্রে গল্পের শিল্প-অবয়বকে রুদ্ধশ্বাস করেছে। গল্পের মধ্যে পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র আখ্যান-অবয়ব থাকায় গল্পের climax বড়গল্পের অনুযায়ী তীব্রতা, থর থর প্রদীপালোক প্রতিফলিত করে। গল্পের ছোটমাপের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শুরুতে গল্পকার লিখছেন: 'সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।' এখানেই গল্পের 'চরমক্ষণে'র প্রাথমিক অস্বস্তির পরিচয় মেলে। বুধ্‌নীর সন্তান প্রসব সেই চরমক্ষণের চমকের প্রথম ব্যঞ্জনা দেয়। শেষে লেখকের বর্ণনায় বিল্টুর মনোলোক হয় চরমক্ষণের চরম আঘাতের অভিজ্ঞান: 'বিল্টু দেখিল—এ কি! বুধ্‌নীকে দখল করিয়া বসিয়া আছে এই শিশুটা! বুধ্‌নী ত তাহার আর একার নাই! অসহ্য!'....এখানেই ক্লাইম্যাক্সের শেষ। এর পরেই বিল্টুর সূত্রে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্লাইম্যাক্সের

পরবর্তী জটিলতম ভাবের রক্তমোক্ষণ (cathersis) : নায়ক 'ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না। নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।' একটি পূর্ণ বড়গল্পের প্লট-স্বভাব এই গল্পে থাকায় 'বুধ্‌নী' একটি নিখুঁত অণুগল্প। গল্পের প্লটের জটিলতম কেন্দ্রটি বিল্টুর অভিনব মনস্তত্ত্বেই গতিময়।

দুই

'বুধ্‌নী' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব বা বক্তব্য একমাত্র বিল্টুর চরিত্র-বলয়েই পাঠকদের সামনে ধরা পড়ে। সবসময়েই, বিশেষ করে গভীর প্রেমে নায়ক বা নায়িকার মনের গভীরে কাজ করে এক বিচিত্র অধিকারবোধ। সমালোচকদের কথায় 'Love is an emotional action, Love is a flood which wells up from the depths of our personality'—এই তত্ত্বে নায়কের আবেগ, উৎসাহ যে কোনো প্রেমিকা নায়িকা এবং বিবাহিত স্ত্রীতেও এক অন্তরঙ্গতম আপনত্বে রক্তের সম্বন্ধের মতো চেতনার জন্ম দেয়। খাঁটি প্রেমিক কোনোক্রমেই প্রেমের অধিকার থেকে নিজেকে বিবিক্ত রাখতে চায় না। প্রেম উভয়ত এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়—যা নর-নারীর মানব-বন্ধনে চিরন্তন শৃঙ্খলের মতো। যতদিন আবেগে-উৎসাহে প্রেম জীবিত, তীব্র আকর্ষণের আধার, ততদিন প্রেমই সত্য, ধ্রুবতারার মতো চিরকালীন আলো।

এই অভিধায় অনেক সময় প্রেমিকা-স্ত্রীর সন্তান হলে, তাকে নিয়ে সমস্তরকম ব্যস্ততায় নিজ সন্তানের মাতৃরূপিনী স্ত্রীর সন্তানপ্রীতিকেও সহ্য করে না পুরুষ প্রেমিক। এটাও সেই প্রেমিকার প্রতি সম্পূর্ণ অধিকার ভোগে চরম স্বার্থপরতার আর এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিক। 'বুধ্‌নী' গল্পে বিল্টু একদিন আদিম সমাজের প্রেমিক, যে একদা প্রেমিকা বর্তমানে নিজ পুত্রের মা সেই বুধ্‌নীর পুত্রস্নেহের সূত্রে এতটুকু নিজ প্রেমের সময় দিতে নারাজ। বিল্টুর দিক থেকে এই মানসিকতা কোনো 'বিকার' নয়। প্রেমবোধের অধিকার-অনধিকার নিয়ে নায়কের জটিলতম এক মনস্তত্ত্ব।

বিল্টুর যে আবেগ, প্রেমের আদিম জীবন-স্বভাব, তা তার খাঁটি সহজ সরল জীবনাবেগেরই প্রতিরূপ। পুত্র তারই অংশ, তারই সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত পরিণাম, কিন্তু তাকেও অসহ্য মনে হওয়ার মূলে আছে বুধ্‌নীর প্রতি একমাত্র প্রেমচেতনার আকর্ষণের ভয়াবহতা। তার ঈর্ষা পুত্রের প্রতি নয়, বুধ্‌নীর সান্নিধ্যের পূর্ণ স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আদিম সারল্যেরই অন্যতম অভিব্যক্তি, যেখানে পুত্র কেন যে কোনো ভাবে অন্য কোনো দিক দাবি করলে তাকেও বিল্টু খুন করবেই। এ এক সৃষ্টিকর্তার নিজের গড়া মানুষের প্রতি জীবনশক্তির (vital energy) ধর্ম।

'বুধ্‌নী' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য লক্ষ্যের মূলেই কাজ করেছে—সর্বাবয়বে প্রেমশক্তির অসীম অনন্ত স্বভাবে অধিকার চেতনার নিঃসঙ্গ দাবি প্রতিষ্ঠা করা। এটা প্রেমশক্তিরই নিয়তি স্বভাবের স্বরূপে আর এক আত্মপ্রসারণের শপথ। কেন্দ্রীয় এই ভাববস্তুর প্রতিষ্ঠায় গল্পকার বুধ্‌নীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে বিল্টুর

সারল্য, উৎসাহ, আবেগ, আদিমতা চিত্রণে এতটুকু ফাঁক রাখেননি। বুধ্‌নী মা হবে এ তার জীবনধর্মের স্বাভাবিক নিয়তি, আবার বিল্টুর কাছে বুধ্‌নীর প্রেমও সেই একই নিয়তি। দু'য়ের মধ্যে রহস্যই গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে অভিনবত্ব এনেছে বিস্ময়রসের অনন্ত প্রবাহে!

তিন

'বুধ্‌নী' গল্পে যে অণুগল্পের শিল্পরূপ যথাযথ, একটিমাত্র চরিত্র বিল্টুর রূপাবয়ব তার উপযুক্ত অভিজ্ঞান। গল্পে একাধিক চরিত্র নেই। বুধ্‌নী একমাত্র নারীচরিত্র যে গল্পকারের বর্ণনায় ও নায়কের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রবল ধর্মে আড়ালে শক্তির প্রেরণা হয়ে থেকেছে। তার প্রত্যক্ষ কোনো সংলাপ গল্পে নেই, প্রয়োজন হয়নি। গল্পকারের অণুগল্পের পরিকাঠামো মেনেই বুধ্‌নী পটভূমি নির্মাণে সহায়তা করেছে। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্‌নীকে বিল্টু বন্যপশুর মতো তাড়া করলে 'ত্রস্ত হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্‌নী নিস্তার পায়।'—এই সামান্য চিত্রের ব্যঞ্জনায় বুধ্‌নীর সারল্য ও পুরুষভীতি—তার অসহায় ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দেয়। এই অণুগল্পে বুধ্‌নীর পরোক্ষ উপস্থিতি আসলে বিল্টুর পাশে প্রত্যক্ষ এক সপ্রাণ শক্তির উপস্থিতির মর্যাদা দেয়। বুধ্‌নী তার অস্তিত্ব দিয়ে বিল্টুর নায়ক-মর্যাদার বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

যেখানে বুধ্‌নী যে এক অবোধ নিয়তির মতো স্বামীর পাশে আসীন, তার মাতৃত্বলাভে তার মনোলোক উদঘাটনে গল্পকারের দেওয়া বুধ্‌নী-পরিচিতি—তাকে অন্য এক শাশ্বত জীবনস্তরে উন্নীত করে:

> 'বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানবশিশু। বুধ্‌নীর সে কি আনন্দ! বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণীমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।'

এই বুধ্‌নীর জীবন-উত্তরণই কিন্তু বিল্টুর, স্বামীর আর এক ট্র্যাজেডির ধাপ চিহ্নিত করে দেয। বুধ্‌নীর কোনো দায়দায়িত্ব এতে নেই, তবে জীবধর্মের এক অখণ্ডনীয় শাশ্বত রূপ এতে প্রতিমা হয়ে ওঠে। এখানেই অণুগল্পের চরিত্র হিসেবে বুধ্‌নীর বড় গুরুত্ব।

বিল্টু এর পাশে বিপর্যস্ত—তা তার প্রেম-ভাবনার চরমতম আবেগেরই আর এক পরিণাম। গল্পে বিল্টু অবশ্যই গভীর নিয়তি-নির্দিষ্ট দুর্ভাগ্যের লক্ষ্যবস্তু। তার ট্রাজেডির আঘাতের মূলে সক্রিয় থেকেই দুই মানসিক অবস্থার দুই মেরুগামী বিপরীত স্বভাব: ১. স্ত্রী বুধ্‌নীর প্রতি প্রচণ্ড আদিম আবেগময় প্রেম-বাসনার পরিণামে নিজ অধিকারের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করা; ২. নতুন পিতৃত্বের আকর্ষণকে চবম উপেক্ষা কবে ঈর্ষায় শিশুপুত্রকে খুনের ঘটনা ঘটানো। ঠিক যে অর্থে ঈর্ষা বুঝি, তা শিশুখুনে তেমনভাবে নেই, আসলে প্রচণ্ড প্রেমের অধিকার হারানোর দাবিব বিপবীতে এখানে পুত্র বা অন্য পরিস্থিতিকে—যে কোনো বিকল্পকে বিনাশ কবার অবোধ আচরণ। তার উদগ্র প্রেমবাসনা এই দুইকে ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠা দিতে ব্যর্থ। এর ব্যর্থতাতেই মেলে তার মধ্যে ট্র্যাজেডি ঘটার রন্ধ্রপথের (tragic flaw) সন্ধান ও সত্যতা।

আমাদের সভ্যসমাজেই দেখা যায়, পারিবারিক শান্ত জীবনে বিবাহের পর পূর্ব-প্রেমিকার বা প্রেমিকা-বধূর সন্তান জন্মালে পূর্বপ্রেমিকা-বর্তমানে মা বা বধূপ্রেম থেকে মা-হওয়া নারী ক্রমশ সন্তানকে কাছে এনে সূক্ষ্মভাবে বা প্রকাশ্যে প্রেমিক স্বামীর প্রতি, তার প্রেমের প্রতি ঔদাসীন্য, নিরাসক্তির মনোভঙ্গি ব্যক্ত করে। তাদের সন্তানের কাছে পূর্ব-প্রেমিকের বা বর্তমান বধূর প্রেম তুচ্ছ হয়ে মাতৃত্বের অহংকার ও হার্দিক যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম বড় হয়ে ওঠে। মেয়েদের মাতৃত্বই হয় একমাত্র নারীত্ব, সন্তানই তার সব এবং সর্বস্ব। এই যে পূর্ব-অধিকারের গুরুত্ব অবহেলিত হয়েছে বলেই, উপেক্ষার অসম্মান বড় হয় বলেই আদিম স্বভাবের বিল্টু তার আদিম প্রেমের ভূখণ্ড হারানোর রাগে ক্ষোভে, হিংসায় নিজের শিশুকে খুন করতে হয় নির্দ্বিধ।

বিল্টুর ট্র্যাজেডির অন্তিমে যাওয়ার ধাপগুলি গল্পকার ধীরে ধীরে গল্পে সচিত্র করেছেন। **প্রথমত** হাজারিবাগের পার্বত্য প্রদেশের এক অঞ্চল আদিম সভ্যতারই পরিচায়ক স্থান। সেখানে বিল্টু একজন ধনুকধারী শিকার-সন্ধানী। এই স্থানিক স্বভাবের আদিমতা নায়কের রক্তে ছিল। **দ্বিতীয়ত** বুধ্‌নীর প্রতি আচরণ ছিল বন্যপশুর মতো। এই বন্যতায় বিল্টু চরম আবেগপ্রবণ যে, তার বুধ্‌নীর পিছনে একটানা লেগে থাকায় প্রমাণিত হয়। **তৃতীয়ত,** তার ভালোবাসার প্রাণ-সংশয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বুধ্‌নীকে জয় করে। বিল্টুর প্রেমে ছিল নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্তি। **চতুর্থত** লেখকের বর্ণনায় বুধ্‌নী বিল্টুর অদৃশ্য প্রেমের সম্বল:

> ...'বিবাহের পর বিল্টু বুধ্‌নীকে এক দণ্ড ছাড়ে নাই! এক দণ্ডও নয়। বনে জঙ্গলে পর্বতে গুহায় এই বর্বর-দম্পতি অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশফুল— বিল্টুর হাতে বাঁশের বাঁশী।'

এই যে বাধাহীন নিষ্কলুষ প্রেমের জীবনচিত্র—তাতেই স্ত্রীর প্রতি নায়কের প্রেমাকর্ষণ এত বেপরোয়া, একগুঁয়ে, অবাধ্য, আত্মসচেতন, স্বাধিকার-প্রমত্ত করে তোলে।

উপরিউক্ত এই চারটি বৈশিষ্ট্যই বিল্টুর সর্বশেষ জীবনবিনাশের নিয়তিস্বভাব স্পষ্ট করে। নবজাত শিশুর জন্য পিতৃত্ববোধের জাগরণের থেকে তার কাছে প্রেমের অধিকার-চেতনাই সত্য করে। এ প্রেম যুক্তিতর্ক মানে না, বিল্টুর প্রেমের মহামূল্য পিতৃত্বের তুলনায় সামাজিক আইন ব্যবস্থা মানেই না। মানা সম্ভব নয়। মানুষের গড়া সমাজের মঙ্গলই লক্ষ্য। এর পাশে অসীম উদ্দাম অফুরন্ত প্রেমবাসনার আবেগ নায়কের মধ্যে 'আপনাতে আপনি বিকশি' ধর্মে অন্তঃশীল থাকে। তার পরিচয় সমাজ-স্বীকৃত নিয়মে সম্পূর্ণ বর্জিত। নৃশংস একজন শিশু-হত্যাকারী সমস্ত রকম মানবিক সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকবেই। পাশে বিল্টুর বুধ্‌নীর জন্য রাবণের চিতার স্বভাবে অনন্তকালের চরম কাতরতা, আর্তি, বেদনা, হতাশা ট্র্যাজেডির আগুনকে করে অনির্বাণ।

চার

'বুধ্নী' অণুগল্পটির শ্রেণীনির্ণয়ে চরিত্রাত্মক রীতি প্রসঙ্গ মানতে হয়। তবে প্রণয় প্রসঙ্গ ধরে নারী-পুরুষের মধ্যগত সম্পর্কভাবনাও এর মধ্যে সচিত্র। তাতে মনস্তত্ত্বের জটিলতাও দুর্লক্ষ্য নয়। গল্পটির সামগ্রিক উপস্থাপনা রীতিতে গল্পকার আদ্যন্ত প্রথম পুরুষের স্বভাবে বক্তার ভূমিকায় উপস্থিত। একটি বিশেষ নায়ক চরিত্র বিল্টুর আখ্যান ধরে উপস্থিত বলে প্রকাশের একমুখিনতা আড়াল থাকেনি। তা শিল্পের সংযমে সার্থক।

অণুগল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য চমক সৃষ্টির মধ্যে শিল্পের মনোরম চমৎকারিত্ব প্রধান হয়ে ওঠা। গল্পকারের বর্ণনায় নেই গতানুগতিকতা, আছে মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টির দ্যুতি ও দীপ্তি এবং সবটাই সংযমে-শাসনে ব্যঞ্জনার অনুবর্তী। গল্পের ঘটনা আছে সংক্ষিপ্ত চিত্রের স্বভাবে এবং একক চরিত্র ঘটনার উদ্ভাবনে দায়িত্ব নেওয়ায় তার তীব্রতা ও গভীরতা অবহেলিত হতে পারেনি। লেখকের বর্ণনার মধ্যে বিবৃতি সর্বস্বতার থেকে আছে চমক এবং নাটকীয়তা। মোট ছ'টি ছোট ছোট মাপের পরিচ্ছেদে চমকের চমৎকারিত্ব পাঠকমনে বিস্ময়ের রসসৃষ্টিতে শিল্পের গুরুত্ব পায়। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদে যখন গল্পকার বর্ণনায় পরিচ্ছেদের শেষে খবর দেন 'কাল তাহার ফাঁসি', 'বুধ্নী তাহার স্ত্রীর নাম' এমন চিত্রাত্মক বাক্যশরীর, তখন চমকের স্বাভাবিকত্ব অণুগল্পের ধর্ম বিশ্বাস্য করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে বিল্টুর-বুধ্নীর পুত্রস্নেহের সূত্রে নিজের ঈর্ষাজনিত অসহনীয় অবস্থার ভাব ব্যক্ত করে, ফাঁসিতে মৃত্যুব আগেও মুহূর্তের জন্য ঈশ্বরের নাম না করে 'বুধ্নী' এমন নামে একটানা চিৎকার করে যায়—এসবই চিত্রের সংক্ষিপ্তিতে অণুগল্পের শরীর নিখুঁত করে তোলে। লেখকের বর্ণনারীতি সাধুগদ্য-আশ্রয়ী, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে তীব্র গতিময়তা তাকে অলংকৃত করে তোলে। গল্পের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বাক্যে গল্পকার সুন্দরভাবে বিল্টুর মনোভঙ্গি নিয়ে এক গভীর শ্লেষ প্রয়োগ করেছেন। প্রকারান্তরে বুধ্নীর প্রতি দুর্দান্ত দুরন্ত প্রেমের আর্তিতে নিজের শিশুপুত্রকে বিল্টুর খুন করার যৌক্তিকতাকে সহানুভূতি দিয়েও দেখার ইঙ্গিতকে শ্লেষবৈশিষ্ট্যে এক অর্থে আর এক ডাইমেনশান দিতে সাহসী হয়েছেন বনফুল।

পাঁচ

গল্পের নাম 'বুধ্নী', অথচ গল্পের মধ্যে কোথাও বুধ্নীর সংলাপ নেই, প্রত্যক্ষ উপস্থিতিও বিল্টুর মতো নেই। আসলে বুধ্নী হল সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, বলা যায় গল্পের প্রেক্ষিতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক জীবন্ত উপকরণ। এই সাধারণ কথায় বুধ্নী নাম গল্পের শীর্ষনামে যথার্থতা পায়।

দ্বিতীয়ত, গল্পের প্রেক্ষিতের যোগে শুধু নয়, বিল্টুর সঙ্গে প্রেম ও স্বামীত্বের সুগভীর সম্পর্কের জেরেই একদিন বিল্টুকে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। বিল্টুর ভালোবাসার দুরন্ত একমুখিন স্বভাব গল্পের মূল ভাবকেন্দ্রকে ভিন্ন

পরিণামমুখী করে। প্রেমের এই Conception গল্পের নায়কের নিয়তি। বুধ্‌নী তার পরোক্ষে যন্ত্রী। নাম সার্থক।

তৃতীয়ত, পুত্র হওয়ার পর বুধ্‌নীর যে স্বাভাবিক মাতৃত্বের মধ্যে উত্তরণ ও তার জয়গান—তা মানবী সত্তার স্বীকৃতি হলেও প্রেমের উপেক্ষার কারণে যে নায়কের মধ্যে ঈর্ষা ও বিপরীত ভাবের ক্রিয়ার জন্ম দেয়, তাতে বুধ্‌নীর নিয়তি-নির্দিষ্ট জীবনাকাঙ্ক্ষা বিল্টুর আবেগকে প্রবল ধাক্কা দেয়। নায়কের মৃত্যুবরণে বুধ্‌নীর সারল' ও কল্যাণী স্বভাব ও বাসনা বিপরীতে এক জীবনকে ধ্বংস করে। এই অর্থে 'বুধ্‌নী' নাম যুক্তিতর্কে সংগত।

৪.

ক্যানভাসার

এক

'বনফুলের আরও গল্প' এমন নামে একটি গল্প সংকলন বেরোয় ১৯৩৮ সালের আগস্টে। এতেই সংকলিত একটি অণুগল্প 'ক্যানভাসার'। পেশায় যারা ক্যানভাসার তাদের নিয়ে গল্প ইতিমধ্যে লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমরেশ বসু লেখেন 'পশারিনী' নাম দিয়ে। এবং আরও অনেকেই। বনফুলের গল্পের প্রধান চরিত্র ক্যানভাসার হীরালাল, কিন্তু এমন বিশেষ নামে তিনি গল্পের নাম রাখেননি। আরও একটি প্রাসঙ্গিক কথা--যে তিনজনের গল্পের এই পেশা বিষয়ক কথা বললাম, তাঁদের প্রত্যেকের গল্পের attitude ও চরিত্র-ভাবনা স্বতন্ত্র। অবশ্যই পেশার অর্থনৈতিক সমস্যা সংকটকে নানান স্বভাবে চরিত্রের dimension-এ গুরুত্ব দিয়েছেন গল্পকাররা। শুধু পেশার হিসেব-নিকেশ নয়, ক্যানভাসার চরিত্রের খাওয়া-পরা-বাঁচার সমস্যার সঙ্গে জটিল মনোলোকও উদ্ঘাটিত হতে দেখা যায়।

'ক্যানভাসার' গল্পে বনফুল ক্যানভাসিং-এ বিজ্ঞাপনের চমক ও চাতুর্যকে যুগপৎ কৌতুক ও করুণ রসে মিশেল দিয়ে সুস্বাদু করেছেন স্বভাবী পাঠকদের কাছে। যেহেতু এটি অণুগল্প, তাই এর আকৃতি ও প্রকৃতি-নির্ভর সংক্ষিপ্ত প্লটের জটিলতায় গভীরতলাশ্রয়ী করেননি গল্পকার। গল্পেব শুরুতেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে বেকার অথচ বিবাহিত ভৈবব ও তার স্ত্রী কাত্যায়নীর সঙ্গে। কাত্যায়নীর একটি শৌখিন শাড়ি কেনার আবদার মেনে নিয়ে বেকার ভৈরবের পক্ষে অর্থাভাবে কিনে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া কাত্যায়নীর পক্ষে স্বামীর সে যুক্তি মেনে না নিয়ে ভৈরবের মতো বেকারের বিয়ে করার প্রতি ব্যঙ্গ শাণিত হয়। স্ত্রীকে ভোলানোর মতো ভৈরবের যুক্তি হল, স্ত্রীর এমন যুক্তিতে আছে বিলাস-লালসার বাবুয়ানি—যা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এমন তর্ক-বিতর্কে, রাগে উত্তপ্ত ভৈরব দুপুরের রোদের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। নিমডাল ভেঙে দাঁতন করতে থাকে। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এক অচেনা দাঁতের মাজনের শহুরে ক্যানভাসারকে দেখে অবাক হয়। নাম ক্যানভাসার হীরালাল। ট্রেনের আসার সময় ঘুমিয়ে পড়ার ফলে মাঝপথেই নেমে পড়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে কিছু ক্যানভাসিং সেরে নিতে চায়, কারণ শহরে যাবার সন্ধের আগে কোনো ট্রেন নেই। মাঝে

এইটুকু ব্যবসা করে নেওয়া! এ গ্রামে আসা নিয়ে নিমডাল দিয়ে দাঁত মাজতে থাকা ভৈরবের সঙ্গে ক্রমশ কথা কাটাকাটি হয়। হীরালাল বার বার তার মাজন কেনার জন্য সহাস্য অনুরোধ করে যায়। রাগ পড়ে ভৈরবের—সেই যুক্তি, দাঁত মাজার মাজন দিয়ে শৌখিনতা তো দেশের ক্ষতি করা, যুবক-যুবতীদের ক্ষ্যাপানো! হীরালালকে ভৈরব এখনি গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার কথা বলে। কথায় কথায় ভৈরব হীরালালের সুন্দর সাজানো দাঁত দেখে তা ওর নিজেরই মাজনে মাজা কিনা—জানতে চায়। হীরালালের সহাস্য উত্তর তার মাজনের পক্ষেই। তর্ক-বিতর্কে হীরালাল, তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথায় ভৈরবের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। রাগে শেষমেশ ভৈরব হীরালালের গণ্ডদেশে চড় মারলে বাঁধানো দাঁত খুলে পড়ে যায়। ফোকলা হীরালাল এর পর তার কালো কুচকুচে গোঁফের দিকে তাকালে কিছু বলার আগে হীরালাল স্বীকার করে তার কাছে বিক্রির জন্য কলপও আছে। ভৈরবকে শেষ কথা হীরালালের, মারধোর-এ কি দরকার! গরিব মানুষের তো এইভাবেই কষ্টে সংসার চলে। তা ছাড়া—'বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটিও মারা গেছে—' হীরালালের কথা শুনে হতভম্ব নির্বাক ভৈরব শেষে নিজে থেকেই এক কৌটা মাজন কিনে নেয়। গল্পের এখানেই আখ্যান-অংশের শেষ!

'ক্যানভাসার' গল্পের যেটুকু আখ্যান মেলে, তার তিনটি অংশ—(১) কাত্যায়নী-ভৈরবের কলহ চিত্র, (২) হীরালালের সঙ্গে মাজন বিক্রি ও গ্রামে এসে ব্যবসা করার কারণে ক্রমিক ভৈরবের উত্তপ্ত বিবাদ, (৩) হীরালালকে ভৈরবের গণ্ডদেশে প্রবল প্রহার এবং ঘটনাচক্রে ভৈরবের মাজন কেনায় হীরালালের ব্যবসায়িক সাফল্য! অণুগল্পের উপযোগী ভৈরব-হীরালালের তীব্র কাজিয়া-চিত্র ঘটনাক্রমকে, অদ্ভুত পরিণামী ব্যঞ্জনাকে চমকপ্রদ করেছে। প্লটের গঠনে ক্যানভাসারের শেষ কথায় দারিদ্র্য ও বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত ছেলের মৃত্যুখবর দেওয়া এবং হতভম্ব ভৈরবের নিজে থেকে মাজন কেনার মতো যুগলবন্দী ছবিতে প্লটের নিখুঁত কৌশল শিল্পের চমৎকারিত্ব আনে। গল্পের নিখুঁত ক্লাইম্যাক্স (চরমক্ষণ)-এর শুরু ভৈরবের দিক থেকে হীরালালের প্রচণ্ড চপেটাঘাত-এর ঘটনায়, শেষ হীরালালের উপযুক্ত ছেলেকে তার বুড়ো বয়সে হারানোর সংবাদে। গল্পের আখ্যানের বিচারে নিখুঁত ক্লাইম্যাক্স 'বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—' এমন একটিমাত্র বাক্যে। এই বাক্যের মধ্যে যে মানবিকতা ও কারুণ্য আদায় করে চতুর হীরালাল, তা শমে ফিরে আসে গল্পের catastrophae-প্রকরণে—ভৈরবের আকস্মিক মন বদলে এককৌটা মাজন কেনার মতো প্রতিক্রিয়ায়। বনফুল অনবদ্য চকিত বিদ্যুৎ-স্বভাব চিহ্নিত চিত্রের চমকে শিল্পীত ব্যঞ্জনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। পরিণতি সার্থক অণুগল্পের অনুগ।

দুই

সামগ্রিকভাবে 'ক্যানভাসার' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে গল্পের শেষে ক্যানভাসার হীরালাল ও বেকার ভৈরবের মধ্যেকার ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক আচরণের চিত্রে। স্ত্রী কাত্যায়নীর সঙ্গে বিতর্কে, অপমানজনক মন্তব্য কানে আসার পর

উত্তপ্ত বেকার ভৈরব দুপুরের খররোদে বাড়ি থেকে বেরোয়। তার সকাল থেকে দাঁতন না-করা মুখ। নিমের ডাল ভেঙে ঘষে দাঁত পরিষ্কার করতে থাকে। হঠাৎ দেখা হয় ক্যানভাসার হীরালালের সঙ্গে। শহরের ক্যানভাসার হঠাৎ এমন গ্রামে আসায় ভৈরব উত্তেজিত হয়। মুখ ধোয়ার জন্য দাঁতের মাজনের বিলাস ভৈরবের অসহ্য। তাকে তাড়াতে চায় ভৈরব। এই নিয়ে কথায় কথায় যখন সংঘাত তীব্র, তখনি হীরালালকে ভৈরবের প্রহার, হীরালালের নকল দাঁত খুলে যাওয়া, পরোক্ষে স্বীকার করা যে দাঁত যেমন নকল, তেমনি তার কালো গোঁফেও আছে কলপ এবং সে কলপও বিক্রি করে, তখনি পাকা ক্যানভাসারের মতো তার সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা বলে। এইখানেই আসে গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের দিক। দারিদ্র্যের মধ্যে তার বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত ছেলের মৃত্যুর খবর দিয়ে ভৈরবের মানবতার দিককে, তার কারুণ্যকে নাড়া দেয়। আর হতভম্ভ ভৈরব ক্যানভাসারের কৌশল, চাতুর্য না বুঝে, যা সে পছন্দ করে না পয়সা খরচের ব্যাপারে —সেই মাজন এক কৌটা কিনে নেয়।

এই যে কিছু সময়ের পারস্পরিক বিসদৃশ আচরণের মধ্যেও ক্রেতা-বিক্রেতার ভূমিকায় চলে আসে হীরালাল ও ভৈরব—গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এখানেই ব্যঞ্জনাগর্ভ। ক্যানভাসারের নাছোড় স্বভাবে জিনিস বিক্রয়ের ব্যবস্থা, টেকনিক, দারিদ্র্যের কথা দিয়ে ভৈরবের মতো ক্রেতার মন জিতে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যেও বাজিমাত করে এবং অন্যদিকে বেকার অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার ভৈরবের দিক থেকে ক্ষণিকের মায়ায় ও মানবাবোধে হীরালালকে মাজন কিনে প্রকারান্তরে সাহায্য করা—গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে একসঙ্গে চাপা কৌতুক ও শ্লেষ এবং ভিতরে প্রবঞ্চিত হওয়ার দিক সুন্দর শিল্পরূপে ধন্য হয়ে ওঠে। বনফুল অসামান্য শিল্পবোধে দুটি চরিত্র একটি ফ্রেমে ধরে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

তিন

'ক্যানভাসার' গল্পে স্পষ্ট হয়ে আছে তিনটি চরিত্র—কাত্যায়নী, ভৈরব ও ক্যানভাসার হীরালাল। তিনটি চরিত্রই অণুগল্পের মেদহীন সংযত চেহারায় উপস্থিত। তবে কাত্যায়নী বেকার ভৈরবের স্ত্রী হিসেবে যেটুকু তৎপর, তাতে তাকে গৌণ চরিত্র বলাই সংগত। সে গল্পের গতির উপযোগী উত্তাপ দিয়ে ভৈরবকে অস্থির করাতেই একমাত্র সক্রিয়। ভৈরব বেকার, স্ত্রীর শখ মেটাতে অপারগ। তাই স্ত্রীর কাছে সে এক অক্ষম ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয়ত, কাত্যায়নী পতিব্রতা স্ত্রী হলেও স্বামীকে বেকার অবস্থায় বিবাহ করার ব্যাপারে তীব্র জ্বালাজর্জর কথা বলে অপমান করে। এই দুই সূত্রে কাত্যায়নীর শিল্প উপযোগিতা। ভৈরবের সেই সূত্রে রাগ গল্পের পরবর্তী অংশে গল্পের শরীর ও শেষ অবয়ব রচনার সহায়ক গতি দিয়েছে।

ক্যানভাসার হীরালাল ও বেকার ভৈরব ভারসাম্যে সমান ওজনের সৃষ্টি। দুজনের কেউই ক্ষমতায় ছোট নয়। ভৈরব তার কঠিন বেকারত্বের কারণেই নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনা রাখে।

১. ভৈরব নিজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে দেশের বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার ও বিক্রয়কে মিথ্যা প্রয়োজনহীন শখ মনে করে। তাই মাজন না কিনে নিমগাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজার অভ্যাস সঠিক মনে করে। ২. হীরালালের বারবার মাজন কেনার অনুরোধ তাকে ভয়ঙ্কর রকম উত্তপ্ত করে, বিরক্ত করে। এই সূত্রে চরিত্রে প্রয়োজনীয় গতিশক্তি স্পষ্ট হয়। ৩. গ্রামে এসে শহুরে ক্যানভাসার হীরালালের ক্যানভাসিং সে মানতে পারেনি। মাজনের পক্ষে হীরালালের যুক্তি, ভৈরবের প্রতিবাদী সংলাপ একে একে গল্পের গতিপ্রাণতাকে তীব্র করে। ভৈরব হীরালালের এক কথায় আত্মসম্মানে আহত হয়। তার ভাবনার চরম স্বভাবে ভৈরব হীরালালকে শারীরিকভাবে আঘাত করে।

আবার যুক্তির দিক থেকে হীরালালের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যবসায়িক লাভ বজায় রাখার কৌশল সুন্দর ধরা পড়ে। ১. যেখানে ভৈরব একভাবে নিমডাল দিয়ে দাঁত মাজে, সেখানে ক্রমাগত তার মাজন কেনার কথা বলে যায়। তার ব্যবসা-বুদ্ধি চাতুর্যে অভিনব! ২. ভৈরবের দিক থেকে তার গ্রাম ত্যাগ করার কথা শুনে হীরালাল সামান্য প্রতিবাদ করেও মাথা ঠাণ্ডা রাখে। এখানেও হীরালাল ভৈরবের বিপরীত। ৩. শেষে হীরালালও তার প্রতিবাদী কণ্ঠ আরও সোচ্চার করে। ধীরস্থির হীরালালের আচরণ একজন ক্যানভাসারের পক্ষে অযৌক্তিক নয়।

ভৈরব এবং হীরালাল—দুজনের বিপরীত সম্পর্কে ও ভাবনায় গল্পের পরিণামী দিক স্পষ্ট হতে থাকে। ১. ভৈরবের আচমকা আঘাতে হীরালালের নকল দাঁত গল্পের লক্ষ্যকে অন্যমুখী করে। ২. কুচকুচে গোঁফ প্রসঙ্গে হীরালাল সহাস্যে পরোক্ষে স্বীকার করে নেয় তার কাছে বিক্রির কলপও আছে। মার খেয়েও হীরালাল রাগ করেনি, প্রতিঘাত করতে এগোয়নি। ৩. উত্তেজিত ভৈরবের কাছে হীরালাল তার ক্যানভাসিং-এ মারধোরের বদলে বাঞ্ছিত মোক্ষম তির দুটি ছোঁড়ে—তা হল তার পক্ষের দুই যুক্তি: ক. গরিব মানুষ—এই করেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। খ. বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—

এই situation দুটি চরিত্রকে দুদিক দিয়ে আকর্ষণীয় করে। হীরালাল জাত ক্যানভাসার। এদের চেষ্টা এবং মূল লক্ষ্য যেভাবে হোক নিজের জিনিস বিক্রয় করা, তার গুণের দিক ক্রেতার কাছে কথার মার-প্যাঁচে প্রতিষ্ঠিত করা। তাতে যদি কেউ উপেক্ষা করে, তা হলে নিজের পারিবারিক জীবনের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে কৌশলে শোনানো। হীরালাল তা-ই করেছে। তার সুন্দর দাঁত নকল, তার কালো গোঁফে কলপ-নকল। সুকৌশলে হীরালালের কথায় বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলের মৃত্যুর খবরও মিথ্যা। জিনিস বিক্রির এটাও টেকনিক। এই টেকনিকে উত্তেজিত ভৈরব মানবতার বোধে ও কারুণ্যে বন্দি হয়ে যায়, হয় মুহূর্তের মধ্যে হতভম্ব—আবেগে একটি মাজনও কিনে নেয়—যেখানে সে এর প্রবল বিরোধী বেকারের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে। এক অর্থে ভৈরব হয় প্রবঞ্চিত। মার খেয়েও ক্যানভাসার হীরালালের ব্যবসায়িক লাভের লক্ষ্য যথাযথ।

ভৈরব এবং হীরালাল—দুজনেই গল্পের শেষে ক্রেতা-বিক্রেতার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বনফুলের অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কনের ক্ষমতাকে প্রমাণ করে।

চার

ক্যানভাসার অবশ্যই একটি চরিত্রাত্মক অণুগল্প। ক্যানভাসার হীরালালের ব্যবসায়িক বুদ্ধির অসামান্য ছবি এঁকেছেন বনফুল। তার ধৈর্য, যথাস্থানে নিজের কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা পাঠকদের বিস্মিত করে। গল্পের শেষের দুই ব্যক্তিত্বের চরম টানাপোড়েনের সম্পর্ক একটি 'মহামুহূর্তে'র পরিস্থিতিকে সংযত স্বভাবে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে। অবশ্যই ঘটনাশ্রয়ী গল্প, তবে ঘটনা একটিই এবং কোনো বিশেষ ভাব নয়, বিশেষ চরিত্রের প্রকাশমূলকতাই সেই চরিত্রের মূলে সক্রিয়। এখানে হীরালালের বিচিত্র ক্যানভাসিংই লেখকের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে বনফুলের সিচুয়েশন সৃষ্টির অনবদ্যতা, সংলাপ বিনিময়ের মধ্যেকার টান টান অর্থানুকূল্য কোনো জীবনদর্শনকে দ্যোতিত না করলেও অণুগল্পের তীব্রতার প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

গল্পের বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই স্পষ্টত একমুখিনতা আছে। ভৈরব ও হীরালাল যৌথভাবে গল্পের গতিমুখে থেকে অণুগল্পের পক্ষে অনাবশ্যক অতি-বিস্তারকে করেছে বর্জন। কাত্যায়নীর অভিযোগ দিয়ে যে গল্পের শুরু, শেষে শিল্প যাথার্থ্যে তার অন্য চিত্র, ভাষা, সিচুয়েশন, তাই গল্পের সনেট-বন্ধন এতটুকু ব্যাহত হয়নি। বনফুল গল্পের প্রকাশরীতির অনুবর্তনে থেকেছেন সচেতন। কোথাও প্রকাশে বিবরণ-সর্বস্বতা গল্পের মেদবৃদ্ধি ঘটায়নি। লেখকের বর্ণনায় মেলে কথ্য-মেশানো সাধুগদ্য, কিন্তু সংলাপের কথ্যরীতি এত নিখুঁত বক্তব্যকেন্দ্রিক ও বিশেষ চরিত্রদ্যোতক যে প্রায় এক নিশ্বাসে গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনাকে গভীরতম বিশ্বাস্য ও মান্য করার মতো পাঠকদের অনুভূতির গভীরে তটস্থ অবস্থায় নিয়ে যায়।

পাঁচ

যে কোনো গল্পের নাম যদি বিশেষ চরিত্রকেন্দ্রিক হয়, তবে তার মধ্যে ব্যঞ্জনার কোনো ইঙ্গিত থাকে না, নাম হয় বাস্তব অর্থে যথাযথ। 'ক্যানভাসার' গল্পে হীরালাল তার চরিত্র-ব্যক্তিত্বকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। গল্পের নামে ভৈরবের কোনো দায়-দায়িত্ব থাকার কথা নয়। বেকার ভৈরব অর্থ না থাকা সত্ত্বেও হীরালালের ক্যানভাসিং-এর কৌশলের শিকার হয়েছে। তার মাজন কেনার অনিচ্ছাও প্রবল। সে হয়েছে হীরালালের ব্যবসায়-র 'Victim'। হীরালাল চতুর ক্যানভাসার। ক্যানভাস যারা করে তাদের এই চাতুর্য, মিথ্যাচার তাদের পেশার অন্তর্নিহিত শক্তি। যতই ভৈরব উত্তেজিত ও রাগে উত্তপ্ত হোক, হীরালাল কিন্তু গোড়া থেকেই ঠাণ্ডা মাথায় তার মাজনের কথাই বলে গেছে। মাজন বিক্রিটাই তার লক্ষ্য, খরিদ্দারের সঙ্গে তার Confrontation-এ যাওয়ার বাসনা নয়! ব্যবসায়িক ক্ষতিও সেখানেই—যদি সংঘর্ষ প্রধান হয়।

এমন হীরালালের ব্যবসা ও তার বিক্রির যাবতীয় টেকনিক সত্য হওয়ায় গল্পের নাম ঠিকই—'ক্যানভাসার'। গল্পের নামে আবার 'হীরালাল'ও নেই, শুধু 'ক্যানভাসার'। তাই নামের কেন্দ্রবিন্দু হীরালাল নয়, তার ক্যানভাসিংয়ের বিশেষ বৃত্তি। সুতরাং গল্পের নাম গল্পের বিষয় ও লক্ষ্যমুখীন, সার্থক। একজন ক্যানভাসারের কাছে একজন সাধারণ ক্রেতা

যে কথার কৌশলে হারতে বাধ্য, ভৈরব তার দৃষ্টান্ত। ক্রেতার মন জিনিস কেনার দিকে ঘোরাতে হীরালাল সম্যক সমর্থ হয়েছে। তাই গল্পনাম চরিত্র-বাস্তবতায় সার্থক।

৫.

তিলোত্তমা

এক

বনফুলের একটি গল্পগ্রন্থের নাম 'বিন্দু-বিসর্গ'। এর প্রথম প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫১, ইংরেজি ১৯৪৪ সাল। এই গ্রন্থেরই অন্যতম গল্প 'তিলোত্তমা'। গল্পটি যথার্থ অর্থে যে অণুগল্প হতে পারে না, তা নিয়ে পরে আলোচনা হবে। তবে গল্পটি আকারে বড়ই এবং মোট নয়টি ছোট-বড় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গল্পাংশ সামান্য এবং অণুগল্পের মতো এর মধ্যে বর্ণনা ও ঘটনা-উপস্থাপনায় গল্পকারের সংযম কম—যদিও ঘটনাগুলি বিবরণাত্মক স্বভাবে উপস্থাপিত বলেই বেশ কিছু বাড়তি মেদ ধরা পড়ে।

নকুল নন্দীর একটিমাত্র সন্তান বিবাহের বাজারে সুপাত্র গোকুল। পিতার মতোই সাধারণ, তবে বি.এ পাস করে আড্ডা, তাসখেলা, শখের থিয়েটারে অভিনয় করা, রাজনীতি বা সাহিত্য সম্পর্কে অনুরাগের মধ্যেই তার দিন কাটে। তার বাবার তেজারতি ব্যবসা, শহরে একটি তিনতলা বাড়ি, মামার বাড়ির বিষয় সম্পত্তির সহজ অধিকারে গোকুল অতি-সচ্ছল। বাবার পছন্দের যে মেয়েকে সে বিয়ে করে তার ডাকনাম তিলু, ভালো নাম তিলোত্তমা। গোকুলকে, সেকেলে ভাবনায়, বাবা নকুল নন্দী পাত্রী দেখায়নি। এদিকে নাম তিলোত্তমা হওয়ায় নাম স্মরণেই মুগ্ধ গোকুলের আনন্দের অন্ত নেই। কিন্তু বিয়ের শুভদৃষ্টির সময় পাত্রীকে দেখে গোকুল হতভম্ব। 'তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি।' নকুল স্ত্রীর গঞ্জনায় মিথ্যে কথা জানায়, এ মেয়েকে সে দেখেনি। বেয়াই অন্য মেয়ে দেখিয়ে ঠকিয়েছে। দানসামগ্রীও গুণমানে সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং নকুল ছেলের আবার বিয়ে দেবার কথা কবুল করে। এদিকে বিবাহের পর তিলোত্তমার সঙ্গে আলাপ হলে গোকুলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—তিলু অত্যন্ত ভালোমানুষ স্বভাব-লাজুক। তার বাবাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির যাবতীয় গালিগালাজকে আমলই দেয় না তিলু। শ্বশুরের তার বাবার বিষয়ে যাবতীয় মিথ্যাভাষণে প্রতিবাদও করে না। সে যেন গোকুলের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় কৃতার্থ। তার মতো অনুপযুক্ত অনধিকারী মেয়ের ভাগ্যে গোকুলকে স্বামী হিসেবে পাওয়া স্বর্গসুখের সামিল। গোকুল যখন জানায় তিলুকে বাবা তার আবার বিয়ে দেবে, তিলু কোনো প্রতিবাদ, রাগ, অভিমান জানায় না। হিন্দুঘরের নিয়মে তাকে মেনে নেয়। এমন তিলু কিন্তু বাড়ির যাবতীয় কাজে—বাসনমাজা কাপড়কাচা ইত্যাদিতে সমর্পিতপ্রাণা। তার রূপহীনতা, অশিক্ষা তার মহিষের মতো শ্রমকে খাটো করে না।

ইতিমধ্যে বছরখানেক কেটে যাবার পর যখন তিলুর সঙ্গে প্রেমে কঠিন যান্ত্রিকতাই একমাত্র সত্য, তখন কলকাতায় যাওয়ার পথে গোকুলের সঙ্গে পরিচয়, ট্রেনের একই

কামরায় এক বয়স্কা রমণীব সঙ্গে, আলাপ ও নতুন করে বিবাহের বিষয়েও কথাবার্তা হয়। বিস্তারিত কথাবার্তার পর মহিলা তার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ে ঊষাকে নিয়ে গোকুলদের বাড়ির দূরে ঘবভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করে গোকুলের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য। গোকুলের মা ও বাবা মুগ্ধ ঊষাকে দেখে এবং বাবাও প্রচুর টাকা পাওয়ার লালসায় পুনর্বিবাহ মেনে নেয়। মেয়ের মায়ের চরিত্রদোষের কারণে এতদিন ঊষার বিবাহে বাধা আসে। এবার গোকুলের বাবা সব গোপন রাখে। আশীর্বাদের আগের দিন রাতে গোকুল তিলুর কাছে সব কথা বলে মতামত জানতে চাইলে তিলু অবলীলায় তাতে মত দেয়, শর্তে তিলুকে চিরকালের মতো বাপের বাড়ি বাস করতে হবে শুনেও তিলু বলে কিছু চায় না সে, শুধু গোকুল তিলুর বাড়ি এক-আধবার গেলেই তিলু খুশি হবে। তিলুর এমন সব আচরণে গোকুল বাক্যহীন। পরের দিন সকালে ঊষার গাঁথা মালা ও আশীর্বাদের জিনিসপত্র আসে। আশীর্বাদে উদ্যোগী হলে, গোকুলের মায়ের শাঁখ বাজানোয় অসুবিধে থাকায় তিলুর শাশুড়ির কথায় তিলুকেই শাঁখ বাজাতে হয়। 'শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎচমক বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।' গোকুল এই অবস্থায় ক্ষমা চেয়ে মালাটা ছিঁড়ে ফেলে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে দ্রুতপায়ে সরে যায়। গল্পের এখানেই শেষ।

'তিলোত্তমা' গল্পের প্লটগঠনে মাঝে মাঝে বনফুল বর্ণনায় সময়ের ব্যবধান স্পষ্ট করে দেওয়ায় প্লটের জটিলতা ঘন হয়নি। কাহিনী বর্ণনায় ঘটনার উপস্থাপনায় বিবরণাত্মক বৈশিষ্ট্য প্রকট হওয়ায় আখ্যানভাগ হয়েছে শিথিল এবং বড় গল্পের বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। গোকুলের দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন অনেকটা সময়সাপেক্ষ হয়েছে। গল্পে তিলোত্তমা চরিত্রই প্লটের মাকড়সার জালের মতো কেন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য। তাতে বনফুলের বর্ণনা প্লটের সূত্রগুলির কেন্দ্রানুগ শিল্পধর্ম থেকে বিচ্যুতি এনেছে। চরিত্রকে পাশে সরিয়ে আখ্যান ও ঘটনাগুলিকে প্লটের বুননে সুসংবদ্ধ করায় বাধা এসেছে একাধিক। গল্পের ক্লাইম্যাক্স তৈরি হবে গোকুলের সঙ্গে তিলুর শেষ বাক্য বিনিময়ের চিত্র ধরেই। তা হয়েছে বিলম্বিত এবং ক্লাইম্যাক্স ও পরিণামী আঘাত মধ্যবর্তী স্বভাবে ধীরগামী ও অমোঘ হয়নি। তবু প্লটের শ্লথতা সত্ত্বেও ক্লাইম্যাক্স চিত্রটি নিপুণ অঙ্কিত এবং 'চরমক্ষণ' ও পরিণামী ব্যঞ্জনার সংমিশ্রণে তার শিল্পচমক মান্য:

> (তিলুর শাশুড়ীর কথা)—
>
> ...'ও বৌমা, কোথা গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও তুমি। শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।
>
> শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন। আমাকে মাপ করবেন।
>
> দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।'

দুই

'তিলোত্তমা' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য বিশেষ একটি চরিত্র ধরেই সত্য—সে চরিত্র তিলু—তিলোত্তমা। স্বামী গোকুলের সঙ্গে তার নীরব প্রতিবাদহীন শীতল আচরণ ছোটগল্পের শিল্পরূপে গল্পের কেন্দ্রস্থ লক্ষ্য করে তোলে তিলোত্তমাকেই। বিয়ের পর তিলোত্তমার সঙ্গে আলাপে স্বামীর অভিজ্ঞতা: 'তিলু বড় ভালমানুষ। ...তাহার মুখখানিতে ভালোমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা কবিয়া তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে।' তিলোত্তমা অসুন্দরী, তার বাবার প্রতি শ্বশুরের নানা মিথ্যাভাষণে সে প্রতিবাদ করেনি। সে জানে সে গোকুলের অনুপযুক্ত তবু নিজের একটি জগৎ তৈরি করে পতিব্রতার স্বভাবে দিন কাটায়। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের খবরে কোনো মানসিক বিকার নেই। হিন্দু-ঘরের বিবাহরীতিতে এমন ঘটনা মান্য এই যুক্তিতে এবং স্বামীর তাতে সুখ—এমন উদাসীন উদারতার স্বভাবে কষ্টের সহনশীলতায় নিজের সংসারে দিন কাটায়। গোকুলের মা তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না। সে বাইরের সব রকমের কাজে ডুবে থেকেই স্ত্রীর অস্তিত্ব ও অধিকারটুকু বজায় রাখায় অন্য এক নারী। গল্পের শেষে গোকুলের যখন দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তুতির শুরু ঊষা নামের এক আধুনিকা শিক্ষিতা যথার্থ সুন্দরী নারীর সঙ্গে, তিলু নিজের তৈরি করা জগৎ থেকেই স্বামীকে দেখে। আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে, তাকে নতুন বিবাহের পর চলে যেতে হবে বাপের বাড়ি চিরদিনের জন্য, তাতেও স্বামীর প্রতি তার নিজের মতো আত্মসমর্পণ যেনবা। 'তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া করে তাতেই আমার যথেষ্ট হবে।' স্বামীর আশীর্বাদের কালে শাঁখ হাতে সসঙ্কোচে তিলু শাঁখ বাজায়। এই ভূমিকায় তিলোত্তমার স্থান অসহনীয় হয় সচেতন গোকুলের কাছে। এই যে তিলোত্তমার যাবতীয় বরফের মতো কঠিন শীতল আচরণ—তাকে তিল তিল করে স্বভাবেব বৈশিষ্ট্যে তিলোত্তমাই করেছে। তিলোত্তমার ঔদাসীন্য, নির্বিকারত্ব, অন্তর্গূঢ় উপেক্ষা, নিজের একটা জগৎ তৈরি করে স্বামীর পাশে জীবনযাপন—তাই তো এক বিশেষ নারীর উজ্জ্বল রূপ তুলে ধরে। সংসারে তিলুর অনুচিত ভূমিকা চরিত্রের ভিতরের শক্তির ঔচিত্যের প্রতিষ্ঠা দেয়—যা গোকুলের নিজের পক্ষে আত্মঘাতীর অভিমানের দিক তুলে ধরে। বধূ হিসেবে সে নিজের জগতে ঠিকই, এই রূপের যাথার্থ্য স্ব-রূপে তাকে এক ব্যতিক্রমী বধূর স্থানে বসায়। গল্পের শেষে তিলুর আচরণ ও সচেতন শিক্ষিত গোকুলের অন্তরগত সংঘাতের ছবিতেই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠা পায়।

তিন

সমগ্র 'তিলোত্তমা' গল্পে বনফুলের চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার প্রমাণ মেলে। গল্পে তিলোত্তমা নায়িকা, গোকুল নায়ক। চরিত্রের শিল্পন্যায় প্রতিষ্ঠায় বনফুলের চরিত্র আঁকায় কিছু অতিকথন থাকতে পারে গল্পের বিবরণধর্মে, তবু সেসব উপেক্ষা করে তিলোত্তমাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে বিচার করলে যা সহজবোধ্য হয়, তা হল তিলোত্তমাই আপন স্বভাবে

সংযমে গল্পের কেন্দ্রীয় আসন নেয় নীরব ভূমিকায় থেকে। তিলোত্তমা জানে তার সংসারে বধূ হিসেবে কতটুকু ভদ্রতার অধিকারে, কোথায় সে অনধিকারী। সে সুন্দরী নয়, শিক্ষিতাও নয়, গোকুলের মতো পুরুষের মন জয় করার ক্ষমতাও তার নেই। কিন্তু সাংসারিক কর্তব্যে এবং পাশাপাশি পাতিব্রত্য ধর্মে সে নিশ্চুপ বধূর স্থান নিতেই পারে। সংসারের বাইরের সব কাজে সে নীরব প্রতিবাদহীন নিঃসঙ্গ কর্মী। এই অধিকারই তার বিবাহিত জীবনসম্ভোগ! স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে সে প্রতিবাদ না করে শাশুড়ির কথায় শাঁখ বাজাতে এগিয়ে আসে। এ হল এক কঠিন পাথরের চরিত্রশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ—নীরবে, নিভৃত মনে। নিশ্চয়ই কোথাও বুঝি ব্যঙ্গ বেজে ওঠে—যা স্বতঃস্ফূর্ত এবং তিলোত্তমা সে ব্যাপারে নিজস্ব স্বভাবে অবুঝ। সে গল্পকারের নিজস্ব সৃষ্টি। রূপে নয় নামে সে তিলোত্তমা—তা ছাড়িয়ে সে চিরকালীন বধূসভায় তিল তিল করে জমে-থাকা স্ব-নির্দিষ্ট স্ব-রূপের বৈচিত্র্যে তিলোত্তমা।

অন্যদিকে গোকুল তার বাবার মতো নয়, সে শিক্ষিত, সাহিত্য বোঝে, নাটকে অভিনয় করে। সুকুমার কলায়, মুক্তমনের ধর্মে অন্যমনের স্বামী। শেষ বিবাহের ব্যবস্থায় সে তিলোত্তমাকে স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করেনি, যুক্তিতর্কে আবেগে অভিমানে স্ত্রীর মতো, ইচ্ছাকে সম্মান দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার কাছেও তিলোত্তমা এক বিস্ময়। ভিতরে তার তাই অভিমান জমে থাকে। তাই তিলোত্তমা যখন ওরই দ্বিতীয় বিবাহের আশীর্বাদে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও বরণে শঙ্খধ্বনিতে সসঙ্কোচ নির্বিকার স্বভাবে অংশ নেয়, তখন তিলোত্তমা শুধু উপেক্ষার নারী থাকে না, কোথাও বুঝি তার কঠিন পাথরের বুকে তীব্র আঘাত হানার প্রতিবাদী এক বেদনায় গোকুলকে অন্য শিক্ষা দেয়। শেষ স্বামী হারানোর মুহূর্তেও তিলোত্তমা নিরাসক্ত, কঠিন। সেক্ষেত্রে সচেতন, অনুভূতি-প্রাণ 'গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ-শিহরন বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।' গোকুলের স্বরে তখন বুঝিবা 'আমাকে মাপ করবেন' এমন বুকের মধ্য থেকে রক্ত-ওঠা চরম বেদনা ও অপমানের বিনয়। শেষ চিত্রটি একটি বাক্যে: 'দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। ' এখানেই গোকুলের জীবনের চরম ট্র্যাজেডির গভীর বিষাদ, স্বামী-জীবনের পরাজয়। তিলোত্তমার আদ্যন্ত নির্বিকারত্ব স্বামী গোকুলের অন্তর্বিপ্লবের স্বভাবে তৈরি হওয়া ট্র্যাজেডির উপযুক্ত tragic flaw — ট্র্যাজেডি ঘটার রন্ধ্রপথ।

চার

বনফুলের 'তিলোত্তমা' গল্প যথার্থ অর্থে অণুগল্প নয়। শুধু আকারে নয়, প্রকৃতিতেও সাধারণ ছোটগল্প। লেখক এখানে একাধিক ঘটনা এনেছেন, কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন— যা একটি 'নভেলেট'-এর আকারে বর্ধিত রূপ পেতে পারে। Unity of time তেমন নেই। গোকুলের বিবাহ থেকে বছরখানেকের সংসার জীবনচিত্র এবং দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজনে ও প্রস্তুতিতে গল্পটি বিবরণের ধর্ম পেয়েছে। গল্পটি চরিত্রাত্মক হলেও

চরিত্রবিকাশে আখ্যায়িকার অতি-বিস্তার-স্বভাবকে সমর্থন করা হয়েছে। ঘটনাশ্রয়িতা থাকায় একটিমাত্র 'মহামুহূর্ত' (Climax) গল্পের একেবারে শেষ চিত্রে রচিত। বিবরণ সংক্ষিপ্ত হতে পারত আরো। তবে চরিত্রের নাম ধরে তিলোত্তমার অন্তর-স্বভাব আঁকায় গল্পকার পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মকে ব্যঞ্জনাকে নানাভাবে সমর্থন করেছেন। তা চরিত্রের বাঁধুনির শিল্পগৌরব। ক্লাইম্যাক্স চিত্র ও পরিণামী ব্যঞ্জনা (Catastrophae) অনবদ্য শিল্পরসের বিস্ময় জাগায়।

পাঁচ

'তিলোত্তমা' গল্পের নামে আছে বিশেষ নায়িকা চরিত্রের স্বীকৃতি। তিলোত্তমাই গল্পকারের লক্ষ্য এবং প্রতিপাদ্য হওয়ায় গল্পের নাম সাধারণ অর্থে সার্থক। দ্বিতীয়ত, তিলোত্তমা শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে তাকালে তিলুর চরিত্ররূপ ও তার স্বভাবের ব্যঞ্জনা শিল্পপ্রকরণের অসাধারণত্ব পায়। বাইরে তিলোত্তমা অতি সাধারণ অ-সুন্দর অশিক্ষিত এক নারী—সংসারের নবাগতা বধূও। কিন্তু সে হিন্দু পরিবারের উপযোগী এমন বধূ—যার মধ্যে নিশ্চিত সুন্দর একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য এবং ব্যক্তিত্বময়ী স্বভাব বড় মূল্যে পাঠকদের বিস্মিত করে। তার নির্বিকারত্ব, ঔদাসীন্য, নীরবতা, নিঃসঙ্গতা, কাজের মধ্যে ডুবে থাকার কঠিন সবরকমের মূক শ্রম—তাকে যেনবা অভিনব নারীর মর্যাদা দেয়। ব্যক্তি ও শিল্পরূপের গুরুত্বে তিলোত্তমা চরিত্রটি গল্পনামের মর্যাদা বাড়ায়। তাই গল্পের নাম সার্থক। তৃতীয়ত, আলোচ্য গল্পের সর্বাবয়বে, স্বামী গোকুলের স্বামী-স্বভাবের শৈল্পিক নিয়ন্ত্রণে, উদাসীন আচরণে ও সর্বশেষ দ্বিতীয় বিবাহের ভূমিকাপর্বে নিজেরই শঙ্খ বাজানোর Motive-এ প্রধানতম ভূমিকা পালন করে নায়িকা। তিলোত্তমার সঙ্গে গোকুলের সংলাপ-বিনিময়ের চিত্র গল্পকার দুটি প্রসঙ্গে এঁকেছেন। একটি দ্বিতীয় বিবাহের আশীর্বাদের ব্যবস্থাপনায় এবং দ্বিতীয়টি এই বিবাহের পর তিলোত্তমার চিরকালের জন্য বাপের বাড়ি বসবাসের শর্ত উল্লেখের মধ্যে। দুটি ব্যাপারেই তিলোত্তমার সংক্ষিপ্ত উত্তর ও কিছু নীরবতা সমগ্র গল্পের যেমন, তেমনি গোকুলের চরিত্রচিত্রেরও নিয়ন্ত্রক—যা স্বামীর বড় মাপের পরিবর্তিত অবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটায়। সুতরাং গল্পের তিলোত্তমাই এবং তার নির্মম ভূমিকাই একমাত্র সত্য-স্বরূপ হওয়ায় গল্পনামে তার ব্যবহার শিল্পমানে সার্থক।

৬.

তাজমহল

এক

বনফুলের 'তাজমহল' গল্পটি 'অদৃশ্যলোকে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অণুগল্প, গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৪৬ সাল। এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পই সাধারণভাবে অদৃশ্যলোকের, অর্থাৎ রহস্যময় ভৌতিক ঘটনাবলী নিয়ে রচিত। ব্যতিক্রম 'তাজমহল' এবং 'অধরা', 'প্রজাপতি' ইত্যাদির মতো কয়েকটি গল্প। 'তাজমহল' গল্পটির শরীর নির্দিষ্ট ছকে অর্থাৎ বাঁধা অবয়বে অলংকৃত। গল্পের নির্দিষ্ট মাপের আখ্যানচিত্রে মোগল সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থাকলেও মূলে বনফুলের নিজস্ব ভাবনার কাহিনী ও চরিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে।

আখ্যানের মূলে ইতিহাস নেই, আছে সাধারণ সর্বহারা দুই পুরুষ-রমণী, স্বামী-স্ত্রী। গল্পকারের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যই তত্ত্বরূপে গল্পের টীকা-ভাষ্যের মর্যাদা পেয়েছে।

'তাজমহল' গল্পের আখ্যান সামান্যই। গল্পের উত্তমপুরুষ কথক-নায়ক একজন ডাক্তার। তিনি আগ্রার কাছেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হয়ে এসেছেন। তিনি প্রথম যখন আগ্রা দেখতে এসেছিলেন তখন ট্রেনযাত্রী হিসেবে দূর থেকে তা দেখে দিনের আলোয় তাজমহলকে তাঁর মনে হয়েছিল চুনকাম-করা সাধারণ একটি মসজিদ। 'তবু তা দেখে তাঁর মধ্যে ইতিহাসের সম্রাট শাজাহান, তঁ'র স্ত্রী মমতাজ ভাই দারাসেকোর কথা অবলীলায় ভেসে ওঠে। পরে পূর্ণিমার পরদিন, চাঁদ ঠিকমতো তখনো ওঠেনি, সন্ধের পর দ্বিতীয়বার তাজমহলকে দেখার মধ্যে মুগ্ধ হবার মতো যেনবা মমতাজ অভ্যর্থনার স্বপ্নে তাঁর মনোলোকে নিবিড় হয়ে আসে। এই দেখার পরে বহুদিন বাদে আবার যে তাজমহল দেখেন একাধিকবার তা রূঢ় বাস্তবের। মানুষের এবং ব্যবসার প্রয়োজনের তাগিদে পরের একাধিকবার দর্শনের ঘটনা মূল তাজমহলকে একেবারে ভুলিয়েই দেয়। আর কোনো মোহই তাঁর মধ্যে থাকে না।

এমন মানসিকতার মধ্যে ডাক্তার নায়ক চিকিৎসালয়ের আউটডোরের কাজ সেরে একদিন যখন বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত, তখনি দেখা হয় এক বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে। তার পিঠে একটি ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে বৃদ্ধ নুয়ে পড়েছে। ঝুড়ির মধ্যে বৃদ্ধের অসুস্থ স্ত্রী। সে গরিব বলে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসালয়েই দেখাতে এসেছে, বাড়িতে ফি দিয়ে দেখানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। ডাক্তার স্ত্রীর বোরখা খুলেই এক তীব্র দুর্গন্ধ পান। দুরারোগ্য রোগটি সারানো সম্ভব নয়। মুখের আধখানা পচা, ডানদিকের গালটা নেই, দাঁতগুলো বাইরে বেরিয়ে পড়ে বীভৎসভাবে। কাঁধে বয়ে রোগী দেখানো সম্ভব নয় বলে ডাক্তার ইনডোরে জায়গা না থাকায় বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্গন্ধের কারণে হাসপাতালের কেউ তার কাছে যেতে না চাওয়ায় ডাক্তার হাসপাতালের সামনে একটি গাছতলায় রেখে চিকিৎসা করতে থাকেন। ইনজেকশান সেইভাবেই চলতে থাকে। এক মুসলধারে বৃষ্টির মধ্যে রোগীর ওপরে একটি চাদরের আচ্ছাদন করে বৃদ্ধার স্বামী চাদরের দুটি খুঁট গাছের ডালে ও বাকি দু'টি খুঁট হাতে ধরে বৃষ্টি থেকে সামলায়। নির্বিকারে ভিজছে স্বামী, স্ত্রী কাঁপছে অবিরত, আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ তার স্ত্রীর বাঁচবার কোনো উপায় আছে কি না ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলে ডাক্তার পরিষ্কার জবাব দিয়ে দেন। বৃদ্ধ নিশ্চুপ। এর পরের দিন ডাক্তার দেখেন গাছতলা খালি। আরও কদিন পরে হঠাৎ ডাক্তার দেখেন বৃদ্ধ প্রচণ্ড রোদের দুপুরে কিছু ভাঙা ইঁট ও কাদা নিয়ে কিসের গাঁথুনিতে নিবিষ্ট! ডাক্তারকে দেখে এবং ডাক্তারের কথার উত্তরে বৃদ্ধ সামনে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে বলে, সে বেগমের কবর গাঁথায় ব্যস্ত। কিছু অস্বস্তিকর নীরবতার পর ডাক্তার তার বাসস্থান, নাম প্রসঙ্গ তুললে বৃদ্ধ জানায়—সে আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়ায়, নাম ফকির শা-জাহান। ডাক্তারের তখন বাকরুদ্ধ নিশ্চল অবস্থা। এখানেই আখ্যান শেষ।

'তাজমহল' গল্পের আখ্যান সামান্যই এবং একমাত্র একনায়ক নির্ভর। প্লটের আখ্যান-সূত্রে একাধিক কোনো ঘটনার অবতারণা নেই। একটি বিশেষ চরিত্র-চিত্রই গল্পকারের লক্ষ্য। অসুস্থ মুমূর্ষু স্ত্রীকে কাঁধে নিয়ে গরিব বৃদ্ধ মুসলমানের ডাক্তার দেখানো, গাছের নিচে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা ও স্ত্রী বাঁচবে কিনা এমন উৎকণ্ঠা এবং শেষে মৃত স্ত্রীর জন্য কবর খনন—এগুলি যদি ঘটনার সংক্ষিপ্ততার নির্দেশক চারিত্র্য হয়, তবে গল্পের প্লট সরল, স্বাভাবিক এবং জটিলতা না থাকায় সোজা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যেই গল্পের কাঠামো স্পষ্ট করে দেয়। অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যে গল্পের আখ্যানভাগ সহজবোধ্য। এই অণুগল্পের climax অর্থাৎ 'চরমক্ষণে'র সূচনা এমন বাক্যে: 'এর বাঁচবার কি কোন আশা আছে হুজুর?' ক্লাইম্যাক্সের শেষ দুটি দু'পক্ষের সংলাপ চিত্রে: 'কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব—'/'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।'/ 'কবর?'/ 'হাঁ হুজুর।' আর সমগ্র গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা—যা চমককে চকিতে ধরিয়ে দিয়ে শিল্পের চমৎকৃতির আনন্দ-বিষাদে পাঠকদের, উত্তমপুরুষ বক্তার মতো, নির্বাক করে রাখে।

দুই

'তাজমহল' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যও জটিল কোনো বোধের জগতে আমাদের নিয়ে যায় না। একদিকে তাজমহল—সেই পত্নী মমতাজ-বাঞ্ছিত সম্রাট শা-জাহান-নির্মিত মনোরম অনন্ত ব্যঞ্জনার অপরূপ স্মৃতিসৌধ, আর একদিকে হতদরিদ্র এক ভিখারি অথচ প্রেমিক শা-জাহানের মাঠের মধ্যে আচ্ছাদনহীন অক্ষম এক কবর-চিত্র! মূল বক্তব্য এই দুই চিত্রের মধ্যবর্তী এক সকরুণ বাস্তব প্রেম ও জীবনভাবনার কঠিন উপলব্ধির ব্যঙ্গরূপ! ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রেমিক শা-জাহানের অর্থের আড়ম্বর ছিল, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ছিল, ছিল তাঁর মমতাজ প্রেমের মহত্তম উপলব্ধি। সেই অনুভব ও উপলব্ধিতেই মমতাজের বাসনা মতো সম্রাট তাজমহল নির্মাণে ব্যস্ত হন তাঁর মৃত্যুর পরে। নিজের মৃত্যুতে সেই সমাধির নিচে মমতাজের কবরের পাশে নিজের কবর রাখার বাসনাও জানিয়ে রাখেন। সেই মতো 'তা তাঁর মৃত্যুর পর সগৌরবে পালিত হয়। এই ঐশ্বর্যময় প্রেমের কথার পাশে বনফুল রচনা করেছেন এক অনৈতিহাসিক হতদরিদ্র চিরকালের সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ শা-জাহানের করুণতম চিরন্তন প্রেমের নিপুণ চিত্র। অর্থ নেই কবর তৈরির। দরিদ্রতম সাধারণ বৃদ্ধ শা-জাহানের প্রায় বিকলাঙ্গ, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত স্ত্রীকে পিঠে ঝুলিয়ে ডাক্তার দেখানোয়, সে বাঁচবে কিনা সে সংশয়ের চাপ হৃদয়ে নিয়ে শেষে সে খোলা মাঠে মৃত স্ত্রীর কবর তৈরি করে নিজেই সামান্য কিছু কুড়োনো ইঁট আর কাদা দিয়ে! সম্রাট শা-জাহানের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরে প্রেম প্রকাশ, আর গল্পকারের নায়কের প্রেম দরিদ্র ভিক্ষুক শা-জাহানের বীভৎস মুমূর্ষু স্ত্রীর প্রতি প্রেমে গভীরতম বোধের বৈপরীত্যে এক ব্যঙ্গ-চকিত প্রতীকপ্রতীম হয়ে ওঠে। মমতাজ সুন্দরী ছিলেন—সমস্ত দিক থেকে, তাঁর প্রেমের আভিজাত্য সম্রাটের পদাধিকারে সম্রাজ্ঞীর উচ্চ মান-সম্মানে ইতিহাস হয়ে যায়। দরিদ্র শা-জাহানের প্রেম এক বীভৎস স্ত্রী—যার

'মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না', আরও যার 'আধখানা মুখে বীভৎস হাসি' মৃত্যুর আগেও আশার ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ করে—এখানে স্ব-রূপে আর এক অসীম ছোঁয়—যার নাম উত্তুঙ্গ মানবিকতা! বিরল-দৃষ্ট প্রেমেরই বুঝিবা উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। আসলে বনফুল রাজকীয় পরিবেশে সম্রাটের প্রেমের প্রকাশচিত্রের পাশে এক তীব্রতম ব্যঙ্গে প্রেমজীবনের আর এক সমুদ্রসমান অসীমতাকে ধরতে চেয়েছেন। শা-জাহানের মমতাজ-প্রীতি নিয়ে কবি, দার্শনিক, শিল্পী—সব স্তরের মানুষ অসীম প্রেমের গাথা রচনা করে যাবেন অনন্তকাল, কিন্তু এই সর্বহারা দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রেমের কথা কেউ শিল্পের চমৎকৃতিতে রচনা করেন না, করবেন না কোনোদিন। এমন কঠিন শ্লেষে 'তাজমহল' গল্পের এই কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গের প্রতিষ্ঠা।

তিন

'তাজমহল' গল্পে গল্পটির উত্তমপুরুষ কথক নিজে পেশায় ডাক্তার এবং এই ডাক্তারি পেশার পরিচয় ও প্রয়োগ প্রাসঙ্গিকভাবে গল্পে আছে, কিন্তু সমগ্র গল্পেব কোনো স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত চরিত্র হয়ে উঠতে পারেননি, সম্ভবত গল্পের লেখক তা হতে চাননি। অন্য চরিত্র দরিদ্র বৃদ্ধ শা-জাহানের বিকলাঙ্গ, দুরারোগ্য রোগিণী স্ত্রীও চরিত্র হয়নি কারণ তার কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই এবং তার সক্রিয়তার অনুগ সংলাপও অনুপস্থিত।

আসলে 'তাজমহল' চরিত্রাত্মক গল্প এবং এক নায়কের মাধ্যমেই গল্পে লক্ষ্যে বিষয়ের বিস্তার ঘটেছে। তাজমহল অবশ্যই চিত্রধর্মী গল্প। বৃদ্ধ দরিদ্র, স্ত্রী-প্রেমিক ফকির শা-জাহানের সামগ্রিক চিত্রধর্মই তার স্ত্রীকে চরিত্র হওয়ার সুযোগকে আবৃত করেছে। সমগ্র গল্পটি বলেছেন বনফুল উত্তমপুরুষ ডাক্তারের বর্ণনায়। তার ফলে গল্পে 'ফকির শা-জাহান' চরিত্রের কোনো বিবর্তন নেই। গল্পে ঘটনা কম এবং সেই ঘটনাও বিবর্তন স্বভাবে নায়ককে একাধিক ডাইমেনশানে ধরতে পারেনি। ফলে ফকির শা-জাহান একটি 'স্থিতিপ্রাণ' (Static) চরিত্র। সে গল্পের শুরুতে যেভাবে উপস্থিত, শেষেও তা-ই। সে খাঁটি মানবিক বোধ ও বোধিতে, স্বভাবে ও অন্তরঙ্গতায় একজন একনিষ্ঠ স্বামী-ব্যক্তিত্ব। তার প্রেম অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায়, আত্মবিশ্বাসে ও অসাধারণ ধৈর্যশীলতায়, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে অপরূপত্ব পায়। কিন্তু এই সব বৈশিষ্ট্যই তার চরিত্রের চিত্রধর্মকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র আকর্ষক করে। ইতিহাসের শা-জাহানের রাজপ্রাসাদের প্রেক্ষিতে প্রেম ছিল বিলাসবহুল, সুখী জীবনের ঐশ্বর্যময় পরিবেশে তার ভিন্ন স্বভাব ও পরিণতি! দরিদ্র 'ফকির শা-জাহানের' প্রেম মৃত্তিকা-জীবনের অনন্ত প্রাণজন্মের রসে যেন বা মূল্যবান হীরকের থেকেও এক নতুন রত্ন! এর নিহিত মানবতার নামই হল সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত আন্তর্জাতিক মানবতা। তা মানবভাগ্যে স্বয়ংসিদ্ধ অকৃত্রিম। জীবনের ও প্রাণ-প্রকাশের রূঢ় বাস্তবধর্মে এই প্রেম ব্যঙ্গার্থে কোথাও বুঝি সৌধ তাজমহলের থেকেও নিত্য ধ্রুবতারা। গল্পের নায়কচরিত্র এখানেই এক অর্থে একজন পরাজিত সম্রাট!

চার

যেহেতু একনায়ককেন্দ্রিক গল্প 'তাজমহল', তাই এ গল্পে ভাবের একমুখিতা রক্ষিত। অণুগল্প বলেই বনফুল মূল গল্পের প্রাসঙ্গিকতায় নায়ককে তার নির্দিষ্ট সীমায় সংযত রাখতে পেরেছেন। মনে হয় গল্পের গোড়ার দিকে গল্পকার বর্ণনার কিছুটা অতিবিস্তার ঘটিয়েছেন। তাজমহল সম্রাট শা-জাহানের প্রেমের সূত্রে এক বিলাসবহুল স্মৃতিসৌধ। গল্পের শেষে সেই স্মৃতিসৌধ বৃদ্ধ 'ফকির শা-জাহানে'র হাতে প্রতীকের বৈপরীত্যে হয়েছে কিছু কুড়িয়ে পাওয়া ইট এবং কাদা দিয়ে তৈরি সমাধি অর্থাৎ কবরখানার রূপাবয়ব। গল্পের প্রথম দিকে বর্ণনায় আছে এই চিত্রের পাশে, মনে হয়, কিছুটা অতিশয়োক্তি অণুগল্পের শিল্পমাপে। বনফুল মূল গল্পের বর্ণনায় তেমন কোনো গভীর 'indirect' ইঙ্গিতধর্মকে লক্ষ্যে রাখেননি। যেহেতু লেখকের ভাষা ও বর্ণনার রীতিতে রূঢ় বাস্তবতাই সত্য হয়েছে, তাই বর্ণনার ভাষা ও চরিত্রের মনোলোক হয়েছে 'truthful reproduction of the typical characters under the typical circumstances.' গল্পের বলার ভঙ্গি অবশ্যই 'descriptive method' অনুসারী। গল্পের মূল লক্ষ্য অবশ্যই মানুষের প্রতি দরদি মনের, সহানুভূতি প্রাণ-বিকাশের উপযোগী মানবিক এবং লেখক এখানে আদ্যন্ত একজন মানবপূজারি।

পাঁচ

'তাজমহল' গল্পের নাম ভাবকেন্দ্রিক, যদিও ভাবটি নায়কচরিত্রকে কেন্দ্র করেই পেয়েছে রূপাবয়ব। তাজমহল এখানে উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হল চিরন্তন প্রেমের কথা। তাজমহল শাশ্বত প্রেমেরই অমূল্য অভিজ্ঞান। সম্রাট শা-জাহান পত্নীপ্রেমে ও পত্নীর অনুরোধেই গড়ে তোলেন তাজমহল সৌধ। গল্পে সেই প্রেমকে সমান্তরাল দুটি প্রেমের আখ্যানে পাশাপাশি রেখে তার স্বরূপ উদঘাটিত করতে চেয়েছেন গল্পকার, তাই প্রতীকে 'তাজমহল' গল্পনাম সার্থক।

দ্বিতীয়ত, তাজমহল গল্পের নামে আছে বিশেষ থেকে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা। প্রেম যদি খাঁটি হয়, তাকে অনন্ত আকাশের বক্ষ-প্রসারী স্বভাবে চকিত করবেন যেমন শিল্পী, তেমনি প্রেমিক-প্রেমিকাও! প্রেম মানবতাকে এক উদার আন্তর্জাতিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা ও গৌরব দেয়। গল্পের বৃদ্ধ, দরিদ্র 'ফকির শা-জাহান' নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে তার প্রেমের শাশ্বত স্বভাবকে অপার সৌন্দর্যে বাস্তবতায় ছায়াবী ও মায়াবী করেছে—যা বুঝিবা তাজমহলকেও হার মানায়। ব্যঞ্জনায় এমন অর্থ দ্যোতিত হয় বলেই গল্পের নাম তাজমহল শিল্প-সার্থক।

তৃতীয়ত, তাজমহল গল্পের শেষে এক তীব্রতম শ্লেষ-ব্যঙ্গ কাজ করে 'তাজমহল' নাম ধরে। ছড়ানো ইঁট-কাদা দিয়ে গরিব ভিখারি বৃদ্ধের মৃত স্ত্রীর জন্য কবর খোঁড়ার চেষ্টা খাঁ খাঁ রোদে মাঠের মাঝখানে, তা যেন সম্রাট প্রতিষ্ঠিত বিপুল ঐশ্বর্যের উদ্ধত স্বভাবের তাজমহল সৌধের বিপরীত এক বাস্তবতার বিষণ্ণ স্বভাবে গড়া প্রতীক! সম্রাট প্রেমিক শা-জাহান ও বাস্তবত প্রেমিক ফকির শা-জাহান—দু'জনে যেন দুই মেরুতে অবস্থিত, একে অপরের সূর্যতাপদগ্ধ প্রেমানুভবের বিরোধী ভাবের প্রতিবাদী। মূলে গল্পকারের কল্পনায় প্রেমভাবনার বিচার 'তাজমহল' সৌধই দেখিয়ে দেয়। গল্পনাম এই অর্থে সার্থকতা পায়।

৭.

নিমগাছ

এক

বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'অদৃশ্যালোকে' নামের গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। গল্পটি অণুগল্পের ধারায় একটি অন্যতম ব্যতিক্রমী সংযোজন। মোট ছোট-মাঝারি-বড় এমন বিচিত্র সব মাপের আনুমানিক আটাশটি পঙ্‌ক্তির এই গল্পে কোনো আখ্যান নেই প্রত্যক্ষত। যেহেতু অণুগল্প, তাই এর মধ্যে আখ্যান থাকলেও তা হবে সংক্ষিপ্ত, সংযত। যদি ভাবমূলক অণুগল্প হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় মূল ভাবের অনুরূপ রূপক বা প্রতীক অবলম্বন করে গল্পকার ব্যঞ্জনাকেই কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুগামী করেন।

'নিমগাছ' গল্পে বনফুল একটি বিশেষ ভাবের—যা পারিবারিক সমস্যার বা মানুষের কথার রূপাবয়ব পাওয়ার উপযোগী, তার স্বভাবকে সমান্তরাল রেখে এক প্রকৃতিচিত্র নির্মাণ করেছেন। লেখকের কলমে নিমগাছ এমন একটি প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ—যা সহজেই পরিবারজীবন নির্ভর এক নারীর বেঁচে থাকার প্রতিচিত্রণ সামনে আনে। এখানে নিমগাছের একাধিক বৈশিষ্ট্য হয় বা হতে পারে প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিক নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় মালোপামা, মালা-রূপকও। মালোপমা হল উপমার মালা—একটি বিশেষ বিষয়কে স্থির রেখে তার সঙ্গে আরও একাধিক বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিয়ে উপমার মালা রচনা করা। তেমনি রূপকের ধর্মেও একটি বিষয়কে স্থির থেকে অন্য একাধিক বিষয়ের অভেদের সিদ্ধির মধ্য দিয়ে শিল্পের চমৎকৃতি সৃষ্টি করা।

নিমগাছ গল্পে নিমগাছ একটি বিষয়, যার সঙ্গে একাধিক সাদৃশ্যাত্মক বা অভেদাত্মক বিষয় যোগ করে তৃতীয় বা কেন্দ্রীয় তাৎপর্যের প্রতিষ্ঠা স্থির করা। গল্পের যথার্থ অর্থে আখ্যান নয়, সারাংশ সেই তাৎপর্যের গুরুত্ব পায়। সহজ কথায় নিমগাছ এমন এক উপাদান যার বিভিন্ন অংশ জীবন নিরাময়ের বিভিন্ন কাজে লাগে। ছাল সিদ্ধ করে কখনো তার পাতা শিলে পিষে, কখনো গরম তেলে ভাজা করে নানান চর্মরোগে ব্যবহৃত হতেই পারে! যকৃতের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হওয়ায় নিমগাছের কচি কাঁচা পাতা কখনো সোজাসুজি অথবা তেলে ভেজে খাবার মতো নব-আস্বাদী খাদ্যও হয়। আবার কবিরাজদের প্রশংসায় নিমের কচি ডাল চিবনোয় দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বাড়ির পাশে নিমগাছ থাকলে, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে তাকে না কাটা, কারণ নিমের হাওয়া ভালো, স্বাস্থ্যকর। কিন্তু সেই নিমগাছের যত্ন হয় না, কেউ শান বাঁধানোর ব্যবস্থা করলেও অবহেলায় তার পাশে আবর্জনা জমেই থাকে। এমন নিমগাছকে যদি কোনো কবি দেখেন তিনি মুগ্ধ চোখে তার কচিপাতা ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। কিন্তু তাকে ছুঁয়েও দেখেন না, বিস্ময়চিহ্নিত ভালোবাসা আনন্দ বুকে নিয়ে চলে যান। কবিকে দেখার পর নিমগাছের ইচ্ছে হয় ওই কবির সঙ্গে চলে যেতে, কিন্তু যাওয়ায় প্রধান বাধা নিজের শিকড়গুলোর মাটির ভিতর অনেক গভীরে শক্ত হয়ে লেগে থাকা! সে বাড়ির পিছনে

আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই থাকে স্থির! এমন নিমগাছের সঙ্গে পাশের বাড়ির সংসারের কাজে ব্যস্ত, রুদ্ধশ্বাস লক্ষ্মী বধূটির অদ্ভুত মিল। এখানেই চিত্রাত্মক 'নিমগাছ' গল্পটির সমাপ্তি।

গল্পটির প্রথম থেকে কবি প্রসঙ্গ আসার আগে পর্যন্ত অংশটি রূপক মাত্র, গল্পের একটি ভূমিকা অংশ মাত্র। কবির ব্যক্তিগত আশা, উদাসীন মুগ্ধতা নিয়ে চলে যাওয়া, নিমগাছের নিজের বাসনায় সেই কবির সঙ্গে চলে যাওয়ার বাসনা ও গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগ ঘটানোয় নিমগাছ আংশিক রূপক বা প্রতীক আর নয়, সমগ্র বিবরণটিকে অণুগল্পের বৈশিষ্ট্যে সার্থকতা দান করেছে। অন্য একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যখন এরকম এক তথ্য বা খবর আসে 'The king is dead' তখন তা গল্প হয় না, সাধারণ মামুলি খবর! তার পাশে যখন এরকম এক বাক্য ব্যবহৃত হয় 'long live the king'—তখনি গোটা statementটি একটি গল্পের বা আখ্যায়িকার উৎসমুখ খুলে দেয়। 'নিমগাছ' গল্পের আখ্যাননির্মাণে তারই পরিচয় মেলে। কবি এবং বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটির প্রসঙ্গ আসে, আসে কবি ও তার সঙ্গে গাছের চলে যাওয়ার গোপন বাসনা—তখনি তা গল্প হয়ে ওঠে। এক কথায় গল্পে মেলে অশরীরী স্বভাবের আখ্যান চুম্বক, আখ্যান বিস্তৃতি নয়।

আখ্যান-সূত্রে প্রচলিত অর্থে 'চরমক্ষণ' (climax) চিহ্নিত করায় কিছু অসুবিধে থাকলেও গল্পের ভাববিস্তারের ধর্মে তার পরিচয় মেলে কবি প্রসঙ্গ বিচার করলে। গল্পকার একটি চিত্র এঁকেছেন এইভাবে:

> 'হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরণের লোক এল।
> মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।
> বলে উঠল,—''বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি......কি রূপ, থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার..... এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে—বাঃ''
> খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।'

কবি নিমগাছের মধ্যে অনুভব করেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্যরসসিক্ত অসীম অনন্তের মায়া! তা উদাসী বাউল স্বভাবের, কেবল এক স্রষ্টার অভিজ্ঞতায় মেলে। এই মানসিকতা গল্পে স্পষ্ট হওয়ার শুরুতে 'চরমমুহূর্ত' আসার ভূমিকা তৈরি হয়। তার পর গল্পে বনফুল যখন লেখেন: 'নিম গাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।' এই হল 'climax' বাক্য—যার ব্যঞ্জনায় গল্পের মূল সত্য-লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। চরমক্ষণের শেষ ও ব্যঞ্জনাগর্ভ সিদ্ধান্ত এমন একই চিত্রে:

> 'কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।'

কিন্তু নিমগাছের কথা নয়। ভাবের দিক থেকে নিমগাছ উপকরণ, আসল গল্পের শুরু

এমন শেষতম বাক্যে: 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।' এমন গল্পের শুরু সেই লক্ষ্মী বউ দিয়ে—যার জীবন রূঢ় বাস্তবের অনুপন্থী এবং যে এই শেষে গল্পে আবির্ভূত হয়ে গোটা গল্পের শরীরে নিমগাছের প্রকরণে নিজের সর্বাবয়বে অসহায় অস্তিত্বের আর্তি সোচ্চারে ঘোষণা করে। আর এই সাংসারিক গৃহবধূটিই 'নিমগাছ' গল্পের বিষয়গত কেন্দ্রীয় সত্যকে দেখায় pointing finger-এ।

দুই

'নিমগাছ' গল্পের কেন্দ্রীয় সত্য ও লক্ষ্য এক বাস্তব গৃহবধূর জীবনযন্ত্রণা ও অসীম শূন্যতার অসহায় বেদনা। গোটা গল্পে একমাত্র চরিত্র ওই গৃহবধূ। বনফুল যখন 'নিমগাছ' গল্পটি লেখেন তখন সারা ভারতে তথা বাংলাদেশে ছিল তীব্র রক্ষণশীল একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনব্যবস্থা। সেখানে কোনো গৃহবধূর স্থান হত দাসীর মতো। অন্তত পাত্রপক্ষের বর বিবাহ করতে যাবার সময় মায়ের কাছে বলে যেত, সে যাচ্ছে দাসী আনতে। এই প্রথা-সংস্কারে গৃহবধূকে শ্বশুরবাড়ির যাবতীয় কাজ সারা দিনরাত মুখ বুজে করে যেতে হত। বধূর কোনো স্বতন্ত্র সত্তার, ভালো-লাগা মন্দ লাগার বিচার সংসারে গ্রাহ্য হত না। বাঙালি বধূরা ছিল স্নেহপ্রবণা, নিজেকে এমন বড় সংসারের সঙ্গে এমনভাবে মূক রমণীর মতো মানিয়ে নিত যে তাদের ওপর অত্যাচার-এর মতো দাবি চাপালেও তারা প্রতিবাদ করত না, সাহস পেত না।

এমন একটি বধূর মতোই রমণীর সঙ্গে বর্তমান গল্পে আমাদের পরিচয় ঘটে। তার আকাশ দেখার সময় থাকে না, বুঝিবা অধিকারও ছিল না। ফুরসতও ছিল না। এই যে বধূর মুক্তিবাসনা, এক গভীর শূন্যতা থেকে মুক্তির, স্বাধীনতা ভোগের আর্তি, তা পরিপার্শ্বের নিরাসক্ত নিস্পৃহ আচরণে নিষ্ফল মাথা কুটে হৃদয়ের পাথরের ভারে রক্তাক্ত হয়ে থাকত। সে রক্ত তার অবহেলিত জীবনের তাজা রক্তক্ষরণ। গল্পের নিমগাছ আসলে এমন এক গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মীমন্ত বধূর জীবন ও হৃদয়ের কঠিন প্রতীক:

> 'নিমগাছটার ইচ্ছে হতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।'

এই যে বন্ধনের দশা, তা তার পারিবারিক জীবন ও পরিপার্শ্বের দেওয়া নির্মম নিয়তি। বধূটি ঘরের সবরকম কাজে কৃতী, তার মধ্যেই তার জীবনের সত্যকে একমাত্র ভাবে। বধূটি আবার লক্ষ্মীর মতো শান্ত, ধীর, স্থির ও মঙ্গলদায়িনী। এরকম নারী তো প্রতিবাদী হয় না। এইভাবে জীবন কাটাতে কাটাতে সে সংসারের চরম নির্ভরতার জরুরি নিকেত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালকে এঁকে এমন কারাবাস সুলভ বধূত্বের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন বাংলা ছোটগল্পে প্রথম। বনফুলের নামহীন বধূটি তা পারেনি ইচ্ছে থাকলেও, কবিকে দেখেও, তার নীরব আহ্বানেও। কারণ তার দীর্ঘদিনের

মরচে-পড়া জীবনে-মনে-ভাবনায় অনড় অনভ্যাসের অভিশাপ তাকে স্থবিরত্ব দিয়েছে। নিমগাছের বকলমে বনফুল তাই বলেছেন: 'কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।' সে একান্নবর্তী পরিবারের চরম যান্ত্রিকতার শিকার।

এই ব্যঞ্জনায় 'নিমগাছ' গল্পে গাছ হল বধূর জীবনধর্মের প্রতীকপ্রতীম অস্তিত্ব! নিমগাছ আবর্জনার মধ্যে থাকলেও সে চর্মরোগ সারানোর ওষুধ দেয়, খাদ্য হয় নানাভাবে, দাঁতের শক্ত কঠিন স্বভাব আনে, পরিবেশের বাতাস দিয়ে মানুষের সুস্থতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। এসবই গৃহবধূর রূঢ় বাস্তব জীবনের সার্থক প্রতীক। গল্পের জীবন-সত্য রূপ কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে নিমগাছের বৈশিষ্ট্য ধরে একমাত্র বধূর বাস্তবতাতেই ব্যঞ্জনাগর্ভ করেছেন গল্পকার। তাই গল্পের চরিত্র ও লেখকের লক্ষ্য পরিণামে হয়েছে একাকার! কবি এসে বধূর মধ্যে নবজীবনের উদ্বোধনকে সম্ভাব্যতা দিতে চেয়েছেন, জীবনের বড় সৌন্দর্য, বড় মুক্তির অসীম শপথ তো কবিই দিতে পারেন! বধূর এমনি অভ্যস্থ শৃঙ্খলিত জীবন—সেই চলনধর্মকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতাও তার মধ্য থেকে অপহৃত! এইভাবে আলোচ্য গল্পে নায়িকা ও গল্পের কেন্দ্রীয় জীবন-সত্য হয়েছে মহৎ শিল্পের ব্যঞ্জনায় একাকার, একাত্ম। এখানেই নিমগাছ নামক প্রতীকটির শিল্প-সার্থকতা।

তিন

'নিমগাছ' গল্পের প্রকাশভঙ্গির প্রকরণে ভাবের একমুখিতা অবশ্যই বিস্ময়কর। নিমগাছের একমুখিন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা পরে কবি ও গৃহবধূকে একত্র করে গল্পের স্বভাবের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে। এর মধ্যে কোথাও এতটুকু অতিশায়িতা নেই। এই অণুগল্পটি একেবারেই নির্মেদ এবং সবশেষে ব্যঞ্জনায় অব্যর্থ-সম্ভাবী। গল্পের বর্ণনায় বনফুল একদিকে উপমা বা রূপকের আবরণ আর একদিকে বধূর উপমেয়-স্বভাবে তাকে জড়িয়ে তোলায় প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকদের সংজ্ঞায় ধরা উপমার মালা:—সৌসাদৃশ্য বা মালরূপকের অভেদত্ব দিয়ে বর্ণনার গৌরব বাড়িয়েছেন। গদ্যের রীতিতে লেখক গদ্যকবিতার মতো—অন্তত আকৃতিতে—চরণগুলিকে ভেঙেছেন। আকার হয়েছে গদ্যকবিতার। অথচ গদ্যকবিতা নয়, ছোটগল্পই, এবং তা নিখুঁত এক অণুগল্প। তার জন্য রচনায় কবি ও বধূর প্রসঙ্গ সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পায়। বর্ণনার মতো সংলাপহীন, কবির ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংলাপ গল্পকারেরই উদ্দিষ্ট ভাষণ। গল্পের শেষতম যে চমক তা অণুগল্পেরই অন্যতম কৌশল—যা সমগ্র গল্পের চমৎকারিত্ব আনে। গল্পে বিবরণধর্মের বৈশিষ্ট্য নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। আগাগোড়া প্রতীকের ইঙ্গিতময়তা গল্পের সর্বাবয়বে মূল্যবান অলংকারের মতো। চরিত্রের প্রকাশমূলকতায় নিমগাছটি হয়েছে গভীর বাস্তব জীবনভাবনার আনুষঙ্গিক অব্যর্থ বিষয়, যা প্রকরণে অচ্ছেদ্য।

চার

'নিমগাছ' নাম গল্পের পক্ষে প্রতীকী। (১) গল্পটিতে নিমগাছকে লক্ষ্যে রেখে গল্পকার মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন। তাই নামে শিল্প সার্থকতা স্বতঃস্ফূর্ত। (২) নিমগাছ হল বধূটি—যার জীবনে একান্নবর্তী সংসারের যাঁতাকলে প্রাণস্বভাব রূদ্ধশ্বাস, অবহেলিত। নিমগাছ হল বধূই—সাদৃশ্য অর্থে। তাই নাম বিষয়ের গভীরে ওতপ্রোত হওয়ায় এ ছাড়া অন্য নাম প্রয়োজনহীন। (৩) গল্পের মধ্যে বনফুলের attitude সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। বধূটির জন্য লেখকের দরদ আছে বলেই বধূও শুধুমাত্র রূঢ় বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হয়নি, অবরুদ্ধ মানবজীবন ও প্রাণের সহজ প্রকাশক হয়েছে। নিমগাছের প্রতীকে বধূ কবির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলেও অসহায়। তার অক্ষমতার মধ্যে যেন লেখকের শ্লেষ ও বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই গল্পেব নাম লেখকের জীবনদৃষ্টি দ্যোতিত হওয়ায় এমন নাম শিল্পসফল এবং অন্য এক মাত্রার দিক দেখায়।

মনোজ বসু

জন্ম : ২৫ জুলাই ১৯০১

গল্পকার মনোজ বসুর শিল্পী-মানসিকতায় লক্ষণীয় পরিবর্তন আনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল। ১৯৩৯-এর ২রা সেপ্টেম্বর যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, তার অবসান ঘটে ১৯৪৫- এর ২রা সেপ্টেম্বর। এই সময়-পরিধির আগের আবির্ভূত লেখক মনোজ বসু। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবকাল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম-সময়ে বা সামান্য কিছু পরের সময়ে, তখন 'কল্লোল' পত্রিকার বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময়। মনোজ বসু 'কল্লোলে'র নন কিন্তু সমকালের লেখক-সতীর্থদের মননভঙ্গির নিকট-মনস্কতা তাঁর রচনায় মেলে। কবিতার লেখক হিসেবেই মনোজ বসুর প্রথম আবির্ভাব, 'কল্লোলে'র শেষ দিকের কয়েকটি সংখ্যায় তার প্রমাণ আছে।

বাংলা ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'নতুন ফসল' নামে যে গল্পটি ছাপা হয় মনোজ বসুর, সেটিই তাঁর প্রথম রচনা। আগে পাণ্ডুলিপির নাম ছিল 'পিছনের হাতছানি', ছাপার অক্ষরে নাম বদলে হয় 'নতুন ফসল'— একথা লেখক স্বয়ং তাঁর লেখক-জীবন-সংক্রান্ত এক স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন উত্তরকালে। কিন্তু 'বিচিত্রা'র প্রথম গল্প লেখকের পক্ষে সাহিত্য-জীবনের যদি উল্লেখযোগ্য 'প্রস্তাবনা' হয়, 'বাঘ' গল্প— যেটি প্রথম বেরোয় প্রবাসী, ১৩৩৮-এর বৈশাখ সংখ্যায়, তা হল তাঁর 'প্রকাশ'। 'প্রকাশ' শব্দের তাৎপর্য হল, এই গল্পই মনোজ বসুকে খ্যাতির একটা লক্ষণীয় মোজাইক-তৈরি সিঁড়ির ধাপ সামনে আনে, সিঁড়িটা ওপরে ওঠার। 'বাঘ' গল্পের নাম মনে পড়লেই লেখককে মনে পড়ে যায়, মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্পের কথা ভাবলে 'বাঘ' কোনোক্রমেই বাদ পড়ে না।

অর্থাৎ গল্পকার মনোজ বসুর আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কয়েব বছর আগে হলেও তাঁর গল্পকার-মানসিকতার বিবর্তনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল একটি দিকবদলের নিশানা দেয়। মনোজ বসুর 'কামনা', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'পৃথিবী কাদের' গ্রন্থগুলির প্রায় সব গল্পই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের আট-নয় বছরের রচনা। 'একদা নিশীথকালে' এবং 'দুঃখ নিশার শেষে' গ্রন্থ দুটির গল্প যুদ্ধ-সমকালের ফসল। আমাদের আলোচ্য 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পটি শেষোক্ত গ্রন্থভুক্ত একটি অতি উল্লেখযোগ্য রচনা। উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের ফসল বলে যেমন, মনোজ বসুর মানস-পরিবর্তনের স্পষ্ট-চিহ্ন বহন করার কারণেও তেমনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং বিশ্বযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের যে সমাজ-অর্থনীতির বদল ঘটে ধীরে ধীরে, 'কল্লোল' তার বিষগ্রহণে নীলকণ্ঠ হতে চেয়েছিল। কল্লোলীয়রা বিষ চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, নীলকণ্ঠের চিহ্ন তাঁদের কারোর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়নি। আর যাঁরা কল্লোলীয় নন, অথচ 'কল্লোলে'র প্রবাহ ও পরিবেশকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি, তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মনোজ বসু এঁদের কাছাকাছি মনের লেখক, তবে প্রকাশভঙ্গিতে অন্য পথ ধরেছেন। প্রকৃতিকে নিয়ে লক্ষণীয় সোরগোল কথাসাহিত্যে কম ছিল না। তারাশঙ্কর যেমন বিভূতিভূষণও তেমনি প্রকৃতি-প্রাণতায় নিবিষ্ট লেখক সেকালে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' উপন্যাস, আর 'মৌরীফুল', 'পুঁইমাচার' মতো গল্প তো টীকাভাষ্যে রচিত প্রকৃতির এক নবরচিত গীতা। মনোজ বসু আবির্ভাবকালের গল্পে প্রকৃতিকেই প্রদীপ করে তার আলোয় কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র এঁকে গেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ বা জীবনানন্দ, অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে প্রকৃতির দর্শক-শিল্পী, মনোজ বসু তা নন। ১. মনোজ বসুর প্রকৃতি-ভাবনায় নিশ্চিতভাবে রোমান্টিকতার নিবিড় মিশ্রণ ছিল। ২. ছিল প্রকৃতি-কেন্দ্রিক উচ্ছ্বাস ও আবেগময়তা, ৩. প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে এনে তার মধ্যেই একটা গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা দেওয়ার প্রয়াস। প্রকৃতি মুখ্য আধেয়, মানুষ তার উপযুক্ত আধার। বিভূতিভূষণেব মতো সর্বকালের, সর্বদেশের প্রকৃতির সেই নিস্পৃহ বিশাল দৃষ্টি তাঁর গল্পে প্রয়োজন হয়নি।

কবি ছিলেন মনোজ বসু, গল্পেও তাঁর কবিমন একবারও অপসৃত হয়নি। 'বনমর্মর', 'বাঘ', 'নরবাঁধ'—এমন সব গল্পে প্রকৃতি আছে, রোমান্টিক স্বপ্ন আছে, আছে মানুষেরই জীবনযাপনের কথা। কিন্তু সব মিলিয়ে-মিশিয়ে মনোজ বসুর যে বিষয়-ভাবনা—তার একটা সীমা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই সীমায় যে বেড়া বা বন্ধন ছিল, তাতে দিল ঘা। লেখক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে এসে নতুন ধারাব গল্প লিখতে শুরু করলেন। তাঁর মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা 'মন্বন্তর' নামের গল্প, মন্বন্তরের পরের কথা 'মানুষ ও গোরু', 'বন্যা', 'ঘরে আগুন' ইত্যাদি গল্পে সেই নতুন ধারায় কুড়িয়ে-পাওয়া মূল্যবান একাধিক মুদ্রা। আমাদের আলোচ্য 'কন্ট্রোলে লাইন' রচনাটিও সেই তেতাল্লিশের মহামন্বন্তরের একটি মূল্যবান স্মারক গল্প। এ গল্পে প্রকৃতি-প্রেমিক মনোজ বসু সরে গেছেন, প্রধানভাবে এসেছেন মানবপ্রেমিক লেখক হয়ে এবং সেই মানবপ্রেমিক হয়েছেন উচ্চবিত্ত থেকে নেমে সর্বহারাদের বেদনায় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল থেকেই মনোজ বসু তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ে এনেছেন বিস্তার। 'কন্ট্রোলেব লাইন' গল্পে লেখক নায়ক করেছেন এক ধনীর দুলালকে, কিন্তু তাকে তারই স্বভাব-মাধুর্যে নামিয়ে এনেছেন সর্বহারাদের স্তরে—গভীর গোপন মানসিকতায় ও আচার-আচরণে। কিন্তু যুদ্ধ-সমকালেই 'একদা নিশীথ কালে' গল্প সংকলনের গল্পগুলি

লিখতে বসে একাধিক বিচিত্র সব মানুষকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এক বাতিকগ্রস্ত পিতা—যার চরিত্রে আছে একাধিক অসঙ্গতি তাকে এঁকেছেন উতরোল হাসির বলয়ে। পিতা বরদাকান্ত—পুত্র নীলাদ্রি স্ত্রী সৌদামিনী ও নীলাদ্রির স্ত্রী উমা—এদের সক্রিয়তায় কৌতুকরস মনোজ বসুকে অন্য ধাতের লেখক করে। 'সর্পাঘাত' গল্পের মধ্যে দুর্গারাণী-সুধানাথের প্রেম-সম্পর্ক ও স্থায়ী সংসার বন্ধনের সম্পর্ক রচনায় যেসব ঘটনা ঘটিয়েছেন গল্পকার, তা-ও নারীমনের অন্তর্গূঢ় রূপের পক্ষে প্রামাণ্য হয়। 'অভিভাবক' গল্পে মনোজ বসুর আর এক অভাবনীয় পর্যবেক্ষণ। পাটোয়ারী বুদ্ধির চতুর ব্যবসায়ী অবিনাশ যেভাবে প্রীতিব সাহায্যে ও সান্নিধ্যে যুদ্ধ-সমকালের ভিড় ট্রেনে একটি জায়গা করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে প্রীতির কাছে বিদায় নেয় নির্লজ্জভাবে—তাতে কৌতুকরস যেমন আছে, তেমনি আছে শ্লেষ ও নতুন চরিত্র-আবিষ্কার! মনোজ বসু গল্পে সমস্যা ও সংকটে, লোকচরিত্রে কৌতুকরসের জোগানে সিদ্ধহস্ত!

১.

কন্ট্রোলের লাইন

এক

মনোজ বসুর 'দুঃখ নিশার শেষে' গল্পগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটে এপ্রিল ১৯৪৪-এ। এরই অন্তর্ভুক্ত গল্প 'কন্ট্রোলের লাইন'। এর আগের গল্পগ্রন্থটি হল 'একদা নিশীথ কালে' প্রথম প্রকাশকাল ১৯৪২। লক্ষণীয়, 'দুঃখ নিশার শেষে' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি নিশ্চিতভাবেই ১৯৪২-এর পরবর্তী রচনা ও ১৯৪৪ এপ্রিলের মধ্যবর্তী কালের। তাহলেই একটি বিষয় স্পষ্ট, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর—যা ১৯৪৪-এর মধ্যবর্তীকালে পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে বিকটদর্শন কোনো রাক্ষসের মুখব্যাদান নিয়ে বাংলার বুকে ঘুরে বেড়িয়েছিল তার স্পষ্ট পরিচয় সেই সচেতন লেখকের রচনায় থাকতে বাধ্য। ১৯৪২-এ আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩-এর প্রথমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ঝড় সেপ্টেম্বর মাস থেকে মন্বন্তর-দৈত্যের সদম্ভ পদক্ষেপের শুরু। আরও লক্ষণীয়, মানুষেরই তৈরি করা এমন কুৎসিত খাদ্যাভাবের কালে খাদ্য-কন্ট্রোল-ব্যবস্থার যে প্রচলন, তা-ও যুদ্ধের কারণে যেমন, তেমনি ছিল মন্বন্তরকে সামলে দেওয়ার কারণেও। কিন্তু সেই কন্ট্রোল ব্যবস্থা নতুন করে জন্ম দেয় কালোবাজারি-মুনাফাখোর-মজুতদার দলের। তাদের রাতের অন্ধকারে শকুনি-গৃধিনীদের মতো তৎপরতাতেই মন্বন্তর বীভৎস রূপ নিয়ে দেশের মাটি আঁকড়ে বসে। অর্থাৎ একদিকে প্রত্যক্ষ মন্বন্তর, আর একদিকে কৃত্রিম খাদ্যাভাবের কারণে কন্ট্রোল ব্যবস্থা ও সুযোগ-সন্ধানীদের গোপন কৌশল—এই সবের মধ্যেই সাধারণ মানুষগুলির প্রাণান্তকর অবস্থা দেখা দেয়।

সেই প্রাণান্তকর অবস্থার প্রেক্ষিতেই মনোজ বসু শহর নয়, গ্রামের পরিবেশে, এক মফস্বল শহরের যুদ্ধকালীন অন্ধকার জীবনযাত্রার চিত্রে তাঁর নায়ককে এনে এক নতুন অভিজ্ঞতার শপথ শুনিয়েছেন। 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পে সেই নতুন অভিজ্ঞতায় একালের মানুষ হয়ে উঠেছে তাঁর নায়ক অতুল। লেখক যে কাহিনীবৃত্ত রচনা করেছেন, তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে এক নিটোল রক্তমাংসের মানুষের মতো শরীর তৈরি করে দেয়। সেই শরীরী মানুষ সম্পূর্ণ এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

কাহিনী-অংশের টানা একটি সূত্র আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সূত্রে ঘটনার বড় বড় গিঁট বা বন্ধন নেই, আছে স্বাভাবিক ঢেউয়ের উত্থান-পতন। গল্পের প্লট সংযত, শিল্পের পরিমিতিতে নিশ্ছিদ্র। প্লটে কোথাও একটুকুও বাড়তি অংশ নেই যা গল্পের মূল লক্ষ্যে পৌঁছনোর দিককে বিলম্বিত করতে পারে। এ গল্পের নায়ক অতুল রসিকমোহনের মতো এক রীতিমতো ধনীর পুত্র এবং অত্যন্ত আদরের মধ্যে লালিত। আবার সে এক মফস্বল শহরের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠিত উকিল মনোহরের বড় আদরের জামাতাও। পিতা রসিকমোহন ছেলের প্রতিদিনের স্নান-খাওয়া, স্বাস্থ্য, নানান কাল্পনিক বিপদ-আপদ, অসুস্থতা, অসুবিধের কথা ভেবে কখনোই কাছছাড়া করতে চায় না, এমনকি বেয়াই মনোহরের বাড়ির জামাই হলেও গ্রামে পাঠাতে একান্তভাবেই অনিচ্ছুক। শ্বশুর মনোহর

মেয়ে করুণার গোপন অনুরোধ ও বুঝিয়ে-দেওয়া কৌশলে বেয়াইকে বুঝিয়ে অতুলকে মেয়ের সঙ্গেই কলকাতা থেকে গ্রামে নিয়ে যায়।

অতুল সম্পর্কে যত্ন, সতর্কতা, জামাই-আদর একেবারে রাজকীয়। অতুলের বাবাকে দেওয়া কথার এতটুকু নড়চড় করতে চায় না মনোহর। তিরিশ মাইল ট্রেনে কাটিয়ে অতুল ওঠে ইছামতীর বুকে মনোহরের বড় হাউসবোটে। অতুলের এবার তার বাড়ির হাঁপ-ধরা খাঁচার বন্ধন থেকে মুক্তির গোপনতম পিপাসা তীব্র। বোটে আলাপ হল মনোহরের কলকাতার ভৃত্য-সঙ্গী সুবলসখার সঙ্গে। অতুল প্রভুর পুত্র, কিন্তু প্রভুর স্তর ও আভিজাত্যের খোলস ত্যাগ করে একেবারে সহজ সরল অন্তরঙ্গতায় মিশে যায় সুবলসখার সঙ্গে। তার সমস্ত আচার-আচরণ যেমন সুবলসখার সঙ্গে একই স্তরের মানুষের। দুজনের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। মফস্বল শহরের শ্বশুরবাড়িতে এসেও অতুল সুবলসখাকে ছাড়ে না। শুধু প্রীতি নয়, অর্থের ঘুষ দিয়েও অতুল রাত্রে অন্ধকারে গ্রামের যাত্রা শুনতে বেবিয়ে পড়ে। স্ত্রী করুণা তখন গভীর-নিদ্রিত। সরল, সচ্ছল কৌতুকের সম্পর্কের ও কথার মধ্যেও করুণা শ্বশুরের কথা ভেবে অতুলকে সাবধান করে। অতুল শোনে না। সুবলসখাকে নিয়ে সারারাত যাত্রা শুনে ভোরের দিকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে গেটের সামনে পাহারাদার, জাগ্রত-বিরক্ত রামচরণের কণ্ঠ শুনে দুজনেই আবার পালায়। পালিয়ে এসে শেষ-ভোর থেকে কন্ট্রোলের লাইন-দেওয়া মানুষগুলির মধ্যে আত্মগোপন করে তারা দুজন।

সকালের দিকে সুবলসখার সঙ্গে অতুল বাড়ি ফেরে, সঙ্গে একরাশি বকফুল—যেগুলি ওকে খাওয়ার জন্য ঘুষ দেয় কন্ট্রোলের লাইনের একজন লোক তার বদলে দু'ঠোঙা চাল অতুল ছেড়ে দেবে এই ভেবে এবং সেই সঙ্গে এনেছে সাধারণ মানুষদের অতিকষ্টের অভাবের জীবন ও চরম অসহায়তার রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা। সেদিন অতুল করুণার বিবাহবার্ষিকীর তারিখ। করুণা এমন দিনে কোনো দামী শাড়ি নয়, চায় শুধু তার খোঁপায় ওই বনফুল যা স্বামী নিজের হাতে পরিয়ে দিলেই তার পরম উপহার-প্রাপ্তির সুখ গভীর হবে। অতুল পরায় দুটি মাত্র ফুল বাজে খরচের মতো, বাকি সব তার ভেজে খাওয়ার শখ। বিনিময়ে করুণা এমন বিবাহবার্ষিকীর উপহার হিসেবে দেয় ঘনিষ্ঠ চুম্বন। এই উপহার, করুণার ঠোঁটের স্পর্শের ঘ্রাণ অতুলের নতুন অভিজ্ঞতার কাছে কন্ট্রোলের লাইনের ধারের ড্রেন থেকে উঠে-আসা দুর্গন্ধের মতো। অতুল গভীর কোনো বিতৃষ্ণার অনুভূতির মধ্যে চলে যায়।

'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পের কাহিনী দুই বেয়াই রসিকমোহন-মনোহর, অতুল-সুবলসখা, রামচরণ, করুণা-অতুল—এমন সব সম্পর্কের স্তর ধরে চরিত্রগুলির অন্তঃস্বভাবের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। কাহিনীর প্লট প্রধানত চরিত্রনির্ভর। বিবরণ কম, ঘটনাও বড় আকারে কোথাও নেই। কলকাতার বিলাসবহুল বাঁধাধরা কঠিন নিয়মের, শাসনের জীবন থেকে নায়ক অতুলের একেবারে নীচের তলার মানুষের সঙ্গ-সম্পর্কের সূত্রে নতুন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত মানসিকতার চিত্ররূপেই 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পটির মূল প্লট বা কাহিনীবৃত্ত একটি নির্দিষ্ট আকার পেয়েছে। গল্পের আরম্ভে প্লটের প্রস্তুতি, গল্পের শেষতম বাক্য তার

ব্যঞ্জনাময় পরিসমাপ্তি। মনোজ বসু কাহিনী রচনায় কোথাও বিবরণধর্মিতাকে আখ্যান-দেহে প্রশ্রয় দেননি। সামান্য কিছু ঘটনা আদৌ বহিরাশ্রয়ী নয়, নায়ক-নায়িকার মানস গঠনের উপযোগী—মনস্তাত্ত্বিক ও গভীরাশ্রয়ী।

দুই

মনোজ বসুর হাতে ছোটগল্পের চরিত্র সহজেই সজীব হতে পারে। এই সজীবতা তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির অভিনবত্ব যেমন, তেমনি তাঁর নির্মল কৌতুকরস দিয়ে চরিত্রদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের চিত্র উপস্থাপনেও মেলে। নায়ক চরিত্র নির্বাচন করতে বসে লেখক ধনীর দুলালকে নিয়েছেন ঠিকই, সেই নেওয়ার মধ্যে ধনিক শ্রেণীর প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক বিক্ষোভ, ঘৃণা বা সামাজিক কোনো শ্রেণীর প্রতি বিদ্রোহ—এসব এতটুকুও প্রকাশিত হয়নি। একটি সম্পূর্ণ, পারিবারিক সম্পর্ক-চিত্রের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত শিল্পকৌশলে লেখক তাঁর নায়ককে বিশিষ্টতা দিয়েছেন। নায়ক অতুল উদারচিত্ত, ফুর্তিবাজ, দিলখোলা মানুষ। পিতার প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তি কম নয়, কিন্তু পিতার শাসন-অনুশাসন যে তাকে রুদ্ধশ্বাস করে এবং এটা থেকে যে-কোনোভাবে কিছু সময়ের জন্যও মুক্তি পেতে চায়, তার স্ত্রী করুণার সঙ্গে কথোপকথনেও তা বোঝা যায়। ধনীর দুলাল এবং একমাত্র সন্তান ও অত্যন্ত আদুরে, সোনার চামচ মুখে দিয়ে লালিত-পালিত হলেও সে তার স্তরের বা শ্রেণীর আভিজাত্যকে এতটুকুও আমল দেয় না।

তাই মফস্বল শহরের শ্বশুরবাড়ি আসার পথে সুবলসখার মতো ভৃত্যের সঙ্গে সহজেই মিশে যায়। অতুলের সূক্ষ্ম হিউমারবোধ তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুবলসখার সঙ্গে তাদের মতো করে গাঁজা খাওয়া, হাউসবোটের মাঝির হাত থেকে হাল নিয়ে নিজেরই তৎপর-হওয়া, সুবলসখার সঙ্গে পাশাপাশি সাধারণ গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে বসে যাত্রা দেখা—এসব কোনো ধনীর সন্তানের একদিনের বিলাসী বড়লোকের মুখ-বদলানোর মতো খেয়াল নয়, এসবই তার স্বভাব-নিহিত ধর্ম। বাবার শাসনে কলকাতার পরিবেশে তা ছিল সুপ্ত, সুযোগ বুঝেই প্রকাশ পেয়েছে। সবশেষে কন্ট্রোলের লাইনের অভিজ্ঞতা অর্জন বস্তুত অতুল চরিত্রের বিবর্তনের পক্ষে ক্লাইম্যাক্স অংশ।

শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে, বানানো আভিজাত্যে অতুলের স্পৃহা নেই। স্ত্রী করুণার শাসনও সে তোয়াক্কা করে না। অবলীলায় সুবলসখার ঘরের মধ্যে আসে, কিছু সময় কাটায়ও। বাড়ির ভৃত্যকে সে করেছে সুহৃদ। এই যে ধীরে ধীরে নিজের সামাজিক স্তর থেকে নীচে নেমে আসা, এটাই অতুলের জীবনে উত্তরণ। সুবলসখা যেহেতু ভৃত্য, সুতরাং তার প্রতিদিনের বাস করার ঘরটির স্বরূপ অতুল গভীর মমত্ববোধ ও সমবেদনা দিয়েই লক্ষ করে : 'অতুল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরখানা দেখছে। জানালার বালাই নেই। এই দুপুর বেলাতেও আবছা আঁধার। টিকে ধরাবার জন্য টেমি জ্বেলেছে, আলোয় বিচলিত হয়ে কতগুলো আরশোলা উড়তে লাগল। অতুল বলে তোফা জায়গা' রোদ আসে না। হাওয়া আসে না। ম্যালেরিয়া ধরবার ভয় নেই। তা বাবুরা নিজে না থেকে, তাদেব দিয়েছে এমন

খাসা ঘর?' এমন শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য অতুল নিজের স্তরের মানুষদের সম্পর্কেই অবাধে করে যায়। এখানেই চরিত্রটির মহত্ত্ব ও বড় মনের পরিচয়।

কন্ট্রোলের লাইনে বসে অচেনা নীচের তলার মানুষের কাছে তার অকপট স্বীকৃতি : 'ভাগ চাচ্ছিনে বাপু। আমাদের ভাগ আগেভাগে আলাদা করা থাকে, আপনা-আপনি এসে যায়। লাইনে বসতে হয় না। যত খুশি খাই, ফেলাই ছড়াই—ফুরোয় না।' অতুলের এই সারল্য, এই অন্তরঙ্গ হওয়ার মানসিকতা, একেবার অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষগুলির সঙ্গে এক লাইনে বসে-যাওয়া—তার উঁচুতলা আভিজাত্যের, গর্ব-গরিমার আবরণকে সহজেই সরিয়ে দেয়। নায়কের এই চরিত্র-পরিচয় আদৌ কষ্ট-কল্পিত নয়, চরিত্রের ন্যায়েও চিত্রিত। অন্ধকার-ঢাকা কন্ট্রোলের লাইনের আগে-পিছের মানুষগুলির কথা ভেবে অতুলের অভিজ্ঞতা তার ভাবী জীবন ধারণ ও যাপনের উপযুক্ত আলো যেন :

> 'খুশি হয়ে অতুল সামনে পিছনে তাকায়। না, একেবারে ভিন্ন জাত হয়ে ভিন্ন সমাজের মধ্যে বসে গেছে। ওরা মোটরে চড়ে খোঁজাখুঁজি করবে, এত নিচেয় নজর নামবে না। নিশ্চিত হয়ে পাশের লোকটির সঙ্গে সে আলাপ জমিয়ে তোলে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একই শহরে প্রায় এক জায়গায় বসবাস—তবু এত দূরবর্তী এরা।'

দুর্গন্ধ ড্রেন, নীচের তলার মানুষের শরীরের ঘ্রাণ, তাদের অভিযোগহীন অসহায় জীবনধারণ, কষ্ট, মন্বন্তরের অভিঘাতে বকফুলকেও খাদ্য করে উদর ভর্তি করার প্রয়াস, তাদের দুমুঠো চালের জন্য লাইনে বসার ধৈর্যের পরীক্ষা—অতুলকে যে মনের জগতে স্থিত করে, সেই জগৎই তার বিবাহবার্ষিকীর দিনে স্ত্রী করুণার চুম্বনকে বিস্বাদ, কৃত্রিম, তুচ্ছ, পচা-পরিত্যক্ত কোনো বস্তুর অস্তিত্বের মতো অনুভূতির বিষয় করে তোলে। বিবাহবার্ষিকীর ব্যক্তিগত আনন্দ, সুখ তার কাছে নিষ্ফল হয়ে যায়। ফুল হয় রূঢ় বাস্তব প্রয়োজনের, ক্ষুধা মেটাবার খাদ্যের বিষয়, স্ত্রীর খোঁপার বিলাস তাকে বরং ব্যঙ্গই করে। অতুলের এমন যে মানস-পরিণতি, তার মধ্যে লেখক মনোজ বসুকে বিষয়-ভাবনায় সর্বহারাদের মধ্যে নামতে দেখি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের গল্পে লেখক যে প্রকৃতিকে রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনায় মনোরম করার পক্ষে বিলাসী-মন হয়েছিলেন, যুদ্ধ-সময়ের গল্পে সেই প্রকৃতির অনুষঙ্গকে রূঢ় বাস্তবের সত্যে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির গল্পকার মনোজ বসু অতুল চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে হয়েছে প্রাকৃতজনের গল্পকার।

করুণা অতুলের যোগ্য সমধর্মিণী! অতুলকে সে ভালোভাবেই চেনে। স্বামীর মতোই তার কৌতুক রসবোধ, বাক্‌চাতুরী। কথায় কথায় অতুলকে কাছে আনতে পারে, তার ভালোবাসাও দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ স্ত্রীর মতো স্বামী অতুলকে নিয়ে তার দুর্ভোগও কম নয়। এমনকি জামাতা হিসেবে শ্বশুরবাড়িতে তার আভিজাত্য বজায় রাখা উচিত, মান-ইজ্জত বাঁচানো কর্তব্য—এই বক্তব্য করুণা স্বামীকেও শোনায়। সুবলসখার ওপরে উঠে আসা সম্পর্কে স্বামীকে বলে—'আসতে দিতেই নেই। বাইরের চাকর-বাকর দোতলার ঘরে এসে ঢুকবে সে কি?' আবার স্বামী ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে যায়—এটাও তার গর্হিত কাজ ভেবে স্বামীর কাজ সামলানোর জন্যে নিজের বাবাকে মিথ্যে বলতেও

ইতস্তত করে না। বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাধারণ মেয়েদের মতো বাড়িতে জমানো শাড়ির পাহাড়ের ওপর আরও শাড়ি জমানোয় তার এতটুকু আনন্দ নেই। সেও ধনীর কন্যা এবং একমাত্র কন্যাই। তাই তার শাড়ির পাশাপাশি কিন্তু রোমান্টিক পিপাসাও বেঁচে থাকে। সে এখনো ফুল ভালোবাসে এবং সে ফুল যতই সাধারণ হোক, স্বামীর নিজের হাতে খোঁপায় উঠলে তার আরও আনন্দ! করুণা আলোচ্য গল্পে এক উদার-স্বভাব, হিউমারবোধসম্পন্ন সংসারী স্ত্রী-প্রেমিকা হিসেবে সার্থক চরিত্র। স্বামীর ওপরের স্বভাবের সে সঙ্গী। কিন্তু ভিতরের স্বভাবের মধ্যে তার দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা ও সাহস আছে বলে মনে হয় না। সর্বহারাদের স্তরে ক্রমশ নেমে যাওয়ার ব্যাপারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী হতে পেরেছিল তার স্ত্রী, মনোজ বসুর 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পের করুণা সেইরকম স্ত্রী হতে পারেনি।

গল্পের সুবলসখা নামের ভৃত্য চরিত্রটি আর এক অভিনব সৃষ্টি লেখকের। সুবলসখা গল্পের মধ্যে যেমন প্রচুর কৌতুকরসের জোগান দিয়েছেন, তেমনি তার পরিকল্পনা ও উপস্থিতি নায়কের চরিত্র-বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। অতুল তার প্রভুর আদরের জামাই, প্রভুর মতোই, কিন্তু অতুলের ব্যবহারে সে ক্রমশ তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, বন্ধুর মতো হয়ে গেছে। অতুলকে সম্মান দিয়েই সে ঘুরে বেড়িয়েছে। বোটে তার গাঁজার কলকে টানা, তার গ্রাম সাঁইতলা প্রসঙ্গ, সেখানে একাধিকবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার কাহিনী বর্ণনা, পুলিশি ভয়, —এসব যেমন গল্পে কৌতুকরসের জোগান দেয়, তেমনি সুবলসখার জীবনের কারুণ্যকেও স্পষ্ট করে। অতুলের বদ্ধ জীবনের অসহায়তা সুবলসখা তার মতো করে অনুভবের মধ্যে কিছুটা সহানুভূতিও আনে মনের মধ্যে অতুলের প্রতি। তার বুদ্ধি ও কৌতুক-রসবোধ তীক্ষ্ণ সজাগ। অতুলের কাছ থেকে অভাবনীয় দু'টাকা বকশিশ পেয়েই গলা নামিয়ে সুবল বলে, 'কি করতে হবে বলুন তো—', এমন কথার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাকে অকৃতজ্ঞ করে না। সুবলের হিউমার-বোধ প্রচ্ছন্ন এবং স্বতঃ-উৎসারিত। ভোর রাতে রামচরণ—অতুলরা ফেরেনি, গেট খোলা-থাকায়, তা বাবুর জানতে পারার ভয়ে যখন নিজেরই গায়ের কাপড় চুরির কথা জোর গলায় বাবুকে জানায়, তখন 'সুবলের ইচ্ছে করে, তার টুঁটি চেপে ধরে বলে চুরি করবার কি জিনিসখানা রে! গন্ধে ভূত পালায় তা-ও যদি লেংটি ইঁদুরে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে না রাখত!'— এমন সংলাপে সহজ রসবোধ সক্রিয়। অতুলের বাবা রসিকমোহন ও শ্বশুর মনোহর বাস্তব সংসারের ধনী বয়স্ক স্নেহশীল মানুষের উপযোগী টাইপ চরিত্র।

তিন

'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীতে রাখাই উপযুক্ত। নায়ক অতুলের চরিত্র-পরিবর্তনের বাস্তব সার্থক চিত্র অঙ্কনই গল্পের মূল লক্ষ্য। শ্রেণীবৈষম্য মানুষে-মানুষে ভেদের দিকগুলিও এ গল্পের বিষয়ে নিহিত আছে। সামাজিক সমস্যা—অর্থাৎ উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্তের মধ্যে বিত্ত-নির্ভর মানসিকতার মৌল পার্থক্যের দিক—তা-ও এ গল্পে প্রকট। এই গল্পের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়েছে কাহিনীর সূত্রে নয়, একটি বিশেষ চরিত্রের

স্বভাবের সূত্রে। এ গল্প, আগেও বলেছি ঘটনানির্ভর নয়। একটি বিশেষ চরিত্রের প্রকাশমূলকতা এই গল্পের সামগ্রিক আবহে সক্রিয়। যেভাবে অতুল গল্পের প্রথম থেকে ধীবে ধীবে নীচের তলার মানুষের মধ্যে নেমে এসেছে, তাতে ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়েছে বক্তব্যের তীব্রতায়। যে অভিজ্ঞতায় প্রায় দীক্ষিত হয়ে অতুল সকালে বাড়ি ফিরে স্ত্রী করুণার মুখোমুখি হয়, সেই অভিজ্ঞতাই আনে গল্পের চরমক্ষণের মুহূর্তটির শুরুর অংশ:

> 'বক ফুলের রাশি বের করল অতুল।
>
> করুণা আবদার করে বলে, তুমি আমার চুলে পরিয়ে দাও।
>
> পরাব মানে! ভাজা করে দিতে হবে।...আচ্ছা, আচ্ছা, —মুখ হাঁড়ি করো না, দিচ্ছি দুটো। ধরা যাক এ দুটো বাজে খরচ আজকের দিনে।'

এখানেই ক্লাইম্যাক্সের বিস্তার এবং শেষ হল :

> 'ছিটকে সরে গেল অতুল। দু'হাতে মুখ ঘষে আর বলে, দুত্তোর! পাউডার লেপটে দিলে খানিক। গন্ধে গা কেমন করছে।'

গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদটি হল সার্থক পরিণামী-ব্যঞ্জনায় দীপ্ত catastrophae অংশ। ভাবের একমুখিনতার দিকটিও মূল চরিত্রকে নির্ভর করে দেখা দিয়েছে, আদৌ অপ্রয়োজনীয় বিস্তার নেই এ ব্যাপারে। বাবার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলে অতুলের বিশেষ মনটিকে স্পষ্ট করে ক্রমশ করুণা আর সুবলসখাই, এবং সুবলসখার সূত্রে কন্ট্রোলের লাইনে বসে পড়ার অভিজ্ঞতা। গল্পের শেষের চিত্রে একদিকে করুণার রোমান্টিক প্রেমবিলাসের আচরণ, অন্যদিকে অতুলের গভীর অভিজ্ঞতাজাত বিপরীত স্বাদের বাস্তব ভিত্তি---গল্পের ভাবগত ঐক্য ও একমুখিন স্বভাবকে তির্যকতা এবং কেন্দ্রিকতা দিয়েছে। মনোজ বসু কোথাও বিবরণের আশ্রয় নেননি বলেই গল্পটি গতিপ্রাণ। সংলাপের মধ্যে কৌতুকরসের প্রবাহ আলাদা স্বাদ দেয়।

ভাষা ব্যবহারে লেখকের নিজস্বতা লক্ষ করার মতো। আগাগোড়া কৌতুকে মোড়া 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পের ভাষা ও বাক্‌রীতি। রসিকমোহনের স্নেহার্ত স্বভাবের অতিরিক্ততা যেমন গল্পের কৌতুকের পরিবেশ রচনা করে, তেমনি অতুলের একাধিক সংলাপ নির্মল হাস্যরসের জোগান দেয়।

> ১. করুণাকে বলা বিরক্ত অতুলের সংলাপ : 'কেরানির রবিবার আছে, রাস্তায় মুটেরও রাত্তির বেলা মাথায় মোট থাকে না। কিন্তু দিন রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে মাল বয়ে বেড়াতে হবে—কি জ্বালা বলতো?'
>
> ২. সুবলসখার গাঁজার কলকে হাতে নিয়ে অতুল সুবলকে বলে : 'পিছন ফিরে ভক করে ধোঁয়া ছেড়ে দিলি, মাঝি তামাক খেয়ে তোর মুখের মধ্যে ধোঁয়া পুরে দিয়েছিল বুঝি?'

এমন সুবলের সঙ্গে অতুলের একাধিক সংলাপ-বিনিময়, করুণাকে বলা সংলাপ মনোজ বসুর রচিত সংলাপের মধ্যেকাব সহজ নির্মল কৌতুকরসের জোগান দেয় পাঠকমনে। যেখানে হঠাৎ-হঠাৎ অতুলের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, সেখানকার ভাষা ও গদ্যভঙ্গির চমৎকার শ্লেষ মনে বেজে যায়। 'কন্ট্রেলের লাইন' গল্পের ভাষা ও গদ্যরীতি, সংলাপবৈশিষ্ট্য গল্পের গতিকে কোথাও এতটুকুর জন্যেও থামতে দেয়নি। যুদ্ধ ও হা-অন্নের চরম পরিবেশে

গ্রামের পটভূমিকায় মনোজ বসু যে গল্প উপহার দিয়েছেন, তা সমকালীন সমাজব্যবস্থা ও সমাজ-অভিজ্ঞতারই তিক্ত দিক—কেবল ভিটামিনের বড়ির মতো সমগ্র গল্পের ওপর আবরণ দেওয়া আছে কৌতুকরসের মিষ্টত্বের।

চার

নাম ব্যবহারে মনোজ বসু 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পের ক্ষেত্রে গভীর ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেননি। অতুলের যে নতুন জাগরণ, তা কন্ট্রোলের লাইনে কিছু সময় কাটানোর অভিজ্ঞতাতেই সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধ-সমকালে নিবন্ন মানুষের কাছে কন্ট্রোলের লাইন দেওয়া একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ এইভাবেই তখন দরিদ্র সাধারণ মানুষের খাদ্যের সংস্থান সম্ভব হত। শুধু তা-ই নয়, এই লাইন দেওয়ার মধ্যে চরম অনিশ্চয়তাও ছিল খাদ্যের জন্য। পয়সা দিয়েও বরাদ্দ অংশ পাওয়ার ব্যাপারে। মনোজ বসু কন্ট্রোল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি, কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে সাধারণ মানুষের হয়রানি, অসহায়তা, জীবনযাপনের নিষ্ফলত্বের দিক উঠে আসে, অতুলেব ওপর তার প্রতিক্রিয়ার চিত্র দিয়েই বক্তব্য কেন্দ্রাভিমুখী করেছেন। 'কন্ট্রোলের লাইন' থেকেই পাঠক জানতে পারে, ওপরওলা ও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে সহজেই খাদ্য মেলে, সাধারণ মানুষ তার নাগাল পায় না। কন্ট্রোলের লাইনে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয় দুর্গন্ধময় পরিবেশের মধ্যে অসহায়ভাবে থেকেই। মানুষ কত অসহায়, সমবেত মানুষের একতায় নয় বিচ্ছিন্নতায় নিরন্ন জীবন কিভাবে অবহেলিত হয়—তার পরিচয় পায় অতুল এই গ্রামের কন্ট্রোলের লাইনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। আর সমগ্র গল্পের পরিণামী-ব্যঞ্জনা জনতা থেকে সরে এসে ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের মূলে আঘাত করে। করুণা-অতুলের রোমান্টিক সম্পর্কের চিত্রে বিপরীত ভাবের আঘাতে সেই নব আদর্শের দিক ধরা পড়ে নায়কের অভিব্যক্তিতে। তাই 'কন্ট্রোলের লাইন' গল্পের নাম গল্পের মূল ভাবের যোগ্য একটি কেন্দ্রীয় ছোট ঘটনার পরিপোষণ করায় নামটি আকারে ঈষৎ ব্যাখ্যামূলক হলেও গভীর ব্যঞ্জনা পায়।

এমন গল্প-নামের আর একটি তাৎপর্য রাখা যায়। বাবা এবং শ্বশুর, এমনকি স্ত্রী করুণার কাছেও অতুলের দৈনন্দিন জীবন-স্বভাব ধনীর আভিজাত্যে, স্নেহে, প্রেমে সংযত, নির্দিষ্ট শাসন-নিয়মের অধীন থাকার কথা। কঠিন নিয়ন্ত্রিত প্রথাবদ্ধ জীবন-স্বভাবে অতুল যে লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিত্ব, তা থেকে সে যাবতীয় অনিয়মে বেরিয়ে আসতে চায়, এসেছেও, বাস্তবের কন্ট্রোলের লাইনের অব্যবস্থা আর অতুলের মুক্তি এক। নামে তাই ব্যঞ্জনা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জন্ম: ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩
মৃত্যু: ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৬

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মূলত 'কল্লোলে'র লেখক এবং কল্লোলপন্থী লেখক। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কল্লোলের যোগের সূত্রে অচিন্ত্যকুমারকেও এঁদের সাহিত্যের দোসর বলতে বাধা থাকে না। কল্লোলের যে তথাকথিত বিদ্রোহের ধর্ম, বা যে রবীন্দ্র-ভাবনার প্রতিক্রিয়ায় কল্লোলের আবির্ভাব, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ওপর তার দায়ভাগ নিশ্চয়ই বর্তায়। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে, বাংলা ১৩৩০ সালে বিশেষ পত্রিকা 'কল্লোল' যে সাহিত্য-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়, বাংলা কথাসাহিত্য অন্যান্য শিল্পশাখার মতো লক্ষণীয় যেসব পরিবর্তনে চিহ্নিত হয়—পরিবর্তন ঘটে তার প্রসঙ্গে যেমন, প্রকরণেও তেমনি।

গল্পকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে, তাঁর মানস গঠনকে এই বক্তব্যের সূত্রে বিচার করাই শ্রেয়। 'কল্লোলে' লেখার আগেও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত গল্প লেখেন। তার প্রকাশ-আধার মাসিক 'ভারতী' পত্রিকা, বাংলা সাল ১৩৩০, পৌষ সংখ্যা। কল্লোল-নির্ভর সময় ও সাহিত্য-প্রতিক্রিয়াজাত আন্দোলনের অন্যতম হোতা অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কল্লোলে প্রকাশিত গল্পটির নাম হল 'গুমোট', ১৩৩৯ সালের অর্থাৎ 'কল্লোলে'র দ্বিতীয় বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় তার পত্রস্থ হওয়ার সংবাদ মেলে। বিখ্যাত 'বেদে' গ্রন্থটি—যাকে কেন্দ্র করে সে সময়ের সাহিত্য-প্রতিক্রিয়ার প্রথম পরিচয় মেলে, তার প্রকাশ ঘটে, 'কল্লোলে'র চতুর্থ বর্ষের সংখ্যাগুলিতে।

এসবই এই লেখকের সে সময়ের সাহিত্য-সৃষ্টির তথ্যনির্ভর সংবাদ। এই সংবাদ থেকে সে সময়ের নির্দিষ্ট রচনাগুলি পাঠ করার পর অচিন্ত্যকুমারের মানসিকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সামনে আসে। ১. অচিন্ত্যকুমার কথাসাহিত্যেও কবিদৃষ্টিকে অস্বীকার করতে বা এড়াতে পারেননি। ২. প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অর্থনীতি-নির্ভর হতাশা তাঁর নায়ক-নায়িকাদের ওপর অবধারিত ছায়াপাত ঘটায়। ৩. যে শূন্যতা মানুষকে প্রতিষ্ঠিত সব কিছুকে অস্বীকার করতে শেখায়, তার সেই অস্বীকৃতির মূলে নির্দিষ্ট আদর্শের অভাব প্রকট হয়ে থাকে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেই অস্বীকারকে কারণহীন রোমান্টিকতা দিয়ে কথাসাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। ৪. একালে লেখকদের শিল্পী-মনে ছিল এক অনাস্বাদিত যৌবনচেতনা, যা ফ্রয়েডীয় যৌন ভাব-ভাবনাকে গ্রহণ করে কথাসাহিত্যে আশ্রয় নিতে তৎপর হয়।

দেহভোগ, আবেগাকুল দেহবিলাস নিরাশ্রয় যুবমনের পক্ষে যেনবা আর এক আশ্রয় হয়ে দেখা দেয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মনে-প্রাণে কবি ছিলেন। কবিপ্রাণের ভাবসংহতি তাঁকে গল্পকার হতে সাহায্য করে। তিনি একদিকে যেমন কল্পনার আশ্রয়ে সুদূরের দিকে স্থির-দৃষ্টি, নিষ্পলক, তেমনি রূঢ় বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় হন জীবনের দৃঢ়-অর্থসন্ধানী কথাকার। দুই মিলে-মিশে অচিন্ত্যকুমারের মানসিক গঠনকে বিচিত্র করেছে। সে সময়ের সরকারি বিচারবিভাগে মুন্সেফ, সাবজজ, ডিস্ট্রিক্ট জজ—এসব কাজে জড়িত থেকে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগৎ তৈরি করেন লেখক-মনোভঙ্গিতে, তা তাঁর গল্পকার সত্তাকে কঠিন মাটি দেয়। তাঁর জীবন সচেতনতা তাঁর গল্পগুলির ভিতরের শিল্পশক্তি। এই শক্তিতেই অবলীলায় বিচিত্র সব গল্প লিখে গেছেন।

গল্পকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিশিষ্ট মানসিকতার প্রধান দুটি পর্যায়—একটি কল্লোলের কাল থেকে প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাল-সীমায় ধরা লেখক-মনের রচনা, আর একটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল নিয়ে ফিনিক্স পাখির মতো নবজন্মের অভিজ্ঞতায় গঠিত মনোভঙ্গির গল্প। 'সারেঙ' (১৯৪৭) গ্রন্থভুক্ত 'সারেঙ' গল্পটি দ্বিতীয় স্তরের বিশেষ মনোভঙ্গির গল্প ভাবনার দৃষ্টান্ত।

যুগের যুব-জনচিত্তে যে হতাশা, অনন্বয়, অনিকেত অসহায়তা, নিষ্ফলত্ব দানা বাঁধছিল, ক্রমশ যুবকদের করছিল গভীর বিষাদগ্রস্ত, বালির মতো ভঙ্গুর মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যুবকরা বাঁচার জন্য শ্রমে ক্লান্ত হচ্ছিল, অচিন্ত্যকুমার সেই সব তরুণদের স্থান দিলেন তাঁর কথাসাহিত্যে, ছোটগল্পে। পরিবাব ও সমাজ-বিচ্যুত এই সব তরুণ লেখকের কলমে হয় নিরুদ্দেশ বোহেমিয়ান। এদের কথাকে অচিন্ত্যকুমার জন্ম-রোমান্টিকেব বৈশিষ্ট্যে গল্পে এনেছেন। আর এই বৈশিষ্ট্যেই তাঁর একাধিক উপন্যাসে তাঁরই ভাষায় 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা', এসেছে 'বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ'-এর চিত্র-চরিত্র, এসেছে নর-নারীর বাস্তব মিথুন-স্বভাব।

অবশ্যই ছোটগল্পে অচিন্ত্যকুমার মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক সংকটের রুদ্ধশ্বাস রূপকে আঁকতে ভুল করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের গল্পে কৃষক-মজুরদের আঁকতেও ভোলেননি। মহামন্বন্তরের কালে বসে এই লেখক 'যতনবিবি', 'সারেঙ', 'হাড়ি মুচি ডোম' এর মতো গল্প লিখে গেছেন। অবশ্যই গল্পের বাস্তবতা লেখকের দূরান্বয়ী রোমান্টিক আদর্শ ভাবনায় শীলিত হয়ে রুক্ষ স্বভাব ত্যাগ করে একধরনের বিলাসের শিল্পরূপ পেয়ে যায়।

অচিন্ত্যকুমার গল্পে শহবজীবন, শহবতলির জীবন যেমন পট কবেছেন, তেমনি নিজের কর্মসূত্রে নানা জায়গায় বদলি হওয়ার কারণে শহর থেকে দূবের, গ্রামজীবনের কথাকে

বাদ দিতে পারেননি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নানান দুঃখী দরিদ্র মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন বলেই নিম্নবিত্তের জীবন-সীমাকে সঠিক চিহ্নিত করতে পেরেছেন গল্পে। 'বেদে'র নায়ক কাঞ্চন যাদের সান্নিধ্যে এসেছে বা যাদের দেখেছে তার ভবঘুরে জীবনে চলার পথে, তারা শহরের অন্ধকার জীবনের মানুষ, অন্ধকার হল দারিদ্র্যের, অসহায় অর্থনীতি-ভাগ্যের।

এরা উপন্যাসের চরিত্র যেমন, তাঁর গল্পেও জায়গা পেয়ে যায়। 'দুইবার রাজা', 'ইতি', 'যে কে সে', 'কাঠ খড় কেরোসিন', 'ধন্বন্তরি' ইত্যাদি গল্প তার দৃষ্টান্ত। 'দুইবার রাজা' গল্পের মৃত্যু দিয়ে অন্তিমে যে তার অস্তিত্বের দুই নিষ্ফল রূপের বৈপরীত্য, 'ইতি' গল্পে এক পতিতা রমণীর যে অন্তিম ভঙ্গ-বাসনা, 'ধন্বন্তরি' গল্পের কঠিন রোগে আক্রান্ত গরিব নায়ক রেবতী ও তার স্ত্রী শিখার অসহায় জীবন-স্বভাবের বিপরীতে সুস্থ, প্রচুর সম্পদের অধিকারী ডাক্তারের যে ছবি—তা লেখকের গল্পকার সত্তার বিশেষ রূপের প্রামাণ্য হয়।

১.

সারেঙ

এক

'সারেঙ' গল্পটি ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত লেখকের 'সারেঙ' গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত একটি রচনা। গল্পটির রচনাকাল ১৩৫২ সাল। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও ১৩৫৪ সালে তার রেশ যখন জনমানসে ভয়ে, তিক্ততায় চেপে বসে আছে, তখনকার রচনা এই গল্প। এত বড় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেলেও, এত আন্দোলন, প্রতিবাদ চতুর্দিক ছেয়ে ফেললেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদে অভ্যস্ত, ঔপনিবেশিক জীবনব্যবস্থায় অভিজ্ঞ ভারতবাসীর পক্ষে তখনো স্বাধীনতার আশ্বাস মেলেনি। চারপাশ উত্তাল। দেশীয় এই পরিবেশে বসে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত গল্পটি লিখেছেন। অচিন্ত্যকুমারের রচনা থেকে তখন কল্লোলের প্রতিক্রিয়াজাত জীবনভাবনা অপসৃত হয়ে গেছে।

'সারেঙ' গল্পের কাহিনী-অংশ অতি সামান্য। অচিন্ত্যকুমার কখনোই কাহিনীকে তাঁর গল্পে প্রাধান্য দেননি। বুদ্ধিদীপ্ত কথার ঔজ্জ্বল্য দিয়ে তিনি তাঁর গল্পের সামান্য কাহিনী ও গল্পাংশকে আলোকিত করতে অভ্যস্ত। 'সারেঙ' গল্পে তাই না আছে কাহিনীর বিবরণধর্মিতা, গল্পের ঘটনা-স্বভাব, না কোনো বড় ঘটনার ব্যঞ্জনাগর্ভ পরিণামী আঘাত। এর সামান্য যেটুকু কাহিনী, তাতে আছে এক সারেঙের চরিত্র-কথা। চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই রচনা করেছে কাহিনী, আর তাব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাসিম নামে এক কিশোরের চাপা আত্মনিগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা।

নাসিমের বাবা মারা যাবার পর মা গোলবানু আবার ধনী গহরালিকে বিয়ে করে নতুন সংসার করতে চায়। কিশোর নাসিম সেই ব্যবস্থার ঘোরতর প্রতিবাদ যেন। যে গহরালির তার ওপর অত্যাচার, তাতে আছে মায়ের সমর্থন। এসব সহ্য করতে না পেরে ঘৃণায় মায়ের সান্নিধ্য ছেড়ে চলে আসে স্টীমারে গোপনে। স্টীমারের সারেঙ সকলের কর্তা। তার কথাতেই সকলে তটস্থ, সকলে তার অবনত। নাসিম সেই স্টীমারেই বহাল হয়ে যায়। যে প্রহার সে গহরালির কাছ থেকে পেত মায়ের কাছে থাকার সময়, সারেঙের সেই প্রহার আরও বেশি হয়ে আসে নাসিমের কাছে। তা সহ্য করে নাসিম নিজেকে বাঁচানোর জন্যে, বড় হয়ে ওঠার জন্যে। এ ব্যাপারে সে জাহাজের আর সব শ্রমিকদের আশা-নিরাশা, দুঃখ-যন্ত্রণার অন্যতম শরিক হয়ে যায়। সারেঙের প্রহার, সমস্ত রকম অবজ্ঞা, অত্যাচার তার ক্রমশ সহ্য হয়ে আসে।

সারেঙের পরোক্ষ প্রশ্রয়েই নাসিম স্টীমারের যাত্রীদের টাকা-পয়সা, গয়না চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। চুরির সমস্ত পয়সা কিন্তু সারেঙের হিসেবে যায়, নাসিম পায় না, পাবেও না। চুরির অভ্যাসে একদিন রাতে এক নতুন বৌয়ের গলার হার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, যাত্রীদের হাতে বেদম মারও খায়। তাকে মারের হাত থেকে বাঁচায় সারেঙ। যে ছিল সত্যিই ভৃত্য, তাকে সারেঙ সামাল দেয় সকলের সামনে পুত্রের স্বীকৃতি দিয়ে। নাসিম অবাক। ৺া৭ অতীত পুত্রস্নেহের স্মৃতিতে নতুন বৌ গোলবানু—যার গলার

হার নাসিম নিতে গিয়েছিল, সেও নাসিমের হার চুরির ঘটনাকে অস্বীকার করে। সঙ্গে আছে গহরালি যে চুরির দায়ে কিছু আগে নাসিমকে অসম্ভব প্রহার করেছিল! লতাবাড়ি স্টেশনে নামল গোলবানুরা। নাসিমের হল সেই কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, ভৃত্য থেকে সিঁড়ি ধরার শ্রমিক। সে জলের ছায়ায় দেখে তার নতুন বৌ-সাজা পুরনো মায়ের মরা মুখ, আর অন্যদিকে স্টীমারের ডকে দেখে ব্যক্তিত্বে সূর্যদীপ্ত সারেঙের মুখ। গল্প এই ব্যঞ্জনায় শেষ।

আগেই বলেছি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কোনো গল্পেই কাহিনীকে প্রধান স্থান দেননি। গল্পে তাঁর কাহিনী-রচনা বুদ্ধিনির্ভর শিল্পাঙ্গিকের অনুগত। 'সারেঙ' গল্পের শুরু হয়েছে নাসিম আর তার বিধবা মা গোলবানুর সম্পর্কচিত্র দিয়ে। এর সঙ্গে গহরালির যতটুকু প্রসঙ্গ তা মনে রাখলে যে অঙ্গ স্পষ্ট হয়, তা হল, এটি গল্পের ভূমিকা। কিন্তু এই ভূমিকা অংশটি আদৌ প্রক্ষিপ্ত নয়। কারণ এই গহরালি-গোলবানু প্রসঙ্গ এবং নাসিমের মাতৃস্মৃতি, মাকে অস্বীকার—সমস্তই গল্পের পরিণামী-ব্যঞ্জনা আনার একমাত্র শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। কাহিনীটির বৃত্ত-বন্ধ এই ভূমিকা ও উপসংহার চিত্রের শিল্প-গুরুত্বে নির্দিষ্ট।

কাহিনীর সর্বাধিক অংশে আছে সারেঙ। সারেঙের সাহচর্য নাসিমের মধ্যে বার বার মায়ের মরামুখ দেখার প্রতীক্ষাকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং মাকে ছেড়ে নাসিম চলে গেলেও তার সমস্ত দুর্গতিব কারণ যে মা গোলবানুই, এটা সে শেষ পর্যন্ত ভোলেনি। গল্পের শেষ সেই মাকে দিয়েই—যে স্নেহের আবেগে তার হারচুরির অপরাধ থেকে তাকে বাঁচায় কিছুটা! কিন্তু তার কাছে সারেঙের নিজ পুত্র হিসেবে গ্রহণের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মায়ের সেই স্নেহ তুচ্ছ হয়ে গেছে, বরং নতুন বৌ হিসেবে মাকে গহরালির সঙ্গে দেখে সে সারেঙকে যতটা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করে তার থেকে অনেক বেশি ত্যজ্য মনে করে মায়ের সান্নিধ্য। সর্বশেষ জলের ছায়ায় মায়ের মরা মুখ দেখার মধ্যে সূক্ষ্ম কাহিনীর ও তন্নিহিত চরিত্রের আর এক বাঁক।

বস্তুত 'সারেঙ' গল্পে কাহিনী নগণ্য, ঘটনার মধ্যে গোলবানুর হার চুরির ঘটনা ছাড়া তেমন বড় কিছু আপাতত চোখে পড়ে না। আর ছোটখাটো যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি চরিত্রের সঙ্গেই ওতপ্রোত। কাহিনীর টানে তারা আসেনি, চরিত্রের স্বভাববৈচিত্র্যে তারা আপনা-আপনি রচিত হয়ে বরং সামান্য কাহিনী অংশকে যেমন তৈরি হতে সাহায্য করেছে, তেমনি তার অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্যকারী ঘটনা হয়ে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যে 'সারেঙ' গল্পের কাহিনী-বৃত্ত, ঘটনা, প্লটরচনা বিশিষ্ট।

দুই

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আছে কোনো চরিত্রকে দেখার মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আর সে দৃষ্টি বুদ্ধি-পরিশীলিত। সুতীক্ষ্ণ মননে এঁর চরিত্রগুলির রক্তমাংস গড়ে উঠেছে বলেই 'সারেঙ' গল্পের সারেঙ চরিত্রটি অনবদ্য একাধিক মাত্রা পেয়েছে। এ এক অভিনব চরিত্র। সারেঙ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, নায়ক বলা ভাল নাসিমকে। সারেঙের একনায়কতান্ত্রিক

মনোভাব, অত্যাচার, শাসন-শোষণ কিছুটা বুঝিবা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকার প্রতীকী তাৎপর্য পেতে পারে। গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের শেষ সীমায় লেখা। ভারত তথা বাংলাদেশ তখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের খেলনা।

সারেঙ চরিত্রটির এমন সূক্ষ্ম শিল্প-পরিমিতির মধ্যে উপস্থাপনায় চরিত্রটি লেখকের বাস্তব চরিত্রজ্ঞানের বিস্ময়কর পরিচয় দেয়। গল্পের আরম্ভে সে নেই, এসেছে দশ বারো বছরের ছেলে নাসিমের নিজের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার সূত্রে। সারেঙের কাছে বিনা মাইনের চাকরের কাজ করার বাসনা নাসিম জানালে সারেঙের সোজা সহজ যুক্তি—'ভালো করে কাজ-কর্ম করতে পারলে জাহাজেই বহাল করব একসময়ে। প্রথমেই সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ। কে বলতে পারে আগে বিনি-মাইনের চাকর, শেষ কালে এই জাহাজের জমিদার।' সারেঙের এমন কথায় যে নাসিমের ভাগ্যের সূক্ষ্ম সূত্র সমন্বিত, গল্প পাঠের শেষে তা বোঝা যায়।

স্টীমারের আর যারা বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক তাদের কথাতেই সারেঙের স্পষ্ট চরিত্ররূপ, নাসিম ধীরে ধীরে তা বোঝে। একটু ভুল হলেই নির্মম অকথ্য প্রহার, তার পরেও মাসিক বেতন থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা কেটে নেওয়া, যারা তোষামোদ করে তাদের বিশেষ সুবিধাদান, ক্ষতিপূরণ দিয়ে মাস শেষে টাকা কম পেলে সারেঙেরই সুদ-নিয়ে টাকা-ধার-দেওয়া, আগে খোরাকি বাবদ বরাদ্দ চাল নুন লঙ্কা পিঁয়াজ দিয়েও মাসান্তে তার মূল্য কেটে নেওয়া, আবার সেইমতো খাদ্যও স্টীমারের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে-বাঁধা বার্জে রাখা বস্তা বোঝাই চাল, নুন লঙ্কার অংশ থেকে গোপন চুক্তিমতো সরানো—এসব বৈশিষ্ট্য সারেঙ চবিত্রটিকে তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। থার্ডমেট আফসারউদ্দীন, বয়লারের খালাসি বিলায়েত আলী, সিঁড়ির ইনচার্জ মকবুল, হুইলকের লোক ইয়াদালি—এইসব শ্রমিকদের নানান কথা থেকেই সারেঙের পূর্ণরূপ তৈরি হয়ে যায়।

সারেঙ জাহাজের ইজারাদার। কোম্পানি সারেঙকে চেনে আর চেনে জাহাজের মোটা অঙ্কের মুনাফা। আর সব তার কিছুই দেখার কথা নয়। সারেঙই সেখানে সর্বেসর্বা। কোম্পানি শ্রমিকদের মাহিনা ইত্যাদি বাবদ যে টাকা দেয়, সারেঙ তা পায় এবং তা বিচার-মতো ভাগ করে দেয় শ্রমিকদের। জাহাজ যেন সারেঙের জমিদারি। সারেঙের কঠোর শাসন, ধমক, ভর্ৎসনা, মহাজনি-মানসিকতা, তার নিজস্ব আরাম-বিলাসের স্বার্থপরতা—এসবেই তার রাশভারী ব্যক্তিত্ব বিধৃত। তার ভয়ে গোটা স্টীমারের শ্রমিকরা তটস্থ। সারেঙের বিচার করাব অধিকার কারোর নেই। শ্রমিকরা সংঘবদ্ধভাবে কিছু করতেই পারে না, ভরসা পায় না। চাকরি বাঁচানো আর পদোন্নতির রঙিন আশায তারা পশুর মতো ভীরুতা বুকে করে জীবন কাটায়।

কিন্তু এমন কঠিন মানুষটার মনের মধ্যে অজ্ঞাতে নাসিমই বুঝি খুব সূক্ষ্ম এক ফাটল ধরায়। প্রথম জাহাজে আসার দিন সারেঙ নাসিমকে ভালো করে কাজ করার পুরস্কার হিসেবে জাহাজে বহাল করার কথা দিয়েছিল। নাসিম পরিবেশের শিক্ষায় সারেঙের উপযুক্ত হযে ওঠে। সারেঙও বুঝেছিল, দশ-বারো বছরের বালককে দিয়েই তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তাই সারেঙকে খুশি করার নানান পদ্ধতির মধ্যে নাসিম যখন

হতাশ হয়, তখন—'পারবি, পারবি, আস্তে-আস্তে পারবি। সারেঙের চাউনিটা তাই যেন তাকে বলে কানে কানে।' সারেঙের পরোক্ষ সমর্থন নাসিমের প্রতি সারেঙের কোথায় যেন একটু দুর্বলতার জায়গা তৈরি করে দেয়। আর এই বক্তব্যের অন্যতম প্রমাণ, তার অক্ষমতার জন্যে 'সারেঙ রাগ করলেও তাকে সে সরাসরি মারে না তাতেই নাসিম উৎসাহ খোঁজে।'

সারেঙের নিষ্ঠুর স্বার্থ আর স্নেহ যেন একই তুলাদণ্ডে ওজন করা। তা স্বর্ণকারের নিক্তির ওজন। নাসিমকে সে যাত্রীদের টাকা-পয়সা চুরি করতে শেখায় পরোক্ষে। সারেঙ বুঝেছিল, তার শিক্ষাকে সরল সহজভাবে এবং গভীর বিশ্বাস করে গ্রহণ করতে পারে এই আশ্রয়হীন, পিতৃমাতৃহীন নাসিমের মতো বালকই। এই সেই শিক্ষাই তাকে গোলবানুর গলার হার চুরি করার দুর্দান্ত সাহস দেয়। নাসিম ধরা পড়ে গেলে, যাত্রীদের সমবেত নিষ্করুণ প্রহারে রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণাকাতর হয়ে চিৎকার করে উঠলে সারেঙ তাকে তার সন্তানের মর্যাদায় নিজের পিতৃত্ব প্রকাশ করে। নিজে থেকে প্রমাণ করে গোলবানুর সঙ্গে কথা বলে যে নাসিম চুরি করেনি, করার ছেলে নয়। এই সূত্রে সারেঙের মানস-পরিবর্তনের বিস্ময়কর স্তর লক্ষণীয়। সারেঙ নিজে যখন জাহাজের কোনো শ্রমিক এমনকি নাসিমকে নির্মম প্রহারে জর্জরিত করত তখন কারোর এগিয়ে এসে প্রহৃত মানুষকে সামলানোর ব্যাপার এতটুকুও বরদাস্ত করত না, অথচ অন্যেরা যখন নাসিমকে নির্দয় প্রহারে সংঘবদ্ধ, তখন সারেঙ এগিয়ে এসে মধ্যস্থতায় তা সামলায়। এই সূত্রে সারেঙের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষণীয়। নাসিমের প্রতি তার কোথায় এতটুকু যেন স্নেহ জমছিল। কঠিন পাহাড়ের পাথরের বুক বিদীর্ণ করে একটি তৃণের জন্মের মতো!

নির্মম স্বার্থ আর সুগভীর স্নেহ-মায়া-মমতার মিশেলের মধ্যে দিয়ে যে সারেঙ, সে নতুন। সারেঙের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন চিত্র তাকে জীবন্ত করেছে। সাবেঙ তার শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদের রাজনীতির মতো খেলা খেলে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখে। নাসিমকে তার মধ্যে থেকে তুলে এনেছে নিজের কাছে। স্বার্থ আর মানবতাবোধ একই সঙ্গে সারেঙের মনের রং বদলায়। গোলবানুর হার চুরি সংক্রান্ত শেষতম উক্তিটি সারেঙের এমন মানস নির্মাণের পক্ষে শৈল্পিক ঘটনার সার্থক coincidence। সারেঙের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন চিত্র অচিন্ত্যকুমারের অসামান্য শিল্পসম্মত মননক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তব প্রতিরূপ। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় 'সারেঙ' গল্প যেমন, তেমনি সারেঙ চরিত্রটিও এক অভিনব সৃষ্টি।

অন্যদিকে দশ-বারো বছরের ছেলে নাসিম বালক হলেও তার এক স্বতন্ত্র চারিত্র্য তাকে শিল্পের আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। সচেতন মানসিকতায় সে তার পিতাকে হারিয়ে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তীব্র অভিমানী। মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ, গহরালির শাসন-ভর্ৎসনা সে যে সহ্য করতে পারে না এটি তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। পাঠকরা তার অশ্রুসজল অসহায় মুখ দেখে দ্রুত তাকে আপন করে নিতে পারে। তার অল্পবয়সের অসহায়তা, অভিমান ক্রমশ মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে এনে প্রতিবাদী. ক্রুদ্ধ করে তোলে।

এ ক্রোধ যেমন তার মায়ের ওপর, তেমনি গহরালির ওপরও। বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে জাহাজে এসে সে বার বার মায়ের মরা মুখ কল্পনা করে। বাল্যকালে নাসিমের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নানান বৈপরীত্যের সমন্বয়ে। তার বালক মনে আছে রোমান্টিক বিস্ময়, কৌতূহল। জাহাজে ঢোকার পর তার একসময়ে উদাস চিন্তা,—'নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল, ভাবতে পারত না নাসিম। আগে-আগে মনে হত নদী না জানি চলে গেছে কোন সমুদ্দুরে। এই দেশ থেকে কোন দূর-বিদূরের বিদেশে।' সারেঙের কথায় বিনা মাইনের কাজে বহাল হবার পর নাসিমের গোপন বাসনা দুটি এমন—'বাবা নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই তার অনেক। অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহাসুখ।'

এইসব ভাবনার ছবি তার বালক-মনের, নিষ্পাপ মানসিকতার রোমান্টিক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বালক কালের রোমান্টিক মোহ-কল্পনা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায় প্রথম দিনই রাতে কাচের বাসন ভাঙার জন্য সারেঙের হাতে নির্মম প্রহার খেয়ে। আর 'ব্যথার চেয়ে আশ্চর্য লাগল বেশি নাসিমের।' এই হল অভিজ্ঞতার অন্য রূপ, রূপান্তর। জাহাজের পরিবেশে, সারেঙের মার খেতে খেতে, বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকদের কথার তাৎপর্য ক্রমশ 'মার খেতে তার আর লজ্জা হল না। অপমানের জ্বালা পর্যন্ত লাগল না তার মনে। মকবুলের সঙ্গে, সমস্ত খালাসীর সঙ্গে সে দোস্তালি অনুভব করলে।'

চুরি করা শিখতে শিখতে নাসিম সারেঙের পরোক্ষ সমর্থন পেয়ে যায়, মন পেয়ে যায়, মন বুঝেও যায়। ক্রমশ সারেঙের আপন হয়ে ওঠার মতো তৈরি করে ফেলে নিজেকে। তার কৌশল, চাতুর্য, কোনো কাজে অক্ষমতা, ব্যর্থতার কারণে সারেঙের রাগ নয় পরোক্ষ সমর্থনটুকুর তাপ বুঝতে পারায় নাসিমের উৎসাহ দারুণ বাড়ে। যত মার-খাওয়া, অসহায় অবস্থা আসে, ততই তার 'মার মরা মুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর পায় এই মার সহ্য করতে। ''মাগো'' বলেও যদি সে কাঁদতে না পারে, তবে নিঃশব্দে হজম না করে উপায় কি?' নাসিমের জিদ, মায়ের সঙ্গে কোনোরকম আপোস না করার কঠিন মানসিকতা, তার সারেঙের মন জয় করার যাবতীয় তৎপরতা তার বাঁচার উপযোগী, ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার উপযোগী অসামান্য এক বালক-ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। সে ক্রমশ বালক থেকে হয়ে ওঠে মনে-প্রাণে বয়স্ক, অভিজ্ঞ এক পুরুষ। লক্ষণীয়, গোলবানুর হার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে সে নির্মম প্রহারের মধ্যে মা-কে ডাকেনি, 'বাবা গো'—বলেই চিৎকার করে উঠেছে। নাসিম চরিত্রের এমন বিকাশ, তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত সক্রিয়তা তাকে বাংলা ছোটগল্পের এক অদ্বিতীয় বালক-চরিত্র করে তুলেছে। গোটা গল্পে নাসিমের আবির্ভাব, বিকাশ, পরিণতি তার সব দিক থেকে স্বাবলম্বী-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। চাকর থেকে সারেঙের সন্তান হয়ে সিঁড়ির শ্রমিক রূপে পদোন্নতি হওয়ার গভীর আনন্দের মধ্যে নাসিমের এই উপলব্ধি একটি বড় অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে একসঙ্গে জ্বলতে থাকে :

> 'পাড়ের কাহেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ। আর ওপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে! উড়ছে

তার সাদা আচকান, সাদা দাড়ি। দিনরাত কবে যে সূয্যি, যেমন তার মতো চেহারা।'

এ অভিজ্ঞতা নাসিমের বড় জীবন-অভিজ্ঞতা। এই চিত্রে সমগ্র গল্পের লক্ষ্যে উজ্জ্বল পরিণামী বিশ্বরূপ। তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার, মন থেকে মুছে ফেলার সাহস তার কাছে সারেঙ। বড় শ্রমিক-জীবনে তার পদার্পণ তার আশাবাদকে বলিষ্ঠ করে তোলে।

গল্পে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আছে গোলবানু—নাসিমের মা। গোলবানু যৌবন বয়সের ধর্মে, সন্তান নিয়ে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বাস্তব দিক ভেবেই গহরালিকে বিবাহ করে। কিন্তু একমাত্র পুত্র নাসিম চলে এলে সে নিজের নিবাপত্তাতেই নতুন করে গহরালিকে নিয়ে সংসার পাততে এতটুকু দ্বিধা করে না। তাব মাতৃত্ব ও মাতৃপ্রাণ অদ্ভুতভাবে এঁকেছেন অচিন্ত্যকুমার একটিমাত্র ঘটনায়। সে ঘটনা নাসিমের জাহাজে গোলবানুর দ্বিতীয় বিবাহের রাতে তারই গলার হাব চুরি করার। আগের স্বামীর দেওয়া পুত্রের প্রতি তার যে কিছু দুঃখ, দয়া, ক্ষমা, দায়িত্ববোধ, করুণার মতো মানবিক বোধ সক্রিয় ছিল এবং আছে, তার প্রমাণ নাসিমকে চিনতে পেরে তার গলার হার চুরিকে অস্বীকার করার মতো সংলাপ উচ্চারণে : 'না। ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।' এই একটি কথায় গোলবানু চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি স্পষ্ট হয়। তার নতুন স্বামী গহরালির সব শেষে জাহাজ থেকে যাবার সময় পিছন থেকে নাসিমকে ধাক্কা মারার ঘটনায় তার অক্ষম আক্রোশ আর নিষ্ফল রাগটুকুরই পরিচয় মেলে।

'সারেঙ' গল্পের সবচেয়ে বড় সম্পদ জাহাজের অন্যান্য শ্রমিক চরিত্রগুলি, জাহাজের সাধারণ যাত্রীরা। এই বিষয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলে'র কালে :সে গল্পে অসামান্য শ্রমিক-সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যেনবা লেখক শ্রমিকদের একজন হয়ে উঠেছেন, নেমে এসে গভীর দরদ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সর্বহারাদের মধ্যে। সারেঙ যদি ক্যাপিট্যালিস্টদের প্রতিনিধি হয়, তা হলে শ্রমিকরা চিরকালের সর্বহারা; যদি জমিদার বা ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতীক হয়, তবে শ্রমিকরা তাদের শোষণ করার উপযুক্ত প্রজা, ছলে বলে তাদের শ্রমের ভাগ নেওয়ার অন্যায় অংশীদার। জাহাজের শ্রমিকরা কেউই একতাবদ্ধ হতে পারেনি সারেঙের অত্যাচারের, শাসনের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে! তারা সবাই একই স্বভাবের টাইপ, তারা যেন শেক্সপীয়রের নাটকের জনতা চরিত্র! অফুরন্ত কান্নার মধ্যে নাসিমকে মকবুল বলে, 'কেউ আমাদের দেখবার শোনবাব নেই।'—বলে উপরের দিকে তাকায়। যেন উপরআলা শুনছেন এই আর্তের ফরিয়াদ।

এই তাদের সমবেত চরিত্ররূপ। তারা individual হতে পারেনি কেউ, collective, কিন্তু সেই স্বভাবের collectivity কোনো প্রতিবাদী মানসিকতা, প্রচ্ছন্ন বা সবল বিদ্রোহিতায় এতটুকু উজ্জ্বল হয়নি, হওয়ার অবকাশও রাখেনি সারেঙ তার চতুরতম divide and rule policy দিয়ে। শ্রমিকদের চিত্রে অচিন্ত্যকুমার অনন্য ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শ্রমের মধ্যেও তাদের বিনা মাইনের চাকর হওয়া থেকে 'প্রথমেই সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ' হওয়ার গভীর গোপন বাসনা তাদের ধবে রাখে একভাবে। শেষে

হয়তো হবে কাপ্তেন, জাহাজ-নাখোদা। সে ক্ষমতা তাদের নেই, তবু তারা জীবন গড়ার আশায় শ্রম দিয়ে যায় নির্মম শাসন-শোষণের মধ্যেও।

অচিন্ত্যকুমারের এইসব চরিত্র-চিত্রের এমনি ব্যঞ্জনা, যেখানে মনে হবে লেখকের গোপন মানবিক বেদনাও বুঝি ব্যঞ্জিত হয় সামগ্রিকভাবে। লেখক তাদের এঁকেছেন নির্মম নিরাসক্তি দিয়ে, কিন্তু যেন গোপন ছায়ার মতো কোথাও বুঝি শ্রমিক জীবনের করুণ বিষাদ গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠকদের আবৃত করে ফেলে কখন! শ্রমিকদের সমবেত চিত্রাঙ্কনের সম্যক সার্থকতা লেখকের সামগ্রিক শিল্পকর্মের দিক থেকেই। এদের সঙ্গে জাহাজে দেখি সাধারণ যাত্রীদের। 'কোম্পানির আলোতে তেজ নেই, বৃষ্টি নামলে তেরপল নেই, মেয়ে পুরুষদের আলাদা কামরা নেই, তবু সবাইর চোখে ঘুম আছে। এমন ভদ্র যাত্রী নেই যে তাস খেলে বা গান বা খোস গল্প করবে। চাষাভুষোর লাইন। বন্যার তোড়ের মতো যারা খাটে আর তাল তাল মাংসপিণ্ড হয়ে যারা ঘুমোয়।' এই যাত্রীরাও নিরীহ পশুর মতো মূক। গল্পের অ-প্রতিবাদী এই সর্বহারা যাত্রীদের মধ্যেও যেন লেখক স্বয়ং গভীর সমবেদনায় উপস্থিত।

তিন

'কল্লোলে'র কালের লেখকদের বিশিষ্ট নিম্নবিত্ত শ্রেণী-সচেতনতা ও শ্রমিক-কৃষক ভাবনা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখনীতে যে কি অসামান্য তাৎপর্য পেয়েছে, অনবদ্য 'সারেঙ' গল্পটি তার সার্থক প্রমাণ। এই গল্পটি শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যে প্রত্যক্ষতই চরিত্রাত্মক গল্প-ভাবনার অন্তর্ভুক্ত। সারেঙ সেইরকম এক কেন্দ্রীয় চরিত্র যাকে দিয়ে অন্যান্য সব চরিত্রের স্বাভাবিক চলা-ফেরা সম্ভব হয়েছে। সারেঙের ব্যক্তিত্বই সমগ্র গল্পের প্রাণকেন্দ্র। একেবারে রূঢ় বাস্তব জীবন-স্বভাব গল্পটির প্রধান ভিত্তি। সারেঙকে ঘিরে এসেছে নাসিম, জাহাজের আর সব শ্রমিকশ্রেণীর মানুষগুলি। যৌথভাবে সারেঙ ও নাসিমের মানসিকতার ক্রম-পরিবর্তিত রূপ এবং সর্বশেষ চরিত্রনিহিত অপূর্বত্বের ব্যঞ্জনায় গল্পের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়ায় চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীরূপ শিল্পের সুষমা লাভ করেছে। জাহাজের অন্যান্য সমবেত শ্রমজীবী মানুষগুলি যেন এই গল্পের অবধারিত পোশাক, একই সঙ্গে সারেঙ ও নাসিমকে ঘিরেই তাদের যাবতীয় ভাব-ভাবনার মূল্যায়ন।

অচিন্ত্যকুমার বাংলা ছোটগল্পের একজন দক্ষ কারিগর। তাঁর নিখুঁত কাজ বিশ্বকর্মার মতো। গল্পের কোথায় মূল বিষয়ের সঙ্গে, প্রধান চরিত্রের সঙ্গে স্বভাবী-পাঠকদের একাত্ম করতে হয়, 'সারেঙ' গল্পের লেখকদের তা নিশ্চিতভাবে জানা আছে। তাই সবশেষে চুরি করার দায়ে 'প্রহার' খেতে খেতে নাসিমের 'বাবা গো' চিৎকারে সারেঙ যখন বলে, 'কী হয়েছে? কে মারছে আমার ছেলেকে?' 'চাকর! মিথ্যে কথা! ও আবার বিয়ার ঘরের ছেলে। আমার মা-হারা সন্তান। ওকে মারে কে?'—এমন কথাগুলির গভীরতম দ্যোতনা ঘটনাকে তুচ্ছ করে নাসিমকে যেমন গভীর বিস্ময়ে অভিভূত করে, তার থেকেও সারেঙ চরিত্রটিকে ঊর্ধ্বের নীল আকাশের বুকের প্রেক্ষাপটে এক ঘোর সংসারী মানুষকে

জ্যোতিষ্মান করে দেখায়। আর এখানেই গল্পের ক্লাইম্যাক্স অংশ ঈষৎ বিস্তৃত। নাসিমের ধরা পড়ে মার-খাওয়া ও চিৎকার অংশটি থেকে ক্লাইম্যাক্সের শুরু, গোলবানুর গলার হাসনা চুরি-যাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য—'না। ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।'—এমন সংলাপে শেষ। গল্পের পরবর্তী অংশ হল সারেঙ চরিত্র ধরে যেমন 'catastrophae', তেমনি নাসিমের নতুন জীবন-অভিজ্ঞতা অর্জনের সূত্রে তা পরিণামী ব্যঞ্জনা। সারেঙ চরিত্রায়ণে গল্পের ভাবগত একমুখিনতা এতটুকু বাধা পায়নি, অন্য-রসাশ্রয়ী হয়নি।

ইঙ্গিতধর্ম অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের অন্যতম দিক, বিবৃতিমূলকতা সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বর্জিত হয়েছে। গল্পের শেষে সারেঙের স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপের দ্যোতনা, নাসিমের ওপর তার সূক্ষ্ম প্রভাব, নাসিমের মনোভঙ্গিতে ক্রমশ ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের উপযোগী শক্ত মাটির আশ্রয়ে এসে দাঁড়ানো, জলের ছায়ায় তার মায়ের মরা মুখ দেখার সঙ্গে আর একদিকে সূর্যের মতো দীপ্ত চেহারার সারেঙের মধ্যে জীবনের পক্ষে বড় প্রত্যয়ে স্থির-নিবদ্ধ হওয়ার মানসিকতা—এসবই সার্থক ছোটগল্পের উপযোগী মহৎ শিল্পকর্মের ইঙ্গিতধর্মই। অচিন্ত্যকুমারের situation সৃষ্টির অপূর্ব ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংযত, পরিমিত গদ্যশৈলী।

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের ভাষা তাঁর নিজস্ব। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সে সময়ের কিছু গল্পকারের গদ্যে পূর্বসূরি-ব্যক্তিত্বের প্রভাব চোখে পড়ে, অচিন্ত্যকুমার কখনোই তার মধ্যে ভাষাকে সীমিত করেননি। বিবরণের থেকে বুদ্ধিদীপ্তশাণিত আবেগহীন গদ্য-ভাষাই তাঁর লেখনীর মূল্যবান অলংকার। এতে তাঁর রচনায় যে চমৎকার এক নিরাসক্তি ধরা পড়ে, 'সারেঙ' গল্পটি তার প্রমাণ দেয়। গল্পের কোথাও একটিও বাড়তি শব্দ নেই, বাক্য নেই। লেখকের উপস্থিতি, আগেই বলেছি, প্রত্যক্ষত ঘটেনি কোথাও, তবে নিম্নশ্রেণীর কথায় লেখকের বিষাদময় ছায়ার আভা গল্পপাঠে পাঠক-হৃদয় ঢাকতেও পারে কখনো-কখনো। শ্রমজীবী, দরিদ্র, শোষিত মানুষদের দলে লেখক যে আছেন মানবতাবোধের স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারে, 'সারেঙ' গল্পের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় শোষিত মানুষদেরই ভাষা, শব্দ দিয়ে গল্পকে অলংকৃত করার শৈল্পিক প্রয়াসে।

'সারেঙ' গল্পের ভাষা পাঠকদের অবলীলায় হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসায় সেই জাহাজের মাঝখানেই। যেখানে মুসলমান সমাজ ও মানুষের কথা, সেখানে পাঠক তাদের সমাজ ও মানুষের আপন হয়ে যায় এমন ভাষার জোরেই। আবার যেখানে জাহাজের শ্রমিকদের অসহায়তা, দুঃখ, ক্রোধ, উচ্চাশা, বাঁচার আর্তি—সেখানে পাঠকরা আসন পেয়ে যায় লেখকের সেই ভাষার অধিকারে। 'জমি খিল যায়', 'দায়েরী মোকদ্দমা', 'খাওন-পিয়নের কষ্ট', 'চিলে-বাওড়ে', 'কেরায়া নৌকা', 'ছুটুলে বউ', 'সোতের শ্যাওলা', 'লেট আজ নিঘ্‌ঘাত', 'গলায় সোনার হাসনা', 'আঙুলে ওজরি', 'ঘুমের বেহোঁসে', 'বিরানা পুরুষের আনাগোনা'—এমন সব আঞ্চলিক শব্দ, ঘরের অন্তরঙ্গ কথা নিজের

গদ্যে ও চরিত্রের সংলাপে ব্যবহার করে লেখক গল্পের পরিবেশে যে অদ্ভুত ভিজে মাটির ঘ্রাণ এনেছেন, তা এই গল্পেরই শিল্পের লাবণ্য। অচিন্ত্যকুমারের এই গল্পের ভাষা বস্তুত তাঁর গল্পকার ব্যক্তিত্বের সম্যক প্রতিচ্ছায়া।

চার

লক্ষ করার বিষয়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'সারেঙ' গল্পে সাধারণ এক বয়লারের খালাসির নাম পর্যন্ত রেখেছেন বিলায়েত আলী, কিন্তু গল্পের যে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সারেঙ'—তার কোনো স্বতন্ত্র নাম দেননি। আর গল্পের নামেও সেই চরিত্রই এসেছে, মূল বক্তব্যের ব্যঞ্জনা ধরে লেখক নাম রাখেননি। সারেঙ চরিত্রের ব্যক্তিগত নামেই গল্পের নাম নয়, তার চিহ্নিত পেশা দিয়েই গল্পেরও নাম। বোঝা যায়, যেহেতু সারেঙকে কেন্দ্র করেই গল্পের সমস্ত কাহিনী ও ঘটনা এবং প্রতিপাদ্য কেন্দ্রস্থ হয়েছে, তাই নামের সার্থকতা সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায় পাঠকদের। দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যাও আছে এমন নামের। সারেঙ হল জাহাজের সেই প্রধান ব্যক্তি—যার বুদ্ধি চিন্তা জাহাজকে নদী বা সমুদ্রের ওপর সমস্ত রকম অনুকূল-প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই নিয়ন্ত্রিত করে। 'সারেঙ' গল্পের জাহাজের যাত্রী ও শ্রমিকদের সর্বাবয়ব জীবনধারণের একমাত্র চালক তো সারেঙই। তাদের ভয়ে নির্ভয়ে সারেঙ-নির্ভরতা গল্পের নামকরণে ব্যঞ্জনা আনে। তৃতীয় কথা হল, লেখকের গল্পের উদ্দেশ্য যেমন সারেঙ, তেমনি নাসিমও। নাসিমের জীবনস্বভাবের পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের উপযোগী একটা স্থায়ী আশ্রয়ের সন্ধান দেওয়া, তা গল্পের ব্যঞ্জনায় সমান্তরাল আছে, আর নাসিমেব সেই সূত্রে মৌল সিদ্ধিও ঘটে যায় সূর্যের মতো দীপ্ত ব্যক্তিত্বের সারেঙের সূত্রেই। তাই নাসিম চরিত্রের প্রাধান্যে 'সারেঙ' নাম শিল্পশ্রী পায়। তার ব্যক্তিনাম বর্জিত হওয়ায় সারেঙ বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দ্যোতনায় বাংলা ছোটগল্পের এক সার্থকতম চরিত্র।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জন্ম : ১৯০৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোলে'র লেখক। এখানে আদৌ আক্ষরিক অর্থে নয়, একমাত্র ভাবগত ও আদর্শগত অর্থেই প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের লেখক—কল্লোলীয়। ছোটগল্পের ধারায় আবির্ভাব-সময় থেকে তিন-চার বছরের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্প প্রকাশের আধার বদলান। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প 'শুধু কেরানী'র প্রকাশ ঘটে 'প্রবাসী'র ১৩৩০ সালের চৈত্র সংখ্যায়। এসময় 'বিজলী' পত্রিকাতেও তিনি গল্প লিখে গেছেন। এই দুই পত্রিকাতে প্রকাশিত গল্পগুলি তাঁকে তখনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। এলেন 'কল্লোলে'র পাতায়, পত্রিকা প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই, শেষ দিকটায়। আবার, 'কল্লোলে' থাকতে থাকতেই তিনি বছর তিনেকের মধ্যে মুরলীধর বসু আর শৈলজানন্দের নতুন পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যমে সামিল হয়ে যান। তাঁর গল্প ক্রমে 'কালিকলম'কেও সমৃদ্ধ করে।

কিন্তু এসবই ছিল নিছক প্রকাশের প্রয়োজনে আধার বদলানো মাত্র, আসলে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে কল্লোলীয়। অর্থাৎ 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের কালে 'কল্লোলে'র জন্মের মূলে; প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো, যে মানসভূমি রচিত হচ্ছিল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসিকতা তাব ঘনিষ্ঠ অনুবর্তী ছিল। 'কল্লোল' একটি পত্রিকা মাত্র, তাব চারপাশে সময় ও যুগের তাগিদে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের যে মানস-প্রতিক্রিয়া মাথাচাড়া দিয়েছিল অবধারিতভাবে, তা পত্রিকা-কেন্দ্রিক হওয়ায় অভিধা পায় 'কল্লোলীয়' ।

আসলে যুগটাই একটা অস্থিরতার, অনিশ্চয়তার, হতাশার, অসহায়তার । প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল, দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি একের পর এক জ্বলছিল যুবকপ্রাণের স্বদেশীয় আবেগে, আবার উদ্যমহীনতায় নিভছিল কিছু পরেই । এইভাবেই ওঠা-নামা করতে করতে যুবকরা কোনো গভীর হতাশায় নিমজ্জিত মুখ হচ্ছিল বুঝিবা ভাগ্যের নির্দেশেই । যখন বেকারত্ব চরম, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় দেশীয় অর্থনীতি-সমাজনীতি প্রায় পঙ্গু, রবীন্দ্রনাথের স্থিতধী শিল্পপ্রাণ এক নির্দিষ্ট আদর্শের আলোয় বিভাসিত, তখনি আসে 'কল্লোল' আর কল্লোলের লেখকরা । লক্ষ্য— সমস্ত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিরক্ত প্রতিবাদ । যাকে বড় অর্থে বিদ্রোহ বলে, তা নয়, বিদ্রোহ তৈরি হওয়ার উৎসে যে প্রতিবাদ-প্রচ্ছন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তা-ই ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এর সামিল হলেন। কিন্তু সে সময়ের যুবক প্রেমেন্দ্র মিত্র সরল বুদ্ধিপ্রাণ

স্বভাব নিয়েও বিভ্রান্ত হয়েছেন । বিভ্রান্তি যুগের, সময়ের, পরিবেশের। কিন্তু বিভ্রান্তি সত্ত্বেও জীবনের একটা স্থির কেন্দ্রকে ধবতে তিনি উৎসাহী ছিলেন । তাই সমস্ত রকম নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের মধ্যেও তাঁর সুন্দরের সন্ধিৎসা এতটুকু দমিত হয়নি । তিনি কবি ও কথাকার — দুই সত্তার সব্যসাচী । তাঁর কবিতার যে যন্ত্রণা, প্রতিবাদ, অসহায়তা, গল্পেও তা-ই । আবার কবিতায় যে জীবনপ্রেম, সুন্দরের জন্য গভীবতম আর্তি, গল্পেও তার সমান স্বীকৃতি, সমানুপাত । তিনি সমকালীন জীবনে দুঃখ, কদর্যতা, মায়ের চোখের অসহায় অশ্রু, 'গলিত কুষ্ঠ', 'লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদক বিকলাঙ্গ, রুগ্ন-গলিত শব'— এ সমস্ত দেখেছেন, কিন্তু এসব দেখেও তিনি কল্যাণকে অভিনন্দিত করতে চান । তাই তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জীবন সম্পর্কে ভাব-ভাবনায় আছে সন্ধিৎসু মনের প্রবল সক্রিয়তা, তাঁর মতে—'আনন্দ কল্যাণের সঙ্গে না মিশলেই যায় সব ভেঙে।...... কল্যাণের সঙ্গে আনন্দ মেশে না, তাই গোল । এগিয়েও ভুল করতে পারি, পেছিয়েও । পাল্লা সমান রেখে কেমন করে চেনা যায়, তাও ত ভেবে পাই না।'

কল্লোলের কালের এই কল্লোলীয় লেখকের এমন জীবনার্তি, এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা ও গল্প—দুই শিল্প-শাখাই। মূলত কবি এই লেখক রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম সার্থক গল্পকার। তাঁর গল্পে আছে কবিত্বেব 'essence'। কিন্তু তাঁর গল্পের সেই সঙ্গে আবেগ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে, ভাবপ্রবণতা হয়েছে নির্দ্বিধায় পরিত্যক্ত। বুদ্ধি-নির্ভরতা তাঁর ছোটগল্পে জীবনকে দেখার, জীবনব্যাখ্যার পক্ষে একটি নিরাসক্ত অথচ শাণিত অস্ত্রের অধিকার এনে দিয়েছে। যুগযন্ত্রণাকে সর্বাংশে গ্রহণ করে তিনি নীলকণ্ঠ হতে চেয়েছেন—গল্পে-কবিতায়, বিশেষ যুগে অবস্থান কবে তিনি যুগের নানান স্রোতের বৈপরীত্যে জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন। আব আনন্দ-সুন্দরের সঙ্গে কল্যাণের সমন্বয়কে করেছেন তাঁর শৈল্পিক শান্তির আশ্রয়।

কল্লোল-প্রাণ লেখকদের আর্তি ছিল বর্তমান সমস্তরকম বৈপরীত্যের গভীরে সুন্দরের সন্ধান। এই অর্থে ইউরোপীয় রোমান্টিক কবিকুলের সঙ্গে তাঁদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বক্তব্যের সমর্থন আনেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্য-শিল্প-ভাবনার অমোঘ প্রভাব। এক মিশ্র অনুভূতিতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পের অঙ্গে সচেতন পরীক্ষায় সুযোগ নেন। তিনি একাধারে কবি, অন্যদিকে গল্পকার। কবির কবিত্ব, বিজ্ঞানীর নিরাসক্তি, গল্পকারের সহমর্মিতাবোধ ও মানব্য, বিষয়ীর বুদ্ধির বিচার—এসব দিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প সর্বশিল্পশ্রীধন্য। তাঁর গল্পের পোশাক ও প্রাণ, সচলতা ও আধ্যাত্মিকতা যে বিভাকে বিভাসিত করে সামগ্রিকভাবে, তা-ই তাঁর অন্বিষ্ট—তা জীবনের আনন্দ, কল্যাণ-সুন্দরের সঙ্গে মিলিত গঙ্গাবারি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত নগরজীবনের কথাকার। জটিলতম মনস্তত্ত্ব, নাগরিক জীবনের নিষ্করুণ অর্থের বণ্টনবৈষম্য, সুস্থ দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে বৈষম্যের বিষাক্ত বীজ বপন ও বিবৃদ্ধির চিত্ররচনা, মানব-মানবীর সম্পর্কের ধূর্ত, বুদ্ধিপ্রাণ কৌশল—এসবই তাঁর একাধিক গল্পের নাগরিক স্বভাবের অভিজ্ঞান হয়। এই লেখকের প্রথম উল্লেখ্য গল্প 'শুধু কেরানী' বেরোয় ১৩৩০ সালের প্রবাসীর চৈত্র সংখ্যায়। এর পর যত সময় এগোয়, ততই প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলি মালায় গাঁথা বিভিন্ন রঙের ও ঘ্রাণের ফুলের মতো আমাদের অভিজ্ঞতায় জমা হতে থাকে। তাঁর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পই নয়, 'ভবিষ্যতের ভার', 'পুন্নাম', 'সংসার সীমান্তে', 'স্টোভ', 'শৃঙ্খল', 'হয়তো', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' ইত্যাদি গল্পও আমাদের শিল্পবিবেককে বিস্ময়ে আপ্লুত করে। নিম্নবিত্ত মানুষ থেকে, উচ্চবিত্তের দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা, প্রেম-প্রেমহীনতা—সমস্তই কঠিন বাস্তবতায় ও নাগরিক-জটিল মনস্তত্ত্বে আঁকা হলেও লেখক সর্বত্র এক কল্যাণসুন্দর জীবন ও জীবনাতীতের সন্ধিৎসু। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ক্রান্তিরেখা চিহ্নিতকারী এক নান্দী-গল্পকার।

১.

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

এক

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' আর 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্প দুটি বিষয়ে ও রীতিতে দুই মেরুর রচনা হলেও দুটিতেই আছে লেখকের সেই জীবন-মিত্রতা ও জীবন-মুক্তিজনিত আনন্দের সমানুপাতী প্রয়োগ-সাধনা। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের দুটি দিক লক্ষ করার মতো—১. এর বিষয়বস্তুর বিষাদ-খিন্ন অনিঃশেষ অসহায়তার দিক; ২. কাঠামোগত পরিকল্পনার আশ্চর্যজনক প্রয়োগনৈপুণ্যের দিক।

বিষযবস্তুতে কাহিনী-অংশ সামান্যই। সুদূর গ্রাম তেলেনাপোতায় উজ্জ্বল এক শহর থেকে তিন যুবক হঠাৎ একদিন বেড়াতে আসে। এই তিন যুবকের একজনের হয়তো এর সঙ্গে মাছ ধরতে আসার বিলাসিতাও থাকে। আসার পথে তারা অন্ধকার গ্রামের রোমাঞ্চকর পরিবেশের বিভোর বিস্ময়কর রোমান্স-রসের সান্নিধ্য ও স্বাদ পায়। গ্রামে যে অতি-পুরনো জীর্ণ জমিদার বাড়িতে তাদের আশ্রয়লাভ ঘটে, সেখানে থাকে যামিনী নামের এক অনূঢ়া গ্রাম্য শান্ত যুবতী, আর তার অসহায়, অন্ধ, বিছানায় শয্যাশয়ী বৃদ্ধা মা। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। যামিনীকে বিয়ে করবে বলে একসময় এই যুবকদের মতোই বেড়াতে আসা নিরঞ্জন নামের যামিনীর মায়ের দূর সম্পর্কের এক বোনপো কথা দিয়ে যায়। আর সে আসেনি। আসবেও না যে, তা যামিনী জানে, তার নতুন বেড়াতে আসা তিন সঙ্গীর মধ্যে একজন যামিনীর মণিদাও জানে। কিন্তু যামিনীর মায়ের সরল নির্বোধ অসহায় করুণ প্রতীক্ষা থাকে সেই নিরঞ্জনেরই একদিন-না-একদিন ফিরে আসার! মণিদার সঙ্গে আগন্তুক আজকের বাকি দু'জনের একজন এই ছোট দুঃখচিত্রে এক বিশেষ মুহূর্তের বিহ্বল রোমান্টিক আবেগ-মনস্কতায় যামিনীকে দেখে, আকস্মিকভাবে যামিনীর মায়ের বিশ্বাসমতো নিজেকে 'নিরঞ্জন' বলে পরিচয় দেয়। যামিনীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলে। এই প্রতিশ্রুতি শুধু ছদ্ম-পরিচয় দিয়ে মৃত্যুমুখিনী বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দেওয়া ছিল না, যামিনীর বিশ্বাসী-করুণ চোখ দুটিও যেন নতুন নায়কের জীবনে এক মুহূর্তে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেয়। তিন বন্ধু গল্পের শেষে ফিরে আসে শহরে। নায়ক কঠিন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। ফিরে আসার প্রথম দিকে তেলেনাপোতায় ফিরে যাওয়ার যে বাসনার ছিটেফোঁটাটুকু ছিল, রূঢ় বাস্তব রোগের জীবনে তা নায়কের রোমান্টিক কল্পনার মনকে, স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। তেলেনাপোতায় যাওয়ার বাসনা, উদ্যম যায় হারিয়ে। অলৌকিক স্বর্গবাসনার মতো সেই আশাদীপ্ত বাসনা নায়কের অপরাধবোধকে জাগিয়ে রেখে নিষ্ফল থেকে যায়।

অতি সাধারণ এই কাহিনীতে ঘটনা প্রায় সম্পূর্ণত বর্জিত। যে ঘটনাটুকু আছে তা-ও চরিত্রদের মানসিক চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভূত সামান্য আর্তিটুকু। বাইরের কোনো ঘটনা এ গল্পে প্রয়োজনহীন। গল্পাংশ নয়, একটি ভাবই এ গল্পের মূল কেন্দ্র। রুদ্ধশ্বাস প্রকৃতি-পরিচয়, লেখকের রোমান্টিক মনোভঙ্গি, সেকালের গ্রামবাংলার দরিদ্র পরিবার ও

পরিবারের যুবতী কন্যা ও দুঃখিনী মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার অসহায়তার চিত্র এই গল্পের কাহিনীকে তুচ্ছ করে, ত্যাগ করে এক সর্বাবয়ব রোমান্টিক পরিমণ্ডলকে সত্য করেছে। তাই কাহিনী ও গল্প-স্বাদ-বিবিক্ত এই ছোটগল্প পাঠককে সম্পূর্ণ অন্য জগতে নিয়ে যায়। সে জগৎ ভাবের জগৎ, রূঢ় বাস্তব জগৎ নয়। অবশ্যই সামান্যতম কাহিনীবৃত্তটি একটি মহৎ রসকেন্দ্রের উপযুক্ত পরিধিতে নির্মিত ও স্থিত থেকেছে।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কাব' গল্পেব বিষয় ও অঙ্গভাবনাকে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র অতি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন তাঁর শিল্পাত্মার লক্ষ্যের নির্দেশে। গল্পটির অঙ্গের অভিনবত্ব তার বলার ভঙ্গি বা উপস্থাপনারীতির মধ্যে চিরাচরিত, গতানুগতিক শিল্পরীতির সম্যক বর্জনেই মেলে। গল্পটির বিষয়বস্তু একটি ভেঙে-পড়া গ্রামীণ পরিবারের দারিদ্র্য ও অসহায়তার কারণে, এক সহায়-সম্বলহীন মায়ের বিবাহ না হওয়ার কারণে করুণ আর্তি ও তার অনূঢ়া কন্যার দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকা এবং মনের দিক থেকে একাধিক পুরুষের অবাঞ্ছিত আশা দেওয়ার আশ্বাস থেকে নৈরাশ্যে নিমগ্ন হওয়ার নিঃসীম দুঃখ! কিন্তু এই বিষয়টিকে মনে হতে পারে অতি-পরিচিত এবং নানান গল্পে একাধিক বার ভিন্ন আধাবে ব্যক্ত।

অবশ্যই গল্পটির বিষয়কে প্রেমেন্দ্র মিত্র শিল্পের অসীমতা দিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে সহমর্মিতা বোধে। এই মানবিক সহমর্মিতাবোধ বস্তুত শিল্পীর নিজস্ব সূক্ষ্ম বিষয়নির্ভর কৌশলও। লক্ষ কবার যে দিকটি প্রধান, বিষয়বস্তুর দিক থেকে মূলত, তা হল বিষয়ের কেন্দ্রস্থ বিষাদ-খিন্ন অনিঃশেষ অসহায়তার দিক। এই দিকটি অবশ্যই নিবিড় বেদনায় সজল কারুণ্যে গল্পে চিহ্নিত। কারুণ্য ও অসহায়তা তিনটি দিক থেকে প্রধানত লক্ষণীয়—ক. যামিনীর অন্ধ, বৃদ্ধা মাযেব দিক থেকে, খ. যামিনীর অতিগোপন মনোলোকের আশা-আশাহীনতার সূত্রে, গ. গল্পের কথকের সহায় চারিত্র্যে। যামিনীর বৃদ্ধা, অন্ধ মা নিশ্চিতভাবেই সেকালের এবং চিরকালের গ্রামবাংলার এক দরিদ্র-সংসারের স্নেহান্ধ মা। প্রতিটি মা-ই এইভাবে কন্যার বিবাহদানে সুস্থ জীবনের প্রতিষ্ঠার বাসনা পোষণ করে। নিজেব দারিদ্র্য ও কন্যার বয়সের অনুরূপ শরীরের বৃদ্ধিহীনতা, সেই সঙ্গে যামিনীর পক্ষে বিবাহিত জীবন-প্রত্যাশাকে লালন করে নিষ্ফল হওয়ার দিক—তার মাকে বার বার তাড়িত করে। এই ভাবনা বৃদ্ধার বড় বাস্তবতার দিক। আগের জীবন ও মনের 'সত্য নিরঞ্জনের' জন্য বৃদ্ধার প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষাকে 'মিথ্যা নিরঞ্জনেব' শ্লোকবাক্য বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত করার মধ্যে যে নিষ্ফলত্ব—তাতেই চোখে জল আসে।

অন্যদিকে যামিনীর চাপা স্বভাবের মধ্যেও থাকে প্রতীক্ষার দুঃখ। প্রথম নিরঞ্জনের জন্য প্রতীক্ষায় যামিনীর মধ্যেও ছিল সূক্ষ্ম আশা-প্রত্যাশার প্রতীক্ষার আনন্দ-সংশয়। সে আসেনি আর কোনোদিন। শহরেই বাস করে নিজের সচ্ছল জীবন নিয়েছে বেছে। যামিনী জানে, তার মা না জানলেও বা মাকে গভীর দুঃখ দেবে না ভেবে না জানালেও। কিন্তু দ্বিতীয়বার মিথ্যে নিরঞ্জনের ভূমিকায় গল্পের কথক যেভাবে যামিনীর মনের আশা জাগিয়ে দেয় এবং শেষে অসুস্থ হয়ে আর কোনোদিন যেতে পারেনি সেখানে—তার মধ্যে

যামিনীর মনের প্রতি যে অসহায় অসম্মান, অবজ্ঞা প্রকট হয়, তাতে যামিনীর দিক থেকেই দুঃখ ও বেদনা গভীরে বেজে ওঠে।

গল্পের উত্তমপুরুষ কথক এক রোমান্সপ্রবণ মানসিকতায়, দরদি মনের আবেগে, গ্রামীণ পরিবেশে যামিনীর অসহায়তায় স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবে আবার এসে যামিনীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানবিকতার প্রমাণ দিলেও আর ফিরতে পারেনি। তার অসুস্থতা ও শহুরে জীবনের পরিবেশে রোমান্টিক মনটির অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার দুঃখের মধ্যেই সে আবার তেলেনাপোতায় যাওয়া থেকে বিরত হয়। 'মিথ্যে নিরঞ্জনে'র ভূমিকায় এসে গল্পের নায়কের যে অসহায়তা, তা-ও বিষয়বস্তুর কারুণ্যকে সজল, বেদনাবিধুর করে।

লেখক এই বিষয়গত বেদনাকে যেমন মানবিক করেছেন, তেমনি কোনো বিশেষ যামিনী, বিশেষ তার মা ও বিশেষ নিরঞ্জনের কথায়, তাদের পরিবারের দারিদ্র্যের বাস্তব প্রতিচিত্রণে না রেখে নির্বিশেষ করার জন্যেই গল্পের আঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন অভিনবত্ব। ১. রোমান্সপ্রবণ পরিবেশ, শহরের বাইরে সামান্য কদিনের এ্যাডভেঞ্চার, নায়কের রোমান্টিক মনোভাব গল্পের বিষয়কে করে আচ্ছন্ন। ফলে বিষয়টি নির্বিশেষ মা, মেয়ে, নিরঞ্জনের কথায় সত্য হয়। ২. তেলেনাপোতা নামে কোনো গ্রাম নেই, কিন্তু সমস্ত গ্রামই এই তেলেনাপোতা গ্রাম, আর তার দারিদ্র্য সব গ্রামেই সত্য, সত্য তার মানুষগুলি শহরবিচ্ছিন্ন, সুখ বৈভব বিলাস বিবিক্ত চিরন্তন অসহায়তা। ৩. লেখক বর্ণনা করেছেন ভাববাচ্যে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, ঘটনা লক্ষ্য নয়। এখানে লেখকও সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকে বিষয়কে নির্বিশেষ তাৎপর্যে দীপিত করেছেন। ৪. দ্বিতীয় নিরঞ্জনের image গল্পের কথক নায়কের মধ্যে আনার ব্যাপারে লেখক যে ভাষা ও সংলাপ রচনা করেছেন গল্পে, যে বড় ঘটনা বাদে সূক্ষ্ম situation সৃষ্টি করেছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত—তাতে গল্পের টেকনিকের অভিনবত্ব নিশ্চিত বড় মূল্য পায় এবং সেই সঙ্গে বিষয়-ভাবনার সজল কারুণ্য, অসহায়তা অঙ্গের সান্নিধ্যে শিল্পের একাত্ম বিষয় হয়।

দুই

গল্পের চরিত্র-কল্পনাও মুগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি অর্জন করতে চায়। গল্পটি কোনোক্রমেই যেমন কাহিনী ও ঘটনা-প্রধান নয়, তেমনি চরিত্র-মুখ্যও নয়। তবু রূঢ় বাস্তব গ্রামজীবন-চিত্রের পটভূমিতে আমরা চারটি মানুষকে দেখি প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে আর একজন, সে নিরঞ্জন নামের যামিনীর মায়ের দূর-সম্পর্কের বোনপো। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটির যামিনী চরিত্র একা নয়, তার মায়ের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে গল্পে যে তাকে আলাদা অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। তার বেদনা, যাবতীয় তৎপরতা মাকে কেন্দ্র করেই। এটা তার এক দিক, আর একদিক তার সঙ্গে আগের নিরঞ্জনের বিবাহ সম্পর্কের কথা-দেওয়া প্রসঙ্গের সূত্রে তার মনের অন্তর্লীন স্বভাবে মেলে। নায়কের ছিপ ফেলার দৃশ্যে যামিনীর প্রথম 'শান্তভাবে' আবির্ভাব দেখি গল্পে। সমাজ-আড়ষ্টতাহীন গতিবিধির মধ্যে তার কৌতূহলী তৎপরতা, তার 'মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য' তার গ্রাম্য স্বভাবেরই

অনুকূল। সেকালের গ্রাম্য তরুণীর শারীরিক গঠন ও গল্পের গ্রামীণ সমস্যানির্ভর মূল সুরের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো। 'তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে গেছে।' যামিনী নিজে থেকেই নায়ককে তার মাছ-ধরা সম্পর্কে সচেতন করে, উদ্দেশ্যহীন আচাব-আচরণে সে স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে তার শান্ত-করুণ মুখে তার দীপ্ত হাসির আভাস লেগে থাকে। বস্তুত এই চরিত্রে তার গ্রাম্য স্বাভাবিকতা এতটুকুও নষ্ট হয় না।

আবার এই যামিনীই মায়ের নিরঞ্জন-জনিত উৎকণ্ঠায় কাতর অপ্রস্তুত বিপন্ন হয় তার মণিদার কাছে। মায়ের পুরনো পাগলামি মণিদার কাছে হবে মুশকিল আসান—এটাই তার ভাবা ছিল। কিন্তু মায়ের কাছে মণিদার সঙ্গে নবাগত বন্ধুর আগের 'নিরঞ্জন' হয়ে ওঠার ঘটনায় সে স্তম্ভিত বিস্ময়ে অনড় হয়ে ওঠে। মায়ের বোনপো কথা দিয়ে গিয়েছিল বিয়ে করবে যামিনীকে, কিন্তু কোনোদিন সে আর আসেনি, তার কথা রাখেনি। নবাগত বন্ধুটি সেই নিরঞ্জনের ভূমিকায় হঠাৎ নিজেকে বসিয়ে যামিনীর মধ্যে আনে স্তম্ভিত বিস্ময়, আর তাতে যামিনীর 'বাইরে কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদান তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে বুঝি দেরি নেই।' যামিনীর এই বর্ণনায় তার অন্তরলোক উন্মোচন করতে চেয়েছেন লেখক। কিন্তু তা-ও রহস্যময়। আগে সেই নিরঞ্জন নিজে আসেনি, আর কোনোদিনই আসবে না জেনে গিয়েছিল যামিনী। আবার নতুন নিরঞ্জনের শপথ তার সামনে। আবার সেই আশা-নিরাশার আলো-আঁধারি খেলা শুরু যামিনীর মনে। সেকালের গ্রামীণ অনূঢ়া মেয়েদের কতবার যে পাত্রপক্ষের দেখতে আসা দলের সামনে বসতে হয় ক্ষীণ আশাটুকু বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে!

এই অর্থে 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের যামিনী আদৌ মিথ্যে নয়, অলীক কল্পনা নয়, দরিদ্র গ্রামীণ যুবতী রমণীর ভাগ্যকে লেখক জড়িয়েছেন গল্পের মূল বিষয়ে। 'নিরঞ্জন'-রা এভাবেই বিভিন্ন নাম ধরে যামিনীদের কাছে আসে, মুগ্ধ হয়, কথা দেয়, আর ফিরে আসে না। গ্রামের এই পরিবেশে কয়েকদিনের জন্য সমস্তরকম দায়িত্বহীন সোনালী স্বপ্ন নিয়ে বেড়াতে এসে শহুরে বা বহিরাগত কোনো যুবক যামিনীর মতো সহজ, সরল, শান্ত, নিষ্পাপ রমণীকে দেখে মুগ্ধ হবেই, সূক্ষ্ম আকর্ষণবোধ করবেই, হয়তো বিশেষ আবেগে বিবাহের কথাও ভাবতে পারে। এর মূলে কাজ করে তার সূক্ষ্ম, সহজাত সৌন্দর্যবোধ। কিন্তু তা একসময়ে ঢাকা পড়ে যায় মোহে। সেই বিশেষ পরিবেশের ও কয়েক মুহূর্তের মোহ কেটে গেলে সেই বাসনালোকও মুছে যায়। সুতরাং 'যামিনী'রা বাংলার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গ্রামগুলিতে আবহমান কাল বেঁচে আছে, থাকবে, আর সভ্যতার প্রখর আলোয় গড়ে ওঠা কৃত্রিম শহরের মানুষগুলি সেই একইভাবে অবসর বিনোদনের, বিলাসের জীবন কাটানোর উপায় হিসেবে ক্ষণিকের জন্য যেমন গ্রামকে ভালোবাসবে, ভালোবাসবে তার মানুষগুলিকেও। আধুনিক বিলাসবহুল শহর আর গণ্ডগ্রাম— দু'য়ের মধ্যেকার ক্রান্তিরেখায় এমন ক্ষণস্থায়ী বাসনা-কামনার মায়া রহস্য তৈরি করে দেয়

মানবমনে। গল্পের নিরঞ্জনরা বাস্তব, যামিনীর রূঢ় বাস্তবের অধীন, রোমান্সের অধীন হল এমন ক্ষণস্থায়ী ভালোলাগা! আসলে গল্পের আবহই এর জন্য দায়ী। বস্তুজগতের কোনো দায়ভার এখানে একেবারে উপেক্ষার বিষয়।

যামিনী কোনোক্রমেই দুর্বল মুহূর্তের কুয়াশাময় কল্পনা নয়, তার অস্তিত্ব বাস্তব, কেবল বেড়াতে আসা শহুরে যুবকদের কাছে সে এক আবেগময় অনুভূতি। বিলাসী দিনযাপনের বাসনার মধ্যে এই যামিনী কল্পনাময় হয়েই থেকে যায়। যামিনী ও নকল নতুন নিরঞ্জনের পরিকল্পনায় লেখক শহর ও গ্রাম জীবনের সম্পর্কের মধ্যে, আধুনিক সভ্যতার বিচারণায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও ব্যঙ্গটিকে বজায় রাখতে ভোলেননি। যামিনী খাঁটি ও রূঢ় বাস্তব, তার চোখেও বাস্তবতার ছায়া। নিরঞ্জনদের চোখেই থাকে কল্পনার মোহাঞ্জন, তারা আত্মসুখী, আত্মমুখীন, রোমান্টিক। বিষয়ীব আত্মতায় রিয়ালিস্টিক ও রোমান্টিক— দুই সত্তার মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম ভেদরেখা সব সময়েই থাকতে বাধ্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র বুঝিবা যামিনী ও নতুন 'নিরঞ্জন' তথা সর্বকালের 'নিরঞ্জন'দের পরিকল্পনায় তা বোঝাতে চেয়েছেন। 'নিরঞ্জন'দের কল্পনার বাস্তবভিত্তি অবশ্যই ক্ষণিকের, ক্ষণিকের অতিথির মতোই ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে 'যামিনী'দের কল্পনা সেই ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের সান্নিধ্যে এসেও, কিছু সময় থেকেও নিজেদের রূঢ় বাস্তব ভিত্তিতে চলে আসে। দু'পক্ষের কারোরই কোনো মীমাংসা হয় না। আর সেই কারণেই 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের 'যামিনী-নিরঞ্জন' সম্পর্ককল্পনা সার্থক ছোটগল্পের অসীম ব্যঞ্জনার চিরকালীন বিষয় হয়ে উঠেছে।

যামিনীর মা যথার্থ অর্থেই কন্যা-স্নেহ ও কন্যার জীবন-প্রতিষ্ঠার নির্মল আশায় অন্ধ রমণী। তার দারিদ্র্য শুধু নয়, তার অসহায়তা, যামিনীর উজ্জ্বল বিবাহিত জীবনের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করার বাসনা বার বার তাকে তাড়িত করে। এটাই স্বাভাবিক, এটাই এই চরিত্রের রূঢ় বাস্তবতার দিক। যামিনীর মণিদা শহরে বাস করা শিক্ষিত যুবক, rational, পরিবেশের বিরক্তি তাকে আর এক অসহায়তায় নিয়ে আসে। গল্পের নায়ক রোমান্টিক। গল্পের পরিণাম দেখে বোঝা যায়, তার মধ্যে সততার অভাব নেই। সে sentimental, আবেগপ্রবণ, স্পর্শকাতর মানুয। তাই বিশেষ মুহূর্তে সে নিজেকে 'নিরঞ্জন' বলে যামিনীর মনকে সান্ত্বনা দিতেও ইতস্তত করে না। যামিনীর ভাগ্য, তার মায়ের ভাগ্য—সব মিলিয়ে সে নিজের চোখের জল সামলাতে পারে না। শহরের কোলাহলমুখর পরিবেশে এই মনোভঙ্গি হয়তো দেখা দিত না, কিন্তু গ্রামের শান্ত পরিবেশে, যামিনীর মতো মেয়ের উপস্থিতিতে দুঃখ বড় করে বেজে উঠবেই। সেখানে সত্যই 'নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।'

আমাদের কথা হল, প্রেমেন্দ্র মিত্র রোমান্টিক গল্পের চরিত্রগুলিকে বাস্তবতা থেকে সরিয়ে আনেননি। এ গল্পের মূল যে ভাবকেন্দ্র, তার পক্ষে চরিত্রগুলির তুলিতে ধরা সংক্ষিপ্ত কালির টানের ছবি, বৈপরীত্যে বড় শিল্প আভাসিত করে।

উত্তমপুরুষ নায়কের অন্তঃশীল স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের বিচারে স্পষ্টই গতানুগতিক বিষয়বর্জিত একটি দিক লক্ষ করার মতো। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র

তাঁর কবিসুলভ রোমান্টিক মনের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন এমন চরিত্র নির্মাণে। 'তেলেনাপোতা' একটি গ্রামের নাম এবং বোঝা যায় এই নামে কোনো গ্রাম বাংলায় নেই। কিন্তু লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, বাংলার সমস্ত গ্রামই এই তেলেনাপোতার মতো। সব গ্রামেই আছে চরম দারিদ্র্য, নানা জটিল রোগে নিত্য প্রাদুর্ভাব, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত একাধিক পরিবার এবং সেই সব পরিবারের কন্যাদায়, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অসহায় আর্তজিজ্ঞাসা, অশ্রুসজল জীবনযাপন ইত্যাদি। শহর জীবনের পাশে এমন সব শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রাম ও গ্রামজীবন চমৎকার contrast নিয়েই উপস্থিত।

এমন গ্রাম-ভাবনায় আছে লেখকের রোমান্টিক মনের বিস্ময়কর স্বভাব। কীট্‌স্‌ শেলী প্রমুখ কবিতায় নিজেদের একটি করে জগৎ— যা স্বপ্নময়, একান্তই নিজস্ব—তৈরি করে সেখানে আত্মস্থ হতেন, পরে বাস্তবে ফিরে আসতেন বস্তুজগতের নির্মম অভিঘাতে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেরকম একটি জগৎ তৈরি করেছেন 'তেলেনাপোতা' কল্পনায়। তাঁর আবিষ্কার-ভাবনা দু'দিক থেকে লক্ষণীয়। 'আবিষ্কার' কথার ইংরেজি শব্দ 'Discover' যেমন হয়, তেমনি হয় Invention। যা আছে অথচ আবিষ্কৃত হয়নি, তাই discovery, যা আদৌ নেই তার আবিষ্কারের অর্থেই invention। 'তেলেনাপোতা অবিষ্কার' গল্পে তেলেনাপোতা গ্রাম সত্যই নেই, অথচ তার আবিষ্কার— এই অর্থে ব্যঞ্জনায় একটি অর্থ পায়। আবার তা না থাকলেও সমস্ত গ্রামই তেলেনাপোতার মতো। এই অর্থে আর একটি আবিষ্কারেব অর্থ দ্যোতিত হয়। দুই অর্থের ব্যঞ্জনায় 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' আবিষ্কাবের বড় অর্থ পেয়ে যায়।

আমরা জানি, কবিরা প্রতিভার মায়াবলে অলৌকিক 'শোক' ও লৌকিক ভাবের অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন। তখনি কাব্যের পাঠকের মনে রসের উদয় হয— যার মানে করুণ রস (pathos)। শোক হল দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যপাঠে পাঠকমনে যে করুণরসের সঞ্চার হয, তা— চোখের জল আনলেও মনকে আনন্দে পূর্ণ করে। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের শোকভাব হয়েছে স্বভাবী পাঠকমনে করুণ রস-সঞ্চারী। গল্পের কথক-নায়কের আবার গ্রামে ফিরে না যাওয়া, যামিনীর সেই নিরঞ্জনের গ্রামের ফিরে আসা-না-আসার সকরুণ প্রতীক্ষা রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের পুত্রহারা অম্বার করুণ কণ্ঠের মতো যামিনীর মায়ের অক্লান্ত অসহায় ক্রন্দন গল্পের করুণ রসকে ঘনীভূত করে।

আসল নিরঞ্জনের 'ধাপ্পা' দেওয়া এবং বানানো নিরঞ্জনের এক মানবিক গভীরতম অনুভূতিতে, রোমান্টিক মনের প্রবণতায় ও বিগত রাত্রির রোমান্সরস-অভিজ্ঞতার ঘনীভূত স্বভাবে প্রতিশ্রুতিদান— দুয়ের তফাতের মধ্যে কোনো রসাভাষ-দোষ নেই। 'না মাসিমা, আর পালাব না'— এই উক্তিটিতে অন্তরের সত্য ও মানবিক সজল হৃদয়ের বিম্বন আছে। সেই সত্য ও মানবিকতা রোমান্টিক স্বপ্নময় মোহমুগ্ধ পরিবেশ ও বাইরে কিছুদিনের জন্য বেড়'তে আসার অ্যাডভেঞ্চারের নূতনত্বে এবং সুদূরতায় বাস্তব জীবনেরই সত্য হয়ে উঠেছে। এখানেই সর্বজনীন দুঃখবোধের সহমর্মিতা ও সমবেদনাবোধ, চিরন্তন মানবতাবোধ! সে মানবতাবোধ গ্রামের দারিদ্র্যের চিত্রেই রূঢ় সত্য।

প্রথম গ্রামে আগত অর্থাৎ মূল নিরঞ্জনের অস্তিত্বের crude reality-র সঙ্গে যুক্ত চিন্তাভাবনা ও আচরণ, আর ক্ষণস্থায়ী বানানো নিরঞ্জনের স্বপ্নময় কল্পনা-রঙিন বাসনার সত্য— দুয়ের মধ্যে গল্পের নায়কের চারিত্রিক মানবরস-সৃষ্টির পরিচয় মেলে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এভাবে একটি মানবিক চিত্র এঁকেছেন : 'চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথাও যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে— ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।' বৃদ্ধার হাঁফ ধরা কথাগুলির প্রতিক্রিয়ার এই চিত্র এঁকে লেখক একসময় নায়ককে সমব্যথী করে বলেছেন— 'আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।' এইভাবে মানবিক রসে এবং মিথ্যে ও সত্য নিরঞ্জনের বৈপরীত্যে রসাভাষ দোষ না ঘটিয়ে লেখক জীবনের সত্য ও রসরূপ এঁকেছেন।

বস্তুত, এমনিতেই বোঝা যায়, গল্পের নায়ক তেলেনাপোতা আবিষ্কারে অসমর্থ, কিন্তু গল্পের নির্গলিতার্থে কখন যেন আবিষ্কৃত হয়ে যায় রচনাটি লেখার সমকালীন গ্রামবাংলার দরিদ্র পরিবারের অসহায়তার চিত্র ও তার মানুষজনের অসীম কান্নাকুল স্বভাব। তেলেনাপোতা আবিষ্কার দরিদ্রতম এক গ্রামবাংলার রূঢ় জীবন, জগৎ ও মানুষের আবিষ্কার। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা, চরম অসহায় অস্তিত্বের স্বরূপ আবিষ্কার, যে 'সত্য নিরঞ্জন' সত্যই ফেরেনি কোনোদিন, 'মিথ্যা নিরঞ্জন' কোনোদিন না ফিরেও সেই 'সত্য নিরঞ্জনের' স্বভাবকে চিনিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় নিরঞ্জনের সততা, মানবিকতা গভীর সহমর্মিতাবোধ 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের প্রথম নিরঞ্জন থেকে পৃথক সত্তার অধিকারী। মনে হয়, নকল নিরঞ্জন লেখকসত্তার জীবন ব্যাখ্যার উপযোগী, বক্তব্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী চরিত্র।

তিন

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' কবিত্বরসপূর্ণ রোমান্টিক ভাবমূলক গল্প। বাংলা সাহিত্যে এ এক স্বতন্ত্র রসের ধারা আনে। এই ধারার গল্পের বৈশিষ্ট্য হল— ১. বাস্তব সমাজ ও সংসার কাহিনীতে থাকলেও পরিণামে তা একমাত্র সত্য হয় না। ২. প্রকৃতি সমস্ত রকম প্রাকৃত অস্তিত্ব ছেড়ে এক অপার্থিবলোকে মুক্তির আকাশ হয়ে ওঠে। ৩. বাস্তব মানুষের কামনা-বাসনা সীমার শাসন থেকে অসীমের দ্যোতনায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যেনবা পদ্মরেণু হয়ে ওঠে। ৪. জীবনযাপনের একাধিক অধ্যায় হয় বিলাসিতায় শ্লথ-মন্থর, সমস্ত রকম প্রয়োজন সেখানে তুচ্ছ। ৫. এই ধরনের গল্পে কাব্যধর্মিতার আবরণ অবধারিত। তা গল্পের পক্ষে 'essence'। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে এগুলির পরিচয় পাই বলেই একে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ ধারার গল্প থেকে অন্য আসনে বসাতে আগ্রহী।

এই গল্পের ক্লাইম্যাক্স ঘটনায় নেই, চরিত্রের স্বপ্রকাশ বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যে নেই,

আছে সমস্তরকম বাস্তব-প্রয়োজন-বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ মানব মনের আকস্মিক একটি ভাবপ্রকাশের বিন্দুটিতে। গল্পের নায়ক, যামিনীর সামনে তার মাকে যখন নিজেকে নিরঞ্জন বানিয়ে বলে ওঠে, ('না মাসিমা, আর পালাব না।')— তখনি এই বিশেষ কথার আক্ষরিক অর্থে নয়, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে ও বিস্মিত বেদনায় ক্লাইম্যাক্স বিন্দুটি কেঁপে ওঠে। যখন আবার জানায়—('আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।')— তখনি ক্লাইম্যাক্সের পূর্ণগ্রাস থেকে গল্পের ভাবের একমুখিন স্বভাবের মুক্তির সময় হয়ে যায়। ক্লাইম্যাক্স অংশ একটু দীর্ঘ, কিন্তু অনাবশ্যক অতিবিস্তারের অসংযম নেই। তা এত তীব্র, এত রুদ্ধশ্বাস, এত নিবিড় আঘাতধর্মী, যে তার স্থিতিকালটিই গল্পের উজ্জ্বলতম অংশ হয়ে ওঠে চিরকালের পাঠকদের কাছে।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটির ভাবের দিক থেকে প্রধান দুটি ভাগ। প্রথম ভাগটি হল, তেলেনাপোতা গ্রামে আসার শুরু থেকে রাত্রির অভিজ্ঞতা দিয়ে নায়কের গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হওয়া পর্যন্ত। এই অংশ নায়কের মনের চোখে এক রোমান্সরসসমৃদ্ধ চরম রোমান্টিক মায়া-কাজল টেনে দেয়। বেড়াতে আসা নায়কের মনে এক সাময়িক স্বভাবে বৈরাগী গেরুয়া বসন-পরা উদাস বাউল জন্ম নেয়। নায়কের চরাচর ও প্রকৃতিকে দেখার বিস্ময় তার রক্তের স্বভাবকে কিছু সময়ের জন্যে অন্য আনন্দের স্বাদে আপ্লুত করে। এই অংশ রোমান্টিক কল্পনার অংশ।

আর এক ভাগ, রূঢ় বাস্তবের— যেখানে নায়ক ঘুম থেকে জেগে উঠে বাস্তব অভিজ্ঞতার সামীপ্য লাভ করে। কিন্তু এই সামীপ্যের মধ্যে তার চোখ থেকে সেই রাতে মনোরম সুদূর রোমান্সরসসমৃদ্ধ বোধ সরে যায় না। নায়ক চেতন-অচেতন-লোকের মাঝখানে অলৌকিক মনের স্বভাবে স্থির-নির্দিষ্ট থাকে। আর গল্পের এই দুই প্রান্তের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যেই আসে ইঙ্গিতধর্ম। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই গল্পে যত বেশি ব্যঞ্জনা এনেছেন, ততই বাস্তবের প্রয়োজনটুকু গ্রহণ করেই তাকে ঢেকে দিয়েছেন কবিত্বে। এমন রোমান্টিকতা ও কবিত্ব বা কবিপ্রাণতা আছে বলেই এই গল্পের নায়কের চরিত্রে যেন লেখক স্বয়ং থেকে গেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বয়ং কবি। তিনি কবিপ্রাণেই নায়কের মনকে সত্য করেছেন। যামিনীর মতো মেয়ের আকর্ষণ কোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, শহরের শিক্ষিত যুবকের কাছে এমন তীব্র হওয়ার কথা নয়, কিন্তু তেলেনাপোতার গ্রামীণ পরিবেশ, স্বপ্নময়তা, রোমান্টিক রূপালি ভাবনা একটা মুহূর্তে নায়কের মানসমুক্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। এই আকস্মিক মানসমুক্তিতেই আছে কবির কবিত্ব, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের কবি শেলী, কীট্স্ কবিতায় নিজস্ব এক রোমান্টিক জগৎ তৈরি করে, তার আনন্দে আপ্লুত থাকার পরেই বাস্তব পৃথিবীর অভিঘাতে আবার ফিরে আসেন মাটির ওপরে। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটি সার্থক গল্পের অবয়বে এক নিখুঁত রোমান্টিক কবিতা। কবিব্যক্তিত্বই এর জন্মদাতা, এর নায়কও।

এই কারণেই এর টেকনিক অভিনব ও অনবদ্য শিল্প-সুষমামণ্ডিত। ভবিষ্যৎ ভাববাচ্যে

আগাগোড়া গল্পের বাক্যগুলি গঠন করে এক নিরাসক্ত-চিত্ততার পরিচয় রেখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে। ১. গল্পের 'তেলেনাপোতা' গ্রাম রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'বাসা' কবিতায় কল্পিত ময়ূরাক্ষী নদীর মতো সম্পূর্ণ কাল্পনিক (fictitious) অস্তিত্ব। বাস্তবে কোথাও তা নেই। তা কবির উত্তুঙ্গ কল্পনার ফসল। কিন্তু আশ্চর্য, তেলেনাপোতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হলে তারা বোঝে, এ গ্রাম বাংলাদেশেই আছে এবং বাস্তবেই! এখানেই গল্পের পটভূমি রচনায় সার্থকতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র গ্রামবাংলার কল্পনায় নির্বিশেষ, যে কোনো ভৌগোলিক সীমানা ছাড়ানো গ্রামের কথায় আমাদের নিয়ে গেছেন। তার সত্যতা বিশ্বজনীন তাৎপর্য পায়। এখানেই এই গল্পের আন্তর্জাতিক শিল্পরূপ। ২. লেখকের সর্বজনগ্রাহ্য ভাববাচ্যে রচনার ভঙ্গিটি সার্থক হয়েছে এই কারণেই। সে ভঙ্গি বিশেষ (particular) নয়। ৩. লেখকের নিষ্ঠুর নিরাসক্তি অনুভবযোগ্য। যামিনীদের সংসার ও মানুষদের চিত্র, সেই গ্রামের গরুর গাড়ি, রাতের পরিবেশ, জমিদার বাড়ি, নিরঞ্জন নামের যুবক— সবই সত্য হয়ে যায় এই টেকনিক গ্রহণ করার কারণে। এক বিশেষ গ্রাম ও তার সংসার এবং প্রতিবেশ নয়, নির্বিশেষই লেখকের লক্ষ্য। এখানেই তিনি জাত রোমান্টিক। ৪. রোমান্টিক কাব্যময়তা এই গল্পে কায়ার ছায়ার মতো স্থিত। বাস্তবতাকে গ্রহণ করে গ্রাস-করার এই রোমান্টিক কাব্যময়তা গল্পের অনন্য সম্পদ। ৫. এই গল্পের ভাষা-রীতি আর এক অভিনবত্ব আনে শিল্পরূপে। চরিত্রগুলির কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজস্ব সংলাপ বর্জিত এবং যেখানে বর্জন সেখানে লেখকের ভাববাচ্যের বাক্যগঠনই তার অভাব পূর্ণ করেছে। যেমন, নায়কের পক্ষে যামিনীদের ব্যাপারটি জানার প্রবল ইচ্ছে, কিন্তু সে ইচ্ছেটা লেখকের বলার ভঙ্গির গদ্যেই নিহিত থাকে। — 'ব্যাপারটা কি এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির সঙ্গে বলবে, ব্যাপার আর কি!' এমন সব সিচুয়েশনকে গদ্যের টেকনিকে উতরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশল নিশ্চয় অভিনব।

জীবনকে দেখার দৃষ্টিতে আর প্রকরণগত নিখুঁত ধারণায় প্রেমেন্দ্র মিত্র 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে অনন্য। তাঁর গল্পে morbidity-প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিক সমালোচক কিছু মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, তাঁর এই morbidity-র জন্য তাঁর যুগ ও সময়ই দায়ী, লেখক সেক্ষেত্রে নিরুপায় দর্শক মাত্র। তিনি গল্পের ক্ষেত্রে এর মধ্যে কখনোই নিবদ্ধ থাকেননি, থাকতে পারেননি তাঁর দীপ্ত চারিত্র্যের কারণে। লেখকের চৈতন্যের শেষতম অধিতলে যে আত্মার বিস্তার সেখানে তিনি সমস্তরকম morbidity-কে অতিক্রম করেছেন, অস্বীকার করেছেন। তাই যে morbidity তাঁর গল্পে আছে, তা শিল্পের প্রসঙ্গগত উপায়মাত্র, লক্ষ্য বা সিদ্ধি নয়। একথা তাঁর দ্বন্দ্ব-দীর্ণ একাধিক চিঠির attitude-ও বলে দেয়।

চার

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' এমন গল্পের নামের তাৎপর্য শিল্পের বিচারে সুদূরপ্রসারী। ১. তেলেনাপোতা গ্রামে গিয়ে নায়কের অসম্ভব মানবভ্রমণের অভিজ্ঞতা, মানস মুক্তি, পরিশেষে যন্ত্রণাবিদ্ধ হওয়ার ফলে নায়কেব নিজেকে যে নতুন করে আবিষ্কার করার ঘটনা ঘটে, তা-ই এ গল্পের লক্ষ্য যেহেতু, তাতে নাম ব্যঞ্জনা আনে। ২. তেলেনাপোতা বলে কোনো গ্রাম নেই, তবু তার আবিষ্কার-বাসনায় যে রোমান্টিক নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা, এমন নামে তার প্রমাণ মেলে। ৩. আমরা আগেই এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত করেছি নায়ক চরিত্র ব্যাখ্যায়, আপাতত নামের ব্যাখ্যায সেটাই দ্বিতীয়বার আলোচনা করা যায় সংক্ষেপে। 'আবিষ্কার' শব্দটির আক্ষরিক অর্থে পরিচয় ইংরেজি অভিধানে লিখিত দু'টি ভিন্ন শব্দে—discovery এবং invention। প্রথম শব্দের অর্থ— যা প্রত্যক্ষত আছে, অথচ আজও অজানা তাকেই খুঁজে বের করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ— আদৌ নেই প্রত্যক্ষত কোথাও, তাকে খোঁজা। 'তেলেনাপোতা' গ্রাম এই নামে কোথাও নেই। তাকে তো কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই রোমান্টিক ভাবনায় একটি আবিষ্কারের তাৎপর্য আনে। আবার 'তেলেনাপোতা' নামে গ্রাম নেই ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামই তো লেখক-অভিহিত কাল্পনিক 'তেলেনাপোতা'র মতোই। তাকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা যে কোনো রসিক, মানবপ্রেমিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব! শিল্পী সেই আবিষ্কারের বড় পটভূমি দিয়েছেন এই গল্পে। যা নেই তাকে আবিষ্কার করা— দুই অর্থের ব্যঞ্জনায় 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের নিগূঢ় তাৎপর্য নামকরণের সার্থকতাকে শিল্পরসে মণ্ডিত করে।

২.

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে

এক

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর একটি চিঠিতে বলেছেন, 'দুঃখ দেখেছি বটে, দেখেছি কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ রুগ্ন-গলিত শব।' এই দেখায় শিল্পী-মনে যে অন্তর্গূঢ় প্রতিক্রিয়া তারই অন্যতম ফসল তাঁর 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটি। কল্লোলের কালের লেখকদের শিল্পী-মনের অন্যতম দস্তুরি ছিল বিষয়ের অভিজ্ঞতা ব্যবহারে একেবারে নীচের তলায় নেমে আসা। শৈলজানন্দের খোলা বস্তির জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাব খাদ্য হয়েছে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'সারেঙ' গল্পে সর্বহারাদের ভিড়ে নিজেকে নিরপেক্ষ রেখে তাদের কথায় গভীর-নিবিষ্ট হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এর ব্যতিক্রম নন।

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের বিষয়-অবলম্বনে এই লেখক নিশ্চিতভাবে কল্লোলীয়।

এই গল্প এক বিগতযৌবনা অত্যন্ত গরিব গণিকার গল্প। কিন্তু সে গণিকা শরৎচন্দ্রীয় ভাবনার অনুগ নয়, তার মধ্যে মধ্যবিত্ত সংস্কারের, বাঁচার অনিশ্চয়তার প্রলেপ নেই, আছে ফরাসি ন্যাচারালিজমের স্পষ্ট সাক্ষর। সংশয়, হতাশা, অনিশ্চয়তা, সুগভীর যন্ত্রণা— যেগুলি ছিল সে সময়ের তরুণদের মধ্যে সমকালের প্রতিক্রিয়ার অবধারিত প্রকাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেগুলিতে বিদ্ধ হয়েই নিরাবেগ বুদ্ধি দিয়ে জীবনের পোস্টমর্টেমে ব্যস্ত থেকেছেন। তাঁর এই জীবন-ব্যবচ্ছেদ কেবল মধ্যবিত্তের জীবন-সীমানায় স্থির থাকেনি, একেবারে নীচের তলার মানুষদের, তাদের কদর্য বাঁচার আর্তির মধ্যেও নিহিত থেকে গেছে।

বুদ্ধি থাকলেই বিচারণা ও ব্যঙ্গ লেখকের হাতের তুলির নির্দিষ্ট রঙ হবেই। মনন যেখানে জীবন-ব্যাখ্যার অস্ত্র, সেখানে নিরাসক্তি স্বীকৃত সত্য। আর যেখানে নীচের তলারও অবজ্ঞাত, কদর্য মানবস্বভাবের মধ্যে জীবন-অনুসন্ধিৎসা, সেখানে সমস্তরকম আবেগ, মধ্যবিত্ত-ভাবালুতা, compromise সাপের খোলসের মতো যেন নিজেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। যে কোনো ক্ষুধা বড় জীবনের তাৎপর্যেই অর্থের অতিশায়িতা পায়, তার অনুগৃহীত মানুষগুলির একই সঙ্গে বিকৃতি ও যন্ত্রণায় যথাযথ হতে কোনো বাধা থাকে না। এই সব বক্তব্যই 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের পাঠকদের ভাবিত করবে। জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র অস্তিত্বের সংকট, সংকট মোচনের জন্য সমস্ত রকম তৎপরতার নিরুচ্ছ্বাস চিত্র আঁকতে উন্মুখ। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, বণ্টনের বৈষম্য, দারিদ্র্য যে ক্লেদাক্ত জীবন গ্রহণে বাধা, অভ্যস্ত মানুষদেরও চরম অসহায় ও আত্মিক সংকটে তীব্রতম তাড়না দেয়,'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের মূল গণিকা নায়িকাটি তার দৃষ্টান্ত।

ফরাসি ন্যাচারালিজমকে প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন আত্মীয়তায় গ্রহণ করেছেন এ গল্পে, তেমনি দেশীয় প্রেক্ষিতে গল্পকে রেখে সর্বকালীন মানব্য-ভাবনায় তার স্বভাবে মাটির মধ্যেকার বিশুদ্ধ বাঁচার সারকে সম্মিলিত করেছেন। তাই 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে চরম হতাশার মধ্যেও আছে জীবনের জন্য ব্যাপ্ত মমত্ব ও মমতাবোধ।

দুই

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের মধ্যে টানা কোনো কাহিনী নেই, নেই কোনো পরিকল্পিত ফ্ল্যাশব্যাক। সামান্য কাহিনীটুকুর সময়-পরিধিও এক সন্ধে থেকে সেদিনেরই গভীর রাতের মধ্যবর্তী ক্ষণটুকু। একটি নিটোল ছোটগল্পের সংযম ও শাসন মেনে নিয়েছে এর ক্ষীণ কাহিনীর রেশটুকুও। গল্পের নায়িকা হল এক দেহজীবিনী বিগতযৌবনা দরিদ্র নারী বেগুন। যৌবনই হল পতিতাদের সঞ্চিত মূলধন। তা চলে গেলে তারা সব দিক থেকেই দরিদ্র হয়ে পড়ে। যে কারণে এই জীবিকা গ্রহণ, সেই জীবনধারণের উপযোগী পেটের ক্ষুধা তাদের কমে না। অথচ বেগুনের বাঁচার মতো, নির্দিষ্ট আশ্রয়ে থাকার মতো পয়সা নেই। বাড়িউলির অর্থআদায়ের

চাপে পড়ে তাকে প্রতি সন্ধেয় বেরুতে হয় পুরনো, ছেঁড়া, সেলাই-করা সিল্কের শাড়িটুকু পরে খদ্দেরের খোঁজে। সাহেবদের এক মেলায় নিজের অর্থের শেষ সম্বলটুকু খরচ করে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় তাকে। খদ্দের ধরার সমস্ত রকম কৌশল কিন্তু তার একের পর এক ব্যর্থ হয়। আসে তার গ্লানি, অসহায়তাবোধ। যে বীভৎস মানুষটিকে সে প্রথম খদ্দের হিসেবে বেছেও তার বীভৎস বিকলাঙ্গ চেহারার জন্য পছন্দ করেনি, গল্পের শেষে তাকেই আবার গ্রহণ করতে গিয়ে দেখে, আক্ষরিক অর্থে সে এক কপর্দকহীন পুরুষও। অথচ এই কপর্দকটুকুর জন্যেই তার এতক্ষণের সমস্ত রকম মরিয়া-প্রয়াস! শেষে সেই বীভৎস-দর্শন, কপর্দকহীন, কামুক পুরুষের সঙ্গকে বেগুন, অভিশাপজর্জর নরক জীবনে যাওয়ার পারানির কড়ি না মিললেও, একমাত্র ভাগ্যের দান বলে মেনে নেয়।

এখানেই কাহিনীর শেষ, গল্পেরও শেষ। কাহিনীবৃত্তে unity of time এবং place অদ্ভুত পরিকল্পনায় রক্ষিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'সারেঙ' গল্পে যেমন কাহিনীর প্রথমে নাসিমের মা গোলবানুকে এনে পরে একেবারে গল্পের শেষে হঠাৎ তাকে দিয়েই গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব তৈরি করেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রও তেমনি গল্পের প্রথম-ধরা বেগুনের সেই পুরুষটিকে দিয়েই শেষ ব্যঞ্জনার গভীর চিত্র এঁকেছেন কাহিনীর শেষ প্রান্তে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কাহিনীর বয়নের এ এক সার্থক স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পকৌশল। কৌশল গ্রহণে দুই কল্লোলীয় লেখকের শিল্প-সাযুজ্য লক্ষ করার মতো।

গল্পের চরিত্র-পরিকল্পনায় নায়িকা বেগুন তার সমস্ত ছোট ও পার্শ্বচরিত্রকে একেবারে ম্লান করে দিয়েছে। গণিকাকে লেখক নির্মম নিরাসক্তি দিয়ে, নিরাবেগ দিয়ে এঁকেছেন। সে যা, তা-ই হয়েছে গল্পে। এই বিগত যৌবনেও তার পেশায় নামতে যাওয়ার আগের প্রস্তুতি-চিত্র অস্বাভাবিক বাস্তবতায় আঁকা। সে চিত্রের কারুণ্য, অসহায়তা, যন্ত্রণা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় বেগুনকে এক অসাধারণ দেহোপজীবিনী করে তোলে। তার কণ্ঠস্বর যেন তার পেশার জীবনে শেষ অক্ষয় সম্পদ। তা তার শারীরিক অস্তিত্বকে ব্যঙ্গ করে যদিও, কিন্তু তার খদ্দেরকে বিস্মিত করতে পারে। আকর্ষণের পক্ষে এই বিস্ময়ও দরকার। বেগুন চরিত্র-পরিকল্পনার মূলে লেখকের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটি শিল্প-সার্থক।

বেগুনের সন্ধেয় সাজসজ্জার প্রস্তুতির মধ্যে থেকেই তার সামগ্রিক রূপ পাঠকের সামনে আসে। সে বিগতযৌবনা, কপর্দকহীন। বাড়িউলির দয়ায় তার বিগত দু'মাসের অসহায় আশ্রয়লাভ ও জীবনধারণ। যে শরীর দিয়ে তার জীবিকার সাশ্রয়, সেই শরীর ভিতরেও ভাঙতে শুরু করেছে। ভালো অন্ন জোটে না বলে তার দেহ দুর্বল, তার ওপর বুকের মধ্যে চাপা শারীরিক অসুস্থতাজনিত ব্যথা। সেই আগের মতো বাড়িউলির কোনো কথার প্রতিবাদ করতে পারে না। সন্ধেয় যে কোনো খদ্দের পাওয়ার ক্ষীণ আশাও সে মনে মনে পোষণ করে।

যৌবন থাকলে পতিতালয়ের মাসির সুনজরে থাকা যায়। শশী চরিত্রটি তাই বাড়িউলির একান্ত আদরের। তার উপস্থিতি দিয়ে লেখক বেগুনের জীবন-অস্তিত্বের

দীনতাটুকু আরও তীব্রভাবে এঁকেছেন। বেগুনের দারিদ্র্যের চিত্র ও চরিত্র আঁকতে বসে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন, যে নিরাসক্তচিত্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর তা এই লেখকের কলমেই তুলনারহিত হয়ে দেখা দেয়। এর সঙ্গে বাস্তবিক অর্থে ফরাসি ন্যাচারালিজম-এর প্রতিতুলনা চলে। যেন প্রেমেন্দ্র মিত্র যে গণিকা-জীবন-ছবি আঁকলেন বেগুনকে দিয়ে, তারই উত্তরসূরি হয়ে ওঠে নবেন্দু ঘোষের গণিকা বিষয়ক 'রাত্রি' গল্পের নায়িকা, হয় বিমল করের 'আঙুরলতা'ও।

সারা মেলা ঘুরে বেগুনের যে খদ্দের ধরার নিঃশব্দ ফাঁদ রচনার প্রয়াস— তার কৃতিত্ব যেমন যথাযথ, তেমনি তার নিষ্ফলত্বও বেগুনের নির্মম ট্র্যাজেডি আনার উপযুক্ত দিক। বয়স হয়ে গেলে খদ্দেরের বাছবিচার চলে না, এ বোধ বেগুনের প্রথমে ছিল না। সে বীভৎস মুখের প্রথম খদ্দেরকে তাই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে। প্রথমে তার খদ্দের ধরায় ছিল সূক্ষ্ম কৌশলের গোপনীয়তা, গল্পের মধ্যে ক্রমশ ব্যর্থ হতে হতে তার বেপরোয়া হয়ে-ওঠা স্পষ্ট হয়। সেই সংসারী ভদ্রলোকের হাত ধরে দোলায় বসার বাসনা সোজাসুজি বলা ও প্রত্যাখ্যাত হওয়া, রূপোর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া, সেই বুড়োকে জোর করে কাছে আনা এবং পুলিশের ধমকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেওয়া, সেই জুয়ার আড্ডায় গিয়ে পুরুষ বাছার কৌশল— সবই কপর্দকহীন অসহায় বেগুনের অক্ষম অথচ বেপরোয়া কৌশলের পরিচয় দেয়।

প্রথম-দেখা সেই বীভৎস কদর্য মুখের খদ্দেরের কাছে ফিরে-আসা এবং শেষে তার কপর্দকহীন অবস্থা দেখেও তাকে দুঃখে, যন্ত্রণায়, অনুশোচনায়, অসহায়তায় ও চরম হতাশায় রাতের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়ার মধ্যে আছে তারই নিয়তি-নির্দিষ্ট ভাগ্য। সব শেষে বেছে নেওয়া খদ্দেরটি যেন বেগুনের এমন অসহায় পতিতা জীবন-অবস্থার সম্মান। তাকে যে এখনো কেউ চায়, এমন খদ্দের গ্রহণ করে তার পেশার জীবনকে সচল করার প্রত্যয় আনে পতিতা সমাজে। কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণের গভীরে আছে কপর্দকহীনতার অসহায়তা, জীবনকে জিইয়ে রাখার উপযোগী শক্তিহীনতা। বেগুনের ক্লেদাক্ত জীবনভাগ্যের সকরুণ পরিণতি সমগ্র মানব ভাগ্যেরই স্বাভাবিক স্বরূপ।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে আছে বাড়িউলি, শশী, নামহীন তিনটি বেগুনের খরিদ্দার। তারা সকলেই বেগুনের জীবনভাগ্য ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং পরিণামী জীবন-যন্ত্রণার স্বরূপকে স্থায়ী রূপ দিয়েই প্রয়োজনহীন হয়ে পড়েছে। তাদের স্বতন্ত্র শিল্প-মর্যাদা বেগুনের সঙ্গেই ওতপ্রোত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এমন চরিত্র-পরিকল্পনা অসামান্য ছোটগল্প-শিল্পের অনুসারী। লেখকের সংযম, পরিমিতিবোধ, নিরাসক্তি, নিরাবেগ, সার্থক ছোটগল্পের আঙ্গিক-ভাবনাই 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের চরিত্রচিত্রণে শিল্পের মহত্ত্ব দান করেছে।

তিন

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে লেখকের 'মরবিডিটি'কে কেউ কেউ বড় করে দেখতে পারেন। কিন্তু গল্পটির নিখুঁত পাঠে যা স্পষ্ট, তা হল, তার আগাগোড়া আছে লেখকের তির্যক ব্যঙ্গের প্রচ্ছন্ন কশায় স্বাদ! ব্যঙ্গ জীবনের শূন্যতাকে সত্য করে না, জীবনমুখিন সত্যকে পূর্ণ করে। বেগুনের জীবন-সিদ্ধান্ত যেভাবে গৃহীত হয়েছে গল্পে, তা জীবন গ্রহণের অসহায়তাকেই বড় করে। আব এই negation সমগ্র গল্পের বিচারে affirmation-এর একজাতীয় উপায় (means)। প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনশূন্যতার যথাযথ চিত্র এঁকে পূর্ণ জীবনের সবল আর্তিটুকুকে কখনো ভোলেননি। বেগুনের সবল জীবনাকাঙ্ক্ষাই তো তার negative জীবন-অস্তিত্বকে এত করুণ করেছে! তাই এই গল্পে বেগুনের যে পরিণতি তা বিপরীতে সমান ওজনে জীবনবাদিতার স্বীকৃতির সমার্থক। বিষয় নির্বাচনে কল্লোলের কালের অবধারিত বিষয়ের সঙ্গে 'মরবিডিটি' গৃহীত হয়েছে মাত্র, তা জীবন-বিষয়ক প্রস্তাবে গ্রথিত হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই তত্ত্বসূত্রে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত কল্লোলীয় গল্পকাব একজন।

একটি সার্থকতম ছোটগল্পেব বিশিষ্টতায় 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'-র যে এক নিটোল শিল্পরূপ, এর প্রারম্ভিক চিত্রই তার প্রমাণ দেয় (সিল্কের শাড়ি সেলাই করার চিত্রে চরম দারিদ্র্যেব রূপ, 'ভর সন্ধেয় দরজা বন্ধ' থাকা, 'বেগুন' নাম প্রয়োগ— এসবে দেহজীবা নারীর কাহিনীর স্বীকৃতির প্রাথমিক দ্যোতনা)। গল্পের পরিণামী বাক্য 'এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিল না'— গল্পের নিটোল বন্ধন আনে ও বেগুনের জন্য নিয়মিত পরিহাসকে জ্বালাময় করে তোলে পাঠক হৃদয়ে। গল্পেব ক্লাইম্যাক্স ঠিক এই বাক্যের কিছু আগে শেষতম ধরা খদ্দেরের শূন্য পকেটগুলি বেগুনের তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কবার অসীম অসহায় হতাশার অভিব্যক্তিতে মেলে। এর পরেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে গল্পের 'ক্যাটাস্ট্রফি'। এবং সেখানেই গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা— যার মূল তাৎপর্য গল্প থেকেই জাত, কিন্তু গল্প থেকে বেগুনকে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যায় টেনে আনে।

সমগ্র গল্পের একমুখিতা কাহিনীতে নয, লেখকেব বিববণে নয়, কোনো ভাবের প্রবহমানতায় নয়, রক্তমাংসের চরিত্রের অভ্যন্তরের সঙ্গে তা সূত্রবদ্ধ, নিবিড়তম। গল্পের লক্ষ্যবস্তুর ইঙ্গিতধর্মিতা (suggestiveness) চরিত্র-আত্মায় সমন্বিত। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' চরিত্র-নির্ভর গল্প। নায়িকা চরিত্রের জটিল মনের আর্তি ও অস্থিরতাই এর মৌল বিষয়। বেগুনের সমস্তরকম তৎপরতা এর পোষকতা করে। তা চরিত্রব্যক্তিত্বের পোষকতা যেমন, তেমনি লেখকের জীবনদর্শনেরও, গল্পের পরিকল্পনাগত দাবিবও। এখানেই এই চবিত্রাত্মক গল্পের অনন্যতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা এই গল্পে কবিত্বহীন, শুষ্ক, নিরাবেগ, নিরাসক্ত। আগাগোড়া ব্যঙ্গ এর তাৎপর্যনির্ভর মর্মমূলে অন্তঃশীল। বর্ণনায় আছে বুকেব গভীরে ঘা মারার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস। বেগুনের সমস্ত রকম আচার-আচরণের ভাষ্যচিত্রে আছে সেই তীব্র কশায় ব্যঙ্গ।

সংলাপ বিশেষ এক পল্লীর বিশিষ্টতাকে এতটুকু কৃত্রিমতায় বিনষ্ট করেনি। লক্ষ করার বড় দিক হল, ভাষায় বুদ্ধি ও মনন এমনভাবে ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে, যা লেখকের রূঢ় বাস্তব-জীবন-ছবির গল্পের অন্যতম সম্পদ। বিষয়ানুগ গদ্য ব্যবহারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পী-মন সু-নন্দিত হবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের পরিমণ্ডলে শিক্ষাগ্রহণ করেও কল্লোলের কালে প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমারের মতো নিজস্ব একটি বাক্‌রীতির তাপস হয়েছিলেন, 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্প নিশ্চিতভাবে তার প্রমাণ দেয়।

চার

আগেই বলেছি, 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্প। কিন্তু নাম দিয়েছেন ঈষৎ ব্যাখ্যাশ্রয়ী বাক্যাংশের মধ্যে সুগভীর ব্যঞ্জনা দিয়ে। বেগুনের সমস্ত ক্ষুধাটাই তো বিকৃত, বিকৃত তার পেশার পদ্ধতি বিচারে— সে ক্ষুধা তার পেশার জীবনের বা খেয়ে-পরে বেঁচে-থাকার জীবনে যে সূত্রেই হোক না কেন। তাই নামের গভীরতর তাৎপর্য সহজেই পাঠকমনে বেজে যায়।

আর একটি ব্যাখ্যা আছে। বাইরের যে ক্ষুধা তা তো সামগ্রিক সাশ্রয়ে মিটে যায়। কিন্তু জীবনকে, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ক্ষুধা বা বাসনা, তার তো সহজ পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়! বেগুনের আছে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার আদিম বাসনা। সেই বাসনায় সে কিন্তু অসহায়। তার বয়স, তার শরীর সেই ক্ষুধার কাছে এক ফাঁদের মতো। সেই ফাঁদে জড়ানো ক্ষুধার আর্তি গল্পে ও চরিত্রে আছে বলেই নাম যথার্থ ও ব্যঞ্জনায় গভীর অর্থবহ।

তৃতীয় বক্তব্য হল, খদ্দের ধরতে বেগুন তো নানাভাবেই নিজেকে পোশাক-আশাককে ফাঁদ করেছে, তা তার সামগ্রিক আচরণ-বিধির এক জটিল ফাঁদ। কোথাও সে ফাঁদে আপনা থেকে ধরা পড়েছে বিকৃত মুখের সেই নোংরা পুরুষ, কোথাও সেই ফাঁদকে ছিঁড়েফুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে সেই অপরিচিত সতীর্থা রূপোর ধরা পুরুষটি, কোথাও বা ভুল জায়গায় ফাঁদ পাতায় বেগুনেরই বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন-হওয়া ঘটে গেছে। সুতরাং তার সবদিক থেকে অনশনক্লিষ্ট বিকারগ্রস্ত ফাঁদ পাতার চাতুর্য ও চঞ্চলতার ছবিতে গল্পটি সার্থক বলেই নামের ব্যাপক অর্থ উপেক্ষিত হয় না।

শেষ কথা হল, নামের মধ্যেও আছে ব্যঙ্গ। বেগুনের ক্ষুধা কি সত্যই বিকৃত? সে তো পেশায় দেহজীবা নারী। পুরুষ-সঙ্গ তার ব্যবসার অর্থ, লক্ষ্মী! পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সার যে ক্ষুধা, তার পক্ষে তা স্বাভাবিকই! বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে পয়সা উপার্জন করেই তো বাঁচতে হবে। ক্ষুধার নিবৃত্তির পথ সেখানেই। সুতরাং তার ক্ষুধা বিকৃত হবে কেন? আর সব মানুষের মতোই তার বাঁচার দাবি! তার ওপরই যে ফাঁদের কল্পনা, তাকে সব মানুষই এই পৃথিবীতে জড়িয়ে নিয়ে দিন কাটায়। তো বিধাতার পাতা ফাঁদ। সুতরাং ব্যঙ্গ অর্থে বেগুনের সক্রিয়তা বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদ পাতা নয়, স্বাভাবিক জীবন বাসনারই এক অন্য উপায় মাত্র! নাম এই অর্থেও সার্থক।

৩.

পাশাপাশি

এক

প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্পগ্রন্থের নাম 'মৃত্তিকা', প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫-এ। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মোট সাতটি গল্প— মৃত্তিকা, পাশাপাশি, মোট বারো, শুরু ও শেষ, প্রতিবেশিনী, শবযাত্রা ও পরাভব। দ্বিতীয় স্থানে সংকলিত আমাদের আলোচ্য গল্পটির সমস্যা যৌথ অর্থে সামাজিক ও পারিবারিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তিরিশের দশকের আনুমানিক মাঝামাঝি সময়ে লেখা এই গল্পে সময়ের পরিচয় যেমন মেলে, তেমনি আছে একনায়িকা কেন্দ্রিক চরিত্রভাবনার পরিপার্শ্ব মিলিয়ে জীবনধারণ ও যাপনের নিজস্ব সমস্যা ও সংকট। প্রসঙ্গত স্মরণে রাখা যাক, 'মৃত্তিকা' প্রকাশের আগের একটি গল্পগ্রন্থ 'নিশীথ নগরী'। এর প্রথম প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায়নি। উপবোক্ত দুটি গল্পগ্রন্থের প্রকাশের 'মধ্যবর্তী সময়ে অন্য ছোট গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু-পাঠক জানান : 'তাঁর মতো অস্থির, অন্যমনস্ক, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, বিস্মৃতিপরায়ণ, নিয়মহীন, বেহিসেবী মানুষ দুটি পাওয়া কঠিন; নিজের জিনিস বা রচনা, নিজের খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা রক্ষার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন;' এই স্বভাবের কথা মনে রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্প-মনস্কতার কথায় আমাদের সতর্ক হতে হবে।

'পাশাপাশি' গল্পের আখ্যান-অংশ সামান্যই। তার মধ্যে বড়মাপের তো নেইই, সামান্য ঘটনাও উপেক্ষা করার মতো। মাঝখানে একটি দরমার বেড়া দেওয়া, একটিমাত্র কল-পাযখানার ব্যবহারে অভ্যস্ত সামান্য ভাড়ার দুই পরিবারের সম্পর্কচিত্র গল্পের প্রথমেই মেলে। ছোট একটি বাড়ির মধ্যে দুই দরিদ্র পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে জোড়াতালি স্বভাবের গবমিল যেমন আছে, আবার মিল নেই তা-ও বলা যায় না। তার অর্থ দুটি পরিবাবেরই অসুবিধে আছে অনেক। স্বামী বিধুভূষণ অফিস যাবার আগে ভাত খেতে বসার সময় সামনে বসা স্ত্রী মেজবৌ-এর নানান অভিযোগ শোনে। পাশেব ভাড়াটেব শুচিবায়ুগ্রস্ত পিসি, তাদের চার বছরের ছেলের দৌরাত্ম্য— এসব সামলানো অসম্ভব। বিরক্ত ব্যতিব্যস্ত মেজবৌ নতুন বাড়ি খোঁজার কথা বলে স্বামীকে। বিধুভূষণ নির্বিকার শোনে, সে সব কথায় উদাসীন থেকে নিজের কিছু ছোটখাটো কাজের কথা নিজের খেয়ালে জানিযে অফিস বেরিয়ে যায়। পাতানো দেবর পাশের ঘরের ভাড়াটে অমল বৌদি-দেওর সম্পর্কে মেজবৌ-এর সঙ্গে তার ছেলে ও স্ত্রী কাননবালার প্রসঙ্গ ধরে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে মেতে ওঠে। কৌতুকের বিষয় অমলের নিজের সন্তানটি, স্ত্রী কাননবালার মতে, ওর মামাদের দিক থেকে এত সুন্দর! অমলের কথা সরল, স্বতঃস্ফূর্ত, ছদ্ম-কপট। মেজবৌ তাতে কিছু মনে করে না। মেজবৌ দেওরের স্ত্রী কাননবালার স্বভাব বোঝে—স্বার্থপর, অহংকারী, নিষ্ফল মিথ্যা আভিজাত্য নিয়ে কাননবালা মেজবৌকে জানায়—ওর বর বি.এ পাস বলেই এবং জলপানি পাওয়াতেই বায়োস্কোপের টিকিট বিক্রি করার কাজ পেয়েছে—বি.এ পাস না করলে নাকি কেউ এই কাজ পায় না। মেজ

বৌ-এর স্বামী বিধুভূষণ প্রসঙ্গে কাননবালাকে একসময় জানায় মেজবৌ—অসুস্থ হয়ে পড়ে বলেই বি.এ পাস করতে পারেনি স্বামী— এমন কথার প্রত্যুত্তরে। একসময়ে অমল কঠিন শুচিবায়ুগ্রস্ত পিসিমার পিছনে লেগে একটি ব্যাপারে গোটা কলকাতার কলের জল অশুচি হয়ে গেছে এই খবর দিয়ে তুমুল কৌতুকে মাতে মেজবৌ-এর সামনেই। পাশাপাশি দুই বাড়ির মধ্যে এমন কৌতুকের বন্ধন যেমন আছে, তেমনি গরমিলও। তবে মিলের আর একটি সূত্র অমলের ছোট ছেলেটি। তার লুচি খাওয়ার বাসনায় যে শিশুসুলভ জিদ ও কান্না— তাকে থামায় মেজবৌ স্নেহ, আদর দিয়ে; প্রায়ই লুচি খাওয়ায়। মেজবৌ-এর সন্তানাদি নেই। এর মধ্যে কাননবালা তার ছেলের প্রতি স্নেহের পছন্দ-অপছন্দের কথা শোনায়। পছন্দ-অপছন্দ নিযে কথার একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে পিসিমা মেজবৌ-এর সন্তান না থাকার দিককে নিয়ে খোঁটা দেয়। এমন কথার ভিতরে প্রবলতম বিক্ষুব্ধ মেজবৌ স্বামীর ওপর চাপ দেয় বাড়ি বদল করার জন্য। স্বামী আত্মকেন্দ্রিক উদাসীন। এসবের মধ্যে হঠাৎ অমলের টিকিট বিক্রির চাকরি চলে যায়। কঠিন অভাবে ক্রমশ বাসন-পত্র বিক্রি কবে কোনোরকমে সংসাব চলতে থাকে। নিঃস্ব অবস্থায় কানন প্রায়শই মেজবৌ-এর রান্নাঘর থেকে তেল ও নিত্যব্যবহার্য আনুষঙ্গিক ইত্যাদি চুরি করতে থাকে। মেজবৌ তা সামলাতে রান্নাঘরে তালা দেয়। ওদের কিছু চাল ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে গেলেও কাননবালা আভিজাত্য বজায় বাখতে তা নিতে অস্বীকার করে। অভাবের দিনে ছেলেটা কেঁদে আকুল হয়। পিসিমা ওদের সাহায্য নিতে চাইলেও কাননবালা মানসম্ভ্রম বাঁচাবার কথায় জোর দেয়। শেষে ওদের সাহায্য পিসিমা নিজে থেকে নেয়। গভীর রাতে মেজবৌ-এর স্বামী বিধুভূষণ মেজবৌ-এর হাতে রান্নাঘরের দরজার তালাচাবি দেখে জিজ্ঞেস করে এখনো রান্নাঘর তালাবন্ধ করা হয়নি কেন! মেজবৌ-এর উত্তর :

> 'ঢের ঢের মেযে দেখেছি বাপু, এমন নচ্ছার মেয়ে হয় জানতাম না। দেমাকে এদিকে মাটিতে পা পড়ে না, অথচ চুরি করতে বাধে না। '...... 'কি করব বল? সামনা-সামনি দিতে গেলে তো নেবেন না। নবাবের বেটির যে মান যায়। তা বলে ওই দুধের ছেলেটা উপোষ করে মরবে।'....
>
> 'তা হলে বাড়ি বদল আর দরকার নেই?'.......
>
> 'দরকার নেই কি রকম! অমল ঠাকুরপোর একটা চাকরি হোক না, তারপর এই ছোটলোকদের সঙ্গে আমি আর একদণ্ড থাকব ভেবেছ!'

এইখানেই গল্পের শেষ।

'পাশাপাশি' গল্পের মূল প্লটে টানা কাহিনী নেই, প্রয়োজনও হয়নি, কারণ গল্পের মূল বিষয় দুই নিম্নবিত্ত তথা দরিদ্র পরিবারের দুই মহিলা সদস্যের ব্যক্তিত্বের সংঘাতই একমাত্র লক্ষ্য। সেখানে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই গল্পকারের বিষয়-ভাবনার একমাত্র ভিত। প্লট গড়ে উঠেছে চরিত্র ধরে, তাদের বাস্তবতার অনুগ থেকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বর্তমান গল্পের গঠনরীতি সেখানে ভিন্ন মাত্রায় গড়ে-ওঠা গল্প-ভাবনা, প্রচলিত পথ থেকে লেখক সরে এসেছেন। দুটি প্রতিবেশী দরিদ্র পরিবারের মধ্যে পারিবারিক ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব

থেকে জাত মিল আর গরমিলের ছবি আঁকতে গিয়ে প্লটের প্রচলিত রীতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। কথাটা বোধ হয় এভাবেই বলা ভাল, কাহিনীসূত্র ও ঘটনা লেখকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চাপে হয়েছে প্রয়োজনহীন।

গল্পের মধ্যে লেখক শিল্প-ন্যায় মেনে বেশ কিছু কথা বলেছেন যা এমন গল্প-গঠনের নীতি-নির্দেশক :

> 'ছোট একটি বাড়ির মধ্যে শুধু দারিদ্র্যের প্রয়োজনে দুইটি পরিবার এমনি করিয়া জোড়াতালি দিয়া বাস করে।
>
> গরমিল যথেষ্ট আছে কিন্তু মিলও একেবারে নাই বলা যায় না।'

সম্পর্কে মিল ও গরমিল দেখাতে গিয়ে গল্পকার পরিকাঠামোয় দুটি প্রধান চিত্রগুচ্ছের রূপাবয়ব সামনে এনেছেন। গল্পের মধ্যভাগে অমলের টিকিট বিক্রির চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনার কথা আছে। এমন একটিমাত্র ঘটনাই গল্পের জট তথা প্লটের গিঁট তৈরির লক্ষণীয় দিক। এর আগে নিজের শিশুপুত্র ও স্ত্রী কাননবালাকে নিয়ে অমলের মেজবৌয়ের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকহাস্যের ছবি আছে, ছবি আছে শুচিবায়ুগ্রস্ত পিসিমাকে নিয়ে বিপুল কৌতুক রসসৃষ্ট-চিত্র। চাকরি যাওয়ার পর যে চিত্র, তা গরমিলের। অবশ্যই প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের চিত্রগুচ্ছের মধ্যে যত মিল ও গরমিলই থাক না কেন, এসবের মধ্যে মিলনের সূত্রটি একমাত্র অমলের শিশুপুত্র। অর্থাৎ দুই ভিন্ন রসের ছোট ছোট একাধিক চিত্র দিয়েই সমগ্র গল্পটি সূত্রবদ্ধ। সবশেষে মেলে গল্পের climax — 'চরমক্ষণ'।

গল্পের 'মহামুহূর্তে'র দায়িত্ব এসেছে প্রধান নারী তথা নায়িকা চরিত্র মেজবৌ-এর সক্রিয়তা ধরেই। ক্লাইম্যাক্সের অনবদ্য শিল্পমহিমা— প্লট ও চরিত্রধর্ম উভয়ত— প্রতিষ্ঠা পায় মেজবৌয়ের উচ্চ মানবিক বোধের তাৎপর্যে:

> 'বিধুভূষণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার হাতে কি?'
>
> মেজ বৌ সংক্ষেপে বলিল, 'কিছু না, রান্নাঘরের তালা।'
>
> বিধুভূষণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তালা দিয়ে এলে না?'
>
> মেজবৌ তাহার সামনে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'কি করব বল? সামনাসামনি দিতে গেলে তো নেবেন না। নবাবের বেটির যে তাতে মান যায়। তা বলে ওই দুধের ছেলেটা উপোষ করে মরবে!'

ক্লাইম্যাক্সের গভীর অর্থদ্যোতক ব্যঞ্জনার রহস্য মূর্ত হয় মেজবৌ-এর ব্যক্তিক attitude-এ। পরবর্তী মেজবৌ-এর চরিত্র ধরেই গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনাব চিত্র চিরন্তন মানবতার এক রসসৃষ্ট মাটির ভিত নির্মাণ করে :

> 'বিধুভূষণ খানিক চুপ করিয়া থামিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,'তা হলে বাড়ি বদল আর দরকার নেই?'

মেজবৌ উচ্চ স্বরে বলিল, 'দরকার নেই কিরকম। অমল ঠাকুরপোর একটা চাকরি হোক না, তারপর এই ছোটলোকদের সঙ্গে আর একদিনও থাকব ভেবেছ!'

বস্তুত 'পাশাপাশি' গল্পের প্লটের পরিকাঠামোয় মাংস-মজ্জা-প্রাণ মিশ্রিত বিস্ময়কর

শিল্প-লাবণ্যের রহস্যের প্রলেপ দিয়েছে কাননবালা-মেজবৌয়ের দ্বান্দ্বিক মনোজগৎ ও শেষমেশ একক মেজবৌ-এর নিঃসীম আকাশের বুকে আলোর মতো মনোভূমির ঔজ্জ্বল্য।

দুই

'পাশাপাশি' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তিরিশের দশকের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরোক্ষ পরিবেশ ধরেই তাৎপর্য পায়। তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে যে সময়ে, আনুমানিক দিক থেকে, বর্তমান গল্পটি রচিত, তা বৃটিশ উপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় বুর্জোয়া অর্থনীতির বিভেদমূলক বণ্টন-বৈষম্যে সচকিত। পরিবার জীবন তথা সমাজ জীবন নিম্নবিত্ত স্বভাবে সংকট-সংশয়ে তটস্থ। দারিদ্র্য, বেকারি, বিভেদ— এসব দিয়েই জীবনধারায় ঘটে নিয়ন্ত্রণ। উপনিবেশবাদ শেখায় যেমন অসহায়তা, তেমনি মানুষে-মানুষে, এক পরিবারের সঙ্গে আর এক পরিবারের সম্পর্কসূত্রে নিষ্ফল আভিজাত্যের অহংকারও শেখায়, আনে স্বার্থপরতা, অহংকৃত মনোভঙ্গি। যে চরম দারিদ্র্যে মানুষ হয়ে যায় ভাঙা, সেই দারিদ্র্যের ওপরেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো নেমে আসে পুনর্বার বেকারি জীবনে ফিরে আসার অভিশাপ। এক পরিবার দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্য নিয়ে অক্ষম হেঁটে যায়, আর এক পরিবার কোনোরকমে টিকে থাকার অভ্যাস থেকেও স্খলিত হয়ে সর্বহারার অভিশাপ মাথায় নিয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

'পাশাপাশি' গল্পে অমল-কানন-শিশুপুত্রের সংসার, আর মেজবৌ-বিধুভূষণের সংসার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত হয়ে কখনো পরস্পরের মিত্রতার যাত্রাসঙ্গী হয়, কখনো আবার পারস্পরিক প্রবল প্রতিকূলতায় মানবতার বিরোধী ভয়ংকর হয়ে ওঠে। অমলের স্ত্রী কানন হয় স্বার্থপর, অহংকারী, ঈর্ষাকাতর ও নিষ্ফল আভিজাত্যের উপকরণ— ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে সৃষ্ট এক নিশ্চিত লক্ষ্য। অন্যদিকে মেজবৌ এত অবক্ষয়িত অবস্থার মধ্যেও টিকিয়ে রাখে তার মানবতাবোধ।

দুটি পরিবার পাশাপাশি থেকে মিলে-গরমিলে যে চিত্রের জন্ম দেয় গল্পের শেষে, তার মধ্যেই বড় হয়ে ওঠে মানবতা-মন্ত্রের মহত্তম প্রতিশ্রুতি। মেজবৌ তারই সমর্থক। তা-ই সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য, লেখকের পক্ষে উন্মুক্ত জীবনাগ্রহ (attitude to life)। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পের পরিশ্রুত রসাভাষে জীবন সংকটের সমাধানের ব্যঞ্জনাগর্ভ চিত্র এঁকেছেন স্বামী বিধুভূষণ ও মেজবৌয়ের অন্তিম কর্মতৎপরতায়। অমলের চাকরি যাওয়ার পর অর্থনৈতিক অসহায়তায় স্ত্রী কাননের যে সংসার বাঁচানোর প্রয়াস, নিষ্ফল আভিজাত্যের অহংকার, মেজবৌ-এর রান্নাঘর থেকে সংগোপনে খাদ্য ও খাদ্য তৈরির উপকরণ চুরির প্রয়াস, মেজবৌ-এর প্রকাশ্যে সাহায্য করতে গিয়েও অপমানিত হয়ে ফিরে আসা এবং শেষে মুক্তমনে শিশুটিকেও বাঁচাবার জন্য উপায় নির্ধারণ, ওদের পরিবারকেও বাঁচিয়ে রাখার উদার মানসিকতা— এসবের মধ্যেই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ব্যঞ্জনাত্মক করে। কানন স্বভাবে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি-আশ্রয়ে প্রশ্রয় পেয়ে হয় তারই যথোচিত victim, মেজবৌ এসবের মধ্যে কিছুটা নির্মল আকাশ— যার আলো মানবতা

নামক সূত্রের স্বচ্ছ আলোর অভিজ্ঞান। অমলের সামান্য চাকরি যাওয়া, কাননের মিথ্যা আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার মেকি স্বার্থপর মানসিকতা অর্থনৈতিক বিভেদের ও বুর্জোয়া মানসিকতার বিশেষ সময়-ভাবনার দৃষ্টান্ত। গল্পের শেষে একদিকে কাননের নকল মানসম্মান নীতিবোধ ধরে ভয়ংকর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আর একদিকে রান্নাঘরের দরজায় তালা খুলে রেখেও 'ওই ছোটলোকদের সঙ্গে আমি আর কোনদিনও থাকব ভেবেছ'— স্বামীকে মেজবৌ-এর বলা এমন সত্যিকারের মানবিক অভিমানাহত কণ্ঠের উক্তি— পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় 'পাশাপাশি' গল্পের মূল রসাস্বাদ জীবনের দিকে মূল ফেরানোতেই বড় প্রাপ্তির দিক উন্মোচন করে।

তিন

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর আঁকা কোনো চরিত্রকেই আবেগে, ভাবপ্রবণতায় আঁকেন না, তীব্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে যেমন জীবনকে দেখেন, দেখান, তেমনি চরিত্রগুলিকে মেদবর্জিত করে লক্ষ্যের উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সংহত করেন। তাই আখ্যান-অংশ হয় সংক্ষিপ্ত, ঘটনার ঘটে বর্জন, গল্পের পক্ষে, তাঁর জীবনভাবনার সমর্থনে যতটুকু চরিত্রের আলো প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহযোগী, ততটুকুই চোরালণ্ঠনের আলো ধরে দেখান। 'পাশাপাশি' গল্পের একমাত্র প্রধান চরিত্র মেজবৌ। এর কয়েকটি মাত্রা বোঝাতেই গল্পে এসেছে প্রতিবেশী-পাতানো-দেবর অমল, স্ত্রী কানন, অমলের পিসিমা, মেজবৌ-এর স্বামী বিধুভূষণ।

অমল হাসিঠাট্টায় দেবরের স্বভাবে মেজবৌকে মাতিয়ে রাখে কঠিন দুঃখের দিনেও। তার স্বভাবে মেলে মুক্ত মতি, মুক্ত মন। ঠাট্টার কারণে তার কথা বেশি। তাতে মাঝে মাঝে বিরক্ত হবার মতো মনের অবস্থা দেখা দিলেও মেজবৌ সেসবে আমল দেয় না, কারণ, মেজবৌ-এর ভাবনায় 'তাহার আচরণে কথাবার্তায় যেন সত্যকার একটা সরলতা আছে।' অমল নিজের ছেলে ও স্ত্রী কাননকে জড়িয়ে কৌতুকে মাততে দ্বিধা করে না মেজবৌ-এর সামনে। আবার পিসিমাকে নিয়ে তার হাসির কথায় কানন ও মেজবৌ দুজনেই সোচ্চার হয়। আসলে গল্পে অমল কিছুটা যেন 'রিলিফ', পাশাপাশি দুই দরিদ্র পরিবারেব একটি বাড়ির মধ্যে দরমার দেয়াল ভাগ করে দৈনন্দিন জীবনযাপন, তাতে অমল এক ঐক্যের সুষমায় সব ঢেকে দেয়। গল্পের মধ্যে একই সঙ্গে দুটি রসাস্বাদ মেলে। একদিকে মিলমিশ, আর একদিকে গরমিল। অমল মিলটা কৌতুকের রসে ভরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে কানন মেয়েদের স্বভাবে, ঈর্ষায়, অহংকারে, স্বার্থপরতায় অন্য দিক দেখায়। মিথ্যে মানসম্ভ্রমবোধে সে যেনবা একটা অন্ধকার ঘরের এক কোণের বাসিন্দা। পাশের মেজবৌ তার যেন প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বামী অমলের কথায়, প্রশংসায় মেজবৌ-এর কাছে সে মিথ্যের আশ্রয় নেয় নির্বিবাদে। মেকি আভিজাত্যবোধে কানন তিরিশের দশকের এক বাস্তব ব্যক্তিত্ব— যার সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া অর্থনীতির কেন্দ্র থেকে জন্ম। সে তার দুর্দিনে প্রতিবেশীর মানবিক সাহায্য নিতে অস্বীকার করে অসম্মানবোধে, কিন্তু গোপনে

মেজবৌয়ের রান্নাঘর থেকে চুরি করতে নির্দ্বিধ। পিসিমা শুচিবায়ুগ্রস্ত মহিলা। তার সংস্কার কঠিন পাথরের মতো অনড়, কিন্তু সেখানেই তার যাবতীয় অসহায়তা! তা সত্ত্বেও পিসিমার বদল হয়, মেজবৌকে সন্তান না-হওয়ার নিন্দা করতে পিসিমা অশিক্ষিত মনের পরিচয় দানে অস্পৃশ্যপ্রায়।

মেজবৌ প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলায় ছোটগল্পের ধারায় একটি জীবন্ত, বাস্তব, মানবাবোধে দীপিত চরিত্র। মেজবৌ আদৌ emotional ও sentimental ব্যক্তিত্ব নয়, যথার্থ অর্থে rational। তার মানব্যবোধ তাকে উচ্চ মর্যাদার আসন দেয়। শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে শিশু চরিত্র এঁকেছেন অফুরন্ত বাৎসল্যরসের আবরণ দিয়ে। তারা যুক্তিহীন বাৎসল্য ভাবে ও রসে এক বাঙালি পরিবারের অভিজ্ঞান হয়ে যায়। নিঃসন্তান হয়েও মেজবৌ সেই ধারার বিপরীত এক ব্যক্তিত্ব। প্রথমত নিজের কোনো সন্তানাদি নেই বা হয়নি বলে মেজবৌ কাননের ছেলেকে কাছে টানেনি। বাৎসল্য ভাবে মেজবৌ অমল-কাননের সন্তানকে কাছে আনেনি। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্যের প্রয়োজনে দুইটি পরিবার জোড়াতালি দিয়ে বাস করে এবং তাদের যাবতীয় মিল গরমিলে 'মিলনের সূত্র ছেলেটি'। মেজবৌ তাকে স্নেহে, আদরে মানবিক বোধে কাছে আনে। তার শিশুসুলভ চাহিদা যতটা সম্ভব মেটায়। সুবিধা থাকলে ছেলেটি চুরি করতেও ছাড়ে না। খাদ্যবস্তু না পেলে তার কান্নাকাটিতে মেজবৌ এক এক সময়ে অকারণ উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে ওঠে। তবু তার সহজাত মানবিক ভাব-ভাবনা সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাকে সম্পূর্ণ প্রচলিত ধারার স্নেহময়ী জননীর স্বভাব থেকে ভিন্ন মেরুতে বসায়। তৃতীয়ত, সমগ্র 'পাশাপাশি' গল্পে মেজবৌ-এর হাতেই এবং মানসিকতাতেই গল্পটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের প্রতীকী রূপ মেলে। গল্পের শেষে এমন সংলাপ বিনিময়ে সেই দৃষ্টান্ত :

> 'বিধুভূষণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার হাতে কি?'
> মেজবৌ সংক্ষেপে বলিল, 'কিছু না! রান্নাঘরের তালা।'
> .....'তালা দিয়ে এলে না?'..........
> মেজবৌ তাহার সামনে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'কি করব বল? সামনাসামনি দিতে গেলে তো নেবেন না। নবাবের বেটির যে তাতে মান যায়। তা বলে ওই দুধের ছেলেটি উপোষ করে মরবে!'

মেজবৌ রান্নাঘরে নিজে থেকে তালা না দিয়ে প্রতিবেশীর প্রতি যে আচরণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাতে চাবিটাই বিস্ময়কর প্রতীক হয়েছে মানবতাবোধের নিগূঢ় তাৎপর্যে। এই মানব্যভাবনাই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। মেজবৌ তাই বাংলা ছোটগল্পের ধারার এক নতুন নারীচরিত্র।

গল্পের অমল, পিসিমা, বিধুভূষণ নানান দিক থেকে মেজবৌয়ের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্মাণে সাহায্য করেছে। বিপরীতে কাননের সূত্রেও মেজবৌ-এর বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। বিধুভূষণ যেমন মেজবৌও সাংসারিক পরিবেশে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত। তেমনি অমলও দুঃখের, সাংসারিক দারিদ্র্যের মধ্যেও উন্মুক্ত হৃদয়ের পরিচয় রেখেছে। চাকরি চলে যাওয়ার পরও

দারিদ্র্যের মধ্যে নিজের দুটি পয়সা এক প্রায়-সর্বহারা রাস্তায়-বসা অসহায় গণৎকারের কথা ভেবে তাকে দিতে দ্বিধা করে না। পিসিমাও কাননের বিপরীতে এমন কথা অবলীলায় বলে, 'কি আমার নবাবের বৌ গো, তার আবার মানসম্ভ্রম। আমি বলে আধপেটা খেয়ে উপোষ করে দিন কাটাই। দশটি টাকা সম্বল!'—শেষে মেজবৌ-এর সাহায্য কিছুটা মুক্ত মনেই মেনে নেয়। বিধুভূষণ স্ত্রী মেজবৌ-এর সিদ্ধান্তে পরম স্বস্তি পায়। সেখানেও সেই চিরন্তন মানবিক বোধের কাছে স্বস্তির স্বস্ত্যয়ন! একালের এক প্রয়াত কথাকার-সমালোচক যে বলেছেন : 'সমস্ত হীনতা-দীনতার মধ্যেও মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মমত্ব ও সমাত্মকতার অনুভাবে গল্পটি আমাদের স্নিগ্ধ করে' তা নিশ্চয়ই মান্য, কিন্তু গল্পে 'শরৎচন্দ্র-সুলভ একটি কোমল মাধুর্য বিস্তার করে দেখা'—এ বিষয়ে আমাদের কিছুটা অস্বস্তি থাকেই। মেজবৌ যেভাবে এই গল্পে অমল-কাননের শিশুপুত্রের প্রতি তার যুক্তিনিষ্ঠ কর্তব্যবোধ, মানবিক মমত্বে, সহমর্মিতায়, উদারতার অপূর্ব স্বাক্ষর রেখেছেন, শরৎচন্দ্র এই জাতীয় চরিত্রে গভীর গাঢ় যুক্তিহীন বাৎসল্য ভাবে ও রসে তাকে ভাবপ্রবণতার (Sentiment) অনুগ করেছেন তাতে 'কোমল মাধুর্য' অন্য মাত্রা দেয়। মেজবৌ ও প্রতিবেশীর শিশুপুত্রের পারস্পরিক আচরণ সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাতেই শেষ নয়।

চার

আগেই বলেছি 'পাশাপাশি' গল্প পারিবারিক-সামাজিক মানুষদের চরিত্রাত্মক সমস্যার গল্প। জটিল মনস্তত্ত্ব জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি চরিত্রের রক্তমাংসে। এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা গড়ে উঠেছে পরিবার ও সমাজের কঠিন সমস্যা ও বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক স্বভাবের প্রভাবেই। গল্পে বিশেষ একটি চরিত্র মেজবৌ, তাকে আপন চিত্ত-স্বাতন্ত্র্যে অমলের স্ত্রী কানন নানাভাবে আঘাত করে। সে আঘাতও 'Mental' ও 'Psychological'। গল্পের শেষে এই দুই সম্পর্কের টানাপোড়েনে এক অচেনা অপূর্বতার দিক আলোময় হয় মেজবৌ ব্যক্তিত্ব ধরে। গল্পটি তাই যেন এক প্রচলিত ego-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ!

গল্পটির মধ্যে 'মহামুহূর্ত' তৈরি হয়েছে প্রধান চরিত্র ধরেই। তা বানানো নয়, প্রধান চরিত্রের অভ্যন্তর থেকে স্বাভাবিকতায় উঠে আসার মধ্যে। এতে ঘটনা নয়, ভাবের অভিঘাত নয়, চরিত্রের প্রকাশমূলকতায় তার প্রতিষ্ঠা। মেজবৌ-এর শেষতম বাক্যটি যে স্বামী বিধুভূষণের কাছে স্ত্রীর পক্ষে একেবারে নিষ্ফল, সাময়িক ক্রুদ্ধ ও অভিমানাহত ভাষণ, তার প্রমাণ মেলে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরাসক্ত বিধুভূষণের এমন মনোরম ও স্বস্তির অভিজ্ঞতা লাভেই : 'বিধুভূষণ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তা হলে বাড়ি বদল আর দরকার নেই?' বিধুভূষণ ও মেজবৌ—দুজনের দুটি অনিবার্য সংলাপ-বিনিময়ে মেলে দুই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গভীরতায় 'পাশাপাশি' গল্পের বড় সার্থক শিল্পপ্রকরণ— গল্পে এতটুকু অনাবশ্যক অতিবিস্তার নেই। লক্ষ্য মানবিক বোধের চরম রূপ আঁকা— গল্পের শেষে সমস্ত মেদের ভার সরিয়ে দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বর্ণনা

এতটুকু বিবৃতিধর্ম পায়নি, সে সুযোগও আসেনি। গল্পের গতিপ্রাণতা (dynamicity) তীব্র একমুখিন। লেখকের ভাষা সাধুরীতির, সংলাপ চলিত ও কথ্য। যাদের মেজবৌ গল্পের শেষ বাক্যে বলে— 'ছোটলোক'— এবং অভিমানে ও সঙ্গত রাগে এবং তাদের সঙ্গে কোনোদিন আর থাকবে না, তাদের নিয়েই যে থাকবে— সেই ভাবের ব্যঞ্জনায় সংলাপ-বাক্যটির বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব বাস্তবিকই মনোরম ও উপভোগ্য। এর মধ্যেও ব্যঞ্জনাগর্ভ সংলাপ negative থেকে affirmation-এ শিল্পের গভীর ব্যঞ্জনা ও বিস্তার পায়।

পাঁচ

'পাশাপাশি' গল্পের এমন নামে মেলে গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের অনুগ ব্যঞ্জনাময়তা। 'পাশাপাশি' এমন নামের সাধারণ অর্থদ্যোতনায় মেলে সহাবস্থানের ঔদার্য। মানুষ পাশাপাশি থাকলেই তো পারস্পরিক হৃদয় স্বভাবের সমারোহ অনুভববেদ্য হয়। এতেই ধরা পড়ে মানবতার সত্য ও স্বভাব-রূপ।

এই পাশাপাশি থেকেছে অমল-কানন-তাদের শিশুপুত্র ও প্রৌঢ়া পিসিমাদের সংসার এবং বিধুভূষণ-মেজবৌ-এর আর এক সংসার। দুটি সংসারই দরিদ্র, অর্থনৈতিক অসাচ্ছল্যে নড়বড়ে— পুরনো জীর্ণ ভাড়াবাড়ির মতো। গল্পের শুরুতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি চিত্র এঁকেছেন যেখানে 'পাশাপাশি' বহু শব্দার্থের এক লেখচিত্র সামনে ভাসে :

> 'মাঝখানে একটি দরজার বেড়া আছে। কিন্তু সে কোন কাজের নয়। তাহাতে আব্রু রক্ষা হয় না। ...... বেড়া দরমার না হইয়া আর কিছু মূল্যবান জিনিস হইলেও লাভ ছিল না। কল পায়খানা এক। সুতরাং সামান্য ভাড়ার ভাড়াটে এই দুই পরিবারের আব্রুর আদর্শকে অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে রফা না করিলে চলে না। অসুবিধা আছে অবশ্য অনেক।'

এমন যে একই বাড়িতে দুই ভাড়াটের চিত্র— তাতে পাশাপাশির বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার বলা হয়েছে। এই সাধারণ অর্থে 'পাশাপাশি' নাম কিছুটা শিল্পের সার্থকতা পায়।

দ্বিতীয়ত, সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে দুই ভাড়াটের মধ্যে মিল-গরমিল-এর কথা বলেছেন লেখক। তাতে যে দিক উঠে আসে তা দুই নিম্নবিত্ত পরিবারের ভিতরে স্বভাবের সংঘর্ষ ও সংকটকে চিত্রময় করে। পাশাপাশি থাকায় সুবিধে ও অসুবিধে নিয়েই এ গল্প। শুধু পাশাপাশি থাকা নয়, তার নীতি ও মানবিকতায় বাঁধার চিত্র প্রকট বলেই গল্পনাম তার দিকেই আঙুল তোলে। নাম স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত, গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি পড়লে বোঝা যায়, পাশাপাশি থেকে যে আত্মীয়তা, মমত্ব, সমধর্মিতা বোঝায়, কাননের মিথ্যা মানসম্ভ্রম বোধ ও মেজবৌ-এর উদার মানবতাবোধ— বিপরীত দুয়ের সংঘর্ষে অর্থের নিষ্ফলত্ব উঠে আসে। গল্পে পাশাপাশি থাকার মধ্যে মহামানবতার জীবনবেদ মানা হয়নি। অথচ পাশাপাশি দিন অতিবাহনের মূলে কাজ করে মুক্তমন ও মুক্তবুদ্ধির নির্দেশ। আলোচ্য গল্পে সেই নির্দেশ

প্রশ্ন তোলে। শেষে তারই আলোর পাশাপাশি জীবনবোধের ঘটে স্বরূপ উদঘাটন। মেজবৌ ধরেছে সেই মহান আলোকবর্তিকা। এই গভীর সুস্থ বিশ্বাসের সামনে 'পাশাপাশি' এমন গল্পনাম সার্থক শিল্প-সমর্থন পায়।

৪.

মোট বারো

এক

প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্প সংকলনের নাম 'মৃত্তিকা'। প্রকাশিত হয় তিরিশের দশকের মাঝামাঝি ১৯৩৫-এ। এই গ্রন্থের সংকলিত সাতটি গল্পের মধ্যে তৃতীয় গল্পের নাম 'মোট বারো'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কুড়ির দশক অতিক্রম করে তিরিশের দশকের প্রথম পাঁচটি বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় 'মোট বারো' গল্পটি। প্রসঙ্গত বলা ভালো, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিজেরই প্রতিটি গল্প লেখার সময়কাল মনে না থাকায় এবং অন্য কোনো গল্পগ্রন্থে রচনাকালের উল্লেখ না থাকায়' অন্য একাধিক গল্পের মতো 'মোট বারো'র বিশেষ রচনাকালকে আনুমানিক তিরিশের দশক ধরেই বিচারে বসতে হয়। তিরিশের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রেণী-চিহ্নিত মধ্যবিত্ত জীবন থেকে — উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত থেকে—সরে এসে সর্বহারাদের কথায় নিবিষ্ট হয়েছেন। কল্লোলে-কালিকলমের কালে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের লেখার ভাবনায় প্রশ্ন রেখেছিলেন যারা উৎপীড়িত, সর্বাবয়বে ভাঙা মানুষ— তাদের নিয়ে গল্প রচনা সম্ভব কিনা! একাধিক কল্লোলীয় লেখক এই জিজ্ঞাসায় আত্মগত থেকে পীড়িত, কান্নাক্রান্ত, দুর্বল, অবহেলিতদের কথা বলতে শুরু করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনার শুরু থেকেই 'শুধু কেরাণী'র প্রসঙ্গ সূত্রে সর্বহারাদের কথায় স্থিত হতে চেয়েছেন।

আলোচ্য 'মোট বারো' সে সবেরই এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প। এই সময়েই তিনি লিখেছেন ভেঙেপড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের 'পাশাপাশি' নামের গল্প। 'মোট বারো'য় তিনি আরও নীচে চলে এসেছেন। তাদের চিত্রে লেখক তিরিশের দশকের সময়কার মানসভঙ্গি, জীবনদৃষ্টি, সহানুভূতি-প্রবণ অনুভবের সমবেদনার অন্তরঙ্গ রূপের সংযোগ ঘটিয়েছেন। কারণ সর্বহারাদের জীবনবিন্যাসে তিনি লক্ষ করেছেন মানুষ ও পশু মিলেমিশে একাত্ম হয়ে এক অদ্ভুত অবহেলার পীড়নের জীবন বিষয় হয়ে ওঠে নির্বিচারে। ' মোট বারো' গল্প তারই উজ্জ্বলতম বাস্তবতার অভিজ্ঞান।

গল্প লেখার পুরনো প্রকরণে 'মোট বারো' গল্পে টানা আখ্যান নেই। নেই ঘটনার উতরোল বা বড় কোনো ঘটনার চমক। আগে ধার্মিক জমিদাররা পুণ্যার্জনের জন্য নদীর ঘাটের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের আশ্রয় নির্মাণ করতেন। তাতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য নির্মিত হত দুটি গৃহ। বহুদিনের পুরনো, জীর্ণ এমন দুটি গৃহে একদিন আরা জেলার ঘমণ্ডী নামে এক সর্বহারা মানুষ আশ্রয় পায়। শোন নদের বন্যায় তার বাবা-মা থেকে আত্মীয়-পরিজন সবই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেখানে অনেক কিছু হারিয়ে, অনেক

বিড়ম্বনায় জীবন কাটিয়ে সে যখন বাঁধানো পুরনো ঘাটে আশ্রয় পায়, তখন তার বয়স তিরিশ। ঘাটের একটি ঘরে থাকত একটি ঘোড়া। ঘোড়াটির প্রথম যৌবনে একবার দুর্দান্ত স্বভাব থেকে তাকে সামলানোর জন্যে আগের সহিসকে বাদ দিয়ে ঘোড়ার মালিক ঘমণ্ডীকেই স্থায়ী সহিস করে রাখে। আগে বেকার ঘমণ্ডীর পথে পথে দিন কাটত চার পয়সার চানা খেয়ে, খইনি মুখে দিয়ে।

এর পর থেকে ঘমণ্ডীর এই ঘাটের ঘরে পনেরো বছর কাটে। এই পনেরো বছরে ঘমণ্ডীর সংসার বেড়েছে। মানুষ ও পশুপাখিদের মিলিত আস্তানায় ঘমণ্ডীর প্রতিদিনের জীবন চলে বৈচিত্র্যে। ঘোড়াকে আদর করে ডাকে বুঢুয়া বলে। ঘোড়া আর ঘমণ্ডী পরস্পরের কথা, ইঙ্গিত বোঝে। পনেরো বছর আগে এক দারুণ শীতের রাতে ঘমণ্ডীর সংসারে আসে—এক বেওয়ারিস 'লেড়ি কুত্তা'র ঘাটের সিঁড়িতে দুটি তুলোর পুঁটলির মতো আকারহীন মাংসের ডেলা প্রসব করে মারা যাবার পর সেই দুটি ডেলার থেকে বড় হওয়া একটি কুকুর। আর একটি ঘমণ্ডীর অনেক আদরযত্নেও শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি। ঘমণ্ডীর সেবায় ঘোড়ার পাশে আশ্রয় নেয় একটি কুকুর। নাম দেয় ঘমণ্ডী দুখিয়া। দুখিয়ার সঙ্গে ঘোড়ার সংঘর্ষ হয়, আবার মিল-মিশ! দুখিয়ার জন্যে রাস্তার কাবুলিওয়ালা, ভল্লুক সমেত এক বাজিকর — এরাও পালিয়ে বাঁচে। এই দুখিয়াও বড় হয়ে জন্ম দেয় আরও বাচ্চার। ঘমণ্ডীর রাস্তার পাশে, গঙ্গার ঘাটের সংসারে রমরমা অবস্থা।

এর মধ্যেই আসে দুলারী তার অনিচ্ছুক ছাগলীটাকে নিয়ে ঘমণ্ডীর সংসারে। ঘমণ্ডীর সঙ্গে দিনের পর দিন গায়ে পড়ে আলাপ করতে করতে দুলারীও ঘমণ্ডীর আর একজন হয়ে ওঠে। কখনো কৌতুক, কখনো রাগ, কখনো বা টাকাপয়সা নিয়ে মতবিরোধের মধ্যে ছাগল-সমেত দুলারী ঘমণ্ডীর কাছে আশ্রয় পায়। উৎসবের শাঁখ, উলুধ্বনির বিনা আয়োজনেই প্রায় এগারো বছর আগে দুলারী স্থায়ী আস্তানা পায় ঘমণ্ডীর কাছে। ইতিমধ্যে ঘমণ্ডীর এক দেশওয়ালী বন্ধু একটা তিতির পাখি তার কাছে বিক্রি করে দিয়ে যাওয়ায় ঘমণ্ডী তাকেও খাঁচা তৈরি করে পুষতে থাকে। কুকুর দুখিয়ার বাচ্চা, দুলারীর ছাগলীর বাচ্চা, পোষা বেড়ালের আদর-খাওয়া, তিতিরের শিস দেওয়া ধ্বনি— এসবে বছরের পর বছর কেটে যায়।

এইভাবে এগারো বছর কেটে বারো বছরে পড়ে ঘমণ্ডী-দুলারীর সংসার। এখন মোট বারো বছর হল সময় পরিধি। গঙ্গার ধারে পথের ওপর এই সংসার-জীবন সর্বহারাদের জীবনধারণের আশ্রয়ভূমি। এখানে 'মানুষ ও পশু জাগে, মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়। সমস্ত দিন রান্নাবাড়া, খাওয়া-দাওয়া আছে, কলতলায় জল নিয়ে ঝগড়া— ঘুটে দেওয়া আছে, সন্ধ্যাবেলার জটলা আছে। মাতোয়ালা গোলদার হরদুঙ্গি আসে তার সারেঙ নিয়ে, খড়ের গোলার রামজীবন আসে ঢোলক নিয়ে। দড়ির খাটিয়া পড়ে রাস্তায়। ঘমণ্ডী, রামজীবন, হরদুঙ্গি বসে। এমনকি বড় বাবুদের দরওয়ান মহাদেও পর্যন্ত মাথায় পাগড়ি বেঁধে এসে মাঝে মাঝে সে খাটিয়ায় বসতে দ্বিধা করে না। দুলারী নিচে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে একটা কুকুরকে পায়ের ওপর শুইয়ে

আঁটুল বাছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো মন্তব্য প্রকাশ করে।' এরই মধ্যে ক্রমশ দুলারীর শরীরে আসে বার্ধক্য— মাথার চুলে পাক ধরে, দেহের মাংস ঢিলে হয়, চোখের কোণ হয় কুঞ্চিত। দুলারী এখন ঘমণ্ডীর কাছে বার বার বলে তার এক ভাজের অসুস্থতার কারণে দেশে যাওয়ার কথা। তীব্র বাধা দেয় ঘমণ্ডী— যার ভাইয়ের কোনো খোঁজ ছিল না, তার ভাজ আসে কোত্থেকে? কথা কাটাকাটি চরমে ওঠে। ঘমণ্ডী দুলারীকে ছাড়তে চায় না। চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে ঘমণ্ডী দুলারীকে চুরির অপবাদ দেয়। দুলারীও নাছোড়। পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্কের মধ্যে দুলারী ঘমণ্ডীকে জানায় সে থানায় নালিশ করবে। ঘমণ্ডী বিদ্রূপ করে— ওখানেই তার ভাজ আছে। দুলারীকে আটকানোর কথাতেই ঘমণ্ডীর সংসারের গল্প শেষ।

'মোট বারো' গল্পের কাঠামোয় ছোট বা বড় ঘটনার ভিড় নেই, কোনো নির্দিষ্ট কাহিনীর স্বাভাবিক বিস্তার আদৌ না থাকায় ঘটনাটি হয়েছে নিশ্চিত পরিত্যক্ত। গল্পের শুরুতে সামান্য বিবরণ দিয়ে লেখক অতীত ভ্রমণে গল্পের নায়ক ঘমণ্ডী ও তার ঘোড়ার সঙ্গে সম্পর্কের এবং নায়কের জীবনধারণ ও যাপনের প্রাথমিক কথা বলে এক বাস্তব পটভূমির চিত্র এঁকেছেন। এই পটভূমি গল্পের মূল্যবান অংশ। গল্পে ঘাটের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য নির্মিত আশ্রয়ে ঘমণ্ডীর মালিকের ঘোড়ার সহিস হয়ে বসবাস, সর্বহারা জীবনের উপযোগী পথেই দিন অতিবাহনের আকর্ষক কথা শুনিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র কিছুটা কাল্পনিক ইতিহাসাশ্রয়িতার প্রমাণ রেখেছেন। এই অংশটুকু গল্পের আখ্যানে কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্বভাব-উপযোগী শক্ত সূত্র, অনেকটা পৌরুষদীপ্ত শরীরের প্রধান মেরুদণ্ডের মতো! লেখক যখন ঘমণ্ডী সম্পর্কে জানান : 'ত্রিশ বছর বয়সে স্থায়ী আশ্রয় সে পেল, পেল ওই ঘোড়াটির আগ্রহে, ওই গঙ্গাযাত্রীদের সাবেক চটিতে,'— তখন মূল আখ্যানের সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্রের যোগ হয় স্বাভাবিক ও নিবিড়।

গল্পের পরবর্তী অংশে লেখক-কৃত কোনো কাহিনীর অবতারণা নেই, আসলে ঘমণ্ডীর সঙ্গে তার পেশা ও পোষ্য হিসেবে যারা জড়িত— সেই ঘোড়া, নেড়ী কুকুর ও তার জন্ম দেওয়া শাবক বংশ-পরম্পরায়, দুলারীর ছাগল ও তার ছানা, তিতির পাখি, বিড়াল এবং মানব চরিত্র হিসেবে দুলারী— এরাই ঘমণ্ডীর সঙ্গে বন্ধনে গল্পের অবয়বকে স্বাভাবিক করেছে। আসলে ঘমণ্ডী গল্পের কাঠামোর কেন্দ্রস্থলে আসীন, তারই সূত্রে, তারই নিজস্ব মর্জিতে ও সমবেত পশু, পাখি ও মানুষের সঙ্গে মানবিক আচার-আচরণে গল্প বা আখ্যান বানানো মনে হয় না, হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এদের মধ্যে গল্পের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য প্রমাণ করার জন্য স্ত্রী হিসেবে দুলারী বিশিষ্ট গৌণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে। গল্পের পরিণতিতে তাই পশুপাখিরা কেউ নেই, আছে ঘমণ্ডী ও দুলারী!

গল্পের ক্লাইম্যাক্স এসেছে ধীরগতিতে— গল্পের শেষদিকে ঘমণ্ডী-দুলারীর মধ্যে অশালীন সংঘর্ষ-সংঘাতের চিত্র ধরে। 'মহামুহূর্ত' আসার আগে এমন একটি বাক্যে আসন্ন চরম মুহূর্ত তৈরির অবস্থার ইঙ্গিত মেলে :

'দুলারী গঙ্গার ঘাটে গেছল, ফিরে এসে ঘমণ্ডীকে দেখে একটু চমকে উঠে

বল্লে— মোট বাঁধতে মেহনত লাগে না— সব খোলা হয়েছে যে?

ঘমণ্ডী চোখ রাঙিয়ে বলে, — খোলা হয়েছে! এসব থালা বাড়ি কার?'

এর পরেই ঘমণ্ডীর দুলারীকে চোর অপবাদ দেওয়ার সোচ্চার ঘোষণা ঘটে। উভয়ের সম্পর্কের যে চরম চিত্র এঁকেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তার মধ্যেই ক্লাইমাক্সের বিস্ময় :

> 'ঘমণ্ডী খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলে কাপড়টায় এক টান দিলে। এবার দুলারী সমস্ত সংযম ত্যাগ করে উচ্চস্বরে রোদনের সঙ্গে ঘমণ্ডীর পিতৃ-মাতৃকুলের উদ্ধার সাধন করে মুক্ত হস্তে ঘমণ্ডীর ওপর কিল চড় ঘুষি আঁচড় কামড় বর্ষণ শুরু করে দিলে। তার পর এগার বছর ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে জড়িত এই দুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্লজ্জ রণতাণ্ডব শুরু হল তার বর্ণনা করা যায় না।'

গল্পের দুই স্বামী-স্ত্রী ঘমণ্ডী ও দুলারী এবং লেখক স্বয়ং উপস্থিত থেকে যে চিত্রের বীভৎসতা অনুভব করিয়েছেন আমাদের, গল্পের মহামুহূর্ত সেখানেই উজ্জ্বল। এই climaxই সর্বশেষ দুটি বাক্যে— যা গল্পের বিষয়, লক্ষ্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে ব্যঞ্জনাময় হয়েছে :

> 'দুলারী উঠে বল্লে, "হাম থানেমে যাওত বানি।" ঘমণ্ডী বিদ্রূপ করে বললে, "যা তু থানে মে। হুঁয়ে তোহার ভোজাইন হও।"'

আসলে দীর্ঘ মোট বারোটি বছরের পূর্ণতায় এক সর্বহারা স্বামী-স্ত্রীর আশ্রয় ভাঙতে চায়নি ঘমণ্ডী— সেই যৌথ সম্পর্কের যে নিবিড় সুখ, পারিবারিক মানব্য-ভাবনা, তারই ব্যঞ্জনা 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'-এর বিস্ময়ে শিল্পের চমৎকৃতি আনে।

দুই

প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের অন্যতম সম্পূর্ণ ও সম্যক দীক্ষিত পুরোধা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় কল্লোলীয়রা লেখনী ধরেছিলেন। তাঁর গল্পে রবীন্দ্রনাথ যাদের নেননি, কল্লোলে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাদের কথা দিয়েই সাহিত্য ভাবনায় গভীর নিবিষ্ট হয়েছেন। একমাত্র প্রতীচ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক ভারতে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে অধঃপতিত প্রাণস্বভাব সমাজকে গ্রাস করে, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই বিষয়নির্ভর গল্পভাবনায় ব্রতী হয়েছেন। অবহেলিত, উৎপীড়িত ব্রাত্যজনকে রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম কল্লোলীয় দ্রোহবুদ্ধিতে গ্রহণ করেছেন। সে সময়ে শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির কথায় অনেক নিচে নেমে আসতে সক্ষম হলেও আবেগ (emotion) আর ভাবপ্রবণতায় (sentimentalism) সর্বহারা-প্রাণস্বভাবের গভীরে যেতে পারেননি, সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে ব্যতিক্রম, 'মোট বারো' তার পক্ষের এক উজ্জ্বল উদ্ধার।

প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী', পরবর্তী 'পুন্নাম' ইত্যাদি গল্প নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষের কথায় শুরু, 'মোট বারো'য় সেই শ্রেণীহীন সমাজকে গভীর সহানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করে কল্লোলের দ্রোহচেতনাকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। যারা রাস্তার পাশে ঘর বাঁধে, সংসার করে, মানুষ হয়েও পশুদের সঙ্গে নিয়ে মানব্যের সংসার সাজায়, এই গল্পকার ঘমণ্ডী,

তার পোষ্য কুকুর, বেড়াল, পাখি, ঘোড়াদের মতো পশুপাখিদের মধ্যে দুলারীর মত রাস্তার বাসিন্দাকেও স্ত্রীর আপনত্বে ধরে রেখে এক অভিনব জীবনের চালক হয়। এদের সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় যে উজ্জ্বল সহানুভূতি ও মমত্ববোধ গল্পকারের মনোভঙ্গিতে কাজ করে, তা বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্র-সময়ের পরিবেশে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন-স্বাদী। 'মোট বারো' তাই বাংলা ছোটগল্পে এক নবসৃষ্ট ব্রাত্যজনের পালা-চিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুদূর রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর সচেতনা এদেশীয় পড়ুয়া বুদ্ধিজীবীদের তটস্থ করে। যেন এক নবজাগরণ গভীর-তলাশ্রয়ী থাকে যুদ্ধোত্তর পোড়-খাওয়া বুদ্ধিজীবী মানুষজনের চিন্তাভাবনায়। 'মোট বারো'র মানুষ-পশুর সহাবস্থানের চিত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র এক সঠিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের চিত্রী।

'মোট বারো' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কেবল ঘমণ্ডীর মতো কোনো সর্বহারা ব্রাত্যজন নয়, সে তার পরিপার্শ্ব ও স্ত্রী দুলারীদের সহযোগে যে নব রসাভাসের মানব্যকে তুলে ধরে পাঠকদের সাধনে— তা-ই সত্য। আক্ষরিক অর্থে ঘমণ্ডী নায়ক হতে পারে, এমনকি কেউ দুলারীকে নায়িকা বা প্রধান গৌণ চরিত্র ভাবতেও পারেন, আসলে গল্পকার গল্পের সদস্যদের সকলকে মিলিয়ে নিবিড়তম নীড়ের স্বভাবে মর্মরূপ উপহার দিয়েছেন, তা-ই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের মূল সন্ধিৎসা।

সদ্য মৃত 'নেড়ি কুত্তা'র জন্ম দেওয়া দুটি বাচ্চার কঠিন শীতের রাতে সস্নেহে শুশ্রূষা করা, তাদের লালন-পালন, তাদের সঙ্গে আত্মীয়ের অধিক আচার-আচরণ, তিতির পাখিদের জন্য খাঁচার ব্যবস্থায় আপন করে তোলা, বেড়াল আর দুলারীর সঙ্গে তার দুগ্ধবতী ছাগল এবং তার বাচ্চাকে নির্দ্বিধায় নিজের আশ্রয়ে স্থান দেওয়া— এইসব চিত্রে ঘমণ্ডী যেন উৎপীড়িত অসহায় মানুষদের হৃদয়-কথার নতুন বিস্তারিত অর্থ-ব্যঞ্জনা দেয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের হৃদয়গত বাস্তবতা, তা গল্পের অবশ্যই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। সর্বশেষ ঘমণ্ডী-দুলারীর সম্পর্ক-নিহিত একদিকে প্রীতি-সখ্যতা ও নির্ভরতা, অন্যদিকে তীব্র সংঘর্ষ-সংঘাত গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে শিল্পের মায়া ও বাস্তব রসাস্বাদী ব্যঞ্জনার আবরণ টানে। প্রচলিত, দৈনন্দিন জীবনপথ থেকে বর্জিত, পরিত্যক্ত, পীড়িত, অনিশ্চিত জীবনধারণের, সর্বহারা মানুষজনের এবং মূক পশুদের মিলমিশের ভাঙা সংসার কল্লোলপন্থী লেখকের জীবনদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই 'মোট বারো' গল্পের মধ্যে থেকে উঠে আসে সময় ও সমাজের ভিন্নতর ভাষ্য, লেখকের ভিন্ন attitude-এর বিবেক।

তিন

'মোট বারো' গল্পে পোষ্য পশুপাখিদের ভিড়ে প্রধান দুই মানুষ চরিত্র হল ঘমণ্ডী ও তার স্ত্রী দুলারী। কিন্তু চরিত্রগুলি কোনো কাহিনী বা আখ্যানের সূত্রে আসেনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনোই চরিত্র ধরে কাহিনী বয়নের, ঘটনা সাজানোর কথাকার নন, বরং একটি বিশেষ মনোভঙ্গি ধরে— যা তাঁর জীবনভাবনা বা লক্ষ্য ধরেও অন্য মাত্রা পায়— সেদিকেই লক্ষ্য রেখে চরিত্রদের সাজান। ফলে চরিত্ররাই প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্বে প্রত্যক্ষে, কখনো বা পরোক্ষে

এক প্লটের উপযোগী আখ্যানের স্বভাব সামনে আনে। 'মোট বারো' গল্পে বিশেষভাবে পশুপাখিরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বভাবে লেখকের কলমে দেখা দিলেও তারা এক একটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে— মনুষ্যেতর প্রাণীদের সারল্য সেখানে কৌতুকরসের সূক্ষ্ম-স্রোত আনে। পোষ্য ঘোড়ার সঙ্গে বাস করতে করতে— পেশায় ও ব্যক্তিগত পোষ্য বৈশিষ্ট্যে ঘমণ্ডীর আপন হয়ে যায়। ঘমণ্ডীর দেওয়া নাম বুঢ়ুয়া। যেমন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের ষাঁড় মহেশ নাম নিয়ে গফুর-আমিনার নিত্যসঙ্গীর স্বভাব পায় তেমনি। ঘোড়ার সঙ্গে পনেরো বছর টানা কাটাবার পর ঘমণ্ডী ও বুঢ়ুয়ার সম্পর্কও এই রকম :

> ......'ঘোড়াটি সামনের বাঁ পা তুলে আঁচড়াবার ভঙ্গি করে। ঘমণ্ডী বলে, "এ বুঢ়ুয়া! তোহার ভুখ লাগল হো। বুঢ়ুয়া কান দুটি নেড়ে গলাটি বাড়িয়ে দেয়। পরস্পরের নাড়ীনক্ষত্র জানে।" এভাবে ঘোড়া ও মানুষ একত্র হল।'

এইভাবেই ক্রমশ পোষ্য কুকুর-বাচ্চাও ঘোড়ার সঙ্গে অবোধ সংঘাতে গিয়ে শেষে সহাবস্থানে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট করে :

> 'কুকুর-বাচ্চা একটু মাত্রাতিরিক্তভাবে অগ্রসর হয়ে সেদিন ঘোড়ার ডান পায়ের ওপর আবার দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করে বসল। ঘমণ্ডী .... আকাশফাটা আর্তনাদে চমকে উঠে ছুটে গিয়ে দেখে বীর কুকুর শাবক চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে এবং ঘোড়াটি বিস্মিত হয়ে ঘাড় নামিয়ে ওই ক্ষুদ্র বেয়াদপটির সর্বাঙ্গ শুঁকে দেখছে। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ কুকুর বাচ্চার ভয়ার্ত চিৎকার থামল না! এবং কয়েকদিন সে দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াল না। একদিন দেখা গেল সে নির্ভয়ে ঘোড়ার পায়ের ফাঁকে খেলে বেড়াচ্ছে।'

বড় হয়ে দুখিয়া নামের কুকুরটি ভল্লুক সমেত বাজিকরকে বাকি সহযোগীর সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আসে। এমনকি ঘমণ্ডীর আস্তানার ইঁদুরদেরও দুখিয়া রেহাই দেয় না। এইভাবে ক্রমশ দুলারীর আনা ছাগল, খাঁচার তিতির, ছাগলের পরবর্তী বংশধর, দুলারীর কোলঘেঁষা বেড়াল— সকলেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৌতুকরস সিক্ত কলমে ঘমণ্ডীর দিক থেকে সহাবস্থানের মানবিক মূল্যে পশুপাখি সকলেই 'চরিত্র'-ই হয়েছে গল্পের শিল্পমানে। ঘমণ্ডীর এইরকমই এক অভিনব সংসার।

এমন যে সংসার সেখানে একমাত্র মানুষ-ব্যক্তিত্ব হল ঘমণ্ডী ও তার স্ত্রী দুলারী। এদের দুজনকে ঘিরে ভিড় করে একান্তই গৌণ স্বভাবে প্রতিবেশী মানুষসঙ্গীর দল— মাতোয়ালা গোলদার হরদুঙ্গি, খড়ের গোলার রামজীবন ঢোলকবাদক, বড়বাবুদেব দারোয়ান মহাদেও। এদের মধ্যে দুলারীকে নিয়ে চলে নানা ধরনের ঠাট্টা-মশকরা। আসলে এই পরিবেশেই ঘমণ্ডী ও দুলারী 'মোট বারো' গল্পের সদস্যদের পরিবারে প্রধান বিষয়টি স্পষ্ট করে।

ঘমণ্ডী সর্বার্থ অর্থেই সর্বহারা। একটানা পনেরো বছর ধরে এক অভাবী জমিদার প্রপৌত্রের অধিকারে থাকা তাদেরই গঙ্গাতীরবর্তী ঘাটে নির্মিত একটা জীর্ণ ঘরের বাসিন্দা ঘোড়ার সেবক, রক্ষক ও চালক। আরা জেলার শোন নদের বন্যায় সব হারিয়ে এখানে

এসে আশ্রয় নেয়। রাস্তার ধারে গঙ্গাতীরবর্তী ঘরে ঘমণ্ডী পথেরই পশুদের নিয়ে সংসার বসায়। এমন সংসার গুছিয়ে তোলার পর, আজ থেকে বছর এগোরো আগে দুলারী নিজে যেচে ঘমণ্ডীর সংসারে আসে তার দুধ বিক্রির ছাগলকে নিয়ে। এরপর দুজনের সম্পর্কের ব্যঞ্জনা কৌতুকরসে এমন: 'অনিচ্ছুক ছাগলীটার গলার রসি ধরে টানতে টানতে দুলারী একদিন ঘমণ্ডীর আস্তানায় এসে উঠল। সে এগারো বছর আগেকার কথা। শাঁখ বাজল না, উলুধ্বনি হল না,— কোনও উৎসবের আয়োজন দেখা গেল না। ঘরে একটু স্থানাভাব হয় বটে, কিন্তু সে এমন কিছু নয়।...... বছর যায়।' ....'দুলারী সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে অতি কষ্টে পাশ ফিরে শুয়ে দিন কাটায়।........ মানুষ ও পশু জাগে। মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়। সমস্ত দিন রান্নাবাড়া খাওয়াদাওয়া আছে, কলতলায় জল নিয়ে ঝগড়া আছে—'।

এই সহাবস্থানে এগারোটা বছর চলে গিয়ে বারোয় পড়ে। ঘমণ্ডী ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, দুলারীর ছাগদুগ্ধের ব্যবসায় লাভ-লোকসান নিয়ে তবে সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম দুলারীর ওর কাছে আসার সময় 'ঘমণ্ডী নীরবে তামাক খেতে খেতে ডিবিয়ার আলোয় দুলারীর অত্যধিক পুষ্ট হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত আঁকা উল্কিগুলো কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে।' এইভাবে ওর ঘরে দুলারীর ঘটে বোধন ও অনুপ্রবেশ। কিন্তু গল্পের দ্বিতীয়ভাগে বারো বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের শুরুতে প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘমণ্ডী ও দুলারীর মধ্যে তীব্রতম সংঘর্ষ চিত্রে গল্পের উপসংহার টেনেছেন যা চরিত্রদুটিরও এক স্থায়ী পরিণাম নির্দেশক হয়ে ওঠে।

দুলারী একজন পুরুষের ওপর নির্ভরতার জন্যই ঘমণ্ডীর কাছে নিজে থেকেই আসে। ঘমণ্ডীর কাছে থাকতে থাকতেই :— 'দিন যায়। এগার বছর কেটেছে। দুলারীর মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে, মাংস আরো ঢিলে হয়েছে। চোখের কোল আরো কুচকেছে। এই সম্পর্কের বারো বছরে পা রাখার সময়েই দুলারী তার দেশওয়ালী ভাজের অসুস্থতার অজুহাতে ঘমণ্ডীর কাছ থেকে দেশে চলে যেতে চায়। ঘমণ্ডীর এবার নিজের বয়সের হিসেব, স্ত্রীর ওপর বেশি বয়সের নির্ভরতার হিসেবই বড় কথা। দুলারীকে চুরির অভিযোগে আটকে রাখে। দুলারীর ওপর ঘমণ্ডীর এগারো পার হয়ে বারো বছরেই নীরব-প্রতিষ্ঠিত অধিকার-চেতনা তীব্র হয়ে ওঠে। চুরির অপবাদ দিয়ে সে স্ত্রীকে ধরে রাখতে চায়। দুলারীকে দেওয়া চোরের অপবাদের মধ্যে দুলারীর অসহায়তার দিক যেমন চরিত্রদ্যোতক হয়, তেমনি ঘমণ্ডীর প্রায় হিংস্র আচরণও পথের ধারে বাস করা সর্বহারা শ্রেণীর জীবন্ত ছবি চড়া রঙে জ্বলজ্বল করে ওঠে :

> 'ঘমণ্ডী খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে কাপড়টায় এক টান দিলে। এবার দুলারী সমস্ত সংযম ত্যাগ করে উচ্চস্বরে রোদনের সঙ্গে ঘমণ্ডীর পিতৃ-মাতৃকুলের উদ্ধার সাধন করে মুক্ত হস্তে ঘমণ্ডীর ওপর কিল চড় ঘুঁষি আঁচড় কামড় বর্ষণ শুরু করে দিলে। তারপর এগার বছর ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে জড়িত এই দুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্লজ্জ রণতাণ্ডব শুরু হল তার বর্ণনা করা যায় না।'

নষ্ট দাম্পত্যের উপযোগী এমন চিত্র পাঠকদের যতটা ভাঙা মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যায়, তেমনি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের থেকে সরিয়ে এনে একেবারে ভিন্ন এবং বাংলা সাহিত্যে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। 'মোট বারো' গল্পের পশুপাখিদের ভিড়ে মানুষজনের যে সহাবস্থান ও বিপরীতে সংঘর্ষ-সংকট— তা যতই তথাকথিত শিক্ষিতদের থেকে দূরবর্তী হোক না কেন, 'মোট বারো' গল্পের স্বাদে অনাস্বাদিত এক স্বাদ বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের রোমাঞ্চ আনে। সে রোমাঞ্চ শিল্পরসে জারিত বিস্ময়েরই উপচার। ঘমণ্ডী ও দুলারী সেই বিস্ময়েরই টানা বারোটি বছরের জীবনধারণ ও যাপনের আলম্বন স্বভাব।

চার

'মোট বারো' গল্পটিকে সম্ভবত একধরনের সমাজ-সমস্যামূলক গল্পের শ্রেণীভুক্ত করলে গল্পটির সমস্যা ও প্রকাশরীতির বিচার সুষম হয়। এখানে যে সমাজের কথা বলা হয়েছে, তা মধ্যবিত্ত তো নয়ই, নিম্নবিত্ত ছাড়িয়ে তার বেদনার জগৎকে অতিক্রম করে আরো নিচের অর্থাৎ সর্বহারাদের পীড়িত অসহায় ব্রাত্য জীবনের প্রতিবিম্বন সচিত্র হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই এই দেয়ালে পিঠ ঠেকে থাকা ব্রাত্য জীবনের স্বভাবে কোনো প্রতিবাদ নেই, আছে জীবন ধারণ ও যাপনের পীড়িত রূপ। প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধিক গল্পে ভাঙা মানুষদের— যেমন বস্তিবাসীর, বেশ্যাশ্রেণীর, চৌর্যবৃত্তিকারীদের কথা লিখেছেন। 'মোট বারো' গল্পের লোকজন, জন্তুরা একই সমাজের সহানুভূতিব লক্ষ্য। তাই এরা প্রতিবাদী না হলেও সামগ্রিক চিত্রস্বভাবে বিশেষ শ্রেণীর পরোক্ষ পরিচয়কে প্রত্যক্ষ করায়। সমস্যা এখানে মানুষ ও জন্তুদের সামগ্রিক সহাবস্থানে এক অভিনব জীবনসমস্যারই মৌল স্বভাবের চিত্রপট সামনে আনে।

গল্পের প্রকাশরীতিতে 'চরমক্ষণ' এসেছে বিশেষ দুই চরিত্র ঘমণ্ডী ও দুলারীর স্বভাবের বৈপরীত্যে ও টানাপোড়েনে। এ বিষয়ে আগে আলোচনা করেছি। এই 'ক্ষণ'টি ঘটনা বা ভাবের পরিবাহী হয়নি, হয়েছে চরিত্রদ্যোতক। মুহূর্তের তীব্রতায় আছে দুই চরিত্রের জীবনের এক বিশেষ বোঝাপড়ার শিল্পকৌশল। 'মোট বারো' গল্প একক জীবনের গল্প নয়, সমবেত পশু ও মানুষের জীবনস্বভাব আঁকার মূলে স্থিত টানা এক উপাখ্যান। মূলে ঘমণ্ডীর তৎপরতা শিল্পসম্মত, কিন্তু গল্পকার সর্বহারাদের জীবনচিত্রে কিছু আখ্যায়িকা, কিছুটা বা একাধিক প্রাণস্বভাবের কলরোল কৌতুকরসের আস্বাদে স্বাদ্য করেছেন। গল্পের বর্ণনায় গল্পকার স্বয়ং বুঝিবা চলিষ্ণু জীবনস্বভাবের প্রবাহ ধরে ধূয়ার মত মাঝে মাঝেই 'বছর যায়' এমন ঘোষণা শুনিয়েছেন। নিজেই পাঠকদের সামনে ঘমণ্ডীর গড়ে তোলা জীবন ও পরিবার পটভূমিতে দুখিয়ার বাচ্চাদের বড় হওয়া ও নিজেদের মতো বসবাসের জায়গা করে নেওয়ার কথা বলেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট ছোট সংঘাতের কথা বলা শেষ করে পাঠকদের জানান—'বছর যায়' এমন দু'টি শব্দ। দুলারীর জীবনধারাকে মানিয়ে নিয়েই গল্পকার উল্লেখ করেন— 'বছর যায়'। এইভাবে

দুলারীর প্রৌঢ়ত্বের কথার মধ্যেও লেখক উদাস ধূয়ার মতো উল্লেখ করেন 'দিন যায়'। এইভাবে মাঝে মাঝে উপাখ্যানের স্বভাবের মধ্যে সময়ের নদীস্রোত বুঝিয়ে স্বভাবী পাঠকদের কাছে আখ্যানের গল্পস্বভাবে নতুনত্ব আনেন। এই রীতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে নতুন এবং নতুন রীতির উদ্বোধকও বটে। ফলে ছোটগল্পের প্রচলিত ধারা ধরে না এগিয়ে গল্পে এসেছে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের আখ্যানের ধীর স্রোত।

'মোট বারো' গল্পের শরীরে আদ্যন্ত আছে কৌতুকের পরিবেশ এবং তা নির্মল, কাউকে আঘাত করার জন্য সন্নিবেশিত হয়নি। এমনকি ঘমণ্ডী ও দুলারীর শেষ সংঘর্ষ চিত্রের অভ্যন্তরেও মেলে কৌতুকের বাতাবরণ। তা উদ্দেশ্যহীন এবং গল্পকারের নিপুণ রসসৃষ্টি-ক্ষমতার উদাহরণ। চলতি ও কথ্য গদ্যে লেখা গল্পটির ভাষায় মেলে বাংলা কথ্য ও দেহাতী হিন্দি আঞ্চলিকতার মিশ্রণ। ঘমণ্ডী, দুলারীর সংলাপে বাংলা-হিন্দির চলিত মিশ্রণ পথের ধারে বাস করা নিচু শ্রেণীর কথ্য ককনির সহজতার, সারল্যের স্বাদ দেয়।

১. 'দুখিয়াকে তো দুরোজ ন দেখলু হম ; কাঁহা গইন বা?'
(ঘমণ্ডীকে দুলারীর জিজ্ঞাসা)

২. 'রূপয়াঠো মিলি কি ন?' (ঘমণ্ডীর দুলারীকে জিজ্ঞাসা)

৩. হম থানে মে যাওত বানি' (দুলারীর কথা)

আবার শুদ্ধ কথ্য বাংলায় কথা বলে ঘমণ্ডী: 'আমি ত বুড়োই হয়েছি তুইও তো তাহলে বুড়ি।'

কিছু দেহাতি শব্দ মিলিয়ে বা একেবারে বাদ দিয়েই সাদা বাংলায় ঘমণ্ডী ও দুলারী কথা বলতে পারে, কারণ শহরে ঘমণ্ডীর যেমন অল্প বয়স থেকে বসবাস, তেমনি দুলারীও তাতে অভ্যস্ত: 'গলির ভেতর ডাগদর বাবুর বুড়ো কোচোয়ান নাকি ত্রিশ টাকা মাইনে পায়।' এইভাবে সর্বহারাদের জীবনধারণের স্বভাব মতো ভাষা প্রয়োগ করে গল্পের চরিত্রনির্ভর ও মূল বিষয়গত বাস্তবতার শিল্প সার্থকতা বজায় রেখেছেন গল্পকার।

পাঁচ

গল্পটির নাম 'মোট বারো'। এমন নামে কোনো গভীর তাৎপর্যগত অসীম ব্যঞ্জনা নেই। গল্পকার নাম রেখেছেন ঘমণ্ডীর জীবনধারণ ও দুলারীর সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে বসবাসের সময়গত অঙ্ক মিলিয়ে। গল্পের মধ্যে ঘমণ্ডীর কাছে দুলারীর আগমনের হিসেব জানায় এইভাবে : 'অনিচ্ছুক ছাগলীটার গলার রসি ধরে টানতে টানতে দুলারী একদিন ঘমণ্ডীর আস্তানায় এসে উঠল। সে এগারো বছর আগেকার কথা।' এই অঙ্কের মাপে ঘমণ্ডী-দুলারীর দাম্পত্যজীবনের সময় মাপের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয় প্রচ্ছন্ন অর্থে।

আবার 'বছর যায়', 'দিন যায়', এমনভাবে— পথের পাশে অঙ্ক দেওয়া মাইলস্টোনের মতো— লেখক মাঝে মাঝে দুলারীর সঙ্গে ঘমণ্ডীর সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝান: 'এগারো বছর কেটেছে। দুলারীর মাথায় চুলে বেশ পাক ধরেছে, মাংস আরো ঢিলে হয়েছে। চোখের কোণ আরো কুঁচকেছে।' এই 'এগারো' বছর পূর্ণ হয়ে বারো বছরে

সম্পর্কের হিসেবে 'বারো' অঙ্কটি চলে নামে আসে।

বাঙালী লোককথায় মেলে বারো বছর এমন একটা সময় যাকে বলা যায় একটি 'যুগ'। অর্থাৎ ঘমণ্ডী ও দুলারীর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মোট বারো বছর। সুতরাং তাদের বিচ্ছেদ যে কাম্য নয়, গল্পকার এক চলতি নীতি ধরে পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। গল্পের শেষে ঘমণ্ডী ও দুলারীর তীব্র সংঘর্ষের চিত্রে যখন ওদের সম্পর্কে ভাঙন আসন্ন, তখন গল্পকারের বর্ণনায়, দুলারীর একটি উক্তি : 'তার হকের টাকা কেন ও ডাকু কেড়ে নেবে। এগারো বছর ধরে সে কি মাগনা দুধ ঘুঁটে বেচেছে!' আবার রাস্তার ওপর কুৎসিত চিৎকার ও গালাগালির মধ্যে প্রতিবেশী হরদুঙ্গি বলে ঘমণ্ডীকে : 'হাঁ ভাই মিটমাট করলে। এগার বরিষ দুনো এক সাথ রহলি।' এর উত্তরে দুলারীকে চুরির অপবাদ দিয়ে উত্তেজিত ঘমণ্ডীর যুক্তি—'এগারো বছর তো কি হয়েছে। ও চোর আর এ চৌকাট মাড়াতে আসুক দেখি। বেইমান।'

বারো বছর একটানা দাম্পত্যজীবন কাটায় দুলারী ঘমণ্ডীর সঙ্গে। ঘমণ্ডী সেই এক যুগ অর্থাৎ মোট বারো বছরের সম্পর্কের জোরে দুলারীকে ছাড়তে নারাজ। এই তাৎপর্যেই ঝগড়া, অভিযোগ— পাল্টা অভিযোগ। গল্পের শেষে এই চিত্রের ব্যঞ্জনায় গল্পের নাম 'মোট বারো'। গল্পটির বিষয়ে আছে ঘমণ্ডীর জীবনধারণ ও যাপনের উপাখ্যান। ঘমণ্ডীকে ধবে গল্পের নামে 'ঘমণ্ডীর উপাখ্যান' এমন নাম হতে পারত, কিন্তু মানুষ ও পশুদের সমবেত পরিবেশে লেখক মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাই 'মোট বারো' এমন দাম্পত্য সময়ের অঙ্ক মিলিয়ে আসন্ন নষ্ট-দাম্পত্যের বিপন্নতায় সমবেদনায় তাৎপর্য যোগ করতে চেয়েছেন। পথের পাশে বা নদীর ধারে পরিত্যক্ত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ যে নিজেদের মনোমত সুখে-শান্তিতে সংসার করতে সক্ষম— গল্পকার তার চিত্র নিপুণ প্রতীকী ভাষায় দেখিয়েছেন। ঘমণ্ডীর যে জীবন প্রয়াস, যে প্রৌঢ়ত্বে এসে দুলারীর সঙ্গে জীবন কাটানোর বাসনার গোপন লালন, তার স্থায়িত্ব এক যুগ সময়ে যথেষ্ট! গল্পের সর্বশেষ 'confrontation' , তা মোট বারো বছরেই মৃত্তিকা প্রোথিত শিকড়ের মতো। ঘমণ্ডী-দুলারী সম্পর্কের শেষে দাম্পত্য ভিন্নমাত্রায় সূক্ষ্ম শেষ মান্য। গল্পের নাম তাই শিল্পমানে সার্থক।

৫.

পুন্নাম

এক

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আগামীকাল' নামের উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৩০-এ, ওই বছরেই বেরোয় 'বেনামী বন্দর' নামের গল্পগ্রন্থও। এই গল্পগ্রন্থে ছিল মোট পাঁচটি গল্প : 'শুধু কেরাণী', 'পুন্নাম', 'ভবিষ্যতের ভার', 'জীবন-যৌবন' ও 'এই দ্বন্দ্ব'। লক্ষণীয়, 'পুন্নাম' গল্পটি আছে সংকলনের দ্বিতীয় ক্রমে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ রচনার, বিশেষ করে ছোটগল্পের রচনাকাল বা প্রকাশকাল পাই না যেভাবে হোক, যে কোনো

কারণেও— লেখকের ঔদাসীন্য ও অনীহা, অগোছালো স্বভাববৈশিষ্ট্যে। তবে 'বেনামী বন্দরে'র গল্প পাঁচটি, আমরা গ্রন্থের প্রকাশকাল ধরে নির্দিষ্ট করতে পারি—কুড়ি দশকের শেষার্ধে রচিত।

একই সময়ে লেখা 'আগামীকাল' উপন্যাস এবং কিছু গল্পভাবনা ধরলে গল্পকার মূলত মনোভঙ্গিতে নাগরিক। 'আগামীকাল' উপন্যাসের বিষয়ে আছে আধুনিক নগর পরিবেশ। এই পরিবেশ তখন ছিল গঠমান এবং তার মানুষজন হল নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই লক্ষ্যবস্তু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ শতকের কুড়ির দশক জুড়েছিল যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়, দারিদ্র্য, অসহায়তা, যুদ্ধোত্তর বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বণ্টনবৈষম্য জাতীয় দুর্নীতির চরম রূপ। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে অসহনীয় দারিদ্র্যের ছোবল ছিল মারাত্মক। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী' এবং পরবর্তী 'পুন্নাম' গল্পে সেই বীভৎস দারিদ্র্যের অসহায়তাকে ও তার কারণে সচেতন নিম্নবিত্ত মানুষের তীব্র মানস-প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতাকে নিপুণ সচিত্র করেছেন। 'শুধু কেরাণী'র নগণ্য এক নায়ক কেরাণী এবং তার অসুস্থ কিশোরী বধূর অর্থনৈতিক দুরবস্থায় যে বিক্ষত জীবনচিত্র মেলে, 'পুন্নাম'-এর মধ্যেও নায়ক ললিত, নায়িকা স্ত্রী ডলি ও তাদের একমাত্র রিকেট রোগগ্রস্ত সন্তান খোকার দুঃসহ দারিদ্র্যের জেরে সম্পর্কের টানাপোড়েনে এবং নায়কের বীভৎস পরিণতি ভাবনার আত্মস্থতায় সেই ছবি আরও বড় করুণতম অভিজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয় পাঠকদের। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পেব বিষয়ের দিক থেকে মঞ্চ বদলে নতুন আলোর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

'পুন্নাম' গল্পে গল্পকারের সেই শিল্পভাবনা স্পষ্ট— যার মধ্যে ঘটনা-নির্ভর আখ্যান নেই, গল্পের প্লটের জটিলতা চরিত্রই রচনা করে, আর গল্পপাঠের অভিজ্ঞতা চরিত্রের জটিলতা ছাড়িয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বৃহৎ বোধ ও উপলব্ধির বলয়ে স্থিত করে। যেটুকু গল্পের উপযোগী আখ্যান মেলে তার অবয়ব সামান্যই। শহরের বুকে 'টিনের চালের একটি বড় ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটা নিচু রান্নাঘর আর একফালি সরু উঠান— এই নিয়ে সংসারে' এক দম্পতি ছবি ও ললিতদের বসবাস। তাদেরই একটি সন্তান 'খোকা', নানান রোগে বিপর্যস্ত, বিছানায় শয্যাশায়ী। ললিত হল 'ডকের মাল তোলা ও নাবানোর সামান্য সরকার। জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দু'পয়সা আসে। নইলে নিছক বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মাসে যা আয় হয় তাতে মুদির ঋণশোধই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তবু সে কোনো ত্রুটি রাখেনি। খোকা প্রায় বিরতিহীন কান্নায় মা-বাবাকে অসহায় করে তোলে। মায়ের কাছে তার একই আবদার অন্যায় জিদ হয়ে যায়। ললিতকে রাতে এত পরিশ্রমের পর যাতে ঘুম নষ্ট না হয়, ছবি ছেলেকে সামলে বিছানায় ললিতকে স্বস্তি দিতে আপ্রাণ তটস্থ। কিন্তু পারে না। সামলাতে না পেরে খোকাকে মাবে মা, পরমুহূর্তে নিজেই কাঁদে ওই রুগ্‌ণ ছেলেকে প্রহারের জন্য। ছেলেকে ভোলাতে চেষ্টা করে, এর মধ্যে স্বামীকে ঘুমের সময় করে দিতে যেমন ব্যর্থ হয় ছবি, তেমনি তার নিজেরও দিনের পর দিন ঘুম ছুটে যায়। ললিত নিজে ঘুম ভেঙে ছেলে সামলাবার প্রস্তাব

দেয়, ছবিকে ঘুমোতে বলে, ছবি রাজি হয় না স্বামীকে সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাতের ক্লান্তির মধ্যে কষ্ট দিতে। এ নিয়ে দুজনের ঝগড়াও হয়।

খোকার রোগ যেন দুরারোগ্য। সর্দি-কাশি, খোশ-প্যাঁচড়া, ন্যাবা— কী না নেই খোকার। একটা সারে তো আর একটা শরীর ঢেকে মাথাচাড়া দেয়। 'প্যাকাটির মত সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে— সে চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো। শিশুর চোখ যেন নয়— জীবনের সমস্ত বিরস বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্ত মুখে কোনো বৃদ্ধ সে চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু ওই অসহায় কাতরতাটুকু শিশুর।' এ হেন শিশুকে যদিও বা ডাক্তার দেখে, কিন্তু অসুখ সারে না। ডাক্তার শেষ পর্যন্ত যেভাবে হোক চেঞ্জে নিয়ে যাবার কথা বলে। কিন্তু অর্থ কোথায়? অবশেষে অনেক হিসেব-নিকেশ করার পর ললিতের মতো নগণ্য এক নিম্নবিত্ত চাকুরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এক রাঙামাটির দেশে চেঞ্জে আসে।

আর চেঞ্জে আসার পর বছর পাঁচ বয়সের রুগ্‌ণ শিশু ক্রমশ সুস্থ হতে থাকে। কিন্তু খোকার মধ্যে এক অদ্ভুত বদল চোখে পড়ে ললিতের। মায়েরও। সুস্থ খোকার সঙ্গী জোটে নতুন। নাম টুনু। তার সঙ্গেই খেলায় মত্ত খোকা। প্রতিবেশীর ছেলেটি সুশ্রী সুন্দর মধুর কণ্ঠ। ছোট্ট মুখে ম্লান হাসি সব সময়েই লেগে থাকে। কিন্তু ওর সঙ্গে খেলার নামে খোকার দুরন্তপনা, হিংসুটে, স্বার্থপর স্বভাব ক্রমশ ললিতের খারাপ লাগে। পড়াতে বসলে ললিত খোকাকে দেখে হতাশ হয় নির্বোধ অসহায়তায়, টুনু কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো, উৎসাহী, একেবারে সহজ সরল। টুনুর সঙ্গে খেলার মধ্যে ছোটখাটো নানা বিষয়ে, টুনুকে সন্দেশ দেওয়া নিয়ে, কেমন সব হীন স্বার্থপরতা দেখায়, তা শিশুসুলভ কিন্তু ভয়ংকর আচরণ! ললিত লক্ষ করে, ছবি সামলাতে যায়, পারে না। খোকা একেবারে অন্যরকম। ললিতের মনের গভীরে কষ্ট বেদনা জমে ছেলের জন্য। টুনু অসুস্থ হয়ে মারা যায় এক রাতে। এই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া স্ত্রীর সামনেই ললিতের বিকৃত-স্বর উক্তিতে : 'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে রইল, আশ্চর্য নয় ছবি!' এরই প্রতিক্রিয়ায় ললিত প্রথম জানায়, ওদের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে কিভাবে ডকের কাজে চুরি করে, পাপ করে টাকা এনে চেঞ্জে এসেছে। ললিতের চিন্তায়, কথায়, স্বীকৃতিতে, আত্মধিক্কারের বেদনায় শ্লেষ— টুনুর মতো ছেলেরাই মারা যায়, আর খোকার মতো স্বার্থপর, অমানবিক, হিংসুটে, হীন মনের ছেলেরাই পৃথিবী ভরিয়ে বেঁচে থাকবে। ললিতের মতো পিতারা অন্যায়ভাবে অর্থসংগ্রহ করে খোকাদের বাঁচিয়ে রাখবে। এটাই বিশাল বসুন্ধরার চিরন্তন নিয়তি।

'পুন্নাম' গল্পের প্লট-নির্ভর শিল্প কাঠামো কাহিনী ও ঘটনার জাঁকজমকে নয়, চরিত্রের বিকাশে ও দ্যোতনায়। গল্পে বড় ঘটনা বলতে কিছুই নেই। পরোক্ষে আছে শেষ দিকে ললিতের পক্ষ থেকে বড় গোপন ক্রিয়াকর্মের স্বীকৃতি!

'চুরি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাটরি বিক্রী করেছি।'

এর ওপরেই গল্পের মধ্যবর্তী অংশ থেকে শেষপর্যন্ত একমাত্র পরিণাম নির্ভর করছে।

তা-ও গল্পকার প্রত্যক্ষ ছবি রচনা করে দেখাননি, ললিতের সুস্থ বোধের জগতে ট্র্যাজেডির রক্তক্ষরণে ব্যঞ্জনাগর্ভ করেছেন গল্পকার। প্রসঙ্গত গলস্‌ওয়ার্দি'র একটি নাটক 'জাস্টিস'-এর কথা মনে পড়ে। সেখানে প্রেমিকা নায়িকা রুথ হানিউইলকে বিবাহ করতে গিয়ে সামান্য এক ব্যাঙ্কের কেরানি-নায়ক ফল্ডার নিম্নবিত্তের চরম অসহায়তার কারণে ব্যাঙ্কের চেকের সূত্রে এদিক-ওদিক করে টাকা জোগাড় করে। আর এই ব্যাঙ্কের হিসেবে গোলমালের ঘটনাটুকুই ফল্ডার-এর জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। গোটা নাটকের পরিণাম এর ওপরেই নিয়ন্ত্রিত রূপ। 'পুন্নাম' গল্পের প্লটে ফল্ডারের মতোই দারিদ্র্যের কারণে ললিত ডকের জাহাজের কর্মক্ষেত্র থেকে পাপের টাকা জোগাড় করে, আর তার প্রতিক্রিয়ায় নিজে সুস্থ হলেও অসুস্থ মনের ছেলের প্রতি পুত্রস্নেহের ও সুস্থ পুত্রের আশায় যা করে, তাতে মনোলোকেই আসে প্রবলতম আঘাত।

তাই 'পুন্নাম' গল্পের প্লটে কোনো প্রত্যক্ষ বড় ঘটনা বা কাহিনী দরকার পড়েনি! প্লটের কেন্দ্রে আছে নায়ক ললিতেরই আত্ম-অন্বেষণ, আত্মদর্শন যা সমগ্র পৃথিবীর স্বার্থান্ধ সংকীর্ণ চিত্ত, হীন, পাপী প্রজন্মের ধারাবাহিকতাকে বিষাদে বিষণ্ণতায় নিয়তির লিখন রূপে মেনে নিতে হয়। 'পুন্নাম' গল্পে কাহিনী, ঘটনার উতরোল নেই ঠিক, কিন্তু 'চরমক্ষণ' (climax) তৈরি হয় অসামান্য শিল্পকৃতিতে। চেঞ্জে আসার মতো গল্পের শেষার্ধে 'মহামুহূর্ত' একেবারে স্বাভাবিকতায় চিত্রল :

> 'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল, আশ্চর্য নয় ছবি?'

ললিতের ছবিকে বলা এই কথাটিতেই আছে মানসিক ও মানবিক চরম সংকটের শিহরন। একজন স্নেহান্ধ পিতা হয়ে— যে টাকা তছরূপ করে অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করার জন্য চেঞ্জে এনেছে এবং সে সুস্থও হয়েছে, তার সম্বন্ধে সেই পিতার এমন নির্দয়-নিয়তির মতো উক্তি গল্পের সবচেয়ে বড় এক 'turning point !' climax-এর যে অভিঘাত, শঙ্কা— তা ধরা পড়েছে স্ত্রীকে বলা ললিতের কথায় :

> 'কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা। এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না! চিরকাল ধরে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।'

আর গল্পের ভাবগত অন্তিম ব্যঞ্জনা ললিতের আন্তর উপলব্ধিতে মেলে— যা প্রসারিত হয় উদার মুক্ত প্রান্তরের মত চিরকালের পাঠকদের মনোলোকে— যাকে আমরা শিল্পপ্রকরণের বিশেষ শব্দে বলতে পারি 'ক্যাটাসট্রফি'—

> 'বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ যুগান্তর ধরে বার বার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায় নি।'

দুই

'পুন্নাম' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য নায়ক ললিতের চরিত্র ধরেই গল্পের পরিণামনির্ভর বিশাল ব্যঞ্জনায় পাঠকদের উপলব্ধির জগতে চলে আসে। গল্পের প্লট এমনভাবে নির্মিত,

যা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যভূমিকে নির্দিষ্ট ও অনড় করে রাখে। গল্পে কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে বিস্তারিত করতে সাহায্য করেছে ছবি, ললিতের স্ত্রী ও অসুস্থ খোকা— ললিতের পুত্র। গল্পের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যায় সমগ্র রচনাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. খোকার অসুস্থতা নিয়ে ছবি ও ললিতের শোচনীয় দুর্ভোগ, অনিশ্চয়তা ও অসহায়তা, বিষাদময়তার জীবন্ত রূপ; ২. ডাক্তারের কথামতো খোকাকে নিয়ে চেঞ্জে আসা, সেখানকার প্রতিবেশীপুত্র টুনুর সঙ্গে খোকার পরিচয় ও টুনুর মৃত্যু, ৩. ছবি ও ললিতের শেষ কথোপকথনে ললিতের পাপের আত্মস্বীকৃতি, টুনুর বদলে পুত্র বেঁচে থাকায় ললিতের নিরাকার অন্তর্গূঢ় বিক্ষোভ ও বৃহত্তর চেতনার উত্তরণ।

এমন বিভাগ দেখায়, যদিও কেন্দ্রীয় বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তৃতীয় পর্বে এবং স্বাভাবিক তা, কিন্তু প্রথম দুই অংশ নায়কের সেই চরম অভিজ্ঞতাকে নিবিড়তম অনুপন্থী করার জন্য ও বেদনার রক্তক্ষরণে দীপ্ত করার জন্য প্রথমের জর্জরিত কষ্টের যে ছবি বিস্তারিত, তা কেন্দ্রীয় ভাবনাকে শিল্পের সহনশীলতা ও অসীমতা দেয়। ললিত নিজের ছেলের স্বার্থপরতা, হিংসা, সংকীর্ণ অধিকারচেতনা, লোভ, অন্যকে দমিত করার প্রয়াস— এসবের মধ্যে প্রতীকী ভাবনায় কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে কঠিন সত্যের ভিত দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বক্তব্যে মেলে নায়কের নিজের মধ্যে শ্লেষাত্মক পলায়নী মনোভাবকে সমর্থন-প্রয়াস, আত্মসন্তুষ্টির নকল ভান, বৃহত্তর জীবন ও জগৎবোধে শান্ততায় আশ্রয়ের ধ্যান :

> 'ললিত তিক্তমুখে হেসে বললে, 'কিচ্ছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা! এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না! চিরকাল ধরে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।'

ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেমনি বেগে শান্ত হয়ে এল।

এই শান্ততার মধ্যেই যে জগৎকে, বিধাতার ও প্রকৃতির নিয়তিনির্দিষ্ট নিয়মকে ললিতের মনে দৃঢ়-স্থিত হয়, তাতেই শাশ্বত সত্য— যা সমাজসত্য ও জীবনসত্যের অনুগ— কেন্দ্রীয় ব্যঞ্জনায় পায় :

> '..........তার মনে হল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছু কারণ নেই। বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধরে বার বার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি।'

তিন

'পুন্নাম' গল্পের প্রাণ ও মৌলিকতা এর কেন্দ্রীয় বক্তব্যে যেমন, তেমনি এর গল্প-আবহে তীব্র গতি এনেছে এর চরিত্র। মোট বড় দুটি ও ছোট দুটি চরিত্র মিলে গল্পের সংক্ষিপ্তি ও তির্যকতা অনন্য শিল্প-স্বভাবী বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বড় গুণ এক পক্ষে অভিনব চরিত্রসৃষ্টির কৌশল। গল্পের অবশ্যই যদি নায়ক-নায়িকা চিহ্নিত করতে হয়, তবে প্রাথমিক ও প্রধান দুই অর্থে ললিত ও ছবি— দুই স্বামী-স্ত্রী। এর মধ্যে স্বামী ললিতের অন্তঃশীল বিবর্তন গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবের সঙ্গে রক্তমাংসের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে

ওতপ্রোত। ললিত যেমন মহৎ মানবতায় স্ত্রী ছবির সঙ্গে সাংসারিক কল্যাণ ও মঙ্গলধর্মে নিবিড়, তেমনি পিতৃত্বের স্পর্শকাতরতায় ও আগামী প্রজন্মের একাধিক সূত্রের সঙ্গে জড়ানো কোটি কোটি সন্তানের সুস্থ জীবন ভাগ্যের পরিশীলিত রূপ কল্পনা করে— যা প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও জীবনাদর্শ ও জীবনাগ্রহ (attitude to life)। তাই গল্পের শেষ দিকে তীব্র শ্লেষাত্মক স্বভাবে ললিতের পিতৃত্বের প্রাণবীজের প্রকাশ এমন :

> 'আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মত আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে। নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্টস্বীকার কমান যে বৃথা ছবি।'

ললিত 'পুন্নাম' গল্পের প্রথমার্ধে স্ত্রীর পাশে সাংসারিক মমত্ববোধ ও সহাবস্থানের আচরণে এতটুকু ফাঁক রাখেনি। রুগ্‌ণ খোকার জন্য তার দিনানুদৈনিক আত্মত্যাগ কম নয়। ছবির স্বামী-ভাবনা ও পুত্রসেবায় ললিত সমান দরদে ও সমবেদনায় ছবির পাশে থেকেছে। তাই চেঞ্জের জায়গায় প্রতিবেশীর পুত্র টুনুর মৃত্যুর পর ছেলের আচরণে তার যে ভিতরে জ্বালার জন্ম, সেখানে যেন ললিতের কোনো compromise নেই। এই non-compromising attitude-এর নির্মমতা ও নিরাসক্তি থেকেই ললিত নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছে : 'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে রইল, আশ্চর্য নয় ছবি?' ললিত নিজপুত্রের জন্য অনেক দায়দায়িত্ব নিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছে, ছবির কষ্ট লাঘব করতে নিজেই ছেলেকে একসময়ে ঘরোয়া স্বভাবে কোলে আশ্রয় দিয়েছে, চেঞ্জের জন্য কাজের জায়গায় গোপনে অর্থ-তছরূপ করেছে, চেঞ্জে গিয়েও ছেলেকে সুস্থ করে তাকে লেখাপড়া শেখাতে ব্যস্ত থেকেছে, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায় তার মনোলোকের আন্তরিক দিকগুলি! তাই গল্পের শুরু যেখানে ললিতের আশাবাদ দিয়ে, গল্পের শেষদিকে ললিতের বিবর্তনে সেখানে মেলে বিরক্তি, হতাশা, নৈরাশ্য, frustration থেকে, ট্র্যাজেডি-করুণ অবস্থার মধ্য থেকে এক ছদ্ম cynicism। এই 'সিনিসিজমে' মেশানো আছে ব্যর্থতার মধ্যেও প্রতীক্ষা। তা বস্তুত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজস্ব মঙ্গলবোধ ও আশাবাদ-চিহ্নিত।

ললিতের চরিত্রমূলে— বিশেষ করে শেষ দিকে—আছে অসীম যন্ত্রণাদিগ্ধ দ্বন্দ্ব। যা ছিল তার মধ্যে শমীবহ্নির মত চাপা, আত্মদহনকারী, তা হয় মৃত শিশু টুনু ও নিজের জীবিত পুত্র খোকার সমূল বৈপরীত্যে বেদনার স্বভাব :

> 'চুবি করেছি, জুয়াচুরি করেছি, লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করেছি। ভবিষ্যাতের মানুষের দাবী মেটাতে অন্যায় করিনি নিশ্চয়!'
>
> 'তাহলে কি হবে', ছবির স্বর ভয়ে কাঁপছিল। ললিত তিক্ত মুখে হেসে বললে,'কিচ্ছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা! এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধরে এ শুধু খোঁচা দেবে।' ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা কিন্তু যেমন বেগে এসেছিল, তেমনি বেগে শান্ত হয়ে এল।'

ললিতের উত্তেজিত মনের এই শান্ততা নতুন জীবন ও জগৎ উপলব্ধির ভিত। মনের

গভীরে ললিত যে ক্ষতবিক্ষত, বিধ্বস্ত— তার কথায় তার প্রমাণ। ললিতের মধ্যে যে গভীর প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষার অসীমতা, তার মূলে নায়কের বুঝিবা পাপবোধ থেকে পুনরুত্থান!

আদর্শ স্ত্রী হিসেবে ছবি এই গল্পে অনন্য। কিন্তু ছবির অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বামীর সেবায় ও প্রেমে তার কষ্টের মধ্যে আশ্বস্ত করার প্রয়াস, আবার পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠা, তাকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য নিজের সমস্তরকম অসুবিধে মেনে নিয়েও সেবায়, স্নেহে, শুশ্রূষায় বিরক্তি ঢেকে সান্ত্বনা দেওয়া, নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়ে রুগ্‌ণ পুত্রের বিরাগ-বিদ্রোহের একঘেয়েমিকে সহনশীলতায় মানানসই করা— এসবে ছবি এক বাঙালি বধূর আদর্শ দৃষ্টান্ত। কিন্তু গল্পের শেষ দ্বিতীয়াংশে ছবির তেমন কোনো বিবর্তন নেই। ছেলে সুস্থ হলে তার বিসদৃশ আচরণে, টুনুর প্রতি উৎকট হিংসা ও স্বার্থপরতায় প্রতিবাদী তৎপরতা সঠিক হলেও ললিতের পাশে স্বামীর ভাবনার সহমর্মী হতে পারেনি। গল্পের পরিকল্পনায় ও চলনধর্মে ছবির ভূমিকা সঠিক, কিন্তু খোকাকে ভাল করে তোলা, সুস্থ করার মধ্যেই তার কাজ শেষ। টুনুর সঙ্গে খোকার আদ্যন্ত আচরণের তীব্র প্রতিবাদে তার স্নেহের স্বভাবে কোনো খামতি নেই। সে ললিতের পাশে থেকে শিল্পের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। ছবিই ললিতের ছেলের প্রসঙ্গে পৃথিবীর কোটি কোটি ছেলের সুস্থ হয়ে বাঁচার, শ্লেষাত্মক ভাবনার ভিত গড়ে, ললিতকে তার নিজস্ব চিন্তায় এগিয়ে যাওয়ার পরোক্ষ সুযোগ করে দেয়। অর্থাৎ ছবির সীমা আছে, ললিত তা ছাড়িয়ে অসীম।

ললিত-ছবিদের সন্তান খোকা এবং চেঞ্জে আলাপ-হওয়া প্রতিবেশী-পুত্র টুনু— এই দুই শিশুপুত্রের মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্যই 'পুন্নাম' গল্পের শিল্প-পরিণামে মূল বক্তব্য বিস্তারে সহায়ক। দুটি শিশুই গল্পকারের হাতে আঁকা সার্থক চরিত্র। অল্প-পরিসরে টুনু বাংলা ছোটগল্পের শিল্প-ভাবনার বিবর্তনে রীতিমতো বিস্ময় জাগায়। যতদিন ললিত-ছবির সন্তান চেঞ্জের আগে পর্যন্ত রুগ্‌ণ ছিল, ততদিন মূল গল্পের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য ছিল কম। গল্পে চেঞ্জের পরিবেশে শিশু টুনুর ছোট ছোট তৎপরতা খোকার গতানুগতিক অথচ আড়ষ্ট কান্নার পরিবেশ থেকে প্রসারিত তাৎপর্যে গল্পভাবনায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। খোকার অসুস্থ থাকাকালীন যাবতীয় চাহিদা, স্বাভাবিকভাবেই তাকে সুস্থ হবার পর সেসবই মূঢ় স্বার্থপর করে তোলে। তার মা-বাবার কাছে নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো পক্ষকে সহ্য করতে যে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই শরীর সুস্থ হলেও মনের অসুস্থতা তাকে ক্রমশ নিচের দিকে ঠেলে। ক্রমশ সুস্থতর খোকার খেলা টুনুর সঙ্গে, বুঝিবা টুনুর পক্ষে অত্যাচার হয়ে ওঠে। খোকার খেলায় সুশ্রী সুন্দর মধুর-কণ্ঠ টুনু যখন হাঁপিয়ে ওঠে, শিশুসুলভ স্বভাবে ললিতকে তা নিয়ে অভিযোগ করে, তা নিয়ে খোকাকে ভর্ৎসনা করলে টুনু সুন্দর সামলায় খোকার দুষ্টুমি। ললিতকে বলে, 'না ঝগড়া হয়নি তো। .... আমার তো লাগেনি।' টুনুকে খোকার পড়ার সময় আসতে বারণ করলে পরে ললিতের নিজেরই লজ্জা, গ্লানি, অনুশোচনায় মনের মধ্যে গভীর বিষাদ ঘিরে ধরে। টুনু দুদিন আর আসে না— ললিতের ভয়ে, নিষেধের কারণে। চমৎকার নিষ্পাপ অভিমানে

টুনু ললিতের অন্তরঙ্গ সস্নেহ অভ্যর্থনায় আবার আসে। সন্দেশ খাওয়া নিয়ে খোকার হিংসুটে স্বভাব, কুৎসিত স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুর আত্মাদর— এসবের সামনে টুনু সরল নির্লোভ সত্যভাষণে এক নতুন শিশু 'আমি তো সবটা খাবো না কাকিমা— আমার বড্ড অসুখ করেছে কিনা। আমার তো খেতে নেই।'

বিপরীতে খোকা বহু দূরবর্তী আর এক মেরুর। ললিতের ভিতরে তার আচরণ চাপা ঘৃণা জাগায়, তার নিজ পুত্রের পিতৃত্বের আভিজাত্যকে করে কালি অপমানে। এই গভীর গোপন উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে ছবির পাশে ললিত একা! তার তীব্র শ্লেষাত্মক, নৈরাশ্যপীড়িত সংলাপ ছবির প্রতি :

> 'শোন না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে, তাই জন্য আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ।'

আসলে দুই শিশু দুই পারস্পরিক বিপরীত স্বভাবের প্রতীক— জীবধর্ম ও জীবনধর্মের সুস্থতা ও অসুস্থতার বিচার এদের মধ্যেই মেলে।

চার

'পুন্নাম' গল্পটি বৃহত্তর অর্থে সমাজ-সমস্যামূলক গল্পের শ্রেণীতে পড়ে। গল্পের সারা দেহে উৎকট সমাজ-সমস্যা, কিন্তু পরিণামে নায়ক ললিতের এক অসীম দার্শনিক উপলব্ধিতে সমগ্র গল্পের গুরুত্ব বিস্ময় জাগায়। খোকার দুরারোগ্য অসুখ, তাকে সুস্থ করা, তার চিকিৎসা এবং চেঞ্জে এসে তার শারীরিকভাবে নিরাময়ের পিছনে এক নিম্নবিত্ত পরিবারের কেরানির বুর্জোয়া অর্থনীতির অন্যায় আঘাত মেনে নিয়ে বিপর্যস্ত হতে হয়। কিন্তু শরীর সুস্থ হলেও মনের বড় জীবনের সুস্থতা কোথায়? সামাজিক সমস্যা জিজ্ঞাসা জাগায় চিরকালের মানব সমাজের নীতিহীন অস্তিত্বের মূল্যায়নের ব্যাখ্যায়। গল্পের সমস্যা নতুন বোধের জন্ম দেয় নায়কের মনে, আত্মার আকৃতিতে।

গল্পটির ক্লাইম্যাক্স নিয়ে আগে আলোচনা করেছি। সেই 'মহামুহূর্ত' তীব্র হয়েছে ললিত ও তার স্ত্রীর সংলাপ বিনিময়ে, শেষে একা ললিতের মধ্যে নবচেতনার উদ্বোধনে। গল্পে কোনো ঘটনা নায়কের চেতনালোককে কাঁপায় না, আসলে দুই শিশুর যৌথ চিত্র থেকেই বৈপরীত্যের দুই মেরু-স্বভাবেই তীব্র রূপ পেয়েছে যেমন, তেমনি অসামান্য গভীরতা লাভ করেছে। কোনো বিশেষ ভাবকে দ্যোতিত করার মূলে প্রকারান্তরে দুই শিশুর ভাবগত সংঘর্ষ ও সংকট পেয়েছে প্রতীকী মর্যাদা।

প্রত্যেকটি গল্পেই থাকে ভাবের একমুখিতা। যে কথায় গল্প শুরু, তারই প্রসারিত ব্যঞ্জনা— পুরোটাই নির্যাসের মতো গল্পের শেষে কঠিন মৃত্তিকা পায়। 'পুন্নাম' গল্পে ছবি-ললিতের দুঃসহ অসহায়তা ও যন্ত্রণার একসময়ে নিরসন হয় চেঞ্জে ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। পূর্ববর্তী ভূমিকার সঙ্গে এই স্তরের স্বাভাবিকতা একমুখিনতার সাযুজ্য আনে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো অনাবশ্যক ভার নেই। গল্পকারের কলমে বিবরণ হয়েছে

মেদবর্জিত। আগাগোড়া বিবৃতিধর্ম পরিত্যক্ত। ভাষার ও সংলাপের নিপুণ বিন্যাসে ক্রমশ গল্পের মধ্যে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্ম (Suggestiveness) চমৎকারিত্ব এনেছে। ললিতের শ্লেষ টুনুর স্বভাব ধরে উঠে-আসা নায়কের গ্লানিবোধ, অনুশোচনা, চাপা বিষাদে নিজেকে ছোট মনে করা, টুনুর মৃত্যুতে ললিতদের নিজের ছেলের বেঁচে থাকার চিন্তায় এক ধরনের নিষ্কলুষ গ্লানি অবশ্যই শ্লেষজর্জর প্রতীকের ব্যঞ্জনা-ধন্য হয়। গল্পটির লেখক গল্পের ভাষায় যে সহজ তির্যকতা ও গভীরে আঘাত দেওয়ার মতো প্রস্তুতিচিত্র রচনা করেছেন, তা অনবদ্য। সমগ্র গল্পেরই মূল্যবান শিল্প—অলংকার। আগেও বলেছি, সমগ্র গল্পের ধীর গতির শেষে গল্পকার-ব্যক্তিত্বের রঞ্জনমূর্তি মেলে ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে বিশ্বজনীন সত্যকে উদ্ভাসিত করার প্রয়াসে। 'পুন্নাম' প্রেমেন্দ্র মিত্রের যেমন শ্রেষ্ঠ গল্প, তেমনি বাংলা ছোটগল্পের মূল্যবান সম্পদ। সামাজিক বৈষম্যের তীব্র শ্লেষ ও দার্শনিক উপলব্ধির আলোময়তা গল্পের স্থায়ী সম্পদ যেমন, গল্পকারের জীবনদর্শন-দীপ্ত আত্মপ্রকাশের একমাত্র আধারও।

পাঁচ

আমাদের আলোচ্য গল্পটির নাম 'পুন্নাম'। অভিধান রচয়িতারা 'পুন্নাম' শব্দের ব্যাকরণসিদ্ধ ব্যাখ্যায় বলেছেন, পুৎ নাম যার, তা-ই 'পুন্নাম'। পুৎ নামক (নরক) এখানে বুঝতে হবে। ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয় এই সংস্কৃত সংজ্ঞা 'পুন্নামো নরকাৎ ....ত্রায়তে।' আবার এমন ব্যাখ্যাও শোনা যায়— পুন্নাম নরক বোঝাতে নরক বিশেষকে বোঝানো হয়। 'পুৎ নামক নরক'-এর ব্যাখ্যায় পুত্র না জন্মালে যেখানে যেতে হয়....'

গল্পের নাম অবশ্যই ব্যাখ্যাধর্মী নয়। ললিত-ছবির পুত্র খোকাকে মনে রাখলে তার সদ্য সুস্থ হওয়ার পর আচরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে 'পুন্নাম' তাকেই লক্ষ্যে আনে। খোকা চরিত্র ও তার স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি যাবতীয় অমানবিক কলুষ আচরণ, সংলাপ গল্পের নায়ককে হতাশ করে বলেই নরককে পৌরাণিক প্রতীক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। মানুষ সন্তান চায়, বংশবৃদ্ধি চায়, পুত্রের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সত্যতার প্রতিষ্ঠা চায়। নিছক বংশবৃদ্ধি কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য নয়। পুত্রের গরিমায় পৃথিবীকে ধন্য করার আদর্শভাবনাও বাবা-মায়ের আদর্শে সমন্বিত থাকে। খোকার যে শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়ার পর আচরণ, তা গ্লানিকর, মানুষের মতো জীবধর্মের ও জীবনস্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতা ললিতের নিজের পুত্রকে দেখে, তার পরিণামী চিত্র প্রত্যক্ষ করে নরকের মতো পাপীদের স্থান, ঘৃণ্য আবাসকে ভেবেছেন। এই অর্থে 'পুন্নাম' গল্পনাম স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় আর একটি দিক হল, ললিত শুধু নিজের জীবনের সমৃদ্ধি তার পুত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে চায়নি, সে চেয়েছে ও ভেবেছে— সারা বসুন্ধরার বুকে যুগ যুগ ধরে অনন্তকালের সুস্থ মানবজাতির পরিবেশে যেন তাদের পুত্র এক উদাহরণ হয়। খোকার হিংসা-স্বভাব, স্বার্থপরতা, আত্মাদর, কুৎসিত লোভ ও অহংভাব, অ-মানবিক অধিকার চেতনা— এসবই জগতের সুস্থতা বজায় রাখার বিপরীত মনস্কতা। পুত্রের জন্ম দিয়ে মা-

বাবাই তো তাদের বড় করে তোলে— দেহে-মনে-প্রাণে-আত্মায়, এর যে কোনো এক-এর অস্তিত্ব মানুষকে অপ্রয়োজনীয়ের স্তূপে নিক্ষেপ করে। পৃথিবী থেকে সুস্থ জীবনের বিলোপ ঘটছে অকালে— টুনু তার প্রমাণ। অসুস্থ, অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে দাপটে ভোগের জীবন কাটাতে চায়— প্রমাণ দম্পতির একমাত্র সন্তান 'খোকা'। এই যে জগতে সুস্থ প্রাণশক্তির 'mal-distribution '— ও বিলোপ হওয়ার দিক, তা-ই তো ভয়াবহ। স্ত্রী ছবির কাছে ললিতের তাই শ্লেষ-কটাক্ষে বড় ভাবনা— যা 'পুন্নাম'-এর নির্গলিতার্থকে সমর্থন জানায়, তা এই :

> 'আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি। আমাদের ছেলের মত কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে। নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি।'

এই প্রতীকী ভাষণে মেলে গল্পের নামের অন্তঃশীল মূল সত্য, যা শাশ্বত, সত্য, যা বাঞ্ছিত। তা একান্ত কাম্য বলেই গল্পে 'পুন্নাম'-এর স্বীকৃতি কঠিন যুক্তির মধ্যে নিহিত।

৬.

হয়তো

এক

প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প লেখেন চরিত্র ধরে, মূল বিষয় আগে ভেবে নিয়ে— এমন একটা ধারণা মনে রেখে তাঁর কিছু গল্প পড়লে সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধে হয় না। সব গল্প যে নয়, তার দৃষ্টান্ত যেমন 'হয়তো', তেমনি 'কুয়াশায়'-ও। সেই সঙ্গে 'সাগরসঙ্গম', 'ভিজে বারুদ' এমন একাধিক গল্পের নামও করা যায়। এই গল্পগুলিতে টানা কাহিনী আছে, ঘটনাও আছে ছোট, বড়, মাঝারি মাপের। চরিত্র ধরে গল্প তো আগেই আলোচনা করেছি— 'পাশাপাশি', 'পুন্নাম', 'মোট বারো' ইত্যাদি। যখন গল্প বলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তখন বিবরণধর্মী কাহিনী গ্রহণ করেন না এবং কেবল কাহিনীকে সমৃদ্ধ করার জন্যই ঘটনাকে আড়ম্বরপূর্ণ করেন না। আসলে প্রধান চরিত্রদের স্থান ও বিকাশ-বিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে ঘটনাগুলির অনুপুঙ্খ সংক্ষিপ্তি ও পরিমিতি দিয়ে সাজানো। আবার কোনো কোনো গল্পে এমন পরিবেশ রচনা করেন যা সেই চরিত্র ও ঘটনার গায়ে জড়ানো নির্দিষ্ট পোশাক। পরিবেশ নামক পরিচ্ছদটি সরালেই অদ্ভুত অন্য আস্বাদ ও শিহরন আসে।

আসলে তাকে পরিবেশের রহস্য বললেও গোয়েন্দা বা রহস্যগল্পের উদ্দেশ্যমুখিন হয় না। গোড়া থেকেই একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য পরিবেশের আড়ালে থাকে। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'ভিজে বারুদ', 'সাগরসঙ্গম', 'কুয়াশায়'—এমন সব গল্পে পরিবেশের ও বর্ণনার, কাহিনীসূত্র ও ঘটনার রুদ্ধশ্বাস স্বভাব যতই গাঢ় হোক, পাঠক এই জাতীয় গল্পে বাস্তবতাকে আস্বাদ করেন। পরিবেশের মায়াঞ্জন গল্পের শেষে এক ঘোর বা বিভোর অনুভূতি ও উপলব্ধিকে মান্য করে বাস্তবের কঠিন মাটির আঘাতকে অদ্ভুত সত্যতা দেয়।

আমাদের বর্তমানে আলোচ্য 'হয়তো' গল্পটিকেও এই ভাবনার অনুক্রমে রাখতে আমরা নির্দ্বিধ।

'হয়তো' গল্পের কাহিনী ও ঘটনার সূত্রে এর প্লটের বৈচিত্র্য বিস্ময়রস আস্বাদ্য করে। এই গল্পের, অনেকটা ভূমিকা মতো অংশে, লেখকের উত্তম পুরুষ কথক হিসেবে সশরীর উপস্থিতি আসলে অনেকটাই সূত্রধরের মতো। প্রথমে যে বিষয় বলছেন, তাকেই শেষে গল্পের যোগসূত্র ধরে উপসংহারে উন্নীত করেছেন। আসলে প্রথম অংশটা লেখকের শিল্পনিপুণতায় লেখক-নিরপেক্ষ গল্পেরই প্রধান পরিণতি-অংশ। সমগ্র গল্পে লেখক শুধু সচেতন নিপুণ শিল্পী-কথক। 'হয়তো' গল্পের শুরু গল্পের উত্তমপুরুষ কথকের কথা দিয়ে। প্রবল ঝড়জলে এক গভীর দুর্যোগের শহুরে রাত। রাতে ফেরার পথে পড়ে নদীর ওপর চেন দিয়ে ঝোলানো, ঝড়ে দোদুল্যমান অর্ধ-সমাপ্ত দু'পাশের রেলিংহীন এক সেতু। গ্যাসের আলোয় পথ নিষ্প্রভ। এই অবস্থায় পুল পার হওয়ার জন্য শক্তি ও সাহস দরকার। পুলটির পথ না ধরলে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আরও এক মাইল অতিরিক্ত পথে ঘুরতে হয়। অথচ ঝড়ের বেগে খোলা নদী ভয়ঙ্কর। যে কোনো মুহূর্তে নিচে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। এমন জনহীন পুলে কথক কোনোরকমে পার হতে তটস্থ।

হঠাৎ কথক বিপরীত দিক থেকে দেখে দুই নারী-পুরুষকে। তাদের দুজনেরই শরীর মোটা কাপড় দিয়ে মোড়া। আর সেই কাপড়ের জঙ্গলের মধ্যেই কেরোসিন তেলের বাতির অস্পষ্ট আলো। আলোয় কথককে রীতিমতো চমকে দেয় নারীর মুখ— শীর্ণ রুগ্ণ মুখে দুটি দীর্ঘায়িত অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত চোখ। পুল প্রা শেষ হয়ে এসেছে কথকের, কাছে হঠাৎ পিছন থেকে অমানুষিক চিৎকার কানে আসে। টাল সামলাতে না পেরে মেয়েটি নিচে পড়ে যায়। কথক দ্রুতপায়ে ওদের কাছে আসে। পাশে মেয়েটি নেই, পুরুষটি হতবুদ্ধি ও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে পড়ে মেয়েটির শাড়ির একটি অংশ পুলের বল্টুতে জড়িয়ে গেছে। নদীতে না পড়ে নদীর ওপর সে ঝুলছে। আচ্ছন্ন পুরুষটিকে সঙ্গে নিয়ে কথক মেয়েটিকে পুলের ওপর তোলেন। সাবধানে তাদের আবার পুল পার করে দিয়ে ফিরে যান।

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই পুরুষ-রমণীর কিছু সংলাপ-বিনিময় শোনেন। মেয়েটি পুরুষটিকে বলে, তার তো পা ফসকে যায়নি, তার মনে হয় পুরুষটি তাকে ঠেলে দিয়েছে। লোকটি হাসির শব্দ করে বলে, 'পাগল! কি যে বলো, আমি ঠেলে দেব তোমায়.....' সেই অসাধারণ ঘটনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই কথক মূল গল্পটি পাঠকদের শোনান। প্রকাণ্ড সাতমহল, জরাজীর্ণ, নোনাধরা, ইঁটকাঠের স্তূপে ঢাকা এক ভূতুড়ে নিয়োগীদের জমিদার বাড়ি। এই বাড়িতে লাবণ্য স্বামী মহিমের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পালকিতে চেপে বরপক্ষের পুরোহিত ও কন্যাপক্ষের পরিচারিকা সহ আসে। এমন জায়গায় মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য কনের বাড়ির ঝি তো মেয়ের বাপকে শাপ-শাপান্ত করে। ইতিমধ্যে কথায় কথায় লাবণ্যরা জঙ্গল পেছনে ফেলে চলে আসে চারধার ঘেরা ঘরের সারির মাঝখানের অঙ্গনে। এমন পরিবেশে একমাত্র এক অসামান্য রূপসী শাঁখ বাজিয়ে দেখা দেয় ও সহাস্যে ঘোষণা করে যে তার দাদা চুপি চুপি বিয়ে করে উপস্থিত।

কৌতুকে উচ্ছল, উজ্জ্বল, কিছুটা বাচাল রূপসীর সঙ্গেই আসে এবং রূপসী লাবণ্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ও করিয়ে দেয় সেই পিসিমার— যে এক মূর্তিমতী জরা এবং শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দিয়ে লাবণ্যকে বুঝিবা বিদ্ধ করে। বেশিরভাগ পোড়ো জীর্ণ আগাছা-জঙ্গলে অব্যবহার্য পরিত্যক্ত ঘরগুলির মধ্যে কোথায় কে বাস করে লাবণ্য জানে না, তবে সে বুঝে গেছে সারা বাড়িতে ওর স্বামীকে ও নিজেকে নিয়ে মোট চারজন প্রাণী—পিসিমা ও রূপসী— পরে নাম জেনেছে মাধুরী! এরা যেন এক রহস্যময় জগতের জীব। স্বামী সব সময় কাজে ব্যস্ত, স্ত্রী সম্পর্কে কখনো আসক্ত, কখনো চরম নিরাসক্ত। লাবণ্যর সঙ্গে যে কোনো কথায়— একবার প্রেমিক, পরেই আবার দুর্বোধ্য পাগলামিতে সম্পূর্ণ অন্য, লাবণ্যের কাছে দুর্বোধ্য, বিস্ময়ের মানুষ। লাবণ্যের ভালোবাসায় কখনো আকৃষ্ট হয়, পরমুহূর্তে সন্দেহে ফেটে পড়ে। কখনো রাতে লাবণ্যর আঁচলের খুঁট নিজের কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে বেঁধে শোয়, পরে রসিকতা ভেবে খুঁট খুলে উঠলেই মহিমের সন্দেহ এত রাতে বুঝি লাবণ্য অন্য কোথায় যেতে উৎসুক। সারাদিন কাজে বেরুলে মহিম এক পরিত্যক্ত ঘরে স্ত্রীকে রেখে শিকল টেনে দিয়ে যায়। ফিরে নিজেরই খুলে দেওয়ার কথা ভাবে।

স্বামীর থেকেও আরও দুর্জ্ঞেয় মনে হয় লাবণ্যের সুন্দরী মাধুরীকে। বয়সে সে লাবণ্যের থেকে কিছু বড়ই, স্বামীকে মাধুরী দাদা বলে সম্বোধন করে ভগিনী স্থানীয়ের দাবিতে। কিন্তু নিজের বোন যে নয়, তার আচরণে বিষয়টা নিঃসন্দেহ হয়। মাথায় সিঁদুর নেই, বিবাহের বয়স অনেকদিন পার হয়ে গেছে। সারাক্ষণ সর্বাঙ্গে দামী দামী অলংকার পরে পটের বিবির মতো নিখুঁত সেজে, চওড়া পাড় শাড়ি-পরা মাধুরী গতিবিধি ও স্বভাবে সারা বাড়ির আর এক রহস্যময়ী। সচ্ছল কৌতুকেই কখনো হঠাৎ দেখা দিয়ে লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, তাকে গভীর ভালোবেসে ফেলার কথা জানায়, তাকে নিয়ে বাইরে পালিয়ে যাবার যুক্তি দেয়। বলে লাবণ্যকে বর সেজে মাধুরীকে কনের মতো পাশে নিয়ে দিল্লি বা লাহোরে রোজগারের কথা। লাবণ্যের ফুলশয্যা নিয়ে বলে সকৌতুকে— 'তোর ফুলশয্যা, না আমার?' লাবণ্য ঠাট্টা করে মাধুরীর ফুলশয্যা বললে মাধুরীর কৌতুক— 'শেষপর্যন্ত দেখতে পারবি তো?.....তবে বেরো ঘর থেকে। দেখি তোর বুকের জোর!' মহিম এলে মাধুরী ফুলের গহনার পুঁটলি বলে মহিমের কাছে চটকানো সমস্ত ফুলের পুঁটলি রেখে যায়। মহিম লাবণ্যকে ঘরের শিকল টেনে বন্ধ করে রেখে গেলে মাধুরী খুলে দেয়। একদিন মহিম কাজে চলে গেলে মাধুরী দরজায় শিকল খুলে লাবণ্যকে নিয়ে পিসিমার ঘর খোলা থাকার সুযোগে মজা দেখানোর জন্য সেই ঘরে ঢুকে সব গহনা তছনছ করে, লাবণ্যকে সাজানোর খেলায় মাতে। কখনো লাবণ্যকে এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার পরামর্শও দেয়। স্বামী মহিমের ব্যবহারে বিসদৃশ দিকের কারণ জানতে চাইলে কৌতুক সরিয়ে গম্ভীর মাধুরীই উত্তেজিত হয়ে বলে :

> 'মেয়েমানুষের শাপে, হাজার হাজার মেয়েমানুষের শাপে এ বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরের ভিৎ পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে! সাতপুরুষ ধরে এরা মেয়েমানুষের

এমন অপমান লাঞ্ছনা নেই, যা করেনি। তাদের সে অভিশাপ যাবে কোথায়! যা নিয়ে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে তারই জন্য দুর্ভাবনা আজ তোর বরের বুক কুরে কুরে খাচ্ছে। ও যে সেই বংশের শেষ বাতি।'

পিসিমার ঘরে লাবণ্য ও মাধুরীর না জানিয়ে ঢোকার পরের দিন পর্যন্ত লাবণ্য পিসিমাকে নিয়ে কোনো কথা স্বামীকে বলেনি। পিসিমা কেন এইভাবে এত সব মূল্যবান গহনা সংগ্রহ করে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখে তার কোনো ব্যাখ্যাই লাবণ্যের কাছে বলেনি মহিম। পরের দিনই বিকেলে মহিম লাবণ্যকে নিয়ে বাড়ি ছাড়ে হঠাৎ। জঙ্গলে ঢাকা জমিদার বাড়ি ছাড়ার পর উদ্দেশ্যহীন হাঁটার মধ্যে মহিম নিজের সহজ মানুষের মতো বেঁচে থাকার বাসনার কথা বলে, লাবণ্যেব ভালোবাসা পেলে সে সমস্ত পাপ ধুয়ে বাঁচতে পারবে। ভালোবাসায় রক্তের বিষ ধুয়ে যাবে। মহিম স্বীকার করে অদৃশ্য মনে অকারণ সন্দেহই মহিমকে পোড়ায়, পোড়ায় লাবণ্যকেও। এবার তার নবজন্ম হবে। তাদের এমন ঘুরে বেড়ানোরও শেষ। এসব কথা একটা গাড়িভাড়া করে উদ্দেশ্যহীন ঘোরার কথা ভেবে গাড়িতে বসে বলে মহিম লাবণ্যকে। একসময়ে গাড়ি ছেড়ে দেয়। ভয়ংকর দুর্যোগের রাত। ওরা হাঁটতে হাঁটতে চেনঝোলানো পুলের কাছে আসে। এর পবের চিত্রটিই গল্পের পরিণামী দিক। গল্পের প্রথমেই উত্তমপুরুষ কথক তার ছবি উপহার দিয়েছেন পাঠকদের। অবশ্য আগে নবজন্মের কথা বললেও নতুন করে বাঁচার কথা ভুলে নারীকে অবিশ্বাস করে বাঁচার, ভালোবাসার মধুরতম মুহূর্তকে চিরন্তন করার জন্য মহিম একসময়ে লাবণ্যকে ঠেলে দেয়। এর পরে কথকের কথা—তার কল্পনার অন্ধকারে মহিম-লাবণ্যর পরিণাম ও মাধুরীর প্রেতিনী স্বভাবে জীবন-পরিণতির শূন্য ভাবনায় স্থির হয়ে যান।

'হয়তো' গল্পে আখ্যান আছে একাধিক ছোট-বড় ঘটনার রহস্যময়তায়, সেই সঙ্গে আছে তিনটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিল প্রতিক্রিয়ায় ও সামন্ততান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাব ধ্বংসের অন্তর্নিহিত রন্ধ্রপথ নিয়তি স্বভাব চিহ্নিতকরণে। গল্পের প্লট তার কেন্দ্রে নানান দিকের জটিল জালগুলিকে গুটিয়ে এনেছে অসামান্য নিখুঁত শিল্প-শাসনে। মূল কাহিনী মহিম-লাবণ্যর নতুন সংসার জীবন। তার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ভাঙন, হতাশা, অসহায়তা, নৈরাশ্য, পাপ-পুণ্যের হিসেব-নিকেশ— তাকে নিখুঁত অঙ্কের উত্তরে ধরার জন্য গল্পে এসেছে মাধুরী, পিসিমার মতো রহস্যময় মানুষজন! আখ্যানের খণ্ড খণ্ড স্তরে লাবণ্যের সঙ্গে মহিমের স্বামী হিসেবে সম্পর্কের আদ্যন্ত জটিলতাই শুধু নয়, মাধুরী-মহিম, মাধুরী-পিসিমা, মহিম-পিসিমা— এই গিঁটগুলির রহস্য উন্মোচন গল্পটিকে প্লটের চমৎকারিত্ব দিয়েছে কাঠামোর কেন্দ্রীয় বাঁধুনির সূত্রে। চরিত্রগুলিই— মহিম, মাধুরী, পিসিমা— একে একে লাবণ্যের শেষ পরিণতিকে ন্যায়ের (logic) জালে নিয়তিনির্দিষ্ট করেছে।

গল্পের প্রথমেই কাহিনীসূত্র ধরে উত্তমপুরুষ কথকের যে ভূমিকা, তা এক নতুন রীতির প্রকরণ কৌশল। গল্পের প্রথমে লাবণ্য স্বামীকে বলেছে, তার স্বামীই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ওই পরিবেশে এই অভিযোগের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হওয়ার, সত্য হওয়ার মধ্যে সংশয় থাকে।

লাবণ্যের দিক থেকে ভুল হতেই পারে। তা ঠিক কিনা— গোটা গল্পে কথক তার যুক্তিনিষ্ঠ চিত্র উপহার দিয়েছেন— যাতে বোঝা যায় লাবণ্যকে মহিমই ঠেলে ফেলতে চেয়েছিল। গল্পের শেষে কথক লাবণ্য-মহিম সম্পর্কে বলেন, 'পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে।' কিন্তু মহিম যে কোনোক্রমে লাবণ্যকে বাঁচিয়ে রাখবে না— এই যুক্তি মহিম চরিত্রের আদ্যন্ত ন্যায় (logic) বিচারে গল্পকারের কথাই ঠিক হয় আখ্যানের উপসংহারে: 'হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।' গল্পের প্লটের পরিকাঠামোয় লাবণ্য-মহিমের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এখানেই সঠিক। প্লটের বন্ধন শিল্পের মাপে সমাপ্তির স্বরূপে যথার্থ। মাধুরী সম্পর্কে কথকের assesment সঠিক।

'হয়তো' গল্পের 'মহামুহূর্ত' (climax) তৈরি হয়েছে কোনো বিশেষ ঘটনা বা 'situation' ধরে নয়, একমাত্র নায়ক চরিত্র ধরেই— সে হল মহিম। তার যে অতীতের পাপ-অনুষঙ্গে জটিলতম মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, জীবনযাপনে নৈরাশ্য, অনিশ্চয়তা— তার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে চরিত্রের এবং সমগ্রভাবে গল্পের 'চরম মুহূর্ত'। এর প্রথম সূত্রটি হল, মহিমের এমন কথার গভীরে জড়ানো :

> '১. মহিম প্রথম কথা বলিল এবং কথা বলিল যেন একেবারে নতুন মানুষ হইয়া।' ......বলিল, একটি কথা বুঝে আজ আমায় ক্ষমা করতে অনুরোধ করছি লাবণ্য। ও বাড়ির হাওয়া পর্যন্ত বিষাক্ত— এইটুকু জেনে তুমি আমায় মার্জনা করতে পারবে নাকি কখনো?'
>
> ২. 'আবার আমরা সহজ মানুষের মতো সংসার আরম্ভ করতে পারি না কি লাবণ্য? সাতপুরুষের পাপ দেহ থেকে ধুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়া যায় নাকি? যেখানে কেউ আমাদের জানে না এমন জায়গায়, একেবারে নতুন করে জীবন আরম্ভ করলে আবার আমি সহজ হতে পারব না কি?'
>
> ৩. 'তুমি জানো না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে। কিন্তু এ বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই।'
>
> ৪. .....'(ভালো) বাসো, বাসো জানি, কিন্তু অসুস্থ মনে অকারণ সন্দেহ জাগে। সে সন্দেহে মিছে পুড়ে মরি, তোমাকেও পোড়াই। তুমি শুনবে হাসবে লাবণ্য কিন্তু তুমি ও কথাটি প্রতিদিন আমাকে বলে স্মরণ করিয়ে দিলে আমি যেন জোর পাই।'
>
> ৫. 'ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অপরিচিত স্থানেই মহিম হঠাৎ লাবণ্যর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল।...... 'চলো না যেদিকে খুশি! ঝড়বৃষ্টি থামলে যেখানে গিয়ে উঠব সেইখানে ভাবব আমাদের নবজন্ম হল।'

এই সমস্ত কথা নিজের বাড়ি থেকে লাবণ্যকে নিয়ে বেরিয়ে আসার পর প্রবল দুর্যোগ-ধ্বস্ত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে বসে মহিম একে একে বলে লাবণ্যকে। সমস্ত কথার মধ্যে এত যে নতুন করে বাঁচার উপযোগী অস্তিবাচক কথা বলার 'Negation'-এর ছলে

'affirmation', যে নতুন বাঁচার শপথ-স্বীকৃতি, সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতি, লাবণ্যের হাত ধরে গাড়ি থেকে মহিমের নামার অন্তরঙ্গ দৃশ্য— এসবে মহিম সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ, জীবনপ্রেমী যেন বা! কিন্তু এসব ধরেই ধীরে ধীরে গল্পের climax নিয়তির মত জায়গায় আড়ষ্ট, অনড়, স্থির হতে থাকে। climax হয়ে ওঠার সেই ভয়ঙ্কর ক্ষণটি মুহূর্তে অবচেতন মনে পরিবর্তিত মহিমের স্বভাব-চিত্রে এঁকেছেন গল্পকার এইভাবে :

> 'লাবণ্য ..... বলিল, 'ও পোল ভাঙা কিনা কে জানে, যদি পড়ে যাও।'
> 'তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে। পারবে না পড়তে?'
> আবার তাহার চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া উঠিল। গাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে লাবণ্যকে বুকের কাছে ধরিয়া যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, এতখানি পথ হাঁটিতে হাঁটিতে তাহা মহিমের মন হইতে কখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে!'

ঠিক এই অবস্থার পরেই 'চরম মুহূর্তে'-র সেই অস্বাভাবিক কম্পন, ভয়ার্ত শিহরন মহিমেব অবচেতনে তীব্র malignant (ভয়ংকরী) হয়ে ওঠে।

> 'কি বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কি তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ? তাহার চেয়ে এই মধুরতম মুহূর্তটিকেই চিরন্তন করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না কি? এই সন্দেহের দেয়াল হইতে চিরদিনের মতো রক্ষা পাইয়া তাহার ক্লান্ত মন যে তাহা হইলে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে! ভালোবাসা, জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?'

এই আত্মগুপ্ত, অন্তর্গূঢ় মনের অবচেতনলোকের ক্রিয়ায় পরমুহূর্তেই ঘটে 'চরম মুহূর্ত' টানার মতো মোক্ষম ঘটনা: 'লাবণ্যের হাত ধরিয়া দোদুল্যমান সেতুর উপর দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মহিম তাহাকে ঠেলিয়া দেয়.....'

এভাবেই এবং ঠিক এইখানেই গল্পের ক্লাইম্যাক্স হয় নিয়তির নির্বন্ধের মতো। গল্পের প্রথমে উত্তমপুরুষ কথক সংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি লাবণ্যকে না চেনা সত্ত্বেও তার বিমূঢ় স্বামীর সাহায্যে ঝুলে থাকা লাবণ্যকে টেনে তোলে, তাদের দুজনকে পুল পার হয়ে যেতে সাহায্য করেন। মূল গল্পের শেষে কথক কিন্তু লাবণ্যকে টেনে বাঁচিয়ে তুললেও ক্লাইম্যাক্সের পরেও লাবণ্যের মৃত্যুকে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠায় জানান : 'হয়ত আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে'। ক্লাইম্যাক্সের পর শেষতম ব্যঞ্জনা অসহায় লাবণ্যের মৃত্যুতেই গভীর নিবদ্ধ করেছেন। গল্পের 'মহামুহূর্ত' রচনায় এমন Pomp and grandeur, এমন বিশাল প্রস্তুতি 'হয়তো' গল্পের পরিকাঠামোর ও central theme-এর বড় ঐশ্বর্য, বড় মাপের সুপরিকল্পিত শিল্প-প্রকরণ। 'হয়তো' গল্পের আখ্যানগত চিত্র-সৌকর্যে গল্পকারের প্রয়াস নন্দিত হবার যোগ্য।

দুই

'হয়তো' গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনা এক সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থায় আজন্ম লালিত জমিদারতন্ত্রের পারিবারিক শূন্যতায় রুদ্ধশ্বাস রহস্যের ভারে অনড়। গল্পটি মূলত নববিবাহিতা স্ত্রী লাবণ্যের প্রতি পুরনো জমিদার বংশ নিয়োগীদের সাতপুরুষের 'শেষ বাতি' মহিমেব দুর্বোধ্য রহস্যময় দ্বিধাজর্জর বীভৎস আচরণের অনিশ্চয়তার সূত্রেই সার্থক ছোটগল্পের সিদ্ধ শিল্প-প্রকরণ। গল্পের মধ্যেই গল্পকার লাবণ্যকে উত্তেজিত কণ্ঠে মাধুরীর বলা-কথায় কেন্দ্রীয় বক্তব্যের দিকে Pointing finger নির্দিষ্ট করেছেন :

> 'মেয়েমানুষের শাপে, হাজার হাজার মেয়েমানুষের শাপে বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরের ভিৎ পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাতপুরুষ ধরে এরা মেয়েমানুষের এমন অপমান লাঞ্ছনা নেই যা করেনি। তাদের সে অভিশাপ যাবে কোথায়! যা নিয়ে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে তারই জন্য দুর্ভাবনা আজ তোর বরের বুক কুরে কুরে খাচ্ছে।'

গল্পের মধ্যে মাধুরী ও পিসিমা জমিদার বংশের ধারাবাহিক শোষণ ইতিহাসের ক্রমিক স্বভাবে পরম্পরাগত আচরণে কিছুটা প্রতীকী হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু মহিমের স্ত্রী লাবণ্যকে দেখার জটিলতায় মহিমই লেখকের মূল লক্ষ্যের কেন্দ্রকথাকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

সামন্ততন্ত্রে একদল ভোগী জমিদাব প্রজাদের কাছে আদায়-করা অর্থের সাচ্ছল্যে সুরা ও নারীকে সহজলভ্য ভেবে বিলাসে ডুবে থাকত। নারী হত একমাত্র স্বাধিকারের সীমায় চিহ্নিত ভোগ্যপণ্য। সেকালে জমিব যেমন মালিকানা তমসুকের স্বভাবে পাট্টা পেত, তেমনি নারীও হত হস্তান্তবযোগ্য জমি, দামী আসবাবপত্রের মতো ভোগ্য সম্পত্তি। গল্পে নিয়োগীদের 'সাতপুরুষের কোটা'— 'প্রকাণ্ড সাতমহলা দালান' ইতিহাস-সমর্থিত দুর্দান্ত দাপটে তটস্থ থেকে হত নারীভোগের গোপন কর্মশালা, মহিম যেন তারই অবচেতন স্বভাবের উত্তরাধিকার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তেব উইল'-এর বোহিণী— যার মূলে ছিল নায়কের প্রতি প্রেমাকুতির শুদ্ধতা, সে প্রাসাদপুরের পরিবেশে হয় গোবিন্দলালের ভোগ্য সম্পত্তির অধিকার সূত্রে পাওয়া নারীমাত্র। এভাবেই নারীর মূল্যায়নে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া স্বভাব সামন্ততন্ত্রের মূলে মাথা তোলে। 'হয়তো' গল্পের মহিম মানসিকতায় তার বিকার স্বভাবে একা, নিঃসঙ্গ প্রজন্মের অভিজ্ঞান।

স্বভাবে হাসিখুশিতে সচ্ছল মাধুরী ভিতরে অবচেতন মনে মাঝে মাঝে মানসিক বিকারগ্রস্ততাকে এড়াতে পারে না। পিসিমার জরা-আক্রান্ত বীভৎস রূপের পিছনে আছে হিংস্র অলংকারপ্রীতি— তারও বিকৃত স্বভাবের প্রচ্ছন্ন প্রতিবিম্বন। 'হয়তো' গল্পে এইভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পের অতীত কালের প্রেক্ষিতকে রহস্য, প্রতীক, বিকার, সম্পর্কের অবক্ষয়, অনিশ্চিত জীবন রহস্য, ভয়, শঙ্কা এসব মিশিয়ে মূল লক্ষ্যের শিল্প-পুষ্টি প্রকরণ-সৌন্দর্যে সার্থক করেছেন।

তিন

'হয়তো' গল্পের রাতের ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগ দিয়ে প্রেক্ষিত ও চরিত্রদের সহযোগে এমন এক রহস্যের মায়া এনেছেন গল্পকার, যা প্রধান চরিত্রদেরই ভিতরের গোপন স্বভাবকে বিশ্বাস্য ও বাস্তব করেছে। প্রধান চরিত্র মোট চারটি— মহিম, মাধুরী ও পিসিমা— এরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্তর্গত পরিবারের সদস্য, আর আছে বহিরাগত, মহিমের স্ত্রী হিসেবে নববধূ লাবণ্য। গল্পের মূল নায়ক-নায়িক মহিম ও লাবণ্য। এই দম্পতির সম্পর্কের রহস্যময়তাকে ব্যাখ্যা করেছে বা বুঝিয়ে দিয়েছে পরিবেশ ও মাধুরী এবং পিসিমা।

চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত মহিম, তার চিন্তাভাবনার অসংলগ্নতা, লাবণ্যকে নিয়ে বিকার, ভয়, ভাবনা ও ভালোবাসা, পাপবোধ— এই সমস্ত কিছু জড়িয়ে নিয়ে। গল্পে মহিমের জীবন-ভাবনার বিবর্তন আছে এবং তার তিন স্তর : ১. সুস্থ-স্বাভাবিক, ২. অসুস্থ-অস্বাভাবিক, ৩. জীবনমুখিন (জীবনপ্রেমী)। লাবণ্যকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার পর মহিমের একাধিক আচরণ তার সুস্থ ও স্বাভাবিক মনেরই পরিচায়ক। বিছানায় 'নিজের চিন্তাতেই তন্ময়' মহিম একসময়ে হঠাৎ স্ত্রীকে কঠিন বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে 'আদরে-চুম্বনে একেবারে অভিভূত' করে দেয়। মহিম লাবণ্যের কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা, স্বামীকে তার পছন্দ হয়েছে কিনা— এই সব স্বামীর দিক থেকে প্রথম খোঁজ নেওয়ার মধ্যে মনের স্বাভাবিকত্বের প্রতিষ্ঠা দেয়। কিন্তু এই স্বাভাবিক কথা অস্বাভাবিক রূপ নেয় একটু পরেই। মহিম উগ্রকণ্ঠে লাবণ্যের স্বামী পছন্দ নিয়ে কটাক্ষ, ছদ্ম-সন্দেহ প্রকাশ করে, আবার শান্ত হয়ে তাকে সারাজীবন ভালোবাসবে কিনা— এমন আর্ত জিজ্ঞাসাও সামনে রাখে।

মহিমের মধ্যে চলে সুস্থ-অসুস্থ মানসিকতার তীব্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব— সবই স্বকপোল কল্পিত। বেশি রাতে দেওয়াল বাতির উজ্জ্বল আলোয় মহিম বিছানায় অনুরাগহীন কোমলতাশূন্য তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুমন্ত স্ত্রীকে দেখে। স্ত্রীর সামনে সে বিষয়ে ধরা পড়ে গেলে সে কৌশলে এড়িয়ে যায়। এক ভোররাতে বিছানায় স্বামীর পাশে শুয়ে লাবণ্যর অভিজ্ঞতা হয় তার শাড়ির আঁচল মহিমের কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে বাঁধা। মহিমের সন্দেহ, তখনো রাত আছে এবং স্ত্রী এই রাতে হয়তো অন্যগামিনী! তাকে খুন করার কথাও প্রকাশ্যে বলে ফেলে মহিম। হাসির অভিনয় দিয়ে, তা কোনো বিশ্রী স্বপ্ন দেখার অজুহাত, জানায়। দূরে কাজে যাওয়ার জন্য মহিম বাড়ি ফিরতে না পারলে রাতে লাবণ্য একা শুতে ভয় পাবে কিনা ভালোবাসার সুরে জানতে চাইলে লাবণ্যর ইতস্তত করে 'না, ভয় আর কি?' এমন উত্তরে মহিম তীব্র ব্যঙ্গে স্ত্রীকে আঘাত করে সামলে নেয়। বাইরে গেলে মহলের পুরনো অব্যবহার্য ঘরে কৌশলে রেখে সারা দিনের জন্য শিকল টেনে দরজা বন্ধ করে চলে যায়। প্রায়ই দূরে যেতে হয় বলে মহিম সোজাসুজি সকালেই তাকে ঘরে রেখে চাবি দিয়ে যায়। এসবই তার চরিত্রের লক্ষণীয় অস্বাভাবিকতার, অসুস্থতার দিক।

গল্পের শেষে লেখক মহিমকে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে বাইরে দুর্যোগের রাতের শহরের পথে এনেছেন। সঙ্গে তার বাধ্য স্ত্রী লাবণ্য। ভাড়া করা গাড়োয়ানের গাড়ির মধ্যে মহিমের বলা প্রথম কথাতেই 'যেন একেবারে নতুন মানুষ'। লাবণ্যের কাছে নিজে থেকে

ক্ষমা চাওয়া, বাড়ির বিষাক্ত হাওয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন, আবার সহজ মানুষের মতো সংসার আরম্ভ করার বাসনা জানানো, সাতপুরুষের পাপ দেহ থেকে ধুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়ার বাসনা, লাবণ্যর ভালোবাসা, নিজের মুক্ত হওয়ার শপথ উচ্চারণ— এসবে মহিমের তীব্র সুস্থ জীবনার্তি, জীবনমুখিতা তার চরিত্রগত গভীর বোধের, মুক্তির তৃতীয় স্তরকে চিহ্নিত করে। গল্পে সেইভাবেই মহিমের অন্তর্লোক চিহ্নিত।

কিন্তু মহিম যে করুণতম ট্র্যাজেডির নায়ক! পৌরাণিক শিব সমুদ্রমন্থনের সময় সমস্ত উত্থিত গরল কণ্ঠে ধারণ করে হয় নীলকণ্ঠ। মহিম সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও জীবনব্যবস্থা থেকে মেয়েমানুষের পাপ, অপমান , লাঞ্ছনা, ঘৃণা সূত্র ধরে উঠে আসা বিষাক্ত পাপকে ধারণ করেছে রক্তে— যা বংশপরম্পরায় মুছে যাওয়ার বিষয় নয় আদৌ। যা জীবনের প্রাণবীজ, শক্তি সাধনার মূলাধার। তাই তার সমস্ত সুস্থ জীবনবাসনা— যা বাড়ি থেকে দুর্যোগের রাতে বেরিয়ে আকাশের নিচে মহিমের অপরাধী মনের কঠিন শপথের মতো শোনায়— তা নিষ্ফল হয়ে যায়। এটাই ট্র্যাজেডির নায়কের ওপর অনন্ত নিয়তির অমানুষিক অ-লৌকিক রাগ ও ঘৃণার অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি নেই বলেই প্রেমেন্দ্র মিত্র শেষের এই অসাধারণ চিত্রটি এঁকেছেন :

> 'মহিম বলিল, 'চলো, ওই পোল পার হয়ে যাব।' এবার লাবণ্য একটু ইতস্তত করিল। বলিল, 'কিন্তু ও পোল ভাঙা কিনা কে জানে, যদি পড়ে যাও।' 'তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে। পারবে না পড়তে?' আবার তাহার চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া উঠিল। গাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে লাবণ্যকে বুকের কাছে ধরিয়া যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, এতখানি পথ হাঁটিতে হাঁটিতে তাহা মহিমের মন হইতে কখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কি বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কি তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ?'

মহিমের মনের এবার দ্রুত পরিবর্তন। স্বামী-স্ত্রীর যৌথভাবে আত্মহননের রোমান্টিক ভাবপ্রবণতায় মহিম মৃত্যুর মধ্যেই অমর হওয়ার কথা ভাবে— সে মৃত্যু জীবনবিরোধী, বাস্তবতার বিপরীত এক পলায়নী মনোবৃত্তি যেন :

> 'তাহার চেয়ে এই মধুরতম মুহূর্তটিকেই চিরন্তন করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না কি? এই সন্দেহের দোলা হইতে চিরদিনের মত রক্ষা পাইয়া তাহার ক্লান্ত মন যে তাহা হইলে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে! ভালোবাসা, জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?'

গল্পের প্রথমে গল্পকার পতনোন্মুখ লাবণ্যকে বাঁচিয়ে মহিমের সঙ্গে পুল পার করে দিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর যে সম্ভাব্যতার (possibility) কথা শেষতম বাক্যে মেলে, তা-ই মহিমেব চরিত্র-ভাবনার পক্ষে সত্য : 'হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।' 'Probability ' দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত মহিমের নিয়তি

নির্দিষ্ট স্বভাবকেই আনুকূল্য করে। মহিম যে নিশ্চিত ট্র্যাজেডির নায়ক! স্বাভাবিক জীবন, অস্বাভাবিক জীবন তথা অসুস্থ জীবন থেকে মহিমের যে মানবিক সুস্থ উত্তরণ চিত্র মেলে দুর্যোগের রাতে ট্রেনে—গাড়োয়ানের গাড়িতে গল্পের শেষে তা জীবনের সৃষ্টিশক্তির (Creative energy) কাছে নায়কের জীবনের শক্তির (vital energy) অবধারিত বিনাশ। গল্প ও নায়ক চরিত্রের ন্যায়ে (logic of art) গল্পকারের ইঙ্গিত সঠিক।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে একটা শব্দ প্রায়শই ব্যবহৃত হয় 'Paranoia'। এর অর্থ বদ্ধমূল ভ্রান্তির কারণে যে অসুস্থতা — তা-ই। এই অসুস্থতার মূলে থাকে অস্বাভাবিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, দেখা দেয় সেই সঙ্গে ভ্রম-বাতুলতা। এইরকম রোগীদের বলা হয় — Paranoiac ভ্রম-বাতুলতার লক্ষণাক্রান্ত অসুস্থ মানুষ। (a faint trace of doubt, a shadow of doubt) — আরও ব্যাখ্যায় 'propensity to suspect, foul play, collusion etc.'। 'হয়তো' গল্পের নায়ক মহিমের মধ্যে এই বোধের symptom একাধিক পাঠক লক্ষ করতে পারেন। যে বংশের সন্তান মহিম, তার মধ্যে বংশের অনুবৃত্তিতে এমন দৌর্বল্য ও বিকার দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। মহিম সচেতন বলেই তার মধ্যে দেখা দেওয়া অপরাধবোধ থেকেই লাবণ্যের প্রতি সে psychological torture করেছে। তার ট্র্যাজেডির নায়কের উপযোগী দুই প্রবৃত্তির সংঘর্ষ তীব্র হয়েছে।

'হয়তো' গল্পে মাধুরী চরিত্র গল্পকারের এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর রচিত গল্পগুলির মধ্যে যে সব শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র উপহার দিয়েছেন, 'হয়তো'-র মাধুরী সেই তালিকার প্রথমেই স্থান পাওয়ার যোগ্য। বিয়ের দিন শ্বশুরালয়ে আসার পথে প্রথমেই লাবণ্যর— বলা যায় রহস্যময় অনুভূতির শিহরন আসে শরীরে মাধুরীর অভ্যর্থনার মাদকতায়। 'অন্ধকার পথ সুমধুর কলহাস্য মুখরিত', তার অপরূপ কণ্ঠ, লাবণ্যের সীমাহীন বিস্ময়ের মধ্যে লাবণ্যের অভিজ্ঞতা : 'নারীর দেহে এত রূপ সম্ভব, লাবণ্যেব কখনও জানিবার সুযোগ হয় নাই।'

এই মাধুরীর নির্দেশে পিসিমাকে প্রণামের পরোক্ষ কথায় মাধুরীর কৌতুকরসসিদ্ধ উচ্ছলতা যেন মাধুরীর আর এক রূপ। কিন্তু লাবণ্যের কাছে এ বাড়ির সুন্দরী মেয়ে স্বামীর থেকেও অনেক দুর্জ্ঞেয়। মাধুরী মহিমের বোনের মতো, কিন্তু বোন নয়। বিবাহের বয়স অনেকদিন অতিক্রান্ত। সব সময় সারা শরীর জুড়ে বহুমূল্য অলংকারে অলংকৃত হয়ে থাকে। লাবণ্যের কাছে তার আবির্ভাব একেবারেই হঠাৎ-হঠাৎ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্তর্গত এক রক্ষণশীল পরিবারের সুন্দরী মেয়ে মাধুরী। রক্ষণশীল পরিবারের কঠিন শাসনের মধ্যে যুবতী মেয়েরা কিছু বিকার নিয়ে জীবন কাটাত। এই বিকার স্বাভাবিক সুস্থ জীবন থেকে আলাদা, বাসনা ও যৌনতার অবদমনে তারা সহজ হয়েও উচ্ছল। মাধুরী লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, বলে, 'তোকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি ভাই। চ, তোকে নিয়ে কোথাও পালাই।' বলে, লাবণ্য হবে বর, মাধুরী কনে। লাবণ্যের ফুলশয্যার ঘরে মহিমের অবর্তমানে বলে, ' তোর ফুলশয্যা না আমার?' লাবণ্য হেসে বলে, 'তোমারই তো দেখছি!' 'শেষপর্যন্ত দেখতে পারবি তো?..... তবে বেরো ঘর

থেকে। দেখি তো বুকের জোর।' এই সমস্ত কথা, মাধুরীর সক্রিয়তা প্রবল হাসির, কৌতুকের মধ্যে লঘু রসাস্বাদ দিলেও ভিতরে সেই lesbionism-এর মতো বিকারের সূক্ষ্ম প্রকাশ কি থাকে না?

লাবণ্যর জীবনে মাধুরী এক মুক্ত আকাশের প্রতীক। মাধুরী লাবণ্যকে এ বাড়ি ছেড়ে পালাবার যুক্তি দেয়। বুঝিয়ে দেয়, কেন তার স্বামী মহিমের এমন দুর্বোধ্য রহস্যময আচরণ। মাধুরী গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে প্রকাশ করে। মাধুরী ফুলশয্যার সময় অবলীলায় গম্ভীর মহিমকে বলে :'তোমার বউ এখনও পর্যন্ত আস্তই আছে। আরেকটু হলেই ঠেলে ঘরের বার করে দিয়েছিলাম আর কি?' মাধুরীর এই রসিকতায় মহিমের কোনো কথা না বলার মতো নিরাসক্তি কি মাধুরী-মহিমের কোনো গোপন সম্পর্কভাবনার ইঙ্গিত দেয়? তা না হলে জড়োসড়ো বসে থাকা লাবণ্যকে ঘর ছাড়ার আগে বলে: 'নে তাড়াতাড়ি দখল কর ভাই; আমি যাই। মানুষের মন তো, মতিভ্রম হতে কতক্ষণ?' এর পরে সমস্তই চটকানো ফুলের পুঁটলিটা মহিমের উদ্দেশে বলা কথাটির এক গভীর তাৎপর্য প্রতীকী মানে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে : 'তোমার বউ-এর ফুলের গহনা নাও মহিদা, তাড়াতাড়িতে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।' এ কি মহিমের ফুলশয্যার প্রতি মাধুরীর কোনো অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ায় উপেক্ষা, উপহাস, অশ্রদ্ধা, অস্বীকার, বিদ্রূপ, নিষ্ফলত্বের ইঙ্গিত? এইখানেই মাধুরী এক রহস্যময়ী নারী।

মাধুরীর চমৎকার মানবিকতাবোধ আছে। মহিম স্ত্রীকে ঘবে বন্ধ করে রেখে গেলে, তালা দিয়ে সারাদিনের জন্য রেখে গেলে ত্রাতার ভূমিকায় থাকে মাধুবী। পিসিমার ঘরের গয়না সব অবলীলায় লাবণ্যকে সাজবার জন্য দিয়ে দেয়। তার নির্ভীকতা, মহিমের প্রতি আচরণে ঔদাসীন্য, নিয়োগী বাড়ির পূর্বপুরুষদের মেয়েমানুষদের অপমান অসম্মান করার জন্য তীব্র রাগ ও ঘৃণা— সবই তাকে অন্য মেয়ে করে তোলে। সে যে জমিদার বাড়ির লোভ-লালসার একদা-victim ছিল, তা ব্যঙ্গাত্মক স্বভাবে মেলে গল্পে। লেখক যখন গল্পের একেবারে শেযে মাধুরীকে গুরুত্ব দিয়ে এমন বাক্য লেখেন · 'কে জানে মাধুরী হয়তো সেই জনহীন এবং ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে এখনো প্রেতিনীর মতো ঘুরিয়া বেড়ায়।'— তখন ব্যঞ্জনায় এটাই সত্য হয়— মাধুরী জমিদার বাড়ির অপমানিত, অভিশপ্ত মেয়েদের এক প্রতীক প্রতিম চরিত্র। লেখকের এমন মন্তব্যে মনে হয়, আজকের মাধুরী পিসিমার শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস আজকের রূপের বীভৎসতার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠবেই সময়ের ফেরে। মাধুরী গল্পকারের একেবারে নিজেরই এক চিররহস্যময় মৌলিক সৃষ্টি। সে নানাভাবে যেমন কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে, তেমনি প্রধান নায়িকা লাবণ্যকেও নিখুঁত শিল্প-প্রকরণের ভারসাম্য দিয়েছে।

গল্পে পিসিমার ভূমিকা সংক্ষিপ্ত এবং প্রতীকী। তার কোনো সংলাপ গল্পে নেই। তার বাইরের রূপ— 'মূর্তিমতী জরা যেন', 'শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখ'। তার দেখা লাবণ্যের পক্ষে সহজে মেলে না। সারাদিন একটা ঘরে বসে খটখট কাজ করে। তার ঘরে কারোর প্রবেশ নিষেধ। হঠাৎ সাক্ষাতে লাবণ্যের প্রতিক্রিয়া : 'অকারণে লাবণ্যেব বুকের

ভিতর পর্যন্ত হিম হইয়া যায়।' গল্পে নারী চরিত্র সৃষ্টিতে গল্পকার তিনপুরুষকে এঁকেছেন— ১. লাবণ্য— নবযৌবনা, নববিবাহিতা রমণী, ২. মধ্যবয়সী অসাধারণ রূপসী মাধুরী— অবিবাহিতা, বিবাহের বয়স উত্তীর্ণা, ৩. পিসিমা— বৃদ্ধা, জরাগ্রস্ত, বীভৎস। এই পরিকল্পনা গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অবশ্যই অনুগ। লাবণ্য— সুস্থ নারী, মাধুরী— বংশানুক্রমে বাড়ির ব্যবহৃতা রমণীর প্রতীক যেন। এই দুজনের মধ্যে পিসিমা শেষ নারী— সাক্ষীও, যে বংশের ইতিহাসকে জানে, আর গহনা জমিয়ে রাখতে রাখতে নারীদের যে গহনার লোভ দেখিয়ে নিজেদের কুক্ষিগত করার প্রয়াস পুরুষদের, তারই প্রতীকপ্রতিম সাক্ষী! গল্পে পিসিমার নিজের ঘরে মাধুরী ও লাবণ্যকে দেখে, তার জমানো গয়নার ব্যবহার লক্ষ করে হিংস্র শ্বাপদের মতো দেখা ও বাক্যহীন স্বভাবে দরজা টেনে দেওয়ার মধ্যে প্রতীকত্বই শিল্প-লক্ষ্য। পিসিমার নীরব রাগ, শাসন আর সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর কলহাস্য এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে পিসিমাকে সরিয়ে নবযৌবনদৃপ্তার প্রতিষ্ঠার স্বভাবকে প্রতীকত্ব দেয়। এই ঘটনার পরেই মহিম কোনো কথা না বলে লাবণ্যকে তার পরের দিনই বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে চলে যায়। সে বোধ হয় লাবণ্যকে সেইসব গহনার পাপ-সম্পর্ক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর এক ভাবনা মহিমের। দ্বন্দ্বের এখানেও আর এক দিক মহিমের!

নববিবাহিতা লাবণ্য এক আকর্ষণীয় স্ত্রী চরিত্র— নিষ্পাপ, সরল, সহজ নারী-ব্যক্তিত্ব। তার শ্বশুরবাড়ির জীবন কাটে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভরে যেমন, তেমনি আনন্দেও। বিমাতার কাছে অবহেলা অবজ্ঞায় মানুষ লাবণ্য। এখানে ক্রমশ ভয় সরে গিয়ে সাহস ও সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করে। স্বামীকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তার ভালোবাসা অকৃত্রিম। কিছুটা যুক্তি দিয়ে রহস্যময় স্বামীকে বুঝতে চেষ্টা করে। তাই মাধুরীর কাছ থেকে জানতে পারে স্বামীর রহস্যময় নানা বিপরীত আচরণের কারণ। তার সবচেয়ে আপন মানুষ হল মাধুরী। সে যেন রহস্যময় সাতমহলা দালান ও বাড়ির পরিবেশে মুক্ত আকাশ মাধুরী। লাবণ্যর সারল্য, বিস্ময়, কৌতূহল, স্বামীকে মানিয়ে নেওয়ার সর্ববিধ প্রয়াস তার স্বভাব ও জীবনের অলংকার। গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে লাবণ্য যেন যাবতীয় বিরোধের বিপরীত শক্তি। তা পরোক্ষ, কিন্তু মহিমের সূত্রে আত্মধ্বংসী হলেও লাবণ্য স্বামীর ট্র্যাজেডির সঙ্গে গভীর নিবিড় যোগে নিজেই নিজের ট্র্যাজেডির উপাদান হয়ে উঠেছে। তার স্বামী-প্রেম, স্বামীর প্রতি বিশ্বাস তাকে ট্র্যাজেডির উপাদান করেছে ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়ে।

চার

'হয়তো' গল্পের শ্রেণীবিচারে এক নারী ও পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রশ্নে মনস্তাত্ত্বিক গল্প। মহিম, মাধুরী ও পিসিমার রহস্যময় মনস্তত্ত্বই এই গল্পের মূল বিষয়, গল্পের চরম মুহূর্ত প্রসঙ্গে আমরা আগেই জানিয়েছি, এর climax ঘটনাশ্রয়ী নয়, চরিত্রভাবনা অনুসারী। কেন্দ্রীয় বক্তব্য— যা মাধুরীর কথায় মেলে— তার সূত্র ধরে মহিমের চরিত্রের যাবতীয় বৈপরীত্য ও লাবণ্যকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার মধ্যে গল্পের বক্তব্যের ও চরিত্রের

একমুখিনতা স্পষ্ট হয়। গল্পের প্রথমে লেখক নিজে উত্তমপুরুষ কথক রূপে থেকে মূল গল্পের একটা সূচনা রচনা করেছেন। তা গল্পেরই শেষ অংশ— ভূমিকা রূপে প্রথমে চিত্রিত করা।

এই প্রসঙ্গে গল্পের আরম্ভ নিয়ে কোনো কোনো সমালোচকের বিভ্রান্তি নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরি। এক একালের সমালোচক বলেছেন, 'প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ে যখন প্রকৃতি এলোমেলো, সেই দুর্যোগের রাতে একটা কাঠের সাঁকো পার হচ্ছিলেন এক ব্যক্তি, ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষ করে— তার জবানীতেই এই উপকাহিনী!' এই মন্তব্যের মূল ভ্রান্তি হল— সমালোচক গোটা গল্পটিকেই বলেছেন 'উপকাহিনী'! সমগ্র গল্পটির ভূমিকা তো মূল গল্পেরই শেষ অংশ! গল্পটি পড়ার পর শেষে প্রথম অংশটি যুক্ত হবে! তা হলে মূল গল্পটি কি করে উপকাহিনী হয়? 'হয়তো' গল্পে কোথাও কোনো উপকাহিনী নেই! গল্পটিই উপকাহিনী— এই বিচার বিভ্রান্তিকর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পাশফেল' নামের একটা গল্পের প্রথমেই ছোট এক প্যারায় খবর দেন, গল্পের নায়ক নীরেন ভালভাবে আই.এ পাস করেও আত্মহত্যা করেছে। তার পরে গল্পটি বিস্তারিত লিখে প্রথম মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেন। এই যে গল্পের উপসংহারকে গল্পের প্রথমে বলে দিয়ে গল্প লেখার প্রয়াস— তা প্রকরণের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টিরই লক্ষণীয় দিক। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেইভাবেই শেষের কথা আগে বলে দিয়ে গল্পটি লেখেন। 'হয়তো' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র আগের অংশটি যেখানে শেষ করেন, তার পরেও গল্পের শেষে আরও কয়েকটি কথা বলেন, যা গল্পেরই উপসংহার। সেখানে উপকাহিনী কোনটি, কোথায়? 'হয়তো' গল্পের প্রকরণের অভিনবত্বই এর বড় শিল্পগুণ।

'হয়তো' গল্পে অনাবশ্যক কোনো বিস্তার নেই। গল্পে যে রীতিমতো বৃষ্টি-ঝড়ের দুর্যোগময় চিত্র আছে, তা গল্পের পরিবেশ-এর প্রয়োজনেই রচিত। তার সঙ্গে গল্পের প্রধান চার চরিত্রের কোনো যোগ নেই। চরিত্রের বাস্তবতাই এর রহস্যের উন্মোচন ঘটায়, দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ মহিমের স্ত্রীকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটানোর জন্যই সংক্ষেপে অঙ্কিত। আখ্যায়িকা বা বৃত্তান্তের প্রবণতা চরিত্রদের জন্য আনা হয়নি, হয়েছে মহিমের পক্ষে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং 'হয়তো' গল্পের রহস্য পরিবেশে নেই, আছে প্রধান তিনটি চরিত্রের— মহিম, মাধুরী ও পিসিমার চরিত্রকেন্দ্রে। এই লক্ষ্য থাকায় গল্পটি হয়েছে মেদবর্জিত ও বৈপরীত্যমূলক ভাব-ভাবনার সংঘর্ষে শিল্পরস-উপাদেয় অনবদ্য বিষয়।

'হয়তো' গল্পের বাস্তবতাই অন্বিষ্ট। আর সে বাস্তবতা যেহেতু মনের বাস্তবতা, বাইরের নয়, তাই মাধুরীর রহস্য, মহিমের রহস্য মনের ধর্মে গল্পের প্রকরণকে শিল্প-ধন্য মর্যাদা দিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা ব্যবহারে বড় গুণ— কি সাধু, কি চলিত বা কি কথ্য-চলিত— যে কোনো গদ্যেই লিখুন না কেন, কোথাও তা বর্ণহীন, বিস্বাদ হয় না। ফুলের পুঁটলির চটকানো ফুল, পিসিমার ঘরের গহনার বিশাল স্তূপ, মাধুরীর যাবতীয় চাঞ্চল্য ও কৌতুক— সবই উপমা রূপক ছাড়িয়ে হয়েছে প্রতীকী ভাষণ।

পাঁচ

গল্পের নাম 'হয়তো'। নামে এক ধরনের সম্ভাব্যতাকে লেখক ব্যঞ্জনাগর্ভ করেছেন। প্রথমেই মহিম লাবণ্যকে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছে পুল থেকে নদীতে। কিন্তু কেন? তা পাঠকদের জানা সম্ভব নয়, তাই এক 'হয়তো'কে সামনে রেখে গল্পটি বিস্তারিত হয়েছে। নাম এতে তাৎপর্য পায়।

দ্বিতীয় কথা হল, লেখক গল্পের কোনো বোনো জট ছাড়াতে গিয়ে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে দুলেছেন চিন্তর জগতে। যেমন রাতে বিছানায় যখন মহিম লাবণ্যকে খুন করে ফেলার কথা ভেবে পরে নিজেকে সামলায় মিথ্যে স্বপ্ন দেখার অজুহাত শুনিয়ে, এবং স্বপ্নেই কাউকে খুন করতে চাইছিল— এই যুক্তিতে— তখন লেখকের মন্তব্য : 'হয়তো কথাটি সত্য' কিন্তু লাবণ্যের মনে কেমন একটি সন্দেহ জাগতে থাকে। কাপড়ে গিঁট দেওয়ার রসিকতাটা 'কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে।' এই যে লেখকেব লাবণ্যকে বিশেষ সময়ের ১. পর্যবেক্ষণ, তাতে ধরা পড়ে দুটি দিক— লাবণ্যের ক্রমশ স্বামীকে বোঝার সূত্র ধরা, ২. মহিমের রসিকতায় মিথ্যাভাষণ ও গোপনতম অবচেতন মনের কাজটুকু সাধিত করার চাপা বাসনার দিক। এমন সম্ভাব্যতা সূচক কথা লাবণ্যকে স্বামীকে-বোঝার সহায়ক ভাবনার সূত্র ধরায়।

তৃতীয়ত, গল্পের একেবারে শেষে আগের শেষ হওয়া অংশের পর গল্পকার দুটি 'হয়তো' ব্যবহার করে গল্পের এমন নামের মূলে নিজস্ব যুক্তি রেখেছেন। লেখক গল্পের প্রথমে জানিয়েছিলেন তিনি অচেনা মহিম ও লাবণ্যকে স্ত্রীর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে পুল পার করে দিয়ে ফিরে এসেছেন। এখন গল্প শেষ করে তাদের চরিত্রের পরিণতির দিককে সম্ভাব্যতায় দেখাতে চাইছেন। এবার গল্পকাবেব নিজস্ব দর্শন ও চরিত্রন্যায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বা উপসংহার। দুটি বাক্য এখানে আলাদাভাবে লক্ষণীয় :

> ১. 'কে জানে মাধুরী হয়তো সেই জনহীন ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে এখনো প্রেতিনীর মতো ঘুরিয়া বেড়ায়।'
>
> ২. 'হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।'

এই দুটি বাক্যে যে 'Quest', তা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের শেষেও যামিনীর অনন্ত প্রতীক্ষায় 'অস্ত-যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে।' 'হয়তো' গল্পের মাধুরী, মহিম, লাবণ্যও এক সুদূর রোমান্টিক বিষয় হবে। গল্পকার 'হয়তো' শব্দ ব্যবহার করে মাধুরী ও মহিম, লাবণ্যর বিষয়ে লাবণ্যের মৃত্যুর কথা ভেবে সংশয় যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা রোমান্টিক সত্য, সংশয় মাত্র নয়। মাধুরী ও মহিম-লাবণ্যের চরিত্রন্যায় তা-ই প্রতিষ্ঠা দেয়। আসলে 'হয়তো' নাম অবশ্যই রীতিমতো ব্যঞ্জনাধর্মী, নামের প্রকরণে আকর্ষণীয় ও দ্বিধাকে জিইয়ে রাখার সমার্থক শব্দ-ভাষা। নাম তাই সার্থক।

৭.

কুয়াশায়

এক

গ্রন্থের প্রকাশকাল জানা যায়নি এমন একটি গল্পগ্রন্থের নাম প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিশীথ নগর'। তবে এটি 'মৃত্তিকা' নামের আর একটা গল্পগ্রন্থের (১৯৩৫) আগে প্রকাশিত। 'নিশীথ নগরী'র পর অন্য একটা গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়, তার পরের গ্রন্থ 'মৃত্তিকা'। আলোচ্য 'কুয়াশায়' গল্পটি নিশীথ নগরীব গল্পসূচির প্রথম রচনা। পরবর্তী গল্পগুলি হল যথাক্রমে সংসার সীমান্তে, পুনর্মিলন, রাত্রিব ছায়ায়, কেশবানন্দের তিরোধান, কল্পনায় ও গ্রন্থনামে চিহ্নিত গল্প। 'কুয়াশায়' গল্পটিতে চরিত্র ধরে গল্পের কাহিনী বা আখ্যান সম্পূর্ণত নয়, এর মধ্যে আখ্যান বেশ কিছুটা কর্তৃত্ব করেছে। গল্পটির আখ্যান অংশ কিছু ছোট ও বড় মাপের ঘটনার সমবায়ে সমৃদ্ধ। হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড় থেকে একাধিক গলি পিছনে রেখে আসতে হয় এক ছোট রেলিং-ঘেরা কাঠা তিনেক জমির কাছে। জমির চারপাশে পুরনো নোনা-ধবা ইটের একাধিক বাড়ি। রেলিং দেওয়া জমিতে ছিল ছেলেমেয়েদের খেলার জন্য লোহার রডের তৈরি দোলনা। সেই রডে ঘন কুয়াশায় ঢাকা সকালের রোদের মধ্যে স্থানীয় মানুষরা দেখে গলায় ওড়নার ফাঁস জড়িয়ে এক প্রায় পূর্ণযৌবনা বিধবাব ঝোলানো দেহ। বিধবার বেশ মলিন, গলায় একটি সোনার হার। মাথাভর্তি দীর্ঘ রুক্ষ চুল, চেহারায় ভদ্র পরিবারের ছাপ। বিকৃত মুখে অসীম ক্লান্তি ও অসহায় কাতরতার ছাপ। এই মৃত্যুর কোনো কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।

এই ছোট জমির গায়ে এক যুগ আগে ছিল চকমেলানো বিশাল বাড়ি। আজও সে বাড়ির বুড়ো দরওয়ান আছে কাজ না থাকলেও, আছে সরকারমশাই। এখনো প্রাচীন জমিদার বংশের উত্তরাধিকারীরা ছোট ছোট কুঠরির মধো বাস করে। কুঠরিগুলোর বাসিন্দাদের বেশ বড় মাপের রান্নাঘর আছে যেখানে আবাসিকদের দু'বেলা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে একান্নবর্তী স্বভাবে। এই একান্নবর্তী ব্যবস্থা সরকার মহাশয়ের অধীনেই ন্যস্ত। জমিদারি ব্যবস্থায় সবকারের কিছু আয়েরও ব্যবস্থা আছে।

এই বিধিব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কুয়াশায়' গল্পের আখ্যান ও চরিত্রদের মিলমিশের ছবি এঁকেছেন। এখানে আছে মোক্ষদা নামের এক মহিলা যার কাজ রান্নার জোগাড়ে যারা আছে তাদের তত্ত্বাবধান করা। রান্নার জোগাড়ের কাজে যারা আছে তাদের মধ্যে একজন সরমা— বিধবা এবং রূপে-গুণে তাকিয়ে দেখার মত যুবতী। আছে ক্ষ্যান্তপিসি। সরমা যে মৃত স্বামী ফটিকের বউ, ক্ষ্যান্ত আন্দাজ করে। সরমা তার কথা লজ্জা ও সংকোচে লুকোতে চায় যেন! বিধবা হবার পর বাবা-মা মারা গেলে ভাইদের কাছে থাকতে থাকতে একদিন ভাই এই শ্বশুরবাড়িতে রেখে যায়। সরমা এখানে এসে অন্তত দুঃখের কথা না ভেবে সহজেই দিন কাটিয়ে গেছে ক'বছর।

এর মধ্যেই সরমা মোক্ষদার কাছে মোক্ষদার ঘরে শোয়। আলাপ হয়েছে নলিনী বলে একটি শীর্ণকায়া মেয়ের সঙ্গে— যার বয়স প্রায় সরমার বেশি নয় বিশেষ। শীর্ণ মুখে

থাকে সব সময়েই বিরক্তি। তবু সরমার মনে হয় এমন উগ্র মেয়েটির কাঠিন্যের আড়ালে আছে গোপন স্নেহের রুদ্ধ ফল্গুধারা। নলিনীর সদা-বিরক্ত স্বভাবের মধ্যে সরমা নানাভাবে স্নেহ-সহানুভূতি পেয়েছে। এদের মধ্যেই বছরের পর বছর কেটে যাবার সময়সীমায় সরমার জীবনে আসে এক পরিবর্তনের সংকেত। সরমা ভীষণ লাজুক, ভদ্র, ভীতু স্বভাবের। তার জীবনে যে কোনোদিন বদল আসবে ভাবেইনি।

একদিন এলো। মোক্ষদার ঘরে তার এক ভাইপো আসতে থাকে। নাম নরেন। সে মোক্ষদার সবচেয়ে স্নেহধন্য। তার হাস্যকৌতুক, স্বতঃস্ফূর্ত রসিক স্বভাব, কথার চমক সরমার ক্রমশ লজ্জা ভাঙায়, তাকে গভীবে আকর্ষণ করে অতিসংগোপনে। হঠাৎ কোনোদিন স্বামীর স্বপ্নে দেখে স্বামীকে নয়, নরেনকেই। ভিতরে জড়োসড়ো হয় সরমা। ক্রমশ নরেন সরমার ঘনিষ্ঠ হয়। চিঠি হাতে দিতে না পেরে সরমার অলক্ষ্যে বিছানার তলায় রেখে যায়। সরমা জানত না, সে চিঠি পায়ওনি। শেষে নরেন নিজেই প্রস্তাব দেয় সরমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার। লজ্জা ভেঙে, আপনার সাহসে সরমা এক রাতে নরেনের সঙ্গে চলে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে রাতে কালো পোশাকে শরীর ঢেকে। গেটের দরজায় তালা। গেট খুলে দেয় নলিনীই— কারণ নলিনীই সরমাকে একদিন দেখে নরেনের বুকে আলিঙ্গনেব সুখের মধ্যে থাকতে।

অনেক দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত দুর্বার সাহসে বাড়ি ছেড়ে নির্দেশমতো অপেক্ষমাণ নরেনের গাড়িতে ওঠে। গাড়ির মধ্যেই সরমা হঠাৎ দেখে নরেনের পকেটে শিশুদের খেলনা। জানতে পারে নরেনের কথায়— তার গ্রামে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। নরেন জানত মোক্ষদা হয়তো এসব সরমাকে আগেই বলেছে। কিন্তু সরমা এসব কিছু জানতই না! নরেনের আর এক স্ত্রী আছে জেনে উন্মত্তের মতো প্রতিবাদী ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গাড়ি থামিয়ে নরেনের সঙ্গ ত্যাগ করে সে রাতেই, সেই সময়েই! নরেনের কাতর অনুরোধ, নিষেধ, তার ভুলের স্বীকৃতি স্পষ্ট করে জানালেও, তাকে কোনো কষ্ট দেবে না শপথ করলেও সরমা রাগে দুঃখে অভিমানে একা রাতের অন্ধকারে ফিরে আসতে তৎপর হয় কঠিন জিদে আগের আশ্রয়ে। শেষে নরেনও সরমাব সঙ্গে আর এগোনো উচিত নয় ভেবে সঙ্গ ত্যাগ করে হতাশায়। সরমা ধীরে ধীরে রাতের ছায়াপথে অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্লান্ত কাতর সরমা অর্ধোন্মত্ত অবস্থায় কলকাতার নির্জন পথে ঘুরে ঘুরে শেষে সেই ছোট রেলিং ঘেরা জমিটি আবিষ্কার করে আশ্রয় হিসেবে।

সরমার সামনে তখন ফেরার মতো সমস্ত দরজা বন্ধ। বিবর্ণ ঘাসের জমিতেই সরমার ব্যর্থ জীবনের আশ্রয় মেলে কুয়াশার যবনিকা-আস্তরণে!

'কুয়াশায়' গল্পের প্লটের বাঁধুনি সরমা চরিত্র ধরেই নিশ্ছিদ্র হয়েছে। গল্পের আখ্যানে প্রথম দিকে আছে গল্পের পটভূমির এক চিত্রাত্মক উপস্থাপনা। মূলত নায়িকা সরমার জীবন ও মনের সংগুপ্ত বিবরণ সেই প্রেক্ষিতেই ক্রমশ ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়। শুরুতে খবর আছে ছোট পার্কের বিবর্ণ ঘাসের ওপর ছোটদের খেলাব রডে ঝুলে থাকা এক বিধবা রমণীর আত্মহননের কথা। গল্পকার জানিয়েছেন :

'নামহীনা গোত্রহীনা পৃথিবীর অপরিচিতা হতভাগিনী নারীদের এক প্রতীকই বুঝি সেদিন নিশান্তের অন্ধকারে এই রেলিংঘেরা জমিটুকুর নির্জনতার উদ্বন্ধনে সকল জ্বালা জুড়িয়েছে ভাবতে পারতাম,—

কিন্তু তা সত্য নয়। এই শোচনীয় সমাপ্তির কোথাও একটা আরম্ভ ছিল।'

এরপরেই গল্পটি লেখার সময় থেকে বছর তেরো আগের পার্ক ঘিরে গড়ে-ওঠা চকমেলানো বিশাল বাড়ির অন্দরের সম্ভাব্য ছবির গুরুত্ব প্লটে যোগ করেছেন গল্পকার। নায়িকা সরমাকে নিয়ে আখ্যানের যে জটিলতা শুরুর প্রথম গিঁট, তা আরও শক্ত হয় গল্পের শেষ চিত্রের পরিণামী অনড় অসাড় রুদ্ধশ্বাস বিধুর রহস্যের কঠিন আবরণে :

'পৃথিবীতে সমস্ত দ্বার যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন এই বিবর্ণ ঘাসের জমিটুকু সরমাকে বহুকালের হারানো মেয়ের মত কোল দিয়ে তার ব্যর্থ জীবনের উপর কুয়াশার যবনিকা টেনে দিয়েছিল।

এইভাবে নায়িকা সরমার অন্তরঙ্গ জীবনকথায় গল্পের প্লট-প্রকরণ জটিল হয়েছে প্রধান চরিত্র সরমা ও তার প্রেমভিক্ষার্থী নরেনের যৌথ সম্পর্কের টানাপোড়েনের স্বভাব ধরেই। গল্পে সরমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেনবা নিয়তির মতো অদৃশ্য এক শক্তি পাঠকদের ধরে রাখে। তারপর একে একে একক নিঃসঙ্গ সরমা নরেনের সঙ্গে ভাগ্যনির্দেশের অমোঘ স্বভাবে জড়িয়ে যায়। সরমার কাছে যা ছিল জীবনকে নতুন করে গড়ার উপযোগী জীবনার্তি, তা-ই যেন আত্মহননের পরোক্ষ ফাঁস হয় বিবাহিত, সপুত্রক, সস্ত্রীক নরেনেব আকর্ষণের নিষ্ফলত্বে। গল্পকার রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি তৈরি করে, মূলত সরমাকেই নিপুণ পর্যবেক্ষণে, তার মনোলোকেব প্রার্থিত আলো দিয়ে নরেনকে আমাদের সামনে প্রকাশ্য করেন।

কাহিনী বা আখ্যান যেহেতু নায়িকাকেন্দ্রিক শিল্প-প্রকরণে নিখুঁত, তাই গল্পেব ট্র্যাজেডিসুলভ বোধের 'চরমক্ষণ' (climax) স্বতঃস্ফূর্ত হয় সরমা ধরেই— তার সরল, অবোধ, উৎসুক, নির্ভীক জীবনপ্রীতির সুতোর শক্ত-স্বভাব ধরেই। গল্পকার সেই 'মহামুহূর্ত' রচনা করেছেন সরমারই প্রীতিহীন জীবনস্বভাবকে প্রতীকী অসহায়তার সর্বাবয়ব গুরুত্ব দিয়ে। কেবল সরমার চরিত্র, মনের বিকাশ ধরে 'মহামুহূর্ত' হল এই জায়গায় : 'সরমা উত্তর দিলে না; কিন্তু নরেনের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টাও তো দেখা গেল না। নরেনের বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে সে কাঁদতে লাগল।' সরমার এই স্বতঃস্ফূর্ত acceptance চরিত্রের বিকাশের climax-কে ইঙ্গিতময় করে।

কিন্তু একটি চরিত্রই গোটা গল্পের 'মাহেন্দ্রক্ষণ' রচনা করে না, সমগ্র গল্প-প্রকরণ ধরেই climax অভূতপূর্ব চমৎকারিত্ব, গুরুত্ব ও সৌন্দর্যময় হয়। গভীর রাতে নরেনের সঙ্গে ছ্যাকরা গাড়িতে পাশে বসে যে আকস্মিক অভিজ্ঞতার সামনে আসে, সেখানেই গল্প-আখ্যান ও দুই চরিত্রের চরম মুহূর্ত :

'নরেন বলে, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে সরমা?'

'না, কিন্তু তোমার পকেটে কি আছে; গায়ে একটু যেন ফুটল, চলতি পথে

> রাস্তার একটা গ্যাসের আলো গাড়ীর ভেতর এসে পড়েছে। নরেন পকেট থেকে যা বাব করে তা দেখতে পেয়ে সরমা চমকে উঠে বলে, 'এ কি, এ খেলনা কেন?'
>
> নরেন একটু লজ্জিত হয়ে বলে, 'ছেলের জন্যে কাল কিনেছিলাম, পকেটেই রয়ে গেছে।'
>
> সরমা নিশ্বাস রোধ করে অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'কার জন্যে বললে? তোমার ছেলেমেয়ে আছে?'
>
> নরেন হেসে বললে, 'বা তা জানতে না?'
>
> সরমা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার স্ত্রী?'
>
> নরেন একটু হেসে বলে, 'সে তো দেশে।'
>
> সর্পদষ্টের মত গাড়ীর ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সরমা তীক্ষ্নস্বরে বলে, 'গাড়ী থামাও।' ...

এই বিস্ময়কর অভূতপূর্ব আকস্মিকতা ও তার অভিঘাতের মধ্যেই সরমার চরিত্র ও জীবন-ভাবনা এবং সমগ্র গল্পের রুদ্ধশ্বাস পরিণতির 'চরম মুহূর্ত' চমৎকার ঘোষিত হয়ে যায়।

এর পর সরমার চবিত্র ও আখ্যানের উপসংহার আসে এই চিত্রে : 'ধীরে ধীরে সরমা শীতের রাতের কুযাশায় অদৃশ্য হয়ে যায়।' পরবর্তী শেষ কয়েকটা বাক্য লেখকের নিজস্ব বর্ণনার চিত্রেই গল্পের প্রথমের খবর ধরে শমে ফিরে আসে : 'প্রভাত সূর্যের আলো সেদিন তখনও ওই জমিটুকুর ঘন ধোঁযাটে কুয়াশাকে তরল করবার সুযোগ পায়নি। সেই অস্পষ্ট দেখা গেছিল ছেলেদেব দোলনার ওপরকার দড়ি থেকে কণ্ঠে মলিন দোরকা জড়ান একটা নারীর মৃতদেহ ঝুলছে।. ... পরণে তার বিধবার মলিন বেশ।'

'কুয়াশায়' গল্পের প্লটগঠনে ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী আখ্যান সাজানোর কৌশল আছে। সে কৌশল শুরুতে পাঠকদের কৌতূহল, আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা জাগায়। শেষের সঙ্গে প্রথম দিকের ঘটনাব মধ্যে অন্তর্নিহিত সৌ-সাদৃশ্য রচনায রহস্য এক বিবর্ণ বিস্বাদ জীবন-ট্র্যাজেডির বাক্যহীন শোকের আচ্ছন্নতা আনে।

দুই

'কুয়াশায়' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য অবশ্যই নায়িকা চরিত্রকেন্দ্রিক। সে সরমা। গল্পের আঙ্গিকেব সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে 'হয়তো' গল্পের পরিকাঠামোর। 'হয়তো' গল্পের নায়িকাকে পুল থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দেওয়ার যে চিত্রব্যঞ্জনা, কোথায় যেন 'কুয়াশায়' গল্পের নায়িকা সরমার আত্মহননে মৃত্যুর পরিণামী দিকের সূক্ষ্ম সূত্রযোগ তাৎপর্য পায় শিল্পের। 'হয়তো' গল্পে আছে জীর্ণ বিধ্বস্ত এক সাত দালানের জমিদার বাড়ি ও তার পরিবেশ। 'কুয়াশায়' গল্পের প্রথমেই লেখক ক্রম-অবসিত জমিদারি প্রতাপের প্রেক্ষিতে দরিদ্র উত্তরাধিকারীদের বসবাস এবং তার মধ্যে থেকে সরমাকে নায়িকা স্বভাব দিয়ে প্রধান করা— আখ্যানের সূক্ষ্ম ছায়ার উৎস মিলে যায়।

'কুয়াশায়' সরমা মোক্ষদার ভাইপো নরেনের সঙ্গে প্রেমাবেগে যুক্ত হয়ে যায়। সরমা বিধবা, ভদ্র, লাজুক, স্বল্পবাক এবং যথেষ্ট সপ্রতিভ। তার সঙ্গে যোগ ঘটে নরেনের— যে বিবাহিত, একটি সন্তানের জনক, সচ্ছল, বাকপটু, গ্রামে তার স্ত্রী বর্তমান। সে সময়ে কলকাতা ছিল বাবু সমাজের আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসের 'আদ্যাপীঠ' প্রায়। তার মধ্যে থেকেই নরেন নিজেকে জড়ায় সরমার সঙ্গে। লেখক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে নরেনকে যথেষ্ট ভদ্র, দায়িত্ববান রুচিসম্পন্ন করে প্রকারান্তরে সরমাকে কি 'রক্ষিতা'র মর্যাদা দিতে চায়নি? অন্যদিকে বিধবা সরমা প্রেম চায়, চায় নিরঙ্কুশ নির্ভরতা। ভাগ্যের ফেরে সে বিয়ের শুরুতেই স্বামীকে হারায়। তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষারই পরিপূরক।নরেন সেখানে সেই আর্তি কি জুড়োতে পারে?

এই জিজ্ঞাসা থেকেই গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য উজ্জ্বল হতে থাকে স্বভাবী পাঠক মনে। কঠিন মুহূর্তে নরেন যখন সরমাকে এই বলে সামলাতে তৎপর হয় যুক্তির ভানে : 'আমাদের অতীত যেমনই কেন হোক না, এখনকার ভালবাসাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য নয় কি?'— তা কি সরমার জীবনাকাঙ্ক্ষার সুস্থতা ও তীব্রতার কাছে কোনো পরোক্ষ তাৎপর্যে ছল বা কৌশল অথবা স্তোকবাক্য হয় না? নরেন এক সময়ে সরমাকে বলে, 'আমি শপথ করে বলছি, আমার সঙ্গে গেলে, তোমার অসম্মান কখন আমি করব না।' এ কি গ্রামে বা দেশঘরে স্ত্রী-সন্তানকে রেখে এক তথাকথিত প্রেমিক পুরুষের পিতৃতান্ত্রিকতার দাবি ও দায়িত্বে নিজেকে প্রভু করার বাসনা নয়?

সুতরাং 'কুয়াশায়' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য— পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তথা সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরমার প্রতিবাদী ভূমিকার স্বরূপ ভাবনা। একদিকে সুস্থ জীবন ও নিজস্ব সংসার বাসনা আর একদিকে তার নবজাগ্রত প্রেমিক সত্তার শীলিত রূপ— দু'য়ের ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যাওয়ায়— সরমারও জীবনবিশ্বাসের মাটি গুঁড়িয়ে যায়। আত্মহননে তার মৃত্যু স্বাভাবিক পরিণতি। সুতরাং গল্পের মূল লক্ষ্য আখ্যান, ঘটনা ও চরিত্রন্যায়ে গল্পে যথাযথ শিল্পরূপ পেয়েছে।

তিন

'কুয়াশায়' গল্পের বড় সম্পদ হল এর চরিত্র। অন্তত সরমা ও নরেন তো নিশ্চয়ই, পাশাপাশি ছোটখাটো দুই চরিত্র নলিনী ও মোক্ষদা তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসামান্য মানবিকতা নিয়ে সক্রিয় থেকেছে যেমন, নায়ক নরেন ও নায়িকা সরমা তাদের পারস্পরিক বিবর্তনে তেমনি সঠিক শিল্প-দায়িত্ব পালন করেছে। নলিনীর শীর্ণ চেহারা, মুখও সব সময়ে যেন প্রসন্নতাহীন বিরক্তি মাখানো। স্বভাবে কথায় উগ্র কাঠিন্য। অথচ স্বভাবের গভীরে মানবিক স্নেহরস স্বতোৎসারিত থাকে। সরমাকে এই একান্নবর্তীসুলভ পরিবারগুলিতে থাকতে থাকতে অসম্ভব ভালবাসে। সরমার প্রথম রাতে শোয়ার অব্যবস্থায় নলিনীর ভূমিকা, নরেনের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার রাতে নলিনীর গেটের দরজা গোপনে খুলে দেওয়া এবং শেষে নিজেরই একটি সোনার হার দেওয়া,

নরেনের আলিঙ্গনে সরমার থাকার দৃশ্য দেখেও কাউকে কিছু না বলা— এসবই সরমার জীবনে বাড়তি লাভ। তেমনি মোক্ষদারও ভূমিকা সরমার জীবনে শিল্প গতির অনুগ। মোক্ষদাই মানবিক বোধে সৌজন্যে সরমাকে ওর ঘরেই থাকার ও শোওয়ার ব্যবস্থা করে। বড় কথা, ভাইপো নরেনের সঙ্গে সরমার যোগ তো মোক্ষদার তৎপরতাতেই! মোক্ষদার দিক থেকে সরমার নিরন্তর প্রশংসা নরেনের সরমার প্রতি দুর্বলতার প্রাথমিক উৎস।

সরমা 'কুয়াশায়' গল্পের নায়িকা, গল্পকারের আঁকা এক অনবদ্য চরিত্র। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার একসময় কপালকুণ্ডলাকে সখেদে বলেছিল, 'মৃন্ময়ি! তুমি তো কোন রূপ দেখিয়া ভোল নাই?' যে রূপ সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার ভয়ঙ্কর ক্ষমতা রাখে, কপালকুণ্ডলার মধ্যে তা ছিল, আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আঁকা সরমার মধ্যেও। তেরো বছরে বিধবা হয়ে এখন সরমা যুবতী। তার লজ্জা, ভীতু সারল্য, ভদ্রতা, সপ্রতিভতা, নিষ্পাপ বোধ-বুদ্ধি, স্বল্পবাক অস্তিত্ব, স্বল্প-ভাষিতা, আত্ম-সংবৃত মন— সরমার সৌন্দর্যের 'স্বরূপ'। সরমার 'রূপ' তো লক্ষ্মীমন্ত! এই সরমাই নরেনকে কঠিন নীরব অদৃশ্য স্বভাবে আকর্ষণ করে। নরেনের সূক্ষ্ম হিউমার করার দক্ষতা ক্রমশ সরমার প্রিয়তায় প্রকৃতিগত সংকোচ সরায়। মোক্ষদা নরেনকে একসময়ে বলে : 'অমন লক্ষ্মীপিতিমের মত মেয়ের এমন কপাল হয়! পোড়ামুখো বিধেতার মাথায় ঝাড়ু।' এই সমস্ত কথা যেমন নরেনকে নিঃশব্দে ঠেলে দেয় সরমার দিকে, তেমনি সরমাও যেন আত্ম-স্থ গোপন আবেগে ভরে তোলে তার কাঙাল মন।

কিন্তু সরমা বিবাহিত, এক পুত্রের পিতা, স্ত্রী বর্তমান—নরেনের এসব খবরে স্তম্ভিত হয়ে যায়। নবেনেব প্রতি সরমার ভালোবাসা নিছক ফ্যাশন নয়, বৃহত্তর প্রেম-জীবনের পক্ষে জরুরী। ১. তার ভালোবাসা পূর্ণ জীবনের পক্ষেই, ২. স্বতন্ত্র সংসার গঠনের স্বার্থে, ৩. এক মুক্ত জীবনের আর্তিতে! সে আর কারোর সংসার ভাঙতে চায়নি, সে রক্ষিতা হতে চায়নি। নরেন যখন সরমাকে হঠাৎ আলিঙ্গনে ধরে বলে : 'এ বাড়ি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর আশ্রয় নেই।'— তখন 'সরমা উত্তর দিলে না।' তবু বুঝে যায়, নরেন তার এক নির্ভরতা হতে পারে। নরেনের 'আশ্রয়' শব্দের প্রয়োগে যে 'রক্ষিতা' হওয়ার বাসনা থাকে, নরেন বিবাহিত এটা জানার আগে তার ধারণায় আদৌ ধরা পড়েনি।

সরমার মত মেয়ে প্রেম চায়, কিন্তু অমল নির্ভরতাও চায় নিরঙ্কুশ স্বভাবে। সেই কঠিন বাসনায় ধাক্কা লাগতেই সরমার অন্য ব্যক্তিত্ব। সে নরেনের কাছে বেঁচে থাকার রসদ পেত, কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিতে প্রেমের সব আবর্জনা ফেলে সে মৃত্যুর মধ্যে যেতেও ইতস্তত করেনি। সরমার জীবন ট্র্যাজেডির রন্ধ্রপথ রচিত হয় সুস্থ তীব্র জীবনার্তির নিষ্ফলত্বে— নরেনের চরম আঘাতে। সরমার ট্র্যাজেডির মূলে সে গৌণ, মুখ্য তার পরিপার্শ্ব— যার সবটাই নরেনের ভূমিকায় এক নিশ্চিত নিয়তির নির্দেশ। নরেনের কাছে শেষ বিদায়ের সময় সরমার ধারণা ছিল, সে পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়ে বাঁচবে : 'দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে আর এস না। একলা গেলে এখনও আমার আশ্রয় মিলতে পারে। আমার সে পথও নষ্ট করো না।' এই বাঁচার বাসনা তো পরিপার্শ্বের অনড় স্বভাবে

নষ্ট হয়ে যায়! গভীর রাতে বাড়ির গেটে তখন তালা। অন্যদিকে কলঙ্কের ভয় : 'এ বাড়িতে এসে আর কিছু না শিখুক কলঙ্ককে সে ভয় করতে শিখেছে।' এইসব বাহির ও অন্তরের চিন্তা-ভাবনায় ও ঘটনায় সরমার আত্মহনন নিঃস্ব, শূন্য মনের বিশাল আকাশকে সামনে আনে। ভাগ্যদোষে স্বামী হারায় সরমা বিয়ের পরই। শেষে যে সে নিজের জীবনকে হারায়, তার মূলে ভাগ্য (Fate) নয়, তার মূলে আছে নবেন চরিত্রের অনুচিত বাসনা, নরেন চরিত্রের (Character) অভিঘাত আর পারিপার্শ্বিক (Circumstances) -এর সমাপতন (coincidence) । সরমার পরিণতি তাই স্বভাবী পাঠকমনে অশ্রুর বেদনাকে রক্তিম করে।

সরমার পাশে নরেন হৃদয়যন্ত্রণার দীর্ণ স্বভাবে, জীবন-বিনাশের নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যে তুলনায় কিছুটা খাটো। সরমার যন্ত্রণা আলম্বন (Principal), নরেনের যন্ত্রণা সরমার ক্ষেত্রে উদ্দীপন (Auxilliary)। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে ব্রাহ্মণ রোদের মতো প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের তেজমূর্তি সরমার। সেই চিত্রের ব্যঞ্জনা অসামান্য :

> 'সর্পদষ্টের মত গাড়ীর ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সরমা তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'গাড়ী থামাও।'
>
> নরেন অবাক হয়ে বলে, 'কেন, পাগল হলে নাকি?'
>
> 'থামাও বলছি, শিগগীর।' সরমার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকরকম তীক্ষ্ণ। নরেন তাকে জড়িয়ে ধরে বসাবার চেষ্টা করে বলে, 'কি পাগলামি করছ! তুমি কি এসব জানতে না নাকি?'
>
> সরমা উন্মত্তের মত তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলে, 'জানতাম মানে?'
>
> 'বাঃ, পিসিমার কাছে শোন নি?'
>
> 'পিসিমার সঙ্গে এই কি আমার আলোচনাব বিষয়। তুমি গাড়ী থামাও।'
>
> নরেন কাতর স্বরে বলে, 'কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝছ সরমা। আমি তোমায় ফাঁকি দিতে চাইনি। আমার সব কথা শোন আগে।'
>
> সরমা রাগে দুঃখে অভিমানে কেঁদে ফেলে বলে, 'না গো না। তোমার পায়ে পড়ি; আমি বাড়ী ফিরে যাব, গাড়ী থামাও।'
>
> সরমাকে শান্ত করবার সমস্ত চেষ্টা নরেনের নিষ্ফল হয়ে যায়। সরমার উত্তেজনা দেখে শেষ পর্যন্ত সে একটু ভীতই হয়ে পড়ে— সরমা যেন প্রকৃতিস্থ নয়। একান্ত অনিচ্ছায় সে গাড়ী থামাতে আদেশ দেয়।'

এই বিস্তারিত চিত্রেই একদিকে আছে সরমার অপমানের কালি নিয়ে কঠিন জিদ। অন্যদিকে নরেনের এক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো পরাজয়ের সূত্রপাত। ক্রমশ নরেন ম্লান হতে থাকে। এই সবের অভিজ্ঞান হল নরেনের কয়েকটি সংলাপ—

১. 'আমি তোমায় ফাঁকি দিতে চাইনি।'

২. 'তোমাকে সত্যিই আমি ঠকাতে চাইনি।'

৩. 'এখন জেনেও এত বিচলিত হবার কি আছে সরমা, বুঝতে পারছি না।'

৪. 'ভালোবাসাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য নয় কি?'

সরমাকে নরেন আদৌ চিনতে পারেনি বলেই এমন সব সংলাপ হয় চরিত্রের বিকাশের পথে নিষ্ফল। এক হতাশ নায়ক— ট্র্যাজেডির— উপযুক্ত করুণকণ্ঠ, বিষাদঘন আত্মপ্রলাপ: 'তোমার এ বিপদের জন্যে আমি দায়ী সরমা। আমায় তুমি অন্ততঃ তার প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসরটুকু দাও।' প্রায়শ্চিত্তের যে কোনো উপায়ই নরেন ভেবে থাক না কেন, তা যে সরমার পক্ষে কোনোক্রমেই গ্রহণীয় নয়, সরমার ব্যক্তিত্বের ও প্রেম-সত্তার তীব্রতা তা বোঝায়। নরেন যখন শেষ কথা বলে : 'আমি শপথ করে বলছি, আমার সঙ্গে গেলে, তোমার অসম্মান কখন আমি করব না!'— তখন এক পরাজিত নায়কের চরম নৈরাশ্যের, ব্যর্থতার, রক্তক্ষরণের অনুগ হাহাকার চিত্রের ভিতর থেকে বেজে ওঠে। বাঞ্ছিত প্রাপ্তির সব হারাবার বেদনা নিয়েই 'নরেন আর এগুতে পারে না' সরমার সঙ্গে।

বস্তুত অল্প বয়স থেকেই পোড়-খাওয়া ভাঙা মানুষ সরমার চরিত্রে আছে জীবনযুদ্ধের মধ্যেকার নিহিত সত্তার ত্রিমাত্রিকতা :

১. অকাল বৈধব্য— যাতে তেরো বছর বয়সী সরমার কোনও দায়িত্ব নেই, থাকার কথাও নয়।

২. বাবা-মা মারা যাবার পর নিজের ভাইয়েব পক্ষ থেকে তাকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরত দিয়ে যাওয়া।

৩. নরেনের সরমাকে নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা!

এই 'থ্রি ডাইমেনশন'-এর ঊর্ধ্বেই সরমার কঠিন ব্যক্তিত্বের দিক, শুদ্ধ পরিশীলিত আত্মার প্রকাশের দিক। তার প্রকাশ আছে নরেনেব গাড়ির মধ্যে নরেনের সামনেই। নরেনের ভুল বোঝা আছে সরমাকে, কিন্তু তার ভালোবাসার যাবতীয প্রয়াস ভিত্তিহীন, মাটির ওপর নতুন গাছ জন্ম দেওয়ার মতো শক্তির অসারতা। প্রথম সরমাকে আলিঙ্গন কবার সময় নরেন বলে :'এখানকার এই নিরর্থক ব্যর্থ জীবন থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই আমি চিঠিতে লিখেছিলাম, সরমা।' এই স্বীকৃতি কি বোঝায় যে নরেন সে চিঠিতে তার আর একটি সংসারের কথা বলেছিল? নরেনের বিবাহ, বধূ ও পুত্রসন্তান থাকা সম্বন্ধে নরেন ওর পিসিমা মোক্ষদার ওপর দায়িত্বের কথা বলেছিল সরমাকে জানানোর। মোক্ষদার কথায় তো তার প্রমাণ বা ইঙ্গিত ছিল না!

অর্থাৎ সব মিলিয়ে সরমার জীবনে যে ট্র্যাজেডির গভীর ছায়া নামে, তার মূল কারণ নরেনই। 'হঠাৎ নরেন তাকে জীবনের গভীরতম দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি করে দাঁড় করিয়ে দেয়। সরমা নিজের প্রতি সমবেদনা করতে শেখে। মরুভূমি হঠাৎ মেঘের চোখ দিয়ে নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায়।' এমন নিজের ব্যর্থতা থেকে বাঁচার জন্যই সরমা নরেনের সঙ্গে রাতে বেরিয়ে আসে। কিন্তু নরেনের যাবতীয় প্রয়াস তার পায়ের তলা থেকে কঠিন মাটিকে সরিয়ে নেয়। তাই নরেনই সরমার চরমতম দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। সরমা সেই

দুর্ভাগ্যের দোসর হয়েছে আপন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার শক্তিতে। গল্পকারের হাতে সরমার ট্র্যাজেডির অনবদ্য শিল্পরূপ।

চার

'কুয়াশায়' গল্পটি সমাজ-সমস্যা, নারী-পুরুষের মধ্যগত মনস্তত্ত্বসম্মত গভীর প্রশ্নাত্মক বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত গল্প। বিধবা সরমার সে সময়ের অবৈধ প্রেম-ভাবনা, সামাজিক কলঙ্কের ভয়, নরেন-সরমার তীব্রতম মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া, সরমার আত্মহনন— এসবই গল্পের আখ্যান ধরে প্রধান দুই চরিত্রের রহস্যময় জীবনস্বভাবের সংকটকে ঘনীভূত করেছে। নায়িকাব আত্মিক সংকটে দীপিত চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য তার দ্বন্দ্বের ক্রমাভিব্যক্তি এবং সর্বশেষ আত্মহনন। বিবাহিত নরেনের প্রতি প্রেমের অনৈতিকতা সমাজের নীতিবৈষম্যের মূলে আঙুল তোলে।

গল্পের 'মহামুহূর্ত' সম্পর্কে আমরা সরমার মানস বিকাশের বৈশিষ্ট্য ধরে যেমন চরিত্রের দিক থেকে একটা দিক দেখিয়েছি আগে, তেমনি সমগ্র গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনার কথা ভেবে রাতে ছ্যাকরা-গাড়িব মধ্যে সরমা-নরেনের দ্বান্দ্বিক স্বভাব উন্মোচনের ক্ষণটিকেও, চরমক্ষণের অনুগ ক্ষেত্রটিও চিহ্নিত করেছি। কিন্তু এই climax — দু'দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১. ছোট ঘটনা— নরেনের পকেটে তার সন্তানের জন্য খেলনা দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরমার তীব্রতা প্রতিক্রিয়া-চিত্র ধরে, ২. সরমা ও নরেনের মধ্যে উভয়ের ভিতরের ভাবনার দ্বান্দ্বিক ভূমিকা অবলম্বনে। অবশ্যই ক্লাইম্যাক্সের তীব্রতা ও গভীরতা গল্পের ও প্রধান দুই চরিত্রের বিষয় ধরে অসাধারণ শিল্পের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। ক্লাইম্যাক্স রুদ্ধশ্বাস পরিণতির আসন্ন দিককে তীব্র আলোর বিন্দুতে রহস্যময় করেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পের মধ্যেই বলেছেন তাঁর পাঠকদের রীতিমতো সচেতন করে : 'কল্যাণের হোক, অকল্যাণের হোক, দুটি নরনারীকে এই অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে পাঠিয়েই গল্প সমাপ্ত করা যেত; কিন্তু তা হবার নয়। সরমার জীবনকে একেবারে ভেস্তে দেবার জন্য তখনও ভাগ্যদেবতার হাতে এমন অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর চাল ছিল, কে জানত!' এমন স্বয়ং-লেখকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে যে কৈফিয়ত, তাতে বস্তুত সরমার কথাই লেখক গুরুত্ব দিয়ে বলতে যে উৎসুক, বোঝা যায়। প্রসঙ্গত এই কথায় আসে, গল্পের ভাবের যে একমুখিতা, তা সরমা-নির্ভরতায় সার্থকতা পেয়েছে। কোথাও চরিত্র-ভাব অতিবিস্তারে ক্লান্তিকর করেনি পাঠকদের। আখ্যানের বা গল্প বলার প্রবণতা না থাকায় গল্পের মেদ কম এবং তারই ফলে ভাবের তির্যকতা চরিত্রের চাঁছা-ছোলা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয়েছে।

গল্পের প্রকাশভঙ্গি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখক ব্যক্তিত্বকে মান্য করেই বিশিষ্ট। বিবরণ আছে গল্পের গোড়ায়, কিন্তু আদৌ তা বিবৃতিসর্বস্ব নয়। গল্পের একটি নির্দিষ্ট পটভূমি না থাকলে সরমা ও নরেন কাছাকাছি আসতে পারত না, নলিনী ও মোক্ষদা— দুই

চরিত্রেব মানবিক সক্রিয়তা তো প্রেক্ষিত ধরেই উজ্জ্বল হয়, হয় সরমা চরিত্রের দীপ্ত ব্যক্তি-স্বভাবের যথার্থ প্রকাশক। আগাগোড়া চলতি গদ্যে গল্পটি লেখা। সংলাপে মেলে কথ্য চলিত ভাষা— যা মোক্ষদা, ক্ষ্যান্ত পিসি, নলিনী— এদের স্বভাবের পক্ষে বাস্তবতা-অনুমোদিত। প্রকৃতি ও চরিত্রের রূপ এবং স্বভাব বর্ণনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র অসাধারণ উপমা, সৌন্দর্যসিদ্ধ অলংকৃত ভাষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন :

১. 'অত্যন্ত কুটিল গোলকধাঁধায় ঘোরাবার পর'
২. 'দেখলে কেমন মায়া হয়— ওর ঘাসগুলির বিবর্ণতায় যেন পৃথিবীর দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরগুলির বিচ্ছেদের কান্না......'
৩. 'সমস্ত সংসার যাত্রাটা বিরাট চাকার মত অমোঘভাবে চলে, অবশ্য অত্যন্ত পুরনো ভাঙা তৈলবিহীন কলের চাকার মত .....'
৪.'আর একটা মেয়ে যে চোদ্দপো অধর্ম করে ...'
৫. 'আদর ফুরোবার আগে একটা নোটিশ দিও'
৬. 'কি ভাগ্যি দ্রৌপদীব ননদ ছিল না, নইলে মহাভারতে তাঁর রান্নাব সুখ্যাতি আর ব্যাসদেবকে লিখতে হত না।'
৭. 'সরমা নিজের প্রতি সমবেদনা করতে শেখে। মরুভূমি হঠাৎ মেঘের চোখ দিয়ে নিজের ব্যর্থতা দেখতে পায়।'
৮. 'এই বিবর্ণ ঘাসের জমিটুকু সরমাকে বহুকালের হারানো মেঘের মত কোল দিয়ে তার ব্যর্থ জীবনের উপর কুয়াশার যবনিকা টেনে দিয়েছিল।'

এই সমস্ত বর্ণময় বর্ণনার উপমা, সাদৃশ্য-ভাবনা, বিরোধমূলকতা, ভাবের বৈষম্যসুলভ চিত্রাত্মকতা 'কুয়াশায়' গল্পের বক্তব্য ও চবিত্রবিকাশের শিল্পধর্মের বিস্ময়কর আনুকূল্য কবে।

পাঁচ

'কুয়াশায়'— এমন গল্পনামে অবশ্যই ব্যঞ্জনার বিস্তারিত স্বভাব নিহিত। শুধু 'কুয়াশা' থাকলে নামের ভিতর অর্থে হয়তো মূল বক্তব্যের একটা আভিধানিক তাৎপর্য ব্যক্ত হত। কিন্তু গল্পের নাম 'কুয়াশায়', অর্থাৎ কোনো এক কুয়াশাময় পরিবেশে কি হয়েছিল, কি সেখানে ঘটনার চিহ্ন আছে, এমন এক রহস্য পাঠকদের আকর্ষণ করেই। সুতরাং কুয়াশাময় পরিবেশে রহস্য-গল্পের বিষয়ে ও পরিণতিতে ব্যঞ্জিত হয় বলেই এমন নাম প্রাথমিক অর্থে মান্য।

দ্বিতীয়ত, কুয়াশায় ঢাকা পরিবেশ ও আংশিক পটভূমির চিত্রে লেখকের নিজস্ব কিছু ভাবনা কাজ করে— যা গল্পের মূল থীমে ওতপ্রোত। লেখক বলেছেন : 'এই সামান্য রেলিং ঘেরা তিন কাঠা পরিমাণ জমিটির ভেতরে দশ বছর আগে শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিল.........'। এই পরিবেশ যে লেখক যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করেছেন বিষয় ধরে, তাতেই গল্পনাম গুরুত্ব পায়। ঘন কুয়াশার মধ্যেই অস্পষ্ট দেখা গেছিল ছেলেমেয়েদের দোলনার ওপরকার দণ্ড থেকে কণ্ঠে মলিন দোরকা জড়ান

একটি নারীর মৃতদেহ ঝুলছে। এই চিত্র গল্পের শেষে গল্পকার চরিত্র ও কথার তাৎপর্য দিয়ে আবার এঁকেছেন। কাহিনীবৃত্তে এমন চক্রবৎ মিল গল্পে থাকায় নাম সার্থক।

তৃতীয়ত, নায়িকা সরমার পরিণতিতে গল্পকার তাকে কলকাতার ঘন শীতের মধ্যে নিঃসঙ্গ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। কুয়াশার রহস্য আর নায়িকার জীবনরহস্য এক সূত্রে বাঁধা। 'ধীরে ধীরে সরমা শীতের রাতের কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে যায়।' নায়িকার স্বভাবের সঙ্গে তাৎক্ষণিকতায় রাতের কুয়াশার রহস্যময়তাকে এক করেছেন—তা হল ব্যর্থ জীবনের উপর কুয়াশার যবনিকা টানার সমতুল। গল্পের নায়িকা চরিত্র ও কুয়াশার স্বভাব— সর্বাবয়ব রহস্য-বিস্ময় গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনায় একাকার। 'কুয়াশায়' গল্পের নামে তাই গভীর ব্যঞ্জনা গল্পেরই মূল্যবান অলংকার।

৮.

মহানগর

এক

'মহানগর' গল্পের মূল পটভূমি, এর নামেই যার পরিচয়, কলকাতার মতো এক ব্যস্ত কোলাহলমুখর শহর। কিন্তু গল্পের আরম্ভ শহর নয়, শহরের এক প্রত্যন্তের সাগর থেকে বড় নদী হয়ে বয়ে-আসা, নগরের মুখে ঢুকে পড়া ছোট নদীগুলির একটি শাখা। নদী ক্রমশ অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ধীর হলে ভেসে আসে নড়ালের পোলের তলায় ফুটন্ত কদম গাছের নিশান-দেওয়া পুরনো পোনাঘাটে। তারপর মানুষজন নিয়ে আসা নৌকা একে একে পাড় ধরে সমস্ত ভাঙাঘাট, ন্যাড়া শিবের মন্দির, ইটখোলা, চালের আড়ত, কেঠোপটি ও স্তূপ-করা টালি, ইট আর সুরকি-বালির গোলা পিছনে ফেলে থামে পোনাঘাটে— যেখানে মাছের চারাপোনা বিক্রি হয় কুনকে হিসেবে। আষাঢ় মাসের ভোরবেলা বৃষ্টিহীন মেঘে ঢাকা আকাশের পরিবেশে ঘাটে আসার পর নৌকার ব্যবসায়ী মানুষরা দিনের আলোয় একসময়ে জেগে উঠে ব্যস্ত হয় পোনা বিক্রি নিয়ে।

পোনা বিক্রির ছ'খানা নৌকা এসেছে মুকুন্দর। ব্যবসার দেনাপাওনা মিটিয়ে মুকুন্দরা ফিরে যাবে কাল। মুকুন্দ এবার নোঙর করে পাড়ে। এখন নদীমুখের দুদিক ঢেকে গেছে জাহাজ আর স্টিমারে। গাধাবোট আর বড় বড় কারখানার সব জেটি চোখে পড়ে। এখান থেকেই গল্পের শুরু। গল্পের মূল আখ্যান মুকুন্দর নয়, তার শিশুপুত্র একমাত্র রতনের। রতন বাবাকে বুঝিয়ে নানা জিদ ধরে বাবার শাসন মেনে বাবার সঙ্গেই নৌকায় এসেছে। তার উদ্দেশ্য— নগর দেখার বা নৌকায় চাপার আনন্দ ভোগ নয়, শহর দেখা নয়. তার তীব্র বাসনা তার মায়ের মতো স্নেহময়ী দিদির খোঁজ করা! বাবা বা অন্য কেউ তা জানেই না।। তার দিদি, মায়ের মৃত্যুর পর, ছোটবেলা থেকে স্নেহ দিয়ে তাকে বড় করেছে। সেই দিদি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে একদিন কোথায় চলে যায়! কেউ তা জানে না। কেউ তার কথা রতনকে বলেও না। জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে বলে, ধমক দেয়। তবু সে শুনেছে কলকাতার উল্টোডিঙির ওখানে দিদি থাকে। এ ছাড়া আর কিছুই শোনেনি।

দিদির সঙ্গে দেখা করতেই বাবা ও অন্যান্যদের পোনা বিক্রির ভয়ঙ্কর ব্যস্ততার মধ্যে এক সময়ে লুকিয়ে শহরের রাস্তায় চলে আসে রতন। রাস্তাঘাট কিছুই জানে না। তাই রাস্তা ভুল করলে একজন তাকে উল্টোডিঙির ঠিকমতো পথ বলে দেয়। তা অনেক দূরের পথ। রতন সেই পথ হাঁটার শ্রম, কষ্ট, ক্লান্তি, কাতরতা নিয়েই একসময়ে উল্টোডিঙিতে এসে পৌঁছয় দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। তার গভীর বিশ্বাস, একবার দিদিকে খুঁজে বার করতে পারলে, দিদির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দিদি ওর সঙ্গে ঠিক ফিরে আসবে। ক্লান্ত, শুকনো মুখ, কাতর রতন অনেক পথ ঘুরে এসে দাঁড়ায় খোলায়-ছাওয়া এক মেটে বাড়ির দরজায়। রতন সেখানে একটা মেয়েকে দেখে দিদি-র ভ্রমে 'দিদি' বলে ডাকতেই মেয়েটি তাকে নিয়ে আসে চপলার কাছে। চপলা সামনে এলে রতনেরই যেন কষ্ট হয়! দিদি কত বদলে গেছে! ওকে দেখে চপলাও প্রথমে বিস্ময়ে নিস্পন্দ! শেষে চপলা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

শিশু রতন একা এসেছে— চপলা অবাক। চপলার ঘরে এত সব দামী জিনিস দেখে রতন থমকে যায়। দিদিকে বাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলে। এত জিনিসপত্তর দিদিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় সঙ্গে নেবে— এমন যুক্তি দেয়। তার দিদির যে যাবার উপায় নেই, জানায় চপলা। ম্লান হতোদ্যম রতন শেষমেশ জানায় দিদি না গেলে সে এখানেই দিদির সঙ্গে থেকে যাবে। কারণ দিদির যে ফিরে যাওয়া বারণ। বাবার রাগ, বাড়িতে দিদির নাম উচ্চারণে নিষেধ— এসবে বিশ্বাস জন্মে। সারা বিকেল ভাই-বোনের গল্পের পর, বাবার রতনকে নিয়ে চিন্তাভাবনার কথা ভেবে শঙ্কিত চপলা ওকে চার টাকা দেয় এত দূরের পথ ট্রামে বা বাসে নড়ালের পুলে যাওয়ার জন্য, কিছু খাবার জন্য। চপলার দু'চোখে জল। রতনের তীব্র অভিমান, দিদি যাবে না, আবার ওকে এখানে থাকতেও দেবে না— এতেই সে চলে যায়। কিন্তু আবার একটু গিয়ে ফিরে আসে। চপলা তখনো দরজায় দাঁড়িয়ে স্থির। রতনের শেষ কথা : 'বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাবো দিদি! কারুর কথা শুনব না।' এই শপথটুকুই যে রতনের একমাত্র সত্য! নতুন এক শক্তিতে বেদনাহীন ক্লান্তিহীন রতন গলির মোড়ে আড়াল হয়ে যায়। মহানগরের সন্ধেয় মেশে বিস্মৃতির ঘন ছায়া।

'মহানগর' গল্পের এই মূল আখ্যান অংশ সামান্য, কিন্তু তার উপস্থাপনায় আছে বিস্ময়কর প্যানোরামা! তা গ্রাম থেকে নগর এবং নগরসূত্রে তার অবক্ষয়িত রূপ ও ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির ঔজ্জ্বল্য— দুই মেরুই অভাবনীয় গুরুত্ব পেয়েছে। আর এটাই যথার্থ প্রেক্ষিতের ব্যঞ্জনা, লক্ষ্য, রতনের কাহিনী সেখানে উদ্দীপন বিভাব। মূল কাহিনীর শুরু অনেক পরে— বাবা মুকুন্দ দাস ও পুত্র রতনের প্রসঙ্গ স্পষ্টত আসার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু যে গল্পের বিষয়, তা তো প্রেক্ষিতের অনেক বেশি! তাকে ধরেই রতনের অবোধ শৈশবের গোপন বাসনার রহস্যময় উন্মোচন, বিস্তার, সিদ্ধান্ত।

গল্পের শুরুতেই গল্পকার পরিণত বুদ্ধির পাঠকদের ডাক দিয়েছেন রতনের গভীরভাবে ভাঙা মনের স্বরূপ ধরিয়ে দিতে। 'আমার সঙ্গে চলো মহানগর' পরিণতির নিশ্চয়তায় পুনরুক্তিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এঁকেছেন স্বভাবে : 'আমার সঙ্গে এসো

মহানগরের পথে, যে পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধাবার মতো, যে পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।' মহানগরের পথের বৈশিষ্ট্য— তা-ই তো রতনকে কালো মলিন নৈরাশ্যের বর্ণে অভিজ্ঞতার সামনে আনবে। এই প্রত্যয়ে স্থির থেকেই কাহিনীর শুরুতে তাঁর বিশ্বাস : 'এ মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত— ভয়াবহ, বিস্ময়কর সঙ্গীত।' আবার যেন প্রতীকী স্বভাবে একা রতন নয়, তার সঙ্গে সহযাত্রী হওয়ার জন্যই গল্পকার সকল সচেতন বুদ্ধিজীবীদের ডাক দিয়েছেন লেখকের সঙ্গী হতে। রতন অবোধ শিশু, তার মন ঢেকে আছে মায়ের মতো নিজের দিদির স্নেহরসের তীব্র বাসনায়। সেই সূত্রে নগরদর্শন করে চিরকালের পাঠকরা রতনের অসহায়তা ও নগরের বিযাক্ত রূপ উপলব্ধি করুক, তাই চান লেখক।

গল্পকার আখ্যানের বিস্তৃত উপস্থাপনা-মুখে নিপাট অকপট : 'আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি—' এমন গল্প বলার মধ্যেও প্লটনিহিত আখ্যানের বিস্ময়কর অথচ সফল রীতিবৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। সূক্ষ্ম স্তরে স্তরে রতনের কাহিনীকে আমাদের কাছে স্বাদ্য করেছেন। প্রথমে বাবার শাসন মেনেও রতন শহরে আসার জন্য ব্যাকুল। শুধু শহর দেখার জন্যেই কি এই ব্যকুলতা! গল্পকারের বলার রহস্য! 'আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।' বড় নদী থেকে নৌকাকে পুরনো জীর্ণ শহরতলির পরিবেশে দেখে রতনের এক আশা জাগে। কেন এই আশা? এর পরেই গল্পকারের কৈফিয়ত: 'আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।' নড়ালের পোল চোখে পড়লে রতন উত্তেজনায় উদগ্রীব হয়, কৌতূহলী হয়, কিন্তু তা শহর দেখার কৌতূহল তো নয়! গল্পকার থেমে গিয়ে লিখছেন : 'কিন্তু সে কথা এখন থাক।' ঠিক এইভাবে থেমে থেমে গল্পকার নতুন শিল্পরীতিতে রতন চরিত্র আঁকতে গিয়ে নিজে গল্পের মধ্যে রহস্য রচনা করেছেন। এইভাবে গল্পের আখ্যান ও চরিত্রগত শিল্প-প্রকরণে গল্পকার রীতির চমৎকারিত্ব এনেছেন। নগরের পথে দিদির সন্ধানে উল্টোডিঙির পথ জানতে চেয়ে এক পথচারীর সঠিক নির্দেশদানের পর ভয়ে এড়িয়ে যায় রতন। এর পরেই গল্পকারের প্রস্তাব : 'এবার তা হলে বলি।' 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'হয়তো', 'কুয়াশায়' ইত্যাদিতে নিজ নিজ রীতিবৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে প্লটনিহিত আখ্যানের চমৎকারিত্ব আনেন সেখানেই তাঁর গল্প বলার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য।

দিদি ও রতনের শেষ সাক্ষাৎদৃশ্য, সংলাপ-বিনিময় বাইরের মাপে সামান্য এবং বিষাদময় গাঢ় ঘন রসে জমাট, সংক্ষিপ্ত ও সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনার অনুগ। রতনের কাহিনী শুরু গল্পের প্রায় মধ্য অংশ থেকে। প্লটের জটিল কেন্দ্র তৈরি হয় শেষে। আখ্যান ও প্লটের মিলমিশে গল্পের ক্লাইম্যাক্স :'বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।' এই প্রস্তাবের যে নিষ্ফলত্ব ও অশরীরী কান্নার বিশ্বরূপী অসহায়তা, সেখানেই চরমমুহূর্ত ব্যঞ্জনা পায়। গল্পকারের নিজের কথায় অবধারিত নিয়তিনির্দিষ্ট উপসংহার : 'মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।' এই কঠিন বিস্মৃতির একমাত্র 'victim' হল মহানাগরিক অবক্ষয়িত সম্পর্কের অভিজ্ঞান—চপলা-রতনের মানব্যের দিক।

দুই

গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে আছে কলকাতার মতো এক মহানগরের স্বভাবেই, রতন-দিদির সম্পর্কচিত্রের নৈরাশ্য ও নিষ্ফলত্ব! এক অসীম অনিশ্চয়তা সেই বক্তব্যেরই উজ্জ্বল উদাহরণ হল দুই ভাইবোনের সম্পর্ক। গল্পের শেষে রতনের দিদি চপলার বাসস্থান, তার পরিবেশ—সব দেখে অবোধ শিশু। গল্পকারের বর্ণনা :

> '........... ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন করে সাজানো হতে পারে, এত সুন্দর জিনিস সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন করে জানবে? এত জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রথম, 'এসব তোমার দিদি?'

চপলা নগরের শিকার। চপলা আজ দেহজীবা রমণী। যার জন্যে সে নগরে, বা যার সুদ-আসল আদায় করার জন্যে তাকে এখানে এনেছে, — সবই ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় গড়ে-ওঠা সমাজের লোভনীয় পুরস্কার! প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন:

> 'মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদেব আশা এখানে কখনো-কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব কিছুকে দাগী কবে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু ফিরিয়ে'।

পূর্ণ পাওয়ায় আনন্দ থাকে, কিন্তু চপলার এমন পাওয়ায় বিষ স্বতোৎসারিত।

গল্পের গোড়ায় গল্পকার জানিয়েছেন—'আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো মহানগব,' আবার সেই মহানগরই 'মিনারে-মন্দিরচূড়ায় আর অভ্রভেদী প্রাসাদশিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।' এই যে একই মহানগরের স্বভাবে দুই মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্য— তার পথই রতনের পথ, তার মধ্যেই তার দিদির ভাগ্যদেবতার নিষ্ঠুর নির্দেশ। চপলার শহরের দিবা-রাত্রির কলুষ অন্ধকারের ভোগের জীবন লাভ আর লোকের অঙ্ক মেলাতে চায়, মেলে না, আবার নতুন উদ্যমে একের পর এক অঙ্কের অনিঃশেষ হিসেব চলে। রতনের দিদি নগরের ক্ষতের আবিষ্কার, লোভের চূড়ায় লাভের নিখুঁত প্রসাধন। তা মানবতাবিরোধী, মানবতাবিনাশী।

রতনের যে সরল নিষ্পাপ মনের দিদির প্রতি গভীরতম আর্তির স্নেহ-শ্বাসে দিদিকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস, তাকে পিছন থেকে যেন আততায়ীর মতো ছুরিকাঘাত করে যৌথভাবে অবক্ষয়িত ও সম্পদশালী মহানগর। মিনার-মন্দির-এর প্রার্থনার মত মানবাত্মার যে স্বরূপ তা হয়ে ওঠে গৌণ। 'মহানগর' গল্পে কেন্দ্রীয় বক্তব্যে প্লটের কেন্দ্রে যে জটিলতার জট, তা রহস্যময় হয়েছে সভ্যতার অধিকার মহানগরের মতো বিকারগ্রস্ত রূপাবয়বে। সভ্যতা বিকাশে অগ্রগতি দেখায়— প্রমাণ মহানগরের সমৃদ্ধি, আবার তার ভিতকে মলিন, পচনশীল, বিনাশী করে। রতন ও তার দিদির সম্পর্ক তা-ই দেখায়। এই গল্পেরই চলচ্চিত্র রূপে পরিচালক তপন সিংহ তাঁর 'দিদি' নামের creation-এ দেখিয়েছেন এক গ্রামের বধূর শহরে স্বার্থান্বেষী পুরুষদের কাছে নিশ্চিত আত্মসমর্পণের

ছবি। ছোটগল্পে যা ছিল তির্যক বক্র শিল্পের সূক্ষ্মতায়, চলচ্চিত্রে তা হয় শহুরে সভ্যতার অমোঘ বিষজর্জর আত্মসমর্পণের বাধ্যবাধকতার। অর্থ তো ভোগ্যপণ্যের আদান-প্রদানের উপযুক্ত মাধ্যম। রতনের বেশ্যা দিদি তারই শিকার। 'মহানগর' গল্পে তাই রতন ও রতনের দিদির মহত্তম মানবিক সম্পর্কের মধ্যে নগরজীবনের অভিশাপ হয় সভ্যতারই সৃষ্ট দালালদের বিপুল লাভের কলঙ্কিত মূলধন।

তিন

'মহানগর' গল্পে রতনই একক নায়ক, তারই আর্ত বাসনার বেগে এসেছে তার দিদি চপলা। আসলে এই গল্পে, আগেও বলেছি, রতন হল দৃষ্টান্ত, সভ্যতার Product। কলকাতার মতো মহানগরে মাৎস্যন্যায়ে চকিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও তার বিষাক্ত স্বভাবই গল্পকারের চিত্র আঁকার প্রয়াস ও প্রসঙ্গ। গল্পে মুকুন্দদাসের সূত্রে শিশুপুত্র রতন পাঠকদের সামনে আসার পর থেকে মহানগরের অন্তঃশীল বিষম স্বভাবের সে হয় Pointing finger । তার দিক থেকে দিদিকে আপ্রাণ অন্বেষণের মন ও তৎপরতা তাকে গল্পের শেষে জটিল করে। প্রথম দিকে রতন এক খণ্ডচিত্রের বিষয়, শেষে তাব সর্বাবয়ব পূর্ণতা— সেখানে সে দিদিকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের মধ্যেও বয়সের অনভিজ্ঞতায় ভেঙে পড়ে।

দিদির খদ্দেরদের দেওয়া উপহারে ও অর্থে সাজানো মাটির টালি দেওয়া ঘর রতনকে বিস্ময়ে স্থির করে। দিদিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। রতনের ভিতরে তখন আশার উজ্জ্বল আলো। কিন্তু চপলার কথা: 'আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!' এমন মন্তব্যে রতনের গোপন প্রতিক্রিয়া : 'মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিবে যায়।' দিদির এই কথার সঙ্গে বাবার দিদির ওপর রাগ, নাম করতেও নিষেধ— এসবের সঙ্গে মিলিয়ে দিদিকে পরোক্ষে সমর্থন করে। রতন সিদ্ধান্ত নেয় : 'আমিও তা হলে যাব না দিদি!'....... দিদির কাছে থাকার বাসনায় তার সারল্য চপলাকে মলিন বিষণ্ণ করে। দীর্ঘসময় দিদির স্নেহ পেয়ে রতন বাবাকে তাচ্ছিল্য করার মানসিকতায় চলে আসে। শেষে চপলা যখন জানায়, তার কাছে রতনের থাকতে নেই— রতনের মনের গভীরে তৈরি হয় এক স্ব-রচিত দ্বিধাগ্রস্ত মন, অভিমানে সে দিদিকে ছাড়াই চলে যেতে প্রস্তুত! তা ছাড়া দিদি তাকে নিজে থেকেই থাকতে না বলায় বিমূঢ় হয়ে যায়। চলে গিয়েও শেষে ফিরে আসে আবার রতন। তার শপথ— ১. বড় হয়ে দিদিকে সে নিয়ে যাবে, ২. এ ব্যাপারে সে কারোর বাধা মানবে না।

এই দু'রকমের মানসিকতায় রতনের শিশুমনের সারল্য, দিদির প্রতি বড় মাপের মানবিক ভালোবাসাই কঠিন মাত্রা পায়, কিন্তু স্বভাবের ভিতরে থাকে চরম নিষ্ফলত্ব, অসহায়তা, পরাজয়— যা আজ রতন বোঝে না— যা মহানগরেরই প্রদত্ত নিয়তির মতো। দিদি-ভাই-এর এই ছোট চিত্রের মূলে আছে মহানগরের চরম অভিশাপ, এখানেই মহানগর গল্পের প্রেক্ষিতের সঙ্গে চরিত্রের যোগ— কি চপলা, কি রতন— দুজনের

সূত্রেই। তাই গল্পের চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে আলম্বন হল নগর, উদ্দীপন হল নিখুঁত দৃষ্টান্তের স্বভাবে রতন। রতন যেন সুস্থ জীবনের এক প্রতীকপ্রতিম অস্তিত্ব। চপলার অসহায়তা মহানগরের বিশাল দেওয়ালে লেখা সভ্যতার ললাটের লিখনেরই প্রতীকী ভাষা চিত্র।

চার

'মহানগর' গল্প বিষয়ের দিক থেকে সমাজ সমস্যামূলক গল্পের শ্রেণীতে পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নগর-সভ্যতা ও তার বিচ্যুতির কথা ধরে দার্শনিক ভাবনাও গল্পের অভ্যন্তরে অন্তঃশীল। গল্পের 'চরমমুহূর্ত' চপলার 'আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই' এমন উক্তিতে মেলে। কিছু একেবারে পরিণামী ব্যঞ্জনা গল্পকারের নিজস্ব ব্যবহৃত বাক্যে বেজে ওঠে— সমস্ত কিছু যেখানে মহানগর মানুষকে গাঢ় বিস্মৃতির অন্ধকারে এনে নিয়তির নির্দেশের মতো ভুলিয়ে দেয়। গল্পে ঘটনা নেই বললেই চলে। একটা বিশেষ ভাবকেই— যা মহানগরের স্বভাবনির্ভর— গল্পকার গল্পে রূপ দিতে চেয়েছেন। তার তীব্রতা এবং গভীরতা আমাদের বোধের জগতে চমৎকারিত্ব আনে। বক্তব্যের একমুখিনতা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যাতে শরীরে বাড়ন্ত মেদের মত অনাবশ্যক অতি-বিস্তার নেই। আখ্যায়িকার প্রবণতা গল্পের প্লটকে অযথা ঢিলেঢালা করেনি, হওয়ার সুযোগ দেয়নি। মনে হতে পারে গোড়ায় প্রকাশভঙ্গিতে বিবৃতিমূলকতা আছে, তা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, যে একজন একালের সমালোচক 'দীর্ঘ উপক্রমণিকা, দীর্ঘতর বর্ণনার শঙ্খিল পথ'-এর কথা গল্পে মান্য করে বলেছেন, তা ঠিক নয়। 'উপক্রমণিকা' (?) যাকে বলা হয়েছে, তা গল্পেরই মূল অংশ—যা রতনের—তার দিদির অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়, যা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মহানগর ও সভ্যতা ভাবনার দর্শন তৈরি করে। দীর্ঘতর বর্ণনা বর্ণনামাত্র নয়, তা লেখকের সংক্ষিপ্ত সংযত লক্ষ্যবস্তুই! একথাও ঠিক নয় যে 'গোটা গল্পকে..... বালকের (রতনের) চোখ দিয়ে দেখা এবং দেখানো হয়েছে;'! আদৌ তা নয়। পাঠকদের সঙ্গে নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই পাঠকদের দেখিয়েছেন! রতন-দিদির আখ্যান অংশটুকু তাঁর বক্তব্যের দৃষ্টান্ত-দলিল মাত্র। সামগ্রিক গল্পরূপ বিচারে ইঙ্গিতধর্ম গল্পের অলংকারই। গল্পের ভাষায় একাধিক উপমা মনোরম। কদমফুল, ভাবনার বৈপরীত্য ও বৈষম্য-অলংকরণের যথাযথ উপমান। ভাষায় আবেগ ও বুদ্ধির মিশ্রণে গল্পটি মননধর্মী। শেষে রতনের মনের ওঠা-নামার দিকগুলি আনন্দ-রসগ্রাহী। সে আনন্দ শুদ্ধ শিল্পেরই অনুগ।

পাঁচ

গল্পের নাম 'মহানগর' এবং এই এক মহানগরের বুকেই গল্পের সামগ্রিক প্রসঙ্গ ও লক্ষ্য স্থির-নির্দিষ্ট আছে বলেই প্রাথমিক অর্থে নাম সার্থক। প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পের শুরুতেই তত্ত্বের দিক থেকে মহানগরের বৈশিষ্ট্য বৈপরীত্যে বিস্তারিত করেছেন। আর তা লেখকের লক্ষ্য হওয়ায় গল্পের চরিত্রের সঙ্গেও ওতপ্রোত থেকেছে ভিতরের অর্থে, তাই নাম শিল্প-তাৎপর্যে গ্রাহ্য।

দ্বিতীয়ত, মূল গল্পের দুটি চরিত্র শিশু রতন ও দিদি চপলা দুজনেই justification of character-এ মহানগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। শহরে ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি আছে, আছে ঔদ্ধত্য, জৌলুস। তার পাশে মেলে হতদরিদ্রের নিষ্করুণ ছবিও। চপলা এই দ্বিতীয় ভাগের বাসিন্দা। রতনের যে দিদির অনুসন্ধান, তা শহরের বুকেই শুরু ও শেষ। সুতরাং চরিত্রের প্রেক্ষিতের শিল্প-ন্যায়ে মহানগর নাম বৃহত্তর শিল্প-মর্যাদা পায়।

তৃতীয়ত, শহরের যে জীবন ধারণ ও যাপন, সেখানে বিকৃতভাবে লাভ, লোভ, নারীভোগ ও নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার— এমন সব বিষাক্ত বাসনার আধিপত্য ও নির্দেশ সুযোগসন্ধানী মানুষদের মধ্যেই বেশি। এসবই উপনিবেশবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বেশি। নগরকেন্দ্রিক জীবনে একদিকে থাকে অবক্ষয়, আর এক দিকে থাকে ঔদ্ধত্য— বিলাসের, আরামের। রতনের দিদি চপলা এই দ্বিতীয় মানসিকতার অব্যর্থ শিকার। তার জন্যই সে তার ভাইয়ের সঙ্গে মানবিক মহাবন্ধন থেকে অনন্বয়ে বিনষ্ঠ, নষ্ট দাম্পত্যে একক জীবন নিয়ে পণ্যের হিসেবে মহানগরীর অবক্ষয়ে (decadence) স্থায়ী অভ্যস্ত। এইভাবেই চপলা তার অবোধ শিশু ভাই রতনের থেকে নির্জন দ্বীপের ব্যবধানে গভীর শূন্যতায় আক্রান্ত হয়। রতনের কাছে সে মূক হয়ে ওঠে অসহায়তায়। নগর-জীবনের অভিশাপই গল্পের সত্য— এই ন্যায়ে (logic) নাম 'মহানগর' সার্থক।

৯.

সাগর সঙ্গম

এক

'সাগর সঙ্গম' গল্প আলোচনার ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে', 'মহানগর', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'-র মতো গল্পগুলি প্রসঙ্গত মনে পড়ে। যথাক্রমে রজনী, চপলা, বেগুন— এরা জাতে এক— ভদ্রসমাজের কাছে একেবারে অচ্ছুৎ— গণিকা শ্রেণীর; 'সাগর সঙ্গম' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়নি গণিকা কন্যা বাতাসি, তবু সে উদ্দীপন বিভাব হয়েছে ভদ্রসমাজের ব্রাহ্মণ বংশের বিধবা নিষ্ঠাবতী দাক্ষায়ণীর মতো কেন্দ্রীয় চরিত্রটির। এ গল্পে গণিকা নয়, ভদ্রশ্রেণীর আচার-সর্বস্ব, ধর্মভীরুতায় সীমিত ব্যক্তিত্বের রমণীর মধ্যে সব সংস্কার বর্জন করে মানবতার বড় দিক মাতৃত্বের আলোয় উন্মুক্ত তারকাখচিত আকাশ রূপ নিয়েছে। প্রখ্যাত কথাকার-প্রাবন্ধিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সাগর সঙ্গম' গল্পটির প্রসঙ্গ টেনে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের ভাবগত এক ঐক্যকেই একমাত্র সম্পর্কসূত্রে মেনেছেন। তাঁর যুক্তি : 'অনধিকার প্রবেশে রবীন্দ্রনাথ সূত্রাকারে লোকধর্মের ওপর মানবধর্মের যে প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত করেছেন— তাকে অবলম্বন করেও প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বতন্ত্রতর মহিমক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের মধ্যে মাতৃত্বের কোমল স্পর্শ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন।' এই বিচারে আমরা একমত।

'সাগর সঙ্গম' গল্পের আখ্যান বিস্তারিতভাবেই পাঠকমন আকর্ষণ করে। গল্পরসে আখ্যান অবশ্যই আকর্ষক। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বালবিধবা দাক্ষায়ণী— এক সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বড় বউ। চলেছেন নৌকায় সাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নানে পবিত্র হতে। সেই নৌকাতেই, যা আগে চিন্তায় ছিল না, — একদল গণিকাও যাত্রী। দাক্ষায়ণী একজন যথার্থ নিষ্ঠাবতী, অননুকরণীয় ধর্মপ্রাণা, কঠিন সংস্কারাচ্ছন্ন। নৌকায় অচ্ছুৎ গণিকারা সহযাত্রী হওয়ায় দাক্ষায়ণী ক্ষুব্ধ এবং তাদের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে যেতে অসহায় বোধ করেন। ইতিমধ্যে গণিকাদের একটি আট বছরের ছোট ফুটফুটে সুশ্রী চঞ্চল মেয়ে ছই-এর ঘরে বসা দাক্ষায়ণী ও অন্যান্য ভদ্র শ্রেণীর মহিলা যাত্রীদের অস্থির তটস্থ করে তোলে। তার পাকা পাকা কথা, বলার ভঙ্গি ও ভাষার অকালপক্কতা যাত্রীদের প্রবল ঘৃণার উদ্রেক করে। মেয়েটির নাম বাতাসি। বাতাসিকে যাওয়ার জায়গা না দিলে যখন সে গায়ের ওপর দিয়েই বিকৃত ভঙ্গিতে যাবার কথা বলে, দাক্ষায়ণী অগ্নিমূর্তি হয়ে প্রথম শাসায় এই বলে : 'ইল্লুতে মেয়ে— যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। যা না দেখি গায়ের ওপর দিয়ে, গলা টিপে পুঁতে ফেলব না!' বাতাসি থামে না, সমানে তর্ক করে। বাতাসির মা ছই-এর ঘরের বাইরে থেকে ডাকলেও কাঁদার ভান করে স্পষ্ট মিথ্যে কথা বলে : 'লক্ষ্মণদাদার কাছে যেতে চাইলুম তা মাগী গলা টিপে দিলে!' এমন মিথ্যা-ভাষণে যাত্রীর দল স্তম্ভিত। বাতাসির মা এগিয়ে এসে মেয়ের কাছে জানতে চাইলে কে গলা টিপেছে— বাতাসির দাক্ষায়ণীকে আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করে উক্তি : 'ওই ধুমসী মাগীটা।' এই উত্তরে দাক্ষায়ণীর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ। শেষে দু'পক্ষের মধ্যে মাঝিরা এলে ঝগড়া বন্ধ হয়।

নৌকা চলেছে ডায়মন্ডহারবার থেকে সাগর সঙ্গমে। এদিকে বেশ্যার দল নৌকার সহযাত্রী হওয়ায় দাক্ষায়ণীর জলগ্রহণও বন্ধ। মাঝে দুবার করে নৌকা লাগানোয় দাক্ষায়ণী ভালো করে স্নান করে, সামান্য কিছু আহারও করেন। দিন দুই পরে শতমুখী পিছনে ফেলে নৌকা ধবলাটের কাছে নোঙর করে। কুয়াশার রাত বলে অন্ধকারে চারপাশের কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ রাতে জোয়ারের টানে বেহাল এক মহাজনী ভড় এদের ছোট-নৌকার ওপর এসে পড়ে। যাত্রীনৌকা চৌচির হয়ে যাত্রীসমেত ডুবে যায়। জ্ঞান হারান সাঁতার জানা দাক্ষায়ণী। কিন্তু জ্ঞান এলে দেখেন তিনি জলে ভাসছেন এবং নৌকার হালের কাঠ সামনে ভাসায় তা ধরে বাঁচার চেষ্টা করেন। আর সেই হালের আর একদিকে বেশ্যাদের সেই মেয়ে বাতাসি বাঁচার জন্য আর্তনাদ করে ওঠে। নিজস্ব সংস্কারের জটিল দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাময়িক নিরসন ঘটিয়ে দাক্ষায়ণী বাতাসিকে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্য করেন।

পাড়ে ভড়ের লোকেরা ওদের দুজনকে তুলে আনে। তাদের স্থির বিশ্বাস যেভাবে দুজনকে নদী থেকে তুলেছে তারা, তাতে প্রমাণ—এরা মা ও মেয়ে। দাক্ষায়ণী চিৎকার করে তাঁর অস্বীকৃতির কথা জানালেও পাড়ের সহজ সরল লোক বিশ্বাস করে না। শেষ পর্যন্ত মহাজনী ভড়ের মাঝিরা ওদের দুজনকে নৌকায় নিয়ে গিয়ে ধবলাটে নামিয়ে দেয়। ধবলাট বেশি দূরে না। ধবলাট থেকে গঙ্গাসাগরের দূরত্ব কম। মাঝিরা পাড়ের সঙ্গে

লাগানো তক্তা ধরে দাক্ষায়ণী ও বাতাসিকে পাড়ে নেমে যেতে সাহায্য করে। ধবলাট থেকে দাক্ষায়ণীরা যে কোনো নৌকায় গঙ্গাসাগরে পৌঁছতে পারবে সহজেই। মহাজনী ভড়টি অন্যদিকে ঘুরে যায়। দাক্ষায়ণী বাতাসিকে বাঁচিয়েছে মাত্র, বাকি ব্যবহার তাঁর সংস্কার-কঠিন জীবন-প্রত্যয়ে চরম উপেক্ষারই, আবার ঘৃণারও। বেশ্যার মেয়েকে মেয়ে বলায় দাক্ষায়ণীর ঘৃণা কঠিন থাকে। নামার সময় মাঝিরা মেয়ের হাত ধরার কথা বললে দাক্ষায়ণীর আচরণ যন্ত্রচালিতের মত। বাতাসির হাত ধরে তীরে নামেন।

পাড়ে বাতাসির প্রতি দাক্ষায়ণীর তীব্র বিরূপ ব্যবহার। বাতাসি শিশুসুলভ মনে চাপা ভয়ে ও আড়ষ্টতায় দাক্ষায়ণীকে সহযোগিতা করতে চায়, পেতে চায় তাঁর সহজ স্বভাবে প্রীতি, সমবেদনা, কিন্তু দাক্ষায়ণীর কখনো ভর্ৎসনা কখনো উন্নাসিক অনীহা কেমন তাকে অসহায় করে। এইভাবে নানা ঘটনায় মনে বিপর্যস্ত হতে হতে—দাক্ষায়ণী ও বাতাসি আসে গঙ্গাসাগরে। এখানে দাক্ষায়ণীর একমাত্র দুশ্চিন্তা বাতাসিকে নিয়ে তিনি কিভাবে এগোবেন, কি করবেন? তবে ক্রমশ তিনি বুঝেছেন বাতাসি আগের থেকে অনেক বদলে গেছে।— যেনবা তাব একেবারে নবজন্ম! কবে থেকে যেন বাতাসি দাক্ষায়ণীকে মা বলে ডাকতে শুরু করে! তার ব্যবহার একেবারে অসহায় শিশুকন্যার মতো! দাক্ষায়ণী বাতাসিকে সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে, মানবিক আচরণে ক্রমশ ভিতরে ভিতবে আপন করে নেন। তবু ভাবেন বাতাসিকে সঙ্গে নিয়ে তো দেশে ফেরা অসম্ভব! তাহলে এই কলঙ্কিত-জন্মা মেয়েটিকে কি করে নিজের জীবনে স্থান দেবেন! বাতাসিকে অনাথ আশ্রমেও দিতে চান না, কারণ আশ্রমে অবিশ্বাস। তাকে নিয়ে বিপর্যস্ত— একথা বাতাসিকে জানালে তার দুচোখ জলে ভরে যায়। কখনো ভাবেন এত ভিড়ের মধ্যে ওকে একা ফেলে রেখে গেলেই তো আসল সমস্যাই মেটে! গঙ্গাসাগরের ভিড়ে একদিন হারিয়েও যায় বাতাসি, আবার খোঁজও মেলে।

এক সময় ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় বাতাসির হয় নিউমোনিয়া— ভর্তি হতে হয় সাগরের অস্থায়ী হাসপাতালে। দাক্ষায়ণীর আজ স্নানের দিন। মনের এক আর্ত উপলব্ধি : 'সামান্য একটা অপরিচিত মেয়ে কদিনের পরিচয়ে তাঁহার সমস্ত জীবনের ধারা যেন বদলাইয়া দিয়াছে। নিষ্ঠা, ধর্ম, পুণ্য কিছুরই যেন আর সে অর্থ নাই। স্নান সেরে দাক্ষায়ণী দুহাতে কিছু খেলনা ও পুতুল নিয়ে হাসপাতালে বাতাসিকে দেখতে যান ভীরু পায়ে, কম্প্র বক্ষে। মনেব গভীরে সন্দেহ, বাতাসি গণিকার মেয়ে না-ও হতে পারে!' 'নিজেদেব স্বার্থসাধনের জন্য ভদ্র পরিবারের ছোটো মেয়ে চুরি করিয়া আনে গণিকারা। সদ্বংশের না হলে এত তাড়াতাড়ি বাতাসির স্বভাবে রুচিতে বদল হয় কি করে?' এইসব ভাবতে ভাবতে দাক্ষায়ণী হাসপাতালে আসেন। ঘণ্টা দুয়েক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর খবর পান বাতাসির করুণ বিষাদঘন মৃত্যুর! গল্পের টানা আখ্যানের শেষতম করুণ চিত্রটি দাক্ষাযণীর বিস্ময়কর দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসানের :

> 'ডাক্তার ..... অত্যন্ত সংকুচিতভাবে বলে, 'আর একটু দরকার আছে আপনাকে। আপনার মেয়ের দাহ আমরাই করব। একটু পরিচয় তাই দিয়ে

যেতে হবে। .....হ্যাঁ, এই বয়েস, বাপের নাম— এইসব।'

দাক্ষায়ণী খানিক চুপ করিয়া থাকেন, তারপর সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বড়ো বউ, জীবনের সমস্ত সংস্কার ও শিক্ষা ভুলিয়া যাহা করিয়া বসেন তাহাতে তাঁহার শ্বশুরকুলের চতুর্দশ পুরুষ সুদূর স্বর্গের সুখাবাসে শিহরিয়া ওঠেন কিনা জানি না, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে জীবন দেবতার মুখ বুঝি প্রসন্নই হইয়া ওঠে।

বলেন, 'সব তো মুখে বলতে নেই। দিন লিখে দিচ্ছি।'

'সাগর সঙ্গম' গল্পের আখ্যান দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল। একটি বড় ঘটনা নৌকাডুবি ও যাত্রীদের সকলেরই হারিয়ে যাওয়ার বা মৃত্যু হওয়ার মধ্যে একমাত্র দাক্ষায়ণী ও বাতাসির বেঁচে থাকা, এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট ঘটনা, চিত্রখণ্ড কেন্দ্রীয় ও বাতাসি চরিত্রকে ধরে গল্পের শরীরে প্লটের জটিল বাঁধুনি মেনে বিন্যস্ত হয়েছে। গল্পে দাক্ষায়ণীর সীমাবদ্ধ সংস্কার থেকে যে জীবনমুখী বড় মানবতায় উত্তরণ— তা দেখানোই একমাত্র লক্ষ্য। গল্পের একমাত্র জট দাক্ষাযণীর এই বদলসূত্রেই। বাতাসির জন্ম ইতিহাস বেশ্যাদের ঐতিহ্যসম্মত, তবে তার মনেব ও স্বভাবের যে বদল, তা এক নিষ্পাপ শিশুর সারল্যের ও সহজতার অনুগ। গল্পের আখ্যান অবশ্যই দীর্ঘ। আখ্যানের এমন অতিবিস্তার ছোট গল্পের কায়া গঠনকে শিথিলতার মধ্যে নিয়ে আসে। গল্পের এককেন্দ্রিকতা ও চরিত্রের একমুখিনতাকে মান্য করলেও অতিবিস্তার পাঠকদের অস্বস্তি কিছুটা জাগাতেই পাবে! নৌকাব দুর্ঘটনার যে চিত্র— তাব বিস্তার শিল্পের সংযমে কমানো যেত। দুর্ঘটনাব পর পাড়ে আশ্রয় নেওয়া থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় আসার মধ্যবর্তী অংশটুকুও সংক্ষিপ্ত হলে ক্ষতি হত কিনা পাঠকদের চিন্তা দানা বাঁধে। তবু গল্পকারের যে প্লটনিহিত কুশলী কাহিনীবর্ণনা, তা গতানুগতিকতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। দ্বিতীয়বার মহাজনী ভড়ের জোয়ারের জলে কেঁপে ওঠার প্রসঙ্গ কি বর্জিত হলে বক্তব্য যুক্তিহীন হত?

তবে সমগ্র গল্পে দাক্ষায়ণীর চিন্তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বমুক্তির কথা, বাতাসির অনবদ্য শিশুসুলভ ভয়, ভাবনা, অসহায়তা, আড়ষ্টতা ও আনন্দ, মায়ের আদর পেতে আগ্রহী, স্বভাবে ঘুমের মধ্যে দাক্ষাযণীকে জড়িয়ে ধরে বাতাসির নিপাট ঘুমে ডুবে যাওয়ার চিত্র গল্পের বড় দিক। গল্পের ক্লাইম্যাক্স অর্থাৎ 'চরমক্ষণ' গল্পের 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'— এমন বাক্যবন্ধের অনুরূপ স্থানেই : 'সব তো মুখে বলতে নেই। দিন লিখে দিচ্ছি।' এই একটি বাক্যেই ক্লাইম্যাক্স ও শেযতম ব্যঞ্জনার উপসংহার! সমস্ত পুরনো সংস্কার ত্যাগ করে, সর্বধর্ম বিচ্ছিন্ন একমাত্র উদার মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষায় প্লাবনে যেখানে দাক্ষায়ণীর মনের সংকীর্ণ সীমা ভেঙে প্রসারণ ঘটে 'বাতাসি তাহার বাঁচুক' এবং 'শ্বশুরবাড়িতে স্থান না হয় তিনি তাহাকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ি বা যেখানে খুশি চলিয়া যাইবেন।'— এই আধ্যাত্মিক সমবেদনা ও সহানুভূতির রসসিঞ্চিত বোধের জায়গাটিতেই গল্পের climax-এর শুরু, শেষ দাক্ষায়ণীর সব কিছু লিখে দেওয়ার মতো তমসুকের আয়োজনে।

দুই

'সাগর সঙ্গম' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বা লক্ষ্য, প্রথমত এবং প্রধানত কেন্দ্রীয় চরিত্র দাক্ষায়ণীর মানস বিবর্তনকে স্তরে স্তরে চিত্রিত করা। দ্বিতীয়ত এর সঙ্গে জড়ানো আছে বাতাসির ক্রমশ 'নবজন্ম' হওয়ার মতো ভিতরের প্রাণধর্মের প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্রীয় সংস্কার, ধর্মীয় আচার-আচরণ, নিষ্ঠা, লোকধর্মে বিশ্বাস, সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে একে একে তার কঠিন মাটি হারাতে থাকে। যা কিছু প্রথাসর্বস্ব, তা হয় অমানবিক। মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দাক্ষায়ণীর যে বাতাসিকে ঘৃণা করা, গণিকার সন্তান বলে তাকে নির্মমভাবে অস্বীকার করা— সবই মানুষকেই ছোট করে। বিধবার নিষ্ঠা, জীবনমূলের কৃচ্ছ্রসাধন স্বাভাবিক প্রাণশক্তিকে তুচ্ছ করে বলেই তা কৃত্রিম সংস্কার-সর্বস্বতার উপকরণ হয়। দাক্ষায়ণীর সেই শিক্ষা ছিল রক্তের সঙ্গে তার অস্তিত্বের মিলমিশে জীবনের গতিবিমুখ স্থবিরত্বে উৎকট, বীভৎস হয়ে ওঠে।

বাতাসি সেই বীভৎসতার উগ্রতাকে, জীবনবিরোধী মানব্যহীন অবমূল্যায়নকে প্রকট করে। বাতাসি দাক্ষায়ণীর নবচেতনার জাগরণের একমাত্র সহায়ক শক্তি। ক্রমশ দাক্ষায়ণী তাঁর সীমাবদ্ধতাকে গভীরে উপলব্ধি করেন। মাতৃত্ব পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। এই সঙ্গীতধর্ম আন্তর্জাতিক মেঘের মত সর্বহৃদয় স্ব-ভাবে সুধাবর্ষণের ক্ষমতা রাখে। বাতাসির ধীরে ধীরে দাক্ষায়ণীর বুকে নিষ্পাপ স্বভাবে আশ্রয় গ্রহণ, তাকে দাক্ষায়ণী ছেড়ে গেলে তার চোখের জল, তার মধ্যে আগের সেই ঔদ্ধত্যের অপসৃত স্বভাব জাগরণ, বাতাসির আকুল আশ্রয়ার্থী হয়ে ওঠা দাক্ষায়ণীকে অবলম্বন করে— সবই 'সাগর সঙ্গম' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে বৈপরীত্যে শিল্পসুষমাময় করেছে।

এক শিশু আর এক বয়স্ক রমণী— দুজনের সম্পর্কের টানাপোড়েনে যে হৃদয়মন্থনজাত মানবরসের স্বাদ মেলে, গল্পকার তাকেই করেছেন গল্পের শিল্প-প্রকরণে মূল্যবান মণিখণ্ড। দাক্ষায়ণীর চিরজীবনের সনিষ্ঠ লালিত সংস্কারে অশুচি বাতাসি ছিল অস্পৃশ্য। বাতাসির পা কেটে রক্তক্ষরণ হলে দাক্ষায়ণীর মায়া জাগে। তিক্ত বিতৃষ্ণ মনে তাকে কোলে নেন, কিন্তু বোঝেন মেয়েটির সমস্ত অপরাধ তার ভাগ্যের অভিঘাত! আর বাতাসি তাঁর মধ্যে যা জাগিয়ে দিয়েছে তা তাঁর জ্যোৎস্নার মতো প্লাবিত মানবিক মাতৃত্ব : ' সমস্ত সংস্কারের চেয়ে যাহা পুরাতন— সমস্ত ধর্মের অপেক্ষা যাহা প্রবল, সেই মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষার প্লাবনে তাঁহার মনের সমস্ত সংকীর্ণ সীমার বেড়া তখন ভাঙিয়া ভাসিয়া গিয়াছে।........ বাতাসি তাঁহার বাঁচুক, ...' এই বাঁচা ও বাঁচানোর আর্তিতে আছে সংকটময় অস্তিত্বের অনিকেত স্বভাবের সমাপ্তি। এই হল গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। বাতাসি ও দাক্ষায়ণী— সমগ্র গল্পে অস্তিত্বের সার্থক রূপায়ণ বৈশিষ্ট্যে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। যেখানে এর পূর্ণতা, সেখানেই অপূর্ণতার ট্র্যাজেডি। বাতাসির মৃত্যু আর দাক্ষায়ণীর বাতাসিকে সর্বাবয়বে নিজের জীবনে মুক্ত বিশুদ্ধ স্বীকৃতি দান— দু'য়ের বিপরীত স্বভাবেই গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনার নিখুঁত গল্পশিল্পের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব।

তিন

'সাগর সঙ্গম' গল্পের প্রধান চরিত্র দাক্ষায়ণী, শিল্পের স্বভাব বিচারে বলা যায় তাঁর সহায়ক বাতাসি। বাতাসিকে গৌণ চরিত্র বলা যাবে না। গল্পের ছোটবড় ঘটনাবহুল আখ্যানের ধারাবাহিকতায় প্লটের জটিলতায় দাক্ষায়ণীর লক্ষণীয় বিবর্তন গল্পের পক্ষে অবশ্যই চমৎকারিত্ব আনে। আবার বাতাসির শিশুমনের যে সব বিচিত্র দিক গল্পে উঠে এসেছে সে সবের দায় ও দায়িত্ব কম নয়। গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার সূত্রে আখ্যান অংশ প্রধান পাঁচটি স্তরে কাহিনী ও ঘটনায় বিশিষ্ট। ১. ডায়মন্ডহারবার থেকে দাক্ষায়ণী সহ বেশ্যার দল ও তাদের প্রতিনিধির মতো শিশু বাতাসি সহ গঙ্গাসাগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দুদিন পরে শতমুখী পিছনে রেখে ধবলাটের কাছাকাছি এসে নোঙর করার প্রস্তুতি; ২. নোঙর-করা অবস্থায় মহাজনী ভড়ের ধাক্কায় দাক্ষায়ণীদের দুর্ভাগ্যজনক নৌকাডুবি এবং দাক্ষায়ণী ও বাতাসি— দুজন ছাড়া বাকিদের নদীবক্ষে নিমজ্জনের ঘটনা; ৩. মহাজনী ভড়-এর মাঝিদের সহায়তায় দাক্ষায়ণী ও বাতাসির ধবলাটে অবস্থান; ৪. ধবলাট থেকে গঙ্গাসাগর অভিমুখী এক নৌকায় গঙ্গাসাগরে দাক্ষায়ণীদের পৌঁছনো, ৫. গঙ্গাসাগরে দু'দিনের স্নানের উদ্যোগের মধ্যেই বাতাসির নিউমোনিয়ায় মৃত্যু এবং দাক্ষায়ণীর নবজীবন উপলব্ধির উপযোগী প্রসারিত মনোভঙ্গির স্বরূপ প্রতিষ্ঠার চিত্র!

আখ্যানের এই সব স্তর, ঘটনা-পরম্পরা ধরেই দাক্ষায়ণীর ব্যক্তিত্বের রূপ ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বিস্ময়কর, পরিণামী রূপ ও ব্যঞ্জনা আমাদের প্রসাবিত নীল আকাশ উপলব্ধি করাব অভিজ্ঞতা আনে। দাক্ষায়ণী তাঁর দীর্ঘ দিনের প্রথা-সর্বস্ব সংস্কারে, শুচিবায়ুগ্রস্ত আচার-আচরণের নৈষ্ঠিক বিশ্বাসে আখ্যানের প্রথমে বেশ্যাদের অবস্থান ও তাদের মেয়ে বাতাসির প্রাসঙ্গিকতায় এক মানব্যভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন বিধবা মাত্র। তা না হলে মাত্র বেশ্যার দল সহযাত্রী হওয়ায় নৌকায় জলগ্রহণ পর্যন্ত ত্যাগ করেন কি করে? নৌকাডুবির মধ্যে সামনে ভাসমান অসহায় শিশু বাতাসি সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ভয়াবহ, রুদ্ধশ্বাস হয় :

> '.......... অসহায় মেয়েটার মুখ দেখিয়াও বিন্দুমাত্র অনুকম্পা তাঁহার হইল না। বিষাক্ত সরীসৃপ শিশুর মতো এ একদিন বড়ো হইয়া সংসারকে পাপের বিষে জর্জর করিয়া তুলিবে এমনি একটা অস্পষ্ট চিন্তায় তাঁর মন বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অসহায় কান্না, দুর্বল দু'টি হাতে প্রাণপণে হালটিকে জড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা, এ সমস্ত কিছু গ্রাহ্য না করিয়া সবলে তিনি তাহাকে জলে ঠেলিয়া দিলেন।'

এই যে এক বয়স্ক বিধবার স্বভাবচিত্র তা তো প্রথাজর্জর, পুরনো সংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তথাকথিত পাপপুণ্যের হিসেবে অন্ধ মানুষেরই নির্মম, দৃষ্টান্তহীন অ-মানবিকতার কলুষিত রূপ নয়? দাক্ষায়ণীর চিন্তাটাই তো জীবন-বিনাশী বড় পাপের! তবু তার মধ্যে নতুন চেতনার বীজ বপন করেছেন গল্পকার : 'মেয়েটির সেই শেষ অর্ধস্ফুট চীৎকারে মনে কি যেন সব ওলটপালট হইয়া গেল।.... ভীত সকাতর মুখের

মিনতি ভুলিবার নয়।........দারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দাক্ষায়ণী উন্মত্তের মতো' হয়ে বাতাসিকে জল থেকে বাঁচাল।

এইভাবে দাক্ষায়ণীর মধ্যে মানবব্যবোধের বীজবপন, আর ক্লাইম্যাক্সের মতো গঙ্গাসাগরে স্থানে ও স্নানে যে মানসিক শুভ ও শুদ্ধবুদ্ধির মৌলিক জীবনবোধের জাগরণ, সেখানেই দাক্ষায়ণীর বিতর্কিত চরম রূপেরও পরিণামী ক্লাইম্যাক্সের উজ্জ্বল বোধন। দাক্ষায়ণীর আত্মজাগরণের ও আত্মোপলব্ধির মধ্যেই গল্পের শেষ। পাড়ের সহজ সরল গ্রাম্য মানুষ ভাগ্যের বিশ্বাসে ও নির্দেশেই যেনবা দাক্ষায়ণীর কন্যা ভেবে নেয় বাতাসিকে। বাতাসিকে দাক্ষায়ণী সংস্কারের ও বেশ্যা সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণায় ক্রমাগত অস্বীকার করলেও নিয়তির মতো বাতাসির ছায়া তাঁকে অনুসরণ করে। কখনো ক্ষোভে রাগে, কখনো সংস্কার থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে নীতি নির্ধারিত পাপবোধে, বাতাসির পা খোলামকুচিতে রক্তাক্ত ও বাতাসিকে ক্লান্ত করলেও তাকে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেননি।

গঙ্গাসাগর যাত্রা ও স্নান হল ধর্মভীরু ভক্ত পুণ্যার্থীদের পক্ষে ভক্তিজীবনের এক climax—'মহাসন্ধিক্ষণ'। সেই গঙ্গাসাগরেই প্রেমেন্দ্র মিত্র দাক্ষায়ণীর পবিত্রতম মানবিক বোধের জগতে উত্তরণের স্থায়ী শেষ পর্বের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। নৌকাডুবির ঘটনার পর থেকে অসহায় বাতাসির ক্রমিক অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য নানান দ্বিধাদ্বন্দ্বে দাক্ষায়ণীকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। যে জীবন সুস্থ, মহৎ মানবিক জীবনরসে সিক্ত, গতিপ্রাণ (dynamic) জীবনকেই দাক্ষায়ণী শেষপর্যন্ত মুক্ত হৃদয়ে ও বোধে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দাক্ষায়ণী তাই ট্র্যাজেডির নায়িকা হননি, বরং তাঁর, যীশুর কবর থেকে আবির্ভাবের মতো কতকাংশে 'রেজারেকশান' ঘটেছে। পৌষ মাসের শীতে বাতাসি যখন দাক্ষায়ণীর বুকের কাছে ঘুমের ঘোরে শারীরিক শৈথিল্যে ঘুমোয়, তখন অশুচি এই মেয়েটির 'কণ্ঠলগ্ন' শীর্ণ শুভ্র হাতখানা সরাইতে গিয়াও তিনি কেন জানি পারিলেন না', কারণ 'সে মুখে সংসারের ভাবী সর্বনাশিনীর কোন আভাসই নাই।' গঙ্গাসাগরে পৌছবার আগের অনুভূতি দাক্ষায়ণীর মনের আয়নার ঝাপসা ভাব আস্তে আস্তে সরতে থাকে। গঙ্গাসাগরে এসে নানান ব্যস্ততার মধ্যে দাক্ষায়ণী বাতাসির মুখে স্বতঃস্ফূর্ত 'মা' ডাক শোনেন, বাতাসির একাধিক আচরণে মন যেন ভিতর থেকে প্রস্তুত হয় দাক্ষায়ণীর। পিতৃকুল, বিশেষভাবে শ্বশুরকুলে, বাতাসির মতো অন্তরঙ্গ ব্যবহার সত্ত্বেও, কিভাবে একটু স্থান করবেন, তা নিয়েই গভীর চিন্তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। বাতাসি গঙ্গাসাগরে একবার হারিয়ে যাওয়ার পরে যখন দেখা পায়, তখন শোনেন লোকে তার খোঁজ নিলে বাতাসি 'শুধু বলে মার সঙ্গে এসেছি।' স্নানের দিন স্নান সারার পর দাক্ষায়ণীর যে অভিজ্ঞতা, যা গল্পের ক্লাইম্যাক্স-এর একটা স্তরও,—'নিষ্ঠা ধর্মপুণ্য কিছুরই যেন আর সে অর্থ নাই।' গঙ্গাসাগরের অস্থায়ী হাসপাতালে বাতাসিকে দেখতে আসার আগে দু'হাত ভরে খেলনা ও পুতুল আনেন। সর্বশেষ সংবাদ—বাতাসির মৃত্যুতে দাক্ষায়ণীর মানবিকতায় শুদ্ধ, ধৌত, সংস্কারাচ্ছন্ন-প্রথাসর্বস্ব জীবনকে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' রূপে উপলব্ধি গল্প ও চরিত্র—

দুইকেই বড় জায়গায় স্থায়ী আসন দেয়। দাক্ষায়ণীর বদল সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য,— স্বভাবের ও শিল্পের সংযত মাপের নিরিখে।

বাতাসি অবশ্যই দাক্ষায়ণীর ব্যক্তিত্বের পক্ষে উদ্দীপন বিভাব। সে গল্পের একেবারে প্রথম দিকে গণিকার কন্যা হিসেবেই শিশুসুলভ সারল্যে— প্রায় তোতাপাখির মতো অপরিচ্ছন্ন সংলাপ বলে। গল্পেব মধ্যেও— যখন দাক্ষায়ণীর মধ্যে বাতাসিকে কেন্দ্র করে ভাল-মন্দর প্রতিক্রিয়া গোপন ও প্রবল, তখন একবার সেই পুরনো স্বভাবের প্রকাশ ঘটায়। সে চিত্র এইরকম :

> 'সাগরে যাইবার নৌকায় উঠিবার সময় হঠাৎ সে (বাতাসি) মুখ বাঁকাইয়া ঘাড় দোলাইয়া তাহার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ এক অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আর নৌকায় উঠতে পারিনে বাবা! জল যেন আমার দু'চক্ষের বিষ। বলে, আর জলে যাব না সই—'
>
> কিন্তু ওই পর্যন্ত বলিযাই দাক্ষায়ণীব মুখের পানে চাহিয়া তাহার মুখের কথা আটকাইয়া গেল— ভয়ে তাহার মুখ শুকাইযা উঠিল।'

এ চিত্রে আছে বাতাসির বদলের সূক্ষ্ম দিক। দাক্ষাযণীর যেমন বাতাসির সাহচর্যে বদল ঘটেছে, তেমনি বাতাসিও দাক্ষায়ণীর সাহচর্যে বদলে যেতে থাকে।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, নৌকাডুবির পর বাতাসি একবারও তার নিজের মায়ের কথা বলেনি, ভাবেনি, খোঁজ নেয়নি, যাকে প্রথম গল্পের শুরুতেই দেখা যায় এই চিত্রে :

> 'হ্যাঁ গা, ওই কচি মেয়ের গলা টেপা কিসের জন্যে।' বলিয়া যে স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসে— শীর্ণ অসুস্থ কুৎসিত মুখে, কোটরপ্রবিষ্ট দুই চোখে, দেহের মস্ত ভঙ্গিতে তাহার জীবনের কদর্য ইতিহাস অতি স্পষ্টভাবেই লেখা— দেখিলে চিনিতে বিলম্ব হয় না।'

তাহলে দাক্ষায়ণীর চিন্তাসূত্র ধরে একথাই ঠিক : 'বাতাসির যে কলুষের মধ্যে জন্ম তাহারই বা প্রমাণ কি? গণিকারা নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য ভদ্র পরিবারের ছোট মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া আসে,.....'। দাক্ষায়ণীর এমন চিন্তার কারণ তাঁর সাহচর্যে বাতাসির স্বভাবের, ভাষার, ভঙ্গি ও মনোভঙ্গির বদলের বিস্ময়— যেন নতুন মেয়ে হয়ে ওঠা! বাতাসি নৌকাডুবির পর তার অসহায়তার মধ্যে একবারও আগের মায়ের কথা বলেনি, খোঁজও নেয়নি দাক্ষায়ণীর কাছে, দাক্ষায়ণীও সে বিষয়ে নিজে থেকে বাতাসিকে জিজ্ঞেস করেনি। বাতাসির দ্রুত স্বভাব বদল হয়তো এই কারণেই সহজতা পায়।

বাতাসি শিশু হলেও নিজের সম্পর্কে বেশ কিছু সজ্ঞানতা আছে। দাক্ষায়ণী কি ভালোবাসে, রাগলে কিভাবে থাকতে হয়, কথা বলতে হয়, দাক্ষায়ণীর পছন্দ-অপছন্দকে নিরীক্ষণ করার উপস্থিত বুদ্ধি অবশ্যই ধরে। বাতাসিকে গঙ্গাসাগর পৌঁছে একসময়ে দাক্ষায়ণী বলেন ওকে একা ফেলে যাওয়ার কথা, তাতে বাতাসির লেখচিত্র এইরকম : বাতাসি হাসিয়া বড়ো বড়ো চোখ দুইটা তাঁহার মুখের পানে পরম নির্ভরতায় তুলিয়া ধরিয়া বলে, 'ঈস!' দাক্ষায়ণী যখন বলেন শাসনের কণ্ঠে :

'..........আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি তোকে নিয়ে।'

বাতাসি নীরব হইয়া যায়, শুধু চোখ দুইটা তাহার অল্পেই সজল হইয়া আসে।' বাতাসি দাক্ষায়ণীর রাগ বা বিরক্তি কমানোর জন্য কখনো স্টিমারের পুতুল পাখিদের কথা বলে, কখনো ভাল পা টিপতে পারার কথা বলে, কখনো দাক্ষায়ণীর জন্য কঠিন শীতের অজুহাত প্রসঙ্গ তোলে। শেষের দিকে রূঢ় রুক্ষ ব্যবহারের সামনে বাতাসি নীরব হয়ে যায়। দাক্ষায়ণীর পছন্দ-অপছন্দ ধরে বাতাসি নিজেকে সামলাতে শেখে। বাতাসির শেষ মৃত্যুতে, এই পরিণাম অত্যন্ত Pathetic। এই বিষাদময় পরিণতির জন্য যে বেদনা— তা যেমন দাক্ষায়ণীর কাছে যথার্থ অর্থে নিজ কন্যা হারানোর মতো হৃদয়বিদারক, শূন্যতার স্রষ্টা, তেমনি বাতাসির মত এক নিষ্পাপ শিশুর পরিণামী বেদনা সম্ভবত গঙ্গাসাগরের অজস্র তরঙ্গের সীমা ছুঁতে ছুঁতে দিগন্ত অতিক্রম করে যায়। বাতাসি ঘুরিয়ে খেলনা পুতুল পাখি চেয়েছিল দাক্ষায়ণীর কাছে, তাকে শেষ সান্ত্বনা দিতে স্নানে শুদ্ধ হয়ে তা নিয়েই হাসপাতালে আসে। দাক্ষায়ণীর এই বদল বাতাসির অকালমৃত্যুকে আরও তীব্র, গভীর, বিষাদময় করে তোলে। দাক্ষায়ণীর বদলে, মানসভূমি তথা আত্মার স্বচ্ছ, নির্মল পরিশীলনে বাতাসি হল এক শিশু শহিদ! তার নতুন মা পেয়ে বাঁচার তীব্র বাসনা, আর্তি— যা নৌকাডুবির সেই চরমমুহূর্তে ছিল, তা তার নির্মম মৃত্যুতে চতুর্দিক ছাওয়া আর্তির অসীমতা, অসহায়তার আক্ষেপ গভীর করে। বাতাসি পৃথিবীর সমস্ত শিশুর পক্ষে পরিত্যক্ত, সারল্যের ও নিষ্পাপ পবিত্র জীবনার্তির রাবণেব চিতাব মত বেদনা-অগ্নির শাশ্বত স্মারক।

চার

'সাগর সঙ্গম' সামাজিক সমস্যানির্ভর চরিত্রাত্মক গল্প। এই শ্রেণীর গল্পে থাকে সমাজ ও জীবন নিহিত নানা জ্বালা-যন্ত্রণা, শূন্যতা-অসহায়তার দহন ও অস্থিরতার রক্তাক্ত দিক। চরিত্র মূল লক্ষ্যে থাকায়— রোমান্টিকতার ধর্ম— যা বিদ্রোহের স্বভাবে এক নতুন মুক্তির আকাশ তৈরি করে— তা-ই প্রতিষ্ঠা পায়। এই শ্রেণীর গল্প সম্পর্কে এক প্রতিষ্ঠিত কথাকার সমালোচকের সংজ্ঞা-সিদ্ধান্ত : 'একটি বিশেষ চরিত্রের চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য, তার একটি ক্রমাভিব্যক্তি এবং সর্বশেষে একটি অপরিজ্ঞাত অপূর্বতার উপরে আলোকপাত এই ধরনের গল্পে থাকে।' 'সাগর সঙ্গম' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দাক্ষায়ণীর এবং তাঁর পরিপূবক বাতাসির সামগ্রিক চরিত্রচিত্রে এব সার্থক প্রমাণ মেলে। দাক্ষায়ণীর নিখুঁত বিবর্তন এবং সবশেষে যে Resurrection — তা এক গভীর বিস্ময়রস ও শূন্যতা-সৃষ্টিকারী অপূর্বত্বের অভিজ্ঞতা আনে পাঠকচিত্তে।

গল্পে মেলে একটি সংক্ষিপ্ত গৌণ 'মহা-মুহূর্ত'— তা নৌকাডুবির ঘটনায় আছে। এই ক্লাইম্যাক্স আর তা থাকে না, যখন দেখা যায় দাক্ষায়ণী ও বাতাসির যৌথ কাহিনী তাকে তুচ্ছ করে অন্যদিকে এগোয় পিছনকে পরিত্যাগ করে। গল্পের শেষে ক্লাইম্যাক্স ও 'ক্যাটাসট্রফি'— অর্থাৎ উপসংহার দাক্ষায়ণীর 'কৃতকর্ম ও দুর্ভোগে' উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে

বাতাসির মধ্যে নতুন স্বভাবের উদ্বোধন ঘটে। আসে একমাত্র পরিণতির মধ্যে চরিত্রনির্ভর বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা— সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। গল্পটি অবশ্যই ঘটনানির্ভর— যা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বিরল-দৃষ্ট। দাক্ষায়ণী চরিত্রের একমুখিন তীব্রতা এবং অতলাশায়ী গভীরতা চরিত্রকে dynamic করেছে।

অবশ্য একথাও ঠিক, দাক্ষায়ণী ও বাতাসির যৌথ স্বভাবের আন্তর টানাপোড়েন বোঝাতে গল্পকার রীতিমতো একাধিক ছোটবড় ঘটনার, 'সিচুয়েশন'-এর কল্পনা করেছেন— যেগুলি আখ্যানের প্রবণতাকে বাড়িয়েছে মেদ-মাংসে কিছুটা। অবশ্য প্রকাশভঙ্গির অমোঘতা সে সবকে মানানসই করেছে বলে আমাদের ধারণা। গল্পের পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্ম আছে দাক্ষায়ণীর শেষতম সক্রিয়তার চিত্রে। গল্পের ভাষা, সংলাপ, বর্ণনারীতি এমন বড় গল্পটিকে যথোচিত মর্যাদা দেয়।

পাঁচ

গল্পের নাম 'সাগর সঙ্গম'। সাগরের সঙ্গমক্ষেত্র বলতে বোঝায় একাধিক সূত্রে সাগরের মুখে যে মিলন বোঝায়, তা-ই। যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'ত্রিবেণী সঙ্গম'— যেখানে তিন নদীর মিলনরূপ— যেখানে পুণ্যার্থীদের বিশ্বাস— সেই সঙ্গমমুখে স্নান করলে মানুষের পুণ্যার্জন ও পাপমুক্তি ঘটে। গঙ্গাসাগরেও এই সঙ্গমক্ষেত্র আছে। গল্পের নামে প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন দুটি তাৎপর্যগত শব্দ ব্যবহার করে ঘটনা ও চরিত্র ধরে ভিন্নতর ব্যঞ্জনার কথা বলতে চেয়েছেন।

প্রথমত, গল্পের কাহিনী আকারে যে ঘটনা ও চরিত্রের বিবর্তন তাতে স্পষ্টভাবে আছে প্রধান চরিত্র দাক্ষায়ণী ও তার সঙ্গে জড়িত বাতাসির সেই গঙ্গাসাগর মুখে গমন। গল্পের আখ্যান-নির্দিষ্ট ঘটনা ও চরিত্র তাকেই মূল লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। গল্পের শেষও সেই গঙ্গাসাগরে দাক্ষায়ণীর স্নান ও বাতাসির মৃত্যুর মতো পরিণত চিত্র আঁকায়। তাই একেবারে প্রাথমিক অর্থে এমন নাম-এর কারণ সহজবোধ্য।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে যদি কিছুটা বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে এমন নামের জীবনমুখিন তাৎপর্য স্বতন্ত্র গুরুত্ব পায়। গল্পকার দেখিয়েছেন অসুস্থ বাতাসিকে সাগর-হাসপাতালে ভর্তি করার পর দাক্ষায়ণী সাগরস্নান সারেন। এর পর এক মুক্তমনে একমাত্র বাতাসির কথা ভেবেই খেলনা পুতুল কেনেন, নতুন নতুন চিন্তায় বাতাসির কথা মনে নিয়ে দেখা করতে যান। গঙ্গাস্নানের পর দাক্ষায়ণীর নিজের মনোলোকের যে দ্বিধা ও শঙ্কা বিবিক্ত যে বদল, তার মূলে মুক্ত মন স্বতঃস্ফূর্ত তৈরি হয়েছে সাগরের জলে পরিচ্ছন্ন স্নানের জন্যই। সাগরের যে সঙ্গমক্ষেত্র, সেখানে দাক্ষায়ণীর বদলে সাগর সঙ্গম ক্ষেত্রের পরোক্ষ প্রেরণা আরও গুরুত্ব পায়। নামের লক্ষ্য যেনবা কেন্দ্রীয় চরিত্রের একমাত্র গুরুত্বকেই শিল্পের মাপে মান্য করে।

তৃতীয়ত, বিশেষ ধর্মীয় আচার-আচরণ সর্বস্ব সংস্কারে কঠিন সীমিত, প্রথাদীর্ণ বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, আত্মাদর ও সম্পূর্ণ অমানবিক বিশ্বাস থেকে দাক্ষায়ণী এই সাগর সঙ্গমে

এসেই নতুন জীবনের ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। স্নান সেরে ওঠার পর দাক্ষায়ণীর মন শান্ত হয় এবং চিন্তা এইরকম : '.........ওই অনাথ অসহায় মেয়েটির জীবন পাপ ও গ্লানির কোন অন্ধকারে অতলে তলাইয়া যাইত কে বলিতে পারে!... বাঁচিলে যখন অশেষ দুর্গতি, তখন বাতাসির মরাই ভালো। ...... কিন্তু সে মরিতেছে ভাবিয়া তাঁহার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।' যা সংস্কারের থেকে পুরনো, ধর্মের থেকেও ভয়ংকর শক্তিমান,— তা হল নির্মল আকাশের মতো মুক্ত মানবতা ও মাতৃত্ব। তা দাক্ষায়ণীর মনের সব সীমা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তাঁর শেষ উপলব্ধি: 'বাতাসি তাঁহার বাঁচুক.... সমস্ত সংসারের নিন্দা অপবাদের বোঝা তিনি নির্ভয়ে মাথা পেতে নেবেন।' এই যে মানবিক সত্যের উপলব্ধি, সাগরে স্নানের পরেই মনের গভীরে বেজে উঠেছে, সাগর সঙ্গম সেই মানসিক মুক্তি ও শান্তির নবরচিত বেদ। নাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থত, টলস্টয়ের নায়ক নেখলুডফ 'রেজারেকশান' গ্রন্থের শেষে গণিকা ও নায়কের প্রেমিকা মাসলোভার কাছ থেকে সরে এসে বাইবেলের মধ্যে ধীরে ধীরে মুক্তি পেয়েছে। দাক্ষায়ণীর কাছে সেই বাইবেল হল পুণ্য সাগর মিলনক্ষেত্র। জনতার স্রোত, যা পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্পর্শে সঙ্গমস্থলের বিশুদ্ধ বারির মতো, তার মধ্যে দাক্ষায়ণী বড় মুক্তির সত্যকে পেয়েছেন। সাগর সঙ্গম-স্থল তাই ধর্মের পাঠ শেখায়, উচ্চারণ করে, তা দাক্ষায়ণীর কাছে নতুন মন্ত্র। মন্ত্রোচ্চারণেও জন্মস্থল হল সাগর সঙ্গম। তাই নামের গুরুত্ব আকাশের মতো ব্যঞ্জনাময়।

প্রবোধকুমার সান্যাল

জন্ম : ৭ জুলাই ১৯০৫

'কল্লোল' পত্রিকার যে বছরে প্রকাশ ঘটে, সেই বছরের 'মাঘ' সংখ্যায় বেরোয় প্রবোধকুমার সান্যালের 'মার্জনা' নামের গল্প। লেখকের প্রথম 'কল্লোলে' প্রকাশিত গল্প এটাই। গল্প দিয়েই তাঁর লেখক-জীবনের সূত্রপাত। প্রবোধকুমার সান্যাল অবশ্যই কল্লোলীয় ছিলেন মনেপ্রাণে। 'কল্লোলে'র যেটা তারুণ্যের দিক, যৌবন-চেতনার প্রতিবাদী স্বভাবের দিক, যে কোনো ঐতিহ্য-সম্মত অথচ স্থবির ভাবনা-ধারণার তীব্রতম প্রতিক্রিয়ায় নড়েচড়ে ওঠার দিক, প্রবোধকুমার সান্যালের শিল্পীমনে তা ছিল রক্তের সম্বন্ধের মতো। এই লেখক দেখেছেন প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার প্রতিক্রিয়া এই যুদ্ধের উত্তরকালে আর সব লেখকদের মতোই তাঁকেও সমানে নাড়া দেয়।

চিরকালের যৌবন-পিপাসার মূল্যবোধের প্রতি অসম্মান, যৌবনের অবক্ষয়, ব্যর্থতার গ্লানি প্রবোধকুমার সান্যালের পক্ষে সহনাতীত ছিল। তবে বাস্তব জীবনে যৌবনের প্রয়োগ আর শিল্পে তার ব্যবহৃত রূপে তফাত থাকবেই। সে সময়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ নতুন যৌবন-চেতনাকে যেভাবে শিল্পিত করতে সক্ষম হয়েছেন, প্রবোধকুমার সান্যাল তা পারেননি। এই না পারাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রবোধকুমার সান্যালের জীবন-ভাবনা নিশ্চয়ই নাগরিক এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর বোহেমিয়ান মানসিকতা। কিন্তু এসব মিলিয়ে তাঁর আলাদা এক বৈশিষ্ট্য ছিল, তা তীব্র সপ্রাণ আবেগধর্ম। তিনি যতটা আবেগবান পুরুষ, তাতে তাঁর বিবেকবান শিল্প-স্বভাবের ততটা আনুগত্য নেই।

অর্থাৎ কল্লোলীয় বোহেমিয়ানিজমকে প্রবোধকুমার সান্যাল প্রসারিত করেন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগধর্মে। এই আবেগে তাঁর অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সপ্রাণ রূপ নিয়েছে একাধিক গল্পে। তাঁর গল্পের মানুষগুলি পোড়-খাওয়া জীবনের প্রতিরূপ। সময়ের প্রহারে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যে প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তি-মনে যে শূন্যতা, পারিবারিক সম্পর্কে যে অবক্ষয়, নীতিহীনতা— এসবকে লেখক আপন ব্যক্তিত্বে এঁকেছেন। এই অঙ্কন প্রয়াসে আছে তাঁর আবেগপ্রাণতার পরিচয়। আবেগের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নিবিড়। মানব হৃদয়ের স্বভাবই এই প্রতিক্রিয়াগত আবেগে দীপ্ত হওয়া। প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর গল্পের চরিত্রদের এমন আবেগেই হৃদয়ের প্রসারিত রূপচিত্রণ ঘটিয়েছেন।

গল্পকার প্রবোধকুমার সান্যাল দু'ধারায় তাঁর গল্পের মূলভঙ্গিকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের কল্লোলীয় প্রতিক্রিয়ায় তাঁর গল্পের এক রূপ, প্রত্যক্ষভাবে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তাঁর ছোটগল্পের আর এক রূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধসমকালে বসে এই লেখক সমাজ, মধ্যবিত্ত মানুষকে আর এক দৃষ্টিকোণে দেখেছেন। বাংলা কথাসাহিত্য তথা ছোটগল্পের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল এক বিষম অগ্নিপরীক্ষার কাল। এই অগ্নিপরীক্ষার দাহ্য বিষয় হয়েছিল সমকালীন সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক গ্রাম ও শহরের গোটা মানুষ. দহনে সাহায্য করার উপযোগী প্রখর, প্রতপ্ত, উজ্জ্বলতম আগুন উঠেছিল নানান রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের উপস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তর ইত্যাদির উৎসেই।

কথাসাহিত্যে এসবের সূত্রেই আসে লক্ষণীয় বদল। যে মন্বন্তর স্থূল বাঁচার উপযোগী খাদ্যের অভাবে মানুষের সূক্ষ্ম ঐতিহ্য-আদর্শ-নির্দিষ্ট সমাজ-ন্যায়ে টান দেয়, ব্যক্তির সমস্ত রকম নীতিবোধকে নিষ্ফল করে তোলে, সেই মন্বন্তরের অভিঘাত লেখকরা গ্রহণ করে বিষকণ্ঠ হয়েছিলেন। সাহিত্যে তার পরিচয় মেলে। সুনিশ্চিত অবক্ষয়, পচন, পতন, ভাঙন, নাগরিক জীবনের ভয়ঙ্কর শূন্যতা ও অসহায়তা, গ্রাম-জীবনের শক্ত মাটিতে অবধারিত ক্ষয় ও কাল— এসব মিলেমিশে বাংলা ছোটগল্পের (এবং উপন্যাসেরও) বিষয়ে বিচিত্রতা দেখা দেয়। প্রবোধকুমার সান্যাল সেই বৈচিত্র্যকে নিজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যেই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর গল্পে। লেখকের 'অঙ্গার' গ্রন্থের 'অঙ্গার' গল্পটি তার এক প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে প্রবোধকুমার সান্যাল সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন— 'মুক্ত হাওয়ার মুক্ত আকাশের মানুষ সে, আর সেই হাওয়া আর আকাশ আমাদের এই বন্ধ জানলাব জীবনে অল্পদৃষ্ট।' এই মন্তব্য কল্লোলীয় প্রবোধকুমার সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র মনোভঙ্গির যথার্থ স্বীকৃতি যেন! প্রবোধকুমারের ছিল জীবনের বিচিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেইসব অভিজ্ঞতা পাথেয় মানুষগুলির খুব কাছে থেকে অর্জন করা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার বাস্তবতা উঁচুতলার অভিজাত শ্রেণীর মানুষজনের জীবন-পরিধির সীমায় যাচাই করা নয়, তা প্রত্যক্ষ হতশ্রী জীবন ও মানুষ ছাড়িয়ে রোমান্টিক প্রাণের অসম্ভব বেগের কাছে নতুন মূল্যে বুঝে নেওয়া। যাদের কথা ভাবতেন তারা অতি সাধাবণ, কিন্তু যেভাবে তাদের গ্রহণ করতেন, তাতে জীবনের বেগের ধর্মেই শিল্পে পেত নির্দিষ্ট আসন।

প্রবোধকুমার সান্যালের 'গল্প লেখার গল্প' রচনাটিতে নিজের কথাতেই তাঁর গল্পের তথা সাহিত্যের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়। ১. 'পথে ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি— স্টীমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলে ওয়েটিং রুমে, তীর্থপথের মেলায়.........। আমি বড়লোক নিয়ে কিন্তু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে, এই সব চরিত্র নিয়ে। কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতে ভালো লাগতো না। গল্পটা এই নিছক একটা

গল্পই হলো, তার থেকে আর কিছুই পাওয়া গেল না— তেমন গল্প ছিল আমার দু'চোখের বিষ। একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা, একটা কোন দুরূহ ভাবনার পথ— ঐ যদি সব গল্পের মধ্যে না থাকে তবে গল্প লিখে লাভ কি?'

বস্তুত প্রবোধকুমার সান্যাল শিল্পের অবয়বে রেখেছেন তাঁর স্বভাব নিহিত আবেগধর্ম, রেখেছেন সহজাত যাযাবর বাসনা, যোগ করেছেন এক দুর্মর রোমান্টিকতা। 'গুহায় নিহিত' গল্পের প্রিয়কুমার-দেবীরাণীর জীবন সম্পর্কের মধ্যে প্রিয়র স্ত্রী প্রতিমার অস্তিত্বের সংকট, 'অন্ধ' নামের গল্পের নায়িকা রুনু ও নায়ক জিতুর মধ্যেকার সতর্ক, সভয় অন্তিম সম্পর্ক ভাবনার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ, 'বনমানুষের হাড়' গল্পের যোগমায়া— যে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন পতিতা রমণী— তার শূন্যতাবোধ, 'প্রেতিনী'র কুৎসিত দর্শনার নায়িকা চন্দ্রময়ীর আর্ত হৃদয়ের অসহায়তা, 'নিশিপদ্মে'র নায়িকা পার্বতী বা 'মনকামনা'র বীণার আত্মবঞ্চনায় মেলে লেখকের সেই আবেগমথিত হৃদয়ের রোমান্টিক অভীপ্সা।

১.

অঙ্গার

এক

'অঙ্গার' গল্পটি মূলত তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা। যে মন্বন্তর মানুষকে অবধারিত করে উন্মূলিত জীবন গ্রহণে, উৎখাত করে মানুষকে তার এতদিনের বাস্তুভিটা থেকে, সর্বোপরি শুধু টিকে থাকার জন্যে যে মন্বন্তর সমস্ত রকম নীতিবোধের যোগফলে শূন্যকে বার বার সত্য করে, সেই মন্বন্তরই এই গল্পের বিষয়ের দেহ ও প্রাণ।

এই গল্পের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী আছে। কিন্তু সে কাহিনী ঘটনায় জোড়া নয়, চিত্রের স্বভাবে বিশিষ্ট। প্রবোধকুমার সান্যাল কাহিনীবৃত্তে প্লটকে কাহিনী-নির্দিষ্ট মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাবে নিবিড় করেছেন। এ গল্পের মূল কথক নলিনাক্ষ নামে এক দিল্লী-প্রবাসী ব্যক্তি, যে ফরিদপুরের ঠিকানায় তার পিসতুতো বিধবা বোন শোভনার নামে পুরনো ব্যবস্থামতো দীর্ঘ তিন বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট টাকা মানি-অর্ডারে পাঠিয়েও মন্বন্তরের সমকালে তা দু'বার ফেরত আসতে দেখে অস্বস্তি ও বিস্ময় বোধ করে। নলিনাক্ষের দিল্লি অফিসের ডিপার্টমেন্টাল সাহেব অফিসের কাজে কলকাতায় আসে এবং তার সঙ্গী হওয়ার সুযোগে নলিনাক্ষ কলকাতায় এসে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করে বউবাজারের এক গলিতে। হঠাৎ এই নতুন ঠিকানা পায় শিয়ালদার কাছে আচমকা দেখা-হওয়া তার আর এক পিসির ছেলে টুনুর কথামতো।

বউবাজারে দিনের বেলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় দেখা করতে এসে নলিনাক্ষ এক জটিল অবস্থায় পড়ে। সে দেখে, তার ফরিদপুরের ধর্মভীরু, শুদ্ধাচারিণী সেই পিসিমাব সে শুদ্ধাচার নেই আহারে ও আচরণে। শোভনার বোন কিশোরী মিনুও সদ্য যৌবন আসার সুবাদে ওই বাড়ির দোতলায় মেসবাড়ির আবাসিকদের সঙ্গে কারণে-অকারণে যোগাযোগ রাখে। শোভনার একমাত্র ছেলেকে,নিয়ে গেছে তার জ্যাঠা-কাকারা, তারাই মানুষ করে। শোভনা তাদের ঘরের পার্শ্ববর্তিনী বিনোদবালার সঙ্গে যোগে বেঁচে থাকার একটা উপায় ধরে দিন কাটাতে সচেষ্ট। চরম দারিদ্র্যে তারা অনেক নীচে নেমেছে। আগের মতো সেই আন্তরিক আদর-আপ্যায়নের উত্তাপ নলিনাক্ষ পায় না। শোভনা আর পিসিমার মধ্যেকার— মিনুর দিনের আলোয় মেসবাড়ির লোকের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে আনা নিয়ে যে তুমুল অশালীন ঝগড়ার সম্মুখীন হয় নলিনাক্ষ, তাতে তার আড়ষ্ট অস্বস্তিকর মন আবও ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

মা ও মেয়ের অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে নলিনাক্ষ নিজেই সমস্ত দিকে অস্বস্তি কাটাতে ওদের বাড়ি থেকে চলে আসে। ছুটি শেষ, পরের দিনই দিল্লি চলে যাবে নলিনাক্ষ। কিন্তু ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নলিনাক্ষ ওদের এমন অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে বেশ কিছু সাহায্য দেওয়ার কথা ভাবে। সেদিনই বিকেলে দৈনন্দিন সাংসারিক প্রয়োজনের চাল, ডাল, জামা-কাপড় ইত্যাদি মাস তিনেকের জন্য অনেক কিছু কিনে সন্ধের পর ওদের বাড়ি আবার আসে। কিন্তু তখন সারা বাড়ির একতলা টিমটিমে

কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় মৃত্যুপুরীর মতো নিঃসাড়। মিনু-হারুদের ডেকেও সাড়া না পেয়ে যখন সে অসহায়, তখনি শোভনা বোঝে সে ডাক তার ছোড়দারই, আর তখনি এসেই নলিনাক্ষের পায়ের কাছে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে। এত খাবার, পোশাক পেয়ে শোভনার অসহ্য উল্লাস, অসীম তৃপ্তি। কিন্তু শোভনা যখন নলিনাক্ষকে বার বার চলে যাবার অনুরোধ করে তখনি আসে কদাকার দেখতে নেশাগ্রস্ত, কারখানার এক কর্মী-খদ্দের— যে শোভনার ঘরে ঢোকার জন্যেই আগে থেকে টাকা দিয়ে অবসরযাপনের সময় নির্দিষ্ট করে রেখে গিয়েছিল। শোভনা অসম্ভব রাগে চিৎকারে বঁটি নিয়ে তাকে তাড়াতে গেলে লোকটা গভীর রাতে আবার আসার কথা জানিয়ে প্রতিবেশী বিনোদবালার ঘরে আপাতত আশ্রয় নেয়। শোভনার কান্না ও প্রতিবাদ আরও তীব্র হয়। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যের দুঃখ-করুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে দিল্লি-প্রবাসী নলিনাক্ষ সে বাড়ি থেকে বিদায় নেয়। কাহিনীর এখানেই শেষ।

কাহিনীটি বক্তার অর্থাৎ নলিনাক্ষের দৃষ্টি ও তৎপরতা দিয়ে আঁকা। ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া কাহিনীসূত্রে এমন কোনো বড় ঘটনা ও তন্নিহিত ব্যঞ্জনা এই গল্পে নেই যা দিয়ে এর ক্লাইম্যাক্স রচিত হতে পারে। গল্পের প্লট চরিত্র-চিত্রে যতটা ঘন, কাহিনীর গতিতে ততটা নয়— আরম্ভে নলিনাক্ষর প্রবেশ, শেষে নলিনাক্ষর প্রস্থান। মাঝখানে নলিনাক্ষর দৃষ্টি দিয়েই দেখানো কয়েকটি ভেঙে-পড়া অসহায়, দরিদ্র, অবক্ষয়ে জর্জর মানুষের পারিবারিক ভাঙনের বেদনাদীর্ণ চিত্র। প্লটের আরম্ভ, বিস্তার ও পরিণামী ব্যঞ্জনা গল্পের কথকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। প্রবোধকুমার সান্যাল আলোচ্য গল্পে কাহিনীকে তুচ্ছ করে তাঁর শিল্পী-স্বভাব-ধর্মের আবেগকে দীপ্ত করেই বরং প্লটের একটা চেহারা রক্ষা করেছেন।

দুই

'অঙ্গার' গল্পের চরিত্র-পরিকল্পনাই এর সমস্ত গতিময়তার মূলে কার্যকরী থেকেছে। চরিত্রগুলি প্রত্যেকটি নিখুঁত বাস্তবতায় ধরা। পিসিমা, শোভনা, মীনু, হারু, টুনু, শোভনাদের প্রতিবেশী বিনোদবালা, সেই মাস্টার, শোভনার কাছে খদ্দের হয়ে-আসা কারখানার সেই নেশাগ্রস্ত মানুষটি— সবাই সমকালের মহামন্বন্তরে বিযাক্ত নাগরিক জীবন-বাস্তবতায় উজ্জ্বল চরিত্র। চরিত্রচিত্রই এই গল্পের প্রাণ ও গতি।

গল্পে মীনু, হারু, টুনু— এদের অল্প সময় দেখি। কিন্তু এদের সামান্য সংলাপেই ব্যঞ্জনা গভীরতর হয়ে সাংসারিক ও চারিত্রিক পতন ও পচনকে নিখুঁত করে। টুনুর সঙ্গে শিয়ালদায় নলিনাক্ষর দেখা হলে তার সম্পর্কে নলিনাক্ষর অভিজ্ঞতার বর্ণনা— 'কসাইখানার মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ, যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন।' তার সম্পর্কে বক্তার ধারণা দীর্ঘদিন পরে তাকে হঠাৎ দেখে— 'চমকে সে ওঠে নি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না।' পঁচিশ বছর বয়সেই সে বৃদ্ধ। তার বর্তমান অবস্থা 'নির্বোধ ভারবাহী পশুর মতো।' টুনুর সঙ্গে নলিনাক্ষর আকস্মিক সাক্ষাৎ এই গল্পের চাবিকাঠি। টুনু চরিত্রই বুঝিয়ে দেয় একজন

প্রবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক মানুষের কাছে মন্বন্তর-বিধ্বস্ত কলকাতাব নিম্নবিত্ত মানুষের অবস্থা কি? মানুষের অকল্পনীয় দারিদ্র্য. তাব বিরুদ্ধে সংগ্রামের নিরন্তর নিষ্ফলত্ব মানুষের চরিত্রে স্বাভাবিকতা, সৌজন্য, হৃদয়ের উত্তাপ, আবেগ-উচ্ছ্বাস, অকৃত্রিম আন্তরিকতা—এসবকে যে কিভাবে দলিত-মথিত করে নিঃশেষ করে দেয়, সমস্ত রকম মানবিক রক্ত-মাংসের আকর্ষণকে নিশ্চিহ্ন করে একটা শুকনো উচ্ছিষ্টে পরিণত করে, নলিনাক্ষর বড় আপনজন পিসতুতো ভাই টুনুর সংক্ষিপ্ত চরিত্রচিত্রটি তা-ই প্রমাণ করে। টুনুর একটি কথা নলিনাক্ষকে— 'তোমার খবর ভালো, দেখতেই তা পাচ্ছি। বেশ আছো।' এর মধ্যে যে কঠিন, রসকষহীন চাপা নিরাসক্ত শ্লেষ আছে, তা-ও টুনুকে যথার্থ নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত একটি পরাজিত যুবকের বৈশিষ্ট্যে আমাদের সামনে আনে।

মিনুর সঙ্গে নলিনাক্ষের প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যই গভীর বেদনার। মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা অভিশপ্ত হয়ে এসেছিল তেতাল্লিশের মহামন্বন্তরে, মিনুব সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনায় তার প্রমাণ।

> 'আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মিনু?
> মিনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস আমাকে?
> না।......
> মিনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?
> পোড়ারমুখি। বলে তার হাত ধরলুম... চল্ ভেতরে, তোর মার কাছে গিয়ে বল্‌ব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলেছিস?....
> বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিনুব ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে।'

এই চিত্রে দুই ভাইবোনের মধ্যে যে ব্যবধান, তা মানুষেব মানবিক স্মৃতি-বিনষ্টির অন্যতম উদাহরণ। তার জীবনযাপন ও জীবনধারণ তাকে ভাইয়ের সম্পর্কের মানবিক সূত্রটিকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। কিশোরীর পুরনো স্মৃতিব মোহ, আর দীর্ঘদিন পরে প্রবাসী দাদার সঙ্গে হঠাৎ এমন দেখা হওয়ায় যে সহজ, সরল, গ্রামীণ আনন্দ, উৎফুল্লতা— এই কিশোরীর মনে তা মুছে গেছে। এক মরুভূমির অভিজ্ঞতা আর অভিশাপ বুঝি মিনুর জীবন ঘিরে। সে তার মায়ের কাছে নলিনাক্ষর সামনেই বলতে পারে মেসবাড়ির লোকের কাছ থেকে একটি আধুলি নিয়ে আসার কথা। মিনু সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রের এক সার্থক অনুষঙ্গ।

হারুও মিনুর মতোই নলিনাক্ষের আর এক দৃষ্টি খুলে দেয়। হারুও নলিনাক্ষব দীর্ঘশ্বাসকে গভীর—গভীরতর করে। সে-ও তার দাদাকে চিনতে পারেনি। মায়ের প্রচ্ছন্ন নির্দেশেই মিনু মেসবাড়ির লোকেদের কাছে যায় পয়সা আনতে। মিনু যেভাবে পয়সা পায় তাতে এমন দারিদ্র্যের মধ্যে সহজেই পয়সা হাতে আসায় যেমন আনন্দ আছে, তেমনি আছে কিশোরী মেয়ের নিষিদ্ধ যৌনাবেগ খুশি করার উপায়ও। হারু তার দিদির এটাও বোঝে এবং বোঝে বলেই সকলের সামনে অবলীলায় মিনুকে বলে, 'মা তোকে রাত্তিরে

যেতে বলেছিলো না?' ভাই-বোনের এই অধঃপতন-চিত্র সে সময়ের সংসারে সহজ ঘটনার জীবন্ত প্রতিরূপ ছিল।

হিন্দু ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা পিসিমা চরিত্রটির বদল লক্ষ যোজন বুঝি! সে মা হয়ে নিজের মেয়েকে অন্য পুরুষের কাছে যেতে বাধা দেয় না। এমনকি কিশোরী মেয়েকেও সর্বনাশ জেনে পয়সা আনতে মেসবাড়িতে পাঠায়। নিজেও বুঝি একসময়ে সমস্ত সম্মান খুইয়ে ভিক্ষে করেছে। তার অতীতের সেই সমস্ত রকম গ্রামীণ শুদ্ধাচার, তার দেবীর মতো প্রণম্য ব্যক্তিত্ব আজকের অবস্থায় চরমতম ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে ওঠে। নলিনাক্ষ এতদিন পরে দেখা করতে এসেছে, সেখানে তার কোনো অন্তরঙ্গ আহ্বান নেই, বরং স্বরে আছে শীতলতা, ঔদাসীন্য আর অবহেলা। সর্ববিধ্বংসী দারিদ্র্য তাকে কঠোরতম বাস্তব রমণী করেছে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যত নীচের স্তরে নামা যায়, পিসিমা সেই স্তরে নামতেও রাজি। হারুকে সে রাস্তা থেকে মাংসের হাড়, বাসি পাঁউরুটি কুড়িয়ে আনতে বলে। নলিনাক্ষর কাছে শেষ অবশিষ্ট সৌজন্য, শালীনতা, শিষ্টাচারটুকু বাঁচাতে গিয়েও, ভদ্র হবার বাসনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়েও ধরা পড়ে যায়। শোভনার সঙ্গে তার যে কুৎসিত সংলাপ-বিনিময়ের সংঘর্ষ— তা পতনের চরমতম রূপের পরিচায়ক।

বিনোদবালা যে বারবণিতা, তার নামে ও কথায় প্রমাণিত। মাস্টার চরিত্রও অধঃপতিত। রাত্রির অন্ধকারে নাবীর সঙ্গে তার গোপন অভিসার তাকে অন্য মানুষের রূপে পাঠকদের সামনে আনে। 'অঙ্গার' গল্পের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র শোভনা। তার অসহায়তা, প্রতিবাদী স্বভাব, অভিমানবোধ, কান্না, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তীব্র দ্বান্দ্বিক মনোভঙ্গি তাকে মন্বন্তরকালীন বাঙালি পরিবারের পক্ষে বজ্রাহত, ঝড়ে-ঝাপটায় পর্যুদস্ত এক কঠিন বৃক্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়।

অকালবৈধব্য শোভনার এক ভাগ্য, ভাগ্যের অভিশাপও। সন্তানকে বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেওয়া তার জীবনধারণের পক্ষে এক নিয়তি। মিনু, পিসিমা, হারু, বিনোদবালা, মাস্টার— এরা জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শেষ অর্থ, শেষ অঙ্ক নির্ভুলভাবে বুঝে গেছে, শোভনা তা পারেনি। সে এখনো সংগ্রাম করে, করতে চায়। তার বার বার একই প্রশ্ন— 'আর কতদিন এমনি করে বাঁচতে হবে?' যেন সে সেই মুক্তির দিনটির জন্যই এমন নিরন্তর আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়। নলিনাক্ষর বর্ণনায় শোভনার বাইরের চেহারা— 'চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ। মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দু'খানা শির ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম।'

শোভনা চরিত্রে প্রবোধকুমার সান্যাল বেশি আবেগ যোগ করেছেন, তার ক্রুদ্ধ দীপ্ত সংলাপ অন্তঃস্বভাবে পুনরুক্তি-দোষ আনে। বস্তুত লেখকের আবেগ চরিত্রকে তার শিল্পের শাসনে রাখতে পারেনি। নিজের বক্তব্য নলিনাক্ষকে যেমন শোভনা অকপটে বলে গেছে,

লেখকের আবেগধর্ম সেই অকপটতাকে জিইয়ে রাখার সহায়ক হয়েছে। একমাত্র শোভনাই সেই ফরিদপুর গ্রামের পুরনো দিনগুলির কথা বলে। তার বেদনা তাকে স্মৃতিতে অনেক বড় জায়গায় নিয়ে যায়। শোভনা যে এখনো একেবারে মরেনি, তার স্মৃতির অমূল্য মুক্তাগুলি— যা উজ্জ্বল এ গল্পে— তা-ই প্রমাণ করে। তার চরিত্রে এখনো কিছুটা নীতিবোধ আছে চরম অসহায়তার মধ্যেও, দারিদ্র্যের শেষতম আঘাতের মুখেও। তা না থাকলে সেই কারখানার, বিনোদবালা কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট খদ্দেরের কাছে চরম ক্রোধে-জ্বালায়, বঁটি নিয়ে এগিয়ে যেত না। খদ্দেরটা নলিনাক্ষকে বলে— 'এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো, জানেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারী খেয়ালী।' এই সংলাপেই প্রমাণ হয়, শোভনার মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব আছে, সে দ্বন্দ্ব নীতি ও নীতিভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যেকার জটিল মানস-দ্বন্দ্ব। তার শেষ কথা—'আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি।' শোভনার কণ্ঠে এই যে জ্বালাময় অনুশোচনা-খিন্ন অকপট স্বীকৃতি, তা গভীর আবেগদীপ্ত হলেও চরিত্রকে যেমন প্রতিবাদী করে, লেখককেও চরিত্রের সঙ্গে এক করে দেয়।

অর্থাৎ, প্রবোধকুমার সান্যাল শোভনার চরিত্রে নিজেকেই বসিয়েছেন। লেখকের যে ভাবপ্রবণতা ও আবেগধর্ম— তাই শোভনা চরিত্রের নিয়ামক। গল্পের বিষয়-চিহ্নিত মূল রসকেন্দ্রে আছে চরম অমানবিক দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের সূত্রেই সমস্ত চরিত্র বাঁধা। যে কয়েকটি চিত্র গল্পে খণ্ড খণ্ড ভাবে অঙ্কিত, সেগুলির একই লক্ষ্য— অমানবিক দারিদ্র্য এবং তারই কারণে মানুষের, মানবতাবোধের, যাবতীয় সুস্থ নীতি-চেতনার, অবক্ষয়ের পচা ঘায়ের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ। চরিত্রগুলির আবেগদীপ্তি লেখক-আরোপিত কতকাংশে মনে হলেও তাদের সামগ্রিক চিত্ররূপ বাস্তবতায় ও মানব্যের সমূহ বিনাশী রূপে রক্তিম।

নলিনাক্ষ চরিত্রটি সমগ্র গল্পের কথক। তার প্রতিক্রিয়া দিয়েই গল্পের সমাপ্তি। এই প্রতিক্রিয়া লেখক-অঙ্কিত চরিত্রচিত্রের তাৎপর্য থেকে জাত। গল্পে নলিনাক্ষ কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়, সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী মাত্র। পিসিমা, মিনু, হারু— এদের অধঃপতনের ক্রমিক স্তরগুলিতে তার নিজস্ব ভাবনায় একটা সিদ্ধান্ত টানতে সচেষ্ট। সে একটি পরিবারের চরম দারিদ্র্যজনিত সংকটে কিছু খাদ্য, বস্ত্র নিয়ে সাময়িকভাবে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু এটুকুই তার দায়, তার মধ্যে তার গল্পের শিল্প-বক্তব্যের উপযোগী কোনো ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব তাকে তাড়িত করেনি। চোখে আছে ভাবালুতার, আবেগের মোহাঞ্জন, যুক্তির বুদ্ধির তীক্ষ্ণ শলাকা নেই। সে লেখকের প্রতিনিধি মাত্র, সমগ্র গল্পের বাইরে দাঁড়ানো দর্শকমাত্র, গল্পের আত্মার কেউ নয়। চৌকাঠ পেরোলেই তার প্রয়োজন শেষ।

তিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল থেকেই সারা পৃথিবীর মতো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে পর্যুদস্ত ভারত তথা বাংলাদেশে মানুষে-মানুষে অ-মানবিক বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা দিচ্ছিল। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের মতো ঘটনা তাতে সমূহ ইন্ধন জোগায়। মানুষ যেমন ভূমি থেকে সমূলে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৃক্ষের মতো অসহায় হতে থাকে, তেমনি পাশাপাশি পরিচিত-অপরিচিতদের ভিড়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ বলে ভাবতে থাকে। এমন এক বিচ্ছিন্নতার সর্বনাশ দিক 'অঙ্গার' গল্পের ভাবনিষ্পত্তিতে ব্যঞ্জনা পেয়েছে। আর সেই ভাবনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে লেখক-অঙ্কিত চরিত্রগুলিই প্রধান দায়িত্ব পালন করে। নলিনাক্ষর নিজের ভাবনাতেও তার সরব অনুশোচনার স্বীকৃতি:

> 'আমি এই পরিবারের মানুষ, আমি এদেরই একজন। এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরকাল আপনার জন বলে জেনে এসেছি-- এরা তারা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!'

এই যুক্তিতে 'অঙ্গার' গল্পের শ্রেণী-পরিচয় মন্বন্তরকালীন নবোদ্ভূত পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাজড়িত ভাবনায় সত্য হলেও রক্তমাংসের মানুষের চরিত্র-স্বরূপেই তার কেন্দ্রীয় আধাব। শোভনা, পিসিমা, টুনু, মিনু, হারু, মাস্টারমশাই, বিনোদবালা, যুদ্ধ-কারখানার 'এসেন্‌সিয়াল সার্ভিসের' সেই কামুক লোকটি—সকলেই সমবেতভাবে সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবকে একটা স্থায়ী রসকেন্দ্রে আনে। লেখকের লক্ষ্য চরিত্রাবলী—ছোট বড় যাই হোক, তাই 'অঙ্গার' শ্রেণী-পরিচয়ে চরিত্রাত্মক গল্পই।

'অঙ্গার' গল্পের মহামুহূর্ত অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স প্রধান চরিত্রকে নির্ভর করেই সামনে আসে। এ গল্পে নিটোল কাহিনী শুধু নয়, তেমন কোনো উল্লেখ করার মতো কাহিনী-অংশ নেই, ঘটনাও তা-ই বর্জিত। চরিত্রচিত্র বড় হওয়ায়, শোভনা— যাকে এ গল্পের নায়িকা বলতে বাধা থাকে না, তারই এক কঠিন মানস-দ্বন্দ্বের চরম সংকটের মুহূর্তে ক্লাইম্যাক্স ধরা পড়ে। এ গল্পের ক্লাইম্যাক্স ঈষৎ বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে। যেখানে ভয়ঙ্কর এক চাপা ভয়ে, অস্বস্তিতে, আড়ষ্টতায় এবং অস্বাভাবিক ত্বরিত-স্বভাবে রাতের স্বল্প-আলোর রহস্যময় পরিবেশে শোভনা অসহায় আর্তির মতো তার নিজের বড় প্রিয় আদরের মামাতো ভাই নলিনাক্ষকে বলে, 'এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি... তুমি যাও, একটুও দেরী কোরো না... লক্ষ্মীটি ছোড়দা...' তখনি গল্পের এবং সেই সঙ্গে চরিত্রের ক্লাইম্যাক্স অংশের শুরু হয়ে যায়। দাদাকে চঞ্চল অস্থির উদ্দাম স্বভাবে প্রায় জোর করে টেনে আনার সময়েই আসে তার নতুন জীবনযাপন শুরুর সাক্ষ্য সেই কারখানার কুৎসিত স্বভাবের লোকটি। সমগ্র গল্পের সবচেয়ে দ্বান্দ্বিক মুহূর্ত এখান থেকেই বিস্তারের সুযোগ

পায়। এর পর যেখানে 'উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো।'—সেখানেই এমন রুদ্ধশ্বাস ক্লাইম্যাক্স অংশের শৈল্পিক সিদ্ধি।

আবার আগের কথায় আসি, 'অঙ্গার' গল্পের ভাববস্তু হল মানুষের ক্যান্সার রোগাক্রান্ত রোগীর নিয়তি-নির্দিষ্ট অমোঘ মৃত্যুর মতো মানুষের অমানবিক অধঃপতন ও সমস্ত সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতাই। এই ভাবটিকে কেন্দ্রস্থ করতে গিয়ে প্রবোধকুমার সান্যাল সার্থক শিল্পের যথার্থ দাবি থেকে, তার অনুশাসন থেকে সরে গেছেন। এর মৌল কারণ লেখকের স্বভাবের আবেগধর্ম। গল্পে আগাগোড়া নিজে উপস্থিত থাকায় ভয়ঙ্কর কষ্টের চিত্রে সংযত থাকতে পারেননি। তাই চরিত্রের চারপাশে জমে উঠেছে সেন্টিমেন্টের বাষ্প, আবেগের আতিশয্য-জনিত স্ফীতি, সংলাপে একই ভাবের পুনরাবৃত্তি। প্রবোধকুমার সান্যাল সম্ভবত এত বেশি আবেগে তাড়িত হয়েছেন শোভনা চরিত্র আঁকতে গিয়ে যে, ভুলে গেছেন আক্ষরিক অর্থে শোভনা বাস্তবের কোনো নারী নয়। বাস্তব তথ্যের নারীর সত্য আর তারই শিল্পরূপের অস্তিত্বের সত্য এক হতে পারে না। শিল্পের শোভনাই তো সত্যকারের শোভনা, বাস্তবের শোভনা সেক্ষেত্রে প্রয়োজনহীন। তাই 'অঙ্গার' গল্পের চরিত্র-আশ্রয়ী মৌল ভাবটির একমুখিতা নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত ও কখনো বুঝিবা বিপর্যস্ত হবার মতো রূপ পেয়েছে। সেই সঙ্গে নলিনাক্ষ মানুষটিও শিল্পের পরিমিতি বোধ-বর্জিত একটি চরিত্রে রূপ পেয়েছে। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি গল্পের মধ্যেকার কোনো চরিত্রেরই নয়, কোনো ঘটনার নয়, তা গল্পের বাইরে চৌকাঠে দাঁড়ানো নলিনাক্ষর—তথা লেখকেরই নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এই অনুচ্ছেদের ইঙ্গিতধর্ম গল্পের শিল্পগঠনকে শিথিল করেছে—গল্পের বাকি অংশের কোনো দায় এর সঙ্গে সমন্বিত হয়ে নেই।

এখানেই গল্পটির আঙ্গিকগত ত্রুটি। এই ত্রুটির জন্য প্রবোধকুমার সান্যালের শিল্প-বিবেক নয়, সেন্টিমেন্টাল আবেগ-সর্বস্বতা দায়ী। লেখক নিরাসক্ত হতে পারেননি। এমন উদ্দেশ্যমূলক একাত্মতা যথার্থ শিল্পরূপের পক্ষে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর। প্রবোধকুমার সান্যাল মন্বন্তর-সময়ে লিখতে বসে সমাজের যে বড় ভাঙনকে ধরেছিলেন সাহিত্যে, তাঁর এই ছোটগল্পে—এখানেই শিল্পী হিসেবে তাঁর অনন্যতা। তাঁর গল্প, মানব-জীবনের যেন-বা ছোটবড় সমস্ত শিকড়-বাকড় সহ মূল ধরে টানে, মানুষকে আগামী দিনের ভয়াল জীবন-ভাবনার ছবি দেখায়। একটা শ্রেণীর মানুষ নীচের দিকে আর একটা পতিত শ্রেণীর মধ্যে নেমে আসতে বাধ্য হচ্ছে, একটা শ্রেণীর মানুষ তারই শ্রেণীর আর একজনকে অতীতের সমস্তরকম সুখ, মানবিক সম্বন্ধকে বিস্মৃত হয়ে অস্বীকার করছে, মানুষের স্মৃতির, সংগ্রামের কোনো মূল্য নেই, কান্নাটুক্ ছাড়া আর কোনো ভাষা নেই কথা বলার—এই দিকগুলি লেখক নিপুণভাবে রূঢ় সত্যের বিশ্বাসে রাখতে পেরেছেন এই গল্পে, এখানেই 'অঙ্গার' গল্পে বিস্ময়কর যুগচেতনার প্রকাশ এবং লেখকের সর্বাবয়ব শৈল্পিক মানস-মর্যাদাও।

চার

'অঙ্গার' গল্পের রচনারীতি, গদ্যভঙ্গি ও ভাষারীতির প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। লেখকের বর্ণনা অংশে যে যথেষ্ট আবেগ আছে, তা সহজবোধ্য। সেন্টিমেন্ট, আবেগের আতিশয্য, অতিকথন এই গল্পের গঠনকে শৈথিল্য দিয়েছে যথেষ্ট। প্রথম দিকে কলকাতার শিয়ালদা অঞ্চলে রাস্তায় টুনুর সঙ্গে নলিনাক্ষর দেখা হওয়ার আগের অংশটি নিশ্চয়ই অতিকথনদুষ্ট। এর বিবৃতিমূলকতা গল্পের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে স্বভাবী-পাঠকের কাছে মনে হতে বাধা নেই। আবার স্মরণ করিয়ে দিই, শোভনার সংলাপ দীর্ঘ হওয়াও ঠিক হয়নি। যথেষ্ট ব্যঞ্জনাগর্ভ সংলাপ তার মুখে বসানো যেত। তার সংলাপ যত বেশি ঘা মারে পাঠকমনের গভীরে, তার অনেক সেন্টিমেন্টও আবেগের অস্বস্তি সৃষ্টি করে। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদের শিল্প-যৌক্তিকতা আছে কিনা, তাতে যথেষ্ট সংশয় থেকেই যায়।

গল্পটির বাঁধুনিগত এত ত্রুটি সামলাবার পর আসে ভাষার ব্যঞ্জনা। নলিনাক্ষ নতুন জামা-কাপড় খাদ্য এনে শোভনাদের সামনে রাখলে শোভনার যে ফরিদপুরের গ্রামজীবনের অতীত স্মৃতি-চিত্রগুলির চকিত রোমন্থন, তা অসাধারণ কবিত্বে অনবদ্য। বর্তমানের পরিবেশের বৈপরীত্যে শোভনার অতীত স্মৃতি-রোমন্থন যে বেদনার জন্ম দেয়, যে আত্মিক যন্ত্রণার হৃদয়কে দেখায়, তার কবিত্ব অতুলনীয়। বোঝা যায় মানবিকবোধ অন্তত শোভনার মধ্যে এখনো মরে যায়নি।

গল্পে শোভনার আচার-ব্যবহারের বর্ণনায় কোথাও কোথাও অসাধারণ উপমা ব্যবহার করেছেন লেখক। সে-সব উপমা একেবারে চরিত্রের রক্ত-মাংস-মজ্জার অন্তর্গত অস্তিত্বই, তা চরিত্রের ছায়া-কায়ার মিশ্রিত এক রূপ। যেমন:

> 'শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো এক প্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো।'

এই হাসির বর্ণনা শোভনার চরিত্রের অন্তস্তলের স্বভাবের তাৎপর্যেই তৈরি হয়ে গেছে, লেখককে এতটুকু ভাবতে হয়নি। 'অঙ্গার' গল্পে বর্ণনা ও বিবৃতিমূলকতা বেশি স্থান পেয়েছে ঠিকই, তা গল্পের কথকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মূল চরিত্রগুলিতে ততটা নয়।

পাঁচ

চরিত্রপ্রাণ গল্প হলেও 'অঙ্গার' গল্পে নামের আছে অর্থের দূরতর ব্যঞ্জনা। লেখক চরিত্র ধরে নাম রাখেননি গল্পের, বিষয়ের গভীরে যে কেন্দ্রীয় বক্তব্যের ব্যঞ্জনা, তাতেই প্রধানতম দৃষ্টি রেখেছেন। লেখক স্বয়ং গল্পের শেষে নলিনাক্ষর পরিণামী-চিন্তার মধ্যে নামের একটা ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন,—'মনে হলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাগ্রস্ত কাঙালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-

ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে।' তাই গল্পের শোভনা, পিসিমা—এদের ভিতরের জ্বালা, অভিমান যেটুকুবা আছে, তা-ও নিষ্ফল আক্রোশে, দারিদ্র্যে, নীতিহীনতায়, পতন ও পচনশীলতায় ক্ষয়িত হতে হতে অবশেষে একদিন সমস্ত কিছু নিরঙ্কুশ অন্ধকারকেই ডেকে আনবে। অঙ্গারের আগুনের মতোই তাদের নিস্তেজ হয়ে শূন্য হওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া। এই অর্থে নাম শিল্প-সম্মত। দ্বিতীয় আর একটি তাৎপর্য শোভনা চরিত্র ধরে উঠে আসে। গল্পের ছোটবড় আর সব চরিত্রের মধ্যে শোভনাই যা এখনো কিছুটা অক্ষম প্রাণের পরিচয় দেয়। সে এখনও সত্যিকারের রাগতে জানে, ক্ষোভে, প্রতিবাদে মুখর হতে পারে, নীতি-আঁকড়ানোর যন্ত্রণা, দ্বিধা, অক্ষমতার মধ্যেও, মানবিক বোধেও কাঁপতে জানে। তার যেসব বোধ অঙ্গারের মতো জমেছে, তার অভ্যন্তরে ধিকিধিকি আগুনটুকু বুঝিবা থেকে গেছে। জ্বলে ওঠার ইন্ধন পেলে জ্বলে উঠতেও পারে এবং সে প্রজ্বলন অক্ষম হলেও নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য। শোভনার স্বভাবের এই অর্থে গল্প-নাম গভীর অর্থবহ। তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা টানা যায়। গল্পের চরিত্রগুলির ওপর সর্বদিকের নীতিবোধ, কামনা-বাসনা, মানবতাবোধ দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তে ছাই জমা করে অঙ্গারের স্তূপ রচনা করেছে কখন যেন! মিনু, হারু, পিসিমা সকলেই শোভনার যা নিজস্ব নৈতিক সঞ্চয়, তা ভুলে গেছে, ভুলতে বসেছে শোভনাও! এই স্তূপের স্বভাব গল্পের সামগ্রিক চরিত্রগুলিকে স্থির রাখে। তাই 'অঙ্গার' গল্পের এমন নাম যেনবা সমগ্র গল্পের শরীরে, স্বভাবে তপ্ত ভস্ম ছড়ায়, ভস্মে বেদনাদায়ক আচ্ছাদন আনে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম: ২৯ মে ১৯০৮

'কল্লোল' এবং 'কালিকলম' দুটি পত্রিকাই প্রকাশিত হয়ে, সমকালের তরুণ বুদ্ধিজীবী লেখকদের দাক্ষিণ্যে একটা আন্দোলনের চেহারা দিয়ে কয়েক বৎসর পরে বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরে এসেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে' কোনো গল্প-উপন্যাস লেখার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু 'কল্লোল' বন্ধ হয়ে গেলেই যে তার ধর্ম ও প্রভাব রুদ্ধ হয়ে যাবে, মুছে যাবে— এরকম কোনো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন কোনোকালেই ঘটে না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। তাই তিনি লেখক হিসেবে কল্লোলের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে কিছুটা চিহ্নিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসব সময়েরই স্বভাব!

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন', বুদ্ধদেব বসুর মতে তিনি 'belated Kallolean', তাঁর রচনা বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিতে 'of Kallol in spirit.' কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় কল্লোলীয় আদর্শ গৃহীত হয়েছে সংযমে, শাসনে, চিন্তার গভীরে। এই বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে কার্যকরী থেকেছে। কল্লোলের কালে ছিল তীব্র যৌবন-উন্মাদনা, কোনো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে তথাকথিত বিদ্রোহের ধর্মে সোচ্চার করা, সময়ের প্রেক্ষিতে লেখকদের নিজেদের আবেগ, উচ্ছ্বাস-উদ্দামতাকে স্বভাবের আতিশয্যে দীপ্ত করা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলা কারণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধিসমন্বিত ভাবনায় এসব অতিরিক্ততা থেকে দূরে রেখেছিলেন তাঁর সাহিত্য-ভাবনাকে।

'আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)।' নিজের সম্পর্কে এমন বলিষ্ঠ বক্তব্য তাঁকে পূর্বসূরি কল্লোলীয়দের থেকে অভিজাত স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, 'প্রকাশ্য ও মুখোশপরা হীনতা, স্বার্থপরতা'-র অভিজ্ঞতায় বিরক্ত হয়েছিলেন, আবার 'চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগদীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবনকে' আর এক অভিজ্ঞতায় দেখতে উৎসুক ছিলেন। সাহিত্য-জীবনের গোড়া থেকেই এই জিজ্ঞাসা তাঁকে তাঁর বাস্তববোধের শিক্ষা দিয়েছে। সেই বাস্তবতাবোধ তাঁকে একদিকে নিরাসক্তচিত্ততায় বিশিষ্ট করে, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক নির্মোহ স্বভাবে বুদ্ধিপ্রাণ করে তোলে।

বৈজ্ঞানিকদের মতোই তাঁর অন্বেষণ—জীবন-অন্বেষণ। কোনো ভাবালুতা, নয়, কোনো গোঁজামিল নয়, সর্বস্তরের মানুষের যৌনতা, মনস্তত্ত্ব, বিকারগ্রস্ততা যেমন তাঁর বৈজ্ঞানিক

বাস্তব দৃষ্টির পক্ষে অন্বিষ্ট বিষয়, তেমনি নীচের তলার সমাজ-মানুষের অসহায় অমানবিক শোষণজনিত অস্তিত্বের সংকট—এ সমস্তই তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট করে। তাঁর ছোটগল্পে এই দু'য়েরই সম্যক দরদি প্রতিচিত্রণ লক্ষ করি। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার সংজ্ঞা নির্ণয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কল্লোলীয়দের আবেগধর্মের আতিশয্য, বিদ্রোহের নামে যৌবনধর্মের অযথা অপচয়, নীচের তলার মানুষদের কথায় ভাবালু দরদ তার সন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্তি ছিল না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে জীবন, জগৎ, মানুষকে দেখেছেন, দেখাতে চেয়েছেন। এইখানেই তার বাস্তবতা, আধুনিকতা, স্বাতন্ত্র্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয় ও রীতিতে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি কল্লোলীয় হতে পারেননি। প্রত্যক্ষভাবে 'কল্লোল' উঠে যাওয়ার পর তিনি সাহিত্য রচনা করতে বসে শান্ত সংযতভাবে মানুষকে দেখেছেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হতে থাকেন। যে নিজস্ব তাত্ত্বিক বাস্তবতায় তাঁর প্রাক-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের রচনার জন্ম, যুদ্ধ-সময়ে ও যুদ্ধোত্তর কালে সেই নিজস্ব তাত্ত্বিক বুদ্ধিগত বাস্তবতার শিক্ষা ও প্রয়োগ মার্কসবাদে বড় তাৎপর্য পায়। যুদ্ধোত্তর কালের গল্পে তা-ই প্রযোগ করেছিলেন। যুদ্ধ-পূর্ব-কালের 'আত্মহত্যার অধিকার' ও 'প্রাগৈতিহাসিক', যুদ্ধ-সমকালের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্প এবং যুদ্ধোত্তর সময়ের 'হারাণের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণে আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ মেলে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধ-পূর্বকালের রচনায় মানুষের জীবন, তার আদিমতা, জৈব তাৎপর্য ও আদি-অন্তহীন স্বভাবকে গল্পে শিল্পের মূল্যে যথার্থ রূপ দিয়েছেন, যুদ্ধ-সমকালের রচনায় সাধারণ জীবন থেকে ব্যক্তি-মানুয ধরেই তারই ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে সমষ্টি-মানুষের সন্নিহিত হতে চেয়েছেন, যুদ্ধোত্তর গল্পে সমষ্টি মানুষের হয়ে সারা পৃথিবীর পক্ষে বড় সমাজ-ন্যায়ে সোশিয়ালিজমকে বড় জীবন সন্ধানে ও মানবতার স্বরূপ-অঙ্কনে বিশ্বাসী থেকেছেন। আবহমান কালের আদি-অন্তহীন জীবনস্বভাব, নাগরক ব্যক্তির সূত্রে সমষ্টির কথায় চলে আসা, সমষ্টি মানুষের ভিড়ে মহত্তম মানবতায় উদার মুক্ত সমাজ-কল্পনা—এ সবই ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সুরকে চিহ্নিত করে দেয়। এ সবই বাস্তবতায় বিশিষ্ট হয়ে গেছে বর্তমানে লেখকের বুদ্ধিনির্ভর নিরাসক্ত দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহলী ও বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গির কারণে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদি কোনো বিশেষ জীবনদর্শন থাকে, তা এ সবের কেন্দ্রেই স্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গল্প 'কুষ্ঠরোগীর বউ', 'হলুদপোড়া', 'শিল্পী', যুদ্ধ-সমকাল ধরে যুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত পটভূমির প্রসারণে লেখা গল্প 'দুঃশাসনীয়', এক নব ব্যাখ্যায় নর-নারীর যৌন সম্পর্কের টীকা-ভাষ্য রচনায় রুদ্ধশ্বাস আদিম সত্তার উন্মোচনে

'সরীসৃপ'— এমন সব গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকার সত্তায় বিতর্কের অবকাশ তৈরি করে। যে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্বে বসে জটিল যৌনতা ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে গল্পে অসামান্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি-চিন্তা-মননের প্রমাণ রেখেছেন, সেই সঙ্গে মানবতার এক নিরাসক্ত অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন, যুদ্ধ পরবর্তী কালের গল্পে সেই পুরনো ভাবনাকেই নতুন করেছেন মানবতার নতুন ব্যাখ্যায়। সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই স্তরের গল্পের লেখক-মানসেব কঠিন চালিকা শক্তির কাজ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোভাবেই পথভ্রষ্ট হননি, উত্তরণ ঘটিয়েছেন আপন শিল্পী-মানসের। মহাশ্বেতার কুষ্ঠরোগীদের সেবা, মদন তাঁতির শিল্পের সঙ্গে জীবনের, শিল্পের সঙ্গে সংগ্রামের কঠিন শপথে যোগসাধন বাসনা, নগ্ন নারীদের বস্ত্রের অভাবের দিনে মানবতাবিধ্বংসী সম্পর্কের অসহায় সম্মুখীন হওয়া, মানুষের সংস্কারের জীবন বিরোধী দিককে চোখে-আঙুল দিয়ে দেখানো, মানুষের আদিমতম বৃত্তির উৎকট উপস্থিতি সভ্য মানুষের অন্তস্থলে—এসব দিয়ে লেখক হয়েছেন বিশ শতকের এক নির্মম শিল্পী-সাধক।

১.

আত্মহত্যার অধিকার

এক

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে আমরা বিশেষ বড় জাতের গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত পরিচয় পাই। এই গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় লেখকের 'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প' এই নামের গল্প-সংকলন গ্রন্থে। এ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস। আমরা জানি, কল্লোলীয়রা একেবারে নীচের তলার মানুষদের মধ্যে নেমে গল্পের বিষয়ভাবনার কথায় মেতেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী', শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির কাহিনী', অচিন্ত্যকুমারের 'সারেঙ' গল্পে এর প্রমাণ আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টির অধিকারী, যদিও বিষয়ের ভাবগত সাযুজ্য অস্বীকার করার নয়।

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি সবদিক থেকে চরমভাবে ভেঙে-পড়া, পর্যুদস্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের অসহায়ভাবে বাঁচার কাহিনী, প্রয়োজনের জীবনের অস্তিত্বটুকু কোনোরকমে টিকিয়ে রাখার কাহিনী। এর কাহিনী-অংশ সেই পরিবারের গৃহকর্তার আত্মনিগ্রহের চিত্রে বিশিষ্ট। এক বর্ষণমুখর প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে এমন একটি নিম্নবিত্ত, বা বলা ভালো, দরিদ্র পরিবারের গৃহকর্তা নীলমণি দুই পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রী নিয়ে ঘরের মধ্যে তটস্থ। ঘরের চাল পুরনো হওয়ায় এবং যথাসময়ে সংস্কার করার অর্থনৈতিক অক্ষমতায় ফুটো হয়ে গেছে চারপাশে। ঘরের মধ্যে বৃষ্টি-পড়াকে সামলাতে পারছে না। স্ত্রী নিভা কোলের ছেলেকে সামলাতে ব্যস্ত। মেয়ে শ্যামা ঘুম ভেঙে উঠে বাবার রাগের কাছে অসহায়। নীলমণি স্ত্রী-ছেলেমেয়ের এমন অসহায় পরিবেশে ক্রমশ জীবন-অস্তিত্বের মূল্যে নিজেকে অসহায়, একা মনে করে। মাঝে মাঝেই তার মনে হয় তার বেঁচে থাকার যেন কোনো অধিকার নেই।

রাত বাড়লে, বর্ষণের চাপ বৃদ্ধি পেলে স্ত্রী নিভা সরকারকে পাকা বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার কথা বলে স্বামীকে। স্বামী জানে তাদের মতো দরিদ্রের পক্ষে অবস্থাপন্ন বাড়ির মানুষের কাছে এমন অসহায়তার মধ্যেও আশ্রয় ভিক্ষা করার কি হীনম্মন্যতা, উপেক্ষা, জ্বালা থাকে। প্রথমে যেতে অস্বীকার করলেও প্রকৃতির বর্ষণ উত্তরোত্তর বাড়লে একসময়ে যেতে বাধ্য হয় সেই অক্লান্ত বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার গভীর কাদা, জল ঠেলে। সঙ্গে আসে তাদের আশ্রয়প্রার্থী উঠোনের কুকুরটাও। সরকার বাড়ির বড়ছেলের উপেক্ষা-মিশ্রিত দাক্ষিণ্যটুকু মিললেও যে ঘরে তারা আশ্রয় পায় এক নোংরা চটে শুয়ে থেকে রাতটুকু কাটাবার, সেই ঘরেই বড়ছেলের অসুস্থ পিসেমশাই শুয়ে আছে চৌকিতে। আশ্রয়ের সাময়িক স্বস্তি ও ঘুমোবার আনন্দটুকুও নিষ্ফল ও বীভৎস শ্বাসরুদ্ধকারী হয়ে ওঠে, যখন তারা চোখের সামনে দেখে সরকার-বাড়ির পিসেমশাইয়ের বাইরের বাতাস থেকে সামান্য শ্বাসটুকু গ্রহণ করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার চরম অক্ষমতার অসুস্থতার চিত্র। নিজের বাড়ি

থেকে শ্যামা বাবার যে জলহীন হুঁকাটুকু বয়ে এনেছিল তাতেই নীলমণির তামাক টানার নিষ্ফল আরামের স্মৃতিটুকু জিইয়ে রাখার চিত্রের মধ্যেই গল্প শেষ হয়ে যায়।

গল্পটির কাহিনী গল্পে চিত্রিত পরিবারের গৃহকর্তা এবং গল্পের নায়কও নীলমণির পরিপার্শ্ব থেকে নিজেকে দেখা ও বিচারণা দিয়েই শুরু। নিজের চাল-ছেঁদা-হয়ে-যাওয়া বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে জর্জরিত বেড়ার ঘরের মধ্যেকার অসহায় উৎকণ্ঠিত মানুষগুলি চিত্রে তার বিস্তার। সরকারদের বাড়ি এসে এক সম্পূর্ণ অসুস্থ, দম-বন্ধ-করা ঘরের পরিবেশে শেষ আশ্রয় লাভে সেই গল্পের শেষ। কাহিনী-বৃত্তটি গল্প ও চরিত্রের হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। এ গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনীকে একেবারে বর্জন করেননি। নিজের বেড়ার ঘর থেকে নীলমণির সরকারদের পাকা দালানে প্রবল বর্ষণমুখর রাতে সপরিবারে এসে আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে একটি কাহিনী আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। গল্পাংশ তার মধ্যে গভীর-নিবিড়। গল্পের যেখানে আরম্ভ আর যেখানে শেষ— দু'য়ের মধ্যেকার নিটোল বন্ধনটুকুর শিল্পমূল্য অস্বীকার করা যায় না।

নীলমণির সংসার-চিত্রে কাহিনীর একটা অংশ, সরকার বাড়ির বড়ছেলের কথা, আচরণে কাহিনীর আর এক পক্ষের জীবন্ত ছবিতে কাহিনীর বিস্তার-চিত্র, সব শেষে পিসের অসুস্থতার ভয়াবহ ছবি ও নীলমণির জলহীন হুঁকায় আরাম করে তামাক টানায় ব্যঙ্গাত্মক আত্মগোপনে কাহিনীর চমৎকার পরিণামী ব্যঞ্জনা— সবই সার্থক শিল্পের সাযুজ্য লাভ করে। এ গল্পে কাহিনীও আছে, গল্পের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির মতো ঘটনাও আছে পরিণামে, আবার কাহিনীটি নীলমণি, নিভা, শ্যামা— এদের সমবায়ে একটা স্থায়ী আশ্রয়ও করে নিয়েছে চবিত্রভিত্তির গভীর তাৎপর্যের মধ্যে। তাই 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে কাহিনী গ্রহণ ও বিস্তারে শিথিল হয়নি, তার মন্থর করেনি প্লটকে, অথবা ঘটনাবলী এনে সস্তা চমকও সৃষ্টি করেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রথম দিকের গল্পে তাঁর গল্পকার-বৈশিষ্ট্য তাঁকে যথার্থ কল্লোলীয়দের সন্নিহিত ব্যক্তিত্ব করে তোলে।

দুই

কাহিনীর মতো চরিত্রও 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে উপযুক্ত মর্যাদা পায়। নীলমণি চরিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক লেখনীর সৃষ্টি। তার বৃষ্টির মধ্যে ঘরের পরিবেশে সমস্ত রকম চিন্তা-ভাবনা তাকে বিশিষ্ট করে তোলে। সে এত অসহায়তার মধ্যেও ভাগ্যের কথা বলেনি, ভগবানের দোহাই দেয়নি একবারও। চারপাশ থেকে সে যেন অভিমন্যুর মতো এক শরবিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তার ক্রোধ একেবারে স্বভাবসিদ্ধ। সে যুক্তি দিয়ে স্ত্রী, মেয়ের ব্যবহারের বৈসাদৃশ্য বোঝে, কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তির কাছে যখন সে পরাজিত হয়, মনে মনে তখনি সে রেগে যায়। আর রেগে গেলে তার মনে নানান প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এই সব প্রতিক্রিয়ার একটি প্রধানতম হল— 'বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন।' তার দারিদ্র্যের চিন্তা মাঝে মাঝে তার অসহায়তাকে আরাম দেয়। এ তার দুঃখের মধ্যে, চরম অসহায়তার মধ্যে, যুক্তিসিদ্ধ সান্ত্বনা। তার রাগ

তীব্র হলে নিজের ওপর সব দায়িত্ব নিয়ে নেয়। নিভা তাকে সরকার বাড়িব আশ্রয়ে যাওয়ার কথা বললে তার আত্মসম্মানে লাগে, কিন্তু তবু এক সময়ে সে যেতে রাজি হয়।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যার ওপর রাগ করেও সে একসময় রাগ সামলে বুদ্ধির মধ্যে এসে স্থিত হয়। তখন স্ত্রীর অসহায়তা, শ্যামাকে অকারণ মারার জন্য দুঃখ তাকে গভীর পীড়া দেয়। আর তখনি তার মন-খারাপের মধ্যে ভেবে নেয়— 'মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে।' নীলমণির আত্মহনন-বাসনা মাঝে মাঝেই তার মধ্যে ঠেলে ওঠে। সরকার বাড়ি যাওয়ার পথে তার নিঃশক্তি অবস্থা সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ, — 'তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,— সে কোন্ দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?' প্রকৃতির প্রতিকূল স্বভাব, অবস্থাপন্ন মানুষের স্বার্থসর্বস্ব হীন আচরণ, নিজের পরিবারের ফুটো নৌকায় চেপে সমুদ্রপারের মতো অবস্থা বাস্তবিক অর্থে নীলমণির বেঁচে থাকার প্রয়াসের মধ্যেও আত্মহননের মানসিকতা তৈরি করে দেয়।

গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় জলহীন হুঁকায় নীলমণির আরামের টান দেওয়ার প্রয়াস আত্মহননে প্রস্তুত হওয়ারই প্রতীকী স্বভাব। 'বাতাস। পৃথিবীতে কত বাতাস। তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকায় ওর দম আটকাইল।' সরকারদের পিসের জীবনের উপযোগী বাতাস নেওয়ার অসহনীয় কষ্ট, আর তার জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য এক একজন মজুত করার ফলে নীলমণির সর্বদিকের অসহায়তা যেন এক হয়ে যায়। মুমূর্ষু পিসে আর জীবনভাগ্যে সম্যক পর্যুদস্ত নীলমণি এক হয়ে একই ঘবের পাশাপাশি বিছানায় থেকে প্রতীকের ব্যঞ্জনায় শিল্পের অসাধাবণত্ব পেয়ে যায়। নীলমণি চরিত্রের পরিণামী ব্যঞ্জনা অনবদ্য।

নিভা, শ্যামা চরিত্র-দুটি নীলমণির শিল্পভিত্তি দানেই পরিবার-চিত্রে কিছুটা বিস্তৃত হয়েছে। তার এমন দারিদ্র্যের মধ্যেও, স্বামীর দিক থেকে তিক্ত ভর্ৎসনা ইত্যাদি পেয়েও নাবালক পুত্রস্নেহে ও মমতায় নিভা স্বামীকে মান্য করে, ভয়ে শ্রদ্ধাটুকুকেই সত্য করে। লেখক প্রতীকী বাক্য প্রয়োগে স্বামীর শ্লেষাত্মক কথায় নিভার স্বামীভক্তির ও স্বামীর ওপর নির্ভরশীলতার প্রমাণ রেখেছেন— 'নিভা আর কিছু বলিল না। রুক্ষ চুলের ওপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথার কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।' শ্যামা তার মায়ের মতোই সহনশীলা কিশোরী। বাবার হঠাৎ-হঠাৎ অকারণ রাগ ও ভর্ৎর্সনায় সে হতভম্ব হয়ে যায়। বাবার একাধিক আচরণের অসঙ্গতির মধ্যেও সে তার স্বাভাবিক সরল নিষ্ঠার এতটুকু ঘাটতি রাখে না। শুধু ভুলু নামের কুকুরটাকে বাবা রাগে মারতে গেলে শ্যামা তীব্র প্রতিবাদ করে। তার প্রতিবাদী স্বভাব মানবতার সঙ্গে যুক্ত কিছু বোধের। সে তার জন্য বাবার কাছে ভয়ঙ্কর মার খেতেও দ্বিধা করে না। সরকারবাড়ির বড় ছেলেব অসুস্থ পিসে আর অনাত্মীয় নীলমণি অবস্থাপন্ন মানুষের কাছে একই স্তরের। তাই

দুজনের প্রতিই বড় ছেলের অবহেলা, তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা! পিসের অবস্থায় যে নির্মম অমানবিকতা, নীলমণির জীবনেও তাই।

তিন

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি একটি ভেঙে-পড়া দরিদ্র পরিবার ও তার গৃহকর্তাকে নির্ভর করে গড়ে উঠলেও এর শ্রেণীপরিচয় সমাজ-সমস্যামূলক গল্পের সূত্রেই নির্দিষ্ট করা যায়। শ্রেণীবৈষম্য বুর্জোয়া সমাজের নিজেরই তৈরি করা বিষয়। মানুষ নিজের স্বার্থেই শ্রেণীবিভাগ জিইয়ে রাখে, আর সেই সূত্রে মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর গড়ে ওঠে। মানব্য ধ্বংসের অবধারিত দিক এমন বিভেদের চিত্রে সত্য হয়। নীলমণির ও তার পরিবারের যে ভাগ্য, তা মানবসমাজ নির্দিষ্ট এবং সৃষ্ট এক নিয়তি।

গল্পটির ক্লাইম্যাক্স একেবারে শেষতম অনুচ্ছেদে দেখা দিয়েই ব্যঞ্জনায় গল্পটি শেষ হয়েছে। গল্পের নায়ক নীলমণির জলহীন হুঁকা টানায় প্রতীকের ব্যঙ্গে গল্পে চরমমুহূর্ত চিহ্নিত হয়ে যায়। চরিত্রের অস্তিত্ব রক্ষা-জনিত সংকটের তীব্রতা ও অস্তিত্ব রক্ষার অক্ষম নিষ্ফল প্রয়াসেই গল্পের পরিণামী-ব্যঞ্জনার দিক। ভাবের একমুখিনতাও প্রধান চরিত্র ধরে শিল্পের মহত্ত্ব লাভ করেছে। কাহিনীর যেটুকু উপস্থিতি সারা গল্পে, ভাবের এককেন্দ্রস্থিত তীব্রতায় তার গুরুত্ব পরিত্যক্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নীলমণি, নিভা, শ্যামা, এমনকি পিসের অস্তিত্ব এনে কোথাও বিবরণের আশ্রয় নেননি। বুদ্ধির অধিগত চিন্তাই ছোটগল্পের ইঙ্গিতময়তাকে আদ্যন্ত রক্ষা করেছে। লেখকের কাহিনী ও চরিত্র থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার অবলোকন, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির অনুগত।

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পের ভাষার তির্যকতা লক্ষণীয়। নীলমণির বিশেষ এক মানসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে তার বাইরের চিত্র এঁকেছেন এমন বাক্যাংশে—'সিদ্ধ-করা চামড়ার মতো ফ্যাকাশে ঠোঁট।' একাধিক বাক্যগঠনের ব্যঞ্জনা সুগভীর:

১. 'ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কি অপরাধ যে মেয়েটাকে ও-রকমভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?'

২. 'না আছে তামাক, না থাক। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত।'

৩. 'মেয়েকে না-মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে।'

৪. 'ঘরে ওকোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ... এত রাতে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন হিসেবে?'

এমন একাধিক বাক্যের অন্তর্নিহিত শ্লেষ-ব্যঙ্গ গল্পের গদ্যকে অসাধারণ দীপ্তি দিয়েছে।

চার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মহত্যার অধিকার' এমন নাম দিয়ে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গটিকে বজায় রেখেছেন যথোচিত শিল্পসম্মতভাবেই। নীলমণির পরিবারের যে চরমতম দুর্দশার চিত্র, তাতে স্বাভাবিকভাবেই পিতার আত্মহননের বাসনা জাগবে। গল্পের কথায় একাধিকবার সে মৃত্যুর কথা ভেবেছে। তার স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক যে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে, সেই মানবিক সম্পর্কের ক্রমভঙ্গুর নীরব স্বভাব-প্রকাশে নীলমণির শিহরিত মনের গভীরে উপলব্ধি আসে— 'বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন।' গল্পে বর্ষণমুখর রাতে নীলমণির পারিবারিক চিত্রের যে আত্মার উন্মোচন, তা থেকে রুদ্ধশ্বাস মানুষ শূন্যতাই সত্য মনে করে জীবনের পক্ষে। শূন্যতা সত্য হলেও তো জীবন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যায়, মানুষ নিজে থেকেই মৃত্যুকে বরণ করে। সারা গল্পে নীলমণির এমন অবস্থার প্রতিচিত্রণ আছে বলেই আত্মহত্যাটা অধিকারের শর্তে স্পষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, গল্পের শেষে নীলমণির যে পিসের কাছে অসহায়ভাবে বাস ও জলহীন হুঁকোর মধ্যে আরামের বাতাস গ্রহণের প্রয়াস— তাও প্রতীকী স্বভাবে আত্মহননেরই একজাতীয় চিত্র। সরকারের বড় ছেলে এইভাবেই তাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পিসের বাঁচার উপযোগী বাতাসের জন্য বীভৎস আর্তি নীলমণির অস্তিত্ব রাখায় বিশেষ সর্বাবয়ব স্বভাবের প্রতিরূপই। পিসের অসুস্থ হয়ে মুমূর্ষু হওয়া আজ জীবনের অসম-অবস্থার অবধারিত রূপে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে adjust করার অক্ষমতা এবং তজ্জনিত শূন্যতাবোধ আত্মহত্যাকেই সত্য করে।

তৃতীয় কথা হল, আত্মহত্যা তো মানবিক ও সামাজিক আইন— দু'দিকের প্রয়োগেই অন্যায়, পাপ। তা ক্ষমাহীন। সমাজ তার আইনে আত্মহননকারীকে কাঠগড়ায় নিয়ে যায়, বিচার করে। মানবতাবোধ আত্মহত্যাকে সবলে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তা জীবনের পক্ষে অধিকার হতেই পারে না। অথচ আলোচ্য গল্পে সেই আত্মহননকে অধিকার হিসাবে ব্যঞ্জনা দেওয়ার চেষ্টা আছে। যে সমাজ আত্মহননের বিরুদ্ধে আইন করে, সেই সমাজই আত্মহননে মানুষকে বাধ্য করে। যে সমাজ মানবিক সম্পর্কের কল্যাণের জন্যই, শুভ বোধ প্রতিষ্ঠার জন্যই আত্মহননকে পাপ বলে, পলায়নী মনোবৃত্তি বলে, সেই সমাজই মানবতাকে ধ্বংস করতে চায় মানুষের সুস্থ সবল অস্তিত্বের মাটিকে নড়বড়ে করে। সুতরাং 'আত্মহত্যার অধিকার' নামে গভীর ব্যঞ্জনা ও ব্যঙ্গনিহিত স্বাভাবিক অর্থেই।

২.

প্রাগৈতিহাসিক

এক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি তাঁর এই নামেরই একটি গল্প-সংকলন গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট গল্প। গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কল্লোলীয়দের অবাধ যৌনতার ভাবনা ও প্রভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেভাবে

নেননি। তাকে নিজ শিল্প-স্বভাব দিয়ে ভিন্ন তাৎপর্য দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের সূচনা থেকেই জীবন সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা ছিল। সে জিজ্ঞাসা প্রচলিত পথে, আবেগদীপ্ততায় বা মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টাল স্বভাবে কখনোই মূল্য পায়নি, তাকে জীবন-আবির্ভাবের উৎস-চিহ্নিত মূল প্রকৃতিতে ধরার বাসনা ছিল।

মধ্যবিত্ত ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষও তিনি। আর এই সমাজের কৃত্রিমতা, মুখে রঙ মাখার মতো উৎকট জৌলুস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছিল 'সমুদ্রের স্বাদ' উপন্যাসের 'লেখকের কথা' শীর্ষক ভূমিকা রচনার সময়,— 'মিথ্যের শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠবে, মলমের ব্যবস্থা করবে।'

অর্থাৎ পোশাক-পরা মেকি সভ্যতার আড়ালে যে আদিম স্বভাব আছে, তাকে বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস আছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার যথাযথ সত্যতা চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন। মানুষের জীবনের মৌল রূপটি যতই আদিম হোক, কি তার আসল রূপ— এই ভাবনা থেকেই রচিত হয় 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প। এই গল্পের সৃষ্টির মূলে শিল্পীর পক্ষে কল্লোলীয়দের উপযোগী যৌনভাবনার স্পর্শ থাকতেও পারে।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেবারে প্রথম দিকের গল্প। এই গল্পের বিষয়-ভাবনা ও রচনারীতি উত্তরকালে আর সেভাবে শিল্পীর পক্ষে গৃহীত হয়নি, কিন্তু এই গল্পে লেখক উত্তরকালের নিজস্বতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় রাখতে ভোলেননি। এই গল্পের মধ্যে স্পষ্টত একটি কাহিনী আছে। এ গল্প ভিখু নামে এক দুর্দান্ত ডাকাতের জীবন-ইতিবৃত্ত। তার ডাকাতির সূত্র ধরে লেখক চরিত্র ছাড়িয়ে মানব-জীবন-স্বভাবের আদিমতম বৃত্তি, যৌনতা, ক্ষুধাতৃষ্ণার crude বৈশিষ্ট্য এঁকেছেন শিল্পের সত্যতায়!

ভিখু এ কাহিনীর নায়ক। সে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে দলের লোকের ধরা পড়ার সময় কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খেয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ পথ দিনের আলোয় কখনো লুকিয়ে থেকে, রাতে হেঁটে অতিক্রম করে চিতলপুরে তার পরিচিত পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ি আসে। পেহ্লাদ পুলিশের ভয়ে তাকে নিজের বাড়ি আশ্রয় না দিয়ে মাইল পাঁচেক দূরে এক ঘন বনের মধ্যে গাছের ডালে মাচা বেঁধে লুকিয়ে রেখে আসে। দিনের পর দিন পেহ্লাদ তাকে খাবার জোগায়। ভিখু শরীরের অসম্ভব যন্ত্রণা, ঘা, জ্বালা, পোকামাকড়ের উৎপাত, জোঁকের ঘা থেকে বিষরক্ত শোষণ—এসব নিয়ে জীবনটাকে টিকিয়ে রাখে। কদিন পেহ্লাদ না গিয়ে শেষে একদিন দেখে, ভিখুর মাচার ওপরে অচৈতন্য অবস্থা। নিজের বাড়ি আনে বোনাই ভরতের সাহায্যে। কিন্তু এখানে ক্রমশ সুস্থ হলে একদিন পেহ্লাদের অবর্তমানে তার স্ত্রীর প্রতি লোভের প্রকাশে প্রচণ্ড মার খেয়ে পেহ্লাদের ঘর ছাড়ে।

ভিখু ক্রমশ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে এসে জীবন কাটায়। কারণ একটা হাত নষ্ট হওয়ায় ডাকাতি করার শক্তি লুপ্ত। ভিক্ষের পয়সায় তার সাময়িকভাবে দিন ফেরে, স্বাস্থ্য ভালো হয়, নদীর কাছে বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশে ভাঙা চালা মাসিক আট আনায় ভাড়া নেয়। খাওয়া-থাকার সুখের মধ্যে নাবীসঙ্গহীন-নিরুৎসব জীবন তার কাছে বিরক্তিকর। বিন্নু মাঝির সচ্ছল, সাংসারিক, স্বামী-স্ত্রী সঙ্গ-মাধুর্যের জীবন তার মনে আদি ঈর্ষা জাগায়। ভিখু ক্রমশ তার অস্থির জীবনযাপনের মধ্যে পরিচিত হয় বাজারের পায়ে দগদগে ঘা নিয়ে ভিক্ষারত যুবতী পাঁচীর সঙ্গে। ভিখু পাঁচীর সাহচর্য আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে সঙ্গিনী করতে চায়, ঘা সারানোর কথা বলে, পাঁচী তা চায় না। তার যুক্তি, ভিখু তাকে কোনোদিন ছেড়ে দিলে সে তখন খাবার পাবে কোত্থেকে— যা তার ভিক্ষাবৃত্তির একমাত্র মূলধন!

পাঁচী একসময়ে আর এক ভিক্ষুক বসির মিঞার সঙ্গিনী হয়ে যায়, তার আশ্রয়েই রাত কাটায়। ভিখুর তা সহ্য হয় না, পাঁচীর সান্নিধ্য-বাসনা ক্রমশ তীব্র হয় বসির মিঞার সঙ্গে আলাপ করে ঝগড়া করে পাঁচীকে কাছে রাখার জন্য। শেষে এক গভীর রাতে সরু ধারাল লোহার শিক দিয়ে তারাভরা আকাশের নীচে অন্ধকারে বসির মিঞাকে নিষ্ঠুর ঈর্ষায় নির্মমভাবে হত্যা করে শিক তার মুখে বিদ্ধ করে। পাশে শায়িত পাঁচী জেগে ওঠে। পাঁচীর সাহায্যে বসিরের ভিক্ষালব্ধ সঞ্চিত সমস্ত টাকা, জিনিসপত্তর পুঁটুলি বেঁধে পাঁচীকে সঙ্গে নিয়ে ভিখু বেরিয়ে পড়ে নতুন ভিক্ষা-জীবন ও সংসার-জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে। পাঁচীর পায়ে ঘা, হাঁটায় কষ্ট। ভিখু তাকে কাঁধে নেয়, চলে নতুন আশ্রয় খোঁজে।

গল্প এখানেই শেষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পে স্পষ্টত কাহিনী নিয়েছেন ঘটনাবহুল করে। কিন্তু তা আশ্চর্য এক শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে এই কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে। কাহিনীর কেন্দ্রে ভিখু। যা কিছু ঘটনা ঘটেছে সবই ভিখুর জীবন-স্বভাবকে কেন্দ্র করে। কোথাও এতটুকু অতিরিক্ত বিস্তার ও শাখা-প্রশাখা নেই কাহিনীর গতিতে। লেখক স্বয়ং বিবৃতিধর্মী ভাষায় কাহিনীর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কোথাও ঘটনা ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ ব্যবহারে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের কাহিনী বিচিত্রতা পেয়েছে। কাহিনীটি কোথাও এতটুকুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। কাহিনীর লক্ষ্যভ্রষ্টতা বলতে মূল যে চরিত্র ভিখু এবং যার মধ্য দিয়ে গল্পের অন্তিম তাৎপর্য অসাধারণ ব্যঞ্জনা পেয়েছে, তার লক্ষ্য থেকে কাহিনী সরেনি কোথাও। কাহিনী ও ঘটনার মধ্যে গল্পের প্লট এক নিখুঁত বৃত্ত-পরিকল্পনায় সমতা পেয়েছে। ভিখুর আদিম স্বভাব ও বাসনা, গল্পের শেষে পাঁচী-ভিখুর পারিবারিক যৌন জীবনের সংকেত ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মে আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব-স্বভাবের ধারাবাহিকতায় সূত্র-পরিচয়— এ সবের মধ্যে বৃত্তের পূর্ণরূপ।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ঘটনাগুলির সূত্র ভিখুর আচার-আচরণে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। ডাকাতি করতে গিয়ে কাঁধে বর্শার খোঁচা নিয়ে ভিখুর পলায়ন, আত্মগোপন প্রয়াস দিয়ে গল্পের ঘটনার সূত্রপাত। ক্রমশ পেহ্লাদের সহায়তায় গহন বনে অসহ্য কষ্টের জীবনযাপন, পেহ্লাদের স্ত্রীর প্রতি লোভের আকর্ষণ ও মার খেয়ে বিতাড়িত হওয়া, সবশেষে পাঁচীর জন্য বসির মিঞার হত্যার ঘটনা—সবই মূল চরিত্রের একই ন্যায়ে ধরা। কাহিনী ও

ঘটনার বৃত্ত-পরিধিটি ভিখু চরিত্রের রক্তনিহিত ভাবে কেন্দ্রের চারপাশে বলয়িত থেকেছে। একটি কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মম নিরাসক্ত ইতিহাসকারের মতো ভূমিকা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে এর লেখকের। এখানেই এই গল্পের প্লটের অভিনবত্ব।

দুই

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের চরিত্র-পরিকল্পনা মূল ভাবের লক্ষ্যসূত্রেই নিয়ন্ত্রিত। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত ভিখুর চরিত্রে যে কাম্য নয়, গল্পের গঠন ও লক্ষ্য থেকেই তা বোঝা যায়। ভিখু এই গল্পের নায়ক। পার্শ্বচরিত্রদের মধ্যে পেহ্লাদ, পাঁচি, বসির মিঞা পাঠকের সামনে আসে। ভিখুর আদিম জীবন-স্বভাবের প্রতিচিত্রণ এবং তার সুগভীর তাৎপর্যের উৎস্থাপনাই গল্পের ও গল্পকারের লক্ষ্য। তাই কোনো ব্যক্তিচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রহস্য, জটিলতা ও সুষমা ভিখু চরিত্রে মিলবে না। ভিখু সমগ্র গল্পে যা সক্রিয়তা দেখিয়েছে, তার সব কিছুই মানুষের জীবনের সভ্যতা-উদ্ভবের আগের আদিম জীবন-অনুগ। ভিখুর নৃশংস ডাকাত-জীবন তার চরিত্রের একটি শিক্ষা। গভীর অরণ্যে ক্ষত-দুষ্ট ঘা শরীরে নিয়ে বাঁশের মাচায় জীবনযাপনে তাকে একেবারে আদিম মানুষই করে তোলে। পেহ্লাদের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তির জীবনে পাঁচীর জন্য আকর্ষণ, যৌন-আর্তি, বসির মিঞাকে প্রবলতম ঈর্ষায় সভ্য সমাজের সমস্ত রকম নীতি-নিয়ম-বহির্ভূত শ্বাপদ-স্বভাবে নির্মম হত্যা— এ সবই ভিখুর রক্তের বৈশিষ্ট্য। তার এই রক্ত সভ্যতায় পরিশীলিত নয়, আদিমতায় অকৃত্রিম।

সুতরাং ভিখুর চরিত্রে যে একমুখিন স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তা তার স্রষ্টার আদিম জীবন-স্বভাব-ভাবনার তাৎপর্য-অনুসারী। ভিখু সভ্য সমাজের সীমার বাইরের মানুষ। আর তার স্বভাবই সত্য হয়ে গোপন থাকে সভ্যতার কৃত্রিমতার আবরণে। যার মধ্যে মানুষের দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই, জীবনের প্রচণ্ড বেগে যার শুধুই সম্পর্কে ভাঙচুর করতে করতে আদিম সরল অকৃত্রিম জীবনের স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিই লক্ষ্য, তার কাছে মানবিক সম্পর্কের সীমা আশা করা বৃথা। কিন্তু আদিম জীবনের সরল অনাড়ম্বর দয়ামায়া ছিল, যা প্রয়োজনহীন, স্বার্থশূন্য কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। বসিরকে হত্যা করে ভিখু পাঁচীকে নিয়ে নতুন জীবনের উপযোগী আশ্রয়ের জন্য বেরিয়ে পড়েছে গভীর রাতেই। পাঁচী সেই আদিম জীবনের উপযুক্ত সঙ্গিনী। তারও কোনো পিছুটান নেই, তার জন্য আর্তি নেই। সে ভিখিরি,. ভিখুও তাই। দুজনের মিল তাই জীবন-স্তরের সমতায় সার্থক হয়েছে। কিন্তু ভিখুর মধ্যেও মমতা ক্ষণিকের জন্য চকিত হয়েছে পাঁচীকে কাঁধে নেওয়ার আগে :

> 'পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে কি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?'
> 'হ, ব্যথা জানায়।'
> 'পিঠে চ্যাপামু?'
> 'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল।'

এই দু'জনের সম্পর্কের অন্তর্গূঢ় সারল্য ও অকৃত্রিমতা, দু'জনের মমতার বন্ধন— এর মূলেও আছে আদিম জীবনের প্রকৃতিপ্রদত্ত নির্দেশ। গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলির সক্রিয়তা ভিখু-নির্ভর একান্তভাবে। তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লেখক দেননি, দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

তিন

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি চরিত্রাত্মক গল্পের শ্রেণীতে পড়ে। ভিখুর আছে প্রাগৈতিহাসিক স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব। তারই সার্থক চিত্ররূপ এই গল্প। এর সমস্যা চরিত্র-নিহিত' আদিমতার। ভিখুর যে চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য ও অপূর্বত্ব তাতেই লেখকের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত। গল্পের ক্লাইম্যাক্স বসির মিঞাব হত্যা ও পাঁচীকে পিঠে নিয়ে বিকলাঙ্গ ভিখুর হাঁটার ঘটনাতেই স্থির। এই ক্লাইম্যাক্স নিশ্চয়ই ঘটনানির্ভর কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর ভাবের বিপুল বিস্তারে। ভিখুর শেষতম সক্রিয়তা ভাবকে যেমন গভীরতা দিয়েছে, তেমনি একমুখিনতার শেষ স্তর স্পষ্ট করেছে। আগেই বলেছি, কাহিনীর মধ্যে বিবরণ দানের প্রবণতা আছে, কিন্তু তার কোনো অংশই অযথার্থ ও প্রয়োজনহীন মনে হয় না। গল্পের ইঙ্গিতধর্ম লেখকের টীকাভাষ্যের মতো শেষতম অনুচ্ছেদে:

> 'হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোন দিন পাইবেও না!'

লেখকের এই ভাবনা সমগ্র গল্পের চাবিকাঠি। এই ভাবনায় ও ধারণায় ভিখুর যাবতীয় কর্মের সৌন্দর্য ধরা পড়ে।

আসলে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই আছে আদিম জীবন-স্বভাব। তার কখনো অবলুপ্তি নেই, তার মানব-বংশের উত্তরাধিকার সূত্রে বাঁধা। তার গোপন স্বভাব সভ্যতার আলোয় আরও গোপন থেকে যায়। আদিম জীবনের আকর্ষণও মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত। জৈব প্রবৃত্তি, শ্বাপদবৃত্তি মানুষের রক্ত-চিহ্নিত সত্য। তারই প্রতিনিধি ভিখু এবং পাঁচীর গর্ভে ভিখুর সন্তান হয়ে তার সত্য-স্বরূপকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ।

গল্পের ভাষায় আছে narrative style। কিন্তু ভাষার মধ্যে যে প্রবহমানতা, তা চিত্রানুগ নিঃসন্দেহে। সাধু গদ্যে লেখা এই গল্পে আছে ইঙ্গিতধর্মের থেকে বিবৃতিমূলকতা। বুদ্ধির কৌশলের থেকে ঐতিহাসিকের সরল বিবরণ এই গল্পের ভাষায় চিত্র-রসের স্বাদ দেয়। ভিখু, পাঁচী, পেহ্লাদ, বসির মিঞা— সকলেই একেবারে নীচের তলার অশিক্ষিত, অমার্জিত স্বভাবের মানুষ। তাদের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে মুখের ভাষার অপরূপ সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন

লেখক। ভিখু-পাঁচীর প্রেমের ও ঈর্ষার চিত্রগুলি অনবদ্য ভাষায় আঁকা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়— 'ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে।'

চার

গল্পের নামের তাৎপর্য স্পষ্ট এবং লেখক শেষতম অনুচ্ছেদে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভিখু চরিত্রই নামের সঙ্গে জড়িত। ভিখু যেন গল্পের প্রাগৈতিহাসিক এক মানুষ। তার আদিম জৈববৃত্তি, তার হিংসা, জিঘাংসা বৃত্তি, তার লোভ-লালসা, ঈর্ষা, যৌন-ভাবনা সবই চরমতম, প্রধান অর্থে যেনবা দুই মেরুস্থিত। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতোই ভিখুর যাবতীয় তৎপরতা গল্পে নিহিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের মধ্যে ভিখু সম্বন্ধে একসময় বলেছেন, 'নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।' এই সর্বদিকের দুর্দান্ত ক্ষুধাজনিত চরম অস্থির স্বভাবে ভিখু দীপ্ত এবং তার সূত্রে নামের ব্যঞ্জনা গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের পোযক হয়ে উঠেছে সহজেই।

৩.

কে বাঁচায়, কে বাঁচে!

এক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পটি তাঁর লেখক-জীবন ও মানসিকতার এক সন্ধিলগ্নের ফসল। একথা বলার কারণ, এই গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে এমন এক সংকটলগ্নে ও তার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের পটভূমিকায় রচিত যা কল্লোলের কালে ও অব্যবহিত পববর্তী সময়ের অথচ প্রাক-যুদ্ধপর্বের লেখকদের মনোভঙ্গির বিকাশে একটি বিশিষ্ট স্তর চিহ্নিত করতে সক্ষম। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পটি তেতাল্লিশ সালের ভয়াবহ মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় রচিত এবং সেই বিশেষ কালে বসেই! তাই এই গল্পে লেখককে বিশিষ্ট এক মানসিকতায় দেখি, যা প্রাক-যুদ্ধপর্বের লেখা থেকে নিশ্চিতভাবে স্বতন্ত্র!

আমরা আগেই বলেছি, 'আত্মহত্যার অধিকার', 'প্রাগৈতিহাসিক'—দু'টি গল্পে এবং এই সময়ের অন্যান্য গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তি-চরিত্র-নির্ভর জীবন-ভাবনার বিচিত্র স্বভাবের সন্ধানী। সে জীবন-ভাবনা আদিমতম স্বভাবের কোনো বৃত্তির বিকাশের হতে পারে, সভ্য সমাজে তার অস্তিত্ব জ্বালায়-যন্ত্রণায় বিশ্বাসী রূপে অন্য তাৎপর্যে বিচারণাও হতে পারে। মোট কথা, উল্লিখিত দুই গল্পে জীবনের চরম রূপের ব্যাখ্যার প্রয়াস স্পষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের গল্পে এই লেখক ব্যক্তিকেই নিয়েছেন। আদিম জীবন-ব্যাখ্যা বা জীবন-বিলাসী কোনো প্রেরণা বা মানসিকতাকে সবল করতে উৎসুক হয়নি। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে ব্যক্তি-মানুষকে নিয়ে এসেছেন সমষ্টি মানুষের ভিড়ে।

আদিম জীবন ও জৈব জীবন থেকে সূত্র ধরে সমষ্টি মানুষের ভিড়ে ব্যক্তিকে হারিয়ে দেওয়ার এই ঘটনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুদ্ধোত্তর কালের বিষয়-ভাবনার সূত্র-সংযোগকারী বিষয় নিশ্চয়ই। সে আলোচনা 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ও 'হারাণের নাতজামাই' গল্প প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে করা হবে। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্প তারই এক শিল্পিত ভিত্তিরূপ। এই গল্পটি সর্বপ্রথম পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থে প্রকাশিত। এই সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশ—মার্চ, ১৯৪৪। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে তার ধ্বংসের ক্রিয়ায় উজ্জ্বল। এর প্রকাশকাল তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ স্বভাব সমানে বয়ে নিয়ে চলেছে তখনো।

অবশ্য মন্বন্তরই এই গল্পে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে। গল্পটি আকারে বেশ ছোট প্রকৃতিতে গভীরতম তাৎপর্যবাহী। কাহিনী অংশ এর সামান্যই। গল্পের প্লট-গঠনে যেটুকু প্রয়োজন, তার বাড়তি এতটুকুও ঘটনা চরিত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি এর ঘটেনি। অর্থাৎ এই গল্পের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ নিরাসক্তি স্পষ্টরূপে আছে। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় সে সময়ের মোটা মাইনের মধ্যবিত্ত চাকুরে। সে মানবতাবোধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। অফিস যাওয়ার পথে একদিন সে প্রত্যক্ষভাবে একটি মানুষের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা দেখে। তার প্রতিক্রিয়ায় সে শারীরিক ও মানসিক দু'ভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অসুস্থতা তাকে অসহায় করে তোলে। সে এমন মৃত্যু বন্ধ করার জন্যে নিজের খাবার, পরিবারের খাদ্য কমিয়ে বাইরের লোককে বাঁচাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও তার অসহায়তা! অফিসের মাহিনা সে রিলিফ ফান্ডে দেয়, ক্রমশ তার সংসার হয় অচল। মৃত্যুঞ্জয়ের অফিস-বন্ধু নিখিল সেই সংসার সামলাতে এসেও বোঝে, মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রীও স্বামীর ভাবনার সমান অংশীদার। মৃত্যুঞ্জয় ক্রমশ কলকাতার পথে পথে ঘুরে লঙ্গরখানা দেখে, অন্নক্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গে কথা বলে অসহায়তা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করে। সে অফিস ছাড়ে, বাড়ি ত্যাগ করে ফুটপাতে আরও দশজনের মধ্যে থেকে মগ হাতে করে লঙ্গরখানার খিচুড়ি ভিক্ষে করে দলের ভিখিরিদের মতোই। এখানেই গল্পের শেষ।

কাহিনী এ গল্পে কিছুই নেই। প্লট চরিত্রকে আশ্রয় করে গভীর-নিবিড় শিল্পের বন্ধন পেয়েছে। চরিত্রকেন্দ্রিক সামান্যতম কাহিনীর রেশটুকু বিশেষ এক নায়ক চরিত্রে মনোভাবনার শেষ অভিব্যক্তিতেই জ্বলে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনোই কাহিনীকে একমাত্র কৌশল মনে করেননি দ্বিতীয় যুদ্ধ-সমকালে গল্প লিখতে বসে। প্রাক-যুদ্ধের কালের ছোটগল্পের কিছু সংহত কাহিনী ছিল, এই পর্বে তাকেও বর্জন করতে উৎসাহী। তাঁর অদ্ভুত নিরাসক্তি যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতোই। একান্তভাবে বিষয় ও বক্তব্যের প্রয়োজনেই কাহিনী ও ঘটনার বাড়তি অংশ বর্জনে তিনি এক নির্মম সচেতন শিল্পী। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের প্লট-গঠন পরিকল্পনায় সে শিল্পী-স্বভাব স্পষ্ট।

ঘটনা এ গল্পের একেবারে শুরুতেই ঘটে গেছে। তা চরিত্রের অন্তঃশীল আত্মার অধিগত হওয়ায় ঘটনার এতটুকু চমক নেই, নেই তার পরবর্তী ঘটনা ঘটানোর স্বাভাবিক

সুযোগ-উদ্যোগ। মূল ঘটনা মন্বন্তরে একটি মানুষের অসহায় মৃত্যু এবং সেই চিত্র প্রত্যক্ষভাবে দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের তীব্রতম মানস-প্রতিক্রিয়া। বাকি গল্পের যে মোক্ষম টান, তা চরিত্রের অসম্ভব 'inert' স্বভাবেই সম্ভব হয়েছে। সমগ্র গল্পে চরিত্রই ঘটনার জন্ম দিয়েছে, আবার তাকে অবলীলায় পরিত্যাগ করেছে। সবশেষে কোনো ঘটনার দ্যোতনা নেই, আছে চরিত্রের অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণত রূপ।

দুই

'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে চরিত্রসংখ্যা মাত্র তিনটি— মৃত্যুঞ্জয়, তার স্ত্রী— গল্পে চিহ্নিত টুনুর মা, আর অফিসের সহকর্মী নিখিল। মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রের অমোঘ টানে বাকি দুই চরিত্র যা কিছুটা নড়াচড়া করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের যে ট্র্যাজেডি, তা কোনো কাহিনী ও ঘটনায় নয়, চরিত্রের মানব্য-ভাবনার অনাবিল লালনে। মহত্তম মানবতাবোধের আঘাতেই মৃত্যুঞ্জয়ের পরিণতি-চিত্র উজ্জ্বল। তার মধ্যবিত্ত স্তর পেরিয়ে ক্রমশ সর্বহারাদের স্তরে নেমে আসার বিষয়টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শনের পোষকতা করে।

মৃত্যুঞ্জয় উচ্চবিত্ত অফিস চাকুরে। যেসব শিক্ষিত মানুষ কাগজ পড়ার আর অন্যের কাছে জেনে-নেওয়ার কথার বিলাসিতায় নিজের স্তরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করে, মৃত্যুঞ্জয় তাদেরই দলে ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে একটিমাত্র ঘটনার সাক্ষী করে নামিয়ে এনেছেন সেই বিলাসী সুবিধাবাদী স্বার্থপর স্তর থেকে। গল্পের শুরুতে সে সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ নয়। সে যে স্তরের মানুষ, তাতে প্রত্যক্ষ মৃত্যু দেখারও প্রতিক্রিয়া সাময়িক হয়েই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের তা হয়নি। এখানেই সে নায়ক— শিল্পের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ব্যক্তিত্বের।

যে অবজ্ঞার সঙ্গে একটু ভালোবাসে একই অফিসের সহকর্মী নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে, সেই অবজ্ঞার ব্যাখ্যার মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের নায়কোচিত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে। 'মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদী ভালমানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য-আদর্শের কল্পনা-তাপস বলে।' বস্তুত লেখকের ভাষায়— 'মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়।' এইসব মানস-ভঙ্গির কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের মানবিক বোধ বড় জাতের। সে স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, অ-মানবিক হতে পারেনি, জানে না— এখানেই সে মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকেও মনে মধ্যবিত্ত নয়।

আর এই কারণেই তার ক্রমশ নীচে নেমে আসা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের যে তৎপরতা তা নিজেকে খোঁজারই নামান্তর। 'সহরের আদি অন্তহীন ফুটপাত ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ... ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ্য কর। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার বার অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে।' এই সন্ধানের মধ্যে তার লব্ধ অভিজ্ঞতা হল, ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। '... ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই।'

মৃত্যুঞ্জয় অবশ্যই এদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সর্বাহারাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি গল্পের শেষে। তার মধ্যবিত্ত মর্যাদা, আত্মসংযমবোধ, বাঁচার বাসনা স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়েছে তার জীবনে। তার বাস্তব অভিজ্ঞতা নিখিলের থিওরিসর্বস্ব যুক্তির কাছে একেবারেই নিষ্ফল। মৃত্যুঞ্জয়কে সর্বাহারাদের মধ্যে নিয়ে এসে লেখক মানবজীবনবোধের ব্যক্তি থেকে সমষ্টির গুরুত্বকে স্পষ্টত বেশি মূল্য দিয়েছেন। ব্যক্তি না, সমষ্টিই বড় এবং তাদের মধ্যে ব্যক্তির বিলোপ না হলে বুর্জোয়া শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্যাটার্ন বদলানো যাবে না। মৃত্যুঞ্জয় চরিত্র লেখকের সেই বিশ্বাসকেই প্রোথিত করে। চরিত্রটি উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে সর্বহারাদের, অসহায় নিরন্নদের মধ্যে এসে নেমেছে—এখানেই চরিত্রটির শিল্পসম্মত ক্রমপরিণতি!

মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী অর্থাৎ টুনুর মা আর এক অভাবনীয় বাস্তব চরিত্র। তার স্বামীর সঙ্গে সমান নীচে নেমে আসার মানবিকতাকে কেউ কেউ বানানো মনে করতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মে স্বামীর সহধর্মিণী ও সহমর্মিণী হওয়া যদি সতীসাধ্বী স্ত্রী-র conception হয়, তবে টনুর মা তাতেই অনেক বড়। সে নিখিলের কথার উত্তরে বলে, 'উঠতে পারলে, আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।' এই চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানবতাবোধে দীক্ষা চরিত্র-চিত্রণের কোনো কৃত্রিম শিল্প-আরোপে আসেনি, এসেছে গল্পের পরিবেশের ও মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার-ধর্মের অন্তরগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যেই। টুনুর মায়ের অস্তিত্ব এই ছোটগল্পে খুবই স্বল্প পরিসরে দেখি, কিন্তু তার চারিত্রিক ব্যঞ্জনা ও শিল্পদায়িত্ব নায়কের পরিণতির পক্ষে অপরিসীম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্বন্তরের অভিঘাতে বৃহত্তর মানবতাবোধের দায়ে একজন ব্যক্তির চিত্র আঁকছেন না, একটি বুর্জোয়া সমাজের গড়া পারিবারিক জীবনকেও ভাঙতে চেয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় চিহ্নিত এক একটি পরিবারও তো বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্যের একাধিক ক্ষতে বিকট। টুনুর মায়ের চরিত্ররূপ পরিবার-ব্যবস্থা বিলোপের একটা সফল সূত্র যেন।

নিখিল চরিত্রটি ' কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের টুনুর মায়ের মতোই স্বল্প পরিসরে অঙ্কিত হলেও তার উপস্থিতি মৃত্যুঞ্জয়ের নায়ক-স্বভাবকে উজ্জ্বল করার জন্যই। 'নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু অলস প্রকৃতির লোক।' তার জীবনে আছে বই পড়ার ও সেই সূত্রে শিক্ষিত মনের জগৎ নির্মাণের সুগভীর বাসনা। এ সবই মধ্যবিত্ত সমাজের এক বিলাসিতা। ফুটপাতে অনাহারে মৃত্যু তার কাছে অতি সহজবোধ্য ব্যাপার। যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনের সুরাহা সম্ভব নয়, তাই 'নিজেকে না খাইয়ে মারা পাপ।' নিখিল চরিত্র টিপিক্যাল মনোবিলাসী মধ্যবিত্ত—যার স্বার্থপর, নিজেকে বাঁচানোর কারণে অ-মানবিক। নিখিল মৃত্যুঞ্জয়ের সফল contrast।

তিন

গল্পটি চরিত্র-নির্ভর বিশেষ এক ভাবের গল্প। এর ক্লাইম্যাক্স অংশ গল্পের একেবারে শেষতম বাক্যে— 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।'—মৃত্যুঞ্জয়ের এই শেষ কথায়। এখানেই গল্পের পরিণামী-তাৎপর্য। মৃত্যুঞ্জয়ের এমন

তৎপরতা তাকে লেখক-চিহ্নিত বিশেষ কোনো জীবন ও সমাজ-ভাবনার সত্যকে তুলে ধরে। চরিত্রই গল্পের ভাবের একমুখিন স্বভাবকে ধরে রাখে। গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাবনার পক্ষে লেখক কোনো দিক থেকেই আত্মবিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করেননি। গল্পে বুদ্ধিগত চিত্ত-উদ্ভাস আছে, বিবরণগত শৈথিল্য নেই। লেখকের বুদ্ধির দীপ্তি ও মনন চরিত্রমূলে সক্রিয়। বুদ্ধির প্রখরতার মধ্যেই আছে গল্পের 'suggestiveness'।

'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের গদ্যরীতি ও ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত, সংযত, ভারহীন। কোথাও এতটুকু থেমে থাকার ক্লান্তি নেই। আরম্ভের দ্যোতনা গল্পের সমগ্রকে হারিয়ে দেয়! মৃত্যুঞ্জয়ের অনাহারে মৃত্যু দেখা ও শারীরিক ও মানসিক দুই অর্থেই অসুস্থ হওয়ার চিত্র দিয়ে গল্পের শুরু। সমগ্র গল্পের দেহে তারই অবধারিত ছায়ার আবরণ। গল্পের পরবর্তী অংশে নায়কের কি পরিণাম— তাতেই পাঠকের কৌতূহল জেগে থাকে। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে পাঠকও একটা বড় সিদ্ধান্তের অভিজ্ঞতায় পৌঁছে যায় শেষে। এই অভিজ্ঞতাই গল্পের ভাবকেন্দ্র, আর তাতে পৌঁছবার যে ভাষ্য, বাক্যরীতি — তা অযথা উপমা-বহুল হয়নি। একাধিক শ্লেষব্যঙ্গে গদ্যের শরীর রক্তিম, তির্যক। অযথা উপমা, analogy, আবেগ, সেন্টিমেন্ট— এসব দিয়ে গদ্যকে এতটুকু ভারাক্রান্ত করেননি লেখক। এত কাট-ছাঁট গদ্যের মূলে আছে লেখকের বুদ্ধি ও প্রখর নিরাসক্তি। এইখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য-ভাবনা ও ভাষ্যরীতির শৈল্পিক ভিত্তি।

জীবনদর্শনের উপযোগী ব্যক্তিত্বও এমন বৈজ্ঞানিক স্বভাবে স্পষ্ট হয়েছে। অভ্যং মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের মধ্যে থেকে সর্বহারা মানুষদের দলিত মথিত মানবতাকে বড় করা যাবে না। বুর্জোয়া খোলসটিকে অবলীলায়, নির্মোহ মানসিকতায় ত্যাগ করতে হবে, শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে সমান স্বভাবে নিহিত হতে হবে, তবেই মানবভাগ্যের যথার্থ পরিশীলন সম্ভব। মেকি মানবতা দরদ নিষ্ফল— যেখানে মানবতাবোধ সর্বধ্বংসী মানব-রাক্ষসের সম্মুখীন। এই ভাবনাই 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের অন্তর্নিহিত সত্য।

একালের কোনো কোনো গবেষক-সমালোচক 'মৃত্যুঞ্জয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতির' কথা বলে, তার সত্যে নিজের বক্তব্যকে সিদ্ধান্ত করে এই গল্পের বিচার শেষ করেছেন। এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের মূল শক্তিকে না-বোঝার দিকটাই প্রমাণ করে। বলেছেন, 'জোরালো বক্তব্য নেই' এই গল্পে। তাঁর মতে গল্পটি 'মৃত্যুঞ্জয়ের বিকারের সার্থক শিল্পরূপ!' ভয়ঙ্করভাবে জীবনবাদী, মানবপ্রেমিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নের জন্য তুলনাহীন হাহাকারের সময় মানুষের বিকার-বিলাস নিয়ে গল্প লিখতে বসবেন এটা ভাবতেই খারাপ লাগে। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের জন্ম-প্রেরণা অতি সাধারণ ভাবকেন্দ্র থেকে নয় আদৌ। একটি বড় সমাজ-ন্যায়ের, বড় অর্থে বৃহত্তর মানবিক সম্পর্কে বড়, চিরকালের,— চমৎকার শিল্পব্যঞ্জনাই এই গল্পে একমাত্র লক্ষ্য। এ গল্পের ক্রেন্দ্রে বিকারগ্রস্ততার অনুসন্ধান সমালোচকদের অবুঝ বুদ্ধিভ্রংশতাই প্রমাণ করে। মৃত্যুঞ্জয়ের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ তার বিকার নয়, মধ্যবিত্তদের দিক থেকে, সর্বাহারাদের দিক থেকে সর্বহারাদের বৃহত্তর সমাজের সামীপ্য গ্রহণের মতো চরম সোশিয়ালিস্টিক ভাবনায় তার ভিতরের শক্তি।

চার

'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের এমন নামে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্রই এ গল্পের মৌল ভাব-প্রতিষ্ঠার একমাত্র আধার। সেই চরিত্র নামে নেই, নেই কোনো বিশেষ ঘটনা বা কাহিনী-সূত্রে। জীবন-অস্তিত্বের মূল ধরে টান দেওয়ার ভাষা ব্যবহার করেছেন গল্পের নামে। হোক ব্যাখ্যামূলক, কিন্তু গল্পের নামেই একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে লেখক ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত প্রশ্নও রেখেছেন বুঝি! দ্বিতীয় কথা হল, মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রের অসহায়তাবোধক ভাবের প্রকাশকে ধরার জন্যই গল্পের নামে এমন বিস্ময়বোধক চিহ্ন প্রয়োগের ব্যঞ্জনা থাকতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, ছিলেন না ঈশ্বরেও, সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের তথা শোষিত মানুষদের বাঁচার প্রশ্নে ভাগ্যের স্বীকৃতির কোনো ইঙ্গিত এখানে নেই! নেই অলৌকিক ঈশ্বরের কাছে কোনো করুণ আবেদনও। বরং লেখকের নিজস্ব একটি অনুসন্ধিৎসু মনের ব্যঞ্জনাগর্ভ স্বভাব নামে থেকে যেতেও পারে। গল্পের মধ্যে অন্নহারা মুমূর্ষু লোকদের দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সিদ্ধান্তে আছে,— 'কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই! কোথা থেকে কিভাবে কেমন করে সব ওলট-পালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।' আর এইসব লোকদের ভিড়ে মৃত্যুঞ্জয়কে এনে লেখক প্রকারান্তরে 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!'-র নামের তাৎপর্যে অতি গভীর ব্যঞ্জনায় তাদের বাঁচার উপযোগী নালিশ, প্রতিবাদের কথাটায় দৃষ্টি রেখেছেন। বাঁচতে হলে তার শক্তি এদের হাতেই, আর বাঁচাতে হলে তারাই পারবে নিজেদের বাঁচাতে। সুতরাং নামে কোনো হতাশা নয়, শূন্যতার বোধও নয়, পরোক্ষে নিরন্নদের ভিড়ে মৃত্যুঞ্জয় সমেত সমস্ত মানুষকে বাঁচার সূত্রটুকু ধরিয়ে দেওয়ার সুদূর-প্রসারী ব্যঞ্জনা পাঠকহৃদয়ে দেখা দিতেও পারে। তাই এই সার্থকতম একটি গল্পের নামের প্রসারিত অর্থ অনেক বেশি শিল্পসম্মত আমাদের মতে।

৪.

হারাণের নাতজামাই

এক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুদ্ধ-সমকালীন দেশীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির তীব্রতা যেমন বাড়ে, তেমনি তার চরিত্রও বদলাতে থাকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত সাম্যবাদী রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে সমূল তুলে ফেলে তাকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা, আর ছিল দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নবজাত ব্রিটিশ সমর্থনপুষ্ট বণিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চাপা বিদ্রোহ। স্বদেশ থেকে বিদেশি শক্তির হাত গুটিয়ে নেওয়ার পর তাদের শাসনে-শোষণে জমিদার তথা ধনী, সর্বোপরি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলন ক্রমশ মুখ ফেরাতে থাকে। এ ব্যাপারে দেশীয় সাম্যবাদী রাজনীতির প্রখর ইতিবাচক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তখন সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য এবং

সচেতনভাবে তাঁর ছোটগল্পে রাজনীতির উত্তাপকে যথার্থ অর্থে গ্রহণে উৎসাহী। স্পষ্টত রাজনীতি নয়, রাজনীতির উত্তাপ এ সময়ের গল্পে কখনো বাস্তবতায়, কখনো তীব্র ব্যঙ্গে, কখনো বা সমবেত মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদী ভূমিকায় গৃহীত হয়েছে। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে একই সঙ্গে রূঢ় বাস্তবতা আছে, আছে জ্বালাধরা ব্যঙ্গ, আরও আছে সংগ্রাম-সচেতন গ্রামীণ কৃষকশ্রেণীর সমবেত শক্তির প্রতিরোধী সবল ভূমিকা।

যেহেতু 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ছোটবড়' গ্রন্থভুক্ত রচনা, তাই, স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর দেশি, রক্তাক্ত, ন্যায্য কৃষক আন্দোলনের সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট আভাস পাই। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল-মে থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময়সীমায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত হয়েছে মোট তিনটি গল্পগ্রন্থ—'আজ কাল পরশুর গল্প', 'পরিস্থিতি' ও 'খতিয়ান'। এই তিনটি গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলিতে, আমরা বুঝতেই পারি, যুদ্ধ শেষ ও তার অব্যবহিত পরবর্তী রচনার স্থান লাভ ঘটেছে। ১৯৪৭-এ বেরুল 'খতিয়ান', ঠিক এর পরের গ্রন্থ 'ছোটবড়'—প্রকাশকাল ১৯৪৮। স্বভাবতই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে রচিত গল্পগুলিই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'হারাণের নাতজামাই'।

'হারাণের নাতজামাই' রচনাকালের আগে কাছাকাছি সময়সীমায ঘটে গেছে রক্তক্ষয়ী তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণত কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলন। নেতৃত্ব ও নীতিসূত্র এসেছিল তৎকালীন সাম্যবাদী আন্দোলনের চিন্তাধারা থেকে। একদিকে দেশীয় জমিদাব ও জোতদারদের অধিকার ধরে রাখার বজ্রকঠিন ব্যবস্থা, শোষকসুলভ শক্তির কঠিন চাপ, পুলিশি ব্যবস্থার সুযোগে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যদিকে শোষিত অত্যাচারিত কৃষকদের প্রতিবাদী অত্যদ্ভুত সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে তারই এক অভাবনীয় শিল্পরূপ আমরা লক্ষ করি। স্পষ্টত দেশীয় তেভাগা আন্দোলনের উত্তাপে আলোচ্য গল্পটির প্রেক্ষাপট রক্তিম, উজ্জ্বল, দীপ্ত এবং থমথমে। আশ্চর্য এক বাক্যের প্রতীক ব্যবহারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আন্দোলনের সূক্ষ্ম স্বীকৃতিটুকু স্বারকচিহ্নের মতো গল্পে ব্যবহার করেছেন সমবেত চাষীদের একটিমাত্র ক্রুদ্ধ চিন্তার সূত্রে— 'শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।' বাক্যের 'তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলো'র প্রসঙ্গটি একই সঙ্গে গল্পে পরিবেশ ও মৌল পটভূমির তথ্যভিত্তিক বিষয়ের ব্যঞ্জনা আনে।

রাজনৈতিক আন্দোলন তে-ভাগা। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পে কোথাও এতটুকু রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আনেননি। যদি একে তে-ভাগা আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে ব্যাখ্যা না-ও করা যায়, তবু এর বৈপ্লবিক পটভূমি ও প্রস্তাব, এর মধ্যবর্তী কৃষকদের সমবেত স্বভাব ও নায়িকা ময়নার মা, জগমোহন— কিছুই এতটুকুও ম্লান হয় না। প্রত্যক্ষ রাজনীতির তথ্যবর্জিত, তার বিন্দুমাত্রও প্রসঙ্গ-বিবিক্ত সার্থকতম একটি বাংলা ছোটগল্প রচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম এবং বিদেশি যে কোনো সমান মূল্যের

রাজনীতি-ভাবনা-উদ্বোধিত ছোটগল্পের সঙ্গে এর যথার্থ প্রতিতুলনা চলে। যাঁরা বলেন, বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দলীয় রাজনীতি-সচেতনতায় নিবিষ্ট হওয়ায় সাহিত্য-ক্ষমতার হানি ঘটিয়েছেন, তাঁদের কাছে এই লেখকের একটি বড় জবাব 'হারাণের নাতজামাই' গল্প।

দুই

'হারাণের নাতজামাই'-এ যেটুকু কাহিনী আছে, তা গল্পের প্রধান আধার প্লটের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েই। কাহিনীর স্বতন্ত্র কোনো শিল্প-মূল্য বিচার হবে না প্লটের গঠন ব্যতিরেকে! কাহিনী-অংশ সামান্য। মাঝরাতে সালিগঞ্জ গ্রামে বুড়ো হারাণের বাড়ির চারপাশে হানা দিয়েছে পুলিশ, জমিদার এবং জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতির সহায়তায়। এর মূল কারণ, তাদের কাছে খবর আছে হারাণের বাড়িতেই কৃষকদের দেড় মাস ধরে পলাতক প্রিয়তম রাজনৈতিক নেতা ভুবন মণ্ডল গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। এই মণ্ডলই তাদের লক্ষ্য। পুলিশের দলে আছে কানাই ও শ্রীপতি এবং রেইডিং পার্টির নায়ক বি. এ. পাস শিক্ষিত মন্মথ।

খবর পেয়ে গ্রামের লোক সজাগ। চাষীরা লাঠি, সড়কি, দা, কুড়ুল বাগিয়ে দল বেঁধে চারপাশে দণ্ডায়মান। কানাই বা শ্রীপতি বুড়ো হারাণ দাসের বাড়ি চিনত না। প্রতিবেশী রাখাল পুলিশের প্রচণ্ড চড় খেয়েও, বোবার ভূমিকায় থেকে সেই বাড়ি চিনিয়ে দেয় না। তবু একসময়ে ঠিক তারা চিনে আসে হারাণের বাড়ি। এরই মধ্যে একুশ-বাইশ বছরের বিবাহিতা যুবতী ময়নার মা অর্থাৎ হারাণের মেয়ে তার ঘরে আশ্রিত ভুবন মণ্ডলকে লুকিয়ে রাখার মোটামুটি ব্যবস্থা করে রাখে। ময়নার মা তার বৃদ্ধ বাবা হারাণকে ইশারায় নিশ্চুপ থাকতে বলে, আলো জ্বেলে দ্রুত হাতে ময়নাকে তাঁতের রঙিন শাড়ি পরায়, সত্যিকারের জামাইয়ের সামনে থাকার মতো ঘোমটা দিয়ে লজ্জা দেখাতে শেখায়। ভুবন মণ্ডলকে আসল জামাইয়ের নাম, তার পিতৃপরিচয়, নিবাস মুখস্থ করিয়ে দেয়। বাইরে পুলিশের সামনে যখন সমবেত প্রতিবাদী কৃষক-জনতার আক্রোশ, চিৎকার পুলিশের তল্লাশি করার বিরুদ্ধে, তখনি ময়নার মা নিজে থেকে পুলিশকে ডেকে এনে ঘর তল্লাশি করার কথা বলে। তার আগে বোঝায়, অনেকদিন পরে জামাইয়ের কিছু প্রাপ্য মেটানোর ফলে জামাই ঘরে এসেছে। ভুবন নিজেকেও সে হিসেবে প্রামাণ্য করে পুলিশের সামনে। মাথার চুল রুক্ষ, মুখে দাড়ি— এই অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি আসার কারণ, স্ত্রী অর্থাৎ ময়নার অসুখ শুনেই সোজা হাট থেকে চলে এসেছে। পুলিশের সামনেই ময়নার মার নির্দেশে শেষে ময়না ঘরে ঢোকে, ভুবনও সেই ঘরে ঢোকে। তাদের ঘরের দরজা বন্ধ হয়। মন্মথর চোখে ছিল মদের ঘোর, যুবতী ময়নার প্রতি সূক্ষ্ম চাপা লোভের মোহাঞ্জন। হারাণের বাড়ি সামান্য তল্লাশি শেষ করে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথ হতাশ হয়ে দলবল নিয়ে ফিরে যায়।

ইতিমধ্যে ময়নার মায়ের চালাকি, রাতে ময়নার ঘরে ভুবনের আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা

নানাভাবে গাল-গল্পে রসসিক্ত হয়ে বাইরে প্রচার হয়ে যায়। পুলিশ প্রতারিত হওয়ার ক্ষোভে গ্রামের বাইরে ভুবন মণ্ডলকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসার পথে ময়নার যুবক ভাইকে গ্রেপ্তার করে। আর, সবচেয়ে বড় কথা, জগমোহন অর্থাৎ হারাণের সত্যিকারের নাতজামাই তার স্ত্রী এমন রাত কাটানোর দুর্নাম শুনে রাগে ক্ষোভে আসে শ্বশুরবাড়ি। ময়নার মা ক্রমশ জামাইয়ের রাগের বিষয়টা বুঝতে পারে। জগমোহনের রাগ, ভুল বোঝার বিষয়টা ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাতে চেষ্টা করে জগমোহনকে। একে একে শোনায় ময়নার মা, ময়নার ঘরে যে ঢুকেছিল সে হচ্ছে সারা গ্রামের মানুষের বাবার মতো, ময়না কোনো ভুল করেনি। শোনায়, তার যুবক ছেলেকে পুলিশে ধরেছে ভুবন মণ্ডলকে গ্রামের বাইরে ছেড়ে আসার সময়। একসময়ে জামাইয়ের জন্যে বাইরে প্রতিবেশীদের কাছে খাবার জোগাড় করতে গেলে ময়নার সঙ্গে জগমোহনের, ক্রুদ্ধ বাক্যবিনিময় হয়। কিন্তু ক্রমশ জগমোহনের রাগ কমে।

আর এই সময়েই চারপাশে খবর ছড়ায় পুলিশ আবার গ্রামে হানা দিচ্ছে এই সন্ধেতেই। পুলিশ এবার সোজা আসে হাবাণের বাড়ি। ময়না, জগমোহন, ময়নার মা এদের নিয়ে মন্মথ স্থূল রসিকতা-মিশ্রিত ব্যঙ্গ করতে এগিয়ে এসে ময়নার থুতনিতে হাত দিলে প্রবল প্রতিবাদে রাগে গর্জে ওঠে জগমোহন। বাইরে তখন আগের দিনের থেকেও কৃষক ও গ্রাম্য মানুষের সমাগম অনেক বেশি। মন্মথ বাড়ির বুড়ো হারাণ থেকে সকলকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পথে সশস্ত্র জনতার সামনে এসে দাঁড়ায়। ময়না তখন স্বামীর মুখের রক্ত আঁচল দিয়ে মোছাতে ব্যস্ত। বুড়ো হারাণ তখনো তার ভাগ্যের ভগবানকে স্মরণ করে যায়। গল্প এইখানেই শেষ।

লক্ষণীয়, 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি নিশ্চিতভাবে তেভাগা আন্দোলনের জটিল প্রেক্ষাপটে আঁকা শোষিত, সর্বহাবা মানুষের চবম দুঃখের কাহিনী! পুলিশি, ধনিক শাসকশ্রেণীর শাসনের চাপে পর্যুদস্ত, অসহায় গ্রামবাসীরা তাদের শ্রমের সামান্য ভিত্তিটিও হারাতে বসেছে। জীবনধারণের এমন অসহায়তার যুগে তারা পঙ্গু। তাদের দুঃখের সঙ্গী কেউ নেই। কিন্তু ক্রমশ তারা নিজেরাই সংঘবদ্ধ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক চাপে। দুঃখের জীবনকেই একমাত্র সত্য বলে তারা ভাবছে না আর।

যে দুঃখের কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকেছেন গল্পে, তার পরিচয় পূর্ববর্তী ও সমকালীন একাধিক কথাকারের রচনায় থাকতে পারে, কিন্তু দুঃখকে একক প্রয়াসে নয়, সমবেত মানুষের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হাজার হাজার বজ্রমুষ্ঠির আবেগদীপ্ত আন্দোলনে জয় করার প্রয়াসের চিত্র সেখানে নেই। অর্থাৎ ব্যক্তির দুঃখকে, শ্রমজীবী কৃষক মানুষের প্রত্যেকের অসহায় করুণ দুঃখকে জয় করার জন্য কোনো বাহির থেকে চাপানো মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের প্রয়াসে নয়, বানানো কৃত্রিম নায়কের তৎপরতাতেও নয়, কৃষকদের মধ্যে থেকেই তাদের গোষ্ঠী জীবনের বিদ্রোহের স্বভাবে মিলিত শক্তির বেগে-আবেগে জয় করার প্রয়াসের ছবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এঁকেছেন এই গল্পে।

'হারাণের নাতজামাই' গল্পের প্রথমেই লেখক জোতদার চণ্ডী ঘোষ ও তার সঙ্গী

কানাই এবং শ্রীপতিদের জোর-জবরদস্তিতে ধান মাঠ থেকে তুলে নেওয়াব বিরুদ্ধে খেটে-খাওয়া চাষীদের দাঁত-চাপা দুঃখের দিনগুলি, প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী প্রয়াসের দিকগুলি এইভাবে এঁকেছেন : 'কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমে-বিহ্বল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা।' এই যে পেটের অন্নকে আগলে রাখার জন্য অসহায় গ্রাম-মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কৃচ্ছ্রসাধন, তার কষ্ট গভীর দুঃখের মধ্যে চলে আসে তখনি, যখন পুলিশ এদের সমস্ত প্রয়াসকে তুচ্ছ করে গ্রামের মধ্যে আসে এদের সমস্ত শক্তির নেতা ভুবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে। প্রতিদিনের অন্ন নিয়েই যাদের অত্যন্ত দুঃখের জীবনযাপন, পুলিশি অত্যাচার তাদের দুঃখের অসহায়তাকেই তীব্রতম করে তোলে।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুঃখকে কেবল ভুবন মণ্ডলের গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় ও আত্মগোপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, চাষীদের পক্ষে অসহায় আত্মসমর্পণেও ছোট করেননি, সমগ্র গল্পে ময়নার মা, ময়না, সমস্ত গ্রামবাসীর দৃঢ় প্রতিরোধী মনোভাব এবং শেষে নাতজামাই জগমোহনের প্রবলতম প্রতিবাদী মনের প্রত্যক্ষ প্রকাশে তাকে জয়ের মঞ্চে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ময়নার মা যখন ব্যক্তি-মা থেকে সর্বজনের ত্রাণদাত্রী মায়ে রূপান্তরিত হয় ধীরে ধীবে, তখনি ভয়ঙ্কর দুঃখ ও ক্ষতি থেকে লেখক গভীর সমবেদনায় জয়ের যেন রক্ততিলক এঁকেছেন গ্রামের মানুষদের শক্ত-চোয়ালের আচরণে, রক্তচক্ষুর এবং উত্তোলিত বাহুর সবল নির্ঘোষে:

> 'বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয় নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।'

এখানে লেখক যে বিশাল গ্রাম-জনতা চরিত্রের 'প্যানোরামিক' চিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যেই আছে দুঃখকে জয় করার উপযোগী আসন্ন বড় সংগ্রামের ব্যঞ্জনা। এই দিয়েই গল্পের প্লটের বৃত্তের সমাপ্তি ঘটেছে। এখানে কোনো একক মানুষ নেই— নেই ভুবন মণ্ডল, নেই ময়নার মা, নেই জগমোহনও! এ সমস্ত ছাড়িয়ে গ্রাম-জনতাই এই গল্পের প্রতিবাদী নায়কত্ব নিয়ে গল্পের কাহিনীগত ব্যঞ্জনার পরিধি সর্বকালের সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের দুঃখ জয়ের অনুগ করে তুলেছে। সম্ভবত বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম একক নায়কের সক্রিয়তা ও পুরনো রীতিনীতির নায়কোচিত

শৌর্য-বীর্য বর্জন করে জনতার নায়কত্বকে বড় শিল্পের মর্যাদা-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পেই তার সার্থক প্রমাণ। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পের শেষতম চিত্রটি লেখকের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবস্তুর ব্যঞ্জনার উপযুক্ত এক প্রতীক-প্রতিম সূক্ষ্ম প্রতিরূপ।

কাহিনীর সূক্ষ্ম এমন ঘনপিনদ্ধ সার্থকতম প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য আমরা এর আগে দেখেছি—বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা', তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সারেঙ' গল্পে। কল্লোলের কালের এইসব বিখ্যাত গল্পকার ছোটগল্পের অঙ্গবন্ধনের চূড়ান্ত শিল্পস্বভাব দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁদের রচনায়। সামান্যতম কাহিনী থাকলেও কোথাও তা কাহিনীমাত্র থাকেনি, প্লটের বৃত্ত পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় দায়িত্বটুকু পালন করে তার সঙ্গে ওতপ্রোত থেকে যায়।

'হারাণের নাতজামাই' গল্পের শুরু কাহিনীর এক চরম সময় দিয়ে— মাঝরাতে গ্রাম ঘিরে পুলিশি হানার সূত্রপাতে, শেষও সন্ধেয় পুলিশি হানার ঘটনায়। কাহিনীবৃত্ত ঘটনাকে বর্জন বা অস্বীকার করেনি। ময়নার মায়ের পক্ষে পুলিশ আসার পর একাধিক ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে যা গল্পের মূল বক্তব্যের সঙ্গে জড়িত। জগমোহনের রাগ ও শ্বশুরবাড়ি আগমন আর এক স্বাভাবিক ঘটনা। গল্পের শেষে পুলিশের হাতে জগমোহনের মার খাওয়া, হারাণের বাড়ির হারান-সহ সকলের গ্রেপ্তার বরণ এবং ময়না-জগমোহনের স্বামী-স্ত্রীর মানবিক বোধ ও মমতায় কাছে আসার চিত্রে ঘটনাগুলি কাহিনীকে একটিমাত্র শর্তেই ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গল্পের মধ্যে প্লট-নিহিত unity of time ও unity of place শিল্পের শাসনে অনবদ্য কায়া-গঠনের সমীপবর্তী থেকেছে। কাহিনীতে কোনো ফ্লাশব্যাক নেই, প্রয়োজনও হয়নি। বুড়ো হারাণের কথায় যে কাহিনীগত ফ্ল্যাশব্যাকের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, তা হারাণের চরিত্র-গঠনেই গৃহীত, কাহিনীতে তার কোনো স্থান নেই, এতটুকু প্রয়োজনও নেই!

'হারাণের নাতজামাই' গল্পের কাহিনী, প্লট ও বৃত্ত-পরিকল্পনা লেখকের অসামান্য শিল্পক্ষমতার পরিচায়ক। ছোটগল্পের পটের অবয়ব উপন্যাসের নয়। তার বিস্তার ছোটগল্পে শিল্পের শাসনে সংযত হতে বাধ্য। আলোচ্য গল্পের কাহিনী তাই চরিত্রগুলির মাত্রা যত বড় করে দেখায়, তত নিজেব অস্তিত্বের গুরুত্ব গৌণ করে তোলে। এখানেই গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় কৃতিত্ব।

তিন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে চরিত্র যে বাস্তবতা পায়, তার বৈশিষ্ট্য লেখকের নিরাবেগ নিরাসক্তি দিয়ে মাপা। এতটুকু বাড়তি মেদ-মাংস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত চরিত্রে মেলে না। ছোটগল্পের শরীরে এক বা একাধিক ছোট চরিত্রের যে জীবন-স্বভাব, শিল্প-স্বভাব, সক্রিয়তা, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব শিল্পী-মন দিয়ে তৈরি করা। চরিত্রগুলির সজীবতা, মনস্তত্ত্ব, কাহিনীকে মেনে আবার অস্বীকার করার মতো

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে তুলনারহিত। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে আমরা এভাবেই গল্পনিহিত সমস্ত ছোটবড় চরিত্রের সঙ্গে পবিচিত হয়ে উঠি।

'হারাণের নাতজামাই' গল্পে ময়নার মা অবশ্যই কেন্দ্রীয় চরিত্র। আর সাধারণ শিল্পসূত্রে ছোটগল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্রের কয়েকটি শিল্পদায়িত্ব থেকেই যায়। প্রথমত, যে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র গল্পের প্লটকে জটিল করার সহায়ক ব্যক্তিত্ব হয়। কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে যে প্লটের বৃত্ত রচিত হতে থাকে, কেন্দ্রীয় চরিত্র তাদের জটিল-যৌগিক এমন এক ব্যক্তিত্ব, যা কাহিনী-ঘটনার গতিপ্রকৃতির স্বাভাবিকত্বেই প্লটের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, যেখানে চরিত্রই মুখ্য ভূমিকা নেয়, সেখানে তার বিবর্তনে, সক্রিয়তায়, মানসলোক উন্মোচনে, ব্যক্তিত্বের বিস্তারে কাহিনী ও ঘটনার পরিমাপ, সীমা চিহ্নিত। গল্পের একমুখিনতা এমন চরিত্রের কারণেই শিল্পিত হয়। তৃতীয়ত, ছোটগল্পে এমন চরিত্রই যখন কেন্দ্রীয় শক্তি, তখন লেখকের যে attitude to life — জীবনাগ্রহ, তথা জীবনদর্শন, এমন বিশেষ চরিত্র ধরেই ব্যঞ্জনা পায়, অন্য যে কোনোও বিষয় সেখানে গৌণ। চতুর্থত, ছোটগল্পে অন্তত তিরিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলা ছোটগল্পে এই শিল্পরূপের শেযে থাকত পরিণামী ব্যঞ্জনার চমক। তা কখনোই সস্তা, পাঠকের চিত্তচমৎকারী নয়, কখনো একটি বাক্যে, কখনো বা একটি কোনো ছোট পরিচ্ছেদে গল্পকার ব্যঞ্জনাকে কঠিন জীবন-ব্যাখ্যার উপযোগী প্রতীকী স্বভাব দেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্র আপন ব্যক্তিত্বের বিভায বড় দায়িত্ব পালন করে। চরিত্রের পরিণতি আর গল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য এক ও একাকার হয়ে চিত্রাত্মক রূপ পেয়ে যায়।

বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা'য় এমন পরিণামী ব্যঞ্জনা হয়েছে চিত্রাত্মক, সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের শেযতম অনুচ্ছেদও তা-ই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রেকর্ড' গল্পের ব্যঞ্জনা একটি কি দুটি বাক্যে অসীম বিপ্লব-ভাবনার দ্যোতক। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা পরিবর্তিত জগমোহনের প্রাধান্যে ঠিকই, কিন্তু তারও পিছনে মূল প্রেরণা চরিত্রটির স্বাভাবিকের ন্যায়ে ময়নার মায়েরই। কেন্দ্রীয় চরিত্রের সফল পরিণতির প্রতিরূপই হল জগমোহন। এই অর্থে জগমোহন গৌণ, ময়নার মায়ের বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব, তাব সুদূর প্রসারিত প্রভাব ও বিস্তার গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের উদ্দীপক।

ময়নার মা এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। লেখক তার কোনো স্বতন্ত্র নাম রাখেননি। তার কারণ নিশ্চয়ই চরিত্রটির স্বভাবে নিহিত। এই চরিত্র তো বিশেষ নামে চিহ্নিত হবার নয়! তেভাগা আন্দোলন শুধু নয়, দেশীয় যে কোনো সুস্থ, সর্বহারাদের আন্দোলনের পক্ষে পরিবার-নির্দিষ্ট মানুষদের এই ভূমিকাই হবে, হওয়া উচিত। সুতরাং তাকে বিশেষ নামে চিহ্নিত করা মিথ্যা। নির্বিশেষ এমন যা স্বভাবে, রক্তে বিপ্লবের আত্মাকে ধরে রাখে। তারা হয়তো বিপ্লবও করতে বেরিয়ে আসে! কিন্তু পরিবারকেন্দ্রিক বাংলার গ্রাম-জীবনে তাদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপনের উপযোগী সেই ভয়ঙ্কর শক্তি নিহিত থাকে। এমন শক্তিতে চিহ্নিত বলেই 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে ময়নার মায়ের কোনো স্বতন্ত্র নাম নেই। সে সকলের মা, যেমন সকলের মা-কে দেখি গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসে।

দ্বিতীয় যুক্তি হল, ময়নার মা-র বিশেষ নাম গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের প্রয়োজনের দিক থেকে অনধিকারী বিষয়। গল্পের লক্ষ্য হারাণের 'নাতজামাই' এই পরিচয় দিয়ে, তা ভাঙিয়ে একটি বড় বিপ্লবের নেতাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানো এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিকে আরও বেশি বেগবান করা। 'নাতজামাই' শব্দটিই লেখকের লক্ষ্য, 'জামাই' নয়। শুধু জামাই হলে হাবাণ অস্বীকৃত হয। আর ময়নাব মায়ের সেই সম্পর্কিত উচ্চারণ গভীর ব্যঞ্জনায় স্বভাব পায না। তাই ময়নার মায়ের স্বতন্ত্র কোনো নাম গল্পে নেই।

ময়নার মা চরিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি। উপস্থিত বুদ্ধি, সততা, কৌশল, মেয়ের জন্য দুঃখ, জামাইয়ের জন্য অসহায়তাবোধ, ছেলের চিন্তায় অস্থিরতা— সবই একটি উৎস থেকে নিয়ন্ত্রিত — তার স্বভাবসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবচেতনা। সে অশিক্ষিত-পটুত্বের মধ্যেও বিপ্লবের মৌল প্রাণটিকে বুঝতে সক্ষম। এখানেই তার চরিত্রের মূল মাটিটি কঠিন থাকে। ময়নার মা সাংসারিক মা, সে সংসার মধ্যবিত্তের নয়, শিক্ষিতের নয়, একেবারে নীচের শ্রেণীর অভাবী সংসারের মা। সে বিধবা। সংগ্রাম তার কাছে সত্য হতে বাধ্য। তার চেহারার বর্ণনা তার স্বভাবেরই অনুপন্থী— 'প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতিপরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুযালী ভাব।'

ঠিক এই বর্ণনাব পাশেই যদি তার একটি সবব ভূমিকার কথা উল্লেখ করি, তাতেই তার প্রকৃত স্বভাবেব সামগ্রিক একটি ব্যাখ্যা ধরা পড়ে। 'কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুযশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল দিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া কবে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা।' ময়নার মায়ের পক্ষেই তা সম্ভব। মায়ের যে অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি আছে, তার প্রমাণ বুড়ো হারাণকে পুলিশি হানা প্রত্যক্ষভাবে বাড়িতে এসে পৌঁছনোর আগে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানোর ও সতর্ক করা, ময়নার ছেঁড়া কাপড় বদলে তাকে রঙিন তাঁতের শাড়ি পরানো, ভুবন মণ্ডলকে আসল জামাইয়ের পরিচয় পাখি-পড়ানোর মতো পড়িয়ে দেওয়াতে মেলে। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই সমগ্র গল্পের বক্তব্যের পক্ষে অবধাবিত শক্তি।

পুলিশের সামনে ময়নার মায়ের ভূমিকা অসাধারণ সাহসীর ও বুদ্ধিমত্তার। সে নিজেই এগিয়ে যায় পুলিশের কাছে, ডেকে আনে ঘরে। মেয়েকে ঘরে শুতে যেতে বলে অবলীলায় ভুবনকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। তার অভিনয় অনবদ্য, নিখুঁত, কিন্তু ময়নার মার অভিনয় তার চরিত্রের মহত্তর তাৎপর্যের ক্ষেত্রে আদৌ অভিনব নয়, তার স্বভাব-নিহিত আর এক বড় ব্যক্তিত্ব। সে ব্যক্তিত্ব এক বিপ্লবপ্রাণা রমণীর। বিপ্লবের যে বড় নীতি, তাতেই দীক্ষিত ময়নার মা, এসব অভিনয় তো তারই অন্যতম অঙ্গ! আর শরীরেব স্বাভাবিক অঙ্গ যেমন শরীরের অবধারিত বিকাশ ও রূপ, ময়নার মায়ের অভিনয়ও তার বিপ্লব-বিশ্বাসের, তার বড় ন্যায়নীতিবোধের প্রধান অঙ্গ। তা শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে সত্যই!

এককথায়, ময়নার মায়ের চরিত্রে যে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি একসঙ্গে সামনে এসে ভিড় করে, যেগুলি চরিত্রের সঙ্গে ছায়া-কায়ার সম্পর্কে বিস্ময়কর বিশ্বাস্যে আমাদের সামনে আসে— সেগুলি হল, তার উপস্থিত বুদ্ধি অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার সংগ্রামী চেতনা, তার কূটকৌশল আর সর্বকাল-সমর্থিত মাতৃত্ববোধ। প্রসঙ্গত স্মরণ করাই, কোনো কোনো সমালোচক ময়নার মায়ের চরিত্রে 'সংগ্রামী মেজাজ'কে দেখেছেন। কিন্তু এমন শব্দপ্রয়োগে কারো বিপ্লবচেতনাকে অনেক ছোট করা হয়। 'মেজাজ' আর 'চেতনা' এক জিনিস নয়। 'মেজাজ' হল মানুষের মনের, জীবন-যাপন ও ধারণের ওপরের স্তরের বিষয়, অন্যদিকে 'চেতনা' হল মানুষের মনের গভীর-তলাশ্রয়ী আত্মিক সংকটের সঙ্গে তার সমন্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। 'সংগ্রামী মেজাজ' কথাটি নিশ্চিতভাবে হবে 'সংগ্রামী চেতনা' ময়নার মায়ের ক্ষেত্রে।

গল্পের প্রথমেই ময়নার মায়েব চারিত্র্য বোঝাতে এবং সূক্ষ্ম কাহিনীর স্বভাব বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বিবরণে জানিয়েছেন— 'আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধেব পর তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে।' লক্ষ করাব বিযয, এমন বিবরণে নিশ্চিতভাবে আছে ময়নার মায়ের উপস্থিত বুদ্ধি ও কৌশলের চমৎকার পরিচয়। কিন্তু এটুকুতেই চরিত্রের পুরো ডাইমেনশান বোঝানো যায় না। ময়নার মায়ের মধ্যে যে এক বিপ্লবপ্রাণা রমণীর প্রতিবাদী রক্ত আছে, সে যে গ্রামের অন্য সব মা ও বিধবা রমণীর থেকে আলাদা জাতের, সেটাই ধরা পড়ে। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গ্রামের মধ্যে এমন একটা রমণী সমস্ত প্রতিরোধ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা ও অস্বীকাব করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে এক বিপ্লবীকে নিজে ডেকে এনে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে, এই একমাত্র মানসিকতাতেই ময়নার মা অনন্য-রমণী হয়ে ওঠে।

ময়নার মায়ের অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সূক্ষ্ম চাতুর্যপূর্ণ কৌশলের একাধিক অনবদ্য উদাহরণ গল্পের কাহিনীর গতিতে উজ্জ্বল বিচিত্র মণিখণ্ডের দীপ্তিতে পাঠকের সামনে ধরা পড়ে যায়:

১. আসন্ন পুলিশি ভয়ের ভাবনায় বুড়ো বাপের জন্য ময়নার মায়ের তৎপরতার চিত্র: 'তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে শুয়ে থাকতে বলে।'

২. ভুবন মণ্ডলকে লুকিয়ে রাখার আর এক কৌশল: 'ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড় খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলোভাবে জড়িয়ে দেয় রঙিন শাড়ি।'

৩. পুলিশ ইন্সপেক্টর মন্মথর গুলি চালাবার হুকুম দেওয়ার আগের মুহূর্তে ময়নার মায়ের দুর্দান্ত অভিনয়ে অকপট স্বীকৃতি-চিত্র: 'ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু

তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন। ... দ্যাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে।'

প্রচণ্ড সাহস ও সংগ্রামী চেতনার চিত্ররূপ হল ময়নার মায়ের চরিত্র। লক্ষ করার বিষয়, এই চরিত্রে বিপ্লবী চেতনার প্রয়োগ-কৌশলটি ক্রমশ বিপ্লবের রক্তকে বাইরে থেকে চরিত্রের অভ্যন্তরে আত্মার আলোর স্বভাবে চিহ্নিত করে দেয়। এখানেই চরিত্র আর এক বিবর্তন-স্বভাবী অনন্যতা।

ভুবন মণ্ডল ময়নার মায়ের ঘরে উপস্থিত। যে কোনো মুহূর্তে সামান্য ভুলের জন্যে ধরা পড়ে যেতে পারে মন্মথর হাতে। এ এক দারুণ 'টেনশন' গল্পের ক্লাইম্যাক্সধর্মী 'situation'-এর ক্ষেত্রে। গ্রামের সব মানুষ চারপাশে ভীত-উত্তেজিত দর্শকের ভূমিকায় বর্তমান। নেশাগ্রস্ত মন্মথর দৃষ্টি যুবতী ময়নার শরীরে লোভের জিভ ঘষতে উদ্যত। এই আড়ষ্ট, নিথর, অসহায় অবস্থার বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিত্রখণ্ডটি উপহার দিয়েছেন, তাতে বিপ্লবী ভুবনের যেমন ভিতর-স্বভাব আছে, তেমনি আছে ময়নার মায়ের সবর্জনীন বিপ্লব-ভাবনার স্বভাবানুগ অগ্নিখণ্ড: 'ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না।'

কঠিন প্লটের বন্ধনে কাহিনীবৃত্তটির দুটি ভাগ— প্রথম ভাগে আছে ময়নার মায়ের সঙ্গে ভুবন মণ্ডল, ময়না, মন্মথ, বৃদ্ধ হারাণ, দ্বিতীয় ভাগে আছে ময়নার মা ও জগমোহন। দ্বিতীয় ভাগে নকল জগমোহনকে দেখে পুলিশের দল চলে গেলে আসে আসল জগমোহন— হারাণের নাতজামাই। স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে রাত কাটানোর নোংরা অপবাদ শুনে ক্ষুব্ধ জগমোহন শাশুড়ির কাছে এলে, কাহিনীর যে দ্বিতীয় ভাগের শুরু, তার মধ্যে ময়নার মায়ের চরিত্রের ক্লাইম্যাক্স ও চরিত্রটির স্বভাবে ক্রমশ ব্যক্তি-মা থেকে বিশ্ব-মায়ের স্বভাবে উত্তরণের চিত্র রচিত হয়ে যায়। এখানেই তার সেই উপস্থিত বুদ্ধি, চাতুর্যপূর্ণ কৌশল সংগ্রামী চেতনাকে চরিত্রে গভীর-নিবিষ্ট করে যেমন, তেমনি তার তৃতীয় একটি ডাইমেনশান আনে। এই ডাইমেনশানটি প্রথম ভাগে ছিল না, এটি চরিত্রের বিবর্তনের ফল। তা হল ময়নার মায়ের সকরুণ মানবতাবোধ জড়িত গভীর মাতৃত্ববোধ। ময়নার মা হিসেবে রক্তের সম্বন্ধের মাতৃসত্তা, আর জগমোহনের শাশুড়ি হিসেবে অর্থাৎ পোশাকি বা কুটুম্বিতার স্বভাবে মাতৃসত্তা— দুই মিলে গভীরতম মাতৃত্ববোধে ময়নার মা নিয়ন্ত্রিত করেছে একদিকে ময়নার অসহায়তা ও অশ্রুসজল কারুণ্য, অন্যদিকে জামাইয়ের সন্দিগ্ধ মন থেকে তাকে বড় বৈপ্লবিক জীবনসত্যে দীপ্ত হওয়ার বিশিষ্ট মানস-ধর্মকে। মাতৃত্ব ভাবনাকে কেন্দ্র করে লেখক বিপ্লবের অসামান্য পরিশীলন এনেছেন ময়নার মায়ের শেযতম উত্তরণ চিত্রে। এখানে ব্যক্তি-মা হয়েছে বিশ্ব-মা অর্থাৎ গ্রামীণ সর্বসাধারণের উপযোগী মা:

> 'ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি?'
>
> 'বাপ নাকি?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

'বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।'

বাঙালি দরিদ্র ঘরের সাংসারিক মা, ব্যক্তি-মা হিসেবে ময়নার মায়ের শেষতম অসহায় চিত্রটিও বড় করুণ। বড় সংগ্রামের জায়গায় ময়নার মায়ের ঘটে জয়, ছোট সাংসারিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে বড় দুর্বল হয়, হেরে যায় সহজেই। সেই পরাজয়ের চিত্র ভাবপ্রবণতায় ও আবেগে অত্যন্ত ব্যক্তিক। দুটি উদ্ধৃতিই উপযুক্ত উদাহরণের পক্ষে যথেষ্ট:

১. লেখককৃত ময়নার মায়ের মানসিক অসহায়তার ছবি— 'বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে , অবুঝ পাষণ্ড জামায়ের সাথে লড়াই নেই।'

২. ময়নার প্রতি সন্দেহে জগমোহন শ্বশুরবাড়ি থাকতে চাইছে না, শাশুড়ির কোনো অনুরোধও সে মেনে নিতে অপারগ, এই অবস্থায় ময়নার মায়ের জামাইয়ের কাছে আন্তরিক আবেদন— 'তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।'

নিজের রক্তের সম্বন্ধের সন্তানকে ময়নার মা পুলিশের হাত থেকে, তাদের আসন্ন অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু সারা গ্রামে সর্বহারাদের ত্রাতা তাদের নেতা ভুবন মণ্ডলকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। একই মাটিব ওপরে দাঁড়িয়ে মা হিসেবে ময়নার মায়ের যে স্থান পরিবর্তন, তা তাকে বিশেষ থেকে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনায় বড় মর্যাদায় দেয়। এভাবেই চিরকালের সর্বহারাদের নেতৃত্বে আসে তাদেরই মধ্যকার এক একজন মানুষ— সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক!

আবার ময়নার মায়ের হারাণের নাতজামাই সংক্রান্ত ভাবনায় দুই রূপ। এক রূপে সে মিথ্যের জগমোহন ভুবন মণ্ডলকে সামলায়, বাঁচায়, গ্রামে বাইরে তাকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। আর এক রূপে সে সত্যিকারের জগমোহনের— হারাণের নাতজামাই-এর, নিজের জামাইয়ের শাশুড়ি হয়ে তাকে সামলাতে চেষ্টা করে। দুই বিপরীতধর্মী মানুষকে অসাধারণ ক্ষমতায় সামলানোর ব্যাপারে ময়নার মা বাংলা সাহিত্যে একটি অনবদ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে। ময়নার ঘরে পুলিশ ও পাড়াপ্রতিবেশীর সামনে ভুবন মণ্ডলকে ঢুকিয়ে দিয়ে সে কোনো কোনো প্রতিবেশিনীর কুৎসিত ইঙ্গিতের লক্ষ হয়েছে, কিন্তু সেখানেও সে বেপরোয়া। তার ব্যক্তিত্বই তাকে আরও সাহসী করেছে।

নিজের জামাই জগমোহনকে সামলানোর বিষয়টি ময়নার মায়ের দিক থেকে অতি ধীবে শান্তভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তার সামলানোর প্রয়াস তিনটি স্তরে: ১. সাধারণ পারিবারিক কুটুম্বিতার অনুরূপ খবর দেওয়া-নেওয়ায়, ২. জগমোহনের শালা অর্থাৎ

ময়নার জোয়ান ছেলেকে পুলিশের ধরে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ দানে, ৩. ভুবনকে দশটা গ্রামের পিতারূপে অভিহিত করায়। এর পরেই জগমোহনের অতি ধীর যে পরিবর্তন, যে নতুন করে সুস্থ বিশ্বাসের মাটি গ্রহণ, তার সশব্দ বিস্ফোরণের মতো প্রতিবাদী ভূমিকা দেখি পুলিশের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার চিত্রে। সুতরাং জগমোহনের মধ্যে যে নতুন করে ময়নার প্রতি, নিজের প্রতি, সমগ্র পরিবারের প্রতি ময়নার মা বিশ্বাস জাগায়, তার কৃতিত্ব এই চরিত্রের অসাধারণ বাকপটুতাধর্ম ও বুদ্ধিকেই উজ্জ্বল করে।

সমগ্র গল্পে ময়নার মায়ের ভূমিকাই গল্পের প্রাণ। গল্পের গতি এই চরিত্রের কেন্দ্র থেকেই তীব্রতা পায়। গল্পের শেষে দেখা যায়, ময়নার মায়ের দায়িত্ব শেষ হয়েছে যেখানে, সেখানেই গল্প ও তার প্লটকে এসে ধরেছে পরিবর্তিত জগমোহন। ময়নার মায়ের দায়িত্ব শিল্পের দিক থেকে এখানেই শেষ। ভুবন মণ্ডল ও জগমোহন— দুই ব্যক্তিত্বের সমস্ত রকম দায়দায়িত্ব ময়নার মা-ই নিজের কাঁধে নিয়েছে সমগ্র গল্পে। তাই এই চরিত্রের ভূমিকা অসাধারণ দীপ্তিতে আমাদের অভিভূত করে।

জামাই জগমোহন চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিক রঙে চিত্রিত। তার কাছে গ্রাম্য পরিবেশে যেভাবে খবর গেছে, তাতে তার রাগ, ক্ষোভ দেখা দেওয়া একান্তই স্বাভাবিক। সে যেভাবে শাশুড়ির কাছে রাগ প্রকাশ করেছে, তার মধ্যে এতটুকু অতিরিক্ততা নেই। একেবারে মাপা, সময়োপযোগী তার সমস্ত সংলাপ, তার বার বার রাগে চলে যাওয়ার বাসনা-প্রকাশ ও না-যাওয়ার প্রচ্ছন্ন প্রয়াসের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে বাঙালি পরিবারের জামাই আসা-যাওয়ার অন্তর্নিহিত কৌতুকটিকে বজায় রেখেছেন। জগমোহন এ গল্পে একটি অত্যন্ত serious চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যে শ্বশুরালয়ের পরিবেশে প্রচ্ছন্ন কৌতুকটি একবারে অবধারিত ছায়ার স্বভাবে লেগে থাকে।

গল্পটি জগমোহনের প্রতিবাদী সক্রিয়তা দিয়েই শেষ। তাই গল্পে তার গুরুত্ব আর একদিক থেকে লক্ষ করার মতো। সে ভুবনের চরিত্র বুঝতে পেরে, শাশুড়ির সত্যভাষণে বিশ্বাস রেখে, শালার গ্রেপ্তার হওয়ার অসহায়তার ভাবনায় নিবদ্ধ থেকে স্ত্রীর প্রতি একটা বিশ্বাসের মাটি নিজের মধ্যে থেকেই পেয়ে যায়। এই বিশ্বাস কিন্তু সাধরণ বিশ্বাস নয়— যা তাকে একটি সাধারণ জামাই করেই হারাণের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! এই বিশ্বাস তার বড় বিশ্বাস, তার এক পুনরুজ্জীবনের (Resurrection) মতো! সে তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্যকভাবে জড়িয়ে যায়। গল্পের শেষতম মোক্ষম সূত্রটি তারই হাতে। পুলিশের বিরুদ্ধে তার যখন ময়নাকে আড়াল করে গর্জিত কণ্ঠের প্রকাশ 'মুখ সামলাই কথা কইবেন।'—তখনি তার ভিতরের স্বভাবে পরিবর্তিত রূপ ধরা পড়ে যায়। গল্পের মধ্যভাগে তার আবির্ভাব, কিন্তু গল্পের মূল ব্যঞ্জনায় তার যোগ নিবিড় হয়ে যায়। 'ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের।' —এই চিত্রে জগমোহনের প্রতি পাঠকের সম্যক সহানুভূতি, মমত্ববোধ, পরমতম শ্রদ্ধা ময়নার এমন আচরণের মতোই ঝরে পড়ে।

'হারাণের নাতজামাই' গল্পে মন্মথ তার এক বিরোধীপক্ষের পুরুষ চরিত্র। সে পুলিশি হানায় রেইডিং পার্টির নায়ক, দারোগা। গল্পের প্রথমে তার আবির্ভাব, বড় ভূমিকা গল্পের শেষেও। সে বি.এ. পাস, শিক্ষিত, শৌখিন, মদ্যপানে অভ্যস্ত। পুলিশের কাজে এসে নারীলোভ তার বাদ যায় না। 'ময়নার রঙিন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথর, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা তীক্ষ্ণ লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা!' এই চিত্রে মন্মথ যথার্থ অর্থেই এই বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার শোষকশ্রেণীর শোষণ-যন্ত্রের উপযোগী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। মদ আর মেয়েমানুষ বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকদের পক্ষে শাসনযন্ত্রকে কালে লাগানোর একমাত্র inspiration। অথচ এটাই যে তাদের মরণ ঘটায়, তা তারা বোঝে না। মন্মথও বোঝেনি। সে প্রবঞ্চিত হয়েই হারাণের বাড়ি থেকে ফিরে যায়। যতক্ষণ তল্লাশি চলে হারাণের বাড়ি, মন্মথ নিজের অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত কামপ্রবৃত্তি মনে মনে চরিতার্থ করে। আর নিজের এই চরিত্রে নিজেই বড় ঠকান ঠকে। গল্পের শেষে তার ভূমিকা, কথায় অশালীন শব্দ ব্যবহার, ময়নাকে ছোঁয়ার ক্ষণিক সুখ তাকে যথার্থ এক সুবিধাভোগী পুলিশ চরিত্র করলেও জগমোহনের প্রতিবাদ তাকে কিছু শিক্ষা দেয়। সেই শিক্ষা তার মনে ভয় জাগায়, দ্বিধা আনে সারা গাঁ ছাপিয়ে-আসা জনতার সামনে। এই শিক্ষা তাব চরম শিক্ষাই।

হারাণ চরিত্র গল্পে এক পোড়খাওয়া, ভাগ্যে বিশ্বাসী মানুষের স্বভাব স্পষ্ট করে সমগ্র গল্পে। তার কথাতেই গল্প শেষ। সে যেন এই গল্পের বিবেক, বা মূলভাবের পক্ষে কিছুটা ধুয়াব (Refrain) মতো। তার ছেলের কথা ভেবে ভগবানের উল্লেখ যেন মানুষগুলির প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ। এভাবেই গল্পে হারাণের এক পরোক্ষ ভূমিকা থেকে যায়। অন্যান্য গ্রাম্য সাধারণ মানুষদের মধ্যে গৌর সাউ, মোক্ষদা, ক্ষেন্তি, রসিক ভড়, মথুর—সকলেই গল্পের প্রধান চরিত্র ও মূল লক্ষ্যের প্রয়োজনেই এসেছে, কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব তাদের নেই।

চার

'হারাণের নাতজামাই' গল্পটিকে সামাজিক সমস্যামূলক গল্পের শ্রেণীতে রাখায় বাধা হয় না, আবার আদর্শ-নির্ভর রাজনৈতিক গল্প বলতেও ইচ্ছা জাগে। ময়নার মা চরিত্রকে সামনে রাখলে একে চরিত্রাত্মক গল্প বলতে আপত্তি হবে না। আসলে মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে এর শ্রেণী চিহ্নিত হতে পারে সামাজিক সমস্যামূলক গল্পেই। শোষক ও শোষিত-সমাজের সমস্যা ও তাদেব বিরোধ এবং বড় প্রতিবাদে সেই বিরোধের এক রক্তিম বৈপ্লবিক রূপ—এই ব্যাখ্যায় 'হাবাণের নাতজামাই' গল্পটিকে সমাজ সমস্যামূলক গল্প বলাই বিধেয়। রাজনীতির উত্তাপ আছে কিন্তু বাজনীতি নেই, তাই রাজনৈতিক আদর্শের গল্প বলা ঠিক হবে না।

গল্পের ক্লাইম্যাক্স একেবারে শেষে ত্রি-স্তরে: ১. গ্রাম্য কৃষক-জনতার বিপুল বিস্ময়কর সংঘবদ্ধতার চিত্রে, ২. জগমোহনের প্রতিবাদে এবং জগমোহন-ময়নার পারিবারিক

সম্পর্ক-স্থাপনে, ৩. হারাণের অসহায় ঈশ্বর-আশ্রয়ী স্বগতোক্তিতে। গল্পের শেষে এসে দেখি, জগমোহন পরিবর্তিত, কিছুটা স্বভাবে বিপ্লবী, মন্মথ বিশাল সংঘবদ্ধ ক্রুদ্ধ জনতার সম্মুখীন। আর সেই সঙ্গে পারিবারিক অশান্তির মধ্যে ময়নার জগমোহনের কাছে আসা! এই সমস্ত মিলিয়ে যেমন গল্পের ক্লাইম্যাক্স রচিত, তেমনি বক্তব্যের একমুখিন স্বভাবে ভাবটির কেন্দ্রীয় তাৎপর্য পরিণামী-বিস্তারে গভীর। গল্পে কোথাও অতি-বিস্তার নেই, আগেই বলেছি, কাহিনী এখানে গৌণ হয়ে গেছে গল্প যত এগিয়ে গেছে। গল্পের ইঙ্গিতধর্মিতা সার্থক ছোটগল্পের উপযোগী, শোষণের উপযোগী শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রামের দ্যোতনাতেই নিবদ্ধ। তার কেন্দ্রবিন্দুটি মন্মথর পরোক্ষ পরাজয়, জগমোহনের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ও হারাণের নিষ্ফল ভাগ্যের কাছে স্বগতোক্তিসুলভ দোহাই— এসবের সামগ্রিক তাৎপর্যে স্থিত।

'হারাণের নাতজামাই' গল্পটির ভাষারীতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতাকে স্পষ্টত মান্য করে। সংলাপ সংক্ষিপ্ত, শ্লেষ-ব্যঙ্গ আলোকিত। যেমন, গৌর সাউ-এর একটি প্রশ্নের উত্তরে ময়নার মায়ের বলা সংলাপ—'সদর দিয়া আইছে। তোমার এক মাইয়ার সাতটা জামাই। চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে।' অথবা লেখকের নিজেরই দারোগা মন্মথর কামুক দৃষ্টির বর্ণনায় ভাষা ব্যবহার,—'ময়নার রঙীন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটির আধুপষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা।' এই উপমা প্রয়োগে মন্মথর নোংরা কামার্ত দৃষ্টির প্রতি লেখকের তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ করার মতো।

ময়নার মায়ের কথায়, একাধিক অর্থের ব্যঞ্জনা দেওয়া সংলাপ ব্যবহারে লেখকের ভাষারীতির সার্থক শিল্পরূপ অবলীলায় ধরা পড়ে:

> 'ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিস, কাঁদনের কি?'
>
> 'বাপ নাকি?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।
>
> 'বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিতে হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে! আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে।'

এই সংলাপের বাঁধুনি লেখকের নিজস্ব ভাষারীতির সম্যক পরিচায়ক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে স্ব-কাল স্বদেশকে সার্থকভাবে এঁকেছেন। সেই অঙ্কনে তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয় মেলে। তিনি ক্রমশ সর্বহারাদের মধ্যে নেমে আসছিলেন। 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় গল্পের শেষে যেখানে নেমে আসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সেখানে দাঁড়িয়েই 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল যেভাবে শোষিত শ্রেণীর জীবন-পরিচয় ঘটিয়েছিল লেখকের, তার শিক্ষা যুদ্ধোত্তর কালের গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন হয়ে

দেখা দিয়েছে। গল্পে মন্মথর বিরুদ্ধের গ্রাম্য কৃষক ও সর্বশ্রেণীর শোষিতদের যে প্রতিবাদী ভূমিকা, যে কঠিন শপথ, তা লেখকের নিজস্ব বিশ্বাসই। এই গল্পের শেষ জনতা যেন 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের শেষের সেই নিরন্ন অসহায় মানুষগুলি। তারাই যেন আজ একতার শক্তি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে এই গল্পের শেষে মন্মথর সামনে দাঁড়িয়েছে। এ হল লেখকের নিজস্ব সাম্যবাদী সমাজদর্শন তথা জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনে দীপ্ত 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

পাঁচ

গল্পটির নাম বস্তুত গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। 'ময়নার মা' এই নামে গল্পের নাম হতে পারত, কিন্তু তা হত আংশিক অর্থের ব্যঞ্জনায় কম শিল্পরূপ-বিশিষ্ট নাম! লেখক নাম রেখেছেন ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির আশ্রয়ে। নাতজামাই জগমোহনের ভূমিকায় থেকে ভুবন মণ্ডল পুলিশের চোখে ধুলো দেয়। আবার জগমোহন প্রকৃত নাতজামাই হয়েই গল্পে আর এক ব্যঞ্জনা আনে। সে প্রকৃত নাতজামাই হয়েও পুলিশকে ঠকায়। এই দুই ভূমিকা 'হারাণের নাতজামাই'-এর থাকায় নাম সার্থক।

আর একটি ব্যাখ্যা হল, জগমোহন গল্পের শেষে এক পরিবর্তিত চরিত্র এবং বুঝিবা নতুন বিপ্লবে বিশ্বাসী চবিত্র হয়ে ওঠে। তার চরিত্রগত রূপান্তর ও ব্যঞ্জনা গল্পের পরিণামী বিষয় হওয়ায় এমন নামের তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না।

'নাতজামাই' শব্দ ব্যবহারে একটা সস্নেহ আদরের সরস কৌতুকের ভাব থাকে, যা 'জামাই' শব্দে নেই। 'নাতজামাই' শব্দের এই কৌতুকটিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা শ্লেষ দিয়ে গল্পের নামে ব্যবহার করেছেন। পুলিশ ও প্রতিপক্ষের বাধা এই নাতজামাইটিই। গ্রামের দিকে একটি পরিবারের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় গৃহকর্তা দিয়ে। তাই হারাণের নাতজামাই বলা যত স্বাভাবিক, ময়নার 'বর' বা 'মায়ের জামাই' বলায় তত সামাজিক স্বীকৃতির স্বাভাবিকতা থাকে না। আবার নব্বই বছরের বুড়ো হারাণের নাতজামাইয়ের কথা বলে কৌতুকরসে ব্যঙ্গ মিশিয়ে যদি একটা গুরুগম্ভীর ভাবকে, বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাতে রসের বৈপরীত্যে নামটি আরও বেশি বিস্ময় ও চমকের আনন্দ দেবে। এই অর্থে গল্পটির নামেব তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা করা যায়।

চতুর্থ ব্যাখ্যা হল, সমগ্র গল্পে আমরা দেখি নানা ঘটনা, অবস্থা, পরিবেশ ও বাহ্যিক-মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে একটি মানুষ নতুন করে বিপ্লবের দীক্ষা পেল, এবং সে হারাণের নাতজামাই জগমোহন, গল্পের পরিণামে তার সেই প্রচ্ছন্ন ভূমিকার প্রতীক-প্রতিম রূপ। তাই হারাণের নাতজামাই যেন এ গল্পের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী-শক্তির অন্যতম নায়ক হওয়ায় নাম সার্থক।

৫.

ছোট বকুলপুরের যাত্রী

এক

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ১৩৫৬ (১৯৪৯) সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত এই নামেরই একটি গল্প সংকলন গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুদ্ধোত্তর এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালের এই রচনাটি 'হারাণের নাতজামাই' গল্পের প্রসঙ্গ ও মেজাজের সঙ্গে একতারে বাঁধা। ব্রিটিশদের হাত থেকে, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তির স্বাদ নেওয়ার উপযোগী ঘটনা স্বাধীনতা-প্রাপ্তির— একই সঙ্গে উদ্বেগ ও আবেগ যথেষ্ট স্তিমিত হয়ে এলে— নবোদ্ভূত দেশীয় পরিবেশে সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক দিকগুলি যেমন জটিল হয়ে পড়ে, তেমনি অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার সূত্রে কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা তীব্র, একাধিক আন্দোলনে চিহ্নিত হতে থাকে।

আসে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, চাষীদের তেভাগা আন্দোলন। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যেই গড়ে ওঠে কলকারখানায় শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের নানান পর্যায়। এমন অস্থিত পরিবেশে দেখা দেয় ভূমিচাষের ক্ষেত্রে নব প্রেরণায় জাগ্রত গ্রামীণ কৃষককুল ও কলকারখানার দৈনিক খেটে-খাওয়া শ্রমিকরা একদিকে, আর একদিকে গ্রামের জোতদার-জমিদার ও কলকারখানার সুবিধাভোগী মালিক শ্রেণী। দ্বিতীয়োক্ত দলের তৈরি-করা দালাল শ্রেণীর মধ্যস্থতা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে রাজ্যের পুলিশ-বাহিনীর তৎপরতা এই বিরোধে বিশেষভাবে সামনে এগিয়ে আসে।

অর্থাৎ জোতদার-জমিদার এবং কারখানার মালিক শ্রেণী আছে পিছনে, আত্মর[illegible] সব রকম ব্যবস্থার মধ্যে। আর তাদের হয়ে ফড়িয়া জাতের বা দালাল গোছের কিছু [illegible] জোতদার-জমিদার-মালিকদের রক্ষার্থে নিযুক্ত পুলিশদের হয়ে আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, এই প্রয়াসের মধ্যে এক অলিখিত নিষ্ফলত্ব মূলেই সক্রিয় থাকে। জীবন, প্রাণ ও মাটির মায়ায় যে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর একতাবদ্ধ হওয়া, তার পাশে ভুঁইফোড় দালালদের কর্মতৎপরতা তাদের শক্তিহীনতা, দুর্বলতাকেই বিশিষ্ট করে। তাদের মধ্যে সেই সংঘচেতনা থাকতেই পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ সুবিধাভোগী, সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থান্বেষী মানুষই এর সামিল হয়।

বুর্জোয়া সমাজের ধর্মই এই। সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সব রকমেই মধ্যস্বত্বভোগী একদল মানুষের সৃষ্টি করে, যারা 'পরগাছার মতো, যাদের শিকড় মাটিতে থাকে না। জোতদার-জমিদার-কারখানার মালিকদের কৌশলেই তাদের জন্ম ও অস্তিত্ব থেকে বিদায় ঘটে। এই জাতীয় মানুষদের কথা বলেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পের পরিকল্পনা করেছেন। 'হারাণের নাতজামাই'-এ যারা ছিল জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক, কানাই ও শ্রীপতির মতো মানুষ, মথুরের মতো চর, তারাই এখানে বেশ কিছুটা বড় জায়গা নিয়ে ঘুরেফিরে বেড়িয়েছে।

অর্থাৎ 'হারাণের নাতজামাই'-এর মতো 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে সেই একই

রাজনৈতিক উত্তাপ, সেই সংঘবদ্ধ মানুষের কথা, কিন্তু এই গল্পে সংগ্রামী কৃষকদের চরিত্র নয়, তাদের বিপরীত মানুষগুলিকেই বেশি করে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন লেখক। কারণ এরা কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে যেমন আছে, তেমনি কৃষকদের মধ্যেও আছে। জোতদার-জমিদার কারখানার মালিকদের টাকা পেয়ে প্রভুর কর্তব্যকর্ম করার দীক্ষায় দীক্ষিত নয়, তার ওপরেও নিজেদের সব রকম সুযোগ-সুবিধাসহ মওকা বুঝে কুক্ষিগত করার নির্লজ্জ প্রয়াস— এর চিত্রই আলোচ্য গল্পে স্থান পেয়েছে। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে আছে তেভাগা আন্দোলনের মৌল প্রতিক্রিয়া-নির্ভরতা, 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে আছে বাংলাদেশের সে সময়ের সত্যিকারের বিশেষ এক গ্রামেরই চাষীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সত্য, বাস্তব ছবির পরিচিতি। গল্পে গ্রামের মূল নাম পরিবর্তিত।

দুই গল্পেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বহারা শ্রেণীর, শোষিত শ্রেণীর পক্ষে থেকেছেন। এটাই তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর কালের গল্পকার-মানসিকতার প্রধান বিশিষ্ট দিক। লক্ষ করার বিষয় হল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'হারাণের নাতজামাই'-এ শুধুই কৃষকদের পক্ষে থেকে গল্পের আবহ সৃষ্টি করে তার ব্যাপ্ত পরিণামী-চেতনার দিক আমাদের সামনে ধরেছেন, 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে যুগপৎ শ্রমিক ও কৃষক দুই শ্রেণীকেই একটা ছোটগল্পের অবয়বে অসাধারণ ব্যঞ্জনা দিতে সক্ষম হয়েছেন।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পের কাহিনী বলতে কিছুই নেই। যেন একটি চিত্র আঁকা শুরু হয়েছে একটি গ্রামগঞ্জের বুক-চিরে-যাওয়া রেললাইনের মধ্যবর্তী রেলস্টেশন থেকে, আর চিত্রটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে একটি রেললাইন ও রেলস্টেশন থেকে দূরবর্তী এক গ্রামের প্রবেশপথের মুখে এসে। কাহিনীর দায়িত্ব বেড়েছে তার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশে। ওই মধ্যবর্তী অংশের চিত্রই যেন কাহিনীর সর্বশেষ চিত্রটি থেকে বেশি ব্যঞ্জনাগর্ভ। আমরা মধ্যবর্তী প্রসারিত চিত্রে নতুন একদল মানুষকে দেখি যারা শ্রমিকও নয়, কৃষকও নয়, কিন্তু এদের শ্রমের ফসলে জীবনধারণ করে নির্লজ্জভাবে এদেরই ধ্বংস করার হীন স্পর্ধা রাখে। কাহিনীর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী বিস্তারিত চিত্রটির প্রসঙ্গ ও প্রকরণ অনন্য।

একটি লেট-করা ট্রেন সন্ধেয় থমথমে একটি স্টেশনে পৌছলে দেখা যায়, অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী ট্রেন থেকে নামে, ত্বরিত পদে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশে ব্যস্ত হয়। গভীর রাতের অন্য ট্রেনের জন্য কিছু যাত্রী তখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করে। একদল সেপাই এই থমথমে সন্ত্রস্ত স্টেশনে পাহারায় ভিড় করে থাকে। তাদের উপস্থিতির কারণ, নতুন কোনো শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। স্টেশন-সংলগ্ন একটি কারখানায় ধর্মঘট হওয়ার সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের তিনজন নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রমিকেরা প্রচণ্ড বাধা দিলে পুলিশের গুলি চলে, রক্তপাত হয়। তাই স্টেশন থমথমে, যাত্রীরা সন্ত্রস্ত।

এসবের মধ্যেই দিবাকর দাস আর তার বৌ আন্না ছোট শিশুটিকে কোলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে তাদের গ্রাম ছোট বকুলপুরে যাওয়ার জন্যে গরুর গাড়ির খোঁজ করে। ঘোড়ার গাড়িও থাকে, থাকলে এমন সন্ধেয় স্টেশন থেকে অনেক দূরের ছোট

বকুলপুর যেতে সেই গাড়িই করত দিবাকর। না পেয়ে গরুর গাড়িও কিছুটা মুশকিল আসান তার কাছে। ছোট বকুলপুর এখন গ্রামীণ কৃষকদের বিদ্রোহের কারণে সৈন্য-পুলিশ ঘেরা। বাইরে থেকে সেই গ্রামে এখন যাওয়ায় ভীষণ কড়াকড়ি, অথচ দিবাকরকে যেতেই হবে। কারণ সে হাওড়ার কারখানায় ধর্মঘটের কারণে এবং ধর্মঘট সহজে মীমাংসা হবে না বুঝতে পেরে কদিন ছুটির মতো সুযোগ পেয়ে বউ আন্নার কান্নাকাটিতে তাকে নিয়ে ছোট বকুলপুরে আসছে। আন্নার কান্নাকাটি করে গ্রামে আসার তাগিদের কারণ— তার ভয়, গ্রামের মানুষের বিদ্রোহে আর সৈন্য-পুলিশের অত্যাচারে তার বাবা, দাদা, প্রভৃতিরা ভালো আছে কিনা তা জানা!

ছোট বকুলপুর পর্যন্ত নয়, সুতরাং তার আগে কদমতলা পর্যন্ত গরুর গাড়ি গিয়ে ওদের নামিয়ে দেবে— এই শর্তে গরুর গাড়ির জোয়ান চালক গগন ঘোষ দিবাকরদের যাত্রী হিসেবে নেয়। কিন্তু কদমতলা পর্যন্ত গিয়ে গাড়োয়ান গগন ঘোষ তাদের বকুলতলা পর্যন্ত নিয়ে যাবারই সিদ্ধান্ত নেয়। বকুলতলা যাওয়ার পথে দিবাকর-আন্নাদের সাত-আটজন জমিদার-জোতদাবের গ্রাম-সীমান্তে পাহারাদার-লোক গ্রামে ঢোকার মুখে গ্রামেরই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগসাজশ আছে এই সন্দেহে বাধা দেয়, অত্যন্ত অভদ্র, অশালীনভাবে তাদের ধমক দেয়, খোঁজখবব নেয়, তল্লাশি করে। ভেতরে যেতে দেয় না দিবাকরদের। দিবাকরদের আছে পান খাওয়ার নেশা। স্টেশনে নেমেই সে পান কিনেছিল কয়েকটা। সেই কাগজে মোড়া পানের প্যাকেটটা হাতে পেয়েই, তারা আগে অন্য কিছুতে প্রমাণ না পেয়ে হতাশাগ্রস্ততার মধ্যে মোড়া কাগজটা পেতেই দৃঢ় ধারণা করে নেয়— এরা বিদ্রোহীদের দলে— কারণ, কাগজটা পবিত্যক্ত ছিন্ন একটা ইস্তাহারের অংশ, যেখানে লেখা— 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি!' এবার নতুন করে তারা তাদের কঠিন প্রশ্নে জানতে চায়, দিবাকর ও আন্নার আসল নাম কি? অত্যন্ত সহজ সরল এই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে দেখার নিশ্চুপ অসহায়তার মুখ-ভাবের মধ্যে গল্পটি শেষ।

কাহিনী যেমন খুবই সংক্ষিপ্ত, তেমনি এর বিষয়বস্তুও তীক্ষ্ণ, ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাবনার কেন্দ্রস্থিত। গল্প দিবাকর আন্নাকে কেন্দ্রে রেখে গ্রাম-পাহারাদারদের আচার-আচরণ কথাবার্তায় গড়ে উঠেছে। বৃত্ত পরিকল্পনা সার্থক ছোটগল্পের উপযোগী নিটোল, সংযত। আরম্ভ শ্রমিক-ধর্মঘট জনিত ঘটনা ও সেই সূত্রে আড়ষ্ট সন্ত্রাসের এবং পুলিশি অত্যাচারের ইঙ্গিত দিয়ে, শেষ গ্রাম্য কৃষকদের বিদ্রোহের স্বভাব-ব্যঞ্জনায়। মধ্যবর্তী অংশটিই এই গল্পের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো বড় ঘটনাই গল্পের মধ্যে ঘটেনি। যে দুটি বড় ঘটনা ঘটেছে এবং যে দুটি ঘটনার সূত্রে গল্পের কাহিনীবৃত্ত রচিত হয়েছে, সেই দুই ঘটনা গল্পের নেপথ্যে অত্যন্ত শিল্প-সতর্কতায় রাখা হয়েছে। গল্পের কাহিনী, ঘটনা ও বিষয়-ভাবনার ব্যঞ্জনা-বৃত্ত নিগূঢ়। .'হারাণের নাতজামাই'-এ তবু একটু কাহিনীসূত্রের সংহত বিস্তার ছিল, ছিল ঈষৎ উতরোল ঘটনার সংযোজন, এ গল্পে তা সম্পূর্ণ বর্জিত। এখানেই প্লট রচনায় এই গল্পের লেখকের বড় কৃতিত্ব।

দুই

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে নায়ক-নায়িকার চরিত্র-বিস্তার লেখকের লক্ষ্য নয়। কোনো বিশেষ চরিত্রের ব্যঞ্জনাও এই গল্পের কায়াগঠন ও পরিণামকে বিশিষ্টতা দেয়নি! প্রধান বা নায়ক-নায়িকা চরিত্র-ভাবনার থেকে শ্রমিক-কৃষকদের বিরোধী শক্তির এক অংশের সুবিধাবাদী চেহারার রক্তমাংসকে গল্পে এনেছেন। তাদের সমবেত চরিত্রই এই গল্পের বক্তব্যকে পরিণামী ব্যঞ্জনা দিয়েছে। তাই চরিত্রচিত্রণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আস্বাদ দেয়।

গল্পের আরম্ভে দিবাকর ও আন্নাব স্টেশনে নামাকে কেন্দ্র করে স্টেশন-সংলগ্ন ধর্মঘটে স্তব্ধ কারখানার মালিকের কিছু ভদ্রবেশী দালালকে তৎপর হতে দেখি। এই সম্প্রদায় কিন্তু সাংকেতিকতায় গল্পে উপস্থিত। 'বিড়ি-সিগারেট টানতে টানতে ক'জন বাবু মতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল! নামধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-একজনকে। স্টেশন যাত্রীশূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদেব নজর পড়ে!'

এই স্টেশনে সমবেত মানুষগুলিই গল্পের প্রথম-অংশে লেখকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই মানুষগুলির প্রত্যেকের কোনো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যে লেখকের লক্ষ্য নয়, গল্পে চরিত্রগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ না থাকায় তা প্রমাণিত হয়। মাঝবয়সী লোকের কথা— 'চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও।' এই সংলাপেই প্রমাণ হয় তাদের কাছে গ্রাম্য কৃষকদের খোঁজ নয়, বিপরীতে কারখানার শ্রমিকই বা ওই শ্রেণীর কোনো সন্দেহভাজন মানুষই লক্ষ্য। পানখোর খদ্দব-পরা ছোকরার পান খেয়ে বার বার পিক ফেলা, 'পানরাঙা মুখে আরো দুটো পান পুরে চিবুতে চিবুতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকা', 'লোকগুলির মতো কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধ হয় পানটা তার একটু তিতো লাগে'— ওদের স্বভাবের বিরক্তিকর পরিচয়ে দিবাকবের এমন মানসিকতা— বস্তুত ওই ছোকরা ছেলেটির নোংরা স্বভাবটিকে সূক্ষ্মভাবে শ্লেষ-ব্যঙ্গে স্পষ্ট করে। সঙ্গে আরও আছে এক বেঁটে লোক। দিবাকরের কাছে তার গায়ে-পড়ে খবর নেওয়ার ব্যাপারে দিবাকরের সহজ-সরল রুক্ষ, তির্যক উত্তর এবং বেঁটে-লোকটির পাল্টা কথায় তারই উল্টে ধমক খাওয়ার স্বভাবটি চমৎকার চিত্রিত হয়ে যায়।

গল্পের প্রথমে কারখানার মালিকদের দালালদের চিত্র ব্যঞ্জনায় এইভাবে আঁকা হয়ে যায়, মধ্য অংশে আসে জোতদার-জমিদারদের দালালদের ছবি। তারা 'বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে' পাহারা দিতে ব্যস্ত। অসময়ে দিবাকর-আন্নাদের নিয়ে গরুর গাড়িকে দেখে তাদের মধ্যে যে 'সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার', তাতে বীরত্ব ও কর্তব্য-কর্ম দেখানোর মানসিকতাব পবিচয় যেমন আছে, সেই সঙ্গে লেখকের পক্ষ থেকে আছে চাপা শ্লেষের প্রচ্ছন্ন আঘাত, কারণ তাদের আনন্দ উল্লাসের পক্ষে আছে মাত্র নির্ভর হওয়ার মতো অতি সাধাবণ দুই নীচের তলার বিত্তহীন মানুষ ও দৈনিক অল্প-উপায়ী খেটে-খাওয়া গাড়োয়ান।

সাত-আট জনের বেসরকারি দলপতি মোটা লোকটির গাড়োয়ান গগনকে ধমক দিয়ে প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব করার ভঙ্গি ও স্বর, দিবাকরের সবিনয় স্পষ্ট সরল ভাষার উত্তর পাওয়াতে আরও গভীর সন্দেহে একের পর এক প্রশ্ন করে তল্লাশি করার পদ্ধতিতে তার ফাঁপা ফাঁকা বুদ্ধিহীন স্বভাবেরই পরিচয় মেলে। দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়-বয়সী লোকটার— ষোলো-সতেরো বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফর্সা ছেলেটির দিবাকরের এক উত্তরে হঠাৎ জোরে হেসে ওঠাকে প্রচণ্ড ধমক দেওয়ার ভঙ্গি, দিবাকরের সাবধান করার স্বর— সবই পরিবেশকে গম্ভীর করার বদলে অন্তঃস্বভাবে তাদের প্রয়াসের নিষ্ফলত্বকে বড় করে, কারণ যাদের সে প্রশ্ন করে তারা অত্যন্ত সহজ, সরল, সত্যবাদী মানুষ। কদম-ছাঁটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে বখাটে চেহারার ছেলেটির প্রশ্নোত্তরেও সেই একই বৈশিষ্ট্যে ছেলেটিকে চিহ্নিত করে। এরপর একে একে থলথলে লোকটির হুকুমে দিবাকরকে তল্লাশি করার ব্যস্ততায় তার শিঙি-মাছ রাখা হাঁড়ি ভেঙে-দেওয়া, দিবাকরের সপ্রতিভ কথার উত্তরে দলের কারোর আত্ম-অপমানে বিদ্ধ ক্রোধ ও গর্জন, দিবাকরের শিশুপুত্রের নোংরা করে-দেওয়া কাপড়ের স্পর্শে পাহারাদারদের কারও কারও অসহায় অপ্রস্তুত অবস্থা— তাদের সমবেত চরিত্রের পক্ষে প্রকারান্তরে অসম্মানজনক পবিস্থিতিই তৈরি করে দেয়। পানমোড়া ইস্তাহারের কাগজের পাঠ দেখে দিবাকর-আন্নাকে আরও কঠিন-গভীর সন্দেহ করার মধ্যে দালাল শ্রেণীর চরিত্রের রূঢ় বাস্তব চিত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের তিন জনের দিবাকারের পানের মোড়া থেকে অবশিষ্ট তিনটি পান খেয়ে নেওয়ার মধ্যে স্বার্থ-সর্বস্ব, সুবিধাভোগী, সুযোগ-সন্ধানী এই দালাল শ্রেণীর চমৎকার বৈশিষ্ট্য পায়। এরা যেমন প্রকৃত অর্থে নির্বোধ, তেমনি নিজ নিজ কর্তব্যপালনের নিষ্ঠা ও সততাব বিচারে চরিত্রহীন। লক্ষণীয়, ছোট বকুলপুর গ্রামকে ঘিরে-রাখা এই পাহারাদারদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কোনো নামও এ গল্পে নেই। অথচ এরাই এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল লক্ষ্য। পাহারাদারদের সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি যে রাতের অন্ধকারে আরও কি কি খুঁজতে পারে, তার একটি নমুনা ছোট বকুলপুরের সীমায় পৌঁছনোর আগেই মেলে লেখক-ব্যবহৃত একটি ছোট বাক্যাংশের চিত্রের স্বরূপে— 'পাহারাদারদের টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়িটাকে সেটা যেন যতক্ষণ সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।'

এই দালালদের সমস্ত কর্মতৎপরতার মধ্যে কারখানার মানুষ দিবাকর ও তার স্ত্রী আন্না এবং গরুর গাড়ির গাড়োয়ান গগন ঘোষের চরিত্র নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বল। গাড়ি চালাতে গগনের অতিরিক্ত কথা বলার স্বভাব, পাহারাদারদের বেসরকাবি দলপতির কথার উত্তর আগেই বলা তার গ্রামীণ ও নীচের শ্রেণীর অন্তরঙ্গ সারল্যকে চমৎকার শিল্পরূপ দেয়। 'মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্য যুগ করবে'— গগনের এমন কথায় চরিত্রটির বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থনের প্রচ্ছন্ন আভাস এবং সেই সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমিক-সচেতনতার প্রমাণ দেয়। দিবাকর চরিত্রের সারল্য ও বুদ্ধিমত্তা, দুই স্তরের পাহারাদারদের কথার সপ্রতিভ ত্বরিত প্রত্যুত্তর চরিত্রটির অসামান্য দীপ্তি আনে। তার

একাধিক সংলাপ— 'খপর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছেন না স্বাধীন হয়েছে', 'গরিব মানুষ কথা কোথা পাব?', 'সাক্ষী প্রমাণ তো সাথে আনিনি!', 'ওসব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত কর বাবুরা?', 'শিং মাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু?'— এসবের মধ্যে চরিত্রটির অসাধারণ বুদ্ধি, সপ্রতিভতা, নির্ভয়তা, আকর্ষণীয় সারল্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাহারাদারবাবুদের প্রতি উদ্দেশ্যহীন শ্লেষাত্মক ব্যবহার-বুদ্ধির পরিচয় থেকে গেছে। গল্পের শেষে তার 'কেন! তা কেন করতে যাব?'— পাল্টা প্রশ্নে চরিত্রটির একান্ত নিষ্পাপ নিরীহ স্বভাবের ব্যঞ্জনা। স্ত্রী আন্না চরিত্রটিও উপযুক্ত মজুর-সহধর্মিণীর পরিচয় দেয়। তার গাড়োয়ান রামকে বলা— 'তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ!.... বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব',— এমন সংলাপেও সেই সরল যুক্তি। পাহারাদারদের সামনে দিবাকরের কানে কানে কথা বলার মধ্যেও সরল নিষ্পাপ এক বধূর মন সক্রিয়। আন্না ও দিবাকরের চরিত্রের সারল্য ও সত্যভিত্তিই চরিত্র দুটিকে উপযুক্ত স্বামী-স্ত্রী জুটির মর্যাদা দেয়।

বস্তুত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে দিবাকর-আন্না চরিত্র দুটি তাদেরই চরিত্র-বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে তুলে-ধরার প্রধান সহায়ক বিষয়মাত্র।

তিন

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে রাজনীতি আছে, কিন্তু সে রাজনীতিব উপস্থিতি প্রত্যক্ষ বাস্তবতার (truth of details) নয়, শিল্পের বাস্তবতায় সর্বজনীন আস্বাদ দেয়। যে কোনো সচেতন, সতর্ক প্রতিভাবান কথাকার গল্পে রাজনীতির প্রয়োগে রাজনীতির তথ্যকে অতি গুরুত্ব না দিয়ে তথ্যের সত্যে খাঁটি শিল্পের লাবণ্য সমন্বিত করে গল্পের ভাববস্তু ও অবয়ব নির্মাণে হন বিশ্বকর্মা। আলোচ্য গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা তারই। লেখক তখন যেহেতু সাম্যবাদে দীক্ষিত একজন সচেতন, ক্ষমতবান শিল্পী, তাই তাঁব রচনায় সমকালীন রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে এক উত্তাপে যে ভিন্ন মাত্রা আনবে, তা মান্য। রাজনীতি হল সমাজন্যায়ের একটা দিক, একটি দর্শন। স্থির অর্থনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক ন্যায়ে ধরা, যুক্তি-চিন্তা দিয়ে পরীক্ষিত জাতিক তথা আন্তর্জাতিক মানবতার মাটিতে স্থির থাকা এক বিশ্বাসই রাজনীতি ভাবনার নিয়ন্ত্রক বিষয়। এমন রাজনীতি স্থান ও কালবিশেষে দু'ভাবে প্রয়োগে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে-- (ক) ব্যক্তিস্বার্থ থেকে গোষ্ঠীস্বার্থে নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি ভাবনা— যা অশুভ, (খ) অত্যাচারিত মানুষের উপায়-স্বরূপ রাজনীতি প্রয়োগ— যা শুভ। সাহিত্যে-শিল্পে অবশ্যই সমাজ-রূপের মতো প্রত্যক্ষতায় সব সময় রাজনীতি আসে না, সেখানে আসে মানুষ ও ব্যক্তির বৃহত্তর প্রসঙ্গে বিশেষ ও নির্বিশেষ রূপ।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে নেননি, তাব উত্তাপকে তথ্যের সত্যে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাম্যবাদী আন্দোলনে গোষ্ঠী মানুষ তথা সর্বহারা সমষ্টি মানুষের কথা বড় করে আসে। একদিকে মালিক শ্রেণী, কৃষির ক্ষেত্রে জমিদার-জোতদার শ্রেণী, আর একদিকে সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষকের দল। এদের মধ্যবর্তী হল মধ্যস্বত্বভোগী দালাল শ্রেণী। এই

শ্রেণীর উদ্ভব বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থায় ও সমাজে একান্ত স্বাভাবিক। সমাজ ও সমাজ-অর্থনীতিই এর মূলে সক্রিয়। মার্কস্ বলেছেন : 'Political power is precisely the expression of antagonism in civil society' লুই কোলেত্তি প্রমুখের ব্যাখ্যা বোঝায় মার্কসের রাষ্ট্রভাবনায় সমাজ নির্ভরতার দায়বদ্ধতা ও গুরুত্ব। এককথায় মার্কসই বোঝান রাজনীতি বা রাষ্ট্রের মূল আছে সমাজ-অর্থনীতির গভীরে। রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা।

আলোচ্য গল্পে লেখক প্রথমেই প্রসঙ্গ এনেছেন স্টেশন সংলগ্ন এক মিলে ধর্মঘট বিষয়, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ চেতনা ও তাদের তিনজনকে মালিকের নির্দেশে পুলিশের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে সর্বহারাদের রক্তপাতের চিত্র। গল্প ক্রমশ এগিয়েছে কৃষিনির্ভর গ্রাম বকুলপুরের কৃষকদের প্রতিবাদী ভাবনার দিকে। অর্থাৎ গল্পের মধ্যে রাজনীতির বিষয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদ্যন্ত স্পষ্ট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেণীগত সমস্যা, বৈষম্য ও সংঘাতকে এনে তাদের মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের প্রসঙ্গকে প্রধান করেছেন। রাজনীতি এখানে শিল্পের পূর্ণতা পেয়েছে। মার্কসের কথায়, শ্রেণী হল সমাজ-মানুষের এক-একটি গোষ্ঠী যাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর শ্রমের ভাগ শুধু নয়, ফলও অধিকার করতে পারে। এককথায় মানুষেরই বড় বড় গোষ্ঠী হল শ্রেণী— যারা একে অন্যের থেকে আলাদা।

এমন শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে বা পটভূমিতে গল্পের বক্তব্য আঁকা। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী একদিকে, অন্যদিকে মালিক, মধ্যে ওই দালাল শ্রেণী যারা লেখকের লক্ষ্য। গল্পে রাজনীতি আছে, কিন্তু crude form-এ নয়, তার অশুভ প্রয়োগের বিচারণায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু তা মানবতায় ও শিল্পলাবণ্যে অন্যস্বাদী। দালালদের পোষে মালিক শ্রেণী নিজেদের আড়াল করে কার্যসিদ্ধির জন্য। পুলিশ দালালদের কাজে লাগায়। আর দালালরা ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ সুবিধাভোগী, সুযোগসন্ধানী, স্বার্থান্বেষী। এরা পরগাছার মতো, ভুঁইফোড়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাতজামাই' গল্পের জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতির মতো মানুষ, মথুরের মতো চর এখানে গল্পের প্রধান অবয়ব নির্মাণ করে।

অন্যদিকে আছে সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক। নায়ক দিবাকর হাওড়ার এক ধর্মঘটে বন্ধ মিলের শ্রমিক, তার শ্বশুরালয় এক কৃষিনির্ভর গ্রাম বকুলপুরে। তার স্ত্রী আন্না কৃষক পরিবারের সদস্য জন্ম থেকেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুকৌশলে একই সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক— দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক situation তৈরি করেছেন গল্পে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এসে লেখক রাজনীতির বিকৃত উপজাত (by-product) যে ফড়িয়া—তাদের তৎপরতাকে দেখিয়েছেন। গরুর গাড়ির চালক গগন ঘোষও খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। তার সহমর্মিতা দিবাকর-আন্নাদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। বোঝা যায়, লেখকের নায়ক-নায়িকা চরিত্রের বিস্তার গল্পের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল শ্রমিক কৃষকদের বিরোধী শক্তির এক-অংশের সুবিধাবাদী চেহারাটা তুলে ধরা।

কিন্তু সেটাই রাজনীতির আর এক রূপ। গল্পের প্রথমেই লেখক এঁকেছেন স্টেশন-

সংলগ্ন ধর্মঘটে স্তব্ধ কারখানার মালিকের কিছু ভদ্রবেশী দালালদের। এই সম্প্রদায় সাংকেতিকতায় চিত্রিত। লক্ষ করার বিষয়, গল্পে এরা কেউই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, রাজনীতির একটা কৌশল। আর এই কৌশলকে শিল্পসম্মতভাবে প্রয়োগ করাতেই গল্পে শিল্প প্রধান, রাজনীতি গৌণ। গল্পের প্রথম অংশে কারখানার মালিকের দালালদের চিত্র, মধ্য ও শেষ অংশে জোতদার-জমিদারের নিয়োগ করা মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের ছবি। তারা 'বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে' পাহারাদারিতে ব্যস্ত। দিবাকর-আন্নাদের গোরুর গাড়ি দেখে তাদের 'সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার, টর্চের আলো দিয়ে আন্নাকে দেখার নোংরা লোভ'— তাদেব স্বভাব বোঝায়।

গল্পের ফলিত অর্থ, শেষ ব্যঞ্জনা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির নয়, সমষ্টি মানুষের অসহায় জীবনযাপনের ক্ষতমুখ চিহ্নিত করে। গগনেব কথা— 'মোদের ছেলে-পুলেরা ফের সত্য-যুগ করবে'— এমন সরল উক্তিতে সমষ্টি মানুষের সংগ্রামী বিশ্বাস ও আশা ধ্বনিত। কিন্তু তা রাজনীতির শপথ নয়, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত মানস-বিকাশের দিক। চিরকুটে, পান-মোড়া কাগজে বিপ্লবী জনগণের প্রসঙ্গটি ফড়িয়া শ্রেণীর নির্বুদ্ধিতা ও যথেচ্ছাচারের উৎসমুখ চিহ্নিত কবে, সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের অকারণ অত্যাচারিত, শোষিত হওয়ার দিক সত্য করে। দিবাকর-আন্নার সম্ভাব্য বিড়ম্বনা, অত্যাচারের ব্যঞ্জনা দিয়েই গল্পের শেষ।

বস্তুত, স্থানীয় শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের আবহাওয়ায় রাজনীতির তাপে সমষ্টি মানুষের অসহায় জীবনেব গল্প বলেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায। রাজনীতি আছে প্রেক্ষিতের ব্যঞ্জনায়, গল্পের প্রত্যক্ষ স্বভাবে নেই। এখানে আছে রাজনীতি-জ্ঞান বঞ্চিত দালালদের মালিক-জোতদার নির্দেশিত অশুভ তৎপরতার নির্লজ্জ, নির্বোধ চিত্র। রাজনীতি হল উদ্দীপন বিভব, আসল লক্ষ্য হল সমষ্টি মানুযেব ও জীবনের পক্ষে বেঁচে থাকাব বড় মানব্য ভাবনা। রাজনীতিব শ্রেণীচেতনা গল্পের বাঁধুনি শক্ত করেছে, প্রকরণকে করেছে বিশ্বাস্য, কিন্তু মূল লক্ষ্য শিল্প দিয়ে জীবন ও তার বাস্তবতাকে শোভনসুন্দর করা! গল্পটির এখানেই শিল্পে উত্তরণ।

চার

লেখকের বিশেষ প্রত্যয় ও আদর্শমুখিন ভাবনার আবহে ছোট-বড সমবেত চরিত্র-নির্ভর গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। লেখকের আদর্শ হল সমাজের একেবারে নিচের তলার মানুষের সহায়-সম্বলহীন সহজ, সবল অসহায়তাবোধ ও সেই বোধের কারণে তাদের প্রতি মমতার সহজাত প্রকাশ, প্রত্যয়-সংগ্রামী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদী স্বভাবের বলিষ্ঠতার প্রতি বিশ্বাস। এদের বিরুদ্ধবাদী, সর্বদিক থেকে সুবিধাভোগী মানুষদের চিত্রিত স্বভাবেই গল্পের শ্রেণীনির্ণয় বোঝা যায়। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈপ্লবিক চেতনার একটি বলিষ্ঠ সার্থক ছোটগল্প।

গল্পের ক্লাইম্যাক্সের শুরু পানের মোড়া কাগজে ইস্তাহার সুলভ হেডলাইনটি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, শেষ নতুন করে তাদের আসল নাম জিজ্ঞেস করায় দিবাকর-আন্নার

সরল বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে। এখানেই গল্পেরও শেষ। আর এখানেই গল্পের মধ্যে অব্যক্ত পরবর্তী নিষ্ঠুর নির্মম আসল নাম বের করার মতো দালালদের অত্যাচারের ব্যঞ্জনা। ক্লাইম্যাক্স রচনায় লেখকের অসাধারণত্ব লক্ষণীয়। গল্পে তার কোনো ঘটনা নেই, সামান্য চমক থাকলেও তার কোনো অতিবিস্তারী স্বভাব নেই। বিবৃতিমূলক নয়, আগাগোড়া ইঙ্গিতধর্ম (suggestiveness)-এ গল্পের প্রাণকেন্দ্রে নিহিত। সম্পূর্ণ serio-comic রসে গল্পটি আদ্যন্ত সিক্ত। শ্লেষ-ব্যঙ্গে এর রসাস্বাদ বস্তুত বড় জীবনের আস্বাদ দেয়।

আব সে বড় জীবনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্বিষ্ট আদর্শ জীবন। সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকদের সমবেত একতার স্পৃহাই বড় জীবন গঠনের মূল ভিত্তি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিশেষ সময়ের রাজনীতি ভাবনা, সাম্যবাদের শিক্ষা বাস্তব সত্য ঘটনা এই গল্পের শিল্পে নিখুঁত হওয়ার উপযোগী তাপ সঞ্চার করেছে। যে উত্তাপে খাদ-মিশ্রিত সোনা গলে গিয়ে কেবল সোনাটুকুই সামনে আনে জহুরি স্বর্ণকারদের কাছে, 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে সামগ্রিক অবয়ব অর্থাৎ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ সেই সোনার আভাস দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সাহিত্য-শিল্পী-স্বর্ণকার। একই গল্পে দুই আন্দোলন— শ্রমিক ও কৃষক— এদের শত্রু দালালদের চিনিয়ে দিয়েছেন, আর আশ্চর্য, এরা সকলেই স্বভাবে একই! শেষ পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পেব বিষয়-চেতনায় যে নিজস্ব একটি জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠায উৎসাহিত হয়েছিলেন, এই গল্প তা প্রমাণ কবে। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের জীবন-দর্শনকে যথাযথভাবে স্পষ্ট করার উপযোগী সার্থকতম পরিচায়ক-গল্প।

ভাযার ব্যঞ্জনা গল্পটিকে আরও একটি শিল্পের মাত্রা দিয়েছে। এ গল্পের ভাষায, বর্ণনায প্রতি স্তরেব কৌতুক ও শ্লেষ পোশাকের পরিচ্ছন্নতা আনে। দিবাকরের 'তাবা বেঁচে আছেন, না স্বাধীন হয়েছে', 'পুঁটলিতে কি আছে? বোমাবন্দুক?' 'আজ্ঞে কাঁথাকাপড়'— এমন সব শব্দাংশ ও বাক্যাংশ প্রয়োগ, লেখককৃত স্টেশনের থমথমে পরিবেশ বর্ণনা, ছোকরা ছেলেটির বাব বার পানেব পিক ফেলার প্রসঙ্গে লেখকের নির্দিষ্ট তাৎপর্য আরোপের চিত্র ভাষাকে অসামান্য গতি ও দৃঢ়তা দিয়েছে।

পাঁচ

গল্পের নাম দেখে স্বভাবতই মনে হতে পারে পাঠকদের, নামটি একান্তভাবেই সাধারণ। যেহেতু দিবাকর ও আন্নাই এই গল্পে একমাত্র দুঃসময়েও ছোট বকুলপুরের যাত্রী এবং তাদের যাত্রাপথে অকারণ বাধাদানেই গল্পের নামেব ব্যাখ্যার যথার্থতা, তাই নামটি নিঃসন্দেহে বিষয়ানুগ!

কিন্তু ছোট বকুলপুরেব যাত্রী দিবাকর ও আন্নাকে কেন্দ্র করে যে চাপা মানসিকতার প্রকাশ আছে এ গল্পে, তাতে নামের গভীরতর ব্যঞ্জনা অস্বীকার করা যাবে না কোনো ভাবেই। দিবাকর আর আন্নাব কথায়, বিশেষ করে দিবাকরের সংলাপের অন্তর্নিহিত তির্যকতায় গল্পের ব্যঞ্জনা অনবদ্য। গল্পে দেখানো হয়েছে ছোট বকুলপুর গ্রাম— 'যেখানে

সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমতো লড়াই চলছে', সেখানে বাইরের লোকের সহজভাবে প্রবেশে আছে বাধা দালালদের তল্লাশি। সেক্ষেত্রে দিবাকরের কথা— 'আত্মীয়-কুটুম আছে সেথা খপর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছেন না স্বাধীন হয়েছে'— এতে প্রকারান্তরে ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী কৃষক-মানুষদের সংগ্রামকেই সমর্থন করা হয়েছে। গগন ঘোষের কথা— 'এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা ঘোর সত্যযুগ করবে',— এমন সংলাপেও সেই ছোট বকুলপুরের জনগণের পক্ষে সমর্থনের কথা শোনা যায়। আন্নার সংলাপ— 'গাঁয়ের চাষা পাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না। বাবুরা, মোকে দুচারজন চিনবেই, গাঁয়েব মেয়া আমি'— এই কথায় যাদের সঙ্গে দালাল ও জোতদারদের বিরোধ তাদেরই সাক্ষী হিসেবে ডাকার ও আন্নার সেই দলের মেয়ে হওয়ায় সেই ছোট বকুলপুরের বিদ্রোহী দলের লোক-বৃদ্ধির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থেকে যায়। বিদ্রোহী ছোট বকুলপুরের এরাও সভ্য এবং যোগ দিলে এরাও বিদ্রোহী হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই গ্রামের মধ্যে ঢুকতে পারলে এক-একজন এক-একটা জ্বলন্ত মশাল হয়ে যাবে— যা দিয়ে একাধিক জোতদার-জমিদারের ঘাঁটি পোড়ানো যায়! তাই 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' নামেই আছে যাত্রী হিসেবে দিবাকর-আন্নার এবং যাত্রীর মতো গগনের গ্রাম্য বিদ্রোহীদের সদস্য হওয়ার উপযোগী ব্যঞ্জনা। নাম এই সূত্রে অসাধারণ গুরুত্ব পায়।

তৃতীয় আর একটি ব্যঞ্জনা, গল্পের একেবারে শেষ দিকে দালালদের পক্ষে দিবাকরের আসল নাম জানার প্রশ্নে দিবাকর-আন্নার মতো সরল স্বামী-স্ত্রীর কঠিন পরীক্ষার সামনে আসার মুহূর্ত এসে যায়। সে পরীক্ষা হল নানা নির্যাতনে এই দুজনকে নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত করে এদের কাছ থেকে, 'আসল নাম জানার প্রয়াস!' আসল নাম জানার এই শ্রম যে প্রকারান্তরে ছোট বকুলপুরের মানুষকেই শাসন করার, নির্দয়ভাবে প্রহারের বিকল্প হবে, ওদের হবে নিষ্ঠুর আনন্দ, তার ব্যঞ্জনা নামের পিছনে থেকে যায়। 'হাবাণের নাতজামাই' গল্পে 'নাতজামাই' নিয়েই পুলিশের ও দালালদের সমস্যা ছিল। নকল নাতজামাই হয়ে আসল ভুবন মণ্ডল দূরে সরে গেল পুলিশের চোখে। আর আসল নাতজামাই হয়ে জগমোহন হয়ে গেল পুলিশের চোখে আসামি ভুবন মণ্ডল। এই রেশ 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' নামেও। যাদের সত্য সত্যই আসল নাম দিবাকর-আন্না, তার দালালদের কাছে হয়ে গেল মিথ্যে। আর মিথ্যে ভেবে এবার আসল নাম ওদের সত্যকে বুঝতে বাধা দেবে। পদে পদে মিথ্যের বোঝা ওদের হিংস্র পশু করবে। এই দিক থেকে নাম ব্যঞ্জনাগর্ভ।

৬.

দুঃশাসনীয়

এক

বাংলা তেরশো তিপান্ন সালের বৈশাখে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামের সংকলন গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'দুঃশাসনীয়'। গ্রন্থভুক্ত ষোলটি গল্পের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন সমাজ-পরিবেশ, তার মানুষ-জন, অর্থনৈতিক-

সামাজিক কোথাও বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সচেতনভাবে গল্পকার ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থেব ভূমিকায় স্বয়ং লেখক জানিয়েছেন, 'গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।' 'দুঃশাসনীয়' গল্পের প্রেক্ষাপট ও বিষয়ভাবনা তারই প্রমাণ দেয়। কারণ গল্পটির বাইরের মোড়কে মোটা করে জড়ানো আছে মন্বন্তরকালীন অসহনীয় বস্ত্রসংকটের বিষয়ানুগ আবরণ। 'মোটা করে' শব্দযুগ্ম ব্যবহার করছি এই কারণে যে গল্পটির মূল লক্ষ্য কিন্তু তা থেকে ছাড়িয়ে মানবতাবোধের অনেক গভীরে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের সর্বজনীন এক সত্যের সংকট ও সংশয়কে এমনভাবে সামনে আনে, তার মহতী বিনষ্টিকে এমনভাবে দেখায় যে, বস্ত্র সমস্যা সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। তা বুঝিবা শিল্পের বাস্তবতার বড় তাৎপর্য, জীবনের ব্যাখ্যার কাছে পরিত্যাজ্য খোলস!

অর্থাৎ 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি সাময়িক সমস্যার সীমায় না থেকে চিরন্তন মানব্য ভাবনার সংকটজনক জিজ্ঞাসাকেই Pointing finger দিয়ে নির্দেশ করে। বোঝা যায়, যেখানে 'দুঃশাসনীয়' গল্পের বিষয়ে আছে মন্বন্তরের ছবি, আছে শুধু অন্নাভাব নয়, কৃত্রিম মনুষ্যসৃষ্ট চরম বস্ত্রসংকটের আলেখ্য, তাই গল্পটি তেতাল্লিশের মন্বন্তরের বিষণ্ণ মলিন পাণ্ডুর দলিলের একটি অংশ-বিশেষই! এমন মন্বন্তরের পরিবেশের প্রবলতম প্রতিক্রিয়ায় সে সময়ে পরিমল গোস্বামী একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন 'মহামন্বন্তর' নামে। তার ভূমিকায় গোপাল হালদার বলেন :

> 'এই মন্বন্তরকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন ঐতিহাসিক নয়, স্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে তবু একটি সম্পূর্ণতার সাক্ষর থাকবেই।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুঃশাসনীয়' গল্পে সেই মন্বন্তরের সংকটকে অভাবনীয় সুস্থ সবল শিল্প চেতনায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এমন যে জাতশিল্পীর সোনার কলম, তার প্রয়োগ বিষয়ে প্রখ্যাত প্রয়াত কথাকার সন্তোষকুমার ঘোষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ মনোভঙ্গিটিকে আমাদের কাছে নিশ্চিত করেছেন :

> 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার তাঁর নিজের চোখ। একেবারে জ্বলজ্বলে, ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ। বোধ হয় তার মধ্যে রঞ্জনরশ্মিও ছিল। এমন আনকোবা নতুন চোখে জীবনকে এর আগে কেউ দেখেনি। আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস সব কিছু দেখার ধরণ আগাপাশতলা বদলে গেল। বিনা প্রশ্নে কোনো মূল্যই আর যখন গ্রহণ করব না। সব ঘযে ঘযে যাচাই করে তবে রাখা-না-রাখা। অনেক কিছুই যে অচল, প্রথমে বুঝিয়ে দিলেন মানিক তাঁর ঐ দুটি চোখ দিয়ে।'

'দুঃশাসনীয়' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখার দৃষ্টি এক নতুন মাত্রা পায়, যা একই সঙ্গে শিল্পেরও নতুন সংজ্ঞা এনে দেয়। এই গল্পে একটা গোটা গ্রাম জুড়ে বিভিন্ন বয়সের নগ্ন নারীমূর্তিকে যেভাবে এঁকেছেন ও তাদের নিয়ে জীবনের শিল্প রচনা করেছেন, তার অভিনবত্ব ও বাস্তবতা তুলনারহিত। বাংলা কথাসাহিত্যে, বিশেষভাবে ছোটগল্পে এই প্রয়াস প্রথম, বুঝিবা সেই 'একজোড়া চোখ' নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম পথিকৃৎ।

যথার্থ বাস্তবতা বলতে কি বোঝায়, সাহিত্যে-শিল্পে তার মূল্যায়ন ও মান যে কত বড় জায়গায়, 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি তা দেখায়। আমরা একথা একাধিক প্রসঙ্গে বলেছি, নিরেট বস্তু বা তার হুবহু বর্ণনা বাস্তব নয়, মানুষের মনই একমাত্র বাস্তব। আব এই মন দিয়ে যে শিল্পী যেভাবে বস্তুকে ছোঁয়, সেভাবেই তাকে গভীরতম করে শিল্পের অন্তরঙ্গতায়, বাস্তবতার বর্ণালি প্রতিনিয়ত তাতেই কঠিন সত্যের নিরঞ্জন মূর্তি এঁকে দেয়। 'দুঃশাসনীয়' গল্প কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রতিবাদের গল্প। সে প্রতিবাদ সমস্তরকম অনন্বয়েব বিষ-জালা সূত্রে অ-সভ্যতার, অ-ভব্যতার বিরুদ্ধে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব নিশ্চিত জীবনদর্শন জড়ানো জীবনের দিকে ফেরার প্রত্যয়-আর্তির গল্প হল 'দুঃশাসনীয'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটির মধ্যে আছে তারই প্রয়াস, তারই প্রতীক্ষা।

'দুঃশাসনীয়' গল্পে কোনো গতানুগতিক কাহিনী নেই, নেই কোনো বিশেষ ধরনের ছকে-বাঁধা নায়কোচিত উত্তরণ, আছে সমষ্টিগতভাবে নীচু তলার মানুষদের পবস্পরের সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার টানাপোড়েনে ঠিকঠাক বেঁচে থাকার নিষ্ফল প্রযাসের, কৃচ্ছ্রসাধনের কথা! হাড়িপুর গ্রামের মহামন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের চরমতম বস্ত্র সঙ্কটজনিত অব্যবস্থায় নীচু শ্রেণীর সাংসারিক মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়। বস্ত্রেব অভাবে তারা বস্তুত কায়াহীন ছায়ামূর্তি যেন বা! সেই ছায়াগুলি দিনের আলোয় বাইবে আসতে পারে না :

> 'সাবাটা দিন সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাবা-ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না— স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায়। কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে, মামী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ী, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—'।

এমন অবস্থার জীবন্ত রূপ এঁকেছেন লেখক কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম্য পরিবারের সভ্যদের সম্পর্ক-চিত্র এঁকে। টানা কাহিনী নয়, এমন একাধিক খণ্ড চিত্রের সমবায়ে গল্পের অবয়ব গঠন। ভোলা নন্দী নিজে অর্ধ-উলঙ্গ থেকে পাঁচ হাত মাপের ধুতিখানা মেয়েদের দেয লজ্জা ঢাকতে। ওই একটিমাত্র ধুতি-কাপড়েই বদল করে পরতে পরতে ভোলার মেজো ছেলের বউ পাঁচী, ভোলার নিজের বউ, মেয়ে শিউলি— এক এক করে আব্রু বাঁচিয়ে দিনের বেলায় ঘাটের কাজ সারে। তাদের এমন কয়েদখানার জীবন অসহনীয। বৈকুণ্ঠ মালিক ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসকে নিজের ব্যক্তিগত লঘু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পরিহাসে রসিকতায় একেবারে তরল করে স্ত্রী মানদার উলঙ্গ থাকার দুঃখকে হালকা করার চেষ্টায় থাকে। এমন অসহায় চিত্রের মধ্যে বিপিন সামন্তের সঙ্গে গোকুলের বোন মালতী বেনারসী শাড়ি পরে আর এক বিলাসের-সুখের জগতে যাওয়ার গর্বে ভিন্ন মেয়ে হয়ে যায়। দাসু কামারের সধবা মেয়ে বিধবার থানে লজ্জা ঢেকে তার সঙ্গী হয়। সুযোগ বুঝে রঘু বিন্দীর সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলক কৌতুক করতেও ছাড়ে না। ভূতি উলঙ্গ অবস্থায় তার বারো

বছরের ছেলে কানুর হাসির কাছে শুকনো দুচোখের জ্বালা সামলাতে পারে না। গল্পের সব শেষে আসে রাবেয়া-আনোয়ারের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের শেষ করুণতম ছবি। স্ত্রী রাবেয়ার পরার কাপড় জোগাতে অক্ষম আনোয়ার সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে রসুল মিয়ার কাছ থেকে কদিন পরেই লজ্জা ঢাকার উপযোগী শাড়ি পাওয়ার। কিন্তু রাবেয়া তখন এমন করুণ জ্বালা-ধরা অপমানের, ধৈর্যের শেষ সীমায়। যে স্বামী পরার কাপড় দিতে পারে না, শরীরের নগ্নতা ঢাকতে পারে না, তার সঙ্গে বিছানায় শোয়ায় আসে ঘেন্না। ঠাণ্ডা মাথায় রাবেয়া তাই অন্ধকারে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় পুকুরের জলে জীবন শেষ করে নির্ভুল আত্মহননে। গল্পের এখানেই শেষ।

'দুঃশাসনীয়' গল্পের প্রকরণে আছে অভিনবত্ব। গল্পের চিরাচরিত প্রথা ভেঙে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনী বর্জন করেছেন, কোনো বিশেষ নায়ক সন্ধানে এতটুকুও ব্যস্ত হননি। কারণ লেখকের অন্বিষ্ট সমষ্টিজীবন, ব্যক্তিজীবন নয়। ব্যক্তিজীবনে গল্প আসবেই, অথবা একক ব্যক্তিত্বের মনের গভীরে কিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজা। সমষ্টি জীবনের কথায় 'ব্যক্তি' বা 'ব্যক্তিরা' থাকতেই পারে, কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে এক সমবায়িক তাৎপর্য সেখানে উঠে আসতে বাধ্য। 'দুঃশাসনীয়' গল্পের ব্যঞ্জনায় তা-ই ঘটেছে। গল্পের শুরুতে আছে হাতিপুর গ্রামের অতীতের অতি স্বাভাবিক রূপ— যা গ্রাম-বাংলার প্রায়-স্থায়ী তমসুকের মতো। কিন্তু বর্তমানে সেই গ্রাম মহামন্বন্তরে বিধ্বস্ত হওয়ার পর কিছুটা সামলে নিলেও চরম বস্ত্র সংকটে তা জীবন্ত ছায়ামূর্তির পরিবেশে ভিন্ন অভিজ্ঞতা আনে।

এমন পটভূমি রচনা করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভোলা নন্দী, তার স্ত্রী, বৌমা পাঁচী, মেয়ে শিউলিদের সংসার, বৈকুণ্ঠ মালিক-স্ত্রী মানদার উলঙ্গ অবস্থার কয়েদি জীবন, দাসু কামারের সধবা মেয়ে বিন্দীর ভয়ের ছবি, উলঙ্গ মা ভূতি ও বারো বছরের ছেলে কানুর সম্পর্কের রুদ্ধশ্বাস আড়ষ্টতা, জড়তা, রাবেয়া-আনোয়ারের দাম্পত্য সম্পর্কের নিষ্ফলত্ব, আবদুল আজিজ-সুরেন ঘোষদের নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নু শোষক স্বভাব, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবের কামার্ত পশুবৃত্তি— এসবের নিপুণ খণ্ডচিত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। গল্পের পটভূমি ও লেখকের লক্ষ্যের সঙ্গে এসব গভীর-নিবিড় সম্পৃক্ত। অবশ্যই গল্পের শেষ টেনেছেন রাবেয়ার আত্মহনন দিয়ে। যে অসহায়তা বস্ত্র সংকটের, শোষক শ্রেণীর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চরম বণ্টন বৈষম্যে, তা-ই ঘটায় রাবেয়ার পরিকল্পিত আত্মহনন। এই পরিণতি সমগ্র গল্পের খণ্ড চিত্রগুলিরই যেনবা নিয়তি-নির্দিষ্ট অবসানের প্রতিনিধিত্ব করে।

যেহেতু গল্পের কোনো টানা কাহিনী নেই, নির্দিষ্ট নায়ক নেই, তাই এর 'চরমক্ষণ'টি নির্ণয় করার ব্যাপারে জটিলতা দেখা দেয়। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে প্লট-বৃত্ত রচনার উপযোগী একাধিক ঘটনা ও কাহিনী নেই ঠিকই, কিন্তু সমগ্র গল্পটির মধ্যে যেসব উলঙ্গ মানুষ অঙ্কিত, তাদের কাছে একটা আশাব্যঞ্জক সংবাদের প্রতীক্ষা আছে— তা হল সুরেন ঘোষ ও আবদুল আজিজের তৎপরতায় শীঘ্রই এমন বীভৎস নগ্নতা ঢেকে লজ্জা নিবারণের মতো বস্ত্র জোগানো সম্ভব হবে। একটা আশা ও স্থির বিশ্বাস অসহায় পরিবার ও মানুষগুলির মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এমন আশা ও বিশ্বাসই গল্পটির অন্তঃশীল কাহিনীটুকুকে

দুটি ভাগে ভাগ করেছে। একদিকে বহু প্রতীক্ষিত আশা, আর একদিকে আশাহীনতা ও নিষ্ঠুর বঞ্চনায় নিজেদের অসহায়তাকে নিরঙ্কুশ ও মুমূর্ষু জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া। এই দুই মানসিকতার মধ্যবর্তী অংশটুকু 'দুঃশাসনীয়' গল্পে একটু বিস্তৃত এবং সেই বিস্তৃত অংশটুকুই গল্পের 'মহামুহূর্ত' রচনা করে ধীরে ধীরে :'

> 'হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে যায় ধীরে ধীরে। একদিকে আশা ফুরিয়ে যাওয়ার হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশি।'

এখান থেকেই গল্পের চরমক্ষণ শুরু। শেষ হল :

> 'হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।
>
> 'তবে যে ঢেঁঢরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে?' সকলে প্রশ্ন করে সন্ত্রস্ত হয়ে।'

যে খবরটা সীমাবদ্ধ ছিল সুরেন ঘোষ, আবদুল আজিজ, আর পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবদের সঙ্গে গ্রামের মানুষদের সভায় ও আলাপ-আলোচনায়, তা সারা হাতিপুর গ্রামের সন্ত্রস্ত মানুষদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারের কাছে রটে যাওয়াতেই 'মহামুহূর্ত' উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরই জেরে রাবেয়ার শেষতম বাঁচার চেষ্টা সচেতন আত্মহননে। তা গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনাই। অর্থাৎ কোনো কাহিনীর 'চরমক্ষণ' নয়, একটিমাত্র খবরের সূত্রেই গল্পের মানুষগুলির মনোবলের যে স্তিমিত বিবর্ণ রূপ, তা গল্পটির পরিণামী ব্যঞ্জনার যথোচিত ভূমিকা। বস্তুত 'দুঃশাসনীয়' গল্পের অভিনবত্ব ও প্রকরণ-চাতুর্য এর প্রসিদ্ধ কোনো কাহিনী ও ঘটনা-বিবিক্ত প্লটের চিত্ররূপে, কয়েকটি খণ্ডচিত্রের এক সমষ্টি জীবনের পরিপূর্ণ রূপ ও স্বভাব-চিত্রণে এবং গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় সমবেত শোষিত অসহায় মানুষদের প্রতিবাদের পরোক্ষ প্রতীকী প্রয়োগেই! গল্পের 'মহামুহূর্ত' তৈরি হয়েছে গল্পের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর বিস্তারের দিক থেকে, কাহিনীর প্রথাবদ্ধ শিল্পরূপ সেক্ষেত্রে পরিত্যক্ত।

দুই

'দুঃশাসনীয়' গল্পে বিশেষ নায়ক, নায়িকা ও তাদেরই জন্য প্রচলিত গল্পশিল্পের নিয়মমাফিক আঁকা কোনো গৌণ বা পার্শ্ব চরিত্রের আদৌ সমাবেশ নেই, তবে খণ্ডচিত্রের স্বভাবে একাধিক মানুষজনের সাক্ষাৎ মেলে। সে মানুষগুলি উলঙ্গ, এমন সভ্য জগতের বুকে আদিম জীবনেরই কোনো পুরুষ-রমণী যেন! এই যে হাতিপুরের এতগুলি উলঙ্গ পুরুষ ও রমণীর চিত্র অঙ্কন— এর মধ্যেই আছে গল্পের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। উলঙ্গ নারীদের নানাভাবে নিয়ে চরম শিল্পক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর প্রমুখ। সাহিত্যে কবিতায় তাদের বর্ণনা মেলে, গল্পে-উপন্যাসে প্রয়োজনে তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এমন সমষ্টিগতভাবে উলঙ্গ অসহায় নারীদের নিয়ে এই 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি লেখেন।

বিখ্যাত শিল্পী সেজান আঠারোশো আশি থেকে আঠারোশো নব্বই পর্যন্ত একাধিকবার নানা ভঙ্গিমায় নগ্ন নারীর স্নানের ছবি এঁকেছেন। তাঁর একটি মূল্যবান ছবির নাম

'স্নানার্থীরা' (The Bathers)। এই ছবির মধ্যে সবুজ আর হলুদ পটভূমিতে কয়েকটি নগ্ন শরীরকে দেখা যায় ডাঙায়-জলে আগে-পিছে বসা-দাঁড়ানো অবস্থায়। এদের মধ্যে একটির নগ্ন শরীরের হাত আর বুকের ওপর কাপড়ের টুকরো ঢাকা। এগুলি বর্তমান সভ্যতার আবরণ! স্নানের আগে মানুষ আর প্রকৃতির আদিম সম্পর্কের মধ্যেকার পরস্পরের অমলিন উন্মুক্ত বিশ্বাসের দিক দেখাতে চেয়েছেন শিল্পী সম্পূর্ণ নগ্ন মানুষগুলির সমবায়িক চিত্রে। এ এক নগ্ন শরীরের অসাধারণ সুস্থ শিল্প-প্রকরণের ব্যাখ্যা। আমাদের দেশের হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯১৮-য় যে 'পরিত্যক্তা' নামে নগ্ন রমণীর ও অন্যান্য নগ্ন-শরীর রমণীর ছবি আঁকেন বিভিন্ন সময়ে, সেখানে চিত্রের রঙ-রেখায় ভাবে-বিষয়ে রোমান্টিক আদর্শবাদ শিল্পের জন্য শিল্পই— এমন ধারণা সক্রিয় রাখেন। এ ছিল 'দেশীয় যে প্রচলিত শিল্পাদর্শ— যার মূল কথা হল রসসৃষ্টিতেই শিল্পের সার্থকতা—।'

সাম্প্রতিক কালের চিত্রকলার এক ইতিহাসকার অশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার চিত্রকলা' গ্রন্থের এক স্থানে রোমান্টিক চিত্রকলার সীমা চিহ্নিত করে বলেছেন :

> '.........তার ভিত্তি নড়ে উঠেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। শান্ত, সুস্থ ও পরিশীলিত শিল্পবোধ ও ভাবনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কিছু কিছু নবীন সাহিত্যিক ও শিল্পী— তাঁরা জীবনের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলতে শুরু করেছিলেন বিশ আর তিরিশের দশকে। ... তাঁরা শিল্প আর সাহিত্যকে বিনোদনের উপাদানে সীমাবদ্ধ না রেখে, করে তুলতে চাইলেন মানুষের জীবনমরণ সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার।'

বাংলাদেশের মন্বন্তরের দৃশ্য যে মানবতার অপমানকে দেখায় তাকে রঙে-রেখায় ধরে রাখেন সে সময়ের একাধিক প্রবীণ ও নবীন শিল্পী— দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অতুল সুর, বয়সে তরুণ সোমনাথ হোর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাঁদের কারো কারো হাতে যেমন ভিখারি আংশিক বা পূর্ণ নগ্ন নারীমূর্তির ছবি রচিত হয়ে যায়, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সে নগ্নতায় আছে শোষকদের বীভৎস স্বভাবের প্রতি শ্লেষ-ব্যঙ্গ, আছে সভ্যতার অপমৃত্যুর সত্য ছবি।

যে বুভুক্ষা, হাহাকার, যে বস্ত্র সংকটের চরম রূপ নারী সমাজের অপমানে অধোমুখ, তা চিত্রশিল্পীদের হাতে এক মাত্রা পায়, ফ্যাসিবিরোধী লেখক-শিল্পীসংঘের পতাকার নীচে থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার আর এক মাত্রা দিলেন। প্রমাণ, 'দুঃশাসনীয়' গল্পের উলঙ্গ নারী চরিত্রগুলি। এই উলঙ্গতা এমন এক প্রতিক্রিয়া যা বাস্তবতাকে দেখায়, প্রতিপক্ষকে প্রতিঘাত করার অমোঘ প্রেরণা দেয়। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে সেই উলঙ্গতা হল গল্পকারের শোষক শ্রেণীকে আঘাত করার প্রতিবাদী অস্ত্রের মতো। রাবেয়ার মৃত্যু ব্যক্তিক নয়, সভ্যতার তথাকথিত ধ্বজাধারীদের প্রতিবাদী ধিক্কার। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক রাজকুমারের সামনে তার অন্যতম প্রেমার্থী অতসীকে এনেছেন এক সন্ধেয় তারই নির্জন ঘরে সম্পূর্ণ নগ্ন করে। নারীর সে নগ্নতা এক বুর্জোয়া প্রেমিক নায়কের নিরাসক্ত সৌন্দর্য দর্শনের বিলাসিতা মাত্র! তা উপন্যাসের প্লটবৃত্তের যাথার্থ্যেই তৈরি।

'দুঃশাসনীয়' গল্পের ভোলা নন্দীর মেজো ছেলের বউ পাঁচীর যে নগ্নতা, তা রূঢ় কঠিন জীবন-সমস্যার ব্যঞ্জনা আনে।

এমন একাধিক চরিত্রের নগ্নতা দিয়েই গল্পের চরিত্র-ন্যায় ও রুদ্ধশ্বাস প্রায়-ভৌতিক পরিবেশের বিশিষ্টতা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। উলঙ্গ শরীরের পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ মানব্য-সম্পর্কের বাস্তবতাই এদের কবচকুণ্ডল। পটলের বউ পাঁচীর চরিত্র-পরিচয় এই রকম :

> 'কতকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?'
>
> পাঁচী হু হু করে কেঁদে উঠে।
>
> 'আর সয় না।'
>
> বলে শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয় না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধূলোয় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ঠ দেহ ও পরিপুষ্ঠ স্তন।'

এমন চিত্র রচনায় পাঁচীর নগ্ন শরীর যেন করুণ, অসহায়, নির্মমতম প্রতিবাদ।

মা-ছেলে ভূতি-কানুর সম্পর্কে ভূতির উলঙ্গতা কী গভীর অসহায়তা, দুঃখ বিষাদকেই না তুলে ধরে :

> 'ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাবো? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়?...... কিন্তু সেদিন হঠাৎ উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে?..... হঠাৎ মাদুরটা চোখে পড়ে।.........মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়।

মানুষের তৈরি করা বস্ত্র সংকট ও এক নিষ্পাপ মা-মূর্তি রমণীর উলঙ্গ শরীর বেয়ে সেই সংকটজনিত বস্ত্রহীনতার যে লজ্জা, যে সূক্ষ্ম অনন্বয়ের যন্ত্রণা— তা গল্পকারের হাতে বাস্তবতাকে শিল্পধন্য করে তোলে।

বৈকুণ্ঠ মালিক, যে তার বোনের লজ্জা বাঁচাতে তার কাপড় তাকে দিয়ে নিজের স্ত্রী মানদাকে উলঙ্গ রাখে, যে মানদা স্বামীর সঙ্গে আড়াল থেকে যুদ্ধ করে, সে-ও তার অসহায়তা দূর করতে পারে না। দিনের আলোয় তার স্বামীর কাছে যাওয়ার বড় বাধা সরে না :

> 'সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামীর কাছে মেয়ে-মানুষের লজ্জা কি?'

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে এই এক অসীম শূন্যতাব রপাবয়ব! স্ত্রী হয়ে মানদা আত্মহত্যা করে না, সন্ধের পর নগ্ন অবস্থাতেই স্বামীর কাছে আসে আপন বিশ্বাসে, নির্ভরতায়। কিন্তু স্ত্রী হয়ে রাবেয়া কাছে আসে না, দূরে সরে যায়। রাবেয়া এ গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি। তার শেষ চিত্রের তৎপরতা ও ব্যঞ্জনা সমগ্র গল্পেরই ব্যঞ্জনা·

> 'মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার, অনেকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবেনি? চল।'
'চল।'
দাওয়ায় গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠোনের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে দেয় উঠোনের কোণে।
'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'
আনোয়াবের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।
'ফের নেয়েনি।'
ঘর থেকে ভরা কলসী এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুর্তিটা খুলে চেপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।'

এমন চিত্রের শেষ রাবেয়ার রাতে ঘাটে যাওয়া ও আত্মহনন! গল্পকারের ভাষায় রাবেয়ার যুক্তিতে ধরা অন্তিম ভাবনা :

'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না......'।

রাবেয়ার উলঙ্গ শরীরের ওপর থেকে একে একে জড়ানো চট খুলে ফেলা, নোংরা উলঙ্গ শরীর নিয়ে ঘৃণা, মৃত্যুর আগে জল দিয়ে পরিষ্কার করা, গায়ের ছেঁড়া কুর্তিটাকেই সরিয়ে তা দিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছা— এবং জলেই সেই পরিচ্ছন্ন দেহের চির বিসর্জন— রাবেয়াকে তার ভয়ঙ্কর প্রতিবাদী স্বভাবে অন্য 'ডাইমেনশানে' শিল্পের মাপে বড় মর্যাদা দেয়। রাবেয়াও বাঁচতে চেয়েছিল, আনোয়ার শেষে বস্ত্র আনবে, না এনে রাবেয়াকে শোনায় শুধু রসুল মিয়াব আর মাত্র কয়েকদিন বাদে শাড়ি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি— এতেই রাবেয়ার সিদ্ধান্ত হয় নির্মম, কঠিন, আত্মবিধ্বংসী।

'দুঃশাসনীয়' গল্পে আরও কিছু মানুষ আছে যারা শোষক শ্রেণীর শাসন-যন্ত্রের প্রতিনিধি— সুদেব নামে পুলিশ ইন্সপেক্টর, আছে সরকারের মধ্যস্বত্বভোগী দালালরা— সুরেন ঘোষ, নবীন ঘোষ আর আবদুল আজিজ। এরা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নয়, টাইপ রূপে আঁকা। পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবকে আমরা পাই 'হারাণের নাতজামাই' গল্পেও। সে-ও টাইপ। এরা ছাড়া গল্পের বাকি সব চরিত্র ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তারা সমবেতভাবে মানবতার মহাবিনষ্টির সাক্ষ্য-প্রমাণ দেয় কথায়, আচার-আচরণে। গল্পে সমস্ত শোষণের মতো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো মানুষদেরও এনেছেন গল্পকার— শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু, তার সাত জন সাঙ্গপাঙ্গ, অবিনাশ— এরাই। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ সমষ্টি মানুষের প্রতীকে। তা গৌণ হয়ে যায় রাবেয়ার মতো নারীর আত্মহননের মধ্যে যে প্রতিবাদ তা জানানোর প্রতীকী প্রতিনিধিত্বে। গল্পের চরিত্রগত বড় দিক এই সূত্রেই সার্থক ছোটগল্পের শিল্পরূপে ও মর্যাদায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে চরিত্রগুলি ব্যক্তি নয়, খণ্ড খণ্ড চিত্রের ধর্মে বিশিষ্ট কিন্তু চিত্রের মতো স্থির নয়।

'দুঃশাসনীয়' অবশ্যই সমাজ-সমস্যামূলক গল্প। তবে এ গল্পের সমাজ-জিজ্ঞাসা জীবন-জিজ্ঞাসার অনুবর্তী থেকেছে সব সময়েই। গল্পটির সামগ্রিক ভাবের বা বক্তব্যের

একমুখিতা রক্ষা করেছে গল্পের সমষ্টিগুলি। তারা নেতৃত্বহীন। যখন গল্পের ক্রমপরিণতিব শেষ ধাপে আবদুল আজিজ, সুরেন ঘোষ, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবের গোপন চক্রান্তের শিকার হয় তারা, যখন প্রয়োজনীয় বস্ত্রটুকু এনেও দালালদের চক্রান্তে ওদের অধিকারেব বাইরে চলে যায় গোপন কৌশলে, তখন মানুষগুলির মধ্যে সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত সমষ্টি মানুষের মধ্যে আসে আশঙ্কা, বিভ্রান্তি ও অসহায়তা। এর মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত সেই নেতৃত্বহীন স্খলিত সমষ্টি মানুষের সম্পর্কগুলি হতাশায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওঠে :

> 'এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ার হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশি। এভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাতলে দিত।
> 'জান নয় দিলাম রে আব্বাস', আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটি দিব তা বল?'
> ভোলা বলে, 'লুট করে তো আনতে পারি দু-এক জোড়া, কিন্তু তারপর?'

সম্পূর্ণ অসংগঠিত এই সমষ্টি মানুষের জন্য গল্পে গল্পকার অন্য কোনো ঘটনা, চরিত্র বা নিজস্ব যুক্তিসিদ্ধ বিবৃতির আশ্রয় নেননি, তিনি তাঁর আঁকা সাধারণ চরিত্রগুলির মানস বিবর্তনে ও ধর্মে মূল ভাব যে প্রতিবাদী মনোভঙ্গিতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ধিক্কার দান, তাকে শিল্প-ন্যায়েই রেখেছেন। বস্ত্র সংকটে যাদের স্ত্রী-ধর্ম বিকৃত হয়ে পড়েছে, তাদের হয়ে রাবেয়া জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাবেয়ার স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ, তার সচেতন আত্মহনন তো স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র নয়, তা সংকটময় জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই শুদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য এক সহায়হীন আর্তি। 'দুঃশাসনীয়' গল্পেব একমুখীভাব সংযত ও সংহত হয়েছে সমষ্টি চরিত্রের ব্যাপক তাৎপর্যে।

তিন

'দুঃশাসনীয়' গল্পের পটভূমিতে আছে প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজ। সে সমাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন তেতাল্লিশের মহামন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তী, আবার এই মহাকালের সঙ্গেই গভীর সূত্রবদ্ধ বস্ত্রসংকট। এমন মন্বন্তরের মতো এই বস্ত্রসংকটও মানুষেরই তৈরি করা— যেসব মানুষ লোভী, স্বার্থপর, আত্মপরায়ণ, অমানবিক থেকেই শাসক-শোষকদের দালালের কাজ করে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালেই জন্ম নেওয়া, শাসকদলেব নিজেদের স্বার্থেই তৈরি হওয়া এবং তাদের নিজেদেরই অর্থলিপ্সাকে এরই মধ্যে কুশলতায় পরিতৃপ্ত করতে সবরকম চক্রান্তে উৎসাহী। এই যে মানুষগুলি, এই যে শাসন-ব্যবস্থার বুর্জোয়া অর্থনীতির বনিয়াদ, এ সবই তথ্যের সত্য। ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে কঠিন সত্যে যাচাই হয়ে। যে কোনো সময়ের সমাজ যখন গোষ্ঠীস্বার্থের তথা মঙ্গলের জন্যই গড়ে ওঠে, ব্যক্তিস্বার্থ থেকে গোষ্ঠীর বড় উত্তরণে তার সবরকমের দায়-দায়িত্ব বর্তায়, সেখানে শাসকশ্রেণী ও তার ফড়িয়াদের তৎপরতা স্বার্থে বিপরীত হলেই সমাজের মূল তাৎপর্য ও লক্ষ্যই যায় বদলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য গল্পে সেই সমাজের এক দুঃসময়ের বাস্তব রূপ ও মানুষদের নিয়েছেন।

লেখকদের রচনায় নিখুঁত শিল্প-বাস্তবতার দাবি নিয়ে সমাজ ও মানুষজন প্রত্যক্ষভাবেই স্থান করে নেয়। সেখানেই একজন বাস্তববাদী লেখকের দায়িত্ব বড় কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হয়। প্রথমত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনোই আবেগে-উল্লাসে জীবন ও সমাজকে দেখতে চাননি। দ্বিতীয়ত, লেখকের ব্যক্তিচিত্তের অন্তর্নিহিত এক নিরাসক্ত জীবনবোধে তিনি সদা-নিয়ন্ত্রিত। মনে রাখা দরকার, বাস্তবতার সঙ্গে নিরাসক্তির (detachment) যোগ সদা-নিবিড়। তৃতীয়ত, এই সূত্রেই আসে জীবন ও সমাজের সমগ্রভাবে দেখার দৃষ্টি। একালের বিখ্যাত প্রয়াত কথাকার সন্তোষকুমার ঘোষের মন্তব্য— যা আগেও উল্লেখ করেছি, এখানে তা প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরায় স্মরণীয় ·

> 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার তাঁর নিজের চোখ। একেবারে জ্বলজ্বলে ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ। বোধ হয় তাব মধ্যে রঞ্জনরশ্মিও ছিল। এমন আনকোরা নতুন চোখে জীবনকে এর আগে কেউ দেখেনি। আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস সব কিছু দেখাব ধরণ আগাপাশতলা বদলে গেল। বিনা প্রশ্নে কোনো মূল্যই আর আমবা গ্রহণ করব না। সব ঘষে ঘষে যাচাই করে তবে রাখা-না-রাখা। অনেক কিছুই যে অচল, প্রথম বুঝিয়ে দিলেন মানিক তাঁর দুটি চোখ দিয়ে।'

এমন দুটি চোখে দেখাই সমাজ-বাস্তবতা, 'দুঃশাসনীয়' গল্পেব প্লট, পট, খণ্ডচিত্র ও তার মানুষগুলি এবং প্রতিপাদ্যে তা গভীর-নিহিত, নিবিড়। যে কোনো গল্পের সমাজ-বাস্তবতার স্বভাবে তথ্যের সত্য যুক্ত হতেই পারে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ ও তার অব্যবহিত পরের কালের যে মন্বন্তরেব অন্যতম উপসর্গ (by-product) বস্ত্রসংকট— তা তথ্যেব সত্যে লেখকের অভিজ্ঞতায় যাচাই করা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বস্ত্রসংকটকে প্রেক্ষিত করেছেন, আর তা থেকে যে চরিত্রগুলির চলাফেরায় টীকাভাষ্য রচনা— তা-ই গল্পের সমাজ-বাস্তবতার পরিচ্ছন্ন প্রমাণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাস্তববাদী কথাকারের সনিষ্ঠ নিরপেক্ষ, নিরাবেগ দৃষ্টি রোমান্টিক আদর্শবাদ বর্জনে ও এক পাশ্চাত্য সমালোচক কথিত 'truthful reproduction of typical characters under typical circumstances.'-এর সফল বৈশিষ্ট্যে অসামান্য সমাজ-বাস্তবতার উপলব্ধির প্রমাণ দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী কথাকার বস্ত্রসংকটের মতো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়কে আদৌ 'truth of details'-এ 'দুঃশাসনীয়' গল্পে রাখেননি, তাকে অবলীলায় অতিক্রম করে চিরকালীন মানব-সম্পর্কের সত্যকে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর এমন কল্পনার বিষয় বস্তুসত্যে বস্তুর অতীত। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে টানা কাহিনী নেই, নেই বাঁধা নিয়মের প্লট-বৃত্ত রচনার প্রয়াস, নেই তাই একজন নির্দিষ্ট একক নায়কও, আছে মানব-মানবীর এক একটি ছোট ছোট সংসারের ও সম্পর্কের খণ্ডচিত্র। চরম বস্ত্রসংকটে একেবারে নীচের তলার পরিবার ও তাদের বিভিন্ন বয়সের নারীরা হয়ে গেছে নগ্নতায় 'ছাযা'— এক অসাধারণ উপমার সচিত্র টীকাভাষ্য। এরই ফলে :

'কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ-ভাই-স্বামী-শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না— স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায়। কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ী, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—'

এ এক অদ্ভুত অনন্বয়ের ছবি— যা সুস্থ, মানবিক, তা এই চিত্রে খণ্ডিত, আড়ষ্ট। এখানেই 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মূল সমাজ-বাস্তবতার পত্তন! যেখানে সমস্ত মেয়েরাই ছায়া, দিনের বেলায় বেরুতে পারে না, পূর্ণিমার উন্মুক্ত জ্যোৎস্নাও যাদের ভয় দেখায়, শুধু অন্ধকারই যাদের একমাত্র বিশ্বাস্য প্রতিবেশ, সেখানে ভোলা নন্দী দু'আঙুল চওড়া পট্টি নিজের শরীরে রেখে পাঁচহাতি ধুতিটি মেয়েদের দেয়, বৈকুণ্ঠ মালিক ভাগ্যের পরিহাসকে নিজের পরিহাসে তরল করে ছায়ার শরীর স্ত্রী মানদার কাছে কৌতুকের জগৎ রচনা করে দুঃখের দিনেও, নগ্ন অসহায় মা ভূতি তার বারো বছরের ছেলের হাসিমুখের কাছে চোখের জ্বালায় শেষে জল ঝরায়, রাবেয়া অসহায় নগ্নতার অধোমুখ লজ্জায় স্বামী আনোয়ারের পাশে শোওয়াকে ঘেন্না করে সচেতন আত্মহননে তীব্র প্রতিবাদ জানায়— সেসব সম্পর্কই 'দুঃশাসনীয়' গল্পের সমাজ-বাস্তবতা। কখনোই বস্ত্রসংকটের কারণে 'truthful details'-এ নেই, আছে সামাজিক-পারিবারিক মানুষগুলির অসহায় অ-সভ্য অবস্থার নিখুঁত টানা-পোড়েনেব জীবন্ত চিত্রে। এমন বর্ণনায় নেই রোমান্টিক আদর্শবাদ, আছে কথাকারের নির্মম নিরাসক্তচিত্ততা। গল্পের সমাজ-বাস্তবতা পটভূমিতে কম নেই। বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে চরম পর্যুদস্ত, অব্যবহিত পূর্ববর্তী মহামন্বন্তরেও কোনোভাবে বেঁচে থাকা মানুযগুলিব মধ্যে বিপরীত চিত্রে দেখি হাতিপুরের আবদুল আজিজ, বিপিন সামন্ত, রঘু, সুরেন ঘোষদের। শোষক শ্রেণীর অত্যাচারের যে কাঠামো, তার অন্যতম কর্ণধার খাকি-পোশাক পুলিশ অফিসার সুদেবকে, তার নোংরা লোভকে। এ আর এক সমাজের প্রতিনিধিত্বে বিশিষ্ট। এই মেরুর বাস্তবতা শোষিতদের বিপরীতে থেকে আর এক পচাগলা দুর্গন্ধময় সমাজের বাস্তবতার রং উজ্জ্বল করে।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে শোষণের ছবি এঁকেছেন, এঁকেছেন শোষকদের ছবি, সেই সঙ্গে আঁকতে ভোলেননি, সংক্ষিপ্ত অসহায় চিত্রে হলেও, সমষ্টি মানুষের সর্বহারা স্বভাবের মধ্যেও প্রতিবাদী মানুষগুলিকে— শরৎ হালদারের হাজতবাসী মেজছেলে বঙ্কু, তার সাতজন সাঙ্গপাঙ্গ এবং অবিনাশ— যে অসুস্থতার কারণে জেলে যায়নি— তাদের সংক্ষিপ্ত চিত্রের স্বভাবে। গল্পে নায়ক নেই, সমষ্টি মানুষের নায়কত্বের বীজ-স্বভাব আছে কেন্দ্রীয় বক্তব্যে। যেখানে শোষণ ও শোষিতরাই লক্ষ্য, সেখানে শোষকের নির্মম অত্যাচার থাকলেও প্রতিরোধ থাকবেই। এটা লেখকের বিশ্বাস, আদর্শ। প্রতিক্রিয়ায়, বিপ্লবের সমাজ-বাস্তবতার স্বাভাবিক নিয়মেই তারা গল্পে আছে— আশাবাদিতায়। এ আশাবাদ আশীর্বাদ নয়, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে উঠে-আসা সমাজসত্য তথা সমষ্টি মানুষের জীবনসত্য— 'an attitude which purports to depict life'। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে বিষয়গত সমাজ-বাস্তবতার শিল্পরূপ সমাজের স্থূল পটে নেই, গভীরতম তাৎপর্যে তার অসাধারণ রূপ

আছে মানুষে-মানুষে মানবতা বিধ্বংসী অনন্বয়ের রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণায়। ভোলা নন্দী, পটলের বউ পাঁচী, ভোলার মেয়ে শিউলি, বৈকুণ্ঠ মালিক-মানদা, মাতা-পুত্র ভুতি-কানু, স্বামী-স্ত্রী রাবেয়া-আনোয়ার, কালোবাজারি আবদুল আজিজ, সুরেন ঘোষ— এমন সব চরিত্রের যথাযথ নির্মোহ প্রতিচিত্রণ— যেখানে তারা সমবেতভাবেই 'the truthful reproduction of typical characters under the typical circumstances.'। কথাকার-সমালোচক কথিত লেখকের সেই বিশেষ 'দুই চোখে সব ঘষে ঘষে যাচাই করে রাখা-না-রাখার' বৈশিষ্ট্যযুক্ত এরা!

চার

'দুঃশাসনীয়' গল্পের প্রকাশরীতিতে গল্পকার এতটুকুও বিবৃতি-ধর্মকে প্রশ্রয় দেননি। গল্পের শুরুতে এক বিশেষ গ্রামের নির্বিশেষ অতীত চিত্র দিয়ে।

> 'গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। ... গা ছম ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।'

সেই হাতিপুর গ্রামের বিশেষ এক চিত্র বর্তমানের— এর বর্ণনা পরবর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই :

> 'এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষ গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু— নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়া মূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।'

এমন প্রচ্ছন্ন গভীর শ্লেষের পরস্পর বিপরীত দুটি চিত্র উপহার দিয়ে গল্পকার পটভূমির একটি বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জনায় বিশিষ্ট করেছেন। উপরি-উক্ত দুই বিপরীত চিত্র গল্পটির মূল ভাবটির প্রধান সূত্রের যোজক-ভূমিকা। জীবন্ত মানুষগুলিকে গল্পকার তাদের কায়া বাদ দিয়ে বলেছেন 'ছায়া'— যেন বা অলৌকিক কোনো অস্তিত্বের উপস্থিতি!

এমন পটভূমির ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপ আঁকার পর খণ্ড খণ্ড কয়েকটি চিত্র এঁকেছেন গল্পকার। তাদের সমবায়েই গল্পের শরীর, কিন্তু তারা এক সংসারের নয়, এক গ্রামের, তথা একই অভিশাপে অভিশপ্ত জীবনযাপন করে। এখানেই তাদের মিল। এমন মিল দেখাতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ শ্লেষ-ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন গদ্যনির্ভর বর্ণনায় :

> ১. ' কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু-সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।'

উলঙ্গ রমণীদের কাছে রাত্রির অন্ধকার পুরাণের দ্রৌপদীর যথার্থ অর্থে উলঙ্গ হওয়ার আগের অন্তহীন বস্ত্র আবরণের রূপক ধর্মের মতো। যেখানে শোষক শ্রেণীর শাসনটাই এক গভীর অর্থে দুঃশাসন, সেখানে মন্বন্তর-পরবর্তী বস্ত্র সংকটের ফলিত রূপে তারই সমান

অভিজ্ঞতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। উপমায় এমন শ্লেষ প্রয়োগ ভাষার শিল্প সুষমাকে অস্বীকার করায় না।

২. 'হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা!'

ভোলা নন্দীর মেজ ছেলে পটলের বৌ উলঙ্গ পাঁচীর কয়েদখানায় থাকার মতো প্রতিদিনের জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সেই গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার পরের দেহরূপের বর্ণনায় গল্পকার অসামান্য বাস্তব শিল্পের অভিজ্ঞানে উপমেয় ও উপমানের নিবিড় হয়ে ওঠার দুর্লভ ভাষাচিত্র এঁকেছেন নির্দ্বিধায়। ধুলোর ছাই মাটি কাদার আবরণ হবে উলঙ্গ 'মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা।' এ চিত্রে গল্পকারের কল্পনাশক্তি বিস্ময়কর।

৩. 'সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা— কচুর পাতার ফোঁটায় মুক্তা হীরা।'

এমন বাক্যের অলংকার প্রয়োগ বিলাসিতার নয়, রোমান্টিক অনুভাবনার মৃদুস্বাদ এখানে নেই, আছে বাস্তব জীবনের crude reality দিয়ে প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা, কবিত্ব নয়, কবিত্বকে তীব্র কষাঘাত করার প্রয়াস চাপা শ্লেষে!

গল্পের ভাষার ব্যঞ্জনায় আছে পরিচিত শাস্ত্রসম্মত অলংকার অতিক্রম করা নিষ্ঠুর বাস্তবতার ভাষ্য।

১. 'বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয়। আসলে, মানুষের মেয়ে।'
২. 'একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার পাশে।'
৩. 'বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে,...'
৪. 'ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালান চলে।'
৫. 'লাল ধূলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।' এই বর্ণনার প্রতীকপ্রতিম স্বভাব হাতিপুর গ্রামের আশায় ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল সাধারণ মানুষগুলির কালো ভবিষ্যৎ।'
৬. 'টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে যেন ভেতরে কাঁচা কয়লার আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।' পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবের জনতার সম্মুখীন হওয়ার চমৎকার অসহনীয় ক্রোধের চাপা স্বভাব এই চিত্রে।
৭. 'শাড়ি না পাক, কথা সে আদায় করেছে।' বাক্যের শ্লেষ ভবিষ্যৎ নিষ্ফলতাকে অনবদ্য করেছে।

এমন সব উদ্ধৃতির মধ্যে ভাষার যে যথাযথ প্রয়োগকৌশল, তা শিল্পের বাস্তবতার একমাত্র উপযোগী চিত্রই। সর্বশেষ রাবেয়ার যে আত্মহননের এক বাক্যের সন্নিহিত চিত্রটি এঁকেছেন, সেই ভাষার আড়ম্বরহীন নিরাসক্তি, মৃত্যুগ্রহণের কঠিন শপথ-স্বভাব যেমন চরিত্র-ন্যায়কে রক্ষা করে, তেমনি মৃত্যুর সমস্ত রকম আবেগহীন বাস্তবতা ও অমোঘতা অবলীলায় প্রতিষ্ঠা করে।

বস্তুত 'দুঃশাসনীয়' গল্পের ভাষা পূর্ণ সহযোগিতা করেছে গল্পের বিষয়ের। কোথাও কোনো সহজ, সস্তা রোমান্টিসিজ্‌ম্ নেই, নারীর নগ্ন শরীর নিয়ে চিত্রের বাড়াবাড়ি ঘটেনি।

মানুষে-মানুষে অনন্বয়ের, মানবতা-ধ্বংসের বাস্তব ভিত্তি রাবেয়ার পক্ষে এই ভাষা যথোচিত। গল্পের প্রথমেই আছে হাতিপুর গ্রামের অতীত ও বর্তমান অন্ধকার রাতের ছবি, গল্পের শেষে আছে বাইরের সেই অন্ধকারের চরিত্রের অভ্যন্তরে মিশে যাওয়ার। কোনো কোনো সমালোচক মনে করতে পারেন, গল্পটি শেষ হতে পারত এমন বাক্যে :

> 'আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না।'

পরবর্তী অংশ অতিরিক্ত সংযোজন! কিন্তু আমরা মনে করি, গল্পের শেষের ব্যঞ্জনা— যা গল্পের মূল ভাবের সঙ্গে রক্তের স্বভাবে জড়ানো, তা এই বাক্যেরও পরে! রাবেয়া যে প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করে তার মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রতিবাদ জানানোর প্রতীকে সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি কঠিন ধিক্কার জানানোর ভিন্ন অনুভব। স্বামী-সহবাসে নারীর পক্ষে বড় পাওয়া হল আগে লজ্জা নিবারণ, পোশাকের আবরণে নারীদেহকে সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠ করে তোলা। একজন নারীর পক্ষে স্বামী হল একই সঙ্গে শ্রেয় ও প্রেয়। এই দুই বৈশিষ্ট্য তখনই সুন্দর যখন স্বামী-স্ত্রীর শরীরের যথোচিত সম্মান দিতে পারে। সহবাসের যে অন্তিম সৌন্দর্য তার বড় মূল্য, যা লজ্জা দিয়ে মহান হয়, সেই পোশাকের আবরণ দেওয়ার মাধ্যমে সম্মান দান। নারীদেহকে সম্মান পরিপূর্ণভাবে দিতে জানলে তবেই সেই দেহগ্রহণে সুন্দর হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ শর্ত এরই মধ্যে নিহিত। তাই গল্পের শেষের বাক্যে 'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোব না'— রাবেয়ার মনের কথা এভাবে লেখক বলে তার মৃত্যু ঘটানোর চিত্রে মানব-মানবীর বড় তাৎপর্যের মানব্য ভাবনাকে মূল্য দিয়েছেন। রাবেয়া ধিক্কারে অনন্বয়কে অস্বীকার করে, প্রবল বিরোধিতা করে সব নারীর মর্যাদাদান চেয়েছে। তাই পরিণাম বাস্তব শিল্পের অনুগ।

পাঁচ

'দুঃশাসনীয়' গল্পটির নামের ব্যঞ্জনা গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে গভীর ওতপ্রোত। কোনো বিশেষ চরিত্র এমন নামে জড়িত নেই। গল্পের এমন বিশেষ নাম নিশ্চিত ব্যঞ্জনাধর্মী এবং শিল্পের মাপে সুপ্রযুক্ত। নাম কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর সঙ্গে সমন্বিত, লেখকেব কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের যথার্থ নির্দেশক।

প্রথম কথা হল, গল্পের নামে আছে 'দুঃশাসন' শব্দটি। মহাভারতের কৌরব বংশের সূত্রে এই নামটি অবশ্যই অতি পরিচিত। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করার যে বিকৃত বাসনা ছিল পুরাণের অন্যতম নায়ক দুঃশাসনের মনে ও প্রয়াসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার এক রূপক ভাবনাকে এ গল্পে যোগ করেছেন। গল্পে তিনি উলঙ্গ নারীমূর্তিগুলিকে কায়ারূপে দেখেননি, দেখাননি পাঠকদের, এনেছেন ব্যঞ্জনানির্ভর 'ছায়া' স্বভাবের দ্যোতনায়। তা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন :

> 'কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু-সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন

মহাভারত পুরাণে আছে, প্রথম পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির পরাজিত হলে দুর্যোধনের আদেশে একবস্ত্রা, রজঃস্বলা দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে দুঃশাসন সভায় আনে এবং যেমন অশ্লীল ভাষায় বিদ্রূপ করে, তেমনি অঙ্গরাজ কর্ণের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বস্ত্রের সীমাহীনতায় তার সমূহ ক্লান্তি আসে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে সর্বহারা দরিদ্র শ্রেণীর নারীদের উলঙ্গ রূপ ঢাকা থাকে দিনরাত্রির প্রাকৃতিক নিয়মে রাত্রিকালীন আবছা অন্ধকারের আবরণে। এমন যে রূপক-ভাবনা দিয়ে লেখকের নগ্ন মূর্তিগুলির লজ্জা নিবারণের প্রয়াস, তা-ই গল্পের পটভূমি হয়েছে আদ্যন্ত। লক্ষণীয়, গল্পের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত পটভূমিতে একবারও দিনের আলো নেই। রাত্রির গভীর অন্ধকার, আবছা অন্ধকার বা গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় নগ্নমূর্তিগুলির চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দ্রৌপদীর রূপক বস্ত্র দ্রৌপদীর পক্ষে, আর প্রকৃতির সহজ অন্ধকার নগ্ন নারীমূর্তিগুলির পক্ষে একই। গোটা গল্পে সেই আবরণ থাকায় পৌরাণিক সমার্থক ব্যঞ্জনায় গল্পনাম সার্থকতা পায়।

দ্বিতীয়ত, যে সময়ে গল্পটি রচিত, তার বৈশিষ্ট্য ধরলে গল্পনাম আরও গভীর ব্যঞ্জনা তুলে ধরে। মন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তী কাল বস্ত্রসংকটে ছিল বিশিষ্ট। সে সময়ের শাসকরা শোষকের রূপ ধরে বস্ত্রসংকটকে অবধারিত করে। তাকে সাহায্য করে শাসকের শাসনযন্ত্র, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবরা যেমন, তেমনি মধ্যস্বত্বভোগী আজিজ, সুরেন ঘোষের মতো দালালরাও। এরা কালোবাজারি মুনাফাখোর মজুতদার। এদের প্রথম আবির্ভাব বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার উপযোগী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পরিবেশেই। সেই সময়ে যারা শাসক, তারাই শোষক। শাসকশ্রেণীর বিকৃত শাসনব্যবস্থা ছিল নির্লজ্জ, দুঃখজনক, তারই ফল নারীদের নগ্নদেহে দিনযাপন! গল্পে শাসক-শোষকদের বৈশিষ্ট্যের চাপা ইঙ্গিত থাকায় নামকরণ নিশ্চিত শিল্প-সার্থক।

তৃতীয়ত, দুঃশাসন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত আর একটি অর্থ হল 'দুঃখে শাসনীয়'। এমন একটি অর্থ ধরলে হাতিপুর গ্রামের নগ্ন নারীদের যে আত্ম-স্খালন বা সংযম— তা হল নিজেদের নগ্ন থাকার লজ্জাকে সংযমের মধ্যে রাখা, বস্ত্রের অভাবের দুঃখ তাদের ভাগ্যে ছিল অবধারিত সত্য— তা সাময়িকতায় সীমা পেলেও; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের দিনেও তারা রাত্রির অন্ধকারে তাদের লজ্জাকে, শাসন-সংযমে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে প্রয়াসে পরাজয় আছে, কয়েদখানার জীবন-যন্ত্রণা আছে— 'কতকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?' ভোলা নন্দীর মেজো ছেলের বউ পাঁচীর এমন উক্তিতেই তার প্রমাণ, আছে হতাশা, গ্লানি, বাঁচার অপমান। তবু নগ্ন নারীগুলি নানা বয়সের অনুপাত নির্বিশেষে লজ্জাকে সামনে রেখে রাত্রির অন্ধকারে আত্মনিগ্রহের দিন অতিবাহিত করে। সে সব অবশ্যই 'দুঃখে শাসনীয়' এক অর্থে। এমন আত্মশাসনকে অস্বীকার করে, অপমানকে বড় করে দেখে আনোয়ারের বউ রাবেয়া শেষে আত্মহত্যা করে। সে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দুঃখের অতীত লোকে চলে যায়। যে নারীর বড় লজ্জা দুঃশাসনীয় থাকে, তা থেকে অতিক্রমই গল্পের শেষ চিত্রের ব্যঞ্জনা পায়। তাই নামকরণে তৃতীয় একটি অর্থদ্যোতক মাত্রা সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না

৭.

হলুদপোড়া

এক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে প্রকাশিত 'হলুদপোড়া' নামের একটি গল্প-সংকলনের প্রথম গল্পটিই হল 'হলুদপোড়া'। গ্রন্থে মোট দশটি গল্প সংকলিত। 'হলুদপোড়া' গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অমলেন্দু দাসগুপ্ত উনিশশো পঁয়তাল্লিশে, অনুবাদে নাম হয় 'Burnt Termeric'। এটি কোনোক্রমেই, কোনো দিক থেকেই 'ভৌতিক গল্প' বা 'অলৌকিক রসের গল্প' নয়। এটি সম্পূর্ণ ভূত-সংস্কারের গল্প। বিশেষ করে গল্পটির রচনাকাল জানা যায়নি। গ্রন্থে সংকলিত হয়ে প্রকাশকাল ধরেই এর আলোচনায় আমাদের নির্দিষ্ট হতে হয়। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সাম্যবাদে কঠিনভাবে দীক্ষিত এই কথাকার কি করে এমন একটি গল্প লিখলেন অনেক সমালোচক এতে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

কোনো কোনো সমালোচক এমনও ভেবেছেন 'গল্পের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যই আবিষ্কার করা যায়নি।' এইসব সমালোচক আবার এভাবেও ভাবতে সচেষ্ট হয়েছেন, 'ঘটনাকে অতিক্রম করে কোনো প্রতিবাদী ব্যঞ্জনার জন্ম হয়নি, এইটাই আশ্চর্য।' আমাদের মত এইসব ধারণার ঘোরতর বিরোধী। 'হলুদপোড়া' গল্পে তীব্র শ্লেষ আছে, মনস্তত্ত্ব আছে। 'কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চিহ্নও এর মধ্যে অলভ্য'— এজাতীয় ভাবনায় গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য ক্ষমতাকে যথেষ্ট ছোট করা হয়। তার ওপর একজন কথাকার, বিশেষভাবে মানিকবাবুর মতো কথাশিল্পী, সবসময়েই গল্পে প্রতিবাদীর ভূমিকায় আসবেন— এমন ভাববার মূলেও যুক্তি নেই। যেহেতু অনুমানে সাম্যবাদে দীক্ষা নেওয়ার পর এই রচনা, তাই তার মধ্যে নিশ্চিত প্রত্যক্ষ প্রতিবাদীর ভূমিকায় লেখককে দেখার বাসনা সচেতন পাঠকের পক্ষে হাস্যকর।

আসলে, 'হলুদপোড়া' গল্পের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাংলাদেশের যে কোনো একটি গ্রাম থেকে নির্বাচন করার কারণে মানিকবাবুর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে ধাঁধায় পড়েছেন বুদ্ধিমান পাঠককুল। ভূতকে বিষয় করে ইতিপূর্বে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অলৌকিক রসের গল্প লিখেছেন, ভূতের অস্তিত্বকে কল্পনা করে নিজের জীবনদর্শনের উপযোগী গল্প উপহার দিয়েছেন আমাদের। উত্তরকালে বিভূতিভূষণ, প্রমথনাথ বিশী এবং একাধিক গল্পকার ভূতকে বিষয় করেছেন গল্পে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া' সে সব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভূতকে নিয়ে এ জাতীয় গল্প বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। 'হলুদপোড়া' বাস্তবিকই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

'হলুদপোড়া' গল্পে টানা কোনো কাহিনী নেই, নেই বড় বড় ঘটনার সশব্দ উপস্থিতি। গল্পের প্রথমেই, গ্রামের মধ্যে, যে গ্রামে বিগত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে তেমনভাবে কেউ জখম পর্যন্ত হয়নি, দুটি খুনের ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন লেখক। যারা খুন হয়েছে তাদের

মধ্যে একজন মাঝবয়সী যুবক পুরুষ গ্রামের বাসিন্দা বলাই চক্রবর্তী, অন্যজন গ্রামেরই, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা ষোল-সতেরো বছরের রোগা ভীরু মেয়ে শুভ্রা। গ্রামে এমন খুন নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক।

বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী ভাইপো নবীন চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে স্ত্রী দামিনীকে নিয়ে একেবারে সপরিবারে গ্রামে চলে আসে। ঠিক একুশ দিনের মাথায় নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর ভূতের ভর হয়। যে শুভ্রা মারা যায় তার দাদা হল ধীরেন, স্কুলের গ্রামের একজন পুরনো শিক্ষক এবং না-পাস করা ডাক্তারও। বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় হলেও একসঙ্গে একই স্কুলে পড়ার বন্ধু হওয়ায় দুজনের যুক্তিতে ওঝা কুঞ্জ এবং কৈলাস ডাক্তার দুজনকেই দেখানোর জন্য ডাকা হয়। প্রথমে আসে কুঞ্জ। কুঞ্জর ভূত তাড়ানোর প্রক্রিয়ায় দামিনী তাকে মারতে নিষেধ করে নিজেই স্বীকার করে— 'সে চাটুজ্যে বাড়ির শুভ্রা, বলাই খুড়ো তাকে খুন করেছে।' কুঞ্জ ওঝাদের ভূত তাড়ানোর প্রক্রিয়ায় যে অত্যাচার করে দামিনীর শরীরের ওপর, কৈলাস ডাক্তার এসে কুঞ্জর ক্রিয়াকর্মের তীব্র প্রতিবাদে তাকে শাস্তি দেয় ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে।

দামিনীর এমন যুক্তিহীন স্বীকারোক্তি সারা গ্রামের মানুষদের মনের গভীরে ভূত বিশ্বাসকে চেপে বসায়। এই বিশ্বাসে কিছুটা যুক্তিবাদে নির্ভর মানুষ শুভ্রার দাদা স্কুলশিক্ষক ধীরেনও নিজেকে ক্রমশ জড়িয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে ধীরেন দুর্বল হতে হতে নিজেকে ভূতাক্রান্ত করে ফেলে। তার নিজের বাড়ির স্ত্রী-পুত্রের পরিবেশ সেই বিশ্বাসেই স্থির ছিল। তার স্কুলের পরিবেশ তার মনে সংশয় জাগায়। ক্রমশ ছুটি পেয়ে বাড়িতে একা হয়ে যায় ধীরেন। গ্রামের ক্ষেন্তিপিসির কথায় শুভ্রার আত্মা যাতে না আসে, তার কারণে ধীরেনের স্ত্রী শান্তি কাটা বাঁশের দু'পাশ পুড়িয়ে শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটেব সঙ্গে দুপ্রান্ত ঠেকিয়ে তা পেতে নেয়। শান্তির অলক্ষে সন্ধেয় এক সময় ধীরেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ফেরে নিজের বিকৃত কণ্ঠ, আর ঠোঁট থেকে চিবুক পর্যন্ত গড়ানো রক্তমাখা মুখ নিয়ে। বোঝা গেল ধীরেনকেও ভূতে ভর করেছে। কুঞ্জ ওঝা এসে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে যখন তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে, ধীরেন জানায়, সে বলাই চক্রবর্তী, শুভ্রার খুনি।

গল্পের এখানেই শেষ। কাহিনী অংশ সামান্যই, আসলে 'হলুদপোড়া' প্লট গঠনের বৈশিষ্ট্যে টানা কোনো কাহিনী-বিচ্ছিন্ন চরিত্রেরই তীব্র মানস-প্রতিক্রিয়ার গল্প। গল্পে যেটুকু কাহিনী তৈরি হয়েছে কিছু ঘটনার সমবায়ে, তার মূলে সক্রিয় থেকেছে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব। গল্পের শুরুর মধ্যে যে দুটি মৃত্যুর ঘটনা শুনিয়েছেন গল্পকার, তা গল্পকারেরই শিল্পরীতি অবলম্বনের 'নান্দী' অংশ যেন। গল্পের শুরু থেকে নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর ভূতের ভর করার মতো ঘটনা ঘটার ঠিক আগে পর্যন্ত গল্পকার কেবল সংবাদ ও তার গ্রামময় স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার চিত্রই এঁকেছেন। ভূত বিষয়ক কোনো চিন্তাভাবনাই এই অংশে নেই। বরং খুনের রোমাঞ্চকর খবর ও পরিবেশ দিয়ে লেখক প্লটে এক স্বাভাবিক

শিল্প-কৌশল-ধন্য 'মুড' নির্মাণ করেছেন। কাকার খুনিদের জন্য নবীনের রিওয়ার্ড ঘোষণা পর্যন্ত গল্পটির প্লট-অংশ স্বাভাবিক, যুক্তিগ্রাহ্য।

দামিনীর ওপর এক শক্তির ভর হওয়ার ঘটনা দিয়ে প্লটের যে মোড় বদলের দিক, সেখান থেকেই গল্পকারের কাহিনী-ঘটনার অতিরিক্ত উদ্দেশ্য প্লটে জড়িয়ে যায়। এখান থেকে লেখকের পক্ষে আর কাহিনী বয়নের প্রয়োজন হয় না। গ্রামের সমস্ত ছোট বড় চরিত্র এবং সেই সঙ্গে গল্পের নায়ক বলা যায় এমন লেখক-নির্দিষ্ট মুখ্য ব্যক্তি ধীরেন— এরা সবাই মিলে গল্পের প্লটকে নির্মাণে সাহায্য করে। ধীরেন, পঙ্কজ ঘোষাল, ওঝা কুঞ্জ, কৈলাস ডাক্তার থেকে শুরু করে স্কুলের হেডমাস্টার, ধীরেনের বউ শান্তি, ক্ষেন্তিপিসি— এরা সবাই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বে ও স্বাভাবিকতায় গল্পের প্লট-নির্দিষ্ট কাহিনী ও ঘটনার আলাদা রূপ দেয়। সেখানে লেখকের কোনো সচেতন প্রয়াস নেই। প্রথম দিকে গল্পকার স্বয়ং কাহিনীর সূত্রধার, পরে সব নিরাসক্তভাবে সৃষ্ট চরিত্রই তার নিটোল রূপাবয়ব দানে সক্রিয় অংশ নেয়।

গল্পের মধ্যে নায়ক চরিত্র ধরেই গল্পকারের মূল লক্ষ্য ব্যঞ্জনা পায়। 'হলুদপোড়া' গল্পে যদি ধীরেনকেই নায়ক করা যায়, 'নায়ক' শব্দে আপত্তি থাকলেও যদি মুখ্য চরিত্রই বলা যায়, তবে ধীরেনের ক্রমিক মানস স্বভাবের বিস্ময়কর চরমতম পরিবর্তনের কালেই গল্প-শিল্পের একটা 'চরমক্ষণ' বা 'মহামুহূর্ত' চিহ্নিত হয়ে উঠবে। এবং গল্পে গল্পকার সেরকম একটি 'সিচুয়েশন' ধীরেন চরিত্র ধরেই রেখেছেন। সন্ধেয় শান্তি যখন সব কাজ সেরে এসে ঘরে ঢুকে ধীরেনকে ঘরে আসার কথা বলে, ধীরেন 'না' উত্তর দেয়। এই পর্যন্ত অবশ্যই ধীরেন মনের গভীরে দুর্বল হলেও নিজেকে চেনে, বোঝে, স্ত্রীর কথার কিছু প্রকৃতিস্থ জবাবও দেয়। কিন্তু এর পরেই আসে সেই 'মহামুহূর্ত' যেখানে ধীরেন তার অস্তিত্বের সজ্ঞান একটা পাড় থেকে নির্জ্ঞান, আত্মবোধ-লুপ্ত আর একটা পাড়ে যাবার ক্রান্তিরেখায় দাঁড়ায় :

> 'ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরী না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।
>
> চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।'

এই যে চিত্র, এখানেই ধীরেনের শেষ চেতনারও স্বাভাবিক অবলোপ। গল্পের শেষে তার বিকারগ্রস্ত বলাই চক্রবর্তী সত্তায় চলে আসা গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অনুবর্তী সিচুয়েশন!

'হলুদপোড়া' অবশ্যই অতিলৌকিক রসের গল্প যে নয়, আগেই বলেছি। আসলে, বস্তুর অনুপুঙ্খ বর্ণনা বাস্তব নয়, মানুষের মনই সবচেয়ে বাস্তব, কঠিন প্রত্যক্ষ বাস্তব। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ফ্রয়েডের ভূমিকা অবশ্যই বিস্ময়কর। মনের গভীরের জটিল অন্ধকারে তার বিস্ময়কর রহস্য কোনো কালেই স্থায়ী সমাধানে মুছে যাবার নয়। অন্তরলোক মানুষকে

ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে যায়। তার অন্ধকার পরিবেশ কখনো কখনো মানুষের নিজেকেই ভুলিয়ে দেয়। মানুষের উন্মাদগ্রস্ততা সেও তারই এক শোচনীয় রূপ! মনের গভীরেই সচেতন সভ্যতার পরিপন্থী বিকার জন্ম নেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মনের রহস্যেই এনেছেন 'হলুদপোড়া' গল্পের নায়ক থেকে শুরু করে সমস্ত গ্রাম্য মানুষের রহস্যময় সক্রিয়তার অসঙ্গতিপূর্ণ দিকগুলি। আর এখানেই আমাদের মতে, সৃষ্টির অনন্যতার, শ্রেষ্ঠত্বের সূত্র মিলে যায়।

দুই

'হলুদপোড়া' গল্পে গল্পকার কাহিনী নয়, ঘটনা নয়, কোনো বিষয়ের ভার নয়, মূলত চরিত্র ধরেই গল্পের প্রাণবস্তুটিকে স্থির-নির্দিষ্ট করেছেন। আর সেই সূত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত বিচার-বিশ্লেষণে লক্ষ্য হয়েছে চরিত্রেরই শিল্পিত পোস্টমর্টেম, অস্ত্র হয়েছে জটিল মনস্তত্ত্ব। তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর শিল্পরীতির মৌল পার্থক্য হল— তারাশঙ্কর কাহিনী ও ঘটনার ঘোড়ার পিঠে চরিত্রদের বসিয়ে গল্পের গতি ও চরিত্রের পরিণতি আঁকতে অভ্যস্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আদৌ তা করেন না। তাঁর চরিত্ররা সমস্ত রকম নাটকীয় ও অতিনাটকীয় স্বভাব-বিবিক্ত রহস্যময় মনস্তত্ত্বের মানুষ। তাদের বাস্তবতা সমাজ স্বভাবে ও মনের রহস্যে বিশিষ্ট। কাহিনী ও ঘটনা মানুষগুলির দাসত্ব করে, চরিত্ররা কাহিনী ও ঘটনার দাস নয়। ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজ-বাস্তবতার যে স্বরূপ, তার এক অভিনবত্ব আছে। যুক্তি-চিন্তা-মননে চরিত্ররা পুতুল নয়, সচেতন সতর্ক তাদের নড়াচড়া। তারা এতটুকু বাড়তি মেদ-মাংস পায় না, পেতে পারে না গল্পকারের প্রশ্রয়ে। 'হলুদপোড়া' গল্পের চরিত্ররা এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যে নন্দিত হবার যোগ্য।

আর এই চরিত্রদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের মানসিকতা দিয়ে গল্পের বিষয় ও লক্ষ্যকে ধরতে চেষ্টা করলেই 'হলুদপোড়া' গল্পের বিষয়ের ও শিল্পরূপের চমৎকৃতি আমাদের নিবিড় করে। প্রথমেই ধীরেন চরিত্রটির দিকে তাকানো যাক, কারণ গল্পকারের লক্ষ্যবস্তু একে ধরেই প্রধানত তার আসন পাততে থাকে। ধীরেনের চরিত্র-ন্যায় এতাবৎকাল পর্যন্ত কোনো সমালোচকই বুঝতে পারেননি বলেই গল্পটিকে কেউ বলেছেন অতিলৌকিক ভাবনার গল্প, কেউ বলেছেন ভৌতিক গল্প, কেউ বা সংশয় প্রকাশ করে গল্পকে তার রহস্যময়তার অন্ধকারে নিক্ষেপেই স্বস্তি পেয়েছেন।

গল্পে ধীরেনের প্রসঙ্গ আসে একেবারে দামিনীর ওপর একটি শক্তির ভর করার ঘটনার পর থেকে। আগে শুভ্রার যে সে দাদা, তার মৃত্যুর পরে গল্পকার একবারও জানাননি। ঠিক যখন প্রয়োজন, তখনি গল্পে তার প্রসঙ্গ। এই পরিমিতি বোধেই ধীরেনের চরিত্রের অবয়ব শিল্পরূপ পায়। লক্ষণীয়, ধীরেনের ভিতরের স্বভাব কি রকম! সে স্কুল মাস্টার ঠিকই, কিন্তু ফিজিক্সের মতো বিষয়ে বি. এসসি-তে অনার্স নিয়ে পাস করে সাত বছর জিওগ্রাফি পড়ায়। এক অদ্ভুত অসঙ্গতি। আর এক অসঙ্গতি তার সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনে নিশ্চিত অসম্পূর্ণতায়— লাইব্রেরি তৈরিতে, তরুণ সমিতি গঠনে, তার মতো

শিক্ষিত যুবকের গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিবাহ করার মধ্যে। সে ফিজিক্সের ছাত্র, বই পড়ে ফিজিওলজি ও মেডিসিনের। ডাক্তারি বিদ্যা তার বই-পড়া অর্জন এবং তারই সূত্রে ওষুধ বিক্রি করার মানসিকতায় আরও সেই অসঙ্গতি। অর্থাৎ যে মূলত পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, সে হয় এক অস্থির, অস্থিতচিত্ত যুবক। তার মধ্যে মনের ভিত ধরে আছে দুই মেরুর ব্যবধানের মানসিকতা— একদিকে যুক্তিচিন্তা, আর একদিকে শিক্ষা ও আবেগের প্রযুক্তিগত বৈপরীত্য।

এমন ভারসাম্য বজায় রাখায় দুর্বল-চিত্ত মানুষটিকে যে ভূতের সংস্কার ধীরে ধীরে গ্রাস করবেই, গল্পকার তা বোঝাতেই ধীরেনকে এভাবে এঁকেছেন। এখানেই ধীরেন চরিত্রের বাস্তবতা। সে গল্পের গোড়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ, একজন যুক্তিনিষ্ঠ শিক্ষিত লোকের মতোই কথা বলে :

> 'ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বললে, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাস-করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা পাচ্ছি না।.....
>
> নবীন জিজ্ঞেস করল, কুঞ্জ কত নেয়?
>
> ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞানবুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

এখানে ধীরেন সম্পূর্ণ সুস্থ, শিক্ষিত, অতি সচেতন, যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের চরিত্র।

কিন্তু গল্পকার দেখিয়েছেন এই চরিত্রে ক্রমশ অসুস্থ, বীভৎস সংস্কারের ক্রমিক অনুপ্রবেশ। শুভ্রাকে বলাই চক্রবর্তী খুন করেছে এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, হাস্যকর কাহিনী-অংশ গুজব নয়, লৌকিক সংস্কারে ফুলে-ফেঁপে অনেক কান ঘুরে ধীরেনের কানে পৌঁছয়। আর আগেই দেখিয়েছি, ধীরেনের চরিত্রের মর্মমূলে আছে এক গভীর অসঙ্গতি। সে এক দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ। সেই চরিত্রগত অসঙ্গতির রন্ধ্রপথেই সংস্কার বড় হয়ে ওঠে, যুক্তি-চিন্তা, বাস্তব বুদ্ধি-বিচার ঢাকা পড়ে, সরে যেতে থাকে। এটাই তার স্বভাবের নিশ্চিত পতনের উপযুক্ত ছিদ্রপথ— flaw। যেহেতু একজন সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ধীরেন, তাই তার মধ্যে সংস্কারের ভূত আসন পাততে থাকে ধীরে ধীরে পরিবেশের রহস্যময়, মায়াময় প্রভাবেই।

ধীরেনের ভাবনা ছিল মানবতার— সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা বোন শুভ্রার পিছল কাঠের সিঁড়ি বানানোর চিন্তার মধ্যে। গ্রামের গুজবের প্রভাব ক্রমশ তা থেকে সরিয়ে এনে তাকে অন্যমনস্ক করে, শুভ্রার হত্যার ভাবনায় গভীরভাবে নিমগ্ন করে, ক্ষোভ ও বিষাদে স্থির অনড় করে দেয়। স্কুলের প্রধানশিক্ষক, ক্লাসের ছাত্ররা, মথুরবাবু, বাড়ির ভূত-বিশ্বাসের পরিবেশ, গ্রাম্য, অশিক্ষিত স্ত্রী শান্তির ভয় ও সংস্কার, ক্ষেন্তী পিসির ভূত তাড়াবার সংস্কারবদ্ধ দাওয়াই— এসবই জেঁকে বসতে থাকে। তার একাকীত্ব, তার অন্যমনস্কতা, শুভ্রার মৃত্যুর দুঃখ তাকে তার যুক্তিবর্জিত সংস্কারের জগতে নিশ্চিত স্বভাবে ঠেলে দেয়।

তারই পরিণাম ওঝা কুঞ্জর জবাবে : 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'— এমন বিকৃত সম্পূর্ণ যুক্তিবিহীন উক্তিতে।

সুতরাং 'হলুদপোড়া' গল্পের মূল লক্ষ্য সংস্কারকে শ্লেষ-বিদ্ধ করে উলঙ্গ অবয়বে পাঠকদের সামনে নিয়ে আসা। ধীরেনের মানস বিবর্তনে ও মনস্তত্ত্বে তারই প্রকৃষ্ট রূপ রূপায়ণ। আমাদের মতে, এখানেই গল্পের শিল্পগত অভিনবত্ব। ধীরেন আদৌ রোমাঞ্চকর চরিত্র নয়, অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তব তার পরিণতি চিত্রও। দামিনীর মধ্যে ভর হওয়ার চিত্রে আছে এক নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত বধূর সংস্কারে দুর্বল চিত্তের প্রশ্রয়দান। শুভ্রা ও বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতেই ভিতরের দুর্বল চিত্তের সংস্কারে সে এত বেশি গ্রস্ত যে সামান্য সন্ধের মৃদু বাতাসে তেঁতুল গাছের পাতার কম্পনেই সংস্কার অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে। অবচেতন মনে নিরন্তর যে ভয়ার্ত শুভ্রা-বলাই মৃত্যু-ভাবনা, তা-ই ধীরেনের বিকারগ্রস্ত-নিজেকে 'শুভ্রা' করে, তার খুনি করে 'বলাই'কে। এই অস্বাভাবিক মানসিকতা রক্ত সম্বন্ধে নিহিত সংস্কারেরই ফল। বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল মানুষটিও গ্রামীণ অশিক্ষিত সংস্কারে মোড়া। তার অপ্রাকৃত শক্তির পক্ষে পথিকের ঘাড় মটকে দেওয়ার যুক্তিতে আছে সংস্কারের দুর্ভার বোঝা— যা যুক্তির ধার ধারে না। ধীরেনের স্ত্রী শান্তি 'গেঁয়ো' মেয়ে, অর্থাৎ অশিক্ষিত সংস্কারে আজীবন লালিত। তার প্রভাবও গল্পের মূল চরিত্র ধীরেনকে নিয়তির দিকে ঠেলে দেয়।

তাই, যদি আমরা দামিনী, বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল, শান্তি, কুঞ্জ, হেডমাস্টার এবং শেষে ধীরেনের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের চোখ দিয়ে গল্পের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করি, তবে মনস্তত্ত্বের চমৎকার নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়ে যাই, যা যেমন গল্পের অবয়বের মেদহীনতাকে সমর্থন করে, তেমনি গল্পের লক্ষ্যের কেন্দ্রকে কঠিন প্রতিষ্ঠা দেয়। 'হলুদপোড়া' গল্পের বাস্তবতা সম্পূর্ণত চরিত্রের বাস্তবতা ধরে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই আমরা মনে করি, 'হলুদপোড়া' এক অভিনব রীতির, যা বাংলা ছোটগল্পে আগে ছিল না, ভূত বিশ্বাস ও সংস্কার বিষয়ক সম্পূর্ণ বাস্তব বোধ ও বুদ্ধির, বাস্তব রসের গল্প। এর বাস্তবতা চরিত্রের মধ্য থেকে জাত, গল্পকারের বলা কোনো কাহিনী ও ঘটনা-সমৃদ্ধ প্লটে নেই।

তিন

একথা ঠিক, 'হলুদপোড়া' গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ভূত বিষয়ক সংস্কারই, ভূতনির্ভর অলৌকিক রস নয়, ভৌতিক গল্প তো নয়ই! সংস্কার কখনোই, কোনো কালেই যে যুক্তি-চিন্তার ধার ধারে না, তাকে মানে না, মানতে পারে না, 'হলুদপোড়া'র বিষয় ও চরিত্র তা প্রমাণ করে। তা না হলে তিনদিন আগে মৃত বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে খুন করে— এই বিশ্বাস কি করে প্রতিষ্ঠা পায় জনমনে? 'হলুদপোড়া' গল্পের শিল্পতত্ত্বের বিচার সাধারণ গল্প বিচারপদ্ধতির মধ্যে পড়ে না। এর বিচারপদ্ধতি প্রচলিত বিচারপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানেই গল্পের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব। কোনো সমালোচক যদি এমন মন্তব্য করে থাকেন 'কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টাই করা হয়নি' গল্পের একাধিক চরিত্র

ভাবনায় ও কল্পনায়, তা হলে আমরা মনে করি, তাঁরা গল্প বিচারের প্রচলিত পদ্ধতিতে গিয়েই ভ্রান্তিতে ঘূর্ণিতে পড়েছেন।

গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পৌছতে গিয়ে মানিকবাবু গল্পের মধ্যে ঠিক জায়গায় দামিনী প্রসঙ্গের ইতি ঘটিয়েছেন। 'শুভ্রা' আর 'বলাই' সঙ্গত কারণেই উপস্থিত থেকে ধীরেনের মধ্যে গল্পের নায়কের গরিমা দেয়। ধীরেন ক্রমশ সংস্কারে গভীর আক্রান্ত ও অভিভূত, অন্যমনস্ক বলেই মৃত শুভ্রার সঙ্গে যোগ ঘটাতে বাঁশ ডিঙিয়ে মাঠে চলে যায়। তার যুক্তিহীন মানসিক অসুস্থতা তাকে টেনে নিয়ে যায়। শুভ্রার সঙ্গে যোগাযোগ বাসনা তার আক্রান্ত চেতনা-লোকের দুঃখজনক পতনের কারণেই দেখা দিয়েছে। এটা লেখকের মূল লক্ষ্যের বা কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুগ চরিত্ররীতি।

আমাদের ব্যাখ্যায়, মানিকবাবু বোঝাতে চেয়েছেন স্পষ্ট করেই, কি গ্রামীণ, কি নাগরিক— মানুষেব মধ্যে সংস্কার এত ভয়ঙ্কর সংক্রামক ব্যাধির মতো কাজ করে। তা সমস্ত রকম গুজবের অতীত এক বিষয়। তারই অমোঘ সত্যরূপ গল্পের চতুর বাস্তব চরিত্রন্যায় থেকে উঠে এসেছে। কুসংস্কার এমন যে তা মানুষকে রক্তের অন্তর্গত থেকে অক্টোপাসের স্বভাবে মানুষকে বাঁধে। তা একবার একটা জট পাকায়, সে জট ছাড়ালে আর একটা জট তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়। এইভাবে গল্পে গ্রামের মানুষদের মনে জট ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যের স্বভাবে লেগেই থাকে। যাবার নয় কোনোদিনই! এটা একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জটিলতম ঘেরাটোপ। আমরা সংস্কারবদ্ধ মানুষ প্রত্যেকেই কমবেশি কোনো না কোনো ভাবে বাইরের উপযোগী ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসের গভীর থেকে অবিশ্বাসের দিকে যেতে চেষ্টা করি, আবার অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের দিকে ফিরেও আসি। ধীরেনের মধ্যে এরই নাম দ্বন্দ্ব— মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে অবিশ্বাস জয়ী হয়েছে, নতুন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে, তা জীবন-বিকৃতির, আত্মলয়ের। সংস্কার থেকেই তো মানুষ উন্মাদ হয়!

ধীরেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের জীবনদর্শনে গড়া মানুষ— যাকে শিল্পী নিরপেক্ষতায় সর্ব মানুষের সঙ্গে যোগ ঘটিয়েছেন। 'হলুদপোড়া' গল্প যে আদ্যন্ত ভূতের সংস্কারের কুৎসিত স্বভাব ও তার বিধ্বংসী নিষ্ফলত্বকে সামনে আনে, ধীরেন চরিত্র এঁকে লেখক তারই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন গল্পে। ধীরেনও লেখকের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের উপযুক্ত অভিজ্ঞান। কোনো এক মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলো উন্মুক্ত মঞ্চের পরিবেশকে দেখায়, কিন্তু মঞ্চে চরিত্রের সক্রিয়তা শুরু হলে চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই আলো মঞ্চের পরিবেশের গভীর তাৎপর্য বোঝায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া' গল্পে গল্পকারের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি হল সেই পাদপ্রদীপের আলোর মতো, যা চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেমন গল্পের পরিবেশের ভৌতিক দিকের শিল্পিত রূপকে স্পষ্ট করে, তেমনি চরিত্রদের মধ্য দিয়ে সেই পরিবেশের তাৎপর্যে গভীরতা আনে। এইভাবেই গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের আলোকময় অস্তিত্ব পাঠকচিত্তে ধরা পড়ে। যারা চোলাই মদকে খাঁটি মদ বলে চালিয়ে কৃতিত্ব নিতে চায়, তারা যেমন তুচ্ছ, উপেক্ষার মানুষ, ঠিক তেমনি যে সব লেখক সস্তা অবৈজ্ঞানিক

ভূতের সমর্থনে ভূতের গল্প নিয়ে খাঁটি ভূতের গল্পের রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চান, কৃতিত্বের দাবিদার হন, মানিকবাবু সত্যিকারের ভূত-বিষয়ক সংস্কারের গল্প লিখে তাঁদের মনোভঙ্গির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ভৌতিক পরিবেশ রচনায় গল্পটি অনন্য, কিন্তু ভিতরে আছে ভূত বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ফল রূপের বাতাবরণ, আছে ভূতের অস্তিত্বের যথোচিত নিষ্ফলত্বের দিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কেন্দ্রীয় বক্তব্যের একান্ত পরিপোষক।

চার

'হলুদপোড়া' গল্পের প্রকরণ কৌশল বিস্ময়করভাবে নিখুঁত ছোটগল্পের গৌরবকে সামনে আনে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের রূপ ও ভাষা-রীতি বিষয়ক বৈশিষ্ট্য 'হলুদপোড়া' গল্পে মেলে। প্রথমত, তাঁর গল্পে সমাজ-বাস্তবতাই হয় একমাত্র লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি হল তাঁর হাতের সেই চোরালণ্ঠন, যার আলো দিয়ে নিখুঁত করে ধীরে ধীরে খনির নীচের হীরকখণ্ডের অনুসন্ধান চলে। তৃতীয়ত, বর্ণনায় মেদহীন ভাষাপ্রয়োগ, আবেগহীনতা নিশ্চিত নিহিত থাকে। চতুর্থত, গল্পকার চরিত্রের মনের ভূমিকেই সব সময় ভাবনার বিচরণক্ষেত্র ঠিক করেন। পঞ্চমত, সব সময় একটা মমতাহীন শ্লেষ কাজ করে— কি বিষয়ে, কি গদ্যে।

আলোচ্য গল্পে শুভ্রা ও বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুবর্ণনায় লেখকের এতটুকু আবেগ কাজ করেনি। সার্থক সাংবাদিকের মতোই তিনি এমন বীভৎস ও অসহায় দুটি মৃত্যুর ছবি উপহার দিয়েছেন পাঠকদের। শুভ্রার মৃত্যু সম্পর্কিত খবর বলার ভঙ্গিতে তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, যেনবা গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকেই— যা গল্পে খুনের রহস্যকে অদ্ভুত শিল্পস্বভাবে আরও বেশি রোমাঞ্চকর ঘন হওয়ার সুযোগ দেয় :

> 'বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?'
> দু'টো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? ... একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।'

গল্পকারের লেখনীতে গ্রামীণ মানুষের সমবেত বৈশিষ্ট্য চাপা শ্লেষ-ধর্মে গল্পের বিশেষ পরিবেশ-অনুকূল শিল্পবৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়।

গল্পে ছোট ছোট প্রকৃতিচিত্র আছে, কিন্তু সেগুলি চরিত্রের গভীর-জটিল মনের স্বভাবের অন্তর্নিহিত থেকেই সত্য, সেই সঙ্গে গল্পের একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ তৈরি করারও সহায়ক উপকরণ হয়ে ওঠে একই সঙ্গে। অগ্রহায়ণের মিষ্টি উজ্জ্বল রোদচিত্র ধরে অন্যমনস্ক ধীরেনের চোখে যে প্রকৃতিচিত্র ভাসে, তা কিন্তু তাকে কঠিন সত্যের ভাবনায় ধরে রাখে। সে শুভ্রার মৃত্যু ও তার সূত্রে কিভাবে তার এই অঘটন ঘটে তাতেই নিমজ্জিত হয়ে থাকে। প্রকৃতি চরিত্রের স্বক্ষেত্রে তাৎপর্যময় না হয়ে চরিত্রের বৈপরীত্যকে স্পষ্ট করে। এমন প্রকৃতিচিত্র পরেও আছে যার মধ্যে নায়ক শুধু দেখে বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুর

স্থান। ধীরেনের চোরের মতো ডোবার মাঠের দিকে যাওয়ার আগের ছোট প্রকৃতিচিত্রটির তাৎপর্যও সেই চরিত্র-ন্যায় ধরেই গুরুত্ব পায় :

> 'তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি। দু-তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে, আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা।'

এমন প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে আয়নায় ভেসে ওঠা মুখের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় লেখকের কেবল উদ্দেশ্য নয়, প্রকরণগত কারুকার্যও নয়, ধীরেনের মুখবিম্ব। অর্থাৎ লেখকের বর্ণনায় ধীরেনের মনই এখানে ধরা পড়ে। অথচ গল্পের ভূত-সংস্কারকে প্রতিষ্ঠা করার মতো একটা আড়ষ্ট ভয়ের স্পন্দনও যেন এর মধ্যে সহজ হয়ে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের প্রকরণে এক অসম্ভব সংযমসিদ্ধ শিল্প-ব্যক্তিত্ব। এত নিখুঁত প্রকরণ প্রয়োগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত কল্লোলেতর সাহিত্যিককুলে দ্বিতীয়রহিত। পূর্বসূরি সম্ভবত গল্পকার সত্তায় জগদীশ গুপ্ত। বিভূতিভূষণের একাধিক গল্পে প্রকরণ শৈথিল্যের কিছু প্রমাণ মেলে, প্রচুর এমন শৈথিল্যের নমুনা আছে তারাশঙ্করের একাধিক ছোটগল্পে, কিন্তু সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র গল্পকার, যাঁর ছোটগল্পে প্রকরণের অসামান্য প্রয়োগ-বিশুদ্ধি আমাদের বিস্মিত করে। এর মূলে যে গল্পকারের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বের বিম্ব— তাতে ধরা আছে তাঁর সেই নিবাসক্ত বৈজ্ঞানিক শিল্পী-মন!

'হলুদপোড়া' গল্পের শেষতম পরিণামী ব্যঞ্জনায় আছে অসাধারণ শিল্পসংযমের স্বাদু সুষমা :

> '... ঘণ্টা-খানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।
> তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্র কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল্ তুই কে?'
> ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

শেষের এই কথা যে কত বড় ভুল, মিথ্যা, সচেতন পাঠক ধীরেনের ধীর, স্থির বিবর্তন ও বদলের দিকগুলি দেখে বুঝতেই পারে। কোনো ভূত নয়, একমাত্র অন্ধ সংস্কারই যে যুক্তিহীন করে মানুষকে, অবলীলায় বিকারগ্রস্ত করে, গল্পের শেষতম সিদ্ধান্ত তারই সাক্ষ্য দেয়। অথচ বিষয়কে যদি গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনার অসীমতা দিয়ে গল্পরসের স্বাদে গৌরব দিতে চাই, তাতেও এই শেষ বাক্য যে চমক আনে, তার মধ্যে বাস্তব সত্যই ছায়া ফেলে। চরিত্রের বাস্তবতা ও গল্পের প্রকরণগত পরিণামী সুষমা এক থেকে অভিনব এক ছোটগল্পের গৌরব পতাকা উঁচু করে দেয়।

'হলুদপোড়া' গল্পের বর্ণনায়, ভাষায় ও বাক্যের গতিতে আছে চাপা শ্লেষ। সেই শ্লেষই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী মনকে ছায়ার স্বভাবে গল্পের অবয়বে জড়িয়ে রাখে। ভূত বিষয়টা যে নিছক অন্ধ সংস্কারই, কোনো অলৌকিক আত্মার রহস্যময় খেলা নয়, ম্যাজিক

নয়— সমগ্র গল্প আস্তে আস্তে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সচল থাকে। গল্পপাঠের আনন্দের মধ্যে এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভবই শ্লেষকে জিজ্ঞাসাচিহ্নে প্রতিবাদী স্বভাব দেয়। গল্পের কোনো কোনো বর্ণনাচিত্রে, ভাষায়, বিশেষ শব্দগ্রন্থনে গল্পকার তার প্রমাণ রেখেছেন। দামিনীকে ভয় করার ঘটনা যেন এক তীব্রতম উত্তেজক এবং কৌতূহল-ভরা পরম উপভোগ্য শিহরনের বিষয়। গ্রামের জনতার সামনে তার এই দিকের চিত্র সতর্ক গল্পকারের শ্লেষের বিষয়ই :

> 'দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপরের ম্যাজিক।'

এই চিত্রের ভাষাবৈশিষ্ট্য শ্লেষের স্বভাবকেই নিশ্চিত করে। এই ভাষাচিত্রে 'স্টেজ', 'নাটক', 'অভিনয়', 'আমদানি করা', 'ম্যাজিক'— এইসব শব্দ ব্যবহার করে মানিকবাবু সচেতনভাবেই ভাষা-প্রয়োগে শ্লেষধর্মকে, ভূতের অস্তিত্বের নিষ্ফলত্বকে হালকা ঠাট্টায় আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। 'হলুদপোড়া' গল্পের ভাষাচিত্রে এখানেই বৈজ্ঞানিক গৌরব-সমুন্নতি।

পাঁচ

'হলুদপোড়া' গল্পের নাম অবশ্যই ব্যঞ্জনার অনুগ। গল্পে ভূত তাড়াবার ওঝা কুঞ্জ কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে তা দামিনীর নাকের কাছে ধরে তার ভর হওয়া জীবনে আততায়ীর নাম জানতে চায়। দামিনী সহজেই নিজেকে ওঝা এবং বলাই খুড়ো তার খুনি— তা জানিয়ে দেয়। আর সেটাই সমগ্র গল্পকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। আবার ধীরেন বিকারগ্রস্ত হলে সেই কাঁচা হলুদপোড়াব গন্ধ কুঞ্জ তার নাকে দেয়, এবং দামিনীর স্বীকৃতি ধরে তার সমর্থন আদায় করে নেয়। পোড়া হলুদ এখানে ভূত-সংস্কারের লোকবিশ্বাসের যথোপযুক্ত উপকরণ। গল্পের প্রথমে ও শেষে তার প্রয়োগে ও নিয়ন্ত্রণে গল্প গতি পেয়েছে বলে নামের ব্যঞ্জনা শিল্পসম্মত সমর্থন পায়।

দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা তাৎপর্যের স্বরূপ ধরতে রাখা যায়। যখন কোনো ম্যাজিসিয়ান মঞ্চে ম্যাজিক দেখায়, তখন তার হাতে একটা যাদুদণ্ডের মতো উপকরণ থাকে। বস্তুত ম্যাজিক আর কিছুই নয়, শুধু কৌশল মাত্র। একজন ম্যাজিসিয়ানের যে কৌশল যত বেশি গোপন অথচ প্রভাব ফেলতে নিখুঁত, সেই ম্যাজিকই সবচেয়ে সত্য ও আকর্ষণীয়। ম্যাজিসিয়ানের যাদুদণ্ড সম্পূর্ণ মিথ্যা, অথচ কৌশলের কাছে দর্শক জনমানসে তা সত্য। হলুদপোড়া একজন ওঝার কাছে সেই যাদুদণ্ডের মতো। সংস্কারকে সত্য রূপ দিয়ে বিশ্বাস জন্মানোর উপযোগী পোড়া হলুদ এক অব্যর্থ উপকরণ। তার নিষ্ফলত্ব গল্পের চরিত্র-ন্যায় ধরে ভৌতিক বিশ্বাসকে তুচ্ছ করার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তুচ্ছ ও অবহেলার, অবিশ্বাসের হয়ে যায়। 'হলুদপোড়া' গল্পের পোড়া হলুদের অস্তিত্বের নিষ্ফলত্ব চরিত্রের কঠিন নিরাসক্ত বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে যায়। গল্পের 'হলুদপোড়া' নাম তাই প্রকারান্তরে

শ্লেষকেই দেখায়। সংস্কারের প্রতি শ্লেষেই এমন নামকরণ লেখকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে প্রমাণ করে। নাম তাই শিল্পের-ন্যায়ের দিক থেকে সার্থক।

তৃতীয় আর একটি ব্যাখ্যা লক্ষণীয়। একটা নিছক কাল্পনিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার একই ভাষায় ও উদ্দেশ্যে দামিনী ও ধীরেনের বিকৃত মনে ধরা থাকে। এই পৌনঃপুনিকতা গল্পের সংস্কারাবদ্ধ মানুষগুলির সম্পূর্ণ নির্বোধ যুক্তিচিন্তার একমাত্র পরিপোষক। হলুদপোড়া, ওঝা, ভূত— এসব তারই একান্ত সমর্থক। গল্পের নামের শ্লেষ এই টীকাভাষ্যে যুক্তির মাটি নেয়।

৮.

সরীসৃপ

এক

এমন 'সরীসৃপ' নামেই একটি গল্পগ্রন্থ আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যার সংকলিত মোট বারোটি গল্পের মধ্যে 'সরীসৃপ' নামের গল্পটিই শেষ গল্প। গ্রন্থটির প্রকাশকাল উনিশশো উনচল্লিশের আগস্ট মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনো আক্ষরিক অর্থে শুরু হয়নি। 'সরীসৃপ' গল্প সংকলনটি লেখকের গল্পগ্রন্থ তালিকার চতুর্থ স্থানে পড়ে। ইতিপূর্বে গল্পকারের দ্বিতীয় গল্প সংকলন গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর প্রকাশ ঘটেছে এবং আমরা 'সরীসৃপ' গল্পটির পাশাপাশি 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে নিশ্চয়ই আনতে পারি। বস্তুত মানিকবাবুর লেখা তিরিশের দশকের শেষতম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থভুক্ত গল্প 'সরীসৃপ'। এর প্রকাশের আগে পর্যন্ত আমরা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে— অন্তত সাহিত্য ভাবনার সূত্রে— পাই কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকার প্রকাশের মতো ঘটনা, তাদের উনিশশো উনত্রিশ সালের মধ্যেই একে একে অবলোপের সংবাদ।

অবশ্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে কল্লোলের লেখক ছিলেন না, হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না, কারণ তিনি বয়সে ও আবির্ভাবে স্পষ্টতই কল্লোল-কনিষ্ঠ লেখক। কিন্তু কল্লোলের প্রত্যক্ষ ছায়ায় জগদীশ গুপ্ত যে মানবমনের গভীর-জটিল স্বভাব ও অবচেতন মনের আদিম পাশববৃত্তি নিয়ে একাধিক গল্প-উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা— অন্তত প্রথম পর্বের সে সবের সঙ্গে সূক্ষ্ম সূত্রগত যোগকে একেবারে অস্বীকার করে না। আমাদের মতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পে যে আধুনিক সভ্য মানুষের অন্তর্গূঢ় আদিম প্রবৃত্তির জগতের নিরাসক্তির গেরুয়া রঙে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ, 'কল্লোলের'ই যথার্থ অর্থে কথাকার জগদীশ গুপ্ত সম্পূর্ণ নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকেই প্রথম অভিনন্দিত করেছেন তাঁর বিষয় ভাবনায়, চরিত্র-আধারে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে বলেছেন 'সে কল্লোলের কুলবর্ধন'।

'সরীসৃপ' গল্পে আগের একাধিক গল্পের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবন, মানুষ ও মনস্কতার অধিতলে পাশব আদিম বৃত্তির অধোমুখ নরক। তাঁর এই নির্বিঘ্ন মনের সমস্ত রকম শিল্পসন্ধান জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতায়। তাই

তাঁর রচনায় 'কল্লোল' কুললেখকদের সঙ্গে যোগ ঘটে যায়। তিরিশের দশকে কিছুটা পূর্বসূরি হিসেবে পান বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করকেও। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে কাহিনীকে নিয়েছেন বিবৃতিধর্মী শিল্প-আঙ্গিকে জড়িয়ে, ঘটনাকে সাজিয়েছেন মোটা রঙে কখনো কখনো। সারা তিরিশের দশক জুড়ে ছোটগল্পের শরীরচর্চায় তারাশঙ্কর প্রমুখ যে রীতিতে গল্পের বিষয়ে বিচরণ করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে এর প্রথানুগ ধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় মাপের গল্প লিখেছেন, কাহিনীকে সেইভাবে গ্রহণ করেছেন, ঘটনার পর ঘটনা এনে গল্পের গতিসৃষ্টি করেছেন। তিরিশের দশকের ছোটগল্পের এটাই ছিল ভাগ্যলিপি।

কিন্তু এর মধ্যেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ করেছেন অত্যন্ত কৌশলে জটিল অনালোকিত অন্ধকার মনের রহস্যময় ক্রিয়াকর্ম। ক্রমশ সেইদিকের ঝোঁকেই মানিকবাবুর নিরাসক্ত নির্মম দৃষ্টিতে কাহিনী ও ঘটনা প্রথানুসরণে পরোক্ষে কিছুটা থেকে গেলেও তাঁর নিজস্ব মৌলিক যে দৃষ্টি— মধ্যবিত্ত মানুষের জটিল মনের গভীরে অবগাহন প্রয়াস—তাই তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের পর 'সরীসৃপ'-এর মতো গল্পে সে সবেরই মোড় ফেরানো প্রত্যয়। প্রসঙ্গত আর একটি কথাও স্মরণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কল্লোলের কাল থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্য-নির্ভর বিষয়ভাবনার প্রবণতা তরুণতম লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। তার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি স্বাগত হন সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড। এই ফ্রয়েডীয় আধুনিকতম ব্যাখ্যার মনোবিজ্ঞান লেখককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তা নিজের মতো করে তাকে গ্রহণ করেছিল। 'প্রাগৈতিহাসিক' থেকে 'সরীসৃপ' পর্যন্ত এই লেখকের মানসভ্রমণে তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 'সরীসৃপ' গল্পে গল্পকার সেই আদিম মনের শিল্পিত প্রয়োগে এক বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।

'সরীসৃপ' গল্পের কাহিনী-বস্তু একাধিক ঘটনাকে আশ্রয় করে বিস্তারিত অবয়ব পায়। সরীসৃপ আকারে নিশ্চয়ই বড় গল্প। গল্পের নায়ক বনমালী, তার দুপাশে দুই প্রধান নারী চরিত্র— চারু ও তার ছোট বোন পরী। গল্পের শুরু প্রৌঢ়া চারু ও মধ্যবয়সী পাটের দালাল বনমালীর কথা দিয়ে। চারুর যখন বিয়ে হয়, তখন তার সতেরো বছর বয়স, বনমালীর পনেরো। চারুর শ্বশুর রামতারণের অভ্যাস ছিল তার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব যে বনমালীর বাবা, তাকে নিয়ে ব্যারাকপুরের গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে রাতকাটানো ও ফুর্তি করা। যাবার আগে স্ত্রী-জাতির সতীত্বে স্বাভাবিক অবিশ্বাস থাকায় তার পাগল পুত্রের বধূ চারুকে পাহারার জন্য রেখে যেত বনমালীকে। চারু বুদ্ধিমতী, সে তা বুঝত। বনমালীকে রাতে পাশের ঘরে শুইয়ে পাগল স্বামীর সামনে শোবার ঘরের মাঝের দরজা খুলে রাখত। বাবার ভয়ে কাঠ স্বামী বাধা দিত না।

রামতারণ মারা যাবার পর সে ব্যবস্থা বদলায়, কিন্তু বনমালীর যাতায়াত ঠিক ছিল। ক্রমশ যাতায়াত কমে। চারুর শ্বশুরের দামী বাড়ি বাগান একসময়ে দেনার দায়ে বনমালীর হাতে চলে যায়। বনমালীও শহরের মধ্যে নিজের বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে যায়।

বর্তমানে স্বামীহীনা চারুর একটি জড়বুদ্ধি সন্তান আছে, নাম ভুবন। তাকে নিয়ে চারু বনমালীর কাছে ওদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িতেই থাকে। চারু সম্পত্তির সুব্যবস্থা নিয়ে এই বয়সেও বনমালীর সঙ্গে কথাবার্তার নানারকম মজায় আনন্দ পায়। তাছাড়া চারু বুদ্ধিমতী, কৌশলে বনমালীর সঙ্গে সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করতে চায় পুত্রের কথা ভেবে। বনমালী কম কথা বলার মানুষ, গম্ভীর। সে চারুর অস্বাভাবিক মোটা চেহারার জড়বুদ্ধি ছেলেকে দেখে চারুর এমন সন্তান স্নেহে বিস্ময় প্রকাশ করে মনে মনে। প্রসঙ্গত চারুকে আজও অবিবাহিত নিরাসক্তচিত্ত বনমালী জানায়, নিজেরই ধার-নেওয়ার কারণে বন্ধক-রাখা চারুদের বাড়িটি একসময়ে ছাড়িয়ে ভুবনকেই সে দিয়ে দেবে। এরই মধ্যে চারুর ছোটবোন পরী একমাসের ছেলে নিয়ে চারুর কাছে আসে, থাকে। ক্রমশ বোঝে, দিদি থাকতে বনমালীর কাছে কোনো রকম আমল পাওয়া তার পক্ষে খুবই দুরূহ, তাই সরে আসে। মাসখানেক পরে 'আর আসবো না' এমন অভিমানের কথা জানিয়ে পরী শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। বনমালী একসময়ে শহরের মধ্যকার নিজের কেনা বাড়ির বাস ছেড়ে চারুর বাড়িতে আসে বুড়ি মা ও জিনিসপত্তর, দাসদাসী এবং অন্যান্য আশ্রিতদের নিয়ে। মা হেমলতা চারুদের ওখান থেকে নানা ছলছুতোয় সরাতে চায়। বনমালীর স্বভাবসিদ্ধ নিস্পৃহতায় তা পারে না। বুদ্ধিমতী চারুর কাছে বনমালী বেশ অসহায়।

গল্পের কাহিনী ঘন হয়, তীব্র গতি পায় বিধবা হয়ে পরীর সেই একমাত্র ছেলেটিকে নিয়ে দিদির কাছে চলে আসার পর। চারুর নিজের ক্ষোভ, অসহায়তা চরমে ওঠে পরীর বৈধব্যের আঘাতেই। এদিকে অবিবাহিত মধ্যবয়সী বনমালীর চোখে বিধবা যুবতী পরীর অস্তিত্ব, কমবয়সী চারুর ব্যবহার, মনোবিকার ইত্যাদির, এমনকি কথাবলার ভঙ্গিরও সুদূর স্মৃতি জাগায়। কেবল চারুর থেকে পরীকে বনমালীর অনেক স্পষ্ট, স্বচ্ছ মনে হয়। এমন গম্ভীর মানুষটিও তাই পরীর সঙ্গে ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারে না। চারুর যুক্তিতেও পরী কিছুতেই আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে চায় না। তার শ্বশুর তাকে যে সম্পত্তির সামান্য কিছু দিতে অস্বীকার করবে, তার স্বভাব সে বোঝে বলেই সে যেতে চায় না। ক্রমশ পরী ও চারুর মধ্যে বনমালীকে নিয়ে গোপন জটিল দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। পরী তার উদ্বিগ্ন, চঞ্চল যৌবনধর্ম দিয়ে বনমালীকে এমনভাবে ঘিরে রাখে, প্রৌঢ়া চারু বনমালীর কাছে যাওয়ার সুযোগই পায় না। বনমালীর ঘরে পরীর চলে নৈশ গোপন অভিসার। মধ্যবয়সী বনমালীও সে অভিসারে নিজেকে ধরা দেয়। এক বাদল রাতে একেবারে প্রত্যক্ষভাবেই চারুর চোখে পড়ে তা। ক্রমশ নিজের সন্তান ভুবনের অধিকার হারাবার ভয় জাগে। সেই সঙ্গে যৌবন বয়সে বনমালীর ভালোবাসার আগ্রহকে তার নিজের দিক থেকে উপেক্ষায়, উদাসীনতায় হারানোর সেই পুরনো ব্যথাও জাগে। বিধবা বোন পরীর বনমালীর প্রতি আকর্ষণে তার বিস্ময় আর সরে না। অনেক ভেবেচিন্তে চারু পরীকে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দেওয়ার ফন্দিতে শেষে তারকেশ্বর থেকে আনা কলেরার জীবাণু মেশানো পাত্রে পরীকে প্রসাদ খাওয়াতে গিয়ে কিছুদিন পরে নিজেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

এবার গল্পের চরম সিদ্ধান্তের দিকে কাহিনী একমুখিন হয় পরী ও বনমালীর সম্পর্কের

তীব্র টানা-পোড়েনে। চারু নেই, কিন্তু মধ্যে আছে চারুর আঠারো বছরের অবোধ সন্তান ভুবন। পরীর কাছ থেকে বনমালী দূরে সরে যায়, চারুর মৃত্যুর পর থেকে পরীর ঘরে দিনে রাতে একবারও আর যায় না। পরীর ছেলেকে বনমালীর ক্ষণস্থায়ী স্নেহ করার মতো মানসিকতায় পরী ভয় পায়। নানাভাবে বনমালীকে সে কাছে আনার চেষ্টা করে। নানা ছল, কৌশল, কান্না। কিন্তু প্রথম বয়সের নেশায় প্রতিভাময়ী, বুদ্ধিমতী চারু আর বাইরের রূপ ও দেহসর্বস্ব বিধবা যুবতী পরীর তফাত বনমালীর কাছে প্রকট। বনমালী হয় স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যে সংযত, নির্মম, নিরাসক্ত। সে ভুবনকে নিয়ে বেশি ভাবে। ভুবনও অনেক বেশি অনুগত হয়ে ওঠে বনমালীর। অস্বাভাবিক মোটা চেহারার ভুবনের সরল নিষ্পাপ বুদ্ধি ও চেতনার মধ্যে, মাতৃবিয়োগ ব্যথার ক্রমিক জাগরণে বনমালীর অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়। নিরাসক্ত, নিস্পৃহ বনমালীর মন ভুবনের জন্যই কোমল হয়। পরীর সামনেই শ্যামবাজারের একটি ছোট বাড়ি ভুবনের নামে লিখে দেবার কথা বলে ভুবনকে। কোনো নির্দিষ্ট বাড়ির কথা উল্লেখ করেনি অবশ্য বনমালী সেদিন পরীর সামনে। তাই পরীর সন্দেহ হয় তাদের সম্প্রতি বাস করা বাড়িটাই ভুবনকে দেবে বনমালী। রাগে, ক্ষোভে, জ্বালায়, ঈর্ষায় পরী নিজের ছেলের গলা টিপে মারার চেষ্টা করে; তার ছেলের অস্বাভাবিক শরীরের ক্ষতের দায় চাপায় বনমালীর ওপর পদ্ম-ঝির সামনেই। শেষে বনমালীর মা হেমলতার অসুখে বনমালীর ব্যস্ত থাকার সুযোগে এক দুপুরে ভুবনকে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বের গাড়িতে তুলে দেয়। তাকে প্রায় এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বনমালী পরীর ষড়যন্ত্র ধরতে পারে। নির্বিকার থেকেই এই বাড়িতেই পরীর বাস করার ব্যবস্থা করে নীচের তলায় ঝি-দের পাশের অন্য আশ্রিতাদের মতো স্যাঁতসেঁতে একটি ঘরে। শেষে একদিন বনমালীর মা ভুবনের খোঁজখবর নিতে বললে বনমালীর নির্মম নিরাসক্ত উত্তর হল এমন, — আপদের বিদায়েই শান্তি।

এর পর গল্পের কাহিনী অংশ এবং গল্পেরও শেষচিত্র দুটি বাক্যের ব্যঞ্জনাগর্ভ মূল লক্ষ্যকেন্দ্রিক ব্যঞ্জনায়। প্রথমে অবশ্যই মনে রাখা দরকার, গল্প-কাহিনীর মূল লক্ষ্য দুই বোনের বিপরীত প্রান্তীয় লোভ-লালসা জনিত দ্বন্দ্বের ব্যর্থতার দিক নয়, নয় বিষয়-সম্পত্তি নির্ভর দ্বন্দ্বের আদ্যন্ত বিস্তারের চমৎকৃতি। যেটুকু টানা কাহিনী আছে গল্পে, তার অধিতলে অনেকটাই under current-এর মতো আছে গল্পকারের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য, যা গল্পেরও মূল বিষয়— আধুনিক সভ্য মধ্যবিত্ত মানুষের মনোলোকের গভীরে জটিল মনস্তত্ত্বসম্মত আদিম, বীভৎস পাশব প্রবৃত্তির স্বরূপ উদঘাটন। গল্পের কাহিনী ও ঘটনানির্ভর প্লট হল সেই বিষয়ের ধারণ-উপযোগী কঙ্কালের মতো কাঠামো, চরিত্র হল সেই কাঠামোর ওপরে চাপানো মেদ-মাংস-মজ্জা, আর লেখকের মনস্তাত্ত্বিক আদিম জীবন-স্বভাবের প্রতিরূপ বিষয়টি রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ সঞ্চারিত মানবদেহের লাবণ্যের মতো। গল্পের প্লটবৃত্ত স্পষ্টভাবেই একটি কাহিনীকে আশ্রয় করে, ঘটনার মালা দিয়ে সাজানো জটিল শিল্প-অস্তিত্ব। প্লটের স্বভাবে কাহিনীর তিনটি খণ্ডাংশ— ক. চারু-বনমালী সম্পর্ক

প্রসঙ্গ, খ. চারু-বনমালী-পরী—ত্রিকোণ প্রেমের স্বভাব বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত কাহিনীভাগ, গ. বনমালী-পরীর অন্তিম কাহিনী।

এমন কাহিনীভাগগুলির মধ্যে এক-একটি শক্ত গ্রন্থির যোগ-এর স্বভাব এনেছে পরীর বৈধব্য যোগ ও চারুর বাড়ি আগমন ঘটনা, চারুর কলেরায় মৃত্যু, ভুবনকে পরীর বোম্বে পাঠানোর প্রয়াস, পরীকে বনমালীর নীচের ঘরের আশ্রিতাদের পাশে পাঠানো। প্লটবৃত্তে কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে এগুলিই মূলত গল্পের ওপরের অবয়বকে নির্মাণ করে। ভিতরের স্বভাবে রক্তিম হয় চারু-বনমালী-পরীর কুটিল মানসিকতার জটিল দ্বন্দ্ব, মনের গভীর গোপন আদিম পাশব প্রবৃত্তির ক্রূর কঠিন লীলা। গল্পকার এমনভাবে কাহিনী বয়ন করেছেন, যার সর্বশেষ সিদ্ধান্তে রুদ্ধশ্বাস পরিণতি চিত্রে নিঃসঙ্গ একা হয়েছে গল্পের নায়ক বনমালী। তার সংসার সম্বন্ধে নিস্পৃহতা, কঠিন নিরাসক্তি আদিম সরীসৃপ জাতীয় জীবনের ভয়াল চাপা কালো শ্বাসের শব্দ শোনায়।

কাহিনীর মধ্যে প্লটের জটিলতার ফাঁকে ফাঁকে রোমাঞ্চকর পরিবেশ তৈরি হতে পারত, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য ও মনস্তত্ত্বের বাস্তব সত্যের স্বভাবে তা হয়নি। 'সরীসৃপ' গল্পের প্লটের বাঁধুনি তাই তারাশঙ্করের একাধিক ঘটনানির্ভর গল্পের মতো শিথিল হয়নি। 'সরীসৃপ' গল্পের প্লট প্রত্যেকটি মোড় ফেরানোর জটিলতায় চরিত্র-ন্যায়কে কঠিনভাবে মেনে তৈরি হয়েছে বলেই প্লটের বিন্যাসে আছে শিল্পের যথার্থ ন্যায়। তাই শুধু কাহিনীবয়ন নয়, শুধু চরিত্রের ভিড়ের দিক নয়, এর যে বড় গল্পের শিল্প-আভিজাত্য, তা এর অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিকতার সুষমা পায়।

স্পষ্টত ত্রিকোণ প্রেমের বন্ধন আছে এর প্লটে, কিন্তু তিন চরিত্রের এমন অদ্ভুত তিন মেরুগামী স্বভাব উঠে আসে চরিত্রের অভ্যন্তর থেকে, যা ত্রিভুজের কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল দেখায় না। তিন মানুষই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেনবা ভিতর স্বভাবে এক-একটি নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপ! চারুর মৃত্যু, পরীর অভিজাত জীবনস্তর থেকে নিম্নস্তরের জীবনে পতন, বনমালীর কঠিন নির্মম নিস্পৃহ মনে স্থির হওয়া— তিনটি বিষয়ই সেই টানাপোড়েনের নিয়তির খেলায় এক গভীর শূন্যতাকে দেখায়। সেই শূন্যতার মধ্যে তিন চরিত্রই পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। গল্পের প্লটবৃত্ত এই অনন্বয়েই বৃত্তের কেন্দ্রটিকে চিহ্নিত করে দেয়।

'সরীসৃপ' গল্প অবশ্যই মনস্তাত্ত্বিক গল্পের শ্রেণীতে পড়ে। আদিমতম প্রবৃত্তির সরীসৃপরাই সর্বকালের মানুষের মনের জগতের বিষাক্ত ভাইরাস। সেই ভাইরাসের ভয়াল মিশ্রণেই সভ্য মানুষের মনে বিকৃতি আসে। এমন বিকৃতির গল্প 'সরীসৃপ'। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভ্য মানুষের বিকৃত মনের গল্প উপহার দিয়েছেন। বিকৃত মনের পরিচয় পরীর মনেই প্রকট। বিকারের ঘোরেই সে ভুবনকে বোম্বে পাঠিয়ে দেয় নিজে উপস্থিত থেকে। গল্পের যে 'চরমক্ষণ', তার পরিচয় দুদিক থেকে দুরকম জায়গায় চিহ্নিত করা যায়। নিছক কাহিনীর দিক থেকে ধরলে চরমক্ষণের শীর্ষবিন্দুর শুরু পরীর সামনে ভুবনকে বনমালীর বাড়ি দান করার প্রসঙ্গের পর পরীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রথম আরম্ভে, শেষ নিজের ছেলের গলা টিপে মারার প্রয়াসে ও পদ্মর কাছে

মিথ্যা কৈফিয়ত দানের চিত্রে। এর পরেই পরী ভুবনকে বোম্বে পাঠানোর ফন্দি করে। কিন্তু গল্পে নায়ক বনমালীর চরিত্র ও মানসিকতার বিবর্তন ধরে 'মহামুহূর্তে'র জায়গাটি নির্দিষ্ট হয় পরীকে বলা বনমালীর শেষ কথায় :

> 'এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নীচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।'

দুই

'সরীসৃপ' গল্পের বড় সম্পদ এর তিন চরিত্র— বনমালী, চারু ও পরী। এই তিনের মধ্যে বনমালী সবচেয়ে সার্থক নায়ক, পুরুষ চরিত্র। লক্ষণীয়, সমগ্র গল্পে তিন চরিত্রই গভীরতর অর্থে নিঃসঙ্গ। বনমালী অবিবাহিত, মধ্যবয়সী, চারু বিধবা, সন্তান জড়বুদ্ধি হওয়ায় সে একা। পরী বিধবা হওয়ার পর, শ্বশুরবাড়ির শ্বশুরের প্রবঞ্চনার নিষ্ঠুর শিকার হয়ে ক'মাসের শিশুসন্তান নিয়ে একা। এই তিন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যে মনের আদিম প্রবৃত্তির কঠিন ক্রূর দ্বন্দ্ব এবং তার উৎকট প্রকাশ— তারই মধ্যে চরিত্রগুলির ভিতরের জীবন্ত পঙ্কিল রূপ পাঠকের সামনে আসে।

বনমালী এক রক্তমাংসের বিস্ময়কর জটিল চরিত্র। সে কম কথার মানুষ, গম্ভীর। তার কঠিন ব্যক্তিত্বের প্রয়োগ তার ভিতরের প্রাণ-স্বভাবকে অভিনবত্বে চিহ্নিত করে দেয়। বনমালীর মনের গঠনে গল্পকার চরিত্র-ন্যায় ও শিল্প-ন্যায় দুইকে চমৎকার রক্ষা করেছেন গোপন ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বজায় রেখে। একালের কোনো কোনো সমালোচক চরিত্রটির ভিতরের ন্যায় ও শক্তিকে আদৌ বুঝতে না পেরে তাকে বলেছেন 'স্বার্থপর, মতলববাজ, কুটিল এবং আত্মসর্বস্ব'। এমন সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যায় চরিত্রটির প্রতি এবং একজন সচেতন প্রতিভাবান লেখকের প্রতিও অন্যায় করা হয়। তার ব্যবহারের ভালোমন্দ দিয়ে অবশ্যই আমরা গতানুগতিক চরিত্র আলোচনায় যাচ্ছি না।

আমাদের মতে, বনমালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তৃতীয় দশকের জটিল প্রেক্ষাপটে বসানো এক অলস, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত যুবক, যার তরতাজা কিশোর কালের শিক্ষা সমাজের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মতো এক পচনের প্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে। সেই প্রেক্ষিতের শিক্ষা তার মনে তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। তার রোমান্টিক প্রেমতপ্ত মনের বাধা হয় চারুর উদাসীনতা, তার বনমালীকে নিয়ে খেলা করার মনোভাব। উনিশ শতকীয় অলস-বিলাসের অভিশপ্ত বাবু-কালচার দিয়ে গড়া বনমালীর পনেরো বছরের কিশোর জীবনের অভিজ্ঞতা। উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত পায়রা-ওড়ানোর বিলাসী বাবুরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আওতায় থেকে তাদের বিবাহিত জীবনেও রক্ষিতা পোষার গর্ব করত। রাতে বাগানবাড়ি যাবার আগে স্ত্রীকে সামলানোর জন্য একজন কর্মচারী বা ভৃত্যকে স্ত্রীর দরজার সামনে পাহারাদার রেখে বাগানবাড়ির রক্ষিতা ও বাঈজি নিয়ে রাত কাটাত। ফিরত ভোরে। বনমালীর নারী সম্পর্কিত উদাসীন অভিজ্ঞতা অর্জন সেখান থেকেই।

বনমালীর স্বভাব বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

'অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোন স্তরই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুতগতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়া লয়। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনি অধীর। স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক জীবনের রসবস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।'

সাময়িক ভালো লাগায় এবং অতীত যৌবন বয়সের চারুর স্মৃতি পরীর বিধবা রূপের মধ্যে চকিত হওয়ায় বনমালী পরীকে নিয়ে মাতে, কিন্তু বেশিদিন সেই মত্ততা থাকে না। চারুর প্রতি অতীত চাপা প্রেম এবং চারুর মৃত্যুর পর জড়বুদ্ধি ভুবনের জন্য এক দাযিত্ববোধ তাকে পরীর সান্নিধ্যকে উপেক্ষা করতে শেখায়।

অথচ বনমালীর সচেতন মনে চারুর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ দেখা দিলেও তা যে চারুর খেলা করার মনোভাব, অর্থের দম্ভ ও আভিজাত্য, চারুর দিক থেকে ভালোবাসা গ্রহণে অনীহা, উপেক্ষা ও উদাসীনতা— বনমালীর বর্তমান মানসিকতার অনুপন্থী বিভাব হয়ে ওঠে। সমগ্র গল্পে নারী সম্পর্কে বনমালীর যে নিরাসক্তি, নিস্পৃহতা, তা কিশোর জীবন-অভিজ্ঞতারই ফল। চারুকে সে সত্যিই ভালোবাসতে চাইত বলেই প্রৌঢ় প্রতিভাময়ী চারুর প্রতি কোনো বিরূপ ব্যবহার করেনি অবিবাহিত মধ্যবয়সে এসে :

'চারু তার প্রথম বয়সের নেশা; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভ সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারী-মনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে, চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহমন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে লইয়া খেলা করিত; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তাহার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে সেই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য বস্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মবিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।'

রূপসর্বস্ব বুদ্ধিহীন যুবতী পরীর প্রতি তার যে আকর্ষণ তা সেই নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মনের অধিতল থেকে উঠে আসে। তাই তার পরীকে নিয়ে প্রাথমিক সক্রিয়তায় লাম্পট্য নেই। সে আত্মসচেতন বলেই তার এক জটিল মনের পরিচয় মেলে চারুর মৃত্যুর পর হেমলতার অস্থিত চিত্ত পরীকে কোথাও পাঠানোর প্রস্তাবে তাকে বাড়িতেই থাকার সিদ্ধান্ত জানানোর মধ্যে :

'পরীকে সে এখন অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল তাবোল নাচ দেখতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।'

বস্তুত পরীর স্বভাবের স্থূলতা, সীমা বনমালীর অবিবাহিত মধ্য বয়সের অতৃপ্তিকে মেটাতে অক্ষম :

'বনমালীর পাক খাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না।

> তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না।'

চারুর ছেলে ভুবনকে নিয়ে পরীর যে নগ্ন, পাশব নির্দয় মনোবৃত্তির জাগরণ, বনমালীর কাছে সহনাতীত।

চারুর প্রৌঢ় জীবনের অভিজ্ঞতার চোখে বনমালীর ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা এইরকম :

> 'মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কী কারণে মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনও কোনো আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তার নৈকট্যকে, তার নির্বাব আবেদনকে, তার দুচোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তাহার হিসাব হয় না।'

বনমালী চরিত্র প্রসঙ্গের প্রথমেই বলেছি, কিশোর জীবনের অভিজ্ঞতা বনমালীর মধ্যেকার নারী সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে যাচাই করার শক্তি দেয়। গল্পে প্রথম জীবনে চারু যে সমস্যা সৃষ্টি করে তার মনে, পরে পরী, শেষে ভুবনের বোম্বে চলে যাওয়ার মতো ঘটনা— এই সমস্ত স্তরকে বনমালীর মনের দিক থেকে অতিক্রম করা দুরূহ হয়নি। চারুর মৃত্যুর পর চারুর জন্য পরীর শোক কৃত্রিম, বিরক্তিকর সচেতন বনমালীর কাছে। কিন্তু ভুবনের যে মায়ের জন্য কান্না, তা বনমালীর মতো নায়কের চিত্তকে এক এক সময় আর্দ্র করে :

> 'চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।'

যৌবন বয়সের ধর্মে চারুর প্রতি আকর্ষণে বনমালীর ছিল এক অন্তঃশীল প্রেমভাবনা। প্রৌঢ় বয়সে চারুর দায় ও নির্ভরতাকে তারই সূত্রে বনমালী ভিতর থেকে অস্বীকার করতে পারেনি। বনমালী চারুকে কোনোদিন পায়নি, তার মৃত্যুর পর ভুবনের প্রতি আছে নিস্পৃহ কর্তব্যবোধ, তা মমত্ববোধের সস্তা সেন্টিমেন্ট নয়। নির্বিকার বনমালীর এই যে মনোভঙ্গি তা ক্ষণস্থায়ী হলেও, তার মানবিক বোধের জাগরণ প্রমাণ করে। অথচ এই বনমালীই তার মায়ের সামনে ভুবনের নিরুদ্দেশ যাত্রাকে 'আপদ বিদায় হওয়ার শান্তি' বলতে নির্দ্বিধ হয়। বনমালীর পুরুষ সত্তায় তার জীবন সম্পর্কিত ঔদাসীন্য ও নির্বিকারত্বের মধ্যে বজায় আছে দুই মেরুস্বভাবে মানবিক সত্তা ও অবলীলায় সবকিছু ত্যাগের বাসনালোক। আসলে বনমালীর মনের গভীরে কৈশোর ও যুবক-প্রাণ ছুঁয়ে প্রেমজীবনের যে সক্রিয়তা, তার অতৃপ্তি তাকে সংসার বাঁধার মতো বিবাহে যেমন বিমুখ করেছে, তেমনি মানবিক আচরণের সামান্য প্রকাশেও তার অবলোপকে সমর্থন জানিয়েছে। বনমালী প্রেমিক, কিন্তু জীবন স্বভাবে নিঃসঙ্গ এক সন্ন্যাসী— বিষয়সম্পত্তির প্রয়োজন ও লোভেও, তার স্বভাবসিদ্ধ উদাসীনতাতেও।

কোনো কোনো সমালোচকের মনে হয়েছে 'বনমালীর মতো হৃদয়হীন পাষণ্ড বড় একটা

দেখা যায় না।' এমন বিচারের ভ্রান্তি বস্তুত চরিত্রটির ভিতরের গঠন ও শক্তিকে আদৌ না বুঝতে পারার কারণেই সম্ভব হয়েছে। গতানুগতিক গল্পপাঠক-সমালোচকরা বোঝেননি মানিকবাবুর বনমালীর মতো পুরুষ চরিত্র সৃষ্টির শিল্পন্যায়কে। মানিকবাবুর হাতে বনমালী এক বিশ শতকীয় বৈজ্ঞানিক আধুনিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। আগে যে যুক্তি আছে পুনরুক্তি হলেও জানাই, কৈশোর-যৌবনে তার যে চারুর প্রতি ভালোবাসাবোধ তা ক্রমশ ব্যর্থতার কারণে মধ্যবয়সে এসে নির্বিকার ঔদাসীন্যে গেরুয়া হয়ে ওঠে। চারুর প্রৌঢ়ত্বে তা তার প্রতি মন্থর দায়িত্ব নির্বিকার পালনেই স্থির হয়ে যায়। তার ছেলের প্রতি শেষ যে দায়-বোধ ও দায়বদ্ধতা, তা-ই তাকে করে আধুনিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পে ছিল নারীর প্রেম থেকে উদাসীনতা পেয়ে কোনো পুরুষ নায়ক পরে তার পুত্র বা কন্যার প্রতি গভীর আবেগে ও সেন্টিমেন্টে সারাজীবন আত্মদানের সর্বস্বতায় নিজেকে নিঃশেষ করে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাত। বনমালীর সে গতানুগতিক শিক্ষা নেই। ভুবনকে শ্যামবাজারের একটি বাড়ি দিয়ে তার দায় থেকে সামান্য মুক্তিই চেয়েছে সে। যখন ভুবন বোম্বের পথে নিরুদ্দেশ, তখন তার সেই প্রয়োজনটুকুও আর না থাকায় একেবারেই নির্বিকার শূন্যমনের মানুষ বনমালী। এমন যে মন, এই শূন্য মনেই বনমালী পূর্বপ্রকাশিত ছোটগল্পের সমস্ত প্রেমিক-নায়ক-ভাবনা থেকে বিশ শতকীয় আধুনিক ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবী। বনমালী বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক নতুন নায়ক।

'সরীসৃপ' গল্পে চারুর দৈহিক মৃত্যু ঘটেছে গল্পের ঠিক মাঝখানে। তার পরেও গল্পের যে বিস্তারিত পরিণামী অংশ— সেখানে চারুর প্রতিনিধি ভুবন আছে। তাই চারুর অন্তর্ধান পরিণামে পরী ও বনমালীকে বুঝতে ও বোঝাতে অসুবিধের সৃষ্টি করেনি। গল্পের শুরুতেই চারুর প্রৌঢ় জীবনের সঙ্গে শ্রান্তি, ক্লান্তি, ভীরুতা জড়ানো। উন্মাদ স্বামী স্বর্গত, সন্তান জড়বুদ্ধি— এমন ভাগ্য নিয়ে যে মধ্যবয়সী বনমালীর দয়ায় বিক্রি হয়ে যাওয়া নিজেরই শহরতলির বাড়িতে আশ্রিতা। অথচ সে প্রতিভাময়ী, বুদ্ধিমতী। অতি সূক্ষ্ম বোধ ও মন নিয়ে বনমালীর সঙ্গে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা বজায় রাখে। সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনে সে ঠাণ্ডা মাথায় তার থেকে দু'বছরের ছোট বনমালীর প্রেমের তাপ অনুভব করেও খেলার ছলে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এইসব অতীত নিয়ে চারুর সঙ্গে বনমালীকে কেন্দ্র করে পরীর সঙ্গে বাধে তীব্র দ্বন্দ্ব।

পরী বিধবা হয়ে ক'মাসের ছেলে নিয়ে চারুর কাছে স্থায়ীভাবে থাকতে এলেই জটিলতা তৈরি হতে থাকে চারুর মধ্যে। চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া চারুর গল্পের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন গল্পকার। তার পুরনো ব্যক্তিত্বের ঘটে জাগরণ। চারু তার এই দীন জীবনের শিক্ষায় যে কোনো দিকে অন্ধ আবেগশূন্য। সে পরীর সমস্তরকম নীতিহীন জৈব আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়, কলেরার জীবাণু দিয়ে তাকে মেরে ফেলতেও নিষ্কুণ্ঠ! পরিণামে তারই মৃত্যু। প্রৌঢ়া চারুর এই যে তৎপরতা তার মূলে তার জড়বুদ্ধি পুত্রের জন্য এক আবেগহীন দায়িত্ব পালনের বাসনা।

গল্পকার চারুকে দিয়ে 'সরীসৃপ' গল্পের অন্তর্নিহিত সেই আদিম ক্লেদাক্ত বৃত্তির

বিষয়টিকে শিল্পের ন্যায়ে একদিক থেকে প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছেন। তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র ভুবনকে নিয়ে পরী ও বনমালীর যে প্রবল মানসিক সংঘর্ষ-সংকট, নির্বিকার বনমালীর নিজের মতো করে সংকট মুক্তি, তার মূলে আছে চারুর প্রতি বনমালীর সেই অতীত প্রেমাকর্ষণের হতাশ-খিন্ন অবশিষ্ট ক্লান্ত, বিষণ্ণ উত্তাপ! চারুর স্বভাবে যে সরীসৃপ জাতীয় জীবস্বভাবের উদ্ভব, ধীরস্থির নড়াচড়া ও শেষে তার তীব্রতম প্রকাশ, তা তার সমস্ত প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধির জগৎ ও বোধকে ঢেকে দেয়।

পরী চরিত্র গল্পের মধ্যে তার পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে যেমন অসম্ভব বেপরোয়া স্বভাবে পাঁকে নিমজ্জিত করেছে নিজেকে, তেমনি উগ্র, উৎকট যৌনতা দিয়ে বনমালীকে নির্জীব করতে গিয়ে ব্যর্থতার কান্নাকে গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। যৌনতা, বিকৃতি চারুর স্বভাবে ছিল না, পরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চারুর মধ্যে থেকে যে বিকৃত মনের পরিচয় মেলে— অবশ্যই প্রৌঢ় বয়সের কোনো যৌনকামনায় নয়, মানসিক অসহায়তার উৎকট, বীভৎস ঈর্ষার স্বভাবেই তার প্রকাশ। অকৃত্রিম স্বার্থসর্বস্ব ভাবনায়, রাগে, ক্রোধে পরীর হৃদয়-স্বভাব হয় কৃত্রিম। বনমালীর উগ্র আবেগময় ভালোবাসার বিবর্ণ রূপে সে হতাশ, ক্রমশ ক্লান্ত হয়। পরীর যে যৌন আচার-আচরণ, তার সঙ্গে যুক্ত হয় চরম ঈর্ষা ভুবনের প্রতি বনমালীর পক্ষপাতিত্বের কারণে। ঈর্ষা যে কত বীভৎস হতে পারে, পরী তার জ্বলন্ত উদাহরণ। চারুর দিক থেকে নিজের বোন পরীর মৃত্যুকামনা ও তার প্রস্তুতিচিত্রও সেসবেরই আর এক রুদ্ধশ্বাস দৃষ্টান্ত।

বনমালীর ক্রমশ শীতল ব্যবহার, উপেক্ষা ও উদাসীনতা এবং নির্বিকারত্ব মনস্তত্ত্বের জটিল স্বভাবেই পরীকে নানাভাবে তীরবিদ্ধ করে। বনমালীকে হারিয়ে পরী সর্বনাশা পথ নেয় ভুবনকে বোম্বে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো এক ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত গ্রহণে। এখানেও পরীর মনে কাজ করে নিজ পুত্রের ও জীবনের নিবাপত্তার স্থির দিক। পরীর মনের সরীসৃপ স্বভাব শ্বাপদের মতো তাকে অস্থির, চঞ্চল, হিংস্র করে। পরী চরিত্রের পতনের চিত্র দিয়েই গল্পের শেষ। সে চিত্রের সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নির্বিকার নির্মম রূপ-রচয়িতা ও দর্শক কঠিন বনমালী স্বয়ং। বনমালীর চরিত্র-ন্যায়ে তা সঠিক।

যৌনতা ও জটিল মনস্তত্ত্ব 'সরীসৃপ' গল্পের বিষয়ের ভিতরের শক্তি। তা দিয়ে গল্পকার নিজের লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনটি প্রধান চরিত্রের আধারে। চরিত্রগুলি কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রতীকী স্বভাব পায়নি, তারা হয়েছে আধুনিক সভ্যতার মাপে জীবন্ত মানুষ। সভ্য মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত মানুষগুলির সরীসৃপ স্বভাব তাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক চলাফেরায়, কথাবার্তায় ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় গল্পকারের যথার্থ বাস্তবতার স্বরূপকে শিল্পভিত্তি দিয়েছে। গল্পকারের নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শক্তি ও জীবন বিচার চরিত্রগুলির মূলে সক্রিয়।

তিন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই তাঁর দেশ ও কাল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-মধ্যবর্তী যে সামাজিক-

অর্থনৈতিক কাঠামো, ফ্রয়েড নির্ভর যে শিল্প-সাহিত্যে বিষয়ের প্রসার— তা থেকেই উঠে আসে 'সরীসৃপ' গল্পের লেখকের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। 'পয়োমুখম্' ইত্যাদি একাধিক গল্পে জগদীশ গুপ্ত 'কল্লোলে'র প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত মানুষের অবচেতন মনের ক্লেদাক্ত, বীভৎস জগৎকে নির্ভীক নিরাসক্তিতে আমাদের সামনে এনেছেন। সেই দেখায় যে জীবন, জগৎ ও মানুষ সম্পর্কিত বাস্তবতা, তার সারবত্তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শনে অ-দৃশ্য নয়। উত্তরকালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে সেই অন্ধকার জীবনকে অনুসন্ধানে সমান নিবিষ্ট থেকেছেন। অবশ্যই জীবন-বাস্তবতার এমন রূঢ়, রুদ্ধশ্বাস দিকগুলি যৌনচেতনায় তিন লেখক প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বতন্ত্র বিশ্বাসে ও দর্শনে রূপ দিয়েছেন।

বনমালীর মতো অবিবাহিত মধ্যবয়সী পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই বোনের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যে মনের জগতের উন্মোচন— তা যৌনবিকৃতির পশুসুলভ দিকের পোষকতা করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সভ্য মানুষের মনের গভীর থেকে এসব বৃত্তির যে প্রকাশ হওয়া, তা সভ্যতার নির্মোকে মানব চরিত্রের নিষ্ঠুর বৈপরীত্যকে দেখায়। নিজের বোনকে কলেরার জীবাণুর স্পর্শ দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা, পরীর নিজের পুত্রের পাশেই দিদির জড়বুদ্ধিপুত্রকে নির্দ্বিধায় ও চাপা ঈর্ষায় বোম্বের দিকে পাঠানোর মধ্যে যে পঙ্কিল মনের সক্রিয়তা— তা সভ্য জগতের স্বভাবে আবৃত মানব মনেরই আদিম পশুত্বের দিক। নায়ক বনমালীর মধ্যে থেকেও তার সহজ আবেগ-অনুভূতির ঘটেছে ক্রমিক নির্বাসন। তারা যে মানুষ, তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় নিরাসক্তি, নির্বিকারত্ব, পরীকে নীচের তলায় পাঠিয়ে নিরুদ্দিষ্ট ভুবনকে শেষে আপদ বিদায় হওয়ার উপকরণ ভাবা— সবই এক নিঃসঙ্গ, সিনিক মানুষের চরিত্রের বসকষহীন মনেব দিক দেখায়।

আসলে, 'সরীসৃপ' গল্পেব মধ্যে গল্পকারের জীবনকে দেখার দৃষ্টি তাঁর এই সময়ের বিশেষ মানব তথা জীবনদৃষ্টির অনুগ থাকে। মানুষের জটিল মন ও সম্পর্কের যৌনতা যে কত হিংস্র করে, আদিম কবে তোলে মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার সভ্য সম্পর্ককে, 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে তার একদিক দেখানো হয়েছে, 'সরীসৃপ' গল্পে অন্যদিক। ভিখুর পক্ষে ঘুমন্ত বসিরের মাথায় লোহার শিক ঢুকিয়ে পাঁচীকে অধিকার করার মধ্যে আছে অলিখিত অমার্জিত, পঙ্কিলতম জীবনে অভ্যস্ত মানুষেব অন্ধ যৌন-আকাঙ্ক্ষার আদিম রূপ। 'সরীসৃপ' গল্পে তারই বিপরীত দিক। এখানে পশুবৃত্তির জাগরণ ভদ্র, সভ্য বেশে মানুষের জীবন-স্বভাবেরই সূত্রে!

চরিত্র ও জীবন-বাস্তবতাকে নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই আছে গল্পটির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। সে সময়ে গল্পকার যা ভেবেছেন, তা তাঁর নিজস্ব কাল, সমাজ ও মানুষের জীবনধারণের ও যাপনের ন্যায় ধরেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়। মানুষ সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন করেন মার্কসবাদের জীবন ও সমাজমুখী শিক্ষার সীমায়। 'সরীসৃপ' গল্পের সব শেষে ব্যঞ্জনায় বনের পশুদের মধ্যে আধুনিক জীবনের অস্তিত্বের বৈপরীত্যকে বুঝতে চেয়েছেন। আধুনিক সভ্যতা মানবিক বোধকে সরিয়ে রেখে সরীসৃপ স্বভাবে বনের পশুর সভ্যতায় হারিয়ে যায়। গল্পের রুদ্ধশ্বাস ভয়াবহ পরিণতিতে গল্পকার নিজের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্যের প্রতীকী ভূমি দিয়েছেন সাংকেতিকতায়।

চার

'সরীসৃপ' গল্পের শুরু অবিবাহিত, মধ্যবয়সী, এক পাটের দালাল নায়ক বনমালীর বিষয়-সম্পত্তির লক্ষণীয় সমৃদ্ধির প্রসঙ্গ দিয়ে। তার এমন সমৃদ্ধির মধ্যে তার কৃতিত্বের থেকে তার যৌবন বয়সের কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকার, বর্তমানে গল্পের প্রৌঢ়া বিধবা নায়িকা চারুর শ্বশুরবাড়ি সূত্রে পাওয়া বিষয়-সম্পত্তির অধিকারও যুক্ত। শুরু এর খবরে, বিস্তার বনমালী ও চারুর মধ্যে নির্বিকার নিরাসক্ত সম্পর্কভাবনার টানাপোড়েন জাতীয় সংলাপচিত্র দিয়ে। গল্পের শেষ বনমালীর সেই নিষ্ঠুর নিরাসক্তি ও এক সেমি-সিনিক নিঃসঙ্গ মানবিকতার পরিচয়ে। তার পরেও লেখক স্বয়ং একটি সম্পূর্ণ সাংকেতিক ছোট অনুচ্ছেদ দিয়ে নিজের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে গল্পের সঙ্গে নাড়ির যোগে রেখেছেন :

> 'ঠিক সেই সময় মাথাব উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।'

এই ব্যঞ্জনাগর্ভ চিত্রে আছে সভ্য মানুষ ও বনের পশুর সম্পর্কের এক গভীর বৈপরীত্যের বিস্ময়। এই বৈপরীত্যের দিক তুলে ধরে সভ্যতার দ্রুতগামী স্বভাবের প্রতীক এরোপ্লেন।

শুরু থেকে শেষের মধ্যে গল্পটির যে প্রকরণগত নিখুঁত রূপ, তাতে অবশ্যই আছে গল্পকারের দিক থেকে গল্পটির ভাবগত একমুখিতা রক্ষার প্রয়াস। গল্পটিতে অবশ্যই আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু তা মূল ভাবের কেন্দ্র থেকে এতটুকু অনাবশ্যকতায় বর্জিত হবার যোগ্য নয়। আকারে যে বড় গল্পের বিস্তার, তা অবশ্যই আভ্যন্তরিক ছোটগল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণকে নিখুঁত সংযমেই সীমা দেওয়া! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় কিছু বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি চরিত্রগুলির ন্যায়েই তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগে একান্ত স্বাভাবিক। প্রথম পর্বের ছোটগল্পে গল্পকার তাঁর পূর্বসূরি কোনো কোনো গল্পকারের রীতি বিস্মৃত হননি, কিন্তু অবশ্যই সেই আনুগত্যে যে নিজস্বতা থেকেও সরে যাননি তিনি, 'সরীসৃপ' গল্পে বনমালী-চারু, চারু-বনমালী-পরী এবং পরী-বনমালী— এই তিন তরঙ্গের উপস্থাপনাগত সংযম তা সমর্থন করে।

গল্পে সামান্য যেটুকু আখ্যায়িকা আছে, তাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে চারুর মৃত্যুর ঘটনা। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চারুর পরীকে কলেরার জীবাণু দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা ও পরীর দিক থেকে ভুবনকে নিরুদ্দেশের দিকে পাঠানোর তৎপরতা— অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে একই। চারুর মৃত্যু আর পরীর একতলায় ঝি-চাকরদেরও নীচে নেমে-আসা এই দুটি দিকও গভীর তাৎপর্যে একই। মাঝখানে নায়ক বনমালী। তার চরিত্র-ন্যায় যা দিয়ে শুরু, তার স্বাভাবিক বিবর্তনেই— চারুর মৃত্যু, পরীর প্রতি ঔদাসীন্য, ভুবনের জন্য চিন্তা, পরীর ভুবনকে বোম্বে পাঠানো, পরীকে নীচের স্তরের মানুষদের মধ্যে নিক্ষেপ, শেষে বনমালীর সেমি-সিনিক নিঃসঙ্গতাকে স্বীকার করে নেওয়া— এইসব চমৎকার প্রকাশরীতিগত পরিকাঠামোকে দেখিয়ে দেয়। এসবেই গল্পের প্রকরণগত অসাধারণ শিল্পসৌন্দর্য।

কোনো কোনো সমালোচক 'সরীসৃপ' গল্পের অবয়বে নাটকীয় রীতির প্রয়োগকে লক্ষ্য

করেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঠন, যে শিল্পভাবনা, যে জীবন ব্যাখ্যা ও সমাজ-বাস্তবতাবোধ, তাতে প্রথানুগত বিষয়টাই রচনায় থাকে না। গল্পে একের পর এক সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে চরিত্রচিত্র রচিত হলেই তা নাটকীয় হবে— এ ধারণাই ভুল। চারুর পরীকে মেরে ফেলার প্রয়াস ও শেষে নিজের মৃত্যুবরণ, ভুবনকে বোম্বে পাঠানো, পরীর ঘরে বনমালীকে অস্বস্তিকর অবস্থায় চারুর এক শ্রাবণ রাতে দেখা— এসবই গল্পের তথাকথিত নাটকীয়তাকে প্রমাণ করে না। আসলে প্লটের জটিলতায় এ সমস্তই চরিত্র-ন্যায়ে ধরা, আরোপিত নয়। চারুর তারকেশ্বরে যাওয়া, রাত কাটানো, ফেরা, পরীকে প্রসাদ দেওয়া, চারুর মৃত্যু ঘটনার যে অংশ— তা সরীসৃপেরই ধীর নিশ্চিত শীতল চলা ও কোনো কিছু শিকারকে গ্রাস করার স্বভাবেরই প্রতিচিত্রণ। চারু বা পরী চরিত্রের অভ্যন্তরে সেই জাতীয় নাটকীয়তা নেই, আছে জটিল পশুবৃত্তিতে কঠিন মনের আলো-আঁধারি খেলা। সুতরাং 'সরীসৃপ' গল্পের শিল্পবিষয় কোনো ক্রমেই গতানুগতিক নাট্যরীতির সমর্থক হতে পারে না। বনমালীর শীতল নিস্পৃহ স্বভাবের একমুখিন স্বভাব, চারুর সম্পত্তি-আকাঙ্ক্ষা ও সভ্যমনের অভ্যন্তরের কুৎসিত ঈর্ষা, পরীর যৌবন বয়সের উদগ্র যৌনতা ও ঈর্ষা দিয়ে বনমালীর দেহসম্ভোগ, সম্পত্তিভোগ এবং নিজের ও পুত্রের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নিরাপত্তার ভাবনা, তার নিষ্ফলত্ব-আশঙ্কার হতাশা— সমস্তই সরীসৃপ স্বভাবে গল্পের প্রকাশরীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্যে ওতপ্রোত।

গল্পের চরিত্রে ও সংলাপে গল্পকারের ভাষাচিত্রের স্বভাব এনেছে চরিত্রগুলির মনের গহনলোকের। বিষয় ও ভাষা পরস্পর সহযোগী। গল্পে অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষ আছে চারুর স্বভাব বর্ণনায়। তাতেই গল্পের গদ্য ভাষায় আছে বৈচিত্র ও অনায়াস গতিময়তা। কোথাও কোথাও চরিত্রের চিন্তায় বা লেখকেরই দিক থেকে সৃষ্ট চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে আছে অভিজ্ঞতাদীপ্ত, মনস্তত্ত্ব-চকিত general statement-এর অনুগ বাক্যরীতি :

১. উহাদের শুদ্ধতা নিঃসম্পর্কীয়।

২. বক্তব্য সহজে দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

৩. আজকাল কোনো কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখি হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না।

৪. তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে একপরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

৫. কাঁকর বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দুটি কচি সবুজ গাছের শিষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাই-এর মতো তাদের দুটিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত!

৬. শরৎকালের ফাজিল মেঘের মতো চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

৭. মতলব থাকে। যে দিকে যে ভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

গল্পের গদ্যে এমন সব বাক্য ব্যবহারে চরিত্রের মনস্তত্ত্বের ও লেখকের উদ্দেশ্যের চমৎকার চিত্রধর্ম গল্পের প্রকাশরীতিতে সুষমা ও লাবণ্য মেশায়।

'সরীসৃপ' গল্পের অন্তিম অনুচ্ছেদ একটি সংকেতময় চিত্রে বিশিষ্ট। তা সমগ্র গল্পের লক্ষ্য। বনমালীর সর্বশেষ ভুবনের প্রসঙ্গ থেকে আপদ বিদায় হয়ে নিষ্পত্তি পাওয়ার মানসিকতা প্রকাশের পরেই এই চিত্র উপস্থাপিত। গল্পের শেষ চারু, পরী বা ভুবন প্রসঙ্গ দিয়ে নয়, নায়ক বনমালীর মানসিকতার সেমি-সিনিক ধর্মের পরিচয়ে। এরোপ্লেন দ্রুতগামী বর্তমান বিজ্ঞান-মার্জিত সভ্যতার প্রতিনিধি। তার সহায়তাতেই গল্পকার মানুষের সম্পর্কের অনন্বয়ে বনের পশুদের আশ্রয় আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। এর ব্যঞ্জনায় সুস্থ জীবনের আর্তি বা অন্বেষণ নেই, আছে সভ্য মানুষের মধ্যেকার সরীসৃপ বৃত্তির স্বরূপকে স্মরণ করানো। মানুষের মধ্যে যতই সভ্যতার পালিশ থাক, মূলে আছে সেই আদিম বৃত্তি। কিন্তু মানুষের আদিম বৃত্তি ও পশুদের আদিম বৃত্তির মধ্যে আছে মূলগত প্রভেদ। এরোপ্লেন সভ্য মানুষকে বনে পৌঁছিয়ে দেয় তার খোলস ঢাকা আদিম বৃত্তিসহ। কিন্তু বনেই ধরা পড়ে তার আদিম বৃত্তি কত নোংরা, নগ্ন, ঘৃণ্য সহজ সরল আদিম পশুবৃত্তির পাশে। বনের স্বাভাবিক পশুদের কাছে কৃত্রিম সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ যে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিতে কত ছোট, ঘৃণ্য, সরীসৃপ স্বভাবে কত ভয়াবহ, গল্পের অন্তিম প্রতীকী বিবরণে তারই ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রতিবিম্বন। এ চিত্র পাঠকদের মনে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আনে না, সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে গল্পশিল্পের ব্যঞ্জনায় এক নিস্পৃহ গৈরিক বর্ণে বিস্ময়ে ঢেকে দেয়। আর এই অনন্ত বিস্ময়ের মূলেই আছে 'সরীসৃপ' গল্পের পরিণামী শিল্পসম্পদ। গল্পের প্রকরণের দিক থেকে এখানেই এক সম্যক সমুন্নতি ও উচ্চ মহিমা।

পাঁচ

'সরীসৃপ' গল্পের নাম সভ্য মানব চরিত্রের স্বভাবের আনুকূল্য পায়। গল্পে কোথাও একটিও সরীসৃপ জাতীয় জীবের অস্তিত্ব নেই, নেই এমন শব্দের উল্লেখ। পাত্রপাত্রী সকলেই সভ্য সামাজিক মানুষ। তাদের দুটি বৃত্তির আন্তর-বৈপরীত্য বোঝাতেই এমন সরীসৃপের প্রতীক ব্যবহার করেছেন গল্পকার।

প্রথম কথা হল, বনমালীর যে আচরণ মনের অধিতলের স্বভাবে চারুর প্রতি— তা নীরব, কঠিন, শীতল ও নিরাসক্ত স্বভাবের অনুগ। বনমালী অতি সচেতনভাবেই চারুর সামনে নিজেকে রাখে, পরীর দিকে এগোয়, ভুবনকে নিয়ে ভাবে, নির্মমতায় এতটুকু ঘাটতি না দিয়ে পরীকে নিক্ষেপ করে নীচের তলার করুণায় উপেক্ষায় আশ্রিত মানুষদের পাশে। তার যে মন ও আচরণ— একজন কৃত্রিম সভ্যতার উপজাত ব্যক্তিত্বেরই অনুগ। বনমালীর আচরণ অনন্বয়কেই প্রশ্রয় দেয়। সে সন্ধির মধ্যে যায় না, সে সম্পর্কের মধ্যে আত্মসর্বস্বতাকে যত বেশি প্রাধান্য দেয়, অন্যদের ততটা মূল্য দেয় না। এটা— সভ্যতার যে মানব-বন্ধনের বাণী রচনা, তার পরিপন্থী একান্তই। এই অনন্বয়ী-স্বভাব মধ্যবিত্ত সংসারের সভ্যদের কাছে সরীসৃপের স্বভাবকেই প্রতীকী করে। নায়ক বনমালী, তাই সরীসৃপ এমন নাম তাৎপর্য পায়।

দ্বিতীয় দিকটি, নামের গভীর ব্যাখ্যার পক্ষে, চারু এবং পরী দুজনের দিক থেকেই বিচার্য। গোড়া থেকে চারু যেভাবে বিষয়-সম্পত্তির কথা ও ভাবনাকে বনমালীর সামনে মনের জটিলতায় উপস্থাপিত করে, তাতে সারল্য নেই, বিশ্বাস-অবিশ্বাসে যেন শীতকালীন সান্ধ্য ধোঁয়াশা জমাট হয়। এর পর পরী এলে তাতে আর এক মাত্রা যোগ হয়— তা ঈর্ষা। এই ঈর্ষার জঘন্য রূপ পরীকে মেরে ফেলার শীতল কঠিন গোপন পরিকল্পনায় ধরা পড়ে। ঈর্ষা স্বাভাবিক হয়ে আসে পরীর মধ্যেও। পরী ভুলে যায় তার সমস্ত রুচি ও শালীনতার সীমা। উগ্র অ-সভ্য যৌনতার ব্যবহার, দিদির প্রতি ঈর্ষার উগ্রতা, ভুবনের প্রতি অধিকার রক্ষা করতে না পারার জ্বালা, বনমালীর আচরণে ও ঔদাসীন্যে অসহনীয়তা— সমস্ত দিকগুলির মধ্যে যে আদিম পশুর আচরণ, তা সরীসৃপের মতোই স্বভাব পায়। এক অসুস্থ পরিবেশ তৈরি হয় যেনবা সরীসৃপের ধীরস্থির শ্বাস ফেলার শব্দের অভিশাপে। সমগ্র গল্পে তারই পরিবেশ ক্রমশ ঘনীভূত হওয়ায় গল্পের নাম মানব-স্বভাবের আদিম বৃত্তির ব্যঞ্জনাকে অসীম করে।

শেষে আর একটি যুক্তি রাখা যায়। সভ্য সমাজে সরীসৃপ জাতীয় জীব আচরণে বৈপরীত্যকেই প্রধান করে। মানব স্বভাবের কাছে তারা ভীত, পরাজিত, কোণঠাসা। তারা মানুষের কাছেই পলাতক। কিন্তু মানুষ স্বভাবে তাদের কাছে হার মানে। সভ্য মানুষেরই মনের অন্ধকার জগতে তারা আশ্রয় নেয়। মানুষই হয় সরীসৃপ। সভ্যতা তাদের স্বভাবে হয় তুচ্ছ আবরণমাত্র। এই শ্লেষাত্মক প্রয়োগ গল্পের বক্তব্য ধরে নামে থাকায় গল্পের এমন বিশেষ নাম শিল্প সার্থক।

৯.

শিল্পী

এক

ইংরেজি উনিশশো ছেচল্লিশে প্রথম প্রকাশ ঘটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' নামের গল্প সংকলনের। এই গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলির মোট সংখ্যা বারো। এই বারোটি গল্পের মধ্যে আলোচ্য 'শিল্পী' গল্পটির স্থান অষ্টম। মনে রাখা দরকার, এই গল্পটি যখন লেখেন গল্পকার, তখন তিনি একজন ভারতীয় সাম্যবাদী দলের সদস্য এবং পরিপূর্ণভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাসী কথাকার। আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ, বিপ্লব চেতনা, গণঅভ্যুত্থান, সমষ্টি মানুষের প্রতিবাদী মনোভঙ্গি, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন— এসবের ওপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বাস্তব ভাবনা যেমন সক্রিয়, তেমনি এই বিষয়গুলিকেই শিল্পী-মনের প্রতিক্রিয়ায় গল্প-উপন্যাসে প্রয়োগে ছিলেন বিশেষ সচেতন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ উনিশশো পঁয়তাল্লিশে, 'শিল্পী' গল্প সম্ভবত তেতাল্লিশের মধ্যের বা অব্যবহিত পরের রচনা। আকালের দিনের প্রসঙ্গ গল্পে আছে। তীব্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশীয় আন্দোলন, সাম্যবাদী রাজনীতির লক্ষণীয় তৎপরতা, গান্ধীজির বিয়াল্লিশের আন্দোলনের 'ভারত ছাড়ো'র এক বিস্ময়কর প্রতিবাদী বিশাল স্বভাবের

দিক— এসবই গল্পকারের মনে মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেতনার প্রয়োগমূলক ভাবনাকে ধরে রাখে। 'শিল্পী' গল্পে মদন তাঁতি ও তার গ্রামের প্রতিবেশী তাঁতি মানুষদের সমবেত ঐক্যচেতনার মূলে এমন সব বিষয়ের নির্যাস নিশ্চয়ই সক্রিয় ছিল, প্রেরণাও দিয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কসবাদের আন্তর্জাতিক মানবতার অন্তর্গূঢ় শিক্ষা।

'শিল্পী' গল্পটি তাই শুধুমাত্র একজন শিল্পীর সুস্থ ঐতিহ্য গড়া সত্যিকারের শিল্পের সম্মান বাঁচানোর মতো প্রতিবাদী আত্মসংযমের, সূক্ষ্ম তাঁতশিল্পের মান বাঁচাবার গল্প নয়, এর সঙ্গে সমান মাপে ও মাত্রায়, শক্তিতে ও বিশালতায় যুক্ত হয়েছে সর্বহারা এক গ্রামীণ শ্রমিক-মানুষদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা। গল্পটির রচনাকালের সময়ের সঙ্গে গল্পের বিষয় ও সিদ্ধান্তে অভূতপূর্ব মিল আমাদের বিস্ময় জাগায়, লেখকের প্রকরণ কৌশলকে নন্দিত করে। 'শিল্পী' গল্পটির মূল কথারম্ভ কোনো নিটোল কাহিনীর ধারাবাহিকতায় ধরা নেই, একমাত্র নায়ক চরিত্রকে কেন্দ্র করে পরিপার্শ্বের মানুষগুলির সংক্ষিপ্ত স্বভাবের যথাযথ প্রতিচিত্রণে একটি আঁটসাঁট বিষয়ই পাঠকদের সামনে আসে। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে এক প্রায়-সর্বহারা তাঁতি মদন। গল্পের শুরু এক শীতের সকালে গল্পের নায়ক মদন তাঁতির সাতদিনের কর্মবিরত, অলস শরীরে খিঁচ ধরার ঘটনা দিয়েই। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বেশি দামে সুতো নিয়ে তাঁত চালাতেও একেবারে নারাজ গ্রামের গরিব, খেটে-খাওয়া তাঁতিরা। সুতো ব্যবসার মধ্যস্বত্বভোগী ভুবন সুতোর আকালের দিনে বেশি দামে সুতো দিতে চাইলেও উপোসের চরম অসহায়তার মধ্যেও তারা তা নিতে অস্বীকার করে। এর মধ্যে মদন তাঁতির দিক থেকে আরও একটি সমস্যা। অন্য তাঁতিদের যেখানে সাধারণ সুতো নিয়ে সাধারণ বস্ত্র ও গামছা তৈরিতে অসুবিধে হয় না, মদন কিন্তু সেখানে সূক্ষ্ম সুরুচিসম্মত তাঁতের কাপড় তৈরিতে উত্তরাধিকার সূত্রে একজন যথার্থ শিল্পী বলেই সে তার তৈরি শিল্পের মান নামাতে তীব্রভাবে অনীহ।

এইসব মানসিকতা নিয়ে সাত দিন টানা প্রতিবাদী মনস্কতায় তাঁত চালানোয় মদন তাঁতি সহ গ্রামের এই তাঁতিরা প্রায়-উপোসে দিন কাটায়। কেবল বৃন্দাবন আর কেশব ব্যতিক্রম, সমবেত প্রতিবাদে তারা নেই, তাঁত চালায়। মদনের অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী অভাবে-উপোসে দুর্বল। সংসারে অশান্তি, মদনের মেজাজ ক্রমশ রুক্ষ হয়। ভুবনের দিক থেকে সুতো জোগান দিয়ে তাঁত চালানোর প্রস্তাব সে মেনে নেয় না। গ্রামের সকলের দৃষ্টি কঠিন জেদি মদনের দিকে। প্রতিবেশী তাঁতিদের নানা প্রতিকূল কথাবার্তার মধ্যে মদনের মানসিক দ্বন্দ্ব তীব্র। একসময়ে সে ভুবনের কথার প্যাঁচে তার দেওয়া কিছু সুতোয় তাঁত চালানোর কথাও চিন্তা করে। কিন্তু তার পাঠানো সুতো যে অত্যন্ত মোটা! তাতে ভালো কাপড় হয় কি করে? আর মদনের মতো তাঁতি আজ তা-ই বুনবে! দাদনের দুটি টাকা, এমন সুতো, তাতে কাপড় তৈরি, স্ত্রীর ও সংসারের সকলের উপোসের অসহায়তা, মদনের শরীরের না-কাজ করার কারণে খিঁচ ধরার ভাবনা— এসবের প্রতিক্রিয়াতেই নিজের মধ্যে গভীর দ্বন্দ্বে থাকে মদন।

সেদিনই গভীর রাতে কিন্তু সত্যি তাঁত চালায় মদন। বাকি রাতের একটানা তাঁত

চালানোর শব্দ শুনে পাড়া-পড়শি উদি, ভোলা থেকে সকলেই অবাক, স্তম্ভিত! সকালেই প্রতিবেশী উদির আগ্রহ মেটাতে মদন দেখায় তার তাঁতঘর। ফাঁকা শূন্য তাঁত, ভুবনের দেওয়া সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনই পাশে পড়ে আছে। গভীর বিস্ময়ে তা দেখে গ্রামের আর সব প্রতিবাদী তাঁতিরাও। মদন জানায়, তাঁত একদিন না চালানোয় শরীরের যে অস্বাভাবিক আড়ষ্টতা, কর্মবিমুখ আলস্যভাব, তা কাটাতেই সে সারারাত সুতো বাদ দিয়ে খালি তাঁতই চালিয়েছে। ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত বোনার মতো বেইমানি করার মনোবৃত্তি তার নেই, নেই তাঁতিদের সমবেত প্রতিবাদী ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার পাশে তার মতো মানুষের কথা-না-রাখার শপথ ভাঙার মানসিকতা।

মদনের সিদ্ধান্তসূচক শেষ সংলাপের ভাঙা অংশটুকু দিয়েই 'শিল্পী' গল্পের কথাবস্তুর সমাপ্তি। 'শিল্পী' গল্প আকৃতিতে ছোট, কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের ব্যঞ্জনাও একটি মাত্র চরিত্রকেন্দ্রিক। আমাদের আলোচনার গোড়াতেই বলেছি, এ গল্পের কাহিনীধারা নিটোল নয়। গল্পটিব যেটুকু কাহিনীরস, তা কোনো ঘটনার চকিত আঘাতে পাঠকের আস্বাদে আসে না, তা একটি গ্রামীণ দরিদ্র পেশাগত শিল্প-সচেতন শ্রমিকের মনের আয়না ধরেই স্বচ্ছ হয়। ঘটনা বাইরের, বাজারে তাঁতিদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয় সুতোর আকাল হওয়া। এমন যে মানুষের তৈরি অভাব ব্যক্তি-মানুষ, পরিবার-জীবন, সমষ্টি মানুষ ও একজন শিল্পী-তাঁতির ভিতরের সূক্ষ্ম বাসনালোকটিকে কিভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে থাকে এবং পরিণামে সেই বদ্ধ অবস্থা থেকে তারা মানসিক মুক্তিতে উত্তরণের উজ্জ্বল অভিজ্ঞতা পায়, 'শিল্পী' গল্পের প্লট-বৃত্ত তারই কেন্দ্রে সচল!

মদন তাঁতি নিশ্চয়ই এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, আর তাকে ঘিরে যেসব মানুষের ভিড়, তারাই কথায়, আচরণে, প্রতিবাদে গল্পের প্লটে যেমন জটিলতা আনে, তেমনি চাপা গতিটুকুও সৃষ্টি করে। মদনের পায়ে খিঁচ ধরার ঘটনায় ভুবন যখন এসে তাকে সাহায্য করে, তখন পর্যন্ত গল্পের গতি মদন তাঁতির চরিত্রকেই সামনে আনতে থাকে। যখন গল্পকার মদনের চারপাশে পাড়া-প্রতিবেশীদের জড়ো করেন পরিবেশের একান্ত শৈল্পিক বাস্তবতায়, তখন ভুবনকে জড়িয়ে গল্পের গতিসৃষ্টির উপযোগী এক চিত্র তৈরি হয়:

> 'পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ে এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বার বার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দুচোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজী হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতি শাড়ি গামছা বুনে দিতে?'

ভুবন যখন কেন্দ্রীয় চরিত্র মদন তাঁতির পাশে আসে, তখনই সমগ্র গল্পে এক প্রচ্ছন্ন সংঘাতের মাটি তৈরি হয় গ্রামবাসীদের মনোভূমি ধরে। ভুবন মদনের কাছে এই অসময়ে সুতোর অপর এক জোগানদার মিহিরবাবুর সালিশি করে। তাঁত বিক্রি করে দেওয়ার ভয়ও দেখায়।

ভুবনকে কেন্দ্র করেই উপোসী, সাতদিন ধরে রোজগারহীন গরিব তাঁতিরা উভয় ভাবনায় নিমগ্ন হয় :

'তাঁত বাঁধা দিতে, বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গ্যাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা?'

কাহিনীর এখানেই চাপা এক স্বভাব প্লটে জড়িয়ে যায়। লেখকের আঁকা মদনের পরিবারের ছোট ছোট চিত্র রচনার পর আবার ভুবন মদনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মদনের ক্ষণিকের মনের শান্ততা, ভুবনের সেই অবসরে যেন বা সন্ধির প্রস্তাবে মদনকে তাঁত বোনার মানসিকতায় জড়িত করার জন্য দু'টাকা দাদন সহ মোটা সুতো পাঠানো, মদনের দোলাচল মনোবৃত্তি : 'কি করবে মদন তাঁতি?'— দিয়ে গল্পে ভুবন প্রসঙ্গই সেই প্লটের জটিলতাটুকু বজায় রেখে দেয়। শেষে মদনের সুতো বাদ দিয়ে তাঁত চালানোর ঘটনায় গল্পের গতির তীব্রতা যেমন পাঠকদের তটস্থ করে, তেমনি মদনের আপসহীন সংগ্রামী মন ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কঠিন সিদ্ধান্তে সমগ্র গল্পের প্লটবৃত্তটি গতির শেষ ব্যঞ্জনায় রক্তিম হয়।

সুতরাং 'শিল্পী' গল্পের প্লটবৃত্তের কেন্দ্রে আছে দুই বিরোধী শিবির— মদন ও ভুবনের সূত্রে দুই জনগোষ্ঠী— একদল একতাবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী, আর একদল ছলে বলে কৌশলে সেই শক্তিকে দুর্বল করার সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী। এদের সঙ্গে আছে চিত্রের স্বভাবে কিছু প্রসঙ্গের মূল বিষয়মুখিন সক্রিয়তা। এইসব মিলিয়ে 'শিল্পী' গল্পের প্লটে আছে ধীর, মন্থর গতি, কিন্তু পরিণামী লক্ষ্যের অমোঘতা তার স্বভাবে বিস্ময়কর। গল্পের 'চরমমুহূর্ত' মদন তাঁতির চরিত্র ধরলে তারই এমন ভাবনায় : 'কি করবে মদন তাঁতি?' আবার যদি সমবেত ঐক্যবদ্ধ তাঁতিদের বিস্ময়, সংশয়ের দিক থেকে দেখা যায় 'মহামুহূর্ত'-এর জায়গাটি এমন চিত্রে চিহ্নিত করা যায় : 'ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।' গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় আছে নিজ সৃষ্টির প্রতি গভীর নিষ্ঠা. ভালোবাসা, আর সেই সঙ্গে সমস্ত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী তাঁতিদের সঙ্গে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে উজ্জ্বল শপথদীপ্ত একাত্মবোধ।

দুই

'শিল্পী' গল্পের শ্রেণী-পরিচয় হল— এটি একটি সার্থক চরিত্রাত্মক গল্প। সাধারণভাবে যে কোনো একটি চরিত্রাত্মক শ্রেণী-পরিচয়ের গল্প এমন বিশেষ শ্রেণী স্বভাবের ব্যাপকতায় মনস্তত্ত্বকে প্রধান করতে পারে, সমাজকে প্রসারিত অর্থে গ্রহণ করতে পারে, বিষয়ে নিবিষ্ট করতে পারে নরনারীর সমস্যাকেও। তবে এই শ্রেণীর গল্পের কিছু স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত দিক আছে। একটি বিশেষ চরিত্র এর প্রধান অবলম্বন হয়, তার মনোভূমির যে নিজস্ব বিশিষ্টতা— গল্পকারের কলমে ঘটে তারই সফল প্রতিবিম্বন। তেমন চরিত্রের যে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব, তা ক্রমশ গল্পের প্লট ধরে অভিব্যক্ত হতে হতে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় স্বভাবী পাঠকদের মনে। শেষে ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাই হয় ব্যক্তিকে নতুন অবয়বে চিনে নেওয়ার পক্ষে সেই রঞ্জনরশ্মি, যা অজানাকে জানিয়েই আবার গভীর রহস্যময় নতুন অজানার মধ্যে পাঠকদের নিমগ্ন করে।

মদন তাঁতি সেইরকম এক চরিত্র। সে মুখ্য এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রও নিশ্চয়ই। একজন দক্ষ, সচেতন, কুশলী তাঁতি বলেই তার শ্রমনির্ভর জীবনে তাঁতের অস্তিত্ব দুটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ— ১. জীবনধারণের জন্যই তাঁতের প্রয়োজনের দিক। এটা তার বেঁচে থাকার উপায়ের প্রধান অবলম্বন। ২. সবরকম জাগতিক স্থূল প্রয়োজনের উর্ধ্বে তার মানসিক দিক থেকে শিল্পী-মনের এক গভীর মুক্তির, সৌন্দর্য-উপাসনার আশ্রয়। একটার সঙ্গে যোগ জীবনধারণের, আর একটার সঙ্গে কোনো জীবনযাপনের। গল্পকার এই প্রধান দুটি দিক থেকে মদন তাঁতির মনের সঙ্গে তার তাঁতের সম্পর্কের নিগূঢ়তার কথা ভেবেছেন। তার মতো গরিব তাঁতির পক্ষে তাঁতকে শিল্প ভাবা বিলাসের নয়, বড় তাঁতি-জীবনের প্রধান ভরসা, সাত পুরুষের ঐতিহ্য এর সঙ্গে সূত্রবদ্ধ হওয়ায় মদন তাঁতির পক্ষে তাঁত শুধু বস্ত্র নয়, শুধু কর্মসংস্থান নয়, তার রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ যেন! তাঁতের সঙ্গে আত্মার নিবিড় যোগ।

'শিল্পী' গল্পে এমন যে মদন তাঁতি, গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ধরে তার দায়ভাগ তিন দিকের ডাইমেনশানে বড় গুরুত্ব পায়। ১. মদন তাঁতির একান্তভাবে ব্যক্তিজীবনসহ পারিবারিক সম্পর্কে তাঁত-নির্ভর কর্মিষ্ঠতায় পরিবার প্রতিপালনে নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত কাম্য হয়। ২. সমগ্র কর্মবিরত, দরিদ্র, প্রতিবাদী, রুজি-রোজগারহীন, উপোসী তাঁতিদের সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে মদন তাঁতির সক্রিয়তা ও দায়বদ্ধতা বড় দিক তুলে ধরে। ৩. সবার উপরে একজন শিল্পী তথা স্রষ্টা হিসেবে মদন তাঁতির যে নিপুণ শিল্পের প্রতি, নিজের সৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সততা, তাতে তাকে শপথদীপ্ত হবার দায়িত্ব বর্তে যায়। বস্তুত মদন তাঁতির ব্যক্তি তথা পারিবারিক সত্তা, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী সত্তা ও পরিচ্ছন্ন শিল্পীসত্তা— এই তিনের অভূতপূর্ব সমন্বয়রূপ আঁকার মধ্যেই আছে গল্পটির চরিত্রের যথার্থ গৌরব ও শিল্পের সমুন্নতি এবং চমৎকারিত্ব।

মদনের নিজের সংসারে আছে বুড়ি মা, ন'মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা বউ, দু'বছরের এক ছেলে আর মাসি। একটি চার বছরের মেয়ে সহ প্যাকাটির মতো রোগা একহাত নুলো মাসি। মদন তাঁতির, টানা সাত দিন তাঁত না চলায়, সংসার অচল। প্রতিবেশিনী উদি লুকিয়ে লুকিয়ে মদনের বউকে কিছু চাল আর ডাল দেয়। বস্তুত ব্যক্তিগতভাবে নিজের পারিবারিক অবস্থার পর্যুদস্ত স্বভাবে মদন ভিতরে কিছুটা অসহায়! কারণ, উদির কথায় ওর সংসারেব খবর মেলে : 'এক বেলা এক মুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু'মাস।' এর মধ্যে মদন থাকে শান্ত, কিন্তু জেদি। এরই মধ্যে ভুবনের পাঠানো সুতো পেয়ে তার গভীর মানসিক দ্বন্দ্বে ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনধাবণের অসহায়তাবোধ মাথা চাড়া দেয় : 'পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বার বার, বৌটা গোঙাচ্ছে একটানা। কি করবে মদন তাঁতি?' এমন স্বগতোক্তিমূলক অসহায় চিন্তায় ধরা পড়ে মদন তাঁতির পারিবারিক ও ব্যক্তিক জীবনধারণের অনিকেত স্বভাব-যন্ত্রণা।

কিন্তু মদন তাঁতি এই পরিবার জীবনের দায় থেকে নিজের জিদে বড় করে দেখে তার সৃষ্টির উচ্চতম মানকে যেমন, তেমনি সমগ্র গ্রামের প্রতিবাদী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী স্বভাবকেও

গুরুত্ব দেয়, মর্যাদা দেয়। উদি গোপনে 'চুপিচুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের।' এখানেই মদনের যে জেদি স্বভাব, তা ব্যক্তিগত স্বভাবে মাত্র নয়, সমষ্টি মানুষের কথা ভেবে আর এক দায়িত্বে ব্যঞ্জনা পায়। 'সুতোর অভাবে তাঁতিপাড়ার সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া থমথম করছে; শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।' এই অবস্থায় সমস্ত তাঁতিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেশব-বৃন্দাবনের মতো মদন তাঁত চালাতে পারে না কিছুতেই। কারণ তার দায়িত্ববোধ যেমন নিজের শিল্পচেতনার কাছে, তেমনি সমবেত গ্রামের তাঁতিদের সংঘবদ্ধ চেতনার কাছেও। এর সার্থক প্রমাণ আছে গল্পের শেষতম বাক্যে মদনের কথায় : 'বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে?'

মদন তাঁতির যে শিল্পীসত্তা, তা তার এমন সংগ্রামী মনের সঙ্গেই ওতপ্রোত। মদন কখনোই শিল্পকে গ্রামের সংঘচেতনা ও প্রতিবাদী মনস্কতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেনি। সে সর্বশেষ উক্তি করেছে : 'ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব?' এই কথার দুটি অর্থ— ১. ভুবনের দেওয়া মোটা সুতোয় শিল্পের সূক্ষ্মতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট, তাই তার প্রতিবাদী সিদ্ধান্ত : 'এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে, কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনে নি।' 'দায়েপড়ে' বলতে পারিবারিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থা থেকে মুক্তির দায়, আর মদনের কাছে গামছা তৈরি মানেই তার কঠিন শিল্পবোধের করুণ অবনমন। ২. দ্বিতীয় অর্থ হল, সুতোর ব্যবসায়ে মধ্যস্বত্বভোগী ভুবনেব কাছে পরাজয় মানা, তার অন্যায়কে সমর্থন করা। এই দ্বিতীয় চেতনা তার সংগ্রামী প্রতিবাদের সমতুল। মদন শুধু খালি তাঁত রাতে চালিয়ে যেমন শরীরের জড়তা কাটাতে চেয়েছে, তেমনি শিল্পীসত্তাকে চলনধর্মে সজীব রাখতে consolation খুঁজছে একান্তভাবে নিজের মতো করে। সে কখনোই গ্রামের সংগ্রামী তাঁতিদের অসম্মান করেনি, অপমান করেনি, বেইমানিও না। তার শেষতম অসমাপ্ত সংলাপ-অংশটির গভীর গূঢ় ব্যঞ্জনার মধ্যেই আছে তার শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব— দু'য়ের মেলবন্ধন : 'মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—মদন হঠাৎ থেমে যায়।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নায়ক কখনোই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক শিল্পীর গর্বে উন্নতশির হতে চায়নি। সে সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে, ব্যক্তি, পারিবারিক অসহায়তা ও সমষ্টি মানুষের একতার শক্তিকে সরিয়ে রেখে শিল্পী ও তার শিল্পের গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হতে পারত। অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে শিল্প অনেক বড়, একজন মানুষ শুধু শিল্পের জন্য আত্মিক রক্তক্ষরণে যদি জীবন শেষ করে— সেখানেই তার সর্বকালীন মহত্ত্ব— এই বিশ্বাসে মদনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন গল্পকার। কিন্তু তিনি তা করেননি, কারণ মানিকবাবুর সে সময়ের বিশ্বাস ও উপলব্ধি— শিল্প ও প্রতিবাদী সংগ্রাম সমান মাপে এক মঞ্চে না থাকলে মানুষের সর্বাবয়ব মুক্তি নেই। তাই মদন তাঁতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শনের অনুগ এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

'শিল্পী' গল্পে গৌণ চরিত্র অনেক— মদনের মা, বউ, মাসি, গগন তাঁতির বউ, উদি,

বৃন্দাবন, বুড়ো ভোলা, পরোক্ষে কেশব, মিহিরবাবু ইত্যাদি। এরা এসেছে অনেকেই মদনকেন্দ্রিক বক্তব্য তৈরিতে চিত্রের স্বভাবে। ভুবন গল্পের অনেকটা জুড়ে আছে ঠিকই, সে সুতোর ও তাঁতের ব্যবসায় মধ্যস্বত্বভোগী ঠিকই, কিন্তু সে কঠিন প্রতিপক্ষ হয়ে ধরা পড়েনি, কেবল চতুরতায় ও কৌশলে গল্পের মধ্যে সক্রিয়। অবশ্যই সে গল্পের মধ্যে মদনের মনের দ্বন্দ্ব, সংকট ও মোড় ফেরানো বিষয়ে সহায়ক হয়েছে। তার দায়িত্ব মূলত মদনকে কেন্দ্র করেই, তবে গ্রামের মানুষের কাছে সে যে গভীরতর ব্যঞ্জনায় কিছুটা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, গল্পের এমন সিচুয়েশনে তার প্রমাণ মেলে :

> 'পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। .... বার বার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দু'চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজী হল প্রায় বেগার-খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে?'

গল্পের গতি অবশ্যই ভুবনকে দিয়েই টান টান হয়েছে। সবশেষে ভুবনের সুতো পাঠানো ও মদনের সেই সুতো ব্যতিরেকে তাঁত চালানোয় গতির মুখ চরিত্র-ব্যঞ্জনার মধ্যে সামিল হয়েছে। সুতরাং ভুবন গল্পের শেষে আর উপস্থিত নেই। সে মদনের মনে গভীর দ্বন্দ্ব-সংকট জাগিয়েই গল্প থেকে বিদায় নিয়েছে। গল্পের মধ্যে তার স্থান সমবেত তাঁতিদের প্রতিবাদ জানানোর প্রধানতম লক্ষ্য হিসেবেই। গৌণ চরিত্রগুলির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত, সমষ্টি মানুষের স্বভাবেই তাদের ঔজ্জ্বল্য।

তিন

আমরা একাধিক প্রসঙ্গে আগেই বলেছি 'শিল্পী' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবস্তুটি কি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক গণজীবন ও গণআন্দোলন এবং শিল্পাদর্শ— দুইকে এক করে দুয়ের সমান মর্যাদা দিয়ে লেখকদের যথার্থ দায়িত্ব পালনের প্রসঙ্গের ওপর জোর দিয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন ও ওই দলের সদস্য হওয়ার পর। জাঁ পল সার্তর তাঁর 'হোয়াট ইজ লিটারেচার' নামের একটি প্রবন্ধের উপসংহারে এসে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এইভাবে : 'সাহিত্য আপনাকে লড়াইয়ের মাঝখানে এনে ফেলবে। লেখা বলতে একভাবে স্বাধীনতা চাওয়া। একবার শুরু করলেই, চান বা না চান, আপনি জড়িয়ে পড়েছেন।' ঠিক এইরকম ভিতরের তাগিদ থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন এক সময়ে 'কেন লিখি'। সেই সঙ্গে তাঁর 'লেখকের কথা' নামের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থে শিল্প ও সংগঠন আন্দোলনের যৌথ দায়িত্ব বিষয়েও সুচিন্তিত মন্তব্য রেখেছেন— যার তাৎপর্য 'শিল্পী' গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের মধ্যেকার এক যুক্তিনিষ্ঠ জীবন-সন্ধিৎসায় মেলে।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশের তিন থেকে আট মার্চ তারিখের এক সম্মেলনে আমাদের দেশের তিরিশের দশকে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' রূপান্তরিত হয় 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' নামে। সেই সংঘের যুগ্ম সম্পাদক হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উনিশশো উনপঞ্চাশের এপ্রিলে সংঘের যে পরবর্তী সম্মেলন হয়, সেখানে সম্মেলনের সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করেন মানিকবাবু। তা পরে প্রবন্ধ হিসেবে সংকলিত হয় তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে। তার মধ্যে তিনি আদর্শ ও সংগঠনের স্বরূপ বিষয়ে এবং পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে মন্তব্য করেন :

> 'আদর্শ ও সংগঠন পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। আদর্শে খুঁত থাকবে অথচ সংগঠন নিখুঁত হবে, বা সংগঠনে খুঁত রেখেও নিখুঁত আদর্শ সার্থক হবে— এটা অসম্ভব। আদর্শ ও সংগঠন আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক, অবিচ্ছিন্ন ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।'

'শিল্পী' গল্পে এমন বিচার প্রযোজ্য। মদন তাঁতি শিল্পী। ভালো তাঁতের বস্ত্র বুননে, তার আদর্শরক্ষায় সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনমনীয় তার মনোভাব। সেই সঙ্গে ঠিক সংগঠন আন্দোলনের অবয়বে নেই যদিও, তবু গ্রামের সমবেত তাঁতিদের মধ্যে ছায়ার স্বভাবে যে প্রতিবাদী ঐক্যবদ্ধ মনোভাব— তাতেই তা ধরা পড়ে। তার সঙ্গে মদন তাঁতির শিল্পপ্রেম চিত্রণে লেখক কোনো বিরোধকে গল্পের শেষে রাখেননি। এটা তাঁর মার্কসবাদে বিশ্বাস থেকেই দেখা দিয়েছে। মদন যেভাবে হোক কাপড়ে বুনতে যদি মত দেয়, মত বদল করে, তা হলে অন্য সব তাঁতিরা সুতো পাবে তার কাছ থেকে। বর্তমানে তারা মদনের নেতৃত্বের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখে। তাদের যে সাতদিনের উপবাসের জীবন, সেখানে তারা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ! মদনের শিল্পচেতনা ও অন্য তাঁতিদের সংগঠিত কর্ম-মনস্কতা— দু'য়ের মধ্যে শেষপর্যন্ত সমন্বয় চিত্র এঁকেছেন লেখক।

ঠিক এর মধ্যে দিয়েই উঠে আসে মানিকবাবুর গল্পটির কেন্দ্রীয় বক্তব্যনির্ভর জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শন অবশ্যই গল্পকারের আলোচ্য গল্পটি রচনাকালীন দেশ ও কালনির্ভর। ১. 'ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব?' ২. 'বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে?'— এমন দুটি সিদ্ধান্ত বাক্যেই আছে অবশ্য আদর্শ ও সংগঠন আন্দোলনের শিল্পসম্মত মেলবন্ধন। মানিকবাবুর লক্ষ্যও তা-ই। মদন তাঁতি চরিত্র মানিকবাবুর দেখার বিশেষ দিকটিকে ধরে। এইভাবে সাম্যবাদে দীক্ষিত, মানবতাবাদের উপলব্ধিতে মার্কসিস্ট লেখক তাঁর শিল্পের দায় পালন করেছেন। উনিশশো চুয়াল্লিশের আগে ও পরে— দুই ভাগের মধ্যে সমাজজীবন ও শিল্পসাহিত্য, শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব-ভাবনায় অনেক দ্বিধাজিজ্ঞাসা, প্রশ্ন ছিল মানিকবাবুর :

> 'সমাজজীবন ও শিল্পসাহিত্যের সম্পর্কে মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি তখন আমাদের নিখুঁত ছিল? আজকের চেয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে? তা নয়, দৃষ্টি তখন আমাদের অনেকখানি ঝাপসাই ছিল, আদর্শগত ও সমগ্রতার দিক থেকে।

'শিল্পী' গল্পে সেই গল্পকারের ঝাপসা দৃষ্টির পরিচয় নেই। আদর্শগত সমগ্রতাবোধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্প গল্পকার-মানসিকতার বদলের পথে 'মাইলস্টোন' হয়ে ওঠে।

চার

ছোটগল্পের প্রকরণের দিক থেকে 'শিল্পী' গল্পের অবয়বে আছে মেদ-মাংস বর্জিত নিখুঁত রূপ ও স্বভাব। গল্পটির শুরু ও শেষের মধ্যে আছে নিটোল সম্পূর্ণতার দিক। একটিমাত্র অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে মানিকবাবু গল্পের শুরুর চিত্র এঁকেছেন :

> 'সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক দিচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।'

একজন যথার্থ কর্মিষ্ঠ শ্রমিকের চিত্রে শীতের সকালের রোদের আরাম নেওয়ার মধ্যে আলস্য ও সুখ-বিবশতা থাকে, যা কাম্য নয় মদন তাঁতির ক্ষেত্রে বলেই, তার পরের চিত্র হয় তার পায়ে ভীষণভাবে খিঁচ ধরার। এই রূঢ় বাস্তব চিত্রের ব্যঞ্জনা বুঝিয়ে দেয় সমগ্র গল্পের মধ্যেকার যে মদন-ব্যক্তিত্বের, তার শেষতম চিত্রে তা থেকে বেরিয়ে আসার সফল রূপ ধরা পড়ে :

> 'তাঁত চালাওনি রাতে?
> চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে বাত, তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু।'

এই যে সাময়িক অসুস্থতা থেকে স্থায়ী সুস্থতার মধ্যে আসার প্রয়াস, সমগ্র গল্পের মধ্যেকার গতিতে তারই ক্রমিক নির্দেশ। মদন তাঁতির দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ মনের বদ্ধ অবস্থা থেকে যে মুক্তির দিক, এই প্রথম ও শেষ চিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তা প্রমাণিত হয়ে যায়। গল্পের প্রকরণগত শিল্প-সৌকর্যের এই দিক গল্পকাবের সৃষ্টি-কৌশলের সার্থকতা প্রমাণ করে।

গল্পের মূল ভাবের একমুখিতা একমাত্র মদন তাঁতির চরিত্র ধরেই চোখে পড়ে। গল্পে এতটুকুও প্রয়োজনহীন বিস্তার নেই। নিশ্চয়ই গল্পে কোনো গভীর মনস্তত্ত্ব ও তার জটিলতা নেই, কিন্তু নায়ক চরিত্রের আদর্শ ও বাস্তব জীবন এবং গণজীবন ভাবনার যে সংঘাত, তা স্বাভাবিকত্বে উজ্জ্বল। মদন তাঁতি বরং কম কথা বলেছে গল্পে, ভুবন এবং অন্যান্য মানুষগুলি মদন তাঁতির মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগায় তাদের চলাফেরার স্বাভাবিকতায়। মদন তাঁতির নিজস্ব খ্যাতি-ভাবনা ও শিল্পানুরাগকে মদনের মনে জাগিয়েছে তার পরিবেশ। এই পরিবেশ গল্পে হয়েছে নিখুঁত। গল্পের বাস্তব-সামাজিক শিল্পসত্য এভাবেই রক্ষিত।

গল্পের ভাষা ব্যবহারে গল্পকার সব সময়েই সংলাপের ভাষা ও চরিত্রদের চিন্তাভাবনার ভাষা এক করেছেন। এখানে গল্পকারের বাস্তবতার আর এক অভিজ্ঞান। বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে মদন বলে, 'পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তন্না......'। আবার মাসির চিন্তার ভাষায় 'ছিষ্টিছাড়া' শব্দ প্রয়োগ, মদনের সংলাপে 'এট্টু' ব্যবহার— এমন সব শব্দের পরিবেশ বিশেষ অঞ্চলের পরিমণ্ডলের পরিচয় দেয়। গল্পটির ভাষার সবচেয়ে বড় দিক, গল্পকার গদ্যে সবচেয়ে কম আলংকারিক শব্দ-প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বর্ণনায়। 'শরীরটি প্যাকাটির মতো', 'যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে', 'বনগাঁর শ্যাল রাজা মদন তাঁতি', 'মদন যখন গামছা বুনবে... সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে', 'তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ি'— এমন সব চিত্রাত্মক, ব্যঞ্জনাধর্মী

বাক্যাংশে যেটুকু আলংকারিক সৌন্দর্য, প্রবাদপ্রতিম লোকভাষার সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা জন্মে, তা অবশ্যই চরিত্রেরই অন্তর্নিহিত শিল্পন্যায়েরই একান্ত অনুগত, গদ্যে বাইরে থেকে আদৌ চাপানো নয়। এককথায় 'শিল্পী' গল্পের গদ্যভাষা সমাজ-বাস্তবতা ও গল্পের পটভূমি এবং চরিত্রন্যায় থেকে এতটুকুও স্বতন্ত্র নয়। গদ্যে ব্যবহৃত বাক্যের সরলতা, সংযম, সংক্ষিপ্তি ও অমোঘ স্বভাব 'শিল্পী' গল্পের প্রকরণের বড় বৈশিষ্ট্য দেখায়।

পাঁচ

'শিল্পী' গল্পের নামে প্রত্যক্ষভাবে প্রধান চরিত্রের নাম নেই, তার পেশানির্ভর জীবন-স্বভাবের সূত্রে তার প্রাণকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নাম অবশ্যই ব্যঙ্গাত্মক। মদন তাঁতি ভালো, সূক্ষ্ম কারুকর্ম করা কাপড় বোনে। সেখানেই সে একজন শিল্পী। অন্যান্যদের থেকে তার যে স্বাতন্ত্র্য, গল্পে তা-ই গল্পকারের রূপদানের লক্ষ্য। তাকে সাধাবণ তাঁতি বলা যাবে না। সে একজন তাঁতশিল্পী। সেই 'শিল্পী'-আত্মার এক যন্ত্রণাই গল্পের মধ্যে আদ্যন্ত বজায় থাকায় এমন নাম সার্থক।

কিন্তু এই সাধারণ ব্যাখ্যার পাশে আর একটি ব্যাখ্যাও রাখা যায়। মদন তাঁতির কাছে তার শিল্প তার শুধুমাত্র দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের, অর্থের সাচ্ছল্য আনার উপায় বা আশ্রয় মাত্র নয়, তাঁত তার রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ, আত্মার অধিতলে তার তাঁতের প্রতি অনুবাগ, ভালোবাসা। কারণ এই তাঁত দিয়েই সে তার ভালো কাপড় তৈবির স্বপ্ন দেখে। যে কোনো একজন শিল্পীকে তার প্রয়োজনের জীবন বার বার তার স্বপ্ন থেকে, তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। এই বিচ্যুতি যে মেনে নেয় তার শিল্পী-জীবন শেষ। মদন তা মানেনি। সে উপোসে কাটাতে চায়, কিন্তু পরাজয় মানতে চায় না। এক এক সময় তার মনে প্রলোভন জাগায় বাইরের শক্তি, জীবনও, কিন্তু সে একজন সৎ কর্মিষ্ঠ পুরুষ এবং শিল্পী পুরুষ। তাই তার মনের জোর তাকে বাঁচিয়ে রাখে, তাকে জিতিয়ে দেয়। গল্পের এই ভাষ্য ধরলে এমন নাম শিল্পের নিশ্চিত আনুকূল্য করে। পরেও গল্পের নামের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি রাখা যায়। শিল্পীর কাজ কি শুধু নিজের শিল্পের চরম রূপ দেখে গর্বের, সুন্দরের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলা? শিল্পী কি হবে স্বার্থপর? আত্মমগ্ন? শুধুই ধ্যানই তার একমাত্র উপায়? এইসব প্রশ্নের কথা মানিকবাবু গল্পের মধ্যে রেখেছেন। মদন তাঁতির নিজের শিল্পশুদ্ধির জন্য আকালের দিনে 'কম্প্রমাইজ' করলে ক্ষতি কি? সে তো শিল্পের কাছে সৎ? কিন্তু মানিকবাবুর কথা এর পরেও থাকে। একজন শিল্পী তার শিল্প-আদর্শ ও সংগঠন আন্দোলন— দুয়ের অনন্বয়ে বড় হতে পারে না। মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পীর জীবন একান্ত ওতপ্রোত। শুধু শিল্পচেতনা শিল্পীর সমৃদ্ধি আনতে পারে, শিল্পের সংগ্রহশালার সহজ বৃদ্ধি করতে পারে, শিল্পের নান্দনিক মূল্যে মানুষকে মোহবদ্ধ করতে পারে, সেখানে একজন শিল্পীর বড় মূল্যায়ন ঠিকই। কিন্তু শিল্পী কি সাধারণ মানুষ থেকে, একতাবদ্ধ শ্রেণী-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে নিজের শিল্পের জন্য তাতেই মৌমাছির মতো ডুবে থেকে? এই প্রশ্নই গল্পটির 'শিল্পী' নামের আর এক তাৎপর্য আনে।

গণচেতনার সঙ্গে শিল্পের যোগ দরকার। একটা বাদ দিয়ে আর একটা নিরর্থক। মদন তাঁতির যে শেষতম উপলব্ধি সেখানে তারই স্বীকৃতি। সে ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনবে না যেমন, তেমনি সে বেইমানি করতে পারবে না গণআন্দোলনের ছায়ায় ধরা দরিদ্র তাঁতিদের অসহায়তায়। শিল্পী আত্মকেন্দ্রিক নয় সমাজ ও জনগণের অস্তিত্বের পাশে। সে-ও জনগণেরই একজন সদস্য। এই বক্তব্য প্রমাণ করে গল্পটির এমন 'শিল্পী' নামের বড় দিক। সেই বড় শিল্পী যে ব্যক্তির সৃষ্টির সঙ্গে জনগণেরও সুস্থ দাবির মেলবন্ধন ঘটায়। 'শিল্পী' গল্পের লক্ষ্য সেই শিল্পী। নামে তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা থাকায় গল্পনাম অবশ্যই পাঠকদের গভীরতম বোধের জগতে আলোড়ন আনতে সক্ষম।

১০.

কুষ্ঠরোগীর বউ

এক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌ' নামেব গল্প সংকলনটির প্রকাশ ঘটে ইংরেজি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে। গ্রন্থটিতে মানুষের বিশেষ পেশা, বয়স, স্বভাব, সাংসারিক হতাশ-গ্রস্ততা, রোগগ্রস্ততা, বিকলাঙ্গ স্বভাব— এসবকে ভিত্তি করে মোট তেরোটি গল্প সংকলিত ছিল এর দ্বিতীয় সংস্করণে। প্রথম সংস্করণে ও দ্বিতীয় সংস্করণের পরের সংকলনের মধ্যে আটটি করেই গল্প থেকে যায়। স্মরণীয় 'বউ' গ্রন্থের প্রকাশের এক বছর পরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। মার্কসবাদ নির্ভর মানবতাবাদের ধ্যান-ধারণা এখান থেকেই প্রামাণ্য হয় উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল ও পরের সময়ে প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাসে। কিন্তু আমাদের মতে মার্কসবাদে দীক্ষা তখন প্রত্যক্ষভাবে হয়নি, কিন্তু 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে মানুষের প্রতি ভালোবাসার এক অনবদ্য চিত্র রচিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে মানিকবাবু মন্বন্তর-সূচনাব আগের কোনো কোনো রচনায সমবেত মানুষের কথা ভেবেছেন, ভেবেছেন অসুস্থ, দূষিত বাহ্যিক ও মানসিক পরিবেশ থেকে নায়ক ও নায়িকাদের সরিয়ে এনে জনগণের বিপুল বিশ্বাসের ওপর তাদের স্থিব স্থান করে দেওয়ার কথা।

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে আছে সেই অসাধারণ মানস মুক্তির দিক, যেখানে এক শান্তির জগৎও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পটির কি প্লট-বৃত্ত, কি চরিত্র— এক নতুন প্রকরণে লেখা। এব নিটোল কোনো কাহিনী নেই, বড় কোনো ঘটনাও নেই। মাত্র দুটি চরিত্রের মনের জটিল টানাপোড়েনের মধ্যে যে রুদ্ধশ্বাস ভয় এবং চমৎকৃতি আছে অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে গল্পকার তার জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। কুষ্ঠরোগী যুবক স্বামী যতীন আর তার সম্পূর্ণ সুস্থ যুবতী স্ত্রীব যে সম্পর্কেব টানাপোড়েনের কথা, তারই যে জটিল সম্পর্ক ও বদলের বিষণ্নতা ও উত্তরণ, গল্পের শেষে স্ত্রী মহাশ্বেতার মানবীয় গরিমাব স্বভাবে ও সক্রিয়তায় সে সবেরই মুক্ত শ্বাস ফেলার মতো সবুজ জমির সন্ধান মেলে।

নিশ্চয়ই ঘটনাব মালায় গাঁথা গল্পের কাহিনী নেই, কিন্তু যে সংক্ষিপ্ত কথাবস্তু দুটি

চরিত্রের দাম্পত্য সম্পর্কে মেলে, তার পরিচয় এই রকম। গল্পের মধ্যে যতীন তার পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী এক অতি সুদর্শন শিক্ষিত আটাশ বছরের পুরুষ। যতীনের বাবা যে এত সম্পত্তি করেছিল, তার ইতিহাসের মূলে আছে অন্য বহু মানুষকে নিষ্ঠুর বঞ্চনার দিক। সেসব বঞ্চিত মানুষের দিক থেকে অসহায় অভিসম্পাত এমন সম্পত্তিব স্তূপ হওয়ার মূলে থাকা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে মূল একটি সিদ্ধান্তও স্মরণে রাখা দবকার— 'এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড়ো স্কেলে কবিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া?' হয়তো সেই অভিশাপেই বিবাহিত যতীনের আঙুলে একদিন দেখা দেয় কুষ্ঠরোগ। স্ত্রী মহাশ্বেতাকে নিয়ে তার ছিল অফুরন্ত উচ্ছল আনন্দের জীবন। কুষ্ঠ হওয়ার পর যতীন নিজের বাড়িতেই নেয় সম্পূর্ণ নির্বাসিত জীবন। এ জীবনে একমাত্র মহাশ্বেতার অন্তরঙ্গ সেবা ও সাহচর্য ছাড়া সে কিছু চায় না। মহাশ্বেতা এমন রোগেও স্বামীর নিখুঁত সেবা করে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন জীবনে, দুরারোগ্য রোগের কারণে স্ত্রীর প্রতি এক এক করে সন্দেহ তৈরি হতে থাকে যতীনের অবচেতন মনে। সন্দেহ হয় মহাশ্বেতা ওকে সেবার মধ্য দিয়ে অবহেলা করে, ঘৃণা করে, ওকে ছেড়ে অন্য পুরুষের জন্যও বুঝিবা ওর প্রতীক্ষা থাকে। ইতিমধ্যে মহাশ্বেতার একটি রোগগ্রস্ত সন্তানও মারা যায়। স্বামীর সন্দেহ যত তুঙ্গে ওঠে, বিকৃত হতে থাকে, মহাশ্বেতা হয়ে যায় যন্ত্রের মতো। ঈশ্বর-বিমুখ স্বামী যতীন একসময়ে ঈশ্বরবিশ্বাসে, দেবতার প্রত্যাদেশের প্রার্থী হয়ে কামাখ্যা চলে যায়। তার অনুপস্থিতিতে মহাশ্বেতা স্বামীর জন্য কালীঘাটে ভিখিবিদের মধ্যে দান-ধ্যানে ব্যস্ত হতে গিয়ে সাক্ষাৎ পায় একাধিক কুষ্ঠরোগীর। মহাশ্বেতা নিজেকে লক্ষণীয় বদল ঘটানোর উপায় ও সান্ত্বনা খুঁজে পায় মনের মতো। যতীন ফেরাব আগেই বাড়িতে কুষ্ঠাশ্রম খোলে একুশ জন কুষ্ঠরোগী নিয়ে। ডাক্তার ও নার্স রাখার ব্যবস্থা করে। যতীন ফিরে অবাক। সে ফিরে এসে নিজের মনের মতো দৈবশক্তিতেই বিশ্বাস রেখে শান্ত হয়। তার বাড়িতে সেই আগের জায়গাতেই সে আশ্রয় নেয়। মহাশ্বেতা তাকে আর সেই সেবা করে না, তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। সে তার নব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কুষ্ঠরোগীদের সেবাতেই গভীর-নিবিষ্ট থাকে। সুস্থ স্বামীকে ভালোবাসার সময় যে ঘৃণা ছিল কুষ্ঠরোগীদের প্রতি, এখন তার ঠিক বিপরীত তার মনের গঠন। এখন সে কুষ্ঠরোগীদের ভালোবাসে, স্বামীকে করে ঘৃণা।

ছোট একটি কাহিনী-আভাস নির্ভর কথাবস্তুর এখানেই শেষ। অবশ্যই 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের প্লট-স্বরূপে প্রথাবদ্ধ কাহিনী ও ঘটনানির্ভর কোনো আঙ্গিক অনুসন্ধান সম্ভব নয়। গল্পের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অভিনবত্ব এখানে স্পষ্ট। গল্পের মধ্যে লেখক স্বয়ং মাঝে মাঝে কাহিনীর উপস্থাপক, ব্যাখ্যাকার, টীকা-ভাষ্যকার হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন। মাঝে মাঝে যতীন ও মহাশ্বেতার এক এক করে মনোভঙ্গির প্রকাশ ও বদলের কথা মনে রেখে পর পব ছোট ছোট চিত্র রচনা করেছেন দুটি চরিত্রের সংলাপ প্রয়োগ করে। সেই সংলাপগুলি যেটুকু কাহিনী-মায়া রচনা করে, গল্পকার স্বয়ং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পাঠকদের কাছে গল্পের একটি মন্থর গতি-স্বভাব তুলে ধরেছেন।

মনে রাখা দরকার, গল্পটির সম্পদ এর চরিত্র দুটির ক্রমবিবর্তিত মনোলোক। তা তাদের স্বভাবে, ব্যবহারে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, অন্তর্গূঢ় সংঘাতে-সংকটে উঠে এসেছে। তার ওপর সেগুলিকে অতিরিক্ত মাত্রায় গতি দিয়েছেন গল্পকার স্বয়ং। ফলে টানা কাহিনী কোনোক্রমেই তৈরি হয়নি। গল্পকারও তা চাননি। কোনো বড় ঘটনা গল্পে নেই। কেবল যতীনের কুষ্ঠব্যাধি হওয়া একটি বড় রকম প্রতিক্রিয়া জাগানো ঘটনা। তার পর থেকে ছোট ছোট চিত্রখণ্ডের স্বভাবে এসেছে গল্পের পূর্ণ অবয়ব। চিত্রগুলি হল মনের বাস্তব চিত্র। তার গভীরে যে জটিলতা, যে নগ্নতা, নায়ক ও নায়িকার অসহায়তা— তার দায়িত্ব চরিত্রদেরই, গল্পকার সেখানে নীরব নিরাসক্ত দর্শক ও 'narrater'। কখনো বা গল্পকার চিত্রগুলির ভাষ্যকারের ভূমিকাও নিয়ে নেন।

মূল গল্পকথা ধরলে এর শুরু যতীনের কুষ্ঠ হওয়ার খবরে। তার পরেই এসেছে যতীন-মহাশ্বেতার পরস্পরের মধ্যেকার প্রেমের চিত্র— যা তাদের স্বভাবের ও মনের সুমধুর ও শ্রেষ্ঠ সমন্বয়কে বোঝায়। এ চিত্র অতীতের নয়, কুষ্ঠরোগ কিনা তা না বুঝেই তাদের জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি। এর পরেই ডাক্তারদের মতামতে যখন স্থির হয়ে যায় এ এক ভয়ানক দুরারোগ্য ব্যাধি, তখন থেকেই প্রথম ভাবনা জাগে ছ'মাস আগে মহাশ্বেতার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানের কথায়। লেখকের বর্ণনায় :

> ১. 'মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য মরিয়া গিয়াছে।'
>
> ২. 'যতীন তখনো মরে নাই, মরিতেছিল।'

এই যে দুজনের অবস্থা, এর পর থেকেই গল্পের গতি বাহির ছেড়ে দুজনের মনের গভীরে মুখ ফেরায়। এক এক করে সারা গল্প জুড়ে একে একে দেখা দেয় যতীনের মধ্যে গভীর নিঃসঙ্গতাবোধ; মহাশ্বেতা হয় 'খানিকটা কল-বনিয়া-যাওয়া মানুষের মতো।'

এই পরেই দুজনের মধ্যে আসে বিচ্ছিন্নতা ও অনন্বয়ের অভিশাপ। যতীনের অসহায় সন্দেহ ও মহাশ্বেতার নির্বিকারত্ব ক্রমশ চরম রূপ পেতে থাকে। গল্পের গতি সেই দিকে একমুখিন। দুই চরিত্রের টানাপোড়েন কোনো কাহিনী ও ঘটনাকে আশ্রয় করেনি, এসেছে যতীনের দিক থেকে ঘৃণার স্বভাবে, মহাশ্বেতার সব কিছুর সামলানোর প্রয়াসে। যতীনের মহাশ্বেতাকে, তার চরিত্রকে সন্দেহ করার মধ্যেই গল্পের 'মহামুহূর্ত' এগোতে থাকে মহাশ্বেতার ভাবনা ধরে। 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের চরমক্ষণটি মহাশ্বেতার মনের গভীর থেকেই প্রস্তুত হতে থাকে। গল্পের নাম 'কুষ্ঠরোগীর বউ', কোনো 'কুষ্ঠরোগী' মাত্র নয়, তাই 'মহামুহূর্ত' মহাশ্বেতার মধ্য দিয়েই রচিত হওয়া স্বাভাবিক। লেখকের বর্ণনায় তারই সূত্রপাত:

> 'এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিস্তব্ধ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে।'

যেহেতু টানা কোনো গল্প নেই, গল্পকারই এই চরিত্র দুটির একমাত্র সূত্রধার, তাই এখানেই, মহাশ্বেতার জীবনের অবলম্বন খোঁজার ভাবনাতেই চরিত্র বদলের উপযোগী মহামুহূর্তের

প্রস্তুতি! মূল 'মহামুহূর্তটি' গল্পের ছায়ায় মহাশ্বেতার চরিত্রশক্তি ধরে এমন বাক্যে ও তার সিদ্ধান্তে মেলে : 'বাড়ি ফিরিয়া সেই দিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।' এমন বাক্যটি দিয়েছেন গল্পকার মহাশ্বেতার চরিত্র-ন্যায় ধরেই। এর সূত্র ছিল মহাশ্বেতার আগের সেই নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন অনুসন্ধানের ভাবনায়। গল্পের পরিণাম লক্ষ্যে রেখে যদি শেষতম ব্যঞ্জনা ধরা যায়, তবে যতীনের শেষ সংলাপ ও মহাশ্বেতার মনেই তার প্রতিক্রিয়ার চিত্রে মেলে :

> 'যতীন একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল : 'তুমি খালি ওদেরই সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখো না।'
> মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।'

দুই

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের নামেই প্রমাণ হয়ে যায়, গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও চরিত্র হল মহাশ্বেতা। তার চরিত্রনির্মাণে তার মনোলোকের যে অসামান্য চমৎকারিত্বপূর্ণ বিবর্তনচিত্র লেখক এঁকেছেন, বাংলা ছোটগল্পে এই জাতীয় চরিত্র-কাঠামো দ্বিতীয়রহিত। মহাশ্বেতা আমাদের গভীর বিস্ময় জাগায়। এরকম একটি ইস্পাতকঠিন নারী চরিত্র বাংলা ছোটগল্পের ধারায় নিশ্চিত অমূল্য সংযোজন। গল্পের প্রথম দিকে যতীনের কুষ্ঠ হয়েছে এমন বিশ্বাস যখন এতটুকুও হয়নি, সন্দেহও জাগেনি সে বিষয়ে, তখনকার স্বামীর সামান্য অসুখ ভেবে মহাশ্বেতার যে প্রেমস্বভাব প্রকাশের সারল্য ও রোমান্টিক অন্তরঙ্গ দাম্পত্যের আবেগধর্ম, তা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের এক মধুর লাবণ্যকে তুলে ধরে। তার অসুখ সারাবার যুক্তি প্রেমিকা স্ত্রীর অকৃত্রিম মনোবাসনার অনুগ।

এর পরেই ডাক্তারদের কথায় যতীনের কুষ্ঠই প্রমাণিত হলে মহাশ্বেতার মনের গভীরে এক বড় ধাক্কা লাগে :

> 'মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে, অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য-সদ্য মরিয়া গিয়াছে।'

এর পর থেকেই মহাশ্বেতার মনের গভীরে এক এক করে লক্ষণীয় বদল হতে থাকে। কিন্তু তা তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি একবারও। কুষ্ঠ এমন এক ব্যাধি, এবং তা-ও আবার তার নিজের স্বামীর, একজন নারীর পক্ষে এ যে কত বড় আঘাত, তার পরবর্তী চিত্রে যতীনের সেবায় 'খানিকটা কল-বনিয়া-যাওয়া মানুষের মতো' হওয়াতেই প্রমাণ মেলে। সে ক্রমশ হয় নির্বিকার। তার স্বামীর কাছে নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণ তার জীবন-নৈরাশ্যের দিককেই পাথরের ভার চাপায় যতীন তা বোঝে না। তার স্বামী তার প্রতি ক্রমশ কুৎসিতভাবে ক্রুদ্ধ, সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই মহাশ্বেতা হয় শীতল, শান্ত। রাতে যতীনের ঘর থেকে যখন স্বামীর অসঙ্গত ব্যবহারের জন্য অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে দূরে সরে আসে, তখনই তার মধ্যে জাগে জীবনের কোনো একটা অবলম্বনের অনুসন্ধিৎসা।

চরিত্রের বদল মনের চিন্তায়। কাজে তা সম্ভব হল যতীনকে কামাখ্যায় একা পাঠিয়ে দেওয়ার পর। তার শুরু কালীঘাটে সর্বহারা ভিখিরি ও কুষ্ঠরোগীদের দান-ধ্যানের সূচনায়। কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনে তার সুস্থ জীবনের অবলম্বনই মেলে। মহাশ্বেতার চরিত্র-ব্যক্তিত্বের এই যে অদ্ভুত বদল, এখানেই চরিত্রটির যথার্থ শিল্পন্যায়। সে ক্রমশ সীমার জীবন থেকে অসীম জীবনের দিকে এগিয়েছে। গল্পে মহাশ্বেতা যেন গল্পকারের বড় জীবনের এক বাস্তব মিশন! স্বামীর সেবার থেকে অসংখ্য অসুস্থ জীবনের সেবায় যে তার নিমগ্ন হওয়া, এখানেই চরিত্রটির স্বাভাবিক পরিণতিচিত্র। মহাশ্বেতার সম্যক ও সম্পূর্ণ মানবী মূর্তি রচনাতেই গল্পকারের কৃতিত্ব এবং শিল্পের চমৎকৃতি।

যতীন চরিত্রের মূলে আছে এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সচ্ছল, সুদর্শন পুরুষের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের করুণ রূপ। তার অস্থিরতা ও অসহায়তা তাকে মনস্তত্ত্বের গভীর রহস্যে জীবন্ত ও বাস্তব করে তুলেছে। তার রোগ শুধু বাইরের সম্পর্কেই মানুষে-মানুষে ব্যবধান রচনা করে না, অন্তরের মধ্যেও এক নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতাকে তৈরি করে। স্ত্রী মহাশ্বেতার সঙ্গে তার যে মানসিক ব্যবধান ক্রমশ প্রকট হতে থাকে, একজন সচেতন কুষ্ঠরোগী পুরুষের পক্ষে তার সবটাই মনগড়া। যতীনের কুষ্ঠরোগে স্ত্রী হিসেবে মহাশ্বেতা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে জানায়, তা তারই ভাগ্যের লিখন, স্বামীর কোনো পাপ নয়। কিন্তু মানসিক বিকৃতিতে যতীনের কুৎসিত ভিন্ন মূর্তি :

> 'যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে : 'তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলে-খেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পারোনি? না, সাধ-আহ্লাদ এখনো মেটেনি? এখনো বুঝি একজনকে খুব ভালোবেসেছ?'

এই যে মনোধর্মে যতীনের পাঁকের মধ্যে পতন, তা-ই তার রোগী হিসেবে বাস্তবতার দিক। শুধু দেহে নয়, মনেও সে কুষ্ঠরোগীর দেহের পচা-গলা রূপ নিয়ে দিন কাটায়। তার সন্দেহ, রাগ, আত্মরতির মধ্যে মহাশ্বেতার প্রতি অপমানকর মন্তব্য তাকে দেহের অসুস্থতার থেকেও আরও জঘন্য রোগীতে পরিণত করে।

ঈশ্বর, দৈবাদেশে বিশ্বাস ইত্যাদিতে এককালের অনীহ যতীন ক্রমশ মাদুলি, মন্ত্রপূত ফুল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে থাকে। তার চরিত্র পরিণতির দিক থেকে এ-ও এক পতনের ভয়াবহ রূপ। ডাক্তার যখন মহাশ্বেতাকে বিশ্বাস করায়, 'বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।'— তখনি যতীনের রোগ সম্পর্কে তার হতাশার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, আর তার পরেই সে শান্ত থেকে বুদ্ধিতে নির্ভর করে জীবনের দিকে ফেরে নিজের বড় জায়গায় দাঁড়াবার জন্য। কুষ্ঠাশ্রমে মহাশ্বেতার যতীনের প্রতি যে আচরণ, তা যতীনের নিঃসঙ্গতা, স্ত্রীর সঙ্গে চিরকালীন অনন্বয়ের বেদনা, দুঃখ ও আর্তিকে বিষাদঘন করে। যতীন হয়ে যায় একক সত্তায় মৃত, মহাশ্বেতা বহুর জীবনে সপ্রাণ। যতীনের স্বভাবের যে ক্রমিক বিবর্তন, তার মনোলোকের যে ভয়াল রূপ-চিত্র, তা তার বাস্তবতার, একজন কুষ্ঠরোগীর মনোলোকের সত্য রূপের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে। মহাশ্বেতার বিবর্তন ব্যক্তি থেকে সমষ্টির জীবনে অবগাহনে, যতীনের বিবর্তন ব্যক্তিরই এক সংকীর্ণ মন থেকে আর এক সংকীর্ণচিত্ততার মধ্যে।

আদিতে যতীন ছিল যথার্থ অর্থে মহাশ্বেতার প্রিয়তম স্বামী, গল্পের শেষে সেই যতীন আর স্বামী হয়ে নেই, একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সাধারণ রোগী। যতীনের ঠাকুর, দেবতা ও মাদুলি মন্ত্রপূত ফুলে গভীর বিশ্বাস আবার মহাশ্বেতাকে অস্থির কববেই। এই ভাবনাতেই বৃহৎ মানবধর্মে মহাশ্বেতা তাকে অস্বীকার করেছে গল্পের শেষে।

তিন

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পটিতে বিষয় হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃহত্তর মানবতার বাস্তব ভিতের সর্বজনীন রূপাবয়ব। যে মার্কসবাদে বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরবর্তী আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের দীক্ষা দেয়, উনিশশো চুয়াল্লিশের আগের এই রচনায় তারই যেন ভূমিকা রচিত হতে দেখি। এখানে কোনো তত্ত্ব নেই, মানবতার ভাবনা সৃষ্ট চরিত্রের অভ্যন্তর থেকেই প্রকাশ্য হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু জটিল মনস্তত্ত্বের রূপকার নন, তিনি বাস্তব সত্যে দীপিত জীবনভাগ্যেরও রূপকার। তাঁর মানব সম্পর্কের ভাবনা মৃত্তিকাপ্রেমে বলিষ্ঠ।

মহাশ্বেতার মানব বিবর্তনে তারই স্বীকৃতি। তার পরিণতি চিত্রের আগে গল্পের ভূমিকা হিসেবে গল্পকার মহাশ্বেতার স্বামী যতীনের জীবনের যে কর্মফলের দিক এঁকেছেন, তার অলক্ষ্যে আছে তার বাবার অর্থলোভ। সেই অর্থলোভ, সেই ধনী হওয়ার প্রয়াসের মধ্যে আছে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অর্থনীতি। আর এই অর্থনীতিতে একজন সহজেই অনেক মানুষের অর্থ নিয়ে বড়লোক হওয়ার সুযোগ পায়। একজনের অর্থগৌরব তার জীবনে আনে চারিত্রিক অধঃপতন। অন্যায়, অপরিমিত অর্থলোভ ও সঞ্চয় বাসনা বহু মানুষের অভিশাপ কুড়োয়। এই অভিশাপেরই বুঝিবা পরোক্ষ শাস্তি যতীনের দেহে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব। তবু মানিকবাবু এই কার্যকারণ সম্বন্ধের সমর্থনের থেকে অর্থের সঙ্গে যথেচ্ছ ভোগ বাসনা ও লালসাকে যোগ করেছেন। যতীনের ব্যাধি তারই অভিজ্ঞান। এই যে অর্থনীতি সম্পর্কে গল্পকারের ব্যাখ্যা, তা-ই পরবর্তী কালের আর্থ-সামাজিক ধারণার প্রযুক্তিগত বাস্তব সত্যের ভূমিকার আভাস দেয়।

আলোচ্য গল্পে তাই মানিকবাবুর জীবনদর্শন, সমাজদর্শন ও অর্থনীতি-ভাবনার একটি পরিচ্ছন্ন ছকের বীজরূপ, এক খসড়ার পরিচয় মেলে। জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টির পরিচয় গল্পকারের বক্তব্য উপস্থাপনার তিন সূত্রে মেলে 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে। ১. বিপুল ধনীদের অর্থ শোষণের অভিশপ্ত রূপকে প্রমাণ করে। ২. পিছনে কোনো নৈসর্গিক কারণ থাক বা না থাক, তা রহস্যময় হয়েই, কোনো কাজের প্রতিফল ফলেই থাকে, বিপরীত স্বভাবে তা বিযাক্ত এবং ভীষণ হতে পারে। ৩. মানুষই একদিন প্রসারিত মনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। মানুষের সেবাই হয় আন্তর্জাতিক মানব্যভাবনার একমাত্র স্বচ্ছ দর্পণে বিম্বিত মুখস্বরূপ।

যতীনের বাবার অর্থসঞ্চয় তার বিকৃত জীবনের উদ্বোধক ও পোষক। মাত্র আটাশ বছর বয়সেই যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব সেই বিপুল অর্থভোগের জীবন থেকে

জাত প্রাককর্মের প্রতিফলের স্বভাবে বিষাক্ত এবং ভীষণ। কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের পর মহাশ্বেতাকে বলা ডাক্তারের কথা— 'কত রোগ সংসারে আছে.......বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে', তা থেকে মহাশ্বেতার যে মানসক্রিয়া, তা তাকে নতুন জীবন গ্রহণে এক অন্তঃশীল প্রেরণা দেয়, স্বামী যতীন সম্পর্কে এক স্থায়ী ধারণা তৈরি করে :

> 'বংশ! পুরুষানুক্রম! কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা করিয়াছে। ডাক্তার জানিয়াও নির্বিকার হইয়া আছে। হয়তো মনে মনে ডাক্তার সমর্থনও করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।'

মহাশ্বেতার শেষ পরিণতি বহু অসুস্থ, অসহায় সর্বহারা মানুষের সেবার জীবনে চলে আসা! তাদের মধ্যে তার সুস্থ জীবন-বাসনার সম্যক প্রতিষ্ঠা :

> 'মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈরি হইয়াছে, তাহার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা ওরা পায়।'

বস্তুত 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার চিন্তা, বুর্জোয়া অর্থনীতির স্বার্থসর্বস্ব স্বরূপ ও প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য, তার বিকৃত রূপ এবং মানুষের প্রতি সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি ও মমত্বে, বৃহত্তম মানবতায় জীবনের বড় রূপের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠার সূত্রে শিল্পরূপে ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

চার

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে ভাবের একমুখিতা রক্ষিত হয়েছে গল্পকারের নিজস্ব বিশেষ অভিনব শিল্পরীতি প্রয়োগের কৌশলেই। গল্পের মধ্যে ভাবের অনাবশ্যক বিস্তারের সুযোগ নেই, কারণ গল্পকার স্বয়ং একাধিক চিত্রের মধ্যে ভাষ্যকারের ভূমিকায় থেকেছেন। মহাশ্বেতা ও যতীনের দাম্পত্য সম্পর্কের সংলাপনির্ভর একাধিক চিত্রের যে ব্যঞ্জনা, তাকে গল্পকারই ব্যাখ্যা করেছেন গল্পের গতিদানের উপযোগী করে। যে বিবৃতি অংশ আছে তা গল্পেরই প্রয়োজনে লেখকের পরিমিতি বোধে যাচাই করা। গল্পটির ভিতরের অবয়ব যেহেতু গভীর মনস্তত্ত্বমূলক, তাই তার সন্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সংকট প্রত্যেকটি চরিত্র ভাগ্যের অনুগ থেকেছে।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে গল্পের প্রকরণ বৈশিষ্ট্য কিছুটা আলোচনা করেছি প্লটের স্বভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। গল্পের শেষে যতীন যখন মহাশ্বেতাকে কাঁদ কাঁদ হয়ে তার দিকে আদৌ না তাকাবার অভিযোগ করে, তখন মহাশ্বেতা থাকে নিশ্চুপ। এর পরে গল্পকার তিনটি পঙ্‌ক্তির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে বাক্য রচনা করে পরিণামী ব্যঞ্জনায় একটা যুক্তি-চিন্তা মেশানো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রথম অনুচ্ছেদের বক্তব্য গল্পকারেরই, যতীন-মহাশ্বেতার সম্পর্কের বিপরীত স্বভাব— অন্তত মহাশ্বেতার মনের দিক থেকে— বোঝাতেই এমন প্রয়োগ :

> 'সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালোবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।'

ব্যক্তি থেকে সমষ্টির প্রতি সেবায় যে মানবতার বড় দিক, মহাশ্বেতার চরিত্রে জীবনের সুস্থ প্রত্যয়ে তাকে তুলে ধরতেই এই কথাগুলি জানিয়েছেন গল্পকার। মহাশ্বেতার ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকা ও কিছু না বলার মধ্যে সেই ব্যাপারটি স্বচ্ছ হয় না আদৌ, তাই গল্পকার সেই ভাষ্যকারের ভূমিকায় থেকে এমন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা গল্পের পরিণামী চমৎকারিত্ব ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু এর পরেও গল্পকার যখন নিজেই বলেন :

'এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসসাধ্য কথা।'

তখন বোঝা যায়, গল্পকার তাঁর পাঠকদের জটিল মনস্তত্ত্বের জগতে বিচরণে নিষেধ করেছেন। তাঁর এই গল্প যে বুদ্ধির সহজতা ও বোঝার মতো অনায়াস স্বভাবেই শিল্পধন্য, সেকথা নিজে উপস্থিত থেকে অকপটে জানিয়েছেন। এই প্রয়াস সমগ্র গল্পের মধ্যে একাধিকবার গল্পকারের সচেতনভাবে উপস্থিত থাকারই শেষ প্রয়াস।

সবশেষে গল্পকার যখন বলেন প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে :

'মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বউ।'

তখন তাঁর মহাশ্বেতা চরিত্র সৃষ্টির মূল লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত তাঁর কথাতেই যেন সমগ্র গল্পের লক্ষ্য ব্যাপকতা পায়। যতীনকে পাশে নিয়ে মহাশ্বেতার যে দিনের পর দিন মানসিক সমস্যা, সংকট ও কৃচ্ছ্রসাধন, তা তাকে দেবীদের মতো সহনশীল, পবিত্র মনের স্ত্রী হিসেবে পাঠকদের কাছে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। তার যে স্বামীর জটিল বন্ধন থেকে মুক্তির আর্তি, তা স্বামীকে অবজ্ঞা, অবহেলা নয়, তার রক্তমাংসের সত্তারই স্বাভাবিক কামনা। সে যে একজন কুষ্ঠরোগী— যে বাইরে নয়, মনের ভিতরেও দুরারোগ্য, ভয়াবহ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। অন্যদিকে তার স্ত্রী, তারও তো বাঁচার প্রয়োজন সুস্থভাবে! তাই সে কুষ্ঠরোগীর বউ বলেই, রক্তমাংসের বাস্তব মনের বউ বলেই অসুস্থ জীবন থেকে বাঁচতে চায়। তার কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে সেবা তার নিজস্ব রক্তমাংসের জীবনের আকাশ রচনা, দেবী হয়ে সেবামন্ত্রে দীক্ষা নয়। তাই গল্পের ব্যঞ্জনা মহাশ্বেতার বাস্তব মন ও অস্তিত্বতেই জীবনমুখিন থেকে যায়।

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের ভাষা আদ্যন্ত মেদহীন, রোমান্টিক আবেগবর্জিত, জটিল মনস্তত্ত্বের একান্ত সমর্থক। গদ্যরীতির মধ্যে যুক্তি আছে, মনন আছে। একাধিক বাক্যে তার সফল প্রমাণ মেলে :

১. 'এ কথা কে না জনে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া?'
২. 'সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না।'
৩. 'তোমাকে ভালোবাসি, না, তোমার চেহারাকে ভালোবাসি বুঝতে পারি না।'
৪. 'এ জগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই না! মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙে গড়ে।'
৫. 'তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক-এক সময় সে শুধু বেশি

বাতাসের প্রয়োজনে জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মতো শোনায়।'

৬. 'সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ওসব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া যায়।'

এমন সব বাক্যের মধ্যে যে বুদ্ধি দিয়ে এক ভাবনার খেলা থাকে, তা কখনো জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়, কখনো বা ঔজ্জ্বল্য দিয়ে গল্পের গদ্যের অলংকার হয়ে থাকে। 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের ভাষারীতিতে এমন একাধিক প্রয়োগ গল্পকারের জীবন ব্যাখ্যার চমৎকার নিদর্শন হয়।

পাঁচ

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের নামের লক্ষ্য অবশ্য নায়িকা-চরিত্রনির্দেশক, তা হল মহাশ্বেতা। নামের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা চরিত্র ধরেই স্পষ্ট হবে। নামের মধ্যে কিন্তু একটি মাত্র চরিত্র-নির্দেশ নেই, যতীন ও মহাশ্বেতা দুজনেই উপস্থিত। কুষ্ঠরোগী যতীন ও তার সুস্থ বউ মহাশ্বেতা দুজনেই এমন গল্প-নামে স্বস্থানে আছে। গল্পটি যেহেতু যতীনের কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে যতীনের যেমন, তেমনি মহাশ্বেতারও প্রতিক্রিয়ার গল্প, তাই নাম-তাৎপর্য প্রাথমিক অর্থে মান্য।

দ্বিতীয় একটি দিক নামের ব্যঞ্জনায় লক্ষ করার মতো। স্বামী এক ভয়ঙ্কর বীভৎস রোগে আক্রান্ত হলে তার সুস্থ স্ত্রীর কি কর্তব্য থাকতে পারে, তার মানসিকতায় কোনো কোনো ক্রিয়া আসতে পারে, সেটা অবশ্যই জটিল পরীক্ষার বিষয়। কুষ্ঠের মতো রোগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিকভাবে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মনের মধ্যেও দেখা দেবে জটিল অনন্বয়ের ধর্ম। যে ব্যাধি একেবারে দুরারোগ্য এবং বীভৎস, তাকে সহ্য করে জীবন ধারণ ও যাপন অবশ্যই 'বউ'-এর পক্ষে এক অগ্নিপরীক্ষার দিককে মেনে নেওয়া! মহাশ্বেতার কাছে যতীনের রোগগ্রস্ত জীবন এক অগ্নিপরীক্ষারই সামিল। তাই গল্পনামে তার স্বরূপ মানতে হয়।

তৃতীয়ত, কুষ্ঠরোগীর বউ হয়ে স্বামীর জটিল মনের সীমা থেকে মুক্তি চেয়েছে মহাশ্বেতা সুস্থ জীবন-বরণের আশায়। সে চলে এসেছে কুষ্ঠরোগীদেরই সেবা ও মমতা মাখানো মানবতার ধর্মে দীক্ষিত হতে। গল্পে হয়েছেও তাই। গল্পের শেষে সে আর বিশেষ কুষ্ঠরোগী যতীনের স্ত্রী থাকেনি, সে বহু মানুষের সেবিকা হয়ে বড় প্রাণের রমণী হয়ে গেছে। যতীনের শুধু দেহেই কুষ্ঠরোগ নেই, আছে তার মনেও। মহাশ্বেতা বাহির ও ভিতর— যতীনের দুই মনের ছোঁয়াচ থেকে সরে এসেছে নিজেকে সুস্থ রেখে বড় জীবনযাপন করতে। এই যে একটি রমণীর জীবনের উত্তরণ, তা কুষ্ঠরোগকে অস্বীকার করতেই! আবার কুষ্ঠরোগ নির্মূল করতেই তার বর্তমান জীবন সাধনা। এই যে নিজের অসুস্থ জীবন পরিবেশ থেকে, স্বামীসঙ্গ থেকে সরে এসে বড় জীবনে সেবায় ব্রাত্য হওয়া, এই চরিত্র পরিণতিতে গল্পনাম সার্থক।

আশাপূর্ণা দেবী

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯০৯

বিশ শতকীয় বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আশাপূর্ণা দেবী এক গভীর বিস্ময়। বিস্ময় এই কারণে নয় যে, তিনি কল্লোলের কাল অতিক্রম করে বাংলা কথাসাহিত্যে অ-কল্লোলীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাকারদের পাশাপাশি তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাসে একেবারে নতুন, মৌলিক চিন্তা-ভাবনার কোনো কথা লিখে গেছেন, আবার এই কারণেও নয় যে, তিনি একই সময়ে একান্ত নিজস্ব এক যুগ-পরিবর্তন-ক্ষম কোনো জগৎ তৈরি করে গেছেন কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল পরিবেশে। বস্তুত, বিস্ময় তাঁর সাহিত্য-জীবনের চল্লিশের দশকের শুরু থেকে পরবর্তী নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি বিপুল পরিমাণ গল্প-উপন্যাসের জন্ম দিয়ে গেছেন অবলীলায়। এই পরিমাণগত সৃজনক্ষমতা একালের পাঠকদের রীতিমতো বিস্ময় জাগায়।

১৯৪০-এ আশাপূর্ণার প্রথম গল্প সংকলন বেরোয় 'জল আর আগুন' নামে, ১৯৪৪-এ প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' পাঠকদের হাতে আসে। এর পর থেকে লেখিকা এক একটি বছরে কমপক্ষে সাতটি হিসেবে উপন্যাসের জন্ম দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে আবার তিন-চারটি করে তাঁর গল্পের বই-এর সংখ্যাও যোগ করতে হয়। একটানা এভাবে লেখার বিষয় ও সময় নিশ্চয়ই উল্লেখ করার মতো। অথচ তিনি ছিলেন একজন নিপুণ দক্ষ গৃহিণী, ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণত নিষ্ঠাবান পারিবারিক-সামাজিক, আচার-আচরণপন্থী ধর্মবিশ্বাসী মহিলা। একান্নবর্তী বাঙালি পরিবারে বধূ ও মা, পিতামহী-মাতামহী স্বভাবে শুদ্ধশীলা রমণী বৈশিষ্ট্যে আশ্চর্যরকম নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন আ-মৃত্যু। এই গুণ সমগ্র বাঙালি নারীসমাজে, অন্তত আশাপূর্ণার ব্যক্তিগত জীবন ও স্বভাবে-সংসারে এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

দুর্লভ এই কারণে যে তিনি তীব্র ব্যস্ততম সুখ-দুঃখময়, অথচ পরিপূর্ণ শান্তির গৃহজীবনের মধ্যে লিখেছেন একশো একাশিটি উপন্যাস, ছোটগল্প ও আত্মকথা ইত্যাদি মিলিয়ে আনুমানিক চৌত্রিশটি গ্রন্থ, ছোটদের বইও সম্ভবত পঞ্চাশোর্ধ্ব। আমাদের মতে উত্তুঙ্গ নিখাদ কল্পনার অধিকারী না হলে এত রচনা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হত কিনা সংশয় থেকে যায়। প্রসঙ্গত আশাপূর্ণার লেখকজীবন শুরুর মানস গঠনের কথা মনে আসে। কঠিন রক্ষণশীল পারিবারিক প্রথা ও সংস্কারে আশাপূর্ণার পক্ষে কোনো স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কোনো বাইরের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এসেও তাঁর পাঠে নিয়মিত সহায়তা করেননি। একমাত্র মায়ের সান্নিধ্যই তাঁর পড়া ও সাহিত্যচর্চার প্রেরণা হয়।

একমাত্র মায়ের সাহিত্যপাঠের অসীম উৎসাহ, আকাঙক্ষা, আর্তিতেই বাড়ির অন্দরমহলে আসে, জমতে থাকে প্রচুর গল্প-উপন্যাস গ্রন্থ। সমসময়বর্তী বিচিত্র সব পত্র-পত্রিকা ও শিক্ষিত মামার বাড়ির প্রভাব এসবে নতুন প্রেরণা ও তৃপ্তি-রসের জোগান দেয়।

আশাপূর্ণার স্বীকৃতি মতো, ১. 'জানালা দিয়ে দেখা' কলকাতার শহরজীবন, ২. নিশ্চিতই 'গৃহবন্দী'র পারিবারিক জীবন, ৩. 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অনুরূপা দেবীর একাধিক গ্রন্থের রুদ্ধশ্বাস সান্নিধ্য, ৪. বাড়ির মধ্যে নিয়ে-আস' প্রচুর গ্রন্থপাঠের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও রস-শিক্ষা— এসবই আশাপূর্ণার কল্পনাকে নিজ সাহিত্য রচনার প্রেরণা ও উপকরণ দেয়, কোনো প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর লেখার প্রেরণা ছিল না। ঠিক যেমন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচনার মূল প্রাথমিক প্রেরণা ছিল সম্পূর্ণত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, আশাপূর্ণারও তা-ই। তবু শরৎচন্দ্র পরবর্তী সময়ে যথার্থ বোহেমিয়ান জীবন-অবলম্বনে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়েছিলেন বলেই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি অভয়া, শ্রীকান্ত, কমললতা, রাজলক্ষ্মীদের মতো মানুষজন। আশাপূর্ণার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়নি।

অথচ আশাপূর্ণা কত বিচিত্র সব চরিত্র এঁকেছেন! তা সম্ভব হয়েছে, আগে যা বলেছি, তাঁর উত্তুঙ্গ কল্পনাশক্তির কারণেই। কিন্তু এই কল্পনাশক্তি সমসাময়িক লেখকদের লেখা পড়েই, তাঁদের কল্পনাশক্তির সঙ্গে গভীর মিলেমিশেই সম্ভব হয়েছে। আর সব লেখক-লেখিকাদের মৌলিক কল্পনাশক্তিই আশাপূর্ণার কল্পনাশক্তির ভিত, প্রেরণা ও উদ্বোধক। এখানেই তাঁর লেখক-মন ও সৃষ্টির সীমা। তা অভিজ্ঞতার মাপে পরাধীন, বিশ শতকীয় স্ব-উপার্জিত অভিজ্ঞতার নিকষ কষ্টিপাথরে যাচাই করা স্বাধীন প্রেরণা ও উপকরণের উৎস-মুখ দেখায়নি।

একজন যথার্থ কথাকারের মমতা, সহানুভূতি আশাপূর্ণার ছিল, তবে বিশ শতকীয় বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যে তা নিরাসক্ত থাকেনি। বিশ শতক বিজ্ঞানের যুগ, বুদ্ধি-বিবেচনার সফল রূপের প্রেক্ষিত। কল্লোলের প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার থেকে শুরু করে জগদীশ গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, কবি জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ যেভাবে জীবন সাহিত্য শিল্পকে নতুন চিন্তা-ভাবনায়, স্বভাবে, দর্শনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, আশাপূর্ণা সেখানে নিজস্ব জগতেই থেকেছেন— যেনবা তা পরিবার-জীবনের 'কারান্তরালে' আত্মগোপনের সামিল। কল্লোলের কাল, দুটি বিশ্বযুদ্ধ যেভাবে শিল্প-সাহিত্যের প্রথানুগ শরীরে আঘাত করে, একই সময়ে আশাপূর্ণা কথাসাহিত্য রচনা করতে বসে সেই বিশ শতকীয় বুদ্ধিগত জীবন ব্যাখ্যার সামিল হতে পারেননি।

এর মূলেও সেই একই কারণ—গৃহবন্দি পরিবার জীবন ও অন্যান্য সমকালীন লেখকদের লেখার 'গোগ্রাসী' প্রভাবের মধ্যে নিজ কল্পনার মাটি প্রোথিত রেখে সাহিত্য ভাবনার রসদের রসমূর্তি দানের প্রয়াস। আশাপূর্ণা দেবীর মৃত্যুর পরেই এক প্রাবন্ধিকের মন্তব্য— 'বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ যুগের সমাপ্তি ঘটল।' আর একজন সহৃদয় গল্পকার-কবি-প্রাবন্ধিক আশাপূর্ণা-পাঠিকা প্রশ্ন তুলেছেন, 'আশাপূর্ণার মৃত্যুকে "বাংলা সাহিত্যের ইন্দ্রপতন" বলে বর্ণনা করা হল না কেন?' সাহিত্যে এক একটি যুগ হয়ে-ওঠা

কি খুবই সহজ? আমরা 'বঙ্কিমযুগ' জানি, 'রবীন্দ্রযুগ' বলতে নির্দ্বিধ। কিন্তু তার পরে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে, বরং বিতর্কিত 'যুগ' না বলে, একটা বড় মাপের বদলের দিক বুঝি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ দুজনেই একই সম্মানে নতুন যুগের স্রষ্টা, যুগের সৃষ্টিও। পরবর্তী শরৎচন্দ্রকে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রবীণপ্রাজ্ঞ সমালোচক বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্য বাংলা সাহিত্য কতটা প্রস্তুত ছিল, সংশয় আসে। শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে কোনো যুগ হয়নি, হওয়া সম্ভব ছিল না কথাকারের নিজস্ব শিল্পভাবনার সীমাবদ্ধতায়। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ শতকীয় বাংলা কথাসাহিত্যের এক একটি মূল্যবান স্তম্ভ। এঁরাও যুগ তৈরি করেননি, কিন্তু নিছক সমাজ নয়, জীবনের ও সময়ের অসাধারণ নতুন ব্যাখ্যায় এক একটি জ্যোতিষ্ক এঁরা। আশাপূর্ণার লেখায় সেই একেবারে মৌলিক দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখা ও ব্যাখ্যা করার দিক কোথায়? কোন ধরনের একেবারে মৌলিক জীবনদর্শনের প্রবক্তা তিনি? আশাপূর্ণা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' নামে নারীমুক্তির 'ট্রিলজি' রচনা করেছেন অসামান্য ক্ষমতায়। তাঁর পরিবার জীবন প্রেরণা ও অভিজ্ঞতা এখানে লেখিকার কল্পনাগুণে বড় মর্যাদা পেয়েছে। তার মূল্যমান বিস্ময়করভাবে নন্দিত হবার যোগ্য। কিন্তু এসবের আগে রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময়ীর (স্ত্রীর পত্র) ও আরও সৃষ্ট বহু নারীর মধ্যে বিশ শতকীয় মৌলিক বুদ্ধি-বিস্ময়ে নারীদের পাই। সুতরাং আশাপূর্ণার সেই উত্তুঙ্গ কল্পনার সুষ্ঠু ও সুষমামণ্ডিত পরিবেশন যতটা জাগায়, ততটা পূর্বসূরিদের তুলনায় ভাবায় কতটা?

যাইহোক, আশাপূর্ণার স্থান নির্ণয়ে তাঁর মৃত্যুকে এক যুগাবসান— এমন ভাবনা যেমন গুরুত্বহীন, তেমনি তাঁর মৃত্যু এক 'ইন্দ্রপতন'— এ ভাবনাও একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি। শরৎচন্দ্রের যথার্থ উত্তরসূরি আশাপূর্ণা— তাঁর জনপ্রিয়তায়, কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যেও। প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র যে ঐতিহ্যের স্রষ্টা, আশাপূর্ণা সেই ঘরানার লেখক— কেবল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনাময়তায় তিনি নিজস্ব একটি শিল্প-পরিবেশ রচনা করে গেছেন— যা সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসুদের থেকে স্বাদের স্বাতন্ত্র্যটুকুতে বিশিষ্টতা পায়, জীবন জিজ্ঞাসায় তটস্থ হয় না। জীবন এক একেবারে অগোছালো 'Chaotic' বিষয়, তাকে একই সঙ্গে হৃদয় ও বুদ্ধির মাপে ভাঙাগড়া এবড়ো-খেবড়ো হাঁটাচলার পথে রেখে দেখতে হবে। বিশ শতকের প্রধান শর্ত কথাকারদের কাছে তা-ই। একমাত্র আশাপূর্ণা সে বিষয়ে সীমা-শান্তির লেখিকা, বিশ শতকের মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কঠিন জীবনচিত্রী লেখিকারা যেভাবে রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতায় জীবন-যাচাই করেছেন, তার শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, সমকালে থেকে আশাপূর্ণার সাহিত্য প্রেরণা ও প্রকাশ সেখানে আমাদের বিশ শতকীয় বোধে অ-তৃপ্ত রাখে।

আমার আলোচ্য প্রধানত আশাপূর্ণার ছোটগল্প। লেখিকা তাঁর কল্পনাশক্তিতেই গল্প বলে গেছেন সূক্ষ্ম চালে, গল্প লেখেননি বুদ্ধির বিশুদ্ধ আগুনে আলোকিত করে। গল্প বলায় প্রকরণ গুরুত্ব পায় না, গল্প লেখায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ সমান মর্যাদা পায়। তাই তাঁর

গল্পে শরৎচন্দ্রকে দেখি, বিশ শতকের প্রকৃত পোশাকহীন অবয়বে দেখি না। লেখিকা আশাপূর্ণা মনেপ্রাণে, হৃদয়ধর্মে পারিবারিক, বিবেকি মনোধর্মের বৈজ্ঞানিক জীবনরসিক নন। মনে রাখা দরকার, শিল্পসাহিত্যের একজন স্রষ্টার লেখায় সত্য-স্বত্বের অধিকারে পুরুষ লেখক ও মহিলা লেখক— এই ভেদ ভিত্তিহীন, হাস্যকর। আশাপূর্ণা সর্বাবয়বে শিল্পীমনে একজন লেখকই, তাঁর বিচার সমস্ত লেখকদের পঙ্‌ক্তিতে রেখেই একমাত্র যথার্থ, মহিলা বলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্র আলোচনা একেবারেই নিরর্থক, বিভ্রান্তিকর। শিল্পের সত্য মহিলা-পুরুষ শিল্পীব নিরপেক্ষ ধর্মের স্বত্ব-সম্পূর্ণতা পায়।

আশাপূর্ণার হাতে পেয়েছি তাঁর প্রথম লেখা 'পত্নী ও প্রেয়সী' (১৯৩৬) থেকে শুরু করে চল্লিশের দশকে লেখা 'লালশাড়ী' (১৯৪৭), 'বাজে খরচ' (১৯৪৭), 'প্রস্তাব', 'পবাজিত হৃদয়', 'অনবগুণ্ঠিতা', 'না', 'আয়োজন', 'আত্মহত্যা' (১৯৪৭) ইত্যাদি গল্প। বাংলা গল্প যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমস্ত প্রথা ভেঙে নতুন নতুন রূপে সামনে আসছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাল থেকে ক্রমশ পরবর্তী ধারায়, তখন আশাপূর্ণা গল্প লিখছেন না, গল্প বলছেন, বানাচ্ছেন আপন গণ্ডিতে বসে। বলায় কল্পনার খেলা আছে, নেই প্রকরণের বুদ্ধিগত দৌত্য, অভিনবত্ব—যা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের বিধ্বস্ত পরিবেশে নিশ্চিত সময়ের নবরূপ। 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি ১৯৪৭-এ লেখা। এ গল্পটিও বানানো-স্বভাবে আক্রান্ত, গল্পের 'শ্রেষ্ঠত্ব' অবশ্য অন্য কৌণিকতায় ধরা পড়ে।

শরৎচন্দ্র যতটা বড় মাপের ঔপন্যাসিক, ততটা ক্ষমতাসম্পন্ন গল্পকার নন। আমরা আশাপূর্ণাকে শরৎচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরি বলেছি কোনো কোনো দিক থেকে। ছোটগল্পে আশাপূর্ণা অবশ্যই নিজস্বতা কিছুটা রাখতে পেরেছেন তুলনায়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যখন একান্ত দুর্বোধ্য সাধারণ গড়পড়তা পাঠকদের কাছে, এমনকি বেশ কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পাঠকদের মনোলোকেও, যখন শরৎচন্দ্র সেভাবে আসেননি পাঠকদেব সামনে, সেই মধ্যবর্তী সময়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিছুটা গল্পে স্বতন্ত্র স্বাদের প্রমাণ দিয়ে গেছেন। বস্তুত একটা vaccuum তখন। শরৎচন্দ্র এই মধ্যবর্তী সময়কেই ঝড়ের মত্ততায় জনপ্রিয়তার বিজেতা-স্বভাবে দামাল করেন। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিশাণিত জীবন জিজ্ঞাসায়, মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর রৌদ্রতাপে শরৎচন্দ্র ছিলেন বর্ষার বারিস্পর্শ।

আশাপূর্ণার আবির্ভাবও তা-ই—অন্তত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। কল্লোলের সময়কে বোঝাব ক্ষমতা আশাপূর্ণার ছিল না। তিরিশের দশকের শেষে যুদ্ধের সর্ববিনাশি স্বভাবকেও আশাপূর্ণার বুঝে ওঠা হয়নি। কিন্তু যখন ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ বাংলা ছোটগল্পের প্রকরণ ও বিষয়, মানুষজন নিয়ে স্থিত-চিন্তিত, তখন আশাপূর্ণা সহজ কণ্ঠে গল্প বলার আসরে নামেন। অনুরূপা দেবী প্রমুখ লেখিকাদের বিশিষ্ট পাঠিকা কোন আদর্শে গল্প লিখবেন ? কোনো যুগস্রষ্টা নন, কোনো নতুন যুগের প্রবক্তাদের আদর্শ নয়, সোজা শরৎচন্দ্রকে ধরে রেখেই গল্পের প্রকরণ ভাবেন, বিষয়ে যোগ করেন বিচিত্র সব মানুষদের। তাই আশাপূর্ণার ছোটগল্প হয় এক অর্থে নির্বুদ্ধি অথচ শিক্ষিত গড়পড়তার পাঠক-পাঠিকাদের গোপনে মন ও হৃদয়ের আরাম।

কিন্তু আমরা আবার বলি, নিজস্ব একটা স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনাময়তা আশাপূর্ণার মধ্যে কাজ করত। তাতেই সর্বস্তরের মানুষদের স্খলন-পতন, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল মন ও মনন, চরিত্রের ভিতরের অতিপরিচিত টেনশনকে মধুর আবেগে আকর্ষক ও স্বাদু করে আশাপূর্ণা গল্প লেখেন। আর একেবারে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারই তাঁর গল্পের বড় বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এতে সব স্তরেব মানুষ এসে ভিড় করে—ব্যবসাদার থেকে শুরু করে চাকুরে, বেকার, শিক্ষক, খুনি, পকেটমার ইত্যাদি কে না? এদের জন্য বুদ্ধির বিচার দরকার পড়ে না, হৃদয়বৃত্তির জটিল অন্ধকার, নানান বৈপরীত্যকে বানিয়ে দেওয়াতেই শিল্পীর হাতের সৃজন মাত করে পাঠকহৃদয়। আশাপূর্ণার গল্প তাই সর্বস্তরের পাঠকদের স্বাদগ্রহণের ক্ষমতায় মুক্তির আকাশ আনে।

নাটক, আকস্মিকতা, কৌতূহলী উন্মুখতা— এসব তাঁর গল্পের প্রকরণ শানানো অস্ত্র। আশাপূর্ণা গল্পে পরিবার জীবনকে ভোলেননি, সমাজকে চোখে চোখে রেখেছেন, আর মানুষজনকে সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি থেকে কুড়িয়ে আনা বহু বিচিত্র বর্ণের রহস্যময় মৃত ছোট ছোট প্রাণীর দেহের মতো আকর্ষক করেছেন। ছোটগল্প রচনায় তিনি স্ব-ক্ষেত্র নির্মাণ করে গেছেন, ভালো ভালো একাধিক গল্প লিখেছেন, কিন্তু ছোটগল্প যে নতুন নতুন জটিল বিষয় ও মনস্তত্ত্বে, রীতির নব নব পোশাকে বিস্ময় জাগিয়ে চলেছে, আশাপূর্ণা সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। আসলে, একেবারে বিশেষভাবেই বুদ্ধিপ্রাণিত সারা বিশ শতক জুড়ে যে নতুন জীবন-অন্বেষা নতুন ফর্মের দ্বারস্থ হতে বাধ্য, বিবেকি এই বোধের অভাবেই আশাপূর্ণা নিজের জগতের লেখক, সময়ের থেকেও সময়াতীতের ফসল নন।

১.

ছিন্নমস্তা

এক

আশাপূর্ণা দেবীর 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হয় বাংলা তেরোশো ছাপ্পান্ন-র, ইংরেজি উনিশশো উনপঞ্চাশের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হওয়ার আগে তাঁর চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে— প্রেম ও প্রয়োজন (১৯৪৪), অনির্বাণ (১৯৪৫), মিত্তিরবাড়ি (১৯৪৭) এবং বলয়গ্রাস (১৯৪৯)। এই সময়-সীমায় মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছে— জল আর আগুন (১৯৪০) ও সাগর শুকায়ে যায় (১৯৪৭)। প্রথম মুদ্রণের পর 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি এই বিশেষ নামের বা অন্য কোনো নামের গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৪-য় প্রকাশিত হয় লেখিকার তৃতীয় গল্প সংকলন 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থ নামে। এই গ্রন্থেই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি। এর পর লেখিকার নিজস্ব 'গল্প-সমগ্র' (১৯৯১), একাধিক লেখকের গল্প নিয়ে 'নায়িকা পঞ্চবিংশতি' (২০০০) সংকলন নামে এই গল্পের স্থান হয়। পরবর্তী আরও সংকলনে এই গল্পটি মর্যাদার সঙ্গে স্থান পায়।

এই সমস্ত তথ্য থেকে বোঝা যায়, 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি গল্পকার আশাপূর্ণার লেখক জীবনের একটি অন্যতম সৃষ্টি। একাধিক তথ্য বুঝিয়ে দেয়, প্রকাশকাল ধরলে 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের শারদীয় উৎসবের আগেই লেখা। সময়কাল তখন অবশ্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শুধু নয়, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা-পরবর্তী, স্বাধীনতা প্রাপ্তিরও পরবর্তী সময়ের রচনা। ১৯৪৯ সাল মানেই তখন স্বদেশী শাসক কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী আন্দোলন তীব্র হতে শুরু করেছে। স্বাধীন হওয়ার পর বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ঘটেছে অবসান। লক্ষণীয়, এই সময়ে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বর্তমান গল্পের বিষয় নিয়েছেন বিধবা শাশুড়ি ও তরুণী বধূর পারিবারিক ও সামাজিক মানস-সংঘর্ষ ও সংকটের উজ্জ্বল প্রেক্ষিত। তখন কিন্তু একালের মতো বধূহত্যা ও বধূর আত্মহননের ঘটনা তেমন প্রকাশ্যে ছিল না। অবশ্যই বধূর আত্মহনন ও গৃহত্যাগ ছিল পুরনো সংস্কারের ও ঐতিহ্যের অনুপন্থী। তখন সামাজিক বাস্তব ঘটনায় ও লেখায় বধূর যন্ত্রণা, শাশুড়ির অভিমান ও অহংকৃত আত্ম-অভিমানের পরিচয় মিলত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সংবাদ তেমন মিলত না। এর কারণও বোধ হয় এমন এক বিষয়, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে পারিবারিক-সামাজিক সমস্যার ঊর্ধ্বে বধূ নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ ও শাশুড়ির দিক থেকে নিজ অতীতের বধূ-অবস্থায় অত্যাচারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চাপা আক্রোশ এক কেন্দ্রীয় সমস্যার বিপরীত স্বভাবে চোখে আসত না।

'ছিন্নমস্তা' অবশ্যই চরিত্রনির্ভর তথা প্রধান-চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প। গল্পের প্লট-গঠনে লেখিকা কোনোক্রমেই কেন্দ্রীয় চরিত্রকে এতটুকুও স্বাধীনতা দেননি। গল্পে নিজে উপস্থিত থেকে তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গল্পটি আবার উত্তমপুরুষেও লেখা নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, আশাপূর্ণা দেবী কোনো গল্প লিখতে বসেননি, পাঠকদের

শোনানোর জন্য একটি নিটোল গল্প বানাচ্ছেন, বলে চলেছেন। একমাত্র চরিত্রের দিকে তাকিয়েই গল্প বলার টানা কোনো কাহিনী নেই। একটা বড় ঘটনা—পুত্র বিমলেন্দুর আকস্মিক মৃত্যু, তা-ও লেখিকার বর্ণনার মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় প্লটের জটিলতা অন্তত কাহিনী-ঘটনার বৃত্তে মাকড়সার জালের স্বভাব পায়নি।

মূল গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র— লেখিকার কেন্দ্রীয় সমস্যা ও লক্ষ্যের অনুগ— বিধবা জয়াবতী। তার একটিমাত্র পুত্র বিমলেন্দু। সে শিক্ষিত, গ্র্যাজুয়েট। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চাকরি করে। তারই হুগলী থেকে বিবাহ করে এক সময়-গড়ানো সকালে বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার প্রথম খবর জানিয়ে গল্পের শুরু। বউ সুন্দরী প্রতিভা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া কৈশোর-সীমার তরুণী। পাড়াগাঁয়ের স্বভাব-মেশানো মফঃস্বল শহরে মানুষ আর্থিক সচ্ছলতায়। এমন বিবাহের আগেই বিধবা জয়াবতীর কত সাধ-আহ্লাদ-কল্পনা আছে পুত্র-পুত্রবধূর সুখী সংসার নিয়ে, পুত্রকে সফল সংসারী করার বাসনায়, একজন এক সন্তানের বিধবা মায়ের দিক থেকে জীবনের চরম ও পরম কর্তব্যটুকু পালন করার আন্তর শপথে। শাশুড়ি-বউয়ের তিক্ত সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা প্রায় ঐতিহ্যসম্মত প্রথার মতো প্রচার হয়ে আছে। জয়াবতী সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করে উভয়ের সখ্যতায় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হতে চায়।

কিন্তু জয়াবতীর সংসারে নববধূ হয়ে সুন্দরী প্রতিভার সদস্য হওয়ার পর একে একে শাশুড়ির সমস্ত কল্পনা ধূলিসাৎ হতে থাকে। জয়াবতীর সংসারে বধূ হয়ে আসার পরেই প্রতিভা শ্বশুরবাড়ির না-পছন্দের নানা দিক ধরে ধরে তার স্বামী বিমলেন্দুকে হাসির প্রলেপ দেওয়া তিক্ত বিদ্রূপের কথা শোনাতে শুরু করে। বাড়িতে নতুন বধূর মুখ দেখার মতো বড় আয়না নেই, দরজা-জানালায় ছেঁড়া কাপড়ের পর্দা ঝোলানো দীন-দারিদ্র্য। বাড়িতে বাপের বাড়ির মতো কলের জল, লাইট, ফ্যান নেই। সারা গ্রাম জুড়ে ভয়ঙ্কর ধরনের ম্যালেরিয়ার ভয়। এসব কথা জয়াবতী ছেলে-বউয়ের সংলাপ বিনিময়ের আড়ালে শুনতে পায়। এসবে জয়াবতী কখনো তার কাজে-কর্মে অবশতা উপলব্ধি করে। কখনো ওর শান্ত ঠাণ্ডা স্বভাব চাপা ক্রোধে অন্যরূপ নেয়। পুত্রকে এ বিষয়ে কিছু বলতেও পারে না, রুচিতে বাধে। তা ছাড়া বিমলেন্দুও বিবাহের আগের দিনগুলির মতো মায়ের সঙ্গে আপন হয়ে কথাও বলে না, যেন এড়িয়ে যায়। জয়াবতী ক্রমশ স্পৃহাহীন তিক্ত, বিষাদগ্রস্ত মনের রাগ চেপে রেখে বধূ সম্পর্কে নিরাশ হতে থাকে। শেষে পুত্র সম্পর্কেও।

বিয়ের কিছুদিন পর বিমলেন্দু মাস দুয়েকের জন্য প্রতিভাকে বাপের বাড়ি রেখে আসে। জয়াবতী নিজেই গ্রাম্য বধূ, প্রাচীনা, বিধবার সংস্কার তার মধ্যে কম নয়। নতুন বধূ বাপের বাড়ি থেকে আবার জয়াবতীর সংসারে ফিরে আসার পর তার সঙ্গে সেই সব সংস্কার নিয়ে বাধে তীব্র সংঘাত। বিমলেন্দুও ক্রমশ বউ-এর পক্ষ নিয়ে মাকে অপমান করে যায়। জয়াবতী প্রতিভা এবং বিমলেন্দু—দুজনের কাছ থেকেই মানসিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বধূ ও শাশুড়ির সংঘাত-সংঘর্ষ গ্রামের প্রতিবেশীদের রসাল

আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। যেন দুজনেই বেপরোয়া, কেউ কোনো শালীনতা, সৌজন্যের সীমা আর রাখে না। একসময়ে জয়াবতীর রান্নার উপকরণ, খাদ্য-ব্যবস্থা নিয়ে, বিশেষ খাদ্যের প্রতি প্রীতি বিষয়ে প্রতিভা অশালীন ভাষায় শাশুড়ির লোভের কুৎসিত স্বভাবের দিকে ইঙ্গিত করে, নিজের পিত্রালয়ের সচ্ছল আহার-ব্যবস্থার কথা তোলে। বধূর দিক থেকে এই চরম আঘাতে জয়াবতী হয় বোবা। তার আশ্রয় এবার চরমতম রাগ-দুঃখ, অভিমান-অসম্মান-অপমানে দরজা-বন্ধ করা পুজোর ঘর। পরিবারের আরাধ্য দেবতাই তার সব অভিযোগ জানানোর শান্তি-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র সাহস।

বধূ-শাশুড়ির এমন চরমতম অনন্বয়ের মধ্যে হঠাৎ ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে কলকাতায় বিমলেন্দুর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় জয়াবতীর পাথর হয়ে যাওয়া উচিত, পাগল হতেও পারে— এটা ভেবেছিল প্রতিবেশীরা। কিন্তু না, জয়াবতী সদ্য বিধবা পুত্রবধূ প্রতিভাকে নিয়েই সংসারে দিন কাটায়। এবার অদ্ভুত এক সখ্যতা গড়ে ওঠে বাক্যহীন প্রতিভা ও অসম্ভব সহনশীলা শাশুড়ির মধ্যে— সবদিকের আচার-আচরণে। জয়াবতীর তো নাতি নেই। প্রতিবেশীরা নতুন ভাবনায় কৌতূহলী ওদের বিষয়ে। সদ্য বিধবা বধূর প্রতি বিধবা শাশুড়ির কণ্ঠস্বরে যে মমতাময়তা— তার কারুণ্য কি রকম! লেখিকা গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনার দিক দেখিয়ে দিয়েছেন নিজেই : '........জয়াবতীর কণ্ঠস্বরে— মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তাহার মুগ্ধচ্ছায়া? চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের অতিসূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিযাক্ত হাসির আভাসে?'

'ছিন্নমস্তা' গল্পটির এমন কাহিনী-সংক্ষেপ ও বিষয়-ভাবনা জয়াবতী-প্রতিভা-বিমলেন্দু— এই চরিত্র তিনটি ধরে প্লটের জটিলতায় স্বাধীন স্বভাবে তৈরি হয়নি, হয়েছে লেখিকার নিজস্ব নির্দেশে, ভাবনায়, দেখার বিশেষ চোখে। তাই এর প্লট-কাহিনী ও ঘটনায়, চরিত্রের স্বভাব এবং 'থিম'-এর লক্ষ্য হয়েছে সহজ, সরল, গল্প-বানানোর। যে কোনো চরিত্রপ্রধান গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল— ১. টানা কাহিনী ও ঘটনা কম, যেখানে একটিমাত্র ঘটনাই যথেষ্ট, ২. চরিত্রের মনস্তত্ত্বই তার সূক্ষ্মতম কাহিনীর বা কাহিনী-আভাসের সুতো ধরায়, ঘটনার ব্যঞ্জনা বাড়ায়, ৩. মূল 'থিমে'র কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দেয় প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্রই।

'ছিন্নমস্তা' গল্পে লেখিকার একমাত্র লক্ষ্য জয়াবতী। তার কোনো টানা কাহিনীর আশ্রয় নেই। প্রথম দিকে গল্প আরম্ভ হওয়ার পর লেখিকা বিধবা জয়াবতীর স্বামীহীন একক জীবনের একমাত্র পুত্রকেন্দ্রিক কল্পনাময় সুস্থ সুসমঞ্জস ছবি এঁকেছেন। এই চিত্রের সীমা 'গোছগাছ করিতে করিতেই বরকনে আসিয়া পড়ে'— এমন এক বাক্যের অনুচ্ছেদে স্পষ্ট। এর পর জয়াবতীর জীবনে দুটি ঘটনা তৈরি হয়। ১. সুন্দরী প্রতিভার মতো তার একমাত্র সন্তানের বধূর আগমন। শাশুড়ির প্রতিস্পর্ধী রূপে তার সক্রিয়তায় এই ছোট ঘটনাটির বিস্তার ও জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ২. বিমলেন্দুর আকস্মিক মৃত্যু-ঘটনা বউ-শাশুড়ির সংঘর্ষের চরম মুহূর্তে। বধূ হিসেবে প্রতিভার আগমন প্লটের স্বাভাবিক ঘটনাই। কিন্তু বিমলেন্দুর মৃত্যু অস্বাভাবিক, গল্পেরই চরিত্র-ন্যায়ে সংঘটিত। তা প্লটের climax

অঙ্গ, জয়াবতীব সঙ্গে বাইরের স্বভাবে কোনো যোগ নেই। এই দুই ঘটনা জয়াবতীর চরিত্র-ব্যক্তিত্বের পরিণামী ব্যঞ্জনার নিশ্চিত নির্দেশক।

প্লটের পরিণামী চিত্রে যে 'থিমে'র ব্যঞ্জনা, তা জয়াবতীর একক ব্যক্তিত্বেরই সফল রূপ। কিন্তু তার প্রকাশ চরিত্রের স্বাধীন, নিরপেক্ষ সত্তা থেকে উঠে আসেনি। লেখিকা স্বয়ং তাকে পাঠকদের দেখিয়ে দিয়েছেন, পাঠকদের নিজস্ব কল্পনাময় ভাবনার বা উপলব্ধির আনন্দ-ব্যঞ্জনার সুযোগ রাখেননি। শরৎচন্দ্রীয় রীতির ছোটগল্পের প্লট-পরিণতির সঙ্গে কোথায় যেন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য! আমরা আগেও বলেছি, গল্পটির প্লটের ঘটনা ও climax বিমলেন্দুর আকস্মিক মৃত্যু-ঘটনায়, কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিবর্তনে তাব মনোভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে climax সম্পূর্ণ লেখিকা-চিন্তিত বা ভাষ্য হিসেবে ব্যক্ত আরাধ্য দেবতার কাছে জয়াবতীর 'কাণ্ডজ্ঞানহীন আবদার'।

যেমন ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করে জয়াবতীর রহস্যময় যন্ত্রণাদায়ক অবচেতন মনের বর্ণনায় লেখিকা কিছু বেশি কথা বলেছেন, তেমনি গল্পের বর্ণনায় একেবারে প্রথম দিকে মণ্টির আলপনা-আঁকা, মন্টি-জননীর কন্যাগর্বের বিস্তারিত পরিচয়-চিত্রকে অতিকথনে গল্পকে মন্থর করার সুযোগ দিয়েছেন। এমন কি বিমলেন্দুর জলপানির টাকায় জয়াবতীব কিনে দেওয়া বেনাবসী শাড়ি পরে কনকলতার বিয়ে বাড়িতে যাবতীয় ব্যস্ততাও গল্পের একমুখিন স্বভাবের মধ্যে বাড়তি মেদের জোগান দিয়েছে বলে মনে হয়। প্লটের কাহিনী ও ঘটনার পবিমিতিবোধ ও সংক্ষিপ্তি কেন্দ্রীয় 'থিম'-এর পক্ষে যতটা শিল্পসম্মত ভারহীন হতে পারত, তা ততটা হয়নি বলেই আমাদের মনে হয়। এমনকি গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনোলোক তথা আত্মিক সংকটের স্বরূপ বোঝার পক্ষে শেযতম অনুচ্ছেদের কিছু আগে প্রতিবেশী স্বভাব ও কৌতূহল চিত্রের লেখিকাকৃত অতি-কথনের চিত্র-ব্যঞ্জনাও চমকেব তির্যকতা ও চরম অভিঘাত সৃষ্টির অসীম বিস্ময়, কৌতূহল ও আনন্দকে কিছুটা বা বিনষ্ট করে।

দুই

'ছিন্নমস্তা' গল্পটির কেন্দ্রীয় সমস্যা—বিশ শতকের বাংলাদেশের পরিবাব-সমাজজীবন-সম্পর্ক থেকে জাত শাশুড়ি-বউ-এর পারস্পবিক বোঝাপড়ার দুঃখজনক বিযাদঘন এক পরিণামী কঠিন সমস্যা ও সংকট। যখন এই গল্পটি লেখা হয়, তখনো এই পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্ক ছিল নানাভাবে, নানা দিক থেকে দেশীয় পারিবারিক ঐতিহ্যেব পক্ষে প্রবাদ-প্রতিম বিষয়, এক পাথর-কঠিন Reality! এর বিশ্বাস-কঠিন দিকের ভিত ছিল বিবাহে বরপণের প্রথায়, ছিল নারীমুক্তির, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা বিষয়ের ওপর চাপা অনড় পাথর, ছিল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার দুঃসহনীয় দারিদ্র্য, আর বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার প্রধান পরিপোষক পুরুষশাসিত সমাজ, সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদির ওপর বংশানুক্রমিক দায়বদ্ধতার আনুগত্যে। এসবের মধ্যে থেকেই কথায় কথায় তৈরি হয়ে যায় শাশুড়ি-বউ-এর সম্পর্কে, কখনো কৌতুকে, কখনো

তীব্র শ্লেষব্যঙ্গে লোককথার অনুরূপ প্রবাদ-স্বভাব—যুগপৎ বুনোওল-বাঘা তেঁতুল, আদায়-কাঁচকলায় অথবা তেল-জলের ভাবনা-চিন্তা।

সেই রকম এক চিত্র উপহার দিয়েছেন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পটিতে বিধবা শাশুড়ি জয়াবতীর চরিত্র-অঙ্কনের মধ্য দিয়ে। তাঁর ভাবনার মূলে কাজ করেছে মায়ের ঈর্ষা। শাশুড়ি-বউ যথাক্রমে জয়াবতী-প্রতিভার মধ্যে সখ্য হয়নি পুত্র বিমলেন্দু মারা যাবার আগে পর্যন্ত। মারা যাবার পর যে দুজনের সখ্যতার চিত্র নিপুণ স্বভাবে আঁকা, তা শেষে প্রমাণিত হয়ে যায় এক তিক্ততম প্রহসন, এক গভীরতম শ্লেষব্যঙ্গ; বিধবা মায়ের ঈর্ষাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে লেখেন উপন্যাস 'চোখের বালি'। রবীন্দ্রনাথ এতেই বলেছেন, 'চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা।' এই কথা নিয়ে তো অনেক বিরুদ্ধ আলোচনা হয়েছে, এর মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। তবে এটুকু নিশ্চয়ই আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক— রাজলক্ষ্মী মা হিসেবে বিবাহিত পুত্রের প্রতি ছিল বিরক্ত, পুত্রবধূ আশার কাছ থেকে আতিথেয়তা ও সেবাধর্মে একজন শাশুড়ির প্রাপ্তি ও আকাঙ্ক্ষায় ছিল অপূর্ণতা। মহেন্দ্রর বউ নয়, নিজ পুত্রের বউ হিসেবেই দাবি ছিল তার। ছিল অধিকার চেতনাও। 'ধাত্রীদেবতা'র নায়ক শিবনাথের কাছে প্রত্যক্ষভাবে মা না হলেও স্নেহে-শাসনে সম্পূর্ণত মাতৃস্থানীয় পিসিমার সঙ্গে অল্পবয়সে বিয়ে হওয়া শিবনাথের বউ নান্তি, বড় হয়ে যে হয় গৌরী, তার সঙ্গে ঘটে বিরোধ, শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কের সংকট। পিসিমার ভিতরেও মায়ের ঈর্ষা সূক্ষ্মভাবে কাজ করে যায়। ব্যবসায়ী বাড়ির আলাদা রুচির প্রবল অর্থসাচ্ছল্যে মানুষ বধূ গৌরীর সঙ্গে শাশুড়ি পিসিমার বাধে আধিপত্য নিয়ে বিরোধ।

এইভাবে বাংলা উপন্যাসে বধূ-শাশুড়ির সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে একাধিক প্রসঙ্গ মনে পড়ে। 'ছিন্নমস্তা'র কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে বধূ-শাশুড়ির তীব্রতম সংঘাতময় চিত্র থাকলেও পরিণতি ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর। এখানে শাশুড়ি জয়াবতীর ঈর্ষা থাকলেও তার সমস্যা ও সমাধান রুদ্ধশ্বাস, একই সঙ্গে ব্যক্তি তথা চরিত্রকেন্দ্রিক। লেখিকার উদ্দেশ্যও শাশুড়ি-বউয়ের বিরোধ সম্পর্ক ধরে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের একান্ত অনুগ। বিমলেন্দুর বউ হয়ে জয়াবতীর পরিবারে সদস্য হওয়ার পর থেকেই প্রতিভা তার পিত্রালয়ের পারিবারিক অর্থ-সাচ্ছল্যের কথা তুলে স্বামী, সেই সঙ্গে শাশুড়ির সঙ্গে মানসিক দিক থেকে অন্ধকার খাদ রচনা করতে শুরু করে। তা প্রাথমিক পর্বে নতুন বউয়ের অভিমান, আগের সুখী জীবনের নিজ আভিজাত্য বোধে আঘাত মনে হতে পারে, কিন্তু ক্রমশ তা তীক্ষ্ণ হয় স্বামীর ওপর আধিপত্য বিস্তারে শাশুড়ির সঙ্গে আচার-আচরণের মাত্রা-ছাড়ানো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বভাবে। গল্পটির কেন্দ্রীয় সমস্যা ও সংকট, উদ্দেশ্য ও পরিণাম ধীরে ধীরে বধূর পক্ষ থেকে শাশুড়ির জীবনের স্পর্শকাতরতায় এক ভিন্ন অনন্বয়ী স্বভাব ও স্বাদ আনে।

সংসারে বিধবা জয়াবতীর পুত্র বিমলেন্দুকে নিয়ে এক মানসিক স্থিতাবস্থা ছিল। এক গভীর কল্পনাময় আশা-আকাঙ্ক্ষার জগৎ নির্মাণ করে শাশুড়ি নয় এমন এক স্বামীহারা রমণীর একান্ত নিজের মতো সুস্থ মন ছিল। বউ প্রতিভা এসে সেই মনে দিল প্রচণ্ড

আঘাত, যন্ত্রণা। বিমলেন্দুর মা শাশুড়ি হয়ে সেই যন্ত্রণার সমস্ত অংশটুকু গ্রহণ করে শমীবৃক্ষের স্বভাবে গল্পের প্রথম দিকে। সমস্যা সৃষ্টি করে প্রতিভা সংসারের নতুন বউ-য়ের দাবিতে। সমস্যা সংকট-রূপ নেয় শাশুড়ির ব্যক্তিত্বের বিপরীত স্বভাবসূত্রে। লেখিকা একে একে সেই সমস্যাকে সংকটের প্রতিমা করে তোলেন জয়াবতীর মনের গভীর তলদেশকে পাঠকদের সামনে এনে।

শাশুড়ি জয়াবতীর মনের জগতে প্রথম বউ-এর দিক থেকে গোপনতম আঘাত আসে তার দারিদ্র্য ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের প্রতি তাচ্ছিল্যে, শ্লেষে, কটাক্ষে, বিদ্রূপে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্র সম্পর্কে তার নিরুত্তর থাকার দিকটি জয়াবতীর মধ্যে একই সঙ্গে বিস্ময় জাগায়, পুত্রের প্রতি আগের আগের বিশ্বাসে ঘটে ভাঙচুর। দু'মাস পরে পিত্রালয় থেকে বউ ফিরে এলেও জয়াবতী নিজের এতদিনের সহজ, সরল বিশ্বাস ও সংস্কারে বউ-এর কাছ থেকে ধাক্কা খায়। পুত্রবধূর আধিপত্যে অন্য মানুষ আজ। জয়াবতীর মধ্যে তৈরি হয় নিষ্ফল আক্রোশ, পুত্রের প্রতি উদাসীন নিরাসক্ত এক অভিমান— যা ভিতরে সাপের মতো শীতল স্বভাব পেয়ে যায়। ক্রমশ প্রতিভা তার বউ হিসেবে কথা ও আচরণের সীমা ছাড়ায়। কুৎসিত ভাষায় জয়াবতীর বৈধব্য নিয়ে, তার নিজের বিশেষ প্রীতির খাদ্যসামগ্রী নিয়ে প্রতিভা কথা শোনায় জয়াবতীকে। পরিণতিমুখীন কেন্দ্রীয় সমস্যাটি এইখানে এসেই পূর্ণ সংকট রূপে ভয়ঙ্কর (malignant) হয়।

আবার বলি, সমস্যা ও সংকট প্রতিভার নয়, তা জয়াবতীর। তার মধ্যে সেই সমস্যার জটিলতা দুটি সূত্রে চোখে পড়ে— ১. পুত্রের প্রতি স্নেহ, বাৎসল্য, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, রুচি প্রভৃতির বিনাশি স্বরূপে, ২. বউ-এর দিক থেকে সমস্ত ভবিষ্যৎ শান্তির ধ্বংসের হাহাকারে। প্রতিভার পক্ষে তার স্বামী আছে, শাশুড়ি না থাকলে কি আর ক্ষতি, অভাব? জয়াবতীর দিক থেকে দুটি দিক সম্পূর্ণ ধ্বংস— পুত্রকে নিয়ে স্বপ্ন, আর গৃহবধূকে নিয়ে সাংসারিক তুলসীতলার শান্তি। লেখিকা সুকৌশলে জয়াবতীর মধ্যে কেন্দ্রীয় সমস্যাকে সংকটের শীর্ষস্তরে বসাতে পেরেছেন।

সংকটের দুটি পর্ব— একটি, বিবাহের পর প্রতিভার আগমন থেকে বিমলেন্দুর মৃত্যু, আর একটি মৃত্যুর পর থেকে জয়াবতীর একান্ত ব্যক্তিগত গোপনতম মনোলোকের সূক্ষ্ম উন্মোচন। প্রথমদিকের সংকটে দু'জন অংশীদার, বিমলেন্দু তার মধ্যে কিছুটা 'ক্যাটালিস্টে'র মতো, দ্বিতীয়দিকের সংকট একমাত্র জয়াবতীরই। পুত্রের মৃত্যুর পর জয়াবতী আত্মহত্যা করেনি, পাগল হয়নি, ব্যক্তিগতভাবে বেঁচে থেকেই এক রক্তচক্ষু তান্ত্রিক হয়ে গেছে। তার দৃষ্টিতে ওপরে আছে বিধবা বধূর প্রতি রক্তরঙের স্নেহের প্রলেপ, ভিতরে লুকানো আছে বিষাক্ত হাসি। দুই বধূর বৈধব্যের সখ্যতায় ধরা পড়ে উন্নাসিক, উৎকট হাসির নির্মম নিয়তি।

লেখিকা বুঝেছিলেন, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যেহেতু জয়াবতী, তাই গল্পের 'Central theme' একমাত্র তারই ভিতর থেকে তৈরি হওয়া আবশ্যিক। কেন্দ্রীয় সত্য কেবল একটি চরিত্রের ভিতরের আলো দিয়ে ধরা যাবে না, বোঝানো যাবে না। তাই এসেছে পরিপার্শ্ব।

প্রতিভা কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, এক মুখ্য চরিত্র, যেনবা জয়াবতীর কাছে শিল্পের বড় মর্যাদার ইন্ধন। কিন্তু এসবেরও পরে গ্রামীণ প্রতিবেশীদের প্রসঙ্গ থাকতেই হবে। অন্তত আমাদের মনে হয়, লেখিকা যেভাবে নিজে উপস্থিত থেকে গল্প বলছেন, সেখানে পরিপার্শ্ব নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করবেই। তাই গল্পে প্রতিবেশীদের—লাহিড়ী গিন্নি, মন্টির মা, কনকলতা ইত্যাদির অযাচিত আগমন যেমন ঘটেছে, তেমনি প্রতিভার কাছেও প্রতিবেশীদের জমায়েত কম হয়নি। এইভাবে গ্রাম্য পরিবেশে প্রতিবেশী সম্পর্কিত সচেতনা কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে বিপরীত তাৎপর্যে অনেক বেশি বিশ্বাস্যতা দিয়েছে।

গল্পের মূল 'থিম' চরিত্রকেন্দ্রিক, কিন্তু তার আধার, বিস্তার, জটিল রূপ নির্মাণ করেছে প্রেক্ষিত ও তার মধ্যেকার মানুষজন যেমন, তেমনি বড় অর্থে লেখিকার নিজস্ব অনুপ্রবেশও। জয়াবতী চরিত্রের অভ্যন্তরে আছে শাশুড়ি হিসেব নিজস্ব আভিজাত্যবোধ, পুত্রের প্রতি অভিমান। এসবই তার স্বভাবের পক্ষে আলম্বন বিভাব। সেখানে প্রধান উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে নববধূ প্রতিভা। আর গল্পের গ্রাম্য-প্রতিবেশ করুণ বিষাদাত্মক পরিণাম অঙ্কনে অগ্নিময ইন্ধনের জোগান দিয়েছে। লেখিকার অনুপ্রবেশ গল্পের প্লট, চরিত্র, ঘটনা— এসবকে স্বাধীনতা দেয়নি। গল্পের 'থিম'-এর ব্যঞ্জনা কাঠামোয় থেকেছে অন্য-নির্ভর, লেখিকা-নির্দিষ্ট।

তিন

'ছিন্নমস্তা' গল্পের কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র বিবর্তনে কয়েকটি বহির্মুখী ও মানসিক স্তর স্পষ্ট হয়। সেই স্তরগুলির জয়াবতীর বাহির ও ভিতর স্বভাবের বিবর্তনে ধাবা বদলের স্মারক। জয়াবতী সম্পূর্ণত গ্রামীণ জীবন ধারণে ও যাপনে অভ্যস্ত এক বিধবা গৃহবধূ। গ্রামের পরিবেশেই তার সংসার। একমাত্র শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট পুত্র বিমলেন্দুর জীবন ও সংসার-ভাবনার কেন্দ্রেই তার যাবতীয় তৎপরতা। সে যেমন বিমলেন্দুর মা, তেমনি বিমলেন্দুর নববধূ প্রতিভার শাশুড়িও। গল্প শুরু নবপরিণীতা বধূ প্রতিভার প্রথম গৃহপ্রবেশ ও বধূবরণের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার চিত্র দিয়ে।

এমন ব্যবস্থার চিত্রে বধূ নিয়ে গৃহে প্রবেশের আগে লেখিকা জয়াবতীর কয়েকটি সূক্ষ্ম মানসিকতাব দিক পাঠকদের দৃষ্টির সামনে রেখেছেন— যেগুলি জয়াবতীর মা ও শাশুড়ি হিসেবে স্বভাব ও মনের প্রামাণ্য দিক। জয়াবতীর পক্ষে নিজ স্বামীর স্মৃতিচারণ, পুত্রের গৌববময় শিক্ষাজীবনের আত্ম-সুখী ভাবনা, নিজস্ব কিছু পছন্দ-অপছন্দের বিষয় মিলেমিশে নববধূ বরণের কালে তার সূক্ষ্ম শিল্পীমনের পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে। সমগ্র গল্পে জয়াবতীর বিবর্তনে তার চরিত্রধারার চারটি লক্ষণীয় স্তরের শিল্পদিকও ধরা পড়ে। প্রথম স্তরে জয়াবতীর নিজস্ব শিল্পীমনেব ও আদর্শনিষ্ঠ সংসাব গঠনেব সুন্দর পরিচয় মেলে। জয়াবতীর রীতিমতো লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত আলপনায় নিপুণ দক্ষতা, পুরনো শাড়ির পাড় ও জমি দিয়ে গৃহস্থালি ও প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় তুচ্ছ জিনিসগুলিকে সাজানোর বিস্ময়কর শিল্পীমন-এর যে খবর পাই, তাতে চবিত্রটির পরবর্তী স্বভাবের এক

বৈপরীত্যে চরিত্রটির বিবর্তনে নতুন মাত্রা আনে। বিমলেন্দুকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কত রঙিন আশা, স্বপ্ন ছিল। বিমলেন্দুর বিবাহ হলে নতুন বউ এসে পা দেবে শান বাঁধানো মসৃণ শীতল উঠানে— এই পরিকল্পনার আন্তরিকতা জয়াবতীকে আর এক গৃহিণী-শিল্পী করে তোলে। বিমলেন্দুর জলপানির টাকায় ভবিষ্যৎ বউ-বরণের কথা ভেবে বেনারসী কিনে রাখার মানসিকতাতেও একজন সন্তানগর্বে গর্বিতা মায়ের গভীর স্নেহার্ত মনের পরিচয় মেলে। গল্পের প্রথম দিকে এইসব উদাহরণের প্রাসঙ্গিকতা চরিত্রটির মর্যাদা বাড়ায়। কিন্তু আকস্মিক বৈধব্যবরণে জয়াবতীর সেইসব আশা-কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় স্তরে জয়াবতীকে লেখিকা এঁকেছেন বাস্তব কঠিন চরিএ করে— সঙ্গে শাশুড়ি হিসেবে আদর্শের যোগ থেকে যায়। ছেলের বিবাহ তাই তার কাছে 'আনন্দহীন গুরু দায়িত্বের বোঝা', 'রঙীন কল্পনা নহে, কঠিন কর্তব্য'। সেই সঙ্গে শাশুড়ি হিসেবে নিজস্ব একটি আদর্শে ব্রত-ঋদ্ধ থাকার শপথ নেয় মনে মনে: 'নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয় আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে। পরের মেয়েকে কেমন করিয়া আপন করিতে হয়, দেখাইয়া দিবেন তিনি।' তার সঙ্গে আরও একটি ভাবনা সংযুক্ত থাকে— বিমলেন্দুর মতো একটি সন্তানের ক্ষেত্রে 'একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া ছেলেকে সংসারী করিয়া দেওয়াই যেন জীবনের চরম ও পরম কর্তব্য......।' আরও শহরের আধুনিকা মেয়ে না এনে পছন্দ করে পাড়াগাঁর মেয়েই।

চরিত্রটির তৃতীয় স্তরে বিবর্তনের সূত্রে দেখা দেয় পূর্ববর্তী দুই স্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ ও জটিলতম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জয়াবতীর মনোলোকে। এর মূলে নতুন বধূ প্রতিভার গোড়া থেকেই শাশুড়ি জয়াবতীর বিরুদ্ধ-আচরণ। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া সুন্দরী প্রতিভার প্রথম অপছন্দ সে জানায় স্বামীকেই জোর গলায় শুনিয়ে আধুনিক রুচির পরিপন্থী পরিবেশের চরম দারিদ্র্যের অসহায়তা, অগোছালো স্বভাব ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আঘাত দিয়ে। এমন প্রথম আঘাতে জয়াবতীর মনে অবশ ভাব চেপে বসে, ক্রমশ চাপা রাগে কঠিন হয় শাশুড়ি জয়াবতী। একই সঙ্গে দুটি দিকে তার মনের সব আদর্শভাবনা মাটির কলসির মতো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এক, নতুন বউয়ের অপমানকর, অসম্মানজনক উক্তি-ব্যঙ্গোক্তি, দুই, নিজ পুত্রের যাবতীয় প্রতিবাদহীন নীরব নিরাসক্ত স্বভাব, বউয়ের দ্বারা প্রভাবিত জীবনচর্যায় তার মাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা! ক্রমশ জয়াবতীর পুরনো সংস্কার নিয়ে প্রতিভার প্রতিবাদ, পুত্রের মাকে বলা সোজাসুজি অসম্মানকর উক্তি, মায়ের প্রতি ছেলের অসহনীয় নির্বিকারত্বের ভাব, পাড়া-প্রতিবেশীদের শাশুড়ি-বউয়ের ব্যাপারে গুজব-গালগল্পে অংশগ্রহণ— এসব থেকে প্রতিভা অশালীন মন্তব্য করে বিধবা শাশুড়ির বিশেষ কিছু খাওয়ার লোভ নিয়ে। কঠিনতম অপমানে বুঝিবা প্রবল ভূমিকম্পের মতো ভিতরে বিধ্বস্ত হয় জয়াবতী। সেইসঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই দুর্ঘটনায় বিমলেন্দুর ঘটে মৃত্যু কলকাতার ট্রাম থেকে পড়ে।

চতুর্থ স্তরে জয়াবতীর বেঁচে থাকার এক কঠিন পরীক্ষা। বেঁচে থাকা বিধবা একা জয়াবতীর নয় সদ্যবিধবা পুত্রবধূ প্রতিভাকে নিয়েই! এ যে জীবনধারণ ও যাপনে

জয়াবতীর মনোলোকে অগ্নিপরীক্ষা। এখানে জয়াবতী একা, প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত প্রতিভা নেই, আছে পরোক্ষে লেখিকার কথায়, জয়াবতীর কথায়, প্রতিদিনের কর্ম-তৎপরতায়। এ চিত্র বিধবা শাশুড়ি-বউ-এর অদ্ভুত এক সখ্যতার! যাকে লেখিকা প্রথমে দেখিয়েছেন এক সহমর্মী সখ্যতার, তা যে বাইরের দিক, প্রধান চরিত্রটির ভিতরের নয়, তার পরিচয় এই স্তরের সব শেষে— গল্পের ও লেখিকার শেষতম সিদ্ধান্ত অনুচ্ছেদে— লেখিকারই শ্লেষ-বক্রোক্তির প্রশ্নসূচক তির্যক অঙ্গুলিনির্দেশে: 'কণ্ঠস্বরে—মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তার স্নিগ্ধচ্ছায়ায়?... চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাসে?'

'ছিন্নমস্তা' গল্পটির সবচেয়ে বড় সম্পদ জয়াবতী চরিত্র। প্রথমত, যে মানুষটি ছিল গ্রামীণ লোকশিল্পজ্ঞানে নিপুণ, সুরুচিসম্পন্ন স্বভাবশিল্পী, আন্তরিক অনুভূতিপ্রাণ, ছিল সুস্থ সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন, ঠাণ্ডা মাথার ভারসাম্যসম্পন্ন বিধবা শাশুড়ি, সে হয় আঘাতে জর্জরিত, অপমানিত বিপরীত কোটির মানুষ। সমস্ত শিল্পরসবোধ তার সম্পূর্ণ বিনষ্ট। এই স্বভাবের বৈপরীত্য চরিত্রটির বড় মাপের শিল্পপ্রাণ—করুণ বিষাদঘন ও ব্যঞ্জনাময়। দ্বিতীয়ত, পুত্রের কাছে প্রত্যক্ষভাবে অপমানিত হওয়ার পর, একমাত্র পুত্রকে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত দেখার পরও লেখিকা তাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেননি, করেননি তাকে উন্মাদ। বাইরে সে ঠাণ্ডা, কিন্তু ভিতরে সে সন্তানহারা মায়ের, বংশধরহীন সংসারের, জীবিত বিধবা পুত্রবধূর সামনে সহজ থেকেও যে দুচোখে গোপন করে রাখে বিষাক্ত হাসির আভাস— তাতে তার সংসার-পরিণতির জটিল মনস্তাত্ত্বিক অসামান্য ব্যঞ্জনা চিরন্তন হয়ে থেকে যায়। এর স্বরূপ যে রাবণের চিতার জ্বালার চিরন্তনতার স্বভাবে অনন্ত এক জয়াবতীর মতো নারীদের কাছে— একটা শাশুড়ি কর্তৃক বধূহত্যার থেকেও নির্মম, নিষ্ঠুর নিরাসক্ত-স্বভাবী! এই ব্যাখ্যায় জয়াবতী এক শ্রেষ্ঠ শাশুড়ি চরিত্র। তৃতীয়ত, গল্পের প্লটের দিক থেকে জয়াবতীর চরিত্রগত 'চরমক্ষণ'-এর জায়গাটি হল বিমলেন্দুর মৃত্যু ঘটনা, কিন্তু জয়াবতীর নিজস্ব চরিত্রধর্মে তার climax গল্পের শেষতম বাক্যের স্বভাবে। চরিত্রের শেষতম অভিঘাত ও গল্পের সর্বশেষ ব্যঞ্জনা— যা 'শেষ হয়ে না হইল শেষ'—একত্র হয়ে 'ছিন্নমস্তা' গল্পের শিল্পমান অনেক উন্নত করে দিয়েছে। চতুর্থত, জয়াবতীর মতো চরিত্রটির শিল্পভিত্তি শেষ স্তরে লেখিকার নিজস্ব বর্ণনার অনুগ থাকায় তার যে 'হাসি' ও 'বিষাক্ত স্বভাব' চরিত্রের স্বাধীন স্বভাব থেকে তৈরি হয়নি। প্রতিভার দিক থেকে একটি কথাও না থাকায়, তার অভাব লেখিকার নিজস্ব উপস্থিতি ও বর্ণনা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করায় জয়াবতী গল্পের শেষে শিল্পের ধর্মে 'পরাধীন' থেকে গেছে। আসলে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প অনেক ক্ষেত্রে দেখায়— লেখিকা পাঠকদের কাছে গল্প বলতে ভালোবাসেন, গল্প লেখার শিল্প-কাঠামোর নিখুঁত দিক কোনো না কোনো ভাবে এড়িয়ে যান। জয়াবতীর কথায় 'ছিন্নমস্তা' গল্পে এর সমর্থন মেলে। অবশ্যই আমাদের এই বক্তব্য চরিত্র-ত্রুটি বোঝায় না, লেখিকার ছোটগল্পের শিল্পীসত্তার সীমাকেই দেখায়।

গল্পে জয়াবতীর কঠিন সংস্কারাদি সম্পর্কে ভাবনার জটিলতার জট না সরালে এই চরিত্র ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ রূপ বোঝায় কিছু ভুল থাকতেই পারে। বিষয়টি লেখিকা ও জয়াবতী—দুজনের মনোভঙ্গি ধরেই বিশদ করা যথোচিত। দু'মাস পিত্রালয়ে কাটিয়ে শ্বশুরালয়ে আসার পর এক শনিবারে প্রতিভার স্বামীর জলখাবার-ব্যবস্থার স্বতঃপ্রবৃত্ত উদ্যোগে শাশুড়ির সঙ্গে লাগে তীব্র বিরোধ। এই বিরোধের মূলে থাকে জয়াবতীর এতদিনের সংস্কার। পুরনো প্রথাসিদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে আধুনিকা প্রতিভার বিরোধ তীব্র হতেই পারে। এই বিরোধ শাশুড়ি-বউয়ের মানবিক সম্পর্কে ফাটল ধরানোয় তীব্রতম রূপ পেয়েছে। কিন্তু এই ক্রমিক বিরোধের চরমতম রূপে প্রতিভা যখন জয়াবতীর স্পর্শকাতর অন্তরতম ব্যক্তিত্বে শাশুড়ির এতদিনের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কুৎসিত লোভের কথা দিয়ে আঘাত দেয়, তাতে লেখিকা জয়াবতীর আর এক মানসিকতার প্রায়-ব্যাখ্যা দিয়েছেন নায়িকাকে ঠাকুরঘরে পাঠিয়ে। মূল ব্যঙ্গের ভাষা, প্রতিভার দিক থেকে, তার আধুনিক মনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে ওঠে, কুৎসিত রূপ নেয়, সীমা ছাড়ায়: '..... বিধবা মাগীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার মতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে! আপনার লোভের জিনিস!' এর পরে বিধবা জয়াবতীর স্মৃতিসূত্র ধরে সজিনা ডাঁটার প্রীতি ও পরমতম স্বামী-সমর্থনের দিক বর্ণনা করেছেন আশাপূর্ণা এবং চিত্রটি শেষ হয় এইভাবে— প্রতিভার আঘাত সহ্য করতে শাশুড়ি ঠাকুরঘরে ঢুকে খিল দেয়। 'কিন্তু অমন আছড়াইয়া পড়িয়া নালিশ জানাইলেন তিনি কাহার কাছে?' সেই মূর্তি বা পটপূজাব পুরনো অনড় ধর্মান্ধ সংস্কারে লেখিকা জয়াবতীর তাৎক্ষণিক সম্ভাব্য মনোলোক নিজ ভাষায় এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যাতে মনে হতেই পারে পুত্র বিমলেন্দুর বুঝিবা মৃত্যুকামনাও তার মধ্যে ছিল।

এখানেই আমাদের কথা, বিমলেন্দুর হঠাৎ ট্রাম থেকে পড়ে চলন্ত বাসের তলায় চলে যাওয়া ও মৃত্যু যেনবা মায়েরই অভিশাপের একটা দিক! জয়াবতীর সংস্কারের মনকে এভাবে প্রশ্নচিহ্নে ধরার মধ্যে এক ট্র্যাজিক ভ্রান্তির ভাবনা পাঠকদের মনে জাগতেই পারে! বিমলেন্দুর এমন আকস্মিক মৃত্যুর শিল্প-ন্যায় আমরা তার পরবর্তী চরিত্রন্যায় নিয়ে আলোচনায় কিছুটা যুক্তিগ্রাহ্য করব। কিন্তু জয়াবতীর দিক থেকে চরিত্রটিব নিজস্ব মনস্তত্ত্বের বিন্দুমাত্র সূত্র আভাস না দিয়ে লেখিকা নিজেই সিদ্ধান্তের কণ্ঠস্বরে ওঠানামা বক্রোক্তিতে সংস্কারাচ্ছন্ন জয়াবতীর প্রতি কিছুটা অন্যায় করেছেন। আসলে, এটা যদি সামান্য কোনো ত্রুটি হয়, তবে তা, গল্পটি সম্পর্কে আমাদের সেই অভিযোগ, লেখিকা কর্তৃক চরিত্রদের স্বাধীনতা হরণ!

জয়াবতী যত Dynamic, প্রতিভা ততোধিক Static। জয়াবতী জীবন্ত, প্রতিভা একটি স্বভাবের স্থিরচিত্র। তার স্বামীপ্রীতি ও নির্ভরতা এবং শাশুড়ি-বিদ্বেষ তাকে সারা গল্পে একমুখীন স্বভাব দিয়েছে। একমাত্র শ্বশুরবাড়ির অপছন্দের দিক ও শাশুড়ি-বিদ্বেষ নিয়ে প্রতিভাকে প্রথম গল্পে প্রবেশ করতে দেখি। এই ব্যাপারে স্বামীর ওপর আধিপত্য বিস্তার তার বধূ হিসেবে অমোঘ অস্ত্র। শ্বশুরবাড়ির দারিদ্র্য তার মনের গভীরে চরম

উন্নাসিকতার জন্ম দেয়। শাশুড়ির লোকশিল্প-অনুগ সৌন্দর্যবোধ ও ক্রিয়াকলাপ এতটুকুও বিস্ময় ও প্রীতি জাগায় না প্রতিভার মনে। তার সমস্তরকম সখ্যতাহীন ঔদ্ধত্য তাকে গোড়া থেকেই স্থিরচিত্রের স্বভাব দিতে থাকে।

শাশুড়ির যাবতীয় সংস্কার প্রতিভার কাছে অসহনীয়। কোনোরকম সহাবস্থানে সে উদার হতে জানে না। সহমর্মিতার শিক্ষা তার মধ্যে নেই। সে যে এক আধুনিক মফঃস্বল শহরের ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া শিক্ষিত, আধুনিক ধনীকন্যা, তার পরিচয় তার কথায়, আচরণে বজায় রাখতে ব্যর্থ। সে যখন শাশুড়িকে বলে 'বিধবা মাগী', শাশুড়ির লোভের প্রসঙ্গ তুলে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, তখনি বোঝা যায় সে অশিক্ষিত, রুচিহীনা, আত্মস্বার্থের পরম পূজারি।

প্রতিভার চরিত্রভিত্তি দুটি দিক থেকে লক্ষণীয়। এক, তার স্বামী বিমলেন্দুর সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক সূত্রে, দুই, শাশুড়ি জয়াবতীর সঙ্গে নানান সাংসারিক মত বিনিময়ে। তবে বিমলেন্দুকে শোনানো সব কথারই যে লক্ষ্য শাশুড়ি, এটা আশাপূর্ণা দেবী গোড়াতেই বলে দিয়েছেন। 'বিয়ের কনে কে কবে শাশুড়িকে শুনাইয়া বরকে মুখনাড়া দেয়।' কনে হয়ে এসেই বরকে বউয়ের কথা শোনানোর মধ্যে প্রতিভার 'ব্যাপিকা' স্বভাবের পরিচয় মেলে। কিছু বধূ আছে যারা স্বামীর ওপর কঠিন আধিপত্য বিস্তারে আনন্দ পায়, আপন কর্তৃত্বের অভিমান যাচাই করে। বিমলেন্দুকে বলা এমন উক্তি তারই অন্যতম অভিজ্ঞান: 'কি বললে— আমাদের হুগলীও পাড়া গাঁ? বেশী বোকো না। কিসে আর কিসে?' সংসারে প্রতিভার চাপা দাপট বিমলেন্দুর ওপর কি রকম! 'নূতন বউয়ের মতো বিমলেন্দুও যেন একজন অভ্যাগত মাত্র।' প্রতিভার বেপরোয়া স্বভাব— যা জয়াবতীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে গোটা গল্পে—তাতেই সে Static। লজ্জা, কুণ্ঠা, নম্রতা, মমতা— এসবের অভাবে প্রতিভা যেন এক 'টাইপ' ভূমিকায় চলে আসে। শাশুড়ির রুচি, স্বভাব, শান্ততা, নীরবতা, নিশ্চুপ থেকে প্রতিবাদহীন সহনশীলতা— এসবকে প্রতিভা মনে করে 'ভিজে বেড়ালের স্বভাব'। স্বামী বিমলেন্দুকে বলা জয়াবতী সম্পর্কে প্রতিভার সর্বশেষ Assessment রুচিহীনতার চরম উদাহরণ: 'আসল কথা হিংসে! হিংসে! বিধবারা ভারি হিংসুটে হয়, বরাবর জানি আমি। নিজেদের সাধ-আহ্লাদ সব ঘুচে গেছে কিনা, তাই পরের সুখ দেখলে হিংসেয় প্রাণ ফাটে। এই যে— তুমি আমার কাছে একটু বসো কি দুদণ্ড গল্প করো— সহ্য হয় না। বুক ফেটে যায়।'

এমন যে নববধূর ধারণা, বিমলেন্দুর মৃত্যুর পর বিধবা হয়ে তার সঙ্গে জয়াবতীর সংলাপ বিনিময়ের কোনো একটি নমুনা থাকলে চরিত্রটির শিল্প-ন্যায় রক্ষিত হত। অন্তিম স্তরে লেখিকা প্রতিভাকে একেবারে নীরব করে এঁকেছেন। ফলে প্রতিভার টাইপ ভূমিকা ও Static স্বভাবের ধর্ম শেষে একই থেকে গেছে। আসলে, লেখিকার একমাত্র লক্ষ্য জয়াবতীই, প্রতিভা সেখানে লক্ষ্যপূরণে যেন বা যান্ত্রিক উপায় মাত্র। তাই জয়াবতীর ক্ষেত্রে যেমন, প্রতিভার ক্ষেত্রেও তেমনি গল্পের শেষে চরিত্র দুটির শিল্পগত-অসঙ্গতির কিছু দিক পাঠকদের দৃষ্টি এড়ায় না। শেষ চিত্রে প্রতিভা চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি সূক্ষ্ম বিচারে।

বিমলেন্দু পরোক্ষ এক স্বামী চরিত্র। সে যে তার স্ত্রী প্রতিভার স্বভাবগত আধিপত্য বিস্তারী মনের কাছে অসহায়, গল্পের কোনো কোনো চকিত সিচুয়েশানে তার প্রমাণ মেলে। প্রতিভা জোর গলায় হুগলীর প্রশংসা করলে সে নিচু গলায় তর্ক তোলে। শাশুড়ির হিংসার কথা বললে 'বিমলেন্দু ক্ষীণ একটু প্রতিবাদ করে'। আবার স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে বিমলেন্দু মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে মাকে অসম্মান করতেও নির্দ্বিধ: 'তোমার মনটনগুলো আজও কী সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য!' বউ আসার পর সে মাকে এড়িয়ে যায়, কথা বলে কম। স্ত্রীর সঙ্গেই ছুটির দিনগুলো কাটায়। মায়ের সঙ্গে বিমলেন্দুর দূরত্ব তৈরি হয়। এই যে পরিবর্তন বিমলেন্দুর, এর মূলে কাজ করে তার নির্বিরোধী মন ও স্ত্রীর দাপটের চাপা ভীতি।

গল্পে বিমলেন্দুর আকস্মিক মৃত্যু-ঘটনা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সর্বাংশে। প্রতিভার নীরব হয়ে-যাওয়া আর বিধবা মায়ের শাশুড়ি হিসেবে জটিলতম মনস্তত্ত্বের অধিকারী হওয়া— সেখানে আছে তীব্রতম ঘৃণা ও বধূভাগ্যের প্রতি পরিহাস। নিজ সন্তান হারিয়ে জয়াবতীর যে মানসিক-বিকার,—তার মূলে বধূর বিরুদ্ধ ব্যবহার যতটা না দায়ী, তার থেকেও অনেক বেশি নিঃসীম দুঃখের প্রকাশক বধূর প্রতি উন্মাদিনী-সুলভ ঘৃণা। আবার গল্পে বিমলেন্দুর আকস্মিক মৃত্যুকে আশাপূর্ণা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন জয়াবতীর চরিত্র-তাৎপর্যে ইঙ্গিতবহ স্বভাবে, যাতে মনে হতে পারে জয়াবতীর আরাধ্য গৃহদেবতার কাছে আপনার বেদনার নালিশেই এই পরিণাম! বস্তুত তা নয়। যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি মনে নেওয়া যায়, তাতে বিশ্বাস হয়, একটানা বউয়ের অন্যায় দাপট ও আধিপত্য বিস্তারের অহংকারে পর্যুদস্ত, মায়ের প্রতি অসম্মানে বিভ্রান্ত বিমলেন্দুর মানসিক চাপা ভারসাম্য হারাতেই মৃত্যু ঘটে গেছে। জয়াবতীর ঠাকুরঘরে যাবতীয় অভিমানী, ক্রুদ্ধ, ঘৃণ্য বাসনার প্রকাশের ফল এই মৃত্যু নয়। তাতে ঈশ্বরপ্রেরিত নিয়তিকে মানতে হয়। কিন্তু কোনো শক্তিই মানুষের মৃত্যুসম্পর্কিত পরিণামের ঘোষক হতে পারে না। আর যত কষ্টই জয়াবতীর হোক না কেন, নিজ সন্তানের মৃত্যুকামনা সে করতে পারে না বধূ প্রতিভাকে সরিয়ে রেখে। কোনো মানুষের মৃত্যুকামনায় সেই মানুষের মৃত্যুও হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বাস্তব ব্যাখ্যা তাই বলে। কিন্তু লেখিকা এমনভাবে জয়াবতীর ঠাকুরঘরের ভাবনাকে কল্পনায় সচিত্র করেছেন, যা লেখিকার চিন্তার সীমাকেই অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট (Pointed) করে।

গল্পের গ্রাম্য-প্রতিবেশীদের কেউই Individual হয়ে ওঠেনি, সকলে মিলে মনে, স্বভাবে, ধারণায়, পরচর্চায়, পরনিন্দায় Collective, এই সমষ্টি-জীবন কেবল বধূ ও জয়াবতীর মধ্যে সংঘর্ষের দূরত্বই রচনা করেছে।

চার

'ছিন্নমস্তা' গল্পটি আগাগোড়া সাধু গদ্যে লেখা, সংলাপগুলি চলিতে। কিন্তু সাধু গদ্যে লেখা হলেও সে গদ্যে লেখিকা আদৌ descriptive method গ্রহণ করেননি। তিনি স্বয়ং

সাধুগদ্য কথনে নিজেকে ওতপ্রোত করেছেন। গল্পে উত্তমপুরুষ কথকের ভূমিকাও নেননি আশাপূর্ণা দেবী। descriptive method-এ লেখকের নিরাসক্ত ভূমিকা থাকে, এর ফলে যে চরিত্র-ঘটনা স্বাবলম্বী, স্ব-নির্ভর স্বাধীন বিকাশের উপকরণ হয়, ছিন্নমস্তার লেখিকা তার কথা ভাবেননি। ফলে গল্পটি যেনবা আগাগোড়া লেখিকার পক্ষে বলে যাওয়ার ভঙ্গি নিয়েছে, একটি নিখুঁত গল্প হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। প্রতিভার কথায়, জয়াবতীর ভাবনা-চিন্তায়, বিমলেন্দুর নিশ্চুপ স্বভাবে স্বয়ং লেখিকার ভাবনা, নির্দেশ সদা-সক্রিয় থাকায় সচেতন পাঠকরা তাদের কল্পনায় কোনো অংশ নিতে পারেনি। এক কথায় কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ধরে পাঠকদের ব্যঙ্গাত্মক চিন্তাভাবনার জট মুক্ত আনন্দের স্বাদগ্রহণে ধন্য হয়নি।

গল্পটির শেষতম ভাগে— যা বিমলেন্দুর মৃত্যু দিয়ে শুরু— তার পরের পরিণামী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অংশে প্রতিভার নিজস্ব কোনো কথা নেই, নেই জয়াবতীরও কোনো সংলাপ-বিনিময়। প্রতিভার একেবারে মূক স্বভাব সচেতন বাস্তববোধে আঘাত করে। সর্বশেষ জয়াবতীর যে বিষাক্ত হাসি স্নেহের কৃত্রিম আবরণে— তার প্রামাণ্য দুই বিধবার কোনো সংলাপে মেলে না। আমরা যদি ধরেই নিই, দুই মেরুর বিরোধী স্বভাবে-সংঘর্ষে বউ-শাশুড়ির মধ্যে সম্ভাব্য সখ্যটুকুও 'নৈব নৈব চ', তবু প্রতিভা ও জয়াবতীর— যুগ্ম জীবনের বিপর্যয় একটি বিন্দুতে মিলেও দুটি ব্যক্তিত্বের কি স্ব-রূপ এনেছে তার কোনো টুকরো ছবি শেষে উপহার দেননি লেখিকা। দুজনেই তো বিধবা, সহমর্মী বড় জায়গায়— সেখানে সম্পর্কের সূক্ষ্ম জটিল কোনো দিক বুঝতে পারলে চরিত্র দুটির ও 'সিচুয়েশনে'র বাস্তবতা রক্ষিত হত। শাশুড়ির চোখে বিষাক্ত হাসির ছায়া স্নেহের ছদ্মবেশে— তা লেখিকাই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে শিল্পের বড় মানে গল্পটির সীমা ধরা পড়ে। পরিণামী বাক্যে পাঠকদের ভাববার সুযোগ বিনষ্ট।

প্রধান চরিত্র ধরলে গল্পে ভাবের একমুখিতা রক্ষিত। গল্পের পটভূমি গ্রাম, প্রধান চরিত্র জয়াবতী গ্রাম্য সংস্কারে অভ্যস্ত বিধবা। তার মধ্যে তথাকথিত অশিক্ষা আছে— যা তার ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কার, ঠাকুরপুজোর সংস্কারকে বোঝায়। অশিক্ষা আছে গ্রামীণ উপভাষা, কথ্য শব্দ ব্যবহারেও। গ্রামে 'মাগ', 'মাগী', 'মিন্সে', 'ভাতার' ইত্যাদি শব্দ অবলীলায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় নিচু শ্রেণীর ও নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও। 'মাগ' অর্থে স্ত্রী, তার বিপরীত 'স্বামী' শব্দ 'ভাতার' (অশ্লীলতার ব্যঞ্জনায়), কিন্তু 'মাগী' হল 'বয়স্ক মহিলা'। জয়াবতী বলেছে 'বুড়ো মাগী'। তার ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ এমন — 'গুচ্ছির', 'দেখো দিকিন' ইত্যাদি। এমনকি প্রতিভাও শিক্ষিত হয়ে উচ্চারণ করে 'বিধবা মাগীদের মতন'। এভাবে সচেতন শব্দপ্রয়োগে লেখিকা গ্রাম্য মেয়েদের চরিত্র-বাস্তবতা বজায় রেখেছেন।

'ছিন্নমস্তা' গল্পের আরম্ভ ও শেষ সূক্ষ্ম শিল্পসম্মত। বিবাহ করে বউ নিয়ে বিমলেন্দু বাড়ি ফিরবে সকালের দিকে দশটার গাড়িতে। প্রথমেই লেখিকা যে প্রকৃতি চিত্র এঁকেছেন— 'গাছের মাথা হইতে রোদ নামিয়া উঠানের কোণে পড়িয়াছে' 'এইমাত্র স্কুল

বাড়ির ঘণ্টা পড়ার শব্দ শোনা গেল।'— এই সব বর্ণনায় বোঝা যায়, দিনের উজ্জ্বল শুরু-চিত্রটির তাৎপর্য। জয়াবতীর স্বপ্ন-কল্পনার উজ্জ্বল দিকের ব্যঞ্জনা এখানে। কিন্তু এই স্বপ্নময় আশাব্যঞ্জক শুরুর চিত্র যে বিপর্যস্ত হবে, তার বৈপরীত্য ধরা দেবে পরে। আরম্ভে এমন এক আশাবাদ, পরে হবে চরম নৈরাশ্যের অনুপন্থী। এবং তা দিয়েই গল্পের শেষ। আরম্ভ ও পরিণতির এমন স্বভাবচিত্র অঙ্কনে লেখিকার শিল্পদৃষ্টি প্রশংসনীয়। সমগ্র গল্পের প্রশ্নসূচক কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা দিয়ে যেভাবে বর্ণনাচিত্র অঙ্কিত, তাতে আলংকারিক মাধুর্য মান্য। এই বর্ণনাচিত্রে মেলে আগাগোড়া শ্লেষ।

পাঁচ

আগেও বলেছি, আশাপূর্ণা দেবীর 'ছিন্নমস্তা' গল্পের প্লট যেখানে বিধবার একমাত্র পুত্র বিমলেন্দুর মৃত্যু ঘটায়, সেখানেই গল্পটির প্রচ্ছন্ন কাহিনী ও ঘটনার জটিল সম্পর্কের 'মহামুহূর্ত' বা 'চরমক্ষণ'। আবার 'থিম'-এর কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে সেখানেই গল্পটির এমন নামের গভীর তাৎপর্য নিহিত। বিমলেন্দুর আকস্মিক মৃত্যুঘটনাই গল্পের নামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের একাধিক ব্যঞ্জনা-নির্ভর দিক দেখায়, নামের ভিতরের অর্থের বিস্তার ঘটায়। মৃত্যুর ঠিক আগেই লেখিকা প্রধান চরিত্র জয়াবতীকে তার পারিবারিক গৃহদেবতার ঠাকুরঘরে নিয়ে গেছেন। সেখানেই বধূ প্রতিভা ও শাশুড়ির যুগ্ম সম্পর্কের তীব্রতম সংঘর্ষ ও সংকটকে এক স্থায়ী শমে এনেছেন। জয়াবতীর ঠাকুরঘরে অবস্থানকে লেখিকা স্বয়ং রহস্যময় ব্যাখ্যায় দেবতা-নির্ভর নিয়তির ইঙ্গিত দিতে সচেষ্ট হয়েছেন! এটাতেই আমাদের সংশয়!

জয়াবতীর কাছে প্রতিভার অপবাদ-দেওয়ার চরম কুৎসিত লোভের প্রসঙ্গটি অসম্মানের চরম দিকে আঙুল তোলে। ঠাকুরঘরে তার নিত্য-নৈমিত্তিক পূজ্য দেবতার কাছে জয়াবতী কি বাসনা জানাতে পারে? প্রতিভার চরম শাস্তি মৃত্যুকামনা, নাকি নিজ পুত্রের কাছ থেকে নিজের চিরমুক্তির আর্তি, অথবা প্রতিভা ও বিমলেন্দুর জীবন-সর্বনাশ? জয়াবতীর অন্তিম বাসনার একটা দিক— 'প্রতিভার মত একটা তুচ্ছ প্রাণ তার দর্পচূর্ণ করিতে একেবারে গদাটারই প্রয়োজন হইল বীরপুরুষের?' আরও একটি লেখিকা-কল্পিত জয়াবতীর মনোলোকের গোপন ভাষ্য: 'প্রতিভার দর্পের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারিণীর পাঁজর ক'খানাও চূর্ণ করিয়া বসিবে, সে বোধও রহিল না? এমনি বেহুঁশ?'

এইসব কামনায় একটি হল প্রতিভার মৃত্যু, দ্বিতীয় হল বিমলেন্দুর মৃত্যু— যাতে প্রতিভা হয় বিধবা, তৃতীয় হয়তো হতে পারত নিজ মৃত্যুর প্রবল বাসনা! বাংলা কথাসাহিত্যে একাধিক প্রমাণ মেলে— যেখানে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিয়ে ছেলের আবার বিবাহ দেওয়ার বাসনা ও আরও বেশি বরপণ পাওয়ার সুযোগ গ্রহণের চিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা', জগদীশ গুপ্তের "পয়োমুখম" গল্পের কথা মনে পড়ে। লেখিকা সেদিকের ইঙ্গিত দেননি। কিন্তু বিমলেন্দুর মৃত্যু বাস্তবত সংঘটিত হওয়ায় হয়তো কোথাও বুঝি

'জয়াবতীর' প্রতিভাকে শাস্তি দানে তার বৈধব্যকেই চেয়ে থাকতে পারে!

এখানেই 'ছিন্নমস্তা' নামের একটি তাৎপর্য মেলে। জয়াবতীর গোপন কামনা বাসনা যদি প্রতিভার বৈধব্যকেই কেন্দ্রে রাখে তবে তা বিমলেন্দুর মৃত্যুর কারণ নয়। কোনো পার্থিব মানুষের চাওয়ায় একজনের মৃত্যু সংঘটিত হয় না। বিমলেন্দুর মৃত্যু জয়াবতীর রহস্যময় অসুস্থ কোনো চাওয়ার কাকতালীয় ব্যাপার! আসলে বিমলেন্দুর মৃত্যু তার চরিত্রন্যায়ে ধরা— এ বিষয়ে আমরা আগেই কিছু আলোচনা করেছি।

সে যাই হোক, বিমলেন্দুর আকস্মিক মৃত্যু গল্পের পরিণামে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে যেমন যথেষ্ট সহায়তা করেছে, তেমনি গল্পের নামের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে শিল্পের মান ও ভারসাম্য এনেছে। 'ছিন্নমস্তা' শব্দটি এক পৌরাণিক দেবী-নামে মেলে। মহাভারত পুরাণে আছে, পার্বতীকে শিব দক্ষের যজ্ঞে যেতে নিষেধ করলে দেবী পার্বতী নিজের বিভূতি ও স্বরূপ দেখাতে নিজের দশটি মহাবিদ্যারূপ দেখায়। তাতে শিব অভিভূত হয়ে সতীকে যজ্ঞে যাওয়ার অনুমতি দেয়। সেই দশটি মহাবিদ্যার পঞ্চম দেবী হল 'ছিন্নমস্তা'। অন্য নাম চণ্ডিকা। এই মূর্তি সব থেকে বেশি ভয়ঙ্করী (malignant), এর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য— বাঁ হাতে ধরা নিজের কাটা মাথা, আর নিজের কাটা গলা থেকে রক্ত খেয়ে চলেছে নিজেই। এই রক্তপানে ব্যস্ত তার দুই সহচরী— বাঁদিকের ডাকিনী, ডানদিকের বর্ণিনী। সকলেই দিগম্বরী মুণ্ডমালিনী ও মুক্তকেশী। এই দেবী প্রসন্ন হলে উপাসকরা শিবত্ব পায়। বুদ্ধপুরাণ মতে 'বজ্রযোগিনী হল সনাতনী ছিন্নমস্তা'। এই পুরাণের ছিন্নমস্তার যে দিকটি লেখিকা নামের ব্যঞ্জনায় বোঝাতে চেয়েছেন, তা হল— দেবীর নিজের হাতে নিজের মাথা কাটা ও নিজের রক্তপান করা।

'ছিন্নমস্তা' গল্পে জয়াবতীর যে সক্রিয়তা, তা যেন ছিন্নমস্তার অনুরূপ। বধূ প্রতিভার সঙ্গে সংঘর্ষে মেতে জয়াবতী চরমক্ষণে তার নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে। পুত্রকে হারিয়েছে, প্রতিভার মতো তরুণী বধূকে বিধবার স্বরূপে নিজের কাছে রাখতে হয়েছে। যেন নিজের হাতেই নিজের দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নেওয়া! এই ব্যাখ্যায় নাম কিছুটা শিল্প-সমর্থন পায়।

জয়াবতীর সহনশীলতা আরও কাম্য ছিল। তরুণী বধূ প্রতিভার সঙ্গে সংঘর্ষে নামা ও চরম অপমানের মুখোমুখি হওয়া জয়াবতীর দিক থেকে ঠিক হয়নি। চরমতম নিরাসক্ত থেকে নতুন প্রজন্মের কাছে তার আত্মসমর্পণেই তার মঙ্গল হত। তা সে করেনি। তাই ভাগ্যের লিখনে জয়াবতী আত্মধ্বংসে পরাজিত, পুত্রের মৃত্যুতে তার নৈতিক পতন ব্যঞ্জনা পায়। নিজে বিধবা হয়ে বিধবা প্রতিভার সমস্তরে এসে দাঁড়ানো পৌরাণিক দেবী ছিন্নমস্তার মতোই বেঁচে থেকেও বিকৃত আত্মহননের আভাস দেয়। নাম জয়াবতীর স্বভাব ধরে এমন ব্যঞ্জনা পায়।

প্রতিভার দিক থেকেও 'ছিন্নমস্তা' নামের যৌক্তিকতা মেলে। প্রতিভা আধুনিক শিক্ষিতা বধূ। স্বামীই তার জীবনের একমাত্র নিরাপত্তা ও আশ্রয়, তার সমগ্র জীবনের

উজ্জ্বল শপথ। সে স্বামী পেয়েছে জয়াবতীর জন্যই। প্রতিভার উচিত ছিল কিছু সখ্যতার মধ্যে থাকা— জয়াবতীর সঙ্গে সম্পর্কে। কিন্তু তার দম্ভ, অহংকার, স্বার্থপর কামনা-বাসনা, স্বামীর ওপর কর্তৃত্ব ও অধিকারবোধ তাকে অন্ধ করে দেয়। স্বামীর সঙ্গে তার মায়ের রক্তের অন্তরীণ সম্পর্ক— তা-ই জীবনের সত্য, শাশ্বত। তাকে বিচ্ছিন্ন করার দিক বস্তুত ছিন্নমস্তার নিজ গলা কেটে রক্তপান করে রক্তখেলায় সামিল হওয়ার দিক। কোনো ঈশ্বরনির্দিষ্ট নিয়তি বিধান নয়, একেবারে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাতেই মানতে হবে, প্রতিভার স্বভাবের যে স্বার্থসর্বস্ব আত্মসুখ ও গর্বিত আত্মপ্রতিষ্ঠার দিক, তা নিজের ধ্বংসকে নিজেরই স্বাগত জানানোর এক বিকৃত বাসনা। এই অর্থে প্রতিভার আচরণ ও জয়াবতীর বাহির ও অন্তরের সক্রিয়তা চরম আত্মধ্বংসের উজ্জ্বল অভিজ্ঞান হয়ে ধরা পড়ে। গল্পের নাম তাই প্রতীকী অর্থে সার্থক। তবে পৌরাণিক ছিন্নমস্তার সিদ্ধরসতুল্য বীভৎস রূপের সমতুল প্রতিভা-জয়াবতীর সম্পর্ক ও সক্রিয়তা— এমন ভাবনায় একটু বা নামের 'রসাভাসদোষে'র অতিরিক্ততা কোথাও বুঝি ধরা পড়ে। কোনো পাঠকের একরম ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে 'ছিন্নমস্তা' গল্পটির শেষতম বাক্যটির দিকে লক্ষ রাখলে স্পষ্ট হবে এমন বিশেষ নামের সঙ্গে চরিত্র ও প্রতিভার সঙ্গে তার তীব্র সংঘর্ষের আরও এক মাত্রা। গল্প শেষ জয়াবতীর প্রতিক্রিয়া দিয়ে। প্রতিভাকে গৌণ করেছেন লেখিকা, যদিও, আমরা আগে বলেছি, এমন পরিণামী চিত্রে জয়াবতীর প্রতিস্পর্ধা, প্রতিভারও কিছু বৈধব্য-পরবর্তী সক্রিয়তা দেখানো উচিত ছিল। দু'য়ের আচারে, সংলাপ বিনিময়ে এদের থাকত শিল্পের বাস্তব ভিত্তি। যাই হোক জয়াবতীর দায়িত্ব গল্পের শেষেও মেলে তার শাশুড়ি-সত্তা ও মাতৃসত্তার বিকাশধর্মে। একজন বধূর কাছে শাশুড়ি মানেই মা—বকলমে। গল্পে জয়াবতী প্রতিভার মা। দ্বিতীয়ত, সে বিমলেন্দু অর্থাৎ স্বামীর প্রত্যক্ষ মা। দুই সত্তায় গল্পের মূল অংশে জয়াবতীকে দেখি। সে প্রতিভার স্বভাবে, কথায় বিস্ময় থেকে ক্রমশ চরম অপমানিত হয়, আবার তার নিজের পুত্রের কাছ থেকেও অপমান পায়। বাইরের মেয়ের অপমান— যতই মেয়ের সম্পর্ক মানা হোক, অসহনীয় এক শাশুড়ির কাছে, কিন্তু সেই শাশুড়ি যখন পুত্রের প্রত্যক্ষ মা, তখন নিজ সন্তানের কাছে অপমানিত হলেও হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, আত্মার সম্পর্কে একটা ক্ষমা লেগে থাকবেই।

তাই গল্পের শেষে জয়াবতীর যে বিষাক্ত হাসির কথা বলা হয়েছে লেখিকার দিক থেকে, তাতে পুত্রের প্রতি জয়াবতীর কোনো লক্ষ ধরা পড়েনি। বিষাক্ত হাসির মধ্যে শুধু 'হাসি'টুকু ধরলে তার প্রধান তিনটি মাত্রা— ১. সে প্রতিবেশীদের কাছে হাসির ওপর ছদ্মছায়া রেখে আত্মগোপন করে, প্রতিবেশীদের ধারণায় যে 'পাগল' হয়নি, আত্মহননে লিপ্ত হয়নি, পরিবারের দৈনানুদৈনিক কাজে বধূর ওপর প্রতিশোধ নিয়ে কর্মহীন, অলস জীবনও বরণ করেনি। প্রতিবেশীরা তার কণ্ঠে বধূর প্রতি মমতার ও মহানুভবতার মাত্রা

বেশি অনুভব করে বিচলিত হয়। তাদের কাছে জয়াবতীর স্নেহ-বিগলিত করুণ স্বর শোনায় করুণতর অনুরোধ-উপরোধের সময়, তাদের কাছে তার হাসি ছদ্মমনের প্রলেপ।

২. হাসির দ্বিতীয় মাত্রা হল সদ্যবিধবা বধূর দুর্ভাগ্যের প্রতি স্নিগ্ধচ্ছায়া-আবৃত হাসি, নির্মম শ্লেষ। যে বধূ ছিল এতদিন দজ্জাল, অহংসর্বস্ব, দুর্বিনীত, সে আজ একই মঞ্চে তার শাশুড়ির পাশাপাশি, ভাগ্যের কী এক নির্মম পরিহাস! তাই হাসিতে স্নেহের আবরণে আসে শ্লেষ।

৩. 'হাসি'র বিশেষণ হয়েছে 'বিষাক্ত'। এখানেই হাসির তাৎপর্য গভীরতম। ছিন্নমস্তা স্বভাবে জয়াবতী যেভাবে নিজেকে নিঃশেষ করেছে, তাতে পরিণামে সে বিধবা বধূর দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছে, নিজ সন্তানকে অকালে হারিয়েছে। এর মূলে সে জানে, বিশ্বাস করে বধূই দায়ী। মেয়েদের এবং আমাদের জাতীয় লোকাচারের প্রথাবদ্ধ সংস্কারে বলা হয় বউ 'অপয়া' হবে স্বামী আগে মারা গেলে। স্বামীর মৃত্যু বউ-এর চরম দুর্ভাগ্যের স্মারক। জয়াবতী বিধবা বধূকে ত্যাগ করেনি, তাকে রেখে তার সেবা করে গেছে নিজের বৈধব্যের সঙ্গে সমতা রেখে। কিন্তু তার স্বরূপ কী? গভীর চরম ঘৃণা, উদাসীনতা, উপহাস, প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য, ক্রোধ, উপেক্ষা। সমস্ত কিছুর সমীকরণেই হাসি তাই বিষাক্ত, সুস্থ জীবনবিমুখ। যতদিন বেঁচে থাকবে, জয়াবতীকে এই বিষাক্ত হাসি নিয়ে বধূর পাশে কাটাতে হবে। এ এক নির্মম জীবননিয়তির পরিহাস। যে নারীর নিজ সন্তান হারাবার পর, তার জীবিত বিধবা বধূর সমস্ত অপমান নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করে জীবনযাপন, তার তো চিত্র এমনই: 'দুই চোখের কোলে কালির রেখা আর গালের হাড় দুইটা একটু-উঁচু দেখানো ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না।' জয়াবতীর এই রূপ, তার অন্তিম স্বরূপ, তার ট্র্যাজেডির নায়িকা হওয়ার উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে সখ্যতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে— তার এই পরিণাম 'ছিন্নমস্তা'র আত্মধ্বংসী স্বভাবের মতোই।

কোনো কোনো সমালোচক জয়াবতীকে একই সঙ্গে বিজিত ও বিজেতা ভাবতে পারেন বধূর সঙ্গে সংঘর্ষে। আসলে এই বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি আদৌ শাশুড়ি-বধূর পারস্পরিক যুদ্ধ-সংঘর্ষের গল্প নয়। এটা না-বোঝার কারণেই বিচারকের এমন বিষম ভ্রান্তি। দুজনের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সমস্ত মানবিক সম্পর্কের যাবতীয় বিনাশ এর মূলে সক্রিয়। শাশুড়ির জয় আর সদ্য বিধবা বধূর পরাজয়— এই ভাবনা গল্পে কোথাও নেই। লেখিকার নিজস্ব বলার ইঙ্গিতেও তা মেলে না। দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত, কার্য-কারণে বাস্তব শিল্পভাবনার অনুগ। ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরে ঢোকার আগে পর্যন্ত জয়াবতীর যে ক্রমিক জটিল মানস উন্মোচন, সেখানেই এর শিল্পের স্বচ্ছ আলো। জয়াবতীর হাসি তাই, তীব্রতম বিষাক্ত স্বভাবে এক বিধ্বস্ত-জীবন গ্রামীণ-মায়ের। তার অশিক্ষা, সংস্কার, প্রথানুগত্য— এসবকে ছাড়িয়ে এক সর্বজনীন মা-সত্তা— যার মধ্যে শাশুড়ি-সত্তা ও জননী-সত্তা— দুই মায়েরই বিষাদকরুণ গভীর ব্যথাদীর্ণ, হৃদয়

বিধ্বংসী মেলবন্ধন ঘটে চলে। জয়াবতী তার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আদৌ দায়ী নয়, তাব বউমাকে জব্দ করার জন্যও সে ঠাকুর ঘরে ঢোকেনি, ঢুকলেও তার মধ্যে এমন ভাবনা বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তব চরিত্র-ন্যায়ে ধরা পড়ে না। প্রতিভা বিধবা হয়েছে, এতে শাশুড়ির জয়— এই ভাবনা চরিত্রটির মূল শক্তি বোঝার পক্ষে সমালোচকের সুস্থ ধারণার অভাব। বিমলেন্দুর মৃত্যুর মতো একটি বহির্ঘটনার জেরে প্রতিভা বিধবা! এতে শাশুড়ির ওপর কী-ই বা দায়-দায়িত্ব চাপে? জয়াবতীর কোথায় পরাজয়? সে জয়-পরাজয়ের ঊর্ধ্বে এক চরম ট্র্যাজেডির ভয়ঙ্কর উপকরণ— তা জীবন-নিয়তির নির্দেশক, সংকীর্ণ শাশুড়ি-বউয়ের পারিবারিক সামাজিক সম্পর্কে বাঁধা নয়। শেষ বিষাক্ত হাসির চিত্র বোঝায়— জয়াবতী বেঁচে থেকেও প্রচ্ছন্ন স্বভাবে একজাতীয় উন্মাদিনী, কৃত্রিম কর্মের যন্ত্র ও যন্ত্রের চালক— যন্ত্রী। প্রতিভার সঙ্গে বৈধব্য-পরবর্তী সমস্ত আচার-আচরণে সে কৃত্রিম, সমস্ত মানবিক অনুভূতিহীন, এক অমোঘ নিয়তির স্বচ্ছ চালিকা। পুরাণে দেবী ছিন্নমস্তারও নিয়তি তথা মৃত্যু হয়েছে দক্ষের কাছে কন্যার স্থান বদল করে। তা আসলে এক রূপক।

জয়াবতীর স্থান বদল নিজেকে বোঝার ও প্রতিভাকে বোঝাব ও সহনশীল করার অক্ষমতায়। এখানেই তার দুই প্রজন্মের মাঝখানে ট্র্যাজেডি ঘটাব 'রন্ধ্রপথ' (tragic flaw)। গল্পনামে তাই ছিন্নমস্তার এমন পৌরাণিক প্রয়োগ অ-যথার্থ নয়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত